দর্পণ

১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৪শে জানুয়ারী ১৯৭৫ ॥ ৪০ পঃ

পরীক্ষায় টোকাটুকির মহোৎসব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষা নিয়ে কেলেঙ্কারীর অন্ত হল। অথচ কর্তৃপক্ষ মুখ খুলেন-না। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের এই পরীক্ষা গত সপ্তাহে টোকাটুকির ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, জনৈক শিক্ষামন্ত্রীর পুত্র পরীক্ষার্থী হওয়ায় ইনভিজিলেটার ছাড়াই এ পরীক্ষা হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। গত সপ্তাহে ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষার একটি পত্রের খাতা এমনকি তিন আটটার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামকের দপ্তরে জমা পড়ে। ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ব্যাপার বলে অধ্যাপকরা আর ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না।

ডাক্তারী পরীক্ষারও একই হাল। তারা জানুয়ারী ফার্স্ট ও ফাইনাল এম বি বি এস পরীক্ষা শুরু হয়। কলকাতার চারটি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পরীক্ষার চেহারা দেখে পরিদর্শক অধ্যাপকরা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন খ্যাতনামা অধ্যাপক আর জি কর, নীলরতন, ন্যাশনাল ও কলকাতা মেডিকেল কলেজে ঘুরে উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের কাছে আবেদন নিবেদন নিয়েছেন, "স্যার আর আমাদের ডাকবেন না। যা চলছে, তা চোখে দেখা যায় না।" ডাক্তারী পরীক্ষায় টোকাটুকির সংবাদ কলকাতার দুটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর কেন্দ্র পরিদর্শক দুজন ছাত্রকে টেলিফোনে ভয় দেখান এমনকি ছাত্রদের চাপে চারটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষরা সব কেন্দ্রেও টোকাটুকি হয় নি বলে ঘোষণা দিতে বাধ্য হন।

বি এ, বি এস সি, বি-কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষার হলেও একই চিত্র। পরীক্ষায় টোকাটুকির মহোৎসবের দৃষ্টান্ত বিরল বলেই অধ্যাপকদের অভিমত। সব কিছু দেখেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ।

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী ছাত্র-যুবক ঐক্য আলোচনায় অচলাবস্থা

ছাত্র পরিষদের কর্মসমিতির তেতাল্লিশ জন সদস্যের যে সর্বসম্মত তালিকায় প্রদীপ ভট্টাচার্য স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই তালিকাভুক্ত কিছু কিছু নামের পাশে প্রদীপবাবুর অজ্ঞাতে সুব্রত মুখার্জী নিজ উদ্যোগে পদাধিকার উল্লেখ করে দেওয়ায় ছাত্র-যুবদের ঐক্য আলোচনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর পক্ষে প্রদীপ ভট্টাচার্য ও ছাত্র পরিষদের পক্ষে সুব্রত মুখার্জীকে কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা রচনা করার ভার দেওয়া হয়েছিল। সেই মত প্রদীপবাবু ও সুব্রতবাবু আলোচনায় বসেন। প্রদীপবাবুর দেওয়া আঠারো জন সদস্যের নামের তালিকা পাওয়ার পর সুব্রতবাবু তাদের পক্ষের পঁচিশ জনের নাম দেন। উভয়গোষ্ঠীর লোক নিয়ে গঠিত হয় তেতাল্লিশ জনের প্রদেশ কমিটি। এই নামের তালিকায় প্রদীপবাবু ও সুব্রতবাবু স্বাক্ষর করেন। কথা হয় আবার একদিন বসে অফিস বেয়ারার-এর নামগুলো ঠিক করে ফেলা হবে।

কিন্তু সুব্রতবাবু দুম করে এক কাণ্ড করে বসলেন। প্রদীপবাবুর স্বাক্ষরিত তালিকায় অফিস বেয়ারারদের নামের উল্লেখ ছিল না। সুব্রতবাবু কুমুদা ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে প্রদীপবাবুর স্বাক্ষরিত কমিটি সদস্যদের নামের তালিকার মধ্যে কয়েকজনের নামের পাশে পাশে চটপট কাকে কি পদ দেওয়া হল তা উল্লেখ করে দেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের জন্যও প্রেসে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য পদাধিকারীরা সবই

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

উটপাখী

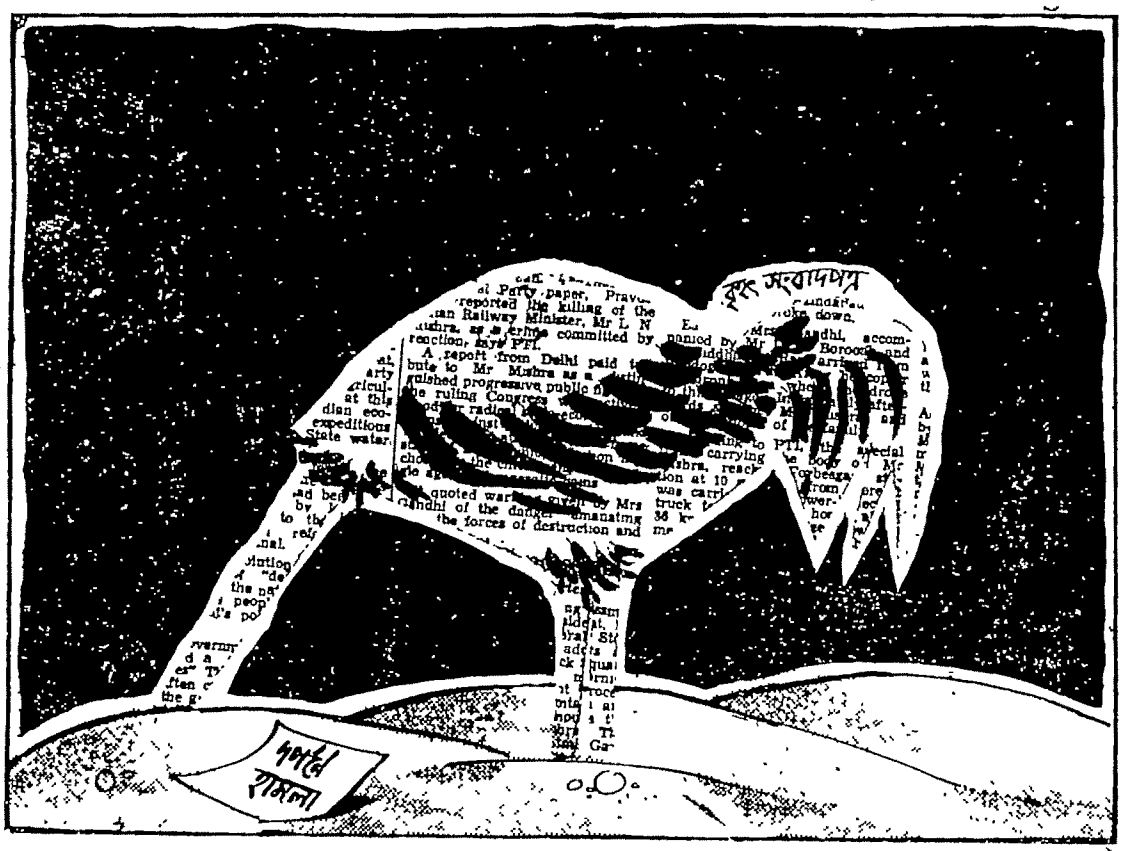

বারিদ দাস বনাম অনন্ত ভারতী ঠাণ্ডা লড়াই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতা জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যুব নেতা ও ঐ জেলার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক বারিদবরণ দাস ও জেলা কংগ্রেস সভাপতি অনন্ত ভারতীর মধ্যে আবার ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

এ আই সি সির নির্দেশে সমস্ত প্রদেশ ও জেলাগুলিতে যে নারেয়া ধরণের সম্মেলন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার ভিত্তিতে উত্তর কলকাতার বারিদবরণ গোষ্ঠী একটি সম্মেলন করার তোড়জোড় শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে বারিদবাবুরা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী ও উত্তর কলকাতার প্রভাবশালী নেতা প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে সভাপতি করে একটি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করেন।

বারিদবাবু বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর তাত্ত্বিক নেতা। সেই সুবাদে রাজনৈতিক কলাকৌশল নির্ধারণের প্রশ্নে তিনি এই গোষ্ঠীর হয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকেন। বারিদবাবু এই কমিটিকে একটি নিরপেক্ষ রূপ দিতে পাল্টা গোষ্ঠীর রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা ও নন্দলাল ব্যানার্জীকে প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম সহঃ সভাপতি করেন। বারিদবাবুর এই চালে কংগ্রেস সভাপতি অনন্ত ভারতী খুব বেকায়দায় পড়ে গেছেন।

বারিদবাবুরা যখন এ-ব্যাপারে তোড়জোড় করছেন তখন অনন্তবাবু **প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাছে** এক চিঠি লিখে তার নেতৃত্বে জেলা সম্মেলন সংগঠিত করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসের অনুমতি চেয়ে পাঠান। অনন্তবাবুর পনেরোই জানুয়ারী তারিখে লেখা এই পত্রে অরুণ মৈত্র অনন্ত ভারতীর দাবী নাকচ করে দেন এবং এক নোটে প্রদেশ কংগ্রেসের দুই সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম ও সৌগত রায়কে নির্দেশ দেন তাঁরা যেন ঐ জেলার সম্মেলন উপলক্ষে উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে একটি সর্বসম্মত কমিটি গঠনে সাহায্য করেন।

অরুণ মৈত্রের এই মন্তব্যে বারিদবাবুরা সম্মেলনের নেতৃত্বের ব্যাপারে বেশ কিছুটা আপার হ্যান্ড পেয়ে গেলেন। কারণ ইতিমধ্যে তাঁরা যে কমিটি করেছেন তাতে উভয় গোষ্ঠীর লোকই রাখা হয়েছে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ পদ থাকছেন বারিদবাবুদেরই নিজেদের লোক।

সম্পাদকীয়

দর্পণের নতুন বছর

দর্পণ এই সংখ্যা থেকে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। বাংলা সংবাদপত্রের জগতে এই ঘটনা স্মরণীয় এই কারণে যে, কোন বৃহৎ পুঁজি-বিজ্ঞাপনদাতা বা কোন রাজনৈতিক দলের পয়োয়া না করেই দর্পণ গত সতেরো বছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। ব্যক্তিমানুষ ও জাতির জীবন তো বটেই, শুধুমাত্র কালের বিচারেও সতেরো বছর অতি দীর্ঘ সময়। কিন্তু কৈশোর ছেড়ে সাবালকত্বের বয়স অর্জন করলেও দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকদের মতই দর্পণের সামনেও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

১৯৫৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী দর্পণ যখন প্রকাশিত হয় তখন সমস্ত রাজ্যে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট। এখনও তাই। কিন্তু এই দুই গভর্ণমেন্টের আচার আচরণ ও মনোভাবে একটা প্রচণ্ড ফারাক দেখা যাচ্ছে, যদিও দুই গভর্নমেন্টের চরিত্রে কোন তফাৎ নেই। কংগ্রেস দল ও প্রশাসনে এবং মন্ত্রী ও এম এল এদের মধ্যে দুর্নীতি তখনও ছিল। কিন্তু সেটা আজকের মত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। প্রাক্তন কংগ্রেস গভর্নমেন্টের আমলে গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান যে সবসময় সর্বক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে তাও নয়। তা সত্ত্বেও দেশে মোটামুটি একটা লিবারেল বা উদারনীতির আবহাওয়া তাঁরা বজায় রেখেছিলেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট তখন এমন তীব্র আকারে দেখা দেয়নি। এই পরিস্থিতি বামপন্থী তথা ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের টিকে থাকার পক্ষে অনুকূল ছিল। যদিও তাদের আর্থিক অবস্থা কোনদিন অস্তিত্ব রক্ষার সংকটকে অতিক্রম করতে পারেনি।

কিন্তু সেদিন দেশের সামনে আশা ছিল, আশা ছিল ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক কংগ্রেস গভর্নমেন্ট উৎখাত হবে, নতুন শাসকরা আসবে, সমাজ ব্যবস্থার বদল হবে, জনগণ শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবে। সেই আশা আজ সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ। ভারতের ভাগ্যবিধাতা এখন চোরবাটপাড় খুনে বদমায়েসের দল। তাদের সর্বাধিনায়ক ইন্দিরা গান্ধী নামে এক মহিলা। বামপন্থীদের শ্লোগান আত্মসাৎ করে এরা সাধারণ মানুষের ওপর লাঠি ঘোরাচ্ছে।

এই অবস্থায় দর্পণের মত বামপন্থী সংবাদপত্রের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দর্পণ দলনিরপেক্ষ পত্রিকা, কিন্তু যেখানে শোষকদের সঙ্গে শোষিতের সংগ্রাম, যেখানে অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের সংগ্রাম, সেখানে দর্পণ নিরপেক্ষ নয়, স্পষ্টত শোষিতের

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

রেল-প্রশাসন ও ধর্মঘটোত্তর পরিস্থিতি (১)

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

প্রায় আট মাস হতে চললো রেলধর্মঘটের অবসান হয়েছে। আশা করা গিয়েছিল যে, ইতিমধ্যে এই শিল্পে সরকার-শ্রমিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে এবং রেল চলাচলেও উন্নতি ঘটবে। আশা করা গিয়েছিল যে, নিঃশর্ত ধর্মঘট প্রত্যাহারকে সরকার নিজস্ব জয় মনে করে কোন প্রতিহিংসাত্মক আচরণে উদ্বুদ্ধ হবেন না। দেশবাসীর অনুরোধ তো তুচ্ছ, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের ছাঁটাই বে-আইনী ঘোষণা সংক্রান্ত রায়কে পর্যন্ত ইন্দিরাজীর সরকার গগনস্পর্শী দম্ভ নিয়ে পদদলিত করেছে এবং করছে। এমনকি সংসদে জনপ্রতিনিধিদের কাছে পর্যন্ত সরকার এখনও ছাঁটাইয়ের অসত্য পরিসংখ্যান পেশ করে নিজেদের পাশবিক উল্লাস চরিতার্থ করছেন। কিছুদিন আগে সংসদে ডেপুটি রেলমন্ত্রী ভুট্টা সিং বরখাস্ত কর্মীর সংখ্যা বলেছেন ৪১৫৭ জন। অর্থাৎ টেম্পোরারী, সাবস্টিট্যুট এবং ক্যাজুয়ালদের সংখ্যাটি তিনি বেমালুম চেপে গেছেন। অথচ, ঐ ঐ বিবৃতি দানের সময় বরখাস্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩১০৫৬ জন। প্রশ্ন হচ্ছে সরকার রেল চলাচলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী কিনা? রেল শ্রমিক কর্মচারীরা যথেষ্ট সহনশীলতা এবং আন্তরিক সহযোগিতার পরিচয় দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, কিন্তু তাদের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ যে আবার একটা সংঘর্ষের কালো মেঘ পুঞ্জীভূত করে তুলছে এবং তার পরিণতি যে ভয়ঙ্কর সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। সরকার যদি ভেবে থাকেন যে রেল ধর্মঘটে তারা একতরফা বিজয়ী হয়েছেন তবে তাকে মূর্খের স্বর্গে বাস করা ছাড়া কিছুই বলা যাবে না। এখনও প্রায় বাইশ হাজার কর্মী বরখাস্ত বা হয়ে আছেন। তার ওপর নতুন করে সাসপেনশনের আদেশ জারী করা হচ্ছে, গ্রেপ্তার চলছে, চলছে খামখেয়ালী বদলীর আদেশ জারী। উপরন্তু, কর্মীদের পাওনা দেওয়া হচ্ছেনা, টি এ বিল শোধ করা হচ্ছে না এবং পাঁচ দিনের স্থলে দেওয়া হচ্ছে তিন দিনের টি এ যদিচ ইন্সপেকশনের নামে বড় বড় অফিসারদের খাতে ঢালাওভাবে অপচিত হচ্ছে জনসাধারণের অর্থ। এই ইন্সপেকশনের মোদ্দা ফল হচ্ছে এই যে, গাড়ী চলাচল আরও অনিয়মিত হয়েছে। পাশাপাশি, শ্রমিক বিক্ষোভ ক্রমবর্ধমান।

ছাঁটাই সংখ্যার আংশিক তালিকা

সারা ভারতে এখনও যারা বরখাস্ত হয়ে আছেন স্থানাভাবে তাদের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। পূর্ব রেল— ২৬২২, দক্ষিণ-পূর্ব রেল— ৩৬৬৭, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল— ২২৮৪, দঃ রেল ৫১৪, উঃ পূঃ রেল—৫৩৮, উঃ রেল—৩৩৩, মধ্য রেল— ২৩০, দঃ মধ্য রেল—৯৮, ডিজেল লোকোমটিভ—২১, ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী—৪ এবং সারা ভারতেই এই চেহারা। এন সি সি আর এস এর পক্ষ থেকে জি এম এর কাছে ডেপুটেশন দিলে বলা হচ্ছে ডি এসরা (বিভাগীয় প্রধান) ক্লিয়ারেন্স না দিলে কিছু করা যাচ্ছে না, আবার ডি এস-দের কাছে ডেপুটেশন দিলে বলা হচ্ছে যে, আরা ওপরওয়ালার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছেন। অথচ, স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাইকে কলকাতা কোচিন, হায়দ্রাবাদ এবং গুজরাট হাইকোর্ট বে-আইনী ঘোষণা করেছে।

সরকার হাইকোর্টকে অমান্য করছেন

টেম্পরারি, সাবস্টিটিউট এবং ক্যাজুয়ালদের ছাঁটাইকে কলকাতা কোচিন এবং হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট এক বাক্যে বে-আইনী ঘোষণা করেছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে, এদের পাওনা মিটিয়ে না দিয়ে ছাঁটাই আদেশ জারী করা হয়েছে বলে তা বে-আইনী। সরকার সংগে সংগে উক্ত কর্মীদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে নতুন করে ছাঁটাই নোটিশ জারী করেছে। কোচিন এবং হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট কিন্তু শ্রমবিরোধ আইনের (আই ডি এক্ট) ২৫ (এফ) (এইচ) ধারা লংঘনের অজুহাতে ছাঁটাই বে-আইনী ঘোষণা করছেন। এই ধারায় বলা হয়েছে, (এক)লাস্ট ইন,, ফার্স্ট আউট অর্থাৎ জুনিয়ারদের রেখে সিনিয়ারদের ছাঁটাই করা যাবে না। (দুই) কোন কর্মীর বিরুদ্ধে পেনাল একসন নিতে হলে বিধিসম্মতভাবে ইনকোয়ারি বোর্ড বসাতে হবে এবং অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে সরকার কোনটিই পালন তো করেনই নি, বরং বাপ ধর্মঘটে যোগ দেবার অপরাধে পুত্রদের বরখাস্ত করা হয়েছে। নজির ধানবাদ ডিভিশনের পাথরিডি লোকো শেডের রাজেন্দ্র শা, এস কে পাল, মেহবুব আলম, জে বি সিং, মহেশ প্রসাদ প্রমুখ দশ জন। পারমেনেন্ট কর্মীদের ১৪(২) রেলওয়ে সার্ভেন্টস এ্যাক্ট (ডি এ) ধারাবলে অপসারণের আদেশকে সরাসরি বে-আইনী ঘোষণা করেছেন কলকাতা এবং গুজরাট হাইকোর্ট। বলা হয়েছে,

"It is declared that the impunged order is a nutility and the petitioner continues in service."

কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি অমিয় মুখার্জী আইনের চুলচেরা বিচার করে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অসসারণের আদেশটক বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছেন। গুজরাট হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি জে ঠক্কর তাঁর মূল্যবান রায়ের সূত্রপাতেই বলেছেন, "ঝোলের পাত্রে পড়া মাছির শিরাচ্ছেদ করা হয়েছে।

(They have been accorded lesser consideration than is shown to a fly in a bowl of soup and have been economically beheaded with greater nonchalant than is exhibited in flicking away a speck of dust from one's coat.)

মাননীয় বিচারপতি বলেছেন,

"One has to visualise the plight of hundreds of workers and their innocent family members, should their lives and meagre resources be expanded in litigations? Now is the time and the opportunity for the establishment to show magnamity and also progmatism and to save the workers from further suffering."

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের সুপ্রীম কোর্টে আপীলের সম্ভাব্যতা বিচার করে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, মামলা চালানোর প্রশাসনের সময় এবং জনসাধা অর্থের অপচয় ঘটছে। এখানে স যে, সরকার কথায় কথায় বলে যাদের বিরুদ্ধে মামলা আছে কথা এখন ভাবা হচ্ছেনা। তাই হয়, তবে নিজেরা কেন কো রায় অমান্য করছেন? আন্তর্জা শ্রম সংস্থার পক্ষ থেকে ভার রেল কর্মীদের প্রকৃত অবস্থা পর্য বেক্ষণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলকেও এদেশে আসার অনুমতি ভারত সরকার দেননি। তাই সরকারের পক্ষ থেকে অনুদার ও প্রতিহিংসাত্মক আচরণের চিত্র প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। পক্ষান্তরে রেলকর্মীরাও সাময়িক হতাশ কাটিয়ে আবার ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এ মুখ এগিয়ে যাচ্ছেন। সরকারে পক্ষ থেকে আক্রমণ শুধু বাইরে নয়, এন সি সি আর, এস-কে ভাঙার চক্রান্ত চলছে। ডাঙ্গের নেতৃত্বে এ আই টি ইউ সি এবং এ আই আর এফ-এর ফার্ণান্ডেজ বিরোধী গ্রুপে এক্ষেত্রে ভূমিকা খুবই স্পষ্ট।

লোহার দামে কারসাজির ফলে বহু কারখানা বন্ধ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা ও আশেপাশে কলকারখানায় লোহার দাম বেপরোয়া লাফালাফি করায় এবং এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর দুষ্ট চক্রান্তে স্টিলের দাম হেরফের হওয়ার মুহূর্তে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এবং উৎপাদকরা কারবারে তালা ঝোলাতে বাধ্য হচ্ছে। সরকারের ঋণ সংকোচন নীতি এবং উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ থেমে যাওয়ায় দশ পনেরোটি ইউনিট কলকাতা ও হাওড়া শহরে প্রায় উৎপাদন বন্ধ করেছে।

সম্প্রতি স্টীল অয়্যার ম্যানুফাকচারারস অ্যাসোসিয়েশনের সপ্তম বার্ষিক সভায় সভাপতি কেওয়াল আগরওয়াল সাহেব কাঁচামালের অভাব এবং অয়ার রডের এর চাহিদাভিত্তিক যোগানের ওপর গুরুত্ব দেন।

ইসকো এবং ভিলাইয়ে অয়্যার রডের বন্টন ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু হওয়া দরকার। বিশেষ করে পিন, পেরেক, ক্লিব, স্ক্রু ইত্যাদি এবং সরু হরেক কিসীমের তারের জন্য জিঙ্ক এবং দস্তা লেড দরকার হয়। ঐ দুই কাঁচা মাল এম, এম, টি দ্বারা আমদানী করা হয়।

সম্প্রতি "জিঙ্ক এ্যাণ্ড ইকনমী ইন অয়্যার ইণ্ডাসট্রি" শী সেমিনার ইণ্ডিয়ান ইট ডিপ ভানাইজারস অ্যাসোসিয়ে সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়ে যেখানে সরকারের আয়রণ ও কন্ট্রোলারের ইস্পাত বন্টনের লোচনা করে আমদানী নীতি পুরানো কোম্পানীকে চাহিদা বায়ী মাল দেওয়ার প্রতি থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ন্যায়ের সংগ্রাম, সেখানে দর্পণ পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে। তাই দর্পণের ওপর শুরু হয়েছে নানাভাবে আক্রমণ। গত সপ্তাহে দর্পণ অফিসে ছাত্র পরিষদ গুন্ডাদের ফ্যাসিস্ত হামলায় তারই এক রূপ দেখা গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদালতে বেশ কয়েকটি মানহানির মামলায়ও দর্পণ বিপর্যস্ত। তার ওপর গভর্নামেন্ট নিউজপ্রিন্ট যেভাবে দুর্মূল্য করে তুলেছেন তাতে ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সমূহ সংকট। এই অবস্থায় ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মত দর্পণের সামনেও অন্ধকার ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু আমরা আশাবাদী।

ঐক্য আলোচনায় অচলাবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সুব্রতবাবুর লোক ব্যক্তিক্রম একমাত্র নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য। যাকে তালিকায় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করা আছে।

তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর প্রদীপ ভট্টাচার্য বিস্মিত হয়ে যান। কারণ তিনি যখন স্বাক্ষর করেন তখন শুধু সদস্যদের নামই ছিল অফিস বেয়ারার উল্লেখ ছিল না। সংগে সংগে তিনি এর প্রতিবাদ করেন। এ পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে সুব্রতবাবু প্রদীপ ভট্টাচার্যের প্রতিবাদে সাড়া দেন নি।

এদিকে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ঠিক করেছেন তাঁরা একতরফা ভাবে অফিস বেয়ারার সুব্রতগোষ্ঠীর লোকজনদের করার সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নেবেন না। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মতে শুধু নির্মল ভট্টাচার্যকেই একটি পদ ছেড়ে দিলে চলবে না, তাদের গোষ্ঠীর আরও কয়েকজনকে অফিস বেয়ারার হিসেবে নিতে হবে। এরা হলেন উত্তর কলকাতার সুদিন ভট্টাচার্য, মেদিনীপুরের জগবন্ধু মন্ডল, হাওড়ার কুন্তল ভৌমিক প্রভৃতি। তাছাড়া রঘুপতি সাহাকে ছাত্র পরিষদের কোন পদে না রাখার দাবিও এই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

রঘুপতি সাহা চন্ডীপদ মিশ্র হত্যা মামলায় জড়িত বলে অভিযোগ। নিম্ন আদালতের রায়ে রঘুপতি সাহা সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছে, বর্তমানে রঘুপতি সাহা হাইকোর্টের নির্দেশে জেলে আছেন। এই অবস্থায় এমন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে ছাত্র পরিষদের সংগে রাখার ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ঘোরতর বিরোধী। সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেসও এই নিয়ে আলোচনা করেছেন।

যুব কংগ্রেসের ঐক্য আলোচনাও আর এগোয়নি। যুব কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ছয় জনকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। এ ব্যাপারে আর কোন আলোচনা এখনও হয়নি। মিলিয়ে যুব ছাত্র ঐক্য আলোচনা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অশুদ্ধিমেধ যজ্ঞ

(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক)

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জাতীয় অধ্যা- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ, প্রাক্তন উপাচার্য, খ্যাত- ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। দ্বিধাহীন চিত্তে তারা এইসব বিশ্রুত ব্যক্তিদের নামে প্রকাশিত ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর প্রায় দুখানা বই ছাত্রছাত্রীদের পাঠের "অনুপযুক্ত" বলে রায় দিয়েছেন; সেই সঙ্গে বিগত বৎসরে ঐ দুই শ্রেণীর জন্য প্রকাশিত দুই হাজার তিনশত বত্রিশটি গ্রন্থের পঞ্চাশ শতাংশকেই "অপাঠ্য" বলে বিবেচনা করেছেন।

একটি দৈনিক পত্রের সাংবাদিক বৈঠকের সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্গত প্রশ্ন তুলেছিলেন "অনুপযুক্ত" ও "অপাঠ্য" কথায় ব্যাখ্যা সম্পর্কে। অনুপযুক্ত ও অপাঠ্য অর্থে কী? সাধারণ ভুল? ছাপা- খানার ভুল? কিংবা নির্দিষ্ট মানের অধোগতি অথবা উর্দ্ধগতি? সেক্ষেত্রে কোন কথা খুলে বলেন নি পর্ষদ ব্যবহার করেছেন বহুমুখী অর্থ- দ্যোতক দুটি উদ্দীপক ধোঁয়াটে শব্দ। শুধু তাই নয়, প্রায় বিরক্ত ও ব্রত গৃহস্থের মত পরিশেষে ক্ষমা- ঘেন্না করে বলেছেন ঃ "বইগুলি অন্তত চলতি বছরে বাতিল হচ্ছে না।" এবং "আগামী বছর (১৯৭৬) পর্ষদের পর্যালোচনার রায় অনুযায়ী এই বইগুলি সংশোধিত না হয়, তাহলে সেই সমস্ত বই আর স্কুলের পাঠ্য তালিকায় স্থান পাবে না।"

যুগপৎ এই ধোঁয়াটে শব্দ ব্যব- হার এবং ক্ষমাঘেন্নার মনোভাব আমা- দের মনে পর্ষদের কার্যক্রম সম্পর্কে সন্দেহ হাজির করে। প্রথমতঃ পর্ষদ কেন আরো এক বৎসর বইগুলি চালু রাখার অনুমতি দিলেন তখন পাঠ্যতালিকাগুলির পাঠ্যতালিকা তৈরী করার প্রাক্ মুহূর্তে হঠাৎ এই সংবাদ প্রকাশ করলেন কেন! প্রকাশকদের সর্বনাশ এইভাবে বিঘ্নিত করার পশ্চাতে কোন দুরভিসন্ধি বর্তমান? দ্বিতীয়তঃ পর্ষদ হঠাৎ এইসব নামী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ ঘোষণা করলেন কেন? এ কী আন্তরিক, সততাপ্রসূত "কামলমতি" বালক বালিকা- বার্থরক্ষার সদিচ্ছা প্রণোদিত!

স্কুল পাঠ্য বই অনুমোদনের বিচার করার জন্য পর্ষদ পাঁচশত জন পরীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। পর্ষদ বলছেন যে, অত্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা, প্রতিটি বই দুজন পর্যালোচককে দেখানো হয়েছে। লেখক ও প্রকা- শকের নামঠাম ছিঁড়ে ফেলেই বই দেখানো হয়।" ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি অক্টোবর বইগুলি পাঠানো হয় এবং একুশ দিনের মধ্যে সেগুলি ফেরৎ পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। খুবই গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা সন্দেহ নেই। কিন্তু পর্ষদ তাঁর ঘোষণায় নিজেই যে থালে থেকে বেড়াল বের করে ফেলেছেন, "পর্যা- লোচকদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোষণার মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন নি।" তার মানে, এঁদের নিজেদের বই আছে, এরা কোন প্রকাশক সংস্থার সঙ্গে জড়িত। পাঁচশো জনের মধ্যে এই সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে কত? কখানা করে কোন কোন শ্রেণীর বই আছে এদের? সেই শ্রেণীর সেই বিষয়ের বইগুলি কি তাঁদের নিকট পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয় নি? অশুদ্ধিমেধ যজ্ঞের পুরোহিত হতে গেলে পর্ষদকে সঠিক তথ্য সহ উক্ত বিবরণগুলি প্রকাশ করতে হবে। এর পরের প্রশ্ন এই পাঁচশো জনের নামের তালিকা কারা করলেন? কারা এদের মনোনয়নপত্র দিলেন? নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই কী তা হয়েছে? এ সন্দেহের কারণ অতি বাস্তব; যেহেতু অনেকেই জানেন যে পর্ষদভুক্ত অনেকেই প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কোন কোন প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে জড়িত। এই সব সংস্থার স্বার্থ- রক্ষার গুরুভার দায়িত্ব তাহলে তাঁদের উপর বর্তায়, এবং বর্তায় বলেই এরা মনোনীত সংশ্লিষ্ট পর্যা- লোচকদেরও সেই সেই প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলির পক্ষে এবং অন্যদের বিপক্ষে প্রভা- বিত করতে সচেষ্ট হবেন।

পর্ষদের একজন সুহৃদ এবং অন্যতম পর্যালোচক জানিয়েছেন যে, "অধিকাংশ পাঠ্য বই-এর লেখক নূতন সিলেবাসের বক্তব্যই বুঝতে পারেন নি।" এবং "যার ফল দাঁড়ি- য়েছে কাঁচি চালাও আর আঠা দিয়ে জোড়।" সত্যই, এমন অপূর্ব অবৈ- জ্ঞানিক পাঠ্যসূচীর সারনির্যাস হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি বা সাধ্য মধ্য- বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের থাকার কথা নয়। কিন্তু তারপরেও কথা আছে। এই পাঠ্যসূচী পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় কবে পেয়েছিলেন লেখক-প্রকাশকরা? আজ যে আনন্দবাজার পত্রিকায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অশুদ্ধিমেধ যজ্ঞের বিবরণ সতর্কে ও সযত্নে ছাপা হচ্ছে, সেই আনন্দবাজার পত্রিকাই ১৯৭৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সংবাদ-ফীচার-সম্পাদকীয় মার- ফৎ বলেছিল, নূতন বছরে সাত লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা বিপর্যয়ের মুখে যেহেতু নূতন পাঠ্য সূচী অনুযায়ী বই প্রকাশিত হয়নি এবং তার কারণ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অসীম কর্মতৎ- পরতা। এই কর্মতৎপরতার সঙ্গে সেদিন যুক্ত হয়েছিল রাজ্য মন্ত্রিসভার কর্মতৎপরতা। বাজারে তখন কাগজ নেই, বিদ্যুত নেই। প্রকাশকরা ব্যব- সায়ী সন্দেহ নেই, কিন্তু এতগুলি ঝুঁকি নিয়েও সেদিন তাঁরা পর্ষদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। তা না হলে ভাবুন তো, প্রকাশকরা যদি একতাবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ন্যায়- সঙ্গত ভাবেই রুখে দাঁড়াতেন, কিংবা শৈথিল্য প্রকাশ করতেন তাহলে চুয়াত্তর শিক্ষাবর্ষে নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী কোন বই কী বেরুত?

ত্রুটিকে ত্রুটি বলেই স্বীকার করা উচিত। অত্যন্ত তড়াহুড়োর মধ্যে চুয়াত্তর শিক্ষাবর্ষের বই তিয়া- ত্তরের শেষ দু মাসের মধ্যে প্রকাশ করতে গিয়ে অসতর্কতা ও অমনো- যোগিতাবশত বহু ভুল থেকে গিয়েছে। সেগুলি সমালোচনার যোগ্য। সেগুলি পরবর্তী সংস্করণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশোধন করা উচিত। কিন্তু যে অবিমৃষ্যকারিতা এই ত্রুটির মূল উৎস তা-ও কী সমানভাবে সমালোচনার যোগ্য নয়? মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সত্যই যদি তাঁরা শিক্ষাদরদী হতেন তবে সমালোচনাটা শুরু করতেন আত্মসমালোচনা দিয়েই।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মালদহের বর্ষীয়ান কংগ্রেস (স) নেতা কংগ্রেসী মস্তানদের হাতে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মালদহের বর্ষীয়ান সংগঠন কংগ্রেস নেতা শ্রীবীরেন্দ্র মৈত্র মুখ্য- মন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের উপস্থিতিতে সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী বরকত মিঞা তথা কংগ্রেসের পোষা সমাজবিরো- ধীদের দ্বারা গত চৌঠা জানুয়ারী গুরুতর ভাবে প্রহৃত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তিন দিন তিনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন। ডাক্তারদের মতে তাঁর বুকে সাংঘাতিক চোট লেগেছে। জানা গেছে, তাঁর বিরুদ্ধে বরকত মিঞার নেতৃত্বে কংগ্রেসী সমাজ বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের কথা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পুলিশ অফিসারকে আগেই জানানো হয়েছিল।

মহানন্দা মাস্টার প্ল্যানের অন্ত- র্গত তিলজলা স্লুইস গেট উদ্বোধন উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ- শঙ্কর রায়ের মালদহ জেলার ভালুকবাজারস্থিত সেচ বিভাগের ডাক বাংলোয় চৌঠা ও পঁচই জানু- য়ারী অবস্থান করার কথা ছিল। এই সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মহানন্দা মাস্টার প্ল্যানের বাঁধ নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হরিশ্চন্দ্রপুরের অধি- বাসীদের এক গণ-ডেপুটেশন প্রেরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে স্থানীয় সংগঠন কংগ্রেস কমিটি। মালদহ জেলার এই অঞ্চলটিতে সংগঠন কংগ্রেস ও তার নেতা শ্রীবীরেন মৈত্রের এখনো যথেষ্ট প্রভাব। স্বভা- বতই হরিশ্চন্দ্রপুরের গ্রামগুলোতে সাড়া পড়ে যায়। সেচমন্ত্রী বরকত মিঞা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বীরেন মৈত্রের গণডেপুটেশনের কর্মসূচী কিভাবে ভেস্তে দেওয়া যায় সেই পরিকল্পনায় শহরের সার্কিট হাউসে পুলিশ ও মস্তানদের সঙ্গে তাঁর ঘন ঘন শলাপরামর্শ চলে। তেসরা জানুয়ারী সেচ মন্ত্রীর নির্দেশ অনু- যায়ী পুলিশ শ্রীমৈত্রের প্রধান সহ- কর্মী মহঃ গিয়াসুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। আরো পরিকল্পনা হয় যে, মুখ্যমন্ত্রীর সভা চলাকালে মস্তানরা সভার মাঝে একটা বোমা ফাটাবে। পরে এই বোমা বিস্ফোরণের দায়- দায়িত্ব বিক্ষোভকারীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে প্রচার করা হবে মুখ্য- মন্ত্রীকে হত্যার উদ্দেশ্যে শ্রীমৈত্রের অনুগামীরা ঐ বোমা ছুঁড়েছে। এই সুযোগে ব্যাপক ধরপাকড় এবং নির্যাতন চালানো যাবে সরকার বিরোধীদের ওপর।

রেল মন্ত্রী শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্রের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে চৌঠা দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভার কর্ম- সূচী বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক শাসকদলের মস্তানরা চার তারিখ সকালেই বোমা এবং মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ ভালুকা- বাজারে উপস্থিত হয় এবং নিকট- বর্তী জানকীনগর কলোনীতে আস্থানা গাড়ে। চার তারিখ সকালে শ্রীমৈত্র বরকতের এই মারমুখী চক্রান্তের কথা জানতে পারেন এবং সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য গণ-ডেপুটেশা- নের কর্মসূচী পরিত্যাগ করেন। তবে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুরের জনগণের বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে এবং সহ- কর্মী মহঃ গিয়াসুদ্দিনের মুক্তির দাবীতে ঐদিন বিকাল থেকে ডাক বাংলোর সামনে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মস্তানদের উপস্থিতি বিষয়ে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় এক ডায়েরী করেন।

সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বিকাল সাড়ে চারটের বিমানযোগে মালদহে আসেন এবং সন্ধ্যায় ভালুকাবাজার ডাক বাংলোয় পৌঁছান। শ্রীবীরেন মৈত্র পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্তমত বিকাল চারটায় ডাক বাংলোর সামনে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেন। মুখ্যমন্ত্রীর ডাক বাংলোয় উপস্থিতিকালেই শাসকদলের মস্তানরা শ্রীমৈত্রের অন- শন শিবিরে হামলা করে। অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণের পর মস্তানরা শ্রীমৈত্রের উপর দৈহিক আক্রমণ শুরু করে এবং তাঁর জামা কাপড় ছিঁড়ে দেয়। মস্তানরা প্রবীণ এই নেতাকে মাটিতে বার কয়েক আছাড় মারে। তিনি এই অমানুষিক প্রহারের ফলে ভয়ানক অসুস্থ ও প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তখন ঐ মস্তানরা তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ শিবির থেকে টেনে হিঁচরে রাস্তায় নিয়ে যায়। এরপর মস্তানরা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। পরে শ্রীমৈত্রের অনুগামীরা ভালুকাবাজারে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে পরে হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে ভরতি করে দেয়।

শ্রীমৈত্রের উপর এই বর্বরোচিত আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়া মাত্র প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় হরিশ্চন্দ্র- পুরে। পরদিন সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ পালিত হয়। যে মস্তানরা শ্রীমৈত্রকে প্রহার করে তারা সকলেই এ জেলার পরিচিত সমাজবিরোধী। এদের অনেকেই এখন মন্ত্রীর কৃপায় সরকারী কর্মচারী। শ্রীমৈত্রকে প্রহারের পরিকল্পনা সফল হওয়ায় সেদিন রাতে ডাক বাংলোয় এবং মস্তানদের অস্থায়ী আখড়া জানকী- নগর কলোনীতে চলে ঢালাও খানা- পিনা ও ফূর্তি। অথচ সেদিন অর্থাৎ চৌঠা জানুয়ারী ছিল ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোক দিবস। চার এবং পাঁচ তারিখ মন্ত্রী এবং অনুগামীদের রাজসিক খানাপিনার জন্য জেলার বিভিন্ন হাটবাজার থেকে হাজার দুয়েক মুরগী ভালুকা বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ঐ দুদিন আড়ম্বরপূর্ণ মোগলাই খানার জন্য প্লেট পিছু খরচ পড়েছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় বাইরে থেকে লোক এনে ভীড় জমা- নোর জন্য মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার অনুগত ঠিকাদারদের কাছ থেকে অনেক লরি তলব করা হয়ে- ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর এই জনসভায় পুলিশী ব্যবস্থাও ছিল লক্ষ্য করার মত। সভাস্থলে আসার সমস্ত রাস্তায় ছিল পুলিশের কড়া ব্যারিকেড, যেন বিক্ষুব্ধ মানুষের কোন মিছিল সভাস্থলে না আসতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মহানন্দা মাস্টার প্ল্যানের বাঁধ নির্মাণের জন্য সরকার যে সমস্ত ফসলী ও বসতবাড়ীর জমি দখল করেছিলেন, সেই সমস্ত জমির মালি- কদের এখনো উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকরা অধিকাংশই গরীব বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষক। ধনী ব্যক্তিদের জমি যাতে বাঁধ নির্মাণের ফলে ক্ষতির কবলে না পড়ে সে সে ব্যাপারে সেচ মন্ত্রী স্বয়ং এবং শাসকদলের এম এল এরা ভয়ানক তৎপর ছিলেন। জোতদার ও প্রভাব- শালী ব্যক্তিদের জমি রক্ষার জন্য মন্ত্রীর তদারকীতে সেচবিভাগ রচিত মানচিত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন কাজের সময় করে নেওয়া হয়েছে।

শরৎচন্দ্র ঃ জীবন সাহিত্য রাজনীতি (৪)

মিহির আচার্য

"পথের দাবী" সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ না করে শরৎচন্দ্রকে ব্যক্তিগত চিঠি দিলে আর উত্তরে শরৎচন্দ্রের চিন্তিত লুকোনোর ব্যাপার নেই। কৌতূহলী পাঠকের জন্যে দুটি চিঠিই উদ্ধৃত করে দিলাম।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কারণ লেখক যদি ইংরেজ রাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম—একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্য ও ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেণ্ট ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু এই পারের সহিষ্ণুতার জোরে যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর। তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়তেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর। অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ রাজের কাছে দাবী করি, নিজের কাছে নয়; তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখ যাই বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে, তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহ দেখতে পাই। কিন্তু এই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে সেখানে এমনিই ঘটবে—রাজ-বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এ কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ না করে দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭শে মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের পত্র

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিৎ বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমান নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে সে সম্বন্ধে আমার দু একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি চেষ্টা করতাম লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে political-দের propaganda হতো, কিন্তু বই হতো না। নানা কারণে বাঙলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই আর সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অথবা বিচারের ভান করে কারাদণ্ড নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং আগেপিছের জন্যে কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ থাক। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না দিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তিভোগ করতে হয়ত করতেই হবে—তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি-ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যেও হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দুই বছর না হয়ে তিন বছর হলো কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ-ছানা-মাখন পায় না বলে কিম্বা মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি jail authority ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ডালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কি না এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য-সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তি কারও ইংরেজ গভর্নমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরেজ রাজশক্তির এই বই ঝাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেস্ট করবার justificationও তেমনি আছে।

আমার মতে আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশী, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এই বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মান করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়েছুড়ে নির্বাসনে বাস করছি। অর্থে সামর্থ্যে সময় যে কত গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছা হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা ব
এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও
হয়ে থাকে আমাকে মার্জনা করবে
আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমি
একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে
আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার ক
আমি ভাবতেও পারিনে। ইতি
২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের পক্ষে পথের দাবী রচনা একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। রেঙ্গুনে থাকাকালীন বহির্ভারতের বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। পথের দাবী তারই পরিণত ফসল। উনিশশো তেইশ-এ শরৎচন্দ্র যখন এ উপন্যাস রচনা শুরু করেন তখনও বিপ্লবী আন্দোলন এদেশে তেমন ব্যাপক রূপ ধারণ করে নি। কাজেই এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। (চল

অকস্মাৎ দুর্ঘণ্ট। আটব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত রবিবার একটা জরুরী কাজে যাচ্ছিলাম আমতলা। যাত্রী ছিলা তেরাশী নম্বর বাসের। সহযাত্রীর বেশীর ভাগই ছিলেন গঙ্গাসাগ অভিমুখী। বাস যখন পৈলান স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলাম পথের মাঝখানে অব করে জটলা পাকাচ্ছে বেশ কি সংখ্যক কংগ্রেসী মস্তান। এদে দাবী ঃ স্থানীয় মদের কারখা কংগ্রেসের শতকরা পঁয়ষট্টি জন ক ণকে চাকরী দিতে হবে। এদের সুব্রত ও লক্ষ্মী উভয় দলের সমথ কই রয়েছে। কারখানাটি চালু হ কথা আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারী।

ঘটনাস্থলে মুহূর্তের ম আরও বহুগাড়ী সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে গেল। এক অচলাবস্থার পড়ে গেলাম। পুলিশেরও সাহস হচ্ছিল না জটলা সরিয়ে পথ করে দেবার। তারপর পথ-সভা করা হ সেই সভায় পথ অবরোধ তুলে নে য়ার সাময়িক সিদ্ধান্ত গৃহীত হ পরো দু ঘন্টা আটক থাকার কংগ্রেস সেবীরা দয়া করে যান পথ করে দেন। বাসের দ যাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

রম্যাঁ রোলার

শিল্পীর নবজন্ম

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। অবিলম্বে গ্রাহক হোন।

আগামী ১৫ই মার্চের মধ্যে যাঁরা ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন, তাঁরা বইয়ের নির্দ্ধারিত মূল্য ১৬ টাকার স্থলে ১০ টাকায় পাবেন। ভাল কাগজে ছাপা, সুদৃশ্য কভার ও বোর্ড-বাঁধাই প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার বই। গ্রাহক মূল্য প্রকাশনীর ঠিকানায় ১২টা থেকে ৭টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। ডাকযোগেও পাঠানো যাবে।

* * *

প্রকাশের পথে

কালিদাস রক্ষিতের প্রথম উপন্যাস "পটভূমি"। ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার গর্ভজাত উচ্চরিত্ত সমাজের বিপন্ন আত্মচ্যুতির এক করুণ দর্পণ আশ্চর্য কুশলতায় তুলে ধরেছেন তরুণ লেখক। "পটভূমি" বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

অগ্রণী বুক ক্লাব

এ-১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাসিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়স
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবা

ঠিকানা ঃ
৬১, বউ বেন, কলি-১৩

...ীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব পরিচালনা সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ

কপিল রায়

...নদিল্লী, ষোলই জানুয়ারী ঃ ...ত্রিশে ডিসেম্বর রাজধানীর ...য় পরিবেশে যে দুই সপ্তাহ-...ী আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টি-...ল বা চলচ্চিত্র উৎসব শুরু ...ছিল ঘারোই জানুয়ারীতে তার ...াপ্তি ঘটেছে। এটি ছিল ...র পঞ্চম আন্তর্জাতিক কথা-...উৎসব। এই কয়দিন রাজধানীর ...টি সম্প্রদায় অর্থাৎ আমিরওমরাহ্ ...ল যেন তাঁদের "শিল্প অনুরাগে" ...তে উঠেছিলেন। অবশ্য এই মেতে ...র কতটা "নির্মল শিল্প-অনুরাগ" ...আর কতটাই বা সুপ্রসিদ্ধ ও ...শিনী ইতালীয় চিত্রতারকা ...ী জিনা লোলোব্রিগিডার ...য় মন্তব্য "শোবার ঘরে যা ...জ্ঞাত হওয়ার কথা তাকে কেন ...লোকজন পর্দার ওপরে খুঁজতে ...তা আমি বুঝি নে" এর ইঙ্গিত-...ত মনোবৃত্তিসঞ্জাত তা বলা ...ন। উৎসবের টিকেট বিক্রি শুরু ...র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই টিকেট ...হয়ে যায় বলে অভিযোগ ...ছিল। তাই বহু চিত্র-অনুরাগী-...কালো বাজার থেকে বেশ চড়া ...দিয়ে টিকেট কিনতে হয়েছে। ...যায় গড়ে প্রতি দুই সেকেন্ডে ...একখানি করে টিকেট বিক্রি ...ছিল—অর্থাৎ আসন নির্ধারণ ...কৃতকরণ, টিকেটের দরুণ টাকা ...ওয়া, ক্রেতাকে টিকেট দেওয়ার ...ন্যান্য কাজ প্রত্যেকক্ষেত্রে গড়ে ...সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করা ...ছিল। কর্মদক্ষতার নতুন নজির দেখা গেছে এই ব্যাপারে অনেকেই মুচকি হেসে বলছেন। ...মাট এগারটি চিত্রগৃহে (বিজ্ঞানভবন ও মডলঙ্করাহল সমেত —যদিও এই দুটি হল নিয়মিত চিত্রগৃহে নয় তবু এখানে প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল) এই সব কথাচিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। ...মোট টিকেটের শতকরা ...ষাটটি "প্রতি প্রদর্শনীর" ভিত্তিতে ...শকদের কাছে বিক্রি করবার কথা ছিল। চিত্রগৃহ কর্তৃপক্ষরা অভিযোগ করেন সে বিভিন্ন সরকারী মহল থেকে প্রচুর সংখ্যায় টিকেট আগে থেকেই কিনে নেওয়া হয়েছে আর ...কার পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগ শোনা যায় একমাত্র প্রমোদকর দপ্তরই নাকি প্রতি চিত্রগৃহের প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য দেড় থেকে দুই শতর টিকেট রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। ...ড়া পুলিশমহলও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বলে অভিযোগ কাগজে বেরিয়েছে। কোন এক ...ণালয়ে জনৈক পদাধিকারী একাই ...দিনে এক সান্ধ্য প্রদর্শনীর জন্য ...টি টিকেট দাবি করেছিলেন।

কিন্তু শোনা যায় গোয়েন্দা বিভাগের কেউ কেউও নাকি কোন কোন বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য টিকেট দাবি করেছিলেন অজ্ঞাতনামা কোন বিদেশী সন্দেহভাজনের ওপরে নজর রাখবার জন্য।

টিকেটের ব্যাপারে যেমন একদিকে চোরাকারবার চলেছে তেমনই অন্যদিকে সরকারী পদাধিকারের অপব্যবহারের অভিযোগও শোনা গেছে। তা ছাড়া এই উৎসবব্যবস্থাপনায় ত্রুটি বিচ্যুতি প্রভৃতিতে ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশেন্যাল এ্যাসোসিয়েশন্স অব ফিল্ম প্রডিউসার্স নামক বিশেষ শক্তিধর আন্তর্জাতিক সংস্থার সাধারণসম্পাদক মিঃ এ ব্রিসসন বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে শোনা গেছে। প্রতিযোগিতা যোগতামূলক আন্তর্জাতিক কথাচিত্র উৎসব করতে গেলে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির অনুমতির প্রয়োজন হয়ে থাকে। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে মিঃ ব্রিসসন এবারের উৎসবে যোগদানের জন্য নতুন দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাকি অল-ইণ্ডিয়া ফিল্ম প্রডিউসার্স কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের কাছে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতে এধরণের আন্তর্জাতিক কথাচিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের অনুমতি ভারতকে দেবার আগে আন্তর্জাতিক সংস্থাকে অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত তাঁর আপত্তি উৎসবের স্থান নির্বাচনে। তাঁর মতে কথাচিত্র উৎসবের স্থান কখনই নতুন দিল্লী হতে পারে না। ভারতের কথাচিত্রকেন্দ্র কেন্দ্র বোম্বে হচ্ছে এই ধরণের উৎসব অনুষ্ঠানের উপযুক্ত ক্ষেত্র। মিঃ ব্রিসসনের দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে সরকারী আওতায় এ ধরণের উৎসব অনুষ্ঠানের কোন সার্থকিতা নেই কারণ সরকারী পদাধিকারীদের সরকারী পদাধিকারের দাপটে শিল্পী ও রসিকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে আর তাতে এ ধরণের উৎসবের মূল্য ও মূল লক্ষ্য ব্যর্থ হয়।

এ ছাড়া তাঁর নাকি আরও গুরুতর অভিযোগ আছে অধুনা-সমাপ্ত কথাচিত্র উৎসবের সরকারী ব্যবস্থাপকদের সম্পর্কে। ব্যবস্থাপকরা আন্তর্জাতিক রীতিনীতিকে অবহেলা করেছেন, এবং তাঁর উপস্থিতিতেও এটা করা হয়েছে বলে তিনি আরও বেশি ক্ষুব্ধ। তাছাড়া ব্যবস্থাপকদের নিয়মলঙ্ঘন, নানাবিধ অব্যবস্থাদি সম্পর্কে উৎসব কাল যে সব অভিযোগ এখানকার সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছে তাতেও তাঁর বিরূপতাবৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথা মা শোনা গিয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি উৎসবের উদ্বোধন করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী নাকি উৎসব শেষে পুরস্কার বিতরণ করবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল তাঁরা তা করলেন না।

অতি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে মিঃ ব্রিসসন নাকি এই মর্মে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ করেছেন যে ব্যবস্থাপকরা যে সব নিয়মবিরোধী কাজ করেছেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কতকগুলি বিদেশী কথাচিত্রের অপব্যবহার। "গডফাদার" ও "এ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ" প্রভৃতির মত "বয়স্কদের জন্য" মার্কাযুক্ত কথাচিত্র বেশ কয়েকবার গোপনে বিশেষ দর্শকদের (কিছু ভি আই পি ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের) দেখানো হয়েছে—উৎসবসূচীর বাইরে। এ ছাড়া টিকেট ঘটিত অভিযোগ তো আছেই। এই সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ ব্রিসসন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতে নতুনদিল্লীতে আর কোন আন্তর্জাতিক কথাচিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি তাঁর সংস্থা নাও দিতে পারেন। মিঃ ব্রিসসনের এই অভিমত যদি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় তা হলে এবারের এই আন্তর্জাতিক কথাচিত্র উৎসবই হবে নতুনদিল্লীর শেষ আন্তর্জাতিক কথাচিত্র উৎসব।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুনদিল্লীতে এ ধরণের উৎসবসমারোহ বেশি জরুরী অথবা জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য জাতির সর্বশক্তি নিয়োগ বেশি জরুরী তা বিবেচনা করে অগ্রাধিকার বা প্রাইঅ্যারিটি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে এখনকার অনেকেই মনে করেন। তাঁরা অবশ্য সমাজজীবনে কথাচিত্রের মত সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন না। তবে তাঁরা মনে করেন যে কোন "কৃতিকে" কাদ দিয়ে "সংস্কৃতি" গড়ে তোলা যায় না, তার প্রসারও সম্ভব নয়। তাছাড়া কোন সংস্কৃতিই সমাজবিমুখী হয়ে কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না। মুষ্টিমেয় আমিরওমরাহের চিত্তবিনোদনের প্রয়াসকেই জাতির চিত্তবিনোদনমুখী বলে মনে করাকে এরা স্বাস্থ্যকর মনে করেন না। এদের মতে যে দেশে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জন লোক দারিদ্র্যরেখার নিচে পড়ে রয়েছেন সে দেশে ন্যূনতম পাঁচ টাকার টিকেটযুক্ত কথাচিত্র উৎসবে কার কল্যাণ ঘটা সেটি বুঝতে কষ্ট হয় না। বৈঠকখানায় টেলিভিসন যন্ত্র যেমন সমাজমর্যাদার প্রতীক— এ ধরণের কথাচিত্র উৎসবে যোগদানও (তা কেনা টিকেটেই হোক কিংবা পাওয়া পাশেই হোক) তেমনই সমাজমর্যাদার দ্যোতক। মুষ্টিমেয় এলিটের "সংস্কৃতিকুশলতা" ও "মড"-প্রবণতার প্রতীক।

রাজধানীদর্পণ

এশিয়া আফ্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

নতুন বছর দেশে দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নিয়ে এসেছে আনন্দ সংবাদ ঃ কাম্বোডিয়ায় সিহানুকের জাতীয় মুক্তি বাহিনীর বিপুল সাফল্য, দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি ফৌজ পাল্টা আক্রমণে হেনে মার্কিন তাঁবেদার থিউ-র অবস্থা কাহিল করেছে, আঙ্গোলা-মোজাম্বিকের স্বাধীনতার পাকা ঘোষণা নভেম্বরে, বর্তমানে আঙ্গোলা-মোজাম্বিকের মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিনিধি ও বর্তমান পর্তুগালের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি প্রশাসন ব্যবস্থা চালুরও ঘোষণা রয়েছে।

মনে হয়, এবার বছরটার শুরু ভালো। উল্লিখিত মুক্তিফ্রন্টগুলোর সাফল্য যে এশিয়া, আফ্রিকা লাতিন আমেরিকায় মুক্তি সংগ্রামে নতুন নতুন জয়টীকা পরিয়ে দেবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বিশেষ করে আফ্রিকায়, আঙ্গোলা মোজাম্বিকের সাফল্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায় মুক্তি আন্দোলনে প্রবল জোয়ার এনেছে। আতঙ্কিত রোডেশিয়া সরকার মুক্তিফ্রন্টের সঙ্গে আপোষ-রফা করার জন্য নানা মহলে তদ্বির করছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিকে যেমন জঙ্গলে-পাহাড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি ফৌজ তৎপর অন্যদিকে শহরাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি ফৌজ তৎপর দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট সংগঠিত করেন। স্বর্ণখনির শ্রমিকদের লড়াই তাৎপর্যপূর্ণ। অজুরীবৃদ্ধির দাবীর লড়াই দমন করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাসিস্ত সরকার গুলি, লাঠি, টিয়ারগ্যাস চালায়। কিন্তু ভর্জিনিয়ার শ্রমিকরা দমেন না। পাঁচজন শহীদ সাথীদের স্মরণ করে সমগ্র আফ্রিকা তোলপাড় হয়ে ওঠে। জোহানসবার্গও প্রিশটি কলকারখানার শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘটে সামিল হন। নাটালে সুতাকল শ্রমিকদের লড়াই উল্লেখ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাসিস্ত শাসক মানুষের মুক্তি আন্দোলন দমন করার জন্য ব্যাপক গ্রেপ্তার, নির্বিচারে গুলি চালনা, পিটুনির পদ্ধতি নিয়েছে। কুৎসিততম বর্বরতার হোতা এই দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার মুক্তি যোদ্ধাদের ভয় দেখানোর জন্য নিরীহ গ্রামবাসীদের নির্বিচারে খুন করে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের সড়কের মোড়ে মোড়ে কর্তিত বিপ্লবীর মুণ্ড ঝুলিয়ে রাখছে। এসব সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপ্লবী শক্তিকে দমন করা যায় নি, যাবে না। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী মুক্তি ফৌজের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসক গোষ্ঠী পর্তুগালের পূর্বতন ফ্যাসিস্ত শাসকদের কাছ থেকে নানা সাহায্য পেত। কিন্তু বর্তমানে পর্তুগালে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেই সাহায্য বন্ধ হয়েছে। বিশেষ করে পর্তুগালের বর্তমান শাসকরা পূর্বতন পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ষাটের দশকে আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রাম যে মার খেয়েছিল এবার তাদের পাল্টা মারের শুরু। শুধু আফ্রিকা নয়। আরব ভূখণ্ডও এবার কিঞ্চিৎ চঞ্চল। প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংস্থা আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। সুখের কথা, ভারত পি এল ও কে ভারতে তাদের দূতস্থান খোলার অনুমতি দিয়েছে।

অন্যদিকে, এবার দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধের আসন্ন বিপুল বিজয়ে সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারসাম্য বদলে যাবে। কাম্বোডিয়ারও মুক্তি আসন্ন। লাওসেও সাফল্য ঘটেছে। ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লাওস মিলে বিরাট চত্বর এখন মুক্তির বিশাল উদ্যানে পরিণত হচ্ছে। বিশ্বাস হয়, এই সাফল্যের ফাল ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায় নতুন করে বিপ্লবী তৎপরতা দেখা যাবে।

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

বিপজ্জনক জলকেলি

পরমাণুশক্তি চালিত মার্কিন জাহাজ, এন্টারপ্রাইজ যেভাবে ভারত দরিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে তাতে সে যে এঅঞ্চলে জলকেলি করতে আসছে না, এটা বোঝা যায়। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি কেউ কি এ কথা চেপে রাখতে পারেন নি যে, মার্কিন সি ১৩০ জাহাজগুলোর এটা অন্যতম। কিছুদিন পূর্বেও নমপেনে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দিয়েছে এসব জাহাজ। যতই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মানুষ মুক্তি আকাঙ্খায় উদ্বেলিত ততই মার্কিনী দানব হিংস্র আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছে।

মতামত

দর্পণে হামলায় খুশি

দর্পণের ওপর যে নোংরা কালো পাপীহাতের স্পর্শে এবং কলঙ্কিত স্পর্ধায় তার প্রাণবায়ু স্তিমিত করার চেষ্টা হয়েছে তার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি খুব খুশি হয়েছি, আনন্দিতও। দীর্ঘ সাতাশটি বছর ধরে এদেশীয় সরকার বর্বরতার এমন কিছু বাকী নেই যা করেনি। অযোগ্য অপদার্থ চরিত্রহীন নির্বোধ শাসক গোষ্ঠীর অনুষের ক্ষতি। শাসক গোষ্ঠীর মানুষের ক্ষতি রাত কাটানো ছাড়া কোনো চিন্তা বা গতি নেই। তাই তাদের যখন কেউ ধীরে ধীরে মুখোশ খোলে কিম্বা একটানে খসাতে চেষ্টা করে তখন ওরা পাগল হয়ে যায়। কারণ কেবল গদি আঁকড়ানো। সুতরাং ক্ষমতার অপব্যয় করা। এই ক্ষমতা বা "অক্ষমতা"কে টিকিয়ে রাখার জন্য সমস্ত রকম "ক্ষমতা" প্রয়োগ করে। আর সে কারণেই তো ইন্দিরার রাজত্বেই বত্রিশ হাজার রাজনৈতিক বন্দি থাকে বছরের পর বছর—আবেদন বা আপীল করবার অধিকারটুকুও নেই— "হা গণতন্ত্র!" জ্বলে পিটিয়ে পিটিয়ে লাশকে লাশ উধাও হয়ে যায়, বাড়ীর তরুণ ছেলেদের অকারণে হাজত বাস করায়।

অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা

নির্বাচনী কৌশল

নির্বাচন কি সত্যিই সমাগত? না কি বামপন্থী দলকে বোকা বানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কৌশল?

শ্রীমতী ইন্দিরার ধারণা নির্বাচনী ধোঁকায় বামপন্থী ঐক্যে ফাটল ধরানো যাবে, কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য এবং ইন্দিরা প্রশাসনের অপদার্থতা সে ঐক্যের গতি রোধ করবে কি করে? ইন্দিরাজী মুখে বলছেন, ছিয়াত্তরের আগে নির্বাচন নয়, অথচ অপরদিকে ভোটার তালিকার প্রস্তুতি চলছে। অতএব এ প্রসঙ্গটি জিজ্ঞাসাসূচক। যদি দেখা যায় অচমকা নির্বাচনের ধোঁকা দিয়েও বামপন্থী দলগুলির ঐক্য রোখা যাচ্ছেনা; যদি দেখা যায় তারা ঐক্যবদ্ধভাবেই কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তখন ইন্দিরাজী কি কৌশল নেবেন?—বলাবাহুল্য সে কৌশলেরও প্রস্তুতি চলছে। সশস্ত্র কাহিনী তৈরী হচ্ছে। কিন্তু সেই সশস্ত্র নির্বাচনেও ইন্দিরা আবার তার গদি ফিরে পাবেন কিনা, সেইটেই বড় জিজ্ঞাসা; বলা যেতে পারে চরম প্রতীক্ষার অনন্ত জিজ্ঞাসা।

সনাতন হালদার
মধ্যপ্রদেশ

টেলিভিশন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতায় টেস্ট খেলার হল্লোড়ের সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন কোম্পানীগুলো কলকাতায় তাদের তৈরী টি ভি সেট বিক্রির জন্যে এনেছেন। অথচ কলকাতায় টি, ভি, কেন্দ্র কবে হবে তা স্বয়ং ঈশ্বর জানেন না বলে বিখ্যাত টি, ভি, কোম্পানীর মুখপাত্র জানালেন। পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গে ইলেকট্রনিক শিল্প গড়তে দেওয়া হয়নি বলে টি, ভি তৈরীর কারখানা কলকাতায় নেই। টি, ভির উপকরণ হিসাবে বহু ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠতে পারে; এ বাবদে কিছুই হয়নি এপর্যন্ত। স্টানডার্ড টি, ভির চেয়ারম্যান এন, ভাটি সাহেব রিংজ কন্টিনেনটাল হোটেলে সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে টি, ভি, পার্টস সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বেকার ইঞ্জিনিয়ার ও স্নাতকদের আহ্বান করেছেন। ফেডারেশন অফ আসোসিয়েশন এ্যাণ্ড স্মল সেল ইণ্ডাস্ট্রির পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ঐ ট্রেনিং দেওয়া হবে। টেলিভিশনের দামও পাঁচ হাজার টাকার মত সেটপ্রতি। অথচ তৈরী করতে খরচ লাগে মাত্র দু হাজার টাকা। বিদেশ থেকে আমদানী করা যন্ত্রের জন্য ট্যাক্স, শুল্ক ইত্যাদি হাজার খানেকের মত। যন্ত্র তৈরী হলেই শেষে আবার নতুন ট্যাক্স ধরা হয়। সব শেষে দাম পড়ে পাঁচ হাজার। অতিরিক্ত শুল্ক এবং কর, এনট্রি ট্যাক্সের বোঝা আরও বাড়ে। সস্তায় টি, ভি, বিক্রি করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা এ পর্যন্ত করা হয়নি। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে টি, ভি, ব্যবহার এখনও হয়নি। বস্তাবাসী কি টি, ভি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। টি, ভি, সেট কলকাতার বড় বাড়ীতে বসালে বাঙলাদেশের টি, ভি, অনুষ্ঠান ধরা যাবে। বাঙলাদেশ এবং ভারতের টি, ভি অনুষ্ঠান পরস্পরের শোনা সম্ভব হবে। বাঙলাদেশ ও ভারতের সীমান্তে বনগাঁ এলাকায় রীলে টাওয়ার বসানো যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের তরুণ সাংস্কৃতিক মন্ত্রী এব্যাপারে আরও ব্যবস্থা করতে পারেন। বাঙলাদেশের টি, ভি অনুষ্ঠান কলকাতায় বসে শোনা এবং চাকায় বসে কলকাতার টি, ভি অনুষ্ঠান শোনার পথ পরিষ্কার করা দরকার। টি, ভির অনুষ্ঠানে যারা যোগ দেবে কলকাতার সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রদের এবং পাশকরা সাংবাদিকদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল তার কিছু হয়নি। অবিলম্বে সুব্রত-বাবুর উচিত ফ্রিলান্স রিপোর্টার, স্বাকৃত তরুণ লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ার কথা ঘোষণা করা।

কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন

(দর্পণের সমালোচক)

সীরিয়াস পাঠকদের কাছে বাজারে পত্র-পত্রিকার চাইতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের গুরুত্ব অনেক বেশী। কেননা নিষ্ঠা, অপেশাদারী সততা, প্রজ্ঞা, অধ্যয়নমুখনতা, আলোড়ন সৃষ্টির মতো বিতর্কিত রচনা প্রকাশের সাহস ও বলিষ্ঠতা এই সব লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংগঠকদের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে।

বিভিন্ন জাতের কয়েকটি পত্রিকা সম্প্রতি হাতে এসেছে যা চেহারায় ও চরিত্রে আদর্শ ভিত্তিক ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। যেমন অনিল আচার্য সম্পাদিত 'অনুষ্টুপ' রাজনীতি এবং সমাজ সচেতন সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। অনালোচিত প্রসঙ্গের অবতারণা, অপ্রকাশিত রচনাবলী সমকালীন প্রয়োজনে প্রকাশ করা, সাম্প্রতিক কালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্পর্কে ঋজু অভিমত প্রকাশ করা, বিভিন্ন প্রদেশের সংগ্রামী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করার আয়াসসাধ্য এবং গভীর অনুশীলন সাপেক্ষ প্রয়াস দেখা যায় 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার সংগঠকদের। অনুরূপ দায়িত্ব এবং সচেতনতার সঙ্গে প্রকাশিত হয় 'প্রস্তুতি পর্ব'। মাস কয়েক পূর্বে প্রকাশিত শরৎকালীন সংখ্যায় প্রকাশিত চীন প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি দীর্ঘ রচনা, কার্জন পার্কে প্রবীর দত্ত হত্যা নিয়ে বিভিন্ন কবির একগুচ্ছ কবিতা, শ্চেদ্রিনের একটি গল্পের অসাধারণ অনুবাদ বিশ্বস্ত করে তোলে 'প্রস্তুতি পর্বে'র বামপন্থী অথচ স্বাধীন সাহিত্য চর্চার প্রতি। একটি বলিষ্ঠ তরুণ লেখকগোষ্ঠী এই পত্রিকার নির্ভীক রাজনৈতিক চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

উচ্ছ্বাস প্রকাশের মতো বলিষ্ঠতার স্বাদ না পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক সাফল্য বা শাসকাশ্রিত গড্ডালিকায় গা ভাসায়নি 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকাও। শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় পত্রিকাটি দীর্ঘ নয় বছর হল নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। মধ্যাহ্নের বৈশিষ্ট্য: এর প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ উপকরণে সমৃদ্ধ বিশেষ সংখ্যা এবং তার কোনটাই গতানুগতিক নয়। যেমন ল্যাটিন আমেরিকান সাহিত্য সংখ্যা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংখ্যা, লিট্‌ল ম্যাগাজিন সংখ্যা এবং আগামীতে প্রকাশিতব্য যুদ্ধ ও অধিকারবোধ সম্পর্কিত সাহিত্য সংখ্যা।

শুধু মাত্র গল্প পত্রিকার পাঠক সংখ্যা সীমিত। তা সত্বেও মিহির আচার্য সম্প্রতি বামপন্থী সাহিত্যের ত্রৈমাসিক গল্পপত্র 'শুকসারী' কম করেও আটটি থেকে দশটি গল্প নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই পত্রিকার নিয়মিত গল্প লেখকেরা খ্যাতিসম্পন্ন, কিন্তু গল্পপাঠে অনুভব করা যায় তাঁদের কলমের শক্তি। সম্পাদকের ধৈর্য এবং একক প্রচেষ্টাকে অবশ্যই তারিফ করতে হয়।

সাম্প্রতিক কালের আরেকটি নতুন দ্বিমাসিক 'দিনকাল'। সবে

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

নাট্যাভিনয়

চারণদলের দুটি নাটক

চারণদল প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট রাজনীতিসচেতন নাট্য সংস্থা। সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে তাদের নাট্যচর্চা বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। এবং তা আবরণহীন, প্রকাশ্য ও বলিষ্ঠ। সম্প্রতি অভিনীত '৭১' কলকাতা' এবং 'কমরেড' এই ধারণার যথাযোগ্য প্রমাণ।

একাত্তরের কলকাতায় যে রাজনীতি একাধিপত্য অর্জন করেছিল, প্রকম্পিত করেছিল প্রশাসনকে, দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল স্থবির বামপন্থী মুখোসধারীদের, ভ্রান্তি সত্বেও সেই রাজনীতিকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দেওয়াই এই নাটকের উদ্দেশ্য। এই নাটকের সততা এবং নাটকীয়তা মূলত দুটি জায়গায়। প্রথমত বিপ্লবী দলে যুক্ত একটি মেয়ের পিতা যখন পুলিশী গুপ্তচরের কাজ করতে গিয়ে বিপ্লবীদের হাতে হত্যা হয়, তখন বাবার হাতের মুঠোয় পুলিশী উৎকোচ দেখে মেয়েটির ঘৃণার প্রকাশ সাবলীল এবং বিপ্লবী আদর্শের প্রতি সততাপূর্ণ আনুগত্যের দ্যোতক। কিন্তু আদর্শগত দৃষ্টি ভঙ্গীতে ঘৃণার পাত্র হওয়া সত্বেও আকস্মিক ভাবে মৃত পিতার মুখ দেখে অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও মেয়ের যে প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিৎ, তা পরিলক্ষিত হয়না বলে দর্শক স্বভাবতই বিস্ময়বোধ করতে পারেন। এর জন্যে কিন্তু নাটকের ঐ বিশেষ মুহূর্তটি দায়ী নয়, দায়ী হল মেয়েটির পিতার চরিত্র চিত্রন। স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির জন্য তাকে আগাগোড়াই নাটকে যেভাবে জোকারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে তাতে নাটকের ঐ মুহূর্তটি স্বাভাবিক মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। বরং ঘৃণা যদি গম্ভীর রসসিক্ত ঘটনাবলীর ভেতর দিয়ে ক্রমপরিণতি লাভ করতো, তবে নাটকের শেষ মুহূর্তটি দর্শকের কাছে আরো শ্রদ্ধেয় ও দৃঢ়মূল হতে পারতো। দ্বিতীয়তঃ গুপ্তচর বৃত্তি করবার গোপন উদ্দেশ্যে একটি লুম্পেন যুবক বিপ্লবীদলের কর্মী হতে প্রস্তাবে অধিকাংশের থাকলেও দল নায়ক পাধ্যায়ের অসম্মতি . সং নীতিকে যেমন নিষ্কণ তেমনি একাত্তরের রাজনী ভ্রান্তির প্রতিও অঙ্গুলি নির্দে নাট্যকার-নির্দেশক অলক চৌধুরীর এই সচেতন প্রশংসনীয়।

এই নাটকের অভিনয়াংশ নি মানের এমন কথা না ব মানোন্নয়নের যথেষ্ট অবকাশ সন্দেহ নেই। সচেতন যুবকদের অভিনয়ে মাঝে লুম্পেনীয় অভিব্যক্তি দর্শকমহ হাসির উদ্রেক করলেও সংশ্লি রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা কম আলো প্রক্ষেপনেও সময় অভাব আছে। আবহস সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য।

তুলনামূলকভাবে বিমল ব পাধ্যায় রচিত কমরেড না একটি অসাধারণ প্রযোজনা। প্রযোজনাটির জন্য চারণদল রীতি গর্ববোধ করতে পারেন। নাটকটি গ্রামীণ কৃষকদের বিপ্লবী উদ্যোগ, নিষ্ঠা এবং সততার এক নিখুঁত জীবন্ত ছবি। নাটকে পটভূমিটি গ্রামীণ, কিন্তু আদ প্রতিষ্ঠার জন্য কোথাও আরোপিত বিপ্লবী বাণীর সাহায্য নিতে হয়নি। অথচ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে কৃষকদের বিপ্লবী আকাঙ্খা এবং এই সত্য অনুভূত হয় যে জনগণই প্রকৃত শিক্ষক এবং বিপ্লবের চালিকা শক্তি।

এই নাটকটি শুধুমাত্র অনবদ্য নয়, প্রযোজনার কলাকৌশল, অভিনয়ও অসাধারণ। চারণদল শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকেই বলিষ্ঠ নয়, অভিনয় নৈপুণ্যে এবং শিল্প সৌকর্যেও অসম্ভব শক্তিশালী বিশেষ করে বৃদ্ধা পিসীমার অভিনয় মনে রাখার মতো। এ নাটকে সংগীতের প্রয়োগও সুসমঞ্জস।

তবে নাট্যকারের একটি রকমের ত্রুটি কানে কাজে বসনের (কৃষক) বৌয়ের মুখ থেকে মরুদ্যানের আভাস' জাতীয় সংলাপ সহসা দর্শককে সচকিত করে। অন্যথায় এ প্রযোজনাটি আদর্শনিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক।

'মা মাটি মানুষ' : যাত্রায় বিকৃত বাস্তবতা

পরেশ ধর

পুজোর কিছুদিন আগে থাকতেই চিৎপুরের যাত্রাদলগুলি আসরে নামতে সুরু করে। ষষ্ঠীর দিন থেকে তাদের আর এক মুহূর্ত অবকাশ থাকে না। প্রতি সন্ধ্যায় অভিনয়। পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণ যাত্রাপালা দেখবার জন্য যেন মেতে ওঠে। কয়েক বছর আগেও শুধু গ্রাম গঞ্জ এবং মফঃস্বল শহরেই যাত্রাভিনয়ের সমারোহ সীমাবদ্ধ থাকতো। বর্তমানে যাত্রাভিনয়ের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা বড় বড় শহরেও উপচে পড়েছে।

কলকাতার লোকেরাও আজ যাত্রাপালার নামে দিশেহারা হয়। এ বছর কলকাতায় তিনতিনটে বড় বড় যাত্রাসম্মেলন হল। মহাজাতি সদন আর রামলীলা ময়দানে দুটো হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় যাত্রা সম্মেলন হয় রবীন্দ্র কাননে। সেটা এখন চলছে। ১০ই জানুয়ারী থেকে ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত ১৮ খানা যাত্রাপালা। ২৩শে জানুয়ারী বেলা দুটোয় একটা ম্যাটিনিশো আছে।

এক কথায় যাত্রার বাজার এখন গরম। নামকরা দলগুলি দু হাতে টাকা লুটছে। শুনেছি প্রথম সারির যাত্রাদলগুলি একরাত্রি অভিনয়ের জন্য চারহাজার টাকা নেয়। পুরো ৯ মাস তাদের একদিনও অভিনয় বন্ধ থাকে না। তাহলে ৯ মাসের এই ২৭০ দিনে তাদের হাতে আসে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। দল চালাতে ব্যয় হয় অবশ্য প্রচুর। তবু যাত্রার মালিকরা যে বেশ ভালরকম মুনাফা ঘরে তোলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা না হলে তারা বড় বড় কাগজ আর বিবিধ ভারতীর বিজ্ঞাপনে হাজার হাজার টাকা ঢালে কি করে? যাত্রাপালা যারা দেখে, তাদের অধিকাংশই সাধারণ লোক, তাদের পকেট থেকেই টাকাটা আসে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে যাত্রাপালার মত একটা মহৎ দেশজ শিল্পকর্মের এমন ব্যাপক প্রচার ও প্রসার জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের সহায়ক—তাদের পক্ষে এটা শুভকর। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা উন্নত হওয়ার ব্যাপারটা শিল্পকর্মের গুণগত প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। শিল্প যদি সমাজ চেতনার বাহন হয়, সমাজের দ্বন্দ্ব-বিরোধগুলিকে যদি সে সঠিকভাবে রসোত্তীর্ণ করে তুলে ধরতে পারে, তবেই তার পক্ষে দর্শকের সাংস্কৃতিক রুচি উন্নত করা সম্ভব। আর তা যদি না হয়, যদি শিল্পকর্মের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয় একটা বিকৃত বাস্তবতা, যদি সস্তা খেলো রঙ্গরসে আর আজগুবি অসামাজিক অবাস্তব সুখ দুঃখে দর্শকচিত্ত আলোড়িত করা হয়, তবে সেই শিল্পকর্ম সামাজিক মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রকৃত সমাজসত্যকে সে দেখতে দেয় না, বুঝতে দেয় না। তাকে আড়ালে রেখে সেই শিল্প মানুষকে বিপথগামী করে করে। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের প্রেরণাকে সে স্তব্ধ করে দেয়। সেই শিল্প হয়ে ওঠে অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আজকালকার যাত্রাপালাগুলি তাই হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্র কাননে যে পালাটি দিয়ে যাত্রা সম্মেলনের উদ্বোধন করা হল, সে পালাটি একটু বিচার করলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। পালাটির নাম "মা মাটি মানুষ।" প্রযোজক নট্ট কোম্পানী। লোকে বলে যাত্রা জগতে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ দল। এর পিছনে আছে একশত বছরের ঐতিহ্য।

গত বছর আমাদের সরকার বাহাদুর এই দলকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করে পুরস্কার দিয়েছেন। এ হেন সর্বশ্রেষ্ঠ দলটি যে পালাখানি গ্রামে গঞ্জে শহরে অভিনয় করে বিকৃতি ছড়াচ্ছে তার নমুনা এবার একটু দেখুন :

চাষার ছেলে পিতৃহীন ইন্দ্রনাথ বি. এ. পাশ করে তার মূর্খ গ্রাম্য স্ত্রী সাবিত্রীকে নিয়ে চলে এল কলকাতায়। চাষবাসের কাজে তার রুচি নেই। শহরে যে চাকরি করবে। ইন্দ্রনাথ গ্রাম ছেড়ে যাওয়াতে তার মা এবং শিবতুল্য দাদা শিবনাথ শোকে মুহ্যমান। দাদাই ইন্দ্রনাথকে মানুষ করেছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে। পালাকার শিবনাথকে এক অদ্ভুত মহৎ মানুষ হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। সে 'শালা শালা' করে কথা বলে। কারোর তোয়াক্কা করে না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে থানার দারোগাকে মুখের ওপর যাতা বলে দেয়। বুঝুন কাণ্ডখানা! তাই ইন্দ্রনাথকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। তাই ইন্দ্র গ্রাম ছেড়ে যাওয়ায় সে দুঃখে মদ খায়। সে কিন্তু অবিবাহিত।

এ দিকে কলকাতার বিরাট ধনী ব্যবসায়ী অসীম হল ইন্দ্রনাথের বন্ধু। কি করে যে চাষার ছেলের সাথে-পতি বন্ধু হয় তা বোঝা মুস্কিল! অসীম ইন্দ্রনাথকে নিজের অফিসে ভাল মাইনের চাকরি দিল। বাড়ি বন্দোবস্ত করে দিল স্বামী স্ত্রীর থাকার জন্য। আর সেই বস্তাপচা চিরাচরিত ধারা অনুসারে অসীম লোলুপ হয়ে উঠল সাবিত্রীর দেহ ভোগের জন্যে। নিজের চাকরির উন্নতির জন্যে ইন্দ্রনাথ স্ত্রীকে অসীমের দিকে এগিয়ে দেয়। সাবিত্রী চায় না, ইন্দ্রনাথ তাকে বাধ্য করে। অসীম সাবিত্রীকে পার্টিতে নিয়ে যায়। তাকে আপ-টু-ডেট করার জন্য ইংরিজি শেখায়। ধীরে ধীরে গ্রাম্য সাবিত্রী হয়ে ওঠে একজন শহুরে হিয়াবিলাসিনীর মত। সে মদ খেতে শেখে। মত্ত স্বামী এবং মত্ত অসীমের কাছে মত্ত সাবিত্রীকে এক রাত্রে টাইট পোষাক পরে টুইস্ট নাচতেও দেখা যায়।

এই ভাবে অনেক দিন কাটে। এক রাত্রে ঘরে শুধু সাবিত্রী আর অসীম। অসীম কামাতুর হয়ে ওঠে। সাবিত্রীর অনিচ্ছা প্রকাশ হওয়াতে অসীম জোর করে তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। সহসা ঘরে ঢোকে ইন্দ্রনাথ। অসীমকে ঐ অবস্থায় দেখে সে রাগে ফেটে পড়ে এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। ইন্দ্রনাথের এই রাগের কোন যুক্তি নেই, কেননা সে নিজেই এতদিন ধরে স্ত্রীকে বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তার ব্যবহারটা এ ক্ষেত্রে পুরো আজগুবি। অসীম প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। অফিসের ৩০ হাজার টাকা তছরূপের দায়ে সে ইন্দ্রনাথকে হাজতে পাঠায়। শিবনাথ সংবাদ পেয়ে নিজেদের সব জমি বেচে ইন্দ্রনাথকে মুক্ত করে।

ইন্দ্রনাথের চৈতন্যোদয় হয়। স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামের ছেলে গ্রামে ফিরে যায়। এই হাস্যকর ছেলে ভুলোনো গল্পে আমাদের দেশের বর্তমান বাস্তব চেহারাটা কি প্রতিফলিত হয়েছে?

এই মূল কাহিনীর উপকাহিনীগুলিও অবাস্তব আর হাস্যকর। ইন্দ্রনাথের গ্রামের দুই গরীব চাষী হল জটা আর লখাই, আর আদুরী এক গরীব চাষীর মেয়ে। দুজনেই আদুরীর প্রেমে ডগমগ, দুজনেই আদুরীকে বিয়ে করতে চায়। এদের প্রায় প্রতি দৃশ্যেই প্রেমের রেষারেষি আর খুনসুড়ি। লখাই আবার ভাল গান জানে. তাই সে আদুরীকে গানে গানে প্রেম নিবেদন করে। জটা আর লখাই দুজনেই গরীব চাষী, অথচ আশ্চর্য ফসলের ব্যাপারে, জমিজমার ব্যাপারে, জমিদার জোতদারের সঙ্গে এদের সম্পর্কের ব্যাপারে, এদের রুজি-রোজগার খাওয়া পরার ব্যাপারে কোন সমস্যার কথাই পালাকার উল্লেখ করেন নি। চাষী হলেও জটা আর লখাইয়ের যেন ও সব কোন সমস্যাই নেই। নিকৃষ্ট ছায়াছবির নায়ক নায়িকার একমাত্র কাজ যেমন প্রেম/করা, জটা, লখাই আর আদুরীর কাজও যেন ঠিক তাই। অথচ সরকারী হিসেব থেকেই আমরা জানতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গে বিগত দশ বছরে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ হয়েছে, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের এই ৬০ ভাগ চাষী অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করে। দুর্ভিক্ষ এদের চির সাথী। খিদের জ্বালায় এদের অনেকেই মরে গেছে, অনেকে শহরে এসে ভিখিরিতে পরিণত হয়েছে। এই হল বর্তমান কালে চাষীর বাস্তব অবস্থা। তাহলে "মা মাটি মানুষ"-এর পালাকার আদিরসাপ্লুত ঐ সব কিষাণ কিষাণীদের কোন্ গ্রহ থেকে ধরে এনেছেন?

উপকাহিনী আরো আছে। ঐ গ্রামে আছেন এক আদর্শবাদী বি-ডি-ও। তাঁর মুখে কি বড় বড় বাত। তিনি মহা মানবপ্রেমিক। গ্রামের দীন দরিদ্র লোকগুলোকে তিনি প্রকৃত মানুষ করে তুলতে চান্। আর আছে কামাল নামে এক আদর্শবাদী মুসলমান যুবক। তার মতে গ্রামের লোকেরা শহরে চলে আসছে বলেই দেশের যত দুরবস্থা। শহর থেকে বেশি বেশি লোক গ্রামে ফিরে গেলেই দুঃখ দূর হবে। এই যুক্তি শুনলে কি মরা মানুষও হেসে উঠবে না? যখন খেতে না পেয়ে দলে দলে লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে, তখন শহরের লোক গ্রামে গিয়ে কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবে? লেখকের সঠিক রাজনৈতিক জ্ঞান না থাকলে কলম দিয়ে যে লেখার বদলে ছাইপাঁশ বেরোয়, হাল আমলের অধিকাংশ যাত্রাপালাগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কদর্য সিনেমার মত এগুলিও বর্তমান সমাজে অপসংস্কৃতি ছড়াচ্ছে।

রাজনীতির নামে আবার রবীন্দ্র কাননের কর্তাব্যক্তিদের প্রচণ্ড অনীহা। কোন পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক বর্তমানে যাত্রাজগতে বেশ পাণ্ডাস্থানীয় ব্যক্তি হয়ে বসেছেন। সম্মেলনের স্মরণিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি নাট্য জগতের রাজনৈতিক ঝোঁকটিকে প্রায় বাপান্ত করে ছেড়েছেন। তিনি লিখেছেন, "যাত্রার নব তরঙ্গ গণনাট্য আন্দোলনের মতন মানুষের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেয় নি। নেয়নি বলেই দেশের আপামর জনসাধারণের অসম্ভব শ্রদ্ধা রয়েছে যাত্রার প্রতি। অস্বীকার করব না, কোন কোন রাজনৈতিক দল হুবহু গণনাট্য আন্দোলনের পথ ধরে চিৎপুরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। দু একটি দল যে ওদের প্রলুব্ধ করেনি, এমনও নয়। কিন্তু সে ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে।" যে গণনাট্য আন্দোলন ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে, নাট্যজগতে যা নতুন নতুন সৃষ্টির দ্বার খুলে দিয়েছিল, বর্তমান কালের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক যে আন্দোলনের ফলশ্রুতি, সেই গণনাট্য আন্দোলন নাকি মানুষের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিয়েছিল! আর অধুনা, উপরোক্ত পণ্ডিত প্রবরের মতে, সে মাটি বোধ হয় যোগাচ্ছে "মা মাটি মানুষ।" মহাশয়, রাজনীতির প্রতি যদি আপনি এতই বিরূপ, তাহলে সবিনয়ে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি: বেছে বেছে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতাদের শুধু পৃষ্ঠপোষক করেছেন কেন—যেমন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, সুব্রত মুখার্জি আর বারিদবরণ দাশ? তার মানে রাজনীতি আপনিও করেন, তাই আপনার বিরুদ্ধ রাজনীতিটা সহ্য করতে পারেন না। আজ যে লেখক বলে সে রাজনীতি করে না, সে হয় গণ্ডমূর্খ নয় কায়েমী স্বার্থের সেবাদাস।

কংগ্রেসীদের মধ্যে মারপিট

বর্ধমান জেলার আসানসোল বাস অ্যাণ্ড গত পয়লা জানুয়ারী দুদল কংগ্রেসীর মধ্যে প্রচণ্ড মারদাঙ্গা হয়েছে। পুলিশ গিয়ে ঐ অবস্থা আয়ত্তে আনে। পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি ইউ সির কিছু লোক যখন বাস অ্যাণ্ডে চাঁদা তুলছিল তখন তাদের আরেক দল গিয়ে বাধা দেয়। তাতেই ঐ কাণ্ড হয়।

পুলিশ বলেছে যে, দাঙ্গাকারীদের একদলের নেতা কংগ্রেসী এম এল এ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী এবং অপর দলের নেতা শ্রীজ্বালাল। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

দর্পণ অফিস হামলার নিন্দা

দর্পণের অফিসে ছাত্র পরিষদ গুণ্ডাদের হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন পীপলস লিটল থিয়েটারের পক্ষে শ্রীউৎপল দত্ত। তিনি বিবৃতিতে বলেছেন—

গত চোদ্দই জানুয়ারী যে ঘৃণ্য অপকীর্তি জীবগুলি দর্পণ দপ্তর বিধ্বস্ত করেছে, কর্মীদের প্রহার করেছে, তারা সর্বসমক্ষে এই বার্তাই বয়ে আনলো যে দর্পণ তার নিজের ব্রত পালন করতে পেরেছে। ব্রস্ত শাসকগোষ্ঠী দর্পণকে আক্রমণ করে প্রমাণ করে দিল, দর্পণের সত্যবাদিতা ও আদর্শনিষ্ঠায় অত্যাচারীরা কম্পিত। আমরা থিয়েটারের কর্মীরাও বারম্বার এহেন কাপুরুষোচিত বর্বরতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। সময় আসছে—ত্রিবর্ণ পতাকার আড়ালে গুপ্ত ঝটিকা-বাহিনীকে সকলে মিলে খুঁজে বার করে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো, পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ে যে নেতার দল তাদের জনতার আদালতে সোপার্দ করবো। সেই দিনটিকে কাছে আনার সংগ্রামে দর্পণ রয়েছে প্রথম সারিতে, তাই বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর যুগ্ম সম্পাদক নেপাল মজুমদার এবং আশু সেন এক বিবৃতিতে দর্পণের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন : আমরা আরো উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, কলকাতার দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা দর্পণ ও ফ্রন্টিয়ারের উপর গত চোদ্দই জানুয়ারী অরিথে একদল সমাজবিরোধী সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে ঐ পত্রিকা অফিস দুটির আসবাবপত্র ভেঙেচুরে দিয়েছে ও কর্তব্যরত কর্মীদের আহত করেছে। এই ঘটনা পশ্চিমবাংলা নতুন নয়। বিরোধী চিন্তার পত্রপত্রিকার উপর আক্রমণ চালিয়ে শাসকশ্রেণী ও তার অনুচরেরা বারবার এটাই কি প্রমাণ করতে চাইছে না যে বর্তমানে এই দেশে গণতন্ত্র একেবারেই মৃত? এক স্বৈরাচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আমরা গণতন্ত্রপ্রেমী লেখক শিল্পী সমাজ দুষ্কৃতদের এই ফ্যাসিস্টসুলভ মনোভাবের তীব্র নিন্দা করি।

ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ স্টাটিস্টিক্যাল চেকিং স্টাফ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীডি বি রায় বিশেষ বলেন, দর্পণের ওপর ছাত্র পরিষদের হামলার কথা শুনে আমি বেদনা বোধ করছি। ছাত্র পরিষদ শাসক দলেরই অন্যতম গণ-সংগঠন। ভাবতে লজ্জা হয় যে, রাজনীতির কথা বলে রাস্তার সমাজ বিরোধী গুণ্ডাদের হিংস্রতা নিয়েই এরা সাংবাদিকদেরও কণ্ঠ রোধ করতে চাইছে। "দর্পণ"-এর নির্ভীক সাংবাদিকতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমি এই হামলার তীব্র নিন্দা করছি, এবং দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য দাবী জানাচ্ছি।

ইষ্টার্ণ রেলওয়েমেন্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং এন সি সি আর এস এর ইষ্টার্ণ রেল জোনাল কমিটির আহ্বায়ক শ্রীবিমল দে এক বিবৃতিতে বলেন—সম্প্রতি ছাত্র পরিষদের কর্মী বলে বর্ণিত কিছু যুবক কলকাতার বিশিষ্ট সাপ্তাহিক দর্পণ অফিসে হামলা করেছে শুনে বিস্মিত হইনি। বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের ছাত্র সংগঠন এই জঘন্য কাজে ব্রতী হয়েছে বলেও আমি অবাক হইনি, কারণ, বিগত রেল ধর্মঘটে রেল কর্মীদের মা বৌ বোনকে পিটাবার জন্য এই সরকার ভাড়াটিয়া গুণ্ডা এবং বাজারের গণিকাদেরও কাজে লাগাতে কুণ্ঠিত হয় নি। রেল কর্মীদের ওপরও এ ধরণের প্রায় দৈনিক হামলার উল্লেখ করাই বাহুল্য।

দর্পণ নিষ্ঠার সঙ্গে মেহনতী মানুষকে প্রেরণা দেয় সংবাদ পরিবেশনার মাধ্যমে। আমাদের সাম্প্রতিক ধর্মঘটেও দর্পণ সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছে। তাই, রেলকর্মীদের কাছে দর্পণ স্বজনের মত। আমি রেল কর্মীদের পক্ষ থেকে দর্পণ-এর ওপর এই সমাজবিরোধী হামলার তীব্র নিন্দা করি এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে এ ধরণের হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানাই।

মধ্য কলকাতার জেলা কংগ্রেসের সহঃ সভাপতি ও যুব নেতা সোমেন মিত্র এম এল এ দর্পণের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। শ্রীমিত্র বলেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠ যারা হামলা করে বন্ধ করতে চেয়েছে, সেই সব সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

এন এল সি সির সভাপতি পঙ্কজ ব্যানার্জীও এম এল এ এই হামলার কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক দেশে স্বীকৃত। দর্পণের ওপর হামলা যারাই সংগঠিত করে থাকুক তারা সমাজবিরোধী

সাব-ইঞ্জিনীয়ারদের রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশনের পঞ্চশতম রাজ্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে সাতাশে ডিসেম্বর। এবারের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল বহরমপুরে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় তিনশো প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন উদ্বোধন দিবসে বক্তব্য রাখেন অরবিন্দ ঘোষ, রাজেন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশনের দীর্ঘ দিনের দাবী দাওয়া পূরণের প্রসঙ্গই এবারের সম্মেলনে প্রাধান্য পেয়েছে। এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার রিপোর্টে জানান : "জাতীয় কনভেনশন থেকে মজুরী সংকোচন, দমন পীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে কর্মসূচী প্রতি পালিত হচ্ছে, ভবিষ্যতে তা রাজ্য বা সারা-ভারত ধর্মঘটের স্তরেও উন্নীত হবে। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেও আগামী বছর (১৯৭৫) আমাদের দৃঢ় ভূমিকা নিতে হবে।

কৃষিকর্মীদের দাবী

সাবর্ডিনেট এগ্রিকাল্চারাল সার্ভিস ক্লাস টু অফিসারদের দীর্ঘদিনের দাবী আজও উপেক্ষিত। এই দাবীগুলি মূলতঃ কৃষি বিভাগের অন্যায় ও অবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে। এই দাবীগুলির মধ্যে একটি মাত্র অর্থনৈতিক, বাকীগুলি কল্যাণমূলক। বহু অভিজ্ঞ কৃষি কর্মী অবসর গ্রহণের দর আজ সপরিবারে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা এই কৃষি বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থলে তাদের সন্তানদের চাকরী পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয়ত তাদের অতিরিক্ত সম্প্রসারণ অফিসার হিসেবে স্বীকৃতির দাবী আজও অনুমোদন পায় নি। গেজেটেড পদে উন্নীত করার আবেদনও নাকচ করা হয়েছে। অন্যদিকে বি ডি ও র ফিডার পদ এবং এ্যাসিস্টান্ট ফার্ম ম্যানেজারদের পঞ্চাশ টাকা স্পেশাল পে সংক্রান্ত যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আজ তিন বছর ধরে তা মানা হয় নি।

পরীক্ষায় টোকাটুকি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিরুপায় অধ্যাপকরা এই অবস্থায় খাতা দেখা আর চোখ বন্ধ করে নম্বর বসিয়ে দেওয়া সমান বলে মনে করছেন।

পরীক্ষার অব্যবস্থা এবং টোকাটুকি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নীরবতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্যরা ক্ষুব্ধ। পরীক্ষা নিয়ামকের কাছে তাঁরা বিস্তারিত সংবাদ জানতে চেয়েছেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের সভায় (যোলই ও সতেরোই জানুয়ারী) সিন্ডিকেটের সভায় এ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়।

দর্পণে পঁচাত্তরের মুখ

সাধন গুহ

ইমার্সনের একটি বিখ্যাত উক্তি হল, "Butchers turn violent while themselves reflect in mirror." দর্পণ-এর ওপর শাসক গোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট ভাড়াটিয়া খুনীদের হিংস্র আক্রমণের মধ্য দিয়ে এই উক্তির সার্থকতা আর একবার প্রমাণিত হল। মহানগরীর আরণ্যক গুহার গুপ্ত গহ্বর থেকে আবার বেরিয়ে এলো ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল, বাহাত্তর সাল থেকে যে পশু শক্তির নির্মম তাণ্ডবে গোটা রাজ্যের বুক জুড়ে নেমে এসেছে সন্ত্রাসের বিভীষিকা, যে পশুদের হাতে অসংখ্য নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে, অসংখ্য নারী হারিয়েছেন সন্তান, অসংখ্য নারী দিয়েছেন জীবন এবং সর্বোপরি যে পশুদের হাতে অসংখ্য নারীর লুণ্ঠিত হয়েছে ইজ্জত এবং এখনও হচ্ছে। এই সেই ঘৃণ্য শ্বাপদ দল যারা পুলিশের সতর্ক প্রহরায় বিগত তিন বছর ধরে এই রাজ্যে চালিয়ে যাচ্ছে খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, চুরি ডাকাতি এবং নারী ধর্ষণের বেপরোয়া কারবার। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তার গণসমর্থনের বাহার দেখাতে গিয়ে বারবার এই খুনী লুঠেরাদের হাতেই তুলে দিয়েছেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।

আবার নির্বাচনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শাসকদল জানে যে, এই রাজ্যে শান্ত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পশ্চিমবাংলার মানুষ সিদ্ধার্থবাবু এবং তার দলকে আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালের মত ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলবে। তাই, আবার সেই খুনে রাজনীতিকে শাসকদল চাঙা করে তুলছে তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। দর্পণ-এর ওপর এই পাশবিক আক্রমণের প্রতিবাদে সে কারণেই কোন নিন্দা ধ্বনিত হয়নি সিদ্ধার্থশঙ্করের কণ্ঠে, প্রতিবাদ জানাননি রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ মৈত্র। এই খুনে রাজনীতি বহাল রাখার আন্তরিক কামনার পরিপোষক বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বাজারী সংবাদপত্রে অন্ততঃ সংযোগী সাংবাদিক সৌজন্যের খাতিরেও উচ্চারিত হয়নি নিন্দার বাণী। এই রাজ্যের মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অসংকোচে উদ্ঘাটিত করে দেয় বর্তমান শাসনের নামে দুঃশাসনের ব্যভিচারী কাহিনী তাদের প্রথম সারিতে রয়েছে দর্পণ। এবং, থাকবেও। বরং বলা যায়, কালের দর্পণে উদ্ভাসিত হল পঁচাত্তরের মুখ। স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ বছর শাসকগোষ্ঠী আবার চালাও ভাবে আমদানী করবে হত্যার বিভীষিকা। দর্পণ সেই নরপশুর বীভৎসার প্রথম বলি। এই আক্রমণ রাজ্যের বামপন্থী রাজনীতিকেও নির্দেশিত করবে নবতর চিন্তায়। নতুন করে চিন্তা করতে হবে সুস্থ জীবনবোধসম্পন্ন প্রত্যেক সংস্কৃতি-কর্মীকেও।

লিটল ম্যাগাজিন

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

মাত্র দ্বিতীয় সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্কলনে মনি মুখোপাধ্যায়ের "থুঃ থুঃ" নামে একটি অসাধারণ গল্প আছে। চরিত্রের দিক থেকে এ সঙ্কলনকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও এর রুচি ও পরিচ্ছন্নতা মার্জিত। প্রচ্ছদ সত্যিই সুন্দর।

এছাড়া আরও দুটি পত্রিকা আমাদের হাতে এসেছে, যা স্থান পাত্র বিচারে অসাধারণ। দেশবন্ধু নগর থেকে প্রকাশিত বাৎসরিক সংখ্যা 'কাঁচালেখা' স্থানীয় সাহিত্য প্রয়াসীদের ফসল। প্রতিটি রচনা পড়ে অনুভব করা যায় চোখের আড়ালে কত উদীয়মান প্রতিভা বিকাশোন্মুখ। সেদিক থেকে বৎসরে একবার হলেও জনকল্যাণ সমিতির এই উদ্যম প্রশংসনীয়। অপর পত্রিকাটি হল গার্ডেনরীচ মুদিয়ালি হাইস্কুলের "পল্লব"। বিস্মিত হতে হয় এই স্কুলের ছাত্রদের গভীর অনুসন্ধিৎসা দেখে। মুদিয়ালি গার্ডেনরীচ অঞ্চলের উৎস, ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গম্ভীর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এর মূল্য শুধুমাত্র ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, স্থানীয় জনসাধারণের কাছেও এর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। নিজ বাসভূমি সম্পর্কে পরিচিত হবার এবং পরিজ্ঞাত করবার যে ইঙ্গিত 'পল্লব' পত্রিকার মধ্যে পাওয়া গেল, তার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ যেমন প্রশংসা পাবেন, তেমনি প্রশংসা পাবেন পত্রিকা সম্পাদক শিক্ষক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। ছাত্রদের অন্যান্য রচনাও যথেষ্ট প্রশংসনীয় মানের।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক ৪ডাণ্ড ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

উত্তর কলকাতার যুবকদের ওপর হামলার কংগ্রেসী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল

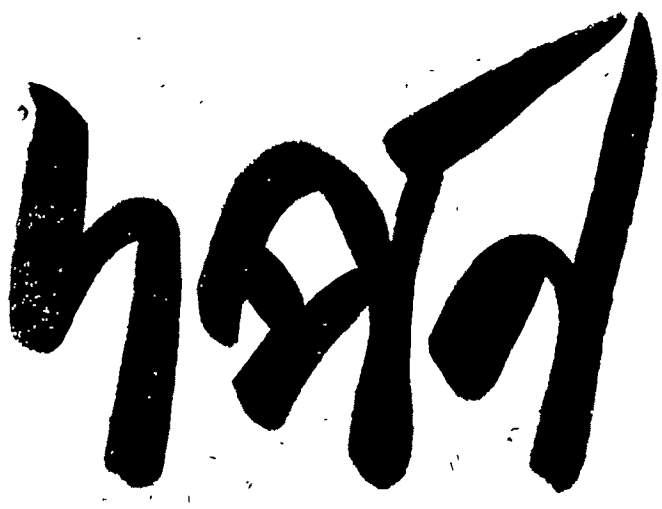

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আনন্দমার্গের নামে যুবকদের ওপর হামলা করার কংগ্রেসী প্ল্যান ভেস্তে গেল। গত তেইশে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিনে ভোর ছয়টা থেকে উত্তর কলকাতার কুমারটুলি পার্কে সশস্ত্র পুলিশী মহড়ার দৃশ্যে স্থানীয় বাসিন্দারা হতবাক হয়ে যান।

পার্কে ক্রীড়ারত যুবকদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। আশেপাশে রাস্তায় লোকজনের যাতায়াতের ওপর সাময়িক বিধিনিষেধ আরোপের চে

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

১৮শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৫ ॥ ৪০ পঃ

তরুণকান্তি ঘোষের মুখে বিস্ময়কর কথাবার্তা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাঁকরাইলে বেলভেডিয়র জুটমিল প্রাঙ্গণে। অনেকেই বক্তৃতা করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে তরুণকান্তি ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ, প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবী চট্টোপাধ্যায়।

তরুণকান্তি ঘোষ সকলকে চমৎকৃত করে বক্তৃতায় বলেন যে, আজকের রাজনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেসের কৌশলের দিক থেকে সি পি আই-এর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করা দরকার। সমাজতন্ত্র, সোভিয়েত মৈত্রী ও দেশে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইত্যাদি নানা যুক্তির অবতারণা করেন তিনি।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নিজের প্রয়োজনে সি পি আই-কে সঙ্গে রাখার দরকার বলে তিনি মনে করেন। তা না হলে আবার বামপন্থী ফ্রন্ট গড়ে উঠবে এবং আবার উনসত্তর সালের অবস্থা ফিরে আসা বিচিত্র নয়।

এমন কি দেবীবাবু নিজেও আশা করেন নি যে তাঁর বক্তব্য তরুণকান্তিকে এত প্রভাবিত করেছে। বেশ প্রত্যুষের সঙ্গে তরুণবাবু তাঁর যুক্তি হাজির করেন।

এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন যে, সি পি আই পশ্চিমবঙ্গে বা অন্যান্য রাজ্যে অস্তিত্বহীন। কংগ্রেসের শক্তিতে তাদের লপচপানি। ওদের মদত দেওয়ার কোন প্রয়োজন কংগ্রেসের নেই।

প্রদীপবাবু মনে করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে যে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ তা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী আর সুবিধাবাদী ধান্ধাবাজ সি পি আই-এর সঙ্গে মিতালি এক জিনিষ নয়।

বঙ্গবন্ধু এবার ডিকটেটর হলেন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

হঠাৎ বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান দেশের সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়েছেন। নিজদল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন।

আওয়ামী লীগের দুর্নীতি ও ব্যাভিচার চরমে উঠেছিল। সারা দেশের মাস্তানরা আওয়ামী লীগের আওতায় মারপিট খুন জখম এবং লুঠতরাজের মাধ্যমে দেশের শাসনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল।

এই অবস্থায় সারা দেশে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দানা বাঁধছিল। প্রতিরোধ অনেকক্ষেত্রে সশস্ত্র পর্যায়ে উপনীত হচ্ছিল। বাংলাদেশের বহু গোষ্ঠীর হাতে এখনও বহু অস্ত্রশস্ত্র আছে। এদের অনেকেই চীনপন্থী। তারা ক্রমশঃ নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে জরুরী কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল।

প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যর্থ হয়েছেন। যত দুর্নীতিপরায়ণ ধান্দাবাজের দল আওয়ামী লীগে ঢুকে লুটেপুটে খাচ্ছিল। কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না বঙ্গবন্ধুর।

মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বলেছিলেন যে, বামপন্থীদের মধ্যে যারা আজ অস্ত্র হাতে করেছে তাদের অনেকেই দেশপ্রেমিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান। তাদের সকলকে একত্রিত করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সরকার গঠন করে সারা দেশে একেবারে গ্রামস্তর পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা দরকার।

তাজউদ্দিনের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। হতাশায় উনি মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন এবং আওয়ামী লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। সে প্রায় মাস দুয়েক আগেকার কথা।

ইতিমধ্যে হত্যা, লুঠ, দুর্নীতি আরও বাড়তে থাকে আর সেই সঙ্গে গোপন রাজনৈতিক সংগঠনও অবস্থা প্রায় আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল।

শেখ মুজিবের সমস্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা-নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া ছাড়া রাস্তা ছিল না। রাষ্ট্রপতি হয়ে তিনি আদালতের বিচার ব্যবস্থা নাকচ করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ হল বিরোধী জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের দৈনিক গণকণ্ঠের প্রকাশ বন্ধ করা। এর আগেই ঐ পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত কবি আল মাহমুদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দলের উচ্চপর্যায়ের প্রায় সব নেতাই জেলে।

কিছুদিন আগে গোপন সশস্ত্র দলের নেতা সিরাজ শিকদার পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। পুলিশ এই ঘটনার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে খুবই পরিচিত।

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি

দর্পণের ওপর পূর্ব পরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত আক্রমণ কোন মামুলী ঘটনা নয়।

এই আক্রমণ এবং পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের বিপন্ন অবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। গণতন্ত্র-বিরোধী বহু ঘটনাই একের পর এক ঘটে চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষীণ প্রতিবাদ হয়েছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ নিজ নিজ এলাকায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে দু এক কথা বলে চুপ হয়ে গেছেন নিছক হতাশায় সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই হঠাৎ দর্পণের ওপর আক্রমণ মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। সংবাদপত্রের ওপর আক্রমণ এ রাজ্যে নজীরবিহীন। এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে সংগঠিত প্রতিবাদ হওয়া দরকার। দর্পণের সম্পাদক আশা করেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনসমূহ এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে সভা সমিতির এবং কনভেনশনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবে। রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পত্রিকাসমূহ দর্পণের ওপর আক্রমণের ঘটনাকে চেপে যেতে চেয়েছে নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। আজ দর্পণের মত ছোট একটি সাপ্তাহিকের কণ্ঠরোধের চেষ্টা হয়ত তাদের কাছে নগণ্য মনে হতে পারে, কিন্তু এই ভাবেই গণতন্ত্র-বিরোধীদের আক্রমণ ছোট দু-একটা ঘটনা দিয়ে শুরু হয়ে ব্যাপক আকার নেয়। ইতিহাসে এর নজীর আছে। আবার এ নজীরও আছে যে, সচেতন মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে গণতন্ত্র-বিরোধীরা পুলিশ প্রশাসনের সব রকম সহায়তা সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছে।

দর্পণ এই প্রতিবাদ সংগঠিত করার জন্য গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত গোষ্ঠী ও সচেতন মানুষকে লিখিতভাবে আবেদন জানাবে। উদ্দেশ্য হবে একটি কনভেনশন সংগঠিত করা এবং গণতন্ত্র রক্ষার ব্যবস্থা হবে আলোচনার বিষয়বস্তু।

দর্পণ সাপ্তাহিকের ওপর গুণ্ডা আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল গত চোদ্দই জানুয়ারী বিকেল তিনটে নাগাদ।

যদিও কারা এই আক্রমণ সংগঠিত করেছিল বা কারা এর অংশীদার সবই পুলিশের জানা তবুও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। গুণ্ডারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই সূত্রে বলে রাখা দরকার যে, দর্পণের ওপর আক্রমণের দু-একদিন পরে ছাত্র পরিষদ নেতা কুমুদ ভট্টাচার্য রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রেস কর্ণারে হাজির হয়ে আস্ফালন করে বলেন ঃ দর্পণের ওপর আক্রমণের নেতৃত্ব আমি করেছি—এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। দরকার হলে এ ধরণের আক্রমণ আবার সংগঠিত হবে।

এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। কিসের জোরে কুমুদবাবু খোদ সরকারী হেড কোয়ার্টারে একঘর সাংবাদিকের সামনে এ ধরণের আস্ফালন করতে সাহস করেন?

অবশ্যই তিনি জানেন যে, তার গায়ে হাত দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পুলিশ প্রশাসন ওদের অঙ্গুলি হেলনে ওঠা বসা করে।

তদন্তরত এক পুলিশ অফিসার দর্পণকে জানিয়েছেন যে, পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে আর বেশী-দূর না এগোবার নির্দেশ আছে ওপর মহল থেকে। পুলিশ সমস্ত জানে কিভাবে এই গুণ্ডা আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে।

প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দরকার ছিল কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা এবং তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা। এ সবের কোন ব্যবস্থা পুলিশ করে নি। ওপর মহল বলেছে কিছু করার দরকার নেই।

এদিকে কংগ্রেসের বিভিন্ন মহল এই আক্রমণের নিন্দা করেছেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আরও অন্যান্য অনেকে নিন্দাসূচক কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু কেউই সাংগঠনিকভাবে কোন ব্যবস্থার কথা বলেন নি। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এত সঙ্গীন যে, কেউই জোর গলায় কোন কথা বলার সাহস রাখেন না।

মুজিবের পথ অনুসরণ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসী নেতৃত্ব হঠাৎ মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের কথা উঠিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এঁরা খতিয়ে দেখেছেন নির্বাচন করার ঝুঁকি অনেক। তাই মধ্যবর্তী নির্বাচন আর করা যায় কিনা ভাবা হচ্ছে।

বরং এখন কংগ্রেসীরা মনে করছেন আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচন কোনও অছিলায় স্থগিত যায় কিনা।

লোকসভায় ও রাজ্যসভায় কংগ্রেসীদের বিরাট সংখ্যাধিষ্ঠতা। নেতৃত্ব নিশ্চিত জানে যে, প্রশাসন পুলিশ, গুণ্ডা এবং কায়েমী সমস্ত একত্রিত করেও আর এত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা যাবে না।

বরং বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে এমন কিছু করা দরকার যাতে কংগ্রেসী শাসন নির্বাচন না করেই আরও কয়েক বছর টিকিয়ে রাখা যায়।

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

জব্বলপুরে বিপর্যয়ে কংগ্রেসীরা বিব্রত ও তীব্র কোঁদলের মুখে

(দর্পণের প্রতিনিধি)

জব্বলপুরের লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে কংগ্রেসী প্রার্থীর বিরাট পরাজয় দলের সর্বোচ্চ নেতৃমণ্ডলীকে প্রচণ্ড বিব্রত করেছে। এর ফলে দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল আরও তীব্র হতে বাধ্য, কেননা কংগ্রেসীদের ওপর তলার যাঁরা আরও ওপরে যেতে চান তারা এখন প্রকাশ্যে ইন্দিরা-বিরোধিতায় নামছেন। কংগ্রেসীরা বুঝতে পারছেন যে, তথাকথিত ইন্দিরা জোয়ার থিতিয়ে গেছে। মানুষ আর ফাঁকিতে বা গরীবী হটাও ধোঁকায় আস্থা রাখছে না।

সর্বোচ্চ নেতাদের প্রায় সকাই এখন নানা অছিলায় দিল্লীতে দিবারাত্র শলাপরামর্শ হচ্ছে। কিন্তু ওরা জানেন যে দেশের সংকট আরও গভীর হবে। সমস্ত পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই শিকেয় উঠেছে।

এদিকে আন্দোলন চতুর্দিকে ফেটে পড়ছে, অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। সারা দেশে বিকল্প নেতৃত্বের আগিদ বাড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত দক্ষিণ ও বাম বিরোধী শক্তি নিজেদের কৌশল ঠিক করতে ব্যস্ত।

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ পন্থীদের খুব একটা আসর নেই। এখানে কংগ্রেসের বিকল্প সি পি এম সমেত নয় বাম দল। সম্প্রতি শেষোক্ত গোষ্ঠী প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষার দাবীতে একযোগে প্রচার আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাধারণ মানুষের কাছে নয়-বামের প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নে এত ছুৎমার্গের ব্যাপারটা বোধগম্য নয়। দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রধান কর্তব্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ এবং গণতন্ত্রের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করা।

যদি বামপন্থীরা এব্যাপারে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে কোন কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে সমস্ত দল ও গোষ্ঠীকে আহ্বান জানায় তাতে বামপন্থীদের ভয় পাওয়ার কি আছে?

নিজেদের সংগ্রামী কর্মসূচী ও কৌশল ঠিক থাকলে আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ হলে এই ধরণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী ফ্রন্টের নেতৃত্ব ত বামপন্থীদের হাতে থাকবেই।

আগেকার সংজ্ঞা অনুসারে প্রগতি অথবা প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এখন ঐক্য ব্যাহত করা আহম্মকী।

জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস, ভারতীয় লোকদল বা অন্যান্য বিভিন্ন দলকে প্রতিক্রিয়ার চক্র মনে করে দূরে রাখা যায়, কিন্তু তাতে বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সুবিধে। আর তাছাড়া এই সমস্ত দলে যারা সমর্থক তাঁরা সঠিক বামপন্থী নেতৃত্বের আওতায় সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকবে।

বামপন্থীরা যদি এ সুযোগ গ্রহণ না করে তবে ধরে নিতে হবে যে, তারা নিজেদের সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থাবান নয়।

বর্মণ কমিশনের রিপোর্টে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অপদার্থতা ধরা পড়েছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস বর্মণকে চেয়ারম্যান করে একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিশন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে এক দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেছেন রাজ্য সরকারের কাছে।

এই রিপোর্টে কমিশন বিদ্যুতের ব্যাপারে সরকারী সংস্থাসমূহের তীব্র নিন্দা করেছেন। সরকারী সংস্থার মধ্যে আছে মন্ত্রী জয়নাল আবেদীনের অধীনে দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড, এবং আবদুল গণি খাঁন চৌধুরীর অধীনে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ।

এই দুই পর্ষদই নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা চরম অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

জয়নাল সাহেবের অধীনে দুর্গাপুর প্রোজেক্টে চরম অব্যবস্থার কথা কমিশন রিপোর্টে দীর্ঘ জায়গা জুড়ে আছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বছর দুয়েক আগে কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশনের পক্ষ থেকে একটি তদন্তে যে অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল আজও তার কোন পরিবর্তন হয় নি। এই তদন্তে বলা হয়েছিল যে, কারখানার সর্বত্র অপরিষ্কার এবং চারদিকে কয়লার ধুলো দেখে মনে হয় যেন প্রোজেক্টে কোন প্রশাসন নেই। বর্মণ কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গত দু-বছর আগের অবস্থা থেকে আরও অবনতি লক্ষ্য করা যায় এখন। অনেক যন্ত্রের পাখার ব্লেড ভেঙ্গে বেরিয়ে গেছে। হামেশাই যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে থাকে যার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ ব্যাহত হয়।

অনুরূপ অবস্থা গণি খান চৌধুরীর বিদ্যুৎ পর্ষদের। কোন সার্থক প্রশাসন ব্যবস্থাই গড়ে ওঠে নি। যা উৎপাদন হয় সেই বিদ্যুৎ ঠিকমত সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। যখন পর্ষদ গঠন হয় তখন ঠিক ছিল যে, পর্ষদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ আগে কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন শিল্পে কারখানায় সরবরাহ করার ব্যবস্থা হবে। উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ যাবে রাজ্যের অপরাপর অংশে। পর্ষদ কোন সময়েই এই ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করে নি।

কমিশন তদন্ত রিপোর্টে বলেছে যে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিচালনের জন্য উপযুক্ত সংগঠনের প্রয়োজন আছে। এই সংগঠনের দায়িত্ব থাকবে যোগ্যতাসম্পন্ন কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা পরিচালিত একটি বোর্ডের হাতে।

কমিশন যা বলেন নি বা এড়িয়ে গেছেন তা হল বিভিন্ন সরকারী সংস্থার যে নৈরাজ্য চলছে সেই সম্পর্কে।

ডিকটেটর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিরাজ শিকদার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তারপর পুলিশের গাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি গাড়ী থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালাতে চেয়েছিলেন বলে পুলিশের অভিযোগ। তাই পুলিশ বাধ্য হয়ে ওকে গুলি করে হত্যা করে।

বাংলাদেশ বন্ধু রাষ্ট্র। সে দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার যা কিছু পরিবর্তন তা নিতান্তই ঐ দেশের ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু ও-দেশের ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এদেশে হতে বাধ্য। কেউ কেউ ও-দেশের আওয়ামী লীগের নামে ব্যাভিচারের সঙ্গে এ দেশের কংগ্রেসীদের কাজকর্মের সাদৃশ্য খুঁজে পান।

অনুসরণ?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসীদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা দেশে মুজিবর রহমানের হঠাৎ সমস্ত ক্ষমতা দখলের নজীর তুলে ধরছেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আহমেদ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মুজিবর রহমানের পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর যাঁরা অনুরূপভাবে স্বাগত জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন আরব ও পশ্চিম এশিয় রাষ্ট্র সমূহের কর্তা ব্যক্তিরা। এই সমস্ত দেশে গণতন্ত্র বলতে মানুষ এখানে যা বোঝে ঠিক সেই ধরণের ব্যবস্থা চালু নেই।

শ্রীমতী গান্ধীর স্বাগত জানানোর ব্যস্ততা অনেকের কাছে ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয়েছে।

সারা ভারত দাবী দিবস

(দর্পণের সংবাদদাতা)

তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ করা ফর্মুলা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা পাঁচ কিস্তি মহার্ঘভাতা পাবার অধিকারী হলেও সরকার তাঁবেদার কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে জানুয়ারী মাস থেকে মাত্র তিন কিস্তির মহার্ঘভাতা দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারও অর্ধেক কেটে নেওয়া হবে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় আইনে। ফলে, একজন সর্বনিম্ন আয়ের কর্মচারীর যেখানে পাবার কথা মাসিক চল্লিশ টাকা সেখানে তিনি পাবেন মাত্র বারো টাকা। বকেয়া একশ ষাট টাকার এক পয়সাও এখন তিনি হাতে পাবেন না। এই অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা ভারত কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী কনফেডারেশন একত্রিশে জানুয়ারী সারা ভারত দাবী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের দাবী

পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের বিভিন্ন দাবীতে গত রবিবার বেঙ্গল মেডিকেল ইউনিয়নের উদ্যোগে মধ্য কলকাতার সেবক সদন হলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়েছে। সম্মেলনে ডাঃ শান্তিপ্রিয় ঘোষ পৌরোহিত্য করেন। কর্মক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে নিম্নোক্ত দাবী জানানো হয়েছে, কর্মচারী রাজ্য বীমা স্কীমে সমস্ত স্তরের রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের কাজের সুযোগ দিতে হবে; কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে অধিক সংখ্যক হোমিওপ্যাথিকের গবেষণাগার খুলতে হবে; অবিলম্বে রাজ্যের হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিলের নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে; কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে এরাজ্যের জেলার সদরে অন্তত একটি করে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল খুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স বা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

গত আঠারই জানুয়ারী উপরোক্ত দাবীর ভিত্তিতে বেঙ্গল মেডিকেল ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়েছে বলে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

হামলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়। সাদা পোষাকে পুলিশ ঘাঁহিনী স্থানীয় কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে ওখানে টহল দিতে শুরু করে।

ব্যাপার কী? ভোরবেলায় স্থানীয় জনসাধারণ তেইশে জানুয়ারীর এই প্রস্তুতিতে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্থানীয় কংগ্রেস অফিস থেকে প্রচার করা হয় যে, কুমারটুলী পার্কে আনন্দমার্গের সদস্যদের সভা করার কথা আছে। সুতরাং ইন্দিরা বিরোধী সভাসমিতি তাঁরা কিছুতেই করতে দেবেন না।

শাসক দলের এই আচরণে অনেকেই বিক্ষুব্ধ হন। কিন্তু গ্রেপ্তার আর মার খাওয়ার ভয়ে আচমকা হয়রানি হজম করতে হয়েছে। অথচ যাদের নামে এত পুলিশী আয়োজন, তাদের কোন সভাতো দূরের কথা, কোন সভেরও টিকি মেলে নি। আর আনন্দমার্গ ওখানে মিটিং করবে এমন কথা উত্তর কলকাতার তাবৎ মানুষের কানে যায় নি। কেবলমাত্র কংগ্রেসী ভাইয়েরাই নাকি গোপন সূত্রে এই খবর সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল।

এদিকে আনন্দমার্গের কোন সাক্ষাৎ শেষ পর্যন্ত না মেলায় পুলিশের মধ্যেও প্রশ্ন দেখা দেয় বলে জানা গেছে এবং কয়েক ঘন্টা পর তারা স্থান ত্যাগ করে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর কলকাতায় যুবকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা যায়। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে অনেকে ঐদিন বেরোয় নি। স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা, আনন্দমার্গের অজুহাতে যুবকদের উপর হামলা চালানোর একটি পরিকল্পনা এই ভাবে কেঁচে গেল।

স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে যে সংবাদ প্রতিদিন নিহত হয় দৈনিক পত্রে, দর্পণ আপনাকে সে সংবাদ পরিবেশন করে নির্ভীক মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষাণ্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

যোগাযোগের ঠিকানা :
সার্কুলেশন ম্যানেজার
৬১নং মট লেন
কলিকাতা-তেরো

ধর্মঘটোত্তর পরিস্থিতি (২)

রেল-প্রশাসনের যথেচ্ছাচারের কাহিনী

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ভারত সরকারের রাজনৈতিক দেউলেপনা এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে, অন্ততঃ গণতান্ত্রিক মুখোস রক্ষার জন্যও সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের রায়ের প্রতি নূন্যতম স্বীকৃতি দিতেও তারা পারছেনা। শুধুমাত্র ছাঁটাই আদেশ বেআইনী ঘোষনার প্রশ্নেই নয়, বোনাস সংক্রান্ত সুপ্রীম কোর্টের রায়কেও তারা পদদলিত করেছে। ১৯৬৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, যেহেতু ভারত সরকারই রেলের মালিক এবং রেল বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয় সেই কারণে বোনাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পৃথকভাবে বিচার করতে হবে—যথার্থ যুক্তি হিসাবে এটা স্বীকৃত হতে পারে না।" ১৯৭২ সালে বোনাস বিভিয়ু কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ বি, আর, মদন বোনাসের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে বলেছেন, "যেখানে শ্রমিকের প্রাপ্ত বেতন লিভিং ওয়েজের কম সেখানে লিভিং ওয়েজ আর প্রাপ্ত বেতনের ফারাক বোনাস দিয়ে পূরণ করা হয়। এই কারণে বোনাস বেতনের গচ্ছিত অংশ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।" ভারত সরকার এই সংজ্ঞাও মানতে রাজী নয়।

তাই, আইনকে বেআইনীভাবে পদদলিত করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় চূড়ান্ত দমননীতি চালিয়ে ২০ লক্ষ রেল শ্রমিক কর্মচারীর বৈধ অধিকারের দাবীকে রুদ্ধকণ্ঠ করে রাখতে বদ্ধপরিকর। স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারের চোখে এন সি সি আর এস -এর মত রেলকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ যুক্ত মোর্চার প্ল্যাটফর্ম ত্রাসের প্রতীক হতে বাধ্য। এই সমীক্ষা রিপোর্টের প্রথম পর্বেই বলা হয়েছে যে, লোয়ার লেভেলে এন সি সি আর এস সক্রিয় থাকলেও টপ লেভেলে কোন কাজই এগোচ্ছে না। প্রথমতঃ এর জন্য দায়ী সি পি আই দলের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এ আই টি ইউ সি এবং এ আই আর এফ নেতৃত্বের একাংশ। কনফেডারেশন নেতৃত্বের সামগ্রিক ভূমিকাও খুব স্বস্তিবাচক নয়। এসব আভ্যন্তরীণ দলাদলির জন্য এন সি সি আর এস এর কোন কেন্দ্রীয় বৈঠকও সম্ভব হচ্ছে না।

এই অনৈক্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে সরকার। রেল প্রশাসনে চলছে মন্ত্রী থেকে সুরু করে ডিভিশনাল অফিসার পর্যন্ত প্রত্যেকের খেয়াল খুশি চরিতার্থ করার পালা। এর বিরুদ্ধেও এন সি আর এস কেন্দ্রীয়ভাবে রুখে দাঁড়াতে পারছে না। প্রয়াত রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র ছিলেন সি পি আই দলের চোখে প্রগতিশীল কংগ্রেসী। বিহারে ললিতবাবুর উপদলীয় শক্তির সমর্থনে সি পি আই দল ডাঙ্গের নেতৃত্বে পাটনায় দলের মহা মিছিলও করেছে ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর। অতএব, ডাঙ্গে কিংবা তাঁর দল যত বাক বিভূতিই বিস্তার করুক না কেন রেলকর্মীদের ওপর ভারত সরকারের ফ্যাসিবাদী কায়দায় হিংস্র আক্রমণের পেছনে তাদের পরোক্ষ সমর্থন ছিল এবং আছে সে সত্য আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট। ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর রেলমন্ত্রী এন সি সি আর এস এর সঙ্গে বসতে রাজী হননি এবং এখনও সরকার সেই জেদই বজায় রেখে চলেছে। সি পি আই দলের চোখে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও প্রগতিশীল। ফলে সমস্ত ঘটনার পেছনে এই দলের রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতিই কাজ করছিল এবং এখনও করছে। প্রয়াত ললিতনারায়ণ মিশ্রও যে কি প্রকটভাবে ডাঙ্গে দলকে মদত দিতেন তার একটি মাত্র নজির উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বলে মনে করি। গত সেপ্টেম্বর মাসে রেলমন্ত্রী হিসেবে ললিতবাবু বম্বে গেলে তার কাছে যখন কয়েকহাজার বরখাস্ত কর্মীর পুনর্নিয়োগ দাবী করা হয় তখন তিনি মাত্র ১৩ জনের পুনর্নিয়োগ অনুমোদন করেন এবং এই ১৩ জনই সি পি আই দল পরিচালিত ধর্মঘটের ঠিক প্রাক্-মুহূর্তে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা কাণ্ডজে সংগঠন রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সংগে যুক্ত। রেলকর্মীরা যখন ছাঁটাইয়ের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আইনের আশ্রয় নেন সি পি আই প্রভাবিত ইউনিয়নের কর্মীরা কিন্তু তার শরিক হয়নি। এরপরও ডাঙ্গেজীরা ধূর্ত বুদ্ধিমানের মত নিজেদের স্বরূপ গোপন করতে চাইলেও তা আর গোপন থাকছে না।

কনফেডারেশনের নেতৃত্বও ডাঙ্গেপন্থীদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়ছে। লোকো রানিং স্টাফ এসোসিয়েশনের নেতৃত্বের একাংশও সরকারী ফাঁদে পা দিয়ে বসে আছে, এ আই আর এফ নেতা প্রিয় গুপ্ত যতখানি উদ্যোগ নিতে পারতেন এন সি সি আর এসকে সজীব রাখার জন্য তা তিনি নিচ্ছেন না। এন সি সি আর এস এর আহ্বায়ক জর্জ ফার্নাণ্ডেজ এবং সংস্থার শরিক সংগঠন সি আই টি ইউ ছাড়া এন সি সি আর এস কে সক্রিয় রাখা এবং আরও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াসে অন্যান্য সমস্ত শরিকের ভূমিকাই প্রায় নেতিবাচক। এটা একাধারে দুর্ভাগ্য এবং ভয়ের কথা। ৭৪-এর রেলধর্মঘট গোটা দেশের শ্রমিক আন্দোলনে যে নতুন দিক খুলে দিল তা ব্যর্থ হবে কি হবেনা সেটা নির্ভর করছে একমাত্র এন সি সি আর এস নেতৃত্বের ওপর। ইতিহাস তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

মৃতের সম্পর্কে অপ্রিয়ভাষণ না করাই প্রচলিত সৌজন্য, কিন্তু, যে কাজের ফলে কিছু কিছু অফিসার ঔদ্ধত্যের আস্ফালন করতে সাহস পায় এমন অন্ততঃ একটি নজির উদ্ধৃত করতে হচ্ছে। গত অক্টোবরের ঘটনা। প্রয়াত মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র কংগ্রেস এম, পি, বিভূতি মিশ্র ধানবাদের ডি এস কে চারজনের চাকরীর সুপারিস করে পাঠালে ডি এস ঐ চারজনকে ইন্টারভিউতে ডেকে পাঠায় কিন্তু তারা না আসায় তাদের চাকরী হয় না, এই খবরে ললিতবাবু ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। কারণ, ইন্টারভিউ হলে যে ঐসব পোষ্য বাহাদের চাকরী নাও হতে পারে সে বিষয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ভালই জানেন। সংগে সংগে ললিতবাবুর একান্ত সচিব ও, পি, গুপ্ত স্বাক্ষরিত চিঠি গেল ডি এস এর কাছে যার বয়ানের একাংশ হচ্ছে, "এটা মনে রাখা উচিত যে, কংগ্রেসের কোন এম, পি, কোন সুপারিশ করলে তাকে জাতি মত বা প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে মর্যাদা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, এটা একটা নীতিগত বিষয়।"

ঐ চিঠিতে এও জানানো হয় যে স্বয়ং মন্ত্রী (এল, এন, মিশ্র লেখক) এ ব্যাপারে আগ্রহী। বলাই বাহুল্য যে, এরপর ঐ চার জনতো বটেই, তাদের সঙ্গে আরও পাঁচ জনেরও চাকরী হলো কোন interview এবং Railway service Commision এর অনুমোদন ছাড়া। এর ফলে ডি এস এ, কে, মুখার্জীও মন্ত্রীর প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। এই সুযোগে তার ঔদ্ধত্য ও দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। ক্ষুদে হিটলারের মত এই ডি এস তার তাঁবেদারে পরিণত হতে গররাজী প্রত্যেকের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ধানবাদের দুজন টি টি ই এ, কে, ঘোষ (কালোবাবু)—এবং নাগকে ৫৫ বছর বয়সে বার্দ্ধক্যজনিত অবসর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা দুজনেই রেলওয়েমেন ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্মী। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে, ডি এস এ, কে, মুখার্জীর খামখেয়ালীতে একটি দুর্ঘটনা ঘটার ফলে রেলের বিপুল সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কর্মরত রেলকর্মীর জীবন বিপন্ন হয়েছে। এতদ্ সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ঘটনাটি ঘটেছে ১৫, ১, ৭৫ তারিখে। ঐদিন একটি ডাউন ই, সি, গুডস্ ট্রেনের ড্রাইভার ধানবাদ ষ্টেশনে এসে মেমো দেয় যে, ইঞ্জিনের ব্রেক কাজ না করার ফলে গাড়ী নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং সে যথাযথ ব্রেক অ্যাডজাস্টমেণ্ট দাবী করে। ডিউটিরত এ, এস, এম ডেপুটি কণ্ট্রোলারকে জানালে ডেপুটি জানান চীফ কণ্ট্রোলারকে। চীফ কণ্ট্রোলার ডি এস কে জানালে ডি এস কোন অ্যাডজাস্টমেণ্ট ছাড়াই গাড়ী নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়। এর ফলে গাড়ী প্রধান খন্তা ষ্টেশনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা করে। ইঞ্জিন এবং কয়েকটি ওয়াগন তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ই, ড্রাইভারও গুরুতর ভাবে আহত হন। বিভাগীয় তদন্তের পর জি এম ডেপুটি কণ্ট্রোলারকে সাসপেণ্ড করলে তিনি ডেপুটি চীফ কণ্ট্রোলারের নির্দেশের উল্লেখ করেন। চীফ কণ্ট্রোলার বার্টসও সে কথা স্বীকার করে ডি এস মুখার্জীর নির্দেশের কথা উল্লেখ করেন। ডেপুটির ওপর থেকে সাসপেনসন প্রত্যাহৃত হলেও ডি এস এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তদন্ত ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত ডিভিশনাল অফিসাররা (ডি এস) কি ধরণের স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে তার আর একটি নজির দানাপুরের ডি এস এম কে সিন্‌হা। হেড অফিস থেকে যে সব বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্বহালের আদেশ দেওয়া হয়েছে সে সব কর্মীদের অন্যত্র বদলীর সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না বলে সিন্‌হা তাদের কাজে যোগ দিতে দিচ্ছে না। অথচ, দুর্নীতির অভিযোগে এই ডি এস এর বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্ত হচ্ছে। স্মর্তব্য যে, দৃশ্যতঃ প্রমাণগ্রাহ্য কোন অভিযোগের ভিত্তি না থাকলে তদন্ত, বিশেষ করে সি বি আই তদন্ত হয় না।

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

ইউকোব্যাঙ্কের হাল খতিয়ান

দেশ ও বিদেশে ৭৪০ টি শাখা!

(বিদেশে ছয়টি শাখা সমেত ১৯৭৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত)

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার যে গুরুদায়িত্ব ইউকোব্যাঙ্কের উপর পড়েছে, সেই লক্ষ্য পূরণে ইউকোব্যাঙ্ক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এজন্যেই শাখা সম্প্রসারণের কর্মসূচী অব্যাহত আছে, যাতে আরো বেশি সংখ্যক লোক তাঁদের প্রয়োজনের সময় ইউকোব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগনকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCOC-41 BEN

১৯৭৪ সালে পূর্বাঞ্চলে নিম্নোক্ত শাখাগুলি চালু হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ : পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলকাতা বোলপুর ইলামবাজার হিজলগঞ্জ বিবাটি দমদম ক্যান্টনমেন্ট শ্রীরামপুর রাজহাটি পোলাবা বাঁকড়া নূতন হাট

আসাম : রেহাবাড়ি গোহপুর গোয়ালপাড়া সিপাঝাড় তাপার রঙ্গিয়া ডুলিয়াজান

নাগাল্যাণ্ড : টিজিট

বিহার : গামারিয়া সাকচি, জামশেদপুর বাউনসি বরাহাট পাটলিপুত্র ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, পাটনা নাবাবপুর বালিয়াপুর আই-ও-সি- টাউনশিপ, বাবাউনি

ওড়িষ্যা : কাটাপালি গড়ডাপা রাউরকেলা-সেক্টর ৫ বলাংগির

শরৎচন্দ্র ঃ জীবন সাহিত্য রাজনীতি (৫)

মিহির আচার্য

বিপ্লবী আন্দোলন ও কর্মীদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি বিপরীত। যদিচ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে রাজনীতি পছন্দ করতেন না তথাপি তিনি যে ঝিঙ্কের তাড়নায় অকারণ বিপ্লবীদের মহৎ আত্মোৎসর্গকারী ভাবমূর্তিকে লাঞ্ছিত করতে ঘরে বাইরে এবং চার অধ্যায়-এ এঁদের হৃদয়হীন পিশাচ করে আঁকলেন সে-উদ্দেশ্য বোঝা ভার।

বিপ্লবীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সহানুভূতির মস্ত প্রমাণ যখন উনিশশো সাতাশ সালে বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতারা মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীদের কাছ থেকে কোন পাত্তা পেলেন না তখন শরৎচন্দ্র নিজের উদ্যোগে রাজবন্দীদের সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন জানালেন ঃ [শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন/শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়]

"দেশের জন্যে যারা নিজেদের রিক্ত করেছে, নিঃস্ব করেছে, আজকে তারাই হবে দেশের লোকের ভয়ের পাত্র? দেশ ছাড়া যাদের আর কিছু নেই, দেশ হবে তাদের প্রতি বিমুখ? কেন? টিকটিকির ভয়ে? আই বি আর সোশ্যাল ব্লাণ্ড এখনো দেশের লোকের মনকে শাসন করবে? কংগ্রেসের কাজ করতে যারা ধরা পড়ল, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন? সম্বর্ধনা জানাবেনা কেন? গভর্ণমেন্ট তাদের রেভলিউশনারি বলছে বলে? তারা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে এই কথা গভর্ণমেন্ট রটিয়েছে বলে? গভর্ণমেন্ট কি আমাদের conscience-keeper? আমাদের নীতিবুদ্ধি কি আমরা identify করব গভর্ণমেন্টের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে? By no means, we must receive them and congratulate them openly and wholeheartedly. কলকাতাতেই এটা প্রথমে হওয়া উচিত ছিল। বি পি সি সি-রই এটা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা যখন হল না, তখন আমরাই প্রথমে করব।"

শরৎচন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হলেন। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান জানালেন ঃ

"দেশের জন্যে এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্ণমেন্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্ণমেন্ট সহস্র চেষ্টা করলেও পারে না ধ্বংস করতে এদের মনের অপরাজেয় বল আর অন্তরের অনির্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। চির-চঞ্চল চিরজীবী চির তরুণ এরা। দেশের তরুণদের আমি বলি তোমাদের কত বড় আপন জন, এত বড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।"

বলা বাহুল্য এই সম্বর্ধনা সভার পরই রাজবন্দীরা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন। পরবর্তীকালে বাঙলা দেশে বিপ্লবী তৎপরতার জোয়ার বয়ে গেল।

আগেই বলেছি স্বাধীনতা অর্জনই ছিল শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য। শরৎচন্দ্র যখন দেখলেন কংগ্রেস কিছু লোকের কায়েমী স্বার্থের বাসায় পরিণত হয়েছে এবং চরিত্রে আন্দোলনের অপেক্ষা আপসকামিতাই মুখ্য হয়ে উঠছে সেই মুহূর্তেই তাঁর এতদিনের নিজের হাতে-গড়া হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি যে কী-পরিমাণ তীক্ষ্ণ ছিল তার প্রমাণ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উর্ধে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। শুধু ভাবা নয় তাঁকে কেন্দ্র করে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী, সন্তোষকুমার মিত্র, ডঃ সুবোধ বসু, ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকে ভবিষ্যত সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা নেয়া হয়। বাঙলা দেশে প্রথম সোস্যালিস্ট নিউক্লিয়াস এইভাবে সৃষ্টি হয়। (শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন)

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বইগুলির মধ্যে রয়েছে Karl Marx—The Civil War in France; Valerin Marcu—Lenin; Odon Por—Fascism; Ivanoc Bonomi—From Socialism to Fascism; R. W. Postgate—The Bolshev Theory; Trotsky—Lenin; Nesta H. Webster—Secret societies and subversive movement: Robins Ransome—Lenin.

কমিউনিস্ট নেতা ডাঙ্গে সম্পাদিত "দি সোস্যালিস্ট" পত্রিকারও তিনি গ্রাহক ছিলেন।

জাতিগত হীনম্মন্যতা ও আত্মবিস্মৃতির দরুন রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এদেশে বিদেশী শিক্ষার সক্রিয় সমর্থক। অসহযোগ আন্দোলনে বিদেশী শিক্ষা বর্জনের বিরুদ্ধে সেসময় রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার মিলন" লিখলে তারি উত্তরে শরৎচন্দ্রের "শিক্ষার বিরোধ" রচনাটি লেখকের শিক্ষাচিন্তার একটি অপূর্ব নিদর্শন।

শরৎচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রবণ মন সঠিক বুঝতে পেরেছিল শিক্ষা ব্যবস্থার "নিরপেক্ষ" "স্বাধীন" কোনো অস্তিত্ব নেই। শিক্ষা শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষারই প্রতিভূ। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের শিক্ষাব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদকে অটুট রাখারই হাতিয়ার।

"পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময়, এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধকরি আর কখনো হয়নি। ....এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন।

"....মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয়নি? হয়েছে বৈকি। কিন্তু সে নিতান্তই by-product এর মত বলা যেতে পারে।

"বস্তুত, একথা বোঝা কি এতই কঠিন যে বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু অরই আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? আর বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যেই তৈরী করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম মত জেলে দিতে ডেপুটি, সাব-ডেপুটি, ধরে আনতে থানায় ছোট বড় পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষপীড়িত মাস্টার, কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, অফিসে খাতা কিনতে জীর্ণ শীর্ণ কেরাণী,—তার শিক্ষা-বিধান এর বেশি দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে, সে যে পারে না কি, আমি তাই শুধু ভাবি।

"মানুষের এক প্রকার শিক্ষা আছে, যা কেবল নিছক ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার খাতিরে মানুষ অর্জন করতে চায়। যে mentality থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ ইংরেজি ভাষাটা সাহেবের গলায় বলাটাকেই চরম উন্নতি জ্ঞান করে, এবং এই mentality-রই এক ধাপ নীচের লোকগুলো জাহাজে এবং রেলগাড়িতে সাহেবি পোষাক ছাড়া কিছুতেই বেড়াতে চায়না। এবং এই জিনিসটা এত ইতর, এত ক্ষুদ্র যে, এ কেন হয়, এর কি উদ্দেশ্য এ বিষয় আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ হয়।

"বিদ্যার জাত নেই একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে culture জিনিসটারও জাত নেই একথা কিছুতেই সত্য নয়। এবং ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে, ত কেবল এই জানোই, বিদ্যার জন্যে নয়।

"....ওদের সমাজ-নীতির যেমন interpretation-ই দেওয়া যাক, তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়া। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। ... এই তার মজ্জাগত সংস্কার, এই সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে।

....এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশের রাজার মাথার কোহিনূর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্যন্ত যেখানে যা কিছু আছে কিছুই ত দৃষ্টি এড়ায়নি। এটা বোঝা যায় কারণ এই তার সত্য, এই তা সভ্যতার মূল শিকড়। ....তাদের মত পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি, ত মারণাস্ত্র যত সত্যই হোক তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল। [কবির যুক্তি ঃ একথা মানতেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করে তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। ... অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয় সে কোন একটা সত্যের জোরে।]

॥ আট ॥

১৯৩৮-এর ষোলই জানুয়ারী বাষট্টি বৎসর বয়েসে যোদ্ধা-সাহিত্যিকের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সহধর্মিনি হিরণ্ময়ী দেবী সামতাবেড়ের বাড়িতেই কাটিয়ে গেছেন। ১৯৬০-এ সেপ্টেম্বরে এই বাড়িতেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আগামী কালের চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে শরৎচন্দ্রের একটিমাত্র দাবি "দেশের জন্যে, অবহেলিত মানব-সমাজের জন্যে আমি কতটুকু করেছি, তা স্থির করার ভার রইল ভাবীকালের সমাজের উপর।"

সাহিত্যকর্মকে দেবোত্তর সম্পত্তি জাতীয় ট্রাস্টী করে ঝানু বিষয়ী লোকের মতো আটকে না রেখে মহা শিল্পীর মতো শরৎচন্দ্রই ঘোষণা করতে পারেন "যে কাল আজও আসেনি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে, কি থাকবে না, সে আমার চিন্তা অতীত। আমার বর্তমানের সর্বোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হয়ে মিলতে না পারে পথ আটকে তো ছাড়তেই হবে। তা আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায় ত শুধু এই জন্যেই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে তা কম্মকালের প্রয়োজন হয়েছে। ক্ষোভ না করে বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাবে যে, আমার দেশে, আমার ভাষায় এত বড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই ঘুচে যেতে পারে" ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দনের উত্তর)

অপিচ—"কোন দেশের কোন

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

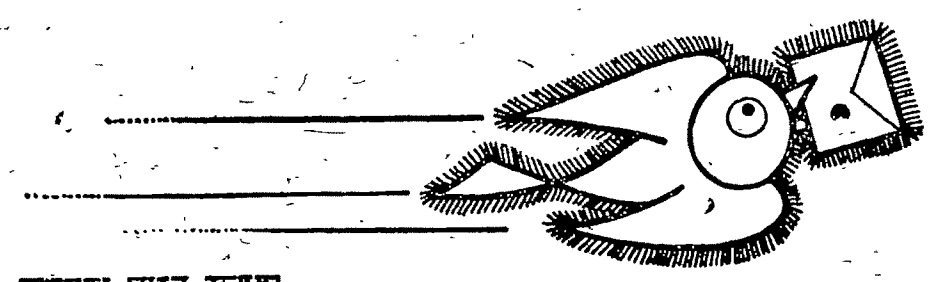

কুশলতা আনে দ্রুততা
দ্রুততায় আসে কুশলতা

চিঠি লিখুন ডাকে ফেলুন
ও সকাল সকাল ডাক ধরুন
সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেলে রাখবেন না

ডাক ও তার বিভাগ

davp 74/288 Ben

গণতন্ত্র হত্যার নতুন নজীর

কপিল-রায়

নতুন দিল্লী, তেইশে জানুয়ারী ঃ হরিয়াণার লোকদল নেতা শ্রীহরদওয়ারী লাল গত পনেরোই জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির কাছে যে খোলা চিঠি লিখেছেন এবং তাতে যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তার দিকে এখনকার সচেতন রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই খোলা চিঠিখানি তিনি গত ষোল তারিখে এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রচার করেছেন। এই চিঠিতে তিনি দাবি জানিয়েছেন যে "ভারতীয় বিধানসভাদির বিশেষাধিকারের বর্তমান অবিধিবদ্ধ অবস্থার সুযোগ নিয়ে শ্রীবংশীলাল-জাতীয় মুখ্যমন্ত্রীরা বিরোধীপক্ষীয়দের শেষ করবার বিপদ যাতে না ঘটাতে পারেন তার জন্য অগোণে সংসদীয় বিশেষাধিকারগুলিকে কোডিফাই বা বিধিবদ্ধ করতে হবে। সংসদ বা বিধানসভার কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কিছুকেই সংসদীয় বিশেষাধিকারের মধ্যে ধরা যাবে না। তা ছাড়া বৃটিশ পার্লামেন্টের কোন আইনসভাই নিজেকে সামগ্রিক সমালোচনার (টোট্যাল ক্রিটিসিজম) উর্দ্ধে বলে দাবি করতে পারবেন না।" শ্রীলাল আরও বলেছেন যে শ্রীমতী গান্ধী হচ্ছেন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী—তাই তাঁর কাছে তিনি এই অনুরোধ জানাচ্ছেন।

স্মরণীয় এই যে গত আটই জানুয়ারী হরিয়াণার বিধানসভা স্বকীয় বিশেষাধিকার কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করে বিধানসভা সদস্য শ্রীহরদওয়ারী লালকে বিধানসভার সদস্য পদ থেকে বিতাড়িত করে তাঁর আসনকে শূন্য বলে ঘোষণা করেছেন। তেয়াত্তর সালে শ্রীলাল দুইখানি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশ করেন, (এক) এ চীফ মিনিস্টার রান্স অ্যামাক—ইণ্ডিয়ান ডেমোক্র্যাসী ইন ডেঞ্জার, আর (দুই) ইমার্জেন্স অব রাফ অ্যান্ড কোরাপ্ট পলিটিকস ইন ইণ্ডিয়া—অ্যানাটমী অব এ চীফ মিনিস্টার। এই দুইখানি পুস্তকায় শ্রীলাল হরিয়াণার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলালের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতি ও শাসনক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এবং ঐ সব অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণাদি দিয়েছেন। আর এই দুইখানি পুস্তক লেখার কারণেই শ্রীলালের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সদস্য শ্রীটিক্কা জগজিৎ সিং ও শ্রীগিরীশচন্দার জোশী বিধান সভার বিগত বৈঠকে বিধানসভার বিশেষাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব এনেছিলেন। যে দিন এই প্রস্তাবটি আনা হয়েছিল সেদিন শ্রীলাল সদনে উপস্থিত ছিলেন না। যাইহোক বিষয়টিকে বিশেষাধিকার কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল। বিশেষাধিকার কমিটির কাছে শ্রীলাল তাঁর লিখিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন এবং এও জানিয়েছিলেন যে এই পুস্তিকা দুইটিকে নিয়ে আদালতে মামলা চলছে।

বিশেষাধিকার কমিটি শ্রীলালের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি এবং তাঁরা তাঁকে সদন, সদস্য ও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের "গুরুতর" অবমাননা ও বিশেষাধিকার ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁর সদস্যপদ বাতিলের সুপারিশ করেছেন। গত আটই জানুয়ারী বিধানসভা মুখ্য বিরোধীপক্ষীয় সদস্যদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে এবং শ্রীলালের অনুপস্থিতিতে বিশেষাধিকার কমিটির সুপারিশকে অনুমোদন করেন। সুপারিশগুলিকে ভাল করে অনুধাবন করবার জন্য সেদিন আলোচনা স্থগিদ রাখবার জন্য এই সব বিরোধীপক্ষীয় সদস্যরা যে আবেদন জানিয়েছিলেন তা অগ্রাহ্য হলে তাঁরা সদন ত্যাগ করে চলে যান। তাই বিশেষাধিকার কমিটির সুপারিশ কার্যত মুখ্য বিরোধীপক্ষীয় সদস্যদের বিরোধিতাজনিত অনুপস্থিতিতে সদনে অনুমোদিত হয়েছিল। হরিয়াণা বিধানসভায় কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

শ্রীবংশীলালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও শাসনক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এই প্রথম আনা হয় নি। গত পাঁচ বছরে বেশ কয়েকখানি স্মারকলিপি এই সব অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়েছিল। কংগ্রেস রাজনীতিতে যিনি শ্রীবংশীলালকে এনেছিলেন সেই শ্রীভগবৎ দয়াল শর্মাই পরবর্তীকালে শ্রীবংশীলালের বিরুদ্ধে এই ধরণের স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। এ সবই এখানকার রাজনৈতিক মহলের বিদিত। বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে চিঠি শ্রীহরদওয়ারী লাল এবারে লিখেছেন তাতেও এই সব স্মারকলিপির উল্লেখ রয়েছে। শ্রীলালের অভিযোগ এই সব স্মারকলিপি সম্পর্কে কোন সত্যিকারের বিধিবদ্ধ তদন্ত হয় নি। শ্রীলাল আরও বলেছেন যে তাঁর উপরি-উল্লিখিত পুস্তিকা দুইখানি তিনি যথা সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছেও পাঠিয়েছিলেন এবং অর প্রাপ্তি-স্বীকৃতি শ্রীলাল পেয়েছেন। এই পুস্তিকা সম্পর্কে রাজসভয় প্রশ্ন উঠলে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীরামনিবাস মির্ধা সদনকে বলেছিলেন যে এই সব অভিযোগ সম্পর্কে শ্রীবংশীলালের বক্তব্য চাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বংশীলাল কি বলেছেন তা শ্রীলাল জানেন না বলে এই চিঠিতে লিখেছেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাঁর পুস্তিকায় উল্লিখিত অভিযোগ বিষয়ে বংশীলালের বক্তব্য শোনবার আগেই বংশীলালের নেতৃত্বাধীন হরিয়াণা বিধানপরিষদীয় দল ভোটের জোরে শ্রীহরদওয়ারীলালকে বিধানসভা থেকে বের করে দিলেন।

বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার এ ধরণের ব্যবহারকে এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহল অশুভ লক্ষণ বলে মনে করছেন। দুনিয়ায় এই প্রথম বিশেষাধিকারভঙ্গের অভিযোগে জনৈক সদন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করা হল বলে এঁরা বলছেন এবং তাও করা হল মুখ্য বিরোধীপক্ষীয়দের বিরোধিতাজনিত অনুপস্থিতিতে ও মাত্র আধ ঘণ্টা স্থায়ী আলোচনার পরে। এই প্রসঙ্গে অনেকেই লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীগুরুদয়ালসিং ধীলন সাম্প্রতিক আমদানী লাইসেন্স কেলেঙ্কারী ও লোকসভা সদস্য শ্রীরামনাথ গোয়েঙ্কা সম্পর্কিত আলোচনায় যে মন্তব্য করেছিলেন তার উল্লেখ করছেন। মাননীয় লোকসভা অধ্যক্ষ বারংবার এ কথা বলেছিলেন যে সংসদীয় কর্তব্য পালনের ব্যাপারে সদস্যের যে আচরণ শুধু তার সম্পর্কেই বিশেষাধিকারের প্রশ্ন আনা যেতে পারে। অর্থাৎ সংসদীয় দায়িত্বঘটিত কার্যকলাপের বহির্ভূত কিছুর জন্য বিশেষাধিকারের প্রশ্ন তোলা যায় না। এ কথা বলা যায় না যে কোন বই লেখা কোন সংসদ বা বিধানসভা সদস্যের সংসদীয় কর্তব্য। কোন পুস্তকাদি তাই "মানহানিকর" অথবা "ব্ল্যাকমেইল" বা ভয় দেখিয়ে জোর করে কাজ হাসিল করবার প্রয়াস হলে তার বিরুদ্ধে আইন-আদালতের কাছে প্রতিবিধান লাভের ব্যবস্থা গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। দুর্নীতির বা শাসনক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তোলাটা এ দেশে যে ইতিপূর্বে সংসদীয় বিশেষাধিকারের প্রশ্ন বলে বিবেচিত হয় নি তার প্রমাণ শুধু সাম্প্রতিক আমদানী লাইসেন্স কেলেঙ্কারী বা শ্রীগোয়েঙ্কা সম্পর্কিত ঘটনাগুলিই নয়, পরন্তু পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত প্রতাপ সিং কাইরো ও নেহরু যুগের পেট্রলমন্ত্রী কেশব দেও মালব্য প্রভৃতির ঘটনা। "মারুতি" সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন বারম্বার সংসদে তোলা হয়েছে ও হচ্ছে সেগুলির জন্য এখনও কোন সদস্যকে পদ হারাতে হয় নি অর্থাৎ সংসদ এ পর্যন্ত এ ধরণের অভিযোগকে সদনের বিশেষাধিকার ভঙ্গের কারণ বলে মনে করেন নি। অথচ সদনের বাইরে পুস্তিকা লিখে হরিয়াণার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করার জন্য সেখানকার বিধানসভা সদস্য শ্রীহরদওয়ারী লালকে বিধানসভার সদস্যপদ হারাতে হল বিশেষাধিকার ভঙ্গের অভিযোগে। হরিয়াণার এই কাজটিকে নজির হিসেবে নেওয়া হলে বিধানসভায় ও সংসদে বিরোধীপক্ষীয়দের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে বলে এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহলে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে সংসদবহির্ভূত কাজকর্মের জন্য সংসদীয় বিশেষাধিকারের ব্যবহার সুস্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। এ ধরণের রীতি চালু হলে ভারতে গণতন্ত্রের আর চিহ্নও থাকবে না।

শ্রীহরদওয়ারী লাল অবশ্য জানিয়েছেন যে হরিয়াণা বিধানসভার এই বিধানের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করবেন। তা ছাড়া তাঁর শূন্য আসনের জন্য উপনির্বাচন হলে তিনি অবশ্যই সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে তাঁর উল্লিখিত বই দুইখানির হিন্দি অনুবাদ তিনি অচিরেই ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতেও শ্রীলাল তাঁর এই সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন। তিনি এই চিঠিতে আরও বলেছেন যে উনষাট সাল অবধি বংশীলাল ছিলেন প্রকৃতই নিঃস্ব কিন্তু বর্তমানে বংশীলাল অঢেল টাকার মালিক।

রাজধানী দর্পণ

ভিয়েৎনাম-কম্বোডিয়ায় দুর্বার সংগ্রাম

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

বেশ কিছুকাল ধরে রোমে এবং প্যারিসে ফ্যাসিস্ত দলগুলো আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই দুই দেশের দল দুটির মিল আছে। এই দু দলই চায় ফ্রান্সে ও ইতালিতে পুনরায় ফ্যাসিস্ত রাজত্ব কায়েম করা। ইতালির দলটি তো গত মহাযুদ্ধের ফ্যাসিস্ত সমর নায়কদের গুণকীর্তন করছে। এদের প্রধান কাজ হল এখন কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রীদের আয়োজিত মিছিল মিটিংয়ের ওপর হামলা চালানো। শুধু এরা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর হামলা চালিয়েই ক্ষান্ত নয়, এরা বামপন্থী দলগুলোর ছাত্র ও যুব সংগঠনের ওপর প্রকাশ্যে ও গোপনে হামলা চালাচ্ছে। এদের হামলায় ইতালিতে এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। বহু বামপন্থী সৎ মানুষ এই ফ্যাসিস্তদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু ইতালির সরকার নীরব দর্শক। এখনো সাতজন বামপন্থীর খুনের কিনারা হয়নি। এর মধ্যে একজন ছাত্রকে ফ্যাসিস্তরা পিটিয়েই খুন করেছে।

সম্প্রতি রোমের পথঘাট হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী ছাত্র-যুবকের সদম্ভ মিছিলে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ওদের মুখে আওয়াজ ঃ "নয়া ফ্যাসিস্তদের শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। ইতালিতে ফ্যাসিস্তদের জায়গা নেই।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছরের তুলনায় এবারকার মিছিলের জমায়েত অনেক ব্যাপক ও বড় ছিল।

ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়ায় মুক্তি আন্দোলন দুর্বার

কাম্বোডিয়ায় সিহানুকের জাতীয় মুক্তি বাহিনী ক্রমেই মুক্তির সিংহদরোজা দখলের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাজধানী নমপেনের প্রায় তিনদিক এক মুক্তিবাহিনী ঘিরে ফেলেছে। নমপেনের উত্তরে প্রেক নিউ এখন

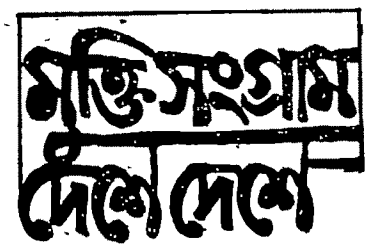

মুক্তি ফৌজের দখলে। নমপেনের উত্তর-দক্ষিণের সাউল ও বেকচান মুক্ত। মুক্তিবাহিনীর প্রবল আঘাতে নলের দু শতাধিক সৈন্য নিহত। এখন কাম্বোডিয়ায় মুক্তির এক জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন প্রেক নিউ অঞ্চলের মানুষরা গোপনে জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। জাতীয় মুক্তি বাহিনীর নির্দেশ অনুসারেই আঠারো হাজার মানুষ শেষ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু প্রেক নিউ নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও মানুষের মধ্যে এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার এক বিবৃতিতে শত্রুর বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, প্যারিস শান্তি চুক্তিকে বানচাল করার জন্য সকাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ভিয়েতনামে সত্যকারের শান্তি স্থাপন সম্ভব।

জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট সম্প্রতি তিনটি শত্রু বিমান ভূপাতিত করে। মেকং বদ্বীপ অঞ্চল এলাকায় থিউ সরকার বড় রকমের হামলা চালাবার জন্য পঞ্চাশটির বেশী সাঁজোয়া গাড়ি সহ দু সহস্র তাঁবেদার সৈন্য নিয়ে তোড়জোড় করছিল। থিউর সেই ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ করে দেয় মুক্তি যোদ্ধাদের আঘাত।

মেকং এলাকায় কাম্বোডিয়ার সীমান্ত বরাবর এই ষড়যন্ত্রের অন্য উদ্দেশ্য ছিল কাম্বোডিয়ার নল চক্রকে একটু মদদ দেওয়া। কিন্তু কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের মুক্তি যোদ্ধারা থিউ চক্রের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই পারস্পরিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে ইন্দোচীনের জনগণের বিপ্লবী ঐক্য।

দর্পণ অফিসে হামলার প্রতিবাদ

কবি চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, জ্যোৎস্না সিংহ রায়, সুখময় চক্রবর্তী (সম্পাদক, গণবার্তা), অধ্যাপক নির্মল বসু, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ডঃ করুণ মিত্র এবং অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্প্রতি দর্পণ অফিসে সমাজবিরোধীদের হামলার প্রতিবাদে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন :

"'মানুষ' ও 'মনুষ্যত্ব' নামের সকল রকম মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে একশ্রেণীর সমাজবিরোধী যেভাবে এই দেশের সমাজ, সংস্কৃতি এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে পিষ্ট ও বিনষ্ট করতে চাইছে, আমরা গভীর উদ্বেগ ও ঘৃণার সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। সম্প্রতি 'দর্পণ' পত্রিকার দপ্তরে সমাজবিরোধীদের সংঘবদ্ধ পৈশাচিক হামলার যে বিবরণ 'সত্যযুগ' ও 'বাংলাদেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক মাত্রই স্তম্ভিত হবেন। 'দর্পণ' পত্রিকা অফিসের কর্মীদের ওপর কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে, টেবিল ভেঙে, টেলিফোন যন্ত্রটিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে হানাদারেরা 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার অফিসেও তাদের পাশবিক কর্মকাণ্ডের কিছু উদাহরণ রেখে যায়।

"ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বাধীনতাকে এই ভাবে বিনষ্ট করার অধিকার অথবা স্পর্ধা সমাজবিরোধীরা কোথা থেকে অর্জন করেছে তা আজ আর কারুরই অজানা নেই। ১৭ই জানুয়ারীর 'দর্পণ' পত্রিকায় 'ছাত্র পরিষদের সুপরিকল্পিত হামলা' বলে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে ছাত্রদের কোন রকম যোগাযোগ থাকলে, তার চেয়ে গভীরতর ক্ষোভের এবং লজ্জার ব্যাপার শিক্ষিত মানুষের সমাজে আর কী ঘটতে পারে? শাসক শক্তির কাছেও এদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের একটিই প্রশ্ন—হিটলারের প্রেতাত্মাকে কবর থেকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা হচ্ছে কেন? এই রাজ্যের একাধিক সংবাদপত্রের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা—প্রতিবেশী অপর সংবাদপত্রকে যথেচ্ছা নির্যাতন করে, সেখানকার পত্রের উপর আক্রমণের খবরটি পর্যন্ত তাঁরা গোপন করেছেন কোন স্বার্থের জন্য, অথবা কীসের ভয়ে? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিটি স্বাধীন দেশের সংবাদপত্রই সত্যকে প্রকাশ করে, এবং যা অসৎ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হয়। আমরা দীর্ঘকাল ধরেই পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ সংবাদপত্রকে এদিক থেকে অত্যন্ত লজ্জাকর ভূমিকাই পালন করতে দেখছি, যা এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের মানবিক ক্লৈব্য এবং চারিত্রিক পতনকেই স্পষ্ট থেকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলে। দেশের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী যদি সমাজবিরোধীদের নষ্টামিকে ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে যায় এবং অপর বুদ্ধিজীবী মানুষেরা তাকে গোপন করে অথবা শুধুই সহ্য শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়—তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মনুষ্যত্বই শুধু নয়, অতি সাধারণ ভাবে বেঁচেবর্তে থাকার অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণই বিনষ্ট হবে।"

ত্রৈমাসিক সংস্কৃতিক পত্রিকা "প্রস্তুতিপর্ব-র" সম্পাদক মণ্ডলী বলেছেন : যে শাসক দল প্রতি মুহূর্তে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপাড়ছে, তাদেরই ভাড়া করা গুণ্ডারা 'দর্পণ' ও 'ফ্রন্টিয়ারে'র ওপর সংগঠিত হামলা করেছে। এ ঘটনা আমাদের ক্ষুব্ধ করলেও অবাক করেনি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষের ন্যূনতম দায়িত্ব। যদিও একের পর এক যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের নিছক মৌখিক 'প্রতিবাদে'র কার্যকারিতা কতটুকু তা নিয়ে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

অভিনয় পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "নির্ভীক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'দর্পণ'-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও তার তাঁবেদার বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে—এটাই স্বাভাবিক। এ আঘাত সংগ্রামী মানুষের ঐক্য দৃঢ়তর করবে এবং আগামী দিনের শোষণ মুক্তির সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করবে। অশ্রু নয়, শোক নয়—ঘৃণাই হোক অটল প্রতিজ্ঞার জনক।"

"জনসংঘের" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শ্রীগীতেশ শর্মা এক বিবৃতিতে দর্পণ অফিসে হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

হামলার প্রতিবাদে সভা

১৯শে জানুয়ারী প্রেস ক্লাব উত্তর চব্বিশ পরগণার গৃহে নিখিল বঙ্গ ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকা সাংবাদিক সমিতি এবং প্রেস ক্লাব, উত্তর চব্বিশ পরগণা যৌথ ভাবে ১৭ই জানুয়ারী দর্পণ কার্যালয়ে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য। নিখিল বঙ্গ ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকা সাংবাদিক সমিতি ও প্রেস ক্লাব, উত্তর চব্বিশ পরগণার সাধারণ সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'দর্পণ' পত্রিকার উপর হামলার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যে গণতন্ত্র ধ্বংসের পথে তার বড় প্রমাণ সংবাদপত্রের উপর আঘাত হানা।

সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় যে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা হোক। দর্পণ পত্রিকায় হামলার তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি প্রদানের অনুরোধ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, এবং তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে।

রেল প্রশাসন

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

এবং, অভিযোগের প্রাথমিক প্রামাণ্য ভিত্তি পাওয়া গেলে সাধারণ কর্মীদের তদন্ত সাপেক্ষ সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়। সিন্‌হার বিরুদ্ধে সে রকম কোন ব্যবস্থ নেওয়া হয়নি তো বটেই, বরং তার দাপট আরও বেড়েছে। সিন্‌হা ছিলো প্রয়াত মিশ্রজীর প্রিয়ভাজন। হাওড়া ডিভিসনের ডি এস ইম্পেট আর এক ক্ষুদে হিটলার। এই লোকটি লাইন ইনস্পেকসন করতে গিয়ে কিছুদিন আগে হাওড়া-বর্দ্ধমান মেন লাইনের পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে টিকেট কালেক্টরের ঘরে প্রবেশ করে। সেখানে টিকেট চেকিং ষ্টাফ এসোসিয়েশনের একটি বহু পুরোনো পোষ্টারের দিকে তার নজর পড়ে। পোষ্টারের এককোণে এ. সি পাল নামক একজন টি সির নাম লেখা ছিল। এ সি পাল পাণ্ডুয়ার ষ্টাফ নন। সেদিন ডিউটিরত টি সি ছিলেন কে সি পাল নামে অন্য এক ভদ্রলোক। ইম্পেট কে সি পালকে সাসপেনশনের আদেশ দেয়। এ সি পাল এবং কে সি পাল একই লোক কিনা সেটা জানবার প্রয়োজনও ইম্পেটের ছিলো না।

কথায় কথায় বদলী, সাসপেনশন এবং অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখন সর্বত্র চলছে। এই প্রতিহিংসামূলক আচরণের ফলে গত ১০-১-৭৫ তারিখে কিউলের ক্যাটারিং ম্যানেজার আর. জে. সিন্‌হা আত্মহত্যা করেছেন। সিন্‌হা ছিলেন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের কিউল শাখার সহ সভাপতি। ধর্মঘটের জন্য বরখাস্ত হয়ে গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পুনর্বহাল হন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে তাকে দুবার বদলী করা হয়। প্রথমে কিউল থেকে দানাপুর, আবার দানাপুর থেকে ভাগলপুর। আর, জে সিন্‌হা যে চিঠি লিখে রেখে গেছেন তাতে তিনি কিছু কংগ্রেসী এবং কয়েকজন অফিসারের দৌরাত্ম্যের জন্যই আত্মহত্যা করলেন বলে উল্লেখ করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে প্রভাবশালী মহল থেকে এতদ সম্পর্কীয় যে কোন প্রতিক্রিয়া ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পূর্ব রেল-কর্তৃপক্ষ এখন তুঘলকী শাসন চালাচ্ছে। বেছে বেছে যে সব নেতৃবৃন্দকে এখনও পুনর্বহাল করা হচ্ছে না তাঁদের মধ্যে আছেন বিমল দে, সুজিত রায়, কানাই ব্যানার্জী, চিত্ত সেন, সুকুমার রায়, অনিল ভট্টাচার্য, ভোলা বসু, বাবুলাল সিং, ওয়াই পি সিং, এস এন সিন্‌হা, সুশীল ব্যানার্জী, বি কে দে, বিপ্লব মুখার্জি, দোলগোবিন্দ রায়, সুশীল চক্রবর্তী, বি সি পাল রায় এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখরা। (চলবে)

যাযাবরের প্রযোজনা

(দর্পণের সমালোচক)

দিল্লী থেকে যাযাবর গোষ্ঠী কলকাতায় এসেছিলেন দুটী কমেডি নিয়ে। 'বাবু' এবং 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন'। দুটি নাটকের সঙ্গেই কলকাতার দর্শকরা বেশী রকম পরিচিত। কিন্তু এই দুটি নাটকের যে পরিণত এবং উন্নতমানের প্রযোজনা এখানকার দর্শকরা দেখেছেন, তার পাশে যাযাবর গোষ্ঠীর উপহার কোন দিক থেকেই তুলনীয় নয়।

অবশ্য শিল্পের ক্ষেত্রে শক্তি সামর্থ্যের তুলনা করে কোন দলকে হীন চোখে দেখাটা অরুচিকর হলেও, একথা সত্যিই যে যাযাবর দিল্লীর বাংলা নাট্যচর্চা সম্পর্কে এখানকার দর্শক মনে কোন শ্রদ্ধার ছাপ রাখতে পারলেন না। হাস্যরসের বৌদ্ধিক আদলটা যে দিন দিন বদলাচ্ছে, তার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সেই অমৃতলাল বসু যুগেরই স্থূলত্ব প্রযোজনার আধুনিক প্রয়োগকলাকে আড়াল করেছে। তাছাড়া হাস্যরসের নাটক ভারিক্কী চালে কখনই সফল হয় না। যেমন 'বাবু' নাটকের প্রারম্ভিক সংগীত মূলত যতটা রসালো, পরিবেশিত হয়েছে নীরস ভঙ্গীতে। 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন' (মিডসামার নাইটস ড্রীম) নাটকটির প্রযোজনা নিম্নমানের। অবশ্য অনুবাদটিও নীরস এবং গতিহীন। তবু ব্যক্তিগত অভিনয়ের চমকে কেউ কেউ নাটকের হাল ধরে রেখেছেন, কিন্তু তাও কম অনুশীলিত দুর্বল অভিনেতার জড়তা জীর্ণ অভিনয়ের সংস্পর্শে মুহূর্তেই বিরক্তির সৃষ্টি করেছে। ব্যয় এবং আড়ম্বর সত্বেও মঞ্চসজ্জা এবং সংগীতের ব্যবহার

নাট্যাভিনয়

অপরিণত। তবু বলব, যাযাবর গোষ্ঠীতে কয়েকজন সার্থক অভিনেতার সাক্ষাৎ মেলে (যেমন, গোবিন্দ চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী, সুশীলা গাঙ্গুলী)। এবং প্রবাসে নিয়মিত বাংলা নাট্যচর্চার জন্য কলকাতার মঞ্চরসিকদের কাছে এই দলের কৃতজ্ঞতা অবশ্যই প্রাপ্য।

অথ ধনপতি কথা

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ভাল খাবার' কবিতা অবলম্বনে 'অথ ধনপতি কথা' প্রযোজনা করলেন এক্ষণ। এদের প্রযোজনা সুপরিকল্পিত এবং যত্নের ছাপ সুস্পষ্ট। একটি ক্ষুদ্রায়তনী নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। সর্বগ্রাসী শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অনিবার্য এবং তা যে একক শক্তিতে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, এই সত্যটি তথাকথিত প্রচারধর্মী নাটকের নীরস রূপরীতি বিসর্জন দিয়ে একটি সহজগ্রাহ্য ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হাস্যরস এবং বলিষ্ঠ গীতিমুখরতার মধ্যেই নাটকের বিস্তার। দেবাশিষ ঘোষ এবং সলিল দের কণ্ঠের গান কিছুতেই ভোলা যায় না। বিচ্ছিন্ন ভাবেও এ গানের সামাজিক মূল্য কম নয়। সেই সঙ্গে মন মাতানো অভিনয় করেছেন নাট্যকার সজল ভট্টাচার্য। তবে একটু আতিশয্যও ছিল।

সুরবাহারের নৃত্যানুষ্ঠান

নৃত্য প্রকল্পের মাধ্যমে মনসামঙ্গলের কাহিনীকে (মনসামঙ্গল পালা) আধুনিক ব্যঞ্জনা দেবার জন্যে সুরবাহার ব্রেখটীয় রীতির অনুষঙ্গে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা আরোপিত এবং অসার্থক। উদ্দেশ্য মহৎ কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বণিক চাঁদকে যদি নিপীড়িত মানবাত্মার সমকক্ষ করে দেখানো যেত নৃত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে (কোরিওগ্রাফী) তবে নাটকের স্বাভাবিক গতিকে বাধা দানের জন্য আকস্মিক ভাবে সূত্রধারের (সুনীল সাহা) ভাষ্যের কোন প্রয়োজন হত না। অথচ সূত্রধারের ব্যাখ্যা ছাড়া প্রযোজনার ভিন্ন ব্যঞ্জনা বোঝবার কোন উপায় নেই। সামাজিক মূল্যায়নের প্রশ্ন বাদ দিলে প্রযোজনাটি সুনিয়ন্ত্রিত এবং সার্থক। আরতি মজুমদার ও শম্ভু ভট্টাচার্যের অভিনয় অনবদ্য।

'মার্চেন্ট মাকৃথন' নামে শ্রমজীবী পরিবার কেন্দ্রিক যে নৃত্যনাটকটি পরিবেশিত হল, তা ভাবগত অর্থে বরং অনেক বলিষ্ঠ এবং অভিপ্রকাশও স্বাভাবিক।

মতামত

শিক্ষকদের গোপন রিপোর্ট কেন ?

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগ একটি আদেশ জারি করেছেন। ঐ আদেশে বলা হয়েছে, সরকারী অফিসের কায়দায় স্কুলে স্কুলে প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট রাখবেন, যাকে সরকারী পরিভাষায় বলা হয় সি সি আর. এবং স্কুলের সেক্রেটারী প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট রাখবেন।

তার মানে, প্রধান শিক্ষককে হতে হবে একজন আমলা আর স্কুলের সেক্রেটারী (যিনি একজন মধ্যম শিক্ষিত ব্যবসায়ী বা অল্প শিক্ষিত জোতদার হতে পারেন) হবেন একজন বড় আমলা। যেখানে গোপনতা, সেখানেই অবিশ্বাস। এই সরকারী ব্যবস্থার ফলে সহকর্মীদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের সুসম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে, ভিতরে ভিতরে তৈরি হবে একটা মানসিক ব্যবধান। কাজের ক্ষেত্রে আসবে যান্ত্রিকতা। স্কুলের কাজ ব্যাহত হবে।

গোপন রিপোর্ট রাখার উদ্দেশ্যটা কী? কী কাজে লাগবে সেই রিপোর্ট? ভাল কাজ করলে কি প্রমোশন মিলবে? উপাচার্য বা শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করা হবে ভাল শিক্ষকদের মধ্যে থেকে?

এর দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা বা শিক্ষার্থী বা বিদ্যালয় কারও উপকার হবে না। এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন কতিপয় প্রধান শিক্ষক দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা নিজেদেরকে আপন আপন সহকর্মীদের চেয়ে উচ্চস্তরের ব্যক্তি বলে মনে করেন, সরকারী আমলাদের কায়দায় যাঁরা কাজ করতে আগ্রহী, সহকর্মীদের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাভাজন হয়ে থাকেন, যোগ্যতা তাঁদের যা-ই হোক না কেন।

মাস গেলে যাঁদেরকে বেতন দেওয়ার ক্ষমতা নেই কর্তৃপক্ষের, যাঁদের ত্যাগে ও অনুগ্রহে অধিকাংশ বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল চলছে, স্কুলের কাছ থেকে যাঁদের ন্যায্য পারিশ্রমিক বাবদ বহু টাকা পাওনা রয়ে গেছে, সেই শিক্ষকদের সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট রাখবে কে?

স্কুলের শিক্ষকগণ সরকারী কর্মচারী নন। তাঁরা এল ডি ক্লার্ক নন যে ইউ ডি হবেন অথবা ছোট আমলা নন যে সি সি আর-এর জোরে বড় আমলা হবেন। এঁরা মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ। সি সি আর-এর লগুড় দেখিয়ে শিক্ষক-সমাজকে নতজানু করবার দুরাশা পোষণ করা কোন জাতীয় মনোবৃত্তির পরিচায়ক?

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ধীরে ধীরে কব্জার মধ্যে আনার এবং শিক্ষকসমাজের মর্যাদার হানি ঘটানোর একটা চেষ্টা অনেক দিন থেকেই শুরু হয়েছে। কর্মরত শিক্ষককে সংশোধিত বেতনহার পাওয়ার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সামনে হাজির হতে হবে, পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে—এই সব অমর্যাদাকর ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সরকারী ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়েছে অতীতে শিক্ষকসমাজের দৃঢ় প্রতিরোধের ফলে। আজ তাঁরা কি সেই অতীত গৌরবের দিনগুলির কথা ভুলে গেছেন?

জনৈক পাঠক

দর্পণের কণ্ঠরোধ

অবশেষে যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই ঘটল। পাটনার সার্চ-লাইটের পর কলকাতার দর্পণের পালা। একদিকে গণতন্ত্রের কপট পূজারীগণ যখন গণতন্ত্রে সংবাদ-পত্রের ভূমিকা নিয়ে উচ্চ রোলে আলোচনা করছেন (পনেরোই জানুয়ারী হুগলীর বৈদ্যবাটীতে গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে গরম আলোচনা হয়েছে) তখন চোদ্দই জানুয়ারী দর্পণ কার্যালয়ে ক্ষমতা মত্ত একটি বিশেষ দলের ভাড়াটে গুণ্ডা-বাহিনী গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করল। দর্পণের নির্ভীক মত প্রকাশ, অশুভ শক্তির জোটের বিরুদ্ধে সমালোচনা, আত্মতুষ্ট তথাকথিত নেতৃবর্গের স্বরূপ উন্মোচন অনেকদিন ধরেই অনেকের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। তাই বিস্ফোরণ হল চোদ্দই জানুয়ারী। আশ্চর্যের কথা কলকাতার প্রভাবশালী দৈনিকগুলির মৌনব্রত ভঙ্গ হল না। সহযোগী একটি পত্রিকার এই লাঞ্ছনা কোন সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিষয়বস্তু বলে গণ্য হতে পারল না। অপ্রিয় সত্য সহ্যের ক্ষমতা চরণাশ্রিতের থাকে না। ভরসা এই শুধু দর্পণ নয়, সত্য ও নিরপেক্ষ মত প্রকাশের জন্য শ্রুত-কীর্তি ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি রচনা কলকাতার একটি শারদীয় সংখ্যা ছাপাতে অস্বীকার করে। দু বছর আগের কথা, পরে ঐ রচনাটি জয়শ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ন্যায় ও সততার পূজারী। আশা করি তিনি এই ঘটনার সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে পশ্চিম বঙ্গের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

সুধীন গুপ্ত
—
কলিকাতা

॥ দুই ॥

গত চোদ্দই জানুয়ারী দর্পণ অফিসে ছাত্র পরিষদের হামলার সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। মুখে গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করার এই হীন অপচেষ্টা নিঃসন্দেহে ঘৃণার উদ্রেক করে। শাসক শ্রেণীর সংকট যতই বাড়ছে, দিক দিকে যখন ওদের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা জাগছে তখন শাসকশ্রেণীর নগ্ন রূপ বেরিয়ে পড়ছে। তাই সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কর্মচারী ও পশ্চিমবঙ্গের অগণিত মানুষের প্রিয় বলিষ্ঠ ও সঠিক কাণ্ডারী দর্পণের ওপর এই ঘৃণ্য, বর্বর ও কাপুরুষোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা ধিক্কার জানাই।

কনকপ্রভা সরকার
মেদিনীপুর

দর্পণে প্রতিবিম্ব

দিল্লীর বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক মহলের সম্প্রতি এক নূতন অভিজ্ঞতা হল। হঠাৎ সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কাছাইকরা ব্যক্তিদের এক বৈঠক ডাকলেন, বললেন, প্রধানমন্ত্রী আসবেন, কথাবার্তা বলবেন। জনা ষাটেক শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী জমায়েত হলেন। ইন্দিরাজীর সঙ্গে তাঁদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও নানা সমস্যা, সরকারী চিন্তাধারা ও কর্মোদ্যোগ, সাম্প্রতিক কালের নানা আন্দোলন ও সরকার বিরোধী মন্তব্য, কিছু লোকের প্রচারিত পার্টিবিহীন গণতন্ত্র, গান্ধীজীর আদর্শ ও শিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে মতবিনিময় হল। গান্ধীপ্রসঙ্গে ইন্দিরাজী কিছু বললে, গান্ধী দর্শনে পণ্ডিত জনৈক অধ্যাপক মহাত্মাজীর লেখা ও বক্তৃতা থেকে এমন সব উক্তি করলেন যাতে মহান নেত্রী পড়লেন বেকায়দায়। শেষ পর্যন্ত সেই অধ্যাপকের উদ্দেশে বললেন যে, গান্ধী দর্শনে তার মতো জ্ঞানী ইন্দিরাজী না হতে পারেন, কিন্তু গান্ধীজীর কোলে তিনি খেলা করেছেন।

ইন্দিরাজীর ইংগিত অর্থবহ। গান্ধীদর্শন নিয়ে চর্চা করে সেই অধ্যাপক যা শিখেছেন, গান্ধীজীর কোলে শৈশবের খেলা খেলে যেন ইন্দিরাজী গান্ধীজীকে কিনেছেন ও গান্ধীবাদ অন্যভাবে শিখেছেন। সত্যি এ নাহলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী! জন্মসূত্রে বা শৈশবে সুযোগের সূত্রে সর্বজ্ঞ হওয়া শুধু এদেশের সম্ভব।

●

কদিন আগে সংবাদপত্রে একটি খবর পড়তে গিয়ে ছেলেবেলায় শোনা গ্রামোফন রেকর্ডের একটি কৌতুক নাটের একছত্র সংলাপ মনে পড়ে গেল—"হাঁড়ি খুলে দেখি মাংস নেই।" হ্যাঁ, এমনই অবস্থা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজার। গত বাইশে জানুয়ারী হাওড়া জেলার বালটিকুড়ি এলাকায় রাজ্য সরকার অধিগৃহীত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেখেন যে সেখানে শয্যা তো দূরের কথা, এক শিশি ওষুধও নেই। পৌঁছনোর দরুণ কিছু করা যায় নি। অনেক আগেই দেওয়া হয়েছিল। জেলার চিফ মেডিকেল অফিসার জানালেন, সরকারী অধিগ্রহণের নির্দেশ তাঁর কাছে শেষ মুহূর্তে পৌঁছনোর দরুণ কিছু করা যায় নি। সংবাদদাতা অন্য সূত্রের খবর উদ্ধৃত করে বলছেন, জেলা পরিষদ পরিচালিত বালটিকুরির এই কেদারনাথ মাতৃসদন শিশু হাসপাতালটির পরিচালনভার স্বাস্থ্য দপ্তর সরকারীভাবে এখনও গ্রহণ করেন নি। অন্য খবর রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে প্রথম পর্যায়ে এক এক লক্ষ টাকাও মঞ্জুর করেছেন।

সেই হাঁড়ির কথাতেই ফিরে যাই। মাংস কেনার টাকা দেওয়া হয়েছিল কিনা, টাকা দিলেও মাংস হয়েছিল কিনা, কিম্বা টাকা যদি দেওয়া হয়ে থাকে ও মাংসও কেনা হয়ে থাকে, তাহলে সব উদরস্থ করে মন্ত্রীকে দিয়ে হাঁড়ি খোলানো কেন? নাকি কিছুই হয়নি; মন্ত্রী নমো নমো করে দ্বারোদ্ঘাটন জাতীয় কিছু করে সংবাদপত্রে ঠাঁই পেতে চেয়েছিলেন। এযাবৎকাল জেলা পরিষদ পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে এক শিশি ডেটল বা এক টুকরো ব্যান্ডেজও অবশিষ্ট নেই, এটা পাঁজা মশাইয়ের জানা ছিল না। তাড়াহুড়ো দ্বারোদ্ঘাটনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই তাঁর এই বিপত্তির কারণ নয় তো?

এই ঘটনার দিন দুয়েক আগে সম্পতি রাজ্য সরকার অধিগৃহীত কলকাতার চিত্তরঞ্জন শিশুসদনে খাটের ওপর তিন মাসের শিশুর দেহ ইঁদুর খেয়ে গেল।

নিজস্ব দপ্তরে স্বজন পোষণের দায়ে ওয়াঞ্চু কমিশনের সম্মুখীন হতে হলেও বিভিন্ন কাণ্ডকারখানার জন্য মন্ত্রীমশাই স্বাস্থ্য দপ্তরের সব কর্মীকে হুমকী দিচ্ছেন। মন্ত্রী বটে অজিত পাঁজা।

শিলাদিত্য

অবৈধ ব্যবসা

হাওড়ার রাজবল্লভ সাহা লেন এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল শান্তি দত্ত নামে জনৈক সমাজবিরোধীর দৌরাত্ম্যে আজ বসবাসের অনুপযুক্ত। দিনে রাতে চলতে ফিরতে মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। তার চেয়েও বেশী বিপন্ন বোধ করছে এ অঞ্চলের তরুণ তরুণীরা।

শান্তি তার স্ত্রী বলে প্রচারিত গীতা নামে জনৈকা মহিলার সহযোগিতায় এখানকার বরদা ভট্টাচার্য লেনে সম্প্রতি জায়গা কিনে প্রকাশ্যে অবৈধ ব্যবসা চালু করেছে। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র তরুণীদের এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা হচ্ছে। এই দূষিত পরিবেশে রাস্তা দিয়ে চলা-ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। নারী-দেহের এই নারকীয় ব্যবসায় স্থানীয় অভিভাবকরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এই গণিকালয়ের কাছেই দুটি স্কুল। ছাত্রছাত্রীদের দুবেলা এই পথেই যাতায়াত করতে হয় এবং অপমানজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া ছাড়া কোন পথ থাকেনা। অশ্লীল গালাগালি এবং ছাত্রীদের জোরপূর্বক সম্ভ্রমহানির চেষ্টা নিয়মিত ঘটনা।

শুধুমাত্র সমাজবিরোধীই, শান্তির যথেষ্ট বিশেষণ নয়। খুন ডাকাতি এবং স্মাগলিং-এর ব্যবসায়ও তার হাত পেকেছে। শান্তি ও গীতার নেতৃত্বে পথের ওপর খোলাখুলিভাবে জুয়াও চলছে। অন্যদিকে পি ডি এ ও ডি আই আর সব কিছুই শান্তির বিরুদ্ধে এক সময় প্রযুক্ত হয়েছে। হাওড়া থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কম নেই।

শরৎচন্দ্র

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হয়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের স্থানও আছে। মানুষের মন ছাড়া তো সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানব-চিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য বিকশিত হয়ে ওঠে। মানব-চিত্তই যে একস্থানে নিশ্চল হয়ে থাকতে পায় না। তার পরিবর্তন আছে, বিবর্তন আছে,—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য-বিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষে খুশি হয়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।..তর্ক উঠতে পারে চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী তো আজও আছে, কালিদাসের শকুন্তলা তো আজও তেমনি জীবন্ত। তাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। কিন্তু এর থেকে তার অবিনশ্বরতাও সপ্রমাণ হয় না। তার দোষগুণেরও শেষ নিষ্পত্তি করা যায় না।" (ঐ)

শরৎ-প্রতিভার মূল্যায়নে আজও যখন বিদগ্ধ মহলে বিস্ময়কর অনীহা ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করি তখন বিদেশী মনীষীর দৃষ্টান্তই তাঁদের নাকের সামনে প্রবল বেগে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে জাগে। মনীষী রম্যাঁ রলাঁ "শ্রীকান্তের" ইংরেজি সংস্করণের ইতালীয় অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পৃথিবীর "প্রথম শ্রেণীর" ঔপন্যাসিকের সম্মান দিয়েছিলেন। (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪, পৃষ্ঠা ২৫০/ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ শরৎ-পরিচয়)

[সমাপ্ত]

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

রেলকর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

"শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার জালিয়াতি, মিথ্যা প্রচার এবং সেই সঙ্গে পুলিশ মিলিটারী ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডা লাগিয়েও রেলকর্মীদের মনোবল ভাঙ্গতে পারে নি, পারবেও না। ধর্মঘট হয় তো সাময়িকভাবে প্রত্যাহৃত হয়েছে, কিন্তু আমাদের দাবী কিংবা দাবীর লড়াই আজও প্রত্যাহৃত হয় নি। আমরা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার মধ্য দিয়েই আমাদের দাবী আদায় করতে চাই কিন্তু সরকার এবং রেলপ্রশাসন যদি আর একটা লড়াই চাপিয়ে দিতে চায়, তবে রেলকর্মীরাও পিছু হটবে না।"

ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের উদ্যোগে আহূত সাতাশে জানুয়ারী বিকেল চারটায় ফেয়ারলী প্লেসের পূর্ব রেল সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভরত কয়েক হাজার রেল শ্রমিক কর্মচারীর সমাবেশে উপরোক্ত ঘোষণা করেন পরিতোষ ব্যানার্জী ও বিমল দে প্রমুখ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। এই বিক্ষোভ রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত হলেও কার্যতঃ এটি এন সি সি আর এস-এর ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতাকেই প্রতিফলিত করেছে এবং অল ইণ্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব রেল শাখা সম্পাদক পি কে দত্তগুপ্ত, অল ইণ্ডিয়া টি আর ডি এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মাণিক ব্যানার্জী, ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ টেকনিকাল সুপারভাইজার এ্যাসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী কে, কে, কে, পান্ডে এবং ষ্টেশন মাষ্টার্স এ্যাসোসিয়েশনের রণজিত দাশগুপ্তও সভায় ভাষণ দেন। এ ছাড়া এম টি পি, রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ মুখার্জী সহ রেল কমার্শিয়াল ক্লার্ক এ্যাসোসিয়েশন এবং ইষ্টার্ন রেল টিকেট চেকিং ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব পেশ করেন বিমল দে এবং দর্পণ অফিসে হামলার তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব পেশ করেন পরিতোষ ব্যানার্জী। দুটি প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিকেল আরটা নাগাদ স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া এবং শিয়ালদা থেকে আগত বিরাট মিছিলের পথ রোধ করে বিশাল সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী। ফেয়ারলী প্লেস-স্ট্র্যান্ড রোডের সংযোগস্থলে কর্ডন রচনা করলে হাজার হাজার রেলকর্মী স্ট্র্যান্ডার্ড রোডের ওপর বাস পড়ায় দীর্ঘ সময়ের জন্য গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত রেলকর্মীদের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে নতিস্বীকার করে পুলিশ কর্ডন অনেকটা পিছিয়ে নেওয়া হয়। এদিন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাতটি অনুচ্ছেদে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দিতে গেলে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এই অজুহাতে যে, রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশানুসারে তারা ইউনিয়নের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা করবেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইষ্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন রেল প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত রেলকর্মীদের ট্রেডইউনিয়ন সংস্থা। এই অস্বীকৃতির সংবাদ প্রচারিত হলে সমবেত রেলকর্মীরা তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন।

এদিন ফেয়ারলী প্লেস ছিল জনসমুদ্র উদ্বেল। রেলকর্মীরা তাদের বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্বহালের দাবী সহ তাদের নিজস্ব দাবীর শ্লোগানই শুধু দেন নি, চটকল ধর্মঘট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থনেও তাদের কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। এই মিছিল থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, রেলকর্মীরা আবার চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সেই লক্ষ্যে এন সি সি আর এস-এর সংহতি রক্ষায়ও তারা বদ্ধপরিকর।

হাসপাতালে ইঁদুরের উপদ্রব সরকারী অবহেলার নজীর

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এক হাত লম্বা কয়েক শ ইঁদুর কলকাতার মত শহরের বড় হাসপাতালে বিছানায় শোয়া শিশুদের হাত পা মুখ ও দেহের অন্যান্য অংশ কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছে। বহু আবেদন নিবেদন করেছেন চিত্তরঞ্জন শিশু সদনের ডাক্তার ও নার্সরা স্বয়ং স্বাস্থ্য মন্ত্রী অজিত পাঁজার কাছে। তাঁরা গত কয়েকমাস ধরে ইঁদুর মারার জরুরী ব্যবস্থার জন্য সরকারের কাছে দরবার করেছেন।

ইতিমধ্যে ফাঁস হয়ে গেল একটি তিন মাসের শিশুর মৃত্যুর কথা। দেখা গেল মৃত শিশুর দেহের অনেকটা ইঁদুর খেয়ে গেছে। সেবব্রতা নার্সরা দেখেছেন যে, শিশুটির কম্বলের তলায় কি যেন নড়ছে। তাঁরা মনে করেছেন শিশুটি বোধ হয় হাত পা নাড়ছে। তারপর নড়াচড়া একটু অস্বাভাবিক মনে হতে একজন নার্স কম্বল তুলে দেখেন একটি বিরাট ইঁদুর কম্বলের তলা থেকে নেমে গেল।

সাংবাদিকদের কাছে হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা বলেছেন, একটি শিশু মারা গেছে বলে এত হৈ হৈ হচ্ছে। এ ধরণের ঘটনা এমন কিছু নতুন নয়। বহু শিশুর হাত পায়ের আঙ্গুল, মাথার ও গায়ের মাংস কুরে খাওয়ার অনেক ঘটনা এই হাসপাতালে ঘটে আসছে গত কয়েক মাস ধরে। অনেক নালিশ জানান হয়েছে হাসপাতাল এবং অভিভাবকদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে। কিছুই হয় নি।

হঠাৎ সংবাদপত্রে একটি ঘটনার প্রচারের ফলে এত হাঁকাহাঁকি। মন্ত্রী ছোটাছুটি করছেন আর নানা জরুরী ব্যবস্থার কথা বলছেন। হাসপাতাল কর্মীদের ধারণা শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না।

এই সূত্রে বলে রাখা দরকার যে চিত্তরঞ্জন সেবা ও শিশুসদন সংস্থা বহুদিন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছিল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে।

এখানে পরিচালন সমিতিতে এবং কর্মচারীদের ইউনিয়নে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের প্রভাব ছিল কংগ্রেস সরকার পত্তন হওয়ার আগে। এর পরের ইতিহাস মামুলী। অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের মত কংগ্রেসীরা হামলাবাজী করে এই প্রতিষ্ঠান কব্জা করে নেয়।

তারপর থেকেই ইঁদুরের উপদ্রব। সরকার এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

সারা রাজ্যে এই অরাজকতা, এবং এর দায়িত্ব শাসকদল এড়াতে পারে না। আজ সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ ও দল একত্রিত হয়ে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় এসেছে।

সিটু কর্মীদের ওপর আক্রমণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত তিরিশে ডিসেম্বর চুয়াত্তর বেঙ্গল ইনগট কারখানায় আই এন টি ইউ সির সমর্থকদের আক্রমণে যুগ্ম সম্পাদক রামলক্ষণ সাউ সহ তিনজন সিটু কর্মী গুরুতর আহত হন। সাউকে আলিপুর পুলিশ কেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত অপর দুইজন কর্মী হলেন রামনারায়ণ আহির এবং সুখী যশোহারা। ইউনিয়নের সভাপতি জুড়ান গাঙ্গুলীর উপর আক্রমণ করে তার ঘড়ি ও ব্যাগ আক্রমণকারীরা ছিনতাই করে নেয়। বিশিফটে কাজে যাওয়ার সময় খাজা বক্স নামে একজন শ্রমিককে তুলে নেয় ও নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করে ও বলপূর্বক মুচলেখা আদায় করে। শ্রমিকদের উপর কংগ্রেসীদের এই হামলার প্রতিবাদে কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা কবিতীর্থ পার্কে জমায়েত হয়ে স্থানীয় সাউথ পোর্ট পুলিশ থানায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে এবং থানায় ডাইরি করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কোম্পানীর মালিকের আশ্রয়পুষ্ট নব গঠিত এই ইউনিয়ন হঠাৎ তিরিশে ডিসেম্বর একদিনের প্রতীক ধর্মঘট ডাকে। অদের দাবি পুরানো সিটু ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে ওদের ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা পঁচিশ-তিরিশ জনের মত। সিটু পরিচালিত বেঙ্গল ইনগট কোম্পানী এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা চরশ চুয়াল্লিশ জন, কারখানার মোট কর্মী সংখ্যা পাঁচশত জনের মত। উক্ত দাবীর সঙ্গে এই কংগ্রেসী ইউনিয়নটি কিছু মামুলী অর্থনৈতিক দাবি যুক্ত করে। সিটু ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আই এন টি ইউ সির ইউনিয়নকে জানানো হয়, সদি সত্যই তারা শ্রমিকদের দাবীতে যুক্ত আন্দোলনে আগ্রহী হয় তাহলে একতরফা ভাবে শ্রমিকদের মতের বিরুদ্ধে ডাকা প্রতীক ধর্মঘটের ডাক স্থগিত রেখে অধিকাংশের আশ্বাভাজন ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসুন। কিন্তু তারা এই প্রস্তাবে রাজী না হয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জোর জবরদস্তির সাহায্যে শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়। প্রত্যেক শ্রমিক লিখিতভাবে বিভেদ সৃষ্টিকারী ধর্মঘটের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় কংগ্রেসী ইউনিয়ন অন্য কোন পথ না দেখে সন্ত্রাস ও গুণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ করে। তিরিশে ডিসেম্বর সকালে কর্মচারীরা কাজে যোগদান করতে গেলে গুণ্ডারা কর্মচারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে এই ইউনিয়নের নেতা হলেন কংগ্রেসী এম এল এ রামপিয়ারী রাম।

পরলোকে মনীশ রায়চৌধুরী

সাতাশে জানুয়ারী রাত্রিতে জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির সি পি আই এম এর পৌর সদস্য এবং অসংখ্য গণ সঙ্গীতের গীতিকার ও সুরকার মনীশ রায় চৌধুরী কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মনীশবাবু অবিভক্ত বাংলায় রংপুরের কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে ইংরেজ আমলে বিনা বিচারে আটক ছিলেন প্রায় আট বছর। মনীশবাবুর মা প্রয়াত কিরণবালা রায় চৌধুরীও রংপুরের মহিলা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তাঁরা চার ভাই-ই ছিলেন রাজবন্দী। মুক্তিলাভের পর প্রাক স্বাধীনতা যুগেই মনীশবাবুর এক ভাই দেবেশ প্রসাদের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক সুরেশ প্রসাদ রায়চৌধুরীও দুই দফায় প্রায় পনের বছর রাজবন্দী হিসাবে কারাবাস করেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিখিলেশ প্রসাদ রাজবন্দী ছিলেন কংগ্রেস আমলে স্বাধীন দেশের কারাগারে। মনীশবাবুর সাহিত্যে ছিল প্রগাঢ় পান্ডিত্য এবং মার্কসবাদী তত্ত্বে তার দখল ছিল অসাধারণ। মিত এবং মিষ্টভাষী মনীশবাবু জলপাইগুড়িতে দলমত নির্বিশেষে সকলেরই প্রিয় ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ষাট। তিনি রেখে গেছেন দুই ভ্রাতা সহ স্ত্রী, এক পুত্র চার কন্যা ও অগণিত অনুরাগীকে।

প্রস্তুতিপর্ব

জানুয়ারী-এপ্রিল (যুক্ত) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে মার্চে। বিষয় সূচী: ভারতের সমাজ—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সুদীর্ঘ ইতিহাস নির্ভর বিশ্লেষণ—সম্বলিত একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র। মুজফ্ফর আহ্মেদ ও নজরুল সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকা সম্পর্কে নতুন তথ্যের ভিত্তিতে দ্বিজেন্দ্র নন্দীর প্রবন্ধ: 'নবযুগ' প্রসঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলায় মাও সেতুঙের 'মাস লাইনের' প্রয়োগ: হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রবন্ধ। গণকবিয়াল রমেশ শীল সম্পর্কে প্রবন্ধ: নিঃশঙ্ক গুপ্ত। এবং কবিতা ও সংস্কৃতি সাময়িকী॥

'পত্রিকা' বেরোল।

প্রথম সংখ্যার আকর্ষণ:
বিহার আন্দোলন কি ও কেন?
জন্ম ১৪৩, মৃত্যু ১০৬, বয়স: ১৩৬০।
কুসংস্কার প্রসঙ্গে।
দিলীপ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
ক্যালার: যে শত্রুকে মানুষ জয় করতে চলেছে।
৬ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ব টেবিল টেনিস শুরু।
ভারত চীন মৈত্রীর প্রয়াস।
মূল্য: ৩০০। গ্রাহক চাঁদা ৫·০০/১০·০০।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক নবার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

উল্টাডাঙ্গায় দুর্ঘটনার জন্য রেল-প্রশাসনই দায়ী

১৮শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ ॥ ৪০ পঃ

সাধন গুহ

দানাপুর ডিভিসনের ডুমরাও ষ্টেশনে ডাউন পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনার পর ইষ্টার্ণ রেলের চীফ অপারেটিং সুপারিনটেণ্ডেন্ট প্রমোশন পেয়ে জেনারেল ম্যানেজার হয়েছিলেন। গুরুপা ষ্টেশনে দুর্ঘটনার পর ধানবাদের ডি এস এবং নিমডি ষ্টেশনে দুর্ঘটনার পর আদ্রার ডি এস মেরিট সার্টিফিকেট পেলেন। এবার উল্টাডাঙ্গা দুর্ঘটনার পর হয়তো শিয়ালদার ডি এস এম এল গুপ্ত এবং এই দুর্ঘটনার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ডি ই ই (টি আর এস) রক্ষেশ্বর চ্যাটার্জীও প্রমোশন পাবেন।

লক্ষণীয় যে, দুর্ঘটনার অব-

কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে দেবকান্ত বড়ুয়াকে অপসারণের চেষ্টা

(দর্পণের নয়াদিল্লীস্থ প্রতিনিধি)

কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়াকে অপসারণের জন্য দলের প্রভাবশালী মহল থেকে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। দেবকান্তবাবুকে অপসারণের জন্য প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম স্বয়ং উদ্যোগ নিয়েছেন। জগজ্জীবনবাবুকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী, বিদেশ মন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী উমাশঙ্কর দীক্ষিত প্রভৃতি দলের প্রবীণ নেতারা।

দেবকান্তবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থে কাজ করছেন। এই অভিযোগ করেছেন জগজীবনবাবু সহ দলের প্রবীণ নেতারা। জগজীবনবাবু রাজ্যে রাজ্যে কর্মী সম্মেলন করে বলেছেন দল আজ সংকটের মুখে। কংগ্রেসের আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখে দল পরিচালনার যোগ্যতা বর্তমান সভাপতির নেই। দেবকান্তবাবু বেশ কিছুদিন এই পদে থাকলে দলের মধ্যে মস্কোপন্থী নয়া কংগ্রেসীদের প্রাধান্য বেড়ে যাবে। এবং তার ফলে এমন দিন আসা কঠিন নয়, যেদিন দেখা যাবে পরিচিত গান্ধীবাদী কংগ্রেসীদের দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

একদিকে জগজীবনবাবু যেমন রাজ্যে রাজ্যে নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসীদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে দলের এই বিপদ সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছেন, অবিলম্বে আপনি দেবকান্ত বড়ুয়াকে সরিয়ে নিন, না হলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না।

ইন্দিরা গান্ধীর এখন উভয় সংকট। এই তো সেদিন যাঁকে মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে দলের সভাপতি করা হলো তাকে এত তাড়াতাড়ি সরাবেন কি করে। অন্যদিকে দলের এই প্রবীণ নেতাদের পুরোপুরি চটিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে বর্তমানে সম্ভব নয়।

উনসত্তর সালে তিনি যে টেকনিকে দলের প্রবীণ নেতাদের বিতাড়িত করেছিলেন আজকে সে পথে এগোনর স্বাধ থাকলেও সাধ্য তাঁর নেই। দলের প্রবীণ নেতারা নানা কারণে শ্রীমতী গান্ধীর ওপর চটে আছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ট বলে পরিচিত উমাশঙ্কর দীক্ষিত পর্যন্ত। শ্রীদীক্ষিতের ইচ্ছা তাঁকে কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের ভার দেওয়া হোক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রাজী নন। শ্রীদীক্ষিত অবশ্য নানাদিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর ওপব চাপ সৃষ্টি করছেন রেলমন্ত্রী হবার জন্য। শেষ পর্যন্ত শ্রীদীক্ষিত

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দল ভাঙ্গার অভিযোগ এনেছেন

(দর্পণের নয়াদিল্লীস্থ প্রতিনিধি)

কংগ্রেস দলের তুর্কী নেতা শ্রীচন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দল ভাঙ্গার অভিযোগ এনেছেন। শ্রীচন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, আপনি অবিলম্বে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে আপোষ করে নিন অন্যথায় জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে দল টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আপনার একগুয়েমির জন্য দল ভেঙ্গে যাবে তা আমরা মেনে নিতে পারি না।

চন্দ্রশেখরের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক কালে এক দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ। উনসত্তর সনে কংগ্রেস দুভাগ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি এমন অভিযোগ দলের বাঘা বাঘা নেতাদের পক্ষেও করা সম্ভব হয়নি।

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির একটা বিরাট অংশ যখন অশোক মেটার নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগদান করেন তখন শ্রীচন্দ্রশেখরও কংগ্রেসে আসেন। তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী হিসেবে শ্রীচন্দ্রশেখর দলের মধ্যে সুপরিচিত। অবিভক্ত কংগ্রেস থাকাকালীন অবস্থাতেও তিনি পার্লামেন্টে বড় বড় ব্যবসয়ীদের প্রতি সরকারের দুর্বলতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। অবশ্যই নানাবিধ তথ্যপ্রমাণ সহযোগে। তাই তিনি দলের প্রভাবশালী নেতাদের কোন দিনই সুনজরে আসেন নি।

কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর তিনি শাসক কংগ্রেসেই থেকে যান। এবং দলের মধ্যে তার অবস্থা অপরিবর্তিতই থেকে। এমনকি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের প্রতি রুষ্ট হন। বাহাত্তর সালে কলকাতার লবণ হ্রদে এ আই সি সি-র সম্মেলনে দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত সরকারী প্যানেলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হয়ে যান এমনা কি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত।

চন্দ্রশেখর জয়প্রকাশজীর প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা পোষণ করেন। অবশ্য তিনি একথা গোপন করেন নি। তিনি জয়প্রকাশজীর সঙ্গে এখনো যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এবং দলের আশি জন সংসদ সদস্য চন্দ্রশেখরকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন। খোদ দিল্লীতে তিনি যে জয়প্রকাশজীর সম্মানে চায়ের আসর ডেকেছিলেন তা নিয়ে অনেক নেতা ইন্দিরা গান্ধীকে চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। কিন্তু বাহাত্তরে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের ঘটনা স্মরণ রেখে তিনি চন্দ্রশেখরকে ঘাঁটাতে সাহস পান নি।

এদিকে চন্দ্রশেখর বিড়লা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কর ফাঁকির অভিযানে সরকারকে সাহায্য করে কয়েক কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করিয়েছেন এবং এবাবদ পুরস্কার হিসাবে পাওয়া পাঁচ লক্ষ টাকা তিনি জনহিতকর সংস্থায় দান করে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে সরকারের প্রকৃত সদিচ্ছাকে সহযোগিতা করার মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন।

চন্দ্রশেখর এখন পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে কয়েক ডজন এম পিকে নিয়ে আসন্ন বাজেট সেসনে তাঁদের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করছেন। বিরোধী অভিযানকে মদত দিতে এবং শ্রীমতী গান্ধীকে জয়প্রকাশজীর সঙ্গে আপোষ করাতে বাধ্য করাতে তিনি ও তাঁর গোষ্ঠী আসন্ন সংসদ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

দুর্ঘটনা মৃত্যু

উল্টাডাঙ্গা স্টেশনের কাছে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় আর একবার প্রমাণ হল ভারতীয় জনসাধারণের জীবন কত সস্তা। শাসক শ্রেণীর অপশাসনের ফলে জনগণের এক বৃহৎ অংশের অনাহারজনিত অপুষ্টিতে মৃত্যু এদেশে দৈনন্দিন ঘটনা। তার ওপর বছরে কয়েকবার বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেন দুর্ঘটনায় বেশ কয়েক হাজার পরিবারে নেমে আসছে শোকের ছায়া। অথচ এইসব দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য রেল-কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি। তাঁরা শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর রক্তচক্ষু দেখাতে যত তৎপর, ঠিক ততখানি নিষ্ক্রিয়- সুষ্ঠুভাবে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে। প্রায় কোন দুর্ঘটনারই যথাযথ তদন্ত হয় না। কর্তৃপক্ষ প্রকৃত তদন্ত এড়িয়ে যান। কারণ প্রকৃত তদন্ত হলে তাঁরা নিজেরাই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন।

গত সপ্তাহের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে সেইভাবে। সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পাওয়া গেছে তাতে একথা পরিষ্কার যে, হাবড়া লোকালের যান্ত্রিক গোলযোগের ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ প্রশাসনিক দায়িত্বহীনতাই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। কিন্তু তড়িঘড়ি ড্রাইভারদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিবেক পরিষ্কার রাখতে চাইছেন।

ললিত মিশ্র পরলোকগত, তাই তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা। কিন্তু রেলওয়ে বোর্ড থেকে শুরু করে রেলের ওপরতলার অফিসাররা প্রায় প্রত্যেকেই জঘন্য আমলাসুলভ মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন। রেলকর্মীদের বিগত ধর্মঘটের সময় এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রমাণ পাওয়া যায় আরও বহু ছোট-বড় ঘটনায়। এই মনোবৃত্তির পরিবর্তন না হলে দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে না। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ সরকারী প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রেই এই মানোবৃত্তি কার্যকর। অতএব ভারতীয় জনসাধারণের একাংশের বিধিলিপি দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় কত লোক মারা গেছে তার প্রকৃত হিসেব পাওয়া যাবে না। কংগ্রেস সরকার সব ব্যাপারেই মিথ্যা বলতে ওস্তাদ। এ ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। সুতরাং সরকারী পরিসংখ্যান যদি হয় একশো, বে-সরকারী পরিসংখ্যান হবে অন্তত তার দশগুণ।

সি পি আইয়ের দশম কংগ্রেস

সংগ্রাম গৌণ, কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যই আসল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি আই-এর দশম কংগ্রেস বিজয়বাদায় সম্পন্ন হল এই সপ্তাহের গোড়ার দিকে। পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বা কৌশলগত প্রশ্নে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই একই নেতৃত্ব পুনর্বহাল হয়েছে। শ্রীডাঙ্গে ও শ্রীরাজেশ্বর রাও পার্টির চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। এই দুই নেতা ছাড়া আর যাঁরা সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেন এন কে কৃষ্ণন, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, যোগীন্দ্র শর্মা, রাজশেখর রেড্ডী এবং এস কুমারণ। বেশীর ভাগই সেই পুরানো মুখ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সমতা রেখে সি পি আই কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বকে প্রগতিশীল বলে মনে করে এবং এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমস্ত কিছু আন্দোলনকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতার অথবা বামপন্থী সুবিধাবাদের প্রকাশ বলে মনে করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সি পি আই কংগ্রেসের সমর্থক দল হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এর ফলে দলের জনসমর্থন ক্রমশঃ কমে এসেছে এবং পার্টির সদস্য সংখ্যার কোন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে নি। সি পি আই এ ব্যাপারে খুব বেশী চিন্তিত বলে মনে হয় না। কারণ, পার্টি বিশ্বাস করে যে, কংগ্রেসের যে অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিতালীতে বিশ্বাসী সেই অংশ নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার জন্য শেষ পর্যন্ত সি পি আইকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হবে। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের এই অংশ এখন রাষ্ট্রক্ষমতায় এবং সি পি আই এই অংশের অনুগ্রহে অনেক সুযোগ সুবিধার অংশীদার। এর ফলে পার্টির আর্থিক ও অন্যান্য নানা সামর্থের কোন সমস্যা নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতায় কেরলে ও বিভিন্ন রাজ্যে কেরালা ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে।

পার্টি বিশ্বাস করে যে, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতির চাপে ইন্দিরা কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত সি পি আই-এর সাহায্য ছাড়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না।

পার্টি ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য শ্লোগানের ভিত্তিতে যে রাজনীতি কোচ্চিন কংগ্রেসের পর থেকে অনুসরণ করে আসছে সেই নীতি এখনও চালু আছে, কিন্তু সংগ্রাম এখন গৌণ পর্যায়ে চলে এসেছে। এখন কংগ্রেসের তথাকথিত প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে ঐক্যের ওপর জোর বেশী দেওয়া হয়েছে। এবং এই ঐক্য কোন আন্দোলনের মধ্যে গড়ে ওঠার কথা তেমন গুরুত্ব পায় নি। ওপরতলায় কথাবার্তার মাধ্যমে এই ঐক্য সম্পাদিত হতে পারে বলে সি পি আই-এর ধারণা।

দেশে কংগ্রেসী নীতি ব্যর্থ হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে। সারা দেশে অসন্তোষ বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। সংগঠিত শ্রমিক কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠছে দেশের বিভিন্ন অংশে। সর্বত্র একই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। সে প্রশ্ন সারা দেশব্যাপী বিরোধী শক্তির ঐক্য সংক্রান্ত।

দেশের মানুষের বুঝতে অসুবিধা নেই যে, ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ছাড়া শোষণভিত্তিক দুর্নীতিপরায়ণ আজকের শাসনের অবসান ঘটান যাবে না। এবং এই ঐক্যের তাগিদ থেকেই দেশে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলার নানা আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে।

কিন্তু দেশে নানা দল, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীস্বার্থের মুখপাত্র হিসেবে বিরাজ করছে। সমস্ত দলই অনুভব করতে শুরু করেছে যে, দুর্নীতি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ যে কোন মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। এই অবস্থায় নেতৃত্ব কব্জা করার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে প্রতিষ্ঠিত অনেক দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস বিরোধীদের মধ্যে। আবার বামপন্থীরাও এই অবস্থায় চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

কিন্তু বাম ও দক্ষিণ এই দুই রাজনীতি পরস্পরের সম্পর্কে সন্দিহান। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থীরা নিজেদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যয় থেকে সঠিক কর্মসূচীর ইঙ্গিত দিতে পারত। কিন্তু বামপন্থীরা অনেকেই নিজেদের সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, তাই ঐক্যের প্রশ্নে সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়, প্রায় সবাইকে প্রতিবিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়া চক্র ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে।

দক্ষিণপন্থীরা যদি অবস্থা বিপাকে বামপন্থীদের শরণাপন্ন হয় তবে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে শেষোক্তদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সঠিক রাজনীতির জোরে জনসমর্থন বামপন্থীদের পক্ষে যেতে পারে। সংকীর্ণতাবাদী না হলে যে কোন যৌথ ফ্রন্টের নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে চলে আসতে বাধ্য। অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু ও পথ সঠিকভাবে নির্দিষ্ট থাকলে গণআন্দোলনের যে কোন প্রোগ্রামে প্রতিক্রিয়ার শক্তি এসে যোগ দিলেও আন্দোলনের নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে থেকে যাবে। জীবিত বিপ্লবী নেতাদের শীর্ষস্থানীয় মাও সে তুং বলে আসছেন : যারাই ঐক্য করতে রাজী, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও। কারণ, সংগ্রাম ব্যাপক এবং শাসকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রচণ্ড সন্ত্রাসে সক্ষম। এই সন্ত্রাসের মোকাবিলা কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধভাবেই করা যায়।

সি পি আই কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়ক হিসেবে সমস্ত সংগ্রামী শক্তির বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদের ধারণা, কংগ্রেসের বা শাসকশ্রেণীর যে অংশ সোভিয়েত মনোভাবাপন্ন সেই অংশ প্রগতিশীল এবং হয়ত সমাজবাদে বিশ্বাসী।

সি পি আই নেতা শ্রীডাঙ্গে ইদানীং যে সমস্ত বক্তৃতা করেছেন তাতে কংগ্রেসের নীতির প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষয়ে সমালোচনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতার ব্যক্তিগত আচার আচরণের উল্লেখ করে কাউকে প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়ার বাহন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন উমাশঙ্কর দীক্ষিত একজন "ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল" এবং ওয়াই বি চ্যবন "আগে যাই থাকুন না কেন, এখন আর ততটা প্রতিক্রিয়াশীল নন" আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় "কাজের চেয়ে কথা বেশী বলেন"।

সি পি আই কংগ্রেসে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিনিধিদের শ্রেণী উদ্ভব বিষয়ে এক বিশ্লেষণে পার্টির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, বেশীর ভাগ প্রতিনিধি মধ্যবিত্ত সমাজের। কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সংখ্যা নগণ্য। এই সমস্ত প্রতিনিধি শুধু যে মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উদ্ভূত তাই নয়, তারা মানসিকতার দিক থেকেও এখনও সুবিধাবাদী ঝোঁক বজায় রেখেছে। তাদের সংগ্রামবিমুখতা এখন পার্টিকে চূড়ান্ত সংশোধনবাদের পঙ্কে ডুবিয়ে রেখেছে। যতই শাসকদলের সঙ্গে আঁতাতের সুযোগে ওরা ব্যস্ত থাকবে ততই সি পি আই তার বিপ্লবী চরিত্র হারাবে। এ স্বাভাবিক নিয়ম।

দেবকান্ত বড়ুয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যদি রেল দপ্তরের ভার না পান তবে তিনি সরাসরি ইন্দিরা বিরোধিতার নামবেন এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

জগজীবন রাম, ওয়াই বি চ্যবন, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী উমাশঙ্কর দীক্ষিত প্রমুখ দলের নেতারা ঘন ঘন আলোচনায় বসছেন তাদের কৌশল নির্ধারণের জন্য। মোটামুটি ভাবে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, শ্রীমতী গান্ধী যদি তাঁদের কথা না শোনেন তবে তারা প্রকাশ্যে বিরোধিতা করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী গোষ্ঠী লড়াই জীইয়ে রাখছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হঠাৎ অন্তবর্তীকালীন লোকসভা নির্বাচন হতে পারে এই সম্ভাবনায় কিছুদিন বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়েছিল। এখন মোটামুটি বোঝা গেছে, কংগ্রেসের উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বের পক্ষে এই ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।

নির্বাচনী সম্ভাবনা দূরে সরে যাওয়ার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বিবদমান বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সমস্ত ঐক্য আলোচনা শুরু হয়েছিল তা ধামাচাপা পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে আবার দুই কংগ্রেসী গোষ্ঠী নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ হত্যা খুন জখমের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। বর্ধমানে এক তরুণ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়কে হঠাৎ একদল তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছুরি মেরে হত্যা করল। কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলেও অনুরূপ হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

ওয়াঞ্চু কমিশনের রায় প্রকাশ হওয়ার পর দুই মন্ত্রীর পদত্যাগ কংগ্রেসী রাজনীতি জটিল করে দিয়েছে। একদিকে বিদায়ী মন্ত্রী সন্তোষ রায়ের অনুগামীরা কুচবিহারে সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে কমিশনের মন্তব্য মেনে নিতে পারে নি। অন্যদিকে ওঁর বিরোধীরা সন্তোষবাবুর পদত্যাগে উল্লসিত হয়ে বাজী পুড়িয়ে, উৎসব করেছে।

রাজ্য সরকারের কাছে এবং খোদ সিদ্ধার্থবাবুর কাছে সন্তোষবাবু অভিযোগ করেছেন যে, কুচবিহারে তাঁর অনুগামীদের পুলিশ বেছে বেছে গ্রেপ্তার করছে। ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসীরা পুলিশের ওপর যা হুকুম করছে পুলিশ সেই অনুযায়ী কাজ করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই হঠাৎ বীভৎস খুনের ঘটনা ঘটে গেল। যুব কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর একজন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে অফিস থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হোল। এর বদলা খুন হবেই। কারণ অপর পক্ষ চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয়।

সিদ্ধার্থবাবুর কাছে রাজ্য কংগ্রেসে গোষ্ঠী কোন্দল কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। বরং গোষ্ঠী কোন্দল বজায় থাকলে তাঁর নেতৃত্ব অপরিহার্য থাকে। আর সবাই এক হলে ওঁর মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে টানাটানি হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ, রাজ্য কংগ্রেসের দুই বিবদমান গোষ্ঠীর উচ্চ পর্যায়ের নেতারা প্রকাশ্যে এবং গোষ্ঠী সভায় সিদ্ধার্থবাবুর আচার আচরণ, নৈতিক সততা এবং রাজনৈতিক শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে জোরালো ভাষায় সমালোচনা করে। এই সব কথাবার্তা কি ধরণের তা সিদ্ধার্থবাবুর অজ্ঞাত থাকার কথা নয়।

কংগ্রেসের কয়েকজন স্থানীয় নেতা অভিযোগ করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী সি পি এমকে যে ভাবে কাবু করেছেন সেই এক কায়দা প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন তাঁর সমালোচকদের বিরুদ্ধে। অনেকে যাঁরা নিহত হচ্ছেন তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে গোষ্ঠী কোন্দলের বলি হিসেবে বর্ণিত হলেও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, তাঁদের অনেককেই একটি বিশেষ বাহিনী টারগেট করে হত্যা করছে। এই বিশেষ বাহিনী পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একটি গুপ্ত ষড়যন্ত্রের অংশ বিশেষ।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন

আবশ্যিক সঞ্চয় আইন বাতিল, কাটা মহার্ঘভাতা ফেরত, প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা সম্পূর্ণ নগদে প্রদান এবং রেল ও কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর থেকে বরখাস্ত-আদেশ, সাসপেনসন ও যথেচ্ছ বদলীর আদেশ সহ সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের কনফেডারেশনের ডাকে ও কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ-র উদ্যোগে গত একত্রিশে জানুয়ারী বিকেলে এসপ্লানেড ইস্টে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। পুলিশ ধর্মঘারীতি কর্ডন সৃষ্টি করলে মিছিলকারীরা রাস্তার ওপর বসে পড়ে পথসভা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডাক-তার কর্মচারী আন্দোলনের নেতা শিশির ভট্টাচার্য।

শ্রীভট্টাচার্য বলেন যে, সুসংহত এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই চক্রান্তকে রুখতে হবে।

আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী বর্ণনা করে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপেন ঘোষ বলেছেন, সমস্ত দাবী দাওয়া আদায়ের সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ও পার্লামেন্ট খোলার দিন দিল্লীতে পার্লামেন্টের সামনে কেন্দ্রীয় গণবিক্ষোভ এবং দেশের অন্যত্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হবে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে দেশের সমস্ত অফিসে ও দপ্তরে গণঅবস্থান করা হবে। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে জাতীয় কনভেনশন থেকে ওয়ার্ক-টু-রুল বা অন্য কোন দুঃসহতর আন্দোলনের কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক কারসাজিতে বেশী জমির মালিকরা লেভি ফাঁকি দিচ্ছে।

অল্প জমির মালিকদের ওপর জুলুম

(দর্পণের সংবাদদাতা)

খাদ্যনীতি ঘোষণার পর বাজারী প্রচারকরা ঢাক ঢোল পিটিয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে জানাতে কসুর করলোনা যে, এবার সরকার কঠোর হাতে লেভি আদায়ে বদ্ধপরিকর এবং মন্ত্রিসভার বড় মেজ ছোটদের লেভি আদায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সচিত্র গালগপ্পো তৈরী করেও তারা চমক সৃষ্টি করলো। বাজারী ট্যাণ্ডেলরা এখন কিন্তু আর সে পথে এগোতে ভরসা পাচ্ছে না কারণ সপারিষদ বচন ফকির সিদ্ধার্থশঙ্কর ইতিমধ্যেই লেভি আদায়ের প্রহসন পর্বে হাসির পাত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছেন। খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধসেরী বৈষ্ণব মন্ত্রীতো প্রভুর দেশে গিয়ে মিসিসিপির জলে গা ভিজিয়ে শুদ্ধ হয়ে এলেন। এখন তিনিও আর হম্বিতম্বি বড় বেশী করছেন না।

সম্প্রতি তিনি গাড়ী করে যখন জি টি রোড ধরে যাচ্ছিলেন তখন তার দৃষ্টিতে পড়ে যে একটি গ্রামীণ তরুণ মণখানেক ধান বোঝাই বস্তা সাইকেলে নিয়ে যাচ্ছে। "দেশপ্রেমিক" মন্ত্রী কি আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন। গাড়ী থামিয়ে ধরা হল সাইকেল আরোহীকে। অভিযোগ, সে কর্ডন ভেঙে ধান পাচার করছে। আরোহীর বক্তব্য যে, সে অল্প কিছু ধান নিয়ে হাস্কিং মিলে যাচ্ছে ভানাতে। প্রফুল্লবাবুর মত করিৎকর্মা হাফ মন্ত্রী কি আর এসব ছোটলোক বজ্জাতদের কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেন? আরোহীকে যথারীতি পাণ্ডুয়া থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কর্ডনের প্রহসন চলছে ভালভাবেই। পুলিশ আর হোম গার্ডের পোষাক পরা কংগ্রেসী ঠ্যাঙারেদের দৈনিক আয় হচ্ছে বেশ ভালই, তদুপরি চালটাও কিনতে হচ্ছে না, কারণ ছিনিয়ে নেওয়া চালের ভাগেই দিনের খরচটা ভালভাবেই চলে যায়।

রেলপথে মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোতে বস্তা বস্তা চাল পাচার হচ্ছে। সেখানে হাত দেবার উপায় নেই কারণ সেক্ষেত্রে দেনা পাওনা চলে একটু উচ্চ পর্যায়ে। তাই, আক্রমণটা লোকাল ট্রেণে এক থেকে পাঁচ কিলো চালের ওপর। চাল ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু সরকারী ভাণ্ডারে তার শতকরা পাঁচ ভাগও জমা পড়ছেনা। পুলিশ এবং হোমগার্ডদের দৈনিক খোরাকীর পরিমাণ বন্টনের পর বাকীটা ঢালাও দরে বিক্রী করা হচ্ছে চোরাবাজারী ব্যবসায়ীদের কাছে। এই ক্রিয়াবিধি হাওড়া শিয়ালদা লাইনে "প্রকাশ্য গোপন" (ওপেন সিকরেট) খবরের পর্যায়ভুক্ত। লেভির ঢক্কানিনাদের অন্তরালে মুনাফা শিকারীদের হাতে মুনাফামৃগয়ার ধারালো তীরতো সিদ্ধার্থ-প্রফুল্লকান্তিরা আগেই তুলে দিয়েছেন। চালকল মালিকরা লেভির পরিমাণ বহির্ভূত চাল যে কোন দরে বিক্রীর ঢালাও ছাড়পত্র পেয়েছে, যার ফলে তারা সরকার নির্দিষ্ট দর থেকে বেশী দামে ধান কিনে মজুদ করে যেখেলেছে। ফুড করপোরেশনের এজেন্টরা তাই চাষীদের কাছ থেকে ধান প্রায় পায়ইনি বলা চলে। এর ফলে ইতিমধ্যেই চালের বাজার বাড়তে শুরু করেছে। এমনকি, উদ্বৃত্ত জেলা বর্ধমানের অন্যতম চালের আড়ত রসুলপুরেও গত এক সপ্তাহে চালের দাম কিলো প্রতি দশ থেকে পনেরো পয়সা বেড়ে গিয়ে দুই টাকা ষাট থেকে সত্তর পয়সায় দাঁড়িয়েছে। হুগলী-বর্ধমান সীমান্তেও তা-ই।

লেভি ফাঁকির পথ উন্মুক্ত

লেভির কাজ কর্ম "বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো" কায়দাতেই এগোচ্ছে। বলা হয়েছে, চার একরের বেশী জমির অধিকারী হলেই লেভি দিতে হবে। লেভি ধার্য হচ্ছে মৌজা হিসাবে। বস্তুতঃ, জমির মালিকদের জেলাওয়ারী তথা রাজ্যওয়ারী রেকর্ড না থাকায় সরকারী সিদ্ধান্তের ফাঁক দিয়ে বাস্তুঘুঘুরা বেরিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরা যাক, কোন ব্যক্তির গোটা জেলায় পঁচিশ বিঘা জমি আছে। কিন্তু, একটি মৌজায় পাঁচ একর এবং অন্যান্য মৌজায় ৪+৪+৪+৩+৩+২ একর জমি আছে। যেহেতু চার একরের বেশী হলেই লেভি দিতে হবে সেইহেতু ঐ ব্যক্তি পাঁচ একরের জমির ওপর লেভি দিয়েই খালাস। প্রশাসনিক অপদার্থতার ফাঁকে এই বৃহৎ জমির মালিক বিশ একর ছাড় পেয়ে গেল। যুক্ত ফ্রন্টের আমলে প্রয়াত হারেকৃষ্ণ কোঙারই প্রথম এই ফাঁকির পথ বন্ধ করে প্রত্যেকের নামে জেলাওয়ারী ও রাজ্যওয়ারী রেকর্ড প্রণয়ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের মরণপণ লড়াইয়ের এটি ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। বাঘা বাঘা জমির মালিকরা কাগজে কলমে জমি ভাগ করে দিয়েছে পুত্র কলত্রের মধ্যে। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা দেখা হচ্ছে না তা হচ্ছে প্রত্যেক ভাগীদারের নামের আলাদা জে এল আর ও খারিজ, রেশন কার্ড এবং অঞ্চল পঞ্চায়েতের ট্যাক্স এর রসিদ।

অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, বৃহৎ জমির মালিকরা লেভি ফাঁকি দেওয়ার জন্য আপাতদৃষ্টিতে জমি ভাগ-বাটোয়ারা করলে ও কার্যতঃ সবাই একান্নভুক্ত। আসলে তহশীলদাররা বি ডি ও অফিসে যে জমির পরিসংখ্যান দিচ্ছে তা-ই চরম সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হচ্ছে। পরিগণিত হচ্ছে। উল্লেখ করা দরকার যে, তহশীলদারদের হাতে জমির পরিমাণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় তারা ক্ষমতার অসদ্ব্যবহারতো করছেই, উপরন্তু এই সুযোগে হাজার হাজার টাকা কামিয়েও নিচ্ছে। এইসব দুর্নীতিপরায়ণ কিছু কর্মচারীর অবর্ণনীয় অত্যাচারের ফলেই আসল লেভির দাতারা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে এবং মধ্যচাষী এমনকি গরীব চাষীর ওপর অকল্পনীয় লেভী ধার্য হচ্ছে। এই সব অসাধু কর্মচারীদের শয়তানীর ফলে এমন লোকের ওপরও লেভি ধার্য হয়েছে যে অনেকদিন আগে মৃত এবং মৃতের যে বংশধরেরা বর্তমানে জমি ভোগ করবে তার পরিমাণ এক একরও নয়।

এই নোটিশটি জারী হয়েছে হুগলী জেলার পোলবা থানার বাসুদেবাটি মৌজার মালীপাড়া গ্রামের মৃত গদাধর পালের পিতা মৃত সতীশ পালের নামে। লেভির পরিমাণ আট কুইন্টাল। আগেই বলেছি পাল বংশধরদের বর্তমানে জমির পরিমাণ এক একরও নয়। মজার কথা হচ্ছে যে, অপদার্থ তহশীলদার এসব খবর নেবার ও প্রয়োজন মনে করেনি। তালান্ডু গ্রামের বিশিষ্ট বর্ষীয়ান পল্লীবাসী শ্রীসন্তোষ সরকার এবং মালীপাড়া গ্রামের জনৈক শিক্ষক শ্রীভোলানাথ ঘোষ রসিকতা করে বললেন, "সতীশ পাল কি ত্রিবেণী শ্মশান থেকে উঠে এসে সিদ্ধার্থ রায়কে লেভি দেবে" অবাক হবার কথা যে, এই মালীপাড়া গ্রামেরই সাধন পালের জমির পরিমাণ প্রায় তিরিশ একর, কিন্তু তার ওপর লেভি ধার্য হয়েছে মাত্র আট কুইন্টল। লেভি নোটিশের যে শুনানী হল তাতে লেভির পরিমাণ যেখানে বেশী হয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে তা কিছু কমানো হলেও যেখানে লেভির পরিমাণ অস্বাভাবিক কম ধার্য করা হয়েছে সেখানে পরিমাণ বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই আসেনি।

অতএব, অসংখ্য সাধন পালেরা কিছু নগদ বিদায়ের কৌশলে লেভি ফাঁকি দিচ্ছে, উপরন্তু, লেভি নোটিশের শুনানী ও প্রহসনে পরিণত হয়েছে। শুনানীর ফলে কারও কারও লেভির পরিমাণ কমলেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা আবার নোটিশ জারী করে পূর্বনির্দ্ধারিত পরিমাণই জারী করেছে। ফলে, রাঘব বোয়ালরা ছাড় পেলেও মধ্য চাষী ছাড় পেলো না। প্রসঙ্গত, একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি। বীরপালা গ্রামের মুন্সী নরুল হকের জমির পরিমাণ চার একরের কিছু বেশী কিন্তু লেভির পরিমাণ পনেরো কুইন্টল। শুনানী হলে সেটা কমে হয় আট কুইন্টল।

ম্যাজিস্ট্রেটের নতুন আদেশের ফলে এখন নরুল হককে পনেরো কুইন্টল দিতে হবে। এই হচ্ছে লেভি প্রহসনের আসল চেহারা। প্রশাসনিক কারসাজিতে এভাবেই বেশী জমির মালিকরা লেভি ফাঁকি দিচ্ছে এবং অল্প জমির মালিকরাই পরিণত হচ্ছে আসল শিকারে।

অন্যদিকে চালকল মালিকদের এবার পোয়াবারো। ইতিমধ্যেই খোলা বাজারে চালের দাম উর্ধমুখী। তাই, একত্রিশে জানুয়ারী তারিখে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আহূত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বৈঠকে মধ্য এবং গরীব চাষী ঠ্যাঙানোর নতুন পন্থা হয়তো উদ্ভাবিত হয়েছে কিন্তু আসল লেভির পরিকল্পনা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে।

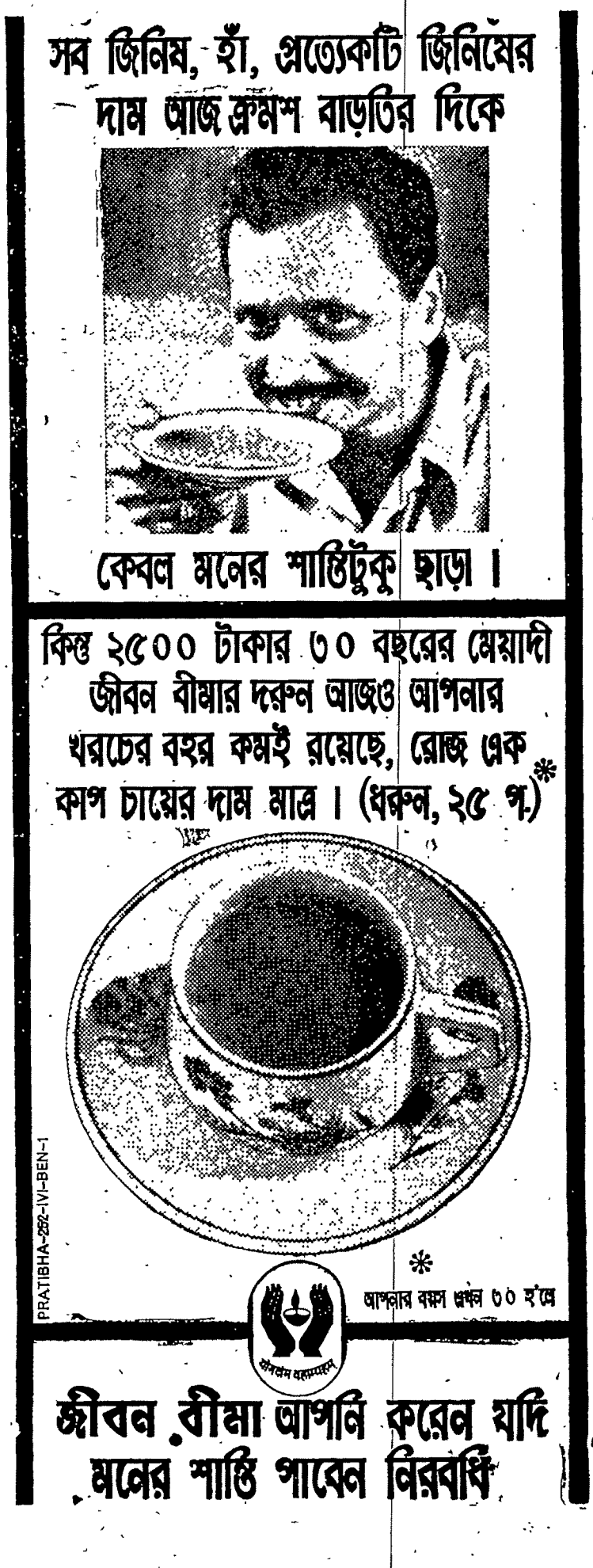

শিক্ষার ওপর সাবিক আক্রমণ

মদনমোহন চন্দ্র

যেদিন হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, সেদিন শুরু হয়েছিল শিক্ষার ওপর প্রথম আক্রমণ। মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা—এই জাতীয় চমকলাগানো তত্বকথার আবরণ দিয়ে চালু করা হয়েছিল হায়ার সেকেণ্ডারী শিক্ষা। নূতন ব্যবস্থা প্রচলনের নামে এমন পাঠক্রমের বোঝা চাপানো হয়েছিল, যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে আয়ত্ত করা ছিল অসম্ভব। এই ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে শিক্ষার্থীরা ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলো শিক্ষাবিরূপ। ক্ষেত্র বুঝে অদৃশ্য শক্তি তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে সহজে কিস্তিমাৎ করার পথে চালিয়ে দিল—শুরু হয়ে গেল দেশজুড়ে সর্বত্র পরীক্ষায় ব্যাপক নকল। বর্তমানে নকল করে পরীক্ষা-পাস করার, অর্থাৎ না শিখে শিক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থাটা আমাদের দেশে বেশ স্থায়ী হয়ে গেছে।

আক্রমণের প্রথম পর্যায় এখানে শেষ। দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়েছে চুয়াত্তর সাল থেকে। এবারের ওয়ারক্রাই হচ্ছে হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থার অনেক দোষ, স্কুল ফাইনাল ব্যবস্থাই ভাল, অতএব মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনরায় ঢেলে সাজানো দরকার। আবার নূতন পাঠক্রম, আগাগোড়া নূতন বই। বইয়ের ব্যবসায়ে সুদিন শুরু হয়েছিল হায়ার সেকেণ্ডারী চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা অব্যাহত গতিতে তো চলছেই, তার সঙ্গে কাগজের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরাও লুণ্ঠনের মহোৎসবে যোগ দিয়েছেন।

এবার শিক্ষা-সংহারকরা এক অভিনব আক্রমণ কৌশল নিয়েছেন। একদিকে পাঠক্রমকে রাখা হয়েছে সমান ভারী (বিজ্ঞানের বাহাদুরির কথা উল্লেখযোগ্য), অপর দিকে স্কুলে যাতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা অচল হয়ে যায় তার জন্য ওয়ার্ক এডুকেশন ও ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে বেজায় মাতামাতি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুলে ওয়ার্কশপ খোল, চাষ কর, বাগান কর, হাঁস-মুরগী পোষ, স্কুলবাড়ি ধোয়ামোছা কর, সাজাওগোছাও—এই হচ্ছে ওয়ার্ক এডুকেশন সম্পর্কিত নির্দেশ। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে এর জন্য। এই সব কর্মে বোর্ডের সহযোগী হচ্ছে কংগ্রেসী শিক্ষক-সংগঠন "পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি।"

তাহলে স্কুলে পড়ানো হবে কখন তার দরকার নেই, কারণ পড়ানো ছাড়াই যাতে ছেলে-মেয়েরা সরাৎ করে পাস করে যায় তার ব্যবস্থাও বোর্ড করছে। প্রতি বিষয়ে শতকরা কুড়ি নম্বর পেলেই পাস।

প্রথম আক্রমণের নায়ক ছিলেন ডক্টর ডি এম সেন। দ্বিতীয় আক্রমণ পরিচালনার নায়ক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বোর্ডের সভাপতি। ভদ্রলোক জেলায় জেলায় সেমিনার করে বেড়াচ্ছেন, বাছাই করা স্কুলের হেডমাস্টারদেরকে ডাকা হচ্ছে, যাঁদেরকে "ডাকা উচিত নয়" তাঁদেরকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, সভাপতি মশাই ঐসব সেমিনারে ওয়ার্ক এডুকেশনের মহাত্ম্য বোঝাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন কলকাতা থেকে বাছাই করা সংবাদপত্র প্রতিনিধি, সঙ্গে সঙ্গে চলছে রেডিওতে সংবাদ-প্রচার।

এদিকে জানুয়ারী শেষ হতে চললো। নূতন পাঠক্রম অনুযায়ী নূতন বই কবে পাওয়া যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, কত যে তার দাম হবে তাও বোর্ড জানে না। অভিভাবকরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। অর্থাভাবে অনেকে বই কিনতে পারবে না। গত বছর বোর্ডের প্রকাশিত ইংরেজি বইয়ের অভাবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়েছে। সরকারী বইয়েরও কোনো পাত্তা নেই।

গোড়ায় বজায় রাখা হয়েছে পঙ্গু প্রাথমিক শিক্ষা। যাকে বলে "থ্রি-আরস্" (3Rs), অর্থাৎ পড়তে লিখতে ও অঙ্ক কষতে শেখা, সেটুকুও না শিখে ছেলে-মেয়েরা আসছে হাই স্কুলে। তাদেরকে নিয়ে বিশালায়তন ক্লাসে নাকানিচুবানি খাচ্ছেন শিক্ষকরা। তার উপর দুটি উপসর্গ—বই নেই, এবং ওয়ার্ক এডুকেশন।

ক্লাইভ যেমন কাজ হাসিল করার জন্য জগৎশেঠ মিরজাফর প্রমুখকে পেয়েছিল, তেমনি এ যুগেও শাসকশ্রেণীর মতলব হাসিল করার জন্য লোকের অভাব হয় না। বেশ সুদক্ষ লোকই তারা পায়।

যে কোনও দিনই সঞ্চয়ের দিন যদি.....

আপনি সঞ্চয় করবেন বলে মনস্থির করেন। আর সেটা মাস পয়লায় মাইনে হাতে পেলে শুরু করা যায়। তবে মনস্থির করতে না পারলে মাইনের টাকা হাতে আসলেই খরচ হয়ে যায়।

সঞ্চয় করতে যখন মনস্থ করবেন (সেটা এখনই করা সব চাইতে ভালো নয় কি?) তখন ডাকঘরের রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউণ্টের কথাটা ভেবে দেখবেন। মাসে মাসে মাত্র দশ টাকা করে জমালে, তা পাঁচ বছরে বেড়ে 750 টাকায় দাঁড়াবে। তাতে চক্রবৃদ্ধি সুদের হার দাঁড়াচ্ছে 9.25%।

আর আপনি একটানা দু'বছর যদি নিয়মিত সঞ্চয় করে যান তাহলে আপনার টাকা বীমার মত সুরক্ষিত থাকতে পারে এমন ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। তা হ'ল অ্যাকাউণ্ট হোলডার বা জমার খাতার মালিকের অসময়ে মৃত্যু ঘটলে বাকী কিস্তির টাকা আর জমা না পড়লেও 750 টাকা অক্ষত থাকবে।

বিশদ জানতে হলে:

নিকটতম

ডাকঘরে গ্রাম্য বিন

কিংবা

ন্যাশনাল সেভিংস অর্গানাইজেশন

পোস্ট বক্স নং 96

নাগপুর

(Advp 74/309

দর্পণ অফিসে হামলার নিন্দা

গত চোদ্দই জানুয়ারী দর্পণ পত্রিকা অফিসে ছাত্র পরিষদ সমর্থকদের হামলার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপেন ঘোষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন ঃ

সাপ্তাহিক দর্পণ পত্রিকার ওপর সম্প্রতি ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসী গুণ্ডাদের আক্রমণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটি প্রধান স্তম্ভ; কিন্তু "বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র"-এর দ্রষ্টা বলে যে শাসকগোষ্ঠী দাবী করে তারা সেই স্বাধীনতা হরণের জন্য আজ সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে তাদের গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিচ্ছে, অথচ এরাই "দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে "গণতন্ত্র রক্ষার" সংগ্রামের জন্য তারস্বরে চীৎকার করছে। প্রকৃতপক্ষে, শাসকগোষ্ঠী সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট যতই ঘনীভূত হচ্ছে এবং এই সংকটের বিরুদ্ধে, শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক এই সংকটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে যতই শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে, ততই শাসকগোষ্ঠীর অসহিষ্ণুতা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং তাদের নীতি ও কার্যকলাপের কোন বিরোধিতাই তারা আর সহ্য করতে চাইছে না। দর্পণ পত্রিকার ওপর হামলা শাসকগোষ্ঠীর ক্রমশঃ প্রকটমান এই স্বৈরাচারী মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। তাই, এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গঠন আশু প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ

কলকাতার সংবাদ সাপ্তাহিক দর্পণ-এর ওপর শাসক দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের জঘন্য হামলার আমরা তীব্র নিন্দা করি। প্রত্যেক দেশেই সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরা অবধ্য দূতের মর্যাদায় অভিষিক্ত। কিন্তু, এদেশের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ায় এখন হিংস্র শ্বাপদের মত সংবাদপত্রের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এটাকে অভিশাপে অশীর্বাদ বলা যায়, কারণ এ ধরণের ফ্যাসিবাদী ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সরকার নিজেই নিজেদের কবর খুঁড়ছে। আশা করি সব সন্ত্রাস সত্বেও দর্পণ মাথা উঁচু করেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবে।

আই এন টি ইউ সি নেতা সমর চক্রবর্তী দর্পণের ওপর "গুণ্ডা" আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের প্রতিবাদ ব্যাপক ও সংগঠিত না করতে পারলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। তিনি আশা করেন যে, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনীতি সচেতন মানুষ এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে এগিয়ে আসবেন।

আলিপুরদুয়ার প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সুধীররঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন ঃ বর্তমানে সংবাদপত্র, সাংবাদিক সংবাদ-কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর প্রবণতা খুব বেড়ে যাওয়ায় গণতন্ত্রের মূলে আঘাত করা হচ্ছে। অতীতে আনন্দবাজার, সার্চলাইট, বাঙলাদেশ, সত্যযুগ প্রভৃতির ওপরে গুণ্ডাবাজী করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা খুবই ভয়াবহ। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ হামলা না হয় এবং সাম্প্রতিক দর্পণের ওপর হামলাকারীদের শাস্তির জন্য আমরা দাবী জানাচ্ছি।

এম টি পি রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, দর্পণ আক্রান্ত হয়েই প্রমাণ করেছে যে, তার সাংবাদিকতা সংগ্রামী মানুষের দাবীকেই রূপায়িত করছে এবং এই কংগ্রেসী গুণ্ডাবাজীর মধ্য দিয়ে শাসক দলের রাজনৈতিক দেউলেপনাও প্রকটতর। এ ধরণের ঘৃণ্য গুণ্ডাবাজীর প্রতিরোধে আজ সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে—দূরে দাঁড়িয়ে থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ টেকনিক্যাল সুপারভাইজার এসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী কে, কে, কে, পাণ্ডে বলেন, দর্পণ যেহেতু সংগ্রামী মানুষের মুখপত্র সেইহেতু এই কাগজের ওপর কংগ্রেসী গুণ্ডাদের আক্রমণ গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ। সংগ্রামকে তীব্রতর করেই এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হবে।

অল ইণ্ডিয়া লোকো রানিং ষ্টাফ এসোসিয়েশনের ইষ্টার্ন রেল জোনাল কমিটির সম্পাদক পি কে দত্তগুপ্ত বলেন, কংগ্রেস সরকারের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তাই বশম্বদ সংবাদপত্রগুলোকে দিয়ে প্রতিনিয়ত মিথ্যাপ্রচারই ওদের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। দর্পণ সেই দালাল শিবিরে যায় নি বলেই ওর কণ্ঠরোধের জন্য শাসকদল নির্লজ্জভাবে এই আক্রমণ চালিয়েছে। আজকের প্রতিরোধ শুধু দর্পণের ওপর হামলার বিরুদ্ধে নয়, আজকের প্রতিরোধ নির্দেশিত হবে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে। অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তিদানের দাবী জানাবো না, কারণ সরকার নিজেই

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

প্রজাতন্ত্রের নাভিশ্বাস

কপিল রায়

নতুন দিল্লী, তিরিশে জানুয়ারী ঃ গত ছাব্বিশে জানুয়ারী এখানকার বিশেষভাবে সুসজ্জিত "রাজপথে" সরকারীভাবে ও রাজকীয় সমারোহে উদ্‌যাপিত হল প্রজাতন্ত্র দিবসের রজতজয়ন্তী বার্ষিকী। বর্ণাঢ্য আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল সামরিক কুচকাওয়াজ আর রাষ্ট্রপতি শ্রীফখরুদ্দিন আলি আমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করলেন। কয়েক-হাজার আমন্ত্রিত বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারী পদাধিকারী এবং আরও কয়েক হাজার টিকিটক্রয়কারী দর্শক বিশেষভাবে নির্মিত ও সংরক্ষিত বেষ্টনীতে বসে এই অনুষ্ঠান দেখলেন। "ইতরজনদের" স্থান ছিল সংরক্ষিত এলাকার বাইরে, পথের ধারে। বিদেশের যাঁরা এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কোণ্ডা ও তাঁর স্ত্রী মিসেস বেটী কোণ্ডা, অষ্ট্রেলিয়ার বিদেশবাণিজ্যমন্ত্রী মিঃ এফক্রীম, সুইডেনের প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল ক্যারী এরিক এল্‌মগ্রেণ, ইরাণের ইকনমিক এ্যাফেয়ার্সের উপমন্ত্রী মিঃ আহমদ কৌরস, ওপেক-এর সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ আলি আট্টিগা, ইরাকের উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মন্ত্রী মিঃ ঘনিম আবদুল জলিল ও বাংলাদেশের ডেপুটি চীফ অব আর্মি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। গত কাল সন্ধ্যায় "বীটিং রিট্রিট" অনুষ্ঠানে বাদ্যসঙ্গীতের শেষে পাঁচ মিনিটস্থায়ী বর্ণাঢ্য আতসবাজীর ও মশালের রঙ্গীন আলোকবিচ্ছুরণের ভেতর দিয়ে এই বাৎসরিক সমারোহের অবসান ঘটে। এই সব অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রাষ্ট্রপতি ছয়-ঘোড়ায় টানা সুসজ্জিত গাড়ীতে এসে থাকেন এবারেও তাই এসেছিলেন।

এবারের ছাব্বিশে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসের রজতজয়ন্তী হলেও অনেকেই প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ছাব্বিশে জানুয়ারীর কথা স্মরণ করেছেন। তাঁদের অনেকেরই জিজ্ঞাসা যে লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে উনিশশো তিরিশ সনে প্রথমে ছাব্বিশে জানুয়ারীর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল তা কি পূর্ণ হয়েছে? পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার সেই শপথ আজও যে অপূর্ণ রয়েছে তাতে অনেকেরই কোন সংশয় নেই। সেদিনের সেই অঙ্গীকারভরা দিবসকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ভারতীয় উত্তরাধিকারী কংগ্রেস সরকার রাজকীয় সমারোহের প্রজাতন্ত্র দিবস করেছেন মাত্র।

প্রজাতন্ত্র চালু হবার পরে পঁচিশটি বছর কেটে গেছে, দেশে কি সত্যি প্রজাতন্ত্রের পরিপুষ্টি ও প্রসারলাভ ঘটেছে? এ প্রশ্ন অনেকেই করছেন। এই প্রসঙ্গে অনেকেই বলছেন যে কংগ্রেসের একটানা শাসনে দেশে প্রজাতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে। নির্বাচনে কারচুপি, সরকারী পদাধিকারের অপব্যবহার, দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার বিরোধী পক্ষীয়দের কণ্ঠরোধ প্রয়াস প্রভৃতি যে সব গুরুতর অভিযোগ ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে বারবার অনীত হচ্ছে তাকে এঁরা শাসকদলের প্রজাতন্ত্রবিরোধী অপপ্রয়াসের নজির হিসেবে দেখছেন। সংসদের বৈঠক চলাকালেও তাকে এড়িয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করার নজিরের দিকেও এই সব মহল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এই প্রসঙ্গে।

দুর্নীতির ব্যাপকতা যে কেমন প্রসার লাভ করেছে তার কিছুটা আভাস মেলে এবারের প্রজাতন্ত্র-দিবসে কংগ্রেস দলভুক্ত লোকসভা সদস্য শ্রীশম্ভুনাথ মিশ্র রাষ্ট্রপতি শ্রীআমেদকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে, শ্রীমিশ্র লিখেছেন ঃ

"আমরা একটি শতাব্দীর একচৌথ পূর্ণ করলাম। কিন্তু যে দিন আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্র শুরু করেছিলাম তার থেকে আজ দেশ পঁচিশ গুন না হলেও অন্তত পাঁচ গুন বেশি দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। গোটা দেশে দুর্নীতি আজ একটা ক্লাই বা জনরক্ষ বা রাজনৈতিক বাণী হয়ে উঠেছে এবং অচিরে এর প্রতিবিধান না করলে দুর্নীতি দেশের গইতন্ত্রকেই বানচাল করতে বাধ্য। আর আমরা কোন দিনই সমাজবাদের স্বপ্নও দেখতে পাব না।"

স্মরণীয় এই যে শ্রীমিশ্র গত বছরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদকে তাঁর (শ্রীআমেদের) বিষয়সম্পত্তির বিবরণ সাধারণে ঘোষণা করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে একাধিক চিঠি লিখলে অধুনালুপ্ত কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট ফোরামের সদস্যরা শ্রীমিশ্রকে পার্টি থেকে বিতাড়িত করবার দাবি তুলেছিলেন। শ্রীআমেদ গোড়াতে শ্রীমিশ্রের চিঠিগুলির কোন জবাব দেন নি। পরে শ্রীমিশ্র শ্রীআমেদের বিষয়সম্পত্তি সম্পদাদির আনুমানিক মূল্য পঞ্চাশ লাখ টাকা বলে একটি বিবৃতি দিলে শেষ পর্যন্ত শ্রীআমেদ একটি বিবৃতি দিয়ে জানান যে তাঁর বিষয়সম্পত্তি-সম্পদাদির মূল্য ছয় লাখ টাকা। লোকসভায় এই প্রসঙ্গ উঠলে শ্রীপিলু মোদী শ্রীআমেদের এখনকার গলফলিঙ্কস্থ বাড়ীখানিকেই ছয়লাখ টাকা দিয়ে কেনবার প্রস্তাব লোকসভায় রেখেছিলেন। এ প্রস্তাবের কোন উত্তর শ্রীআমেদের কাছ থেকে এখনও পাওয়া যায় নি।

আরও স্মরণীয় এই যে প্রধানমন্ত্রীকেও শ্রীমিশ্র একাধিকবার এই মর্মে চিঠি লিখেছেন যে কেন্দ্রীয় সকল মন্ত্রীদের বিষয়সম্পত্তিসম্পর্কিত যে বিবরণই প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয় তা অচিরে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা দরকার। লোকসভায়ও শ্রীমিশ্র বিগত বৈঠকে এই দাবি তুলেছিলেন। লবী মহলে শোনা যাচ্ছে যে বাজেট অধিবেশন শুরু হবার আগে এই সব বিবরণ প্রকাশ করা না হলে শ্রীমিশ্র তাঁর সংগৃহীত বিবরণাদি প্রকাশ করে দেবার কথাও প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। শ্রীমিশ্র শ্রীমতী গান্ধীকে আরও জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী যদি নিজে হাতে লিখে তাঁকে (শ্রীমিশ্রকে) জানান যে তাঁর (শ্রীমিশ্রের) পক্ষে এ ধরণের আন্দোলন করা ঠিক নয় তাহলে তিনি (শ্রীমিশ্র) আর এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করবেন না। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কোন জবাব না পেলে শ্রীমিশ্র কি করবেন তা এখন সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে শ্রীমিশ্র যদি কোন বিবরণ প্রচার করেন তা হলে তাকে খণ্ডন করবার জন্য শ্রীআমেদের মত পদক্ষেপ অন্যদেরও করতে যে হবে তাতে এখানে কোন সংশয় নেই।

ছাব্বিশে জানুয়ারীর এই চিঠিতে শ্রীমিশ্র বলেছেন যে নিজেদের বিষয়সম্পত্তির বিবরণ ঘোষণা না করে অন্যদের সম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে বা তার উচ্চতমসীমা বেঁধে দিয়ে দেশে সমাজবাদ আনা যাবে না। বস্তুত জনপ্রতিনিধি হিসেবে, প্রশাসনিক নেতা হিসেবে নিজেদের বিষয়সম্পত্তির বিবরণ আগে ঘোষণা না করে অন্যদের সম্পত্তির সীমা বেঁধে দেবার কোন অধিকার কারুর থাকতে পারে না। বিষয়সম্পত্তির প্রকাশ্য ঘোষণাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য শ্রীমিশ্র অচিরে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে নির্বাচন বিষয়সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় বেরুবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে অর্ডিন্যান্স জারী করা গেলেও সর্ববিধ্বংসী দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য নেতৃত্বের কেউ তাঁর কথায় কান দিলেন না, অভিযোগের সুরে বলেছেন শ্রীমিশ্র। তবে তাঁর ধারণা এখনও এটি না করা হলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে।

তাই শ্রীমিশ্র অনুরোধ করেছিলেন যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে এবারের প্রজাতন্ত্র-দিবসে রাষ্ট্রপতি শ্রীআমেদ শ্রীমিশ্রের অনুরোধ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় অর্ডিন্যান্স জারী করবেন। শ্রীমিশ্র মনে করেন যে এই অর্ডিন্যান্সে দুইটি বিশেষ ধারা থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

(ক) এই অর্ডিন্যান্স জারী হবার এক মাসের মধ্যেই প্রত্যেক সংসদ, আইনসভা ও পরিষদের সদস্যকে সরকারী পদাধিকারী, পাবলিক সেকটর ও স্থানীয় সংস্থাদির পদাধিকারীকে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রিত বা অধিকারভুক্ত যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে। এ ধরণের ঘোষণাকে সাধারণ (পাবলিক) দলিল হিসেবে গণ্য করা হবে এবং নামমাত্র মূল্য দিয়ে যে কেউ তার নকল নিতে পারবেন।

(খ) এ ধরণের প্রকাশ্য ঘোষণায় বিচ্যুতি ঘটলে অথবা মিথ্যা ঘোষণা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা তিনি যে কোন পদের অধিকারীই হোন না কেন —আপনা থেকেই সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা সাসপেণ্ড হয়ে যাবেন। পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে ঘোষণা না করলে তাঁর পদটি শূন্য বলে বিবেচিত হবে এবং চিরদিনের মত তার পক্ষে কোন পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ হবে।

কংগ্রেস পার্টি যে শ্রীমিশ্রের মতকে সমর্থন করবেন এমন কথা এখানে কেউই মনে করেন না। কারণ এখনকার সচেতন রাজনৈতিক মহলের এই ধারণা যে বর্তমানে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে কংগ্রেসের কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না। তাই শ্রীমিশ্র এর পরে কি করেন সেটি দেখবার জন্যই তাঁরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

রাজধানী দর্পণ

মার্কিণ মুল্লুকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আবার জঘন্য খেলা খেলতে শুরু করেছে। প্যারিস শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউ সরকার গণতান্ত্রিক ভিয়েতনামকে (উত্তর ভিয়েতনাম) ক্রমাগত আক্রমণ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষ তাঁবেদার থিউ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত, থিউর ভাড়াটে বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার বহু অঞ্চল মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। এখন দক্ষিণ ভিয়েতনামের খবর যে, থিউ প্রশাসন নানা জায়গায় ভেঙ্গে পড়ছে। থিউকে বাঁচানোর জন্যে মার্কিন প্রশাসন এগিয়ে এসেছে। এখন আবার ত্রিশ কোটি ডলারের অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য দিয়ে জনগণ থেকে পরিত্যক্ত থিউকে চাঙ্গা করার চেষ্টা হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধের নীতি নিয়েছে। প্যারিস চুক্তির পর থেকে এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাম্বোডিয়ায় মার্কিন তাঁবেদার লন নল ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউকে ছশ কোটি ডলার অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য দিয়েছে। থিউ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে বে-পরোয়াভাবে জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

মুক্তি ফৌজ সায়গনের ৮৮ কিলোমিটার উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ শহর তে নিন দখল করে নিয়েছিল। মার্কিন সরকারের সাহায্য ঘোষণায় থিউ উৎসাহিত হয়ে কয়েকদিন আগে বিমান হানা সংগঠিত করে। কিন্তু ভিয়েতনামের বিপ্লবী শক্তি তাদের সেই আঘাত প্রতিহত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে যুদ্ধের অবস্থা জীইয়ে রাখছে। এর বিরুদ্ধে শুধু অ-মার্কিন মানুষ নয়, খাস মার্কিন মুল্লুকেও প্রতিবাদের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

সাতাশে জানুয়ারী, সানফ্রান্সিসকোতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের কনসুলেট অফিসের সামনে ভিয়েতনাম যুদ্ধফেরৎ মার্কিনীরা প্রবল বিক্ষোভ ফেরৎ মার্কিনীরা প্রবল বিক্ষোভে বিরুদ্ধে নানা ধ্বনি দেন। এমন, কি বিক্ষুব্ধ মানুষ কিছুক্ষণের জন্য কনসুলেট অফিসটি দখল করে নেয়। "আর যুদ্ধ নয়", "খুনী থিউ দূর হটো" স্লোগানে আকাশ গমগম করে। ক্ষুব্ধ সৈনিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে একজন আহত হয়। পুলিশ অবশেষে আঠারোজন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিনবাসীরা ঘৃণা প্রকাশ করেন কনসুলেটের জানালা ইত্যাকার ভাঙচুর করে।

সম্প্রতি গণতান্ত্রিক ভিয়েতনামের (উত্তর ভিয়েতনাম) সরকারী পত্রিকা নানদান ফোর্ডকে ভিয়েতনামে যুদ্ধ জীইয়ে রাখার জন্য অভিযুক্ত করে। পত্রিকায় অভিযোগ করা হয় যে, মার্কিন সরকার দু বছর পূর্বেও যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার প্রতিও সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ড যে নানা চুক্তিভঙ্গের কান্ড করছেন তারও উল্লেখ নানাদানে করা হয়।

ধর্মঘটোত্তর পরিস্থিতি (৩)

রেলওয়েতে ঘাটতির প্রকৃত রহস্য

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

বর্তমান সমীক্ষার পূর্বের দুই পর্যায়ে ভারত সরকারের ফ্যাসিবাদী আচরণ, এন সি সি আর এসের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং রেলের প্রশাসনিক দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছি। ভারতীয় রেল মানেই ঘাটতি। বোধহয় ভারতবর্ষের মত দেশেই সম্ভব যে, রেলে আয়ের সিংহভাগ প্রথমেই ডিভিডেন্ট খাতে টেনে নিয়ে রেল বাজেটে অসত্য ঘাটতি দেখানো হয়। সত্তর-একাত্তর সালে ঘাটতি দেখানো হলো ১৯·৮৪ কোটি টাকা। এই ঘাটতির কারণ হচ্ছে সরকার আগেভাগেই ডিভিডেন্ট নিয়ে নিলেন ১৬৪·৬৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত হল ১৪৪·৮৩ কোটি টাকা, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু কোন নীতির ধার ধারেন না সেহেতু মোট লাভের ওপর লভ্যাংশ না নিয়ে তার পাওনা মিটিয়ে নিয়ে ঘাটতি চাপালেন ১৯·৮৪ কোটি টাকা। ব্যবসায়িক নীতি অনুসারে ব্যালান্স শীটে ডিভিডেন্ট হচ্ছে লাস্ট চার্জ। কিন্তু ভারতবর্ষের রেল বাজেটে ডিভিডেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট চার্জ।

রেলের খাতে কেবলই জেনারেল রেভিনিউ থেকে লোন দেখানো হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ আয়ের পথ সংকুচিত হলেই যুক্তিসংগত হারের সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া হয়। এটাই ব্যবসায়িক নীতি। কিন্তু এদেশের সরকার এসব মানেন না। একাত্তর-বাহাত্তর বর্ষ শেষে রেলের বিভিন্ন ফান্ডে ব্যালেন্স ছিল ২৭৬·৩৭ কোটি টাকা (ডি আর এফ ১৬৭·৩৭, রেভিনিউ আর এফ ০·৩১, ডি এফ ৮·১২ এবং পেন্সেন ফান্ড ১০০·৩৩ কোটি টাকা) এবং জি আরের কাছে রেলের ঋণ ছিল ১০৬·২১ কোটি টাকা। ঋণ পুরোপুরি শোধ করেও ১৭০·১৬ কোটি টাকার থাকার কথা। এই যেখানে অবস্থা সেখানে ঋণের প্রশ্নই বা আসে কেন? জি আর থেকে রেল যে ধার নেয় সেখানে সুদ দিতে হয় শতকরা ছয় টাকা কিন্তু রেলের যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দীর্ঘ মেয়াদে গচ্ছিত থাকে তার বাবদ রেলকে সুদ দেওয়া হয় শতকরা চার টাকা। বিগত দশ বছরে রেলের আয় হয়েছে ৮৭৪২ কোটি টাকা, আর ব্যয় হয়েছে ৬১৩১ কোটি টাকা। অর্থাৎ আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা সত্তর ভাগ। বাড়তি থাকে ২৬১১ কোটি টাকা। এই টাকা থেকে জি আর ফান্ডে ডিভিডেন্ড নেওয়া হয়েছে ১৩৭৭ কোটি টাকা (আনুমানিক শতকরা ৫৩ ভাগ)। এরপরও ১২৩৪ কোটি উদ্বৃত্ত থাকার কথা।

এতদসত্ত্বেও রেলে ঘাটতি হয় কেন? এর কারণ হচ্ছে, (এক) আভ্যন্তরীণ আয়ের পথ প্রশস্ত না করা (দুই) জি আর ফান্ডে ক্রমবর্ধমান কন্ট্রিবিউশানের দাবী। রেলের ক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছাচারিতা বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। রেলের আর্থিক প্রশাসন ঘটিত অসামঞ্জস্য সম্পর্কে প্রাক্তন ফিনান্সিয়াল কমিশনার এল এস পুরী উনিশশো একাত্তর সালে মন্তব্য করেছিলেন,

"It is the time that the financial administration of the railway is once again subjected to critical expert review of a thorough going nature."

এই মন্তব্য মন্তব্যই থেকে গেছে, কারণ, সরকার এত বেপরোয়া হয়ে গেছে যে, এখন আর লাজ লজ্জার বালাইটুকুও তারা রাখতে রাজী নন। এতো গেল অর্থনৈতিক প্রশাসনের কথা। সাধারণ প্রশাসনের প্রসংগটিও একটু আলোচনা করা দরকার। প্রথমেই, গাড়ীর অনিয়মিত চলাচলের কথাটি আসে। এখানেও রেলমন্ত্রী জঘন্য মিথ্যাকথা বলেছেন। একাত্তর-বাহাত্তর-এর রেল বাজেট পেশ করতে গিয়ে তৎকালীন রেলমন্ত্রী ভূমিকা প্রসঙ্গে বললেন,

"Late running of trains are due to inefficiency of railwaymen."

এটা খুবই সুবিদিত যে, গাড়ীর অনিয়মিত চলাচলের জন্য এ এস এম, গার্ড, ড্রাইভাররা প্রায়ই ক্রুদ্ধ যাত্রীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। ধূর্ত রেল মন্ত্রীর এ ধরণের অসত্য এবং দায়িত্বহীন উক্তি সেই ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি মাত্র। অনিয়মিত গাড়ী চলাচলের মূল কারণ হচ্ছে, (এক) প্রয়োজনীয় সংখ্যার রেলের অভাব (দুই) রোলিং স্টকের অভাব (তিন) ভাঙ্গা এবং অচল যন্ত্রপাতির ব্যবহার (চার) মেনটেনেন্স অপারেশনাল কাজে অভাবনীয় ব্যয় সংকোচন। এখানে শিয়ালদা এবং হাওড়ার দুটি রেক লিংক উদ্ধৃত করছি। এগুলো ই এম ইউ অর্থাৎ ইলেকট্রিক কোচ। নিয়মিত প্রত্যেক পঞ্চাশ কিলোমিটার অন্তর এই কোচগুলো মেনটেনেন্স স্টাফ দিয়ে চেক করানোর কথা এবং প্রতি দুশো কিলোমিটার চলার পর এক ঘন্টা মুভমেন্ট গ্যাপ দেওয়া দরকার। উদ্ধৃতে তালিকাটি দেখলেই বুঝা যাবে যে, মুভমেন্ট গ্যাপ তো দূরের কথা, প্রত্যেক রেলের আপ এবং ডাউন যাত্রার পর ন্যূনতম সার্ভিসিংয়ের সুযোগও থাকেনা।

প্রথমেই শিয়ালদার ৪৪নং রেক লিঙ্ক দেখুন। একটি ই এম ইউ রেক ভোর ৪-৫২তে (ডি কে ২৩১) শিয়ালদা ছেড়ে ৫-৩২এ ডানকুনি যায়, সেখান থেকে ৫-৪৩-এ (ডি কে ২৩৪) ছেড়ে ৬-২২-এ শিয়ালদা। এখান থেকে এন ১৯ হয়ে ৬-৩২-এ ছেড়ে ৭-৩৬-এ নৈহাটি, সেখান থেকে এন ২৪ হয়ে ৭-৪৪ এ ছেড়ে ৮-৪৫ এ শিয়ালদা। এখান থেকে বি ৫ হয়ে ৮-৫৫ তে ছেড়ে ৯-৩০ এ ব্যারাকপুর, সেখান থেকে বি ৬ হয়ে ৯-৩৭ এ ছেড়ে ১০-১৭তে শিয়ালদা। আবার কে ৫৭ হয়ে ১০-৩১-এ ছেড়ে ১১-৪৯-এ কল্যাণী, সেখান থেকে কে ৫৮ হয়ে ১১-৫৭-তে ছেড়ে বেলা ১-১৫-তে শিয়ালদা। আবার ১-৪৭-এ বি ৭ হয়ে ২-২৮-এ ব্যারাকপুর। সেখান থেকে বি ৮ হয়ে ৩-৬-এ ছেড়ে ৩-৪৭এ শিয়ালদা। কে ৬১ হয়ে ৪ টায় ছেড়ে ৫-১৬তে কল্যাণী, কে ৬২ হয়ে ৫-২৪-এ ছেড়ে ৬-৪০এ শিয়ালদা, শিয়ালদা থেকে এ ৩৯ হয়ে ৬-৫৪-তে ছেড়ে ৭-৫৮-তে নৈহাটি। অর্থাৎ মুভমেন্ট গ্যাপ ছাড়াই একটি রেককে চালানো হচ্ছে এক নাগাড়ে ৭৪৬ মিনিট অর্থাৎ বারো ঘন্টারও ওপর।

হাওড়ার ৫৭ নং রেকলিঙ্কটি দেখুন। এস ও সকাল ৮-২৬ এ হাওড়া ছেড়ে শেওড়াফুলি যায় ৯-২-তে। সেখান থেকে ৯-৭-এ এস ৩৬ হয়ে ৯-৪৬এ হাওড়া। ১০টায় বি ১১৫ হয়ে ১১-৩এ ব্যান্ডেল, সেখান থেকে বি ১২৮ হয়ে ১১-২৪ এ ছেড়ে ১২-২৪ এ হাওড়া। এখান থেকে সি ২৪৯ হয়ে ১-১০এ ছেড়ে ৩-১৪ তে কর্ড লাইন হয়ে বর্ধমান। সেখান থেকে এম ২২০ হয়ে ৪-৩০এ ছেড়ে মেন লাইন হয়ে হাওড়া আসে ৬-৫২-তে। এখান থেকে আর ১৭ হয়ে ৭-৬এ ছেড়ে ৭-৪০এ যায় শ্রীরামপুর। সেখান থেকে ৭-৪৮এ ছেড়ে আর ১৮ হয়ে হাওড়া আসে ৮-২১এ। এখান থেকে সি ২৬১ হয়ে ৯-২১-এ ছেড়ে কর্ড লাইনে বর্ধমান যায়, রাত ১১-১০এ। অর্থাৎ একনাগাড়ে রেকটিকে চালানো হচ্ছে ৬৪৯ মিনিট এবং গড়ে চলছে ৫০০ থেকে ৬৫০ কিলোমিটার। রেকটি একবার মাঝপথে খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য গাড়ীগুলো মার খায়। হাওড়া কারশেডে পাঁচটি রেকও স্ট্যান্ড বাই থাকেনা। ফলে গাড়ীর অনিয়মিত চলাচলের জন্য কর্মীদের দোষারোপ করাটাও সরকারী অসদুদ্দেশ্যের আর একটি নজির।

রেলের ক্ষতির কথা প্রায়ই বলা হয়, এই ক্ষতির জন্য দায়ী কে? রেলওয়ে বোর্ডের প্রকাশিত পুস্তিকা সেন্ট্রাল ফ্যাক্টস অ্যান্ড মেজর প্রবলেমস-এ দেখা যাচ্ছে, বাহাত্তর-তিয়াত্তর-এর হিসাবে কয়লা, ওর খাদ্যশস্য, পশুখাদ্য, আখ, নুন, সব্জী, ফল বাঁশ, গুড়, চিনি, লাইমস্টোন, ডোলোমাইট ইত্যাদিকে সোস্যাল বার্ডেন বা সামাজিক দায়িত্ব নাম দিয়ে কম ভাড়ায় বহন করার ফলে ক্ষতি হয়েছে দুশ দশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। পরে এর দরুণ আরও পনেরো কোটি টাকা ক্ষতি দেখানো হয়েছে। সাকুল্যে দুশ পঁচিশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। মজার কথা এই যে, এই টাকার ওপরও কিন্তু ছয় শতাংশ অনুসারে তেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ডিভিডেন্ট নেওয়া হয়েছে। কন্টেনার সিস্টেমের দরুণ (আট কনটেনার সমান এক ওয়াগন) প্রতি ওয়াগনে তিন হাজার টাকা কম ভাড়া দেওয়া হয়েছে যার ফলে ৭২০০ ওয়াগন ×৩০০০ টাকা =২ কোটি ষোল লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। ফ্রেট ফরওয়ার্ডার ব্যবস্থার দরুণ ক্ষতি হয়েছে এক কোটি উনআশি লক্ষ টাকা। ব্যবসায়ীদের গুদামভাড়া ইত্যাদি মকুব করার ফলে ক্ষতি দশ কোটি টাকা, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে তেরো কোটি বাইশ লক্ষ টাকা। রেলের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আর পি এফ এর খাতে খরচ হয় বছরে চোদ্দ কোটি টাকা। কিন্তু আর পি এফ-এর নিয়োগের পরে সম্পত্তি চুরি ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। সাতষট্টি-আটষট্টি সালে ক্ষতির পরিমাণ টাকার অঙ্কে ছিল সাত কোটি নিরানব্বই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, আটষট্টি-উনসত্তর সালে দশ কোটি সতেরো লক্ষ উননব্বই হাজার, উনসত্তর-সত্তর সালে এগার কোটি তেইশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার, সত্তর-একাত্তর সালে বারো কোটি বাইশ লক্ষ ব্রাষট্টি হাজার এবং একাত্তর-বাহাত্তর সালে চোদ্দ কোটি আটষট্টি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা।

ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের ক্ষতিপূরণের পেছনে উনিশশো সত্তর সালে আর বি পাল পরিচালিত one man expert committee on compensation claims রিপোর্টে কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে,

"The shortage of staff results in short cut methods of work and inevitably takes its toll in the form of claims. Acceptances, marking, counting, weightment and loading or unloading of parcels are altogether ignored or left to the merchants or to porters. One serious flaw, well known to railway administration, is that there is no proper system of taking over and making over of parcels between station staff and guards; parcels far from being tallied with summaries, are not even counted at the time of taking over and making over, because neither time nor staff are available. Since trains are run in order to carry traffic, adequate stoppages should be provided on passenger trains to permit of loading and unloading in a proper manner and there should be adequate staff for this purpose on trains and adequate labour and staff at stations. Railway authority should keep under constant review the requirements of labour and staff in parcel offices".

এ থেকেই পরিবহণ জনিত ক্ষতিপূরণের রহস্যটি বুঝতে পারা যাবে, কারণ, এই ক্ষতিপূরণের একটু ভাল পারসেন্টেজ যে ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বড় অফিসারদের হাতে যায় সে সত্যটা নতুন করে উচ্চারণ করাই বাহুল্য। এই প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং অপদার্থতার বিরুদ্ধেই রেল কর্মীদের বিক্ষোভ ছিল এবং আছে। সোস্যাল বার্ডেন-এর নামে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের যে ফ্রেট চার্জ ছাড় দেওয়া হয় তার পরোক্ষ কারণ রাজনৈতিক। এইসব বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ও নির্বাচনী তহবিলে কোটি কোটি টাকা যায়। এই ছাড়ের ফলে মনোপলিস্টরা মুনাফা লুটছে। যেমন বাঁশ। থার্ড ক্যাটাগরীর বাঁশ ব্যবহার হয় সিনথেটিক ফাইবারের জন্য এবং এটা বিড়লাদের একচেটিয়া কারবার। চুয়াত্তর সালের তেসরা মে রাজ্যসভায় বিবৃতি দিতে গিয়ে প্রয়াত রেলমন্ত্রী ললিতবাবু বাঁশ বহন জনিত ভাড়া ছাড়ের তদন্তের জন্য সাব কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

"I will appoint a sub-committee with a senior member of Parliament who has aptitude for the subject and wants to be associated with it."

কমিটি আজও হয়নি।

মোদ্দা কথা এই যে, এবারের রেল ধর্মঘটে অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে ছিল ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবী। মনে রাখা দরকার যে, চুয়াত্তর-এর রেল ধর্মঘটই রেল কর্মীদের সর্বপ্রথম টেনে এনেছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নিছক অর্থনৈতিক দাবীর সীমিত গণ্ডী থেকে শ্রমজীবী মানুষের আর্থ-শিল্প-সামাজিক অধিকারের মৌল দাবীর বৃহত্তর প্রাংগণে। সরকারের সঙ্গে রেল কর্মীদের লড়াইটা যদি নিছক বোনাস এবং বেতন বৃদ্ধির লড়াই হতো তাহলে হয়তো কিছু দেনা পাওনা মিটিয়ে সরকার ধর্মঘট রোধ করতে সচেষ্ট হতেন। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে শিল্প শ্রমিকের মৌল অধিকারের, সেখানে আধা-সামন্ততান্ত্রিক একাচটিয়া পুঁজির অতন্দ্র প্রহরী ভারত সরকার তাদের পুঁজিবাদী নীতিগত কারণের ভিত্তি রচনা করেছেন আবশ্যিক এবং অনিবার্য প্রয়োজনেই। সেই সঙ্গে সি পি আই দলের মুখোসও উদ্ঘাটিত হয়েছে।

দর্পণে হামলা

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

অপরাধী। ওদের শাস্তি হবে জনতার আদালতে।

অল ইণ্ডিয়া টি আর ডি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মাণিক ব্যানার্জী বলেন, দর্পণ মেহনতী মানুষের বিশ্বস্ত সাথী বলেই তার ওপর ছাত্র পরিষদের পাশবিক আক্রমণ এই কাগজের অনন্যনীয় আদর্শনিষ্ঠারই পরোক্ষ স্বীকৃতি। শাসকদলের কাছে আজ এই সন্ত্রাস ছড়ানো ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। তাই, দর্পণ সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করেই বেঁচে থাকবে কারণ এই কাগজের প্রাণসম্পদ জনতার সংগ্রাম অমর এবং অপরাজেয়।

প্রশাসনই দায়ী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উক্ত ধারার (ii) সাব ক্লজে বলা হয়েছে—

"The report of the press must not go beyond the following informations: (ii) General nature of accident (no controversial cause, the correctness of which may subsequently be questioned) is to be given."

জেনারেল ম্যানেজারের বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে তা কি প্রমাণিত সত্য? তা যদি না হয় তবে রেলের ধারা লংঘনের অভিযোগে কি তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে? প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ৪৩ আপের ড্রাইভার মহম্মদ আব্বাস এবং এইচ ১৮৫ এর ড্রাইভার গোপাল শর্মা—এরা দুজনেই রেলের অনুগত কর্মী। এরা সাম্প্রতিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেননি। জি এম-এর অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বলে পোষিত ধারণা থেকে কি তাহলে ধরে নিতে পারি না যে তাদের অনুগত কর্মচারীরাই এর জন্য দায়ী? একই অর্থে গোটা প্রশাসনও তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না? আমার অভিযোগ, এটা প্রশাসনেরই অন্তর্ঘাতমূলক কাজ এবং সেই শয়তানী চাপা দেবার জন্যই রেলকর্মীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। আমার অভিযোগের কারণ,

(এক) উল্টাডাঙ্গা নন-ব্লক স্টেশন। এখানে কোন কেবিন নেই। বুকিং ক্লার্ক ইনচার্জ হচ্ছেন স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত। লাইন ক্লিয়ার বিনিময় হয় নারকেলডাঙ্গা এবং দমদম কেবিনের মধ্যে। দু বছর আগে এই স্টেশনে কল্যাণী লোকাল-বানপুর লোকালের সংঘর্ষজনিত দুর্ঘটনার পর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এই স্টেশনকে ব্লক স্টেশনে পরিণত করা হয় নি। অথচ উল্টাডাঙ্গায় বিরাট কার্ভেচার আছে এবং এখানের লাইনে ডাউনওয়ার্ড গ্র্যাডিয়েন্ট আছে।

(দুই) দুর্ঘটনার জায়গা থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরবর্তী শিয়ালদা থেকে রিলিফ ট্রেন আসতে সময় লেগেছে একশো পাঁচ মিনিট। কেন এই বিলম্ব? এ্যাক্সিডেন্ট ম্যানুয়েল-এর সাতাশ পৃষ্ঠায় নিবন্ধ রুল চুয়াত্তর-এ বলা হয়েছে,

"A relief train must leave the shed within 30 minutes by day and 45 minutes by night."

এতে আরও বলা হয়েছে যে, "Emergency cross overs should always be kept in good working orders so as to ensure the expeditions movement of relief trains."

কিন্তু কার্যতঃ কি ঘটেছে? কার শেডের বার লাইন ধরে মেডিক্যাল ভ্যান সাতটা চুয়াল্লিশ মিনিটে বাইরে এসে সিগন্যাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে সাতটা তেপ্পান্ন মিনিটে আসে শিয়ালদা পাঁচ নং প্ল্যাটফর্মে। কোন লাইন ধরে গাড়ী স্পটে যাবে সে সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগলো তেরো মিনিট। এরপর আটটা ছয় মিনিটে বলা হলো আপ লাইনের বদলে ডাউন লাইন দিয়ে যাবার কথা। যেহেতু ডাউন লাইনে আপের কোন স্বাভাবিক সিগন্যাল নেই সেইহেতু দেরী হল আরও চোদ্দ মিনিট। অর্থাৎ আটটা কুড়ি মিনিটে মেডিক্যাল ভ্যান ছেড়ে যায়। দুর্ঘটনা ঘটেছে সাতটা পঁচিশ মিনিটে। রিলিফ ট্রেন ঐ একই লাইনে শেড থেকে চার নং প্ল্যাটফর্মে আনা হয় আটটা পঞ্চাশ মিনিটে। এটা মেডিক্যাল ভ্যানের সঙ্গে একসঙ্গেই নারকেলডাঙ্গা গুমটি থেকে আপ সুবার্বণ লাইন ধরে প্ল্যাটফর্মে আনা যেত। কিন্তু, তা না করে একে চার নং প্ল্যাটফর্মে আনা হল আটটা পঞ্চাশ মিনিটে এবং এটা ছেড়ে যায় আটটা ছাপ্পান্ন মিনিটে। এই বিলম্ব কি এজন্যে নয় যে, রিলিফ ব্রেক রেডি ছিল না? অথবা দুর্ঘটনাস্থলেই প্রায় দেড় শতাধিক মৃতদেহকে যত বেশী সম্ভব গোপন করার সময় ও সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই চক্রান্ত? এগুলো কি রেলের নিয়মবিধি লংঘন নয়?

(তিন) শিয়ালদা ডিভিশনে আগে "এ" ক্লাশ ড্রাইভার ছিল। বছর দুয়েক আগে দশ পার্সেন্ট ইকনমি ড্রাইভের অজুহাতে ঐ ড্রাইভারদের (মেল ও এক্সপ্রেস) হেড কোয়ার্টার বদল করা হয় সাহেবগঞ্জে। ৪৩ আপ দার্জিলিং মেলের ড্রাইভার সাহেবগঞ্জ হেড কোয়ার্টারের লোক। সাহেবগঞ্জের সব ড্রাইভার অটোমেটিক সিগন্যালিং সেকশনে কাজ করে অভ্যস্ত নয়। উপরন্তু ধর্মঘটের সময় বিনা সিগন্যালে গাড়ী চালানো হয়েছে। এবং অনুগত ড্রাইভারদের এর জন্য ক্যাশ রিওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। ফলে, সে সময় অধর্মঘটি ড্রাইভারদের মন থেকে এভাবে সিগন্যাল গ্রাভিটি প্রায় মুছেই দেওয়া হয়েছে। আগেই বলেছি যে, ৪৩ আপ (দার্জিলিং মেল) এবং এইচ ১৮৫ (হাবড়া লোকাল)-এর ড্রাইভাররা ধর্মঘটি ছিল না। বর্তমানে দার্জিলিং মেলের ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে শিয়ালদা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের ঘাড় থেকে সুকৌশলে দায়িত্ব এড়াতে চাইছে। কারণ দার্জিলিং মেলের ড্রাইভার সাহেবগঞ্জ হেড কোয়ার্টারের এবং সাহেবগঞ্জ হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু ঘটনা প্রমাণ করছে যে, হাবড়া লোকালের ড্রাইভার কিছুতেই দুর্ঘটনাজনিত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। কারণ, তিনি তার গাড়ী আবার পেছিয়ে সিগন্যালিং ওভারলাপে ফিরে এসেছেন। এটা রেলের স্টেশনের ট্র্যাক সারকিট পার করে জেনারেল রুলের ৮৭৭ ধারার বিরোধী, এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, সে আপওয়ার্ড সিগন্যাল পার হবার ফলেই স্টেশনের এ্যাপ্রোচ সিগন্যাল পেয়েই আপ দার্জিলিং মেল ধীরগতিতে এগোচ্ছিল এবং এর মধ্যেই হাবড়া লোকালটি আবার ফিরে এসেছে। প্রতিটি সিগন্যালিং ওভারলাপ একশ বিশ মিটার অথবা চারশ ফিট। দার্জিলিং মেলের ড্রাইভার যে হলুদ সিগন্যাল পেয়েছিলেন দৈনিক পত্রপত্রিকায় সে খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং রেল কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি তার প্রতিবাদ করেননি। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও এর উল্লেখ আছে। অতএব, হলুদ সিগন্যালের কথা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

আবার হাবড়া লোকালের যাত্রী রবীন্দ্র ভারতীর অধ্যাপক ধীরেশ চক্রবর্তীও হাবড়া লোকালের বারবার আগুপিছু করার কথা উল্লেখ করেছেন পয়লা ফেব্রুয়ারী তারিখে যুগান্তরে প্রকাশিত তাঁর চিঠিতে। এরও কোন প্রতিবাদ হয়নি। এসব বাদ দিলেও, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এইচ ১৮৫নং গাড়ীর যে ব্রেক জ্যাম ছিল তার সবচেয়ে বড় আপ দার্জিলিং মেলের ধাক্কা খেয়েও রেক এগিয়ে যায়নি। ব্রেক ব্লক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে গাড়ী বেরিয়ে যেত এবং ছয় শতাধিক লোকেরও প্রাণ যেতোনা। তার চেয়েও বড় কথা, শিয়ালদা থেকেই হাবড়া লোকালের রেক খারাপ ছিল। এখানে প্রশ্ন থাকে যে, ড্রাইভার কি এ সম্পর্কে কোন মেমো দিয়েছিলেন? আমি খবর নিয়ে জেনেছি দেননি। তাঁর লগবুকে কোন এন্ট্রি আছে? শিয়ালদার স্টেশন মাস্টারের ডায়েরীতে এটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? এইচ ১৮৫ পুস্ এ্যান্ড পুল সিস্টেমের কোচ ছিলনা। এটা ছিল সেলফ্ প্রপেল্ড্ মোটর কোচ। অতএব গাড়ীতে একজনই ড্রাইভার থাকার কথা। এ্যাসিস্টেন্ট ড্রাইভারের উপস্থিতি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এখন দেখা যাক, হাবড়া লোকালের রেকটির কি অবস্থায় ছিল। প্রতি একশ কিলোমিটার পরিক্রমার পর ই এম ইউ কোচকে এক ঘন্টা মুভমেন্ট গ্যাপ দেবার কথা। প্রতি পাঁচদিন অন্তর ব্রেক ব্লক পাল্টাতে হয় এবং থরো ওভারহলিং করতে হয়। শিয়ালদা কারশেডে সাউথ সেকশন ছাড়া চোদ্দটি লাইনের জন্য আছে মাত্র চব্বিশটি রেক এবং তার প্রত্যেকটিই একভাবে না একভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এই সেকশনে সুবার্বণ ট্রেনে গণ্ডগোলের মূল কারণ ই এম ইউ কোচের জাম্পার কেবল এবং অন্যান্য পার্টস চুরি। অবাধ পার্টস চুরি তথা প্রয়োজনীয় পার্টসের রিপ্লেসমেন্টের অভাবে শতকরা একশটি রেকেই প্রায় ডেড লাইনে এসে গেছে। প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ না করার ফলে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হয় না। যেখানে রিবেটিং দরকার সেখানে কাঠ ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে ওয়েল্ডিং দরকার সেখানে সল্টারিং করে কাজ চালানো হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হাবড়া লোকালের রেকটির বিচার করা যাক। ওয়ার্কিং টাইম টেবিলের শিয়ালদা ডিভিশনের ৩৭নং রেক লিস্টে দেখা যায় যে, এই রেকটি সকাল সাতটা সাত মিনিট থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত শিয়ালদা ও বনগাঁর মধ্যে পাঁচ বার যাতায়াতের মাধ্যমে ৩৮৫ কিলো মিটার রাস্তা অতিক্রমণের মাঝে মুভমেন্ট গ্যাপ পেয়েছে যথাক্রমে দশ, উনত্রিশ ও এগার মিনিট। শিয়ালদা এসে মাত্র ষোল মিনিট পর সেটিই এইচ ১৮৫ হয়ে গেছে। স্বভাবতই ব্রেক ব্লক ফেল করেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে বলা দরকার যে, শিয়ালদা সেকশনের রেলকর্মীদের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টকে দমন করার জন্য উনিশশো সাতষট্টি-সত্তর সালের মধ্যে তৎকালীন ডি এস কল্যাণকুমার দাস বিরাট এক মস্তান বাহিনীকে কাজে ঢুকিয়ে নেয়। এদের কাছে কল্যাণবাবু ডি এস হলেও ছিলেন "কল্যাণদা"। এদের কাজ শ্রমিকদের সভা ভাঙা, ধর্মঘট ভাঙা। খুন, জখম, রাহাজানি এবং ওয়াগন ভাঙার কৃতিত্বও এদের অসাধারণ। এরা কাজে আসে না (অবশ্য জানেনা বলেই) কিন্তু মাসের শেষে মাইনে পায়। ডি ই ই (টি আর এস) রামেশ্বর চ্যাটার্জী এটা জানেন মেনটেনেন্সের লোকের অভাব। পরবর্তী সংখ্যায় বিশদভাবে বলবো।

অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলা দৈনিক পত্রিকা যুগান্তরের উত্তর বঙ্গ সংস্করণে প্রকাশিত "উত্তরবঙ্গের অরণ্যভূমি বনকর্মীদের আবার চুরির স্বর্গরাজ্য" শীর্ষক সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ করে পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিসেস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, উক্ত সংবাদে বনভূমি সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অপদার্থতাকে আড়াল করে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কুৎসা রটনা করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, প্রশাসনিক দূরদৃষ্টির অভাব, উচ্চস্তরে অবাধ দুর্নীতি এবং ভ্রান্ত অরণ্যনীতিই বনভূমি অবলুপ্তির প্রধান কারণ।

এতে আরও বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন আলোচনার সময় কর্তৃপক্ষ এসোসিয়েশনের বক্তব্যকে যুক্তিপূর্ণ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও বনভূমি অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত করার জন্য ফরেস্ট কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে সমস্যাকে আরো তীব্র করে তুলেছে। এর ফলেই বনভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে যার পরিণাম অতি মারাত্মক। বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, বনভূমি অবলুপ্তির ফলে জলবায়ুর ভারসাম্য, ভূমি সংরক্ষণ, জ্বালের চাহিদা ও শিল্পে কাঁচামাল যোগানের ক্ষেত্রে তীব্র সমস্যা সৃষ্টি হবে। এই সমস্যা অনুধাবন না করে সরকারের বনসম্পদ বৃহৎ পুঁজিনিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলি কর্তৃপক্ষে অপদার্থতা ঢাকতে গিয়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে ফরেস্ট গার্ড ও বীট অফিসারদের ওপর। বিবৃতিতে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের পথে সরকারকে অগ্রসর হবার আহ্বান জানিয়ে এসোসিয়েশন পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মতামত

ট্রেন দুর্ঘটনা

উল্টাডাঙ্গার দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতদের জন্য মামুলী শোক প্রকাশ পর্ব শেষ হয়েছে এবং এখন কিছু কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা হবে হয়ত। নিয়মমাফিক তদন্তের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু অভিশপ্ত হাবড়া লোকালের একজন যাত্রী হিসাবে আমার মত দৈনিক যাত্রীর মনে নিদারুণ এক সন্দেহ ও ভয় দেখা দিয়েছে।

শিয়ালদহ থেকে যাত্রা করার পর থেকেই গাড়ীর শম্বুক গতি দেখে প্রতিটি যাত্রীই বুঝেছিল গাড়ীটা খারাপ। উল্টাডাঙ্গা ছেড়ে গাড়ী পুনরায় শম্বুক গতিতে আনুমানিক একশ-দেড়শ গজ গিয়ে একেবারে স্থানু হয়। দু-চার মিনিট পর স্বাভাবিক গতিতে পিছু হটে প্লাটফর্মে ফিরে আসে। চার-পাঁচ মিনিট পর পুনরায় গাড়ী সামনের দিকে চলতে চেষ্টা করে এবং সেই শম্বুক গতিতে আগের দূরত্বে গিয়ে স্থির হয়ে পড়ে। চার-পাঁচ মিনিট পর পুনরায় স্বাভাবিক গতিতে পিছু হটতে থাকে এবং মাত্র খান তিনেক বগী প্লাট ফর্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভীষণ শব্দ—সংঘর্ষ। মনে হয় স্টেশনের স্টার্টার সিগনালের ওপর দিয়ে হাবড়া লোকাল গড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ায় দার্জিলিং মেল উল্টাডাঙ্গা ঢোকার সিগনালের ক্লিয়ারেন্স পেয়ে এগিয়ে আসে। তিন নম্বর আপ লাইন শিয়ালদহ থেকে উল্টাডাঙ্গার কাছে কিছুটা বাঁদিকে বেঁকে থাকায় ও দুই নম্বর প্লাটফর্মের শেডের জন্য দার্জিলিং মেল হয়ত কাছাকাছি এসে তবে হাবড়া লোকালকে দেখতে পায় এবং ঐ প্রচণ্ড ভারী গাড়ী নিজেকে সামলাতে সামলাতে শেষ মুহূর্তে ধাক্কা মারে। বেগে ধাক্কা মারার ফলাফল কল্পনাতীত হত।

আর একটা কথা এসে পড়ে। এইরকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বেতারকেন্দ্রও কি দৈনিক পত্রিকার মত ভূমিকা নিয়ে সাধারণের কাছাকাছি আসতে পারে না? আইডেন্টিফায়েড মৃত ও আহতদের নাম ধাম এবং কে কোন হাসপাতালে আছে তার বিবরণ কি স্থানীয় সংবাদের পর দু-পাঁচ মিনিট রেডিওতে প্রচার করা যায় না? ওদের অনুভূতির ও চিন্তার দৈন্য দশা কাটবে কবে?

রসময় রাউত

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

মুর্শিদাবাদের গ্রামগাঁয়ে জীর্ণসার মানুষের ভীড়

আল কিনদি

বহরমপুরে লালগোলা প্যাসেঞ্জারের ধ্যাদধেড়ে গাড়ীটা পৌঁছে দিয়েছিল। সেখান থেকে আলিগঞ্জ কোন পথে যাবো শুধালে দু চারজন মুখপানে তাকিয়ে ভাবলো একেবারে এপারে এসেছে হয়তো। পদ্মার এপারে বিনি ছাড়পত্রে খুব সহজে লোক আসে বলেই তো ওই ধরণের প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। বাঙলাদেশের অনেক লোকই পা বাড়ায় মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জে কিংবা কান্দিতে। বহরমপুর এসে সিরাজের কবর কিংবা নবাবী আমলের স্মৃতিচিহ্ন ধন্য প্রাসাদ না দেখে কেউ কি আর অজ পাড়াগা খোঁজে।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কিংবা হুগলীর ডানকুনি সব স্টেশনের চেহারা কিন্তু এক। এক একটা বস্তী যেন। স্টেশনে এলেই উলঙ্গ ছেলে, জীর্ণসার মা, আর পাণ্ডুর চোখ মৃত্যুমুখী কুষ্ঠরোগীর হতাশ সংসার চোখে পড়বেই। ভাঙ্গাবাসন নিয়ে যে হতভাগ্য ছেলেগুলো বাবুদের পিছনে যাচ্ছিল তাদের তাড়িয়ে এবং কিছুক্ষণ জ্ঞানদান করে যাত্রীরা এগিয়ে চলছিল দূরে।

রিক্সায় আমি বাস স্ট্যান্ডে এসেছিলাম। বাসে সাত মাইল ঘুরে মুনীর শেখের ঝোপড়া। বেচারা এককালে কলকাতায় বাবুর্চি ছিল আমাদের। তাকে দেখতে এলাম। বুদ্ধ বললো তার বড় ছেলে রাজনীতির লীডার, মেজছেলে কলকাতায় রাজনীতি করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে আর ছোটটি কলকাতায় মিনি বাস বার করেছে।

লম্বা চুল, হিপি, তার ছেলে আমাকে দেখে কিঞ্চিৎ সমীহ করলো। ঐ ধরণের রুক্ষ ছেলের থেকে যতটুকু আশা করা যায়। "এদিকে অবস্থা কেমন চলছে আমি শুধিয়েছিলাম। বললে যা দিনকাল, তাতে তো জানেন, মার শ্বালা, মার হাটা রাজত্ব। লুটে খাও যে যতটা পার। মাগুর মাছের সঙ্গে মটর কলাই দেয়া তরকারী খাইয়েছিল ওরা। বেচারা মুনীর বললো, "বাবুর ছেলে তুমি আমাকে দশ বছর পর নিজের হাতে খানা পাকিয়ে খাওয়ালাম।

অমন ওমদা রান্না সত্যই বহুবাজারে আমাদের মেসে খাইনি। পচা দাগধরা আলু আর ময়দা দিয়ে মুখ আঁটা ফাটা ডিম কিনতে রাধাবেকেষ্ট ঠাকুর আমাদের ধরে পটু। বিকেলে মুনীরের ছেলে আমাকে নিয়ে দুটো গ্রাম ঘুরিয়ে আনলো মেশালগঞ্জ আর মালীপাড়া। মালীপাড়া নামটা শোনা শোনা লাগছিল, হোসটেলের একটি ছেলের নাম ঠিকানা দেখেছিলাম গ্রাম ও ডাকঘর মালীপাড়া, ঐ জেলাতেই। কলকাতার বিখ্যাত রিপোর্টার কাম লেখক আমাকে যে গ্রামটির কথা বলেছিল যেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছেলেরা সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে তার ঠিকানা বহু কষ্টে বার করেও প্রচণ্ড শীতে সেখানে যাওয়ার ভরসা পেলাম না। গঙ্গায় ভাগান দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। লোহার তারের মধ্যে বড় পাথর ঢুকিয়ে যে প্রতিরোধের চেষ্টা হয়েছে তা টেকা মুশকিল। বাকীপাড়ায় আমার পরিচিত ছাত্র লেখক খাজি মহিউদ্দীন আহমদ থাকতেন। কলকাতার বৈঠকখানা এলাকায় তার পরিচিতা জনৈকা হিন্দু মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কদিন আগেই। কনের কাকা, জ্যাঠা আর আরও সব ক্ষুব্ধজন এ বিবাহে সম্মত না হয়ে ঘর চড়াও হয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। ঘটনাস্থলে এ অধমের আবির্ভাব নিতান্তই কাকতালীয় ছাড়া কিছু নয়। সারাদিনের ক্লান্তি আর রাগ কনেপক্ষের থেমে গেল ঘরশত্রু বিভীষণা কন্যার জন্যে। তারাও নতুন জামাইয়ের ঘরে খেয়ে-দেয়ে লালগোলা প্যাসেঞ্জার কখন শিয়ালদা যায় খোঁজ নিচ্ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রীর এলাকায় পাট খুব ভাল হয়েছে। সার আর বীজের সমস্যা কমে গেছে বলে অনেকেই জানালেন। তবে সব এলাকায় সমান ভাবে সমস্যা মেটেনি। দু-চারজন ফড়ে দালাল গোছের লোক সার, বীজ আর ধ টাকা পাইয়ে দেবার নাম করে টা খাচ্ছে। গতবার বাগদীর বউ তো বললে রীতশ্রী প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার যিনি প্রথম ছিলেন জনসংঘ পরে কম্যুনিষ্ট এখন কংগ্রেস সেই হরেন্দ্রনাথ গায়েন টিপসই দিয়ে ঘর পড়ার টাকা তুলে নিয়েছে গত বছরে। এখনও টাকা আর দিচ্ছে না।

আমার দিকে দেখিয়ে "ইটা কে গো" বলেছিল কানপোতার আসফার আলী। সে এক ছাপোষা দিনমজুর। এক বিঘা জমির মালিক। খাজনা মকুব হয়েছে তার অথচ রোড সেস আর শিক্ষা সেস বাবদে দশ আনা ধরেছে।

নতুন ধানচাল উঠেছে। লোকের হাতে দু-চার পয়সা আছে। শহর থেকে যাত্রার দলের এখন আমদানী। ম্যাজিক শোও কম যায় না। কানে আসে কাল রাত্রে বিখ্যাত পার্টির অমুক অভিনয়।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কারচুপির অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য দেড় বছর আগে প্রায় চোদ্দ হাজার প্রার্থীর ইনটারভিউ নেওয়া হয়। এই ইনটারভিউ প্রায় দেড় মাস ধরে চলে এবং এজন্য আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। এ ছাড়া চোদ্দ হাজার বেকার যুবকের হয়রানি ও অর্থব্যয় তো আছেই। এদের ইনটারভিউ গ্রহণের জন্য জেলা স্কুল বোর্ড উপদেষ্টা কমিটির দশজন সদস্যকে নিয়ে ইন্টারভিউ কমিটি করা হয়। এই কমিটিতে প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরাও সদস্য ছিলেন।

কিন্তু তৎকালীন ডি আই শ্রীশ্যামাপতি চট্টরাজ ইনটারভিউ কমিটির সভা না করে এবং নিখিলবঙ্গ ও বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে তাঁদের অগোচরে শাসকদলের সদস্যদের দ্বারা প্রস্তুত আনট্রেন্ড ও ট্রেন্ড প্রার্থীদের দুটি পৃথক প্যানেল গত তেইশে জুলাই জেলা স্কুল বোর্ড উপদেষ্টা কমিটির সভায় পেশ করেন। উপরোক্ত দুটি সমিতির প্রতিনিধিরা বে-আইনীভাবে প্রস্তুত প্যানেল অনুমোদনের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়মনীতি অনুযায়ী প্যানেল প্রস্তুতের দাবী জানান। কিন্তু শাসকদলের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ঐ প্যানেল পাশ করেন।। ডি আই ঐ সভায় শিক্ষক প্রতিনিধিদের বিরোধিতার জবাবে জানান তিনি যে সব সদস্যের কাছ থেকে ইনটারভিউয়ের নম্বর পেয়েছেন তাদের নম্বরের ভিত্তিতেই প্যানেল প্রস্তুত করেছেন। যখন সমিতির প্রতিনিধিরা ডি আইয়ের নিকট অন্ততঃ একজন ইনটারভিউ কমিটির সদস্যের প্রদত্ত নম্বর দেখানোর দাবী করেন তখন তিনি তা দেখাতে পারেন না। সরকারী প্রশাসন ও শাসকদলের এই ঘৃণ্য দলবাজীর প্রতিবাদে নিখিলবঙ্গ ও বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিরা সেদিন সভা কক্ষ ত্যাগ করেন।

কিন্তু অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে সেদিন শাসকদলের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যে প্যানেল পাশ করেন পরবর্তীকালে অত্যন্ত গোপনে সেই প্যানেলের ক্রমানুসারে শাসক দলের কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য ভরপ্রাপ্ত ডি আই এম ঘোষের সহযোগিতায় পরিবর্তন করেছেন এবং সেই প্যানেলমাফিক ডি পি আইয়ের অনুমোদন করিয়ে আনা হয়েছে।

অথচ তেইশে জুলাই চুয়াত্তর উপদেষ্টা কমিটির সভায় ডি আই বলেছিলেন প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই প্যানেল তৈরী হয়েছে। এখন সমস্ত ব্যাপারটি গোপন রাখা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে খুব দ্রুত পরিবর্তিত প্যানেলের ক্রমানুসারের ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা চলছে এবং এ নিয়ে কোন বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে আশঙ্কায় এই গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আরও উল্লেখযোগ্য, যে সভায় প্যানেল পাশ হয়েছিল সেই সভার পরে উপদেষ্টা কমিটির আরও দুটি সভা হয়েছে। অথচ সেই সভাগুলিতে প্যানেলের ক্রমানুসার পরিবর্তন সম্পর্কে কোন কিছু জানান হয় নি। স্বভাবতই এটা সুস্পষ্ট যে শাসকদলের কয়েকজন সদস্য তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থে ও স্বজনপোষণের জন্য প্রশাসনের সহযোগিতায় গোপনে এই কারচুপি ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং এখন জেলা স্কুল বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্যানেল ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটি গোপন রাখছেন।

নিখিলবঙ্গ, বঙ্গীয় ও সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সমগ্র ঘটনাটি জেলা শাসক, জেলা স্কুল পরিদর্শক ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানান হয়েছে। এই তিনটি সমিতির প্রতিনিধিরা এক যুক্ত বিবৃতিতে প্যানেল প্রস্তুতির এই কারচুপি ও জালিয়াতির তীব্র প্রতিবাদ করে পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত ও তদন্ত সাপেক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখার দাবী জানিয়েছেন।

নেই শুধু একজন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বারোই জুলাই কমিটির অফিসে সেই পরিচিত চেয়ারটিতে অন্য আর একজন বসে কাজ করছেন। সবাই আছেন। নেই শুধু একজন। যিনি ঐ পরিচিত চেয়ারটিতে বসে দীর্ঘদিন ধরে স্থিতধী বুদ্ধি এবং প্রত্যয়সিদ্ধ মনোবল নিয়ে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রসারিত করে নেতৃত্ব দিয়েছেন বারোই জুলাই কমিটির এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলিতে। চুয়াত্তর সালের এগারই ডিসেম্বর লণ্ডনের এক হাসপাতালে পৃথিবীর সঙ্গে চিরদিনের জন্য দেনা-পাওনা চুকিয়ে চলে গেছেন সেই খর্বাকৃতি অথচ উন্নতশির অনমনীয় পুরুষ কে জি বসু।

অফিসে ঢুকতেই একজন আমাকে এনে দিলেন এ আই টি ই ই ইউ ক্লাশ থ্রি ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্তৃক প্রচারিত "কমরেড কে জি বসু স্মরণ সংখ্যা" নামক একটি পুস্তিকা। প্রথম কভারেই ব্ল্যাক এ্যান্ড হোয়াইটে ছাপা কে জি-র মিষ্টি মুখেও দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ একটি প্রোফাইল। ব্যাক কভারের ছবিতে কে জি বসু শুয়ে আছেন অন্তিম শয্যায়। পাশে ফুলের মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্য ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসু।

অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, এদেশের ক্রমবর্ধমান সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের যে সংঘবদ্ধ রূপ আজ দেখছি তার জনক কে জি বসু। একথাও অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, এদেশের বৃহত্তর শ্রমিক আন্দোলনের মহাসমুদ্রে সরকারী কর্মচারী আন্দোলনও একটি খরবেগ নদীর ধারা যার ভগীরথ কে জি বসু। দেখেছি, সরকারী কর্মচারীরা কি উদ্বেল আবেগ নিয়ে ভালবাসতেন কে জিকে। প্রায় ঘন্টাখানেক ছিলাম বারোই জুলাই কমিটির অফিসে। এর মধ্যেই অসংখ্য জন এসে প্রশ্ন করলেন কে জির ছবি ছাপা হয়ে এসেছে কিনা। "কমরেড কে জি বসু স্মরণ সংখ্যা" সেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেরই বিষাদজড়ানো ফলশ্রুতি। এতে আছে কে জি-র 'দুটি লেখা, "ছেচল্লিশের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলি" এবং সরকারী কর্মচারী ও শ্রমিক আন্দোলন।" দুটি রচনাতেই কে জি প্রতিভাত হয়েছেন দরদী বন্ধু ও শিক্ষক হিসাবে। দীপেন ঘোষের লেখা "আপসহীন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক—কে জি বসু অগ্রজ সহযোদ্ধার প্রতি নিছক শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়। এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সংগ্রামের উত্তরাধিকার গ্রহণের নির্দ্বিধ শপথ। মণি বসুর লেখা "স্মৃতি" কবি সুকান্তর জীবনে কে জির প্রভাবের এক সাবলীল অধ্যায় বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছে। প্রতিটি লেখাই সংগ্রামী নিষ্ঠায় উজ্জ্বল।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মদন লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেসে গোষ্ঠী-লড়াই তীব্র আকার নিয়েছে

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস সম্মেলন নিয়ে গোষ্ঠী লড়াই এখন তুঙ্গে। সম্প্রতি জেলা কংগ্রেস সভাপতি অনন্ত ভারতী মেদিনীপুরে যে জেলা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন, সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও তা প্রদেশ কংগ্রেসের স্বীকৃতি পায়নি।

দর্পণের পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, ইতিপূর্বে আমরা জেলা কংগ্রেস সম্মেলন নিয়ে উভয় গোষ্ঠীর লড়াই-এর সূত্রপাতের খবর

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

দর্পণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক রুল জারি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এক মানহানির মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহীরেন বসুর আবেদনক্রমে রুল্ জারী করেছেন। মালদার সেসন জজ শ্রীবি বি গাঙ্গুলীর একটি আদেশের বিরুদ্ধে শ্রীবসু বিচারপতি শ্রীএন সি অলুকদার এবং বিচারপতি পতি শ্রীএ এন ব্যানার্জীর আদালতে আবেদন করেন।

১৯৭৩ সালে "জয়নালের বিরুদ্ধে অভিযোগ" এই শিরোনামায় দর্পণে প্রকাশিত একটি সংবাদকে মন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিনের পক্ষে মানহানিকর বলে বর্ণনা করে মালদার পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীঅনিল মৈত্র চীফ সেক্রেটারীর আদেশে মালদার সেসন আদালতে দর্পণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। গত ষোলই ও সতেরই ডিসেম্বর ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু আসামী শ্রীবসু স্বীয় অসুস্থতা এবং তাঁর উকীলী হাইকোর্টে আপীল কেসে ব্যস্ত থাকার জন্য টেলিগ্রাম পাঠান তাঁর স্থানীয় এ্যাডভোকেটের কাছে। চোদ্দ তারিখে এ্যাডভোকেট সেই টেলিগ্রাম আদালতে উপস্থিত করেন। ষোল তারিখে ফরিয়াদী পক্ষ আদালতে জানায় যে, তাদের সাক্ষী আনতে দু হাজার সাতশো টাকা খরচ হয়েছে। তারা আদালতে আবেদন করে আসামীকে এর কিছু অংশ বহন করার আদেশ দেওয়ার জন্য। সেসন জজ আদেশ দেন আসামীকে এক হাজার টাকা ফরিয়াদী পক্ষকে দিতে হবে। এই আদেশের বিরুদ্ধে আসামী শ্রীবসু কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেন। আসামী পক্ষে সওয়াল করেন শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

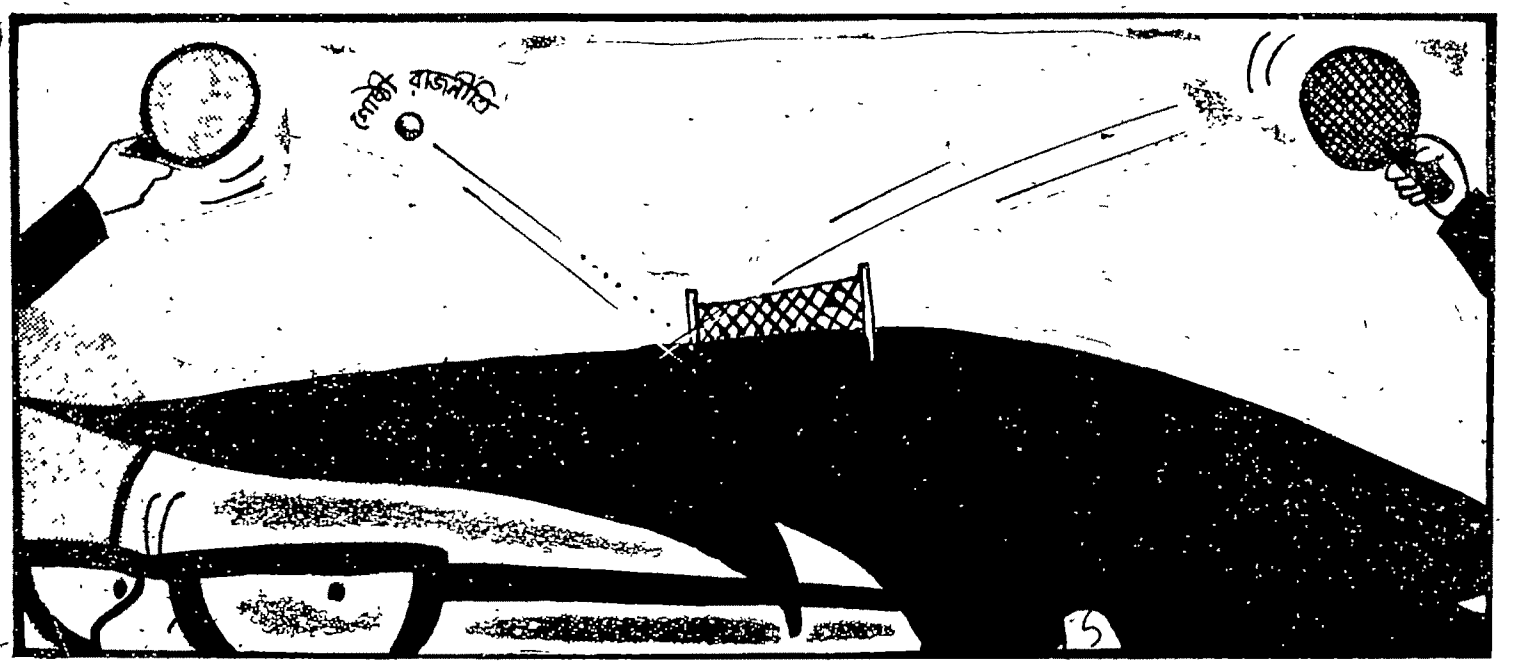

জুম্মা মসজিদ অঞ্চলে পুলিশী তাণ্ডব

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

গত সপ্তাহে দিল্লীর জুম্মা মসজিদ অঞ্চলে ইন্দিরা সরকারের পুলিশ বাহিনীর হাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রাণ দিল। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে দশ জন মারা গেছে। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা অন্তত পাঁচশ জন লোক পুলিশের গুলীতে মারা গেছে এবং কয়েক শো আহত হয়েছে। সি পি এম এম পি শ্রীজ্যোতির্ময় বসু হোম কনসালটেটিভ কমিটির সভায় জুম্মা মসজিদ অঞ্চলের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে সরকার কোন জবাব দিতে পারেন নি।

শ্রীবসু এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, সরকারের আচরণে জনগণ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে ইন্দিরা সরকারের একজন মন্ত্রী জনাব এস এন খান পালিয়ে গিয়ে নোংরা পায়খানায় লুকোতে বাধ্য হল। সেখানে তাঁকে চাবি বন্ধ করে রাখা হয় যাতে লোকে মনে করে ওটা খালি এবং ওখানে কেউ নেই। এই খানই গর্ব করে বলেছিলেন জুম্মা মসজিদের ইমাম সাহেবকে গুলী করবেন।

পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে এবং দু ঘন্টা ধরে বেপরোয়া গুলী চালায়। পুলিশ নাকি বাড়ির ছাদে উঠেও গুলী ছোঁড়ে যার ফলে ঘটনাস্থলেই কয়েকজন মারা যায়। পুলিশ এমন কি জোর করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে বাসিন্দাদের হয়রানি করে, মেয়েদের গায়ে হাত দেয়। গুরুতররূপে আহত ব্যক্তিরা এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে। বহু জায়গায় পুলিশ মুসলমানদের দোকানে আগুন লাগিয়েছে। আগুনে পুড়ে মরার ঘটনাও ঘটেছে বলে শোনা যাচ্ছে। দোকানের আগুন নেভাতে গেলে পুলিশ বাধা দিয়েছে।

ওয়াকফ বোর্ডের দুর্নীতি এবং জুম্মা মসজিদের ইমাম সাহেবের প্রতিবাদ নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তার কথা বাদ দিলেও পুলিশের আচরণ আর একবার ইন্দিরা সরকারের চরিত্র উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। এই সরকার ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দুর্নীতি সম্পর্কে কোন কথা শুনতে রাজি নয় এবং প্রতিবাদকে তাঁরা বলপূর্বক দাবিয়ে রাখতে চান। দোসরা ফেব্রুয়ারী জুম্মা মসজিদ অঞ্চলে পুলিশের যে তাণ্ডবলীলা চলেছিল তার নিরপেক্ষ তদন্ত হলে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, যে দেশ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে সারবে জাহির করে, যে দেশের শাসক শ্রেণী নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপতিরূপে ফকরুদ্দীন আলি আমেদকে মনোনীত করে সেই দেশে সাধারণ মুসলমানের অবস্থা সব সময় নিরাপত্তাহীন। শুধু সম্প্রদায়ের লোকের হাতে নয়, রাষ্ট্রের হাতেই সে নির্যাতিত। আমাদের মত লোক দেখানো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটাই ঘটে থাকে।

সার কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ফার্টিলাইজার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার ইস্টার্ন মার্কেটিং জোনের কনভেনশনে বিভিন্ন সমস্যা ও সার বণ্টনে আঞ্চলিক কিছু কিছু বৈষম্যের চিত্র প্রকাশ পায়।

মেঘালয়ের কৃষিবিভাগের প্রধান শ্রীহরেন জোনস অভিযোগ করেন যে মেঘালয়ের প্রধান চাষ আলুর জন্য নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সারের দরকার অথচ সার পাঠানো হয় অনেক দেরীতে। শ্রীরংগাগ আগরওয়াল বলেন, সার কর্পোরেশনের সারের দাম ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে, অথচ আসাম ও কাছাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে চোরাপথে হাজার হাজার মণ কমদামী সার আসায় বাজার খারাপ হচ্ছে। অরুণাচল প্রদেশের কৃষি ডিরেকটর শ্রীএ পি রায়চৌধুরীও সার বন্টন ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন।

সার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির বক্তব্য হল আসামের নামরূপ কারখানায় তিন লক্ষ টন সার বছরে তৈরী হলেও ঐ সব অঞ্চলেই তা বন্টন করা হয়, অন্যত্র হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার ও সার উৎপাদক সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ করে চাষবাসের উন্নতি এবং সার প্রয়োগ সম্পর্কে চাষীদের কাছে আরও তথ্য পৌঁছে দেওয়া দরকার।

এদিকে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার গ্রামে গঞ্জে প্রতিটি জেলার যে সব ডিলার আছেন তাদের নিয়োগ এবং নতুন ডিলার নিয়োগ সম্পর্কে নানা অভিযোগ পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছে।

লেভীর জুলুম

(দর্পণের সংবাদদাতা)

লেভীর জুলুমের বিরুদ্ধে যে সব হতভাগ্য জমিরমালিক বা মধ্যবিত্ত মামলা ঠুকেছেন তাদের মধ্যে খুব কমই বড় জোতদার আছে। বড় জোতদাররা কংগ্রেসী ছত্রছায়ায় দুই এক কুইন্টল ধান দিয়ে রেহাই পেয়েছেন। এদিকে মামলা করাও যাচ্ছে না। সরকার অর্ধেক ধান দিতে বলছেন পরে মামলা। মিসায় ঝোলার ভয়ে হুগলী ও হাওড়া জেলার দুচারজন লোক ধান কিনে এনে লেভী দিচ্ছে। হুগলীর জাঙ্গীপাড়া থানার প্রকিউরমেন্ট অফিসার অমরেশ চৌধুরীর বিরুদ্ধে বেছে বেছে মধ্যবিত্ত সংখ্যালঘুদের নামে লেভী বাড়ানোর ও কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। ঐ অঞ্চলে রাধানগর ইউনিয়ন-এর পাঁচশত বিঘা জমি আছে এমন লোকের লেভী এক কুইন্টল ধরে ম্যানেজ করেছেন ঐ ব্যক্তি। যে কোন সময় অর্ডিনান্স জারীর কথাও নাকি উঠছে। এই অবস্থায় গরীব মধ্যবিত্তরা মহা ফাঁপড়ে পড়েছেন। হুগলী মুর্শিদাবাদ মালদহের কজন এম এল এ মন্ত্রী লেভী দিয়েছেন? তাঁরা লেভী অস্বীকার করলেও সাধারণ মানুষের ঘাড়ে দায়।

উল্টাডাঙ্গায় ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী

নিখিল ভারত লোকো রানিং-স্টাফ এসোসিয়েশনের পূর্ব রেল শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীপূর্ণেন্দু দত্তরায় উল্টাডাঙ্গা ট্রেণ দুর্ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, গত ২৯শে জানুয়ারী ১৯৭৫ উল্টাডাঙা ষ্টেশনে যে ভয়াবহ টেন দুর্ঘটনার ফলে কয়েকশত যাত্রী হতাহত হয়েছেন, শিয়ালদহ বিভাগ তথা পূর্বরেলের রেল কর্মীরা তার জন্যে গভীরভাবে শোকাহত। শোকার্ত পরিবার পরিজনকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। নিহত ও ও আহত যাত্রীদের পরিবাব বর্গকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দানের জন্য আমরা সরকারের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

"দুর্ঘটনা সম্পর্কে রেলের নিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার যে তদন্ত সুরু করেছেন এইরূপ সীমাবদ্ধ তদন্তের এই শোচনীয় দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটিত ও দূরীভূত হতে পারে না। সাম্প্রতিক কালে শিয়ালদহ বিভাগের রেল চলাচলে যে গুরুতর অব্যবস্থার ফলে একের পর এক দুর্ঘটনা ও যাত্রী সাধারণের প্রাণহানি ঘটছে একমাত্র ব্যাপক ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমেই এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও সে সম্পর্কে যথাযথ ব্যাবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

"এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭১ সালে শিয়ালদহের সাউথ সেকশনে, মোটর ষ্টেশনে যে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা হয়, সেক্ষেত্রে এবং পরবর্তী সময়ে আজ পর্যন্ত প্রতিটি দুর্ঘটনার মূল কারণগুলি সাধারণের কাছে অজ্ঞাত এবং দিনের পর দিন অবস্থার অবনতি ঘটে চলেছে।

"কয়েক দিন পূর্বে একটি ঘটনায় উল্টাডাঙ্গার নিকট ছয়জন যাত্রী প্রাণ হারান এবং অনুরূপ ঘটনায় ইচ্ছাপুরে তিন জন যাত্রী নিহত হন।

যে গুরুতর ত্রুটিপূর্ণ ইলেকট্রিক কোচগুলি জোর করে চালাবার ফলে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছে, অনুরূপ কোচ চালিয়ে প্রতিদিনই যাত্রী ও সাধারণ রেল কর্মীদের জীবন বিপদাপন্ন করা হচ্ছে। জানা গেছে যে হাবড়া লোকালের ই এম ইউ কোচটিও অনুরূপ ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

"শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেন চলাচলে চরম বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও তজ্জনিত দুর্ঘটনার জন্য মূলতঃ দায়ী রেলওয়ে প্রশাসনিক স্তরের একটি দুর্নীতিপরায়ণ চক্র। সরকার যদি দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত না বসান তবে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না এবং দুর্ঘটনার মূল কারণগুলি থেকেই যাবে।

"কোনও রূপ প্রাথমিক তদন্তের পূর্বেই পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজারের মন্তব্য এবং এ সি আর এস এর তদন্তের পূর্বেই দার্জিলিং মেলের ড্রাইভার ও ফ্যায়ারম্যানের গ্রেপ্তারের আমরা প্রতিবাদ করছি। ধর্মঘটী ও শাস্তিপ্রাপ্ত রেল কর্মীদের জড়িত করে ৩১শে জানুয়ারী আনন্দ বাজার পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে তা উদ্দেশ্য মূলক। আমরা তাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। এই মিথ্যা প্রচার দুর্ঘটনার মূল কারণগুলিকে আড়াল করবার প্রয়াস।

"দুর্ঘটনা নিবারণের জন্যে সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টায় আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কিন্তু আমরা মনে করি যে একমাত্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠিত হলেই রেলমন্ত্রী ও সাধারণের পক্ষে সহযোগিতা প্রদান কার্যকারী ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

ডাক ও তার কর্মীদের সম্মেলন

২৬শে জানুয়ারী মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে পশ্চিমবঙ্গের ডাক-তার সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে ডাক-তার কর্মীদের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি এই কনভেনশনে যোগদান করেন। সমন্বয় কমিটির সভাপতি শিশির ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে উক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন পরিচালনা করার জন্য সমন্বয় কমিটির সম্পাদক সাধন মণ্ডল সহ প্রভাত ঘোষ, পাঁচুগোপাল ব্যানার্জী, অনন্ত ভট্টাচার্য, সত্যরঞ্জন ঘোষাল, আর. এন. সাহা ও মনি বোসকে নিয়ে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়।

ডেলিভারীর সংখ্যা কমিয়ে, মেল ভ্যানের সংখ্যা হ্রাস করে শূন্যপদ পূরণ না করে, বাড়তি কাজের জন্য বাড়তি কর্মী নিয়োগ না করে, ডাক সামগ্রী নিয়ম বহির্ভূত ভাবে যত্রতত্র সরিয়ে দিয়ে, লোকাভাব ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবের ফলে জমে যাওয়া টেলিগ্রাম ডাকে পাঠিয়ে, টেলিফোনের জরুরী মেরামতি কাজকর্ম না করে পশ্চিমবঙ্গের ডাক-তার প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ডাক-তার ব্যবস্থায় এমন এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে সারা দেশের জনসাধারণ প্রচণ্ড ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

অপরদিকে ব্যয় সঙ্কোচনের অজুহাতে ডাক-তার ব্যবস্থায় এই অবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য সংগঠনের পরিচালক ও কর্মীদের দূর দূরান্তে বদলী করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত ভাবে এই বদলী কর্মী সংখ্যা প্রায় দুই শত। এ ছাড়াও কর্মীদের ওপর কাজের বোঝা চাপিয়ে, প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা হরণ করে এবং বিভিন্ন অজুহাতে ব্যাপক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, অফিসে অফিসে সন্ত্রাসের আবাহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ডাক-তার চলাচলের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং কর্মীদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে উক্ত কনভেনশনে একটি আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কনভেনশনে গৃহীত দাবীগুলি আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত কনভেনশনে গৃহীত আন্দোলনের কর্মসূচী ছিলঃ ৭ থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অফিসে অফিসে বিক্ষোভ সভার মাধ্যমে দাবী সপ্তাহ পালন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রতি জেলা ও মহকুমা স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সহ ডাক তার যৌথ সমাবেশ ও জনসংযোগ স্থাপন।

বদলীর চক্রান্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সারা পশ্চিম বাঙ্গলায় ডাক বিভাগের ২০০ জন কর্মচারীকে পশ্চিম বাঙ্গলার সুদূর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বদলী করা হয়েছে। সংগঠন ভাঙ্গার এক নূতন চক্রান্ত চলছে। এরজন্যে সরকারকে মোটা টাকা খরচ করতে হচ্ছে। অথচ খরচ বাঁচাবার অজুহাতে শ্রমিককে অতিরিক্ত খাটিয়ে তাকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সরকারের নাকি বড়ই অর্থাভাব। সংগঠন ভাঙ্গার জন্য, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য, দালাল ইউনিয়ন তৈরী করার জন্য, আমলাদের মোটা টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্যে সরকারের টাকার অভাব নেই। শুধু অভাব দরিদ্র-শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা দেবার সময়।

গোষ্ঠীর লড়াই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশ করেছিলাম। এখন লড়াই তীব্র আকার নিয়েছে। এমন কি একপক্ষ অর্থাৎ অনন্ত ভারতী, অজিত পাঁজা গোষ্ঠী তো প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই একটা সম্মেলন করলেন।

জেলা কংগ্রেস সম্মেলন করার জন্য প্রথমে তোড়জোড় করেন জেলার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ও যুব সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক বারিদবরণ দাস। বারিদবাবু ও জেলার অপর সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়চৌধুরী খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে জেলা সম্মেলন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়। সহ-সভাপতি করা হয় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অজিত পাঁজা, নন্দলাল ব্যানার্জী এবং জেলার সভাপতি অনন্ত ভারতীকে। সম্পাদক হিসেবে বারিদবাবুর নাম প্রকাশ করা হয়। যদিও এই কমিটির মধ্যে উভয় গোষ্ঠীর নেতাকেই রাখা হয় তবুও একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি সবই প্রফুল্লকান্তি গোষ্ঠীর কব্জায় থেকে যায়।

জেলার সভাপতি অনন্ত ভারতী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাছে পাল্টা একটি কমিটির নাম পেশ করে সম্মেলন আহ্বান করার অনুমতি চান। অরুণবাবু অনন্তবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অরুণ মৈত্রের নির্দেশে প্রদেশের দুই সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম ও সৌগত রায় এ ব্যাপারে উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে বারিদবাবুর প্রস্তাবিত কমিটিই গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

অনন্ত ভারতী এতে প্রচণ্ড রেগে যান। এবং অরুণ মৈত্রের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে জেলার নামে এক সম্মেলন করেন। আট থেকে ১১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য অরুণবাবুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু অরুণবাবু যান নি। শুধু তাই নয় তিনি অনন্ত ভারতীর কার্যকলাপে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

জেলা সূত্রে জানা গেল প্রদেশ কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়ে বারিদবাবুরা অফিসিয়াল জেলা সম্মেলন আহ্বান করবেন উত্তর কলকাতার "লাহা বাড়ীতে"।

এদিকে জেলা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক মুকুল রায়চৌধুরী এবং তারক ব্যানার্জী সম্পর্কেও কংগ্রেস কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের খবর। বিক্ষুব্ধ কর্মীদের বক্তব্য ঃ শ্রীরায়চৌধুরী উনসত্তর সালে পৌরসভার সাধারণ নির্বাচনে নয় নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের অফিসিয়াল প্রার্থী হরিদাস ঘোষের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিরোধী প্রার্থীর জয়লাভে সাহায্য করেন। সুতরাং তাঁর দলীয় আনুগত্য সম্পর্কে উক্ত কর্মীরা প্রশ্ন তুলেছে। দ্বিতীয়তঃ অপর সম্পাদক তারক ব্যানার্জী সম্পর্কে ঐ কর্মীরা প্রকাশ্যেই প্রচার করে বলছেন, তারকবাবু একাত্তর সালেও পরলোকগত ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অজিত বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং সাতষট্টি ও উনসত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে অজিতবাবুর হয়ে প্রচারে নামেন। অতএব, এই দুই নেতার

বাস চলাচল সম্পর্কে অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দক্ষিণেশ্বর ও জাঙ্গীপাড়া এবং চাঁপাডাঙ্গা দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে যে পঁচিশ ও ছাব্বিশ নম্বর বাস চলে তার অনিয়ম এবং বাসের সংখ্যা হ্রাস ও ভাড়ার বিনাশ বেপরোয়া চলাচল সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। হুগলীর আর টি এ অফিসে দশ হাজার টাকা ঘুষ দিলে নতুন বাসের পারমিট দেওয়া হবে বলে যে ভদ্রলোককে জানানো হয়েছে তিনি দর্পণ অফিসে অভিযোগ করে গেছেন ঘুষ দিয়ে কি ভাবে বাস না চালিয়ে রুটের একচ্ছত্র অধিকার রাখা যায়।

প্রকাশ, পঁচিশ নম্বর বাস রুটে নয়টি পারমিট দেওয়া হয়েছে। অথচ রুটে মাত্র চারখানি পঁচিশ নম্বর বাস চলে। জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসক একথা জেনেশুনেও পঁচিশ নম্বর বাস মালিক সমিতির খুটির কাছে নত হয়েছেন। পারমিট প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আরও বাসের পারমিট পেয়ে কালোবাজারী করছেন। বাস অন্য রুটে বে-আইনী চলাচ্ছেন। বে-আইনীভাবে ভাড়া খাটাচ্ছেন সম্পূর্ণ রিজার্ভ বোর্ড টাঙিয়ে। যদিও নিয়ম আছে বাস পারমিট প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বছরখানেকের মধ্যে রুটে বাস না চালালে পারমিট বাতিল হবে।

এদিকে হাওড়া ষ্টেশন থেকে সাতান্ন এ বাসখানি হাওড়া জাঙ্গীপাড়া রুটে চলার জন্য এর মালিকরা বহুদিন যাবত আবেদন করেও পঁচিশ নম্বর বাস মালিকদের মামলা এবং জুলুমবাজীর কাছে হেরে যাচ্ছেন বার বার। পঁচিশ নম্বর নিজেও নিজেও যাত্রীদের অসহ্য ক্লেশবৃদ্ধি করছে, অন্যদিকে অন্য রুটের বাস আসতেও দিচ্ছে না। ছাব্বিশ নম্বর রুটের দুর্নীতি একই ধরণের। পঁচিশ ছাব্বিশ বাস যাত্রী সমিতির সম্পাদক কেষ্টধন প্রামাণিক বলেছেন চন্ডীতলার এম এল এ মহম্মদ সফিউল্লাহ এবং জাঙ্গীপাড়ার এম এল এ, গণেশ হাটুইকে নয়টা বাসের জায়গায় পাঁচটা বাস চালানো ও দুর্নীতির ব্যাপারে বলেও কোন কাজ হয়নি।

অতীত জেনেও তাঁদের জেলা কমিটির দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানো হল কেন?

উল্টাডাঙ্গা ট্রেন দুর্ঘটনার লোকঠকানো তদন্ত ॥ প্রশাসনিক দায় এড়ানোর কৌশল

সাধন গুহ

গত সংখ্যায় উল্টাডাঙ্গা দুর্ঘটনার পর্যালোচনা করতে গিয়ে ই এম ইউ কোচগুলোর ভয়াবহ অবস্থার কথা উল্লেখ করেছি। মেনটেনেন্স বলতে যে বিশেষ করে শিয়ালদা কারশেডে কিছুই নেই তারও উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য দিচ্ছি। ই এম ইউ কোচে আটটি মোটর চালু থাকার কথা। শিয়ালদা সেকশনে প্রতি রেকেই বড়জোর চারটি মোটর চালু থাকে। অনেক সময় ড্রাইভারদের তিনটি মোটর নিয়েও গাড়ী চালাতে বাধ্য করা হয়। জাপানী কোম্পানীর সহযোগিতায় ভারতে প্রস্তুত YENKAY স্পীডোমিটার ইলেকট্রিক ও ডিজেল ইঞ্জিন এবং ই এম ইউ কোচে লাগানো আছে। এর সঙ্গে কাগজের একটা রোল থাকে এবং সেই কাগজে গ্রাফের সাহায্যে গাড়ী কত কিলোমিটার গতিতে কত পথ অতিক্রম করছে তা ছকের মত লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। তাতে কোন নির্দিষ্ট দূরত্বে গাড়ীর গতি কত ছিল বা কতদূর পর্যন্ত গাড়ীটি গিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে। শুনলে অবাক হতে হয় যে, হাজার হাজার টাকা খরচ করে লাগানো এই যন্ত্রগুলোর একটাও চালু নেই। এটা চালু থাকলে অনায়াসেই হাবড়া লোকালের অতিক্রান্ত দূরত্ব ধরা পড়তো। এর মধ্যে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে রেল প্রশাসন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এগুলোকে অচল করে রেখেছে। তারপর, রেলরোডের কথা। একমাত্র রাজধানী এক্সপ্রেসের রুট ছাড়া ট্রাক রিনিউআল গত বছর যাবত বন্ধ।

গোটা দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত রেল প্রশাসনের মধ্যে শিয়ালদার বিভাগীয় দুর্নীতি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। মেনটেনেন্স কেন হয়না তা জানতে হলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, এখানে বর্তমানে যিনি ডি ই ই (টি আর এস) সেই করিৎকর্মা রত্নেশ্বর চ্যাটার্জী রেলের কাজে মনোনিবেশ করার চেয়ে স্পোর্টস এবং অন্যান্য ব্যাপারেই বেশী ব্যস্ত। প্রাক্তন ডি এস কল্যাণকুমার দাসের অনুগত সহচর রত্নেশ্বরবাবু সমাজবিরোধী এবং মস্তান পরিবৃত হয়ে বর্তমানে শিয়ালদায় বাস্তুঘঘুর বাসা তৈরী করেছেন। ওপরওয়ালাদের নানা কায়দায় মনোরঞ্জনের বিধি বন্দোবস্ত ছাড়াও রত্নেশ্বর চ্যাটার্জী বর্তমানে শাসক কংগ্রেসেরও অনুগত সেবক এবং প্রদীপ ঘোষদের আপনজন। এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে মধুচক্রজনিত কার্যকলাপের অভিযোগও বহুদিনের। এক কথায় বলা যায়, এখন তিনি মুকুটবিহীন সম্রাট। অই, দীর্ঘ আট বছর ধরে তিনি এখানে কহাল তবিয়তে বাস করছেন। বদলী হচ্ছেন না। এরই ছত্রছায়ায় বাস করে কিছু অজ্ঞ ও অপদার্থ লোক মেনটেনেন্স স্টাফ হিসেবে বহাল তবিয়তে মাইনে নিচ্ছে। অতএব, গাড়ীর মেনটেনেন্স হবে কখন আর হবেই বা কি দিয়ে? মালপত্র সবতো লোপাট। এক থেকে ষোল মিলিমিটার রেঞ্চ পর্যন্ত কারশেডে অভাব ছিল এখন নেই। সবাই জানে, এগুলো কে কিংবা কারা নিয়েছে। কিন্তু, বলা যাবে না। বললেই মাথা ফাটবে। এমন কি, জানও চলে যেতে পারে। এককথায়, শিয়ালদা কারশেড এবং ইয়ার্ড জুড়ে চোর ডাকাত খুনে আর লুঠেরাদের রাজত্ব। শিয়ালদা বিভাগীয় কর্তারা সবই জানেন। শুধু রত্নেশ্বর চ্যাটার্জী নন, ডি এস ডি সি এস, ডি ও এস, ডি এম ই প্রমুখ প্রত্যেকেই এগুলো জানেন। অতএব দুর্ঘটনা হবেনা কেন? গাড়ীর প্রয়োজনীয় পার্টস বলতে যদি জোড়াতালি দেওয়া হয় তবেতো দুর্ঘটনা হবেই। এসব দুর্নীতি দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। দুর্ঘটনার তদন্তের সঙ্গে দুর্নীতির ব্যাপকভাবে বিস্তৃত পটভূমিটিও তদন্তের আওতায় আনতে হবে। নইলে, স্থায়ীভাবে দুর্ঘটনার মূলোচ্ছেদ সম্ভব নয়।

উল্টাডাঙ্গা দুর্ঘটনায় কত লোক নিহত হয়েছেন তার সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব না হলেও যে কথাটা বলা যায় তা হচ্ছে এই যে, আট বগী যুক্ত একটি ই এম ইউ রেকে রেলের নির্দিষ্ট আসন অনুযায়ী ষোল শ লোক ধরে। কিন্তু কার্যতঃ প্রত্যেক গাড়ীতে যাত্রীসংখ্যা থাকে অন্ততঃ তিনগুণ। অর্থাৎ প্রত্যেক বগীতে দুশর জায়গায় ছয়শ। বনগাঁ লাইনের যে কোন গাড়ীতে যে কোন সময় ভীড় হয় আরও বেশী। বিশেষ করে অফিস ছুটির সময় শেষ বগীতে সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার গুণ। এমতাবস্থায় হাবড়া লোকালের চূর্ণবিচূর্ণ শেষ বগীতে কত লোক নিহত হতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু, এই সত্য উদ্ঘাটনের উপায় কি? এর একমাত্র উপায় বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গঠিত বে-সরকারী তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সামগ্রিক অনুসন্ধান। অথবা হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে পরিচালিত বিচারবিভাগীয় "প্রকাশ্য" তদন্ত কমিশন। বর্তমানে রেলের নিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার কর্তৃক যে তদন্ত হচ্ছে তা নিরপেক্ষ নয়, হতে পারেনা। কারণ, রেলই এ সি আর এস কমিশন নিয়োগ করেছে। নিয়োগ কর্তা ভারত সরকার কিংবা রাজ্য সরকার নয়। এ্যাকসিডেন্ট মানুয়ালের ১৫৫ ধারায় তদন্তর তিনটি শ্রেণীভাগ করা হয়েছে যথাক্রমে এ সি আর এস যুক্ত তদন্ত কমিটি (রেল অফিসারদের) এবং বিভাগীয় তদন্ত। কিন্তু, এরই সঙ্গে বলা হয়েছে,

"The Central Government may also order a commission of enquiry to enquire into very serious accidents under the commission of Enquiry Act of 1952 (LX of 1952).

এই বইয়েরই এ্যাপনডিক্স আই তে বাইশ নং পরিচ্ছেদে রাজ্য সরকার কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত কমিশন নিয়োগ ক্ষমতার উল্লেখ প্রসঙ্গে রেলওয়ে বোর্ডের উনিশ শ তিরিশ সালের উনিশে মার্চ তারিখের এক হাজার নয় শ ছাব্বিশ-টি নং চিঠিটি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে,

"Whenever an accident, such as is described in Sec. 83 of the Act, has occured in the course of working a railway, the district magistrate or any other magistrate who may be appointed in this behalf by the local government".

যে দুর্ঘটনায় যাত্রী নিহত হয়েছেন এমন প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেকশন তিরাশি-এর আওতায় পড়ে। এতদ সত্ত্বেও, ভারত সরকার কিংবা রাজ্য সরকার কোন তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন নি। এর রহস্য বর্তমানে দেশবাসীর কাছে খুব দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু, এ সি আর এস-এর যে তদন্ত কমিশন চলছে সেটা কি নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হতে পারে? আমার বক্তব্য, পারেনা। কারণ, এ সি আর এস মূলতঃ রেলেরই লোক। রেল কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত ব্যক্তিদেরই এই পদে নিয়োগ করা হয়। বাহ্যতঃ, এই পদটি যোগাযোগ ও পরিবহন দপ্তরের আওতাধীন হলেও এটা সম্পূর্ণ ডেপুটেশনের কাজ, ঐ পদে নিযুক্ত ব্যক্তির "লিয়েন" রেলে থেকে যায় অর্থাৎ ঐ পদে কাজের মেয়াদ শেষ করে উক্ত এ সি আর এস আবার রেলে ফিরে আসতে পারেন। এতো গেল আইনের ব্যাখ্যা। বর্তমান এ সি আর এস কমিশনের বাস্তব চিত্র আরও মারাত্মক। কমিশন নিয়ম অনুযায়ী একজন রেল অফিসারের সাহায্য (এসিসটেন্ট) নিতে পারেন কিন্তু সেই অফিসার সাক্ষীর প্রশ্নকারী (ইন্টারগেটর) কমিশনের নির্দেশক (কন্ডাক্টর) হতে পারেননা। শিয়ালদা ডি এস অফিসে যে তদন্ত কমিশন বসেছে সেখানে গেলেই দেখা যাবে যে, এ সি আর এস শ্রীএস কে মজুমদারের পাশাপাশি চেয়ারে বসে আছেন রত্নেশ্বর চ্যাটার্জী সহ সমস্ত বিভাগীয় কর্মকর্তারা। বসে আছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বসে আছেন রেলের "অনুগত" বলে পরিচিত কয়েকজন। এরাও নাকি সাক্ষী দেবেন। প্রশ্নকারী সবই বিভাগীয় কর্তারা। এ সি আর এস মাঝে মাঝে দু একটি প্রশ্ন করছেন। এখানে দুটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। (এক) বিভাগীয় কর্তারা নিজেদের সুবিধামত প্রশ্ন করছেন। (দুই) সাক্ষী যে জবাব দেবেন সেটা তারা শুনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আত্মরক্ষামূলক জবাবটিও তৈরী করে ফেলছেন। সর্বোপরি সত্য এই যে, রেলকর্মীরা চাকরীর ভয়ে (অথবা প্রাণের ভয়ে) অফিসারদের সামনে মুখ খুলতে ভরসা পাচ্ছেননা। তাছাড়া, এ্যাকসিডেন্ট ম্যানুয়েলের এক শ বাহাত্তর ধারাও লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে তদন্ত কমিটি অথবা কমিশন,

"..., must decide whether on the reported facts there are sufficient grounds for treating an employee or employees as "accused". If so, the accused should be permitted to be present throughout the enquiry and to examine and cross examine the witnesses",

৪৩ আপের ড্রাইভারকে প্রয়োজনমত ডাকা হচ্ছে। আগরপাড়া উপস্থিত থাকতে দেওয়া হচ্ছেনা। এরপর, এই সিদ্ধান্তে অনায়াসেই আসা যায় যে, শিয়ালদা বিভাগসহ গোটা রেল প্রশাসন আজ উল্টাডাঙ্গা ট্রেন দুর্ঘটনার সমস্ত দায়িত্ব এড়াবার জন্য ছলে বলে কৌশলে আসল সত্যকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন। কিন্তু, যেখানে ছয় শতাধিক লোক নিহত হয়েছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে সেখানে আসল সত্য চাপা দেবার এই শয়তানী অপপ্রয়াসকে কি দেশবাসী মেনে নেবেন? সমস্ত রেল কর্মীরাও কি এই জঘন্য চক্রান্তের কাছে নতশির হয়ে থাকবেন-? রাজ্যের যাবপন্থী নেতৃবৃন্দ কি এগিয়ে আসতে পারেননা সংঘবদ্ধ তুমুল বিক্ষোভের ঢেউ তুলে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে? রেক, বগী, ইঞ্জিনের যা অবস্থা, রেলওয়ে ট্রাকের যা চেহারা তা দেখে বলা যায়, এ ধরণের দুর্ঘটনা হামেশাই হবে। এর বিরুদ্ধে রেলকর্মী এবং যাত্রী সাধারণের সার্বিক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ এই মুহূর্তে গড়ে না তুললে আরও ভীষণ বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। বিচার, রেলে চোর ডাকাত খুনে বদমায়েসদের রাজত্ব চলবে না নিজেদের নিরাপত্তার তাগিদে রেলকর্মীরা এবার সজাগ ও সচেতন হবেন?

সরকারী চিকিৎসকদের কাজে গাফিলতি

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

গত ষোলই ডিসেম্বর চুয়াত্তর থেকে প্রতি সোমবার (অনির্দিষ্ট কালের জন্য) মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সরকারী উদ্যোগে পল্লী বাংলার মায়েদের স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ শিবির চালু হয়েছে। বর্ধমানের খ্যাতনামা স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ-তরুণ সার্জেন ডাঃ নীলাঞ্জনশশী রায় একজন বেসরকারী চিকিৎসক হয়েও স্বীয় ব্যবসাকে উপেক্ষা করে প্রতি সোমবার নিয়মিত ভাবে অপারেশন করে যাচ্ছেন। বর্ধমানে অনেক খ্যাতনামা সরকারী চিকিৎসক নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে নার্সিং হোম চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সরকারী এই প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন না কেন? শোনা যাচ্ছে যে, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজার বিশেষ অনুরোধক্রমে শীঘ্রই ডাঃ নীলাঞ্জন শশী রায় অজিতবাবুর দেশের একস্থানে (মঙ্গলকেট থানায়) একটি শিবিরে অপারেশন করতে যাচ্ছেন। এই গরীব দরদী জনপ্রিয় চিকিৎসকটি তাঁর পরিচালিত নার্সিং হোমে প্রতি মাসে চারজন দুঃস্থ পল্লীমাতার বিনা পারিশ্রমিকে অপারেশন করেন। ইতিপূর্বে বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব, রোটারী ক্লাব, রেডক্রশ সোসাইটিতে এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে প্রচুর অপারেশন করেছেন। অথচ সরকারী (বেতনভুক কর্মচারী) চিকিৎসকরা এ বিষয়ে উদাসীন কেন? তবে কি আমরা বুঝবো যে, সরকারী কাজে সরকারী চিকিৎসকরা এবং চিকিৎসা দপ্তরের সঙ্গে জড়িত কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত?

যেমন গত ছাব্বিশে ডিসেম্বর চুয়াত্তর বৃহস্পতিবার বর্ধমান থেকে প্রকাশিত "দৈনিক দামোদর" পত্রিকায় "স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কৃষিক্ষেত্র?". শিরোনামায় মন্তেশ্বর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কমপাউন্ডারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জমিতে ধানচাষ করার এবং (যদিও সরকারী আদেশে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গরু পোষা অন্যায়) গরু পোষার অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণীর গরীব কর্মচারীরা চাষ করতে গিয়েও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বাধায় চাষ করতে পারলেন না অথচ কমপাউন্ডারবাবু কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে কেন সেই অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় মন্তেশ্বর ব্লকের কো-অপারেটিভ দপ্তরের একজন অফিস আর্থারের সহায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসারের নিষেধ সত্ত্বেও চাষ করলেন?

উনিশশো চুয়াত্তর সালের কোন এক সময় "কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গরু পোষা যাবে না এই সরকারী আদেশকে পদদলিত করে (আদেশ পত্রে স্বাক্ষর করেও) আজও তিনি গরু পুষে চলেছেন। অথচ ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার তার কোয়ার্টারের কিছু দূরে নিজের গরু রাখার জন্য চালাঘর নির্মাণ করেছেন।

.. (শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়) ..

ধর্মঘটোত্তর পরিস্থিতি (৪)

রেলকর্মীদের পোলারাইজেশন ও প্রশাসনিক হিংস্রতা

(দর্পণের প্রতিনিধি)

শুধু মাত্র দমননীতি চালিয়েই নয়, এন সি সি আর এসকে নিশ্চিহ্ন করণের সার্বিক প্রয়াসও সরকার চালাচ্ছেন। এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে সি পি আই দল, দলের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এ আই টি ইউ সি এবং এ আই আর এফ নেতৃত্বের একাংশ, "মহান" শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গেতো খোলাখুলিই বলেই দিয়েছেন যে, ধর্মঘটের ফলে সরকার বিপন্ন হোক এটা তারা চাননা। তাই, সি পি আই কিংবা এ আই টি ইউ সির ভূমিকা যে আর যা-ই হোক ধর্মঘটকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নেবার পক্ষে সহায়ক হবে না এটা প্রাক-ধর্মঘট পর্বেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ধর্মঘটের আগে ডাঙ্গে অনেক গরম গরম কথা বললেও রাতারাতি এ আই টি ইউ সির অনুমোদিত ইউনিয়নগুলোকে নিয়ে রেল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন গঠনের তাৎপর্যটি তখনই বেইমানীর ইংগিত বহন করে এনেছিল। তখন কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে এন সি সি আর এসের কোড অব কন্ডাক্ট তৈরীর দাবী উঠলেও শেষ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ওয়ার্কার্স ফেডারেশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি মাঝপথে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এন সি সি আর এসকে প্রভাবিত না করা যায় তবে সি পি আই নেতৃত্বে পরিচালিত ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবেন।

এটাও আজ আর বিতর্কিত নয় যে, ডাঙ্গের দল প্রভাবিত অঞ্চলগুলোতে ধর্মঘটের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিন থেকেই দলীয় সদস্য কিংবা সমর্থক কর্মীরা দলবদ্ধভাবে কাজে যোগ দিয়েছেন। ধর্মঘটকালীন প্রতিবেদনে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ আমরা করেছি। স্থানাভাব হেতু এখন আবার নতুন করে সেই তালিকা পুনরুদ্ধৃত করছি না। ধর্মঘট শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই কে ডি মালব্যের বাড়ীতে খানাপিনার আসরে শুরু হয় গুপ্ত নাশকতার দলিল রচনা। এবং এক্ষেত্রেও যে ডাঙ্গে এবং তার দল চক্রান্তের দোসর ছিল সেই সত্যও আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট। একই সঙ্গে লোকো রানিং স্টাফ এসোসিয়েশনের ধর্মঘট-বিরোধী চক্রও বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে।

একটি জিনিষ কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ভারত সরকার প্রথম থেকেই রাজনৈতিকভাবে ধর্মঘটের বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর ছিল। এবং এর জন্য তারা ক্ষেত্রও প্রস্তুত করছিল। তেসরা জুন তারিখে রাজ্য সভায় বর্তমানে প্রয়াত তৎকালীন রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র বলেন,

"We have sufficient evidence in our possesion to show that Shri Fernandes was not only preparing for a strike but for something bigger than a strike".

কি সেই বৃহত্তর প্রস্তুতি, এটা কিন্তু ললিতবাবু বলতে পারেননি, কারণ তিনিই বলেছেন, "I do not mean to say that he was preparing for some bloody revolution".
Indian Railways in the biggest industrial concern, something bigger than a strike.

তবে এই বৃহত্তর প্রস্তুতিটা কি? স্মর্তব্য যে, সি পি আই নেতা ডাঙ্গে ঠিক একই সুরে বলেছেন যে, ধর্মঘটকে তারা রাজনৈতিক হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে চাননা। বিচার্য, রেল কর্মীদের দাবীগুলো কি সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে নির্দেশিত ছিলো অথবা এটা ছিল তাদের বৈধ অধিকারের দাবী?

প্রথমেই, বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নটি বিচার করা যাক। সরকার রেলকর্মীদের নিম্নতম বেতন স্থির করেছেন একশ ছিয়ানব্বই টাকা। উনিশশো বাহাত্তর সালের বাজার দর অনুযায়ী তিন ইউনিটের এক পরিবারের জন্য নিড বেস্ড থার্ড পে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছিল তিনশ চোদ্দ টাকা। (খাই খরচ ২১৫·০৫ জামা কাপড় ১০৷·৫০ বাড়ীভাড়া ২৫·৫০ এবং অন্যান্য ৬২·৭৫= ৩১৩·৮০ টাকা)। কিন্তু সরকারের অর্থাভাবের প্রশ্ন তুলে কমিশনা পরবর্তী ধাপে নিরামিষ খাদ্য তালিকার ভিত্তিতে নিড বেস্ড স্থির করেন ১৯৬ টাকা (খাই খরচ ১৩১·৭০, জামা কাপড় ১০৷·৫০, বাড়ী ভাড়া ১৪·৭১ এবং অন্যান্য ৩১·২৩= ১৯৬·১৪ টাকা)। অথচ, পে-কমিশনের নির্দেশিত খাদ্যতালিকায় দুবেলার যে পার্থক্য সূচীত হয়েছে সেই অনুসারেই বেতন হওয়া উচিত ২৭৬·৮৩ টাকা। এই দাবীর লড়াই নিশ্চয়ই সামগ্রিং বিগার দেন এ স্ট্রাইক নয় অথবা ডাঙ্গে বর্ণিত রাজনৈতিক হাতিয়ারের ব্যবহার নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বোনাস। সুপ্রীম কোর্টের মতে "ইণ্ডিয়ান রেলওয়েস ইজ দি বিগেস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কনসারণ" বোনাস সম্পর্কিত প্রশ্নে উনিশশো তেষট্টি সালে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, "কাজের চরিত্রের ওপর বোনাস নির্ভর করে। কার পরিচালনায় এবং কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাতেও কিছু এসে যায়না। যেহেতু ভারত সরকারই রেলের মালিক-রেল বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয় সেই কারণে বোনাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের পৃথক ভাবে বিচার করতে হবে যথার্থ যুক্তি হিসাবে এটা স্বীকৃত হতে পারে না।

এক্ষেত্রে সরকার সুপ্রীম কোর্টকেও অমান্য করেছেন। উনিশশো সালে বোনাস বিড়িয়া কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ বি কে মদন তার রিপোর্টে বলেছেন যে যেখানে শ্রমিকের প্রাপ্ত বেতন লিভিং ওয়েজের কম সেখানে লিভিং ওয়েজ আর প্রাপ্ত বেতনের ফারাক বোনাস দিয়ে পূরণ করা হয় এবং সেই কারণে বোনাস বেতনের গচ্ছিত অংশ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু, ভারত সরকার স্টোও গ্রহণ করেননি। বিস্ময়ের কথা এই যে, ডাঙ্গে তার দলীয় কাগজে বোনাস সংক্রান্ত প্রশ্নে বলিষ্ঠ দাবী না তুলে এল পি মিশ্রের বয়ানকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন জানালেন। এই বোনাসের দাবীও নিশ্চয় সামথিং বিগার দেন এ স্ট্রাইক নয় অথবা ডাঙ্গে বর্ণিত রাজনৈতিক হাতিয়ারের ব্যবহার নয়। মোদ্দা কথা, ভারত সরকার এবং সি পি আই দলের এতদসম্পর্কিত চিন্তার কোন মৌল পার্থক্য নেই।

এ আই টি ইউ সি আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের মধ্যেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে শ্রমিকের মৌলিক অধিকারে রূপান্তরণের দাবী তাই ডাঙ্গেদের কাছে রাজনৈতিক হাতিয়ারের ব্যবহার বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এন সি সি আর এসের অ্যাকশন কমিটিতে সি আই টি ইউ-র প্রতিনিধি সমর মুখার্জী এম পি এবং নৃসিংহ চক্রবর্তীর উপস্থিতি তাই এ আই টি ইউ সি তথা সি পি আই দলের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ধর্মঘট শুরু হবার আগে এল আর এসের নেতৃত্বে লোকো রানিং স্টাফের সফল সংগ্রামে সরকারকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। পরবর্তী কালে এস কে ধর প্রমুখ এল আর এসের নেতারা বৃহত্তর রেল কর্মী সংগ্রামের সঙ্গে লোকো রানিং স্টাফের দাবীর লড়াইকে একত্রীভূত করতে চাইলেও এসোসিয়েশনের নেতৃত্বের একাংশ একে বানচাল করতে চাইলেন। তারাও গুপ্ত নাশকতায় মদত দিলেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সি আই টি ইউ প্রভাবিত রেল ইউনিয়ন সংস্থার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু, আঞ্চলিকভাবে সি আই টি ইউ প্রভাবিত নেতৃত্ব যেখানেই ছিল সেখানেই ধর্মঘট ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। প্রসঙ্গত চিত্তরঞ্জন কারখানার কথা বলা যায়।

এই সঙ্গেই আর একটি ঘটনার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। এ আই আর এফের সাধারণ সম্পাদক প্রিয় গুপ্ত ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে একমত না হলেও ধর্মঘট চলাকালীন গুপ্ত নাশকতার বিরুদ্ধে কি সক্রিয় প্রতিরোধের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন? করেননি। কে ডি মালব্যের বাড়ীতে বসে যে চক্রান্ত হয়েছে তা তার অজানা ছিলেনা, কিন্তু, সেই সঙ্কটমুহূর্তে তিনি ধর্মঘটিদের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তারে কি উদ্যোগী হয়েছিলেন? বরং, বলা যায় যে, এন সি সি আর এস যেমন ডাঙ্গেদেরও মনোঃপূত ছিলনা। তেমনি ঠিক প্রিয় গুপ্তদেরও ছিলনা। তাই এক গুলিতে দুই বাঘ মারার সুযোগের তিনি অপব্যবহার করেন নি।

অর্থাৎ, ধর্মঘটের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তিনি একই সঙ্গে ফার্ণান্ডেজ এবং এন সি আর এসকে খতম করার স্বপ্ন দেখলেন। সি আই টি ইউ কে যে তিনি কোনভাবেই সহ্য করতে পারেননি তাতো আর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখেনা। তাই, গুপ্ত নাশকতার ফলে ব্যর্থ ধর্মঘটের পরে যখন এন সি সি আর এসকে আরো শক্তিশালী করে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা তখন বশম্বদ শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় গুপ্ত, মণিবেগ বাবা, বশিষ্ট প্রমুখ এ আই আর এফ নেতারা এন সি সি আর এসকে নির্মূল করার দিকেই উৎসাহ দেখাচ্ছেন। ফার্ণান্ডেজের প্রতি তাদের বিরোধিতাও প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে। লেয়ার লেবেলে কিন্তু এন সি সি আর এস এখন রেলকর্মীদের সংগ্রামের স্থিতিনিষ্ঠ বিবেকের প্রতীক। অনৈক্য টপ লেবেলে। কেন্দ্রীয় এন সি সি আর এসের সভাও করা সম্ভব হচ্ছেনা। সরকারী চক্রান্ত আংশিত সফল বলা যায়।

এই অনৈক্যের সুযোগে রেল প্রশাসন অনেক বেশী হিংস্র হয়ে উঠেছে। এ আই টি ইউ সির সমর্থকরা লোয়ার লেবেলে এন সি সি আর এসের সভায় আসছেনা। এমন কি, কর্তৃপক্ষের ধর্মঘটোত্তর হিংস্রতর আচরণের সার্বিক প্রতিবাদে তারা শরিক হচ্ছে না। তাদের প্রভাবিত অঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও তারা নির্বিকার। এতদসত্ত্বেও বরখাস্ত সহকর্মীদের কাজে ফিরিয়ে আনতে রেলকর্মীরা বদ্ধপরিকর তাদের ন্যায্য ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অর্জনের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে। এককথায়, এবারের রেলধর্মঘটের মধ্য দিয়ে পোলারাইজেশন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সরকারী চিকিৎসক

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

এই গরু পোষা নিয়ে ও গ্রামের চাষীদের ফসল নষ্ট করা নিয়ে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে অনেক ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটে গেছে। বর্ধমানের সি এম ও এইচ মহাশয়ের তা অজানা নয়।

সকাল আটটায় আউটডোর আরম্ভ। অথচ ঐ সময় কমপাউন্ডার বাবুকে বাজারে দেখা যায় কিংবা গরুর সেবা করতে দেখা যায়। বাড়ির অন্যান্য কাজ সেরে বেলা সাড়ে নয়টার সময় তিনি খেয়াল খুশীমত আউটডোরে পদধূলি দেন। এই ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারও অসহায়। প্রায়ই বিকালে কোন ইমার্জেন্সী রোগীকে নিয়ে গেলে কমপাউন্ডারবাবুকে ডাক্তারবাবুরা বার বার ডেকেও পান না। কমপাউন্ডার বাবুর বাড়ীর লোকেরা বলেন, "বাজারে গেছেন, এক্ষুনি এসে যাবেন।" কিন্তু পরে জানা যায় তিনি বালিজুরী গ্রামে, সিংহালীগ্রামে ও জয়রামপুর গ্রামে রোগী দেখতে গিয়েছেন। ঐ তিনখানি গ্রামের অর্ধেক শতাংশ পরিবারের তিনি পারিবারিক চিকিৎসক। কুকুর কামড়ানো ইনজেকশনের জন্য নাকি প্রত্যেক অশিক্ষিত গরীব রোগীদের চোদ্দ টাকা করে কমপাউন্ডার বাবুকে দিতে হয়। জয়রামপুর গ্রামের শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তীর বাড়ী গিয়ে প্রত্যহ তিনি ইনজেকশন করে এসেছেন অর্থের বিনিময়ে। কারণ শ্রীবন্দোপাধ্যায়ের ছেলে ও শ্রীচক্রবর্তীর ছেলেকে কুকুর কামড়ে ছিল। সিংহালী গ্রামের শ্রীরমাপ্রসাদ কুণ্ডুর বাড়ির তিনি একজন বাধা চিকিৎসক। গত উনিশে ডিসেম্বর তারিখে রমাপ্রসাদ কুণ্ডুর স্ত্রীকে (বর্ধমানের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সি বি চ্যাটার্জীর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী) ডাঃ চ্যাটার্জীর দেওয়া ইনজেকশন আজও তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ ফেলে রেখে প্রত্যহ দিতে যাচ্ছেন। বলে অভিযোগ,

কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মচারীদের অভিযোগ যে কমপাউন্ডারবাবু আউটডোরে অনেক রোগীর (যারা গরীব ও অশিক্ষিত) কাছ থেকে ভাল ঔষধ দেবার নাম করে টাকা নেন। অবশ্য কর্মচারীরাই এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু প্রকাশ্যে বলার মত তাদের অধিকার বা ক্ষমতা নাই। প্রত্যেককে আলাদাভাবে গোপনে তদন্ত করলেই এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ হবে।

চটকল ধর্মঘট : শ্রমিক মালিক ও প্রশাসনিক চরিত্র

গত ৩রা জানুয়ারী থেকে বাষট্টিটি চটকলের প্রায় আড়াইলক্ষ শ্রমিক লাগাতার ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। বাঁশবেড়িয়া থেকে উলু-বেড়িয়া এবং হাজিনগর থেকে বজবজ-গঙ্গার দুই তীরে সব কটি চটকলের বাঁশী বন্ধ, চিমনীর ধোঁয়া বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গের এই ধর্মঘটী আড়াই লক্ষ শ্রমিক শুধুমাত্র এই রাজ্যের বাসিন্দা নয়, উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি জেলা থেকে, বিহারের প্রতিটি জেলা থেকে, উড়িষ্যার কটক, বালেশ্বর, গঞ্জাম, সম্বলপুর প্রভৃতি জেলা থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের দুই। তিনটি জেলা থেকে এবং আসাম-নেপাল-পাঞ্জাব-মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশ থেকে রুজি রোজগারের-ধান্দায় এখানে কাজ করছেন। সেই কারণে চটকলের এই ধর্মঘটী শ্রমিকরা সর্বভারতীয় শ্রমিক সমাজের একটি নির্ভরযোগ্য অংশ। এই আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে রয়েছে ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি, আছে ভারতের প্রতিটি ট্রেড-ইউনিয়ন। ভারতের এই একমাত্র শ্রমিক গোষ্ঠী, যারা তাদের প্রতিটি আন্দোলনে, প্রতিটি ধর্মঘটে প্রতি বছরই একটি মাত্র মঞ্চে সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে দাঁড় করায়।

বাষট্টিটি চটকলের মালিক গোষ্ঠীও একটি সংস্থা ভুক্ত। এই সংস্থার নাম আই, জে, এম, এ—চটকল শ্রমিকদের ভাষায় আলুগুদাম। এই আলুগুদামের সদস্য হল নয়টি বুর্জোয়া বিত্তশীল পরিবার। এই নয়টি শিল্পপতি বছর বছর চটশিল্প থেকে কোটি কোটি মুনাফা অর্জন করছে। এই মুনাফার টাকা দিয়ে তারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন শিল্পভোগ গ্রহণ করেছে। শুধুমাত্র তাই নয়, এই মুনাফার টাকা দিয়ে করছে খাদ্য মজুত, বাড়ী-গাড়ী-স্বজন পোষন, কালোবাজারী, এমনকি হিসাবের কারচুপির জন্য সরকারকে ফাঁকি দেবার জন্য, শ্রমিকদের ফাঁকি দেবার জন্য, দেশকে ফাঁকি দেবার জন্য পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কে অর্থ মজুত করছে। মালিক গোষ্ঠীর তিন প্রকার হিসাব : এক নম্বর হিসাবে শ্রমিককে জানানো হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্য বিশ্বের বাজারে বিক্রয় করে মোটেই লাভ হচ্ছে না, বরঞ্চ ক্রমদরে মাল বেচার জন্য ক্রমাগত ক্ষতি হচ্ছে। দুই নম্বর হিসাবে তারা সরকারকে জানাচ্ছে, যে উৎপাদন কম হওয়ার জন্য বিশ্বের বাজারে ঠিকমত যোগান না দিতে পারার ফলে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে কোন লাভ হচ্ছে না। তিন নম্বর হিসাবে শুধু নিজেরাই জানতে পারছে কতটা শ্রমিকদের ফাঁকি দেওয়া হল, কতটা সরকারকে ফাঁকি দেওয়া হল এবং কত পরিমাণ কালো টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা করা হল। এই হল মালিক চরিত্র।

পশ্চিমবঙ্গের এই চটশিল্প নিছক বেসরকারী শিল্প। কিন্তু ভারত-সরকার যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য বিদেশের বাজারে বিক্রয় করে যত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার সিংহভাগ অর্জিত হয় চটজাত পণ্য থেকে। ভারতের যত প্রকার শিল্প-জাত দ্রব্য আছে তার মধ্যে প্রধান তম দ্রব্য হল চটজাত দ্রব্য, অন্তত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। অথচ যত প্রকার শিল্প-শ্রমিক আছে, তার মধ্যে সব চাইতে নিগৃহীত এবং নির্যাতীত হল চটকল-শ্রমিকরা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য একটি সরকারী হিসাব। ভারতে যখন ইংরাজের শাসন তথা শোষণ কায়েম ছিল, তখন আইন ছিল ভারতের যে সমস্ত প্রদেশগুলির উৎপাদিত দ্রব্য বিশ্বের বাজারে বিক্রয় করে যত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে, সেই সব প্রদেশগুলিকে সঠিক হিসাব মত শতকরা আশী ভাগ মুদ্রা দেওয়া হবে এবং শতকরা কুড়ি ভাগ করে কেন্দ্রের প্রাপ্য হবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রকে আর্থিক দিক দিয়ে আরও বেশী শক্তিশালী করার জন্য নতুন আইন তৈরী করলো যে বৈদেশিক মুদ্রা ভাগ-বাঁটোয়ারা করার ক্ষেত্রে আশী আগের পরিবর্তে রাজ্য-গুলি পাবে শতকরা কুড়ি ভাগ এবং কেন্দ্র পাবে শতকরা আশী ভাগ। এই নয়া কানুন প্রয়োগ করেও কেন্দ্রীয় সরকার দেখলো চটের জন্য পশ্চিমবঙ্গ অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে অন্যান্য প্রদেশের চাইতে। তখন কেন্দ্রীয় সরকার শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শতকরা কুড়ি ভাগ হিসাবের আইন তুলে দিয়ে শতকরা কোন হার নির্দিষ্ট না করে একটা থোক (লামসাম এমাউণ্ট) টাকা দেবার ব্যবস্থা করলে। এই হল সরকারী চরিত্র।

চটকল শ্রমিকদের দাবী ছিল যে ইতিপূর্বে যে সমস্ত দ্বিপাক্ষিক (মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ) এবং ত্রিপাক্ষিক (মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ ও সরকার) চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসা হয়েছিল সেই সমস্ত চুক্তি কার্যে রূপায়িত করতে হবে, শতকরা কুড়ি টাকা হারে বোনাস দিতে হবে, এবং ভট্টাচার্য কমিশনের রায় অনুযায়ী ধার্য ছাপান্ন টাকা মাগ্গীভাতা দিতে হবে। এই তিনটি দাবীর ন্যায় সঙ্গত মীমাংসা না হওয়ার জন্য গত ছয়ই জানুয়ারী থেকে আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট সুরু হয়েছে। কারণ মালিকপক্ষ কোন

বিজলী মিস্ত্রী

দাবীকেই গ্রাহ্য বা বিবেচ্য বলে গণ্য করলো না এবং সরকার কমিশনের রায় অনুযায়ী ধার্য্য ছাপান্ন টাকার স্থলে মাত্র ষোল টাকা শ্রমিকদের দেবার জন্য মালিককে আইনতঃ বাধ্য করলো। ধর্মঘট এখনও চলছে, মাঝে মাঝে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকও বসছে কিন্তু কোন মীমাংসাতে পৌঁছানো কারও দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। এই হল ধর্মঘটের চরিত্র।

নেপথ্য কাহিনী কি? আই, এন, টি, ইউ, সির ত্রিদলীয় মোর্চা চেয়েছে ধর্মঘট সুরু হোক ছয়ই জানুয়ারী থেকে এবং সি, আই, টি, ইউ এর নয় দলীয় মোর্চা চেয়েছিল মার্চ মাস থেকে ধর্মঘট সুরু হোক। কারণ গত বছরে যে তেত্রিশ দিন চটকল ধর্মঘট হয়েছিল তার এখন ৩৬৫ দিন অতিবাহিত হয়নি। তাছাড়া জানুয়ারী মাসে আর্থিক চাপ সাধারণত অন্যান্য মাসের (পূজার মাস ছাড়া) চেয়ে বেশী হয়, বিশেষত বিত্তহীন শ্রমজীবীদের পক্ষে। সর্বোপরি এই সময়ে চটজাত দ্রব্যের বাজার নিম্নগামী হয়। পুরানো অর্ডার বন্ধ হয়, নতুন অর্ডার নেবার বা পাবার সময় এখনও এক/দুই মাস বাকী। দুই তিন বছর অন্তরই এই-রকম হয়ে থাকে চটকলগুলিতে। বৃটিশ আমলে এই সময়ে সাধারণত শ্রমিক ছাঁটাই বা লক-আউট হয়ে যেতো। এখন এই গণতন্ত্রের যুগে এসব সম্ভব নয় কোন মালিকের পক্ষেই। মালিকদের বাধ্য হয়ে লে-অফ দিতে হয়। কাজেই এই সময় ধর্মঘট কাম্য ছিল না। আগামী মার্চ্চে মালিকরা নতুন অর্ডার পেয়ে পূর্ণ উদ্যমে কাজ সুরু করতো, সেই সময়ে ধর্মঘটের ব্যবস্থা হলে মালিকের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যেতো। সর্বোপরি সামনের লোকসভা নির্বাচনের জন্য মার্চের ধর্মঘট সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতো। এই দুটি মুখ্য কারণের জন্যই বামপন্থী জোট চায়নি জানুয়ারীতে চটকল ধর্মঘট সুরু করতে।

গত ৭৪ সালের চটকল ধর্মঘট যে রূপ ধারণ করেছিল এবং সেই ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে আই, এন, টি, ইউ সির শিশিরবাবুকে সইতে হয়েছে চটকল শ্রমিকদের বিদ্রুপ, শ্লেষ। মালিকপক্ষকে দৈনিক হাজার হাজার টাকা লোকসান দিয়ে মিল চালু রাখতে হয়। শেষে তেত্রিশ দিন ধর্মঘট চলার পর শ্রমিকনেতা কালী মুখার্জীর অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মালিকদের নির্দেশ দেন আরও ছাপান্ন টাকা শ্রমিকদের দেবার জন্য। মালিকপক্ষ প্রথমে রাজী না হওয়াতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সম্মান রক্ষার্থে ঋণ হিসাবে দিতে আদেশ করেন। তখন বামপন্থী নেতৃবৃন্দ শহীদ মিনারের জমায়েতে এই ছাপান্ন টাকার কথা উল্লেখ করেন। এই ছাপান্ন টাকা দেওয়াতে শিশিরবাবুকে অপমান করা হয়, অপমানের হোতা তারই শ্রদ্ধেয় সহনেতা কালীবাবু পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ নাগও এই টাকার ব্যাপারে (শ্রমিকরা ছাপান্ন টাকা আরও বেশী পাওয়াতে) দারুণ অসম্মান বোধ করেন। কারণ পূর্বেই তিনি বিভিন্ন জমায়েত ঘোষণা করেছিলেন, "যতদিন আমি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী থাকবো, ততদিন চটকল শ্রমিকরা আর এক পয়সাও বেশী পাবে না।" কিন্তু চটকল শ্রমিকরা বেশী পেয়েছিল। এই সব তথ্য আলোচনা করলে দেখা যায় শিশিরবাবুর বিরোধী কালীবাবু আবার শ্রমমন্ত্রীর বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালে জানুয়ারীতে আই, এন, টি, ইউ, সি, ও তার ত্রিদলীয় জোট যখন ধর্মঘট স্থির করলো এবং বামপন্থী নয় জোটের অনুরোধে মার্চে পিছিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলো না, তখন বাধ্য হয়ে বামপন্থী জোটকেও ধর্মঘটে সামিল হতে হ'ল। কারণ বামপন্থী জোট ধর্মঘটে সাড়া না দিলে, শিশিরবাবু চীৎকার করতেন, সি, পি, এমরা মালিকের দালাল, তাই ধর্মঘট করতে চাইছে না।"

১৯৭৫ সালের এই ধর্মঘটের বাস্তবতা উপলব্ধি করলে দেখা যায়, কোন চটকল শ্রমিকই এই ধর্মঘট চায় নি। কারণ ১৯৭৪ সালের ওই তেত্রিশ দিন লাগাতার চটকল ধর্মঘট হয়ে যাবার পর থেকে স্বাভাবিক ভাবে মিল চলছিল না। বিদ্যুতের জন্য প্রথম প্রথম কয়েক মাস প্রায় সবগুলি চটকলই সপ্তাহে তিরিশ ঘণ্টা বা বত্রিশ ঘণ্টা চালু থাকতো। তারপর বাধ্যতামূলক ভাবে আইন করা হল সপ্তাহে একদিন করে বিদ্যুতের জন্য বন্ধ থাকবে। তখন থেকে চটকল শ্রমিকরা সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা করে কাজ পেতে লাগলো আট চল্লিশ ঘণ্টার বদলে। এই ভাবে শ্রম-ঘণ্টা কম হওয়ার দরুন শ্রমিকদের মজুরীও কম হতে লাগলো, প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি চটকল শ্রমিক দশ থেকে পনেরো টাকা কম পেতে লাগলো (লাগলো বললেই সব বলা হল না গত ৫ই জানুয়ারী '৭৫ পর্যন্ত তারা তাই পেয়ে এসেছে) তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা খাতে প্রতি সপ্তাহে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন থেকে আট/নয় টাকা করে কাটতে আরম্ভ করেছে। চটকল শ্রমিকদের এই ধরণের আর্থিক ক্ষতির মাঝে আবার লাগাতার ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে বেতন পাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে থাক, কোন চটকল শ্রমিকই তা চায়নি। কিন্তু শ্রমিকরা কি চায় বা না চায় তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুই হয় না, হয় নেতাদের মর্জির ওপর। শিশিরবাবু নেমেছেন মর্যাদার লড়াইয়ে। এই মর্যাদার লড়াইয়ে নির্যাতীত হচ্ছে আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক।

এই আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকদের মধ্যে পনের হাজার হল 'মিস্ত্রী' এবং 'বাবু'। এ যাবৎ চটশিল্পের কোন মীমাংসার কোন চুক্তি পত্রেই মিস্ত্রীদের জন্য বা বাবুদের জন্য পৃথক ভাবে কোন দাবীর সুরাহা হয়নি।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে যে সংবাদ প্রতিদিন নিহত হয় দৈনিক পত্রে, দর্পণ আপনাকে সে সংবাদ পরিবেশন করে নির্ভীক মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষাণ্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার
৬১নং মট লেন
কলিকাতা-তেরো

সতসিত

অনবদ্য চিত্র 'কোরাস'

সার্থক রাজনৈতিক ছবির নির্মাতা হিসাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ পথিক মৃণাল সেন তাঁর সর্বাধুনিক চিত্র "কোরাসে" আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন। যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি "পদাতিক" এবং "গরম হাওয়া"র (এম এস সাথ্যুকৃত) পর "কোরাস" ভারতবর্ষের তৃতীয় রসোত্তীর্ণ রাজনৈতিক ছবি। ফ্যানট্যাসি বা কল্প-কাহিনীর সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতার নির্যাসকে তিনি যেরকম নিপুণভাবে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন তা কেবল যে শিল্পসম্মত হয়েছে তাই নয়, তা শ্রীসেনের উচ্চমানের মননশক্তির পরিচয় বহনকারী।

প্রশ্ন উঠতে পারে সমকালীন বাস্তবতার নিষ্করুণ বিষয়গুলি নিয়ে ছবি তুলতে গিয়ে তিনি ফ্যানট্যাসির সাহায্য নিতে গেলেন কেন? পশ্চিম বাংলার গত চার বছরের পরিস্থিতির সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে সে রকম যে কোন ব্যক্তিকেই স্বীকার করতে হবে যে সাম্প্রতিক পশ্চিম বাংলার সত্য চিত্র তুলে ধরতে গেলে এবং তাকে সেনসর ও প্রশাসনের আইন-কানুন অতিক্রম করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে রূপক বা কল্প-কাহিনীর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ব্রেখটের স্টাইলের সঙ্গে আমরা বহুদিন ধরে পরিচিত থাকলেও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, অন্ততঃ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে, তা সম্পূর্ণ একটি নতুন ঘটনা ও অভিনব রীতি।

বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগরীতির সাহায্যে শ্রীসেন এই ছবিতে নিঃস্ব কৃষক, বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণী ও অসহায় নিম্ন-মধ্যবিত্তের কাহিনী এই রূপকাবৃত ছবিটির মধ্যে ঠাসবুনানির সাহায্যে গেঁথে তুলেছেন। শুধুমাত্র বর্তমানের ধূসর হতাশামণ্ডিত ছবি এঁকেই যদি তিনি থেমে যেতেন তাহলে তাঁকে আর দশজন বাণিজ্য-সফল পরিচালকের চাইতে বিশেষ স্বতন্ত্র মর্যদা দিতে পারতাম না। যা তাঁকে অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে, তা হলো আগামী দিনের শোষণমুক্ত উজ্জ্বল ও সুখী ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাঁর সুদৃঢ় আস্থা।

নিপুণ পর্যবেক্ষণ ও সহৃদয় শিল্পীমনের স্পর্শ ছড়িয়ে আছে ছবিটির সর্বত্র। কিছু কিছু দৃশ্যের কল্পনা ও গঠনশৈলী তো এককথায় অবিস্মরণীয়। মজুত ধান উদ্ধারে ব্যর্থ মনোরথ সরকারী অফিসারদের উদ্দেশ্যে গ্রাম্য জোতদারের শ্লেষাত্মক বক্রোক্তি, নিস্ব ভূমিহীন কৃষকের জোতদার-মহাজনের কাছে আত্মসমর্পণ—"মণ্ডল পিসে" থেকে "বাবু"-তে উত্তরণের ঘটনা, মত্ত এবং প্রহৃত শ্রমিকের অবচেতন মন থেকে উত্থিত "হাম ভুখ্ সে মরনেবালে / কেয়া মৌত্ সে ডরনেবালে" গান, ধর্মঘটী শ্রমিকদের সুবিশাল মিছিল, শ্রমিক-দের মিছিলে গ্রামবাসীদের সামান্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা, কৃষকদের মিছিলে "ঢ্যাম কুড়কুড়" রণবাদ্যের দৃশ্য এবং ছবির সমাপ্তির দিকে সর্বহারা কৃষকের উন্মত্ত চিৎকার—"তিরিশ হাজার কখনো মিথ্যা হতে পারে না—তিরিশ হাজার মিশে আছে আমাদের রক্তের সাথে"—এই দৃপ্ত ঘোষণার চিত্রকল্পগুলি অনবদ্য সুষমা মণ্ডিত।

ছবিটির আর একটি অসাধারণ সম্পদ মোহিত চট্টোপাধ্যায় (যুগ্ম-কাহিনীকার) রচিত তিনটি গান যা কিনা বাজারী পত্রিকার চোখে নির্বোধ ও কুরুচিপূর্ণ বলে গুন হয়েছে। ভাঁড়ামীর মুখোশটা টেনে খুলে দিলে কায়েমী স্বার্থের গায়ে তা জ্বালা ধরাবেই কাজেই বিস্মিত হবার কিছু নেই।

বুদ্ধিদীপ্ত ফটোগ্রাফি, অসাধারণ কিছু "ফ্রেম" সম্পাদনার নৈপুণ্যে কাহিনীর ক্ষিপ্র গতি এবং চলচ্চিত্র ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগ "কোরাস"কে সমকালীন একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। কণ্ঠসঙ্গীতের পাশে পাশে আবহসঙ্গীতও সমান জলে পা ফেলে চলেছে, কোন বাংলা তথা ভারতীয় ছবিতে এই প্রথম "আন্তর্জাতিক" গানের প্রয়োগ দেখা গেল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পুরনো একটি গান (হাম ভুখ্ সে মরনেবালে) ছবিটিতে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে ধ্রুবপদের মতো।

শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ঐক্যের উপর গঠিত জঙ্গী "শ্রেণীসংগ্রামই" যে মেহনতী মানুষের মুক্তির পথ সে বিষয়ে চলচ্চিত্রকারের আস্থা ও বক্তব্য অত্যন্ত ঋজু ও সরল। কোনরকম ভণিতা না করে সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের আহ্বান "কোরাস"-এর আর কোন ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

দীপান্বিতা রায়

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় রাহুমুক্তির সম্ভাবনা

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বশেষ খবর, কাম্বোডিয়ার প্রতিক্রিয়াপন্থী লন সরকার নমপেন রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন। নমপেন রক্ষার জন্য লনবাহিনী নমপেন শহরের নানা অঞ্চলে বেসামরিক অধিবাসীদের ওপর জোর জবরদস্তি শুরু করে দিয়েছে। নমপেনের যতত্র স্ট্রেনাচ কাটা হচ্ছে। জোরজার করে বাড়ী দখল করে সামরিক ব্যারাক করা হচ্ছে। বেসামরিক অধিবাসীরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। ছিনতাই, খুন-জখম নিত্যকার ঘটনা। অন্যদিকে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই যানবাহনের সারাদিন দৌড়ঝাপ। সেমস্ত ছেলেদের জোর করে সৈন্যবাহিনীতে ঢোকানো হচ্ছে। এখন নমপেনের মানুষ যে কোনো ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

আতঙ্কগ্রস্ত নলবাহিনী অবরুদ্ধ নমপেনের বাড়ি বাড়ি সিহানুকের গেরিলা তল্লাস করে ফিরছে। এখন বলতে গেলে, নমপেনের প্রায় চতুর্দিক ঘিরে ব্যূহ রচনা করে এগিয়ে আসছে সিহানুকের মুক্তিফৌজ, কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী।

এখন নমপেনের পতন প্রায় আসন্ন। নলচক্র এই শেষ মুহূর্তে দুটি কৌশল অবলম্বন করছে। একটি হচ্ছে যুদ্ধসজ্জা। অন্যদিকে গোপন দূত মারফৎ সিহানুকের বাহিনীর সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা। ইতিপূর্বেও মার্কিন লবী এই প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু মুক্তিফ্রন্ট ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য একেবারে চুপ করে বসে নেই, সে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য যথারীতি দিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন মুল্লুকের শোচনীয় অর্থনীতি হাল কী হবে, নয়া ঔপনিবেশবাদকে জীইয়ে রাখার

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

জন্য এই আহাম্মুকী মার্কিন প্রচেষ্টা। তবে ঘটনার গতি থেকে মনে হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রাহুমুক্ত হচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় চরম সংকট

ধনতান্ত্রিক দুনিয়া ক্রমেই সংকটের পঙ্কে ডুবে যাচ্ছে। এবং ক্রমেই গিলটি করা সোনার রং বেড়েই চলেছে। এই সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য মার্কিন, ব্রিটিশ, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স অন্য দেশ লুন্ঠনের নতুন নতুন ফন্দিফিকির চালিয়ে যাচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার এই সংকটের চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে ইউ এস নিউজ এ্যান্ড ওয়ার্ল্ডের একটি রিপোর্টে।

সেই রিপোর্টে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো দেউলিয়া হবার দাখিল। যেমন উনিশশো চল্লিশ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল সাড়ে চার হাজার কোটি ডলার. এখন এর পরিমাণ ছেচল্লিশ হাজার নয়শো নব্বই কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি। পঞ্চাশ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল পঁচিশ হাজার ছয়শো সত্তর কোটি ডলার। গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় ঋণের পরিমান প্রায় কুড়ি বছরে বেড়ে হয়েছে তিন হাজার নয়শো কোটি পাউন্ড। পশ্চিম জার্মানীর জাতীয় ঋণ বেড়ে তেয়াত্তর সালে হয়েছে ষোল হাজার ছয়শো নব্বই কোটি মার্ক। ফ্রান্সের এই সময় (তেয়াত্তর সালে) বেড়ে হয়েছে দশ হাজার তিনশো চল্লিশ কোটি ফ্রাংক। চুয়ান্ন সালে এই পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ কোটি ফ্রাংক অর্থাৎ দ্বিগুণবৃদ্ধি। দেখা যাচ্ছে, তাই সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশগুলোর জাতীয় ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। তার ফলশ্রুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অর্থনৈতিক জগৎ কিঞ্চিৎ তছনছ হবে এটা স্বাভাবিক। ফলে মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য হচ্ছে ওদের। এবং এদের ওপর নির্ভরশীল উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজার যে অস্থির হবে এটা আরও স্বাভাবিক।

ভাঙাগড়ার জোরজুলুম

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়া ময়দান ডালমিয়া পার্ক ভেঙে রাস্তা তৈরী হলো। হাওড়া শতবার্ষিকী উদ্যান (ময়দান) কর্তৃপক্ষ সর্বনাশ করছেন। হাওড়ার খৃষ্টান কবরখানা ভেঙ্গে ক্রিকেট আসর বসছে, দোকানও হচ্ছে। বেলিলিয়াস রোডে মুসলমানদের কবরখানায় কারখানা তৈরী করছে একদল জোর করে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কাছে আবেদন করে কিছুই হয়নি। ময়দানে আম্বুলেন্স সদন আর মিলিটারী স্থায়ী ক্যাম্প ঘর করে সব তুলে দেওয়া হলো। হাওড়ায় কছু খালি জায়গায় এগুলি স্থানান্তরিত করা সম্ভব। কর্তৃপক্ষ তা করছেন না। সম্প্রতি সিটিজনস ফোরামের নেতৃবৃন্দ নাগরিকগণ জেলা শাসকের কাছে আরও দিক দফা প্রতিবাদ পত্র দাখিল করে এসেছেন। হাওড়ায় বেলিলিয়াস পার্ক ইত্যাদি সংস্কারের কথাও আছে। শিবপুরের কাছাকাছি হাওড়ায় কারখানার রাস্তা তৈরীর সি এম ডি এর নীতির প্রতিবাদ করা হয়।

ডাবর কারখানায় শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গড়িয়ায় অবস্থিত ডাবর কারখানার জনৈক শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কারখানার অন্যান্য শ্রমিকদের মনে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ছয়ই জানুয়ারী কতিপয় শ্রমিককে কর্তৃপক্ষ ডেকে এনে যখন এ্যাকোনাইট গুঁড়ো করতে নির্দেশ দেয়, তখন সেই সব শ্রমিক তা গুঁড়ো করতে আপত্তি জানায়। আপত্তির কারণ হল, যে পদ্ধতিতে সেদিন গুঁড়ো করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ প্রথাবহির্ভূত ও অবৈজ্ঞানিক। তবুও কর্তৃপক্ষ তার নির্দেশ ফিরিয়ে নিতে রাজী হয় নি। বরং উল্টো শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যতীন সর্দার নামে জনৈক শ্রমিক সাতই জানুয়ারী ঐ এ্যাকোনাইট গুঁড়ো করতে বাধ্য হয়। গুঁড়ো করে ছুটীর শেষে তার সহকর্মীর সাইকেলে চেপে সে বাড়ী ফেরে। ফেরার পথেই যতীন সর্দার অসুস্থতা বোধ করে। পরের দিন আটই জানুয়ারী সকালে বাড়ীর লোকেরা বাঙ্গুর হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে। ভর্তি হবার খবর কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে জানানো হয়। সহকর্মীরা আটই জানুয়ারী বিকালে খবর নিয়ে জানতে পারে যতীন সর্দারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। নয়ই জানুয়ারী সকালে শ্রমিকেরা পুলিশ আসতে দেখে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে। কি কারণে পুলিশ আসে শ্রমিকেরা বুঝতে পারে না।

এর পর সহকর্মীরা পনেরোই জানুয়ারী যতীন সর্দারের ই এস আই ছুটীর ব্যবস্থা করতে গিয়ে জানতে পারে যতীন সর্দার আটই জানুয়ারী রাত্রে মারা গিয়েছে। এ খবরটি জানে তারা যতীন সর্দারের এক নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে। সেদিন ঐ আত্মীয় কারখানায় এসেছিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে। এই সংবাদে শ্রমিকরা হতবাক হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করেই ওরা জানতে পারে কোম্পানী নাকি এ খবর জানত না। অথচ ইতিমধ্যেই পোস্টমার্টেম ইত্যাদি হয়ে গিয়ে লাশ জ্বালানো হয়ে গিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মতে এই মৃত্যুর কারণ নাকি ফুড পয়জনিং। কিন্তু শ্রমিকদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যতীন সর্দারের মৃত্যুর কারণ ঐ একোনাইট বিষের প্রভাব। এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হয় আটই জানুয়ারী থেকে পনেরোই জানুয়ারী পর্যন্ত এই সাত দিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যতীন সর্দারের মৃত্যুর খবরটা চেপে যাওয়ার কারণে। শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে অবিলম্বে তদন্তের দাবী করে এবং যতীন সর্দারের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার দাবী জানায়। কিন্তু কোম্পানী টালবাহনা করে ঘটনাটি চেপে দেবার জন্য সচেষ্ট। শ্রমিকদের ঠাণ্ডা করবার জন্য ক্ষতিপূরণের কথা কর্তৃপক্ষ বলছে বটে, কিন্তু শ্রমিকদের ধারণা ক্ষতিপূরণের টোপ ফেলে কর্তৃপক্ষ আসলে সময় নষ্ট করতে চাইছে। এর ফলে কর্তৃপক্ষের পক্ষে ঘটনাটি ধামাচাপা দেবার সুবিধা হবে। এই সব কারণে শ্রমিকদের মনে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ডাবর মজদুর ইউনিয়নের চঞ্চল বাগচীজী এক বিবৃতিতে এই ঘটনাটি জানিয়েছেন।

প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন

সীমেন্স ইউনিয়নের সম্মেলন

গত উনত্রিশে জানুয়ারী খিদিরপুরের হেমচন্দ্র লাইব্রেরী হলে ফরোয়ার্ড সীমেন্স ইউনিয়নের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

ডক, পোর্ট কর্মচারী ও নাবিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যাতে সারা ভারত ব্যাপী সম্প্রসারিত করা যায় তার জন্য সংগঠনকে আরো দৃঢ়মূল করার সংকল্প এই সম্মেলনে ঘোষিত হয়। এই সম্মেলনে অপরাপর ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। এর মধ্যে ছিল কলকাতা পোর্ট এ্যান্ড শোর মজদুর ইউনিয়ন, ডক শ্রমিক এসোসিয়েশন, কলকাতা ডক লেবার বোর্ড এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন প্রভৃতি।

এই সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয় যা কর্মীদের অবিচল সংগ্রামমুখীনতায় পরিচায়ক। প্রস্তাবগুলি হল : (এক) সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় নাবিকদের সোচ্চার প্রতিবাদ জ্ঞাপন, (দুই) ভারত সরকারের জঘন্যতম দমন নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় নাবিকদের সংগঠিত প্রতিবাদ, (তিন) বীরত্বপূর্ণ ও সংগ্রামী চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সম্মানজনক মীমাংসার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করার কর্মসূচী গ্রহণ, (চার) গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও বন্দিমুক্তির দাবী, (পাঁচ) বেতন কাটার কালা অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন, (ছয়) ভারতীয় নাবিকদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের ক্রমবর্ধমান শোষণ ও বঞ্চনা অবিলম্বে নিরসনের জন্য হাঙ্গিয়ারী জ্ঞাপন, (সাত) গ্রামে গ্রামে জোটবদ্ধ কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, (আট) ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তার জন্য ওয়ার্কমেনস্ কমপেনসেশন এ্যাক্ট-এর সংশোধন, (নয়) ফরওয়ার্ড সিমেন্স ইউনিয়নের নামের পরিবর্তন করে "ভারতীয় ফরওয়ার্ড সিমেন্স ইউনিয়ন" রাখার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এবং (দশ) উনিশশো পঁচাত্তর সালের মধ্যে এক লক্ষ টাকার "স্ট্রাইক ফান্ড" সংগ্রহের জন্য পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন।

সরকারী কর্মচারী সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম চতুর্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতির তেইশতম রাজ্য সম্মেলন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশনে তেইশ থেকে পঁচিশে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশনে তেইশ থেকে পঁচিশে জানুয়ারী পঁচাত্তর-এ অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলনে আগামী বছরের জন্য শ্রীবাদল দাস—সভাপতি, শ্রীহরিমোহন ভৌমিক—সাধারণ সম্পাদক, শ্রীদেবেন চ্যাটার্জী ও শ্রীচিন্তামণি সাহু—যুগ্ম-সম্পাদক এবং শ্রীজয়দেব বক্সীকে কোষাধ্যক্ষ করে ছিয়ানব্বুই জনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

সমাপ্তি দিবসে প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করার পর প্রকাশ্য সম্মেলন শুরু হয়। প্রকাশ্য সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনীরেন সান্যাল। এছাড়া ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন এবং বারোই জুলাই কমিটি এবং জীবন বীমা কর্মচারী প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্মেলন

আগামী বাইশ থেকে চব্বিশে মার্চ পর্যন্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ কলকাতায় ইতিমধ্যেই মহকুমা ও জেলাস্তরে সম্মেলনপর্ব সমাপ্ত প্রায়। কলকাতার আঞ্চলিক সম্মেলনগুলোও পনেরোই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ হবে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ দর্পণের সংবাদদাতাকে বলেন যে, সরকার এখন ভাড়াটিয়া গুণ্ডা দিয়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের সর্বস্তরের নেতাদের ওপর দৈহিক আক্রমণও চালাচ্ছে। সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বলেন যে, অসীম গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি যেমন দরকার তেমনি অর্থেরও প্রয়োজন খুব জরুরী। তাঁরা অভাব অনটন সত্ত্বেও আগামী আন্দোলনের স্বার্থেই কর্মচারীদের কাছে সম্মিলন তহবিল পূর্ণ করার আহ্বান জানান।

বন্দীদের অনশন

ছয়ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার থেকে বারো দফা দাবীর ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দীরা আবার অনশন শুরু করেছেন। প্রধানতঃ বন্দীদের প্রাপ্য অধিকার এবং রাজনৈতিক মর্যাদা দানের দাবীতেই এই অনশন। স্মর্তব্য যে, কয়েক মাস আগে এসব রাজবন্দীরা দীর্ঘদিন ধরে অনশন করার পর কারামন্ত্রী প্রধান দাবীগুলো মেনে নেওয়া হয়েছে ঘোষণা করায় অনশন প্রত্যাহৃত হয়। খবরে প্রকাশ যে, কারামন্ত্রীর কোন প্রতিশ্রুতিই অদ্যাবধি কার্যকরী হয় নি।

বন্দি মুক্তির দাবীতে শিল্পী সাহিত্যিক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কবি শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকার অভিনেতা প্রভৃতি সর্বস্তরের শতাধিক ব্যক্তি পঞ্চম ট্রাইবুনালে অভিযুক্ত বন্দিসহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি দাবী করে এক বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় উৎপল দত্ত মৃণাল সেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সমর সেন সত্যজিৎ রায় গৌরকিশোর ঘোষ সন্তোষকুমার ঘোষ বিষ্ণু দে সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতি। বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন—"কিছুদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত পাঁচ বছর ধরে ধৃত বেশ কিছু সংখ্যক তথাকথিত "নকশালপন্থী" বন্দীকে "রাষ্ট্রদ্রোহের" অভিযোগে, অর্থাৎ বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা এই সরকারকে উচ্ছেদের চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে পঞ্চম ট্রাইবুন্যাল নামে একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করেছেন। সারা ভারতের নেতৃস্থানীয় নেতারা এই মামলায় অভিযুক্ত। এঁদের মধ্যে কানু সান্যাল, নাগেশ্বর রাও, জঙ্গল সাঁওতাল, সৌরীন বসু, অধ্যাপক নিশীথ ভট্টাচার্য, আজিজুল হক, সন্তোষ রাণা এবং অসীম চ্যাটার্জীর মত সুপরিচিত নামও রয়েছে।

"আমরা এও লক্ষ্য করছি যে এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথ ভুল বলে বিভিন্ন সময়ে বিবৃতি দিয়েছেন। অন্যদিকে তাদের মতামত যাই হোক না কেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষেরই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করার, সমাজ পরিবর্তনের যে কোন কার্যক্রমের কথা বলার অধিকার আছে, বিশেষ করে সে কার্যক্রম যদি দারিদ্র্য ও শোষণের অবসান কল্পে প্রযোজ্য হয়। মতাদর্শগত এই কার্যক্রমকে রূপ দিতে গিয়ে যদি কেউ প্রচলিত আইন-কানুনের সীমা লঙ্ঘন করে তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সরকারের থাকতে পারে, আবার আইন মাত্রেই জনমতের স্বীকৃতি সাপেক্ষ অপরিবর্তনীয় নয়। আবার এই ধরণের বন্দীদের অনেকের ক্ষেত্রেই এমন কি প্রচলিত আইনেরও চরম ব্যতিচার ঘটছে না একথাও বলা যায় না।

"প্রসঙ্গত আমরা ইংরেজ আমলের তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী বা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত নানা ষড়যন্ত্র মামলার উল্লেখ করতে পারি। যেমন মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি। তখনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে "মহামান্য সম্রাটের" বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ আনা হোতো। তাতে সে রাষ্ট্রই এক সময়ে বদলে যেতে বাধ্য হোলো। সে সময় বিশ্বের জনমত, রবীন্দ্রনাথ, রোঁল্যার মত কণ্ঠস্বর এই সব মামলায় অভিযুক্তদের মুক্তির দাবীতে ধ্বনিত হয়েছিল। অনেক সাজা প্রাপ্ত বন্দী মুক্তিলাভও করেছিলেন।

"বেশী দিনের কথা নয় মাত্র কয়েক মাস আগে "ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বরতার অভিযোগে অভিযুক্ত" ১৯৫ জন বন্দী সহ পঁচানব্বই হাজার পাকিস্থানী যুদ্ধবন্দীকে সরকার মুক্তি দিয়েছেন। প্রচলিত সভ্য সমাজের আইন কানুনের উর্ধে উঠেই সরকার এঁদের মুক্তি দিয়েছেন। পঞ্চম ট্রাইবুন্যালে অভিযুক্ত বন্দীরা যদি সরকারের চোখে উক্ত পাকিস্থানী যুদ্ধবন্দীদের চেয়েও বিপজ্জনক অপরাধী হয়ে থাকেন, তবে সরকারের সে মনোভাব দেশ-বিদেশের সভ্য জনমতের গ্রহণযোগ্য নয়।

"পঞ্চম ট্রাইবুন্যালের বন্দীদের অপরিবর্তিত বা পরিবর্তিত কোন রাজনৈতিক মতেই আমাদের অনেকেরই সায় না থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি এই বন্দীরা মানব মুক্তির আদর্শ বিশ্বাসী হয়েই নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছেন। তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা, সততা, নিষ্ঠাকে আমরা দেশের মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করি। বস্তুত অনেক সরকারী প্রবক্তাও অনেক সময়ে এঁদের সততা, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা অভিযুক্ত পঞ্চম ট্রাইবুন্যালের বন্দী সহ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করি, এবং এই দাবীর স্বপক্ষে বলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, সাংবাদিক ও সমস্ত শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন জানাই।

"আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে এও লক্ষ্য করছি যে গত কয়েক বছরে কারাগারে আটক বহু সংখ্যক বিচারাধীন নকশালপন্থী তরুণকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শত শত তরুণ-তরুণী হাজত থেকে খালাস হওয়ার পর, স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না, মূলত আইন ও শৃঙ্খলার সরকারী বেসরকারী রক্ষকদের তাড়নায়। বেকারী দারিদ্র্যের জ্বালার সঙ্গে তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই যোগ হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন হয়রানি, নানারকম ভয় ও লাঞ্ছনা। আমরা এ ব্যাপারে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং সরকারের কাছে অবিলম্বে এই অসহনীয় অবস্থার অবসান দাবী করছি।"

চটকল ধর্মঘট

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবারে তাঁতীক্ষেত্রেই দাবীর মূল্যায়ন নিরূপিত হয়েছে। চটকলের শ্রমিকসমাজ মুখ্যত আই এন টি ইউ সির অন্তর্গত। কিন্তু মিস্ত্রী এবং বাবুরা শ্রমিক হলেও সি আই টি ইউর অন্তর্ভুক্ত। চটশিল্পে পনেরো হাজার শ্রমিক বাদ দিলে বাকী শ্রমিকদের শতকরা নব্বুই ভাগ অবাঙালী, শিশিরবাবুর আওতাভুক্ত শতকরা ষাট ভাগ। ওই পনেরো হাজার চট শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ বাঙালী এবং শতকরা আশী ভাগ বামপন্থী ইউনিয়নভুক্ত। সেই কারণে চটকল শ্রমিকদের যত প্রকার দাবীর সঠিক মীমাংসা হোক না কেন, পনেরো হাজার বাবুও মিস্ত্রীর কোন দাবীরই কোন মীমাংসা হবে না। কারণ এই পনেরো হাজার কম্যুনিষ্টদের জন্য শিশিরবাবুর কিছু করার নেই।

চটকল ধর্মঘট পঞ্চম সপ্তাহ অতিক্রম করল। হয়ত ফেব্রুয়ারী মাসও কাবার করে দেবে, কিন্তু এই ধর্মঘটের কোন মীমাংসা হচ্ছে না। চটকল ধর্মঘটের পর ডক-ধর্মঘট সুরু হল। সরকার, ডক ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে আইন জারী করলেন, তবুও ধর্মঘট চলছে দেখে সরকার রেলের মত ধর্মঘট ভাঙলেন না। বরঞ্চ আলোচনায় বসে মীমাংসার উপনীত হলেন। অথচ চটকল ধর্মঘট এখনও চলছে। সরকার আইন জারী করেনি চটকল ধর্মঘট নিষিদ্ধ বলে, আবার কোন আশু মীমাংসায় উপনীত হচ্ছে না যাতে ধর্মঘট মিটে যায়। কারণ কি?

মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, এই ব্যাপারে নিজেকে না জড়াতে, বরঞ্চ ডাঃ নাগই সব রকম ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া কেন্দ্রে নিয়ে গেলে মুখ্যমন্ত্রীরও অবমাননা। কাজেই এখন আর ত্রিপক্ষিক নয় ষড়পাক্ষিক। মালিকের ছোট পক্ষ, বড় পক্ষ, শ্রমিকের শিশির পক্ষ, কালী পক্ষ সরকারের রাজ্যদল আর কেন্দ্রীয় দল। ছয় দলের টাগ অফ ওয়ারে প্রাণ যাচ্ছে আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকের। ভারত হারাচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

দুর্নীতির প্রশ্নেও মুজিব ডিক্‌টেটর

কপিল রায়

নতুনদিল্লী, ছয়ই ফেব্রুয়ারী : গত পঁচিশে জানুয়ারী বাংলাদেশের সংবিধানকে সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় নতুন যে ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছে তাকে এখানকার অনেকেই একনায়কত্ব-অভিমুখী বলে মনে করছেন। সংবিধানের এই সংশোধনের ফলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর গদি ছেড়ে রাষ্ট্রপতির পদে বসলেন—দেশে একদলীয় শাসন কায়েম হল, বিরোধী দলের অস্তিত্ব অবৈধ হল। আর এই নতুন শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই হবেন দেশের দণ্ড মুণ্ডের বিধাতা, সর্বেসর্বা। শুধু তাই নয় সংশোধিত সংবিধানে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হলেও প্রথম পাঁচ বছরের জন্য "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের" ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করে তাকে প্রথম রাষ্ট্রপতি করা হল "যেন তিনি ঐ পদে নির্বাচিত হয়েছেন"। অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরের জন্য তাঁর পদ সম্পর্কে তিনি হলেন নিঃশঙ্ক আর সুনিশ্চিত হল তাঁর প্রায় সীমাহীন রাজনৈতিক ক্ষমতা। কারণ প্রস্তাবিত "জাতীয় পার্টি" থাকবে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে "জাতীয় পার্টির" সদস্য না হলে যেমন সংসদের সদস্য হওয়া যাবে না তেমনই তাঁর সমর্থন না পেলে "জাতীয় পার্টির"ও সদস্য হওয়া অসম্ভব হবে। অর্থাৎ তাঁর অনুমোদন ছাড়া কারুর পক্ষেই সংসদে আসবার সম্ভাবনা নেই। সংশোধিত সংবিধানে শেখ মুজিবুর রহমানকে যে ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে তাকে এখানকার অনেকেই হিটলারের ক্ষমতার অনুরূপ বলে মনে করছেন।

বাংলাদেশের এই সাংবিধানিক পরিবর্তনে দেশের জন সাধারণের বিভিন্ন সমস্যার কোন সুরাহা হবে এমন কথা এখানে অনেকেই মনে করতে পারছেন না। তাঁরা বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান তো শুরু থেকেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনশ পনের জন সদস্যযুক্ত সংসদে আওয়ামী লীগের সদস্যই তো হলেন তিনশ আট জন। এত ব্যাপক সমর্থন ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি যদি কোন সমস্যার সমাধান না করে থাকেন বা করতে না পেরে থাকেন তাহলে রাষ্ট্রপতি হয়েই কি তিনি তা করতে পারবেন? এ ব্যাপারে এই সব মহলে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা অনেকেই শেখ মুজিবুর রহমানের গত পঁচিশে জানুয়ারী তারিখে বাংলাদেশ সংসদে প্রদত্ত ভাষণের উল্লেখ করছেন। শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন : "আমার তো ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আমার টু থার্ড মেজরিটি, তবু আপনারা আমেণ্ডমেন্ট করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছেন।" অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের গলাতেই যেন কেমন একটা সংশয়ের সুর।

শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণকে এখানকার অনেকেই নিজ ব্যর্থতার ও অক্ষমতার স্মারক দলিল বলে মনে করছেন। বস্তুত বাংলাদেশের বর্তমান দুর্দশার জন্য তিনি যে দুর্নীতি, চোরাকারবারী, স্বার্থপরতার ওপরে দোষারোপ করেছেন সেগুলি দূর করতে তাঁর ব্যর্থতা এখানকার সচেতন মহলের দৃষ্টি এড়ায় নি। শেখের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও অনুগৃহীতরা যে এই তিন বছরে অঢেল মুনাফা কামিয়েছেন, এবং অনেক সময়েই অবৈধভাবে, তার কাহিনীও তো এখন আর অবিদিত নেই। খুলনা-যশোর এলাকায় চোরাকারবারের "রাজা" বলে যিনি কুখ্যাতি লাভ করেছিলেন সেই শেখ আবু নাসের যে শেখ মুজিবুরের সহোদর এও এখন আর গোপন নেই। পাট কেনাবেচার একমাত্র দালাল হিসেবে যিনি কোন কাজ না করেও লাখ লাখ টাকা কমিশন লুটে থাকেন তিনিও তো শোনা যায় শেখের খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। শেখের মানির সম্পর্কেও নানাবিধ দুর্নীতি নিজের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক ভিরু কথা শোনা যায়। শেখের পদাধিকার ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে এঁরা সবাই ফেঁপে উঠেছেন—যেমন এক সময় ফেঁপে উঠেছিলেন পাঞ্জাবের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কাইরোর ছেলেরা। কাজেই পঁচিশে তারিখের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান দুর্নীতি প্রভৃতি উচ্ছেদের যে ডাক দিয়েছেন তাকে কার্যকরী করতে তিনি কি তাঁর এই সব অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজন ও অনুগৃহীতের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন? অনেকেরই এ জিজ্ঞাসা। অতীত অভিজ্ঞতা কোন আশার আলোক দেখায় না।

বস্তুত শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন মন্ত্রিসভাতেও তাঁরা স্থান পেয়েছেন যাঁরা আগেও মন্ত্রিসভায় ছিলেন এবং যাঁদের সময়ে নানাধরণের দুর্নীতির কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে অথবা যাঁরা প্রশাসনের ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য দেখাতে পারেন নি কিংবা দুর্নীতির অবসানে সক্রিয় হন নি। তাই এখানে অনেকেই মনে করেন যে পুরানো মদ নতুন বোতলে সাজিয়ে তার কোন গুণগত পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে এঁরা জনাব কামরুজ্জামান ও নজরুল ইসলামের কথা বলছেন। নতুন মন্ত্রিসভায় কামরুজ্জামান শিল্প মন্ত্রী হিসেবে এলেন। প্রথম দিকে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন। শোনা যায় তাঁর সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এমন কিছু লাইসেন্স বিলি করেছিলেন যার মধ্যে অন্তত পনের হাজার ছিল দুর্নীতিমূলক। কামারুজ্জামানের পরে যিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভার নিয়ে মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি তাই বলেছিলেন। নতুন কাঠামোতে আবার সেই জনাব কামরুজ্জামান সাহেবের আবির্ভাবকে অনেকেই কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখছেন। শোনা যায় উল্লিখিত পনের হাজার লাইসেন্সের অধিকাংশই নাকি সংসদ-সদস্যদের সুপারিশ অনুসারে দেওয়া হয়েছিল। বিরোধী পক্ষীয় কোন সংসদ সদস্যের (বিরোধীপক্ষীয় সদস্য সংখ্যা হচ্ছে মাত্র সাত) সুপারিশ যে এ ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী ছিল এমন মনে করা কঠিন। তাই আওয়ামী লীগের তিনশ আট সদস্যের বেশ কিছু সংখ্যক যে এই ব্যাপারে জড়িত ছিলেন তাতে কোন সংশয় নেই। অর্থাৎ দুর্নীতি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। জনাব নজরুল ইসলাম শিল্প মন্ত্রণালয় ছেড়ে এবারে পরিকল্পনার ভার নিলেন। তাঁর শিল্প মন্ত্রিত্বের সময়ে বাংলা দেশের পাটকলগুলির লোকসান হয়েছিল সাতশত কোটি টাকা। আবার ঐ সময়ে আওয়ামী লীগের শ্রমিকসংস্থা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নানকে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলকার দুইটি পাটকলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করে দিয়েছিলেন তিনি। লক্ষ লক্ষ টাকার তহবিল তছরুপের অপরাধে জনাব মান্নান এখন জেলে।

ডাঃ নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক রহমান সোভান, ডাঃ মোশারফ হোসেন, ডাঃ আনীসুর রহমান প্রভৃতির মত প্রখ্যাত যে সব অর্থনীতিবিদকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য করা হয়েছিল সরকার শাসকদলের কর্মরীতি ও মতিগতি দেখে তাঁরা সবাই সরে গেছেন।

বর্তমান শাসনব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে বিগত কয়েক বছরে দেশে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি ব্যাপক হয়েছে দেশে মোট এগার হাজার লোক এই হিংসার বলি হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান একাধিকবার এ কথা বলেছেন যে এই হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপের ফলে আওয়ামী লীগের মোট তিন হাজার সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। তা হলে প্রশ্ন ওঠে বাদ বাকী আট হাজার কারা এবং তাঁরা কাদের বলি হয়েছেন? আওয়ামী লীগের ভেতরকার উপদলীয় খেয়োখেয়ি যে কেমন আকার নিয়ে থাকে তার প্রমাণ মেলে চাঞ্চল্যকর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রহত্যার মামলায় বর্তমানে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সে মামলার বিচার চলছে। ঐ আট হাজারের মধ্যে কত জন যে সিরাজ সিকদারের মত সঠিক করে সেটা না বলা গেলেও পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতায় পরিস্থিতিটি কল্পনা করা কঠিন নয়।

"স্ক্রিপ্টাইল" বন্ধ করবার অজুহাতে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে সব রকমের সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দিতে তৎপর হয়েছেন। তাই তিনি শক্তিহীন সংসদকেও তাঁর তাঁবেদারে ভরে দিতে সচেষ্ট। নিজের সামগ্রিক ব্যর্থতা ও অক্ষমতাকে চাপা দিয়ে ক্ষমতার আসনে অটুট থাকবার বাসনাতেই তিনি যে এই একনায়কত্ব-অভিমুখী সংবিধান চালু করলেন তাতে সচেতন রাজনৈতিক মহলের কোন সংশয় নেই। এই সব মহল এটাও লক্ষ্য করছেন যে ভারতীয় উপমহাদেশে একটিমাত্র রাষ্ট্রই সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করলেও সেখানকার ব্যক্তিস্বার্থলোলুপ মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব তাকে ফ্যাসিবাদের পথে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু এ পথে যে তার সংকটমুক্তি ঘটবে না, ঘটতে পারে না ইতিহাস তার সাক্ষ্য। কে জানে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাংবিধানিক পদক্ষেপ সেই নজিরের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাবে কি না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে ভারতের জনসাধারণ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন যে পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা দেশের সাম্প্রতিক ঘটনা তাঁদের বেদনাকাতর ও শঙ্কিত করেছে। গোরক্ষপুরে দেওয়া শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের ভাষণের দিকে এই প্রসঙ্গে অনেকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন। এই ভাষণে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন যে তিনি যখন

রাজধানী দর্পণ

দিল্লীতে এসেছিলেন তখন তাঁকে বলা হয়েছিল, ভারতের সঙ্গে পরামর্শ করে বাংলাদেশে একনায়কত্ব চালু করা হল এবং এটাও সম্ভব যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও একনায়কত্ব চালু হতে পারে। কিন্তু চালাকীর দ্বারা কোন মহৎকার্য সাধন করা যাবে কি?

এমন অসাচ্ছন্দ্যতার সম্ভাব্য আশঙ্কা করেই কি রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের মনে আশার প্রশ্ন জাগিয়ে ছিলেন "রাত্রির তপস্যা কী আনিবেনা দিন?"

কোলিয়ারীতে দৌরাত্ম্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ধমান, উখড়া, রানীগঞ্জ ঝরিয়ায় কিছু কিছু কয়লাখনিতে বেকার ছেলের নাম করে কংগ্রেসী গুণ্ডারা লরী আটকাচ্ছে এবং ঘুষ নিচ্ছে। সেই সঙ্গে পিট থেকে কয়লা বে-আইনী চালান করার কাজ কিংবা চুরি করে কয়লা তোলার ব্যাপারে জালিয়াতি করছেন। কলকাতায় গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে কোল কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ মন্তব্য করেছেন ঐ সব প্রচার ভুল এবং উদ্দেশ্যমূলক।

এদিকে ঝরিয়া এলাকায় অশান্তি ও মস্তানদের দৌরাত্ম্যের জন্যই যে কোকিং কোল-এর খনির উৎপাদন কমেছে জাতীয়করণের পর এই সংবাদ রায় হিসাবে দিয়েছেন কোল সরভেজ এসটিমেট কমিটি তাদের রিপোর্টে। অন্যদিকে এন সি ডি সির গিরিডি কোলিয়ারীতে নিম্নধরণের কয়লা আরও ক্ষতি ডেকে আনছে। এখবর দিয়েছে ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের মুখপাত্র। কয়লার দাম লাফালাফি করার আরও দুঃসময় নাকি আসছে।

প্রকাশিত হল

শতবর্ষের আলোকে

শরৎচন্দ্র

মিহির আচার্য সম্পাদিত

তথাকথিত সমালোচক-পণ্ডিতদের ব্যাপক অপদার্থতা আমাদের দীর্ঘকাল এই সত্যকে আড়াল করে রেখেছে যে, সে যুগে শরৎচন্দ্রই শিল্পী, দার্শনিক, শিক্ষা ও রাজনীতিবিদ হিসেবে সনাতনী ভাববাদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী চালিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্রের এই বৃহত্তর পরিচয় স্বাভাবিক কারণেই সংগ্রামী মানুষের সামনে তুলে-ধরার প্রয়োজন। আশ্চর্য তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদক এই গ্রন্থে প্রামাণিক দলিল-সহ এই পরিচয়কে উপস্থিত করেছেন।

দাম : ৬০০

শুকসারি ॥ ১২৭/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান ॥ ন্যাশানাল বুক এজেন্সি। নাথ ব্রাদার্স। কথা ও কাহিনী। দে বুক স্টোর্স। বুক মার্ক।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক নবভারত ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ নং সেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

কংগ্রেস [redacted] কাশীকান্ত রথীন তালুকদার শান্তি দাশগুপ্ত[redacted] বহিষ্কারের চেষ্টা

১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৭ই মার্চ ৭৫ ॥ ৪০পঃ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য কংগ্রেসের চারজন প্রথম সারির নেতাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার জন্য কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। এই চারজন নেতা হলেন শ্রীবিজয় সিং নাহার, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীরথীন তালুকদার ও শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌগত রায় উক্ত চার নেতার বহিষ্কারের সমর্থনে পরিষদীয় দলের সদস্যদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন।

পয়লা মার্চের প্রদেশ কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় উক্ত চার নেতার কার্যকলাপ নিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়। সভা চলাকালীন অবস্থায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র সভাকক্ষের বাইরে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের হাতে টাইপ করা কাগজ দিয়ে বিদায় করে দেন। তারপর রাত আটটা থেকে চলে রুদ্ধদ্বার কক্ষে উত্তপ্ত আলোচনা। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় উপস্থিত কার্যকরী সমিতির সদস্যদের বার বার হুঁশিয়ার দেন যেন, এই আলোচনার খবর প্রেসে ফাঁস না হয়।

বিজয় সিং নাহারের কার্যকলাপ নিয়ে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। সিদ্ধার্থবাবু উত্তেজিতভাবে বলেন, আমার কাছে খবর আছে অনেক নেতা বিজয়দার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

দর্পণকে হুমকী

"দর্পণ চিরতরে বন্ধ করে দেব।" টেলিফোনে ঝাঁঝালো গলায় আবার একটি হুমকী ভেসে এল আমাদের অফিসে গত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটের সময়।

হুমকীবাজ বক্তা নিজেকে সরাসরি যুব কংগ্রেসের সভাপতি বলে পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "আপনাদের শিক্ষা হয়নি? দর্পণ একেবারে বন্ধ করে দেব?"

দর্পণের সম্পাদক কোন সময়ে অফিসে থাকেন সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

কংগ্রেসীদের গোষ্ঠী-লড়াই আবার শুরু ঃ এবার প্রিয় মুন্সী আসরে নামছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসীদের ঐক্য প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেছে। যুব ছাত্র ফ্রন্টে ঐক্যের জন্য চার সদস্যের কমিটি যুব কংগ্রেস ও ছাত্র ফ্রন্ট নতুনভাবে সংগঠিত করার যে ফরমুলা দিয়েছিল তা কার্যকরী করা যায় নি। ফলে ছাত্র পরিষদ দুই বিভিন্ন অফিস থেকে পরিচালিত হচ্ছে। একটির নেতা কুমুদ ভট্টাচার্য এবং অফিস মহাজাতি সদনে, অপরটি নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য কর্তৃক পরিচালিত এবং সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোডে পুরনো জনসেবকের জবরদখল বাড়ীতে অবস্থিত। এই দুই গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ আবার দানা বাঁধছে। বিভিন্ন কলেজ ইউনিয়ন

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

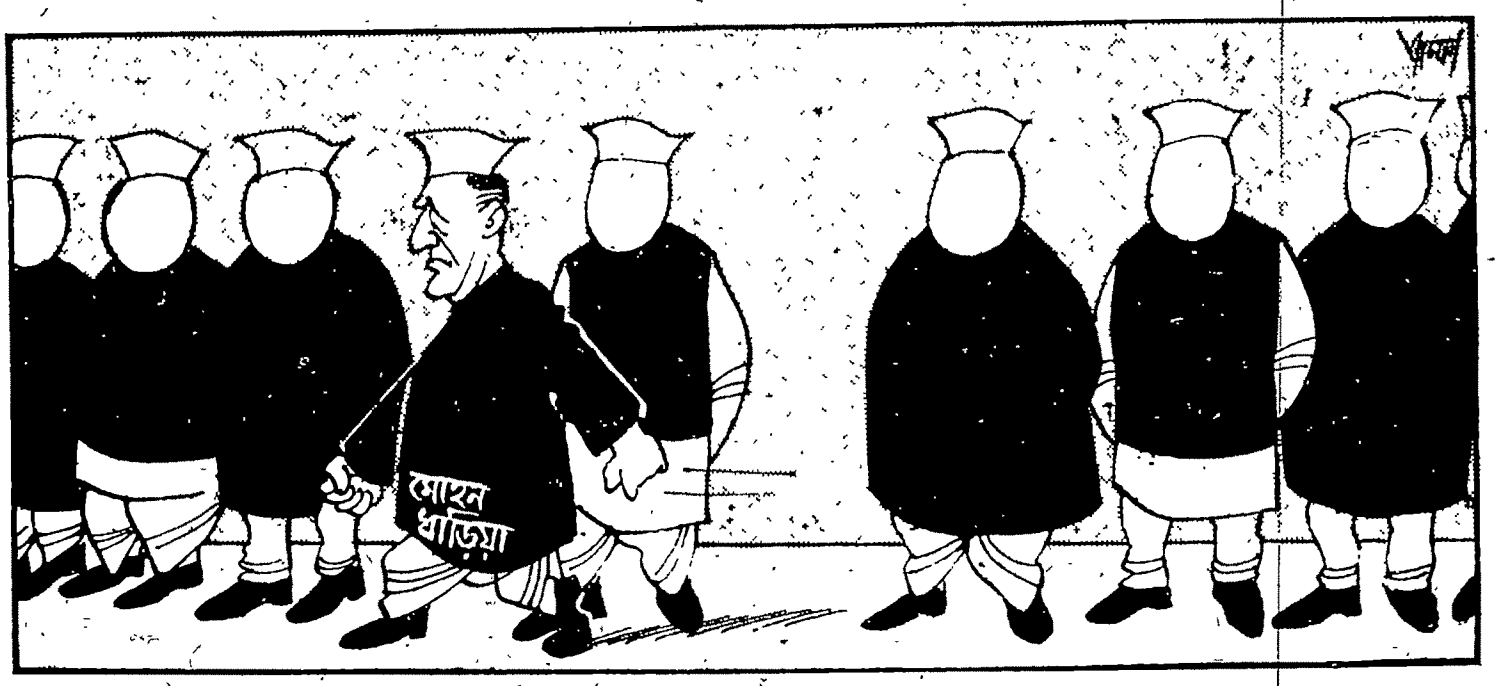

ললিতনারায়ণ মিশ্রর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জ্যোতির্ময় বসু অনেক প্রশ্ন তুলেছেন

সমস্তিপুর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সি পি এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু গত আঠারোই ফেব্রুয়ারী লোকসভায় সমস্তিপুরের ঘটনার ওপর মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনার সময়। এ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীবসু। প্রশ্ন বিস্ফোরণের পরেই বিদ্যুৎ নিভে গিয়েছিল কেন? যদিও বিদ্যুতের মেন মণ্ড নয়, অনাত্র ছিল। যে লোকটির ওপরে গ্রেনেড ফাটানোর ভার ছিল সেই আলো নিভিয়ে দিয়েছিল যাতে কেউ দেখতে না পায়। পরের দিনই মণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল কেন? কারণ তারা কোনরকম ত্রুটি রাখতে চায়নি যদিও, আমি নিশ্চিত—শ্রীবসু বলেছেন; সব সরঞ্জাম আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। যখন আসল অপরাধী সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তখন সত্র উদ্ঘাটিত হবে না।

একজন সিনিয়র এ্যাডভোকেট কতকগুলো প্রশ্ন করেছেন। সমস্তিপুরে বেলা দেড়টার সময় যখন তাঁকে উৎসবের উদ্বোধন করতে হবে তখন মিশ্র দেরী করে দিল্লী ত্যাগ করলেন কেন? বিকেল সাড়ে চারটায় যখন বোমা বিস্ফোরণ হল তখনি শ্রীমিশ্রকে সমস্তিপুর বা লাহেরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হল না কেন? সমস্তিপুর থেকে বিশেষ ট্রেন রাত্রি আটটায় ছাড়ল কেন এবং রাত্রি এগারোটায় ট্রেন দানাপুর পেঁছবার আগে শ্রীমিশ্রর কে চিকিৎসা করেছিল এবং কি চিকিৎসা হয়েছিল?

শ্রীবসু বলেছেন, আমি জানি উত্তর-পূর্ব রেলের চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ ভাল্লা একটা বাণ্ডেজের মত করে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন ওঁর বিপদ কেটে গেছে।

পূর্বোক্ত এ্যাডভোকেটের আরও প্রশ্ন, ডাঃ এস এম নবাব নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিখ্যাত সার্জেন—লাহোরিয়া সরাইয়ে যাঁর নিজস্ব ক্লিনিক আছে—এক ঘন্টার মধ্যেই সমস্তিপুরে পেঁছনো সত্ত্বেও তাঁকে শ্রীমিশ্রর সঙ্গে দেখা করে তাঁর চিকিৎসা করতে দেওয়া হয়নি কেন? ডাঃ নবাব বোমা বিস্ফোরণে আঘাতপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে বিনা পয়সায় তাঁর ক্লিনিকে ভর্তির আদেশ দিয়েছিলেন এবং কয়েকজনের সেখানে চিকিৎসা হয়েছিল. কিন্তু শ্রীমিশ্রর ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন? ঘটনার পর সন্ধ্যার সময় শ্রীইউ এন সাহী যখন টেলিফোনে চীফ সেক্রেটারী, রাজ্যপালের সেক্রেটারী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন তখন কোন উত্তর পাওয়া যায়নি কেন? পাটনায় রেলওয়ে স্টাফের কাছে ডাঃ ইউ এন সাহী কোন সন্তোষজনক উত্তর পাননি এবং তাঁকে কেন বলা হয়েছিল যে বিশেষ ট্রেন পাটনায় দাঁড়াবে না যদিও দশ মিনিটের জন্য ট্রেন পাটনায় দাঁড়িয়েছিল। ডাঃ বি কে সিনহা একজন বিখ্যাত সার্জেন ও চিকিৎসক একথা জানা সত্ত্বেও তাঁকে কেউ কিছু বলেনি কেন এবং তাঁর সঙ্গে এমন কি কেউ কথা বলেনি কেন যদিও তিনি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত দানাপুর হাসপাতালে অপেক্ষা করেছিলেন? দানাপুরের ডাক্তাররা প্রথমে শ্রীমিশ্রকে সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করলেন কেন এবং পরদিন সকালের আগে ডাঃ ইউ এন সাহী ও ডাঃ বি কে সিনহার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি কেন? শ্রীমিশ্র কি তাঁকে বাঁচাবার জন্য ডাঃ ইউ এন সাহী ও ডাঃ বি কে সিনহার সঙ্গে দেখা করতে কান্নাকাটি করেছিলেন?

পাটনায় কাগজের লোকদের শ্রীমিশ্র বলেছিলেন "আমি অনেক ভাল বোধ করছি।" ডাঃ সাহী বলেছিলেন যে, শ্রীএল এন মিশ্রকে বাঁচানো যেত যদি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হত।

শ্রীমিশ্রর মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করা হয়নি কেন এ প্রশ্নও উঠেছে। অস্বাভাবিক ভাবে ও অস্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে পোস্টমর্টেম বাধ্যতামূলক নয় কি যদি কোন কিছু গোপন করার না থাকে?

একথা কি সত্য অথবা সত্য নয় যে, তেইশে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমিশ্রকে ডেকে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন এবং মনস্থির করার জন্য তাঁকে সাতদিন সময় দিয়েছিলেন? একথাও কি সত্য নয় যে, চব্বিশে ডিসেম্বর বিহারের কয়েকজন কংগ্রেসী এম পি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ না দেবার অনুরোধ করেন যে-কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলেন "শ্রীমিশ্র পার্টি গভর্নমেন্ট ও আমায় অস্বস্তিতে ফেলেছেন, সেইজন্য তাঁকে যেতে হবে এবং কিছুদিন রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে।"

শ্রীবসু বলেন, "এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রশ্ন করছি, তিনি যদি কিছু করে থাকেন তার অধিকাংশই কি পার্টি গভর্নমেন্ট ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্য নয়?"

গত পাঁচই ফেব্রুয়ারী অরিখের হিন্দুস্থান টাইমসের একটি রিপোর্টে লেখা হয়েছে ঃ "শ্রীএল এন মিশ্রর

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

অষ্টাদশ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা
শুক্রবার ৭ই মার্চ ১৯৭৫

প্রধানমন্ত্রী আতঙ্কিত

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা হারাবার ভয়ে বেশ ভীত হয়ে পড়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কথা-বার্তা থেকে এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাঁর ভয় প্রধানতঃ জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তার আন্দোলন সম্পর্কে। জয়প্রকাশের আন্দোলন যেভাবে বিহারের গন্ডী ছাড়িয়ে অন্যান্য উত্তর ভারতীয় রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে শ্রীমতী গান্ধী শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সাম্প্রতিক কয়েকটি উপনির্বাচনের ফলাফলে তাঁর শঙ্কা আরও ঘনীভূত। এই অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা জয়প্রকাশের সঙ্গে আলোচনার কথা বলছেন তাঁদের প্রতি শ্রীমতী প্রচন্ড রুষ্ট। মোহন ধারিয়ার অপসারণে শ্রীমতী গান্ধীর এই অসন্তোষের চরম প্রকাশ ঘটেছে। অতঃপর চন্দ্রশেখর ইত্যাদিরা, অর্থাৎ জয়প্রকাশের প্রতি দুর্বলচিত্ত যাঁরা, তাঁরা যদি সাবধান না হন তাহলে কি শেষ পর্যন্ত তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে?

স্পষ্টতই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস এখন দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একদল সি পি আই তথা মস্কোর প্রতি আসক্ত। আর একদল এদের বিরোধী এবং ফলে কমিউনিস্টদের প্রতি এরা বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন। পুরনো কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার সময় এই গোষ্ঠী-বিভেদ আত্মপ্রকাশ করেনি। তখন সামনে শত্রু ছিল কামরাজ-মোরারজী গোষ্ঠী। তারপর ইন্দিরা তরঙ্গের খেলা এবং বাংলা দেশের ঘটনা এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ইত্যাদি চমক। কিন্তু চমকে ত আর অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা দেশের অবস্থার বা মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটেনা। তাই উত্তুঙ্গ অর্থনৈতিক সঙ্কটে ইন্দিরা তরঙ্গ আজ ইন্দিরা বিরোধী তরঙ্গে রূপান্তরিত।

শ্রীমতী ইন্দিরা একথা বুঝতে পারছেন বলেই আজ শঙ্কিত। তাই সি পি আই তথা মস্কোকে খড়কুটোর মত আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। সি পি আই চেষ্টা করছে এই সুযোগে ক্ষমতার তখ্‌ত ভাগাভাগি করতে এবং মস্কো চাইছে আরও জাঁকিয়ে বসতে। কিন্তু জয়প্রকাশের আন্দোলন যে ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছে। তাই শ্রীমতী ইন্দিরা ভীত।

মারুতি কেলেঙ্কারীখ্যাত বংশীলা[illegible] চেষ্টা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হরিয়ানার মারুতি কেলেঙ্কারী খ্যাত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলালের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ এনেছেন লোকসভার সি পি এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু। এই সম্পর্কে শ্রীবসু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি দিয়েছেন।

অভিযোগ হল, শ্রীবংশীলাল হরিয়ানায় গ্রাম কৈদ্যুতিকরণের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তাতে চুয়াল্লিশ কোটি টাকার মত মালমশলা কিনতে হয়, কিন্তু এই কেনার ব্যাপারে সমস্ত রকম নিয়ম কানুন জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। সাপ্লায়ারদের সঙ্গে যোগসাজসে বেশি দামে এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কেনা হয়। শুধু তাই নয়, ত্রুটিপূর্ণ, নাকচ করা, নিম্নমানের পোল অনেক বেশি দামে কেনা হয়। শ্রীবসু তাঁর চিঠিতে বলেছেন যে, মোটামুটি ভাবে আমি হিসেব করে দেখেছি অন্ততঃ বারো কোটি টাকার মত সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। একটি ঘটনায় দেখা গেছে এমন একটি সংস্থাকে ৯১.৪৮ লক্ষ টাকার অর্ডার দেওয়া হয়েছে যাদের পেড-আপ ক্যাপিটাল মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।

শ্রীবসু লিখেছেন, "বিদ্যুৎ আইনে চেয়ারম্যানের কোন কেনার ক্ষমতা নেই। যদি প্রকল্প এক কোটি টাকার বেশি হয় তাহলে বোর্ডকে রাজ্য সরকারের সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। অতএব এর সঙ্গে রাজ্য সরকার কি জড়িত নয় যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলাল? যখন মুখ্যমন্ত্রী একটি অপকীর্তির সঙ্গে জড়িত বলে ধরা পড়েছেন তখন আপনি কি করে পাবলিক একাউন্টস কমিটি বিষয়টি দেখছে বলে এড়িয়ে যেতে পারেন? আমি এ ঘটনা জানি যে, আপনার পুত্র বংশীলালের মারফৎ প্রচন্ড উপকৃত, অতএব অভিযোগ যতই গুরুত্বপূর্ণ হক আপনার সদা প্রচেষ্টা নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাঁকে রক্ষা করা।"

শ্রীবসু আরও লিখেছেন, কিছুদিন আগে আপনি আকালী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একজন মাত্র লোকের আবেদনের ফলে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই তদন্ত কমিশন বসিয়েছিলেন। সেই স্মারকলিপিতেও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অর্থ অপচয়ের কথাই বড় করে ছিল। কিন্তু এখানে বংশীলালের বিরুদ্ধে প্রথমে ছত্রিশ জন এম এল এ ও একজন এম পি এবং দ্বিতীয়বার সতেরোজন এম এল এ, বহু জননেতা ও একশো একুশ জন এম পি একই অভিযোগ তুলে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন। তবু এখানে আপনি নিষ্ক্রিয়। যদিও সান্তনম কমিটির রিপোর্ট অনুসারে আপনি তদন্ত কমিশন গঠন করতে বাধ্য যদি মাত্র দশজন এম পি একজন ক্ষমতাধিষ্ঠিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ সমর্থন করেন।

ললিতনারায়ণ মিশ্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিগত কাগজপত্র ভর্তি দুটো ব্যাগ পাওয়া যাচ্ছে না যাতে মিশ্র-বিরোধী ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয় এমন কথোপকথনের দুটো টেপ ছিল বলে বলা হয়েছে। টেপ দুটো নাকি ডিসেম্বর মাসে স্বর্গত মন্ত্রীর হাতে দেওয়া হয় এবং এদের "প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ" বলে মনে হয়।"

এখানে একটা জিনিস প্রমাণ হল —শ্রীজ্যোতির্ময় বসু বলেন, আমাদের টেলিফোন ট্যাপ করা হয় এবং এই টেলিফোনে কথোপকথনের টেপ শ্রীমিশ্রকে দেওয়া হয়েছিল। আমি তাই শুনেছি। আমায় বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন ট্যাপ করা হয়েছে। তার টেপ স্বর্গত এল এন মিশ্রকে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর প্রধানমন্ত্রী ব্যাপারটি জানতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী পার্টির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী কখনও কাউকে ছেড়ে কথা বলবেন না। এর টেপ শ্রীমিশ্রর কাছে ছিল। শুনেছি শ্রীমিশ্র দুঃখ ও বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলেন, আমি ডুবেছি, কিন্তু আমি একা ডুবব না। আরও অনেককে ডুবতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, আমি পার্টির জন্য আট কোটি টাকা যোগাড় করেছি। এমন কি জ্যোতির্ময় বসু যদি ঠিক কথা বলে থাকেন এবং এক কোটি টাকা আমি আত্মসাৎ করেছি তাহলেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে আমি যে সাত কোটি টাকা তুলে দিয়েছি সেটা কি হল? এল এন মিশ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দিন ঘনিয়ে আসছে এবং শোনা যায় তিনি তার পরিবারবর্গকে মুখ খুলতে বারণ করেছিলেন যদি তাঁর কিছু ঘটে। তিনি তাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন ঃ তাঁর কিছু ঘটার পর যদি তারা মুখ খোলে তবে তাদের ছেলেমেয়েদের একই পরিণতি ঘটবে।

শ্রীবসু বলেন, আমরা জানি সি বি আইয়ের আসল, মূল রিপোর্ট যাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রের নাম ছিল—এল এন মিশ্রর হাতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার অনেকগুলো ফটোস্টাট কপি করিয়ে নেপাল সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেন। রামবিলাস ঝার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একথা কি সত্য নয় যে, সে এক সময় পুলিশ দপ্তরে ছিল? একথা কি সত্য নয় যে, সে ছয়ই জানুয়ারী শ্রীকাপুরের সঙ্গে বিমানে দিল্লী গিয়েছিল? একথা কি সত্য নয় যে, এই ব্যক্তিই লোকদের ও ডাক্তারদের ভেতরে যেতে বাধা দিয়েছিল?

পৌষী-লড়াই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনে এই দুই গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে লড়ছে, কোথাও বা মারপিটে নামছে।

যুব কংগ্রেসের অবস্থাও একই। যুব কংগ্রেস সংগ্রাম কমিটি নিজেদের কাজ কারবার চালাচ্ছে। এবার প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী সরাসরি আসরে নামছেন। এখানকার কংগ্রেসী কোন্দলের মূল নায়ক হিসেবে একদা প্রিয়বাবুকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে সরে দেতে হয়েছিল। এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রিয়বাবুকে আবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির হাল ধরতে বলেছেন।

কংগ্রেসীরা সি পি এম ও অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধীদের জোটবদ্ধ আন্দোলনে একটু বিচলিত বোধ করছেন। তাই নতুন করে আবার কংগ্রেসীদের ঐক্য প্রচেষ্টা শুরু হচ্ছে। সি পি এমকে দমন করার কার্যক্রমের ভিত্তিতে কংগ্রেসীদের নতুন করে সংগঠিত করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন প্রিয়বাবু। এতে লক্ষ্মী বসু, পঙ্কজ ব্যানার্জী, সোমেন মিত্র, বারিদবরণ দাস বিচলিত নন। কে এল বা কে গেল তাতে ভারসাম্যের এদিক ওদিক হওয়ার কথা নয়।

সংঘর্ষ আরও বাড়বে বলে মনে হয়। সম্প্রতি গোষ্ঠী কোন্দলে টালিগঞ্জের বাঁশদ্রোণী এলাকায় দুজন তরুণ নিহত হয়েছে। যাদবপুর-গাড়িয়া কংগ্রেসের শাখা অফিস আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এই অফিস প্রিয়-সুব্রত-সৌগত গোষ্ঠীর সমর্থক তপেশ ধর ও বিরাজ আলির কর্তৃত্বে ছিল।

প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, মন্ত্রী গোবিন্দ নস্করের চেলারা এই আক্রমণের পান্ডা। আক্রমণের মূল নেতৃত্বে ছিলেন শচীন মুখার্জী। শচীনবাবু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কংগ্রেসী শ্রমিক সেলের একজন নেতা। অভিযোগে প্রকাশ, গত সোমবার রাত্রে শচীনবাবু উন্মত্ত অবস্থায় কংগ্রেস অফিস আক্রমণের নেতৃত্ব দেন।

পুলিশ গোষ্ঠী কোন্দলে মাথা ঘামায় না। এ ঝামেলা এড়াতে চায়।

চলেছেন। আমি শেষবারের মত সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যদি কেউ বিজয়বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান তবে তাকে চরম শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই সময় সভার এক কোণে বসে থাকা জয়নাল আবেদিন বিজয়বাবুর সংগে গোপন আঁতাত রাখার অভিযোগ এনে প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ধীরেন বসুকে সরাসরি আক্রমণ করেন। জয়নাল উত্তেজিতভাবে ধীরেন বসুকে বলেন, আপনি রাতের অন্ধকারে বিজয়বাবুর বাড়ীতে যান বলে আমার কাছে খবর আছে। শুধু তাই নয় আপনি বিজয়বাবুকে অর্থ সাহায্যও করেন। আপনি বিজয়বাবুকে মদত দিচ্ছেন।

ধীরেন বসুও গলা চড়িয়ে জয়নালের অভিযোগের প্রতিবাদ করেন। ধীরেনবাবু বলেন, আমার সঙ্গে বিজয়বাবুর কোন যোগাযোগ নেই। তবুও জয়নাল সমানে ধীরেন বসুকে আক্রমণ করে চলেন। এমন সময় সিদ্ধার্থবাবু জয়নালের কথা কেড়ে নিয়ে ধীরেন বসুকে বলেন, দল-বিরোধী কাজের অভিযোগে আপনি পাঁচ-ছয় হাজার লোক নিয়ে কেন বিজয়বাবুর বাড়ী ঘেরাও করছেন না। আক্রমণের পর আক্রমণে নাজেহাল ধীরেন বসু এক সময় বলে ওঠেন, "আমি বিজয়দাকে ঘৃণা করি।"

এরপর মুখ্যমন্ত্রী মধ্য কলকাতার জেলা শিবিরে বিজয়বাবু ও তাঁর সমর্থকদের আমন্ত্রণ জানাতে নিষেধ করে দেন। আমরা পরে খবর নিয়ে জেনেছি বিজয়বাবু আমন্ত্রিত না হয়েও দলবল নিয়ে জেলা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

এরপর সৌগত রায় ও জয়নাল আবেদিন কাশীকান্ত মৈত্র, রথীন জলাদকার ও, শান্তি দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের অভিযোগ আনেন। পরে সভায় ঠিক হয় উক্ত চারজনকে দল থেকে বার করে দেওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকমান্ডকে চিঠি দেওয়া হবে।

এই দিনের সভায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সদস্যদের অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মী বসু সভায় যান নি। অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম একবার মুখ দেখিয়েই চলে যান। আর গোবিন্দ নস্কর ও আনন্দমোহন বিশ্বাস সারাক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা ছিল পূরবী মুখার্জীর তাঁকে সব সময় প্রিয়-সৌগতদের কথায় সায় দিয়ে চলতে হয়েছে। বহুদিন পরে প্রিয়বাবুরা কার্যকরী সমিতির সভ্য দাপটের সঙ্গে প্রস্তাব পাশ করাতে পারলেন।

সভার পর সিদ্ধার্থবাবু সৌগতকে ডেকে বিজয়বাবুদের বিরুদ্ধে এম এল এদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহের নির্দেশ দেন। নির্দেশমত সৌগত এখন স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেছেন।

এম এল [redacted]
মামলা প্রত্যাহৃত হল কেন?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আবগারি দপ্তর একটি পুরানো মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। মামলাটি ছিল বর্ধমান জেলার জামুড়িয়ার বিধানসভা সদস্য অমর মন্ডলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল, গত উনিশশো সাতষট্টি সালে জামুড়িয়ার স্থানীয় জনসাধারণ একটি জিপ গাড়ি আটক করে এবং ঐ গাড়িতে মদ পাচার হচ্ছে বলে আবগারি দপ্তরকে টেলিফোনে জানিয়ে ঘটনাস্থলে আসতে বলে। আবগারি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ঘটনাস্থলে এসে বেশ কয়েক বোতল বে-আইনি মদ সহ জীপ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেন এবং জীপ গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেন। চালক তখন জানায় যে এই জীপ গাড়ির মালিক বিধান সভা সদস্য অমর মন্ডল। শ্রীঅমর মন্ডল একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের মালিক।

আবগারি দপ্তর শ্রীমন্ডল সহ আরো কয়েক জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যথাসময়ে চার্জশীট দাখিল করেন। মামলাটি আসানসোল কোর্টের বিচার বিভাগীয় বিচারক শ্রীটি ডি ব্যানার্জীর আদালতে বিচারাধীন ছিল দীর্ঘদিন ধরে। কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পালাক্রমে কেউ না কেউ অনুপস্থিত থাকায় মামলা দিনান্তরিত হচ্ছিল।

কিছুদিন পূর্বে আবগারি দপ্তরের প্রসিকিউটার শ্রীপি আর দাস জানান যে, আবগারী দফতর শ্রীঅমর মন্ডলের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করে নিতে চায়। আবেদন করা হয়েছিল ভারতীয় কার্যবিধি আইনের ৪৯৪ ধারা অনুসারে। বিচারক শ্রীব্যানার্জী অভিযুক্ত বিধানসভা সদস্য শ্রীঅমর মন্ডলকে মামলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় শ্রীমন্ডল জানান যে, সাতষট্টি সাল ছিল যুক্তফ্রন্টের রাজত্ব এবং যেহেতু তিনি একজন পরিচিত কংগ্রেস কর্মী সেইজন্যই তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে। বিচারক সবদিক বিবেচনা করে শ্রীমন্ডলকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, মামলাটি কেন প্রত্যাহার করা হলো? শ্রীমন্ডল কি আবগারি দফতরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে মামলা প্রত্যাহার করতে আবগারি দফতরকে বাধ্য করেছেন? যদি তা না হয়, তবে চার্জশিট দেবার পরে মামলা সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারক শ্রীব্যানার্জী প্রত্যাহার করা হলো কেন? আবগারি দফতর হয়তো বলবেন যে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব। তাই যদি হয় তবে ছয় বছর পরে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন কেন? আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, এই মামলা প্রত্যাহারের পেছনে আবগারি মন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাতোর হাত আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীঅমর মন্ডলের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা আসানসোল আদালতে বিচারাধীন আছে। সেই মামলারও অনেক ইতিহাস আছে। ঐ মামলা আসানসোলের প্রাক্তন বিচারক শ্রীএস কে দাস খারিজ করে দেওয়ায় সরকার পক্ষ উচ্চ আদালতে আপীল করেন। উচ্চ আদালত ঐ মামলা পুনর্বার বিচারের জন্য প্রেরণ করেন এবং মন্তব্য করেন, যে বিচারিক এই মামলা খারিজ করেছেন, সেই বিচারকের আদালতে এই মামলার বিচার যেন না হয়, কারণ সংশ্লিষ্ট মামলাটি অবৈধভাবে খারিজ করা হয়েছে। ঐ মামলায় শ্রীমন্ডলের সঙ্গে শ্রীমতী পুষ্পলতা মন্ডল সহ আরো কয়েকজন অভিযুক্ত। অভিযোগ ছিল, ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৪৪৮ এবং ৩২৩ ধারা অনুসারে জোরপূর্বক গৃহে প্রবেশ এবং আঘাত করা। এই মামলা খারিজ করার ব্যাপারে বিচারকের ওপর প্রভাব খাটানো হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে বেড নেই ডাক্তার নেই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন হাসপাতালে তিন বছরে পাঁচশত বেড বেড়েছে। অথচ এমন হাসপাতাল গ্রামেগঞ্জে ভুরিভুরি চোখে পড়বে যার বেড সংখ্যা বাড়েনি, বরং বেড কমে যাচ্ছে। শাবলসিংহপুর হুগলী জেলার আরামবাগের কাছাকাছি গ্রাম। এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন বেড কমে যাচ্ছে। ডাক্তার নেই বলেও অভিযোগ। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পিতার দান করা শিংগোট স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বর্ধমানের কাছাকাছি। এখানে বেশীর ভাগ সময় ডাক্তার থাকেন না। বেড বাড়লেও এখানে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ভয়ে রোগী যায় না।

নদীয়ার একটি গ্রামে হাসপাতাল তৈরির সব ঠিকঠাক অথচ ঐ এলাকাটি একটি বিশেষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত বলে গ্রামের মাঝে হাসপাতাল তৈরী করতে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের বাধছে। গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরীর ব্যাপারে জাত সম্প্রদায় ও তপশীলী এলাকা বিবেচনা করার ফলে উন্নয়নে বাধা পড়ছে। তাছাড়া সব ঠিকঠাক হয়েও পি, ডবলু ডির প্ল্যান বাধছে ছয় বিঘার জায়গায় পাঁচ বিঘা বারো কাঠা জায়গা পাওয়া গেছে বলে। স্থানীয় লোক ঐ জমি দিলেও সামান্য কমের জন্য আটকে দিচ্ছেন কর্তারা। অর্থবিভাগ টাকাও দিচ্ছে না এমন ঘটনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ঘটেছে। বিস্তারিত নাম দেওয়া সম্ভব নয় এই কারণে যে সংবাদ প্রকাশের পর একশ্রেণীর আমলার জিদ ও দম্ভ বাড়ে এবং তারা ভালো কাজের বিরোধিতা করছেন।

মন্ত্রী কিম্বা আমলাদের নিকট আত্মীয় হলেও কলিকাতার মেডিকেল কলেজগুলোতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য ভর্তির ব্যাপারে বিশেষ সুযোগ মেলে। সেরকম ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বি, আর, চক্রবর্তীকে চেয়ারম্যান করে একটি ভর্তি সাব-কমিটি তৈরি করেছিলেন। প্রায় কয়েক হাজার ছাত্র কলকাতা বাঁকুড়া বর্ধমানের মেডিকেল কলেজ এবং ন্যাশনাল ও আর, জি, কর থেকে কয়েকটি খালি খালি সিটে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল চার টাকা পোস্টাল অর্ডার দিয়ে বিরাট ফর্ম ভর্তি করে।

ফলে দেখা গেল মন্ত্রী আমলাদের নিজস্ব ছাত্ররাই ঐ খালি সিটে ভর্তি হবার সুযোগ পেলো। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির বালাই ছিল না। কারাই বা ভর্তির সুযোগ পেলো তা প্রকাশ্যে জানানো হলো না। জানলেন শুধু মন্ত্রী আমলারা।

প্রকাশ যে নীলরতন সরকার কলেজে প্রি-মেডিকেল কিছু ছাত্র ফেল করার ফলেই প্রথমবর্ষ এম, বি, বি, এস-এ ঐ সিট খালি হয়েছিল।

পক্ষপাতিত্বের নজীর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুঃস্থ ও রুগ্ন শিল্পী সাহিত্যিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য যে বৃত্তি ও সাহায্য দিতেন সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভা সেই তালিকা কাটছাঁট করে বামপন্থী এবং সরকার সমালোচকদের নাম বাদ দিয়েছেন এবং নতুন করে একদল সরকারের পদলেহী শিক্ষক সাংবাদিক ও লেখকের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। এরাই নিয়মিত শিক্ষা-দপ্তরের অনুষ্ঠানে এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর ও যুব ও জনসংযোগ দপ্তরের সভাসমিতি ও চায়ের আসরের নিমন্ত্রণ পাচ্ছেন। এই সঙ্গে কিছু যুব কংগ্রেসী ও ছাত্র পরিষদ কর্মীও চিঠি পাচ্ছেন।

সম্প্রতি লেখক আবদুল জব্বার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একশ টাকার বৃত্তি হারিয়েছেন।

ক্যান্সার সারছে?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ক্যান্সার রোগের ওষুধ আজও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। সমগ্র বিশ্বে এই বিশেষ রোগের কার্যকারণ নিয়ে অনুসন্ধান চলছে।

তবুও আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হলেও দুরারোগ্য ক্যান্সারের বেশ কিছু রোগী সুস্থ হয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে আছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার লেকগার্ডেন্সের এক বাড়ীতে।

স্বামী চিদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক সাধু (শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য) দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ওষুধ প্রয়োগ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার পর তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার, টি বি, গনোস্ট্রিক আলসার, ডায়বেটিস প্রভৃতি রোগ সারাতে সক্ষম হচ্ছেন। বলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

বেশ কিছু বিখ্যাত এলোপাথিক চিকিৎসক (অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতিই যাদের একমাত্র পেশা) সেদিন সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে বললেন ঃ "আমরা যে সমস্ত রোগীর সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির লড়াই চালাতে অক্ষম হয়ে তার অবধারিত মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছি, তারা আজ স্বামীজীর চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ।" সুস্থ রোগীদের মধ্যে সেদিন উপস্থিত ছিলেন ইনচেক ট্যায়ারের ডিরেকটর-ম্যানেজার রবীন সেনগুপ্ত, এ্যাডভোকেট প্রভাত মুখোপাধ্যায়, মেট্রোপলিটান হসপিটালের মেট্রন উষা সিং, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের এরোনটিক ইঞ্জিনীয়ার ও সামরিক বিভাগের কম্যান্ডার প্রভৃতি অনেকেই। চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন ইন্ডিয়ান অকসিজেন, টাটা টিউব, কলকাতার কয়েকটি হসপিটালের ডাক্তার এবং বিদেশ প্রত্যাগত একজন কেমিষ্ট।

স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলাম, কি ভাবে রোগ সারাচ্ছেন, ভৌতিক প্রক্রিয়ায়, নাকি দৈবিক মন্ত্রবলে? তিনি বললেন ঃ এই চিকিৎসা ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থারই একটি শাখা। "এ্যালকেমি।" ভেষজ, জান্তব এবং ধাতব—এই তিন সূত্র থেকেই ওষুধ তৈরী হয়। হিমালয় অঞ্চলে অনুসন্ধানের ফলেই আমি এই চিকিৎসার সূত্র খুঁজে পেয়েছি। এর নামকরণ হয়েছে "অবধৌতিক পদ্ধতি।" অন্যান্য সব চিকিৎসার মতই এ রোগের ডায়গনসিস প্রয়োজন। আমার পোষাকে ধর্মীয় আবরণ থাকলেও, এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক।

ঃ কিন্তু বিজ্ঞানই যদি এই চিকিৎসার ভিত্তি হবে তাহলে এই প্রতীক্ষিত আবিষ্কারের ফল আপনি একা ভোগ করছেন কেন? এর প্রসারের কোন প্রয়োজন নেই? তার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

ঃ আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে এ চিকিৎসাকে বিচার করলে চলবে না। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়া। ওষুধ তৈরী এবং প্রয়োগের ব্যাপারে অনেক কৃচ্ছ্র সাধন প্রয়োজন। এই আত্মত্যাগে কেউ ব্রতী নয়। সরকারও উদাসীন। একটি ছন্ন শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের দাবী আজও মঞ্জুর হয় নি।

যাদবপুর টি বি হাসপাতালের রোগী রবীন ব্যানার্জী স্বামীজির চিকিৎসায় মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরেছেন। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট কে এস রায় সম্প্রতি একটি চিঠিতে জানিয়েছেন ঃ "আমি স্বীকার করছি যে আমরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে শ্রীব্যানার্জীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছি। আপনার (স্বামীজীর) চিকিৎসার সাফল্য আমাদের কাছে সত্যিই আকস্মিক।"

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী-ও এই স্বামীজীর চিকিৎসায় উপকৃত হয়েছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়কে এক পত্রে এই স্বামীজীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সরকারী সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।? এটা তেয়াত্তর সালের বিক্ষোভ ঃ আমি সাধু বলে ভক্তি অনুরোধে সাড়া পাওয়া যায় নি।

স্বামীজিরও সেই কারণেই বিক্ষোভ ঃ আমি সাধু বলে ভক্তি চাইনা, জনসাধারণের মঙ্গল চাই। এবং ক্যান্সারের বা যেকোন দুরারোগী চাই, যারা সুস্থ হয়ে নিরোগ রোগী চাই, যারা সুস্থ হয়ে নিরোগ দেহে দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে আমার সাফল্য প্রমাণ করবেন।"

বলা যেতে পারে, সরকারী নীরবতা এবং উদাসীনতা স্বামীজির বিভ্রান্তিকর প্রয়াস-(?) অথবা তাঁর প্রকৃত সাফল্যের সম্ভাবনা উভয়কেই আড়াল করছে। ইনি বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার ১৬২/১১৬, লেক গার্ডেনস এবং উত্তর কলকাতার ২১নং বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে চিকিৎসা চালাচ্ছেন।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা ঃ
৬১, মট লেন, কলি-১৩

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস [redacted]

দ্বিতীয় পর্ব

দিলীপ মজুমদার

সরকারী বিবৃতি যাই হোক, মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি ঘোষণার পর থেকে একদিকে যেমন চালের দুষ্প্রাপ্যতা বাড়ল, অন্যদিকে সেই সুযোগে চলল কালোবাজারী। হুগলী, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় বহু অঞ্চলে ২৮ টাকা থেকে ৩০ টাকা মন দরে চাল বিক্রির সংবাদ পাওয়া গেল। সরকারী দরে রসিদ লিখে মিল মালিকরা বেশী দামে ব্যবসায়ীদের—নিকট চাল ছাড়তে সুরু করলেন।

কৈফিয়ৎ হিসেবে বড় বড় মিলমালিক ও আড়তদাররা বললেন, 'সরকারের খাদ্য দপ্তরই যদি মোটা চাল মিহি চালের দামে বিক্রি করে লাভ করতে পারেন তবে আমাদের আর অপরাধ কী?' চমৎকার কৈফিয়ৎ। সরকার কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিতে পারেন নি। দেওয়া সম্ভবও ছিল না তাঁদের পক্ষে।

যেহেতু সরকারের পরোক্ষ সহায়তা ছিল এই কালোবাজীর পশ্চাতে। সেজন্য এই চোরাকারবারের মূলে যে রাঘববোয়ালেরা রয়েছে তাদের সরকারী আইন বলে কোন শাস্তি বিধান করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রমাণ না পাওয়া গেলেও যে সরকার সন্দেহ ক্রমে রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষভুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে দ্বিধা করেন না, সেই সরকার এই সকল সমাজ শত্রুদের উপর নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগেও দ্বিধাগ্রস্ত হন। খাদ্য নিয়ে অতি মুনাফার লোভে যারা দেশের মানুষকে দুঃখকষ্টে ফেলতে চায় তাদের প্রতি কোন কঠোরতা না দেখিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বললেন যে, কৃষকরা ধান ধরে রাখে বলেই যত মুস্কিল; খাদ্যমন্ত্রীর তাঁবেদার কিছু সংবাদপত্রেও লেখা হল যে, কৃষক নিয়ন্ত্রিত দরে ধান না বিক্রি করলে চাল তো দুষ্প্রাপ্য হবেই।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় তৎকালীন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'খাদ্য চোরদের শায়েস্তা করা হইবে না?' শীর্ষক সম্পাদকীয়টি। —"পশ্চিমবাংলার খাদ্যাবস্থা প্রতিদিনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। নিবর্তনমূলক আটক আইন চালু আছে, আর মজুতদার ও মুনাফাখোররাও দেশে বিরাজ করিতেছে—কিন্তু কংগ্রেসী সরকার এ দুইটির কোনটির অস্তিত্ব যেন দেখিতেছেন না।...আমাদের রাজ্য সরকার, বিশেষতঃ খাদ্যমন্ত্রী বলিয়া থাকেন —সরকারী কর্মচারীদের দিয়া কাজ চালানো খুবই মুশকিল, এই সব কর্মচারী অযোগ্য, তাই সরকার নিজে ধান চাউল ক্রয় করে না, মিলমালিক ও ব্যবসায়ীদের মারফৎ সরকার প্রয়োজনমত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিবেন। ঠিক এই কথাই লোকসভাতেও আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমতী রেনু চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—মজার কথা এই যে কোন কিছু ঘটিলে অধঃস্তন কর্মচারীদের উপর দোষ চাপানো হয়। .....রাজ্য সরকার বিশেষতঃ খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের বৃহৎ ব্যবসায়ী ও বৃহৎ মিলমালিকদের তোষণনীতি বন্ধ না হইলে দেশের মানুষ খাদ্য পাইতে পারে না। এই মূল প্রশ্নটির সমাধান করিতে না পারিলে কলিকাতা ও মফঃস্বল শহরাঞ্চলে চাউলের চোরাবাজার বন্ধ করার সাধ্য কাহারো নাই, চাউলের কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা কেহই ঠেকাইতে পারিবে না।" (স্বাধীনতা ২৫।২।৫৯)।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশনে ১৫টি মুলতুবী প্রস্তাবের (এর মধ্যে ১০টি কমিউনিষ্ট সদস্যদের) মাধ্যমে বিরোধী সদস্যরা ঠিক এই অভিযোগই উত্থাপন করেছিলেন, "মুনাফা বিরোধী জরুরী আইন প্রবর্তনের পরেই সমগ্র পশ্চিমবাংলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পাইকারী ও খুচরো বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে খুচরা বিক্রেতাগণ পাইকারী ব্যবসায়ী ও মিলগুলির নিকট হইতে চাউল পাইতেছেন না, অন্যদিকে খুচরা ক্রেতাদের সরকারী নির্ধারিত দাম অপেক্ষা অনেক বেশী কালোবাজারী দামে চাউল ক্রয় করিতে হইতেছে। কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দামের সহিত সরকার নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যের কোন সামঞ্জস্য নাই। সরকার একদিকে সরাসরি ক্রয় সামান্যই করিতেছেন, অন্যদিকে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল সরবরাহে এবং নিয়ন্ত্রণাদেশ ভঙ্গকারী মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন।" (স্বাধীনতা ৪।২।৫৯)।

এই অবস্থায় আশু প্রয়োজন ছিল সর্বস্তরে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন। কিন্তু ১৯শে জানুয়ারীর খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সভাতেও কংগ্রেসী সদস্যদের পীড়াপীড়ির ফলে অন্যান্য স্তরে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠনের বিরোধিতা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সরকার শুধু বর্তমান মহকুমা কমিটিগুলিকে অভিপ্রেত ও প্রয়োজন মনে হলে ২ জন সদস্য মনোনীত করে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু থানা ইউনিয়ন ও শহরাঞ্চল স্তরে কমিটি গঠনের ব্যাপারে অসম্মতি জানান। ইতিপূর্বে কিন্তু সুদীর্ঘ বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকার এই ধরণের কমিটি গঠনের ব্যাপারে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। ১৯শে জানুয়ারীর সভায় সরকার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি এক বিবৃতির মাধ্যমে সরকারী আচরণের প্রতিবাদ জানান।—"কমিটি সমস্ত ঘটনাবলী তীব্র ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন এবং তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাইতেছেন।

সরকারের এই সাম্প্রতিকতম কার্যাবলীকে কমিটি পূর্বেকার যে সমস্ত কথা ছিল তাহার সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি বলিয়া মনে করেন। খাদ্যের ন্যায় এক মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য যে সহযোগিতা ও যৌথ প্রচেষ্টা এত প্রয়োজন, ইহা দ্বারা তাহাকেই খর্ব করা হইতেছে।"

খোলা বাজারে চালের দুষ্প্রাপ্যতা ক্রমশ অসহনীয় করে তুলল জনজীবন। প্রতিবাদ জানাতে সুরু করল মানুষ। ব্যারাকপুর, দমদম, কসবা, তিলজলা, করিমপুর, ময়নাপুলি, আন্দুল প্রভৃতি স্থানে সভা ও ডেপুটেশনের মাধ্যমে জনমত ঘোষিত হল। খাদ্যের ব্যাপারে খাদ্যমন্ত্রীর কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় বিরোধীরা বিধানমণ্ডলীর সভা ত্যাগ করলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির কলকাতা জেলা পরিষদ আয়োজন করলেন এক গণ অভিযানের। এঁদের দাবি ছিল (১) অবিলম্বে বাজার থেকে বিক্রয়যোগ্য চাল সংগ্রহ করে সরকারের হাতে স্থায়ী মজুত সৃষ্টি করতে হবে (২) সরকারকে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট চাল সরবরাহ করতে হবে (৩) মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ বানচালকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে (৪) প্রত্যেক ওয়ার্ডে জনপ্রিয় কমিটিকে স্বীকার করতে হবে। ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিধানমণ্ডলী অভিমুখে এই গণ অভিযান পরিচালিত হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিরোধী পক্ষের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু। মিছিল যখন রাজভবনের দক্ষিণে উপস্থিত হয় তখন পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে; বিধান পরিষদের অভ্যন্তরে কমিউনিষ্ট সদস্যরা দাবি করেন যে, অধিবেশন কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে খাদ্যমন্ত্রী বাহিরে মিছিলকারী মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। কিন্তু সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়।—পরে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সহ প্রতিনিধিদলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শহরে আঞ্চলিকভাবে নির্বাচিত খুচরা চালের দোকানগুলিতে সরকার সরাসরি চাল সরবরাহ করবেন বলে আশ্বাস দেন এবং এ জন্য তিনি বিরোধীপক্ষের নিকট খুচরা চালের দোকানের একটি তালিকা চান। শুধু কলকাতা নয়, সমসাময়িক সংবাদপত্র জানতে পারা যায় যে জনগণের ধূমায়িত বিক্ষোভ আন্দোলনে রূপলাভ করছিল সারা রাজ্য জুড়ে। হাওড়ায় ৫ সহস্রাধিক নরনারীর জনসভায় খাদ্য সরবরাহের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়েছিল। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা খাদ্য সঙ্কটের কবলে নদীয়া জেলার এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছিল।

খাদ্য সঙ্কটের আবর্তে নিমজ্জিত গ্রাম বাংলার কিছু চিত্র সংবাদপত্রের পাতা থেকে উদ্ধৃত করা যাক—। "পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেল যে, সর্বত্র, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে কোথাও কন্ট্রোল দরে চাউল মিলিতেছে না। রেশনের দোকান মারফৎ যদিও বা কোন কোন অঞ্চলে যৎ সামান্য চাউল মিলে, তাহাও মানুষের পাতে দেওয়ার মত নয়। তাহা ছাড়া রেশন কার্ড পাইতেও জনসাধারণের নানারকম ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। সর্বত্র ক্রমশই চাউলের দাম বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে।" (বসুমতী/১৫।২।৫৯)। শুধু কী তাই? রেশন মারফৎ সরকার যে যৎকিঞ্চিৎ চাল সরবরাহ করছেন তা-ও গ্রহণযোগ্য নয়।—"সুদূর গ্রামাঞ্চলে যাহা হইতেছে তাহাতে এখন আর ততটা তাজ্জব বনিয়া যাওয়ায় কিছু নাই। কিন্তু খোদ কলিকাতা ও হাওড়া এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চাউল লইয়া যে ধরণের ছিনিমিনি খেলা হইতেছে তাহাতে কোন লোকই তাজ্জব না বনিয়া পারে না। বিভিন্ন অঞ্চলে খোঁজ খবর লইয়া জানা গেল যে, ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ যে চাউল দেওয়া হয় তাহা মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত না। প্রায় সর্বত্র চাউলের সঙ্গে কালো বিচির ন্যায় এক প্রকার নূতন ধরণের কাঁকরও [redacted] ছাড়াও, রান্নার পরে ভাতের মধ্য হইতে যে ধরণের গন্ধ বাহির হয়, তাহার সহিত যে কোন ধরণের পচা জিনিসের তুলনা চলে। দোকানি জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, সরকার বর্মাই চাউল সরবরাহ করিতেছেন। কালোবাজারে অবশ্য ভাল চাউল মিলে। যদিও তাহা বেআইনী।" (বসুমতী/২৭।২।৫৯)

কিন্তু সরকার নীরব ও বধির। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আত্মতুষ্ট। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা ছাড়াও আনন্দবাজার প্রমুখ অধিক-শ্রেণীর কাগজেই ৮০টি অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর সরকারী ভাষ্য ছিল অন্যরূপ। খাদ্যমন্ত্রীর Food Relief and Supply Department এর রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, গত এক বৎসরে সংবাদপত্রে অনাহারে মৃত্যুর যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি অসত্য। সরকারের দৃষ্টিতে 'অনাহারে' মৃত্যুর দৃষ্টান্ত ছিল না, হ্যাঁ, 'অপুষ্টি'তে কেউ কেউ মরলেও মরতে পারে।

যাই হোক উপায়ান্তর না দেখে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি রাজ্যব্যাপী জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। এই অভিযানের প্রথম পর্যায়ে তাঁরা ১লা মার্চ থেকে কলকাতায় সর্বত্র পথসভা ও জনসভার আয়োজন সুরু করেন। ৪ঠা মার্চ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শ্রীহেমন্ত বসু, এম এল এ'র সভাপতিত্বে এবং মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা সরকারের অনুসৃত খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, সরকারের খাদ্যনীতির কবলে পড়ে বহু লোকের অন্নাভাব দেখা দিয়েছে।—"মজুতদারগণ দেশের সমস্ত ধান চাল মজুত করিয়া রাখিয়াছেন। সরকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন না। তাই আগামী ১১ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে কৃষকগণ পদব্রজে কলিকাতায় পৌঁছিবে ও এক জনসমাবেশে মিলিত হইবে।" (বসুমতী/৫।৩।৫৯)

(ক্রমশঃ)

জয়পুর [redacted] ধনির রহস্য

কপিল [redacted]

নতুন দিল্লী, সাতাশে ফেব্রুয়ারী ঃ আয়কর কর্তৃপক্ষের তল্লাশীর ফলে প্রাক্তন জয়পুর রাজপরিবারের প্রাসাদাদি থেকে প্রচুর পরিমাণ অবৈধ ও লুকানো সোনাদানা, হীরাপান্না, মোহর ও বিদেশী এবং দেশী মুদ্রা ধরা পড়লেও আজ অবধি এই অপরাধে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। যে দেশে নিছক সন্দেহের বশে হাজার হাজার তরুণ রাজনৈতিক কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়ে থাকে এবং হয়েছে সে দেশে প্রথম দৃষ্টিতে অপরাধমূলক ঘটনা অর্থাৎ প্রাইমা ফেইশি কেস দেখা গেলেও সম্ভাব্য অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করাটা স্বভাবতই, সন্দেহের যদি বা নাও হয় নিশ্চিতই বিস্ময়ের উদ্রেক করে থাকে। প্রাক্তন জয়পুর রাজপরিবারঘটিত এই ব্যাপারটিও তাই তেমনই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে আর জনমনে কিছুটা সংশয়েরও বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। বস্তুত এই প্রসঙ্গে গত পঁচিশে ফেব্রুয়ারী রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী শ্রীচিদাম্বরম সুব্রহ্মণীয়মের "মনকে চোখ ঠারা"-প্রয়াসী বক্তব্যে সেই সংশয়ের বাতাবরণকে বেশ কিছুটা জোরদার করেছে।

শ্রীসুব্রহ্মণীয়ম এক স্বল্পমেয়াদী প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আয়কর কর্তৃপক্ষ গত এগারোই ফেব্রুয়ারী তারিখে যুগপৎ দিল্লী ও জয়পুরে প্রাক্তন জয়পুর রাজপরিবারের প্রাসাদাদিতে তল্লাশী শুরু করেন। দিল্লীর তল্লাশী এগারো তারিখেই শেষ হয় কিন্তু জয়পুরের তল্লাশী এখনও চলছে। এই তল্লাশীর ফলে মূল্যবান হীরা, বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা, বেশ কয়েক কোটি টাকা মূল্যের কয়েক কুইন্টল সোনা ও রূপা পাওয়া গেছে। দিল্লীতে শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীর ৩৩, আওরঙ্গজেব রোডস্থ বসত বাড়ী, লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ভবানী সিংহের ৩/১৩ শান্তিনিকেতনস্থ বাসভবন, লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ভবানী সিংহের স্ত্রী শ্রীমতী পদ্মিনী দেবীর ৩/১৩ শান্তিনিকেতনস্থ ও, ৩০২/৯ হেইলী রোডস্থ বাসভবন, জয়পুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত মেসার্স এস এম এস প্রাইভেট লিঃ নামক কোম্পানীর ই-টু হাউস খাসস্থ বাড়ী ও জয়পুর পরিবারের আয়কর উপদেষ্টা শ্রীবি কে ভর্মার দপ্তর ও বসতবাড়ীতে তল্লাশী চালানো হয়।

আর জয়পুরে নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে তল্লাশী চালানো হয়েছে ঃ (এক) সিটি প্রাসাদ, (দুই) লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ভবানী সিংহের বাসস্থান রাজমহল প্রাসাদ, (তিন) শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীর বাসস্থান মোতি দুঙ্গরী প্রাসাদ, (চার) সোওয়াই প্রতাপ সিংহ রোডস্থ শ্রীজয় সিংহের বসতবাড়ী, (পাঁচ) জয়গড় দুর্গের ষ্ট্রং রুম বা মালখানা, (ছয়) প্রাক্তন জয়পুর রাজপরিবারের গৃহস্থালী-নিয়ন্ত্রক (কন্ট্রোলার অব হাউসহোল্ড) শ্রীহরনাথ সিংহের সোওয়াই প্রতাপ সিংহ রোডস্থ বাসভবন এবং (সাত) রত্নব্যবসায়ী মেসার্স মলিরাম পুরনমল রাওয়াৎ-দের কার্যালয় ও তাঁদের অংশীদারদের আবাস। শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী হচ্ছেন জয়পুরের পরলোকগত মহারাজা সোওয়াই মান সিংহের বিধবা পত্নী এবং লোকসভার ভারতীয় লোকদলভুক্ত সদস্যা। লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ভবানী সিংহ, শ্রীজয় সিংহ প্রভৃতি হচ্ছেন উক্ত পরলোকগত মহারাজার পুত্র। অর্থাৎ এরা সবাই হলেন তাঁর উত্তরাধিকারী।

আওরঙ্গজেব রোডের বাড়ীতে যখন তল্লাশী চালানো হচ্ছিল তখন শ্রীভবানী সিংহ ও শ্রীজয় সিংহ ছিলেন। শ্রীভবানী সিংহের কাছে নিম্নলিখিত পরিমান বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় এবং তা আটক করা হয় ঃ ছিয়াত্তর হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিং, তিন হাজার ইতালীয় লীরা, একশো কুড়ি মার্কিন ডলার, তিরিশ সুইস ফ্রাঙ্ক ও দুশো কুড়ি মার্কিন ডলার মূল্যের ট্রাভেলার্স চেক। এ ছাড়া পঁচিশ হাজার টাকার ভারতীয় নোটও পাওয়া যায়। শ্রীভবানী সিংহরা এই পঁচিশ হাজার টাকা কোথা থেকে পেয়েছেন সে সম্পর্কে কোন সঠিক বক্তব্য না রাখতে পারার দরুণ ঐ টাকাও আটক করা হয়েছে। উপরন্তু ইতালীর রাজধানী রোম শহরের একটি ব্যাঙ্কের লকারের চাবি ও মার্কিন মুলুকে অবস্থিত চেজ মানহাট্টান ব্যাঙ্কে তাঁর নামের একখানি চেক বইও পাওয়া গেছে ও আটক করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে শ্রীমতী পদ্মিনী দেবীর কাছ থেকে প্রায় নয় লাখ টাকার গহনাদি ও হেইলী রোডের বাড়ী থেকে সাতষট্টি হাজার টাকা দামের রূপার বাসনাদি পাওয়া গেছে এবং তা আটক করা হয়েছে।

শ্রীভার্মার দপ্তর ও বাড়ী তল্লাশী করে জয়পুর পরিবারের আয় সম্পর্কিত কিছু কাগজপত্র আটক করা হয়েছে।

জয়পুরস্থ সিটি প্রাসাদ তল্লাশী করে "কপর্ট দ্বার" (জয়পুর পরিবারের ধনদৌলত এখানে রাখা হত বলে শোনা যায়) থেকে এখন অবধি যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে প্রায় এক কুইন্টল ওজনের সোনার বাসনপত্র, প্রায় পঞ্চাশ কুইন্টল ওজনের রূপার বাসনপত্র ও ছবির ফ্রেমাদি। এ সব তালিকাভুক্ত করা হলেও এখন অবধি তার মূল্য নির্ধারণ করা হয় নি। কিছু গহনাদিও পাওয়া গেছে। রাজমহল প্রাসাদ থেকে পাওয়া গেছে বিপুল পরিমাণ হীরাপান্নাখচিত গহনাদি। এ সবের মূল্য নির্ধারণ এখনও করা হয় নি তবে এগুলিকে তালিকাভুক্ত করে ঐ প্রাসাদেরই মালখানায় তালাবন্ধ করে তার চাবি নিয়ে আসা হয়েছে। শ্রীজয় সিংহের বাড়ীতেও বিপুল পরিমান গহনা ও নগদে এক লাখ টাকা পেয়ে আটক করা হয়েছে।

মোতি দুঙ্গারী প্রসাদ তল্লাশীর ফলে সেখানকার একাধিক মালখানা থেকে বহু সংখ্যক চাবি পাওয়া গেছে। এই চাবিগুলির মধ্যে রামবাগপ্রসাদ হোটেলের ভূগর্ভস্থ দুইটি মালখানার চাবিও ছিল এবং তাই দিয়ে ঐ মালখানা দুইটি খুলে তার একটিতে সাড়ে পাঁচ তোলা প্রাথমিক সোনা হীরকখচিত একটি টায়রা ও তিন-নরী একটি হীরের হার পাওয়া গেছে। এ সবের মালিকানা ও মূল্য এখনও নির্ধারিত হয় নি তবে মালখানায় সেগুলিকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। মোতি দুঙ্গরী প্রাসাদের এক নম্বর মালখানার মেঝেতে লুকানো গুপ্ত কামরা থেকে ৪৯৪৯৫ টি পুরানো সোনার মোহর, ১০৩৮টি গিনি, ৬১টি অর্ধ গিনি, মাকাবিহীন প্রাথমিক সোনা ১৭·৯৪৩ কিলোগ্রাম আর ২৭৯·৮১২ কিলোগ্রাম ওজনের মার্কযুক্ত প্রাথমিক সোনা পাওয়া গেছে। সর্বসাকুল্যে এখানে পাওয়া এই সোনার পরিমাণ হচ্ছে ৮৪৮ কিলোগ্রাম আর তার বর্তমান আনুমানিক মূল্য হচ্ছে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। এখানে তল্লাশীর সময়ে এমন প্রমাণ মিলেছে যা থেকে জানা যায় যে সুইজারল্যান্ডের কোন একটি ব্যাঙ্কে শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীর একটি আকাউন্ট আছে। এ ব্যাপারে আরও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

জয়গড় দুর্গও জয়পুর পরিবারের অন্যতম মালখানা। এখানে তল্লাশী করে দুই কুইন্টল ওজনের রূপার তৈজসপত্র, কিছু প্রবাল ও জেড পাথর এবং তিন হাজার (মুখ্যত আগ্নেয়াস্ত্র) হাতিয়ার পাওয়া গেছে।

এ সব ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগমূলক কিছু দলিলদস্তাবেজ পাওয়া গেছে। এ সবই এখন বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে।

বিত্তমন্ত্রী মশায় আরও বলেছেন যে এসবে গোল্ড কন্ট্রোল অর্ডার আয়কর প্রভৃতি আইনকে লঙ্ঘণ করা হয়েছে এবং তার কারণে জয়পুরের পরলোকগত মহারাজার এই সব উত্তরাধিকারীদের ওপরে নোটিশ জারী করা হয়েছে। এই সব আইন লঙ্ঘণের অপরাধে ও অভিযোগে কেন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় নি বা হচ্ছে না এই প্রশ্ন করা হলে শ্রীসুব্রহ্মণীয়ম জানালেন যে "প্রশ্নটা গিয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে তথ্য-প্রতিপাদন আর তাতে সময় লাগে। এ ব্যাপারে কোন অপরাধকর্ম (ক্রিমিন্যালিটি) জড়িত আছে কিনা সেটি প্রথমে প্রতিপাদন করতে হবে। তাই তাঁদের কারাগারে বন্দী করবার যে অভিভাবন দেওয়া হয়েছে সেটি দায়িত্বশীল অভিভাবন নয়।" অবশ্য শ্রীসুব্রহ্মণীয়ম এ আভাসও দিয়েছেন যে আইন তার নিজ পথে এগিয়ে চলবে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠাদি যাই হোক না কেন।

কিন্তু কংগ্রেস রাজত্বে আইন সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে নিজ পথে চলে কি? তা যদি চলে তবে তথ্য প্রতিপাদনের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক কর্মীদের মিসা বা অনুরূপ আইনে কেন গ্রেপ্তার করা হয়, আর জয়পুর পরিবারের এঁদের বিরুদ্ধেই বা তা কেন করা হয় না? কিছু দিন আগে সংসদের একাধিক সদস্যকে বিভিন্ন রাজ্যে মিসায় যে আটক করা হয়েছিল তা তো সংসদেই প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া অভিযোগ প্রতিপাদনের আগে হাজার হাজার তরুণ রাজনৈতিক কর্মীকে তা হলে বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে আটক করে রাখা হয়েছে কেন? এ সব প্রশ্নের জবাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মশায় দেবেন কি? সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আইনের এক ধরণের প্রয়োগ আর ওপরতলার লোকদের (বিশেষ করে প্রাক্তন রাজপরিবারের লোকদের) ক্ষেত্রে তার অন্য ধরণের ব্যবহার সম্ভবত কংগ্রেসী গণতন্ত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। অন্তত এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহলে এই ধারণাই দানা বেঁধে উঠেছে, শ্রীসুব্রহ্মণীয়মের এই বক্তব্য থেকে।

মার্কিন চোরাচালানী ওয়ালকটের সঙ্গে জয়পুর পরিবারের এক সময়ে খুব যোগাযোগ ছিল বলে শোনা যায়। বিমানে করে সে সোজা জয়পুরাদিতে যাতায়াত করত। সরকার জয়পুরের তদন্তপ্রসঙ্গে এদিকটিতেও নজর হেবেন কি? তা ছাড়া অন্যান্য রাজপরিবারগুলির মালখানাদির তল্লাশী চালানোর সময় কি এখনও আসে নি? সে সবেও যে কোটি কোটি টাকার সোনা রূপাদি অবৈধভাবে লুকানো নেই তাই বা কে বলবে?

রাজধানী দর্পণ

চটকল ধর্মঘটের নাশকতামূলক শক্তি

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

অবশেষে পশ্চিমবাংলার চটকল শ্রমিকদের ছেচল্লিশ দিন ব্যাপী বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘটের অবসান ঘটলো আই, এন, টি, ইউ সি, এইচ, এম, এস-এর একাংশ এবং এ, আই, টি, ইউ, সি'র রাতারাতি ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তজনিত গুপ্ত নাশকতার ফলে। সি, আই, টি, ইউ, ইউ, টি, ইউ, সি, ইউ, টি, ইউ, সি (লেনিন সরণী) সহ অন্যান্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলো দাবী আদায়ের আগে ধর্মঘট প্রত্যাহারে রাজী ছিলেন না। এমন কি, আই, জে, এম এর সম্মুখে অবস্থানরত শ্রমিকদের সামনেও বিশে ফেব্রুয়ারী এ, আই, টি, ইউ, সির ভবানী রায়চৌধুরী ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যে, ধর্মঘট চলবে কিন্তু পরে তারা আই, এন, টি, ইউ, সির সঙ্গে হাত মেলান।

উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মঘট সুরু হবার আগেই সি, আই, টি, ইউ মার্চ মাসে ধর্মঘটের তারিখ পিছিয়ে নেবার প্রস্তাব করে, কিন্তু আই, এন, টি, ইউ, সি এবং এ, আই, টি, ইউ, সি তারিখ পিছিয়ে নিতে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সি, আই, টি, ইউ এবং ইউ, টি, ইউ, সির দুই অংশ সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলোও বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘটে সায় দেয়। পাটকল শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল যে, মার্চ মাসে পাটকলে কাজের চাপ থাকে এবং এই সময় ধর্মঘট হলে মালিকরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতো। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে কাজের চাপ ধরতে গেলে থাকেই না। লক্ষনীয় যে, রাজ্য সরকারও দীর্ঘ দিন নীরব থেকে ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে আলোচনার নামে মালিকপক্ষকে নিয়ে শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন, কারণ, এখন নতুন অর্ডারের মাল সরবরাহের কাজ সুরু হবে। স্বাভাবিকভাবেই আই, এন, টি, ইউ, সি কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয় এবং এ, আই, টি, ইউ, সি ও সি, পি আই দলের রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতি অনুযায়ী শ্রমিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আই, এন, টি, ইউ, সি'র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। রেল ধর্মঘটেও এ, আই, টি, ইউ, সি দীর্ঘদিন ধর্মঘট চলার ফলে শ্রমিকদের দুরবস্থার যে ধূর্ত জিগীর তুলে গুপ্ত নাশকতার পথ অবলম্বন করেছিল পাটকল ধর্মঘটেও তারা সেই একই জিগীর তুলেছে যা তেলেনীপাড়ার জনৈক পাটকল শ্রমিকের ভাষায়, "উয়োলোক হারাম হ্যায়। লালঝাণ্ডা লে কর তেরাঙাকা নোকর বন গিয়া"।

শ্রমিকদের বৃহত্তর ঐক্য রক্ষার অপরিহার্য কারণেই সি, আই, টি, ইউ সহ অন্যান্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলোকেও ধর্মঘট প্রত্যাহারে রাজী হতে হলো। এবং এর ফলে পাটকল শ্রমিকরা দাবী আদায় হলে যেখানে মাগগীভাতা পেতেন একষট্টি টাকা, এখন সেখানে পাবেন মাত্র ষোল টাকা।

মতামত

প্রাণবন্ত ছবি 'অঙ্কুর'

এ দেশের একটি বাস্তব এবং প্রাণবন্ত কাহিনীর যার্থক রূপায়ণ 'অঙ্কুর'। সামন্ততন্ত্রের জঠরে যে বিষবৃক্ষ লালিত পালিত হচ্ছে ধনবাদী ভাবধারা আরো বীভৎস এবং কদর্য করে তুলছে তাকে। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিরোধ নেই, অত্যাচারিতের সঙ্গে আছে সমব্যাথী অসহায় মানুষেরা। অত্যাচারিত এখানে শুধু জেহাদ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত। কিন্তু কোন রূপ ফ্যান্টাসীর সাহায্য ছাড়াই সুস্পষ্ট প্রতিরোধ দেখানো হলো। প্রতিরোধ সুরু হয়েছে এবং ভোরের মত সে সত্য। আজকে সে অঙ্কুর। আগামী দিনের, আগামী যুগের জন্য প্রতি আক্রমণ অঙ্কুরিত হলো 'অঙ্কুর' ছবিতে।

গ্রাম্য পরিবেশে জমিদার আর তারই তালুকের সামান্যা নারী লছমীকে কেন্দ্র করে জমিদার, তার সহযোগী, তাঁবেদার এবং সাধারণ মানুষ অর্থাৎ গোটা গ্রাম্য সমাজের একত্রিভূত রূপ পর্দায় প্রতিফলিত করেছেন পরিচালক।

এ ছবির পরিচালকের সব চাইতে শিল্প নৈপুণ্য হলো কঠিন প্রতিপাদ্য বিষয়কে সাধারণের গ্রহণ যোগ্য করে পরিবেষণ করা। যা বর্তমান যুগে বাম প্রগতিশীল শিল্পীদের কাছ থেকে আমরা সচরাচর পাই না।

অজ্ঞ মূর্খ (?) কালা বোবা (গ্রামের প্রতীক), গ্রামের মানুষ কৃষ্ণ। ধর্মমন্দিরে যে সন্তানের জন্য মানত করেছিল। ধর্মমন্দিরেই সেই কিষ্টিয়ার অবৈধ সন্তানকে সাদরে গ্রহণ করা এবং তার কুশল কামনা করার দৃশ্যটি অভূতপূর্ব। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচায়ক।

সর্বশেষ দৃশ্যে ছোট ছেলেটির ঢিল ছুঁড়ে জানালার কাঁচ ঝনঝনিয়ে ভেঙে দেওয়ার পর আনন্দে অধীর নূতন প্রভাত পাখীর কলকল শব্দের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করল বিষাদক্লিষ্ট যুগের সমাপ্তি। নতুন যুগ সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ।

ছবিতে অসংখ্য প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার মত এমন যথোপযুক্ত প্রতীকের ব্যবহার ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এবং ছবির বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি না করেই তা করতে পেরেছেন ছবির পরিচালক। সুন্দর ক্যামেরার কাজ। ব্যক্তি ও ঘটনা বিশেষে সুনির্দিষ্ট আবহসংগীত অনেক ক্ষেত্রে দর্শকের মনে নিঃসন্দেহে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

'অঙ্কুর' নিয়ে কিছু আলোচনা হওয়া উচিত। বাংলার সংস্কৃতি পিপাসুরা যেন 'অঙ্কুর' সম্পর্কে প্রায় নীরব। শ্যাম বেনেগাল একজন সম্ভাবনাপূর্ণ পরিচালক। সঠিক পথে আগামীদিনে চলা তাঁর পক্ষে হয়ত নানা কারণে কঠিন হবে। তাই গঠনমূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে একজন নির্ভিক, দক্ষ এবং গণশিল্পীর আরো যার্থক উত্তরণ সুনিশ্চিত করা আজকের দিনের জরুরী কাজ।

জনৈক দর্শক

মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্র

অর্ধীম পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকাগুলির একজন নিয়মিত পাঠক। সেই সূত্রে "স্বাধিকারে"র জন্মলগ্ন থেকে তারও পাঠক। একুশে ফেব্রুয়ারীর "স্বাধিকার" প্রকাশিত (প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা) কাগজ দেখে আমি মর্মাহত হয়েছি।

উক্ত সংখ্যায় এই জঘন্য "বাঙলা দেশ" পত্রিকার প্রেসে হামলার সংবাদে লেখা হয়েছে "বাঙলা দেশ" পত্রিকার কম্পোজিং সেকসনের কোন ক্ষতি হয় নি। তাহলে কি আমাদের এই মনে করতে হবে সংগ্রামী ঐতিহ্যবাহী "গণশক্তি", "দর্পণ", "কালান্তরে" প্রকাশিত সংবাদ মিথ্যে?

"স্বাধিকার" রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের খোদ মহাকিরণের মধ্যে যৌন আচরণ সম্পর্কে খবর প্রকাশের জন্য "বাঙলা দেশ" পত্রিকার নিন্দা করে বলেছে যে কারোর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে সংবাদপত্রে লেখা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি, পত্রিকার চতুর্থ বা পঞ্চম সংখ্যায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের পুত্র কাজী সব্যসাচী চরিত্রের যৌন দিক নিয়ে একবার সংবাদ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, আবার ষষ্ঠ সংখ্যাতেও কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার চেষ্টা সংবাদের মধ্যেও কাজী সব্যসাচীর ব্যক্তিগত চরিত্রের সমালোচনা করা হয়েছে।

আমি মনে করি, কাজী সব্যসাচীর ব্যক্তিগত চরিত্রের চেয়ে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্র সেই রাজ্যের লোকের উপর অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে। কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজেই লম্পট, ঋভিচারী, দুর্নীতিবাজ হন তাহলে তিনি সেই রাজ্যের লোকের শাসনভার নিজের হাতে কি করে নেন, আর কি করেই বা সহকর্মীদের ও নিজের বিরুদ্ধে আনিত দুর্নীতির অভিযোগগুলি নিজেই পরীক্ষা করে সহকর্মীর বিরুদ্ধে কমিশন বসান গণতান্ত্রিক যুগে?

অখিল ঘোষ

দক্ষিণ কোরিয়া ও [redacted] মুক্তি আন্দোলন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুতুল পাক জুং হি-সরকার দক্ষিণ কোরিয়ার বুকে এক বর্বর শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার গণতন্ত্রী মানুষ পাক জুং হির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলছেন। শুধু শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুবক নয়, গণতন্ত্রী লেখক-শিল্পী, সাংবাদিক এই আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাংবাদিকদের অংশ গ্রহণ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যেমন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দেশে দেশে সংবাদপত্র, সাংবাদিকদের ওপর হামলা চলছে, তেমনি এখানেও। সংবাদপত্র ও রেডিওর ওপরে ফ্যাসীবাদী হামলার বিরুদ্ধে জোরদার সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবাদিক সমিতি সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষিণ কোরিয়ায় রেডিও ঘোষণা রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। এই প্রতিষ্ঠানকে কব্জা করার জন্য পাক

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

জুং হি নানা চক্রান্ত করছে। তার একটি হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট রেডিও কেন্দ্রটিকে ব্যাঙ্ক যাতে ঋণ সাহায্য না দেয় তার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত ফ্যাসিস্ত গুণ্ডারা সংবাদপত্র তোঙ্গা ইলবোর লেখা কপিগুলি মাঝে মাঝে চুরি করছে অথবা সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। তৃতীয়ত, সংবাদপত্রে যাতে কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া তার জন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর ফ্যাসিস্ত গুণ্ডারা চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে রেডিও তোঙ্গা ও তোঙ্গা ইলবোর কর্মীরা আর্থিক কষ্টে পড়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় সাংবাদিক সমিতি সাংবাদিক কর্মচারীদের সাহায্য করার আবেদন জানিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে। সেই আবেদনে বিপুল সাড়া দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া শ্রমিক, যুবছাত্ররা।

দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ফ্যাসীবিরোধী ছাত্র সংস্থাগুলি দক্ষিণ কোরিয়ায় সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ পাক জুং হি ব্যাপক গ্রেপ্তার পিটুনির আশ্রয় নিয়েছে। তৎসত্ত্বেও ছাত্র-যুবকদের দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ায় বড় বড় শহরে যে ফ্যাসী বিরোধী ছাত্র-যুব শোভাযাত্রা বের হয় তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশ গ্রহণ করে। এক দিনের বিক্ষোভ মিছিলে এক লক্ষ ছাত্র-যুব অংশ গ্রহণ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার মত ছোট্ট দেশে বিক্ষোভ মিছিলে এত মানুষের অংশ গ্রহণের ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এছাড়া, পাক জুং হির তথাকথিত নির্বাচন অনুষ্ঠান বয়কট করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতন্ত্রী মানুষ প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলছেন। বিক্ষোভকারী ছাত্ররা রাজধানী সিওলের পথে পথে জুং হি-র নির্বাচনী ইস্তাহার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। আওয়াজ তুলছে : সংবিধান বাতিল কর। নির্বাচন বয়কট কর। এমন কি দক্ষিণ কোরিয়ার খ্রীস্টান সমিতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, পাক জুং হি-র স্বৈরাচারী শাসনে নির্বাচন অর্থহীন। দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতন্ত্রী দল এই নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন।

শুধু নির্বাচন বয়কট নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবীও জোরদার। দ্বিতীয়ত, দুই কোরিয়ায় শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলনের দাবীও জোরদার হচ্ছে।

কাম্বোডিয়ায় সিহানুকের জাতীয় মুক্তি বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে কাম্বোডিয়ায় মার্কিন ক্রীড়নক নলচক্র ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। নলচক্রকে বাঁচানোর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যাণ্ডস্থ মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে। এছাড়া, এই সামরিক ঘাঁটি থেকে মার্কিন বোমারু বিমান কাম্বোডিয়ায় যাচ্ছে এবং মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক অঞ্চলে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করে নির্বিচারে হত্যালীলা চালাচ্ছে। সম্প্রতি একজন মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞ এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, কাম্বোডিয়ায় নলচক্রের জন্যে মার্কিন সমরাস্ত্র দ্বিগুণ করা হয়েছে।

মুক্তাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সিহানুকের জাতীয় মুক্তিবাহিনীর সরকার সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাম্বোডিয়ায় নাক গলাচ্ছে এবং কাম্বোডিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করছেন।

সিহানুক সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কতগুলো গুরুতর অভিযোগ করেছেন। এই গুরুতর অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে রাসায়ণিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার। সংশ্লিষ্ট বিবৃতিতে কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তি ফৌজের সরকার বলেছেন যে, ফোর্ড-কিসিঞ্জার মুক্তাঞ্চলে বোমা বর্ষণের নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশনামায় বিশ্ববিখ্যাত আঙরভাট মন্দিরটি ধ্বংসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, মুক্তাঞ্চলের ফসল ক্ষেত ধ্বংসের জন্য নির্বিচারে বিষাক্ত রাসায়ণিক দ্রব্য ছড়ানোর নির্দেশও আছে।

বিবৃতিতে এই মানববিদ্বেষী কাজকর্ম বন্ধের দাবী জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিধিতে রাসায়ণিক অস্ত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই সর্বনাশ নীতির বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষ লড়ছে। সম্প্রতি নলচক্রের রাজধানী নমপেনের ২৪ কিলোমিটার কাছাকাছি অঞ্চলে মুক্তি ফৌজ এসে পৌঁছেছে। তারা নলচক্রের সপ্তম পদাতিক বাহিনীর সদর দপ্তর উড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে নমপেনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নলচক্রের সমস্ত প্রতিরোধশক্তি ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। এখন মুক্তি ফৌজ এই অঞ্চলের পনেরো কিলোমিটারের কাছাকাছি আক্রমণ চালাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা চুরমার করতে পারলে মুক্তি ফৌজের পক্ষে নলচক্রের রাজধানী নমপেন দখল করা সহজ হয়ে পড়বে।

আত্মসমালোচনা ?

দর্পণের একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রিয় মুন্সী সমীপেষু" শীর্ষক চিঠির লেখক শ্রীশঙ্খশুভ্র বিশ্বাসকে আমি আন্তরিকতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই। শ্রীবিশ্বাস এক জায়গায় প্রিয় মুন্সীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন আপনাকে আমি আহ্বান জানাই আরো আত্মসমালোচনা করুন। আমার প্রশ্ন, কোন রাজনৈতিক লোকই যতক্ষণ তাঁর রাজনীতিতে ভাটা না পড়ছে ততক্ষণ কি আত্মসমালোচনা করেন? এখন তো প্রিয় দাসমুন্সীর রাজনৈতিক জীবনে জোয়ার ঠিক এই মুহূর্তে তাঁকে আত্মসমালোচনার আহ্বান জানানো কি বাতুলতা নয়?

কল্যাণ ঘোষ

প্রতিবাদ

গত একত্রিশে জানুয়ারী দর্পণে "অবৈধ কারবার" শিরোনামায় যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ অসত্য। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি আমার কিছু প্রতিবেশী আমাকে বরাবরই ঈর্ষার চোখে দেখে। তারা আর কোন রকমে এঁটে উঠতে না পেরে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার শুরু করেছে। সম্প্রতি এই সমস্ত প্রতিবেশী আমার একটি দোকানঘরও জবর দখল করার চেষ্টা করছে। আমায় উৎখাত করাই এদের আসল উদ্দেশ্য।

শান্তিরঞ্জন দত্ত

[উপরিউক্ত সংবাদে আরও দুটি চিঠি লিখেছেন গীতরানী দত্ত ও দেবকান্ত সেনাপতি।]

[redacted]

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

কিছুকাল পূর্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি কলকাতায় একটি চলচ্চিত্র সপ্তাহ শেষ হল। দিল্লীতে প্রতিযোগিতার বাইরে বিভিন্ন বিভাগে যেসব চলচ্চিত্র ছিল সাতখানি মাত্র ছবিকে অনেকটা সান্ত্বনা পুরস্কারের মত কলকাতায় পাঠানো হয়। দিল্লী উৎসবের বহু ভালো ছবি হয়তো এই চলচ্চিত্র সপ্তাহের আওতায় আসেনা, তবুও এখানে প্রদর্শিত অন্তত তিনটি চলচ্চিত্রের মধ্যে আধুনিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক ক্রোধ ও প্রতিবাদের একটা স্পষ্ট চেহারা দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়। চলচ্চিত্র সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট চলচ্চিত্র জাপানী চলচ্চিত্রকর নাগিসা ওসিমার 'দি ডায়ারি অব এ সিনজুকু বার্গলার'। ওসিমার চলচ্চিত্রের পটভূমি আধুনিক জাপান। কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোন সময় নেই। ওসিমা গোড়াতেই বলেছেন জাপানের সময়রেখা আমেরিকা য়ুরোপের সময়ের মানে নির্ধারিত। ওসিমার পাত্রপাত্রী আধুনিক জাপানের প্রতিনিধি। তাদের প্রথম দেখা যাচ্ছে একটি বইয়ের দোকানে, সেখানে ছেলেটি জেলের 'ডায়ারি অব এ থিফ' চুরি করতে গিয়ে মেয়েটির হাতে ধরা পড়ছে। ছেলেটিকে (সে একটি মার্কিন নামে পরিচয় দেয়) মেয়েটি দোকানের মালিকের কাছে নিয়ে যায় (চলচ্চিত্রে তিনি 'প্রেসিডেন্ট' নামে পরিচিত)। তিনি ছেলেটিকে একটি স্বরচিত পর্নোগ্রাফি উপহার দেন। পরে উপকারী বন্ধুর মত তিনি ছেলে ও মেয়েটিকে যৌন বিষয়ে সদুপদেশের জন্য এক মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপকের কাছে নিয়ে যান। চলচ্চিত্রটির তৃতীয় পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েটিকে টেলিভিশনের জন্য একটি কম্যুনিটি ইন্টারভিউর মধ্যে দেখা যায়। যৌনতার সুখ যে ইন্টারভিউর উপজীব্য বিষয়। এবং এখানে 'সেক্স মাস্ট বি মার্কেটেবল' যার শেষ সিদ্ধান্ত। চতুর্থ পর্যায়ে অধ্যাপকের নির্দেশানুযায়ী চিন্তার স্তরে ছেলে ও মেয়েটি পর্নোগ্রাফিতে অনুপ্রেরণা খোঁজে এবং সেই অনুপ্রেরণার ফলস্বরূপ নির্জন রাজপথে যৌনসঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়। সংরক্ষকের ছদ্মবেশে দুই আগন্তুক ছেলেটিকে আহত ও মেয়েটিকে আহত ও মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। পঞ্চম পর্যায়ে নির্জনে বইয়ের দোকানে চিন্তারাজ্যের অধীশ্বর প্রেসিডেন্টের কাছে ধর্ষিতা মেয়েটিকে ছেলেটি অর্থমূল্যে বিক্রি করতে চায়। যাতে মেয়েটি তার ফলে ছেলেটিকে ক্রয় করার ক্ষমতা লাভ করতে পারে (এখানে বিপরীতভাবে পূর্ব প্রান্তে হেনরী মিলার, কেনিয়াট্টা, স্ট্যালিন, সুশুন প্রমুখ চিন্তাবিদদের নারী স্বাধীনতা সম্পর্কিত মন্তব্য ব্যবহৃত।) ষষ্ঠ বা শেষ পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েটি একটি কাবুকি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে (প্রকৃতপক্ষে যেখানে কাবুকির আঙ্গিক ভেঙে মার্কিন লিভিং থিয়েটারের রীতির অনুপ্রবেশ)। এই অভিনয়ে পালাক্রমে প্রত্যেক চরিত্রই নিজেকে শেশেভমু বা 'পবিত্র তুষার' বলে দাবী করে এবং ক্ষমতাসীন অবস্থায় অপরের মাথা ক্রয় করতে শক্তি প্রয়োগ করে। এই প্রতিযোগিতায় 'ছেলে ও মেয়েটি সর্বস্ব হারায়। রিক্ততার মধ্যে কেবল দৈহিক কম্যুনিকেশন অবশিষ্ট থাকে (নেপথ্যের 'কয়ের' সঙ্গীত বলে দেয় এর সূত্র পর্নোগ্রাফি নয়)। যন্ত্রণা থেকে ওসিমার ক্যামেরা প্রতিবাদের মধ্যে পথ করে নেয় যেখানে বিক্ষুব্ধ তরুণেরা এস্টাব্লিশমেন্টকে ভাঙছে। ওজুর চলচ্চিত্রে যে ট্র্যাডিশন জীবন্ত বাস্তব, ওসিমা তাঁর সমকালীন জীবনে দেখেছেন ট্র্যাডিশনের সে শিকড়কে উন্মূল হয়ে যেতে। তাঁর চলচ্চিত্রে জাপানের রাজনৈতিক জীবনের রক্ষক ও রক্ষিতের সম্পর্ক পরোক্ষে নির্দেশ করতে গিয়ে ওসিমা মার্কিন উপনিবেশিক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক শোষণের চেহারাকে সরাসরি খুলে দিয়েছেন। ঘৃণা করেছেন। এবং প্রতিবাদ করেছেন। এখানে বইয়ের পণ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যার দ্বারা চিন্তা রাজ্যকে ধোলাই করা হয়। পর্নোগ্রাফিকে বৈচিত্রময় করা বা তার ওপর জোর দেওয়ার কারণ প্রতিক্রিয়াশীল উপনিবেশিক শোষনের কাছে সেক্স দেখানো গণসম্মোহনের একটি জোরালো উপায় তা দেখানো যা যুব সমাজকে সম্মোহিত করে, নিষ্ক্রিয় করে ও বিভ্রান্ত করে। গণতন্ত্রের মাদকের সঙ্গে গণোরিয়াতন্ত্রকে চালু রাখা সকল দেশের উপনিবেশিক শক্তিরই একটি প্রয়োজনীয় অভ্যাস। ওসিমার চলচ্চিত্রের গঠন আঙ্গিক, ফরাসী ন্যুভেল ভাগের অনেক পরিচালকের মত প্রবন্ধধর্মী। হয়তো অনেক সূত্র, সমান্তরাল ও বৃত্তের সন্নিবেশে কিছুটা ব্যক্তিক। কিন্তু মাধ্যমের ওপর তাঁর অনায়াস অধিকার। তাঁর ভাষা ক্রুদ্ধ। তাঁর তীব্র ব্যঙ্গ এবং প্রতিবাদকে অগ্নুৎপাতের মত প্রকাশ করে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের আরো একটি ভয়ঙ্কর ছবি আছে আর্জেন্টিনার 'আওয়ার অব দি ফার্নেসেস্' এ।

ফার্নান্দো ই. সোলানাস ও অক্টাভিও গেটিনের এই চলচ্চিত্রটিকে কাইয়ে দ্য সিনেমা আখ্যাত করেছিল "সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র" হিসেবে। এখানে চলচ্চিত্রটির কেবল প্রথম পর্ব দেখানো হয়। নব ঔপনিবেশিকতাবাদ, হিংস্রতা ও মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে ইস্তাহারের মত চলচ্চিত্রটি রচিত হয়েছে অ্যাজিট-প্রপ মন্টাজের কাঠামোয়। সোলানাস ও গেটিনো চলচ্চিত্রটি বক্স-অফিসের দিকে নজর রেখে নির্মাণ করেন নি। বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের সহানুভূতি কুড়নোও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁদের সামনে ছিল আর্জেন্টিনার নিপীড়িত জনগণ। তাদের নিজেদের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা এই প্রথম পর্বের উদ্দেশ্য ছিল। এবং সোলানাস বলেছেন "আইজেনস্টাইন ও ভেরতফের পেছনে ছিল সোভিয়েটের ক্ষমতা, আর আমাদের পেছনে ছিল পুলিশ।" সুতরাং এ চলচ্চিত্র রিলিজ-চেলের রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নয়। সুতরাং এ চলচ্চিত্রের নন্দনেতত্ত্ব ভিন্ন। ঐতিহ্যকে ভাঙার সাহস ও সততা এখানে প্রশ্নাতীত। চলচ্চিত্রের একটি জায়গায় দেখা যায় অনেকগুলি তরুণ বেশ্যা পল্লীতে লাইন দিয়ে অপেক্ষ্যমান। সোলানাস ও গেটিনো নেপথ্যে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত বাজিয়েছেন। তীব্র ঘৃণা থেকে এই তিক্ততার জন্ম। যাঁড়েদের জবাই করার দৃশ্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান মার্কিন বিজ্ঞাপনের মন্টাজ আইজেনস্টাইনের 'স্ট্রাইক'-এর বিশেষ অংশের স্মারক। কিন্তু এটা শুধু চলচ্চিত্রের ভাষাগত উৎকর্ষ নয়, একটি ভীষণ প্রতিবাদও এখানে ভাষা পেতে থাকে। সোলানাস তাঁর চলচ্চিত্রে বলেছেন "আমরা যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তিকে ভয় করি।" পৃথিবীর যে কোন দেশের নির্যাতিত মানুষের একথা বলবার অধিকার আছে। সোলানাস ও গেটিনোর চলচ্চিত্রকে শুধু আর্জেন্টিনার চলচ্চিত্র বলা হবে কেন? এ চলচ্চিত্র ভারতেরই বা নয় কেন?

উপরোক্ত চলচ্চিত্রটি ছাড়াও তৃতীয় দুনিয়ার বিষয় রয়েছে জঁ-লুই বার্তুসেল্লির 'ওয়াল্স্ অব ক্লে' চলচ্চিত্রে (আলজেরিয়া/ফ্রান্স)। বার্তুসেল্লি চলচ্চিত্রটি তুলেছেন আলজেরিয়ার একটি দূরতম গ্রামে। বিরাট অনুর্বর প্রান্তরের মধ্যে সে গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামবাসীরা তাঁর চলচ্চিত্রের চরিত্র। পাহাড় থেকে পাথর বয়ে আনা ও ভাঙাই করা তাদের একমাত্র জীবিকা। শহরের সঙ্গে তাদের একমাত্র যোগাযোগ কোম্পানীর এক ঠিকাদারের মাধ্যমে, যে প্রতিদিন এসে সস্তায় তাদের শ্রম কিনে নিয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে, শহর থেকে সৈন্য আসে এবং গ্রামের একটি মেয়ের বুদ্ধিতে অন্তত সাময়িক ভাবে তাদের প্রতিরোধ জয়ী হয়। সমস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে একমাত্র ঐ মেয়েটির উপলব্ধিতে অনুন্নতদের কাজে লাগানোর ঐ ধূর্ততা ধরা পড়ে। অপর গ্রামবাসীদের মত সে রিচুয়াল্স্-এর ওপর বরাত না দিয়ে গ্রামের বৃত্ত পেরিয়ে বৃহত্তর দুনিয়ার দিকে নিরুদ্দেশ হয়। কেবলমাত্র সামান্য কিছু অপভ্রংশ ছাড়া এই চলচ্চিত্রের জন্য বার্তুসেল্লি কোন সংলাপের আশ্রয় নেন না।

তার জন্য কয়েকটি পরিস্থিতি একটু আড়ষ্ট মনে হয়। কিন্তু তার তথ্যগ্রহণের মন্থর মেজাজ ফ্ল্যাহার্টিকে মনে করিয়ে দেয়। এবং টাইমেজ নির্বাচনের ব্যাপারে কার্তিয়ের বেসঁকে। মেয়েটির মুখে অসামান্য প্লাস্টিসিটি বর্তমান। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দৃশ্য একটু অধিক বিলম্বিত। কুয়োতে কপিকলের ক্লান্ত আওয়াজের প্রযুক্তি মনে রাখার মত। শেষ দৃশ্যে হেলিকপ্টারের মধ্যে ক্যামেরা এনে ইলুশন ভাঙার প্রয়োজন ছিল না। এটা যে সিনেমা সেটা পরিচালক অনেকখানি ভুলিয়েছিলেন।

ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের ছাঁটাই বেআইনী ঃ আদালতের রায়

(দর্পণের প্রতিনিধি)

বিগত রেল ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য দক্ষিণ রেলের ওলাভাক্কোড ডিভিশনের ক্যানানোর সেকশনের পঁচিশ জন ক্যাজুয়াল শ্রমিককে ছাঁটাই করে রেল কর্তৃপক্ষ যে আদেশ জারী করেছিলেন এবং ইতিপূর্বে কেরালা হাইকোর্টের সিংগল বেঞ্চ যে আদেশ বাতিল করে দিয়ে উক্ত শ্রমিকদের কাজে নেবার নির্দেশ জারী করেছিলেন তার বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষের রিট আপীলের রায় দিতে গিয়ে কেরালা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় পি. বালকৃষ্ণ এডাড়ি এবং জর্জ তাদাক্কেল ও উক্ত ছাঁটাই আদেশ বেআইনী বলে ঘোষণা করেছেন। কেরালা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছেন গত একত্রিশে জানুয়ারী।

রায় প্রসঙ্গে মাননীয় বিচারপতিদ্বয় স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে সব ক্যাজুয়াল শ্রমিকের কাজের মেয়াদ চার মাস উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই অস্থায়ী শ্রমিকের মর্যাদা, সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার ভোগের অধিকারী। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় বলেছেন যে শুধুমাত্র ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্যই এই ছাঁটাই করা করা হয়েছে এবং এই বরখাস্ত আদেশকে ছাঁটাই বলে বর্ণিত না করার যে যুক্তি রেল কর্তৃপক্ষ উত্থাপিত করেছেন মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সরাসরি তা অগ্রাহ্য করে পূর্বোক্ত শ্রমিকদের যথা যোগ্য মর্যাদায় কাজে বহাল বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাদের যথারীতি প্রাপ্য বেতনদানের নির্দেশও দিয়েছেন।

ওজরাট হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চও গত ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত্ত রায়ে চৌদ্দ (দুই) ধারা বলে ছাঁটাই বেআইনী ঘোষণা করে বরখাস্ত কর্মীদের প্রত্যেককেই এখনও চাকরীতে বহাল বলে ঘোষণা করেছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার নাকি এমন মন্তব্য করেছেন যে, সুপ্রীম কোর্টও যদি ছাঁটাই বেআইনী ঘোষণা করেন তবু কয়েকজন কর্মীকে কোন মতেই কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। প্রয়োজন হলে তাদের ওপর তিনশ' এগার (দুই) (সি) অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির আদেশ জারী করা হবে যার বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যাবে না।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েমেন্স ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা শান্তি চক্রবর্তী এই রায় প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইতিপূর্বে কেরালা হাইকোর্ট এই ছাঁটাই আদেশে শিল্প বিরোধ আইনের পঁচিশ (এফ-এইচ) ধারা লঙ্ঘনের উল্লেখ করলেও সরকার তার বিরুদ্ধে আপীল করেছেন। কিন্তু, ডিভিসন বেঞ্চও সেই রায়ই বহাল রেখেছেন। দেখা যাক সরকার এখন কি করেন।

Regd. No. WB/CC-32

ধর্মঘটোত্তর পরিস্থিতি (৭)

রেল টিকিট চেকিংয়ের ব্যাপারেও দুর্নীতি

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে রেল ধর্মঘটোত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রেল প্রশাসনিক দুর্নীতির কথা কিছু কিছু বলেছি। বলাই বাহুল্য, সবিস্তারে সে কাহিনী বর্ণনা করা সম্ভব নয়। স্থানাভাব। এবার শেষ পর্যায়ে শুধু আর একটি দুর্নীতির কথা উল্লেখ করছি। এবারের বাজেটে রেলমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, যাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ইঞ্জিনের অভাবে গাড়ী বাতিল করা। অর্থাৎ, জনসাধারণের পয়সায় রেলের কর্তারা ফূর্তি লুটবেন, রেলকর্মী তথা মা-বোনদের মাথা ফাটাবেন কিন্তু ইঞ্জিন এবং কোচ ঝাড়িয়ে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সময়, রেলকর্মীদের বৈধ দাবী পূরণের সময় তাদের অর্থাভাব দেখা দেয়। যাত্রীসংখ্যা কার্যতঃ কমছে না। বিনা টিকেটে ভ্রমণকারীর সংখ্যা বাড়ছে। এর মূল কারণগুলো একটু জনসাধারণের নজরে আনা দরকার। রেল কর্তৃপক্ষ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের শেয়ার ক্যাপিটেলে তেয়াত্তর-চুয়াত্তর সালে বিনিয়োগ করেছেন আনুমানিক সাঁইত্রিশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পাবলিক সেকটর থেকে জনসাধারণের অর্থ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রাইভেট সেকটরে। তুলনায় বাসের ভাড়া অনেক কম। যেমন শিয়ালদা থেকে ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেনভাড়া দুই টাকা নব্বুই পয়সা কিন্তু কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড হারবারের বাসভাড়া হচ্ছে এক টাকা পনেরো পয়সা অর্থাৎ ট্রেন থেকে এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা কম। বর্ধিত ট্রেন ভাড়ার হার নির্ধারণেও প্রশাসনিক খামখেয়ালের লক্ষণ স্পষ্ট। পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত ভাড়া থাকে কম কিন্তু পঞ্চাশ কিলোমিটারের ওপরে হলেই ভাড়া প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বেড়ে যায়। যেমন, হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে হাওড়া থেকে মগরা পর্যন্ত (উনপঞ্চাশ) ট্রেনের ভাড়া হচ্ছে এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা কিন্তু খন্যান পর্যন্ত ভাড়া (উনষাট কিলোমিটার) হচ্ছে দু টাকা পঁচাত্তর পয়সা। অথচ খন্যান থেকে মগরা হচ্ছে চল্লিশ পয়সা এবং এক-পঁচাত্তর ও চল্লিশ যোগ করলে হয় দুই টাকা পনেরো পয়সা। এই তুঘলকী মনোভাবের জন্যই বিনা টিকেটে ভ্রমণও বেড়ে যাচ্ছে। বিনা টিকেটে ভ্রমণকারীর সংখ্যা বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে রেল-পুলিশ, আর পি এফ প্রশাসনের প্রশ্রয়পুষ্ট অধর্মঘটী একদল টিকিট চেকিং স্টাফ এবং উচ্চপদস্থ রেল অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজসে, চালের স্মাগলার এবং বে-আইনী মাল প্যাচারকারীদের বেপরোয়া ভ্রমণ। এদের সঙ্গে দুষ্ট আঁতাত গড়ে উঠেছে পূর্বোক্ত দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসক-চক্রের।

এভাবে একদিকে রেলের আয় কমছে, অন্যদিকে অসৎ রেল পুলিশ, আর পি এফ, টি সি-টি টি ই-দের একাংশ এবং অফিসারদের পেট মোটা হচ্ছে। ভদ্র যাত্রীদেরও অনেক সময় বিনা টিকিটে গাড়ীতে উঠতে হয়, কারণ হাওড়া কিংবা শিয়ালদা কিংবা রোড সাইড ষ্টেশনগুলোতে বুকিং কাউন্টারের অভাব। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও টিকিট পাওয়া যায় না। অনেক সময় তাই অনেককে বাধ্য হয়েই বিনা টিকিটে গাড়ীতে উঠতে হয়। কিন্তু, রেল কর্তৃপক্ষ সে ক্ষেত্রে স্পেশাল চেকিংয়ের নামে জোর করে দশ টাকা পেনাল্টি কেস করার জন্য শিক্ষিত ভদ্র এবং বিবেচনাসম্পন্ন টি টি ই-দের (যাদের শতকরা নব্বুই জনই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন) ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। টি টি ই গাড়ীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক যাত্রী যখন টিকিট না করতে পারার কারণ বর্ণনা করে ভাড়া দিতে এগিয়ে আসেন তখন তাদেরও দশ টাকা পেনাল্টি দিতে হচ্ছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এ্যাকটের তেরো (তিন) ধারায় বলা হয়েছে,

"Provided that where the passenger has immediately after incurring the charge and before being detected by a railway servant notified to the railway servant on duty with the train the fact of the charge having been incurred, the excess charge shall be one-sixth of the excess charge otherwise payable calculated to the nearest multiple of five paise or five rupees whichever is greater". (I. R. Act—Page xii).

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, রেল-প্রশাসন নিজেরাই রেলের আইন লঙ্ঘন করে বেআইনী ভাবে সৎ যাত্রীদের কাছ থেকে বেশী টাকা আদায় করার জন্য শিক্ষিত ভদ্র এবং বিবেকবান টি টি ই-দের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, দশ টাকার পেনাল্টি আদায় করা শতকরা দশটি ক্ষেত্রেও সম্ভব হয় না। অথচ, যাত্রীদের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও যখন টি টি ই-দের এই পেনাল্টি চার্জ করতে হয় তখন বহু ক্ষেত্রে তাদের জীবনও বিপন্ন হচ্ছে। কিছুদিন আগেই খড়্গপুর ডিভিসনের সাঁকরাইল এবং বাগনান ষ্টেশনে টি টি ই-দের ওপর সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের হিংস্র আক্রমণ চলেছে। মজার কথা হচ্ছে যে, অফিসাররা কেউ কিন্তু স্পেশাল চেকিংয়ের সময় টি টি ই-দের সঙ্গে থাকেন না। প্রসঙ্গতঃ বলছি, গত ছয়-ই ফেব্রুয়ারী রাতে বর্ধমান ষ্টেশনে স্পেশাল চেকিং ছিল। প্রায় পঞ্চাশ জন টি টি ই ছিলেন। হেড কোয়ার্টার স্কোয়াড, হাওড়া হেড কোয়ার্টারের এসব টি টি ই-দের একটু বসার জায়গাও ছিল না। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন তাঁরা। খবর নিয়ে জানলাম যে, তাঁদের সঙ্গে আছেন হাওড়া ডিভিশনের ডি সি এস (স্পেশাল) হীরালাল ঘোষাল। যাত্রীদের সঙ্গে যখন টি টি ই-দের তর্ক হচ্ছিল, আমা[illegible] ঘোষাল রেস্ট [illegible] ঘুমুচ্ছেন। অথচ, ঘুমিয়েই কিন্তু ঐদিনের জন্য তিনি প্রায় পঁচিশ টাকা টি এ আদায় করবেন। ঘোষাল ওপরওয়ালাদের প্রিয়পাত্র। অভিযোগ ধর্মঘটের সুযোগে দুজন আত্মীয়কে রেলে ঢুকিয়েছেন পেছন দরজা দিয়ে। ফলে, তাঁর সততার কথা না বলাই ভাল। শুধু তিনি নন, শিয়ালদার এ সি এস পি সি ব্যানার্জী, খড়্গপুরের ডি সি এস সুরজিৎ রায় প্রমুখ কর্তারা টি-টি ই-দের এগিয়ে দেন। কিন্তু যাত্রীদের সংগে কখনও নিজেরা মোকাবিলা করেন না। উপরন্তু, দশ টাকার পেনাল্টি কেস দৈনিক গড়ে তিনটি না করতে পারলেই টি টি ই-দের ওপর রেলওয়ে সার্ভেন্টস রুল (ডি এণ্ড এ) এর এগারো-এক ধারা অনুযায়ী চার্জসীট দেওয়া হচ্ছে। কথায় কথায় তাদের সাসপেন্ড করা হচ্ছে, ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করা হচ্ছে। বিশেষ করে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলের খড়্গপুর ডিভিশনে এ ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। এই ডিভিশনের টি টি ই-দের ওপর কর্তৃপক্ষের প্রতিহিংসাত্মক আচরণ অবর্ণনীয়। বহুদিন আগে বিমল চক্রবর্তী নামক একজন টি টি ই-র [illegible] করা হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি বিনায়ক ব্যানার্জী পঁয়ষট্টি সালের দশই আগষ্টের রায়ে আদেশ বাতিল করে দেন। দশ বছর পর কর্তৃপক্ষ আবার সেই খেলায় মেতে উঠেছেন। স্মর্তব্য যে, টিকেট চেকিং স্টাফ এসোসিয়েশনের খড়্গপুর ডিভিশন শাখার সম্পাদক বি ডি ঘোষকে আজও কাজে পুনর্বহাল করা হয়নি। হাওড়া ষ্টেশনে টি সি-দের দিয়ে এখন পোষ্টার ছেঁড়ার কাজ করানো হচ্ছে। আদের কাজ হচ্ছে, প্ল্যাটফর্মের ভিখিরী তাড়ানো, হকার তাড়ানো ইত্যাদি। জি আর পি এবং আর পি এফ কিন্তু বহাল তবিয়তেই আছে।

আসছে তেরোই মার্চ রেলকর্মী এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা যৌথ বিক্ষোভ দেখাবেন সারা দেশে। যদিও বাজারী কাগজগুলো রেলকর্মীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান খবরগুলোকে চাপা দিতে চাইছে, তবু এটা আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে, আবার রেলকর্মীরা এন সি সি আর এস-কে সামনে রেখে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। (সমাপ্ত)

কংগ্রেসের ঝটিকা বাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসে আরও একটি নতুন বাহিনী হয়েছে। যার নাম দেয়া হয়েছে ঝটিকা বাহিনী। এই বাহিনী তৈরী হয়েছে বর্দ্ধমান জেলার শিল্পনগরী বার্ণপুরে। সংবাদে প্রকাশ যে, বার্ণপুরের কংগ্রেস ইউনিয়নের কিছু বিতাড়িত নেতা একটা পাল্টা সংগঠন গড়ে তুলে এই বাহিনী সৃষ্টি করেছেন এবং এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন হীরাপুরের বিধানসভা সদস্য শ্রীতৃপ্তিময় আইচ। এই ঝটিকা বাহিনী নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়িতেই ব্যস্ত। কংগ্রেস ইউনিয়নের পাল্টা দল হিসেবে জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে এক প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে।

এই বাহিনীর সদস্যরূপে যাদের দেখা যাচ্ছে তারা সবাই পরিচিত এবং দাগী সমাজবিরোধী। এদের উৎপাতে বার্নপুরের জনসাধারণ দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবন যাপন করছেন। স্থানীয় জনসাধারণ এদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করলে থানা কর্তৃপক্ষ বলেন, ওদের আমরাও কিছু বলতে সাহস করিনা, বললেই বদলির আদেশ আসবে।

শিক্ষক নিয়োগের দাবী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত আঠারোই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় হাওড়া ডি এম বাংলোয় জেলা শাসক পার্থসারথী চৌধুরীর সভাপতিত্বে হাওড়া জেলা উপদেষ্টা কমিটির এক সভা হয়।

উক্ত সভায় ডি আই শিপ্রা চন্দ ডি পি আইয়ের অনুমোদিত শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল পেশ করে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি চান। এ বি পি টি এ এবং বি পি টি এ-র প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবে কংগ্রেসী এম এল এদের বক্তব্য : সরকারী নির্দেশানুযায়ী বেসিক ট্রেণ্ড প্রার্থীদের নিয়োগ বন্ধ রাখতে হবে, কারণ তারা সবাইকে চাকুরী দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ বি পি টি এ-র হুগলী সম্পাদক অরুণ মুখার্জী কংগ্রেসের এই দাবীর তীব্র বিরোধিতা করেন। ডি এম এবং ডি আই শ্রীমুখার্জীর প্রস্তাবই সমর্থন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে কংগ্রেসীরা দলীয় স্বার্থে এবং এক রকম গায়ের জোরেই বাইশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। তারপর উলুবেড়িয়া থানার গোপীনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হাওড়া কোর্টে আবেদন করলে কোর্ট বাইশটি বিদ্যালয়ের ওপর ইনজাংশন জারী করেন। তার ফলে নতুন বিদ্যালয় অনুমোদন বন্ধ হয়ে আছে।

দর্পণ

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (সেন্ট্রাল) রুলস্-এর ৮নং ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত বিবৃতি—

১। প্রকাশের স্থান—
৬১, মট লেন, কলি-১৩

২। প্রকাশকাল—সাপ্তাহিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—
হীরেন বসু
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—
১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন
কলিকাতা ৪

৪। প্রকাশকের নাম—
হীরেন বসু
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—
১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন
কলিকাতা ৪

৫। সম্পাদকের নাম—
হীরেন বসু
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—
১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন
কলিকাতা ৪

৬। সত্ত্বাধিকারীর নাম—
হীরেন বসু
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—
১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন
কলিকাতা ৪

৭। অংশীদারদের নাম—
কোন অংশীদার নেই

আমি ঘোষণা করছি যে, উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মত সত্য।

স্বাক্ষর :
হীরেন বসু

সম্পাদক—হীরেন বসু

মুদ্রাকর কর্তৃক নবকান্ত ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, কৃষ্ণ সুরোপ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা ৬ এবং প্রকাশ কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

দর্পণ

১৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৪ই মার্চ ৭৫ ॥ ৪০পঃ

সি পি এম-বিরোধী রাজনীতির জন্য এস ইউ সি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি এম বিরোধী রাজনীতি করতে গিয়ে এস ইউ সি এখন বামপন্থী আন্দোলনে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

এস ইউ সির তীব্র সি পি এম বিরোধী রাজনীতি আজকের নয়। কালের গতিতে সেই বিরোধিতা কেবল তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে মাত্র। সাতষট্টি সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের যুক্ত মোর্চা গড়ার চেষ্টা হয়েছিল, তখন প্রধানতঃ সি পি আই-এর শোধনবাদী রাজনীতির জন্য তা সম্ভব হয় নি। সি পি আই ও বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে সেদিন গঠিত হয়েছিল সি পি এম বিরোধী ফ্রন্ট। যার সঙ্গে সেদিন যুক্ত হয়েছিল এস ইউ সি—শুধু সি পি এম বিরোধী রাজনীতির প্রশ্নে।

তারপর যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেও এস ইউ সি একসঙ্গে সরকারে থেকেও ক্রমাগত সি পি এম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেছেন। যা শুধু প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতকেই শক্তিশালী করেছে। এবং যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে জনতার আশা আকাঙ্খার প্রতীক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের অন্তবর্তী নির্বাচনের আগেও সি পি এম একটা

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সি পি এমের ভবিষ্যত আন্দোলনের ব্যাপারে দলের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে নানা প্রশ্ন উঠেছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি এম) ভবিষ্যত আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা এই সপ্তাহে শেষ করেছে। প্রথমে পার্টির পলিট-ব্যুরোতে এই বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পরে কেন্দ্রীয় কমিটিতে।

এই ব্যাপারে পার্টির মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যাচ্ছে। উচ্চপর্যায়ের অনেক নেতা মনে করেন যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে ব্যাপক ঐক্যের খাতিরে মূল দুইটি শ্রেণীকে চরম শত্রু হিসেবে বিবেচনার মাধ্যমে চারটি শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব।

কিষাণ, শ্রমিক, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত এবং শিল্পে ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী। এই চারটি শ্রেণী বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শরিক হতে পারে। কিষাণ শ্রমিক যেহেতু চরিত্রগতভাবে সমাজ পরিবর্তনের মূল অগ্রণী অংশ তারা অবশ্যই এই সংগ্রামের পুরোধায় থাকবেন। অন্যান্য শ্রেণী সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে এবং নেতৃত্বের পরিচালনা গুণে বিপ্লবে সামিল হবেন।

এই সূত্রে বিপ্লবের মূল শত্রু শিল্পে কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী এবং গ্রামে সামন্তবাদী সুদখোরের দল। এই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা ছাড়া সংগ্রামের অন্য কোন পথ নেই।

সি পি এম নেতৃত্বের একাংশ মনে করে যে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে তা নিতান্তই মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত। জয়প্রকাশজী যদি আন্দোলনকে সীমিত গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান তবুও সংগ্রাম চলতে থাকলে এবং শ্রমিক কিষাণের নেতৃত্ব নিজের আত্মবিশ্বাস অটুট রাখতে পারলে আন্দোলন ইচ্ছামত বন্ধ করা যাবে না।

জয়প্রকাশজীর সঙ্গে যদি সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ ও ভারতীয় লোকদল প্রমুখ রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ হয়ে থাকে তাতে আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকা নিছক সংকীর্ণতাবাদের প্রতিফলন হিসেবে গণ্য হবে।

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো ধারণা থেকে কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য করে আন্দোলন থেকে দূরে থাকা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। বিপ্লবের কর্মসূচী অনুযায়ী শ্রেণী বিচারের মাধ্যমে এবং সংগ্রামের স্তর নির্দিষ্ট করে ব্যাপক ঐক্যের পথেই মুক্তির ইঙ্গিত বলে বিবেচনা করা দরকার।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যে অংশ এই তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হলেন পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি বসু, কেরালার গোপালন এবং নাম্বুদ্রিপাদ এবং মহারাষ্ট্রের বি টি রণদিভে।

রণদিভে অবশ্য নিজমত লিখিত ভাবে কিছু রাখেন নি, তবে দলের আভ্যন্তরীণ আলোচনায় দাবী রেখেছেন পার্টি নেতৃত্ব এই ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে নিজ দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করুক। রণদিভে মনে করেন সি পি এম নেতৃত্ব বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য রাখতে সক্ষম হয় নি।

এই প্রসঙ্গে কথা ওঠে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক কনভেনশন বিষয়ে। এই কনভেনশনে সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ প্রমুখ বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দলের সঙ্গে সি পি এম ও অন্যান্য আরও কয়েকটি বামপন্থী দল একত্রে সামিল হয়েছিল কয়েকটি রাজনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে।

অথচ প্রায় একই দাবীর ভিত্তিতে যখন মার্চ মাসের ২৯ তারিখে জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে বিরাট লোকসভা অভিযান অনুষ্ঠিত হল

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

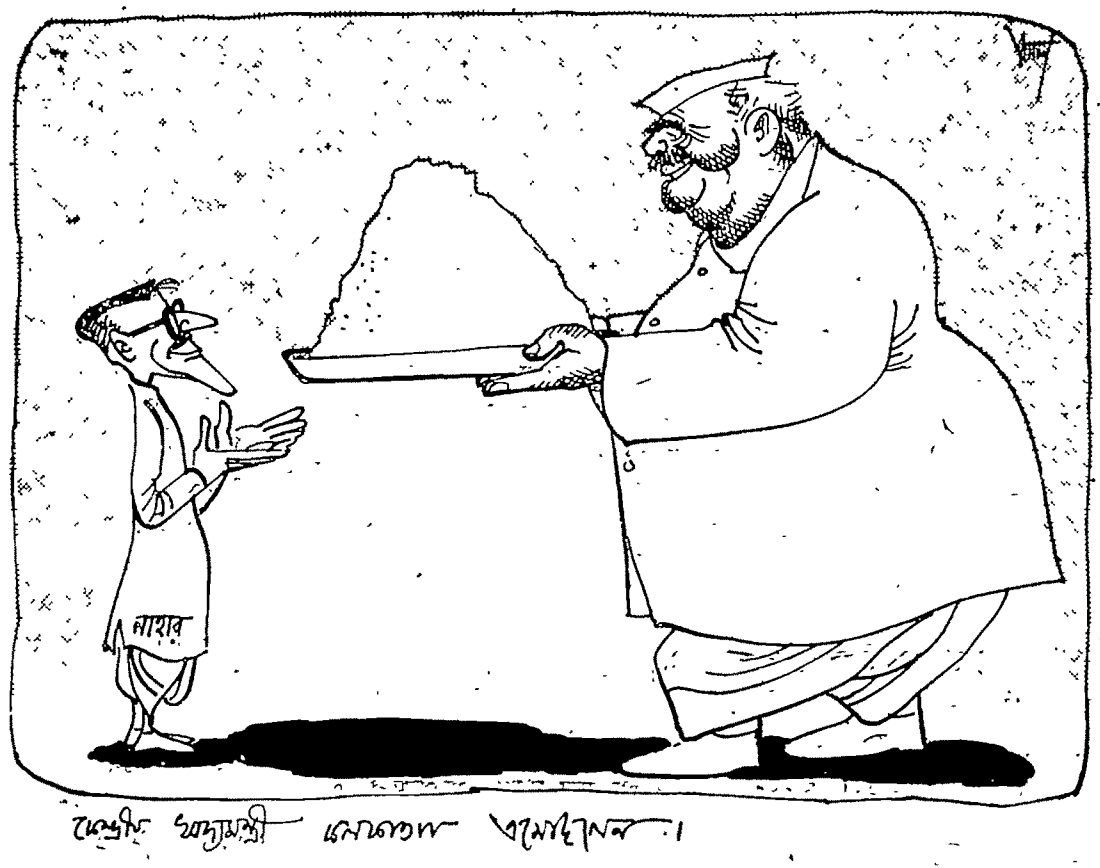

কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর অচলাবস্থা। খরচপত্রে গলদ ঃ কর্মীদেরও নিরাপত্তা নেই

কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর প্রায় উঠে যাওয়ার অবস্থা। কোম্পানীর প্রশাসনে চূড়ান্ত দুর্নীতির নানা কাহিনী শ্রমিক ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে শোনা যাচ্ছে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ দাবী তুলেছে যে, অবিলম্বে কোম্পানীর পরিচালনা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দরকার।

বিভিন্ন মহলের অভিযোগ ঃ লক্ষ লক্ষ টাকা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। কোম্পানীর হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য লভলক লুইস নামে একটি বিরাট অডিট সংস্থা নিযুক্ত আছে। এই সংস্থা অভিযোগ করেছে যে ট্রাম কোম্পানীর খরচপত্রের ব্যাপারে নানা গলদ। অনেক খরচের কোন রসিদ নেই।

ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে নতুন ট্রামগাড়ী কেনার জন্য আর পুরনো ট্রামের যন্ত্রপাতির জন্য। কিভাবে এই টাকা খরচ হবে তার কোন হদিশ নেই।

অনেকে অভিযোগ করেছিলেন যে বিগত কয়েক মাস আগে হঠাৎ যে পঁয়তাল্লিশ খানি ট্রাম পুড়ে গিয়েছিল তার পেছনে বিরাট ষড়যন্ত্র কাজ করেছে। আগের বহু টাকা তছরূপের চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্য এই আগুন সুপরিকল্পিত উপায়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে শ্রমিক কর্মচারীদের অনেকে মনে করেন।

এই অগ্নুন নিয়ে সর্বসমেত তিনটি তদন্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকটির রিপোর্ট অপরের থেকে আলাদা। ফায়ার ব্রিগেড থেকে যে তদন্ত হয় তার রিপোর্টে বলা হয়েছে। যে, আগুন হঠাৎ লেগে যায় নি। এর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি না থাকলে বিভিন্ন সারিতে দাঁড়ান পঁয়তাল্লিশটি ট্রাম মাত্র কয়েক ঘন্টায় পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে না।

পুলিশের তরফে যে তদন্ত হয় তাতে ঘটনাকে আকস্মিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্যাপারে জল এত ঘোলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার আবার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তবে এই তদন্ত কোম্পানীর আমলারাই করবেন। তাতে সত্য প্রকাশিত হবে বলে মনে হয় না।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে উনিশশো জুলাই উনিশশো সাতষট্টি সালে ট্রাম কোম্পানী পরিচালন ব্যবস্থা বিদেশী মালিকের হাত থেকে সরকার অধিগ্রহণ করে। সরকারী কায়দা অনুযায়ী অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত আমলা বা পুলিশ অফিসারদের কোম্পানীর শীর্ষ পদে বসানো হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে এদের সকলেই সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত মানসিকতা নিয়ে প্রশাসনের কাজকর্ম চালিয়ে গেছেন। বিশেষ উদ্যম দেখাবার চেষ্টা কোন সময়েই লক্ষ্য করা যায় নি।

বর্তমান মুখ্য প্রশাসক কল্যাণ চক্রবর্তী একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার। পুলিশে থাকলে এতদিনে ডি আই জি হওয়ার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ওঁকে কোণে ঠেলে দিয়েছে। ফলে কল্যাণবাবুর পক্ষে এই দায়িত্বশীল পদে একাত্মভাবে কাজ করা অসম্ভব।

বরং যা হওয়া স্বাভাবিক তা হল কোনও রকমে দিন কাটানো। এই অবস্থায় প্রশাসনের নানা স্তরে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি মাথা চাড়া দিতে বাধ্য। ঠিক সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ট্রাম কোম্পানীতে।

নোনাপুকুর ডিপোতে সম্প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র কেনার হিসেব দেখানো হয়েছে। কিন্তু ডিপোর দায়িত্বশীল শ্রমিক কর্ম-

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

ইসকোর সর্বনাশ ঘটাচ্ছে কে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইস্কোর পরিচালন ব্যবস্থার অবনতি প্রসঙ্গে গত নয়ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য বিধান সভার ভিতরে ও বাইরে উদ্বেগ প্রকাশ করেন হীরাপুরের থেকে নির্বাচিত বিধান সভা সদস্য শ্রীতৃপ্তিময় অ.ইচ। শ্রীআইচ বলেন যে, ইসকোর একশ্রেণীর অফিসারদের যোগসাজসেই প্রতিদিনই হাজার হাজার টাকা দামের যন্ত্রাংশ প্রকাশ্য দিবালোকেই পাচার হয়ে যাচ্ছে। শ্রীআইচের ধারণা যে কেবলমাত্র চোর বদমায়েসরা কারখানার দারোয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে মাল পাচার করতে পারে না, তিনি বলেন, ইসকোর প্রাক্তন চীফ জেনারেল ম্যানেজার নীহাররঞ্জন দত্ত অবসর গ্রহণ করা সত্বেও ইসকোর বাংলো এবং গাড়ী যথেচ্ছভাবে গত এক বছর যাবত ব্যবহার করেন কি করে। শ্রীআইচ বলেন উক্ত অফিসার ইসকোর উন্নতির পথে বাধা দিচ্ছেন। এই ব্যাপারে অবিলম্বে এক তদন্তের প্রয়োজন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, উক্ত অফিসারের সঙ্গে শ্রীআইচকে প্রায়ই সভা সমিতিতে একই মঞ্চে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া ঐ অঞ্চলের কুখ্যাত ওয়াগন ব্রেকার জগদীশ চ্যাটার্জীর সঙ্গে বিধানসভা সদস্যের বেশ সৌহার্দ্য আছে বলে জানা যায়। অনেকের প্রশ্ন ঃ আজ অবধি ইসকোতে শ্রীআইচের দৌলতে অবৈধভাবে যে সমস্ত কংগ্রেসীদের ভর্তি করানো হয়েছে তারা ক-ঘন্টা কারখানায় থাকে? অথচ বেতনের বেলায় পুরো বেতন পাচ্ছে কি করে? শ্রীআইচের দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে গাবলু কদিন কারখানায় উপস্থিত থাকে? একই দিনে কারখানায় এবং আদালতে উপস্থিত থাকে সমরেন্দ্র, অথচ তার জন্য কোন বৈধ অনুমতি পত্রের দরকার হয়না কেন? সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের বিরুদ্ধে অসানসোল আদালতে -অস্ত্র আইন এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে বেশ কয়েকটি মামলা বিচারাধীন। প্রকাশ, শ্রীঘোষ বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য এবং ব্লক কংগ্রেসের সম্পাদক এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধি। তাছাড়া শ্রীআইচের এক সহোদর ভ্রাতা তো আসানসোল বার্ণপুর এলাকার একজন দাগী সমাজবিরোধী। শ্রীআইচ এদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তা জানতে বড় ইচ্ছে হয়।

দুর্গাপুরে কংগ্রেস বনাম কংগ্রেস

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসের গোষ্ঠী লড়াই ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করছে। সম্প্রতি দুর্গাপুর থেকে এই ধরণের একটি লড়াইয়ের খবর আমাদের হাতে এসেছে। গত সাতাশ তারিখে দুর্গাপুরের কোক-ওভেন কলোনীর রেশনিং অফিসে গন্ডগোল করায় প্রদীপ ভট্টাচার্য গোষ্ঠীর সমর্থকরা কার্তিক শূর নামে (আনন্দ গোপাল মুখার্জীর সমর্থক) একজনকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। ওই ঘটনার আধঘন্টা পরেই কার্তিক শূর দলবল নিয়ে রেশনিং অফিসে এসে হামলা করে। প্রকাশ, তারা একটা জিপগাড়ি করে এসেছিল এবং হাতে ছিল রিভলবার এবং পাইপগান জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র। তারা প্রদীপ গোষ্ঠীর লোকদের খোঁজ করে, না পেয়ে রেশনিং অফিসে ভাঙচুর শুরু করায় সনৎ ঘোষ নামে জনৈক পারমিট ক্লার্ক বাধা দেয়। তখন দুর্বৃত্তরা শ্রীঘোষকে পরপর দুইবার ছুরিকাঘাত করে। এই ঘটনার পরে পুলিশ কার্তিক শূর সহ আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু কংগ্রেসীরা থানা ঘেরাও করে কার্তিক শূর সহ অন্যদের মুক্ত করে বিজয় মিছিল সহ দুর্গাপুরের পথ পরিক্রমা করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আনন্দগোপাল মুখার্জী এবং প্রদীপ ভট্টাচার্যের মতবিরোধ দেখা দেয় আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের বাৎসরিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার এই দুই দলে মারপিট হয়েছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে উদাসীন।

কংগ্রেসের কাছে কিছু সি পি আই নেতা সমর্পিতপ্রাণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি আই-এর রাজ্য ও জেলা স্তরের কিছু নেতা এখন পুরোপুরি কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। এই নেতাদের মধ্যে আছেন রাজ্যকমিটির সহকারী সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত ও কলকাতা জেলা কমিটির সুশীল চক্রবর্তী।

অজয় দাশগুপ্ত ও সুশীল চক্রবর্তী সহ বেশ কিছু নেতাকে এখন প্রায় প্রতিদিন রাত্রে রাজ্য কংগ্রেসের সদর দপ্তর আচার্য জগদীশ বোস রোডের অফিসে দেখা যায়। অজয়বাবুরা আসার আগে খোঁজ নিয়ে নেন সৌগত রায় আছেন কি না। তারপর সবাই মিলে এসে ঢোকেন সৌগতবাবুর ঘরে। অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব চলে চা ও জলযোগ সহযোগে।

ওদের কি আলোচনা হয় জানা যায় নি। তবে সি পি আই-এর এই নেতারা দীর্ঘদিন ধরে গোপনে ও প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘর করে এখন বুঝেছেন ক্ষমতায় কি "মধু"? তাই এই "মধুর" লোভে এই নেতারা আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না। এই নেতাদের একমাত্র ধ্যানধারণা কি ভাবে মার্কসবাদের নামাবলির আড়ালে সংগ্রামের কঠিন কঠোর পথ থেকে সরে এসে কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে ক্ষমতার এই "মধুতে" ভাগ বসানো যায়। এই নেতাদের লালসা আরও বেড়ে গেছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে। যাতে কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে সরকার গড়ার জন্য কংগ্রেসকে আহ্বান জানান হয়েছে।

তবে দলের সব নেতাই এই তোষামোদে রাজনীতির পক্ষে নয়। রাজ্যস্তরে বিশ্বনাথ মুখার্জী এর ঘোরতর বিরোধী। তারা অজয়বাবুদের কংগ্রেসের সঙ্গে এত মাখামাখি মোটেই পছন্দ করছেন না। অপরপক্ষে কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কংগ্রেসের অফিসে সি পি আই নেতাদের এই মজলিশকে সন্দেহের চোখে দেখছেন।

সি পি এম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তখন সি পি এম রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলে সেই মিছিলে অংশ গ্রহণ করে নি। অনেক সি পি এম নেতা এবং সাধারণ সদস্যের কাছে লোকসভা অভিযান বর্জন যুক্তিহীন মনে হয়েছে।

পার্টি নেতৃত্বের অপর অংশ মনে করে যে, জয়প্রকাশজীর আন্দোলন আসলে কংগ্রেসবিরোধী নয়। আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব বদল। ওঁরা ইন্দিরা গান্ধীকে গদিচ্যুত করে কংগ্রেসের অপর গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন করতে চায়।

এই আন্দোলন সি পি এম-এর মূল বক্তব্যের সঙ্গে শুধু সামঞ্জস্যহীন নয়, এর দ্বারা মানুষের মনে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ আছে। এই প্রসঙ্গে উনসত্তর সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপার আলোচিত হয়।

গতবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর প্রার্থী হিসেবে ভোট প্রার্থী ছিলেন ভি ভি গিরি এবং কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন সঞ্জীব রেড্ডী। সি পি এম গিরির বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছে এবং পরিণামে গিরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এর ফলে ইন্দিরা গান্ধীর হাত শক্ত হয়েছে এবং কংগ্রেসেও তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মূলতঃ সি পি এম তখন গিরিকে সঞ্জীব রেড্ডীর তুলনায় "বেশী প্রগতিশীল" বলে মনে করে এবং সেই অনুযায়ী দলের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারিত হয়। পরবর্তী সময়ের ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে ব্যক্তিবিশেষের বিচারে দলের নীতি নির্ধারণ মার্কসবাদ সম্মত নয়। এর ফলে আন্দোলন ব্যাহত হয়, শাসক গোষ্ঠী মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করার সুযোগ পায়।

জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে ওঁর সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে। তিনি জগজীবন রাম, ওয়াই বি চ্যবন প্রমুখ নেতাদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে তাঁদের উচিত কংগ্রেস দলের এবং সরকারের নেতৃত্ব থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অপসারণ করা।

অর্থাৎ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল যে, ইন্দিরাজী এবং তাঁর গোষ্ঠীর প্রভাবকে খর্ব করা। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কোঁদলের কারণে যে আন্দোলন তার সঙ্গে সি পি এম জড়িয়ে পড়লে পার্টি আদর্শচ্যুত হবে এবং পার্টি নিজের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবে।

এই দুই রক্তবৈরী কোন মীমাংসে সহজসাধ্য নয়। তাই সি পি এম একটি মাঝামাঝি সূত্র নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করছে। পার্টি যে কোন দলের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবে নিজের রাজনৈতিক বক্তব্য সংগ্রামী মানুষের কাছে হাজির করার জন্য। কিন্তু কোন যুক্ত আন্দোলনে অবিলম্বে সামিল হবে না। পার্টি বিশ্বাস করে যে, ব্যাপক রাজনীতি প্রচার মারফৎ সংগ্রামী মানুষ আন্দোলনকে গোষ্ঠী কোঁদলের পর্যায়ে থাকতে দেবে না, আন্দোলন সাধারণ মানুষের দাবীদাওয়া আদায়ের এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপক সংগ্রামে পরিণত হবে।

দর্পণ ও প্রেসম্যানে হামলার প্রতিবাদ

বিগত পনেরোই ফেব্রুয়ারী "প্রেসম্যান" মুদ্রনালয়ের উপর হামলা এবং তার আগে "দর্পণ" পত্রিকার উপর শাসক শ্রেণীর সুপরিকল্পিত হামলার নিন্দা করে পিপলস কালচারাল ইনস্টিটিউটের সাধারণ কর্মপরিষদ সম্প্রতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে "পিপলস কালচারাল ইনস্টিটিউটের সাধারণ কর্মপরিষদ "দর্পণ" পত্রিকার উপর গত চোদ্দই জানুয়ারী শাসকশ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট সমাজবিরোধীদের নগ্ন আক্রমণকে ধিক্কার জানাচ্ছে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার শ্বাসরোধের আশংকায় পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় সংগ্রামী জনসাধারণের কাছে আবেদন করছে তারা যেন এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সোচ্চার হন।

বিগত তিন চার বছর ধরে আমরা দেখছি শাসকশ্রেণী অবাধে জনস্বার্থবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে এবং তার বিন্দুমাত্র বিরোধিতা করলে ব্যক্তিবিশেষ থেকে শুরু করে নাট্যগোষ্ঠী ও সংবাদপত্রও সরকারের রোষবহ্নির শিকার হয়েছেন। স্মরণকালের মধ্যে উৎপল দত্ত ও তাপস সেন এই আক্রমণের শিকার হয়েছেন এবং অতিসম্প্রতি গত পনেরোই ফেব্রুয়ারী "প্রেসম্যান" মুদ্রণালয়ের উপর সুপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। আমরা সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই এভাবে তাঁরা দেওয়ালের লিখনকে অস্বীকার করে তাঁদের জনস্বার্থবিরোধী স্বৈরতন্ত্রকে অবাধে কায়েম করতে পারবেন না। সংগ্রামী জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং পশ্চিমবঙ্গকে সন্ত্রাসের আবহাওয়া থেকে মুক্ত করবে।

"আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক নাট্যগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রস্তাব রাখছি তাঁরা যেন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের ওপর হামলার প্রতিবাদে একটি কনভেনসন আহ্বান করেন এবং এই ব্যাপারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন।"

বিজয় উৎসব

কৃষকের জমি, ফসল অধিকার রক্ষার সংগ্রামে বিজয়ী কৃষকের বিজয় উৎসব উপলক্ষে বসিরহাটের অন্তর্গত উত্তর অগড়তলা শহীদ মিনার (স্কুল মাঠ) গ্রামে গত তেইশ ও চব্বিশে ফেব্রুয়ারী "দানবং" ও "সেই ঘটনাটি বলছি" পর পর অভিনীত হয়। প্রথমটি মাক্সিম গোর্কির ও দ্বিতীয়টি শ্রীঅচিন্ত্য বসুর রচনা। নাটক দুইটির পরিচালনায় ছিলেন শ্রীঅচিন্ত্য বসু। দ্বিতীয় নাটকে অভিনেতাদের আন্তরিক ও কৃষক নায়ককে আর্থিক অভিনন্দনে জনগণ ভূষিত করে।

নাটক দুইটির আবহসঙ্গীত মনোরম ও গানগুলি সুগীত। অভিনয়ে উৎকর্ষ দেখান গুণগতভাবে সর্বশ্রী প্রমোদ ভৌমিক, করুণা রায়, সুবোধ চক্রবর্তী প্রমুখ।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস

৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৪১৯৪৩

অর্থমন্ত্রীর আত্মপ্রতারণার বাজেট

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সি সুব্রাহ্মণিয়ম [illegible] মাসের শেষ দিনে লোকসভায় তাঁর জীবনের প্রথম বাজেটটি উত্থাপন করেন। এই বাজেটে কেবলমাত্র জনগণের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টাই হয়নি—অর্থমন্ত্রী ঠাকিয়েছেন নিজেকেও। ভারতীয় অর্থনীতিতে যে দূষিত ধারাগুলি সর্বাপেক্ষা বেগবান তার বিরুদ্ধে তিনি বালির বাঁধ তৈরী করতে চেয়েছেন। মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির মতো দানবকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার কোন উদ্যোগ তো এখানে লক্ষিতই হয়নি, উপরন্তু এই বাজেটে এখন কতগুলি অলিগলি আছে যা এদের আরও বহুদূর এগোতে সাহায্য করবে। কালোটাকার কালো হাতকে কর্মজোরী করার কোন চেষ্টাও এতে নেই।

১৯৭১ সালে সংসদীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ইন্দিরা কংগ্রেস তার নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষণা করেছিল ঃ "মাত্র অল্প কয়েকজনের হাতে বিত্ত কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা চলে যাওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কারণ এটা গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় বিচার সংক্রান্ত ধ্যান ধারণার পরিপন্থী।" সে প্রতিশ্রুতি আজ আর উচ্চারিত হয় না। কারণ গত ছয়-সাত বছরে ভারতের ধনপতিরা যত মুনাফা লুটেছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কোন সময়েই তাদের এমন রমরমে অবস্থা দেখা যায়নি। ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধীর উত্থানের পর থেকে কেন্দ্রে যতগুলি বাজেট এসেছে চরিত্রের দিক থেকে তার কোনটাই ভারতীয় বণিক সমাজের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠেনি।

এবারের বাজেটও কোনদিক থেকেই তার ব্যতিক্রম নয়। বাজেটে করের আওতায় আনা হয়েছে কোন জিনিসগুলিকে? চা, চিনি, তামাক কাপড়ের মতো ভোগ্যপণ্যই তার মূল লক্ষ্য। একথা সহজেই অনুমেয় করের বোঝার বড় অংশটাই বইতে হবে সাধারণ মানুষকে। শ্রীসুব্রাহ্মণিয়ম "সমাজতন্ত্রী" সাজার জন্য উৎপাদক দ্রব্যের ওপর শুল্ক চাপিয়েছেন। বিড়লা সাহেব এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেও মূল বাজেটকে তিনি দুহাত তুলে অভিনন্দনই জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের উপদেষ্টা মনোমোহন সিং বাজেটের সমর্থনে বলেছেন, নতুন কর চাপানোয় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির কোন আশংকা নেই। কারণ গত বছর জুলাই মাসে সম্পূরক বাজেট পেশ করার পর মূল্যস্তর তো বাড়েই নি, বরং জুলাই-সেপ্টেম্বরের তুলনায় এখন মূল্যস্তর শতকরা দুভাগ নেমে গেছে।

কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের জানা উচিত ছিল, মূল্যস্তরের এই সামান্য অবনতিকে কোন অর্থনীতিবিদই স্বাগত জানান নি। এখন রাজ্যে রাজ্যে যেসব বাজেট অধিবেশন চলছে সেখানেও প্রত্যেক মন্ত্রী বলেছেন ঃ মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির কোন সংকেতই এখনও লুপ্ত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নিজেও বারে বারে সেকথা বলেছেন। আর এবারের বাজেট মূল্যসূচকের ওপর শতকরা এগার ভাগ ওয়েটেজ বাড়াবে। সুতরাং মূল্যস্তর কমা তো দূরের কথা তা উর্দ্ধমুখী হতে বাধ্য।

বাজেটে বিত্তমন্ত্রী সংখ্যাতত্ত্বের যাদু দেখিয়ে নিজেকেও প্রতারিত করেছেন। বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৪৬৪ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃত ঘাটতি ৭৯৪ কোটি টাকা। সমস্ত রাজস্ব ঠিক ঠিক মতো আদায় হলেও ঘাটতির মাত্রা ৫৫৫ কোটির কম হবে না কিছুতেই। বাজেটে তেল সংগ্রহে লক্ষ্যীকৃত ৩৩০ কোটি টাকা ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। এই আশা খুবই কম। কিন্তু তা যদি ফিরেও আসে তাতেও ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। আর ফিরে না এলে তো সোনায় সোহাগা। তাহলে এই বিপুল পরিমান বাজট ঘাটতি শেষ অব্দি ঘাটতি আর্থনীতিকেই (ডেফিজিট ফিনান্সিং) জোরদার করবে। আর তার হাতেনাতে ফল পাওয়া যাবে বিপুল মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে। ঘাটতি অর্থনীতি মুদ্রাস্ফীতি ডেকে আনবেই।

আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়ায় ভারত যে ক্ষুব্ধ বাজেটেও তার প্রতিফলন আনার চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী। বিদেশী ঋণের সম্ভাব্য তালিকায় এবার আমেরিকার নাম নেই। এবং এইভাবে মার্কিন-বিরোধী সাজতে গিয়েও তিনি আর এক দফা ফাঁকিবাজীর আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ গত বছর বিদেশী ঋণ সব মিলে এসেছিল ৮৮৮·৩২ কোটি টাকা। আর এবার আমেরিকাকে বাদ দিয়েও বিদেশী ঋণ আসবে ৯২৮·৪৭ কোটি টাকা। তার সিংহ ভাগই দেবে বিশ্বব্যাঙ্কের অনুমোদিত সংস্থা আই ডি এ। বলাবাহুল্য বিশ্বব্যাঙ্ক ওয়াশিংটনের একটি অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্র ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং সেই আমেরিকার টাকাই বিদেশী ঋণ হিসেবে ভারতে ঢুকবে, আরও বেশী পরিমাণেই ঢুকবে, তবে আই ডি এ-র নামে এই যা তফাৎ।

গতবার বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভূটান, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশকে ভারত সাহায্য দিয়েছিল তিনশো বত্রিশ কোটি টাকা। এবার সাহায্য যাবে ৩২৬·২৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ সেখানে প্রায় ছয় কোটি টাকার দায় কমে গেল।

এই বাজেটে মূল্য স্তর এবং মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়বে শুধু তাই নয়, এই বাজেটের মধ্য দিয়ে অর্থমন্ত্রী আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের ভিত পাকা করার ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। নতুন কর কাঠামোয় কর্পোরেট সেক্টরকে অনেক পরিমাণে লঘু দণ্ড দেয়া হয়েছে। শিল্পের এই ক্ষেত্রের মালিকরাই কিন্তু বরাবর কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিল ভর্তি করে থাকে। তাদের দানেই মন্ত্রীরা নির্বাচনী বৈতরণী পার হন। খোলাবাজারে চিনির দামের ওপর কর চাপানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন ক্ষেত্র উত্তর প্রদেশের চিনি ব্যবসায়ীদের কংগ্রেসের আরও কাছাকাছি আনতে সাহায্য করবে।

কিন্তু তাতে বোধহয় শেষরক্ষা করা যাবে না। কারণ সে কথা কংগ্রেসকেও স্বীকার করতে হয়েছে। ঐ একাত্তর সালের নির্বাচনী ইস্তেহারেই কংগ্রেস বলেছে ঃ "সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার আমাদের সংবিধানের লক্ষ্য হলেও তা বহু ক্ষেত্রেই কার্যকর করা যায় নি। সাতষট্টি সালের নির্বাচনে আমাদের দেশব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্যেই তার প্রতিফলন দেখা গেছে।"

যে কটি সাংবিধানিক লক্ষ্যের কথা কংগ্রেস নির্বাচনের মুখে এসে উচ্চারণ করে থাকে তার কোনটাই এ বাজেটে পূর্ণ হবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক স্তরের কোঁদলে ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন এখন ছাত্রদের কাজে লাগাচ্ছেন। দর্পণের পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, এরা পূর্বে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের (শিক্ষা) মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছিল কিছুদিন। গত কয়েকমাসের মধ্যে দলীয় কোন্দল আরও নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে।

উপাচার্য ডঃ সেন সিন্ডিকেটের সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তাঁর মূল প্রস্তাব পাশ করাতে অসমর্থ হন। এরপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের মহিলা কর্মী সমেত জনা কয়েক প্রহৃত হন। জনশ্রুতিকে শোনা যায়, উপাচার্য মশাই নাকি এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, মহিলাদের বাদ দেওয়া উচিত ছিল। উপাচার্যের এই বক্তব্যের সত্যাসত্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। তবে প্রহৃত ছাত্রদের ব্যাপারে তিনি যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, তা সবারই জানা আছে। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত না থাকার অপরাধে একাধিক কর্মীকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

সিন্ডিকেটের সভায় বিরোধী গোষ্ঠী বলে পরিচিত সদস্যদের পর্যুদস্ত করার জন্য উপাচার্য এবার ছাত্রদের শরণাপন্ন হন। এই বিরোধী গোষ্ঠীর কোন কোন সদস্য কংগ্রেস বিরোধী দলের সঙ্গে যুক্ত। ডঃ সেন এঁদের রাজনীতিগতভাবে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হন। অবশ্য বলা বাহুল্য পরিকল্পনাটা তাঁর নয়। এ ব্যাপারে তাঁর মুখ্য পরামর্শদাতা সি পি আই-এর প্রথম সারির কয়েকজন শিক্ষক নেতা।

মোটামুটি ভাবে স্থির হয়, বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সরাসরি লড়াই নয়। কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। গত ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত নাগরিক সম্মেলনে সিন্ডিকেটের কয়জন সদস্য নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে যোগদান করেছিলেন। অধ্যাপকরা রাজনীতি করেন এটা নতুন নয়। বর্তমান সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায়ও একাধিক সদস্য আছেন, যাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। উপাচার্য ডঃ সেনের নামও কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে দেখা যায় সি পি আই নেতা শ্রীডাঙ্গের জন্মদিন পালনের আহবায়কগণের মধ্যে এবং তিনি প্রকৃতই আহবায়ক ছিলেন কি না জানি না। তবে সংবাদপত্রের প্রকাশিত সংবাদের কোন প্রতিবাদ হয় নি।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, মাননীয় উপাচার্যের উপস্থিতিতে আঠাশে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় একাধিক সদস্যকে ইনস্টিটিউট হলের সম্মেলনে যোগদানের অপরাধে (?) অপসারিত করা হয়। বিরোধীপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যই বোধহয় উপাচার্য মশাই সমস্ত অশালীন উক্তি হজম করে নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করে গেলেন।

পত্রপত্রিকায় হামলার প্রতিবাদে সভা

দর্পণ বাঙলা দেশ ও মফস্বলের কয়েকটি পত্রপত্রিকায় সাম্প্রতিক কালে যে হামলা সংঘটিত হয়েছে তার প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকরা সভাসমিতির মাধ্যমে জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছেন।

গত তেইশে ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘ এবং পয়লা মার্চ উত্তর চব্বিশ পরগণা প্রেস ক্লাব এক সভার আয়োজন করে এই জঘন্য হামলার নিন্দা এবং ব্যাপক প্রতিরোধের আহ্বান জানান।

ষ্টক এ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেডে লাগাতর ধর্মঘট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ডালহৌসী অঞ্চলে অবস্থিত ষ্টক এ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড একটি সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্প সংস্থা। এখানে ছাব্বিশ-সাতাশ জন কর্মী কাজ করেন মাত্র সত্তর থেকে দেড়শো টাকা বেতনে।

গত বছরের মে মাসে কর্মীরা ইউনিয়ন গঠন করেন বলে মালিক ক্ষিপ্ত হয়ে আটজন কর্মীকে ছাটাই করেন। পরে সাতজন কর্মীকে পুনর্নিয়োগে বাধ্য হন। একজনকে এখনও পর্যন্ত কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও ইউনিয়ন তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবীপত্র পেস্ করলে এবারেও ইউনিয়নের সম্পাদক সহ তিনজনকে সাময়িক বরখাস্ত করে এবং একজনকে ছাঁটাই করে। এর প্রতিবাদে কর্মচারীরা গত একত্রিশে জানুয়ারী থেকে লাগাতর ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে যে সংবাদ প্রতিদিন নিহত হয় দৈনিক পত্রে, দর্পণ আপনাকে সে সংবাদ পরিবেশন করে নির্ভীক মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষাণ্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার
৬১নং মট লেন
কলিকাতা-তেরো

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস : ১৯৫৯

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

দিলীপ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বড় মুখ করে বলেছিলেন যে, আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ তো তাঁরা করবেনই, বাকী যা ঘাটতি থাকবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে আসবে উড়িষ্যা প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ থেকে। কিন্তু এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাহির থেকে আমদানীর হিসেব নিলে দেখা যায় : এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে উড়িষ্যা থেকে এসেছে সাতাত্তর হাজার টন চাল, মধ্যপ্রদেশ থেকে সতেরো হাজার টন ধান এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ হল মোট ছত্রিশ হাজার টন চাল ও দুই হাজার টন ধান। অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার মত নয় এই সংগৃহীত মোট খাদ্যশস্য। বসুমতীর সম্পাদক ব্যঙ্গ করে লিখলেন : "সরকারের নীতির পরিচয় আমরা উড়িষ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য চাউল ক্রয়েই পাইয়াছি। যখন পশ্চিমবঙ্গে অনাহারে লোকের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে আর ওদিকে উড়িষ্যা মৃতবৎসার স্তনে দুগ্ধের মত অতিরিক্ত চাউলের ভারে পীড়িত, তখন আমরা উড়িষ্যা হইতে চাউল আনিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলাম।" **(বসুমতী / সম্পাদকীয় /** ৯-৪-৫৯ তা হলে উড়িষ্যার কৃষক কিছু অধিক মূল্য যেমন পেত, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে চাল হত সুলভ। কিন্তু সরকার সে ব্যবস্থা অবলম্বন না করে উড়িষ্যার কৃষকের যেমন ক্ষতি করেছেন তেমনি ক্ষতি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের।

ব্যর্থতাকে ব্যর্থতা বলে স্বীকার করতে তাঁদের লজ্জা। ব্যর্থতাকে ঢাকবার অপপ্রয়াসে তাঁরা তাই আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতা ও শহরতলীতে গোপন মজুত চালের সন্ধানে হঠাৎ হানা দিতে শুরু করলে খাদ্য বিভাগের কর্মচারী ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের পুলিশ। ঘটনাটা শুনতে ভাল। কিন্তু প্রথম কয়েক দিনের অভিযানে মোট কত সংগৃহীত হল? কলকাতা ও হাওড়া জেলায় এই অভিযান থেকে সংগৃহীত হল মাত্র দুই হাজার সত্তর মণ চাল (কলকাতায় চারশো মণ, হাওড়ায় এক বললেন যে, খোলা বাজারে চালের কট্টদুদ এসপদএ হবয়ন্তয়ন্ত্রু হএচফঞ্জ মূল্যবৃদ্ধির সংবাদ তো তিনি ইতিপূর্বে পান নি, সেজন্য ইতিপূর্বে এহেন অভিযান সংঘটিত করেন নি। অভিযানের ব্যবস্থা আরো আগে করলেই যে অনেক বেশী চাল সংগৃহীত হত সে কথা মনে করা সঙ্গত নয়। কিন্তু এই অভিযানের মঞ্চ থেকে একটা সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে, গোপন মজুত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য গোপন মজুত উদ্ধারের যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছিল তা যথোপযুক্ত বা প্রকৃষ্ট পন্থা নয়। চালের মূল্যবৃদ্ধি, দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছে তাকে সাময়িকভাবে চাপা দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা। "বসুমতী" সম্পাদক লিখলেন : "গত শুক্রবার চাউল গম ও আটার গোপন মজুত এবং অতি মুনাফা নিরোধ আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে খাদ্য বিভাগ এবং এনফোর্সমেন্ট পুলিশের যুক্ত উদ্যোগে কলিকাতা ও হাওড়ায় যে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়, তাহা যদি অনেকের মনে ১৯৪৩ সনে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের সময় সুরাবর্দী সাহেবের প্রত্যেক বাড়ীতে তক্তপোষের নীচে চাউলের সন্ধান করার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। .... গত শুক্রবার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, অঘোষিত ও গোপনে মজুত করা চাউলের সন্ধানে লাইসেন্সহীন গুদাম ও দোকান যেমন তল্লাসী করা হয়, তেমনি ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স আছে কিনা, নির্ধারিত মূল্যে বিক্রীত চাউলের রিটার্ণ দাখিল করা হয় কিনা এবং মজুত চাউলের দরিমাণ কি তাহা নির্ধারণ করা ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। ....গোপন মজুত সম্বন্ধে সন্ধান করিবার পন্থা কি সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু পুলিশ বিভাগ পন্থা জানে বলিয়াই আমরা মনে করি।" (বসুমতী ২১-৫-৫৯)। ঠিক কথা, পুলিশ বিভাগ পন্থা জানতেন, কিন্তু তাকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ছিলেন অপারগ। "যুগান্তর" পত্রিকায় সমসাময়িককালে মন্তব্য করা হয় : পশ্চিমবঙ্গে চোরা কারবার দমনে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ব্যর্থ—এটা হল দ্বিধাবিভক্ত পুলিশ শাসনের অনিবার্য পরিণতি। (যুগান্তর ১৪-৫-৫৯)।

এই রকম পরিস্থিতিতে দ্রব্য মূল্য ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহেমন্ত বসু, শ্রীনিরঞ্জন সেন, শ্রীমাখন পাল, শ্রীতারা দত্ত, শ্রীনীহার মুখার্জী, প্রমুখেরা এক বিবৃতিতে বললেন— "খোলাবাজারে চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা, চাউলের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে সারা রাজ্যে শস্যের ব্যাপারে যে সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। খাদ্যাবস্থায় এইরূপ অবনতি ঘটায় সহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহা ক্রমশঃ ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গ মুনাফা রোধ আইন ও ধান চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ গত কয়েকমাস যাবৎ রাজ্যব্যাপী চালু ও বলবৎ রহিয়াছে। ইহা লক্ষণীয় বিষয় যে, ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত আইন ও আদেশকে লঙ্ঘন ও ফাঁকি দিয়া তাহাদের অসাধু কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে এবং জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে চাউলের দাম মণ প্রতি গড়ে তিন-চার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্যত্র আরও চড়া দামে বিক্রয় হইতেছে। বিভিন্ন জেলায় চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে এবং অপর দিকে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা আদৌ নিয়মিত ও পর্যাপ্তভাবে চালু নহে। সাথে সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ এক অবস্থায় রাজ্য খাদ্যমন্ত্রী যে উদাসীন ও আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব অনুসরণ করিতেছেন তাহা অতীব নিন্দনীয় ও পরিতাপের বিষয়। খাদ্যমন্ত্রী অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন এবং খাদ্য পরিস্থিতি অবনতির বিষয় স্বীকার করিতেছেন। কমিটির ঘোরতর আশংকা রহিয়াছে যে, খাদ্যমন্ত্রীর এইরূপ হৃদয়হীন মনোভাব ও বাস্তববর্জিত নীতি রাজ্যের জনসাধারণকে এক শোচনীয় পরিস্থিতির মুখে ঠেলিয়া দিবে। দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ও বিরোধী দলসমূহ বহু পূর্ব হইতে খাদ্যে বিপুল ঘাটতির দরুণ সংকটজনক পরিস্থিতির আশংকা করিয়া কিছু সুচিন্তিত মত যথা : খোলা বাজারে চাউল সংগ্রহ, পাঁচ লক্ষ টন চাউলের স্টক রাখা, চাউল কলগুলির উপর শতকরা ৫০ ভাগ লেভি করা প্রভৃতি রাজ্য সরকার বিধানসভা ও রাজ্য খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। অপর দিকে কমিটি খাদ্য সমস্যার সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সমাধানের জন্য সর্বস্তরে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠনের দাবি করেন। কিন্তু অতীব দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় যে, দলীয় রাজনীতির দ্বারা চালিত হইয়া সরকার এই সমস্ত বক্তব্যকে আমল দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। সরকারের এইরূপ অসহযোগিতামূলক ও দলীয় মনোভাবের প্রতিবাদে কমিটি খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সভা বর্জন করিতেছেন। কমিটির সুস্পষ্ট অভিমত বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির অবনতির জন্য সরকারী নীতি ও মনোভাব সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সমস্ত অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কমিটি সরকারকে অনতিবিলম্বে খোলা বাজারে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল সরবরাহের ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইতেছে। মাসে মাসে কমিটি সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা ব্যাপক ও নিয়মিত ভাবে চালু করার দাবি জানাইতেছে। কমিটি সরকারের আচরণ ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া জনসাধারণকে এই বিষয় সজাগ ও সতর্ক করিয়া দিতেছে এবং খাদ্যাবস্থার অবনতি রোধের জন্য এবং ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য রাজ্যব্যাপী প্রবল জনমত ও আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইতেছে।" (বসুমতী ১৩-৫-৫৯)

সাতাইশে মে তারিখে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি আবার একটি বিবৃতি দেন। পূর্বোক্ত তেরোই মের বিবৃতিতে সামগ্রিকভাবে সমগ্র চিত্রটি তুলে ধরা ও সমগ্র রাজ্য জুড়ে এক প্রবল বিপর্যয়ের আশংকা করা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার খাদ্যাবস্থার অবনতিরোধে সুদৃঢ় কোন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হন নি। গোপন মজুত উদ্ধারের লোক দেখানো খেলা খেলে বাজীমাৎ করতে চাইছিলেন তাঁরা। স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী চোদ্দই মে আকস্মিকভাবে সতেরোটি সস্তা দরের দোকান পরিদর্শন করেছিলেন। এও ছিল স্টান্ট। যেহেতু মূল সমস্যাটি ছিল ভিন্ন, এবং স্বাভাবিকভাবেই স্বীয় শ্রেণী স্বার্থকে লঙ্ঘন করে মূল সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা উদ্যোগী হতে পারেন নি। যাইহোক সাতাইশে মে পুনরায় মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি দুঃখ প্রকাশ করে আবার একটি বিবৃতি দিলেন। এই বিবৃতিতে তাঁর সুস্পষ্ট ভাবে দাবি করলেন : (এক) সংশোধিত রেশনিং মারফত রাজ্যব্যাপী সর্বস্তরের জনসাধারণকে সাড়ে সতের টাকা মণ দরে চাল সরবরাহ করতে হবে। (দুই) সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে (তিন) খুচরা দোকান মারফত খোলাবাজারে নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল সরবরাহ করতে হবে। (চার) চাল কলগুলির উপর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লেভি বসাতে হবে (পাঁচ) পাঁচ লক্ষ টন খাদ্য মজুত করতে হবে (ছয়) পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে (সাত) ব্যাপকভাবে মাথাপিছু দৈনিক দেড় টাকা হারে সপ্তাহব্যাপী টেস্ট রিলিফ চালু করতে হবে, (আট) দুঃস্থ ব্যক্তিদের খয়রাতি সাহায্য দিতে হবে (নয়) সর্বস্তরে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করতে হবে।

মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি এই দাবিগুলি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে এ কথাও জানিয়ে দিল যে, এই সব ব্যবস্থা যদি অবিলম্বে অবলম্বিত না হয় তবে ব্যাপকতর আন্দোলন করা হবে। বর্তমানে শুরু হবে প্রচার ও স্থানীয় ভিত্তিতে আন্দোলন। বলাবাহুল্য, সরকারের নীরবতা যথাপূর্বং তথা পরং। জুন মাসের দুই তারিখে রাজ্য খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সভাতে খাদ্যমন্ত্রী বিরোধীদের সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করেন এবং—"গম খাবার উপদেশ দিয়ে বলেন যে তাহলেই চালের দাম কমবে।" (স্বাধীনতা ৩-৬-৫৯) (ক্রমশঃ)

শ্রমিক প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ক্যালকাটা প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিলের উদ্যোগে শ্রমিক প্রশিক্ষণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি শিক্ষণে যোগ দেন। ইউ টি ইউ সির শ্রীযতীন চক্রবর্তী শ্রমিকদের আরও প্রশিক্ষণের দিকে জোর দেন। শ্রম কমিশনার কাদের নওয়াজ সাহেব উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে মালিক পক্ষ যাতে শ্রমিকদের ওপর বোঝা চাপিয়ে না দেয় সে সম্পর্কে সতর্ক করে বক্তৃতা দেন। সমিতির এন সি মুখার্জী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কারখানায় নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথা ওঠে। টাটা স্টীল কারখানায় দশ হয়ে কর্মীর মৃত্যু কিংবা কলকাতার একটি কারখানায় এ্যামিনিয়াম সায়ানাইডের মত বিষাক্ত হাত দিয়ে ব্যবহার করতে বাধ্য করার ফলে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। গ্লভস এ্যান্ড সেফটি অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি বলেন কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে গিয়ে কেউই অতিরিক্ত খরচ করতে রাজী নয়।

এদিকে টাংরা ও তিলজলা এলাকায় দূষিত জল ও বিষাক্ত আবহাওয়ার জন্য কয়েকশত শ্রমিক মারাত্মক রোগে ভুগছেন। এখানে টাংরা ও পিলখানা এলাকায় হাড় ও অন্য আবর্জনা থেকে সারের কারখানা তৈরীর পরিকল্পনাও শিকেয় তোলা আছে। সি এম ডি এ, সি এম পি ও কেউই কলকাতার এত কাছের মানুষ মারার এমন মারাত্মক পরিবেশ সম্পর্কে কিছুই করেনি। সরকার পলুশন কন্ট্রোল বোর্ড গঠন করে একজন ইঞ্জিনীয়ারকে চেয়ারম্যান করে কাগজে শুধু বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন মাত্র। কাজ এগোয়নি।

ইঞ্জিনীয়ারদের ডেপুটেশন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থাগুলিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সঠিক মূল্যায়ন করে কায়েমী স্বার্থ ও আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তে, তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা না দেওয়ার প্রতিবাদে এবং বাইশ দফা জরুরী দাবীর ভিত্তিতে রাজ্যের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা গত আটই মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণ-ডেপুটেশন দেন। বিকাল তিনটায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা ও সমপর্যায়ের টেকনিকাল সুপার ভাইজাররা জমায়েত হন এবং সেখান থেকে রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে মিছিল করে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবীসনদ সহ স্মারকলিপি পেশ করে। টেলিস্কোপিক পে-স্কেল, সমকাজে সমবেতন ও সমান চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা প্রদান জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ডেলিগেশন চালু পদোন্নতির সমস্ত বাধা অপসারণ ইত্যাদি এই দাবীসনদের অন্তর্ভুক্ত।

বড় বিষজ্বালা এই অনাহারে

কল্যাণ ঘোষ

আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে এবছর নাকি প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইয়াছে এবং সরকারও বদ্ধপরিকর যে এবার খাদ্য সংগ্রহের নির্ধারিত সীমায় পৌঁছাবেনই। গত বৎসরও আমরা শুনিয়াছিলাম যে প্রচুর ফলন হইয়াছে এবং সরকার পাঁচ লক্ষ টন ধান আদায় করিবেন। কিন্তু আসলে চার ভাগের এক ভাগও আদায় হয় নাই। তবে কি এ রাজ্যে গত বছর খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল? মোটেই না, তার প্রমাণ, বেশী দাম দিলেই কালোবাজারে প্রচুর চাউল পাওয়া যাইত। প্রতি শহরেই বেশ কিছু যুবক-যুবতী মাথায় এবং সাইকেলে চাউল ফেরি করিয়া বিক্রয় করিত। সুতরাং চাউলের অভাব যে এ রাজ্যে ছিলনা তার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তবে কেন সরকার তাঁর নির্ধারিত সংগ্রহ সীমায় পৌঁছাইতে পারেন নাই। ইহার উত্তরে চাষীরা সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান বিক্রয় করিতে রাজী নন। এইবার সরকার ধানের দাম ধার্য করিয়াছেন কুইন্টল প্রতি চুয়াত্তর টাকা। কিন্তু চাষীদের বক্তব্য যে, কুইন্টাল প্রতি ধান উৎপাদন করিতে তাদের খরচ হইয়াছে পঁচাশি টাকা, সুতরাং লোকসান করিয়া কেউই সরকারকে ধান দিতে স্বীকৃত হইতেছেন না। গেল বৎসর সরকারী ঘোষণা অনুসারে ভাল ফলন হওয়া সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় যে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছিল তা আজ আর কাহারো অজানা নাই। সরকারী প্রচারযন্ত্র বলিয়াছিল যে, ইহা অজন্মাজনিত অবস্থা, দুর্ভিক্ষ এবং অজন্মার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদটুকু একমাত্র রাজনীতিকগণ ছাড়া আর কাহারো চোখে বড় একটা ধরা পড়ে না। দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা যাহাই হউক না কেন, অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আমরা পাইয়াছি। এই অনাহারজনিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া বিধান সভাতেও ঝড় উঠিয়াছিল, এমনকি সরকারী সাহায্যপুষ্ট বাজারী সংবাদপত্রগুলিও আর চুপ থাকিতে না পারিয়া অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিংগ্রেসী মন্ত্রী এবং আমলারা এই মৃত্যুকে আখ্যা দিয়াছেন অপুষ্টিজনিত মৃত্যু। অপুষ্টি এবং অনাহার জনিত মৃত্যুর মধ্যে কতটুকু তফাৎ সেটা তারা জানেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। তবে এতটুকু আমরা জানি যে যেখানে আহার নাই সেখানে পুষ্টি হইবে কি করিয়া, সেখানে অপুষ্টিজনিত মৃত্যুই তো স্বাভাবিক। এবার বড় মুখ করিয়া প্রচার করা হইয়াছে যে নকশালী কায়দায় ধান আদায় করা হইবে। কার্যত তাহাই হইতেছে, বড় বড় জমিদারেরা লেভির আওতা হইতে বাদ পড়িয়াছে এবং স্বল্পবিত্ত কৃষকেরা যাহারা দুই বা তিন একর জমির মালিক তাহাদের ওপরে লেভি নামক জুলুমের খড়্গ নামিয়া আসিয়াছে। যাহাদের কাছে দুর্ভিক্ষের নাম অজন্মা, অনাহার জনিত মৃত্যুর নাম অপুষ্টিজনিত মৃত্যু তাহাদেরই কাছে লুঠের নাম হইবে আদায়, ইহাতে আর আশ্চর্য কি।

এই সরকার এতদিন ধরিয়া আমাদের অনেক বড় বড় আশার বাণী শুনাইয়া আসিয়াছে, যাহার কোনটাই বাস্তবে বড় একটা রূপ পায় নাই। এই সরকারের রাজত্বে সর্বক্ষেত্রেই দেখা দিয়াছে এক প্রবল সংকট। খাদ্য বিভাগে সংকট, শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকট, চিকিৎসাক্ষেত্রে সংকট অর্থনৈতিক সংকট। বিবিধ সংকটের ভারে জনসাধারণ আজ প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। এই সরকারের উপরে আর তাঁদের আস্থা নাই এই কথাই বার বার প্রতিধ্বনিত হইতেছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে শহরের প্রায় সর্বত্রই। এফ সি আই-এর ধর্মঘটকে কেন্দ্র করিয়া খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা আজ প্রায় অচল বলা চলে। এই সরকার তার এতদিনকার রাজত্বে গড়িয়া তুলিয়াছে এক ভেজালের রাজত্ব এবং সেই সঙ্গে তাহারাও যে ভেজাল জনসেবক এই কথাটাই বার বার প্রমাণ করিতেছে তাহাদের প্রতিটি কার্যকলাপের মাধ্যমে। ভেজাল আজ সর্বত্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উনিশে ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রেস নোট নম্বর ৮৪(২০০) কর্তৃক প্রচারিত ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে গত এক বছরে চোরাকারবারীদের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করা খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ হইল—চাউল ১১৬২৩.৭৩ কুইন্টাল, ধান ৬৫১৬.৫১ কুইন্টাল এবং গম ও গমজাত দ্রব্য ১১৮৩.৫১ কুইন্টাল। এই সকল বাজেয়াপ্ত করা খাদ্যদ্রব্য কোথায় গেল এই প্রশ্ন আজ সর্বত্র। সরকারের খাদ্যদ্রব্যের সংগ্রহসীমা দুই লক্ষ টন অতিক্রম করার পথে বা অতিক্রম করিয়াছে ইহা আমরা সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়াছি। বাজেয়াপ্ত করা খাদ্যদ্রব্যগুলিকে কি রেশনের মাধ্যমে বিলি করা যায় না? খাদ্য আইন ভঙ্গের দায়ে দুই হাজার তিনশো চুরাশিটি মামলা রুজু করা হইয়াছে। এইসব মামলা নিষ্পত্তি হইতে যে সময় লাগিবে, ততদিনে বাজেয়াপ্ত খাদ্যদ্রব্য পশুখাদ্যে পরিণত হইবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা। তার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি, রেশনে চাউল এবং গম প্রাপ্ত হইয়া। এখন তো রেশনে খাদ্যবস্তু পাওয়া প্রায় লটারি পাওয়ার সামিল।

গ্রামের চাষীরা বলিতেছেন—আমরা কেন সরকারকে লেভি দিব, সরকার আমাদের কি দিয়াছে, বিজ-ধান, সার কিছুই তো দিতে পারে নাই। আমরা সার সংগ্রহ করিয়াছি কালোবাজার হইতে, সুতরাং যদি আমরা ধান কালোবাজারে বিক্রয় করি সেটা কি অন্যায় হইবে। কথা হইতেছিল বর্ধমানের কৃষক নেতা বিনু চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বলিলেন, সরকার যে ভাবে চাষীদের ওপর জুলুম চালাচ্ছে তা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সামিল। তিনি বলেন এর চেয়ে আরো সহজে সরকার খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

আমি প্রশ্ন করিলাম কি ভাবে, শ্রীচৌধুরী বলিলেন, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা শহরে থেকে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে অথচ তারা শীতকালে মরশুমি পাখির মত গ্রামে এসে তাদের জমিতে উৎপন্ন ফসল চোরাকারবারী এবং মজুতদারদের হাতে বিক্রয় করে দেন। সরকার যদি এই সমস্ত লোকের ধান ক্রয় করেন তাহলে খাদ্যসংগ্রহের নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছতে সরকারকে এইরকম ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে না।

শ্রমিক নেতা বামাপদ মুখোপাধ্যায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, যে সরকার শ্রমিকদের সুসংগঠিত ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট বানচাল করতে পারে সেই সরকার কি খাদ্যের চোরাকারবার বন্ধ করতে পারেন। আসলে এই সরকারের মন্ত্রীরা এই সব চোরাকারবারীদের হাতের মুঠোর ভেতরে আছে। এদের হাতে না রাখলে নির্বাচনের সময় অর্থ আসবে কোথা থেকে? তিনি বলেন, সরকার চাষীদের ন্যায্য মূল্যে সার দিতে পারে নি, অথচ উত্তরবঙ্গ থেকে প্রায় প্রতিদিনই "ইউরিয়া স্পেশাল" নামক সার রেল মারফৎ বাংলাদেশে প্রেরিত হচ্ছে। অথচ দেশের কৃষকদের সার সরবরাহ না করে ধান খয়রাত করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। এই সরকার যে তার প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম একথা আজ আর কারো জানতে বাকি নেই।

এই বৎসর নানা ধরণের কালা-কানুন যথা মিসা, ডি আই আর প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া সরকার অল্পবিত্ত চাষীদের কাছ হইতে জোর করিয়া লেভি আদায় করিয়াছেন। আর আছে যুব কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক নামধারী ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর অত্যাচার। চাষীরা অত্যাচারের ভয়ে নিজেদের খাদ্য তুলিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। এখন শহরের পথে পথে দেখা যায় খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম হইতে আগত কঙ্কালসার মানুষের মিছিল। অথচ তাহারা যে আশা লইয়া আসিয়াছিল তাহা পূরণ হয় নাই। শহরবাসীর খাদ্য উৎপাদনকারীরা আজ শহরবাসীদের অনুকম্পার পাত্র। কেউ কেউ হয়তো দয়াপরবশ হইয়া দু-একটা পয়সা ছুঁড়িয়া দেন। খাদ্যের সন্ধানে শহরে আগত ছিন্নমূল চাষীরা এখন শহরের ফুটপাথেই সংসার পাতিয়াছে, ভীড় বাড়াইয়াছে কুকুরের সঙ্গে ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্টের আশায়। শহরের ফুটপাথেই তাদের জন্ম-মৃত্যু এবং প্রজননের উপযুক্ত স্থান। প্রায় প্রতিটি রেল ষ্টেশনেই এইসব ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের দেখে যায়।

খাদ্য ব্যবস্থা যে একটা প্রহসনে পরিণত হইবে এটা তো জানা কথা। আমরা না হয় কেউ কেউ আবার অনাহারে মরিয়া সংবাদের শিরোনামা হইবে, হয়তো—বিধানসভায় ঝড় উঠিবে, কিন্তু আসলে কি হইবে? আমাদের মৃত্যু কি এই সরকারের ভীত কাঁপাইয়া দিবে?

শিল্প আদালতের রায় মানছে না ইস্কো কর্তৃপক্ষ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইস্কোর চারজন ছাঁটাই কর্মীকে পুনর্বহালের নির্দেশ দেন দুর্গাপুরের নবম শিল্প আদালতের বিচারক শ্রীমিহির মুখার্জী। উক্ত চারজন কর্মী ট্রেড ইউনিয়ন করার অপরাধে কংগ্রেসীদের যোগসাজসে মিসায় গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘদিন ধরে কাজে অনুপস্থিত থাকার অজুহাতে ইস্কো কর্তৃপক্ষ উক্ত চার জনকে ছাঁটাই করে। বিচারক তাঁর রায়ে চারজন শ্রমিককেই জেল থেকে মুক্তির পর কাজে যোগদানের জন্য এবং সবেতন ও সিনিয়রিটি সহ তাদের সকলকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই চার জন শ্রমিক হলেন হরেকৃষ্ণ ঢল, ঘুনাপান্ডে, শান্তি ভট্টাচার্য ও জ্ঞানেন্দ্র কর চৌধুরী। এরা প্রত্যেকেই সি আই টি ইউ ইউনিয়নের নেতা।

ইস্কো কর্তৃপক্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী কর্মীদের কাউকেই কাজে ফিরিয়ে নেয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেসীদের বেলায় কিন্তু ইস্কো কর্তৃপক্ষ খুব উদার মনোভাবাপন্ন।

নমপেনের পতন আসন্ন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

সর্বশেষ সংবাদ, কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন অবরুদ্ধ। নমপেনের দশ মাইলের মধ্যে কাম্বোডিয়ার গদীচ্যুত রাষ্ট্রপতি সিহানুকের জাতীয় মুক্তি ফৌজ এসে পড়েছে। নমপেনের চতুর্দিক ঘিরে এখন জোর লড়াই চলছে। প্রতিক্রিয়াশীল নল-লংবোরেট চক্র এখনো রাজধানী দখল করে বসে আছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের বাঁচানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসছে। তাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম মারফৎ মার্কিনীরা আকাশ পথে নমপেনে রসদ পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু পোচেনটং বিমান বন্দরে বিপ্লবী মুক্তি ফৌজের একটি রকেট একটি মার্কিন বিমান ফেলে দেওয়ায় বিমান থেকে রসদ ফেলার কাজে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটেছে। বিপন্ন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে বাঁচানোর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ কূটনৈতিক চাল চালবার চেষ্টা করছে। যাতে কাম্বোডিয়ায় ন্যায়সংগত জাতীয় মুক্তি সরকারের সঙ্গে নমপেনের মার্কিন পুতুলদের একটা মীমাংসা আলোচনা করা যায় তার জন্যে মার্কিন কূটনৈতিকপনার ত্রুটি নেই। এখন অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছে। এখন তাদের মাথা ব্যথা শুধু নমপেনস্থ চারশত মার্কিনীদের জন্য। তাই ওকিনাওয়া, মার্কিন ঘাঁটি থেকে কিছু হেলিকপ্টার পাঠিয়ে মার্কিনীদের মুক্তির চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য একাজে দুটি কৌশল আছে। একটি হচ্ছে, নিরাপদে মার্কিনী "বিশেষজ্ঞদের" নমপেন থেকে সরানো, দ্বিতীয়ত, এই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য নাক-গলানোর চেষ্টা। মার্কিনী নাগরিকদের গায়ে হাত পড়েছে এই ধুয়ো তুলে আরো একবার যদি মার্কিন ফৌজ সরাসরি ওখানে নামিয়ে দেওয়া যায় এ মতলবও ওদের আছে।

কাম্বোডিয়ায় মার্কিন পুতুল, প্রধানমন্ত্রী লং বোরেট বলেছে, মার্কিন সাহায্য না পেলে নমপেন রক্ষার কোন আশা নেই। নমপেনকে বাঁচানোর জন্যে "শান্তির দূত" ফোর্ড বাইশ কোটি কুড়ি লক্ষ ডলার সামরিক সাহায্যের বরাদ্দ করেছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউ সরকার আতঙ্কগ্রস্ত। কাম্বোডিয়ায় প্রগতিশীল মানুষের বিজয় দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী ফৌজের শক্তি যোগাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঁচ বছর পূর্বে, উনিশশো সত্তর সালে, এই মার্চ মাসে (আঠারই মার্চ), কাম্বোডিয়ায় রাষ্ট্রপতি প্রিন্স সিহানুকের অনুপস্থিতির সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষমতা দখল করে। সিহানুক ঐদিন মস্কো থেকে পিকিং অভিমুখে যাত্রা করেন। তেইশে মার্চ সিহানুক নল-সিরিক মার্টককে উৎখাত করার জন্য জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানান। পাঁচই মে, পিকিং-এ বসে নির্বাসিত অবস্থায় কাম্বোডিয়ার জাতীয় ইউনিয়ন সরকার গঠন হয়। সিহানুক হন যথারীতি রাষ্ট্রপতি, পেননাউথ প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য, উনিশশো সত্তর সালের চব্বিশে ও পঁচিশে এপ্রিল, ইন্দোচীনে একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লাওস ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ইন্দোচীন থেকে সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

মতামত

আকাশবাণীর মিথ্যাভাষ্য

পাটনায় আকাশবাণীর অফিস ঘেরাও করা হয়েছিল, অর কর্মধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। কলকাতার আকাশবাণীর কেন্দ্রে ঘেরাও হয়নি, কিন্তু এই কেন্দ্রের থেকে প্রচারিত সংবাদ বাস্তব ভিত্তিক ও সত্যানুসারী নয়। মর্জিমতন সংবাদ পরিবেশন করে আকাশবাণীর কলকাতার কর্তৃপক্ষ শ্রোতৃবৃন্দকে প্রকৃত তথ্য জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন। গত বছর যখন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রেল ধর্মঘট শুরু হয়, তখন কলকাতা কেতার বারবার শুনিয়েছে অবস্থা স্বাভাবিক, প্রকৃতপক্ষে রেল-চলাচল তখন অনিয়মিত ও বিরল ছিল। অনেক দৈনিক যাত্রী আকাশ-বাণীর ঘোষণা শুনে ষ্টেশনে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। গত উনত্রিশে জানুয়ারী উলটোডাঙ্গার ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে যখন শতাধিক লোক নিহত হন, আকাশ-বাণীর সবজান্তা ঘোষক পঁয়ত্রিশের বেশী মৃতের সংখ্যা বলতে পারেননি। বিকৃত তথ্যের সর্বশেষ নিদর্শন হল বর্তমান রেশন ব্যবস্থার অচলাবস্থা অস্বীকার। প্রায় একপক্ষ কাল আগে যখন ঘোষক "অবস্থা স্বাভাবিক" বলে ঘোষণা করেছেন, যুব কংগ্রেস নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে তখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনারত ও পথের বিশেষ স্থানে "অভিযোগ বাক্স" বসিয়ে অভিযোগ সংগ্রহে ব্যস্ত। বিরোধীদল সত্যের অপলাপ করে এ অভিযোগ চির-কালের, কিন্তু যুব কংগ্রেসের নেতৃ-বর্গ মিথ্যা নালিশ করেন এ কথা আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃ-পক্ষ ঘোষণা করতে পারবেন?

সুবীন গুপ্ত

শাস্তি চাই

গত ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারীর দৈনিক সংবাদপত্রে দেখলাম প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে ওয়াণ্ডু কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উক্ত মন্ত্রীর দলের লোকেরা কোচবিহার জেলার একজন সাধারণ শিক্ষক শ্রীচন্দন রায়কে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পালের বাড়িঘর আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে এই রাজত্বে সত্য কথা বলার ফল মৃত্যু। এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের সাঁইবাড়ির কথা মনে পড়ে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী বল-ছিলেন দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন। আজ এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তিনি নীরব কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলুন, কেন তিনি ওয়াণ্ডু কমিশন বসিয়েছিলেন এবং যদি বসিয়েছিলেন তাহলে সাক্ষীদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন নি কেন? কেন মুখ্য-মন্ত্রীর মত দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য জীবনহানি ও সম্পত্তি নষ্ট হয়। অবিলম্বে খুনীদের খুঁজে শাস্তির ব্যবস্থা করুন। তা না হলে আগামী দিনে আরও চরম অব্যবস্থার সম্মু-খীন হতে হবে।

অশোক পাল

পুস্তক সমীক্ষা

মার্কসীয় সাহিত্য

(দর্পণের সমালোচক)

কোন কোন ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রকাশক অভিযোগ করেন, সিরিয়াস গ্রন্থের পাঠক কমে গেছে। সে কথা ঠিক। কিন্তু সিরিয়াস মার্কসীয় সাহিত্যের পাঠক বেড়েছে এবং বাড়ছে। অনুবাদের পথ ধরেই এতদ্দেশে মার্কসীয় সাহিত্য প্রচারিত এবং ইদানীং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় অভিষিক্ত হয়েছে।

স্বয়ং কার্লমার্কসের CAPITAL নামক মহাগ্রন্থটির (ক্যাপিটেল/ কার্লমার্কস। ১ম খণ্ড—অনুবাদ ও সম্পাদনা পীযূষ দাশগুপ্ত। বাণীপ্রকাশ, এ-১১৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। গ্রাহক মূল্য—২০ টা.) ১ম খণ্ড বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কার্ল মার্কসের মহত্তম কীর্তি CAPITAL গ্রন্থ ৩ খণ্ডে বিভক্ত, ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৭ সালে; অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে এর সাত বছর পূর্বে ১৮৫৮ সালে 'A Contribution to the critique of political Economy' নামক গ্রন্থে মার্কস তাঁর মৌল বক্তব্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক গতির নিয়মটি সংক্ষেপে বিবৃত করেছিলেন। সে যুগের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখের অর্থনীতির জগতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় হলেও, শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার দরুন এরা ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধকে উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। কার্ল মার্কস বুর্জোয়া অপবিজ্ঞান এবং পেটি বুর্জোয়া ভাববিলাস থেকে অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের আধষ্ঠানে এবং শুধু তাই নয় তিনি সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতির নিয়মাবলীর মধ্য দিয়ে উপনীত হলেন এই সত্যে যে, মূলধনের মালিকদের নিরন্তর সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় দুঃখ, নির্যাতন ও শোষণের গুরুভার; কিন্তু একই সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয় শ্রমিকরা। বৃদ্ধি পায় শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ। তাই CAPITAL সমাজ বিপ্লবের অমোঘ পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় গৌরবান্বিত।

বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদের অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে হয়েছিল। শ্রীভবানী সেন, শ্রীপাঁচুগোপাল ভাদুড়ী এবং শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ১ম খণ্ডের অনুবাদকর্মও শেষ করেছিলেন একদা, স্থির ছিল শ্রীপীযূষ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় গ্রন্থটি মস্কো থেকে প্রকাশিত হবে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তা প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য একথা ঠিক যে অনূদিত গ্রন্থখানি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাধা ছিল অনেক; আর্থিক ঝুঁকির প্রশ্ন ছিল এবং অনুবাদের ক্ষেত্রেও সমস্যা কম ছিল না। সেজন্য প্রকাশিত ১ম খণ্ডের অনুবাদক ও সম্পাদক শ্রীপীযূষ দাশগুপ্ত এবং বাণীপ্রকাশ নামক প্রকাশক ধন্যবাদের পাত্র। মার্কসের মূল গ্রন্থটিকে তাঁরা বাংলায় ৩ খণ্ডে প্রকাশ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। প্রকাশক জানিয়ে-ছেন যে এঙ্গেলস সম্পাদিত এবং এডওয়ার্ড এভেলিং অনূদিত ইংরেজী সংস্করণটি অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। প্রকাশিত ১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৩০২, পণ্য—বিনিময়—অর্থ অথবা পণ্য সঞ্চলন—অর্থের মূলধনে রূপায়ণ—অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন—স্থির মূলধন ও অস্থির মূলধন—উদ্বৃত্ত মূল্যের হার—শ্রমদিবস প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। অনুবাদে এবং অনুবাদকর্ম সম্পাদনায় পীযূষ দাশগুপ্ত সিদ্ধহস্ত, তার প্রমাণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত স্তালিন রচনাবলী। আলোচ্য গ্রন্থেও সেই নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বিদ্যমান।

পুঁজির পরেই আলোচিতব্য পুঁজিবাদ ও তারপর। ইংল্যাণ্ডের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী তাত্ত্বিক জর্জ টমসনের CAPITALISM AND AFTER একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ (পুঁজিবাদ ও তারপর। জর্জ টমসন। অনুবাদ—বিজনবিহারী পুরকায়স্থ। নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কল-১২। মূল্য—১০ টা.)। মার্কস থেকে মাও-সে-তুঙ গ্রন্থের সূত্র ধরেই আলোচ্য গ্রন্থটি পরিকল্পিত। জর্জ টমসন নিজেই ইতিহাসে পণ্য উৎপাদনের ভূমিকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। ৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়ের জন্য ক্রয়, পুঁজি ও শ্রম, প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজ, মুনাফার জন্য উৎপাদন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, প্রত্যেকের জন্য সবাই সকলের জন্য প্রত্যেকে প্রভৃতি পর্যায় আলোচিত এবং শেষ দুটি অধ্যায়ে চীনের গণ-কমিউন নিয়ে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে সাম্যবাদে রূপান্তরের প্রস্তুতি হিসেবে সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতিতে কিভাবে পণ্য উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বলাবাহুল্য, গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদক যথার্থই বলেছেন যে, কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল ও অন্যান্য মৌলিক রচনাবলী বাংলায় যেসব পাঠক পড়তে চান তাদের জন্য বর্তমান গ্রন্থখানি সহায়ক ও অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে। গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীবিজনবিহারী পুরকায়স্থ। মূলানুগত্য রক্ষা করেও অনুবাদকর্মেও কতভাবে স্বচ্ছন্দ গতি প্রবাহিত করা যায়, পদে পদে স্বাভাবিক আড়ষ্টতাকে কিভাবে জয় করা যায়—ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'লং মার্চের কাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীপুরকায়স্থ তা সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করে-ছেলেন।

প্লাস্টিক শিল্পে অচলাবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব প্লাস্টিক কারখানা বন্ধ হয়েছিল কাঁচা মালের অভাবে সেগুলি এখনও খোলার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অথচ কাঁচা মাল যথেষ্ট তৈরী হলেও তা কম দামে ছোট ছোট কার-খানা মালিকের হাতে আসছে না। দাম বাড়ছেই। এল ডি পলিথিন পি ভি সি ইত্যাদি কাঁচামাল বিদেশ থেকে বিদেশী মুদ্রা খরচ করে আনা হচ্ছে ঢালাও ভাবে। অথচ স্বদেশে প্রস্তুত ঐ সব কাঁচামালের দাম ক্রম-শই বাড়ছে ট্যাক্স ইত্যাদির বোঝা বেড়ে গিয়ে। এই অবস্থায় অনর্থক বিদেশী মুদ্রা নষ্ট হচ্ছে এবং চোরা-কারবারীর টাকা বাড়ছে। অই বাইরে থেকে মাল আমদানী বন্ধ করা দর-কার কিংবা আমদানীকারী সংস্থার ওপর আরও বেশী কর চাপানো উচিত বলে প্লাস্টিক স্মল স্কেল সমিতির রামঅবতার আগরওয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন। ফেডারেশন অফ স্মল এ্যাণ্ড কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির মুখপাত্রের মতও একই। তারাও সংকটের জন্য ঐসব কারণ দেখিয়েছে।

যাত্রাভিনয়

যাত্রাপালায় ব্রেখট্

(দর্পণের সমালোচক)

আধুনিক বিশ্বের বহু আলো-চিত জার্মান নাট্যকার ব্রেখটের দ্য গুড উওম্যান অব সেৎজুয়ান অব-শেষে যাত্রার আসরে চলে এল "বহু-রূপভা" নাম নিয়ে। উপস্থিত করলেন উত্তর কলকাতার সান্ধ্য নাট্য সংঘ।

শিশির ভাদুড়ী একদা বলে-ছিলেন, ব্রেখটের শেষের দিকের লেখা নাটকগুলি মঞ্চস্থ করলে যাত্রা হবে তার আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে যাত্রায়ও যে নাটকের সত্যমূল্য এবং সময়োচিত বক্তব্য কিছুমাত্র ব্যাহত হয়না তার প্রমাণ রেখেছেন বর্তমান দলের শিল্পীরা।

এই প্রযোজনায় দেবতারা ইন্দ্র বরুণ অগ্নি রূপে আবির্ভূত হয়ে-ছেন। শেন-তে এখানে কমললতা নাম্মা নিয়ে সৎভাবে হয়তো বাঁচতে পারেনি, তখন তাকে মামাতো ভাই (সুই-তা) কল্যাণের ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে। বিচারের আসনে বসে দেবতারা কমল-লতার অভিযোগ শুনে এই সততা দুর্লভ পৃথিবীতে সৎভাবেই বেঁচে থাকার যে হাস্যকর উপদেশ দেন, তার পরেও বিবেকের গানের সাহায্য নিয়ে জগৎ বদলানো ছাড়া যে অন্য কোন পথ নেই সেই চূড়ান্ত বক্তব্যে প্রযোজনা উপনীত হয়, যা এ নাট-কের ক্ষেত্রে ব্রেখটেরও বক্তব্য এবং যাত্রায় প্রযুক্ত হওয়া আরও স্বাভা-বিক।

নাটকের রূপান্তর বেশ সহজ সরল। আসলে যাত্রার দর্শক ও শিল্পীর সম্পর্কটাই ব্রেখটের তত্ত্বের অনেকটা পরিপূরক বলে মনে হয়।

অভিনয়ের দিক থেকে ভীষণ অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে সংগীত নির্দেশক হিসেবে পরেশ ধরের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসনীয়। বিবেকের কণ্ঠে পাঁচটি গানই সমগ্র প্রযোজনাকে সমৃদ্ধি দান করেছে সন্দেহ নেই।

প্রতিবাদ

"কমরেড" নাটকের নাট্যকার প্রসঙ্গে ইন্দ্রজিৎ সেনের একটি পত্রের প্রতি-বাদ পাঠিয়েছেন বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিলীপ বসু। দুজন পত্র প্রেরক-ই জানাচ্ছেন সৌরী ঘটকের "কম-রেড" উপন্যাস ছাড়াও আরও কয়েক-টি উপন্যাসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং "অলিপুর বার্তার শার-দীয় সংখ্যায় নাটকটি যুগ্ম নাট্য-কারের নামে প্রকাশিত হবার পর বিমলবাবু উক্ত পত্রিকায় একটি প্রতি-বাদও পাঠিয়েছিলেন। পত্রলেখকরা ইন্দ্রজিৎ সেনকে বর্তমান নাটকের শুধুমাত্র সংযোজক ও নির্দেশক হিসেবেই স্বীকার করছেন।

[এ সম্পর্কে আর কোন বাদ প্রতি-বাদ গ্রাহ্য হবে না।

সম্পাদক, দর্পণ

চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মীরা বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধি এবং ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের ফলে রাজ্য প্রশাসনের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পরিবার আজ সুতীব্র আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও তাদের শ্রমিক কর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার মহার্ঘভাতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপেক্ষামূলক নীরবতা অবলম্বন করছেন। এমন কি ষষ্ঠ অর্থ কমিশন যে টাকা মঞ্জুর করেছেন তারও একটা বিরাট অঙ্ক এখনও কর্মচারীদের দেন নি।

যখন সুবিধেয় ষ্টিম নেভিগেশন ন্যূনতম বেতন আটশ দশ টাকা, ইস্পাত শিল্পে সাড়ে চারশ টাকা, সুতাকলে তিনশো পঁচানব্বই টাকা, কয়লা শিল্পে চারশো বাইশ টাকা, এল আই সিতে চারশো দশ টাকা, ঔষধশিল্পে চারশো সত্তর টাকা, ডানলপ রবার চারশো পঁচিশ টাকা সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পাচ্ছেন মাত্র একশো ছেষট্টি টাকা। এই সুবজ্ঞামূলক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন প্রদান সাপেক্ষে আড়াই শো টাকা বেতন, মহার্ঘভাতার সুষ্ঠু নীতি এবং তৎসাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ভাতার সম পরিমাণ মহার্ঘভাতা প্রদান, সকলের জন্য সুলভে খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ এবং ৮·৩৩ শতাংশ বোনাসের দাবীতে ধর্মঘট সহ বড় বড় আন্দোলন রাজ্য ও দেশব্যাপী হয়েছে। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দুরবস্থাকে নির্মম পরিহাস করে চলেছেন।

দমন পীড়ন আজ বিভিন্ন কায়দায় চলছে। হয়রণিমূলক বদলী করছেন। তার মধ্যে মহিলা কর্মচারীও বাদ পড়ছেন না। সম্প্রতি মেদিনীপুর সদর হাসপাতালের সাতজনকে বদলী করার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে, সরকারের মন্ত্রীদের নির্দেশে সংগঠন ভাঙ্গার জন্য বদলীর আদেশ দেওয়া হচ্ছে। উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের বিকল্প চাকরী দেবার সরকারী আদেশকে অগ্রাহ্য করে মালদহের ম্যালেরিয়া এবং মুর্শিদাবাদের লালগোলা স্পেশাল জেলের কর্মচারীদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে। অন্যদিকে নতুন লোকও নিয়োগ করা হচ্ছে। একজন লোককে যেখানে একবেলা হোটেলে খেতে সরকারী হিসাবে আড়াইশ টাকা লাগে সেখানে সরকারী কাজে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীরা কলকাতা হতে সুদূর জেলাস্তে মফঃস্বলে গেলে দুবেলা খাওয়া খরচ (ডেইলী এ্যালাউন্স) দেওয়া হচ্ছে মাত্র দেড় টাকা। তাছাড়া হাজার হাজার কর্মচারীকে ওয়ার্ক চার্জড কন্টিনজেন্ট মাষ্টার রোল, ডেইলীওয়েজ সিজনাল প্রভৃতি নামকরণ করে রেখে চাকুরী জীবনের সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। অনেককে বৎসরে ছয়-সাত মাস কাজ করার পর ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারী কৃষি খামারে এবং সেচ বিভাগে তিন টাকা রোজ দেওয়া হচ্ছে। শতশত নৈশ প্রহরী ও হাসপাতালের কর্মচারীদের বারো ঘন্টা থেকে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করান হচ্ছে। এমন কি সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটিও দেওয়া হচ্ছে না। পোষাক দেওয়ার নিয়ম যেসব ক্ষেত্রে রয়েছে সেখানে নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে জি পি ফান্ডের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেতনক্রম আজও চালু রাখা হয়েছে। প্রমোশনের যে সামান্য সুযোগ আছে তা থেকে বিভাগীয় কর্মচারীদের বঞ্চিত করে বহিরাগত নিয়োগ করা হচ্ছে। সিলেকশন গ্রেড ও করনিক পদের সুযোগের সাম্প্রতিক ঘোষণা অধিকাংশ কর্মচারীকে নিরাশ করেছে এবং সামগ্রিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

এস ইউ সি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী মোর্চা গঠন করার জন্য এস ইউ সিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু এস ইউ সি নির্বাচনী মোর্চা গড়তে রাজী হয় নি। সি পি এম নিজ শক্তিতে লড়ে নিজেকে একক বৃহত্তম দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

পশ্চিমবঙ্গে সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল সেন ও নবনির্মাণ সমিতির সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য এস ইউ সি সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান শুরু করেছে। এস ইউ সির বক্তব্য সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু প্রতিক্রিয়াশীল দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। এতে বামপন্থী আন্দোলন ব্যাহত হবে। কিন্তু তাজ্জবের কথা এই এস ইউ সি জয়প্রকাশের নেতৃত্বে গত ছয়ই মার্চের সংসদ অভিযানে অংশীদার ছিল। অথচ ঐ অভিযানের অন্যান্য দলের মধ্যে সংগঠন কংগ্রেস জনসঙ্ঘ প্রমুখ দলগুলিও ছিল। দিল্লীতে সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, লোকদল প্রমুখ দলগুলির সঙ্গে আন্দোলন করতে এস ইউ সির আপত্তি নেই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বেলাতে এই আপত্তি। পশ্চিমবঙ্গের বেলাতে এই আপত্তি।

সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু কেবলমাত্র মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ নিয়েই প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রফুল্ল সেনও এই গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জ্যোতি বসুর সঙ্গে একমত। জ্যোতিবাবু সংগঠন কংগ্রেস নেতার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক ফ্রন্ট গড়েন নি। শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে একটা নাগরিক কনভেনশনে মিলিত হয়েছিলেন।

বামপন্থী নয় পার্টি ফ্রন্টের আটটি শরিক দলই জ্যোতি বসুকে সমর্থন করে জনতার মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন। এতে রাজ্যের কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতিতে নতুন জোয়ার আসবে নিঃসন্দেহে। কেবল এস ইউ সি তার সি পি এম বিরোধী রাজনীতি জীইয়ে রাখতে বামপন্থী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রাজ্যের মানুষ যখন এই অপশাসনের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী বামপন্থী মোর্চা চাইছে ঠিক সেই মুহূর্তে এস ইউ সির এই ভূমিকা অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করছে।

ট্রাম কোম্পানী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চারীরা অভিযোগ করেছেন যে, চালানের ভিত্তিতে অর্থ দেওয়া হয়েছে কিন্তু মালপত্র এসে পৌঁছায় নি।

শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত কন্টিন আছে তাতে শ্রমিকদের খাওয়া হয় না। বাইরের মস্তানরা এসে জোর জবরদস্তি খেয়ে যায়। শ্রমিকরা আপত্তি করলে পাইপগান দেখায়। কন্টিনের জন্য কোম্পানী বছরে উনত্রিশ লক্ষ টাকা অনুদান দেয় অথচ শ্রমিকদের খাওয়ার নিরাপত্তা রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি।

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অনেকবার কন্টিনের প্রবেশাধিকার প্রশ্নে অনেক আবেদন নিবেদন পেশ করা হয়েছে। কিছুই ঠিকমত সংগঠিত করা যায় নি। দেখে মনে হয় কন্টিনের ব্যাপারে নানা গোলমাল আছে এবং কর্তৃপক্ষের একাংশ মস্তানদের ওপর নির্ভরশীল।

তবে এত অব্যবস্থা সত্ত্বেও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এখনও মোটামুটি সংহত। বিভিন্ন দলীয় ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের দাবীদাওয়ার আন্দোলনের প্রশ্নে সবাই ঐকবদ্ধ।

দর্পণে প্রতিবিম্ব

বাজীমাৎ হবে কিনা জানিনা, তবে বাজার গরম করেছেন মোহন ধারিয়া। কতো মন্ত্রী এলেন গেলেন, কতো মতানৈক্য, কতো অকর্মণ্যতা, কতো পদত্যাগ, কতো বিবৃতি এই ইন্দিরা-আমলেই ঘটলো। কিন্তু এবার দেখা গেল মহান নেত্রীর চোখ রাঙানো, বা মন্ত্রিত্বের লোভ কাজ করেনি। সংবাদপ্রকাশে সম্পাদকীয় মন্তব্যে সর্বত্র প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ভাবে শ্রীধারিয়ার সমর্থনে সবাই উচ্চকণ্ঠ। হ্যাঁ, অবস্থাটা ঘোরালো বৈকি। একদিকে জয়প্রকাশের আন্দোলন, অন্যদিকে দেশের সর্বগ্রাসী সংকট। পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে মার্কিন নীতি সম্পর্কে গরম গরম বক্তৃতা, বা পাক-প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো সাহেবের কথাবার্তার অনুষঙ্গের আঁচার একদফা জাতীয় সংহতির জন্য চীৎকার—সরকার পক্ষের কোনো কলাকৌশলই আর লোক ঠকানোর ব্যাপারে কাজে লাগছে না। একে তো জয়প্রকাশের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরাজী চারিদিকে ষড়যন্ত্র দেখতে শুরু করেছেন, নিজের আতঙ্কগ্রস্ত করুণ চেহারাটিকে নানাভাবে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, তবুও প্রচারের ঢক্কানিনাদে প্রস্তুত ভাবমূর্তির রঙ-জৌলুস সব যেন খসে খসে পড়ছে। সদ্য সদ্য এর ওপর আরেকটা ধাক্কা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সদ্য বরখাস্ত শ্রীমোহন ধারিয়া।

[অবশ্য এ ঘটনাকে সবাই পদচ্যুতি বললেও আকাশবাণীর সংবাদে একে পদত্যাগ বলা হয়েছে। এটা যে শ্রীধারিয়া নিয়মমাফিক রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। আর এই ভাবেই আকাশবাণীর তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারিত।]

শ্রীধারিয়ায় পদচ্যুতি উপলক্ষে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এক বিবৃতি দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আরেকদফা অভিযোগ এনেছেন। এরসঙ্গে শ্রীনারায়ণ শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীচ্যবন প্রমুখ নেতাদের ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করেছেন, কেননা, ইন্দিরাজীর নেতৃত্ব দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং জগজীবনবাবু ও চ্যবনজীর মতো নেতারা কংগ্রেসের আদর্শকে সুস্থপথে পরিচালিত করেত পারবেন।

জয়প্রকাশজীর এই বিবৃতি সম্পর্কে নানা জনের নানা মতামত সংবাদপত্রে প্রকাশিত। এবারও এক বক্তব্য রাখলেন ইন্দিরা-দাসানুদাস শ্রীসিদ্ধার্থ রায়। বললেন, জয়প্রকাশের বিবৃতি নাকি একটা চীপ স্টান্ট, এবং এরকম খেলো স্টান্ট বহুকাল তার নজরে আসেনি।

আমাদের মানুষের স্টান্ট ব্যাপারটি অবশ্য অত্যন্ত ভাল বোঝেন। নিজে যে ঐ লাইনেরই লোক প্রথমাবধি। সেই কবে রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ছেড়ে এসে তেজোদৃপ্ত বিবৃতি দিলেন, আবার কোন সময় বামপন্থীদের আশ্রয় ছেড়ে অতুল্য ঘোষের আশ্রয়ে ঠাঁই নিলেন। কতো কৌশলে তিনি অকুচ্ছলে একবারমাত্র গন্ধ শুঁকে হেমন্ত বসুর হত্যাকারী বলে সি পি এম দলকে চিহ্নিত করেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দমদম বা পালাম কিম্বা বন্দরে সিদ্ধার্থবাবু কতোরকম পরিকল্পনা নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন বা অগ্রগতি দেখালেন, উদ্বাস্তুরা কতো জমির মালিকানা পেল, জমি, আইন বা অর্থসংক্রান্ত অবস্থা না দেখে কিংবা প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হবার আগে কতো শিলান্যাস করলেন বা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে করালেন, কতো হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পাঠালেন, কতো হাজার শিক্ষিত বেকারকে চাকরী দিলেন। এহেন, গ্রেট দাদা, অন্যের চীপ স্টান্ট না বুঝলে কে আর বুঝবেন। সিদ্ধার্থবাবুর আমলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কতোটা অগ্রগতি হল, তার পূর্ববর্তী বিভিন্ন সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকার কতোটা কাজ করলে তার পরিচয় পাওয়ার জন্য সিদ্ধার্থবাবু নিজে এবারকার রাজ্যের বাজেটের সঙ্গে বিধান সভায় প্রচারিত আর্থিক সমীক্ষাটি পড়েছেন তো? সিদ্ধার্থবাবুর আমলে মাথাপিছু গড় আয়বৃদ্ধির পরিমাণ যে যুক্তফ্রন্টের আমলের চাইতেও কম। অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের এটা স্টান্ট নয়তো!

পরিশেষে [সিদ্ধার্থবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসুনীতি চট্টরাজ কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে কংগ্রেসীদের এক সভায়, এবং বিধানসভায় যা বলেছিলেন (যে বক্তব্য স্পীকার সভার ধারাবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করেননি), সিদ্ধার্থ-বিরোধী সেই সব রসালো ও চমকপ্রদ অভিযোগগুলি চট্টরাজমশাইয়ের চীপ স্টান্ট বলে কি সিদ্ধার্থবাবু মনে করেন?

●

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটি গৃহীত সাম্প্রতিক করেকটি প্রস্তাবের ওপর আলোচনা প্রসঙ্গে কংগ্রেসী নেতা শ্রীবিজয় সিং নাহার পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে কিছু মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে সি পি আই-এর এখন কোনো "আইডেন্টিটি" নেই, অতএব শুধু এস্তাব প্রস্তাব গ্রহণ। আরেকটি মন্তব্যঃ সি পি আই বামপন্থীও নয়, দক্ষিণ পন্থীও নয়, এখন ওরা শুধু অধঃপন্থী।

বিজয়বাবু অনেকদিন চুপচাপ ছিলেন। ইদানিং কিছু কথাবার্তা বলছেন—বেশ কড়া কড়া কথা, বিশেষ করে রাজ্য কংগ্রেস ও এখানকার মন্ত্রী যুব-ছাত্র নেতাদের সম্পর্কে। এবার সি পি আই সম্পর্কে এমন উক্তি করলেন, যা অনেকদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শিলাদিত্য

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধারিয়ার চার্জশীট

কপিল রায়

নতুন দিল্লী ছয়ই মার্চ : যে পরিস্থিতিতে তিনি গত দোসরা মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করলেন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লোকসভা সদস্য শ্রীমোহন ধারিয়া তেরো পৃষ্ঠার যে ব্যক্তিগত বিবৃতিটি লোকসভায় গতকাল (পাঁচই মার্চ) দিলেন সেটিকে এখানকার রাজনৈতিক মহল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে এক চার্জশীট বা অভিযোগপত্র বলে মনে করছেন। এই সব মহলের মতে, ব্যক্তিগত বিবৃতি দানের এই "বেদনাদায়ক সংসদীয় কর্তব্য পালন করতে উঠে" শ্রীধারিয়া খোদ প্রধানমন্ত্রী গান্ধী ও তাঁর (প্রধানমন্ত্রীর) নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তথা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে যে সব গুরুতর অভিযোগ একের পর এক বিবৃত করলেন ইতিপূর্বে আর কোন দিন অন্য কোন পদত্যাগী বা পদচ্যুত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তেমন কিছু করেন নি। এ যেন নয়া দেবীপীঠস্থানের সর্বশক্তি-অধিশ্বরী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ।

লোকসভা সদস্যটি ছিল সদস্যে ভরা—সাধারণ দর্শক, বিশিষ্ট দর্শক রাজ্যসভা সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলিও ছিল কৌতূহলী দর্শকে পূর্ণ। সাংবাদিকদের গ্যালারীটিও ছিল ভিড়ে ভরা। বহু প্রত্যাশিত বিবৃতিটি ধীর ও শান্ত কণ্ঠে পড়লেন শ্রীধারিয়া পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরে। উনসত্তর, একাত্তর ও বাহাত্তর সনে দেশের জনসাধারণের কাছে কংগ্রেস ও তাঁর সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলিকে পূরণ না করবার জন্য শ্রীধারিয়া কংগ্রেস ও তাঁর সরকারকেই দোষী করলেন অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোর ভাবে।

উনসত্তর সনের পার্টি বিভক্ত হবার সময়ে এবং একাত্তর সনের লোকসভা ও বাহাত্তর সনের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সদনকে বললেন যে ভালো ভাগ বা কপাল (বেটার ডীল) পাবার আশায় জনসাধারণ কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন। সার্বজনিক কল্যাণের জন্য এখনও তাঁরা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে ও আত্মত্যাগ করতে তৈরি। কিন্তু প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যেখানে ভুলে যাওয়া হয়, আশা যেখানে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয় তেমন পরিস্থিতিকে আর তাঁরা বরদাস্ত করতে রাজি নন।

তরুণতুর্কী নেতা শ্রীধারিয়ার এই বিবৃতিটি বার বার অ-কমিউনিস্ট বিরোধীপক্ষীয় দলগুলির করতালির অভিনন্দন লাভ করেছিল—কংগ্রেস দলের কয়েকজন সদস্য ও সদস্যাও তাঁর বিবৃতিকে ঘন ঘন অভিনন্দিত করেছিলেন টেবিল চাপড়ে। এই সব কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী লক্ষ্মীকান্তাম্মা, শ্রীশম্ভুনাথ মিশ্র ও কংগ্রেস সংসদীয় দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রীরামধন। অপরপক্ষে, অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যরা, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও মন্ত্রিসভার অপরাপর সদস্যরা (শ্রীযশোবন্তরাও বলবন্তরাও চাবনের অনুপস্থিতি সকলেরই চোখে পড়েছিল) গোমরা মুখে পাথুরে নীরবতা নিয়ে বসে বসে শুনলেন শ্রীধারিয়ার অভিযোগসম্বলিত বিবৃতি। কংগ্রেস সহযোগী সি পি আই সদস্যরাও নীরবেই এই বিবৃতি শুনছিলেন। কিন্তু তাঁর বিবৃতির শেষ দিকে শ্রীধারিয়া যখন সি পি আইয়ের শাসনক্ষমতা-অংশলোভসঞ্জাত "অসাধু চক্রান্ত" ও "রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের" মাধ্যমে কংগ্রেসের সঙ্গে শাসনক্ষমতা ভাগাভাগি করবার আষাঢ়ে আশার উল্লেখ করে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছিলেন তখন সি পি আই দলের নেতা ভোগেন্দ্র ঝা উঠে প্রতিবাদে কি যেন বলতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অপরাপর বিরোধীপক্ষীয়দের এবং এবং কিছু সংখ্যক কংগ্রেস সদস্যের চীৎকারে তাঁকে সে প্রয়াস ছাড়তে হল। লোকসভায় মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীগুরুদয়াল সিং ধীলনও শ্রীঝাকে বসতে নির্দেশ দিলেন। শ্রীঝাকে উদ্দেশ্য করে মাননীয় লোকসভা অধ্যক্ষ মহোদয় মন্তব্য করলেন যে শ্রীধারিয়া কংগ্রেস সম্পর্কেও তো অনেক কিছু বলেছেন —"আপনি কি দেখছেন না তাঁরা চুপ করে রয়েছেন।" এর পিঠেপিঠি সোশ্যালিস্ট পার্টির শ্রীমধু ডান্ডাভাটেকে মন্তব্য করতে শোনা গেল "এমন কি প্রধানমন্ত্রীও যখন উত্তেজিত হচ্ছেন না তখন সি পি আই হবেন কেন?"

বিরোধী পক্ষীয়দের করতালিমুখর অভিনন্দনে তখনই শ্রীধারিয়া বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হলেন যখন তিনি আবেগভরা কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : "যেখানে দুর্নীতি সংরক্ষিত হয় ও সাধুতা দণ্ডিত হয় তেমন গণতন্ত্র বা অন্য কোন ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন টিকে থাকতে পারে না।"

তাই তিনি তাঁর বিবৃতির শেষভাগে বললেন : "দেওয়ালের লিখন আমি যে দেখেছি। তাই আমাদের পার্টির কার্যসূচীকে কার্যকরী করবার অনুকূলে আমার কথা বলাকে আমার জাতীয় কর্তব্য বলে আমি আরও তীব্রভাবে অনুভব করছি। যে সব মূল বোধকে সযত্নে পোষণ ও লালন করেছি, যেগুলির জন্য সংগ্রাম করেছি সেগুলির জন্য যে কোন মূল্য দিতেই আমি তৈরি।"

প্রধানমন্ত্রী তাঁর পয়লা মার্চ তারিখের চিঠিতে অভিযোগ করেছিলেন যে শ্রীধারিয়ার অভিমতাদি পার্টির চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাই শ্রীধারিয়ার মনে পার্টি নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে সংশয় থাকলে সেগুলি আগে শ্রীমতী গান্ধীকে জানানো শ্রীধারিয়ার কি কর্তব্য ছিল না? প্রশ্ন করেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী এই চিঠিতে। এই পরিস্থিতিতে শ্রীধারিয়ার পক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্য থাকা আর শোভন নয়। শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতিকে অনুরূপভাবে জানিয়ে দিলেন।

শ্রীধারিয়া দোসরা তারিখের সকাল সাড়ে দশটায় আমেদাবাদ থেকে ফিরে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়ার কাছ থেকে এক জরুরী তলব পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সাড়ে এগারোটা থেকে একটা অবধি শ্রীধারিয়া শ্রীবড়ুয়ার সঙ্গে আলাপআলোচনা করেন। তখন শ্রীবড়ুয়া শ্রীধারিয়াকে জানান যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীধারিয়ার সাম্প্রতিক ভাষণাদিতে ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে লেখা চিঠির বক্তব্যে বিশেষ চটে গেছেন। যাইহোক পরে তিনি শ্রীধারিয়ার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন, জানালেন শ্রীবড়ুয়া। বাড়ী ফিরে এসে একটা পনেরো মিনিটের সময়ে শ্রীধারিয়া প্রধানমন্ত্রীর লেখা পয়লা তারিখের চিঠি পেয়েই একটা তিরিশ মিনিটের সময়ে তাঁর পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেন সোজা। আর সেই চিঠির একটা নকল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠান। এই দিনই পরে তিনি আর একটা চিঠি লেখেন প্রধানমন্ত্রীকে। তাতে তিনি তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর আরোপিত অভিযোগগুলিকে তথ্যের ভিত্তিতে খণ্ডন করেছেন। এই সব চিঠিপত্রও শ্রীধারিয়া লোকসভায় পেশ করেছেন। এই সব চিঠিপত্র থেকে (এবং তাঁর বিবৃতি থেকে) জানা যায় যে শ্রীধারিয়া তাঁর মতামত প্রধানমন্ত্রীকে অনেক দিন আগেই লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন এবং পার্টির প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নানাবিধ অভিভাবন (সাজেশন) ও প্রস্তাবাদিও প্রধানমন্ত্রীর বিচারবিবেচনার জন্য লিখিতভাবে পেশ করেন। এ সবের কোন জবাব শ্রীধারিয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পান নি বলে জানান। এ বছরের এগারোই ফেব্রুয়ারী শ্রীধারিয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক চিঠি লিখেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করবার জন্য সময় চেয়ে। কিন্তু সে চিঠির কোন জবাব শ্রীধারিয়া পান নি আর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার সময়ও তাঁকে দেওয়া হয় নি। তাই ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী শ্রীধারিয়া একখানি চিঠিতে তাঁর বিস্তারিত মতামত লিখে জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে।

শ্রীধারিয়ার বিবৃতিতে দেখা যায় যে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন (এই অধিবেশনে আমদানী লাইসেন্স কেলেঙ্কারী নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল এবং এই ব্যাপারে রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল) শেষ হবার পরে সাতই অক্টোবর তারিখে শ্রীধারিয়া নিজে প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে "সন্দেহজনক খ্যাতি সম্পন্ন লোককে" মন্ত্রিসভায় থাকতে দেওয়া হলে তার ফলে সরকারের সুনাম ক্ষয় পাবে। প্রধানমন্ত্রী যে শ্রীধারিয়ার এই পরামর্শে কান দেন নি তার প্রমাণ দশই অক্টোবরের মন্ত্রিসভার রদবদল। এই রদবদলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সব কয়েকজন প্রবীণ সহকর্মীর দপ্তর বদলে দিয়েছিলেন, দুইজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীসহ মোট ছয় জন মন্ত্রীকে মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে বাদ দিয়েছিলেন এবং আট জন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ললিতনারায়ণ মিশ্রকে স্থানান্তরিত বা গদিচ্যুত করা হয় নি।

কংগ্রেস যে সমাজবাদী বুলি কপচে জনসাধারণকে ধোকা দিচ্ছে শ্রীধারিয়ার এই বিবৃতিতে আর অস্পষ্ট নয়। তাই তিনি বলেছেন যে আজ কংগ্রেস ও তাঁর সরকার আপনাদের দেশবাসীর এই ক্ষুদ্র অংশের সমস্যাদিতে মেতে রয়েছেন বড় বেশি। তা শ্রীধারিয়ার এই বিবৃতিতে আর "আজকের বিশিষ্টব্যক্তি বাদী রাজনীতি (এলিটিস্ট পলিটিক্স) রাজনৈতিক চালবাজির খুঁটিনাটি নিয়েই বেশি মগশুল। প্রতিপক্ষের ওপরে এক হাত নেবার কাজেই যাবতীয় শক্তি নষ্ট করা হচ্ছে।"

দেশের দুই তৃতীয়াংশ লোক যে এখন ন্যূনভুক্ষা রেখার নিচে, কংগ্রেস শাসনের সাতাশ বছরে দেশে নিরক্ষরতার যে অরও বৃদ্ধি ঘটেছে তারও উল্লেখ করেছেন শ্রীধারিয়া।

কংগ্রেসের, তাঁর সরকারের ও তাঁর নেত্রীর ধোকাবাজীর, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফানুস এবারে শ্রীধারিয়া ফাটিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব এবারে কি করেন সেটাই লক্ষণীয়।

রাজধানী দর্পণ

নেতাজীর অন্তর্ধানের অকথিত কাহিনী

লিখেছেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর একান্ত রাজনৈতিক অনুগামী বিশ্বস্ত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবিজেন্দ্রনাথ বসু, যিনি নেতাজীর রহস্যপূর্ণ অন্তর্ধানের পর গ্রেপ্তার হয়ে লাহোর কেল্লায় অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হন।

মূল্য—২·৫০ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :

সুভাষবাদী রিসার্চ ফোরাম

১, উডবার্ন কোর্ট, কলিকাতা-২০

এবং

অগ্রণী বুক ক্লাব

এ-৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আপনারা যাঁরা আয়কর দেন

তাঁরা আয়কর দেবার সময়ে আয়ের ৩০% পর্যন্ত

কর-রেহাই এর সুবিধা পুরোপুরি নিয়েছেন কি ?

না নিয়ে থাকলে

১৫ বছরের সরকারী ভবিষ্যনিধির মাধ্যমে

(ক) অন্যান্য অনুমোদিত প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে কর-এ অনুরূপ রেহাই পেতে পারেন, এবং

(খ) বছরে আয়কর মুক্ত ৭% সুদ পেতে পারেন

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার যে কোনও শাখায় মার্চ ৩১, ১৯৭৫-এর আগে ভবিষ্যনিধির খাতা খুলুন

২০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমা করা চলে।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

ডি এ ভি পি 74/485

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক অডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীতে ক্ষমতার লড়াই

দর্পণ

১৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২১ শে মার্চ ৭৫ ॥ ৪০ পঃ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের পরিচিত পুলিশ এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তি আশ্রিত গুন্ডার দল একটি ছেলেকে কোল-পাঁজা করে তুলে দোতলার বারান্দা থেকে নীচে আছড়ে ফেলে দিল। আক্রান্ত যুবক জাহাঙ্গীর কবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কংগ্রেসী ইউ-নিয়ন করে এবং মহাজাতি সদন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

কবীরের কই মাছের জান, মরে নি। তবে হয়ত সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে। গুন্ডার দল হঠাৎ বাইরে থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলায় এবং সম্ভাব্য সমস্ত রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায়। পুলিশ কাছেই ছিল। কংগ্রেসের গোষ্ঠী-কোন্দল, এবং কংগ্রেসীরা আক্রমণকারী। তাই চোখের সামনে মানুষ খুন করলে, বা মানুষের চোখ উপড়ে নিলে অথবা প্রকাশ্য রাস্তায় বাড়ী থেকে মেয়ে ধরে এনে বলাৎকার করলে পুলিশ চোখে দেখেও চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এই রকম ঘটনা ঘটেছে সারা পশ্চিমবঙ্গে গত তিন চার বছর ধরে।

অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও কংগ্রেসী মস্তানদের রাজত্ব। এই মস্তানরা ছাত্র পরিষদ মহাজাতি সদন গোষ্ঠীভুক্ত।

সম্প্রতি এই গোষ্ঠীতে আভ্যন্তরীণ কোন্দল সুরু হয়েছে। কুমুদ ভট্টাচার্য আর জয়ন্ত ভট্টাচার্য এখন সামগ্রিক নেতৃত্বের প্রশ্নে রেষারেষি করছেন। এরা দুজনেই হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে পুলিশ আশ্রিত গুন্ডাদের ওপর নির্ভরশীল নিজেদের নেতৃত্ব রখার জন।

এই গুন্ডারাই দর্পণ অফিসে লুঠতরাজ করেছে এবং দর্পণ সম্পাদক হীরেন বসুকে হত্যার জন্য খুঁজেছে। এদের বিরুদ্ধে সবরকম সাক্ষপ্রমাণ থাকা সত্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থাই নেয় নি।

রবীন্দ্রভারতীতে ছাত্র পরিষদের এক গোষ্ঠী উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। তখন হার্ডিঞ্জ

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপে কংগ্রেসে বিক্ষোভ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সদ্য গদিচ্যুত মন্ত্রী সন্তোষ রায়কে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপ রাজ্য কংগ্রেসে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সমস্ত নীতিনিয়ম জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি সন্তোষ রায়ের পক্ষে রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনকে কাজে লাগাচ্ছেন বলে দায়িত্বশীল মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী কুচবিহার থেকে নির্বাচিত এম পি. বিনয়কৃষ্ণ দাসচৌধুরীকে শাসিয়ে বলেছেন, তোমাকে আগামী নির্বাচনে টিকিট

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

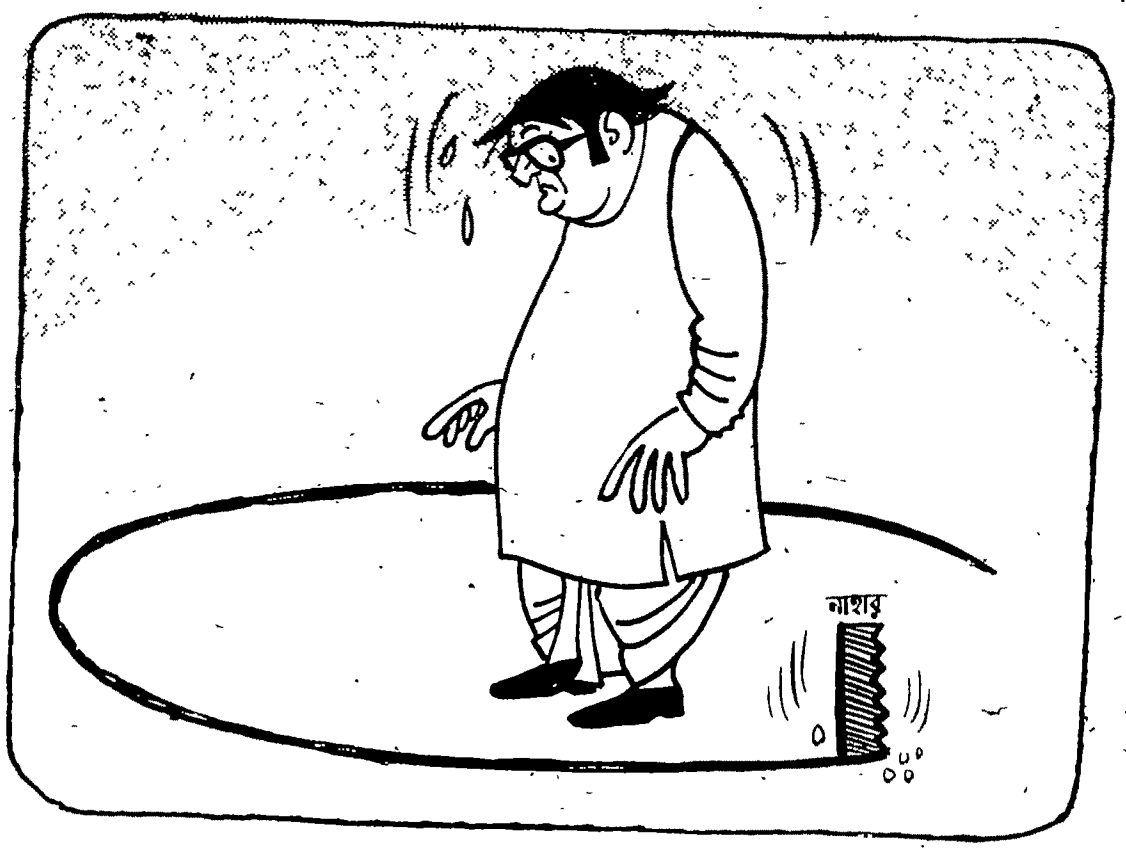

মুখ্যমন্ত্রীর কৌশল : লক্ষ্মী বসুর প্রতিবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুখ্যমন্ত্রীর অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব ক্ষমতার জোরে পাশ করিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত বসু গত বুধবারের পরিষদীয় দলের সভায় যোগ দেন নি।

প্রথমে কথা ছিল বিজয় সিং নাহার বা তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন আলোচনা সভায় হবে না। অন্ততঃ মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে এই প্রচার চালান হয়েছিল। কিন্তু দিল্লী থেকে ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রী নতুন কৌশল নিলেন। মঙ্গলবার তিনি দুই তরুণ মন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং সুব্রত মুখার্জীকে ডেকে সভায় কি প্রস্তাব নেওয়া হবে তা বলেন, এবং প্রদীপ ও সুব্রতকে সেই প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করতে বলেন। প্রদীপ ও সুব্রত রাজী হয়ে যান। যদিও প্রদীপের এব্যাপারে খুব সম্মতি ছিল না। কিন্তু ওরা একান্ত আলোচনায় বলেছেন মন্ত্রীত্বের চাকরী চলে যাওয়ার ভয়েই মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন।

লক্ষ্মী বসুর কাছে এ খবর চলে যায়। লক্ষ্মীবাবু ঠিক করেছিলেন সভায় যাবেন এবং বিজয়বাবু বা অন্য কারও বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী কোন প্রস্তাব নিতে গেলে তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু লক্ষ্মীবাবু যখন দেখলেন প্রদীপ ও সুব্রতকে সিদ্ধার্থবাবু দলে ভিড়িয়ে নিয়েছেন তখন তাঁর আর করার কিছু থাকল না। কারণ সভায় উপস্থিত হলে তাঁকে প্রদীপ ও সুব্রতর বিরুদ্ধেই কথা বলতে হয়। তাই তিনি আর সভাতেই হাজির হননি।

পরিষদীয় দলের সভাতে এমন কিছু লোক কাশীকান্ত মৈত্রের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন যারা মুখ্যমন্ত্রীর পা-চাটা। দুর্নীতি ও নানা অপকর্মে লিপ্ত এই সব এম এল এদের অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর পদলেহন করা ছাড়া কোন উপায় নেই। জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে কাশীকান্তবাবুর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়েছে যে, কাশীবাবু মুসলমান বিরোধী। জয়নাল দলের সংখ্যালঘু সদস্যদের এই বলে উত্তেজিত করছেন এবং কাশীবাবুর বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছেন। জয়নালের আক্রোশ কাশীবাবু মন্ত্রী থাকাকালীন জয়নালের অন্যায় অনুরোধ রাখেন নি।

কংগ্রেস পরিষদীয় দলের অনেক সদস্যই সভার প্রস্তাবে আন্তরিক সমর্থন নেই। কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খোলেন নি। পাছে জয়প্রকাশের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করে দল থেকে তাড়িয়ে দেয়া। তবে মুখ্যমন্ত্রীর একচেটিয়া ক্ষমতা খর্ব করার জন্য ভেতরে ভেতরে চেষ্টা চলছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী সকলের পক্ষেই বিপদের কারণ।

কোনটা আগে?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য সরকারের অর্থ-বিভাগের খেয়াল-খুশির একটা খবর আমাদের হাতে এসেছে।

কয়েক মাস আগে ফুড কর্পোরেশন খাদ্য সরবরাহ ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থ দপ্তরের কাছে একটি ট্রাক কেনবার জন্য আবদার করেছিল, কিন্তু সেই আবদার নাকচ হয়ে যায় কারণ অত টাকা দিতে সরকার অক্ষম। সম্প্রতি অর্থ বিভাগের সচিবের ব্যবহারের জন্য গাড়ির প্রয়োজন হওয়ায় একটির বদলে দুইটি এমব্যাসাডার গাড়ি কেনবার অনুমতি হয়েছে, হয়তো এতদিনে গাড়ি কেনাও হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সরকারের পয়সার ঘাটতি নেই।

আমাদের প্রশ্ন : কোনটা আগে প্রয়োজন? খাদ্য বিভাগের জন্য গাড়ি কেনা, না বিভাগীয় সচিবের ব্যবহারের জন্য গাড়ি কেনা?

নয় লক্ষ টাকা ফেরত যাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রমিকদের কল্যাণে ই এস আই হাসপাতাল করার জন্য কেন্দ্র প্রায় নয় লক্ষ টাকা দিয়েছিল। কথা ছিল এই হাসপাতাল দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু রাজ্য শ্রমদপ্তরে নানা টানাপোড়েনে কোথায় এই হাসপাতাল তৈরী হবে তাই নিয়ে সিদ্ধান্ত হয় নি। কেন্দ্রের নয় লক্ষ টাকা ফেরৎ চলে যাচ্ছে।

কংগ্রেসীদের একাংশ মনে করে হাসপাতাল আসানসোলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। অপর অংশের দাবী দুর্গাপুরের পক্ষে। দুই গোষ্ঠীই সমান প্রভাবশালী। শ্রমদপ্তর ঝামেলায় যায় নি। দরকার কি হাসপাতালের?

টাকা নেই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

? রাজ্য সরকারের হাতে এখন অর্থ নেই, এই মন্তব্য করেছেন অর্থ দপ্তরের জনৈক সেক্রেটারী। সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য পরিবহন সংস্থা একটি নামকরা সংস্থার কাছ থেকে রং কিনেছে। সেই সংস্থা রংয়ের দাম বাবদ ১৫৩ টাকা ৭৯ পয়সার একটি বিল পাঠিয়েছে।

অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী ঐ বিল নাকচ করে দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে চলতি আর্থিক বছরে সরকার কোনরূপ অর্থ দিতে পারবেন না, সুতরাং ঐ বিল যেন আগামী আর্থিক বছরে পেশ করা হয়।

এই ঘটনার পরেও কি কোন সংস্থা রাজ্য সরকারকে ধারে মাল বিক্রয় করতে স্বীকৃত হবে?

কংগ্রেসী শ্রমিক নেতাদের মধ্যে খেয়োখেয়ির আর এক অধ্যায়

(দর্পণের প্রতিনিধি)

কলকাতা বন্দর শ্রমিক ইউনিয়নে মাখন চ্যাটার্জীর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ভাঙ্গার ব্যবস্থা করতে নেমেছেন ওঁরই সহকর্মী হরেন দাস। হরেনবাবুর বক্তব্য মাখন চ্যাটার্জী কংগ্রেস সদস্য হয়েও এইচ এম এস ইউনিয়ন করছেন। হয় তিনি নিজের ইউনিয়নকে আই এন টি ইউ সির অন্তর্ভুক্ত করুন, নয়ত নিজে কংগ্রেস ছাড়ুন।

তবে মাখনবাবু অভিজ্ঞ লোক এবং কংগ্রেসী ওপর মহলে তাঁর যথেষ্ট খাতির। তাই হরেনবাবুর মত নেতা ওঁর কেশ স্পর্শও করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

বন্দরে কংগ্রেসীদের ইউনিয়নের দুই উচ্চপর্যায়ের নেতা সুনীল দত্ত এবং জানকী মুখার্জী এখন নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদে মত্ত। এরা দুজনে এক হয়ে এবং কংগ্রেসের রাজ্যশাখার সভাপতি অরুণ মৈত্রের সহায়তায় শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসুকে বন্দর থেকে সরিয়েছেন। এবার সুনীলবাবু চাইছেন ক্ষমতা পুরো কব্জা করতে।

সুনীলবাবু কংগ্রেসী মন্ত্রী ও অন্যান্য নেতাদের কাছে প্রায়ই দরবার করেন। যাঁদের কাছে যান তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের কাছেই বিদেশী দামী সিগারেট দেখা যায়। বন্দরে ইউনিয়ন করলে বিদেশী জিনিষ জোগাড় করার সুবিধে আছে।

দুর্গাপুরেও কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ অঞ্চলে শিল্প কারখানার সমস্ত সম্প্রসারণ বন্ধ। কেন্দ্র বলেছে যে, কংগ্রেসীদের উৎপাতে ইস্পাত কারখানার উৎপাদন প্রায় ঝানচাল হয়ে যেতে বসেছে। সরকারী উদ্যোগে অন্যান্য শিল্প সংস্থার অবস্থাও একই।

কিন্তু কংগ্রেসী সংগঠন এমনই পঙ্গু এবং দুর্নীতিগ্রস্ত যে, নেতৃত্ব কারুর বিরুদ্ধে কোন ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে ভয় পায়। ভয় পাছে একে অপরের কেচ্ছা বার করে দেয়।

এই ত কিছুদিন আগে সুনীতি চট্টরাজকে মন্ত্রীপদ থেকে খারিজ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কত গোপন কথা ফাঁস হয়ে পড়ল।

আর তাছাড়া এখন কংগ্রেসীরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। বিজয় সিং নাহার বাস্তুঘুঘু। তিনি আদাজল খেয়ে আসরে নেমেছেন। হয়ত বা অনেক কথাই বের হয়ে পড়বে।

শর্মিষ্ঠা বর্মণ

বাড়ীর ক্লাশে মহিলাদের গীটার শেখাচ্ছেন। ২৪১/এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

একদম করমুক্ত— এমন কোনও নিরাপদ বিনিয়োগের কথা কখনও শুনেছেন কি?

ভারত সরকার 1975-এর জানুয়ারী 7 তারিখে একটি বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ঐ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী **শুধু ইউনিট থেকে অর্জিত** 2000 টাকা পর্যন্ত আয় কর থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাবে। ইউনিট এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট প্রকল্প থেকে অর্জিত 3,000 টাকা পর্যন্ত আয় তো আগেই করমুক্ত ছিল; ঐ 2,000 টাকার সুবিধা তার অতিরিক্ত।

কর-রেহাইএর নতুন প্রকল্পের প্রকৃত অর্থ হল এই যে, আপনি 23,500 টাকার ইউনিট কিনে তার থেকে বরাবর নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ আয় করে যেতে পারেন এবং এর জন্যে আপনাকে কোনও কর দিতে হবে না।

1-4-74 থেকে 31-3-75 পর্যন্ত সময়ের জন্যে আয়ের যে বিবরণ 1975-76এ পেশ করতে হবে, তার হিসেবের সময়ে এই রেহাইএর সুবিধা পাওয়া যাবে।

ইউনিটে বিনিয়োগ যেমন নিরাপদ তেমন তার থেকে আয়ও হয় নিয়মিত। আর, যদি বিক্রী করতে চান তাহলে যে কোনও সময়ে ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার কাছেই নিজের ইউনিট বিক্রী করতে পারেন।

আর সময় নষ্ট করবেন না। পারলে এখনই ইউনিট কিনে ফেলুন

আবেদনপত্র পাবার ঠিকানা:

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

- 45 বীর স্যারিমার রোড, বোম্বাই-400023
- 8 কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলকাতা-700001
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলডিং, কোর্ট প্লাসিস, সাউথ বীচ রোড, মাদ্রাজ-600001
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলডিং, 6 পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নতুন দিল্লী-110001

davp 74/453

সংবাদপত্রের ওপর কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হামলার প্রতিবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কিছুদিন যাবত পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার ওপর কংগ্রেসী গুন্ডা বাহিনীর যে আক্রমণ শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য গত সতেরোই মার্চ ১৮ নং সূর্য সেন স্ট্রীটে বত্রিশটি পত্রিকার প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। এই সভায় পত্র-পত্রিকার ওপর হামলা সম্বন্ধে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় :—"পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিবৃন্দের এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে বর্তমানে দেশে সংবাদপত্রের যেটুকু সীমিত স্বাধীনতা আছে সেইটুকুও এই রাজ্যে ক্রমশই গভীর বিপদের সম্মুখীন হয়ে উঠেছে। সর্বশেষ, পত্র-পত্রিকাগুলি ও তাঁদের ছাপাখানাগুলিও প্রত্যক্ষ আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষণীয় যে, যে কোন দল মতের কাগজই হোক না কেন, সেই কাগজ যখনই সরকার বা সরকারী দলের বিরুদ্ধে কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ করেছে তখনই শাসকশ্রেণীর মধ্যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে এবং সেই সব কাগজের বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীর শাসানি এবং সরাসরি আক্রমণ চলছে। "বাঙলাদেশ" "দর্পণ" "ফ্রন্টিয়ার" শান্তিপুরের "জনতার মুখ" "অলিপুর বার্তা" প্রভৃতি আরও অনেক কাগজ এই আক্রমণের প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছেন। আরও অনান্য কাগজের উপরেও নানাভাবে আক্রমণ চলছে অথচ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসক দল কিংবা মুখ্যমন্ত্রী কোন নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করেননি এবং পুলিশ ও প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করেছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মত মৌলিক অধিকার রক্ষার স্বার্থেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই আক্রমণকে রুখবার প্রয়োজন এই সভা গভীরভাবে অনুভব করছে এবং মনে করছে যে সেজন্য একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস গড়ে তোলা উচিত।"

এই সভায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাংবাদিক হত্যা সম্বন্ধে অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে "সায়গণস্থিত ফরাসী সাংবাদিক শ্রীলোঁয়াদ্রিকে মার্কিন প্রশ্রয়পুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল সায়গণ সরকার যেভাবে মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে এই সভা তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার এবং নিন্দা জানাচ্ছে। একজন কর্মরত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে সারা দুনিয়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকাগুলির এই সভাও কণ্ঠ মেলাচ্ছে।"

নিম্নলিখিত সংবাদপত্র ও পত্রিকার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন : পূর্বতরঙ্গ, ছাত্রফ্রন্ট, অনুষ্টুপ, স্বাধিকার, দর্পণ, বাঙলাদেশ, গণবার্তা, শ্রমিক দর্পণ, রাষ্ট্র, লোকমত, দেশহিতৈষী, সত্যযুগ, গণ সংসার, অনর্থ, প্রস্তুতিপর্ব, গণদাবী, অন্যচোখে, ছাত্র সংহতি, স্টুডেন্টস্ প্লেজ, প্রলেটারিয়ান পাথ, স্পন্দন লালতারা, বীক্ষণ, নান্দীমুখ, শ্রমিক ঐক্য, সম্মুখ, পথিকৃৎ, যুব সংস্কৃতি, গণশক্তি, মাসিক বাঙলাদেশ, গণবিপ্লব প্রলেটারিয়ান এরা। এছাড়াও কবি শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন জ্যোতি ভট্টাচার্য।

ছাত্র পরিষদ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হোস্টেলের গুন্ডারা এসে এলোপাথাড়ি আক্রমণ করে। এদের আক্রমণের প্রকৃতি দেখে মনে হয় যে, এরা পেশাদার খুনে।

সাত সাতটা ছাত্র গুরুতর জখম হল। বিশ্ববিদ্যালয়ে লুঠতরাজ চলল, ওখানে লেখাপড়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সরকার চুপচাপ। পুলিশ কোন কিছুই করতে পারছে না।

সারা পশ্চিমবঙ্গে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেসীরা সি পি এম ঠেকাতে যে সব গুন্ডাদের নেতৃত্বে এনেছে তারা এখন বখরা লড়াইয়ে নিযুক্ত।

কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ এই জোড়াটে গুন্ডাদের মিসায় আটক করেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নয়। কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল এমনভাবে মুখ্যমন্ত্রী পরিচালনা করতে চান যাতে বিবদমান সমস্ত গোষ্ঠীই তাঁর তাঁবে থাকে।

বাঙলাদেশ পত্রিকা আক্রমণের ব্যাপারে ঐ পত্রিকায় খোলাখুলি অভিযোগ করা হয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে গুন্ডাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন "প্রেসম্যান" ছাপাখানা লুঠ করার জন্য।

বিচার ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা, জনজীবন, মানুষের নূন্যতম নিরাপত্তা সব কিছুই এই গুন্ডা রাজত্বে বিধ্বস্ত।

বাংলাদেশে মৃত্যুর বিভীষিকা

আল কিন্দি

সম্প্রতি বাঙলা দেশের কিছু কিছু বড় শহরে ঘুরে আধা গল্পে টহল দিয়ে ভয়ংকর অরাজকতা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খল অবস্থা নিজের চোখে দেখে এলাম। কারিশাল ধানের দেশ। বালাম সীতেশাল চালের ধবধবে ভাত শুনেছি মরা মানুষও জীবন্ত হয়ে খেতে আসে বলে এক প্রবাদ আছে। ঠিক সেইখানেই দুঃখী মানুষ পথপ্রান্তে শুয়ে সারা গায়ে বিষাক্ত ঘা নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। গায়ে তার বস্ত্র নেই। কটিদেশে জড়ানো টুকরো কাপড়। অসাড় হয়ে মলত্যাগ করছে। সে মরে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এমন মৃত্যু পথের ধারে সংখ্যাহীন। কে কার কথা ভাবে।

আহমদ মুস্তাফা, বাংলাদেশী দৈনিকের সাংবাদিক বললেন, শয়ে শয়ে লোক মরছে না খেয়ে, তার ওপর আছে প্রায় সকলের গায়ে বিষাক্ত ঘা। মুদুল সরকারের মতে (যিনি টেলিভিশন-এর কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত) এসব নাকি বিষাক্ত গ্যাস ও যুদ্ধের গোলাগুলির ফলে হয়েছে।

আজাদ হিংলান জুট মিলের ম্যানেজার মুর্শিদাবাদের আবদুল কাদির সাহেব বললেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগতদের বলা হয় বঙ্গ টিন্ডি। আমরা সানস অব দি সয়েল নয় বলে চাকরী বাকরী সব থেকে বঞ্চিত। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরকারী চাকরী ছেড়ে এদেশে এলাম স্বদেশ ছেড়ে। তেইশ বছর পর জানলাম আমরা উদ্বৃত্ত এসে জুড়ে বসে ফ্যাসাদ বাড়াচ্ছি।

সরকারের নির্দেশে ব্যবসা বাণিজ্য দপ্তর থেকে প্রকাশিত গেজেটে একরাশ দ্রব্যের ব্যবসা ও স্টক করা মজুতদারী নিয়মমাফিক বলে গণ্য হয়েছে। এতে মজুতদাররা যত খুশি মাল বাড়ীতে জমিয়ে রাখছে। এল সি দিয়ে হংকং জাপান চীন থেকে দাড়ি কামাবার ব্লেড, ক্যামেরা, কিংবা দামী সেন্ট আমদানী করছে। চট্টগ্রামে খাট হাদ বেগ নামক স্থানে ছিলাম। ওখানে গোটা কয়েক পশ্চিমবঙ্গবাসীর বাড়ী বেদখল হয়েছে। বাড়ীওয়ালাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘাটফারহাদ বেগের রশিদে ফাহমিদ চৌধুরী নামের এক ফ্রিলান্স সাংবাদিক বার্লিন রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসী হঠাও সমিতি খুলেছেন। ঐ স্থান থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদী নামক কাগজে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাঙলাদেশবাসীর প্রতি বিষোদ্গার করা হয়েছে। এক সম্পাদকীয় লিখে কাগজ কর্তৃপক্ষ বাঙলাদেশের এম পি এবং মন্ত্রীদের অবিলম্বে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বড়লোকরা বাড়ী বিক্রি করে টাকা পাচ্চার করছে এই ছিল হেডিং। পরে খবর ছাপা হয়। সব চেয়ে মজার ব্যাপার ঐ সাংবাদিক যে বাড়ীতে থাকেন তার ভাড়া দেন না। ছয় বছর ভাড়া বাকী। বাড়ীটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর।

ঢাকার অদূরে সৈয়দপুরে বিহারীদের ভাঙ্গা বস্তী ভেঙেচুরে দেওয়া হল। অসহায় বিহারীরা আজ ভিক্ষা করছে রাস্তাঘাটে। অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু ব্যবসায়ীও ছেলেদের বিয়ে কিংবা লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রায় সামাজিক বয়কট ও সরকারী আমলার ঝামেলা পোহাচ্ছেন। খুলনার একটি জেলে শুনলাম ত্রিশজনের থাকার জায়গায় একশত পঁচিশজন স্থান পেয়েছে। জেলে জায়গা নেই। বন্দীরা রাত্রে শোবার জায়গা পায় না। পাশ ফিরে শুতে হলে একশত টাকা জেলারকে ঘুষ দিতে হয়। এক বছর আগে যাদের দেখেছি দোকানের দাওয়ায় বসে বিড়ি ফুঁকছে তারা নাকি তিন চারটে গাড়ীর মালিক। মাংসের দর আঠার টাকা কেজি বাদ দিলেও দশ টাকার কমে চাল মিলবে না। যে যা ইচ্ছা দর হাঁকছে। এদিকে জনাব মুজিবর রহমানের ভাগ্নে ফজলুল হক মনির এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। যাকে খুশি করছে গুলি। জাতীয় পরিষদের লীডার কিংবা হোমরাচোমরারা মর্জি হলেই যার তার মাথার খুলি বের করতে পারেন অনায়াসে।

ই, এস আই হাসপাতালে অরাজকতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ই এস আই স্কীমের হাসপাতালগুলিতে প্রচণ্ড অরাজকতা চলছে এবং এর জন্য দায়ী এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী। হাওড়ার বালটিকুরি ই এস আই হাসপাতালটির শয্যাসংখ্যা কাগজে কলমে পাঁচশত, কিন্তু বর্তমান শয্যা দুশো চল্লিশ, চিকিৎসক প্রায় চল্লিশ জন, সেবিকা প্রায় ষাট জন। ওয়ার্ডগুলির যা অবস্থা তাতে তাকে হাসপাতালের বদলে ডাষ্টবিন বলা চলতে পারে। রুগীদের যা খাদ্য দেয়া হয় তার পশুখাদ্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দুধের বদলে জোটে দুধ মেশানো জল। ঐ হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট লিফটের কোলাপসিবল গেটগুলিকে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে জনৈক কর্মচারী দর্পণের কাছে অভিযোগ করেন। এই সব দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় মুস্তাফিবাবু নামক জনৈক কেরাণীর ভাগ্যে প্রহার জুটেছিল বলে সংবাদে প্রকাশ। বর্তমানে মুস্তাফিবাবু উত্তরপাড়া হাসপাতালে আছেন।

ঐ হাসপাতালের দুইজন কেরানি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করেন হাসপাতালের কর্মীরা। জানা গেছে যে ঐ দুইজনের বদলীর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা এখনো যাননি। হাসপাতাল সংলগ্ন দুইটি বড় পুকুর নিয়েও অনেক কেলেঙ্কারী হচ্ছে। পুকুরের মাছ নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে। আর ঐ পুকুরের জন্য মশার উপদ্রবও বেশী। পানীয় জল নেই বললেই চলে। বদলি হয়ে আসা নতুন স্টাফদের ওপরে দারুনভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

শিয়ালদা ই এস আই হাসপাতালের অবস্থাও অবর্ণনীয়। এখানেও ঐ একই অবস্থা। ওয়ার্ডের রুগীদের অভিযোগ, চিৎকার করে মরে করে গেলেও ডাক্তার আসে না। যদিও সিস্টারেরা আসেন, তাঁরাতো আর ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া কিছু করতে পারেন না। এখানে এক করুণ কাহিনী জানা গেল। অর্চনা কর চৌধুরী নামক একজন সেবিকা শিয়ালদায় বদলি হয়ে এসেছেন কামারহাটি থেকে, কিন্তু এখানে কোন কোয়ার্টার না থাকায় তাঁকে হোষ্টেলে থাকতে হচ্ছে। বাড়িতে তাঁর দুই বছরের দুগ্ধপোষ্য শিশু অসুস্থ। অথচ তাঁকে তো অন্য কোথাও বদলী করা যেত যেখানে কোয়ার্টার আছে। শোনা যায় তিনি অনেক আবেদন করেছেন, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। বদলির ব্যাপারে আর্থিক লেনদেন হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

পাঠ্যবই চোরাবাজারে বিক্রী হচ্ছে

ছাত্রদের কাছে বিক্রয় করার জন্য শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রেরিত পাঠ্যপুস্তক চোরাবাজারে বিক্রী হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পঞ্চম শ্রেণীর ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক "দি পিকক রীডার" বেহালার রায়বাহাদুর রোডের "দীপক ষ্টোর" নামক দোকান থেকে বিক্রী করা হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, পুস্তকটির পিছনে একটি বিদ্যালয়ের রাবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ বর্তমান। পুস্তকের দোকানের মালিককে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন যে এই পুস্তক শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। দোকানের মালিক এস ইউ সির ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র একজন সক্রিয় কর্মী। বিদ্যালয়টির নাম "গান্ধী কলোনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।" উল্লেখ্য যে, পুস্তকটির দাম যদিও চল্লিশ পয়সা কিন্তু অর্থপুস্তক নিতে স্বীকৃত না হলে পুস্তকটি পাওয়া যাচ্ছে না, অর্থ পুস্তকের দাম ধার্য করা হয়েছে পাঁচ টাকা।

এ বি টি এর জয়পুর থানা সম্মেলন

গত আটই এবং নয়ই মার্চ জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জয়পুর থানা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আটই মার্চ প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস এফ আই-এর পুরুলিয়া জেলার ছাত্র নেতা নিখিল মুখার্জী এবং অধ্যাপক সমিতির অন্যতম নেতা অধ্যাপক বিশ্বনাথ কয়েল। উভয় বক্তাই বর্তমান সরকারের জনবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। নিখিল মুখার্জীর বক্তব্য জনসাধারণের মনে বেশ উৎসাহ সৃষ্টি করে। এর পর গণনাট্য শাখা কর্তৃক গণসংগীত ও তরজার লড়াই পরিবেশিত হয়।

নয়ই মার্চ প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্পাদকীয় রিপোর্ট পাঠ করেন প্রদ্যোৎ বানার্জী। এই রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন রমেশ চ্যাটার্জী ও গণেশ গড়াই।

নীলকমল মাহত, বাসুদেব মুখার্জী এবং ধনঞ্জয় দেকে যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ করে নতুন কমিটি গঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে কালিদাস চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর একটি মিছিল জয়পুর পরিক্রমা করে।

সব জিনিষ, হাঁ, প্রত্যেকটি জিনিষের দাম আজ ক্রমশ বাড়তির দিকে

কেবল মনের শান্তিটুকু ছাড়া।

কিন্তু ২৫০০ টাকার ৩০ বছরের মেয়াদী জীবন বীমার দরুন আজও আপনার খরচের বহর কমই রয়েছে, রোজ ৩টি সিগারেটের দাম মাত্র। (ধরুন, ২৫ প)*

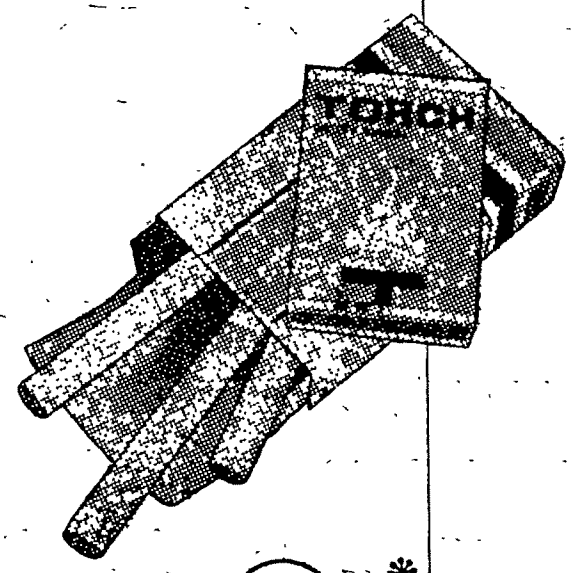

PRATIBHA 282 IM-3 BEN

* আপনার বয়স যখন ৩০ হলে

জীবন বীমা আপনি করেন যদি মনের শান্তি পাবেন নিরবধি

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস : ১৯৫৯

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

দিলীপ মজুমদার

খাদ্যমন্ত্রীর পরে এবার আসরে নামলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতিতে তিনি জানালেন—"এ যাবৎ চাউল কলগুলির নিকট হইতে উৎপন্ন চাউলের শতকরা পঁচিশ ভাগ সংগ্রহের ব্যবস্থা চলিতেছিল। জেলা-অফিসারদিগকেও বড় বড় মজুতদারদের নিকট হইতে চাউল ও ধান রিকুইজিশন করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ হইতে আমাদের জন্য ধান সংগ্রহ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে দশ হাজার সস্তা দরের দোকান আছে। এই সকল দোকানের মাধ্যমে প্রচুর চাউল সরবরাহ করা সত্ত্বেও দর স্থিতিশীল হয় নাই। এ বৎসরের প্রথম তিন মাসে চাউলের দর দাঁড়াইয়াছিল একুশ টাকায় এবং মে মাসে দর বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বাইশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা দাঁড়ায় বলিয়া খাদ্য বিভাগের হিসাবে জানানো হয়; অথচ গত বৎসর ঐ সময় চাউলের দর ছিল চব্বিশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা। হিসাব পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে গত বৎসর ও বর্তমান বৎসরের দরের মধ্যে এই যে পার্থক্য তাহা সমস্ত জেলায় সমানভাবে দেখা যায় নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যদিও পশ্চিমবঙ্গে চাউলের গড়পড়তা দর এখনও গত বৎসরের তুলনায় কম, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও খাদ্য পরিস্থিতি যাহাতে খারাপ না হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার বলিয়া বোর্ড মনে করেন।" (বসুমতী ৫-৬-৫৯) মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতিটি চাতুর্য-পূর্ণ। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এই বিবৃতিতে কোন তথ্যের উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, সরকারী পরিসংখ্যানের কারসাজিতে চালের মূল্য কম করেও দেখানো হয়েছিল। —"খাদ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার জন্য জনসাধারণই দায়ী"—এই ছিল মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহামূল্যবান আবিষ্কার (স্বাধীনতা ৪-৬-৫৯)। খাদ্য উপদেষ্টা কমিটির সভাতেও "অবস্থা সংকটজনক"—খাদ্য মন্ত্রীর এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিরোধী সদস্যরা প্রায় তিন মাস খাদ্য ও তার উপদেষ্টা কমিটি বয়কট করে দোসরা জুনের সভায় যোগ দেন। বোর্ডের নিকট তাঁদের প্রথম প্রস্তাব ছিল : চালকলগুলি থেকে উৎপন্ন চালের ২৫% নয়, ৫০% সংগৃহীত হোক; কিন্তু কংগ্রেসী সদস্য তথা মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা, তা করলে—"বাজার দর বৃদ্ধি পাইতে পারে।" দ্বিতীয় প্রস্তাব : মজুত ধান চাল সংগ্রহের জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হোক। কিন্তু সরকার পক্ষের ধারণা, "জেলাগুলিতে এইরূপ কমিটি সমস্যা সমাধানের খুব সহায়ক হইবে না।" সরকার পক্ষ কিন্তু "বিশেষ বিবেচনার যোগ্য" বলে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তা ছিল অকিঞ্চিৎকর। এক্ষেত্রে চালের বদলে গম ও গম-জাত দ্রব্য ব্যবহারে মানুষকে অধিক অভ্যস্ত করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। সোৎসাহে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "লোকে যদি বেশী গম খায় তাহা হইলে চাউলের দাম হয়ত কমিয়া যাইবে।"

বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে খাদ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রিসভা অগ্রসর হতে চাইছিলেন। অবিলম্বেই চলল সেই ভ্রান্ত নীতির ফল। "বিপর্যয়ের পটভূমিকা"। শীর্ষক সম্পাদকীয়তে "যুগান্তর" পত্রিকা লিখলেন—"সরকারের খাদ্যনীতিতে এবং খাদ্যনীতি পরিচালনা ব্যবস্থায় আত্মঘাতী ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য পশ্চিমবাংলা রাজ্যে আবার একটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের পটভূমিকা তৈয়ারী হইতেছে। ভিক্ষার আশায় কলিকাতার পথে পথে নিরন্ন চাষীর ও ভূমিহীন দিনমজুরের ভিড় ইহারই নিরন্ন চাষীর ও ভূমিহীন দিনমজুরের ভিড় ইহারই সুস্পষ্ট লক্ষণ। ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের প্রাক্কালেও এরকম দৃশ্য দেখা গিয়াছিল।" (যুগান্তর, ১০-৬-৫৯) গত শতাব্দীতে Famine Commission দুর্ভিক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

Any unusual or aimless wandering of men in search of food is a sure sign that famine has already begun. the wandering in masses or groups of people, who are not in the habit of migrating, is a certain sign that relief has been long delayed n the places form which they come.

অর্থাৎ যখন খাদ্যের অভাবে মানুষ স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায় তখন বুঝতে হবে যে দেশে দুর্ভিক্ষ এসেছে। ১৯৫৯ সালের জুন মাসের, মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতার রাজপথে দেখা যেতে লাগল এই চিত্র, এই বুভুক্ষু মানুষের ভিড়, তাদের করুন আর্তনাদ। বিশেষতঃ এই মিছিলের মধ্যে বেশী ছিল নিঃস্ব চব্বিশ পরগণার কয়েক হাজার মানুষ। চব্বিশ পরগণা জেলা কংগ্রেসের হিসাব মতে প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার মানুষ "অন্নের সন্ধানে" কলকাতামুখী। "দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে "বসুমতী" পত্রিকায় তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে দার্জিলিং প্রবাসী রাজমন্ত্রী মণ্ডলীর নীরবতাকে বিদ্ধ করা হল; "অন্নের সন্ধানে" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে "যুগান্তর" পত্রিকা সমবেদনার সঙ্গে মানুষের অসহায়তার চিত্র তুলে ধরলেন; "স্বাধীনতা" পত্রিকায় "অমার্জনীয় অপরাধ", "অন্য পথ নাই", "প্রতিরোধের ঝড় তুলুন" প্রভৃতি সম্পাদকীয়গুলির মধ্যে সরকারী নীতি ও প্রচেষ্টার অন্তঃসারশূন্যতার চিত্র তুলে ধরে মানুষকে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সামিল হবার আহ্বান জানানো হল। মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটিও সংঘটিত করছিলেন প্রচার। বিপর্যয়ের পটভূমিকা যেমন তৈরী হচ্ছিল তেমনি অন্যদিকে শহর, শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে মানুষের প্রতিবাদের ভাষা মুখর হয়ে উঠছিল। ঠিক এই কারণেই দার্জিলিং প্রবাসী মন্ত্রীদের মধ্যে দেখা দিল গভীর উদ্বেগ। তাড়াহুড়ো তাঁরা ফিরে এলেন কলকাতায়।

অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপর্যয়মুখীন খাদ্যনীতি কোন্ পথে, সংশোধিত হবে সে সম্বন্ধে জুন মাসের তেরোই তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংএ এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আহ্বান করলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি শ্রীবি বি ঘোষও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের আলোচনায় ঠিক হল : নূতন খাদ্যনীতিতে বন্টন ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হবে; স্বীকার করা হল —(ক) ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে চাল আটা অদৃশ্য পথে কালোবাজারে মজুত হয়, (খ) কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিমত সাহায্য করলেও অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি, (গ) চব্বিশ পরগণার মত বীরভূমের অবস্থাও সঙ্গীন। দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে রাজ্য সরকারের মুখপাত্রদের মতবিরোধ দেখা দিল, —"কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ এবং বন্টন ব্যবস্থা কতকটা শিথিল করিয়া দিয়া স্বাভাবিক বাণিজ্য ও কেনাবেচার পথ প্রস্তুত করার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।—অন্যদিকে রাজ্য সরকার এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে অসম্মতি দেখাইতেছেন। কারণ, তাঁহাদের মতে এখন এই নীতি পরিবর্তন ঘটাইলেই সরকারের দুর্বলতা তো দেখান হইবেই, চাউল ব্যবসায়ীদের নিকট উহা গভর্ণমেন্টের পরাজয়ের সামিল হইবে।" (যুগান্তর, ১৫-৬-৫৯)। কিন্তু এক এক করে পঞ্চম দিবসও অতিক্রান্ত হল। আলোচনা থেকে পৌঁছানো গেল না কোন সিদ্ধান্তে। খাদ্যমন্ত্রী উনিশে জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণের জন্য বড় বড় মজুতদারদের চাল মজুত করার ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। খোলা বাজারে চালের দাম কোন কোন জেলায় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি শ্রীবি বি ঘোষ গত ছয় দিন ধরে রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনার পর দিল্লী চলে গেছেন, তিনি রিপোর্ট পেশ করবেন এবং এরপর কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ঘোষিত হবে। শ্রীঘোষের রিপোর্টে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য প্রশাসন ব্যবস্থায় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল। যাই হোক, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে আরো আড়াই লক্ষ টন খাদ্য দানে সম্মত হলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাময়িকভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।—"১৯৫৯ সালের পয়লা জানুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গে ধান চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং চাউল কলগুলির উপর শতকরা পঁচিশ ভাগ লেভি আরোপ করিয়া যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা সাময়িকভাবে রদ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন, চাউল কলগুলি হইতে লেভি করিয়া এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী করিয়া সরকারের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ শস্যের সঞ্চয় গড়িয়া তোলা যায় নাই। তিনি বলেন, ইহা স্পষ্ট যে, সরকার ব্যাপকভিত্তিমূলকভাবে সামগ্রিক সংগ্রহ ও পুরাপুরি রেশনিং চালু না করিলে এই সব ব্যবস্থার দ্বারা খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে না।" (যুগান্তর, ২৩-৬-৫৯)। সরকারের তরফ থেকে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেওয়া হল। —"পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতিতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং কিছুকাল ধরিয়া সমগ্র বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। এখন তাঁহারা এই বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। অস্বাভাবিক অনাবৃষ্টির দরুণ এই বৎসর দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় নাই। বাস্তবিক এই বৎসর গত বৎসর অপেক্ষাও উৎপাদন হইয়াছে। বৎসরটি শুধু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে নহে, সমগ্র ভারতের পক্ষেই দুর্বৎসর।"

চমৎকার বিবৃতি। স্বীয় অক্ষমতার সমূহ দায় প্রকৃতির স্কন্ধে অর্পিত, যেহেতু মূক প্রকৃতি তো কখনো মুখর হবে না প্রতিবাদে মানুষের মতো। মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী নীতি সমালোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ নীতি ঘোষিত হবার ছয় মাস পরেই তা বাতিল করা হল কেন? এবং কোন্ অবস্থায় এই নিয়ন্ত্রণাদেশ বাতিল করা হল? বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু সেদিন এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন। শ্রীবসু বলেছিলেন যে, খাদ্যশস্য যখন মজুতদার ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা মজুত করে ফেলেছেন তখন অকস্মাৎ রাজ্য সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করলেন; এর দ্বারা মজুতদারদেরই সাহায্য করা হল। বলা বাহুল্য, বিধানসভা না ডেকে, বিরোধীদলের সঙ্গে আলোচনা না করেই একতরফা ভাবে সরকার পক্ষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

সেদিন কংগ্রেস দলের একাংশও কিন্তু কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভাতে খাদ্য প্রসঙ্গে সরকারী ব্যর্থতার উল্লেখ করে, খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। (যুগান্তর, ২৩-৬-৫৯)। (ক্রমশঃ)

'জনতার মুখ' পত্রিকার বর্ষপূর্তি উৎসব

(দর্পণের প্রতিনিধি)

শান্তিপুর, বারোই মার্চ : শান্তিপুরের প্রগতিশীল পাক্ষিক সংবাদপত্র "জনতার মুখ"-এর তৃতীয় বর্ষ-পূর্তি উৎসব গত নয়ই মার্চ রবিবার স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী হলে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় এই জনপ্রিয় পত্রিকাটির বর্ষ পূর্তি উৎসবে এখানকার সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে সংবাদপত্রের সমস্যা ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা সভার উদ্বোধন করে সাংবাদিকরা এখন বস্তুতপক্ষে মালিকের নির্দেশানুযায়ীই সংবাদ লেখেন ও রচনা করেন। স্বাধীন ও বিবেকবান সাংবাদিকদের এখন বৃহৎ সংবাদপত্রে চাকুরী রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শ্রীসেনগুপ্ত বলেন, আজ দেশব্যাপী এই চূড়ান্ত অবক্ষয়ের সময়ে সৎ ও রুচিসম্পন্ন পত্র পত্রিকাগুলির, বিশেষ করে ছোট ছোট পত্র-পত্রিকাগুলির উপর গুরু দায়িত্ব পালনের কর্তব্য এসে পড়েছে। ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলিকে এখন সত্য সংবাদ নির্ভীকভাবে প্রকাশ করে সঠিক পথে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে। সততার সঙ্গে জনস্বার্থ রক্ষার দায়িত্বও ছোট পত্রিকাগুলিকে নিতে হবে। "জনতার মুখ"-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীকামাখ্যা ভট্টাচার্যও সভায় বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে "জনতার মুখ"-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীশুভঙ্কর চক্রবর্তী রচিত "বিদ্রোহী চার্বাক" পূর্ণাঙ্গ নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীমিন্টু মুখার্জী।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস

৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৪১৯৪৩

জয়প্রকাশের মিছিলে নতুন শ্লোগান নতুন জোয়ার

● ● কপিল রায়

নতুনদিল্লী, তেরই মার্চ—গত ছয়ই মার্চ গণতন্ত্ররক্ষা ও দুর্নীতি দূরীকরণের দাবীতে রাজধানীর বুকে যে বিরাট গণ-মিছিল ও গণ-সমাবেশ হল তাতে যোগদানকারীর আনুমানিক সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মত পোষণ করছেন। এই আনুমানিক সংখ্যাটি এক থেকে পনের লাখের মধ্যে ওঠানামা করেছে। আনুমানিক সংখ্যাগত এই পার্থক্যটা ছিল মুখ্যত অভিমতদানকারী মহলগুলির মানসিক প্রবণতা, সহানুভূতি বা রাজনৈতিক যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। অই দিল্লীর প্রশাসনিক মহলের মতে এই সংখ্যা ছিল এক লাখের কিছু বেশি আর্যর জনসংঘের সর্বভারতীয় সংগঠক সম্পাদক শ্রীনানাজী দেশমুখের মতে এই জনসমাবেশে পনের লাখ নরনারী উপস্থিত ছিলেন। পি টি আই বললেন পাঁচ লাখ, ইউ এন আই তিন লাখ, পেট্রিয়ট বললেন এক লাখের কম। সেদিন কেন্দ্রীয় আড্ডাখানায় অনেকেই এই জনসমাবেশ সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে মন্তব্য করলেন হাসতে হাসতে ঃ "আরে ভাই সঠিক সংখ্যা জানতে গেলে প্রথমে সি পি আই সমর্থক ছাগজ পেট্রিয়টে প্রদত্ত সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে গুন করে নাও আর জনসংঘের কাগজ মাদারল্যাণ্ডের দেওয়া সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করো। তারপর সেই গুণফল ও ভাগফলকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করো। এবারে যে সংখ্যাটা মিলবে সেটাই হবে সঠিক সংখ্যা।"

পথের একটি বিশিষ্ট বিন্দুকে অতিক্রম করতে এই মিছিলটির মোট একশ দশ মিনিট লেগেছিল আর মিনিটে গড়ে ষাটটি পংক্তি ঐ বিন্দু অতিক্রম করেছিল। আবার পংক্তি প্রতি কোথাও কুড়ি জন ছিল কোথাও বা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন ছিল। তাই পংক্তিপ্রতি গড়ে কুড়িজন মিছিলকারী ধরলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে শ্রীজয়প্রকাশের নেতৃত্বাধীন সেদিনের মিছিলে এক লাখ কত্রিশ হাজার লোক ছিলেন। তবে জনসমাবেশে তার অনেক বেশি কয়েকলাখ সংখ্যক নরনারী যোগদান করেছিলেন।

সংসদভবনের কাছে মিছিল নিয়ে এসে নিজেদের মতামত পেশ করবার রেওয়াজটি শুরু হয়েছিল যত দূর মনে পড়ে উনিশশো তেষট্টি সনে। নেহরু সরকারকে সমর্থন জানাবার জন্য ঐ বছরের তেরই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের নেতৃত্বাধীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি (বর্তমানে যাঁদের নিয়ে সি পি আই এম গঠিত অধিকাংশই বিশেষ করে নেতারা তখন নেহরু সরকারের কারাগারে বন্দী ছিলেন) প্রথম এ ধরণের মিছিল সংগঠিত করেছিলেন রাজধানীর বুকে, সেই প্রথম বিভিন্ন রাজ্য থেকে মিছিল করবার জন্যই যোগদানকারী এসেছিলেন। সেদিন মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন প্রায় সাড়ে চৌত্রিশ হাজার নরনারী। মোট উনউনসত্তর শ সাতটি পংক্তি ছিল সেদিনের মিছিলে আর প্রতিটি পংক্তিতে ছিল পাঁচ জন করে মিছিলকারী। পরের দিন শুধু পেট্রিয়টেই নয় আরও অনেক কাগজে মিছিলকারীর সংখ্যা আড়াই থেকে তিন লাখ লেখা হয়েছিল। সেই মিছিলের নাম দিয়েছিলেন সি পি আই গ্রেট মার্চ বা মহামিছিল।

১৯৬৬ সনে এধরণের আর একটি মিছিল করেছিলেন সি পি আই আর তার নামকরণ করা হয়েছিল পিপল্‌স্ মার্চ বা গণমিছিল। আগেরবারের মত এবারেও (১৯৬৬ সনের পয়লা সেপ্টেম্বর) মিছিলকারীরা এসেছিলেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে। প্রতি পংক্তিতে চারজন করে মিছিলকারীর এই মিছিলটি তার যাত্রাপথের একটি বিশেষ বিন্দুকে অতিক্রম করতে মোট নব্বুই মিনিট সময় নিয়েছিল। জনসংখ্যার দিক থেকে এই মিছিলটি তার পূর্বগামী সি পি আই আয়োজিত মিছিল অপেক্ষা ছোট ছিল। তবে কয়েক বছর পরে ১৯৭৩ সনের সাতাইশে মার্চ তারা আবারও একটি মিছিল করলেন গ্রেট পিটিশন বা মহা-আবেদন পেশ করবার জন্য। কিন্তু কোনবারই খাস মিছিলে তাঁদের শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন মিছিলের মত এত লোক ছিল না। অবশ্য কয়েক বছর আগে চণ্ডীগড় দাবি করে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলাল এখানে যে জনসমাবেশ করেছিলেন তার জনসংখ্যাকে এ অবধি আর কোন সমাবেশই অতিক্রম করতে পারে নি বলে এখানকার পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

সি পি আইয়ের আয়োজিত মিছিলাদির সঙ্গে এবারের মিছিলের একটি মৌলিক পার্থক্যও অনস্বীকার্য। সি পি আইয়ের মিছিলাদি ছিল সরকারের সমর্থনে এবং সমর্থিত। এবারের মিছিল ও সমাবেশ ছিল সরকারবিরোধী। তাই সরকারের কোন সমর্থন তো উদ্যোক্তারা পানই নি উপরন্তু তাঁদের আয়োজনকে ব্যাহত করবার সরকারী প্রয়াসেরও অন্ত ছিল না বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে যে হরিয়াণা পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের লোকজন যাতে দিল্লী আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন; তা ছাড়া বিভিন্ন বিন্দুতে কয়েক দিন আগে থেকেই বাসযাত্রীদের দিল্লী আসা বন্ধ করা হয়েছিল। এমন কি ট্রাক চলাচলের ওপরেও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল যাতে ঐ সব রাজ্যের দিল্লী নিকটবর্তী এলাকা থেকে বেশিমাত্রায় জনসাধারণ না আসতে পারেন। দিল্লীর সরকারী পরিবহণ সেদিন তাদের মোট বাস সংখ্যার শতকরা মাত্র ছাব্বিশ খানিকে চালু রেখেছিলেন। দিল্লী পরিবহণ দৈনিক বারশ খানি বাস চালিয়ে থাকেন কিন্তু শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের মিছিলের দিনে মাত্র ৩৩৬ খানি বাস পথে ছেড়েছিলেন তাঁরা।

এবারের মিছিলে ওঠা শ্লোগানের বৈশিষ্ট্যও অনেকেরই কানে ধরা পড়েছে। প্রখ্যাত হিন্দী কবি রামধারী সিংহ "দিনকর"-এর যে বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি দুইটি গত বছরের বিহার মিছিলের (আঠারই মার্চ) মুখ্য শ্লোগান ছিল সেই "সিংহাসন খালি করো, জনতা আতি হ্যায়" শ্লোগানটিই এবারের এই দিল্লী মিছিলেরও বিশিষ্ট শ্লোগান ছিল। অন্যান্য যে সব শ্লোগান সেদিন এই মিছিলকারীদের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল তার মধ্যে "ভ্রষ্টাচার মিটানা হ্যায়, নয়া জামানা লানা হ্যায়" (ভ্রষ্টাচার শেষ করতে হবে নতুন যুগ আনতে হবে), "ইন্দিরাবাণীকো বন্দ করো, আকাশবাণীকো শুদ্ধ করো" (ইন্দিরাজীকে বন্ধ করো আর আকাশবাণীকে শুদ্ধ করো), বিহার থেকে আসা জনতার মুখ্য শ্লোগান ছিল—"পুলিশ হামারা ভাই হ্যায়, উনসে নহী লরাই হ্যায়" (পুলিশ আমার ভাই তার সঙ্গে লড়াই নাই), গুজরাতী মিছিলকারীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—"আধ কিলো যে রাশন দে, বে সরকার নিস্কর্মা হে" (আধ কিলো যে রাশন দেয়, সে সরকার নিস্কর্মা হয়), রাজস্থানীরা ধ্বনি তুললেন, "আ পৌহচা হ্যায় রাজস্থান, ইন্দিরা গান্ধী সাবধান" (এসেছে রাজস্থান, ইন্দিরা গান্ধী সাবধান), দেশভক্তিমূলক গান গাইতে গাইতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা মিছিলকারীরা শ্লোগান তুললেন—"সাচ্ কহনা অগর বাগাবৎ হ্যায়তো সমঝো হাম ভী বাগী হ্যায়" (সত্য কথা বিদ্রোহ হলে আমরা সবাই বিদ্রোহী), কেরালা দলের গলায় ধ্বনিত হল—"লুটওয়ালা খায়েগা, কামানেবালা খায়েগা" (লুটেরা যাবে কর্মীরা খাবে), মধ্যপ্রদেশের দলের মুখে আওয়াজ "ভূষা মিলতা রাশন মে, আগ লাগে তেরা শাসন মে" (জঞ্জাল রাশনে, আগুন তোর শাসনে) পাঞ্জাবীদের গলায় শোনা গেল—"চোরা দি সরকার, মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ" (চোরদের সরকার, নিপাত যাক, নিপাত যাক)। হরিয়াণভীরা গেয়ে উঠলা—'মজদুরোঁ কে আহ্ সুনানে হম সংসদ পর আয়ে হ্যায়" (শোনাতে মজুরের হাহুতাশ এসেছি আজ সংসদপাশ), হিমাচলীরা যেন প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে বললেন—"সুনা লো ও দিল্লী কি রানী, নহী চলেগী অব মনমানী (শোনো ওগো দিল্লী রানী, চলবে না আর মনগড়ানী), উত্তরপ্রদেশের মোর্চার গলায় গলায় ধ্বনিত হল—"ইন্দিরা সঞ্জয় ঔর মাস্তান, লুঠ রহে হ্যায় হিন্দুস্তান" (ইন্দিরা, সঞ্জয় আর মাস্তান, লুটে খায় হিন্দুস্তান)। কিন্তু ছাত্রদের কণ্ঠে শোনা গেল—"বেকারী আদি নহী রুকী তো, খুন বহেগা সাদকোঁ পর" (বেকারী আদি বন্ধ না হয়, রক্তগঙ্গা অবশ্য বয়)।

এই শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল মিছিলের পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার অনেকেই গত নয়ই আগস্ট যুব-কংগ্রেসের আয়োজিত মিছিলে যোগদানকারীদের নানাবিধ দুষ্কর্মের কথা নতুন করে মনে করছেন।

রাজধানী দর্পণ

পর্তুগালে প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

পর্তুগালের সতর্ক বামপন্থী শক্তির সজাগ থাকার ফলে পর্তুগালের প্রতিক্রিয়াশীলদের সাম্প্রতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, প্রতিক্রিয়াপন্থীদের নায়ক জেনারেল স্পিনোলা সপরিবারে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে পালিয়ে গেছে। তবে, গত বছর এপ্রিল মাস থেকে পর্তুগালে যে প্রগতিশীল হাওয়া বইতে শুরু করেছে তাকে উল্টোখাতে বইয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে পর্তুগালে ফ্যাসিস্ত সালাজারের শাসন চলছিল। সালাজারপন্থী কায়েতানো ছিল পর্তুগালের শাসন ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রতিনিধি। এই দীর্ঘকাল ধরে কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতন্ত্রীদল ছিল বে-আইনী। আর পর্তুগাল ন্যাটোর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে আফ্রিকায়, মোজাম্বিক, গিনি-বিসাউ ও আঙ্গোলায় বর্বর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। পর্তুগালের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক ধরে সংশিলষ্ট "পর্তুগীজ আফ্রিকা"র মানুষ সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গতবছর মোজাম্বিক, গিনি-বিসাউ, আঙ্গোলার মুক্তি সংগ্রাম বেশ কিছু বিজয়তিলক ধারণ করে। গিনি-বিসাউ-এ স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। আঙ্গোলার প্রায় মুক্ত। মোজাম্বিকের অবস্থাও অনুরূপ। অন্যদিকে, গোপন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে খাস পর্তুগালে মাঝে মাঝে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকদের ছোট ছোট বিক্ষোভ ফেটে পড়ে।

অন্যদিকে, কায়েতানোর ফ্যাসিস্ত শাসনে পর্তুগালের অর্থনীতি প্রায় দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম। দেশে সাম্রাজ্যবাদী ন্যাটো গোষ্ঠীর অন্য দেশগুলির কাছে প্রায় বন্ধক দেবার উপক্রম। জীবনযাত্রার মান ক্রমেই নীচের দিকে নামছে, অনাহার, অর্ধাহারে সমস্ত জাতি প্রায় সর্বনাশের পথে যাচ্ছিল। ক্রমে চাপা বিক্ষোভ সৈনাবাহিনীর মধ্যে দেখা গেল। এবং তারই ফলশ্রুতিতে গত বছর কায়েতানোর অপসারণ করে নতুন একটি সরকার গঠন এবং যে সরকারে ছিল কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক দল ও সংস্থা। তখন অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে স্পিনোলা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি। কিন্তু যেহেতু স্পিনোলাকে কেন্দ্র করে আর পর্তুগালে প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হচ্ছিল, তাই কয়েকমাস পূর্বে স্পিনোলাকে সরানো হয় গত সেপ্টেম্বরে। এবং মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন হয়। বর্তমান গণঅভ্যুত্থানের সরকারকে সরানোর ষড়যন্ত্র তখন থেকেই চলতে থাকে। এবং অরই ফলশ্রুতি হিসেবে এগারই মার্চ সামান্য কিছু অফিসার (বিমান বাহিনীর) লিসবনে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু সুখের কথা, তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গত বছর এপ্রিল মাসে ব্রিগেডিয়ার অতেললো সারাইভা কারভলের নেতৃত্বে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পর্তুগালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিগেডিয়ার কারভালো সম্প্রতি বলেছেন, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য, পর্তুগালের সজাগ বামপন্থী মানুষ বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে হাজারে হাজারে রাস্তায় নেমে পড়েছেন। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে-শহরে বামপন্থী মানুষ, বিশেষ করে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছেন। তাদের এই বিক্ষোভ মিছিলে হাজারে হাজারে অস্ত্রহাতে সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিদের দেখা যাচ্ছে। চিলিতে যে ভুল, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা করেছিল এখানে সেটি হতে ওরা দেবে না।

কারণ পর্তুগালের বর্তমান সরকার পর্তুগালের মেহনতী মানুষের সরকার। এ সরকার কমিউনিস্ট-সমাজতন্ত্রী ও প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সরকার যারা পর্তুগালে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে সুষ্ঠু ভূমিবন্টন হয়েছে, কৃষকদের মধ্যে গড়ে উঠছে সমবায়, সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ভিত্তিতে। বর্তমান পর্তুগাল সরকার মোজাম্বিক আঙ্গোলা, গিনি বিসাউর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। শহরে শহরে কারখানার মজুরদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় দীক্ষিত করা হচ্ছে। যেটা সবচেয়ে প্রশংসনীয় তা হল, পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি কখনো দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেনি, বে-আইনী অবস্থায় সৈন্য ব্যারাক থেকে শুরু করে কারখানার মজুর মহল্লায় বোঝান বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছে।

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

নকশাল আন্দোলন ও ভ্রান্তদর্শী শঙ্কর ঘোষ

(গ্রন্থ সমালোচক)

ভারতের রাজনীতির অভিধানে "নকশালবাড়ী" এক নতুন সংযোজন। এই নাম আজ আর দার্জিলিং জেলার নিছক একটি ছোট্ট থানা এলাকার নাম নয়, এ নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক বিশেষ রাজনীতি। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই বিশেষ রাজনীতি কিছু নতুন নয়। ভারতের জাতীয় মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান স্তরে এ রাজনীতি বহুবারই সামনে আসতে চেয়েছে। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমাজবাদী চেতনার আবির্ভাব এবং ক্রমে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার মধ্যে তার পরিণতি লাভ—এই সময় থেকেই এ রাজনীতির সূচনা বলা যায়। এই রাজনীতির রণনীতিগত মূল কথা হল, (এক) ভারতবর্ষের সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামো এমন এক অবস্থায় আটকা পড়ে আছে, যেখানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া সাধারণ মেহনতী মানুষের বাঁচার আর কোন রাস্তা নেই; (দুই) এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আশু স্তর সমাজতান্ত্রিক নয়, জনগণতান্ত্রিক; (তিন) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের জোয়াল থেকে মুক্তি এবং এই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য কৃষি বিপ্লব; (চার) এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি; (পাঁচ) এই বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান শক্তি কৃষক; (ছয়) শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সমস্ত মেহনতী শ্রেণী এবং এমন কি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর এক ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট এই বিপ্লব সফল করার অন্যতম শর্ত।

এরপর রণকৌশলের প্রশ্ন। রণকৌশলের যে মূল কথা ছাড়া রণনীতি অর্থহীন হয়ে পড়ে তা হল, (এক) যে কোনরকম সামাজিক বিপ্লব সমাধা করার একটা মূল প্রশ্ন রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন; (দুই) নির্বাচনের মাধ্যমে শোষক শ্রেণী সৃষ্ট রাষ্ট্র কাঠামোর স্থান গ্রহণ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায় না, অতএব সমাজের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনও সাধন করা যায় না; (তিন) সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন রাষ্ট্রযন্ত্রকে চুরমার করে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শোষিত শ্রেণীগুলোর নিজ রাষ্ট্রশক্তি গড়ে তুলতে পারলে তবেই শোষিত শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল সমাজবিপ্লব সম্পন্ন করা যায়।

ভারতীয় বিপ্লবের রণনীতি এবং রণকৌশলগত উপযুক্ত মূল কথাগুলো প্রথম "ড্রাফট প্ল্যাটফর্ম অব এ্যাকশন" নামক দলিলে স্থান পায়। এই দলিল উনিশশো তিরিশ সালে প্রকাশিত হয় যুগপৎ প্রাভদা, ডেইলী ওয়ার্কার এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইমপ্রেকার পত্রিকায়। এই দলিলকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রোগ্রাম বলা হয়। এরপর থেকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে বারে বারেই এই মূল প্রশ্নগুলো উঠেছে, বিকের ঝড় বয়ে গেছে, কমিউনিস্ট পার্টিতে আভ্যন্তরীণ বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বরাবরই দুটো লাইনের মধ্যে লড়াই চলে এসেছে কোন না কোন ভাবে। যদিও এই লাইনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সুবিধাবাদী সমঝোওতাও হয়ে গেছে বারে বারেই। এই দুই লাইন হল মূলতঃ বুর্জোয়া সংস্কারবাদী লাইন এবং মার্কসীয় বিপ্লবী লাইন।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি কার্যতঃ পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে এক পেটিবুর্জোয়া সংগঠন হয়ে থাকার ফলে কোন দিনই মার্কসীয় বিপ্লবী লাইনটি নিজেকে সার্থকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। এ ঘটনা যেমন সত্য, তেমনি বাস্তব সত্য এটাও যে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই দুই লাইনের মধ্যেকার লড়াই কোন দিনই একেবারে মরে যায় নি। দ্বিতীয়ত এ লড়াই শুধু মতাদর্শগত বিতর্ক বা বিরোধের মধ্যেই যে নিছক সীমাবদ্ধ রয়েছে তাও ঘটনা নয়। সংগ্রামের ময়দানেই এ লড়াই মূর্ত হয়ে উঠেছে অতীতেও। যত স্বল্পকালের জন্যই হোক বিপ্লবী লাইন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়েছে, নিজের পথ করে নিতে চেয়েছে। উনিশশো ছেচল্লিশ থেকে একান্ন সালের মধ্যে ময়মনসিং-এর হাজং এলাকা, চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপ এলাকা এবং হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা এলাকায় বিপ্লবী রাজনীতির শুধু মূর্ত প্রকাশই নয়, তার সমুজ্জ্বল বিকাশও ঘটেছিল। সেদিনের সেই সংগ্রামের অপমৃত্যু ঘটলেও তার পেছনের রাজনীতির চরম মৃত্যু ঘটেনি। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগ হয়ে যাওয়ার আশু বা প্রত্যক্ষ কারণ যাই হোক, দুটো লাইনের লড়াইয়ে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। তেমনি হাল আমলের নকশালবাড়ী আন্দোলন বা তৃতীয় এক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

কাজেই ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তৃত ঐতিহাসিক পটভূমিকে একেবারে পাশ কাটিয়ে এগোতে গেলে নতুন করে গড়ে ওঠা কোনো কমিউনিস্ট পার্টি বা সে পার্টি পরিচালিত বিপ্লব প্রচেষ্টার মর্ম কিছুই উপলব্ধি করা যাবে না। শুধু এই নয়, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পর থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে বিতর্ক, যে দ্বন্দ্ব এবং যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে যার ঢেউয়ের আঘাত আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকেও টলিয়ে দিয়েছে এবং সমগ্র মতাদর্শের সংগ্রামের ক্ষেত্রটিকে তীব্রতর করে তুলেছে তাকেও দৃষ্টিসীমায় রাখতে হবে যদি নতুন করে গড়ে ওঠা কোনো কমিউনিস্ট পার্টির বা নতুন কোনো বিপ্লব প্রচেষ্টার সঠিক মূল্যায়ন করতে হয়।

নকশালবাড়ীর সংগ্রাম, নকশালবাড়ী রাজনীতি, বা সি পি আই (এম এল) প্রতিষ্ঠা—এর কোনো কিছুই ইতিহাস নিরপেক্ষ আকস্মিক ঘটনাও নয় বা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো এক বা কতিপয় ব্যক্তির স্বাধীন স্বতন্ত্র বিপ্লবী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিও নয়। অথচ ঠিক এমনি একটি দৃষ্টিকোণ থেকে নকশালবাড়ীকে বোঝার চেষ্টাই বহুলমাত্রিক। হালে "দি নকশালাইট মুভমেন্ট" নামের এক বইতে সাংবাদিক শংকর ঘোষ এমন এক প্রচেষ্টারই স্বাক্ষর রেখেছেন। অবশ্য এও বোধহয় ঠিক বলা হল না, কারণ বইটি আদ্যোপান্ত পড়লে মনে হয় শংকরবাবু কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই নকশালবাদী আন্দোলনকে ঠিক বুঝতে চাননি, পাঠককেও বোঝাতে চাননি। এই জন্যই দেখি সমগ্র বই জুড়ে তিনি কতগুলো ঘটনাকে পর পর শুধু সাজিয়ে গেছেন। এক কথায়, তাঁর বইটি ঘটনাবলীর একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা। অনুসন্ধান নয়, বিশ্লেষণ নয়; অনুধাবনের কোনো প্রচেষ্টা নয়, শুধুই ঘটনাপঞ্জী—তাও নির্ভুল নয়। শংকরবাবু ভূমিকায় বলেছেন যে তাঁর ভূমিকায় কিছু ফাঁক থেকে যেতে পারে যা পূরণ করা তাঁর সাধ্যাতীত। কিন্তু তিনি এটা কেন উপলব্ধি করলেন না যে বইয়ের মালমশলা সংগ্রহে তিনি যে সব উৎস ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর বিবরণে অজস্র ভুল বা বিকৃতি থেকে যাওয়াও নিতান্তই স্বাভাবিক। উল্টে, তাঁর উল্লিখিত ঘটনাবলীর বিবরণ তিনি এমনভাবে দাখিল করেছেন যেন সে সবই সংশয়াতীত সত্য।

বইয়ের সূচনাতেই নকশালবাড়ী আন্দোলনের তাৎপর্য উল্লেখ করতে গিয়ে শংকরবাবু একে আমাদের দেশে মাও চিন্তাধারার প্রথম বাস্তব প্রয়োগ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ".....It (Naxalbari) represents the first experiment with Maoism in this country." কিছু পৃষ্ঠা পরে সেই তিনিই আবার লিখছেন, "....Nor was it (Naxalbari) the first experiment with Maoism in this country." মনে হয় এতবড় স্ববিরোধিতার অন্যতম কারণ শংকরবাবু মাও চিন্তাধারার আলোকে কোনোটাকেই বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা না করে সি পি (এম এল) এবং চারু মজুমদারের ঘোষণাবাণীকে মূলধন করেই মূল্যায়ণে এগিয়েছেন, এই কারণেই তেলেঙ্গানা এবং নকশালবাড়ীর মধ্যে যে পার্থক্য শংকরবাবু টানতে গিয়েছেন তা নেহাতই ছেলেমানুষি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পুস্তক সমীক্ষা

সি পি (এম এল)-এর গোপন পত্র পত্রিকা বা দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করতে যে পরিশ্রম শংকরবাবু করেছেন তার এক সামান্য অংশ কষ্ট স্বীকার করে শংকরবাবু যদি মাও চিন্তাধারার সারমর্ম এবং নকশালবাড়ীর সূচনা পর্বে তার পেছনের রাজনীতিকে বুঝতে চেষ্টা করতেন তবে তাঁর কাছে এ সত্য ধরা না পড়ে পারত না যে তেলেঙ্গানা এবং নকশালবাড়ী একই রাজনীতিকে সামনে তুলে ধরেছে। আসলে চারু মজুমদারের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বাধীনে নকশালবাড়ী রাজনীতি যে মোড় নিয়েছিল, সূচনায় উপস্থাপিত নকশালবাড়ী রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, মাও চিন্তাধারার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ত বাস্তবে ছিলই না। কবে কীভাবে চারু মজুমদার নিজের এমন অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তুলতে পেরেছিলেন সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক এইটুকুই যে, সূচনায় নকশালবাড়ীর রাজনীতিগত ভিত ছিল মাও চিন্তাধারা, কিন্তু সি পি (এম এল) পরিণত হয়েছিল এমন এক সংগঠনে যার রাজনৈতিক ভিত মাও চিন্তা ধারার বিরোধী। মাও চিন্তাধারা কিছুমাত্র উপলব্ধি করার চেষ্টা না করেই শংকরবাবু লিখেছেন, 'Mazumdar' loyalty? to Maoism cannot be doubled কারণ হিসাবে তিনি বলতে চেয়েছেন, "His writing are full of quotations from Mao." শংকরবাবুর মত একজন বিচক্ষণ সাংবাদিক কী করে এটা ভাবতে পারলেন যে কারও নামে মুখে শপথ গ্রহণ করা বা লেখাপত্রে তার উদ্ধৃতি দাখিল করাই তাঁর প্রতি একের আনুগত্যের বড় প্রমাণ, অথচ মাওবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে শংকরবাবু দেখতে পেতেন যে বিপ্লবের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চারু মজুমদার মাও-এর নামে শপথ নিয়েই মাও চিন্তাধারার বিরোধিতা করে গেছেন।

সি পি (এম এল) বা চারু মজুমদারের অনুসৃত রণকৌশলগুলো যে মাও চিন্তাধারার ভিত্তিতেই, এর আরও প্রমাণস্বরূপ শংকরবাবু অনেক কষ্ট স্বীকার করে চীন পার্টির স্বীকৃতি এবং সমর্থনের একরাশ নজীর উপস্থিত করেছেন। এখানেও তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল যে, চীনের পার্টির কোনো এক নেতৃত্বের বক্তব্য বা চীন পার্টির কোনো এক সময়ের প্রচার মাও চিন্তাধারার সঙ্গে সমার্থক নয়, তাছাড়া নকশালবাড়ীর ঠিক আগে আগেই চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যখন এ সত্য মূর্ত হয়ে উঠেছিল যে চীনা পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব জোরালোভাবেই উপস্থিত রয়েছে, তখন এও বোঝা উচিত ছিল চীনা পার্টির প্রচারযন্ত্রের সমস্ত বক্তব্য এমন কি সমগ্র পার্টির বক্তব্য নাও হতে পারে।

শংকরবাবুর বই পড়ে মাও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়হীন পাঠকের মাওবাদ সম্পর্কে ভুল এবং বিকৃত ধারণার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক শুধু তাই নয়, সমাজবিপ্লবের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজবিপ্লবের সম্বন্ধের প্রশ্ন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নকে এড়িয়ে চললে বা এই প্রশ্নের মীমাংসায় কোন রকম যান্ত্রিকতার আশ্রয় গ্রহণ করলে দক্ষিণ বা বাম সুবিধাবাদের জন্ম অবশ্যম্ভাবী। এই আন্তঃসম্বন্ধের প্রশ্নে চারু মজুমদার এক বিরাট ফাঁক সৃষ্টি করেছিলেন, নকশালবাড়ীর সংগ্রাম শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। অন্য কোনো কিছুর জন্য সংগ্রাম নয়, এমন স্লোগানের আড়ালে তিনি সমাজবিপ্লব এবং রাষ্ট্রকে পরস্পর নিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসাবে উপস্থিত করতে গিয়েছেন বারে বারেই। তাঁর অনুসৃত উগ্র বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের মূলে এটি অন্তর্নিহিত জোরালো ভাবেই কাজ করে গেছে। চারু মজুমদারের দৃষ্টিভঙ্গীর এই যান্ত্রিকতা শংকরবাবু ধরতে ত সক্ষম হনইনি, উল্টে তিনি নিজেও সমাজবিপ্লব এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইকে একাধিক জায়গায় পরস্পরের বিকল্প হিসাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। আসলে শংকরবাবু নিজের অজ্ঞাতসারেই চারু মজুমদারের কতগুলো সংকীর্ণ চিন্তাধারার শিকার করে তুলেছেন নিজেকে। এই কারণেই বোধ হয় কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে এগোন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

প্রসঙ্গ বাড়িয়ে লাভ নেই। এ বই সম্পর্কে নির্দ্বিধায় একথা বলা চলে যে রাজনীতির কোন অনুসন্ধানী ছাত্র এ বই থেকে খুব একটা উপকৃত হতে পারবেন না। কৌতূহলী সাধারণ পাঠকও নকশালবাড়ী আন্দোলনের পেছনের রাজনীতির সঠিক পূর্বাঙ্গ চিত্রটির কোনই হদিশ পাবেন না। পুরনো কিছু দলিলপত্র একসঙ্গে একত্রে পাওয়ার যে মূল্য তা কিছুটা হয়ত সাধিত হতে পারত বইটি দিয়ে। কিন্তু এখানেও একটা বড় রকমের ফাঁক শংকরবাবু রেখে গেছেন, কিছু মূল্যবান দলিলের শুধুমাত্র উল্লেখই তিনি করেছেন বা যেগুলো থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি কোথাও কোথাও দাখিল করেছেন। প্রয়োজন ছিল এমন সব দলিলের পূর্বাঙ্গ বয়ান বইটিতে সংযোজিত হওয়া।

নকশালবাড়ী আন্দোলন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গুরুত্ব আরও বেড়েছে এই জন্য যে এক বিশেষ নেতৃত্বের পরিচালনাধীনে নকশালবাড়ীর রাজনীতি বিকৃত রূপ ধারণ করলেও এবং বাস্তব সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও, নকশালবাড়ীর পেছনের প্রকৃত বিপ্লবী রাজনীতির মৃত্যু হয় নি। এ রাজনীতি নিত্য নতুন করে তার সৈনিক সৃষ্টি করে চলেছে তা সে যত নিঃশব্দেই হোক।

সত্যসত

ক্যান্সার প্রসংগে

শুক্রবার সাতই মার্চ দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত "ক্যান্সার সারছে ?" শীর্ষক নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত নিবন্ধটি পড়ে আনন্দ পেলাম। দুঃখের কথা সামান্য কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে গেছে প্রদত্ত রিপোর্টের মধ্যে। নিবন্ধটিতে একান্ত ভ্রমবশতই বর্ণিত হয়েছে —"সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রীও এই স্বামীজীর চিকিৎসায় উপকৃত হয়েছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়কে এক পত্রে এই স্বামীজীর পরীক্ষায় সরকারী সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।"

আমরা স্বামীজীর মুখ থেকে জানতে পারি যে প্রকৃতপক্ষে বাস্তব সত্য কিন্তু তা নয়। স্বামীজীকে যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য বাস্তবিকই সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেই সিদ্ধার্থশংকর রায়কে সবিস্তারে একটি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন তেয়াত্তর সালে। যদিও আমাদের দুর্ভাগ্য সে অনুরোধ পত্রের উত্তর এখনো পাওয়া গেল না। সেই পত্রে বিস্তারিত ভাবে স্বামীজীর পরিচয় ও তাঁর ভবিষ্যত কর্মপন্থার পরিকল্পনা সম্পর্কে লেখা ছিল। কিন্তু তেয়াত্তর সালের এই অনুরোধ পত্র লেখার আগে যখন জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন তখনো স্বামীজীর ক্যান্সার নিয়ে গবেষণার কাজ পরিপূর্ণ ভাবে শেষ হয় নি। তখনো প্রায় মাসখানেক বাকি ছিল। তাই তিনি জয়প্রকাশের স্ত্রীর রোগমুক্তিতে কোনরূপ সাহায্যে আসতে পারেন নি। প্রায় মাসখানেক পরে আপন স্ত্রী বিয়োগের পরে জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন শুনলেন স্বামীজী ক্যান্সার রুগীকে সারিয়ে তুলতে পরিপূর্ণ সক্ষম এবং তিনি স্বয়ং কলকাতায় থেকে এই দুরারোগ রোগ থেকে রুগীদের বাঁচিয়ে তুলতে চান, তখনই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করে উল্লিখিত চিঠিটি লেখেন।

নিবন্ধটির শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে "ক্যান্সার বা যে কোন দুরারোগ্য রুগী চাই" বলে। কিন্তু স্বামীজীর মতে অন্য রোগের নিরাময়ের কিছু না কিছু উপায় তবু আছে কিন্তু সমগ্র বিশ্বে ক্যান্সার রোগের ওষুধ এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি যখন, সে ক্ষেত্রে রোগাতুর যন্ত্রণাকাতর জনগণের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্খী হিসাবে বর্তমানে উচিত হবে শুধুমাত্র ক্যান্সার রুগীদেরই রোগমুক্ত করে তোলা।

অমূল্য সিংহ
বার্ণপুর

অভিনব পরীক্ষা

বার্ণপুর বয়েজ স্কুল সেন্টারে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা চলিতেছে, এমন পরীক্ষা আমার ষাট বছরের জীবনে কখনও দেখি নাই, গণ-টোকাটুকির কথা ছাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু এক ডজন মস্তানের যাহারা অতি অল্পদিন প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজ নাম ঠিকনাও ভালভাবে লিখিতে পারেন না তাঁহাদের উত্তরপত্র দোকানে বসিয়া অভিজ্ঞরা লিখিয়া দিতেছেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহা দাখিল হইতেছে। কেহ দেখিবার নাই। খাতার হাতের লেখা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

বিশ্বনাথ বসু
বার্ণপুর

র‍্যালিস ইণ্ডিয়ার দশজন কর্মী গ্রেপ্তার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি র‍্যালিস ইণ্ডিয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার সহকারী আঞ্চলিক ম্যানেজার শ্রীএ কে আলুওয়ালিয়া গৌহাটী অফিস পরিদর্শনে গেলে আসাম মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ এসোসিয়েশন ও র‍্যালিস ইণ্ডিয়ার গৌহাটিস্থিত মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভরা সম্মিলিতভাবে কোম্পানীর শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মিঃ আলুওয়ালিয়া বিক্ষোভকারী দশজন কর্মীকে পুলিশের হাতে তুলে দেন এবং গ্রেপ্তারের খবরে গৌহাটীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়াও কর্তৃপক্ষ র‍্যালিস ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীএস এন ঘোষকে কলকাতা থেকে ওড়িশায় বদলী করে আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়ার অনবদ্য নজীর এই বদলী।

কলেজে ভর্তির জন্য ঘুষ নেবার অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজে দুর্নীতির শেষ নেই। গত বছর ঐ কলেজে ছাত্র ভর্তির সময় শত শত টাকা ঘুষ নেওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের দপ্তরে হুমকী দেওয়া হয়েছিল। এ বছরও সেই একই অবস্থা চলছে। মধ্য কলকাতার যুব নেতা মৃণাল রায় ঐ কলেজের ছাত্র পরিষদের নেতা। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ দিন ঘোষণা করা হয়েছে ৩১শে মার্চ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন কথা বলছেন না। ল কলেজের লাইব্রেরীতে কয়েক হাজার দামী দামী বই পোকায় কাটছে। ভর্তি শুরু না হতেই এখন থেকেই আগাম টাকা নেওয়া চলছে। পূজার নামে যে চাঁদা নেওয়া হয়েছিল তার হিসাব নেই। ল কলেজের পত্রিকা প্রকাশ হয়নি কেন এই প্রশ্ন তুলেছেন যুব সংগ্রাম কমিটির জনৈক

মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেব না। সময় মত তোমার দলের সদস্যপদও কেড়ে নেওয়া হবে। এই সব কথার সারার্থ বি কে দাস-চৌধুরীকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা।

বিনয়বাবুর অপরাধ, তিনি সন্তোষ রায়ের দুর্নীতি উদ্ঘাটনে জেলার যুব-ছাত্রদের সাহায্য করেছিলেন। বিনয়বাবুর সঙ্গে আর একজন কংগ্রেস নেতা ছিলেন তার নাম ফজলে হক। সন্তোষ রায়ের বিরোধিতা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ফজলে হককে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে সরিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার দিয়েছেন।

জেলার যে সব কংগ্রেসী যুব নেতারা সন্তোষ রায়ের নামে ওয়াঞ্চু কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছিলেন বা সাক্ষী দিয়েছিলেন তাদের জীবনের এখন নিরাপত্তা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে সন্তোষ রায়ের গুণ্ডাবাহিনী পুলিশের সহযোগিতায় কুচবিহারে এখন তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে। অভিযোগকারীদের অন্যতম যুব সংগ্রাম কমিটির নেতা রামকৃষ্ণ পালের বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং শ্রীপালকে প্রাণনাশের হুমকী দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা থেকে পঙ্কজ ব্যানার্জী, নরুল ইসলাম, শান্তি দাশগুপ্ত ও রথীন তালুকদার কুচবিহার গিয়েছিলেন অবস্থা দেখতে। তাঁরা ঘুরে এসে ব্যাপক সন্ত্রাসের পটভূমিকায় পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তাতেও অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয় নি।

কুচবিহারে স্পষ্টতঃই দুইটি কংগ্রেস বিদ্যমান, একটি সন্তোষ রায় সমর্থক গোষ্ঠী অপরটি অন্যদের দ্বারা পরিচালিত, এদের মধ্যে যুব কংগ্রেস ও সংগ্রাম কমিটির নেতারাও আছেন। সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগকারী সুনীল চৌধুরী ছাত্র পরিষদের জেলা নেতা।

সন্তোষ রায়ের দুর্নীতির কাহিনী কুচবিহারের আবাল-বৃদ্ধ বণিতার মুখে মুখে। ওঁয়াঞ্চু কমিশনের কাছে পেশ করা সত্তর পাতার টাইপ করা প্রতিবেদনটি দেখলে একটি শিশুর পক্ষেও সন্তোষ রায়কে দুর্নীতির সম্রাট আখ্যায় ভূষিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা হবে না।

সন্তোষ রায়কে পদত্যাগ করিয়ে আবার নির্বাচনের মুখোমুখি হতে পরামর্শ দেন মন্ত্রী জয়নাল আবেদীন ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র। ওদের ধারণা এতে সন্তোষবাবুর ইমেজ বাড়বে। সন্তোষবাবুর জন্য আবেদীন ও মৈত্রের খুব আক্ষেপ। হাজার হলেও একই চেনের লোক তো। সন্তোষবাবু এখন গাড্ডায় পড়েছেন। তাই জয়নাল ও অরুণবাবু কোমড় বেঁধে লেগেছেন তুলতে। মুখ্যমন্ত্রীকে ওরা রাজি করিয়েছেন সন্তোষবাবুর রাজনৈতিক পুনর্জীবন দানের জন্য।

কিন্তু সে গুড়ে বালী। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে সন্তোষবাবুর নতুন করে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সম্মতি নিয়ে এলেও উভয় গোষ্ঠী থেকেই এব্যাপারে আপত্তি তোলা হয়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত দলীয় কর্মীদের দাবী উপেক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ রায়কে কংগ্রেসের টিকিট দেন তাহলে দলের মধ্য থেকেই বিদ্রোহী প্রার্থী সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন। কুচবিহারের অবস্থা দেখে মনে হয়। সমগ্র প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েও মুখ্যমন্ত্রী জয়নাল-অরুণ মৈত্ররা সন্তোষ রায়কে জেতাতে পারবেন না।

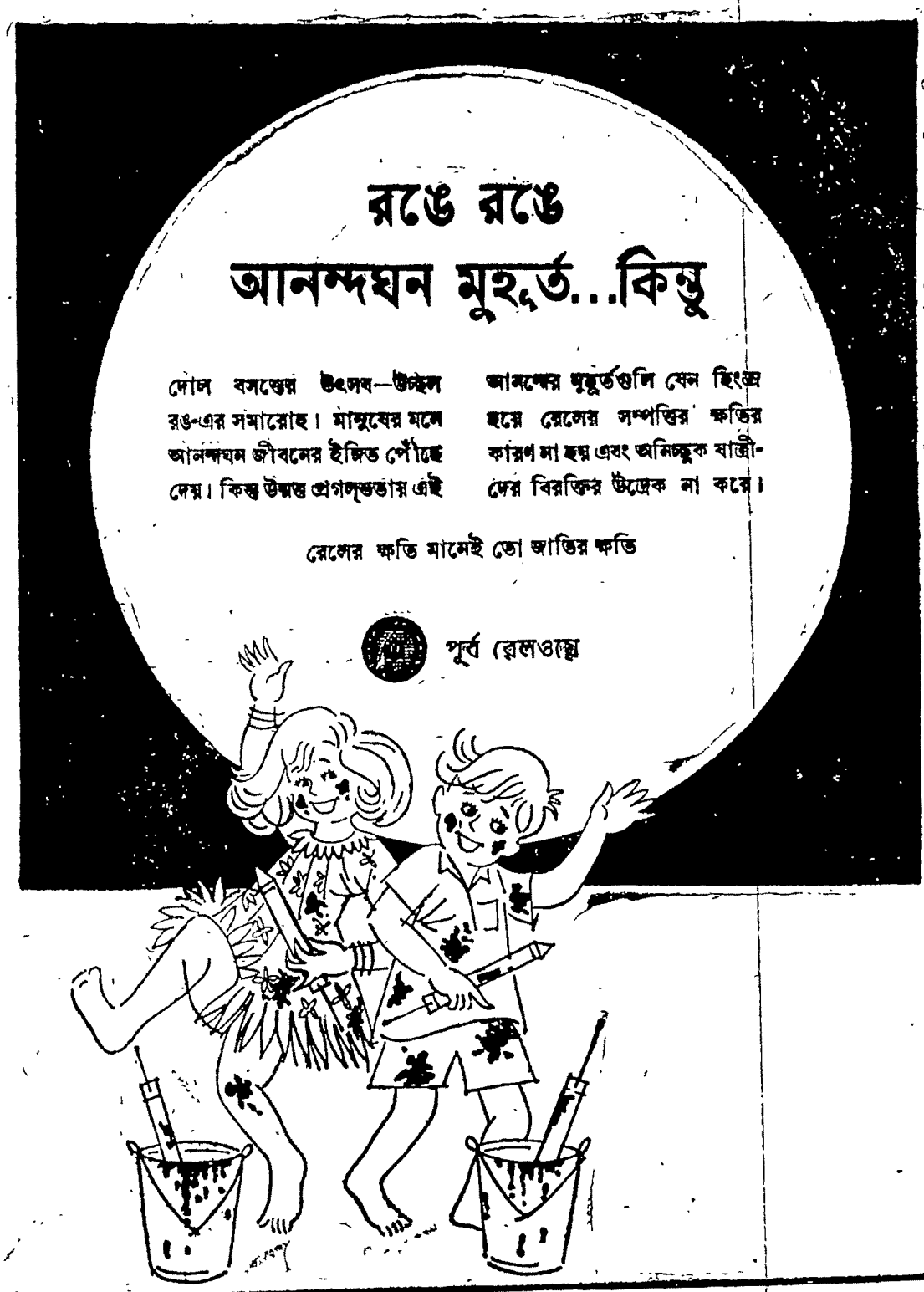

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

কাম্বোডিয়ায় মুক্তিবাহিনীর বিজয় অভিযান

অরুণাভ সেন

"আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নমপেনের ক্রীড়নকদের আর কোনো চেষ্টা চরিত্র করেই রক্ষা করতে পারবে না"—এই দেয়াল-লিখন, এই অনিবার্য পরিণামের কথাই গণতান্ত্রিক ভিয়েতনামের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "নানদান" সাম্প্রতিক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঘোষণা করেছে।

কাম্বোডিয় জনগণের জাতীয় মুক্তিফৌজের সাম্প্রতিক বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে এই সত্য বিশ্বাসীর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সযত্ন লালিত কাম্বোডিয় ক্রীড়নককুল এক জটিল পরিস্থিতি ও অনিবার্য পরাজয়ের মুখেই উপনীত হয়েছে।

বিগত কিছু কালের সামরিক ঘটনাবলীর বিবরণ থেকে জানা গেছে কাম্বোডিয় দেশপ্রেমিক সৈন্যবাহিনী ষোলই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনদিনে ছয় ছয়টি লন নল তাঁবেদার বাটালিয়নকে নমপেনের আশেপাশের যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ষোলই ফেব্রুয়ারীতেই একদিনে ষোলটি যুদ্ধজাহাজকে মেকং নদীতে ডুবিয়ে বা ঘায়েল করে দিয়েছে মুক্তি ফৌজের সৈনিকেরা, জাহাজে প্রহরারত দুইশত লন নল সৈন্যের সলিলসমাধি রচিত হয়েছে। সতেরোই ফেব্রুয়ারী তারিখে মুক্তি ফৌজ ১৪০০ শত্রুসৈন্যকে বন্দী করেছে, কুড়িটি সামরিক ঘাঁটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে আর প্রায় তিনশতাধিক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়েছে। তেইশে ফেব্রুয়ারী লন নলের দুই কোম্পানী সৈন্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ কো চাং রোয়ুন থেকে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়েছে। চব্বিশে ফেব্রুয়ারী একজন ক্রীড়নক জেনারেল নিহত হয়েছে আর অন্য একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

বিগত এই কদিনের ঘটনাবলীই লন নল তাঁবেদার বাহিনীর চরম দুরবস্থাকে সুস্পষ্ট করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?

গত কয় সপ্তাহের সামরিক পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে কাম্বোডিয়ার দেশপ্রেমিক বাহিনী একটানা সফল আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। লন নল বাহিনী কবলিত রাজধানী নমপেনের অবরোধকে তাঁরা দুর্ভেদ্য করে তুলেছে, প্রতিদিন শত শত গোলাবর্ষণ করে চলেছে শহরস্থ শত্রুবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে এবং পোটেনটং বিমান ঘাঁটির ওপর জোরদার আক্রমণ পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ শহরের চার পাঁশের শত্রুপক্ষের অবস্থানের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। মেকং নদীর উপকূলবর্তী দীর্ঘ এলাকায় মুক্তিফৌজ তাদের অধিকার জোরদার করে তুলেছে এবং অন্য অনেকগুলো সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ ও যোগাযোগ পথ তাঁরা বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হয়েছে। এর ফলে নমপেনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো দুর্বল ও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে। বাস্তামবাং, ঔদং, কামপট ও সিহানুকীভল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থান থেকে শত্রুসৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং হাজার হাজার তাঁবেদার সৈন্যকে অকেজো করে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। পঁচিশে ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক সদর ঔদং-এর পতন ঘটেছে, এখন তা মুক্তি ফৌজের নিয়ন্ত্রণে।

লন নল সামরিক বাহিনীর প্রধান সস্থিন ফার্ণান্ডেজকেও কবুল করতে হয়েছে যে নম পেনকে "রক্ষার" সংগ্রামে চারটি ডিভিশন ও চল্লিশটি রেজিমেন্ট সজ্জিত ৪০,০০০ সৈন্য নিয়োজিত হচ্ছে প্রথম পঁচিশ দিনের যুদ্ধে। তার মধ্যে কমপক্ষে ৭,৫০০ সৈন্য অকেজো হয়ে পড়েছে।

এই করুণ স্বীকারোক্তি নমপেনে লন নল বাহিনীর চূড়ান্ত দুরবস্থারই প্রমাণ। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা এই পরাজয়ে ও আঘাতে বিচলিত হয়ে কাম্বোডিয়ায় তাঁদের উন্মত্ত হস্তক্ষেপ জোরদার করে চলেছে। "বেসামরিক পরিবহনের" ছদ্মবেশের আড়ালে তারা বিরাট সংখ্যক বিমানকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্বালানি ও অন্যান্য যুদ্ধসম্ভার পরিবহনের জন্য নিয়োজিত করেছে, থাইল্যান্ড থেকে তা কাম্বোডিয়ায় নিয়ে আসার জন্য। অন্যদিকে নমপেনে সাইগন থেকে বিমান যোগে তারা অবিরাম যুদ্ধসম্ভার বয়ে নিয়ে আসছে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সাইগন ও নমপেনে মদত জোগাবার জন্য ফোর্ড, কিসিঙ্গার ও স্লেইসিনজার প্রভৃতি আমেরিকান কর্তাব্যক্তিরা কংগ্রেসকে আরো বাহান্ন কোটি ডলার মঞ্জুর করার জন্য চাপ দিয়ে চলেছেন।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারী সাংবাদিক সম্মেলনে কিসিঙ্গার বলেছেন—"গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে কাম্বোডিয়ার পতন সুনিশ্চিত হয়ে পড়েছে"—এই উক্তি এবং একই দিনে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ফোর্ড হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর সভাপতিকে এক পত্রে যখন বলেন এই অর্থবরাদ্দ "একটি গুরুতর নৈতিক (!) প্রশ্ন এর একটা বিহিত করতে হবে"—তখন আর সন্দেহ থাকেনা যে অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। মার্কিন কংগ্রেস এই অর্থবরাদ্দের দাবি খারিজ করে দিয়েছে—তাই দেয়াল-লিখন খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে!

কিন্তু সন্দেহ নেই, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা কাম্বোডিয়ায় নির্লজ্জভাবে তাদের জঘন্য হস্তক্ষেপ চালিয়েই যাবে ও যাচ্ছে। তাঁদের তাঁবেদারদের রক্ষা করার জন্য কোনো অপকর্মেই তারা পিছপা হবে না। আর এই অপকর্মে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে একটি ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ও "নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী" কিসিঙ্গার ভিয়েতনামে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত প্যারিস চুক্তিকেই গুরুতরভাবে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন।

এই অবস্থায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ কাম্বোডিয়ার জনগণের সমর্থনে তাদের সংহতিমূলক সংগ্রামকে জোরদার করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে এই অভিযানকে তারা তীব্রতর করেই চলেছেন।

তাই সামগ্রিক বিচারে একথা বলা চলে যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অপপ্রয়াস কাম্বোডিয়ায় চূড়ান্ত পরাজয়েরই সম্মুখীন হয়েছে। কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তিফৌজ এক গৌরবময় বিজয় অর্জন করতে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছে।

বিদ্যুৎচালিত তাঁত শিল্পে সংকট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের বিদ্যুৎচালিত তাঁতগুলি চরম সংকটে পড়েছে। দেশের আট হাজার পাঁচশ পাওয়ারলুম রয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মোট বারোশ ইউনিট আছে। সরাসরি বিশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে ঐ ইউনিয়নগুলির মাধ্যমে। তাঁতের দাম বৃদ্ধি ও কাঁচা মাল সরবরাহ অনিশ্চিত হওয়ার জন্য ঐ সব তাঁত যন্ত্রের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হচ্ছে। উন্নত ধরণের তাঁত না পাওয়ার জন্য কোরা ধুতি ও শাড়ি তৈরীর মধ্যেই কাজ সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। রাজ্যের বেশীর ভাগ পাওয়ার লুমই ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় পড়ে। আধুনিক প্রসেসিং ব্যবস্থা না থাকায় আরও অসুবিধা। সম্প্রতি ভারত চেম্বার অফ কমার্স হলে কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ পাওয়ারলুম অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি শ্রীটি এ জাঠিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন বিদ্যুৎ চালিত তাঁতে লেভী ধার্য হয়েছে নতুন বাজেটে কিন্তু ক্ষুদ্র ইউনিটগুলির পক্ষে ঐ লেভী দেওয়া সম্ভব নয়। দুইশত টাকা হারে লেভী অযৌক্তিক। আগের বলবৎ দশ টাকা লেভীর পরিবর্তে এখন থেকে ধার্য হবে একশত পঞ্চাশ টাকা, লুমের আয়তন ও স্থান অনুযায়ী। তাঁতের সুতোর ওপর বেশী শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। তার ওপর আছে দৈনিক পাঁচ ঘন্টা বিদ্যুৎ রেশন, যার ফলে উৎপাদন কমে যায় হুহু করে। ক্ষুদ্র ইউনিটগুলির পক্ষে কর্মীদের নিম্ন বেতন ক্রম চালু করা অসুবিধা বলে হ্যান্ডলুম সমিতির মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান। উল্লেখযোগ্য, এরা দিল্লীতে প্রতিবাদ দিবস পালন করবেন। বর্তমানে রাজ্যে একদিন সমস্ত তাঁত শিল্প বন্ধ রেখে এরা সরকারী নীতি ও মূল্যবৃদ্ধির সমালোচনা করেছেন।

'মেঘমল্লার' গোষ্ঠীর নতুন অনুষ্ঠান

১ নবযুগের গান

২ বদ্ধডোবা থিয়েটার

(অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে একাঙ্ক হাসির নাটক)

রচনা / নির্দেশনা : পরেশ ধর

৩০শে মার্চ, রবিবার, সন্ধে সাতটা

নাট্য অঙ্গন

(হিন্দ সিনেলার বিপরীত দিকে)

আপনার সবান্ধব আমন্ত্রণ রইল

কোন দর্শনী নেই

সৃজন

মেহনতী মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার

গোর্কির মা

নাট্যরূপ : বিষ্ণু চক্রবর্তী

আলো : তাপস সেন

নির্দেশনা : জ্যোতিপ্রকাশ

১লা এপ্রিল রজনা সাড়ে ছ'টা

হলে টিকিট

৫, ৩, ২, ১

: চারণদল এই দশকের অভিমন্যু :

...দর্শককে এঁরা নাটক দেখতে বাধ্য করেন। —যুগান্তর ॥

..the candle burns with a ruddy
glow deep inside the hearts of men and women...
—Frontier

.. এই দশকের অভিমন্যু নাটকের পেছনে এমন একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে—যা মনকে স্বভাবতই নাড়া দেয়। —অমৃত ॥

রচনা / প্রয়োগ—অলক রায়চৌধুরী

২৪শে মার্চ / একাডেমী / ৭টায়

[হলে টিকিট—১—৭টা]

সৃজনের নাট্যাভিনয়

শিল্পী সংস্থা "সৃজন" আগামী পয়লা এপ্রিল রঙ্গনায় মঞ্চস্থ করছেন ম্যাকসিম গোর্কির "মা"। "মা" উপন্যাসকে নাট্যরূপায়িত করেছেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং তাপস সেন। নির্দেশনা : জ্যোতিপ্রকাশ।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলীর একমাত্র সংকলন

স্বদেশ ও সাহিত্য ১০·০০

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গল্প ৬·৫০

জয়ন্ত জোয়ারদার সম্পাদিত—সত্তরের দশকের চীনের ছুটি গল্পের সংগ্রহ, মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফসল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গঠন কার্যে চীনা সাফল্য ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের ভাবমানসের পরিবর্তনের ছবি গল্পগুলিতে মূর্ত হয়েছে।

নিগ্রো কবিতা ৫·০০ ॥ আফ্রিকা ও আমেরিকার কালো মানুষের কবিতা বাংলা ছোটগল্পের সৎ ও সিরিয়াস পাঠকদের জন্য সুবিমল মিশ্রের নতুন গল্পগ্রন্থ—নাঙা হাড় জেগে উঠছে ৫·০০। শামসুল হকএর স্বরচিত ও অনূদিত কবিতা—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : এই পৃথিবী ৩·০০। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর লোক সংগীত সংকলন—মাঠ পাথারের গান ১·৫০। মাও সে তুং ও নর্ম্যান বেথুনের রচনার সংকলন—ডঃ বেথুন, আমাদের কমরেড ০·৫০। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির স্তালিন মূল্যায়ন ০·৭৫ বিপ্লবী কবি সুব্বারাও পাণিগ্রাহীর সংগীত সংগ্রহ ১·০০।

একমাত্র পরিবেশক : বুকমার্ক

C/o অগ্রণী বুক ক্লাব

এ-১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৮ শে মার্চ ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

ডাঙ্গে মিল-মালিকদের কাছ থেকে ছয় লক্ষ টাকা পেয়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতায় জয়প্রকাশ নারায়ণকে কালো পতাকা দেখাবার জন্য কংগ্রেস ও সি পি আই যখন প্রস্তুত হচ্ছে তখন মহারাষ্ট্র রাজ্যে সি পি আই দলের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়েছে এই দলের চেয়ারম্যান শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গেকে কেন্দ্র করে। শ্রীডাঙ্গের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত রবিবার ৩০শে মার্চ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএস বি চ্যবনের পৌরোহিত্যে এবং আহমেদনগর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে এক লক্ষ টাকার এক তোড়া উপহার দেওয়া হয়। শ্রীডাঙ্গেকে এই টাকা দিয়েছেন চিনিকলের মালিকরা।

উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীডাঙ্গেকে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসীরা এই দ্বিতীয় বার টাকার তোড়া উপহার দিল। কয়েকমাস আগে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মহারাষ্ট্রের কৃষি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও তাঁর পত্নী এবং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীওয়াই বি চ্যবন। শ্রীডাঙ্গেকে এই অনুষ্ঠানে পাঁচ লক্ষ টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়, যে টাকা দেয় প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রের মিল-মালিকরা। দেখা যাচ্ছে সি পি আই নেতারা প্রগতিশীল কংগ্রেসীদেরই শুধু সন্ধান পাননি, তাঁরা প্রগতিশীল মিল মালিকদেরও খুঁজে বার করেছেন।

এক লক্ষ টাকার তোড়া উপহার দেওয়ার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএস বি চ্যবন খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এই জন্মোৎসবের তাৎপর্য "প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কংগ্রেসের প্রগতিশীল শক্তি ও সি পি আই জোট বেঁধেছে।" বলা বাহুল্য সেইজন্য মিল-মালিকরা সি পি আই নেতাকে ছয় লক্ষ টাকা উপহার দিল। অর্ডার অব লেনিন পাবার যোগ্য ব্যক্তি এই ভারতে আর কে আছে।

উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীডাঙ্গে ভারতীয় দর্শনের ওপর সম্প্রতি প্রকাশিত এমন একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন, যে গ্রন্থে বলা হয়েছে মার্কসবাদ ও সাম্যবাদের সব কিছুই বেদান্তে আছে।

লাল বাজারে কংগ্রেসী ছাত্র নেতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে মধ্য কলকাতার জনৈক ছাত্র পরিষদ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়, মধ্য রাত্রে লালবাজারের এক পুলিশ অফিসার দলবল সহ ছাত্রনেতার আস্তানায় হানা দেয়। সেই সময় ছাত্রনেতাটি মত্ত অবস্থায় জনৈকা তরুণীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ। পুলিশ আসতে তরুণীটির হুঁশ হলেও ছাত্রনেতাটি পুলিশকে দেখে হম্বিতম্বি শুরু করে। পুলিশের করার কিছু নেই। খোদ পুলিশ কমিশনারের আদেশ ছাত্র নেতাটিকে নিয়ে যেতেই হবে। এতক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডায় ছাত্র নেতাটির কিছুটা হুঁশ ফিরে আসে। নিজের পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সচেতন হয়ে উঠে। নিজেকে সামলে নেয়। এরপর পুলিশ ভি আই পি ট্রিটমেন্টে ছাত্রনেতাটিকে অপেক্ষমান ভ্যানে তোলেন।

প্রিয় মুন্সী প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার চেষ্টা করছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙ্গে নতুন করে এ্যাডহক কমিটি করার বিষয় নিয়ে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে। প্রিয় মুন্সী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এবং এ বিষয়ে তিনি কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার আশ্বাসও পেয়েছেন।

প্রিয় মুন্সী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করেছেন প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই। প্রিয়বাবুর এই সিদ্ধান্তের পেছনে পুরনো অপমানের বদলা নেওয়ার ইচ্ছাই বেশী মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রিয়বাবুর ভাষায় বললে ঝাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রায় মাস ছয় আগে কলকাতাতে প্রিয়বাবু তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠকে উপস্থিত বিশ্বস্ত সহকর্মীদের প্রিয়বাবু বলেন, "আপনারা দয়া করে কিছুদিন রাজ্য রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়ে আমাকে জড়াবেন না। আপনারা সকলেই আপাততঃ সুদীপ সুরত সৌগতর নেতৃত্বে রাজ্য রাজনীতিতে সংগঠিত হন। আমাকে কেভাবে অপমান করে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরানো হয়েছে তার প্রতিকার সম্ভব যদি আমি আবার ফিরে আসতে পারি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে। আপনারা যদি আমাকে ভালবাসেন, যদি আমার হিতাকাঙ্খী হন তবে আমার নির্দেশ আপনারা মেনে চলুন।"

প্রিয়বাবু নিজের কাজ হাসিল করার জন্য এখন রাজ্যে নিজগোষ্ঠীর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বিরোধ মেটাতে চেষ্টা করছেন। ঐক্য আলোচনার সময় তিনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যাতে প্রতিপক্ষের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় "প্রিয় এখন নিরপেক্ষ হয়ে গেছে"।

ছিয়াত্তর সালে লোকসভা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত পাকা হলে হয়ত নির্বাচনের মাস ছয়েক আগেই প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন এ্যাডহক কমিটি হবে। ঠিক নির্বাচনের আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হতে পারলে তিনি নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে নিজগোষ্ঠীকে বেশি সুবিধা দিতে পারবেন বলে প্রিয়বাবুর ধারণা।

প্রিয় মুন্সী এখন রাজ্যের প্রভাবশালী নেতাদের বিভিন্ন টোপ দিয়ে হাতে রাখার চেষ্টা করছেন। জয়নাল আবেদীনকে মুখ্যমন্ত্রিত্বের টোপ দেওয়া হয়েছে। প্রদীপ ভট্টাচার্যকে একমাত্র সাধারণ সম্পাদক করার প্রস্তাব দিয়েছেন প্রিয়বাবু। এম পি মন্ত্রী করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রিয়বাবু অনেককে দলে টানছেন। অরুণ মৈত্র সভাপতির পদ থেকে অপসারিত হলে তাঁকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে যাওয়া হবে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যাঁর আশীর্বাদ ও সহযোগিতা প্রিয়বাবু সব থেকে বেশী পাচ্ছেন, তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া। যাই হোক কয়েক মাসের মধ্যেই অবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বার্মা শেলের ষড়যন্ত্র

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিদেশী তৈল কোম্পানী বার্মা শেল এবং ক্যালটেক্স বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যের পেট্রোল পাম্পগুলিতে নিয়মিতভাবে তৈল সরবরাহ করছে না। এর ফলে সংশ্লিষ্ট পেট্রোল পাম্পগুলিতে এক গুরুতর তৈল-সঙ্কট এবং ব্যবসা-সঙ্কট চলছে। পাম্পগুলিতে কর্মরত কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

ফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া পেট্রোলিয়াম ট্রেডার্স-এর সম্পাদক শ্রীশচীন দত্ত এক সাক্ষাৎকারের সময়ে ক্ষোভের সঙ্গে ঐ কথাগুলি বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদিও এই দুটি বিদেশী তৈল কোম্পানীকে বারংবার জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করছেন, তথাপি আজও তা কার্যকরী হয় নি। দোদুল্যমান নীতির জন্য তৈল কোম্পানী দুটি এদেশের সম্পদ এবং টাকাকড়ি অবাধে বিদেশে পাচারের সুযোগ পাচ্ছে। পরিশেষে শ্রীদত্ত এব্যাপারে সরকার, জনপ্রতিনিধি এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের ওপর খাপ্পা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ঘর সামলাতে না পেরে মুখ্যমন্ত্রী এখন সাংবাদিকদের ওপর ক্ষাপ্পা হয়েছেন। তাঁর কঠোর সমালোচক বলে পরিচিত কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের দিল্লীতে দরবার করার সংবাদ কলকাতার একটি বৃহৎ সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে যায়।

এই ঘটনার পরই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে দমদম বিমানবন্দরে নেমেই উক্ত সংবাদপত্রের জনৈক সাংবাদিককে ধমকাতে শুরু করেন। এমন কি, কিভাবে কাগজ বেরোয় তা দেখে নেব বলে শাসানি দেন।

মুখ্যমন্ত্রী এখানেই ক্ষান্ত হন নি। দর্পণের সংবাদদাতা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় ঐ সংবাদপত্রের খাতনামা দুজন রাজনৈতিক সংবাদদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি নাকি ইতিমধ্যে প্রেস কাউন্সিলের কাছে এক চিঠি পাঠিয়ে উক্ত দুজন সাংবাদিকের মধ্যে একজনকে পাগল আখ্যা দিয়েছেন। এবং অপর জনকেও যাতে রাজনৈতিক সংবাদ বা সমীক্ষা লিখতে না দেওয়া হয়, তার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে বলে তথাভিজ্ঞ মহলের খবর।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সমালোচক সাংবাদিকদের সম্বন্ধে যে হাবভাব প্রকাশ করেছেন, তাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে।

তিন হাজার মৃত্যুর তদন্ত হয়নি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জগদ্দলে সম্প্রতি পুলিশের গুলীতে এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়। এর জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু গত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে যে হাজার তিনেক ছেলে পুলিশের হাতে মারা গেছে তার একটি ঘটনা সম্পর্কেও কোন তদন্ত হয়নি। এইসব ঘটনায় অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ আদালতের কাজ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করে তার দোষ প্রমাণের চেষ্টা করেনি পুলিশ। বহু ক্ষেত্রে সোজাসুজি গুলী করে মেরেছে বহু ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘর্ষের কথা রটানো হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বোমা পাইপ গান নিয়ে পুলিশকে আক্রমণের এবং আত্মরক্ষার্থে পুলিশের গুলী চালনার খবর প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশের একজন কর্তাব্যক্তির কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্র পুলিশের বক্তব্যই ছেপেছে, কখনও ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করেনি।

জগদ্দলের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগও সোজাসুজি গুলী করে মারার। কংগ্রেসী এম এল এ সত্যনারায়ণ সিংহকে গুলী করেছিল, কিন্তু নিহত ব্যক্তি নিজে গুলীবিদ্ধ হয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে দেন।

দর্পণ

অষ্টাদশ বর্ষ দশম সংখ্যা
২৮শে মার্চ ১৯৭৫

বিভেদ ঐক্য বিভেদ

কংগ্রেসী যুব-ছাত্রদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ, মারপিট, গুলী ছোঁড়াছুঁড়ি, ছুরি চালাচালি প্রায়ই চলছে, আবার ঐক্যের কথাও শোনা যাচ্ছে, আলোচনাও নাকি হচ্ছে। অর্থাৎ বিভেদ ঐক্য বিভেদ। এটা ঠিক পি আইয়ের নীতি "ঐক্য সংগ্রাম ঐক্য" থেকে একটু অন্য ধরণের। বেশ কয়েক মাস আগে প্রিয়-সুব্রত-প্রদীপ-নুরুল দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গীয় ছাত্র-যুবদের ঐক্য সম্পর্কে একটা ফয়শালা করে কলকাতায় পা দিয়েই ঘোষণা করেছিলেন সব ঠিক হয়ে গেছে এবং "আমাদের জন্য অনেক মা সন্তান হারিয়েছে"—একথা স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এই স্বীকৃতি ও অনুতাপে কিন্তু সন্তান-হারা মায়েরা তাঁদের সন্তান ফিরে পাননি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আরও অনেক মা তাঁদের সন্তান হারিয়েছেন।

কিন্তু তবু ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থের ফলে কংগ্রেসী ছাত্র-যুব নেতারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন নি এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় এইসব ক্ষুদে নেতাদের অনুগামীদের মারপিট ও খুনোখুনি বন্ধ করতে পারেন নি। যদিও তিনি গর্ব করে প্রায়ই বলে থাকেন যে, এই রাজ্যে তিনি আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন। সবচেয়ে মজার কথা, মুখ্যমন্ত্রী যেদিন বিধানসভার কক্ষে দাঁড়িয়ে অম্লান বদনে ঘোষণা করলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি অতি উত্তম ঠিক তার আগের দিন দুপুরে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ছাত্র পরিষদেরই (মহাজাতি সদন) এক গোষ্ঠী আর গোষ্ঠীর ওপর ছোরাছুরি ও রিভলভার নিয়ে নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে গেলো। আসলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধলেই এদের ঐক্যের তাল শুরু হয়ে যায়। বর্তমানে বামপন্থীদের ও জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের সম্ভাবনায় এরা আতঙ্কিত। তাই গত সপ্তাহে কুলপি শিক্ষণ-শিবিরে প্রিয়-সুব্রত-প্রদীপ-নুরুল ঐক্যের কথা বলেছেন।

পশ্চিমবাংলায় ইন্দিরা-কংগ্রেসের আর চিন্তা নেই। গত বাইশে থেকে চব্বিশে মার্চ চব্বিশ পরগণার কুলপিতে "নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ শিবির" হল। যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত নেতা বানানোর এই যজ্ঞশালায় কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বরুয়া, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তো শিক্ষাদান করলেনই, ছাত্র-যুবদের বড়-মেজ-ছোট নেতারা মিলে অনেক কথা বললেন। বিভিন্ন জেলা থেকে নাকি দুশ চল্লিশ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন, অর্থাৎ প্রশিক্ষণ নিয়ে উঠতি-নেতা হয়ে দাঁড়ালেন।

দেবকান্তবাবু বলেছেন, পশ্চিমবাংলার যুব-ছাত্ররা কোনও ক্ষোভের বশে কিংবা লাভের জন্য কাজ করছেন না—কাজ করছেন আদর্শের জন্য। তিনি দাবী করছেন, এদের তিনি ভালভাবেই চেনেন ও জানেন। দেবকান্তবাবু সত্যদর্শী বটে! শুধু পশ্চিমবাংলা কেন, সারা ভারতবর্ষের কংগ্রেসী যুব-ছাত্রদের জীবনধারণের নমুনা, পারিবারিক আর্থিক অবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন ও সামাজিক কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি যদি শুধু তাদের আদর্শবাদী বলে প্রশংসাপত্র দিয়ে যেতে পারেন তাহলে বলবো অসমীয়া কবি দেবকান্তবাবুর কল্পনাশক্তি রাজনীতির মঞ্চে এসেও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়নি। যোগ্য

দর্পণ প্রতিক্রিয়া

দলের যোগ্য প্রতিনিধিরা তাদের দলীয় সভাপতির কাছ থেকে উপযুক্ত স্বীকৃতি পেলেন বটে।

পশ্চিমবাংলায় ছাত্র যুব বিভিন্ন গোষ্ঠীর এতো যে ঝগড়া, মারামারি, খুনোখুনি, তার কতোটা আদর্শগত, কতোটা ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল, কতোটা কালোটাকার ভাগ-বাটোয়ারা গত, সে সংবাদগুলি দেবকান্তবাবুর জানা থাকলেও স্বকণ্ঠে প্রকাশ্যভাবে কহতব্য নয় নিশ্চয়ই। তবে এই ঝগড়া-বিবাদ এই প্রশিক্ষণ-শিবিরেই মিটে যাবে, এমন আশা প্রকাশ করেছেন—আর কেউ নয় স্বয়ং সিদ্ধার্থবাবু, যিনি অনেকবার অনেক দফা কর্মসূচী আর ঘণ্টা হিসাবে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে অন্তর্দলীয় কোঁদল মিটে যাচ্ছে বলে ঘোষণা করেছেন। তিন বছরের যে ভুলভ্রান্তি, যে বিবাদ-বিসংবাদ সব কিছুর নিষ্পত্তি তিনদিনের শিবিরেই হয়ে যাবে বলে প্রথমদিনেই সদম্ভে ঘোষণা করেছেন যুবনেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। তিনি আবার তিন বছরের ভুলত্রুটি, ঝগড়া বিবাদের জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। দোষ স্বীকার করেও সবাই স্বপদে বহাল থেকে দেশসেবা করে যাবেন—এমন মৌরসীপাট্টা বোধহয় দাসমুন্সী মশাইয়ের কাম্য।

দল থেকে সমাজবিরোধীদের বহিষ্কার করার জন্য বা এক শ্রেণীর লোকজন যাতে কংগ্রেসে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সচেতন থাকতে সিদ্ধার্থবাবু যুব-ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছেন। যাদের দৌলতে মসনদ পাওয়া তাদের প্রতি সিদ্ধার্থবাবুর এতো অকৃতজ্ঞতা কেন? দোহাই সিদ্ধার্থবাবু এমন আদর্শহীনতার কাজ করবেন না! ভেবে দেখেছেন, এটা করলে কংগ্রেসের লাখো-লাখো কর্মী সমর্থকের কজন অবশিষ্ট থাকবে?

কুলপীর বৈঠকে ঝগড়াবিবাদের ঘরে কুলুপ এঁটে কংগ্রেসী যুব-ছাত্ররা নবোদ্যমে কংগ্রেসে অবতীর্ণ হবেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব সংকট মোচন করবেন। কে জানে ম্যারিজুয়ানা খেয়ে নতুন মহাভারত লেখা হবে কিনা?

●

এবারের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় এক লক্ষ বত্রিশ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে কম করেও পঁচিশ হাজারের বিরুদ্ধে ব্যাপক টোকাটুকির অভিযোগ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে জমা পড়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। এসব গণ টোকাটুকির জন্য পর্ষদ চিন্তিত এবং কর্তৃপক্ষ নাকি এটা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।

পাশাপাশি আরেকটি সংবাদ—জম্মুর বিভিন্ন কেন্দ্রে যেসব ছাত্র টোকাটুকির জন্য নোট ও বইপত্র এনেছিল তারা স্বেচ্ছায় সেগুলি কাজে না লাগিয়ে কর্তৃপক্ষের কা জমা দিচ্ছে। সংবাদটি দিয়ে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা তিনি গণ টোকাটুকির বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়েছেন এবং নিজে বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখছেন। একটি ছেলে নাকি বইপত্র জমা দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, শেখসাহেব তাকে সান্ত্বনা দেন।

এমন প্ল্যানটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবুর মাথায় এলোনা—আফশোষ। একটি দিকে পথিকৃৎ হওয়ার সুযোগ থেকে মানুদ্যা বঞ্চিত হলেন।

যাহোক, পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদকে অনুরোধ তারা এবার এখানকারে মুখ্যমন্ত্রীকে কাজে লাগান। শেখ সাহেবের মতো সিদ্ধার্থবাবুরও জনপ্রিয়তার যাচাই হয়ে যাবে। তবে গত দশ-বারো বছরে অর্থাৎ গণ-টোকাটুকির যুগে যারা মাধ্যমিক পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন টোকাটুকি করে, তাদের হৃদয় পরিবর্তন করে সৎ হতে বলবেন না দয়া করে। তা হলে যে অসংখ্য যুব-ছাত্র এমনকি কিছু তথাকথিত নেতা বা কৃতিব্যক্তির এম এ, বি এ, কিংবা এল এল বি ডিগ্রীও প্রত্যর্পণ করতে হয়।

শিলাদিত্য

হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা পুলিশ ঢোল বাজিয়ে রাজকীয় আড়ম্বরে অসম্ভব তৎপরতার সঙ্গে রাত জেগে চৌরঙ্গী-খিদিরপুর অঞ্চলের হকারদের উচ্ছেদ করেছে। এর দিন কয়েক আগে ব্রেবোর্ণ রোডের হকারদেরও গায়ের জোরে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এই উদ্বাস্তু হকারদের মধ্যে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তার অন্ধকার। ওরা গালে হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।

"সত্যাগ্রহ" খ্যাত পুর প্রশাসক শিবপ্রসাদ সমাদ্দার জানিয়েছেন: সবে মাত্র শুরু। অন্যান্য অঞ্চলের হকারদেরও অবিলম্বে সরে যেতে হবে। ফলে শিয়ালদহ হাওড়া অঞ্চলের হকারদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসীদের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা আর মৃদু শ্লোগান এই বিপন্ন হকারদের প্রতিরোধের মুখোমুখি দাঁড়া করাতে পারেনি। ওরা দলীয় "ঐক্যের" ব্যাপারে ব্যস্ত।

মিনি মার্কেট, সুপার মার্কেট নয়া বাজারের প্রতিশ্রুতিও অনেকবার শোনা গেছে। রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী হকারদের এ প্রলোভন বহুবার দেখিয়েছেন, কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি।

আজ কলকাতার একলক্ষ হকার কোথায় যাবেন? দীর্ঘকালীন বেকারত্বের জ্বালা থেকে মুক্তির জন্য ছোটখাটো স্টল যারা খুলেছিলেন জনবহুল রাস্তার পাশে, কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করেই তাদের হটিয়ে দেওয়া হল।

নেপথ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, উচ্ছেদ হওয়া ক্ষুদে দুঃস্থ হকারদের পুনর্বাসন দেবেন বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তার ভেতরেও দলীয় স্বার্থসিদ্ধের চক্রান্ত রয়েছে। সকলেই পুনর্বাসন পাবেন না। এর ফলে বিক্ষুব্ধ হকারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজও সহজ হবে বলে সরকারী মহলের ধারণা।

কলকাটা ষ্ট্রীট হকার্স ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরেই হকারদের জন্য সুষ্ঠু বিকল্প ব্যবস্থা দাবী করে আসছিলেন। এই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অনিলকুমার পালিত সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন এই ফেরিওয়ালাদের উচ্ছেদ করে। সমাজে আরো বেকার সৃষ্টি করা হচ্ছে। সুষ্ঠু বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত হকার উচ্ছেদ বন্ধ রাখা হক। পুরসভার কাছে আমরা বারংবার বিকল্প জায়গা দাবী করেছি, তার জন্যে আমরা রেন্ট ডিনিউ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু সে কথায় পুরসভা কর্ণপাত করে নি। সি এম ডি এর কাজকর্মের জন্য রাস্তার পরিসর সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে, এ ব্যাপারে শুধুমাত্র হকাররাই দায়ী নয়। সরকারের এই অমানবিক আচরণ দিনের পর দিন সমাজে আরও চুরি রাহাজানী এবং সর্বপ্রকারের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাসিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা:

৬১, মট লেন, কলি-১৩

হারেন বসুর
রাজনৈতিক উপন্যাস

আগুনের দিন

এই উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাদিক। এককালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন পুত্র বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছে। পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ করেছেন। এই তিন পুরুষের রাজনৈতিক অভিঘাত এবং সমকালীন সমাজসত্য বর্তমান উপন্যাসে প্রতিফলিত।

মূল্য পাঁচ টাকা

বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯
দর্পণ কার্যালয়েও পাওয়া যাবে

ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের প্রতিরোধ কোন পথে

সুপ্রিয় সেন

নির্দলীয় বামপন্থা সাপ্তাহিক দর্পণের কার্যালয় এবং বাঙলা দেশ [illegible] হয় যে ছাপাখানার সেই প্রে[illegible]নের উপরে হামলা কতিপয় যুবকের উৎশৃঙ্খল আচরণ মাত্র নয়, এটা একটা পরিকল্পিত, সশস্ত্র রাজনৈতিক হামলা। এটা কোন আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী হামলা শাসক-গোষ্ঠীর বর্তমান রাজনীতির একটা নির্দিষ্ট রূপ। ৭০-৭১ সালের ঘটনাবলীর উল্লেখ যদি নাও করি, একেবারে ইদানিং কালে কুচবিহারের গণ-মিছিলের উপর হামলা চালিয়ে সি পি আই (এম)-এর অনৈক প্রাক্তন এম এল একে হত্যা করা, গত ২০শে জুলাই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমাবেশে কার্জন পার্কে বামপন্থী কর্মী প্রবীর দত্তের হত্যা, বিপ্লবী নাট্যকার উৎপল দত্তের জনপ্রিয় নাটক "দুঃস্বপ্নের নগরীর" প্রদর্শনী জোর করে বন্ধ করে দেওয়া, নাগের-বাজারে আর, এস, পি নেতা, পার্লামেন্টের প্রবীণ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরীকে বক্তব্য রাখতে না দেওয়া, জলপাইগুড়িতে 'নেতাজী দিবসে' এস, পি ও আর, এস, পি নেতৃবৃন্দ ও সংবাদিকের উপর জঘন্য সশস্ত্র আক্রমণ এবং তাদের নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করতে না দেওয়া, মালদহে জ্যোতি বসুর জনসভা সশস্ত্র হামলা করে ভেঙে দেয়া—এগুলো দর্পণ ও বাঙলা দেশের উপর পরিকল্পিত সশস্ত্র হামলার মতই নির্লজ্জ, নগ্ন ফ্যাসীবাদী আক্রমণ। এই আক্রমণগুলি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিচালিত হয়েছে কংগ্রেসী পতাকা হাতে, ওদের রণধ্বনি 'বন্দেমাতরম্' শব্দে সচকিত করে। সুতরাং সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে কংগ্রেসী গুণ্ডাদের এই সশস্ত্র আক্রমণগুলি শাসক গোষ্ঠীর বর্তমান রাজনীতির একটা নির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত রূপ—যার রাজনৈতিক নাম হলো ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস।

ইউরোপে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের যুগে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিশ্ব সম্মেলনে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জর্জ ডিমিট্রভ ঘোষণা করেছিলেন যে "যে পার্টি ফ্যাসিবাদের সম্মুখীন হয়ে বারে বারে শ্রমিক শ্রেণীকে শুধু পশ্চাদপসরণেরই নির্দেশ দেয়, যে পার্টি ফ্যাসিস্ট বুর্জোয়াদের নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করতে দেয়, সে পার্টি শ্রমিক শ্রেণীকে নিশ্চিত পরাজয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। (শ্রমিক শ্রেণীর ফ্যাসি বিরোধী যুক্তফ্রন্ট।)

জার্মান, ইটালি প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির দেউলিয়াপনা, সংগ্রাম ভীতি ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রাখার নীতির ফলে ফ্যাসিবাদের জয়ের পথ যেমন প্রশস্ত হয়েছিল, আমাদের চোখের সামনে ঠিক তেমনই এদেশের কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদী পার্টিগুলির গত কয়েক বছর সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে ধারাবাহিকভাবে পশ্চাদপসারণ, চাপের মুখে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির হাতে একের পর এক গণসংগঠনের নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসা, তাদের ঘাঁটি শক্ত করতে সুযোগ দেওয়ার ফলেই আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদের অগ্রগতি সূচিত হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এমন কি আজকেও প্রতিটি হামলার বিরুদ্ধে ন্যূনতম নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ সংগঠিত করতেও আমরা পেরে উঠিনি। "দুঃস্বপ্নের নগরীর" প্রদর্শনীর উপর যেদিন সশস্ত্র হামলা হলো সেদিন কি কোন বামপন্থী পার্টি তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল? প্রবীর দত্তকে যেদিন হত্যা করা হলো ব্যাপক প্রতিবাদ তো সেদিন দেখা যায় নি! কুচবিহারে সি, পি, আই (এম)-এর প্রাক্তন এম, এল, একে যেদিন প্রকাশ্য মিছিলে ছুরি মারা হলো সেদিনও তো কই বামপন্থী শক্তিগুলির মিলিত প্রতিবাদের ঝড় ওঠে নি। এই ভাবেই আমরা নিজেদের কাপুরুষতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষমার অযোগ্য নিষ্ক্রিয়তা, শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর ও উপযুক্ত বিপ্লবী চেতনার অভাব নিয়ে ফ্যাসিবাদের হাতকে শক্ত করে চলেছি। এখনি যদি সচেতন ভাবে বিপ্লবী মানসিকতা নিয়ে সঠিক কর্তব্য নির্ধারণ করে কাজে নামতে না পারি কোন বামপন্থী সাপ্তাহিকই রক্ষা পাবেন না, হাজার হাজার বামপন্থী কর্মীকে প্রবীর দত্তের মত রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যাবে, ছুরিকাঘাত থেকে কোন জ্যোতি বসু কি কোন বামপন্থী নেতাই রক্ষা পাবে না।

ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস ও যুক্তফ্রন্ট

ফ্যাসিবাদের বিজয় কোন অনিবার্য ঘটনা নয়। ফ্যাসিবাদ শাসক শ্রেণীগুলির শক্তির পরিচায়কও নয়। এটা তাদের দুর্বলতারই পরিচায়ক, আর সেই কারণেই তা প্রতিরোধ্যও।

ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়াদের দুর্বলতারই লক্ষণ। তারা যে সহজ ভাবে জনগণকে প্রতারিত করে শাসন চালাতে পারছে না এটা তারই প্রমাণ। ব্যাপক জনসাধারণ যে তাদের সঙ্গে নেই, তারা যে শাসন ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হবার অবস্থায় এসে গেছে—এটা তারই প্রমাণ। তাদের শক্তি-মত্ততাই তাদের দুর্বলতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এই কারণে তারা অজেয় নয়। জনসাধারণের এতদিনের সংগ্রামের ফলে অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি নিঃশেষে হরণ করে দেশে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠাও অনিবার্য নয়। সঠিক নীতি, সঠিক কর্মপন্থা, নিরলস বিপ্লবী উদ্যম নিয়ে পরিচালিত জনগণের অগ্রণী বাহিনী—কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ব্যাপক জনগণকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলে, ফ্যাসি বিরোধী সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলে, অবশ্যই এই ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদকে প্রতিরোধ ও চূর্ণ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে উচ্ছেদ করে দেশে প্রকৃত জনগণের গণতন্ত্র ও সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ে তুলতে পারে। আর তা আমাদের করতেই হবে।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্রীয় কর্তব্য হলো ব্যাপক জনগণকে, দেশের সমস্ত শোষিত নিপীড়িত মানুষকে, শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এবং যারাই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়াতে চায় তাদের সকলকে, সকল গণতান্ত্রিক পার্টি, সংস্থা ও প্রগতিশীল ব্যক্তিকে ব্যাপক ঐক্য ফ্রন্টের পতাকাতলে সমবেত করা এবং সর্বত্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ব্যাপক জনগণের শক্তি অসীম, অজেয় কিন্তু চেতনাবিহীন জনগণ শক্তিহীন। জনগণের সংগঠনই সংগ্রামের সর্বপ্রধান হাতিয়ার। জনগণের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার, ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করার, জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার হাতিয়ার যুক্তফ্রন্ট সংগঠন।

এই যুক্তফ্রন্ট সংগঠন কেমন? তার রূপ কি? কেমন ভাবেই বা সমগ্র জনগণকে যুক্তফ্রন্টের পতাকাতলে কার্যকরী ভাবে সংগঠিত করা যাবে?

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক জর্জি দিমিট্রভ কর্তৃক এ বিষয়ে ঘোষিত বক্তব্যটি শুনুন—

"যুক্ত অভিযানের জন্য চুক্তি সম্পাদন করে···যুক্তফ্রন্টে যোগদানকারী দল ও সংগঠনগুলি নিয়ে সংযোগ রক্ষাকারী কমিটি গঠন করে আমাদের পক্ষে পরিতৃপ্ত হওয়াটা মোটেই যথেষ্ট হবে না। সেটা হবে মাত্র প্রথম ধাপ। যুক্ত অভিযান বাস্তবে রূপায়িত করার পক্ষে এই ধরণের চুক্তি একটা সাহায্যকারী উপায় মাত্র কিন্তু সেটাই যুক্তফ্রন্ট নয়। যুক্ত অভিযান পরিচালনা সহজ করার জন্য কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির নেতাদের সংযোগ কমিটি গঠন করা দরকার। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের সত্যিকারের বিকাশের পক্ষে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম জনতাকে সংগ্রামে নামাবার পক্ষে এটা মোটেই যথেষ্ট নয়। (ঐ)

আমাদের বামপন্থী নেতারা যুক্তফ্রন্টের নামে কেবল মাত্র নির্বাচনী আঁতাত বা নেতাদের "সংযোগ কমিটি" গড়ে তুলেছেন, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের লাইন বলছে "সেটাই যুক্তফ্রন্ট নয়" যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার তা "সাহায্যকারী উপায় মাত্র" "মাত্র প্রথম ধাপ"। "ব্যাপকতম জনতাকে সংগ্রামে নামাবার পক্ষে এটা মোটেই যথেষ্ট নয়"।

পার্টি-নেতাদের সংযোগ কমিটি যদি যুক্তফ্রন্ট না হয় তবে প্রকৃত যুক্তফ্রন্টের রূপ কি? যা দিয়ে ব্যাপকতম জনগণকে সংগ্রামে নামান যাবে? দিমিট্রভ লিখছেন—

"কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শ্রমিকদের অবশ্যই কারখানায় কারখানায়, বেকারদের মধ্যে, শ্রমিকাঞ্চলগুলতে, শহরের ও গ্রামের গরীব জনসাধারণের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে নির্বাচনের ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের নির্দলীয় শ্রেণী সংস্থা। একমাত্র এই ধরণের সংস্থাই পারবে বিপুল অসংঘটিত মেহেনতকারী জনতাকে যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের পরিধির মধ্যে টেনে আনতে, পুঁজিবাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে জনগণের নিজস্ব উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে এবং এরই ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের বিপুল সংখ্যক সক্রিয় কর্মীদল গড়ে তুলতে।···(ঐ)

এই হলো সঠিক মার্কসবাদী যুক্তফ্রন্টের রূপ, নেতাদের সংযোগ কমিটি প্রকৃত যুক্তফ্রন্ট নয়। ব্যাপক জনগণের যুক্তফ্রন্ট হলো জনগণের স্থানীয় (সেই সঙ্গে জাতীয়) রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংস্থা। যা গড়ে উঠবে সারা দেশে প্রতিটি কারখানায়, শ্রমিকাঞ্চলে, শহরের প্রতিটি পাড়ায়, গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে। যার মধ্যে জমায়েত হবে স্থানীয় গরীব জনগণ, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, প্রতিটি প্রগতিশীল মানুষ। এটা হবে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পার্টিগুলির এবং স্থানীয় গণসংস্থা—ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, কৃষক সংগঠন, মহিলা সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতির এবং প্রভাবশালী প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মিলিত সংস্থা। যা হবে না কোন দলবিশেষের সংগঠন, যা হবে সর্বদলীয়। এই সংগঠন স্থানীয় ভাবে সংগ্রাম করবে সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জনগণের ন্যায্য দাবীগুলির পক্ষে, ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। এই সংস্থা হবে স্থানীয় ভাবে জনগণের নিরংকুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। এই সংস্থাকে গড়ে তোলা সম্ভব স্থানীয় রাজনীতি-সচেতন বিপ্লবী কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ। এই যুক্তফ্রন্ট সংস্থাকে অবশ্যই হতে হবে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা আর তার জন্য যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের একটা বিশেষ পর্যায়ে এই সংস্থা স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করবে নির্বাচনের ভিত্তিতে—এই সংস্থা গড়ে উঠবে সর্বস্তরের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে। এটাই হলো যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন, একমাত্র সঠিক লাইন। এই যুক্তফ্রন্ট সংস্থাই পারে সকল স্তরের ব্যাপক জনগণের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে, তাদের নেতৃত্ব দিতে এবং তাদের রাজনীতি-সচেতন করে তুলতে।

সংগ্রামের রূপ ও প্রক্রিয়া

ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে হলে, বিপ্লবী সংগ্রামে বিজয়ী হতে হলে আমাদের অবশ্যই পরিচালিত হতে হবে সঠিক নীতি ও কার্যক্রমের দ্বারা। বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম না চালিয়ে, নীতিগত প্রশ্নে ভুল ধারণাগুলি ও সুবিধাবাদী কার্যধারাকে পরাস্ত না করে আজ বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে একপা এগোনোও সম্ভব নয়। তাই আমাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে অবশ্যই সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তির সংগে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, আবার সেই সংগে সমস্ত দুর্বলতাকে পরাস্ত করবার জন্য অবিপ্লবী রাজনীতির প্রতিটি বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলতেও হবে। এইভাবেই, বামপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য ও মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা বিপ্লবী কর্মীদলকে এবং সংগ্রামী জনগণকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তুলতে এবং স্থায়ী ও কার্যকরী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারি।

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপ কেমন হবে? দিমিট্রভ লিখেছেন—"ফ্যাসিবাদের হাতে উদ্যোগ ছেড়ে দেওয়া চলতে পারে না। ফ্যাসিবাদ আপন শক্তি সংহত করার আগেই

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস : ১৯৫৯

॥ পঞ্চম পর্ব ॥

দিলীপ মজুমদার

সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল ব্যতীত অন্য বামপন্থী দলগুলিকে নিয়ে গঠিত মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে পঁচিশে জুন বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলগুলি সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে স্বতস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। এইদিন সকাল ছয়টা থেকে বিকেল ছয়টা পর্যন্ত সমস্ত প্রকার যানবাহন চলাচল, বাজার, দোকানপাট, শিক্ষায়তন, অফিস আদালত, কলকারখানা, কলকাতা ডক ও পোর্ট এলাকার কাজ, সিনেমা, হোটেল এমন কি চায়ের দোকান পর্যন্ত বন্ধ থাকে। সংবাদপত্রের রিপোর্টারের অভিমত—"সাম্প্রতিককালে এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন বহুদিন নগরীতে পরিলক্ষিত হয় নাই। বাঙ্গালায়, জাগ্রত জনগণ এই স্বতস্ফূর্ত হরতালের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অধিকাংশ সওদাগরী ও বে-সরকারী অফিসসমূহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। সরকারী অফিস ও আদালত সমূহ খোলা থাকিলেও অতি অল্প সংখ্যক কর্মচারী কার্যে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন মন্ত্রীকে পুলিশের সাহায্য লইয়া রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আসিতে হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। সামান্য কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আংশিক ধর্মঘট হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ইউনিয়নগুলি প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের পরিচালনাধীন। এই দিনের হরতালের বৈশিষ্ট্য হইতেছে—কোথাও কোন পিকেটিং করিতে হয় নাই।" (বসুমতী/২৭-৭-৫৯) পঁচিশে জুন হরতাল পালনের পর কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এম পির সভাপতিত্বে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে একটি জনসভা হয়। সভায় বিভিন্ন বামপন্থী নেতৃবর্গ এই মত ব্যক্ত করেন যে, সরকারকে জনস্বার্থবিরোধী খাদ্যনীতি পরিবর্তনে বাধ্য করবার জন্য তাঁরা যে সংগ্রাম শুরু করেছেন, হরতালেই তা শেষ হবে না। প্রয়োজন হলে আইন অমান্যের পথে সরকারকে অচল করে দেবার পথও তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন।

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের অধিবেশনেও বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যগণ ব্যতীত বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সভায় বিভিন্ন জেলার খাদ্য পরিস্থিতি এবং কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের চরম দুরবস্থার কথা বিভিন্ন প্রতিনিধির রিপোর্টের মাধ্যমে আলোচিত হয়। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণের পর অধিবেশন থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, সারা রাজ্যব্যাপী সংগ্রামের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে হবে। অবিলম্বে সহরে ও গ্রামে কোর্ট কাছারী, লি ডি ও প্রভৃতি সরকারী এবং সরকারী প্রতিনিধিদের দপ্তরগুলির কাজকর্ম অচল করে দেবার জন্য পিকেটিং অবস্থান ঘেরাও মিছিল ও সমাবেশের জন্য প্রস্তুতি চালাতে হবে। খাদ্য চাই, দর কমাও, সকলকে আংশিক রেশনের খাদ্য নিয়মিতভাবে দাও, মজুত ধর প্রভৃতি দাবি পূরণ কর, নতুবা গদি ছাড় প্রভৃতি রণধ্বনিতে সংগ্রাম মুখর করে তুলতে হবে।

পয়লা জুলাই অনুষ্ঠিত মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির জরুরী সভাতেও সরকারের জনস্বার্থবিরোধী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হয় এবং আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সংগ্রামের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কেও বিবেচনা করা হয়। আলোচনান্তে সভা সঠিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, খাদ্য পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে চালের আরও মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। কমিটি লক্ষ্য করেছে যে, খোলাবাজারে চাল আসার সঙ্গে সঙ্গে অসৎ কারবারীরা সরকারের "মজুতদারের নিকট আত্মসমর্পণের" নীতির সুযোগ নিয়ে নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের পূর্বেকার দামের অনেক বেশী দামে চাল বিক্রি করছে। অন্যদিকে আংশিক রেশনিং ব্যবস্থাও মোটেই পর্যাপ্ত নয় এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে রেশন সরবরাহ অনিয়মিত এবং সরকার সমগ্র রাজ্যে সমস্ত শ্রেণীর লোককে কমপক্ষে দেড় সের চাল ও এক সের আটা সরবরাহ গ্যারান্টি করতে মোটেই প্রস্তুত নন। সঠিকভাবেই কমিটি মনে করেছিলেন যে, "সরকার যতদিন মুনাফাকারীর সমর্থনকারী নীতি অনুসরণ করিবে এবং মুনাফাবাজ ও মজুতদারদের বাজারগুলিকে একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীনে আনিতে দিবে ততদিন কেন্দ্রীয় সাহায্যের কোটা আরও বাড়াইলেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটিবে না।" (স্বাধীনতা/৩-৭-৫৯)। বলাবাহুল্য, এই ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করার জন্য প্রজা সোসালিষ্ট পার্টির সঙ্গে কংগ্রেস বিভেদমূলক পন্থা অবলম্বন করেছিল, কিন্তু জাগ্রত গণচেতনা এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ছয়ই জুলাইয়ের সভাতে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁদের মূল সিদ্ধান্ত হল : "বৃহত্তর গণসংগ্রামের মাধ্যমে সরকারকে খাদ্য সম্পর্কে জনসাধারণের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য করিতে হইবে।" (স্বাধীনতা, ৭-৭-৫৯)। কারণ, সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের মাধ্যমে জনসাধারণ তাঁদের ব্যাপক বিক্ষোভ ব্যক্ত করলেও সরকার তাঁর জনস্বার্থবিরোধী খাদ্যনীতি পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ দেখান নি। সেইজন্যই সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী আগস্ট মাসে ব্যাপকভাবে গণ-আইন অমান্য, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি, লাগাতার সাধারণ ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে বৃহত্তর সংগ্রাম পরিচালিত হবে। এই সকল কর্মসূচীকে কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় ভিত্তিতে অবিলম্বে কমিটি পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করবেন।

কমিটির অন্তর্ভুক্ত দলগুলি ও অধস্তন কমিটিগুলিকে এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলন করার নির্দেশ দেওয়া হবে। ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য গণসংগঠনগুলি যাতে এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তার জন্য কমিটি আলাপ আলোচনা চালাবে। কমিটি মনে করে যে, এই বৃহত্তর সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে মহকুমা ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরের নিকট স্মারকলিপি পেশ, অবরোধ, ঘেরাও, অবস্থান ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। মজুত বিরোধী অভিযান এবং মজুত খাদ্যশস্য উদ্ধার করে সস্তা দরে বণ্টন করা বর্তমান পর্যায়ের আন্দোলনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করবে। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির বৃহত্তর সংগ্রামের উক্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে তৎকালীন দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে লেখা হল : "আর কোন উপায় নাই, তাই এই সংগ্রাম। আমাদের রাজ্যে খাদ্যশস্যের অভাব নাই, তথাপি তিরিশ হইতে তেত্রিশ টাকা মণ দরে গ্রাম ও শহরের মানুষকে চাউল কিনিতে হইতেছে। গ্রামাঞ্চলে রেশন সরবরাহ প্রায় বন্ধ। দুর্গত ও ঘাটতি এলাকায় খাদ্য নাই। কৃষক কৃষিঋণ পাইতেছে না। গরীব খেতমজুর ও গ্রামীণ বেকারদের টেস্ট রিলিফের কাজ নাই। দুর্গত অঞ্চলের মানুষ অনাহারে মরিতেছে। গ্রামাঞ্চলের কৃষকের কৃষিকার্যে ঘোরতর সংকট দেখা দিয়াছে। কাজ নাই, ঘরে টাকা নাই। খাদ্যের দর বাড়িয়াই চলিয়াছে। গ্রাম ও শহরের মানুষ, কৃষক ও শ্রমিক, উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত— সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ চরম খাদ্যসংকটে জর্জরিত পশ্চিমবাংলার মানুষ ভাল করিয়াই জানে যে, এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কংগ্রেসী সরকার ও তাহার খাদ্যনীতি। তাহারা আরো জানে যে, আঘাতের পর আঘাত হানিয়াই এই সরকারকে অন্ততঃ কিছু কিছু করিয়া দাবি মানিতে বাধ্য করা যায়। খাদ্য সংকটের সমাধান ইহারা করিবে না। তবে ইহার কিঞ্চিৎ প্রশমন করিতে সরকারকে বাধ্য না করিলে মানুষ বাঁচিয়ে কি করিয়া? তাই এই সংগ্রাম ও তাহার জন্য প্রস্তুতি।" (সংগ্রাম প্রস্তুতি, স্বাধীনতা, ৯-৭-৫৯)

মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয় চোদ্দই জুলাই থেকে। প্রথম পর্যায়ের এই আন্দোলন চলেছিল বিশে আগস্ট পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আইন অমান্য করে প্রায় ১, ৬৩১ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হন। সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শুরু হয় মেদিনীপুর জেলা থেকে। কিছুদিন পূর্বে মেদিনীপুরের চাল্তান এবং সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী মেদিনীপুর শহরে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, ভারতের কোন রাজা যা করতে পারেনি, তারা তাই করেছেন এবং সেই অভিনব জিনিসটি হল কন্ট্রোল না করেও কন্ট্রোল। সম্ভবতঃ এই অভিনব জিনিসের ফলেই সমগ্র পশ্চিমবাংলা, বিশেষত মেদিনীপুরের কৃষক সমাজ ঘোরতর সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকেই অনাহার অর্ধাহারের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। খেজুরী, গড়বেতা, ভগবানপুর প্রভৃতি থানায় সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ঘাটাল, তমলুক ও সদর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য সংকটে জর্জরিত কৃষক রেশন ও রিলিফের অভাবে চরম দুর্গতি ভোগ করছিল। জমি, জায়গা, লাঙ্গল গরু এবং তৈজসপত্র বিক্রির ঘটনাও বেড়ে চলেছিল। কিন্তু মেদিনীপুরবাসী এই অবস্থাকে মুখ বুজে সহ্য করতে রাজী হয় নি। সেইজন্যই বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় সংগ্রামের প্রস্তুতি। রাজ্যব্যাপী আসন্ন সংগ্রামের প্রথম মহড়া শুরু হয় মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি এক বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, "তাঁহাদিগকে এই ব্যাপকতর গণসংগ্রামের মোকাবিলা করিতে হইবে। সরকারের জনস্বার্থবিরোধী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের জনগণ ইতিমধ্যেই যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন সেজন্য কমিটি মেদিনীপুরবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছেন।" (স্বাধীনতা, ১৫-৭-৫৯)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাতাশে জুলাই অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সভা। মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি সিদ্ধান্ত করে যে ঐ সাতাশে জুলাযের সভাতে কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ যোগদান করবেন এবং কমিটি কর্তৃক ঘোষিত এগার দফা দাবির স্বীকৃতির জন্য পুনর্বার সরকারের নিকট দাবি জানাবেন। কিন্তু সাতাশে জুলাইয়ের সভাতে সরকার পক্ষ শুধু যে বিরোধীদের দাবি অগ্রাহ্য করলেন তাই নয়, সরকার পক্ষ, বিশেষতঃ খাদ্যমন্ত্রীর অসম্মানজনক মনোভাবে বিরোধীরা সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। হিন্দু মহাসভার সদস্যরাও বিরোধীদের সঙ্গে এ সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। সভায় সরকার পক্ষের সঙ্গে থেকে যান পি এ পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য বলাবাহুল্য, ফরওয়ার্ড ব্লক তখ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। স্বরাষ্ট্র দিকদের নিকট সভাকক্ষ ত্যাগের কারণগুলি বিরোধী সদস্যরা ব্যাখ্যা করে বলেন যে (এক) মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও লেভী প্রত্যাহারে বিরোধী দলের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নি (দুই) টেস্ট রিলিফ, কৃষি ঋণ, রেশন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি, (তিন) মজুত শস্য উদ্ধারের জন্য জনগণের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়নি, (চার) সংশোধিত রেশন ও উচিত মূল্যের দোকানে চাল বিক্রয় সম্প্রসারিত হয় নি, এবং (পাঁচ) মন্ত্রীমণ্ডলী, বিশেষতঃ খাদ্যমন্ত্রীর অপমানজনক মনোভাব প্রদর্শন।

(ক্রমশঃ)

৫৫১ জন ছাঁটাই কর্মীর ভাগ্য নিয়ে খেলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পদপ্তর এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র গোষ্ঠী ৫৫১ জন ছাঁটাই কর্মীর জীবন নিয়ে খেলা করছে। সংবাদে প্রকাশ, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে রেজিষ্টার্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটগুলির সেনসাসের জন্য একটি স্কীম তৈরী করেন কেন্দ্রীয় সরকার। তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের অধীনে শ্রমবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৫১ জন কর্মীকে নিয়োগপত্র দেয়া হয়।

এই সেনসাস শুরু হওয়ার কথা ছিল ১৯৭৩ সালে, কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন সাহেব এই কাজে নিজের দলের সমর্থকদের নিয়োগ করার চেষ্টা করেন। কোন কারণে তার সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এই সেনসাস শুরু হয় ১৯৭৩ সালের বদলে ১৯৭৪ সালে এই সেনসাস চলাকালে এই কর্মীদের আশ্বাস দেয়া হয় যে তাদের স্থায়ী কর্মী হিসাবে গণ্য করা হবে। এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এক নির্দেশে বলেন এই সকল কর্মীকে স্থায়ীরূপে গণ্য করার জন্য। রাজ্য সরকার কোন কিছু বিবেচনা না করেই গত একত্রিশে জানুয়ারী ৫৫১ জন কর্মীকে ছাঁটাই করেন। অথচ জয়নাল সাহেবের দপ্তরে অনেক শূন্যপদ বর্তমান যেখানে খুব সহজেই এই ছাঁটাই কর্মীদের স্থায়ীপদে নিয়োগ করা যায়। এই কর্মীদের সরকারের উদ্বৃত্ত কর্মী হিসাবে গণ্য করার আশ্বাসও জয়নাল সাহেব নাকচ করে দেন। অথচ এই ছাঁটাইয়ের অব্যবহিত পরেই নদীয়া জেলার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অফিসে দুইজনকে অবৈধভাবে নিয়োগ করা হয়। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

রুশ গুপ্তচরকে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ

কপিল রায়

নতুনদিল্লী, বিশে মার্চ ১৯৭৫

গত সোমবার (চব্বিশে মার্চ) রাজ্যসভায় একটি দৃষ্টি-আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং জানালেন যে এস্‌পিওনাজ বা গোয়েন্দাগিরি ও অপরাপর অভিযোগে ভারতীয় বিমানবাহিনীর জনৈক স্কোয়াড্রন লীডারের জেনারেল কোর্ট মার্শালে বিচার হয়েছিল। বিচারে অভিযুক্তকে "আনবিকামিং বা অশোভন আচরণের" ও "এক বোতল ব্রান্ডী উপহার নেওয়ার" অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অবশ্য জেনারেল কোর্ট মার্শালের এই রায় বর্তমানে বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়কের (চীফ অব দি এয়ার স্টাফ) অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

"কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে ক্ল্যাসিফায়েড বা বর্গীকৃত অর্থাৎ গোপন তথ্য বিক্রি করবার অভিযোগে দুই জন বিমানবাহিনীর অফিসারের কোর্ট মার্শালে সাজা" সম্পর্কে ছিল এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আর সেটি এনেছিলেন বিরোধীপক্ষীয় সদস্য শ্রীরবি রায় (বি এল ডি দলভুক্ত) ও অরও ছয় জন সদস্য। বিরোধীপক্ষীয় এই সব প্রশ্নকর্তাদের দাবি ছিল কোর্ট মার্শাল বিচারের সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সদনে পেশ করা হোক। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী সে দাবি অগ্রাহ্য করলেন। তিনি বললেন যে জেনারেল কোর্ট মার্শালের বিচার হয় "গোপনে" (ইন ক্যামেরা)। "তার প্রকাশ করাটা জনস্বার্থের অনুকূল হবে না" জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। কারণ এ সব প্রকাশ পেলে গোপন কার্যকলাপের অনুসন্ধান করার ক্ষমতা আমাদের অফিসারদের হ্রাস পাবে। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক "এক বোতল ব্রান্ডী উপহার দিয়ে" আমাদের বিমানবাহিনীর এই অফিসারের এই "অশোভন আচরণকে" প্রোৎসাহিত করেছিলেন তার নামও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজ্যসভায় প্রকাশ করলেন না। তিনি শুধু জানালেন যে "জনৈক সিভিলিয়ান অ্যাসিস্টান্ট"ও এই মামলায় জড়িত ছিলেন।

ভারতীয় লোকদলের শ্রীরবি রায় ও শ্রীলোকনাথ মিশ্র এবং জনসংঘের শ্রীভৈরোসিং শেখাবৎ প্রভৃতি প্রশ্নকর্তারা সংশ্লিষ্ট বিদেশীদের "রুশদেশীয়" বলে বারবার অভিযোগ করেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছ থেকে না পেলেন তার স্বীকৃতি না অস্বীকৃতি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানালেন যে সংশ্লিষ্ট বিদেশীরা "কোরকারী নাগরিক" ছিলেন না এবং তাঁরা এখন আর আমাদের দেশে নেই। অর্থাৎ প্রতিরক্ষামন্ত্রী কার্যত এটা স্বীকার করলেন যে সংশ্লিষ্ট বিদেশীরা এখানে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সরকারী পদাধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ উক্ত বিদেশীরা এখানকার রাষ্ট্রদূতাবাসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রশ্নকর্তারা যখন জানতে চাইলেন সংশ্লিষ্ট বিদেশী পদাধিকারীদের এইরূপ অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁদের সরকারের কাছে কোন প্রতিবাদ জানানো হয়েছে কি না তখনও প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার কোন সুনিশ্চিত জবাব দিলেন না।

মূল প্রশ্নের জবাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী গোড়াতে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্য সেটিকে আমরা নিচে তুলে দিচ্ছি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বললেন : "স্পষ্টতই মাননীয় সদস্যরা উনিশশো পঁচাত্তর সনের চোদ্দই মার্চ তারিখের হিন্দুস্থান টাইমস-এ প্রকাশিত খবরের উল্লেখ করছেন। এই খবরে বলা হয়েছিল যে ভারতীয় বিমান বাহিনীর দুইজন অফিসারকে কোর্ট-মার্শাল বিচারে গোয়েন্দাগিরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

"তথ্য হচ্ছে এইরূপ। চুয়াত্তর সনের অকটোবর মাসে খবর পাওয়া গেল যে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশনে কর্মরত ভারতীয় বিমানবাহিনীর স্কোয়াড্রনলীডারের পদমর্যাদাযুক্ত কমিশনপ্রাপ্ত একজন অফিসারকে এবং উক্ত অরগানাইজেশনের জনৈক সিভিলিয়ান অ্যাসিস্টান্টকে দেখা গেছে যে তাঁরা জনৈক বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন।

"তদন্তের পরে চারটি অভিযোগে বিমানবাহিনীর অফিসারের বিরুদ্ধে জেনারেল কোর্ট মার্শালের বিচার শুরু হয়। প্রথম দুইটি অভিযোগ ছিল অননুমোদিত লোকের কাছে বর্গীকৃত গোপন তথ্য দিয়ে দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত, তৃতীয় অভিযোগটি ছিল ভারতীয় বিমানবাহিনীর একজন অফিসারের পক্ষে অশোভন আচরণের সঙ্গে যুক্ত আর চতুর্থটি ছিল এক বোতল ব্রান্ডী উপহার নেওয়ার সঙ্গে যুক্ত।

"বিচার শেষ হয়েছে। প্রথম দুইটি অভিযোগে কোর্ট তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন নি কিন্তু পরবর্তী অভিযোগ দুইটিতে তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন এবং শাস্তি দিয়েছেন—অপমান করে তাঁকে পদচ্যুত করবার (ক্যাশিয়ার্ড) ও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করবার।

"ভারতীয় বিমানবাহিনী আইন অনুসারে, তদন্তফল ও সাজা বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়কের অনুমোদনসাপেক্ষ। বর্তমানে এই বিষয়টি তাঁরই মতামতের অপেক্ষায় রয়েছে।"

ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন এইভাবে হস্তক্ষেপ করছে বলে শ্রীরবি রায় প্রমুখরা যে অভিযোগ এই প্রস্তাব আলোচনার সময়ে রাজ্যসভায় করলেন দৃঢ়ভাবে সে সব অস্বীকার করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং বললেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপও করছেন না অথবা আমাদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কোন রকম ফ্রাটারনাইজ বা মাখামাখি করবারও চেষ্টা করছেন না। তিনি আরও জানালেন যে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন দুই দেশই ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তির ধারাগুলি মেনে চলেন। পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা হচ্ছে এমনই একটি ধারা। এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের আলোচনাকালে কোন কোন সদস্য অভিযোগ করেছিলেন যে আমাদের সামরিক উপকরণাদির জন্য প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস ও মিগ বিমানের উন্নত সংস্করণের মালমশলা নাকি সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে দিতে রাজী হচ্ছেন না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই সব অভিযোগকে পুরোপুরি অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করলেন।

যাই হোক তিনি সদস্যদের অনুরোধ জানালেন যে সদস্যরা যেন তাঁদের ভাষণে এমন কিছু না বলেন যাতে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন যে "কিছু গোপন কার্যকলাপ সব রাজধানীতেই চলে থাকে"। তিনি আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিরোধী কর্মতৎপরতার প্রশংসা করে বললেন যে এ ধরণের গোয়েন্দাগিরি ধরবার ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি আরও বললেন যে কোর্ট মার্শালের রায় তো বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়কের বিচারে নাকচও হয়ে যেতে পারে।

হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় প্রথমে এই খবরটি বেরুলে অনেকের চোখেই সেদিন পড়েছিল। তবে অনেকেই এ খবরের সত্যতা সম্পর্কে সংশয়াকুল ছিলেন। তবে পরের দিন হিন্দুস্থান টাইমসের চিঠিপত্র স্তম্ভে শ্রীইউ এন আর রাও অ্যাডভোকেটের একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে শ্রীরাও জানিয়েছেন যে রুশদেশীয় এক গুপ্তচরের কাছে গোপন তথ্য পাচার করবার অভিযোগে এই স্কোয়াড্রনলীডারের যখন জেনারেল কোর্ট মার্শালে বিচার চলছিল তখন শ্রীরাও আসামীর অ্যাডভোকেট ছিলেন। কোর্ট মার্শালের সাজার বিরুদ্ধে সম্প্রতি তিনি দিল্লী হাইকোর্টে একটি ক্রিমিনাল রীট দরখাস্ত পেশ করেছেন। এই চিঠিতে তিনি আরও বলেছেন যে হিন্দুস্থান টাইমস-এ প্রকাশিত সংবাদ তথ্যের দিক থেকে বেঠিক আর তাই বিমানবাহিনী ও দুইজন

রাজধানী দর্পণ

অফিসারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। শ্রীরাও আরও বলেছেন যে দুইজন অফিসারের বিচার করা হয় নি—মাত্র একজনের বিচার করা হয়েছে এবং তাকেও গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই অফিসার যে বিমানবাহিনীর সেন্ট্রাল-ভিষ্টা হোস্টেলে কোন রাশিয়ানকে খানাপিনায় আপ্যায়িত করেছিলেন কিংবা কেরালার কোভালমস্থ রিসর্ট হোটেলে তাঁকে দেখা গিয়েছিল আর সেখানে টাকার লেনদেন হয়েছিল এমন কোন অভিযোগ বা প্রমাণ ছিল না তাই হিন্দুস্থান টাইমসের এই খবর বেঠিক—বলেছেন শ্রীরাও তাঁর এই চিঠিতে।

বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল কোর্ট মার্শালের রায় সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত করেন সেটা যেমন লক্ষণীয় তেমনই লক্ষণীয় হচ্ছে দিল্লী হাইকোর্টে পেশ করা রীট দরখাস্তের ফলশ্রুতি। তবে যে "অশোভন আচরণ" জনৈক স্কোয়াড্রনলীডারের পদচ্যুতি ঘটাতে পারে তার গুরুত্ব যে কম নয় সে বিষয়ে এখানে কোন সংশয় নেই।

তামিলনাড়ু সরকার বনাম কেন্দ্র

(দর্পণের সংবাদদাতা)

একটানা আট বছর ধরে তামিলনাড়ুতে ক্ষমতায় রয়েছে যে ডি এম কে সরকার তাদের সঙ্গে কেন্দ্রের বিরোধ শুরু হয়েছে। এদিকে কংগ্রেস এ ডি এম কের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়মের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে অমিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি দিল্লীর কর্তাদের বিরুদ্ধে তিক্ত আক্রমণ চালিয়েছেন। শ্রীকরুণানিধি বলেছেন যে, বিত্তমন্ত্রীর দায়িত্বহীন উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবেন। বিত্তমন্ত্রী বলেছেন তামিলনাড়ুকে কেন্দ্র ৭·৫ কোটি টাকা দেবে, কিন্তু তিনি মাদ্রাজে গিয়ে দেখবেন সে টাকা সথাযথ কাজে লাগানো হয়েছে কি না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তামিলনাড়ুর এবারকার খরা প্রায় তুলনাহীন। যে ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের বিষয় নিয়ে কেন্দ্র নাক গলায় না সে ক্ষেত্রে একমাত্র অ-কংগ্রেসী রাজ্য তামিলনাড়ুর প্রতি এই কটাক্ষ কংগ্রেস সরকারের অগণতান্ত্রিক চরিত্র উদ্ঘাটন করে দেয়। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম ডি এম কের সমর্থনে তামিলনাড়ু থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

অন্যান্য রাজ্যও কেন্দ্র থেকে খরা ও বন্যার জন্য অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে। কিন্তু কোন রাজ্যকেই এই সাহায্য কিস্তিতে জমা করে দেওয়া হয় না এবং ঠিকমত খরচ হয়েছে কিনা তা দেখা হয় না। উনসত্তর সালে তামিলনাড়ুতে যখন প্রচণ্ড খরা দেখা দেয় তখন ডি এম কে সরকার বিশেষ সাহায্য হিসেবে কেন্দ্রের কাছে সাতের কোটি টাকা চায়। কেন্দ্র

দেশদর্পণ

প্রথম কিস্তি হিসেবে দুই কোটি টাকারও কম বরাদ্দ করে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেন। ডি এম কের পঁচিশ জন লোকসভা সদস্য তখন তাঁর সরকারের অস্তিত্বের পক্ষে মূল্যবান সমর্থনের কাজ করেছিল। তখন দেখা যায় বিভিন্ন কিস্তিতে ডি এম কে সরকারকে কেন্দ্র খরা সাহায্য বাবদ যে অর্থ দেয় তা তারা যা চেয়েছিল তার চেয়ে বেশী। তার একমাত্র কারণ তখন ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে লোকসভায় ডি এম কের পঁচিশ জন সদস্যের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল।

ভারতের মত যুক্তরাজ্য ভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোয় কেন্দ্র-রাজ্য তিক্ত সম্পর্ক একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সূচনা করে। সাতষট্টি সালের আগে এ ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। কারণ তার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম কেরালা এবং সেখানে কমিউনিস্ট গভর্ণমেন্ট উৎখাতের ঘটনা সকলের জানা। সাতষট্টি সালের নির্বাচনের পর অনেকগুলি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার ফলেই কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং নানা গণ্ডগোল দেখা দেয়। এমনিতেই দিল্লীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এবং ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, তার ওপর এম এল এ ভাঙিয়ে এবং অন্যান্য নানা অজুহাতে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলোর পতন ঘটাতে তৎপর হয়ে ওঠে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, যদিও সবরকম সংবিধান বিরোধী স্বেচ্ছাচারী কাজ করা হয় গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে।

কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সমস্যা এতদিন ধামাচাপা পড়েছিল সন্ত্রাস কায়েমি ও নানা অসদুপায়ের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতা দখল করার পর থেকে। ডি এম কে সরকারের স্বায়ত্ত শাসনের দাবী এবং কেন্দ্রীয় অর্থের সমবন্টনের দাবী এই সমস্যাকে আবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। কিছু পরি-

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

বামপন্থী নেতার রাজনীতি ও সাহিত্য চিন্তা

(গ্রন্থ সমালোচক)

যে-দেশে রাজনৈতিক নেতারা বলেন বেশী, লেখেন কম, সেখানে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা জ্যোতি ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ সংকলন "পরিপ্রশ্ন" (পরিপ্রশ্ন ঃ জ্যোতি ভট্টাচার্য পনের টাকা, প্রকাশক ঃ তপনকুমার সেন, একচল্লিশ বি, কালী দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-পাঁচ) যে বিশেষভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থটি নিজস্ব আবেদনেও নানান ধরণের পাঠককে আকর্ষণ করবে। রাজনীতি ও অধ্যয়নের মিলনসাধন এদেশের বামপন্থী নেতাদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য না হলেও রাজনীতি ও সাহিত্যবোধের যোগাযোগ তেমন সুলভ নয়। "পরিপ্রশ্ন" এ-ব্যাপারে উন্নাসিক পাঠককেও আনন্দ দেবে, পাণ্ডিত্যপ্রেমিক পাঠককেও হতাশ করবে না, আর যে সব তরুণ "জিজ্ঞাসুদের" মুখচ্ছবি মনে রেখে এই বইটি লেখা, তাদের জিজ্ঞাসা যে "আরেকটু স্পষ্ট" "আরেকটু তীক্ষ্ণ" হবেই এ হলফ করে বলা যায়। গ্রন্থের প্রথম ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ—"হর্ষচরিত ঃ সমাজ-চিত্র" সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এমন একটি নমুনা, যা বাংলা সাহিত্যসমালোচকদের পক্ষে অনুকরণীয় বললে অত্যুক্তি হয় না। "হর্ষচরিত" যে শুধুই হর্ষবর্ধনের চরিত্রকীর্তন নয়, তা যে ছত্রে ছত্রে সমসাময়িক সমাজের চিত্রাবলী এই সিদ্ধান্তটিকে যেভাবে অসংখ্য উদ্ধৃতি ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রীভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে আমাদের ঐতিহাসিকেরাও উপকৃত হবেন। ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়নে এ এক নতুন সম্ভাবনা। তবে শ্রীভট্টাচার্যের কাছ থেকে মার্কসবাদীরা হয়তো এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আশা করতে পারেন ঃ (এক) "হর্ষের কালে সভ্যতা পশ্চাদমুখী" হলে তৎকালীন সমাজের কোন্ দিকটি উত্তরমুখী ছিল? বাণভট্ট নিজেই কি এই ক্ষীণ প্রগতিশীল ঝোঁকটির দ্যোতক? যদি তাই হয় তবে "সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষের সমাজ-প্রতিবিম্ব সাহিত্যের ব্যাপারে বাণভট্ট প্রায় একা" হলেও সাহিত্যের বাইরে তাঁর সমগোত্রীয়, কারা ছিলেন? (দুই) সামন্ততন্ত্র ও ফিউডালিজমের একটি ব্যবহারযোগ্য সংজ্ঞায় উপনীত না হয়ে "হর্ষচরিতে"র সমাজকে "সামন্ততান্ত্রিক" হিসেবে বর্ণনা করলে আজকের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত পাঠকেরা কিভাবে সম্ভাব্য বিভ্রান্তি দূর করবেন? (তিন) যদি "ফিউডালিজমের সংজ্ঞা নিরূপণ এখনও পর্যন্ত বহু বিতর্কক্লান্তিকিত" হয়ে থাকে, তবে সেই বিতর্কের কোন্ দিকটিতে সত্য আত্মগোপন করে আছে তা আবিষ্কার করা কি মার্কসবাদী চিন্তাবিদের দায়িত্ব নয়? তবে শ্রীভট্টাচার্য "ফিউডালিজম"-এর লক্ষণ যাই হোক, বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন কেন? পাশ্চাত্য ফিউডালিজমের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মিল ও অমিল নির্দেশ করতে হলে দুটোরই সংজ্ঞা প্রয়োজন হয়। শ্রীভট্টাচার্য মার্কসীয় সংজ্ঞাটিকে যদি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য মনে না করে থাকেন তবে তাঁর নিজস্ব সংজ্ঞা দিয়ে তারপর "হর্ষচরিত"-এর সমাজের চরিত্র-নির্ধারণ করলে জিজ্ঞাসু পাঠকেরা বেশী উপকৃত হতেন। তিনি সে চেষ্টা করেন নি, উপরন্তু "সামন্ততন্ত্র"কে ইউরোপীয় ফিউডালিজমের "অর্থেই ব্যবহার করছি" এই আশ্বাস দিয়ে তিনি নিজেই পরমুহূর্তে প্রশ্ন করলেন, "ফিউডালিজম্"-এর লক্ষণ যাই হোক, "সামন্ততন্ত্র" ব্যাপারটা কি?" এই প্রশ্নটি দুটি সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্যের ইঙ্গিতই দেয়, লেখক যে দুটি শব্দকেই একই অর্থে ব্যবহার করছেন সেই প্রতিশ্রুতির কোনো স্বীকৃতি পাওয়া গেল না (পৃঃ বারো-তেরো)।

পুস্তক সমীক্ষা

গ্রন্থটির অন্যদুটি অংশও অমার্কসবাদী পাঠকদের যতটা মুগ্ধ করবে মার্কসবাদী পাঠককে ততটা করবে না বলে আশংকা হচ্ছে। বৈঠকী ঢঙে লেখা (যা অনেকসময় প্রমথ চৌধুরী বা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মনে করিয়ে দেয়) এ দুটি অংশ—"কালচার ও সংস্কৃতি" এবং "রাজনীতির ভাষা" অবশ্যই সুপাঠ্য ভাষায় ও ভঙ্গীতে। তবে বিষয়ের ব্যাপকতা ও গভীরতাকে হাতের মুঠোর ভেতরে ধরার চেষ্টা এখানে আদৌ দেখা যায় না যা খানিকটা "হর্ষচরিত" অংশে দেখা যায়। তার পরিবর্তে আছে অবসর বিনোদনের উপযোগী হাল্কা মেজাজে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে উড়ে বেড়ানোর খেলা। "নানা সূত্র থেকে এসে পড়া অনেক ভাবনা নিয়ে খানিকটা ভারাক্রান্ত" এ দুটি প্রবন্ধ পাঠকের বিরক্তি ও অস্বস্তি উৎপাদন (লেখকের আশংকা তাই) যতটা না করবে তার চেয়েও দুঃখ দেবে বেশী। দুঃখটা এই, কিসের খেয়ালে একজন বিদগ্ধ মার্কসবাদী অধ্যাপক নেতা তাঁর এই অগাধ পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার মণীষা নিয়েও চিন্তায় ও বিশ্লেষণে শৃংখলা স্থাপনে এতটা অনাগ্রহী? "কালচার ও সংস্কৃতি"র সূচীপত্রে যেভাবে বিষয়গুলি সাজানো হয়েছে তাতে মনে হয় লেখক যখন যাঁর কথা মনে এসেছে তা-ই লিখেছেন, বক্তব্যের অবধারিত বিন্যাস রক্ষায় আদৌ যত্নবান নন। তাই সংস্কৃতি প্রসংগ শুরু হয় ম্যাথু আর্নল্ড ও রবীন্দ্রনাথ দিয়ে। মার্কসের কথা স্থান পায় চার নম্বর অংশে, এরপর সৌন্দর্য প্রসঙ্গ থেকে রাজা দিন বিদেশী ভাষার অধীনে থাকাটাও সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। ভাষা-সমস্যার দেশীয় সমাধান না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত আমাদের পাশ্চাত্যের ওপর সার্বিক নির্ভরশীলতা কখনই কমবে না। দুঃখের বিষয়, শ্রীভট্টাচার্য সেই বিকল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নি, এবং তিনি শুধু ইংরেজীর স্থায়িত্বকেই মেনে নেন নি, তিনি আমরা যে "সেকেণ্ড হ্যাণ্ড" ইংরেজী লিখি-তাতে দুঃখ প্রকাশও করেছেন! ইংরেজীর অধ্যাপক তিনি, এজন্যই কি তিনি ভুলে গেছেন যে সর্বহারা কেন, খুব কম শিক্ষিত মধ্যবিত্তই এখন ইংরেজী পড়ে তার গুণাগুণ অনুধাবন করতে পারেন? তাহলে স্কুলের ইংরেজী শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব দিতে হবে কি? সৌভাগ্যক্রমে শ্রীভট্টাচার্য এবারের আলোচনা সক্রেটিসের ধাঁচে প্রার্থনা দিয়ে শেষ করেন নি, রীতিমত লেনিনীয় "কি করা যাবে" দিয়ে শেষ করেছেন। তাঁর প্রথম নির্দেশ, "আমাদের অনেক খাটতে হবে, ফাঁকি দিয়ে চলবে না।" অমূল্য নির্দেশ সন্দেহ নেই, যেখানে এতগুলি মার্কসবাদী দল থাকতেও আমাদের নির্ভর করতে হয় বহু নিন্দিত মস্কো-র অনুবাদের ওপর। দ্বিতীয় নির্দেশ ঃ "অনুবাদ ছাড়াও সোজাসুজি বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে ছোট ছোট সহজবোধ্য পুস্তিকা লেখা উচিত অনেক বেশী সংখ্যায়।"

এও এক মূল্যবান নির্দেশ। কিন্তু পুস্তিকা না হয়ে যদি পুস্তকই হয় তবু মার্কসবাদী নেতৃবর্গের খেয়াল রাখা উচিত যে সে-পুস্তককেও সহজবোধ্য ও সহজলভ্য হতে হবে, তার নাম "পরিপ্রশ্ন" (যার অর্থ খুব কম লোকই অভিধানের সাহায্য না নিয়ে বুঝতে পারবে) এবং দাম পনের টাকা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এসব বলেও অবশ্য শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যের উদ্যমকে ছোট করে দেখা যায় না। আজকের প্রশ্নহীন রাজনৈতিক অচলায়তনে তাঁর চতুর্দিকে প্রশ্ন তুলে ধরার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রেরণাদায়ক।

কম্বোডিয়ায় নতুন যুগের সূচনা

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতাকামীদের কাছে আনন্দ সংবাদ কাম্বোডিয়ার স্বনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, মার্কিন তাঁবেদার লন নল এবার দেশ থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। এছাড়া অবশ্য তার গত্যন্তর নেই। দ্বিতীয়ত, কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তি বাহিনীর রকেট নমপেনের সরকারী ভবনে আঘাত করায় কুখ্যাত লন নল আহত হয়েছে।

উনিশশো সত্তর সালের আঠারই মার্চ স্বদেশে রাষ্ট্রপতি সিহানুকের

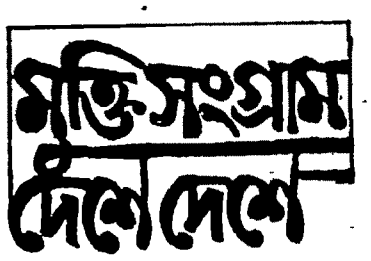

অনুপস্থিতির সুযোগে সি আই-এর যোগসাজসে নল-সিরিক ম্যাটক চক্র ক্ষমতা দখল করেছিল। কুচক্রীদের কবর খোঁড়া হচ্ছে একছরের মার্চ-এ। ইতিমধ্যেই রাজধানী নমপেনের কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ভূখণ্ড সিহানুকের মুক্তি ফৌজ মুক্ত করেছে। রাজধানী নমপেন থেকে মার্কিন তাঁবেদার চক্র পালানোর তোড়জোড় করছে। তাইল্যাণ্ড থেকে মার্কিন সমরাস্ত্র এসেও বেশী সুবিধে করতে পারছে না। কারণ খাসের জনগণ প্রাণপণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

এছাড়া, ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ, ফরাসী ইত্যাকার দূতাবাসের কর্মীরা নমপেন ছেড়ে কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, কাম্বোডিয়ার সত্তর লক্ষ মানুষের বেশীর ভাগ মানুষ এখন মুক্ত অঞ্চলের অধিবাসী।

একদিকে, নমপেনে নল চক্রের সামরিক বাহিনীর রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে নমপেনের ছাত্ররা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে নল বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে ছাত্রদের হাতাহাতি পর্যন্ত হচ্ছে।

এক কথায়, কাম্বোডিয়ায় নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে।

শুধু কাম্বোডিয়া নয়, দক্ষিণ ভিয়েতনামেও চলছে মুক্তি ফৌজের অবিরাম বিজয়াভিযান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে কোয়াঙ ত্রি অঞ্চল মুক্ত হয়েছে। উনিশে মার্চ মার্কিন বিরোধী দিবসের পঁচিশতম বার্ষিকীতে এই অসম্ভব কাজটি সুসম্পন্ন হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রধান তিন শহর কোয়াঙ ত্রি, দানাতে, ইয়ের পথে পথে বিজয় উৎসব পালিত হয়েছে। হাজার হাজার সশস্ত্র মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ পথে বেরিয়ে পড়ে এবং সারাদিন সারারাত ধরে চলে উৎসব উদ্দীপনা। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপতি হুয়ো এক বিবৃতিতে বলেছেন, যতদিন ভিয়েতনামের এক ইঞ্চি জমিও মার্কিন তাবেদার থিউ-র হাতে থাকবে, ততদিন ও মুক্তি যুদ্ধ চলবে।

কাম্বোডিয়ায় সাফল্য ভিয়েতনামের বিপ্লবীদের কপালে জয়টীকা পরানোর কাজকে তরান্বিত করবে।

মতামত

৮০ টাকা বেতনের হতভাগ্য গ্রন্থাগারিক

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু,

বড় মর্মান্তিক কাহিনী এই আশী টাকা বেতনের গ্রন্থাগারিকদের। উনসত্তর সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বত্রিশ-তেত্রিশ জন গ্রন্থাগারিকের বেতন আশি টাকা রয়ে গেল। সমস্ত বিভাগের বেতন সংশোধন হলো, কিন্তু কেন সরকারী আমলা এদের দিকে একবারও ফিরে তাকালোনা। দীর্ঘদিন থেকে এরা শুনে আসছে লালফিতার বাঁধন অর্থ দপ্তরের ডাষ্টবিনে পড়ে আছে শুধুমাত্র অনুমোদনের অপেক্ষায়। তিনি অনুমোদন করবেন না। তাহলে এই বত্রিশ-তেত্রিশটি লাইব্রেরীর জন্য পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দপ্তরের সমস্ত অর্থ শেষ হয়ে যাবে। কত বড় হৃদয়হীন এঁরা এবং এই সরকার। এই সব গ্রন্থাগারিক কেউ উচ্চমাধ্যমিক, কেউ স্কুল ফাইনাল উত্তীর্ণ, এমন কি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। বছরের পর বছর সমাজশিক্ষা বিভাগের দপ্তরে, মন্ত্রীমহলে ধর্ণা দিয়ে কোন ফল হয় নি, শুধু হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে এরা আর শুনেছে সরকারী অর্ডারে ভুল থাকার এই দৈন্যদশা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেই মান্ধাতার আমলের অর্ডার কি সংশোধন হয় না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় একবার আপনারা অনুগ্রহ করে চিন্তা করে দেখুন তো এই সব গ্রন্থাগারিকদের বেতন কি আশি টাকা হওয়া উচিত? এই দ্রব্যমূল্যের দিনে তারা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। অন্যান্য রুরাল আরবান, এমনকি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সমস্ত প্রকার গ্রন্থাগারিকদের বেতন সংশোধন হলো কিন্তু এরা সেই তিমিরেই রয়ে গেল। এরা অন্যান্য গ্রন্থাগারিকদের ন্যায় মহার্ঘভাতা পাবে সরকারী নিয়ম মেনে চলবে কিন্তু বেতনের বেলায় এই বিমাতৃসুলভ মনোভাব কেন? মূল বেতনের সহিত মহার্ঘভাতা যুক্ত হয়নি, যার ফলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের লভ্যাংশ থেকে এরা বঞ্চিত।

পার্বতী বন্দোপাধ্যায়
বীরভূম

স্তালিনের শেষ বক্তৃতা

জে ভি স্তালিন-এর একখানি জীবনী রচনার উদ্দেশ্যে আমি প্রয়োজনীয় দলিল ও কাগজপত্র সংগ্রহ কালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশ কংগ্রেসের সমাপ্তি সূচক অধিবেশনে স্তালিন যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তার অনুসন্ধান করছিলাম। বক্তৃতাটি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কয় মিনিটের মধ্যেই তা স্তালিন সমাপ্ত করেছিলেন। "শেষ বক্তৃতা" হিসাবে সাধারণভাবে সুপরিচিত এই বক্তৃতাটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ওটা একটি ঐতিহাসিক দলিল বলে স্বীকৃত। এই বক্তৃতা থেকেই কটি লাইন পশ্চিম বাঙলার তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা দৈনিক মুখপত্র "স্বাধীনতা"র সম্পাদকীয় স্তম্ভের শীর্ষে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হতো। তারপর সোভিয়েত নেতাদের স্তালিন বিরোধী উন্মাদনার সূত্রধরে হঠাৎ তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। থাক্ সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু এই বক্তৃতাটি সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। স্তালিন-বিরোধী মত্ততার ফলে লেখাটি এখন দুষ্প্রাপ্য।

একজন বন্ধুর কাছে খবর পেয়ে মূলতঃ এই বক্তৃতাটির জন্যই আমি "ন্যাশনেল বুক এজেন্সি"র সাম্প্রতিক ইংরাজী প্রকাশনা সিলেকটেড রাইটিংস —জে ভি স্তালিন, বেশ কয়েকটি টাকা ব্যয় করে সংগ্রহ করলাম। কিন্তু বিস্ময় ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম বক্তৃতাটি ছাপা হয়েছে কিন্তু যে হর্ষধ্বনি ও আনন্দধ্বনি জেগেছিল ঐ বক্তৃতাকালে এবং যা সরকারী বয়ানে ছিল তা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। "ন্যাশনেল বুক এজেন্সি" ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তাদের এই কাজের কী ব্যাখ্যা দয়া করে জানাবেন কি? ঐতিহাসিক একটি দলিল এভাবে ছাটকাট করা কি তারা অনুমোদন যোগ্য মনে করেন?

বিজনবিহারী পুরকায়স্থ

পুরুলিয়ার চিঠি

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সরকারী অবহেলা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

নানাদিক থেকে পেছিয়ে পড়া এই জেলা পুরুলিয়া। সরকারী কর্তা ব্যক্তিরা তাই বলে থাকেন, আর মাঝে মাঝে মায়াকান্না কেঁদে বড় বড় পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি ও কর্মযজ্ঞের হুঙ্কার ছাড়েন। এদিকে তাদের অনুগ্রহে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জেলার হাল বেসামাল। হরিপদ সাহিত্য মন্দির পুরুলিয়া তথা মানভূম জেলার প্রাচীনতম ও বৃহত্তম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বহু মূল্যবান বইয়ের সংগ্রহ ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালাও রয়েছে এই গ্রন্থাগারে। বঙ্গভুক্তির পর থেকে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বছর বার্ষিক চারশ টাকা করে সরকারী সাহায্য পেয়েছিল। বিগত চার পাঁচ বছর ধরে সরকারী সাহায্য এরা আর পাচ্ছে না। এখন জেলা কর্তৃপক্ষ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা চালচুলোহীন কতকগুলো প্রতিষ্ঠানকে অনুদানের নামে বই ও আসবাব কিনে দিচ্ছেন। ১৯৫৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় তিনটি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বই ও আসবার পত্র সরকার সাহায্য করেছেন। কিন্তু সরকারী কর্মনীতির ত্রুটির জন্য পাঁচটি ছাড়া কোন সাধারণ, গ্রন্থগার এ জেলায় বর্তমানে জীবিত নেই। বইপত্তর সব স্বার্থান্বেষীরা আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। তারপর সরকারী কর্তৃপক্ষের বই দেওয়ার রীতিও বড় বিচিত্র। সরকার শতকরা নব্বুইটা গ্রামীণ সাধারণ গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের অধিকাংশ বইই নেই। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ ঐসব মনীষীদের বই বা কৃষি, শিল্প, কারিগরী শিক্ষার বই না দিয়ে তাদের খুসীমত বিশেষ বিশেষ প্রকাশকের বই কয়েকশো কপি করে কিনে বিলি করছেন। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। তাহলে সে লাইব্রেরী আর গ্রান্ট পাবে না। এম এল এ-র লাইব্রেরী হলে অবশ্য তার ব্যতিক্রম হয়।

গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে এ জেলার লোকরঞ্জন প্রতিষ্ঠানগুলি ছৌনাচ, টুসুগান, কীর্তন যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির দল) সরকারী অনুদান পাচ্ছে না। বাৎসরিক প্রায় চার হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল এই জেলার জন্য। সেই টাকায় এখন কলকাতার রিসার্চ বাবুরা ছৌনাচ দল নিয়ে আমেরিকা বিলেত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গ্রামের ছৌ-নাচ, নাটক লোকসঙ্গীত প্রভৃতির ছোট ছোট দল যারা বিশ-পঁচিশ টাকার সরকারী অনুদান পেয়ে বা লাভের আশায় উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে তাদের শিল্পের ঔৎকর্ষবৃদ্ধিতে ও লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী হত এতদিন, তারা এখন ভগ্নমনোরথ। লোকসঙ্গীত ও নৃত্যশিক্ষার বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার দাবী আজও উপেক্ষিত। পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতিকে গলা টিপে হত্যা করে তার বুকের ওপর চলছে স্বার্থপিশাচদের শবসাধনা, উদ্দেশ্য ডকটরেট জাতীয় খেতাবের মোক্ষলাভ।

এরপর আসা যাক জেলা-গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে। এটি বিহার সরকারের আমলে ছিল সরকারী রাজ্য পুস্তকালয়। পুরুলিয়া জেলা বঙ্গভুক্তির পর কয়েক মাস সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চলার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারী গ্রন্থাগারে কর্মরত তিন-চার জন স্থায়ী কর্মীকে পদত্যাগ করিয়ে নতুন বেসরকারী পদে নিয়োগ করে সরকারী গ্রন্থাগারটিকে রাতারাতি বেসরকারী গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করেছেন। শুধু তাই নয় বিহার সরকারের কেনা লাইব্রেরী বাড়ীটির অর্ধেক সমাজশিক্ষা দপ্তর দখল করে বাড়ীটির তিনটি শয়নকক্ষে লাইব্রেরীকে নির্বাসিত করেছেন। দু হাজার সদস্য ও পঁচিশ হাজার বই নিয়ে কাজ চলছে তিনটি ছোট ঘরে। এ জেলার জন্য বরাদ্দ টাকা আজও পাওয়া যায় নি যাতে লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ী তৈরী হতে পারে অন্য জেলার মত। অথচ সমাজশিক্ষা দপ্তর বছর বছর প্রচুর টাকা দিচ্ছেন এ জেলারই অন্য একটি সাধুসন্তের প্রতিষ্ঠানকে। এই প্রতিষ্ঠানটির অর্ধমর্কটরূপী প্রাসাদোপম অট্টালিকা শ্রেণীতে অতিথিশালা থেকে শুরু করে গোশালা পর্যন্ত কিছুরই অভাব নেই। অন্যদিকে জেলা গ্রন্থাগারে চার আঙ্গুল জায়গার জন্য ছাত্র মহিলা ও শিশুরা দাঁড়াতে পান না। চলাফেরা করতে গেলে প্রতিমুহূর্তেই অসুবিধা হয়।

বছরের পর বছর এই অবস্থার প্রতিকার হচ্ছে না কেবলমাত্র একজন কেরাণীর জন্য। তিনি পূর্বে সমাজশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এখন অন্য বিভাগে গিয়েও সমাজশিক্ষা উপশিক্ষা অধিকর্তার একান্ত বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়জন হওয়ার জন্য সমাজশিক্ষা বিভাগের সব কিছুই করে থাকেন। এই সাহিত্যিক (?) কয়েকটা বই লিখেছেন। সেগুলি এ জেলায় চলছে না আর তিনি প্রায়ই সরকারী কাজ নিয়ে পুরুলিয়া বিশ্রাম ভবনে এলে তার জন্য জেলা গ্রন্থাগারের গাড়ী ও আহারাদির ব্যবস্থাই হয় না, সাধুসন্তদের পাদপীঠে তাঁর মনস্তুষ্টির সব ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তাই সমাজশিক্ষা দপ্তরের মোটা টাকা নানা অজুহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হলেও পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার বাড়ী তৈরীর প্রাপ্য টাকা পাচ্ছে না।

জেলার প্রাচীনতম কলেজ আজও উপেক্ষিত। শহরের এক প্রান্তে জে কে কলেজ। সকাল, দুপুর ও রাত্রি তিন শিফটে চলছে কলেজ। কিন্তু কলেজ-বাড়ীটি দেখলে মনে হবে না যে সেটি একটি কলেজ। দীর্ঘদিন কেটে গেছে আজও কলেজের বাড়ী তৈরী হোল না, তৈরী হোল না ছাত্রাবাস। যে রাস্তা দিয়ে কলেজ যেতে হবে সেই কলেজ রোড ভাঙ্গাচোরা। ছাত্ররা দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনার্স খোলার দাবী করে আসছেন। আজও তাদের জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। যুক্তফ্রন্টের সময় যাঁরা অনার্স খোলার দাবী নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তারা এখন ক্ষমতা পেয়ে অনার্স ছেড়ে গণটোকাটুকির সুমহান দাবীর লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বেশ কিছুদিন হলো জে কে কলেজে অধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে। জানা গেছে বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থে শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা বিলম্বিত হচ্ছে। জেলার একমাত্র মহিলা কলেজ দেশবন্ধু রোডে নিস্তারিণী কলেজ। এ জেলা নারীশিক্ষায় পশ্চাদপদ। অথচ সরকার জেলার মেয়েদের উন্নতির জন্য আজ পর্যন্ত নিস্তারিণী কলেজে বিজ্ঞানের কোন শাখাতেই অনার্স চালু করতে পারেন নি।

ছাঁটাই কর্মী

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

যে এই অবৈধ নিয়োগ কোন প্রভাবশালী মন্ত্রীর নির্দেশেই ঘটেছে।

এই ছাঁটাই কর্মীরা যাতে কোন আন্দোলন না করতে পারে সেইজন্য গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র হঠাৎ একটি ইউনিয়ন গঠন করে ফেলেন। এই নেতাকে নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। শ্রীমিত্র নিজেকে রাজ্যসরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের নেতা বলে দাবী করেন, কিন্তু যতদূর জানা যায় যে তাঁর ইউনিয়নের কোন রেজিস্ট্রেশান নেই এবং তা সত্ত্বেও মিত্রকে নিয়ে মন্ত্রী মহলের মাতামাতি বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

তিনি এই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের জন্য সংগ্রাম চালাবেন এই আশ্বাস দিয়ে প্রতি মাসে কর্মীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছেন বলে অভিযোগ। উল্লেখযোগ্য যে, গত আই ফেব্রুয়ারী ফেডারেশনের ডাকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে যে অবস্থান বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কিন্তু এই সব ছাঁটাই কর্মচারীর পুনর্বহালের দাবী প্রাধান্য পায়নি। এই কর্মীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন হয়রাণ করা হচ্ছে।

দেশ দর্পন

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

সংস্থান উদ্ধৃত করলেই দেখা যাবে যে, কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য বন্টনের মাপকাঠি নির্ধারণ করে রাজনৈতিক প্রশ্ন ও রাজ্য রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব। উনিশশো একাত্তর-বাহাত্তর সাল থেকে বাহাত্তর-তিয়াত্তর সালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সাহায্য বাবদ কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে ৬২২.৬২ কোটি টাকা দেয় যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী ছিনিয়ে নেয় মহারাষ্ট্র। এবং গুজরাত সহ এই পশ্চিমী রাজ্য মোট কেন্দ্রীয় সাহায্য পায় ২৯০.৩৭ কোটি টাকা যার মধ্যে গুজরাতের অংশ হল ৭০.৮৫ কোটি টাকা। আশ্চর্যের বিষয় এই দুই রাজ্য যদিও মোট জনসংখ্যার চোদ্দ শতাংশ মাত্র, কিন্তু তবু তারা এই সাহায্য খাতে কেন্দ্রের কাছ থেকে সিংহভাগ আদায় করে নিয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা বিহার ও আসামের লোকসংখ্যা এদের তিন গুণ তবু তারা পেল মাত্র ১১০.৯২ কোটি টাকা।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

হত্যার দায়ে মহিষাদল থানার ও সি গ্রেপ্তার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মহিষাদল থানার অফিসার-ইন-চার্জ ঐ থানারই একজন কনস্টেবল খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। মহিষাদল প্রত্যাগত দর্পণ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, গত সতেরোই মার্চ তারিখ রাত্রে জনৈক ব্যক্তি হলদিয়া থেকে আসছিলেন, সঙ্গে ছিল ষাট হাজার টাকা। পথে কয়েকজন যুবক তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। তখন সেই ব্যক্তি থানায় এসে আশ্রয় চায় এবং সব ঘটনা ব্যক্ত করে। ষাট হাজার টাকা জমা দিয়ে সে একটি রসিদ চায়। অফিসার-ইন-চার্জ টাকা জমা নিয়ে বাঁ হাতে লিখে একটি রসিদ ঐ ব্যক্তিকে দেন বলে সংবাদে প্রকাশ। ওই ব্যক্তিকে তিনি থানা সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাকে শুতে বলেন. ব্যারাকের যে সিটে উক্ত ব্যক্তিকে শুতে বলা হয় সেই সিটের কনস্টেবল ছুটিতে ছিল। হঠাৎ সেই দিন রাত্রেই উক্ত কনস্টেবল ফিরে আসে এবং তার সিটে অন্য লোক থাকায় তাকে প্রশ্ন করে এবং সব শোনার পর অন্য সিটে শোবার কথা বলে।

রাত একটার সময় থানার অফিসার-ইন-চার্জ সহ আরো কয়েকজন ব্যারাকে প্রবেশ করে সদ্য ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসা কনস্টেবলকে সেই টাকা জমা দেওয়া ব্যক্তি মনে করে রিভলবার দিয়ে গুলি করে খুন করে এবং লাশ টেনে নিয়ে থানারই সামনের এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মাটি খুঁড়ে মাটি চাপা দেয়। সেই সময় উক্ত ব্যক্তি থানা সংলগ্ন একটি আমগাছে উঠে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

সকালের প্রথম ট্রেনেই সেই ব্যক্তি তমলুক যায় এবং সমস্ত ঘটনা তমলুকের জেলা শাসককে জানায়। জেলাশাসক উক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে করে এক বিশেষ পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং ঐ ব্যক্তির বক্তব্য অনুসারে একটি লাশ উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় অফিসার-ইন-চার্জ সহ আরো কয়েকজন পুলিশ গ্রেপ্তার হয়। এই ঘটনার কথা আমাদের দপ্তরে প্রথমে জানান শ্রীস্বদেশ চন্দ্র, তারপর তার সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে যান এবং সংবাদ সংগ্রহ করেন। এই ঘটনায় ঐ অঞ্চলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে জমাদেওয়া টাকা আত্মসাৎ করার জন্যই ঐ ব্যক্তিকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের রাজ্য সম্মেলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বাইশে মার্চ থেকে চব্বিশে মার্চ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেরালার শ্রমিক নেতা শ্রীই পদ্মনাভন। সভার কাজ শুরু হয় ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীত দিয়ে। শ্রীপদ্মনাভন তাঁর ভাষণে রাজ্য সরকারগুলির এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক এবং কর্মচারীদের স্বার্থ হননকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। সি আই টি ইউ পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীপি রামমূর্তি। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্য আছে বলেই শাসক দল দমন পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, ডি. আই আর বিদেশী হামলা প্রতিরোধ করার জন্য, তবে কেন ধর্মঘটী শ্রমিক এবং সরকারী কর্মচারীদের এই আইনে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে? তাঁরা কি বিদেশী? তিনি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের রাজত্বে রেশন ব্যবস্থার অবনতির কথাও বলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সত্তর গ্রাম চালের ভাত খেয়ে মহাকরণে যেতে বলেন, তাহলেই মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারবেন কেন আন্দোলন হয়, ধর্মঘট হয়।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সংসদ সদস্য সোমনাথ চ্যাটার্জী, দীপেন ঘোষ, অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জী, যতীন চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর বসু, অনিলা দেবী, শান্তি ঘটক, শান্তি দে প্রমুখ।

সম্মেলন পরিচালনা করেন শান্তি ভট্টাচার্য ও শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য। পাঁচশ পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন।

এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে আন্দোলনরত সরকারী কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়ে এবং সরকারী দমননীতির তীব্র নিন্দা করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক তারবার্তা পাঠান হয়। এই সম্মেলনে গণআন্দোলনের প্রয়াত নেতা ও কর্মীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

একটি বন্ধ কারখানার নেপথ্য কাহিনী

(বিশেষ সংবাদদাতা)

বর্ধমান জেলার জে কে নগরে অবস্থিত এ্যালুমিনিয়ম করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড সংস্থাটি অবিলম্বে খোলার দাবী জানিয়েছেন রাজ্যসভার সদস্য সর্দার আমজাদ আলী। প্রায় আঠারো মাস ব্যাপী বন্ধ থাকা এই সংস্থার প্রায় তিন হাজার কর্মী ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল তিরিশ হাজার মানুষের চরম আর্থিক দুর্গতির এক বেদনাময় চিত্র শ্রীআলী ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীচন্দ্রজিত যাদবের কাছে তুলে ধরেছেন। এই সংস্থার পঞ্চাশ জন কর্মী ইতিমধ্যেই অনাহারে মারা গেছেন। বাকীরা মৃত্যুর অপেক্ষায়।

ভারতের অগ্রগণ্য এই এ্যালুমিনিয়াম কারখানাটি তেয়াত্তর সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিংহানীয়া গোষ্ঠী পরিচালিত এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ ঐ তারিখ থেকে একতরফা ভাবে লক-আউট ঘোষণা করেন।

লক আউটের কারণ হিসাবে কর্তৃপক্ষ প্রথমে শ্রমিক অশান্তির অজুহাত দেখান। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শিল্পে শান্তি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিলে কর্তৃপক্ষ বায়না ধরেন, শস্তা দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ আরো কিছু আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সরকার না দিলে কারখানা খোলা হবে না। এই সংস্থার পরিচালক বর্গের দুর্নীতি ও চরম অপদার্থতা ঢাকার জন্যই যে এই অনায় আবদার তা বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সংস্থাটির কর্তৃপক্ষ সরকারের বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলি থেকে প্রায় আট কোটি টাকার মত ঋণ সংগ্রহ করে। ঋণের এই পরিমাণ সংস্থার সম্পদের মূল্য অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ বেশী। এর পরে সরকারী ঋণপ্রদানকারী সংস্থাগুলির পক্ষে আর ওভারড্রাফট দেওয়া সম্ভব ছিল না। কর্তৃপক্ষ তারপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করে চড়া সুদের লোভ দেখিয়ে। এইভাবে কয়েক কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা এই সংস্থাটি চূড়ান্তভাবেই গ্রহণ করেছে।

এই কারখানায় প্রায় দশ হাজার মেট্রিক টন অ্যালুমিনিয়ম উৎপাদন হত। এবং কারখানার উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে চাহিদাও ছিল এবং এখনও আছে। সুতরাং শিল্পে মন্দা বা আর্থিক অনটনের অজুহাত এখানে খাটে না।

তবুও সংস্থাটিকে বন্ধ করে দেওয়ার পেছনে কর্তৃপক্ষের অসাধু ব্যবসায়িক বুদ্ধি কাজ করছে। কারণ বিভিন্ন সূত্রে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিমাণ মোট সম্পদ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ। কারখানা বন্ধ এই অজুহাতে ঋণের সমস্ত টাকাটা মেরে দেওয়াই কর্তৃপক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কর্মীদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাতর আবেদন জানান হয়েছে কারখানা খোলানোর জন্য। কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

সংসদ সদস্য আমজাদ আলী এ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড খোলার ব্যাপার নিয়ে বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদবের সঙ্গে দেখা করে সংস্থাটির কর্মচারীদের কাছ থেকে পাওয়া আবেদনের ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। আলোচনাকালে শ্রীআলী কারখানাটিকে অবিলম্বে খোলার জন্য মন্ত্রীমহাদয়কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

শর্মিষ্ঠা বর্মণ

বাড়ীর ক্লাশে মহিলাদের গীটার শেখাচ্ছেন। ২৪১/এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

হল্লন

মেহনতী মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার

গোর্কির মা

নাট্যরূপ : বিষ্ণু চক্রবর্তী

আলো : তাপস সেন

নির্দেশনা : জ্যোতিপ্রকাশ

১লা এপ্রিল রঙ্গনা সাড়ে ছ'টা

হলে টিকিট

৫, ৩, ২, ১,

সন্ত্রাস

(৩য়পৃষ্ঠার পর)

তার উপরে চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে। ফ্যাসিবাদকে নিজের ঘাঁটি শক্ত করতে দেওয়া চলবে না। যেখানে ও যখনই ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দেবে সেখানে এবং তখনই তাকে প্রতিহত করতে হবে। ফ্যাসিবাদকে নতুন ঘাঁটি গড়তে দেওয়া চলতে পারে না। স্থানীয় সংগঠনগুলির তরফ থেকে, স্থানীয় চুক্তির ভিত্তিতে স্থানীয় গণঅভিযান গড়ে তোলার উপর আমাদের সবথেকে বেশী জোর দিতে হবে।" (ঐ)

যদি আমরা জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি হারাতে না চাই, যদি আমরা ফ্যাসিবাদের বলি হতে না চাই, যদি দেশে স্বৈরাচারী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে না, চাই তবে আমাদের অবিলম্বে প্রতিটি এলাকায় জনগণের যুক্ত মোর্চা গড়ে তুলে ফ্যাসিবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আগেই তার বিরুদ্ধে জনা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যে পার্টি ফ্যাসিবাদের সমুখীন হয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে বারে বারে শুধু পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেয়, যে পার্টি ফ্যাসিবাদী বুর্জোয়াদের নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করতে দেয় সে পার্টি নিশ্চয়ই শ্রমিক শ্রেণীকে পরাজয়ের মধ্যে ঠেলে দেবে।"

ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস আজ নিশ্চিতভাবে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় লেনিনের বক্তব্য অবশ্যই আমাদের পথ দেখাবে। লেনিন লিখেছেন—"গৃহযুদ্ধের পাঠশালা কোন মানুষকেই অব্যাহতি দেয় না। এ এক নিদারুণ পাঠশালা। প্রতিবিপ্লবের জয়, ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের পাশবতের মত উন্মত্ত আচরণ, গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিপ্লবীদের বর্বর শাস্তিদান ইত্যাদিও নিশ্চিতভাবেই এর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিভিন্ন জাতি এই বেদনাদায়ক পাঠশালায় ঢুকেছে দেখে একমাত্র পণ্ডিতি-ফলানেওয়ালা আর মানসিকভাবে পঙ্গু জীবন্মৃতদেরই প্রাণে ব্যথা লাগতে পারে। কিভাবে গৃহযুদ্ধ চালাতে হয় এই পাঠশালা তা নিপীড়িত শ্রেণীসমূহকে শেখায় এই পাঠশালা শেখায় কোথায় কি করে সাফল্য মণ্ডিত বিপ্লব করতে হবে। নিপীড়িত, বুদ্ধিহীন অশিক্ষিত ক্রীতদাসদের মনে সর্বক্ষণই যে ঘৃণা ধিকি ধিকি জ্বলে এই পাঠশালা আজকের দিনের ক্রীতদাসদের মনে সেই ঘৃণাকেই লেলিহান করে তোলে আর যেসব ক্রীতদাস তাদের এই দাসত্বের লজ্জা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে তাদের চালিত করে মহত্তম ঐতিহাসিক কীর্তির পথে।" (ব্রিটিশ কর্তৃক উদ্ধৃত)

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল ৮৫ ॥ ৪০ পয়সা

জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের নামে কংগ্রেসী ছাত্র-যুবদের গুণ্ডামী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং কালো-পতাকা প্রদর্শন করতে গিয়ে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস দলবদ্ধভাবে বুধবার বিকেলে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় এক নজিরবিহীন বেপরোয়া গুণ্ডামী চালিয়ে নিজেদের মুখেই চুনকালি মাখল। জয়প্রকাশের আন্দোলনের প্রতি কৌতূহলী সমস্ত মানুষ এদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের ওপর দেখলেন ওরা "সুশৃঙ্খল জয়প্রকাশ বিরোধী বিক্ষোভের" নামে কিভাবে ইটপাটকেল ছুঁড়ে কয়েকজন জয়প্রকাশের সমর্থককে ঘায়েল করল, স্টুডেন্ট হলের সভায় কাঁদা ছুঁড়ল, জয়প্রকাশের গাড়ীকে দুমড়ে মুচড়ে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ওঁর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভা বানচাল করল। সবাই ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেসী এবং যুব সংঘের পাণ্ডাদের এই মারমুখী অবস্থা দেখে একরাশ ঘৃণা নিয়ে একবাক্যে বলেছে : ওরা অপ্রকৃতিস্থ ভীত তাই এই দৌরাত্ম্য চালাচ্ছে।

এদিন সকাল থেকেই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় চাপা উত্তেজনা, এক উষ্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত এলাকা পুলিশ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। চারিদিকে কালো পতাকায় ছয়লাপ। পুলিশ ভ্যান এদিক সেদিক টহল দিচ্ছে আর সেই সঙ্গে জয়প্রকাশ বিরোধী ধ্বনি দিয়ে জীপ আর প্রাইভেট কারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাত্র পরিষদ যুব কংগ্রেসের পাণ্ডারা।

বেলা এগারোটা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে ছাত্র পরিষদ ও শিক্ষা বাঁচাও কমিটি যুব কংগ্রেস একযোগে জয়প্রকাশ বিরোধী সভা শুরু করেছে। যুব ছাত্র নেতারা একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

কালো পতাকা

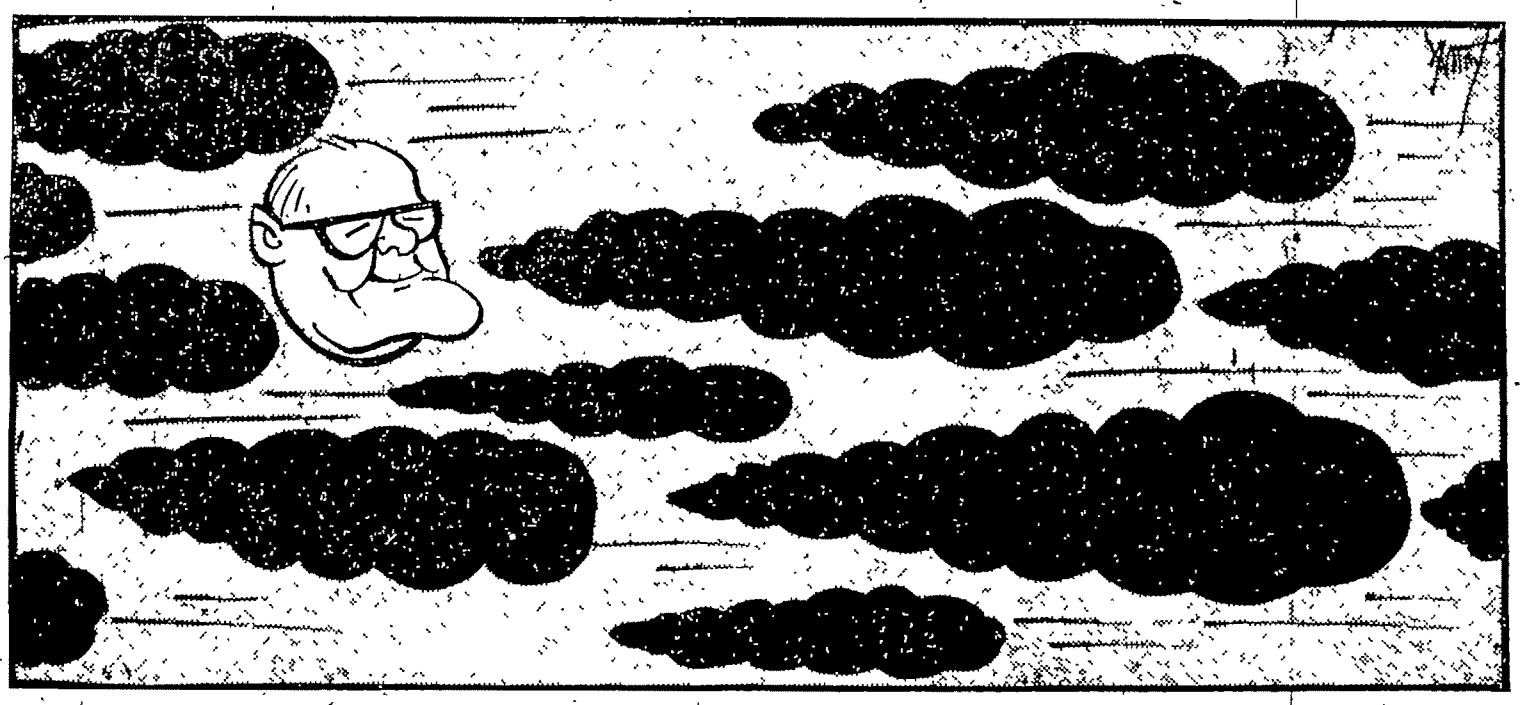

জওহরলাল নেহরুর নাম নিয়ে ফলাও কারবার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জওহরলাল নেহেরুর নাম নিয়ে একটি ফলাও ব্যবসা যদি দেখতে চান তবে কলকাতা ময়দানের দক্ষিণ পূর্ব কোণের দিকে আসুন। দেখবেন, জওহর শিশুভবনের ছয়তলা বাড়ী উঠেছে ময়দানের মধ্যে। যে এলাকায় জমির দাম কাঠা প্রতি অন্ততঃ এক লাখ টাকা, সেই এলাকায় এই শিশুভবনের পরিচালক বলে কথিত জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে বারো কাঠা জমি নিরানব্বুই বছরের লীজে দেওয়া হয়েছে। কোন দামই নেওয়া হয় নি। ভাড়া বছরে মাত্র একান্ন টাকা! এই শিশুভবনের জন্যে প্রবেশ মূল্য নেওয়া হচ্ছে।

এখন পরিচালকরা ইন্দিরা গান্ধীর নাম মুলধন করে এগুচ্ছেন। এখানে নাকি ইন্দিরা শিশু উদ্যান করা হবে। সরকারী জমিতে এই ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ কমিশনার বার বার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের পরিচালক যুগল শ্রীমল অনেক বেশী ক্ষমতাবান। এই মারোয়াড়ী ভদ্রলোক বিনা পয়সায় জমি যোগাড় করেছিলেন প্রফুল্ল সেনের আমলে ছেষট্টি সালে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্যের আমলে ভিত্তি স্থাপনা করা হয়। মাঝখানে সেই কুখ্যাত রাজ্যপাল ধর্মবীর ফুলের মালা পরে এখানকার বেকানুনী কাজকে আরো প্রশ্রয় দিয়ে যান। আর এখন সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার আমলে চলেছে বেকানুনী কাজের অবাধ প্রসার। বেকানুনী, বিনা প্লানে ছয়তলা বাড়ী উঠেছে। বিনা অনুমতিতে ওরা ময়দানের পুকুর ভরাট করছেন। পুলিশ কমিশনার আপত্তি করছেন, মৎস্য দপ্তর চীৎকার করছে। কিন্তু যুগল শ্রীমল কোন পরোয়াই করছেন না।

কেউ ওকে প্রশ্ন করছে না, কলকাতা ময়দানের জমিতে জওহর শিশুভবনের যে রোজগার হচ্ছে সে টাকা কোথায় যাচ্ছে? জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের ট্রাস্টি কারা,

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চাঁদু চক্রবর্তীর খোলা চিঠি

জনৈক এম এল এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

সম্প্রতি দর্পণ সম্পাদকের নামে একটা চিঠি এসেছে। চিঠিটি মুখ্যমন্ত্রীকে সম্বোধন করে লেখা। পত্রলেখক চিঠির নীচে নাম সই করেছেন চাঁদু চক্রবর্তী। ভাষাগত প্রয়োজনীয় সংশোধন করে আমরা চিঠিটি আনুপূর্বিক নীচে ছেপে দিলাম। শুধু মহিলা সম্পর্কিত কয়েকটি লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার—

মহাশয়,

আমি শ্রীচাঁদু চক্রবর্তী নিম্নলিখিত ঘটনা আপনার সুবিচারের জন্য জানাচ্ছি। বিগত সাতষট্টি সাল থেকে আমি বেলঘরিয়ার প্রদীপ পালিতের সহিত ছিলাম। নির্বাচনের পূর্বে প্রদীপ আমাকে কারাসতের কোন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য বেলঘরিয়া থানায় বিক্ষোভ জানায় (সেই সময় থানার ও সি সব জানেন) "চাঁদু যদি হয় খুন বেলঘরিয়ায় জ্বলবে আগুন।" ভোট হওয়ার পর ভোট গণনা কেন্দ্রে ষোল হাজার ভোটপত্র নষ্ট করে আমরা প্রদীপকে জয়ী করাই। তারপর শুরু হয় রাজনৈতিক দলাদলি। ইনু মিত্র ও তার দলবল ছাড়া পায়। আমাকে প্রদীপ বেলঘরিয়া ইনুশূন্য করার জন্য সবরকম মদত দেয়। আমিও ছায়ার মত ওকে অনুসরণ করি। বেলঘরিয়ার বুকে দুই দলে মারামারি শুরু হয়। আমি প্রদীপের কথামত নকশাল ছেলেদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধি (মানিক মুখার্জী—বর্তমানে নিমতায় জোড়া খুনের ব্যাপারে এ্যাবেস্ট হয়েছে, হিতেন, দিলীপ বিশ্বাস, ফেলটুস, অতীন দাস)। ফেলটুস আমাকে প্রদীপের চালাকির জন্য কয়েকটি কোপ দেয়, ফলে আমার মাথায় বাইশটি স্টীচ করতে হয়। বেলঘরিয়া থানায় রেকর্ড আছে। এম এল এ হোস্টেলে প্রদীপের কুকীর্তির বহু কথা কাগজে উঠেছে। তার নীরব সাক্ষী আমি। প্রদীপের গাড়িতে এগারো বার ডাকাতি করতে গেছি আর্মস প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য।

ফলস ব্যাণ্ডেজ বেঁধে প্রদেশ কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের নেতাদের সামনে গিয়ে ইনুর অত্যাচারের কথা বলেছি। বেলঘরিয়া চাউল সমিতির টাকা লুট করেছি (বেলঘরিয়া থানায় কেস রয়েছে)। বাধা দেবার জন্য গোপাল ঘোষাল নামে আমার বন্ধুর ষাট বছরের বাবাকে টাউন কংগ্রেসের সভাপতি পরামেশ মৌলিকের নির্দেশে পার্টি অফিসের সামনে হত্যা করেছি। থানায় সব লিপিবদ্ধ আছে)। ইনু মিত্র যে বাড়ি থাকত প্রদীপ পালিত ও থানার সহযোগিতায় তা আক্রমণ করি। স্টেন গানের গুলীতে নীলু নামে ইনুর এক চেলা মারাত্মক ভাবে জখম হয়। নন্দননগরে দুই ভাই মঙ্গলা ও ফুলটনকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রফুল্লনগরে প্রদীপ ও পুলিশের সাহায্যে পেট কেটে পায়খানার মধ্যে ফেলে দিই (খবরের কাগজে ঘটনাগুলি ওঠে)। এরাও ইনু মিত্রের চেলা ছিল। বিধানসভায় প্রদীপ ইনু মিত্রর বিরুদ্ধে যেদিন ভাষণ দেয় সেদিনও আমি প্রদীপের সঙ্গে ছিলাম। প্রদীপের নির্দেশে আমি নন্দননগরের যুব কংগ্রেস সভাপতি রবি ঘোষকে বেলঘরিয়া স্টেশন থেকে তুলে এনে টাউন কংগ্রেস অফিসে পরমেশ মৌলিকের সামনে প্রচণ্ড মারধোর করি (থানায় কেস রয়েছে)। আজ সেই প্রদীপ পালিত ইনু মিত্র ও তার দলবলের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে। আর আমাকে বেলঘরিয়া ছাড়া হতে হয়েছে। এদিকে পুলিশ

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

অষ্টাদশ বর্ষ একাদশ সংখ্যা
শুক্রবার, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৫

আতঙ্কে বিকারগ্রস্ত

কলকাতায় জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ও সুব্রত মুখার্জীর নেতৃত্বে কংগ্রেসী ছাত্র-যুব নামধারী গুন্ডারা বিক্ষোভের নামে যেভাবে পুলিশের উপস্থিতিতে বেপরোয়া গুন্ডামী চালালো তাতে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, কংগ্রেসীরা এখন জয়প্রকাশাতঙ্ক রোগে ভুগছে।

কংগ্রেসী নেতা উপ্সনতা যুবনেতা ছাত্র নেতারা মুখে যতই লম্বা চওড়া বুলি কপচান, গদগদ কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের কথা আওড়ান এবং তথাকথিত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন না কেন তাঁরা নিজেদের ভাল করেই চেনেন। গত তিন বছরে কে কত গুছিয়েছেন তাও পরস্পরের অজানা নয়। দেশ সমাজতন্ত্র নয়, অধঃপাতের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে সে কথা দেশবাসী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন আর এসব নেতারা বোঝেন না এটা অবিশ্বাস্য। নূন্যতম সামাজিক ন্যায়বিচারও আজ অন্তর্হিত এবং সাধারণ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত এটাও তাঁরা জানেন বলেই প্রতিবাদের ক্ষীণ কণ্ঠকেও আজ ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস ও গুন্ডামীর সাহায্যে স্তব্ধ করে দিতে চান।

পশ্চিমবঙ্গে জয়প্রকাশের অনুগামীর সংখ্যা নেহাৎই নগণ্য। নব নির্মাণ সমিতিতে যেসব দল ও নেতা ভীড় করেছেন তাঁদের প্রভাবও খুব বেশি নয়। আট পার্টি এখনও সক্রিয়ভাবে জয়প্রকাশের আন্দোলনে যোগদান করে নি। বুধবার জয়প্রকাশের দুটি সভাই ছিল নির্দোষ প্রকৃতির এবং তার জন্য কোন ব্যাপক প্রস্তুতিও নেওয়া হয় নি। কিন্তু তাতেই প্রিয়-সুব্রত রাজপথে নেমে যেভাবে গুন্ডামীতে উস্কানী দিলেন তাতে একথা প্রমাণিত যে, তাঁরা ভীষণ আতঙ্কিত। আতঙ্কিত হবারই কথা। গত তিন বছর ধরে তারা যে অপকর্ম করেছেন তার বিচারের দিন তাঁদের পিঠের চামড়া কি আর আস্ত থাকবে? আতঙ্কিত এশিয়ার মুক্তিসূর্যও। তাই প্রায় প্রতিদিনই তিনি প্রলাপ বকছেন। সম্প্রতি তিনি জয়প্রকাশের আন্দোলনের বিশেষ কোন প্রভাব নেই বলে মন্তব্য করেছেন। তাহলে ম্যাডাম, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

আসলে উল্টোটা ঘটছে। জয়প্রকাশের আন্দোলন ক্রমশই ব্যাপকতা লাভ করছে, বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই এত আতঙ্ক

ইসকোর মাল পাচার ঃ নায়ক কংগ্রেসীরা

বার্ণপুরের ইস্কো কারখানা থেকে মাল চুরি করে পাচার করার সময় ট্রাক সমেত কয়েকজনের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া গেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, ইস্কোর নীলাম করা অব্যবহৃত লৌহ সরঞ্জাম ট্রাক মারফৎ বাইরে আনার সময় ট্রাক সমেত কয়েকজনের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া গেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, ইস্কোর নীলাম করা অব্যবহৃত লৌহ সরঞ্জাম ট্রাক মারফৎ বাইরে আনার সময় জনৈক সিকিউরিটি অফিসার সন্দেহক্রমে ট্রাকটি তল্লাশি করেন এবং দেখেন যে স্ক্রাপ মালের নিচে মূল্যবান কনডেনসার বেল্ট রয়েছে।। এই ঘটনা জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসৌরীন চাটার্জীকে জানানো হলে তিনি অনুসন্ধান করে দেখেন যে এই চুরির ব্যাপারে উচ্চপদস্থ অফিসাররা জড়িত। সংশ্লিষ্ট ট্রাকসহ কয়েকজনকে আটক করা হয়। ইস্কোর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীচাটার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দর্পণের প্রতিনিধিকে জানান যে এই ব্যাপারে শীঘ্রই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও জানান যে জনৈক ইউনিয়নের নেতা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন যাতে এই মামলা বেশীদূর না গড়ায়। তিনি ঐ নেতার নাম প্রকাশে অসম্মতি জানান, তবে ঐ নেতা আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নভুক্ত বলে তিনি জানান। বিভিন্ন মহল থেকেও তাঁর ওপরে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন যে, তিনি এই ব্যাপারে কোনরকম চাপের কাছে মাথা নত করবেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন পূর্বে বিধানসভাতেও ইস্কোর দ্রব্যাদি চুরি হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সরষের মধ্যেই ভূত। কেননা এই ব্যাপারে জড়িত বলে যাদের নাম জানা গেছে তারা কংগ্রেসের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে জানা যায়।

গোবিন্দ নস্করের চেলাদের গুণ্ডামী

ক্যানিং অঞ্চলের দুটি গ্রাম শ্রীনগর ও দুর্গাপুরের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে রাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ নস্করের চেলারা সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে। কুড়িটি বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে, ফলে সেই সব বাড়ির বাসিন্দারা গৃহহীন। তাদের সমস্ত জিনিসপত্র লুট করা হয়েছে। মেয়েদের ও বাচ্চা ছেলেদের প্রচন্ড প্রহার করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের বাসিন্দারা ভীত সন্ত্রস্ত।

কলকাতার সান্ধ্য দৈনিক "হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড" এই খবর দিয়েছে। তারা লিখেছে যে, গত গত পয়লা মার্চ শ্রীনগর গ্রামে ধানমোতে রাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ নস্করের একজন ঘনিষ্ট সহযোগী আজিবর রহমান মোল্লার মৃতদেহ পাওয়া যাবার পরই এই দলবদ্ধ গুন্ডামী শুরু হয়। গত সতেরই ফেব্রুয়ারী ক্যানিং অঞ্চলের প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য আজিবুর রহমান মোল্লা শ্রীনগরে রাত্রে তাস খেলার জন্য আমন্ত্রিত হয়। সেখানে যাবার পর থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

প্রকাশ, দুর্গাপুরের অধিবাসী রেশন দোকানের মালিক আবদুল মজিদের সঙ্গে রহমানের বিরোধ ছিল। মজিদের দোকানে কিছু বেআইনী ব্যাপার ঘটে। এই সুযোগে রহমান মজিদের ডীলারশিপ নাকচ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। গুন্ডারা মজিদের এবং তার আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেও হানা দেয়। কিন্তু ঘুটিয়ারীশরিফ আউটপোস্ট ও ক্যানিং থানায় পুলিশের সাহায্য চেয়ে পাওয়া যায়নি এবং পুলিশ ডায়রী নিতেও অসম্মত জানায় বলে অভিযোগ।

চাঁদু চক্রবর্তীর চিঠি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইনুর দলবল খুঁজছে। সরস্বতী প্রেস থেকে সে আমার সাহায্যে ৮০৩৩ বোন্দসে সই করে চল্লিশ হাজার টাকা মেরেছে। আই এম সি থেকে মেসিন বিক্রয় করে সাত হাজার টাকা নিয়েছে। মীনাক্ষীর নামে সাতচল্লিশ নং রুটে বাস পারমিট দিয়েছে। হিন্দুস্থান সেফটিগ্লাস থেকে পাঁচ হাজার টাকা মেরেছে। তা দ্বারা আমাকে দিয়ে প্রতিটি ফ্যাক্টরী থেকে হাজার হাজার টাকা কামিয়েছে। কলকাতায় এমন কোন বার নেই আমি প্রদীপের সঙ্গে মেয়ে নিয়ে আনন্দ করিনি। প্রদীপ ও আমি যৌথভাবে প্রফুল্ল নগর আক্রমণ করেছি (স্টেটসম্যান কাগজে উঠেছে)। দেশপ্রিয় নগরে প্রদীপের নির্দেশে রাতের অন্ধকারে গোলাগুলী ইনু মিত্রের চেলার ওপর চালিয়েছি। দুপুরে বিডার সামনে বোমাবাজী করেছি। সমস্ত ঘটনা বেলঘরিয়া থানায় লিপিবদ্ধ আছে। আজ আমার মত আঠারো উনিশ বছরের ছেলে গুন্ডা হলাম কার পাপে? কে এর জন্য দায়ী? প্রদীপ এম এল এ, হয়তো তাই. তার সব অপরাধ মাফ হয়ে যাবে। এর কি কোন বিচার নেই? আজকে একটি সত্য কথা বলব। যে ছেলেটি বেলঘরিয়ার বুকে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; যে আজও তার লাইন থেকে সরেনি, অর্থাৎ প্রিয়দা ও সুব্রতদার চিন্তাধারা রাজনীতি করে। আমি প্রদীপের নির্দেশে তার বহু ক্ষতি করেছি।

ইতি
চান্দু চক্রবর্তী

ফলাও ব্যবসা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কিভাবে হিসেবপত্র রাখা হয়, এসব অপ্রীতিকর প্রশ্ন কেউই করছে না। যুগল শ্রীমল করিৎকর্মা ব্যক্তি। রাজ্যে যে সরকারই আসে সেই সরকারেরই কৃপাদৃষ্টি উনি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। আর এই কৃপাদৃষ্টির ফলে কলকাতা ময়দানের একটা বিরাট এলাকায় বাড়ীঘর, গাড়ী রাখার জায়গা তৈরী হচ্ছে। এখন শুনছি, ইন্দিরা গান্ধীর নাম দিয়ে একটি বাগান করে সেখানে টয় ট্রেন বসানো হবে।

ময়দানের এই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গড়ে উঠেছে জওহর শিশুভবন নাম দিয়ে এক বিরাট অট্টালিকা। এখানে দর্শনী নেওয়া হয় প্রতি শিশু পিছু পঁচিশ পয়সা আর বড়দের জন্যে পঞ্চাশ পয়সা। শিশুভবনটি পরিচালনা করেন জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ (ন্যাশানাল কালচারাল এসোসিয়েসন্স) নামে একটি প্রতিষ্ঠান। কারা এদের ট্রাস্টি তার খবর কলকাতা ময়দানের কর্তা কলকাতা পুলিশ জানে না। সম্ভবতঃ রাজ্য সরকারও জানেন না। তবু এরা জমি পায় ছেষট্টি সালের বাইশে ডিসেম্বর। জমির কর্তা হচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু দেখা গেল কলকাতা পুলিশকে কিছু না জানিয়ে তদানীন্তন শিক্ষা দপ্তর এই সংস্কৃতি পরিষদকে নিরানব্বই বছর লীজে কলকাতা ময়দানের বারো কাঠা জমি দিলেন রেজিষ্ট্রি করে। ভাড়া বছরে মাত্র একান্ন টাকা। উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা দপ্তরের কোন এক্তিয়ারই নেই ময়দানের জমি সম্পর্কে। তবু দেওয়া হল এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর তীব্র প্রতিবাদ করে ঝাপারটি একরকম মেনে নিলেন। আরো উল্লেখযোগ্য এর পাশেরই একটি জমি কলকাতা রোটারী ক্লাবকে দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছরের মেয়াদী লীজে। আর জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের বেলায় লীজের মেয়াদ নিরানব্বই বছর। তদ্বিরের কি মহিমা।

দেখা গেল সংস্কৃতি পরিষদ কোন অনুমতি না নিয়ে কোন প্ল্যান না দেখিয়ে বাড়ী করল। একতলা দোতালা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত বাড়ী হয়ে গেল। কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকা এটি নয়। এলাকা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের। পুলিশ কিছু জানতেই পারল না। পুলিশ কমিশনার তীব্র আপত্তি জানাতে শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার পাঁচতলা পর্যন্ত বাড়ীর অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। দেখা গেল, পাঁচতলার পর ওরা ছয়তলাও করে ফেলেছে।

গুরুতর বেকানুনী কার্যকলাপ। কিন্তু কলকাতা পুলিশে এক ক্ষণস্থায়ী পুলিশ কমিশনার এসেছিলেন। নাম তাঁর আর এন চ্যাটার্জী। একাত্তর সালের আটই সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের কাছে এক চিঠিতে তিনি সংস্কৃতি পরিষদের অননুমোদিত বাড়ী জেলার তীব্র সমালোচনা করলেও সেই চিঠিরই শেষদিকে তিনি বেকানুনী তোলা ছয়তলা বাড়ীর শুধু অনুমোদনই দিলেন না তাতে আরও তিনটি তলা ওঠাবার অর্থাৎ ঐ বাড়ীকে নয়তলা বাড়ী করবার অনুমতি দিয়ে গেলেন। চ্যাটার্জী সাহেব বোধহয় তার আগেকার পুলিশ কমিশনার পি কে সেন কিংবা তারই অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরীর মন্তব্য পড়বার সময় পান নি।

এইভাবে গড়ে উঠলো ছয়তলা অননুমোদিত বাড়ী কলকাতা ময়দানের বুকে। কিন্তু এই বাড়ীতে ঢুকবার রাস্তা হচ্ছে চৌরঙ্গী দিয়ে ট্রাম লাইন পেরিয়ে। এটি শিশুদের পক্ষে বিপজ্জনক। তদানীন্তন রাজ্যপাল ধর্মবীর বলেছিলেন জমির পশ্চিম দিকে রবীন্দ্রসদনের পাশ দিয়ে বারো ফুট রাস্তা পুকুরের ওপর দিয়ে (ভাসমান) করা যেতে পারে। কিন্তু তা করা হোল না। বছর দেড়েক আগে মন্ত্রিসভার শান্ত মানুষ পূর্তমন্ত্রীর আনুকূল্যে সংস্কৃতি পরিষদ সংগ্রহ করল। তাঁর আনুকূল্যে পুলিশ কমিশনার সংলগ্ন ব্রিজতলা পুলিশ ফাঁড়ির জমি দিয়ে সাময়িকভাবে লরী যাতায়াত করতে দিলেন। দেখা গেল পুকুর ভরাট চলছে। কমিশনার আপত্তি করে বললেন এতবড় জলাধার বন্ধ করা চলবে না। আগুন লাগলে জল কোথায় পাওয়া যাবে। মৎস্য দপ্তর আপত্তি তুলে বলল, তাঁরা মাছের চাষ করেছে এই পুকুরে। পুকুর যেন ভরাট না করা হয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে? আজও পুকুর ভরাটের কোন সরকারী আদেশ নেই। অথচ এটির অর্ধেক ভরাট করা হয়ে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়। পুলিশ কমিশনার দেখলেন সাময়িকভাবে যে রাস্তা ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে সেটিকে প্রায় স্থায়ী দখলে আনার চেষ্টা হচ্ছে এবং পুকুর ভরাট করে মোটর গাড়ী রাখবার জায়গা তৈরী হচ্ছে। ধৈর্যের বোধহয় সীমা আছে। তাই পুলিশ কমিশনার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। আর জানা গিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে এক তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন এই এলাকায় কোন শিশুভবন চলতে দেওয়া যায় না। কেননা আগামী দিনে দ্বিতীয় হুগলী ব্রিজ তৈরী হলে, লোয়ার সারকুলার রোডটি দিয়ে অসংখ্য যানবাহন চলবে নতুন ব্রিজের প্যথ। তাছাড়া পাতাল রেলের একটি ষ্টেশন হবে রবীন্দ্র সদনের কাছে। এলাকাটি প্রচন্ড জনবহুল অঞ্চলে পরিণত হবে। এখানে শিশুভবন চলে না। শোনা যাচ্ছে পরিষদ এখানে টয় ট্রেনও বসাবে। পুলিশ কমিশনার ঘোরতর আপত্তি তুলে বলেছেন, টয় ট্রেন লবণ হ্রদ এলাকায় নির্মায়মান বিধানচন্দ্র শিশু উদ্যানে হওয়া উচিত এখানে কিছুতেই নয়। কিন্তু তবু সম্প্রতি এখানে ঘুরে দেখলাম পুকুর ভরাটের কাজ চলছে বিনা অনুমতিতে। প্রায় সবটাই হয়েছে এইভাবে।

॥ ষষ্ঠ পর্ব ॥

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস : ১৯৫৯

দিলীপ মজুমদার

আগস্ট মাসের শুরু থেকেই পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় শুরু গেল খাদ্য আন্দোলনের প্রস্তুতি। আন্দোলনের এই রূপরেখাটি দেশের সামনে তুলে ধরার জন্য সমসাময়িক সংবাদপত্রের শিরোনামগুলির সাহায্য নেওয়া যাক : আরামবাগ থানায় ছয় দিনের পদযাত্রা, কৃষক সমিতির উদ্যোগে বাঁকুড়ায় জনসভা, উত্তরপাড়া-কোন্নগরে খাদ্য কনভেনশন, বীরভূমের নসিবপুরে ভুখ মিছিল, মহেশতলায় খাদ্য সম্মেলন, গঙ্গারামপুরে বি ডি ও ঘেরাও ও ভুখ মিছিল প্রভৃতি। খাদ্য আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি হল আরো দুটি কারণে। সমসাময়িককালে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ভাবে উচ্ছেদ করল কেরলের কমিউনিস্ট সরকারকে। এই জঘন্য প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ ক্রোধে ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় ঘটনা হল : জুলাই মাসের তিরিশ তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শ্রীবঙ্কিম মুখার্জী, শ্রীনিরঞ্জন সেন ও শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন গভর্ণর ও রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করলেন বাহাত্তর পৃষ্ঠা ব্যাপী এক স্মারকলিপি। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার এক চরম দুঃশাসন সৃষ্টি করছে এই মর্মে অভিযোগ করে সংবিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানানো হয়েছিল। চাঞ্চল্যকর সেই সকল অভিযোগের মধ্যে ছিল : সরকারী যন্ত্রের অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অর্থের অপচয়, ট্যাক্সি-লরি-ট্রাক বাস এবং কন্ট্রাক্ট ও সমবায় ঋণ বিতরণে স্বজনপোষণ, নির্বাচনে দলীয় স্বার্থে সরকারী শাসনযন্ত্রের অপব্যবহার, দলীয় স্বার্থে সরকারী রিলিফ, দান কায়েমী স্বার্থকে পুষ্ট করার জন্য জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পেটোয়া যন্ত্রে পরিণতকরণ, কল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি শত্রুতা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা সমূহে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার দানে অস্বীকৃতি, তদন্ত কমিটি সমূহের রিপোর্ট ধামাচাপা দেওয়া, বিধানসভার সর্বসম্মত প্রস্তাবসমূহ অগ্রাহ্য করা, রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা, মৌলিক অধিকার পদদলিত করার উদ্যোগ প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত খাদ্য সংকটের প্রশ্ন লোকসভাতেও উত্থিত হল। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সদস্যারা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর মাধ্যমে অভিযোগ করেন : একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের চালের মূল্য তালিকা লোকসভায় পেশ করা হয়েছে, স্পীকার খাদ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের চালের মূল্য তালিকা পেশ করার নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের পর পশ্চিমবঙ্গে চালের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। জনগণের প্রচণ্ড ক্রোধ ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে বিভিন্ন জেলার মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি রাজ্য সরকারের খাদ্যনীতির সমালোচনা করেন। উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত করা হয় : "দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল খাদ্যনীতির দরুণ একাধারে মজুতদার ও মুনাফাবাজদের যদৃচ্ছ মুনাফার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইতেছে, অন্যদিকে পল্লী অঞ্চলের গরীব কৃষক ও উৎপাদক শ্রেণীকে বিশেষভাবে প্রতারিত করা হইতেছে।" (যুগান্তর ৬-৮-৫৯)।

আটই আগস্ট দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে পূর্বনির্দিষ্ট রাজ্য খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। মোট সাতশ কুড়ি জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন, প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল শ্রমিক ও কৃষক। পনেরোই জুন থেকে খাদ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য রাজ্যের জনগণকে অভিনন্দন জানানো হল। ইতিপূর্বে পরবর্তী আন্দোলনের জন্য যে পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কথা বলা হয়েছিল, হাওড়া, বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, হুগলী পুরুলিয়া, নদীয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার রিপোর্টের মাধ্যমে দেখা গেল যে, ইতিমধ্যে তিরিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয়েছে। সম্মেলনে অতীতের আন্দোলনের বিশ্লেষণ করে নূতন কার্যক্রমের রূপরেখা নির্দিষ্ট করা হল। যে কুড়ি দফা দাবির ভিত্তিতে কমিটির নেতৃত্বে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয় সেগুলি হল : সর্বশ্রেণীর মানুষকে সাড়ে সতেরো টাকা দরে চাল সরবরাহ, সমস্ত অঞ্চলে সংশোধিত রেশন চালু করে দেড় সের চাল ও এক সের গম সপ্তাহে দুই কিস্তিতে দেবার ব্যবস্থা, খোলাবাজারে বিশবাইশ টাকা দরে চাল বিক্রয়ের নিশ্চয়তা সৃষ্টি, পাঁচ লক্ষ টন খাদ্য রিজার্ভ কেন্দ্রকে সমস্ত ঘাটতি মেটানোর ভার নেওয়ার ব্যবস্থা, মাথাপিছু দেড় টাকা হারে ব্যাপকতর ভিত্তিতে টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা, ব্যাপক ঋয়রাতি সাহায্য দান, প্রচুর পরিমাণে কৃষিঋণ ও বলদ ক্রয় ঋণ দান, সর্বস্তরে খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন, মজুত বিরোধী অভিযান চালিয়ে জনগণের সহযোগিতায় উদ্ধার করা ধানচাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা। এই সকল আশু দাবি ব্যতিরেকে পৌনঃপুনিক খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে সম্মেলনের মঞ্চ থেকে সরকারের নিকট নাস্ত জমি অবিলম্বে ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে, বেআইনী হস্তান্তর অচল ঘোষণা করে অনুরূপ হস্তান্তরিত জমি বাজেয়াপ্ত করতে হবে, ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে, কৃষক কর্তৃক দখলীকৃত জোতদারের পতিত জমিতে কৃষকদের অধিকার দিতে হবে, জমি থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করতে হবে, এ বছর বকেয়া ঋণ ও খাজনা আদায় স্থগিত রাখতে হবে ও ক্রোক পরোয়ানা জারী বন্ধ করতে হবে, সেচের ব্যবস্থা এবং বীজ-সার সরবরাহ করতে হবে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে, খাদ্য ও কৃষি দপ্তর মিলিয়ে একটি দপ্তর করতে হবে, খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় ব্যবসা ও খুচরা দোকান মারফৎ নির্দিষ্ট দরে বন্টন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। আটই অগস্টের রাজ্য খাদ্য সম্মেলন পরবর্তী আন্দোলনের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু সংশোধনী সহ ডাঃ রণেন সেনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এস ইউ সি দলের পক্ষ থেকে শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। তবে "সম্মেলনে গৃহীত না হলেও তিনি উপস্থিত সকলকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, তাঁহার দল প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বান্তঃকরণে আন্দোলন করিবেন।" (বসুমতী, ৯-৮-৫৯)। দশই আগস্টে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী বিশ্লেষণ করে বলেন, ব্যাপক আইন অমান্য, বিক্ষোভ ও পিকেটিং এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ের মূল ধ্বনি হবে : খাদ্য সম্পর্কে হয় জনগণের দাবি গ্রহণ কর নচেৎ পদত্যাগ কর।

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসরেই রাজ্য খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ড থেকে কমিটির মোট ষোলজন সদস্য পদত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। তেরোই আগস্ট মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীতারা দত্ত, সর্বশ্রী হেমন্ত বসু, অমর বসু, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বরদা মুকুটমণি, প্রমোদ সিংহ রায়, জ্যোতি বসু, যতীন চক্রবর্তী, সুবোধ বানার্জী, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, বিমলেন্দু মুখার্জী, অজিত সেন, অনিল চ্যাটার্জী যুক্ত পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। সেই সঙ্গে বাকি তিন জন লোকসভা সদস্যকেও কমিটি পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। বামপন্থী সদস্যদের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ড থেকে শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য এম এল সি-ও পদত্যাগ করেন।

ইতিপূর্বেই আমরা বামপন্থী দল হিসেবে পরিচিত পি এস পি-র কিছু কার্যক্রমের পরিচয় দিয়েছি। খাদ্য আন্দোলনে এই দলটি প্রথম থেকেই বিরোধীদের বিরোধী ভূমিকায় নেমেছিল। শাসক দলের সঙ্গে খাদ্য আন্দোলন দমন করার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিল। পনেরোই আগস্ট সংবাদপত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এবং পি এস পি নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হল। খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভবনের জন্য চোদ্দই আগস্ট থেকে ডঃ ঘোষ ও ডাঃ রায়ের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছিল। ডঃ ঘোষ ও ডাঃ রায়ের যুক্ত বিবৃতিটি নিম্নরূপ : "পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। আলোচনার সময় খাদ্য, সাহায্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। বিশদ আলোচনার পরে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছি। (এক) প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি লোকের অন্যূন বিশ আউন্স করিয়া তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য শস্যের প্রয়োজন ধরিয়া লইয়া এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় পনেরো লক্ষ টন। পশ্চিমবঙ্গের মোট লোকসংখ্যার শতকরা আশি ভাগ প্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা হিসাব করা হইয়াছে। (দুই) কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত যে খাদ্যশস্য দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহার মোট পরিমাণ পনেরো লক্ষ টনের কম হইবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্যের বরাদ্দ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। (তিন) পল্লী অঞ্চলে সপ্তাহে একবারের পরিবর্তে দুইবার করিয়া রেশন দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। (চার) পল্লী অঞ্চলে রেশন কার্ড হোল্ডারদের শ্রেণী বিন্যাসে প্রত্যেকের ইউনিয়ন-বোর্ড টাক্সের ভিত্তির পরিবর্তে প্রত্যেকের জমির পরিমাণের ভিত্তিতে করাই অপেক্ষাকৃত ভাল উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। (পাঁচ) যে সকল কৃষক মাত্র দুই একর পর্যন্ত জমির মালিক এবং যাহাদের জমি সেচ এলাকার মধ্যে পড়ে নাই, তাহাদিগকে এক বৎসরের রাজস্ব রেহাই দেওয়া হইবে।। (ছয়) পশ্চিমবঙ্গে রেশনকার্ড প্রাপ্তদের মোটসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৮০০০০০ জন হইবে। পল্লী অঞ্চলে রেশনে চাউলের বরাদ্দ সপ্তাহে এক সের হইতে বৃদ্ধি করিয়া দেড় সের করা যায় কিনা তৎসম্পর্কে একটি প্রস্তাব আমরা আলোচনা করিয়াছি। বিষয়টি সম্পর্কে এখনও বিবেচনা করা হইতেছে।" (যুগান্তর, ১৫-৮-৫৯)। এই যুক্ত বিবৃতি ছিল প্রত্যাবর্তনমূলক। এতে জনসাধারণের সুবিধার ব্যাপার ছিল একটাই। একমাত্র সুবিধা সেচবহির্ভূত এলাকায় ছয় বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের এই বৎসর খাজনা দিতে হবে না, এর ফলে প্রায় কুড়ি লক্ষ উপকৃত হবেন, এটা ঠিক।—"বিবৃতির বাকী অংশ পরিসংখ্যানের কারচুপি, ভূয়া প্রতিশ্রুতি ও ফাঁকা সদিচ্ছায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য কামনায় পূর্ণ।" (স্বাধীনতা, ১৬-৮-৫৯)। এই যুগ্ম বিবৃতির পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি পৃথকভাবে দেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে যে সকল দাবি সরকারের নিকট উত্থাপন করেন সেগুলি যে অকিঞ্চিৎকর, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে তা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির নূতন বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য যারা শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলন সৃষ্টি করতে চান এমন সমস্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে নির্লজ্জ ও ক্ষমতাগর্বী হুমকী দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের ভাষায় ব্যাপারটা এই রকম : "আইন অমান্য দ্বারা রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে না। বরং ইহাতে লোকের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হইয়া একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। সরকার ইহা হইতে দিতে পারেন না, এবং পাইকারী হারে আইন অমান্য প্রতিরোধের জন্য সম্ভব-পর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন।". (যুগান্তর, (১৬-৮-৫৯)।

খাদ্য আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর অদূর ভবিষ্যতে যে ব্যাপক দমননীতি চালানো হবে, মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে তার আভাস ছিল। দমননীতি চালাবার পূর্বে বে-সরকারী প্রচারযন্ত্রগুলিকেও প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বাণীবাহক কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় সেই সুর বেজে উঠল। এই সকল এত্রিকার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল : প্রথমতঃ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ, দ্বিতীয়তঃ আন্দোলনকারী বামপন্থী নেতাদের হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তৃতীয়তঃ পি এস পি তথা ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হল : "আইন অমান্য আন্দোলন কর্তৃপক্ষের নিকট এমন এক চ্যালেঞ্জ যাহা কোন গভর্ণমেণ্টই উপেক্ষা করিতে পারেন না। পরিকল্পিত ব্যাপক আইন অমান্যের নেতাদের প্রতি ডাঃ রায় যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার যুক্তিযুক্ততায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। . . . . জনসাধারণের অভাব অভিযোগ খাঁটি সন্দেহ নাই, কিন্তু খাদ্যকে রাজনৈতিক নেতাদের খেলার বস্তু করিয়া তোলার অর্থ হয় না। . . . . মুখে যাহাই বলুন না কেন, বামপন্থী দল যে এ সপ্তাহে আন্দোলন সুরু করিতে যাইতেছেন তাহার উদ্দেশ্য খোলাখুলিভাবে রাজনৈতিক। এএ ব্যাপারে অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সহিত ডাঃ পি সি ঘোষের আচরণের পার্থক্য চোখে পড়িবার মত।" (১৭-৮-৫৯)। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হল : "মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার সুদীর্ঘ শাণিত

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

এস ইউ সির রাজনৈতিক চরিত্র

এস ইউ সির জন্ম হয় সম্ভবতঃ উনিশশো সাতচল্লিশ সালে। জন্মলগ্নে জন্মদাতারা ঘোষণা করেছিলেন—এটা কোন পার্টি নয়, দেশের যে সমস্ত চিন্তাবিদ মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস করেন তাঁদের আলোচনা কেন্দ্র হিসাবে এটাকে গড়ে তোলা হবে। উদ্দেশ্য হবে সঠিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুশীলনের মাধ্যমে এদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা। জানি না তাঁদের সে উদ্দেশ্য কতদূর সাফল্য লাভ করেছে, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তাঁদের প্রধান কাজ এখন অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সমালোচনার নামে তাদের এবং বিশেষ করে সি পি এমের আদ্যশ্রাদ্ধ। এরা মাঝে মাঝে তাত্ত্বিক কচকচানিতে কথার ফুলঝুরি ছড়ায় এবং সময় ও সুযোগমত যখনই দেশে বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তর একটা উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই তাকে কুঠারাঘাত করার চেষ্টা করে। এই এদের ইতিহাস।

এহেন দলের নেতা শ্রীশিবদাস ঘোষের (যিনি নাকি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক) অমৃতবাণী মাঝে মাঝে দেওয়াল লিখনে লক্ষ্য করা যায়। ঐ সব লেখা পড়ে ভদ্রলোকের স্বমুখ নিঃসৃত কণী শোনার ইচ্ছা ছিল বহুদিনের। সে ইচ্ছা পূরণ হল সেদিন বহরমপুরে তাঁর দলের কৃষাণ-ক্ষেতমজুর সম্মেলনে বক্তৃতা শুনে। সেদিন জনসভায় ভারতীয় সমাজের শ্রেণীকাঠামো যেভাবে তিনি বিশ্লেষণ করলেন সে বিশ্লেষণ কোন মার্কসবাদের ওপর ভিত্তি করে করা হল এ প্রশ্ন তাঁর দলের কর্মীরা নিশ্চয়ই করতে পারত যদি না মহান নেতার বাণী তাদের কাছে বেদমন্ত্র হত। এদেশে নাকি সামন্ততন্ত্র আর নেই, কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, জমিদার, জোতদার এসব নেই। গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ নাকি শেষ হয়ে গেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ফলে বর্গাদার, কৃষাণ, ভূমিহীন কৃষক এসবের চরিত্র পাল্টে গেছে, তারা সকলেই শ্রমিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। জোতদার জমিদারেরা একচেটিয়া পুঁজিবাদীতে পরিণত। জানিনা এ বিশ্লেষণ কোন মার্কসবাদে আছে? আমি ত জানি একচেটিয়া পুঁজিবাদ ধনতন্ত্রের একটা স্তর এবং এ স্তরের শেষ পরিণতি সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ। আমাদের দেশ কি সেই স্তরে এসে গেছে? দ্বিতীয়তঃ কৃষক সম্প্রদায় সম্বন্ধে মার্কস, লেনিন এবং মাওয়ের যে বক্তব্য তাতে একটাই জানা যায় যে কৃষকের মধ্যে সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও একশ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। কারণ তাদের মধ্যে পেটিবুর্জোয়া ধ্যানধারণা দীর্ঘকাল জাগরূক থাকে। সেই কারণেই মাও সে তুংয়ের প্রয়োজন হয়েছে সমগ্র জাতিকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে নিক্ষেপ করে শুদ্ধিকরণ করার। অথচ শিবদাসবাবু মার্কস, লেনিন, মাওয়ের নামে ব্যাখ্যা দিলেন—যেহেতু কৃষকেরা নগদ অথবা ফসলের অংশ কিংবা কিছুটা জমি মজুরী হিসাবে পেয়ে থাকেন সেইহেতু এদেশে কৃষক নেই, তারা সকলেই মজুর বা শ্রমিক হয়ে গেছেন। অতএব কৃষিবিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পৌঁছে গেছি। শিবদাসবাবুর এই ধরণের ইউটোপীয় কল্পনাবিলাসের কোন ব্যাখ্যা মার্কসবাদে আছে কি? আমি শুধু ঐ দলের কর্মীদের অনুরোধ করব দয়া করে পৃথিবীবিখ্যাত জীবিত মার্কসবাদী শিক্ষক জর্জ থমসনের সদ্যপ্রকাশিত দুখানি বই "ফ্রম মার্কস টু মাও" ও "ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড আফটার" এবং মাওয়ের "অন প্রাকটিস" "অন কনট্রাডিকশন" একটু খুলে দেখুন।

এখন প্রশ্ন, কি কারণে এ-ধরণের পার্টি এবং এ-ধরণের বক্তব্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে জনমানসে প্রচার করার প্রয়োজন হচ্ছে? এর উত্তর একটাই। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীশাসন ও শ্রেণীশোষণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ব্যাপকতা লাভ করে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হবার অবস্থায় আসে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আন্দোলন যখন পাশাপাশি একত্র হয়ে কৃষকসমাজের সক্রিয় সহযোগিতায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলে তখন শোষকশ্রেণী তার শোষণ এবং শাসন বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। তাই তারা কখনও কখনও কোন দলকে চরমপন্থী সাজিয়ে তাদের দিয়ে সত্যকার বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী ও নেতাদের হত্যা করায় (যেমন তারা এগার শতাধিক সি পি এম দলের কর্মী ও নেতাকে হত্যা করেছে)। আবার কখনও কখনও তারা সন্ত্রাসের দ্বারা সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনকে সাময়িক স্তব্ধ করে দিয়ে মেকী বিপ্লবীদের ব্যবহার করে বড় বড় বিপ্লবী বুলির আড়ালে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শিবিরকে ছত্রভঙ্গ করার কাজে। এই মেকী বিপ্লবী দল অনেক সময় সজ্ঞানে এবং অনেক সময় অজ্ঞানে শোষক শ্রেণীর ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করে। জানিনা এস ইউ সি সে কাজ সজ্ঞানে করছে কি অজ্ঞানে করছে। তারা যে শাসক শ্রেণীর ক্রীড়নকের কাজ করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে কি? যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার আগে, সরকার গঠিত হবার পর এবং বর্তমানে আধা ফ্যাসিস্ট-সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের যুগে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তই কি বেরিয়ে আসে না যে তারা বরাবরই ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য ইতিবাচক কাজের পরিবর্তে নেতিবাচক কাজেই ব্যস্ত। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাডে ক্ষমতা দখলের পরেও এই ধরণের মেকী বিপ্লবীরা সেখানকার পৌরভবনে বসে নেতিবাচক সমালোচনায় ব্যস্ত ছিল লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণে। আমাদের এই মেকী বিপ্লবী এস ইউ সি নেতারাও সম্ভবতঃ বিপ্লবের দিন পর্যন্ত সেই ভূমিকাই পালন করে যাবেন। শাসকশ্রেণী সম্ভবতঃ এই কাজের জন্যই তাদেরকে স্বীয় পক্ষপুটে জিইয়ে রাখবে। কোথাও কি শোনা গেছে যে এই দলের কর্মী বা নেতারা গৃহহারা হয়ে এলাকা ছাড়া হয়েছেন, সন্ত্রাস কবলিত হয়ে জীবিকাচ্যুত হয়েছেন বা প্রাণ হারিয়েছেন?

শম্ভুনাথ সরকার
কলকাতা

মতামত

খাদ্য আন্দোলন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

ভাষণে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্যাপক আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত না হইলে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সে ব্যবস্থার স্বরূপ বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। অহা ছাড়া সরকারী কর্তৃত্বের উপর ব্যাপক আঘাত কোন সরকারই উপেক্ষা করিতে পারেন না। .... আসলে বামপন্থী নেতারা জনসাধারণের দুঃখভার হরণ করিতে চাহেন না, তাঁহাদের কষ্ট লাঘব করিতে। তাঁহারা চাহেন শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করিতে।.. দলীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থকেই মূল লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিবার সৎসাহস সকলের থাকে না। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অন্ততঃ সেই সৎসাহস ও সত্যানুরাগ দেখাইয়াছেন।" **(সম্পাদকীয়, ১৭-৮-৫৯)।**

(চলবে)

প্রতিবাদ

আপনার কাগজের গত একুশে মার্চ সংখ্যায় "ই এস আই হাসপাতালে অরাজকতা" শীর্ষক সংবাদে আমার নাম জড়িত থাকায় উক্ত সংবাদ সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই।

আমি কামারহাটি হাসপাতাল থেকে শিয়ালদায় বদলী হয়ে এসেছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কোয়ার্টারের জন্য আবেদন করিনি বা আমার দুই বৎসরের অসুস্থ শিশুও নেই। আমার দুই পুত্রই অসুস্থ ও দুঃস্থপোষ্য নয়। বদলীর ব্যাপারে আর্থিক লেনদেন সম্পর্কেও আমি কিছুই অবগত নই।

অর্চনা কর চৌধুরী

জে পির আন্দোলন ও এস ইউ সি

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অন্যান্য প্রদেশে জে পির আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শাসক কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করে দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে গদিতে বসান। শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভকে মূলধন করে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি নিজেদের বিরোধকে সাময়িক মীমাংসা করে জে পিকে সামনে রেখে শাসক গোষ্ঠীকে গদিচ্যুত করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই কাজটি সহজে করতে পারছে না। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক সচেতন। প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি কোনভাবেই এখানে শক্তি অর্জন করতে পারছে না। তাই তারা বামপন্থীদের ঘাড়ে চেপে এগোবার চেষ্টা করছে এহেন পরিস্থিতিতে অন্যান্য প্রদেশে জে পির আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে ও বামপন্থী অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন সম্পর্কে এস ইউ সির বক্তব্য সঠিক বলে মনে হচ্ছে। ভেবে দেখুন বলে এস ইউ সি. কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেছে— (এক) বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গে জনসংঘ, আদি কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির যেখানে কোন প্রভাব নেই, সেখানে গণতন্ত্র হত্যায় কলঙ্কিত নায়ক ও জনগণ কর্তৃক ধিকৃত প্রফুল্ল সেনকে সঙ্গে নিয়ে সি পি এম গণতন্ত্র রক্ষার কনভেনশনের নামে মৃত শক্তিকে রাজনৈতিক পুনর্বাসন দিচ্ছে কেন? (দুই) বিহারে যেখানে রামপন্থীদের যুক্ত উদ্যোগে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে দক্ষিণপন্থীদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার দরকার ছিল সেখানে দক্ষিণপন্থীরা আন্দোলনে আছে এই অজুহাতে যুক্ত আন্দোলনের বাইরে থেকে সি পি এম কার্যত দক্ষিণপন্থীদের হাতে গণআন্দোলনের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব বাড়তে সাহায্য করল কেন? (তিন) বামপন্থী ঐক্যের বিনিময়ে দক্ষিণপন্থী নবনির্মাণ সমিতির সঙ্গে জোট গঠন করে সি পি এম শাসক কংগ্রেসের কাছ থেকে নির্বাচনী বারগেইনে প্রয়োজনী নয় কটী (চার) সংগঠন কংগ্রেস এবং সি পি এম যারা ক্ষমতাসীন থাকাকালে অপরের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরে হামলা চালিয়েছে, তারা আজ জনসাধারণের নিকট নিজেদের কৃতকর্মের জন্য খোলাখুলি দুঃখ প্রকাশ এবং ভবিষ্যতে সরকারী ক্ষমতায় থাকুক বা, নাই থাকুক অপরাপর রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কি? (পাঁচ) শাসক কংগ্রেসের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে নয় বাম দলের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও গণআন্দোলনের স্বার্থে অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অপরিহার্য নয় কি?

আপনার পত্রিকার চোদ্দই মার্চ তারিখের সংখ্যায় লেখা হয়েছে, সাতষট্টি সনে ইউ এল এফ ও পি ইউ এল এফ দুইটি ফ্রন্টের মধ্যে এস ইউ সি. সি পি এম বিরোধী ফ্রন্টে ছিল। কিন্তু সকলেই জানে যে, সি পি এম দলের নেতৃত্বে যে ইউ এল এফ ফ্রন্ট ছিল তাতেই এস ইউ সি ছিল। ফরোয়ার্ড ব্লক সেদিন বিরোধী ফ্রন্টে ছিল। দ্বিতীয়তঃ উনিশশো একাত্তর সনে সি পি এম ফ্রন্ট করার জন্য এস ইউ সিকে ডেকেছিল সে কথা কেউই জানে না। যদি ডেকে থাকত তবে এস ইউ সি অন্য ফ্রন্টে গেলেও আর এস পি সেদিন সি পি এম-এর সঙ্গে কেন ছিল না? সেদিন তো আর এস পি একা ছিল। উনিশশো একাত্তর সালে নির্বাচনের পর এস ইউ সি বামপন্থী সরকার গঠন করার জন্য সকল দলকে আহ্বান করেছিল। কিন্তু সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক বাংলা কংগ্রেস কংগ্রেসের সহায়তায় সরকার গঠন করেছিল। এস ইউ সি একা বেরিয়ে এসে সি পি এমের সঙ্গে বিরোধী আসনে বসেছিল।

গোবিন্দ নাথ
যাদবপুর

যুবক খুন

গত সোমবার চব্বিশে মার্চ দমদমে ইন্দিরা কংগ্রেসের গুন্ডারা সুপরিকল্পিতভাবে আর একটি যুবককে হত্যা করল। দমদম ক্যানটনমেন্টের নলতা নিবাসী বিমল দত্তের পুত্র বিশ বৎসর বয়স্ক রতন দত্ত একজন সাধারণ সি পি এম সমর্থক ছিল। গত বাহাত্তর সালের নির্বাচনের পর সে গুন্ডাদের ভয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। এর পর কোন এক কংগ্রেসী নেতার আশ্বাসে কিছুদিন বাদে সে পাড়ায় ফিরে আসে। ঠিক তার ছয় মাস বাদে কংগ্রেসী গুন্ডারা ঐ নেতার নির্দেশে রতনকে হত্যা করল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত সোমবার রতন পাড়ার শীতলা পুজোর বাজার করে ফিরে এসে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সময় একজন যুবক তাকে ডেকে নিয়ে যায় এবং পরে দলবদ্ধভাবে তাকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রথমে প্রচন্ড প্রহার করে এবং অর্ধমৃত অবস্থায় তার মাথায় তিনটি গুলী করে। তারপর তার মৃতদেহ দমদম এয়ারপোর্টের কাছে গণ্ডগোলনগর এলাকায় নফলে রেখে চলে যায়।

অভিযোগ যে, পুলিশ ভাল করেই জানে কারা খুনী। খুনীরা পুলিশের সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করার কোন ক্ষমতাই পুলিশের নেই।

এই সব হত্যা-ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক কারা

কপিল রায়

নতুনদিল্লী, সাতাশে মার্চ—গত বিশে মার্চ বিকেলে সুপ্রীম কোর্টের কাজ শেষে মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীঅজিতনাথ রায় যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন পথে তাঁর মোটরগাড়ীর মধ্যে দুইটি বোমা ফেলে দিয়ে আততায়ী যে পলাল আজ পর্যন্ত তাকে ধরা যায় নি। সৌভাগ্যক্রমে দুইটি বোমার একটিও ফাটে নি। তাই মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও তাঁর অপর তিন সহ-যাত্রী তাঁর ত্রিশ বছর বয়স্ক পুত্র শ্রীঅজয়নাথ রায়, আদালত অ্যাটেন্ডান্ট শ্রীজয়ানন্দ ও গাড়ীর ড্রাইভার শ্রীইন্দার সিং এযাত্রা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। ঘটনাটি ঘটেছে সুপ্রীম কোর্টের সীমান্ত প্রাচীরের গায়ের সদর রাস্তা তিলকমার্গ ও ভগবান দাস রোডের সংযোগস্থলে বিকেল চারটা দশ মিনিটের সময়ে। জায়গাটি শুধু যে যানবাহন ও পথিক চলাচলবহুল তাই নয় পরন্তু তিলকমার্গ থানা থেকে মাত্র দু শ আড়াই শ গজের মধ্যে। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী লাল আলোর সঙ্কেতে মাননীয় প্রধান বিচারপতির মোটর গাড়ীখানি থামামাত্রই এই আততায়ী রুমাল ও কাগজে মোড়া এই বোমা দুইটি গাড়ীর জানালা দিয়ে ভেতরে ফেলে দেয় এবং ছুটে পালায়। পালাবার সময়ে তার পায়ের হাওয়াই চপ্পল ফেলে যায়। কিছু লোকজন তার পিছু ধাওয়া করেও তাকে ধরতে পারে নি। এমনকি পরে পুলিশের কুকুরবাহিনীও সেই পলাতক আততায়ীর সন্ধান করতে পারে নি।

গত চব্বিশ তারিখ সোমবার লোকসভায় এবং পঁচিশ তারিখ মঙ্গলবার রাজ্যসভায় এই বোমার ঘটনা নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা হল (প্রত্যেক সদনেই চার ঘন্টার বেশি সময় ধরে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে) তাতেও এই ঘটনা সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য মিলল না অবশ্য সরকার পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী লোকসভায় জানালেন যে পুলিশ এই ঘটনা সম্পর্কে কিছু "কার্যকর সূত্র" (ইউজফুল ক্লু) পেয়েছেন এবং তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে আসামীর ধরা পড়তে খুব বেশি দেরী হবে না। রাজ্যসভাতে সরকার পক্ষ থেকে প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওম মেহতাও অনুরূপ আশার বাণীই শুনিয়েছেন।

বিরোধীপক্ষীয়দের বিশেষ করে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনকে হতমান করবার প্রয়াসে সরকার ও তাঁর গোয়েন্দা দপ্তর বিশেষ করে "র" (আর এ ডব্লিউ) এ ধরণের ঘটনাগুলি "স্টেজম্যানেজ" বা মঞ্চব্যবস্থাপনা করছেন এবং বোমার ঘটনা ঘটাচ্ছেন বলে অ-সি পি আই বিরোধীপক্ষীয়দের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ করা হল সেসবকেই শ্রীরেড্ডী "কল্পনা-শক্তির বিকার" বলে বর্ণনা করলেন।

লোকসভায় কংগ্রেসপক্ষীয় বক্তারা দেশের বর্তমানের "হিংসা-অনুরাগের" (কাল্ট অব ভায়োলেন্স) জন্য মুখ্যত শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনকেই দায়ী করে তাঁর আন্দোলনের সমর্থকদেরও তার দায়-ভাগী করলেন। সি পি আইয়ের প্রবক্তারাও লোকসভায় শ্রীভোগেন্দ্র ঝা ও রাজ্যসভায় শ্রীভূপেশ গুপ্তও কথিত "সামগ্রিক বিপ্লবে"র শ্লোগানদাতাদেরই বর্তমানের হিংসাত্মক বাতাবরণের জন্য দোষী করলেন। অবশ্য শ্রীঝা তাঁর এই মূল বক্তব্যকে ঢাকা দেবার জন্য কিছুটা তাত্ত্বিক কথাজালও সৃষ্টি করলেন এই বলে যে "আমাদের বর্তমান অবস্থায়, সরকারের অনুসৃত পুঁজিবাদী পথ ব্যাপকমাত্রায় বেকারত্ব, দরবৃদ্ধি ও যুবকদের মধ্যে বেপরোয়া ভাব, হতাশা (ডেসপারেশন) সৃষ্টি করছে। এই সবগুলিই মূল জিনিষ যা ব্যাপকমাত্রায় অসন্তোষ সৃষ্টি করছে এবং জনসাধারণকে এক রকমের অসুস্থক বা সিনিক করে তুলছে। রাজ্যসভায় আলোচনা শুরু করতে গিয়ে শ্রীভূপেশ গুপ্তও বললেন ঃ "কলকাতায় কংগ্রেসের কোন কোন অংশ নিজ পার্টির ভেতরকার প্রতিদ্বন্দ্বী অংশের বিরুদ্ধেও, অন্যদের কথা বলারই দরকার করে না, বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছেন। বন্দুক, বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে কংগ্রেসের কিছু কিছু উপাদানী আসানসোল ও অন্যান্য এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন দখল করতে চেষ্টা করছেন। আসানসোলে এ আই টি ইউ সির ইউনিয়নের ওপরে এ ধরণের হামলা হয়েছে।"

সি পি আই প্রবক্তাদের বক্তব্যের এই স্ববিরোধিতা খুবই স্পষ্ট। কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত নীতি কিংবা কংগ্রেস দলীয়দের এই ধরণের কার্যকলাপের জন্য শ্রীজয়প্রকাশের আন্দোলনকে দোষভাগী করা কি যুক্তিসিদ্ধ? এ প্রশ্ন এখানে অনেকেই করছেন।

সরকারপক্ষীয়দের ভাষণে বিশেষ জোর দিতে দেখা গেল "হিংসা-অনুরাগের" বাতাবরণের ওপরে। তারই দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে শ্রীদীনেশ গোস্বামী প্রভৃতি গান্ধীজীর হত্যাকান্ড, শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যাকান্ড প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করলেন। এই প্রসঙ্গে সমস্তিপুরের বোমা-বিস্ফোরণ, এলাহাবাদ হাইকোর্টে দেশী পিস্তলসহ জনৈক শ্রীগোবিন্দ মিশ্রের ধরা পড়া প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করে দেশ ব্যাপী ষড়যন্ত্রের কথা বললেন। বিরোধীপক্ষীয়রাও এই সব ঘটনারই উল্লেখ করে বললেন যে এ সবের অধিকাংশই সরকারের কারসাজিজনিত। আসামী গ্রেপ্তার ও ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনের ব্যাপারে পুলিশের অক্ষমতাকে অনেকেই এই কারসাজিজনিত বলে অভিযোগ করলেন। অনেকেই এই সব ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করছেন না। অনেকেই মনে করেন যে এই সব ঘটনাগুলির ভেতর দিয়ে একটি সামগ্রিক ষড়যন্ত্রের যোগসূত্র সংযোগ রক্ষা করে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজ্যোতির্ময় বসু জার্মানীতে হিটলারের শাসন অনুসৃত রীতিনীতির উল্লেখ করে বলেন যে প্রতিপক্ষকে দমন করে নিজ গদি কায়েম করবার জন্য নাজীরা রাইখস্টাগ ভবনে আগুন লাগিয়ে কমিউনিস্টদের তার জন্য দোষী করে কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান শুরু করেছিল। ইংরেজ যুগে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিভাবে অনুরূপ ষড়যন্ত্র করতেন তার দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রীবসু ফরিদপুরের বদরুদ্দীন দারোগার কাহিনীটি লোকসভাকে শোনালেন। তিনি বললেন যে কোন একজন স্বাধীনতাসংগ্রামীর বাড়ীতে তল্লাশী করতে যাবার আগে এই দারোগাপ্রবর নিজের গুপ্তচরের মাধ্যমে উক্ত স্বাধীনতাসংগ্রামীর বাড়ীতে বোমা ও রিভলবার লুকিয়ে রাখিয়ে দিতেন। অর্থাৎ সাজানো ঘটনায় অনেকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হত। এ সবই করা হত নিজের কর্মদক্ষতা প্রতিপাদনের জন্য। শ্রীবসু আরও অভিযোগ করলেন যে মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর সি আইএর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয়, হরি-

ভারতীয় বিশেষ গোয়েন্দাবিভাগ "র"-এর জন্য খরচের পরিমাণ বর্তমানে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীবসুর মতে পররাষ্ট্র দপ্তরের ডিস্ক্রিশনারী বা গোপন অবাধ তহবিল থেকে এই বিভাগের খরচ দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সনে বরাদ্দ ছিল এই বাবদে ছয় কোটি টাকা আর বর্তমান বছরে তার পরিমাণ ধরা হয়েছে তেইশ কোটি টাকা কাজেই এই বিভাগের অস্তিত্ব রক্ষার ও কর্মদক্ষতার প্রমাণ দরকার এবং শ্রীবসু এ সব ঘটনাকে তারই প্রমাণ বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

কংগ্রেস শাসনে পুলিশের খরচ কত গুণ বেড়েছে তার প্রমাণ দিতে গিয়ে লোকসভায় শ্রীজনেশ্বর মিশ্র বললেন যে কোন একখানি সংবাদপত্রের খবরে দেখা যায় যে পুলিশখাতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০-৫১ সনে মাত্র তিন কোটি টাকা খরচ করতেন আর চব্বিশ বছর পরে ১৯৭৪-৭৫ সনে এই খরচের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে একশ পঞ্চাশ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার শতকরা ৪৯০০ ভাগ।

এমন ব্যাপক পুলিশ খরচ বৃদ্ধিতেও যে এধরণের অপরাধ বেড়েই চলেছে এবং পুলিশ তার কোন কিছুরই কিনারা করতে পারছেন না তার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে কংগ্রেস সদস্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি করে জনদের ওপরে উৎপীড়ন হয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রণালয় কি করে? ওঁদের দিয়ে না চললে, ও কাজের ভার আমাকে দেওয়া হোক, আমি দুই দিনে ঠিক করে দেব।"

পুলিশ গোয়েন্দাবিভাগের ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা করে বললেন ডি এম কে সদস্য শ্রীজে মাথা গৌদার যে পুলিশ আজও রাজধানীর বুকে অনুষ্ঠিত নাগরওয়ালার দমনের কালেক্টর অনিল চোপরার ও সি বি আই পদাধিকারী রমানাথনের হত্যা-কান্ডগুলির রহস্য ভেদ করতেও পারেন নি। এ সবই নিশ্চয়ই গোয়েন্দা ও পুলিশ বিভাগের ব্যর্থতার পরিচায়ক।

জ্যোতির্ময় বসু অভিযোগ করলেন যে, এ সব রহস্যের ভেদ কোন দিনই করা হবে না কারণ অদৃশ্য হাত রয়েছে এ সবে।"

যাইহোক রাজ্যসভার আলোচনার সময়ে দুইজন কংগ্রেস সদস্য ভারতীয় লোকদল নেতা শ্রীচরণসিংহের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন যে শ্রীসিংহ প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। শ্রীচরণ সিংহ প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওম মেহতার কাছে চিঠি দিয়ে এই অভিযোগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত দাবি করেছেন। সরকার কি করেন সেটাই এখন লক্ষণীয়।

রাজধানী দর্পণ

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে জট পাকাচ্ছেন ভূপাল বোস

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রশাসনিক জট কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছেনা। ডাঃ ভূপাল বোস এই জটিল পরিস্থিতিকে আরো জটিল করতে বদ্ধপরিকর। তিনি বর্তমানে কলেজের এক ভুয়া পরিচালক মণ্ডলীর সম্পাদক হিসেবে নিজেকে জাহির করছেন।

অথচ অনুসন্ধানে জানা গেছে যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জে পি মিত্রের সভাপতিত্বে গত বছরে দশই মে তারিখের সভায় বিধিবদ্ধভাবে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে ঐ বছরেরই জুন মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হবে। এই ব্যাপারে পূর্বতন কোষাধ্যক্ষ পি এন পালিতকে আহ্বায়ক করে একটি সাব কমিটিও গঠিত হয়েছিল। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের অনুরোধ সত্ত্বেও জুন মাসের মধ্যে কমিটি গঠনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সদস্যরা সেই নির্বাচনী সাব কমিটিকেও অস্বীকার করেন।

কিন্তু ষড়যন্ত্রের নায়ক ভূপালবাবু পুজোর ছুটিতে অন্যান্য সদস্য তথা শিক্ষকদের অনুপস্থিতির সুযোগ চুয়াত্তরের সতেরই নভেম্বর কয়েকজন পেটোয়া ছাত্র প্রতিনিধি এবং তার প্রশ্রয়পুষ্ট কিছু বহিরাগত ব্যক্তিদের নিয়ে বে-আইনীভাবে নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেন। পুজোর পর কলেজ খুললে সকলেই নবগঠিত পরিচালকমণ্ডলীর চেহারা দেখে হতভম্ব। এই নতুন কমিটির সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ উভয় পদেই ভূপালবাবু নির্বাচিত হয়েছেন।

এই কারচুপির উদ্দেশ্য বহুবিধ। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে বাহাত্তর সালে সরকারী ও বেসরকারী কয়েক হাজার টাকার হিসাবের খাতাপত্র না দেখানোর দায়ে এবং বিভিন্ন অবৈধ কাজকর্মের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ চুয়াত্তর সালের পঁচিশে আগস্টের সভায় ভূপালবাবুকে পদত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু সকল সদস্যের অলক্ষ্যে সতেরোই নভেম্বর স্বনির্বাচিত কমিটিতে ভূপালবাবু পুনর্বহাল হবার ফলে তাকে আর পদত্যাগ করতে হলনা এবং টাকা পয়সারও হিসেব দেখাতে হল না।

অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে জানা যায় যে পূর্বতন পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি জে পি মিত্র, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, হীরেন সেন, রাণু মুখার্জী প্রমুখ সদস্যরা বাহাত্তর সালে পাওয়া সরকারী সাহায্যের কোন হিসেব পান নি। সেই কারণে পরবর্তী সরকারী অনুদান গ্রহণের জন্য পঁচিশে আগস্ট অরিথের আবেদন পত্রে অরা স্বাক্ষর করতে রাজী হন নি। ফলে সরকারী অনুদানও বন্ধ। তদুপরি বাহাত্তর সাল থেকে শিক্ষকরা প্রায় বত্রিশ মাসের বেতন এখনও পাননি।

আরো আশ্চর্যজনক ঘটনা হল পরিচালকমণ্ডলীর বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের দলিল এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চাইলে এগার নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের এস ঘোষ এণ্ড কোম্পানীকে বিনা নোটীশে ছাঁটাই করে দিয়ে রাতারাতি গোপনে অন্য অডিটর পি সি বসু এণ্ড কোম্পানীকে দিয়ে কাজ করানো হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রী ঘটিত কলেজের বাইরের ঘৃণ্য একটি ঘটনায় (ভূপালবাবু যার গুপ্ত নির্দেশক বলে অভিযোগ) যে সব ছাত্র পুলিশী মামলায় জড়িয়ে আছে তার জন্যেও ভূপালবাবু কলেজ ফান্ড থেকেই টাকা খরচ করেছেন বলে অভিযোগ।

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

স্পেনের সৈন্যবাহিনীতে বিক্ষোভ

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

পর্তুগালের পর এবার স্পেনে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এবার বিদ্রোহের আগুন সঠিক কেন্দ্রে। এতদিন শ্রমিক, কৃষকদের বিক্ষোভ, ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল ছিল স্পেনের খবরের মধ্যে। এবার তার সঙ্গে এসে জুটেছে সৈন্যবাহিনীর বিক্ষোভের খবর। ফলে, স্পেনের ফ্যাসিস্ত সরকার আতঙ্কগ্রস্থ। ফ্রাঙ্কোর চল্লিশ বছরের রাজত্বে যে-ঘটনা কেউ কোনদিন শোনে নি সেই ঘটনা এবার ঘটবে। স্পেনের দুই সহস্র সামরিক অফিসার স্পেনেব সরকারের কাছে প্রেরিত এক আবেদনে স্পেনের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী জানিয়েছেন। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট সামরিক অফিসাররা এক ইস্তাহার মারফৎ ঘোষণা করেছেন যে, সৈন্যবাহিনী জনগণকে শায়েস্তা করার শক্তি নয়, সৈন্যবাহিনী হল জনগণের সেবক।

আতঙ্কিত সরকার কিছু উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে মেজর জুলিও BBC, "স্পেনে পেশাদার সৈন্য" নামে গ্রন্থ লিখে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়েছেন। জুলিওর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানায় তার শত শত সহকর্মী। ভয় পেয়ে, বর্তমান স্পেন সরকার আর বেশীদূর এগোন নি।

শুধু সৈন্যবাহিনী নয়, কাতালোনিয়া, আসতুরিয়াস, মাদ্রিদ শহরগুলোতে গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার দাবীতে শ্রমিকদের বড় বড় বিক্ষোভ মিছিল দেখা যাচ্ছে। মাদ্রিদ সহ স্পেনের

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

বড় বড় শহরগুলোতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শ্রমিকদের দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়াল লিখন দেখা যাচ্ছে, আবার স্পেনের বুকে কাস্তে হাতুড়ির ছাপ "শ্রমিকজোট দীর্ঘজীবী হোক।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের শ্রমিক কৃষকদের সমর্থনে বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে আসছেন। মাদ্রিদের প্রখ্যাত পত্রিকা, কামবিও ষোল, কিছুকাল পূর্বে একটি বিবৃতি ছেপেছেন, বিবৃতিতে সই করেছেন দেশের গণ-মান্য ব্যক্তি। এই বিবৃতিতে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়েছে, এই বিবৃতিটির সমর্থনে দেড় লক্ষ মানুষ সই করেছেন। ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় সরকারের পঁচিশত উচ্চপদস্থ অফিসার সরকারের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করেছেন। এই সময়ে দুই হাজার সামরিক অফিসারদের বিবৃতিটি বের হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মাসেলিনো কামাশোর মুক্তির দাবীতে প্রবল গণআন্দোলন দেশের ও প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শুধু কামাশো নয়, এর সঙ্গে অন্যান্যদেরও মুক্তির দাবী করা হয়। সরকার ভয় পেয়ে কয়েকজনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। আসামীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জিমেনেজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল, স্পেনে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী। বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের (বে-আইনী) সঙ্গে এক যোগে কাজ করছে। দীর্ঘ সংগ্রামের ফল এখন ফলতে শুরু করেছে স্পেনে।

বেলজিয়ান চলচ্চিত্রোৎসব

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের বিশ্ব মানচিত্রে বেলজিয়ামের স্বীকৃতি আসে ষাটের দশকের মাঝামাঝি—যখন আঁদ্রে দেলভো তাঁর "দি ম্যান হু হ্যাড হিজ হেয়ার কাট শর্ট" চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। ঐ সময়কাল থেকে দেলভো ও তাঁর কয়েকজন সতীর্থের প্রয়াসে বেলজিয়ান চলচ্চিত্রে একটি পালাবদল সূচিত হয়। দেশের মাটিতে সরকারী ও বেসরকারী আনুকূল্যে একটি ছোট ইণ্ডাস্ট্রিও গড়ে ওঠে। সম্প্রতি কলকাতায় ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ যে দ্বিতীয়বার বেলজিয়ান চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করে সেখানে ঐ দেশীয় চলচ্চিত্রের আরো কিছু গতিপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল। উৎসবের সব ছবিই একাত্তর থেকে বাহাত্তরের মধ্যে নির্মিত। সুতরাং এই পরিচয় আধুনিকও বটে।

সাধারণত য়ুরোপের আর্থিক স্বচ্ছল রাষ্ট্রগুলির চলচ্চিত্রে যে ধরণের সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কটের কথা বলা হয়ে থাকে সেই ধরণের প্রবণতা এখানে দেখা অনেকগুলি চলচ্চিত্রের মধ্যে মেলে। যেমন আধুনিক সময়কে পটভূমিতে রেখে তেলা ক্রিস্টিয়ান মেজনিলের "স্লামুরুজ", জঁ-পিয়ের বার্কমান্সের "দি রেড রুম" এবং ভিয়েস অ্যান্ডারসেনের "জনি এঁন্ড জেসি"। কিন্তু এই চলচ্চিত্রগুলি দেখলে একথা মনে হয় না যে শিল্পী হিসেবে এসব ছবির নির্মাতাদের কোন "স্টেক" আছে। না শিল্পের প্রতি, না জীবনের প্রতি। এই তিনটি চলচ্চিত্রের বিষয় কী? প্রথমটিতে একজন যুবতীর ভ্রান্ত ও বিকৃত যৌন কল্পনা (যার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং হায়! চলচ্চিত্রটি বুনুয়েলকে উৎসর্গীকৃত), দ্বিতীয়টিতে একজন তরুণীর যৌন-তৃষ্ণা, সন্তোষ ও-বিষাদ এবং তৃতীয়টিতে একজোড়া নিষ্পাপ তরুণ-তরুণীর খারাপ সংসর্গে জড়িয়ে পড়ে পুরোপুরি গোল্লায় যাওয়া (যেহেতু পরিচালক তাই চেয়েছেন) এখানে বিষয় অনুধাবনের অগভীরতা ও অকিঞ্চিৎকরতায় বক্তব্যের সার্থকতা খোঁজা পণ্ডশ্রম। যেমন ইদানীংকালের কানাডার চলচ্চিত্রে, তেমন এখানেও শুধু দুটো কথা মনে হয়। হয় বেলজিয়ামের বর্তমান জীবন তৃপ্তিদায়কভাবে বাইরে ও ভেতরে নিস্তরঙ্গ, নয় তো আমদানীকৃত নকল সমস্যায় বেলজিয়ান চলচ্চিত্র এ পর্যন্ত দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন। ইণ্ডাস্ট্রিকে বাঁচাবার জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কো-প্রোডাকশনে ছবি নির্মাণের এটা অন্যতম ফলও হতে পারে।

বর্তমান উৎসবে দুখানি পিরিয়ড-চলচ্চিত্রও অন্তর্ভুক্ত—পল কোলেৎ ও পিয়ের দ্রুয়েতের "লইজা" এবং আঁদ্রে দেলভের "মিটিং অ্যাট ব্রে"। লুইজা চলচ্চিত্রটি সহজভাবে শুরু হয়ে অকস্মাৎ "পলিগ্যামি"র জটিল বিষয়কে আশ্রয় করে। এবং অগ্রপশ্চাৎহীন কারণে ও যে কোন দার্শনিক বোধের নিরঙ্কুশ অভাবে শুধুমাত্র আদিম জৈবলীলার স্থূলে দলিলে পরিণত হয়। তার ওপর চলচ্চিত্রে একটি অনাথ বালিকার মুখে বয়স্ক ও আধুনিক সংলাপ অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফরাসী দেশে "জুল এণ্ড জিম" নামে একটি চলচ্চিত্র রচিত হয়েছে বলে এক্ষুনি বেলজিয়ামে তার পুনরাবৃত্তির চেষ্টার কোন আড়া ছিল বলে মনে হয় না। দেলভোর "মিটিং অ্যাট ব্রে"র মধ্যে একটি সহজাত গীতিকাব্যিক লাবণ্য পাওয়া যায়। স্মৃতিপ্রবাহের গ্রন্থনাটি স্বতঃস্ফূর্ত। পরিবেশ রচনাতেও দক্ষতার প্রকাশ আছে। চলচ্চিত্রটি তথাকথিত সঙ্কট ও সমস্যাবিহীন হওয়ার ফলেও অনেকখানি স্বস্তিবাচক। একটি অকিঞ্চিৎ ভূমিকায় আনা কারিনার অন্তর্ভুক্তি অবশ্য অপ্রয়োজনীয়।

বেলজিয়ান চলচ্চিত্রকরদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবান হ্যারি কুমেল। তাঁর "মালপারটুইস" চলচ্চিত্রের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। যদিও তাঁর চলচ্চিত্র আখ্যানরীতিতে অনেকখানি "ক্যালিগরী"র দ্বারা প্রভাবিত, তবুও পরোক্ষে আধুনিক জীবনের নরক রচনায় তাঁর স্বকীয়তা বিস্মৃত হবার নয়। তাঁর চলচ্চিত্রে দান্তের ইনফার্ণোর সূত্র আছে, সূত্র আছে গ্রীক পুরাণের। তাঁর রচনায় ক্লেমিন চিত্রকলার ছায়াপাত আছে। তবু এসব ছাপিয়ে তাঁর চলচ্চিত্রকারের ভূমিকা এখানে প্রতিষ্ঠিত। দুঃস্বপ্নের মতো অনেক মুহূর্ত তিনি চলচ্চিত্রে এনে দিতে পেরেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে রহস্য চলচ্চিত্রের প্রথম দুই তৃতীয়াংশে সূচিভেদ্য হয়ে নির্মিত, চলচ্চিত্রের বাকি অংশের ম্যাজিক তর্কে অত্যন্ত জোলো করে দেয়। তাছাড়া খৃষ্টের মহৎ রূপ দেখিয়ে প্যাগান দেবতাদের অকারণে খেলো করার মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নয়। চলচ্চিত্রটিতে রঙের ব্যবহারের একটি নিজস্ব মাত্রা আছে। একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অরসন ওয়েলস অবিস্মরণীয়।

বেলজিয়ান চলচ্চিত্রোৎসবে কাহিনী-চিত্রগুলির অপেক্ষিক নিঃস্বতার পাশাপাশি স্বল্প-দৈর্ঘ্য প্রতেকটি ছবি মনে রাখার মত। "পেগারাস" চলচ্চিত্রটি আধুনিক কবিতার কলমে রচিত। টেকনোক্র্যাসি উদ্ভূত চাকরীজীবনের প্রতি শাণিত বিদ্রূপ ছুঁড়েছেন জেরাল্ড ফ্রাইডমান তাঁর "স্কয়ারবাস" চলচ্চিত্রে। তিনি "মানি-প্লেক্সে"র মধ্যে আজকের মানুষকে অবলুপ্ত করেছেন। "হাঁ" এবং "ডেমোক্রাটিয়া" সাধারণ বক্তব্য নির্ভর হয়েও আঙ্গিকে অনবদ্য।

কাম্বোডিয়া চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগোচ্ছে

অরুণাভ সেন

ক্যাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তি ফৌজ আজ যখন চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে চলেছে, সেই মুহূর্তে কাম্বোডিয়ার জাতিজোড়া ঐক্যের প্রতীক আদের জাতীয় কংগ্রেস-এর দ্বিতীয় মহাসম্মেলন কাম্বোডিয়ার মুক্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই জাতীয় মঞ্চে সমবেত হয়েছেন শ্রমিক, কৃষক ও দেশপ্রেমিক জনগণের সমস্ত শ্রেণী, অংশ, দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গ। কাম্বোডিয়ার মুক্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এই দ্বিতীয় কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন কাম্বোডিয়ার জাতীয় ঐক্যের সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি খিউ সাম্ফান। জনগণের বিভিন্ন স্তরের দুশো তেয়াত্তর জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বাসঘাতক লন নল চক্রের তীব্র নিন্দা করে—কাম্বোডিয়া থেকে সমস্ত আমেরিকন সামরিক "উপদেষ্টা", "শান্তিস্থাপনকারী" বাহিনী এবং "সাহায্য প্রদানকারী" সংস্থার লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানানো হয়। যে সাতজন বিশ্বাসঘাতক দেশের প্রতি গুরুতর অপরাধ করেছে তাদের চরম দণ্ডদানের দাবি সম্মেলন থেকে জানানো হয়।

এই কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে কাম্বোডীয় জনগণের আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের ক্রীড়নকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুদৃঢ় ঐক্য এবং দেশের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

রাজনীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে জনগণের সকল অংশের ব্যাপক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান কংগ্রেস থেকে ঘোষিত হয়েছে। কংগ্রেস পররাষ্ট্র নীতি হিসাবে নিরপেক্ষতা, জোটবহির্ভূত থাকা, কাম্বোডিয়ায় বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে না দেওয়া এবং পঞ্চশীলের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে কাম্বোডীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর—দেশে যে ব্যাপক জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠেছে তারই প্রকাশ ঘটেছে কাম্বোডিয়ার সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক অগ্রগতির মধ্য দিয়ে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের ক্রীড়নক লন নল চক্র আজ চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। গত প্রায় পাঁচ বছরের কঠোর সংগ্রাম সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিরাট বিরাট বিজয় এনে দিয়েছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যত অপচেষ্টাই করুক না কেন তাদের ক্রীড়নকদের রক্ষা করা তাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হবে না।

কাম্বোডিয়ার জনগণের জাতীয় মুক্তির এই বিরাট বিজয় ও অগ্রগতির মুহূর্তে গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান দং বিগত পয়লা মার্চ হ্যানয়স্থ কাম্বোডীয় রাষ্ট্রদূতকে বলেছেন : "ভিয়েতনামী জনগণ ও ভিয়েতনাম সাধারণতন্ত্রের সরকার কাম্বোডীয় জনগণের সঙ্গে তাদের সংগ্রামী মৈত্রীবন্ধনকে আরো ব্যাপক ও গভীর করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কারণ এই অঞ্চলের প্রতিটি দেশের জনগণের জয় সমগ্র দুনিয়ার শান্তি ও মুক্তির সংগ্রামকেই জোরদার করে তুলছে।"

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র এবং জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রনায়ক সিহানুককে ব্যাপক জাতীয় ঐক্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে এবং কাম্বোডিয়ার সেই জাতিজোড়া ব্যাপক ঐক্যই আজ ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনের শুভমুহূর্তে উপনীত হয়েছে।

গত পাঁচ বছর ধরে লন নল চক্র ও রাষ্ট্রপতি সিহানুকের দুটো সরকারকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন "স্বীকার" করে আসছিল। তারাও শেষ পর্যন্ত সিহানুকের সরকারকেই কাম্বোডিয়ার "একমাত্র সরকার" বলে স্বীকার করেছে। ভারত সরকারও সিহানুকের সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

ছাত্র-যুবদের গুণ্ডামী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঝে মাঝে দশ-পনেরো জনের টুকরো টুকরো মিছিল ধ্বনি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে প্রবেশ করছে। আর কিছু ছাত্র পরিষদের মাস্তান হিন্দি ছবির নায়কের মতো গলায় কালো রুমাল বেঁধে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশেই জয়প্রকাশের কুৎসা করে একটি সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে কার্টুনের প্রদর্শনী চলছে।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল গোটা কলেজ স্ট্রীট পাড়াটা তখন ওদের হাতের মুঠোয়। কোথাও কোন কথা বলবার যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। কৌতূহলী সকলেরই চোখে মুখে দ্বিধা। অনেক সাধারণ মানুষই আগ্রহ সত্ত্বেও একটু দূরে দূরে ছিলেন, যাতে কোন উত্তেজনা-পূর্ণ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে না হয়।

এদিকে স্টুডেন্টস হল এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক শিক্ষক ও ছাত্র যুবদের সভায় জয়-প্রকাশের আসার সময় যতই এগিয়ে আসছে, বিক্ষোভকারীরা ততই দ্বিগুণ উত্তেজনায় খেপে উঠছে। অবশেষে কলেজ স্ট্রীট পাড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা উত্তেজনা ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হল বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটের স্টুডেন্টস হলের সামনে। এরপর রিকেল সোয়া চারটে নাগাদ ওরা যখন পুলিশের মুখে শুনল জয়প্রকাশের গাড়ী বহুবাজার স্ট্রীট অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে, তখন স্টুডেন্ট হলের সামনে ওদের তাণ্ডব শুরু হল পুরোদমে। গেটের সামনে অপেক্ষমান অধ্যাপকরা, যারা এই সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, ভীড়ের চাপে তাদের অনেকেই প্রবেশ করতে পারেননি। কয়েকজনকে গলাধাক্কা দিয়ে মস্তানরা ঠেলে ফেলে দিল। আমার চোখের সামনে মফস্বল কলেজের একজন অধ্যাপক মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। ইতিমধ্যে জয়প্রকাশের গাড়ী সূর্য সেন স্ট্রীট দিয়ে ভীড় ঠেলে কোন রকমে স্টুডেন্টস হলের সামনে দাঁড়াল। কিন্তু গাড়ীর দরজা খুলে তিনি সহজে বেরুতে পারছেন না। ওরা গাড়ী ঘিরে ধরেছে। গাড়ীর জানলা দিয়ে কয়েকজন যুবক মুখ ঢুকিয়ে "গো ব্যাক জয়প্রকাশ" ধ্বনি দিয়ে চলেছে। অবস্থা ছিল পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু জয়প্রকাশের দৃষ্টি ছিল তাদের দিকে যারা বিপরীত দিকের হকার স্টলগুলির ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে হাত তুলে তাঁকে সহাস্যে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। জয়প্রকাশও হাত তুলে তাদের প্রত্যাভিনন্দন জানান। তারপর কোন রকমে তাকে ধরে স্টুডেন্ট হলের দরজা পার করে দেওয়া হয়।

আমরা কয়েকজন রিপোর্টার তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। "প্রেস" বলা সত্ত্বেও ওরা কোন কথা শুনছে না। ঘুষি বাগিয়ে চীৎকার করে বলছে : "সব দূর হটো"। নব নির্মাণ সমিতি আর কংগ্রেসী মস্তানদের মধ্যে বচসা চলছে। সেই ফাঁকে আমরা কোন রকমে ভেতরে ঢুকলাম। সভা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে চলে সে জন্য প্রধান ফটকের কোলাপসিবল বন্ধ করে দেওয়া হল। ভেতরে সভা শুরু হয়েছে। কিন্তু বাইরে উত্তেজনা কমেনি। এই অশালীন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুলিশের কোন ভূমিকাই ছিলনা। ওরা ঢাল লাঠি সব হাতে নিয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। যেন সাত চড়ে রা করেনা। কলকাতার পুলিশকে এমন জড়-পদার্থের মতো এর আগে কখনও দেখা যায়নি। ওরা জয়প্রকাশের দেহরক্ষার চেষ্টাটুকুই করেছে মাত্র।

স্টুডেন্টস হলের সভায় জয়-প্রকাশ অধ্যাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন : সর্বাত্মক বিপ্লবের ক্ষেত্রে অধ্যাপকদের অবশ্যই বিরাট ভূমিকা আছে। দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের নামে রোজ নতুন নিয়ম করে কোন লাভ নেই। সর্বাত্মক বিপ্লব তাই এখানে সবচেয়ে জরুরী। আপনাদের আহ্বান পেলেই আমি আবার আসব আপনাদের সংগে কাজ করব।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি আক্ষেপের সংগে বলেন : পশ্চিমবঙ্গকে এখনও আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। এখানে অজস্র দল। একে অপরের মুখ দেখেননা, কথা বলেন না। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া কি করে এই অরাজকতার অবসান সম্ভব?

স্টুডেন্টস হলের বক্তৃতা শেষে জেপির ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যুব ছাত্র সমাবেশে যাবার পালা। বাইরে উত্তেজনা এবং জয়প্রকাশের নামে ব্যক্তিবিদ্বেষী খিস্তি খেউর চলছে। সকলেই ভীড় ঠেলে দরজার বাইরে আসতে চাইছেন। জেপিও বেরিয়ে আসবেন ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বড় ঢিল পড়ল জে পির সামনে এক অধ্যাপকের কপালে। নাম দেবপ্রসাদ সেন। ইনি উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক। ওর কপাল থেকে রক্ত বেরুতে শুরু করল। ওকে ধরে কয়েকজন ভেতরে নিয়ে গেলেন। কয়েকজনের গায়ে কাদা এসে ছিটকে পড়ল। সকলে জে পিকে বললেন: আপনার এখুনি বেরুনো ঠিক হবে না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। জবাবে জে পি বলেন : মুঝে যানে দিজিয়ে দো চার ইঁটাসে মেরা কেয়া? হোগা। ভেতরে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। ওর কাছে ঘটনার প্রতিক্রিয়া আমি জানতে চাইলে উনি বললেন : আপনারা নিজের চোখে চেয়ে দেখুন ইন্দিরা শাসন কি বিপজ্জনক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। সরকারী উস্কানি না থাকলে এই জিনিস কি করে ঘটতে পারে। ওদের নোংরা গণতান্ত্রিক কায়দায় ওরা আমাকে শিক্ষা দিতে চাইছে। বাজারী পত্রিকার এক রিপোর্টার বিশেষভাবে জানতে চাইলেন ওঁর কোন আঘাত লেগেছে কিনা। জে পি বললেন : না না আমার কিছু লাগে নি, দয়া করে এটা লিখবেন না। এরই মধ্যে জে পি আহত অধ্যাপকের সম্পর্কে খোঁজ নিলেন এবং তার ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করেন।

এর পর জে পিকে গাড়ীতে তুলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের গেটের সামনে নিয়ে যেতেই অবস্থা আরও ঘোরালো হয়। জনৈকা ছাত্র-পরিষদ নেত্রী জে পির গাড়ীর ওপর লাফিয়ে উঠে নাচতে শুরু করে এবং শ্লোগান দেয়। কয়েকজন মাস্তান জে পির মুখের সামনে গিয়ে মুখ বিকৃত করে ভেংচি কাটে অশ্লীল মন্তব্য করে। সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা সমর গুহ জে পিকে গাড়ী থেকে বের করতে গিয়ে কংগ্রেসী মাস্তানদের হাতে প্রহৃত হন, তার কনুইয়ের কাছে কিছু অংশ ছিঁড়ে যায়। তার নাকের ওপর ইঁট এসে পড়ে এবং দরদর করে রক্ত পড়তে শুরু করে। সে রক্ত ছিটকে আসে আমার জামাতেও। তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়ান। তাঁকে হাত ধরে নামিয়ে দেওয়া হয়।

এর পর রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী এবং প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। নব নির্মাণ সমিতির উদ্যোক্তা অজয় রায় তার চোখের নীচের রক্তাক্ত কাটা দাগ দেখিয়ে আমাকে বললেন : এই দেখুন আমার মুখে জনৈক মন্ত্রীর বর্বরতার চিহ্ন। প্রিয়-সুব্রতবাবুরা অবস্থা শান্ত করার চাইতে আরো জটিল করে তুলেছেন। কুমুদ ভট্টাচার্য ইনস্টিটিউটের প্রধান ফটকের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে : বন্ধুগণ, আমরা আমাদের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করেছি, এখন আপনারা শান্তভাবে চলে যান।" কিন্তু অবস্থা তাতেও শান্ত হয়নি। কংগ্রেসীদের হাত থেকে ছোঁড়া ইঁট পাটকেলে আরও কয়েকজন জখম হন। জনসংঘের ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, বিহার ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির নেতা (যিনি জয়প্রকাশের সঙ্গে এসেছেন) বিদ্যানন্দ তেওয়ারী, হিমাংশু হালদার, দিলীপ মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ সিংহ, স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ অশোক সেন, সুশীল ধাড়া স্টেটসম্যানের ফটোগ্রাফার শ্যামল মৈত্র প্রভৃতি অনেকেই এ ঘটনায় আহত হয়েছেন। এর মধ্যে হিমাংশু হালদার এবং ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত পর্যন্ত খবর পাওয়া গেছে ইন্দ্রজিৎ ঘোষের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

অবস্থার ভয়াবহতা বিবেচনা করে জয়প্রকাশকে পুলিশ সভা না করেই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বলে এবং তার গাড়ী কোন রকমে ভীড়ের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউটের ভেতরে অপেক্ষমান ছাত্র যুবরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও জে পির বক্তৃতা শুনতে পেলেন না। জে পি শর্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন : আমাকে সভা করতে না দিয়ে এরা আমার উৎসাহকে আরো বাড়িয়ে তুলল। মুখ্যমন্ত্রী কাল আর বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না যে এ রাজ্যে গণতন্ত্র আছে।

ঠিকাদার ও ওভারসিয়ারের দুর্নীতি

(বিশেষ সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের (সুন্দরবন) জয়নগর ইরিগেশান ডিভিসনে কুলতলা ইরিগেশান সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত কুন্দখালি সেকশানে ও ভুবনেশ্বরী সেকশানে এবং রায়দীঘি ইরিগেশান সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত কনকনদীঘি সেকশানে ওভারসিয়ার ও ঠিকাদারেরা টাকা লুটে-পুটে খাচ্ছে বলে দর্পণের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগ, এক কুন্দখালি সেকশানে ডেঙ্গাজোড়ার মৌজায় চিরখাকী স্লুইসে মেরামত হয়েছে বলে দেখিয়ে মেরামতের বিল করা হয়েছে। এদিকে ঠিকাদার সিমেন্ট কালোবাজারে বিক্রী করে দিয়েছে। স্থানীয় লোকের কাছে খোঁজ করলেই এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

দুই, ডোঙ্গাজোড়া সারকিটে বর্ষাকালে বাঁধ মেরামত হয়েছে বলে কাজের জন্য ঠিকাদারদের নামে পনের হাজার টাকা মিথ্যা বিল করা হয়েছে। পুরনো চৌকার দুই ফুট উচ্চতা ছিল। ঐ চৌকা তিন ফুট ছয় ইঞ্চি থেকে চার ফুট দেখিয়ে বিল করা হয়েছে। ঐ চৌকাগুলি ড্রাই সিজনে একবার বিল করা হয়েছিল। একই চৌকার জন্য দুই বার বিল করে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

তিন, ভুবনেশ্বরী সেকশানে কাজের সঙ্গে বিলের কোন সামঞ্জস্য নেই। বিল হয়েছে কাজের চেয়ে তিন গুণ। পুরনো চৌকা ও নতুন চৌকা মেজারমেন্ট বইতে এন্ট্রি করে বিল করা হয়েছে।

চার, কনকদীঘি সেকশানে ঠিকাদার এক হাজার চৌকা কেটেছে, কিন্তু মেজারমেন্ট বইতে এন্ট্রি হয়েছে পাঁচ হাজার চৌকা। বছরে দুবার মেজারমেন্ট করে দুবার বিভিন্ন ঠিকাদারের নামে বিল হয়েছে। একই চৌকা বর্ষার পূর্বে এক ঠিকাদারের নামে বিল হয়েছে। দুই ফুট চৌকার উচ্চতা দেখানো হয়েছে তিন ফুট।

ঠিকাদারেরা বলে, বহু জায়গায় ওভারসিয়ারদের পার্সেন্টেজ দিতে হয়, তাই তারা অসাধুতা অবলম্বন করে। ওভারসিয়াররা বলে ঠিকাদারদের সুবিধা না দিলে বড় সাহেবরা তাদের বদলী করে দেন। এইভাবে তারা সাহেবদের খুশি করে এক জায়গায় অনেকদিন থাকতে পারেন। এইভাবে সেচ দপ্তর চলছে। এবং রাজ্যের অন্যান্য দপ্তরও।

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

এস ঘোষ এণ্ড কোম্পানী ভূপালবাবুর নির্দেশে অডিটের কাজ থেকে ছাড়ানই হবার পর উক্ত কোম্পানী কলেজ কর্তৃপক্ষকে গত বছর বারোই ডিসেম্বর একটি চিঠিতে জানান :

Secretary has tried to cancel the audit work on the pretext of delay in audit. It appears to us that it is your secretary who wanted to cancel the audit with the only purpose of avoiding the production of details asked for to suppress the facts.

সরকারী শিক্ষা দপ্তর ও রাজ্য দপ্তর সমস্ত খবর জানতে পেরে সরকারী হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করেন। গত উনত্রিশে থেকে একত্রিশে জানুয়ারীতে কলেজে তদন্ত হয়ে যায়। সরকারী বিশ হাজার টাকার ঠিকমত হিসাব আছে কিনা এবং কলেজের পরিচালকমণ্ডলী বৈধভাবে গঠিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে এবং অন্যান্য বে-আইনী কাজের তদন্ত করাই ছিল সরকারী উদ্দেশ্য।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সরকারী মহল ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত সতেরোই নভেম্বর ঐ ভুয়া কমিটিকে স্বীকার করেন না। ফলে গত বছরে জুলাই মাসে অনুমোদিত বিশ হাজার টাকা অনুদানও পাওয়া যাচ্ছেনা।

অন্যদিকে রবীন্দ্র ভারতীর অনুমতি ছাড়াই ভূপালবাবু বেশ কিছু শিক্ষক নিয়োগ করে বসে আছেন। নিযুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন : রমেন মিত্র, অসীম বোস, হরিপাল সাহু, কার্তিক পাইন, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, বেনু লাহিড়ী, রতীশ সাহা, বিজন চৌধুরী প্রমুখ। এর ফলে দুর্নীতি আরো প্রশ্রয় পাচ্ছে। যেমন অধ্যক্ষের স্বাক্ষর ছাড়াই ছাত্রদের যথেচ্ছভাবে রেল কনসেসন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কনসেসন ফর্মে ভূপালবাবু কর্তৃক নিযুক্ত যখন যে খুশী সই করছেন।

Regd. No. WP/CC-32

PRICE: 40 PAISE

অন্ধ রাজনীতি ও সি পি আই

চাণক্য সরকার

হালেই মাও সেতুং-এর কয়েকটি সাম্প্রতিক বক্তৃতার ইংরেজী অনুবাদ পড়ছিলাম। বিলেতী কোম্পানী পেঙ্গুইন প্রকাশ করেছে, পঞ্চাশদশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তর দশকের শুরু পর্যন্ত চীনা অধিনায়কের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার অনুবাদ।

কমিউনিস্টদের বিভিন্ন সময়ে, কি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কি রাষ্ট্র-পরিচালনায়, যে সমস্ত কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার নানা একান্ত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় এই সঙ্কলনে।

১৯৫৮ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের এক সম্মেলনে মাও সেতুং বলছেন নিজেদের সমস্যা গভীর বিশ্লেষণ ও জনগণের সহায়তায় সমাধান করতে হবে।

এ ব্যাপারে অন্য কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হওয়া বিজ্ঞান-সম্মত নয়। যেহেতু মার্কসবাদ লেনিনবাদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সেই হেতু অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসূচী প্রণয়ন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী।

অন্ধ বিশ্বাসের পরিণাম কি নিজের জীবন থেকে তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মাও সে তুং। তিনি বলেছেন তার জীবনে দীর্ঘ তিন বছর ধরে তিনি মুরগীর সুপ খাওয়া বর্জন করেছিলেন অন্যান্য বহু চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মত। কোন এক সোভিয়েত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে, এই ধরণের সুপ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

সঙ্গে সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েতের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে মুরগীর সুপ বর্জনের নির্দেশ দেয়। প্রায় তিন বছর পরে আবার সোভিয়েত ম্যাগাজিনে বলা হল যে, আগেকার বক্তব্য বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। অর্থাৎ মুরগীর সুপ বর্জনীয় নয়। সঙ্গে সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ প্রত্যাহার করা হল।

অর্থাৎ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এবং রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ কখনই এই নয় যে ঐ পার্টি অথবা ঐ দেশ থেকে যা কিছু নির্দেশ বা প্রকাশিত তথ্য অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। মাও সেতুং বলেছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের ওপর জোর দেয়। কোন তত্ত্ব বা বক্তব্য গ্রহণ করার পূর্বে বিশেষ কোন দেশে তা প্রয়োগ যোগ্য কিনা বা তার সত্যতা কতটা তা নিখুঁতভাবে যাচাই করা দরকার।

এটা অতি সাধারণ কথা। কিন্তু ভারতবর্ষে বা অন্যান্য বহু দেশে কমিউনিস্টদের মধ্যে এই বিশ্লেষণের ক্ষমতা বা এমনকি মানসিকতার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। হয় পার্টির ওপর তলা থেকে যা নির্দেশ আসছে তার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস বা সোভিয়েত কিম্বা চীন যা বলছে তার অন্ধ সমর্থন এ দেশের কমিউনিস্টদের স্বভাব এবং আচার পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সি পি আই-এর কথা ধরা যাক। সৃষ্টির শুরু থেকে সোভিয়েত পার্টির এবং রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির শরিক হিসেবে কাজ করে আসছে এই দল। যে ভাবে ঐ পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তিত হয়েছে ঠিক সেইভাবেই পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্য মোড় নিয়েছে। এই ঘটনা আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে

কমিউনিস্টদের প্রথম কাজ হল শ্রেণীশত্রু চিহ্নিত করে এমন রণকৌশলের ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন চালানো যাতে ঐ শত্রু ক্রমশঃ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঐ শ্রেণীশত্রু অবশ্যই চেষ্টা করবে নিজের পক্ষে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে রাখতে। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, কমিউনিস্টরা যদি সমাজের গতি প্রকৃতি ডায়ালেকটিকসের মাধ্যমে বুঝতে পারে তাহলে ব্যাপক জনগণের ঐক্যসাধন এবং মূল শ্রেণীশত্রু গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

কিন্তু এ দেশে এই মূল শ্রেণীশত্রু চিহ্নিত করার ব্যাপারে যদিও কমিউনিস্টদের মধ্যে মৌলিক কোন মতভেদ দেখা যায় নি তবুও মূল রণনীতি ও কৌশলের ব্যাপারে প্রচণ্ড বিরোধ বহু বছর ধরে চলে আসছে। ফলে শ্রেণীশত্রু জনগণের নেতৃত্বে চলে এসেছে এবং দেশে স্বাভাবিকভাবে সংকট তীব্রতর হওয়া সত্ত্বেও এই শত্রুগোষ্ঠী নিজেদের নেতৃত্বকে এবং দলকে ক্রমশঃ আরও বেশী শক্তিশালী করে নিয়েছে।

আর কমিউনিস্টরা সেই শুরু থেকে যে তর্ক করে আসছে সেই তর্কের আবর্তে এখনও আটকে আছে। শুধু তাই নয় কমিউনিস্টরা বহুধা বিভক্ত হয়ে গেছে।

এই সমস্ত ঘটেছে অন্ধ বিশ্বাস থেকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে সঠিক প্রত্যয় থেকে নয়। আসলে এদেশে আলোচনা বিশ্লেষণ শিক্ষার ভিৎ গড়ার কোন প্রয়াসই কমিউনিস্টদের মধ্যে দেখা যায় নি। দল বার বার নানা ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে গেছে কিন্তু তার কোন সঠিক বিশ্লেষণ দলের ওপর থেকে নীচু পর্যন্ত করা হয় নি।

এই বিশ্লেষণ এবং আলোচনার কোন ভিৎ গড়ে উঠলে প্রতিটি কমিউনিস্টের আত্মশিক্ষার তাগিদ থাকত। অভিজ্ঞতা থেকে এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস থেকে শেখার ঝোঁক থাকত।

কিন্তু এখানে বেশীর ভাগ কমিউনিস্টরা বরাবরই নেতৃত্বের দোষে অর্ধশিক্ষিত থেকে গেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোন চর্চা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। মার্কস লেনিন অথবা অন্যান্য মার্কসবাদী সাধারণ বই পড়ার ধৈর্য এদের নেই। ফলে নেতারা কায়েমী হয়ে বসে থাকেন বার বার নানা ভ্রান্তি সত্ত্বেও।

সম্প্রতি হাওড়া জেলার একজন বিশিষ্ট প্রবীণ সি পি আই নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় চীনের প্রসঙ্গ উঠল। হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে উঠে তিনি হাতের ওপর হাত ঠুকে বললেন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নিজেকে কমিউনিস্ট বলার কোন অধিকার নেই। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা এই বক্তব্য কয়েক বছর ধরে রেখে আসছে এবং এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেক সময় লেনিনের উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সি পি আইয়ের জেলা নেতা তাও পড়েন নি। খালি শুনেছেন যে, সোভিয়েত চীন বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে চীন এখন অপাংক্তেয়।

জেলা নেতাকে প্রশ্ন করেছিলাম কোন গোষ্ঠী বা দলকে কমিউনিস্ট বলতে গেলে কি নির্দেশক দরকার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি হঠাৎ আবার চীৎকার করে উঠলেন। চীন বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে এবং যে দল এই সংগ্রামের বিরোধিতা করে তাকে কমিউনিস্ট পার্টি বলা যায় না।

বলার চেষ্টা করেছিলাম কিউবা মুক্তি সংগ্রামের সময় সোভিয়েত প্রভাবিত ও দেশের কমিউনিস্টদের বিরোধী আচরণের কথা।

বঙ্গদর্শন

ঠাণ্ডা মাথায় ওকে শুনতে অ... রোধ করি। বলার কথা ছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকলে পররাষ্ট্রনীতির তাগিদে বিশ্ব-ব্যাপী রণনীতির প্রয়োজনে নানা কৌশল নেয়। সেই কৌশল দিয়ে ত আর কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচার করা যায় না। তাহলে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বহির্বিশ্বের ব্যাপারে নানা আচরণের কথা তোলা যেতে পারে এবং দেখানো যায় যে আপাতদৃষ্টিতে সেই সমস্ত আচরণ বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে সমূহ ক্ষতি করেছে।

জেলা সি পি আই - নেতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে এবং শে... পর্যন্ত তিনি এই বলে থামলেন যে, এই বয়সে আমি আর নতুন করে মত পরিবর্তন করতে চাই না। তবে এ কথা মনে করি যে, এখানে সি পি এম প্রতিক্রিয়ার দালাল। কোন যুক্তিতে এই দল সংগঠনা কংগ্রেসের সঙ্গে এক প্ল্যাটফরমে বক্তৃতা করে? নেতৃস্থানীয় এক সি পি আই কর্মীর শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার এই স্তর।

আর শুধু ওদের নয়, সব কমিউনিস্টদের হাল প্রায় এক। অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করার কোন প্রস্তুতি ওদের কারুর আছে বলে মনে করার কোন কারণ ওরা সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চার করতে পারে নি।

একতারা : গায়ক যখন নায়ক

একতারা শিল্পীচক্র প্রযোজিত এবং শম্ভু চৌধুরী রচিত ও নির্দেশিত সংগীতবহুল নাটক "গায়ক যখন নায়ক" মহৎ লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের স্থিতনিষ্ঠ ঘোষণায় উজ্জ্বল। অভিনয়ের উৎকর্ষতা এবং কয়েকজন শিল্পীর সুরেলা কণ্ঠের গান এই নাটকের গর্বিত সম্পদ। সন্দেহ নেই, সব কিছু মিলিয়ে "গায়ক যখন নায়ক" আর পাঁচটি নাট্যপ্রযোজনার দরবারে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট।

পক্ষান্তরে যে কথাটা আমি সবিনয়ে বলতে চাই, তা হচ্ছে এই যে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে অপসংস্কৃতিক ক্রিয়াচারের অত্যধিক প্রদর্শন সম্ভবতঃ বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সুধী দর্শকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এই কাজকে সুচতুর ঝবসায়িক কৌশল বলে ভুল করবার সম্ভাবনা আছে অন্যদিকে নাতিসচেতন দর্শকদের মনে (বিশেষ করে কিশোর ও যুব অংশ) এই অত্যধিক প্রদর্শনের নেতিবাচক দিকটি দ্বারা কলুষিত প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনাও আছে।

দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এই যে, নাটকে অধীর মণ্ডলের চিন্তা ও চেতনার দ্বান্দ্বিক পরিণতি অতি-মাত্রিক যান্ত্রিক খাতে প্রবাহিত হবার ফলে নাটকে মোটা দাগের আভাস স্পষ্ট। একজন গ্রামীণ কৃষক তার পল্লীর পরিবেশ ছেড়ে সহরে যায়

নাট্যাভিনয়

তখনই যখন সে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছন্ন হয়ে পা রাখবার স্থান পায় না। এই নাটকে অধীর মণ্ডল সেভাবে চিত্রিত হননি। বরং বলা যায়, গুরু অনন্ত দাসের সান্নিধ্যে এসে অধীর মণ্ডলের মানসিক চেতনা ক্রমোন্নত চৈতন্যের পথেই ধাবিত হয়েছিল। এখানে হঠাৎ আনন্দলোকের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে সে নিজের ঘরণী এবংসমাজকে এক কথায় ছেড়ে যাবে—বাস্তব যুক্তির বিচারে এই সিদ্ধান্ত কোন মতেই গ্রাহ্য নয়। এখানে Dramatic sequence কিংবা নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে অধীরের পরিবর্তিত মানসের পটভূমি বিস্তার ও বিন্যাসই হতো রীতিগ্রাহ্য।

তবে, একটি কথা। এই নাটকের কৃষক রমণীদের দেখে বুঝতে পারলাম, বাংলার চাষী বৌরা গলায় সোনার হার পরে, হাতে চুড়ি পরে, কানে পরে দুল। নাটকার কি তার কল্পিত রাজ্যের কৃষক বধূদের উপস্থাপিত করেছেন —যা আমাদের কাছে অভাবনীয় এবং হাস্যকর? আশা করবো, ভবিষ্যতে নাটকের এই ত্রুটিগুলো সংশোধিত হবে। শম্ভু চৌধুরী এই নাটকের সংগীত পরিচালকও। সুরসংযোজনা মোটামুটি মন্দ নয়। কিন্তু, কবিগানে কীর্তনের সুর আসে কিভাবে? অথবা, বাংলা দেশের ধান কাটার গানে পশ্চিমের আর্বান টুইডল মিউজিক কিভাবে মিশে যায়? গোটা নাটকের পটভূমিই যেখানে লোকসংগীত সেখানে এই stylisation অথবা ভঙ্গীনির্ভরতা কেন? অভিনয়ে তাপস সরকার, রত্না চট্টোপাধ্যায়, সিকত গাঙ্গুলী, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল মালাকার এবং অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শেষ কথা। বুর্জোয়া অবক্ষয়ী আর্থ সামাজিক সৌধের সমান্তরাল উপসৌধিক প্রাকারে আঘাত হানার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিস্মরণও কিন্তু নয়মান্তরে অপসংস্কৃতি। প্রযোজকদের পক্ষ থেকে "তত্ত্বের ভারে প্লটের গতি ব্যাহত না হয়"—এই অজুহাত এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

সাধন গুহ

একটি অনুষ্ঠান

কয়লাঘাটা ইস্টার্ণ রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবের রজত জয়ন্তী উৎসব মঞ্চে গত এগারো মার্চ থেকে পনেরোই মার্চ পর্যন্ত শিল্প সংস্কৃতিতে জীবনের বিকৃতি সম্পর্কে পাঁচদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, অধ্যাপক কুমুদ ভট্টাচার্য, ডঃ প্রভাত গোস্বামী, অধ্যাপক তপোবিজয় ঘোষ ও শ্রীনেপাল মজুমদার। আলোচনা পরিচালনা করেন শ্রীসাধন গুহ। ক্লাব সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্তীও অপসংস্কৃতির প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের সদস্যরা এরপর "শতাব্দীর সংলাপ" নাটকটি অভিনয় করেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক নবার্ক ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১১ই এপ্রিল ৮৫ ॥ ৪০ পয়সা

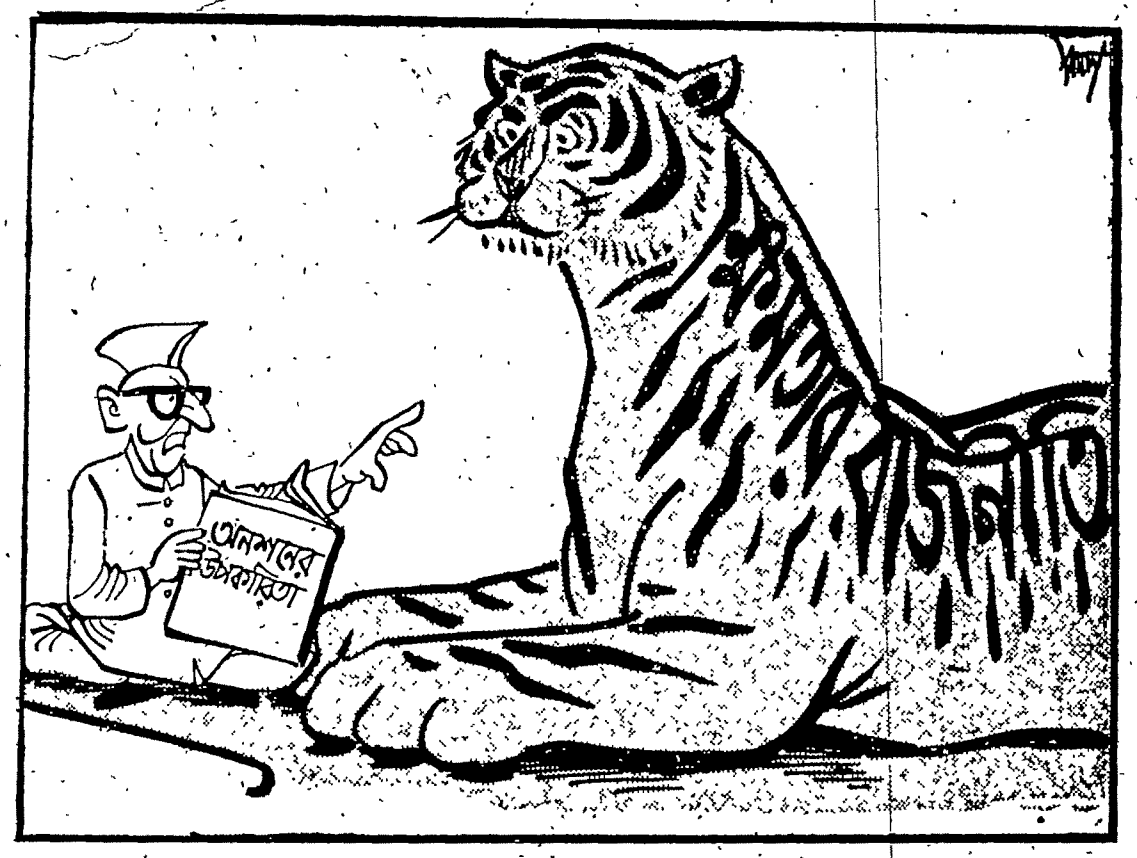

চারজন মন্ত্রী ও বেশ কিছু এম এল এ পদত্যাগ করবেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সীমানা পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাবিত কাঠামোর পরিবর্তন করা না হলে রাজ্য কংগ্রেসের চারজন প্রবীণ মন্ত্রী সহ বেশ কিছু সংখ্যক এম এল এ বিধান সভা থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এঁরা সবাই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সদস্য।

দর্পণের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর জনৈক মুখপাত্র তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, শুধু পদত্যাগেই আমরা ক্ষান্ত থাকব না। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর "আমাদেরকে" খতম করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে রায় সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে দেবো। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকারের আশু পতন ঘটানো।

রাজ্য কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতারা সীমানা পুনঃনির্ধারণের যে প্রস্তাবিত খসড়া দেখেছেন তাতে তারা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। রাজ্যের সীমানা পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাব এপর্যন্ত আছে তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এই গোষ্ঠীর প্রথম সারির নেতারা। রকম সমক দেখে নেতৃবৃন্দের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাঁদের সমালোচক ও বিরুদ্ধগোষ্ঠীর লোকদের প্রসেস অফ এলিমিনেশন"-এর রাজনীতির শিকার করছেন। যদিও সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিটি নিরপেক্ষ বিশিষ্ট তিনজনকে নিয়ে গঠিত তবুও কমিশনের প্রস্তাবের মধ্যে বিক্ষুব্ধগোষ্ঠী তাদের নিধনের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেয়েছেন।

দুইজন বিশিষ্ট বিচারপতি এবং ইলেকশন কমিশনারকে নিয়ে তিন জনের এই কমিটি। সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রশ্নে এঁরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে প্রতি রাজ্য থেকে পাঁচ জন বিধানসভা সদস্য ও পাঁচজন লোকসভা সদস্য মোট দশজনকে সহযোগী সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে। এই সদস্যরা বিভিন্ন দল থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে মনোনীত হন। এঁরা হচ্ছেন সহযোগী সদস্য। সহযোগী সদস্যরা নিজ নিজ রাজ্যের সীমানা পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে কমিটিকে তাঁদের মতামত দেন। অবশ্য এই মতামত গ্রহণ করার কোন বাধ্যবাধকতা কমিটির নেই।

সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে খসড়া রচনা করেছেন তাতে রাজ্য কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান নেতারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বেশী।

বিশ্বস্ত সূত্রে কমিটির খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে যা জানা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, কুচবিহারের ফজলে হক, বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী, জলপাইগুড়ির ভবানী পাল, পশ্চিম দিনাজপুরের রমেন দত্ত, চব্বিশ পরগণার কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী এ কে এস ইশাক প্রভৃতির আসনগুলি তপশিলীদের জন্য সংরক্ষিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা রাজ্যের মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের হাবড়ার আসনটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নদীয়ার কাশীকান্ত মৈত্র ও

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

বি পি এন টি ইউ সির সভা বানচাল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ আই এন টি ইউ সি শাখার সাধারণ সম্পাদক শিশির গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ হওয়ার ফলে সংগঠনের কর্মপরিষদের সভা বাণচাল হয়ে যায় গত মঙ্গলবার।

পরিষদের তরুণ সদস্য এবং এবং দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পার্থ রায়চৌধুরী শিশির গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পুরোধা ছিলেন। শিশিরবাবুর বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণের ভাষা ছিল তীব্র।

তিনি বলেন : "শিশিরবাবু অসৎ, জালিয়াত, চটকল মালিকদের সংগঠন আই জে এম এর দালাল, ইত্যাদি ইত্যাদি।" পার্থবাবুর বক্তব্যের সমর্থনে আরও অনেকে বক্তৃতা করেন পরিষদ সভায়।

ইতিমধ্যে পরিষদ সভার বাইরে তিনটি কংগ্রেসী ইউনিয়নের সমর্থকরা

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সরকারী টাকায় অকারণ দিল্লী ভ্রমণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সর্বভারতীয় হেল্‌থ কাউন্সিলের সম্মেলন দিল্লীতে শুরু হবে আগামী ষোলই এপ্রিল থেকে। চলবে উনিশে এপ্রিল পর্যন্ত। এই সম্মেলনে নিয়ম-মাফিক প্রতিটি রাজ্য থেকেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারী—এই দুজন করে প্রতিনিধি আসছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট এক ডজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনের নাম করে সরকারী টাকায় তাদের দিল্লী ভ্রমণের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন।

প্রতিনিধিদের মধ্যে আছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা এবং হেল্থ সেক্রেটারী অরুণ সেন ছাড়াও ডেপুটী হেল্থ সেক্রেটারী এন কে সাহা, হেল্থ ডিরেক্টর কে ডি বসুমল্লিক, এস কে গুপ্ত, কে কে রায় (ডেপুটি ডিরেক্টর অব হেল্থ ট্রান্সপোর্ট), মুরারী বাগচী (ফ্যামিলি প্ল্যানিং), এ কে মুখার্জী (ডেমোগ্রাফার), ক্ষিতিশ পাল মণি নন্দী দিলীপ রুদ্র (সং এন্ড ড্রামা ডিভিশন) এবং একজন স্টেনোগ্রাফার। এই এক ডজন প্রতিনিধির মধ্যে সকলেই স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। তবুও এই রাজ্যকে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেবার উপযুক্ত "টিম" তৈরী হচ্ছিল না বলে প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়াতে হল। তাছাড়া একজনকে নিয়ে আরেকজনকে না নিলে কেউ কেউ গোঁসা করতে পারেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে হাফ ডজন যাবেন প্লেনে, বাকীরা যাবেন ফার্স্টক্লাশ ট্রেনে। জানা গেছে, এই এক ডজন প্রতিনিধির অপ্রয়োজনীয় দিল্লী বিহারের খরচ পড়বে জন প্রতি দেড় হাজার থেকে দু হাজার টাকা, যা একজন সাধারণ শ্রমিকের এক বছরের আয়ের সমান।

জুট কর্পোরেশনে সংখ্যালঘু ইউনিয়নকে সরকারী মদত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি জুট কর্পোরেশনে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঝামেলা হয়েছে। একটি গোষ্ঠী সৌগত রায়কে সভাপতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কর্পোরেশনের কর্মচারীদের একাংশ এর বিরোধিতা করে।

ইউনিয়ন করার ব্যাপারে কর্মচারীরা একমত। কিন্তু ভিন্নমত দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌগত রায়কে ইউনিয়নের সভাপতি করার ব্যাপারে।

পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই ব্যাপারে সমস্ত কর্মচারীর ভোট নেওয়া হবে। ভোটের বিষয় ছিল—বাইরের কোন নেতাকে ইউনিয়নের সভাপতি করা হবে, না কর্মচারীদের মধ্যে একজন সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

মোট আড়াইশো কর্মচারীর মধ্যে ১৫৯ জন ভোট দেন। বাহান্নজন বাইরের নেতাকে ইউনিয়নের সভাপতি করার পক্ষে ভোট দেন। সাতটি ভোট নষ্ট হয়। আর বাদবাকী সবাই চান কর্মচারীদের মধ্যে কেউ সভাপতি নির্বাচিত হোন।

ভোটের এই ফলাফলে কিন্তু সৌগত রায়ের সমর্থকেরা দমে যান নি। গোপনে তাঁরা সৌগতবাবুকে সভাপতি করে একটি ইউনিয়নকে শ্রমদপ্তরে রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছেন।

কর্মচারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এর প্রতিবাদ করে আবার একটি ইউনিয়ন করে শ্রমদপ্তরে যায় স্বীকৃতির জন্য। কিন্তু গত দুমাস ধরে তাদের হয়রাণ করা হচ্ছে।

শ্রমদপ্তরের কর্তারা বলেছেন ভোটাভুটির ব্যাপারে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু যে ইউনিয়নের সভাপতি সৌগত রায় তার স্বীকৃতি ও রেজিস্ট্রেশন হবে এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই।

দর্পন

১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা
শুক্রবার, ১১ই এপ্রিল ১৯৭৫

নয়া গোয়েবলস

পশ্চিমবঙ্গে দুজন নয়া গোয়েবলসের আবির্ভাব ঘটেছে। একজনের নাম শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, আর একজনের নাম শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। হিটলারের অনুচর গোয়েবলসের মত এরা বিশ্বাস করেন যে, মিথ্যাকে বার বার সত্য বলে প্রচার করলেই সেটা সত্য হয়ে যায়। তাই ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী যেদিন প্রিয় মুন্সী ও সুব্রত মুখার্জীর নেতৃত্বে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের ওপর ফ্যাসিবাদী কায়দায় পুলিশের উপস্থিতিতে হামলা চালালো তার পরদিনই প্রিয় মুন্সী এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করলেন যে, সেদিন বিশেষ কিছু ঘটেই নি, ব্যাপারটা সাজানো এবং কংগ্রেসী যুব-ছাত্রদের খেলো করার জন্য জয়প্রকাশ মিটিং না করে চলে গেছেন। অসত্য ভাষণের প্রতিযোগিতায় সিদ্ধার্থ রায় প্রিয় মুন্সীকে পরাজিত করে দিন তিনেক পরেই বিধানসভায় মিথ্যার তুবড়ী ছোটালেন।

অবশ্য এরা প্রত্যেকেই এক একটা ক্ষুদে গোয়েবলস। দেশবাসীকে ভাঁওতা দিয়ে আর মিথ্যা প্রচার চালিয়ে এরা ক্ষমতায় এসেছেন। প্রথমতঃ সমাজতন্ত্রের কথাটা একটা বিরাট ভাঁওতা। ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে তাবৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেসী নেতা একথা ভাল করেই জানেন। আর তাঁরা একথাও ভাল করে জানেন যে, দেশবাসীও সেটা বোঝে। তাই সারা দেশে পুলিশ সি আর পি ও কংগ্রেসী গুন্ডাবাহিনীর ফ্যাসিবাদী মহড়া।

দ্বিতীয়তঃ পরিসংখ্যান দিয়ে কংগ্রেস সরকার যতই প্রমাণ করার চেষ্টা করুন যে, দেশের শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতি ঘটছে সেটা কেউ বিশ্বাস করে না। মানুষ প্রতিদিন হাড়ে হাড়ে বুঝছে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, যার প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের জীবন আজ দুর্বিষহ। অপরদিকে চোর ছিনতাইকারী ওয়াগন ব্রেকার ডাকাত চোরাচালানদার চোরাকারবারী একচেটিয়া পুঁজিপতি মন্ত্রী কংগ্রেসী নেতারা ক্রমশই স্ফীতকায় হচ্ছে।

এই হল সত্য। কংগ্রেসী গুন্ডাবাহিনী সেদিন জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের নামে রাজপথে ফ্যাসিবাদী গুন্ডামী চালিয়েছে এটাও সত্য। গোয়েবলসের কায়দায় প্রচার চালিয়ে সত্যকে মিথ্যা করা যাবে না।

সীমানা পুনর্বিন্যাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নীলকমল সরকারের আসনটিও তপশিলীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। বর্ধমানের পুরঞ্জয় প্রামাণিক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোবিন্দ নস্কর ও ললিত গায়েনের বিধানসভা কেন্দ্র তপশিলী থেকে সাধারণ আসন করে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এঁরা সকাই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রথম সারির নেতা। অপর দিকে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মালদহের গৌতম চক্রবর্তী ও মুর্শিদাবাদের আদিত্য দত্তের বিধানসভা কেন্দ্র ও মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় ও শ্রীমতী মায়া রায়ের লোকসভার আসনটি তপশিলীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। যদিও সিদ্ধার্থ রায় ও মায়া রায়ের অন্য আসন পেতে অসুবিধা হবে না।

সবচেয়ে বিতর্কিত ঘটনা ঘটেছে কলকাতার দুটি আসন নিয়ে। একাত্তর সালের লোকগণনার রিপোর্টে প্রকাশ কলকাতার লোকসংখ্যা বাড়ে নি। এরই ভিত্তিতে কমিটি কলকাতার শ্যামপুকুর ও কালীঘাট আসন দুটি তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন। শ্যামপুকুর আসনটি তুলে দেওয়ার প্রশ্নে রাজ্যের দশজন সহযোগী সদস্যই বিরোধিতা করেছেন। কারণ শ্যামপুকুর কেন্দ্রটি শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুর স্মৃতি বিজড়িত। এই কেন্দ্রে নির্বাচন প্রার্থী থাকাকালেই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। তারপর উপনির্বাচনে হেমন্ত বসুর দল ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী অজিত বিশ্বাসও নিহত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্নে রাজ্যের সহযোগী সদস্যরা একবাক্যে এই কেন্দ্রটি রাখার অনুকূলে মতামত দেন।

সম্প্রতি লক্ষ্মীকান্ত বসু এক পত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কলকাতার সীমানা পুনর্বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রীবসু তাঁর পত্রে বলেছেন এক থেকে তেইশটি আসনের মধ্যে বেছে বেছে কেন দুই নম্বর সীট শ্যামপুকুর ও দশ নম্বর সীট কালীঘাটকে তুলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এক নম্বর সীট থেকে পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু হলে বাইশ ও তেইশ নম্বর সীট দুটিই তো তুলে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীবসু তাঁর পত্রে হিন্দুদের তীর্থ ক্ষেত্রের নামাঙ্কিত কালীঘাট কেন্দ্রটি তুলে দেওয়ার চেষ্টায় বিরোধিতা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র অজিত পাঁজা শ্যামপুকুর কেন্দ্র নিয়ে যে জল ঘোলা করার চেষ্টা করছেন সে কথার উল্লেখ করে শ্রীবসু পাঁজার বিরুদ্ধে চরিত্র হননের অভিযোগ করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অজিত পাঁজার নেতৃত্বে উত্তর কলকাতার কিছু এম এল এ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর তাত্ত্বিক নেতা বারিদবরণ দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন এই বলে যে, নিজ কেন্দ্র শ্যামপুকুরকে বাঁচাতে বারিদবাবু অন্যান্য কেন্দ্রের এম এল এ-দের স্বার্থহানি করেছেন।

গত দোসরা এপ্রিল কলকাতার কিছু এম এল এ-কে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে বারিদবাবু অজিত পাঁজার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, শ্যামপুকুর কেন্দ্রকে বাঁচানোর জন্য চব্বিশ পরগণার কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে। শ্যামপুকুর কেন্দ্র রক্ষা করার জন্য কলকাতার অন্য কেন্দ্রগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে বলে অজিত পাঁজারা যে আওয়াজ তুলেছেন তা মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সেদিনের বৈঠকে অজিত পাঁজা নিজের অভিযোগের সমর্থনে ও বারিদবাবুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখতে পারেন নি। অজিত পাঁজার দু-একজন চেলা আমতা আমতা করে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়ে তারা চুপ হয়ে যান।

সংসদ সদস্য প্রিয় মুন্সীর দক্ষিণ কলকাতার আসনটি যেভাবে পুনর্গঠিত করা হয়েছে তাতে তার আসনটি অনেক নিরাপদ হয়েছে। গত নির্বাচনে যে তিনটি কেন্দ্রে তিনি সি পি এমের গণেশ ঘোষের থেকে কম ভোট পেয়েছিলেন তার মধ্যে তালতলা ও ইন্টালি কেন্দ্র দুটি কেটে নিয়ে আলীপুর ও কালিঘাট কেন্দ্র দুটি প্রিয়বাবুর কেন্দ্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে সুব্রত মুখার্জীর বালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রিয়বাবুর প্রস্তাব নিয়ে। প্রিয়বাবু কমিশনের কাছে যে প্রস্তাব রাখেন, দেখা যায় কমিশনের মতামতই হুবহু তাই। প্রিয়বাবু আটষট্টি উনসত্তর নম্বর ওয়ার্ড দুটি বাদ দিয়ে বাহাত্তর, একানব্বুই ও বেরানব্বুই নম্বর ওয়ার্ড তিনটি বালীগঞ্জ কেন্দ্রে জুড়ে যেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। দেখা গেল যে বৈঠকে প্রিয়বাবু বালীগঞ্জ কেন্দ্র সম্পর্কে তার প্রস্তাব দেন, কমিশনের সেই সেই বৈঠকে যে খসড়া প্রস্তাব সদস্যদের দেওয়া হয় তাতেও হুবহু একই প্রস্তাব করা হয়েছে, প্রিয়বাবুর সদা প্রেশ করা প্রস্তাবের কমা ফুলস্টপ পর্যন্ত বজায় রেখে। সুব্রতবাবুর আটষট্টি ও উনসত্তর নম্বর ওয়ার্ড দুটি কসবা ও তিলজলার অন্তর্গত। এখানে প্রিয়-সুব্রত সমর্থিত একদল সমাজবিরোধী চরি, ছিনতাই ও নারীলাঞ্ছনার যে অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করছে তার ফলে ঐ এলাকার সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের তীব্র বিরোধী হয়ে উঠেছে। তাই ওয়ার্ড দুটি বাদ যাওয়ায় সুব্রত এখন নিশ্চিন্ত।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একই অভিযোগ উঠেছে। ক্ষমতাশীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধ পক্ষ অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সদস্যদের বিধানসভা ও লোকসভার কেন্দ্রগুলি পশ্চিমবঙ্গের পথ ধরেই এগিয়ে গেছে।

সীমানা পুনর্বিন্যাসের সামগ্রিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে রাজ্যের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এটা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর "প্রসেস অফ এলিমিনেশনে"র রাজনীতি ছাড়া কিছু নয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রদীপ ভট্টাচার্য, নুরুল ইসলাম, সোমেন মিত্র সুনীতি চট্টরাজ ও এই গোষ্ঠীর তাত্ত্বিক নেতা বারিদবরণ দাস প্রমুখেরা গত সপ্তাহে এক গোপন বৈঠকে বসেছিলেন। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তথা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের চারজন মন্ত্রী সহ তিরিশ জন এম এল এ পদত্যাগ করবেন। তারপর শুরু হবে সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আন্দোলন।

এখন সব কিছুই নির্ভর করছে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর। তিনি যদি কংগ্রেসের এক গোষ্ঠীর চাপে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর দাবীকে অগ্রাহ্য করেন তবে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহেই রাজ্যের রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন আসবে।

সভা বানচাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চীৎকার করতে থাকে নেতৃত্ব থেকে শিশিরবাবুর অপসারণ দাবী করে। ডানলপ, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং ইন্ডিয়ান অয়েল এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কংগ্রেসী ইউনিয়ন নেতৃত্বের কোন্দলে নানা ঝামেলায় পড়েছে। ইউনিয়নের কিছু কর্মী এর জন্য শিশিরবাবুকে দায়ী করেন। তাঁরা অবিলম্বে শিশিরবাবুর অপসারণ দাবী করেন।

সভায় পরিষদ সদস্য ভবানী পাল কংগ্রেসী ছাত্র-যুব গোষ্ঠীর সমালোচনায় কিছু বলতে চাইলে তাঁকে চেঁচিয়ে বলিয়ে দেওয়া হয়। যাঁরা চীৎকার করলেন তাঁদের বক্তব্য ঃ আজ যাঁরা ছাত্র-যুবদের সমালোচনায় এগিয়ে এসেছেন, সত্তর-একাত্তরে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির ভয়াবহ অবস্থায় তাঁদের টিকি দেখা যায় নি। ছাত্র-যুবরা নানা ঝুঁকি নিয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পেরেছে। আজকের অনুকূল পরিস্থিতিতে কোন সুবিধাবাদী নেতা আত্মপ্রকাশ করেছেন নেতৃত্ব কব্জা করার জন্য। ছাত্র-যুবরা তা হতে দেবে না।

অর্থাৎ দাবী উঠেছে যে কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন এখন ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হবে। পুরনো যাঁরা আছেন তাঁরা মালিকের স্বার্থে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত।

তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বলেন যে আই এন টি ইউ সির পশ্চিমবঙ্গ শাখার নেতৃত্ব প্রবীণেরা কব্জা করেছে ভুয়া সদস্য সংখ্যা ও ভোটের ভিত্তিতে। এই নেতৃত্ব অপসারিত না হলে পাল্টা আই এন টি ইউ সি গড়ে উঠবে এই রাজ্যে।

প্রবীণ নেতৃত্বের সমালোচনার কেন্দ্র বিন্দু ছিল শিশির গাঙ্গুলী। বাইরে শ্লোগানের ভাষায় ঃ চটকল মালিকের দালাল শিশিরবাবু দূর হটো, দূর হটো দালালের কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী

গত একত্রিশে জানুয়ারী রবীন্দ্র ষ্টেডিয়াম হলে পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজার পদত্যাগ দাবী করেন বিধানসভা সদস্য শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বোস। তিনি বলেন যে, আজকে এইখানে রক্তদান কেন্দ্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত হন নি, সেই কারণেই আমি ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে শ্রীঅজিত পাঁজার পদত্যাগ দাবী করছি। শ্রীবোস বলেন, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সময় বলেছিল যে, এই সরকার শ্রমিক-কৃষক এবং সাধারণ মানুষের সরকার, কিন্তু বিগত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝেছি যে এই সরকারের প্রতিটি কার্যকলাপ শ্রমিক-কৃষক এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। এই সরকারের ভিৎ মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রমিকের টাকা নয়ছয়

কাশীপুরের ইষ্টবেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং ই এস আই স্কীমের বাবদে লক্ষ টাকা তছরূপ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আরও জানা গেছে যে শ্রমিকরা এখনও তাদের দু মাসের বেতন পান নি, ফলে তাদের অর্ধাহার এবং অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। গত চব্বিশে মার্চ তারিখে শ্রমিকরা যৌথভাবে লাল এবং তেরঙ্গা ঝান্ডার নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ত্রিপুরা দিবস উপলক্ষে সমাবেশ

জনবাণীর দুঃখ প্রকাশ

শ্রীসত্যপ্রিয় রায় সম্পর্কে মর্যাদা হানিকর সংবাদ প্রকাশের জন্য "জনবাণী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঐ পত্রিকায় উনত্রিশে মার্চ সংখ্যায়। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষের নামে প্রকাশিত এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ "১৯৭০ সালের এপ্রিল সাপ্তাহিক "জনবাণী" পত্রিকায় "প্রশ্নপত্র ফাঁসের নেপথ্য কাহিনী" শীর্ষক সংবাদে শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের ব্যক্তিগত মর্যাদা হানিকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—এজন্য আমরা দুঃখিত। সংবাদটি প্রকাশের পর তদন্ত করে জানা গেল, ঐ সংবাদের বিষয়ের সহিত শ্রীরায়ের কোন সম্পর্কের সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা সমস্ত বিষয়টি তদন্ত না করে সংবাদটি প্রকাশের জন্য আমি মার্জনা চাইছি।

ব্রিটানিয়ার দু হাজার কর্মচ্যুত শ্রমিকের ভাগ্য নিয়ে তামাসা হচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেস ও রাজ্য সরকার ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার দুই হাজার কর্মচ্যুত শ্রমিকের ভাগ্য নিয়ে তামাসা শুরু করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে আশ্বাস দিয়েও কিছু কংগ্রেস নেতা এই কারখানাটিকে খোলাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। সম্প্রতি শ্রমিকস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এই কারখানাটিকে বিড়লার হাতে তুলে দেওয়ার কাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী প্রায় পাকা করে ফেলেছেন।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাস থেকে টিটাগড়ে অবস্থিত ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাটি বন্ধ হয়ে আছে। সেই থেকে এই কারখানার প্রায় দুই হাজার কর্মী কর্মহীন। ১৯৭০ সালের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট রিভাইবাল কমিটির" সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকারের কাছে এই মর্মে অনুরোধ জানান যে, ব্রিবার্ট সংক্রান্ত লোকের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন জড়িত থাকায় কারখানাটি খোলানোর ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠন হোক।

রাজ্য সরকারের এই অনুরোধ পাওয়ার পর ১৯৭১ সালের পয়লা জানুয়ারী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৯৭১ সালের সতেরোই মে তারিখে তাদের রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পেশ করেন। এই রিপোর্টে কারখানাটি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সুপারিশ মেনে নেন।

অপরপক্ষে বিহারের মোকামায় অবস্থিত ব্রিটানীয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী (ওয়াগন বিভাগ) অধিগ্রহণের জন্য ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়। ১৯৭৩ সালের বাইশে মার্চ তারিখে গঠিত তদন্ত কমিটি তার রিপোর্ট জাতীয় অর্থনীতি ও অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটানো প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তিতে এই কারখানাটি অধিগ্রহণের সুপারিশ করেন।

বাহাত্তর সালে নব কংগ্রেসী সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কয়েকজন কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মাঝে মাঝেই কাগজে বিবৃতি দিয়ে কারখানাটি খোলাবার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানাতে থাকেন। এই সময় কিড়লা কারখানাটি আংশিকভাবে কিনে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়। মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রী মোটামুটি এই প্রস্তাবে রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু সংসদ সদস্য প্রিয় দাসমুন্সী ও রজত চক্রবর্তী কারখানা কিড়লার হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করেন। প্রিয়বাবু ও রজতবাবু সংসদে এই কারখানা অধিগ্রহণের দাবী জানান। একই সময়ে তাঁরা স্থানীয় ক্ষুব্ধ নেতাদের আশ্বাস দিতে থাকেন কারখানার দরজা খুলে গেল বলে। যদিও দায়িত্বহীন সংসদ সদস্য হিসাবে তাঁদের ১৯৭১ সালের পয়লা জানুয়ারী গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও ভারত সরকারের মনোভাব জানা উচিত ছিল।

যাই হোক প্রিয়বাবু ও রজতবাবুর দাবী অনুসারে ভারত সরকার আবার ব্যাপারটি পর্যালোচনা করেন এবং পাকাপাকিভাবে কারখানাটি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী কারখানাটি রাজ্য সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যে চিঠি দেন, তার উত্তরে ভারত সরকার স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে, রাজ্য সরকার কারখানা অধিগ্রহণ করলে নিজ দায়িত্বে করতে হবে। এবং রাজ্য সরকার অধিগ্রহণের আগে এর অর্থনৈতিক দিকটি যেন ভেবে দেখে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় শ্রমমন্ত্রী গোপালদাস নাগের সঙ্গে আলোচনা করে কারখানাটি আংশিকভাবে বিড়লাদের হাতে তুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছেন বলে জানা গেল। বিড়লার টেক্সম্যাকো কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমহেশ্বরী এব্যাপারে বিড়লাদের হয়ে সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। কলকাতায় যে আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস হয়ে গেল তার সংগঠক কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মহেশ্বরী। প্রচুর টাকা তিনি দিয়েছেন সিদ্ধার্থবাবুর সন্তুষ্টির জন্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে টেবিল টেনিস খেলা কলকাতায় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সিদ্ধার্থবাবু নিজে উদ্যোগী ছিলেন। মহেশ্বরীর কাজে খুশী হয়ে বিড়লাদের স্বপক্ষেই মুখ্যমন্ত্রী ওকালতি করছেন।

জানা গেছে বিড়লারা কারখানার তিনটি বিভাগের মধ্যে দুইটি বিভাগ কিনবেন যাতে কিনা তাদের ওয়াগন তৈরীর যন্ত্রপাতি তৈরী হবে। এর জন্য ব্রিটানীয়ার কর্মহীন কর্মীদের নেওয়া হবে না। যা লোক লাগবে সবই আসবে তাদের বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকো কয়লার কারখানা থেকে।

প্রগতিশীল প্রিয়বাবু এখন কি করবেন। সেই বিড়লাকেই যদি কারখানা দেওয়া হবে, তাহলে আর এতদিন অভাগা কর্মীদের আশ্বাস দিলেন কেন যে সরকার কারখানা নিয়ে নেবেন?

পরীক্ষার খাতা রিভিউ হচ্ছে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্রদের খাতা রিভিউ করার জন্য পেপার প্রতি পনের টাকা জমা নিয়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খাতা রিভিউ করছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। চুয়াত্তরের প্রিলিমিনারি এল এল বি পরীক্ষার কিছু কিছু খাতা রিভিউ করা হচ্ছে না। অথচ পঁচাত্তর সালের পরীক্ষার টাকা জমা নেওয়া হয়েছে। গত বছরের প্রি-ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের খাতা রিভিউয়েরও একই হাল। খাতা দেখা হয়নি। এদিকে নতুন পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত।

ছাত্ররা এই অবস্থায় উভয় সংকটে পড়েছে। রেজিস্ট্রার বলছেন, আমি কিছু বলতে পারব না। কন্ট্রোলার সাহেব অর্ডার দিয়েছেন শুনলাম। কর্মকর্তাদের সময় নেই খাতাগুলো খুঁজে পরীক্ষকদের কাছে পাঠানোর।

রেজিস্ট্রার সাহেবের হাতে এক গোছা চাবি থাকে। তিনি আসেন বেলা বারোটায়। যে কোন পরীক্ষার ফল জানতে এবং মার্কশীট পেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারতলায় বসে থাকতে হচ্ছে চাবির অপেক্ষায়।

সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজের ডিসেম্বর সেসানের ছাত্রদের পরীক্ষার সময় প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের আসন নিয়ে তুলকালাম কান্ড হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছেলেদের সঙ্গে মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্র পরিষদের মন কষাকষি চলছিল আগে থেকেই। তাই যে যার ইচ্ছামত বঙ্গবাসী ও অন্যত্র বসে পরীক্ষা দিল। ছাত্র পরিষদের একদল নেতার দাপটে কন্ট্রোলার রবিবার দিনও স্পেশাল অর্ডার পাশ করিয়েছিলেন। মণীন্দ্র কলেজে যাদের সীট পড়েছিল তাদের অনেকের পরীক্ষা অসম্পূর্ণ। এরা পাকা। ঐ অভিযোগ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একদল ছাত্র। অনেকের ধারণা সুরেন্দ্রনাথের ছেলেদের ইচ্ছা করে কষ্ট দেওয়া নাকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের কিছু অধ্যাপকদের চিরকালের স্বভাব।

শিক্ষকদের কর্মবিরতি

প্রাথমিক শিক্ষকসমাজের প্রতি সরকারী বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রাথমিক শিক্ষকগণ এগারই এপ্রিল কর্মবিরতি পালন করবেন এবং সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে বিধানসভা অভিযান করবেন। এই সংবাদ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

দর্পণে প্রতিবিম্ব

কাগজে কলমে আমাদের রাজ্যপালদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। এদের সাংবিধানিক দায়িত্ব, দেশের মহান আদর্শ ও জনগণের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তা থেকে হিংসার পরিবেশ গড়তে না দেওয়া, জেলের প্রশাসন, বন্দীদের প্রতি ব্যবহার, পুলিশদের সমস্যা তফসীলী জাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রতি নজর রাখা, ফসল সংগ্রহ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্র সমাজের উন্নতির জন্য যত্নবান হওয়া—এমন হরেকরকম বিষয়ে রাজ্যপালদের উপদেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য অনেক মন্ত্রী। উপলক্ষ্য ছিল সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্যপালদের দুদিন ব্যাপী সম্মেলন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বকলমে মহান নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী মনোনীত এই সব কয়েক হাজারী মনসবদারেরা এই উপদেশামৃত কিভাবে গ্রহণ করেছেন, ক্ষুণ্ণ বা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, নাকি সমস্ত ব্যাপারটিকে একটি বিরাট তামাসা বলে মনে করেছেন, সে বিষয়ে কোন খবর নেই। বাহবা দিতে হয় ইন্দিরাজীকে। অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভাঙ্গা থেকে বিনা বিচারে হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী যুব ছাত্রকে বন্দী করে জেলে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো যেখানে চলে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে, যেখানে কলেজে কলেজে অ-কংগ্রেসী ছাত্র-শিক্ষকদের মারধোর করা বা হুমকী দেখিয়ে ইউনিয়ন দখল, খুনোখুনি করে শ্রমিক-ইউনিয়ন দখল যেখানে কংগ্রেসী রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেখানে সৎ প্রশাসনিক দক্ষতায় ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শকে বহাল রাখতে হয় যেখানে সুপরিকল্পিত সরকারী কারফাপুর্ণী ও পুলিশ সমর্থিত বিরোধী দলনেতাদের এমনকি জয়প্রকাশ নারায়ণের সভা বানচাল করে গণতন্ত্রের মহান আদর্শ রক্ষা করা হয়, সেখানে রাজ্যপালগণ যে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছেন, এবং এবারকার সম্মেলনের পর আরো সচেতনভাবে তা পালন করবেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

●

অবশেষে সিদ্ধার্থবাবু দুঃখ প্রকাশ করেছেন। গত দোসরা এপ্রিল কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে জয়প্রকাশ নারায়ণের সভা পন্ড করার জন্য কংগ্রেসী যুব-ছাত্ররা সারা এলাকা জুড়ে যে কান্ডকারখানা করেছে, যে হিংসাত্মক বিক্ষোভ দেখিয়েছে, যে অসভ্যতা ইতরতা ও নোংরামি করেছে, পুলিশ যেভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য ধিক্কার উঠেছে সারা ভারত জুড়ে নানামহলে। এমনকী কংগ্রেসী নেতা শ্রীচন্দ্রশেখর তো বটেই, শ্রীবিজয়সিং নাহার এই জঘন্য ঘটনার পেছনে পরোক্ষ সরকারী সমর্থন রয়েছে বলে অভিযোগ এনেছেন।

রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জী, যুবনেতা শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী সেদিনের বিক্ষোভ ও দক্ষযজ্ঞ কান্ডের পান্ডাগিরি করেছেন। রাজ্যবিধানসভায় পরদিন সিদ্ধার্থবাবু থেকে শুরু করে অনেক এম এল এ জয়প্রকাশজীর সভা পন্ড করা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। সি পি আইয়ের শ্রীমতী ইলা মিত্র তো শ্রীমুন্সীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেদিন দুঃখ প্রকাশের কথা ওঠেনি বরং কংগ্রেসী ও সি পি আই সদস্যরা সবাই এক কাট্টা হয়ে জয়প্রকাশজীর বাপান্ত করেছেন ও বিক্ষোভের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন। হঠাৎ গত ছয়ই এপ্রিল দুর্গাপুরে বর্ধমান যুব সম্মেলনে সিদ্ধার্থবাবু ইটপাটকেল ও জুতো ছোঁড়ার ঘটনার কারণ হিসেবে বললেন যে, সেদিনের অন্য এক অনুষ্ঠানে ইন্দিরাজী সম্পর্কে জয়প্রকাশের একটি মন্তব্যে হয়তো ছাত্রযুবরা উত্তেজিত হয়ে এই কান্ড করে থাকতে পারে।

আসল ঘটনার পর বিধানসভায় দুঃখ প্রকাশের সুযোগ ছিল, সুযোগ ছিল কিছু বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করার। চার পাঁচদিন পর হঠাৎ সিদ্ধার্থবাবুর দুঃখ প্রকাশ কেন? দিল্লীর নির্দেশ পেতে কি এতো দেরী হল? ইতিমধ্যে সিদ্ধার্থবাবুতে একবার দিল্লী ঘুরেও এলেন। তিনি অবশ্য দিল্লী থেকে ফিরেই ঘোষণা করেছিলেন, সেদিনের জয়প্রকাশজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ব্যাপারে দিল্লীতে কোন কথা হয়নি। কিন্তু দুর্গাপুরে দুঃখ প্রকাশ থেকে অনেকে মনে করবে সিদ্ধার্থবাবু দিল্লীর নির্দেশেই দুঃখ প্রকাশ করলেন। দিল্লীর দেবীর প্রতি সমর্পিত প্রাণ এমন মুখ্যমন্ত্রী আর কে কবে কোথায় দেখেছে?

শিলাদিত্য

বই কালোবাজারে

রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের খেয়াল খুশির জন্য কি প্রাথমিক শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে? এই কথা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির হাওড়া জেলার সম্পাদক শ্রীঅরুণ মুখার্জী। তিনি বলেন, সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ছাত্রদের বিনামূল্যে সরবরাহ করতে পারেন না, অথচ এ বৎসর সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। গত বৎসর ছাত্রদের হাতে ইতিহাস বইটি এসেছিল সেপ্টেম্বর মাসে, এ বছর তিনমাস হয়ে গেছে, কিন্তু ছাত্ররা শিক্ষায়তন থেকে পাঠ্যপুস্তক না পেয়ে কালোবাজার থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। অভিভাবকরা কলেজ স্ট্রীট বই পাড়ায় এই সব পুস্তকের প্রাচুর্যের কথা জানান, অথচ বিদ্যালয়ে পুস্তক সরবরাহ হচ্ছে না।

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস : ১৯৫৯

॥ সপ্তম পর্ব ॥

দিলীপ মজুমদার

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের খাদ্য আন্দোলন শুরু হল। বিভিন্ন জেলায় সহস্র সহস্র নরনারী এতে অংশগ্রহণ করল। বিশে আগস্ট—প্রথম দিনেই মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, হুগলী হাওড়া, নদীয়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পঃ দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন আদালত ও বি ডি ও অফিসে আইন অমান্য করে সাতাশ জন মহিলা সহ মোট ৪৭৯ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার বরণ করলেন। কলকাতায় পুলিশ মন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে সামিল হলেন হাজার হাজার মানুষ।

এই ব্যাপক আন্দোলনের মুখে দিশেহারা হয়ে গেলেন রাজ্য সরকার। সরকার তাঁদের অনুরাগী প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করার চেষ্টা শুরু করলেন। তোড়-জোড় শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের জন্য। স্পীকার এবং দুইটি উপ-মন্ত্রীর পদ পি এস পি-কে দেবার প্রস্তাব করা হল। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে উপ-প্রধানমন্ত্রী করার জন-শ্রুতি শোনা গেল। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র বা সমঝোতায় যে পি এস পি দলের সকল সদস্য সম্মতি জানিয়েছিলেন তা নয়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দল থেকে শ্রীসুধীর রায়চৌধুরীর পদত্যাগ। সাংবাদিকদের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে শ্রীরায়চৌধুরী তাঁর পদত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ করে বললেন : "কল্পনাই করিতে পারি না, কেমন করিয়া, বামপন্থী বলিয়া আত্মপরিচয়দানকারী কোনও পার্টির নেতা একটি একান্ত জনস্বার্থবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের প্রধান নায়কের সহিত যুক্তভাবে বিবৃতি দিতে পারেন। বিশেষতঃ যখন সেই বিবৃতির উদ্দেশ্য হইল মজুতদারদের রক্ষা করা, জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া এবং বর্বর দমননীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। অতএব এই ধরণের পার্টি হইতে পদত্যাগ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না।" (স্বাধীনতা, ২২-৮-৫৯)।

আন্দোলনের মুখে দিশেহারা সরকার তাই গ্রহণ করলেন তাঁদের শেষ অস্ত্র—ব্যাপক দমননীতি। শান্তিপূর্ণ খাদ্য আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যব্যাপী গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাশী শুরু হল। পনেরোই আগস্ট—স্বাধীনতা দিবসের পূর্বলগ্নে—মধ্যরাত্রি থেকে পি এস পি ছাড়া কলকাতা ও শহরতলীতে বিভিন্ন বামপন্থী দল ও গণসংগঠনের অফিস খানাতল্লাশী হল। নিরঞ্জন সেন, যতীন চক্রবর্তী, সুবোধ ব্যানার্জী, তারা দত্ত, ডাঃ রণেন সেন, বরদা মুকুটমণি, ভবানী সেন, ইন্দ্রজিত গুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়, গণেশ ঘোষ, বিনয় চৌধুরী, সমর মুখার্জী, রবীন মুখার্জী, অজিত গাঙ্গুলী, গোপাল বসু, শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, তারাপদ দে, মনোরঞ্জন হাজরা, সুধীর ভাণ্ডারী, সরোজ রায়, বিশ্বনাথ মুখার্জী, গীতা মুখার্জী, প্রশান্ত শূর, শৈলেন বসু, প্রকৃতি মিত্র, রাধিকা ব্যানার্জী, নরেশ দাশগুপ্ত, অজিত বসু, প্রভাত মিত্র, নরেন ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। আসানসোল, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আইনঅমান্যকারী শান্তিপূর্ণ জনগণের উপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জের সংবাদ শোনা গেল। সরকার যাঁদের গ্রেপ্তার করলেন তাঁদের রাজবন্দীর মর্যাদাও দিতে চাইলেন না। ১৯৪৯ সালে রাজবন্দীরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে দাবি আদায় করেছিলেন, সরকার তা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এই প্রসঙ্গে একটু পূর্বপ্রসঙ্গ স্মরণ করা যাক। ১৯৪৯ সালে জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘটের পর সরকার তাঁদের সঙ্গে যে চুক্তি করেন তাতে স্থির হয়েছিল যে, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং শ্রমিক-কৃষক সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন উপলক্ষে ধৃত সমস্ত বন্দীদের (রাজবন্দী ও বিচারাধীন বন্দী) প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হবে। সেই বৎসর মে মাসে বঙ্গীয় জেল কোডে উল্লিখিত মর্মে এক সংশোধনও হয় এবং উক্ত কোডের ৯১০(১) রুলে সন্নিবিষ্ট হয়। কিন্তু ১৯৫৯ সালে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি শান্তিপূর্ণ খাদ্য আন্দোলন ঘোষণা করার পর বঙ্গীয় জেল কোডের ৯১০ নং রুলের ১নং সাবরুলটির পরিবর্তন করে চোদ্দই আগস্ট এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। ফলে পরিবর্তিত অবস্থায় সেই ৯১০ (১) রুলটি এইরূপ দাঁড়ায় : এখন থেকে বিচারাধীন বন্দীদের দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হবে—অর্থাৎ, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা ও জীবন ধারণের অভ্যাসের দ্বারা উন্নততর জীবন যাপনে অভ্যস্ত সমস্ত বিচারাধীন বন্দীকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসেবে গণ্য করা হবে, এবং অন্য সমস্ত বিচারাধীন বন্দীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচারাধীন বন্দী হিসেবে গণ্য হবেন। মূল্যবৃদ্ধি কমিটির নেতৃত্বে খাদ্য আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট ও পর্যুদস্ত করার জন্যই যে সরকার পূর্ব প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করে পূর্বতন আইনের সংশোধন করেছিলেন সে কথা সুস্পষ্ট। সংশোধিত আইনের প্রয়োগও শুরু করেছিলেন তাঁরা। নিরাপত্তা আইনে সতেরোই আগস্ট ধৃত শ্রীপ্রশান্ত শূর প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে আলিপুর কোর্টে হাজির করা হলে এস ডি ও তাঁদের তাঁদের প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসেবে গণ্য করতে অস্বীকার করেন। অবশ্য অবশেষে ধৃত বন্দীদের প্রবল বিক্ষোভের ফলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রথম শ্রেণীর বন্দীর মর্যাদা দিতে বাধ্য হন। কিন্তু আঠারোই আগস্ট আলিপুর কোর্টে ধৃত শ্রীসুধাবিন্দু ব্যানার্জী, শ্রীমাখন ভট্টাচার্য, জনাব লুতেমন মেল্লা প্রমুখকে কোনক্রমেই প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হয় না। অন্যান্য বিভিন্ন স্থানেও অনুরূপ অবিচারের নজির সৃষ্টি হয়। এর ফলে বন্দীরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন। আলীপুর কোর্টে শুরু হয় বন্দীদের অনশন। বন্দীদের আন্দোলনের ফলে সরকার তাঁদের সংশোধিত আইন—অর্থাৎ চোদ্দই আগস্টের বিজ্ঞপ্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হন। (স্বাধীনতা/২২-৮-৫৯)।

আসন্ন আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র ও দমনপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অপপ্রচার। এই অপপ্রচারের গল্প কাহিনী রচনায় সেদিন কংগ্রেস সরকারের প্রকৃষ্টতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল জনসেবক ও আনন্দবাজার পত্রিকা। আন্দোলনের মুখে এরা আবিষ্কার করলেন যে, বামপন্থী শিবিরে ভীষণ মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে—এমন অবস্থা, এই ভাঙ্গে কি ঐ ভাঙ্গে বামপন্থী শিবির। নিরপেক্ষ সাংবাদিকদের সংবাদভাষ্য শুনুন : "আন্দোলনের প্রকৃতি লইয়া দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির প্রধান অংশীদার কমিউনিস্ট পার্টির সহিত অন্যান্য দলের অর্থাৎ আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদির মতভেদ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব অধিক থাকায় গতকাল মতভেদ কার্যকরী হইতে পারে নাই। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির পরিকল্পনা অনুযায়ী গতকাল আন্দোলন হইয়াছে। এবং ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, আগামী কয়দিনও কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশমত আন্দোলন পরিচালিত হইবে। আন্দোলনের পূর্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, কেহ স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হইবেন না। অর্থাৎ গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির স্বেচ্ছাসেবক পুলিশকে বাধা দিবেন। উক্ত কমিটির সর্বশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে কমিউনিস্ট এম এল এ ডাঃ রণেন সেন সরাসরি উক্ত কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্নরূপ উপলব্ধি করিয়া কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক সক্রিয় আইন অমান্যে প্রস্তুত নহে। এবং এই কারণেই উক্ত কমিটির অংশীদার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এখন মতভেদ তীব্র হইয়াছে। গত বুধবার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, সেই বৈঠকে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্ররূপে শ্রীশৈলেন বসু কমিটির সদস্যদের জানাইয়া দেন যে, তাঁহার পার্টি বাধাদান করিয়া ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য করিবেন না। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ সিদ্ধান্ত শুনার পর নাকি উক্ত বৈঠকে তীব্র বাদানুবাদ হয়। প্রকাশ যে, আর এস পি সদস্য তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, এতদিন বাধাদান করিয়া কেহ গ্রেপ্তার হইবেন না এই মর্মে ঢাকঢোল পিটানোর পর অকস্মাৎ নূতন সিদ্ধান্ত করা মোটেই বিধেয় নহে। ফরওয়ার্ড ব্লক আর এস পি সদস্যদের বক্তব্য সমর্থন করেন বলিয়া জানা যায়। তৎসত্ত্বেও উক্ত বৈঠকে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত হয়।" (জনসেবক/২১-৮-৫৯)। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি বহু দলের সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে মতানৈক্য বা মতপার্থক্য অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে জনসেবক মানুষের দৃষ্টি একটি বিশেষ দিকে নিবদ্ধ করতে চেয়েছিল। মতপার্থক্যের এমন স্বরূপ সে চিহ্নিত করেছিল, যাতে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, এই মতানৈক্যই বর্তমানে একমাত্র সত্য এবং ফলতঃ আসন্ন আন্দোলন পরিচালনার এই কেন্দ্রটি অচিরেই বহুধাবিভক্ত হয়ে যাবে। আর একটি কথা, জনসেবক স্বীকার করেছে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তির কথা; কিন্তু সেইখানেই তো তার জ্বালা, তাই অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি থেকে সে কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাতেই আত্মনিয়োগ করেছিল। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার (কমিউনিস্ট), শ্রীবিভূতি ঘোষ (ফরওয়ার্ড ব্লক), শ্রীমাখন পাল (আর এস পি), শ্রীসন্তোষ মুখার্জী (বলশেভিক), শ্রীঅমর বসু (মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক), শ্রীগৌরাঙ্গ সিংহ (আর সি পি আই), শ্রীহেমেন্দ্র মুখার্জী (ডেমোক্রাটিক ভানগার্ড), শ্রীমাণিক মুখার্জী (এস ইউ সি), শ্রীকানাই পাল (আর ডব্লু পি), এবং সাধারণতন্ত্রী দল চব্বিশে অগাস্টে এক বিবৃতিতে জানান যে, জনসেবক ও আনন্দবাজারের—"সংবাদের প্রতিটি অংশ এতই মিথ্যাপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর যে, ইহাকে ইহার প্রাপ্য দিয়াই ঘৃণা করা উচিত। . . . সরকার বিরাট সংখ্যক বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও এবং বর্বর দমননীতি চলানো সত্ত্বেও খাদ্য আন্দোলনের ব্যাপকতায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া এখন তাহারা আমাদের কমিটির অন্তর্গত দলগুলির মধ্যে মতভেদের মিথ্যা কাহিনী ফাঁদিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমরা এই পত্রিকা এবং উহার নিয়ন্ত্রকদের জানাইতে চাই যে, যদি তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের এই অপকৌশলে কোনও ফল হইবে, তবে তাঁহারা শোচনীয় ভুল করিয়াছেন। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির অন্তর্গত দল—আমরা গত দশই আগস্টের সাংবাদিক সম্মেলনে যে কর্মসূচী ঘোষিত হইয়াছিল, তাহার দৃঢ় সমর্থনে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ আছি এবং সরকার যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের দাবি স্বীকার না করিতেছেন, ততদিন পর্যন্ত খাদ্যের জন্য শান্তি[পূর্ণ] গণআন্দোলন অব্যা[হত] থাকিবে।" (স্বাধীনতা, ২৪-৮-৫[৯])। সরকারের তাঁবেদার সংবাদপত্র অবশ্য পবিত্র ঋণ শোধ বা উদ্দেশ্য কিংবা সুগভীর কৃতজ্ঞতা স্বাক্ষর হিসেবে অব্যাহত রাখে অপপ্রচারের ধারা। পশ্চিমে আগস্টের "জনসেবকে"র সংবাদ শিরোনাম এইরূপ : "তথাকথিত খাদ্য আন্দোলনের চৌকনিক লইয়া তীব্র মতানৈক্য অব্যাহত।" সাতাশে আগস্ট "আনন্দবাজার" পত্রিকায় লেখা হচ্ছে : "খাদ্য আন্দোলনের পদ্ধতি কি হইবে তাহা লইয়া মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির বিভিন্ন দলের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। . . . . কমিউনিস্টরা আইন বা শৃঙ্খলাভঙ্গের পক্ষপাতী না হওয়ায় অন্যান্য কয়েকটি দলের সদস্যগণ কমিউনিস্টদের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অকমিউনিস্ট সদস্যগণ অপেক্ষাকৃত উগ্রতর পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন। তাহাদের অনেকের মতে আন্দোলন এইরূপ "নিরামিষভাবে" চালাইয়া গেলে ইহার দ্বারা জনসাধারণের মনে প্রভাব ফেলা যাইবে না। কিন্তু এই বক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টদের মন ভিজে নাই বলিয়া প্রকাশ।" মন না ভেজার আসল কারণটিও আনন্দবাজার আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন—"কারণ তাঁহাদের চোখ পড়িয়া আছে কেরালার আগামী নির্বাচনের উপর।" প্রতারকের ছলের অভাব হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, সংবাদ পরিবেশনের কৌশলেই প্রকাশ, প্রতারক বড় দুর্বল যুক্তি উত্থাপন করে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছেন। বামপন্থী শিবিরে মতভেদের সঙ্গে তাঁদের অর্বাচীন আবিষ্কার হল : তথাকথিত আইন বা শৃঙ্খলার প্রতি কমিউনিস্টদের শ্রদ্ধা। এমন কি, অন্যান্য দলের মনের কথাটি বুঝে ফেলে তাঁরা লিখলেন : "তাঁহাদের অনেকের মনেই আজ এইরূপ সন্দেহ দেখা দিয়াছে, কমিউনিস্টরা হয়তো "মাঝপথে সরিয়া পড়িতে পারেন।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাঝপথে সরে পড়ে কমিউনিস্টরা আনন্দবাজারের রাজনৈতিক জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করে তোলেন নি।

ইতিমধ্যে পদত্যাগ করলেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন। কৃষি সম্পর্কে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে শ্রীজৈন তাঁর মন্ত্রীপদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পদত্যাগের পটভূমিতে আছে সুদীর্ঘ ব্যর্থতার ইতিহাস। আসাম ও ত্রিপুরায় সফরব্রত বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শ্রীজ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে এখন নিজেদের ব্যর্থতার যুক্তি সম্মত ধারা অনুসারেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য হল পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির তদন্ত করা, পশ্চিমবঙ্গে

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসে অ্যাডহকী গণতন্ত্র চালু হল

কপিল রায়

নতুনদিল্লী, ৩ এপ্রিল—বৃটিশ পার্লামেন্টের পাশকরা শাসনক্ষমতা হস্তান্তরণ আইনের মাধ্যমে দ্বিধা-বিভক্ত দেশের শাসনক্ষমতা লাভ করে গদিতে জেঁকে বসেছে। যে কংগ্রেস তাদের পার্টি সংবিধানের ১৯ (গ) ধারায় বলা হয়েছে যে ওয়ার্কিং কমিটি হচ্ছে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক কর্তৃপক্ষ (একজিকিউটিভ অথরিটি)। অর্থাৎ কংগ্রেসের যাবতীয় নীতি ও সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করবার, বাস্তবে রূপ দেবার ও সে সবের বাস্তব রূপায়ণাদির তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্ব এই ওয়ার্কিং কমিটির হাতে। এহেন গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কিং কমিটির কাজকর্মাদি এবং তাঁদের গৃহীত প্রস্তাবাদি তাই স্বভাবতই সচেতন রাজনৈতিক মহলের তথা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

ঠিক সেই কারণেই গত ২৭ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত একমাত্র প্রচারিত প্রস্তাবটিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঐ দিনের দুই ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে সাংগঠনিক নির্বাচন অনুষ্ঠান না করবার সিদ্ধান্ত—সেগুলির তাৎপর্য যাতে জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে না পড়ে তার জন্যই যেন এই জগাখিচুড়ী জাতের প্রস্তাবটিকে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে বলে এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহল মনে করেন।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন অনেকাদন আগেই হবার কথা ছিল। ইতিপূর্বে একাধিকবার সে নির্বাচন পেছিয়ে দেওয়া হয়েছে নানা অজুহাতে। এমন কি বিগত ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের যে ৭৫তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবার কথা ছিল সেটিও স্থগিদ রাখা হয়েছে আর ঐ সঙ্গে স্থগিদ করে দেওয়া হয়েছে সভাপতি নির্বাচন ও সাংগঠনিক নির্বাচন সর্বস্তরে। অদূর ভবিষ্যতে সাংগঠনিক নির্বাচন হবার কোন সম্ভাবনাই এখন আর নেই। ইতিপূর্বে সাময়িক-ভাবে নির্বাচন স্থগিদের সিদ্ধান্ত গৃহীত ও প্রচারিত হত, যেমন দুই মাস বা তিন মাসের জন্য। কিন্তু এবারে পুরো এক বছরের জন্য নির্বাচন স্থগিদ রাখবার কথা জানানো হল। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা ১৯৭৮ সনের আগে কংগ্রেস তার সংগঠনিক নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে না, কারণ ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সনে কংগ্রেসকে লোকসভা ও কয়েকটি বিধান সভার নির্বাচন নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন প্রদেশে অ্যাডহক কমিটি নিয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। অন্ধ্র, গুজরাত, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে ইতিমধ্যেই অ্যাডহক কমিটি কার্যকরী করা হয়েছে। বিহার আসাম, মধ্য প্রদেশ ও ওড়িশায় প্রাদেশিক নেতৃত্ব পুনর্গঠনের দাবি উঠেছে। শোনা যাচ্ছে যে, সংসদীয় নির্বাচকেন্দ্রের ভিত্তিতে সর্বস্তরে অ্যাডহক কমিটির খেলা শুরু হবে। অর্থাৎ কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত 'ফ্যাসীবাদি বিরোধী সংগ্রামে' অ্যাডহকী গণতন্ত্র চালু হবে 'এশিয়ার মুক্তি-সূর্যের' মুক্তি-দীপ্তিকে ভাস্বরতর করবার প্রয়াসে। আর কংগ্রেসমার্কা এই নতুন গণ-তান্ত্রিক প্রয়াসের প্রধান ব্যবস্থাপক হবেন কংগ্রেসের যুবশক্তি। গতকাল কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিউটে যেতে গিয়ে ভারতে 'ফ্যাসীপন্থী শক্তির পুরোধা' বলে বর্ণিত শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সেই কংগ্রেস-মার্কা নতুন গণতান্ত্রিক প্রয়াসের আর এক যাত্রা শান্তিপূর্ণ দাওয়াইয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলে এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহল মনে করেন। এঁরা আরও মনে করেন যে এই প্রয়াস অদূর ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ও তীব্রতর আকার লাভ করলে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাদের এই 'জগাখিচুড়ী' প্রস্তাবে দেশের ভেতরে রাজনৈতিক উগ্র বল-প্রয়োগের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে" তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বলেছে যে এই উগ্র বলপ্রয়োগের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বনিয়াদকে দুর্বল করা আর আমাদের সমাজবাদী কার্যক্রমকে বানচাল করা। আর যাঁরা এই সব করছেন তাদের ওয়ার্কিং কমিটি অ্যান্টি-ন্যাশেন্যাল বা জাতিদ্রোহী শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে এই 'জাতি-দ্রোহীরা' নির্বাচিত আইনসভা সদস্যদের ওপর বলপ্রয়োগ করে পদত্যাগ করিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ অভিযানকে উৎসাহিত করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির জীবনের ওপরে আক্রমণের কথাও বলা হয়েছে।

উগ্র বলপ্রয়োগ বা হিংসাত্মক-তার তীব্র নিন্দা করেও এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহল বুঝতে পারছেন না ওয়ার্কিং কমিটি কেন এই সব হিংসাত্মক ষড়যন্ত্রের স্বরূপ ও রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ তথা সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ করলেন না। আততায়ীর মারণ অস্ত্রের শিকার তো ললিতনারায়ণ মিশ্রই স্বাধীন ভারতে প্রথম নন। ১৯৪৮ সনে ডিক্সন লেনে সুনীলমাধব ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন তরুণ সংস্কৃতিকর্মী ও কমিউনিস্ট-অনুরাগী আজ-অবধি-না-ধরা-পড়া আততায়ীর গুলীতে নিহত হবার পর থেকে শুরু করে কত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডই তো দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার কয়টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাদের মুখ খুলেছে ইতিপূর্বে? সর্বজনমান্য নেতা হেমন্ত বসু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ গোপাল সেন, বরানগর, বসিরহাট, বারাসত, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতির কত তরুণীই তো না-ধরা-পড়া আততায়ীর মারণ অস্ত্রের বলি হয়েছেন। কিন্তু এইসব হত্যা-কাণ্ডের রহস্য অনাবৃত করার ব্যাপারে পুলিশ তথা সরকারের ব্যর্থতাই কি আজ দেশে হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টির সহায়ক হয়ে ওঠে নি? এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহল অনেকেই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন।

অনেকেই এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করছেন যে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের পদত্যাগ দাবি করে আন্দোলন করা বর্তমানে নিন্দার্হ ও হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টির সহায়ক বলে বিবেচিত হলে ১৯৫৯ সনে কি সে কাজ নিন্দনীয় ও হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টির সহায়ক ছিল না? ১৯৫৯ সনে দেশের প্রথম নির্বাচিত অকংগ্রেস সরকারের কেরালার নাম্বুদিরিপাদ সরকারের উচ্ছেদ করবার জন্য তদানীন্তন কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তদানীন্তন নায়ার সার্ভিস সোসাইটীর কর্ণধার মন্মথ পদ্মানাভনকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে যে 'বিমোচন আন্দোলন' শুরু করিয়েছিলেন এবং উক্ত সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্ক কমিটিং কি বলবে? আজকের কংগ্রেসও এই সিদ্ধান্তকে প্রচার করে কংগ্রেস কি তার ১৯৫৯ সনের দোষকেই পরোক্ষে খারিজ করে দেয় নি?

কেরালার নায়ার সার্ভিস সোসাইটীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আবার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এবারে আর সেই মন্মথ পদ্মানাভন নেই। কারণ কয়েক বছর আগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। এবারে নায়ার সার্ভিস সোসাইটীর বর্তমান কর্ণধার শ্রীকালাথিল ভেলায়ুধন নায়ার এসে গোপন শলাপরামর্শ করে গেছেন শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কয়েকদিন আগে। কেরালায় কংগ্রেস-সি পি আই সরকার বর্তমানে যে সঙ্কটে পড়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় কেরালা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গোপন সাক্ষাৎকার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

জয়প্রকাশ নারায়ণের 'ফ্যাসী-পন্থী আন্দোলনের' বিরুদ্ধে প্রথম কংগ্রেস সংগ্রামের ডাক দিয়েছে ১৯৭৪ সনের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত এ আই সি সি বৈঠকে আর তার পরে গত অক্টোবর মাসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে। ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামে গণতন্ত্রী কংগ্রেস এতই ব্যস্ত যে পাঁচ মাসের আগে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকা সম্ভব হয় নি (জানুয়ারীতে কয়েক মিনিটের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি বসে ললিতনারায়ণ মিশ্রের মৃত্যু সম্পর্কে শোক প্রস্তাব পাশ করেছিলেন)। আর সংবিধানে বছরে এ আই সি সির অন্যান্য দুইটি বৈঠকের বিধান থাকলেও গত দুই বছরে বছর প্রতি একটির বেশি বৈঠক ডাকা সম্ভব হয়নি। গত জুলাইয়ে এ আই সি সির শেষ বৈঠক বসেছিল। শোনা যাচ্ছে আগামী মে মাসে এ আই সি সির বৈঠক বসতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে "ফ্যাসীবাদী শক্তির" বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিঘোষিত সংগ্রামকে জোরদার করবার জন্য সাংগঠনিক নির্বাচনের মত এ আই সি সির বৈঠককেও যে স্থগিদ করে দেওয়া হবে না একথা বিশ্চিত ভাবে বলা যায় না।

রাজধানী দর্পণ

ব্রাজিলে ফ্যাসিস্ত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ব্রাজিলে সামরিক প্রশাসন কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীদের ওপর প্রবল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রেপ্তার, পিটুনি, খুন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় ব্রাজিলের গণতান্ত্রিক মানুষকে দমনের কর্মসূচী নিয়েছে ফ্যাসিস্ত সরকার। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর নির্বাচনে বিরোধী বিশেষত বামপন্থী শক্তির প্রতি প্রবল অনুরক্তি দেখা যায়। শতকরা ষাট ভাগ ভোট পড়েছিল বামপন্থীদের পক্ষে। বিশেষত, শহরাঞ্চলের শ্রমিক মহল্লায় বিরোধীরা শতকরা নব্বুইভাগ ভোট

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

পেয়েছিলেন। কিন্তু, ফ্যাসিস্তরা ভোটের রায়কে অগ্রাহ্য করে গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করে আছে।

ফ্যাসিস্ত সরকারের বিরুদ্ধে ব্রাজিলে এখন জোর আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ব্রাজিল কমিউনিস্ট পার্টি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আওয়াজে সমস্ত বিরোধী গোষ্ঠীকে জোটবদ্ধ-ভাবে কাজের আহ্বান জানিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে দেশে সাড়া পড়ে গেছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে সারা দেশ এখন তোলপাড়। এই ঐক্যবদ্ধ বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ফলে সামরিক জুন্টা কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, ব্রাজিলের মানুষ শুধুমাত্র সীমিত বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে নয়, ব্যাপক ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন এবং সামরিক পুলিশ রাজের বদলে সত্যকার জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনে সমর্থ হবেন। ব্রাজিলের জনগণের আছে দীর্ঘকালের সংগ্রামী ঐতিহ্য, বিশেষ করে সশস্ত্র সংগ্রামের।

মৃত্যু ব্যবসায়ীর অস্ত্র ব্যবসা

মৃত্যু ব্যবসায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রব্যবসা করে বেশ কিছু কামিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধাররা যে কত বড় শান্তিপ্রিয় তারও প্রমান মেলে তাদের যুদ্ধ ব্যবসার হিসেব দেখলে। সম্প্রতি মার্কিন মুল্লুকের কাগজ 'ইকনমিক নোটস' এই যুদ্ধ ব্যবসার এক তথ্য প্রকাশ করার ফলে মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের মুখোশ খুলে পড়ে। ঐ তথ্যে জানা যায়, ১৯৭৪ সালে (জুন মাস ওর্ধ্বস্ত) আর্থিক বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাড়ে আটশ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশিল্প বাইরে রপ্তানি করেছে। এই অস্ত্রগুলি গিয়েছে প্রধানত সৌদি আরব, ইরাণ, ইজরাইল, পশ্চিম জার্মানী, স্পেন, চিলি, দক্ষিণ কোরিয়া ও আইওয়ানে। এর মধ্যে প্রায় ষাট ডলার মূল্যের অস্ত্র গিয়েছে সৌদি আরবে।

এই মারণ ব্যবসায় লাভবান হয়েছে ম্যাকডোনাল ডগলাস, জেনারেল ডায়নামিনস, লকহিড এয়ারক্রোফ্‌ট, জেনারেল ইলেকট্রিক, বোইং প্রভৃতি একচেটিয়া পুঁজি যারা মার্কিন প্রশাসনকে মুঠোর মধ্যে রেখে মানব বিদ্বেষী সর্বনাশা নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। তাই এই অস্ত্র ব্যবসায়ীরা যে মারণ যুদ্ধের উস্কানি দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

মতামত

জংলী রাজত্ব

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসীদের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী "ককটেল" শাসনের তিন বছর হয়ে গেল। এই তিন বছরের ইতিহাস অত্যাচারের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস। সমাজতন্ত্র আর আইন-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি আজ ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেছে। এই কয় বছরে কংগ্রেসের সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতিকে বিদ্রূপ করে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ পথে ঘাটে পড়ে মরে গেছে। এ প্রসংগে কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীঅমিয় কিসকুর একটি বিবৃতি মনে পড়ছে। তাতে তিনি বলেন "মেদিনীপুর জেলার ৭৫% মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। অনেকেই তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। (স্টেটসম্যান চব্বিশে সেপ্টেম্বর, ৭৪)

মানুষের মৃত্যু আর মানুষকে বিশেষ শিহরিত করে না। চারিপাশের মানুষজন সব কেমন যেন পাল্টে গেছে। প্রত্যেকেই আজ বাঁচতে চায়। যে কোন শর্তে বাঁচতে চায়, বাঁচার জন্য মানুষ আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যাচ্ছে।

এই সার্বিক সংকটকে কিন্তু কংগ্রেসীরা তাদের নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে। তারা বোঝাতে চায় এই সংকটের জন্য তারা মোটেই দায়ী নয়। এ অবস্থার জন্য নাকি দায়ী খরা, বন্যা ও একশ্রেণীর আমলার চক্রান্ত। কোন বুদ্ধিমান মানুষই এই তিন বছরকে কংগ্রেসী ভন্ডামীর ভাষায় "দুর্বৎসর" হিসাবে চিহ্নিত করবে না। আর সব সংকটের জন্য আমলাদের চক্রান্তই দায়ী এটাও কেউ মেনে নেবে না। আসলে এই অবস্থার জন্য দায়ী কংগ্রেসীদের শয়তানি।

গত বছর সতেরই নভেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা কংগ্রেস কার্যালয়ে সুব্রত মুখার্জী যুব ছাত্র কর্মীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন "আগামী তিরিশে জানুয়ারী লেভী জমা দেওয়ার শেষ সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকেই আপনারা লেভী ফাঁকি দেওয়া মালিকের গুদাম থেকে মজুত উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।" পয়লা ফেব্রুয়ারীর পর তো কতদিন পার হয়ে গেলো, কিন্তু মজুত উদ্ধারের কি হল? আসলে এই যুব কংগ্রেসী নেতারা আগাগোড়া খালি বড় বড় কথাই বলে চলেছেন। এদের কিসসু করার ক্ষমতা নেই।

খাদ্য সংগ্রহ বানচালের ব্যাপারে কংগ্রেস বিরোধীদের দোষারোপ করে থাকে অথচ সিদ্ধার্থ রায় প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সমিতির এক সভায় একবার নিজের দলের কর্মীদের সম্বন্ধে মারাত্মক অভিযোগ করেন। তাতে তিনি বলেন "তার কাছে, খবর আছে কংগ্রেস কর্মীরাই কৃষকদের জোতদারদের কাছে গিয়ে বলছে সরকারকে তোমরা লেভী দিও না" (যুগান্তর, নয়ই সেপ্টেম্বর,) ১৯৭৪)।

এই সরকারের বিরুদ্ধে আমার সব থেকে বড় অভিযোগ—এরা আইন শৃংখলা রক্ষায় একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে নারী লাঞ্ছনার ঘটনা যত ঘটেছে এই সরকারের আমলে তা এর আগে কোন সরকারের আমলে ঘটে নি। এই তিন বছরে বেশ কয়েকশ নারী ধর্ষিতা হয়েছেন। কংগ্রেসের নিজেদের লোকেরাই একথা স্বীকার করে। এ প্রসংগে তেয়াত্তর সালের আঠাশে আগষ্ট বিধানসভায় গীতা মুখার্জী পুলিশের বিরুদ্ধে খড়্গপুরের কাছে এক গ্রামে ধর্ষণ ঝাপক নারী নির্যাতনের অভিযোগ আনেন তা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। পরদিন উনত্রিশে আগষ্টের যুগান্তরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় "গত চব্বিশে জুন খড়্গপুর থেকে এগার মাইল দূরে গোধুলিয়া গ্রামে এগার জন হরিজন মহিলার উপর পুলিশ ও গুন্ডা বাহিনীর এক বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীমতী গীতা মুখার্জী আজ রাজ্য বিধানসভায় কান্নায় ভেংগে পড়েন। সজল চোখে শ্রীমতী মুখার্জী যখন এই অত্যাচারিত অবহেলিত লাঞ্ছিত মহিলাদের লেখা বিবৃতি পড়ছিলেন, তখন তামাম বিধানসভা নিশ্চুপ, নিস্পন্দ, আবেগে নিথর। শ্রীমতী মুখার্জী বলে চলেন, তারপর সন্ধ্যার পুলিশ ও গুন্ডা-বাহিনী গোধুলি লগ্নে গোধুলিয়া গ্রামে প্রবেশ করলো। উদ্দেশ্য : জোরাই মাল উদ্ধার করা। তিনি বলেন, পুলিশ এবং গুন্ডাবাহিনী ঐ গ্রামে ঢুকে এগার জন মহিলার উপর যে অত্যাচার করেছে তা সভ্য সমাজের এক কলংকজনক অধ্যায়। ওরা মূক, মূঢ়, ম্লান, তাই প্রতিকারের সোচ্চার দাবী জানাতে পারে নি।" একমাত্র জংলী রাজত্ব ছাড়া এরকম ঘটনা কল্পনাও করা যায় না।

সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। চুরিচামারি আজ এখানে খোলাখুলি ঘটনা, ঔদ্ধত্য নোংরামি আর আঁধারের ষোমটার আড়াল নয়, দুর্নীতির উন্মত্ত নেশায় বিবেক নির্বাসিত। চারিদিকে এক বিশৃংখল অবস্থা। তবুও কংগ্রেসীরা নিজেদের "সাফল্য" নিয়ে গলাবাজী করে চলেছে!

সিদ্ধার্থ রায় যতই তার সরকারের "সাফল্য" নিয়ে গলাবাজী করুন না কেন, বহু কংগ্রেসী এম এল এ কিন্তু বহুবার বিধানসভায় বলেছে যে তারা তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারছে না। আমার প্রশ্ন : বাহাত্তরের নির্বাচনে "বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী" এই "জনপ্রিয়" নেতারা জনতার সামনে যেতে পারছেন না কেন? আর দার্জিলিংএ মারমুখী জনতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সিদ্ধার্থ রায়দের পালাতে হয়েছিল কেন? নেপালী টুপি পরে বক্তৃতা দিয়ে সিদ্ধার্থ রায় দার্জিলিংবাসীদের টুপি পরাতে পারেন নি। তাই আজ সিদ্ধার্থ রায়রা নতুন করে সারা রাজ্যে ফাসিবাদ কায়েম করছেন। কিছুদিন আগে কাগজে দেখেছিলাম বিজয় নাহারের মিটিংয়ে অনেক কংগ্রেসী ইচ্ছা থাকলেও ভয়ে যেতে পারছে না।

তবে সিদ্ধার্থ রায়রা যদি ভেবে থাকেন যে এরকম অবস্থাই চলবে এবং জনগণ সব মুখ বুজে নেবে, তা হলে বলব যে তারা মূর্খ। দমননীতির ডান্ডা ঘুরিয়ে জনগণকে ঠান্ডা করা যায় না, আর ইতিহাসের চাকাকেও পিছন দিকে ঘোরানো যায় না।

শংখশুভ্র বিশ্বাস

সত্য সংবাদ

দর্পণের একুশে মার্চ সংখ্যায় "পাঠ্য বই চোরাবাজারে বিক্রী হচ্ছে" —এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন বেহালার দীপক স্টোর্সের দীপক সরকার। তাঁর বক্তব্য : "আমি কোন সরকারী বই বিক্রী করি না বা করি নাই।" পত্রলেখককে জানাই যে, দীপক স্টোর্স থেকে "দি পীপক রীডার" বিক্রী হওয়ার খবর সম্পূর্ণ সত্য।

খাদ্য আন্দোলন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

খাদ্য আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়া এবং রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীকে অপসারিত করা। নানা কারণে শ্রীবসুর বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য। বিবৃতির পুরো বয়ান নিম্নরূপ : "নিজেদেরই পলিসির ফলে রাজ্যে যে খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধানের চেষ্টা না করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির বিরুদ্ধে এবং যথেষ্ট খাদ্য সরবরাহের দাবিতে ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত জনগণের উপর বর্বর দমননীতি চালাইতেছেন। যে সরকার বছরের পর বছর মজুতদার ও মুনাফাখোরদিগকে নির্বিবাদে সকল সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশ ভঙ্গ করিতে দিয়াছেন সেস সরকারই আজ গর্জন করিয়া উঠিয়াছেন যে, জনসাধারণের খাদ্য সুনিশ্চিত করিবার জন্য এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের ঘৃণ্য আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধা করিবার উদ্দেশ্য চালিত জনসাধারণের আন্দোলন তাঁহারা বরদাস্ত করিবেন না। পাইকারী হারে নিবর্তনমূলক আটক আইন, নিরাপত্তা আইন, ফৌজদারী কার্যবিধি আসন প্রযুক্ত হইতেছে—শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য সমগ্র পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা হইয়াছে। কিন্তু ন্যায্যভাবে খাদ্যশস্য বিতরণের জন্য এমন কর্মোদ্যম করিতে কখনো দেখা যায় না। অর্ধাশনের বিরুদ্ধে এবং চড়া দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম পরিচালনার যে অধিকার আমাদের আছে, সরকার সর্বপ্রকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইয়াও সেই অধিকার কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যেভাবে এক অভূতপূর্ব শান্তিপূর্ণ গণসংগ্রাম পরিচালনা করিতেছেন সেজন্য তাঁহাদিগকে সবিশেষ প্রশংসা করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় মুষ্টিমেয় একদল অত্যাচারী যেন আমাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া আত্মসমর্পণ করাইতে সক্ষম না হয়। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বিনা প্রতিবাদে ও স্বেচ্ছায় প্রায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মানিয়া লইয়াছেন এই অপবাদ যেন শুনিতে না হয়। আমি যখন আসামে ও ত্রিপুরায় সফর করিতেছি তখন শুনিতেছি নাকি আমাকে বিনা বিচারে আটক করিবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে। অবশ্য আমি বারবার সরকারী নির্দেশ অমান্যকারী খাদ্য-চোরদিগকে এবং উহাদের পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে গ্রেপ্তার করিবার আবেদন জানাইয়া বিফল হইয়াছি—কাজেই আমি অপরাধ করিয়াছি বৈকি! আমাদের এই পার্টি সংগ্রামের সম্মুখ সারিতেই আছেন এবং যতদিন বাহিরে থাকিব ততদিন আমি জনসাধারণের সেবাই করিব। তবে জনসাধারণ ইতিমধ্যেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিলে আন্দোলন বন্ধ হয় না। গত কয়েকদিন যেখানেই গিয়াছি সেখানেই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনের সমর্থনে বড় বড় জনসভা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোককে অনশনে অর্দ্ধাশনে জর্জরিত করিবার পর কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী যে পদত্যাগ করিয়াছেন ইহা আশাজনক সংবাদ। কিন্তু আজও পশ্চিমবঙ্গের অপরাধী খাদ্যমন্ত্রী সমস্ত লজ্জাবোধ জলাঞ্জলি দিয়া গদি আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন। আমাদের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণ বৃথা যাইবে না। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমাদের এই সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণকে কিছুটা স্বস্তিলাভের সুযোগ করিয়া দিতে পারিব। আমি আশা করি যে, নিজেদের পলিসির ব্যর্থতা স্বীকৃত হইবার পর এখন কেন্দ্রীয় সরকার তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত করিবেন, আমাদের দাবি সমূহ মানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং যাহার অপরাধ আয়ত্ত জঘন্য ধরণের পশ্চিমবঙ্গের সেই খাদ্যমন্ত্রীকেও অপসারিত করা হইবে।" (স্বাধীনতা ২৫-৮-৫৯)। (ক্রমশঃ)

ঠাকুরবাড়ী বধ্যভূমি!

গত সতেরোই মার্চের ঘটনা প্রমাণ করল রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ী এখন বধ্যভূমিতে পরিণত। এই ভয়ংকর পরিণতির ব্যাপারে উপাচার্যা রমা চৌধুরীর ভূমিকা যে কতটা ঘৃণ্য তা আমরা ছাত্রছাত্রীরা সব সময়ে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

সতেরোই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাংগণে যে রক্তক্ষয়ী নৃশংসতা চোখের ওপর ঘটল, তা আমার মত সাধারণ ছাত্রছাত্রীর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। আবহাওয়া যে গরম হয়ে উঠছে এবং তা বীভৎস ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে, তা আমরা তিনদিন আগে থেকেই বুঝতে পেরেছি। জানতাম, যে চোদ্দই মার্চের একাডেমী কাউন্সিলের মিটিংয়ের পর সতেরোই মার্চের সভায় বেশ অসুবিধা দেখা দেবে। পর্ষদ না একাডেমী কাউন্সিলের সভায় উপাচার্যা ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিভাগীয় প্রধানকে "বড় বেশী বেড়ে গেছ, সব ঠিক করে দেব" বলে ধমকান। এর প্রতিক্রিয়া ভাল হতে পারে না। তাই উপাচার্য স্বয়ং একজন সংগীত বিশারদ, বাংলার অধ্যাপক, ইতিহাসের অধ্যাপক এবং একজন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপককে নিয়ে তিন নম্বর ফেডারেশন স্ট্রীটে এক গোপন বৈঠক করেন পনেরোই মার্চ। এই গোপন বৈঠকের ফলশ্রুতিই সতেরোই মার্চের ঘটনা। ছাত্র ইউনিয়নের আট নয়জন ছাত্র কর্মপরিষদের সভায় বক্তব্য রাখতে এলেই, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিন চারটি ছাত্র সহ বেশ কিছু সংখ্যক অপরিচিত ব্যক্তি। তার পর কি ঘটেছে তা সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে।

রমা চৌধুরী রবীন্দ্র ভারতীর গদি জুড়ে বসে আছেন আজ প্রায় ছয় বছর। ওঁর কীর্তিকলাপে আমরা একদিনও নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নি একে অধ্যাপক, তাকে লেকচারার, অমুককে রীডার করতে করতেই তাঁর ছয়টি বছর কেটে গেল।

আমরা জানি বাড়ীতে বসে তিনি উপযুক্ত প্রার্থীদের পোষ্টাল অর্ডারের আবেদন পত্র ছিঁড়ে ফেলছেন, ইচ্ছেমত লোক নিয়োগ করে বাজেটে ঘাটতি দেখাচ্ছেন, গত মে মাস থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্মীদের টাকা জমা পড়ছে না। অন্যদিকে কর্মচারীদের ইউনিয়ন ভেংগে তিনটে হয়েছে, টীচার্স কাউন্সিল ভেংগে চারটি হল। অডিটর ও এ্যাকাউন্টেন্ট পদে অন্যায়ভাবে জনৈক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে।

এতসব কাজ করেও উপাচার্যা মহাশয়ার সাধ মেটে নি। এখনও তিনি অনেক কিছু করতে চান। তাই ঠাকুরবাড়ীর প্রাংগণে আগামী দিনে আরও কত রক্তগংগা বইবে কে জানে।

জনৈকা ছাত্রী

রূপদক্ষ ও পদাতিক

(দর্পণের সমালোচক)

রূপদক্ষের প্রযোজনা মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'পদাতিক' শোষণে বিপর্যস্ত এক কৃষিজীবী পরিবারের জাগরণের কাহিনী। কৃষকের মুখের গ্রাসকে কেড়ে নেওয়া জোতদার মহাজনের যে গতানুগতিক চেহারা, অর্থাৎ নারীলিপ্সা এবং ধর্মীয় আবরণে শূন্যগর্ভ মানবিকতার যে নির্মম প্রতিমূর্তি সাধারণত এই জাতের নাটকে লক্ষ্য করা যায়, সেদিক থেকে কাহিনীগত পটভূমির বিচারে এ নাটক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর, ভিন্ন দৃষ্টিকোণের, এমন কি বিভিন্ন স্বাদেরও নয়।

কিন্তু এই ব্যতিক্রমহীন একটি নাটককেই নির্দেশক তড়িৎ চৌধুরী তাঁর প্রয়োগ পরিকল্পনায়, মঞ্জুশ্রী বসু ও কিরণ লাহিড়ার মতো কয়েকজন কুশলী অভিনেতা অভিনেত্রীর সাহচর্যে একটি প্রশংসনীয় শৈল্পিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন। সামান্য লাউড এবং মইয়ের একটি পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে ও নামাবলীর একটা দীর্ঘায়িত পর্দা ফেলে দিয়ে কৃষক তারক সর্দারের ঘরের দাওয়া এবং জোতদার বৈষ্ণবের সেরেস্তার যে প্রতীকাশ্রয়ী ও ব্যঞ্জনাময় পরিবেশ রচনা করেছেন, তা নির্দেশকের চিন্তাশক্তির গভীরতাকে প্রকাশ করে। তড়িৎবাবুর গভীরচারী শিল্পমনের আরো প্রমাণ পেয়েছি নাটকে কয়েকটি মুহূর্ত রচনায়। দেশের 'তিন উজ্জ্বল রত্ন' দারোগা, বৈষ্ণব হালদার এবং বিষ্টু (গাঁয়ের মুখ্যমন্ত্রী) এক সংগে হাত মিলিয়ে যে স্থির চিত্রটি রচনা করলেন তা প্রযোজনায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছি। রাজেশ্বর ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় এ নাটকে সংগীতের ব্যবহারও বিশেষ প্রশংসনীয়। তবে আলোর কাজে প্রযোজনাকে সহযোগিতা করার আরো অবকাশ রয়েছে।

কিন্তু যে উদ্দেশ্য এবং যে রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ নাটকের বিস্তার, সেখানে এ প্রযোজনা সামান্যই সফল হয়েছে। তার কারণ নাটকে প্রাণ সঞ্চারের যে রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ যার নেতৃত্বে নিপীড়িত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায়, সেই লক্ষণ বাউড়র উপস্থিতি সম্ভবত একটু বেশী রকম বিরক্তিকর। তাঁর কণ্ঠস্বরে আভিজাত্য, নাটকের ছন্দময় এবং মর্মস্পর্শী মুহূর্তে দেবদূতের মতো লড়াইয়ের আহ্বান নিয়ে তাঁর উপস্থিতি প্রেরণার চাইতে দর্শকদের পীড়াদায়ক মনে হওয়া বিচিত্র নয়। জোতদারের হাতে নিহত কান্তর বিয়োগ ব্যথায় তারক যখন সপরিবারে জর্জরিত, সেই বিষাদঘন মুহূর্তে লক্ষ্মণের মুখে সাময়িক সান্ত্বনার পরিবর্তে 'আজ লড়াইয়ের দিন' 'জ্বলে ওঠার দিন'—একথা তারক এবং একযোগে দর্শককে কতটা অনুপ্রাণিত করবে, সন্দেহ আছে। ঘটনার স্বাভাবিক অগ্রগতিকে অস্বীকার করে নাট্যকার রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের জন্য সদম্ভ আত্মপ্রকাশ করতে চাইলে এই বিপত্তি দেখা দিতে

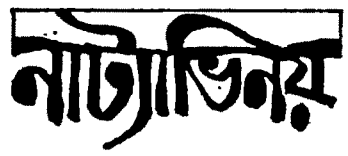

বাধ্য। পাশাপাশি স্বামীর মৃত্যুতে আশার উন্মাদ মুখশ্রী এবং কপালে 'আরো বড়' সিঁদুরের টিপ পরে সে যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করল তা নাটকের বলিষ্ঠতা এবং শিল্প উভয়কেই সাহায্য করে। প্রেরণা সঞ্চারের কাজে এইটেই বাঞ্ছনীয় রীতি।

এ নাটকে রূপসজ্জাতেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তবে চরিত্র নির্বিশেষে সকলেরই ধুলোমাখা পা কি রকম বেমানান লাগছিল। তড়িৎবাবু ও মঞ্জুশ্রী বসু সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। দর্শকদের বেশী প্রশংসা কিরণ লাহিড়ী (দারোগা) পেয়ে থাকলেও অন্যান্য অভিনেতার যে আভিনয়িক দুর্বলতা তাকে নিজের অতিযান্ত্রিক অভিনয় দিয়ে প্রকট না করাই ভালো। দলীয় অভিনয়ে সমতারক্ষাই সবচেয়ে জরুরী। গোঁসাই চরিত্রটি কিন্তু এ নাটকে কোন ভূমিকাই পালন করেনি।

চারণদল : এই দশকের অভিমন্যু

ইতিহাসের কয়েকটি সুপরিচিত ঘটনাকে সামনে রেখে চারণদল 'এই দশকের অভিমন্যু'কে হাজির করেছে দর্শকের কাছে। অলক রায়চৌধুরী লিখিত নাট্যকাঠামোয় যথেষ্ট দুর্বলতা নিয়েও এ প্রযোজনা বলিষ্ঠ বক্তব্য খুব স্পষ্ট ভাবেই রাখতে পেরেছে।

মহাভারতের পাতায় অভিমন্যুর নিধন সম্ভব হলেও আজকের অভিমন্যু শুধুমাত্র বাক্ যুদ্ধের স্পর্ধা দেখিয়ে নিরস্ত্র হতাশায় মরতে চায় না, সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে চায়। অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শাসন ব্যবস্থার সংসদীয় সীমারেখায় সে আজ নিজেকে বাঁধতে চায় না। মাঠ ময়দানের বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করতে চায়।

অভিমন্যু, মঙ্গল পাণ্ডে, ডিমিট্রভ ও তানিত্রয়ের ঘটনার সংক্ষিপ্ত সাহায্য নিয়েই দর্শকদের মধ্যে বক্তব্যের প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন চারণদল। নাটকটি দুর্বল নানা কারণেই। সংলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থূল শিথিল এবং কাঁচা। অর্জুনকে কেন্দ্র করে যে দৃশ্যটি রচিত হয়েছে, তার রঙ্গরসিকতা অতি মাত্রায় স্থূল। ইতিহাস চরিত্রটি যতটা না ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তার চাইতে অমার্জিত ব্যঙ্গ সৃষ্টিতেই সে বেশী মুখর। তবে এই চরিত্রটির বামপন্থী রাজনীতির দু একটি সমালোচনামূলক মন্তব্য নাটকের প্রয়োজনে সুপ্রযুক্ত।

চরিত্রের গভীরে প্রবেশ না করেও এ নাটক করে দেওয়া যায় এই অজুহাতে কিংবা যে কারণেই হক চারণদলের অভিনয়ের কিন্তু যথেষ্ট খামতি রয়েছে। বিবেক চরিত্রে গোষ্টগোপাল দাসের গান অসাধারণ ভালো এবং প্রযোজনাকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু নাটকের ঘটনাবলীর নিজস্ব প্রবহমানতার যে মেজাজ তার সঙ্গে গানের সুরমূর্ছনা যুথবদ্ধ নয় বলেই মনে হয়। বিচ্ছিন্ন ভাবে সংগীতগুলি খুবই ভালো। এখানে শিল্পীর গান নাটকের পটভূমিকে দৃশ্যের ভাবনার আড়ালে নিয়ে যায়, এটা প্রযোজনারই ব্যর্থতা। প্রযোজনার মাধুর্য যাতে গানের অন্তর্নিহিত সুরকে, শুধু কথা নয়, স্পর্শ করতে পারে, সে দিকে নজর দেওয়া দরকার।

মায়াকানন : আই টি এ

ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস নামে নবগঠিত একটি নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি মাইকেল মধুসূদনের 'মায়াকানন' অভিনয় করলেন। নাটকটির সম্পাদনা করতে গিয়ে অগ্রিদূত সাধু চলতির মিশ্র ব্যবহারে অশ্রাব্য সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। অভিনয়ে শিক্ষার্থীদের আশানুরূপ ত্রুটির সঙ্গে নির্দেশক প্রকাশ নন্দীর অভিনয়েও চূড়ান্ত ব্যর্থতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তবে মন্ত্রী এবং অরুন্ধতীর ভূমিকায় হিন্দোল চট্টোপাধ্যায় ও গীতা ব্যানার্জী প্রশংসনীয়।

প্রায় অবহেলিত একটি নাটকের পুনঃপ্রযোজনার জন্য আই টি এ সাধুবাদ পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তাদের উদাসীনতার অভিযোগও এড়ানো যাবে না। এই নাটকটি যতদূর মনে হয়, পুনরাভিনয় হল প্রায় একশো বছর পর। ১৮৭৫ সালে তৎকালীন থিয়েটার সেন্টার এই নাটক অভিনয় করতেন।

কংগ্রেসীদের ভাড়াটে উচ্ছেদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসী মস্তানরা এবার ভাড়াটে উচ্ছেদ করে টাকা কামাতে শুরু করেছে। গত সপ্তাহে ৩৬নং চাঁদনী চক স্ট্রীটের একদল ভাড়াটেকে দুজন যুব কংগ্রেসী মস্তান রাজার করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরিবর্তে ঐ ঘরের নতুন ভাড়াটের কাছ থেকে প্রাপ্ত আট হাজার টাকা নগদ সেলামীর দুই হাজার টাকা ওদের পকেটে গেছে।

বিভিন্ন জায়গায় ভাড়াটে উচ্ছেদ করে কংগ্রেসী মস্তানদের আড্ডা জমছে এবং সাট্টা খেলা চলছে। হাওড়া ময়দানে মার্টিন রেল স্টেশনের কাছে এরকম একটি আড্ডা তৈরী হয়েছে। মাণিকতলা এলাকায় জনৈক যুব নেতা একটি দোকানদারকে উঠিয়ে তার সাগ্রেদদের নিয়ে নতুন দোকান খুলেছে। কংগ্রেসী নেতা উপনেতারা এদের মদত দিচ্ছেন।

বাড়ির মালিকরা নগদ সেলামী ও মোটা ভাড়ার লোভে পুরনো ভাড়াটেকে কংগ্রেসী মস্তানদের সাহায্যে উচ্ছেদ করছেন। কলিন লেন এলাকায় এলিয়ট লেনে এঘটনা ঘটেছে। নিউ মার্কেটের আশেপাশে অনেক ফ্ল্যাট বাড়ি ও দোকান আসল ভাড়াটের হাতছাড়া। পশ্চিমবঙ্গ টেনান্টস এসোসিয়েশনের মুখপাত্র এ ব্যাপারে অবিলম্বে সরকার ও পুলিশকে আসল ভাড়াটের স্বার্থরক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন।

দস্তানা শিল্পে সংকট

পশ্চিমবঙ্গে দস্তানা ও গ্লাভস তৈরীর দুই শত কারখানা সংকটের মুখে। তার কারণ এর চাহিদা হ্রাস পেয়েছে এবং চামড়া রবার ও অন্যান্য কাঁচা মালের দর বৃদ্ধি পেয়েছে। লোহা ও ইস্পাতের জিনিস তৈরী হয় যেসব কারখানায় সেখানে চামড়ার দস্তানার প্রচুর চাহিদা। কিন্তু সেখান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ওৎ পেতে আছেন অর্ডারের বিনিময়ে নগদ প্রাপ্তির জন্য। এই নাকি দস্তুর সর্বত্রই। দুর্গাপুর স্টীল, টাটা স্টীলে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তারা নানা অজুহাতে বাঙালী ব্যবসায়ীদের মাল নিচ্ছে না। টেন্ডার নাকচ করে দিচ্ছে। এমন অভিযোগ করেছেন গ্লাভস মেকার্স এসোসিয়েশনের কে আহমেদ।

তাছাড়া বাইরে রপ্তানীর প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রশিল্প প্রস্তুতকারকদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। ফ্যাসী, ডি জি ডি টি এক্সপোর্ট কাউন্সিল, ন্যাশনাল ইয়ং এন্ট্রিপ্রিনার্স এসোসিয়েশন রপ্তানীতে সাহায্য করার কথা বারবার বললেও কোন কাজ হয়নি। টাংরা ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীঅমল ঢোল বলেছেন, রাজ্য সরকারের উচিত রাজ্য ক্ষুদ্র কুটির শিল্প মালিক ও সরবরাহকারীদের জন্য বাজারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। শ্রীমৃণাল কর বললেন, রাউরকেল্লা ইস্পাত প্রকল্পে গ্লাভস বিক্রি করতে গিয়ে বাবুদের দশ হাজার টাকা ঘুষ দেবার নির্দেশ পেয়েছেন। পরে ভূয়া অর্ডারে ঐ টাকা পুষিয়ে দেবে।

বামপন্থী নির্যাতন

বামপন্থী দলের সদস্যদের ওপরে সরকার কি ধরণের উৎপীড়ন চালাচ্ছেন তার বহু খবর জানা যাচ্ছে। অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধা আবেদন করেও আজ পর্যন্ত টাকা পাননি। প্রকাশ যে, তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে, কারণ তাঁরা বামপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত। এরকম একজন ব্যক্তি হলেন উপেন্দ্রপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। শ্রীসেনগুপ্ত একটি বামপন্থী দলের সদস্য।

উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালে জনৈক সরকারী কর্মচারীকে পুলিশ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কর্মচ্যুত করা হয়। তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল যে তিনি ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের একজন সক্রিয় কর্মী। এই কর্মী আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা করায় হাইকোর্টের বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন যে, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন তথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কয়েকজন লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে রয়েছেন, সুতরাং এ ধরণের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অপরাধ কোথায়? বিচারপতি আবেদনকারীকে পুনর্নিয়োগের আদেশ দেন এবং মন্তব্য করেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দিয়ে যে মৌলিক অধিকারের কথা সংবিধানে বলা হয়েছে, এই কর্মচ্যুতির আদেশে তার গোড়ায় আঘাত করা হয়েছে। এর মানে কি এই যে কেবল মাত্র শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের প্রতি বিশ্বস্ত লোকেরাই সরকারী চাকুরীর যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন?

বস্তি কংগ্রেস দুভাগে

বিজয় সিং নাহারকে সমর্থনের প্রশ্নে বস্তি কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। যারা বিজয়বাবুকে সমর্থন করছেন তাদের মধ্যে আছেন আতায়ন আলী খান, কুঞ্জলাল দাস প্রমুখেরা। অপরদিকে মোহাতেসম হোসেন, অজিত দেব, রূপক গোস্বামী ও এস এম সফিক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বর্তমান নেতৃত্বকে সমর্থন করছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এদের মদত দিচ্ছেন। এরা যাতে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে বসতে পারেন তার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। উভয় পক্ষই বিভিন্ন জেলায় সভা সমিতি করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পটভূমি ও জয়প্রকাশ

বঙ্গদর্পন

● ● চাণক্য সরকার

দেশে অন্য কোথাও জয়প্রকাশজী সম্পর্কে শাসক শ্রেণী ও তার দলের আতঙ্ক এত প্রকট হয় নি যেমনটি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায়। কংগ্রেসীদের মধ্যে যারা দোসরা এপ্রিলের জয়প্রকাশ-বিরোধী হিংসাত্মক বিক্ষোভ অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যেও অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে, জয়প্রকাশজী যদি বিনা বাধায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁর প্রস্তাবিত সভায় ভাষণ দিতেন তাতে এমন কি দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হত। বরং সভা পণ্ড করার প্রচেষ্টায় যে ঘটনা ঘটেছে এবং সেই ব্যাপারে যে সর্বভারতীয় প্রচার চলছে তা সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছে।

কংগ্রেসী যুব-ছাত্র গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের উপস্থিতিতে এবং প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় সেদিন তাণ্ডব হয়েছে—এই অভিযোগ আজ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় শাসক দলের সর্বোচ্চ মহল একটু বিচলিত। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন ঘটনা সম্পর্কে। রাজ্য মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী ও যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রিয় দাসমুন্সী, যারা দোসরা এপ্রিল তাণ্ডবের প্রত্যক্ষ পরিচালক, দিল্লীতে নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন। মনে হয়, তাঁরা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন। তাদের বক্তব্য, অন্ততঃ ওদের সঙ্গে যাদের একান্ত যোগাযোগ তাদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী বিগত কিছুদিন ধরে ছাত্র-যুব গোষ্ঠীর বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জয়প্রকাশ-বিরোধী বিক্ষোভকে সংগঠিত করার জন্য।

এই বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণ লাগে না। সেদিন পুলিশের নির্লিপ্ত আচরণই সরকারী মনোভাবের সাক্ষ্য। সরকারী নির্দেশ ছাড়া ঐ তাণ্ডবের সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সম্ভব ছিল না।

তাণ্ডবের সময় বিভিন্ন সংবাদপত্রের ডজন খানেক রিপোর্টার ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দেখেছেন সুব্রতবাবু পুলিশের মাইক্রোফোনে দলীয় ছেলেছোকরাদের মারমুখী হওয়ার জন্য উত্তেজিত করছেন। উপস্থিত পুলিশ অফিসাররা রেডিও যোগে ঘটনার ইতিবৃত্ত লালবাজারকে প্রতিমুহূর্তে জানাচ্ছিলেন এবং নির্দেশ চাইছিলেন পুলিশের কর্তব্য সম্পর্কে। স্বয়ং পুলিশ কমিশনার লালবাজারে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মারমুখী হিংসাশ্রয়ী ছেলেছোকরাদের নিরস্ত করার কোন নির্দেশ এসে পৌঁছায় নি।

এর পরে ঘটনাকে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ বলে মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি বিধানসভায় পেশ করেছেন তাতে সাধারণ মানুষ মজা পেয়েছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে তাঁরা দেখেছেন এ রাজ্যের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি। মানুষের বুঝতে বাকী নেই, কিভাবে হিংসার আগুন ব্যাপক করে পুলিশী সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে এবং জাল নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থীদের সাময়িক ভাবে দমন করা হয়েছে এবং কংগ্রেস শাসনের গদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দোসরা এপ্রিলের ঘটনা নেহাত মামুলী নয়। এই ধরণের বিক্ষোভ অনায়ত্ত করার কোন প্রয়োজন হয় নি এই কারণে যে, অন্য কোন রাজ্যে সংগঠিত বামপন্থী শক্তি নেই। কংগ্রেস জানে যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন, যে নামেই পরিচালিত হোক না কেন, বামপন্থীদেরই বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করবে। আর এই দলের সংগঠন এখনও অটুট। হয়ত সাময়িকভাবে দল কৌশলগত কারণে একটু ঢিমে তালে চলছে, কিন্তু প্রয়োজনবোধে তৈরী সংগঠন আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ওদের আশা ছিল হয়ত বা সি পি এম জয়প্রকাশ পরিচালিত আন্দোলন থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখবে। কিন্তু ঘটনাস্রোতে সমস্ত কংগ্রেস-বিরোধী অংশ ও গোষ্ঠী কয়েকটি মৌলিক গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমাবেশে রাজী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এর রাজনৈতিক তাৎপর্য কম নয়। এই কারণে শাসক দলের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের পক্ষে কোন পদক্ষেপের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই মানসিক অবস্থা থাকার কথা নয়। এই দশকের শুরু থেকে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে শাসক দল মোটামুটি সমস্ত আন্দোলন দমন করতে পেরেছে সেই একই পদ্ধতি প্রয়োগের ঝোঁক স্বাভাবিক।

এই বিক্ষোভে সব চেয়ে লাভবান হয়েছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই দলের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন মহলে বলে আসছিলেন যে অন্যান্য রাজ্যের অবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোন তুলনা হয় না। ফ্যাসীবাদী পন্থার কথা বললে অন্য রাজ্যে হয়ত নিছক সরকার-বিরোধী শ্লোগান মনে হতে পারে। কিন্তু এই রাজ্যে এই পন্থার প্রয়োগ বাস্তব এবং এত প্রকট যে, মানুষকে বিশেষ কোন ঘটনার উল্লেখ করে বোঝাবার দরকার হয় না। দোসরা এপ্রিল সকালে জ্যোতি বসু জয়প্রকাশজীর সঙ্গে নিভৃত আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার একটি বাস্তব বিশ্লেষণ পেশ করেন। জয়প্রকাশজী সমস্ত কথা শুনে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। আপাতভাবে মনে হয় জ্যোতিবাবুর বক্তব্য জয়প্রকাশজী পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন বামপন্থীরা স্বভাব অনুযায়ী অবস্থার তীব্রতা সম্পর্কে অতিরঞ্জন করছেন। কিন্তু সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি যে ঘটনার সম্মুখীন হলেন তাতে জয়প্রকাশজীর মনে পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের গণতন্ত্র বিরোধী সন্ত্রাস সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইল না।

তিনি এখন বুঝেছেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রেরর পক্ষে বিপদ অনেক বেশী। এই কারণেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কলকাতায় কয়েকদিনের জন্য থাকবেন এবং তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন কংগ্রেস বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। সংগঠন কংগ্রেসের একাংশ সি পি এম-এর সঙ্গে যে কোন ইস্যুতে এক প্লাটফরমে আন্দোলনে সামিল হতে গররাজী ছিল। দোসরা এপ্রিলের পর ঘটনা পালটে গেছে।

সি পি এম-এর মধ্যেও নানা বিভ্রান্তি আছে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে কোন জোটে সামিল হওয়ার ব্যাপারে। এই বিভ্রান্তি আসে নিজের দর্শনের বিষয়ে প্রত্যয়ের অভাবে। আজকে প্রয়োজন গণআন্দোলন। কোন একটি দল বা বামপন্থী গোষ্ঠীর পক্ষে ব্যাপক গণআন্দোলন / গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমস্ত বিরোধী শক্তির ঐক্যবদ্ধ জমায়েত। আসলে এই জমায়েতে ভীত হবে দক্ষিণ পন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত কোন দল কৌশলগত কারণে যে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ কখনও ছাড়ে না। আন্দোলন শুরু হলে সেই আন্দোলনকে মাঝপথে রুখে দেওয়ার বা বিকৃত পথে পরিচালিত করার ক্ষমতা দক্ষিণপন্থীদের থাকার কথা নয়। বৈজ্ঞানিক রাজনীতি বামপন্থীদের হাতিয়ার এবং এর প্রয়োগ কৌশলও এখন নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। বামপন্থীদের শিক্ষা ও সংগঠন ঠিক থাকলে যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁরা লাভবান হবেন। আজ কোন পার্টি দক্ষিণপন্থী বা কে উগ্রবাম এই বিচারে ঐক্যের পক্ষে বাঁধা সৃষ্টি বিভ্রান্তির প্রকাশ বলে গণ্য হবে।

দক্ষিণ পন্থীদের অনেকেই লালপতাকার নামে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। হওয়ার কথা। তাই দাবী উঠেছে আন্দোলনে কোন দলের পতাকা থাকবে না। যদি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার শর্ত হিসেবে দক্ষিণপন্থীর এই পতাকার ব্যাপারে গোঁড়া মনোভাব দেখায় তা হলে বামপন্থীদের সেই শর্তেও রাজী হওয়ার কোন অসুবিধে নেই। কারণ পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হওয়ার অর্থ বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি। দক্ষিণপন্থীরা কোনমতেই এ রাজ্যে প্রভাবশালী হতে পারে না। শুধু এ রাজ্যে কেন ভারতের সর্বত্র। তাই আজ দক্ষিণপন্থীদের রাজনৈতিক দাবীর ব্যাপারে অনেক কথা বলতে হয় যা কায়েমী-স্বার্থের বিরোধী এবং জনস্বার্থের পক্ষে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হলে বামপন্থীর সঠিক কৌশলের মাধ্যমে নিজেদের সঠিক রাজনীতি এবং বৈজ্ঞানিক সংগঠনের শক্তিতে আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসতে বাধ্য।

মনে রাখা দরকার গত তিন-চার বছর ধরে নানা অত্যাচার ও অনাচার সত্ত্বেও এই রাজ্যের মানুষ সংগঠিত হয়ে চলেছে। সামান্যতম প্রতিবাদের সম্ভাবনাও শাসকদল হিংসার পথে দমন করতে চেয়েছে। দর্পণ ও বাঙলাদেশ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ওপর বীভৎস আক্রমণ তার প্রমাণ। আক্রমণকারী কারা সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থাপিত করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা এই কথা প্রমাণ করার জন্য যে, আইনের রাজত্বের বদলে একদলীয় জুলুম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একমাত্র গণতান্ত্রিক পথে ব্যাপক গণপ্রতিবাদ ছাড়া কোন প্রতিবিধান সম্ভব নয়। আজ এই প্রতিবাদ সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সংকীর্ণতাবাদী শ্লোগান তুলে এই আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করলে ফ্যাসীবাদী নৃশংসতাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিজনবিহারী পুরকায়স্থ অনূদিত
চীন বিপ্লবের অবিস্মরণীয় ইতিবৃত্ত
লং মার্চের কাহিনী
মূল্য : ৯.০০
জি, ভি, প্রেখানভ-এর
ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা
মূল্য : ৩.০০
ইংরাজী ও বাংলায় পৃথক পুস্তিকা হিসাবে
চীনের নূতন সংবিধান
(১৯৭৫)
প্রকাশিত হয়েছে : সংগ্রহ করুন।
দাম : ৮০ পয়সা।
পরিবেশক : বুকমার্ক
c/o অগ্রণী বুক ক্লাব
এ-১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

নব নির্মাণ সমিতির সদস্য জয়প্রকাশের কাছে ধমক খেলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি আই এম-এর নামে লাগাতে গিয়ে নব নির্মাণ সমিতির সদস্য এবং সোস্যালিস্ট পার্টির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুনীল দাস জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে কড়া ধমক খেয়েছেন।

নব নির্মাণের তেত্রিশ জন সদস্য গত সপ্তাহে তিন নং ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে জয়প্রকাশের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। বৈঠকে প্রায় সকলেই তীব্র কংগ্রেস বিরোধিতা করেন। হঠাৎ বৈঠকের শেষদিকে সুনীল দাস লাফিয়ে উঠে হড়বড় করে বলতে শুরু করেন, "স্যার, সি পি এম-কে আস্কারা (আপার হ্যান্ড) দেওয়ার আগে ভাল করে ভেবে নিন। এরাই যুক্তফ্রন্টের আমলে ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে, নারী ধর্ষণ করেছে, লুঠতরাজ চালিয়েছে। জনতা এদের চায় না, স্যার। আন্দোলন করতে গিয়ে সি পি এম-কে সঙ্গে নিলে ওরা একদিন ফাল হয়ে বার হবে। ওদের নেবেন না।"

জয়প্রকাশ অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সুনীল দাসকে ধমকে ওঠেন। তাঁকে প্রায় জোর করে থামিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন, "এ সব কথার কোন মানে হয় না। আপনারা আন্দোলন করতে চান নাকি ঝগড়া করতে চান? সি পি এম এখনো এ রাজ্যের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। আমি সি পি এম-কে বলতে পারি না আন্দোলন থেকে বেরিয়ে যাও। আপনাদের কারো কারো যদি সি পি এম-কে পছন্দ না হয়—থাকবেন না। তবে আপনাদের সিদ্ধান্ত আমি জানতে চাই।"

এরপর সকলেই আমতা আমতা করতে থাকেন। শেষে মুখ খোলেন জনসঙ্ঘের সুধাংশু গাঙ্গুলী। তিনি বলেন, "আমাদের সিদ্ধান্ত আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেবো, তবে এখনই নয়।" তাঁকে সমর্থন করেন সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল সেন।

সভার পর নব নির্মাণের নেতাদের বলতে শোনা যায় যে সুনীলবাবু কথাটা বলে ভাল করেন নি। তাঁরা অনেকেই বলেন, "রাজ্যের রাজনীতির চেহারাটা আমূল পালটে গেছে। আমাদের আসল শত্রু তো এখন সি পি এম নয়। আসল শত্রু হচ্ছে কংগ্রেসী গুণ্ডা আর তাদের সি পি আই দোসর। এ কথাটা সুনীলবাবুর সোস্যালিস্ট মগজে ঢুকলো না?

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা

১৮শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৮ই এপ্রিল ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

লক্ষ্মী বসুর অভিযোগ

প্রিয় মুন্সী নিজ ও গোষ্ঠীস্বার্থে কমিশনকে প্রভাবিত করেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

"প্রিয় দাসমুন্সী সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনকে নির্লজ্জভাবে প্রভাবিত করেছেন নিজের ও নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থে।" এই অভিযোগ করেছেন শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু। তিনি বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিকারের জন্য লিখেছি। একমাস অপেক্ষা করব তিনি কি করেন দেখার জন্য। প্রতিকার না হলে আমার স্থির সিদ্ধান্ত পদত্যাগ করব। আর আমার পদত্যাগে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সাজানো সৌধে আগুন জ্বলবে।"

প্রিয়বাবুর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের সমর্থনে শ্রীবসু কমিশন কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত গেজেট থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

কমিশন কর্তৃক যে ওয়ার্ক পেপার সহযোগী সদস্যদের কাছে পেশ করা হয়েছিল, তাতে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রায় ষোলজন নেতৃস্থানীয় এম এল এ-র সঙ্গে প্রিয়-গোষ্ঠীর অর্থাৎ বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর শ্রীমতী মায়া রায় (রায়গঞ্জ লোকসভা) গৌতম চক্রবর্তী (হরিশ্চন্দ্রপুর—মালদহ) ও আদ্য দত্তের (নবগ্রাম—মুর্শিদাবাদ) কেন্দ্রও সাধারণ থেকে তপশিলী আসন হিসেবে প্রস্তাবিত হয়েছিল। কিন্তু গেজেটে দেখা গেল প্রস্তাবে রদবদল ঘটিয়ে ঐ কেন্দ্রগুলি সাধারণ কেন্দ্র হিসেবেই রেখে দেওয়া হল।

গৌতম চক্রবর্তীর কেন্দ্রকে তপশিলী কেন্দ্র হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে প্রিয়বাবু নির্লজ্জ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। যেহেতু শতকরা ৫ ভাগ বা তার বেশী তপশিলী জনসংখ্যা থাকলে হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্র তপশিলী হয়ে যাবে তাই প্রিয়বাবু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন এই কেন্দ্রে তপশিলী অধিবাসীর সংখ্যা চোদ্দ ভাগের কম। কিন্তু কমিশনে অন্যতম সদস্য সি পি এমের জ্যোতির্ময় বসু পরিসংখ্যান উল্লেখ করে দেখিয়েছেন এই কেন্দ্রে তপশিলী জনসংখ্যা শতকরা ১৪.২২ ভাগ।

পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ৩৬.৭১ শতাংশ তপশিলী ও উপজাতির জনসংখ্যা বলে এই কেন্দ্রটি তপশিলী কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হল, কিন্তু তার পাশের কেন্দ্র ইটাহারের জনসংখ্যার ৩৭.৬৭ শতাংশ তপশিলী এবং উপজাতি হওয়া সত্ত্বেও এই কেন্দ্রটি তপশিলী কেন্দ্র হিসাবে সংরক্ষিত হল না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে রায়গঞ্জের এম এল এ রমেন দত্ত এবং ইটাহারের এম এল এ মন্ত্রী জয়নাল আবেদীন, যিনি এখন প্রিয়-অনুগত। জয়নালের সমালোচনা করায় রমেন দত্তকে শায়েস্তা করার যে হুমকী জয়নাল দিয়েছিলেন, তারই ফলশ্রুতি ঘটল প্রিয়বাবুর মাধ্যমে কমিশনকে প্রভাবিত করে।

একই ঘটনা ঘটেছে কৃষ্ণনগর পূর্ব কেন্দ্রের বেলায়। এই কেন্দ্রের মোট জনসংখ্যার ১৪.৪০ শতাংশ তপশিলী, আর কৃষ্ণনগর পশ্চিম কেন্দ্রে ১৭.০৩ শতাংশ। আশ্চর্যের ব্যাপার কৃষ্ণনগর পূর্ব তপশিলীদের জন্য সংরক্ষিত হল অথচ পশ্চিম কেন্দ্রে বেশী জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও ঐ কেন্দ্র তপশিলী হল না। কৃষ্ণনগর পূর্ব কেন্দ্রের এম এল এ ও প্রাক্তন মন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্রকে বলি দিয়ে বাঁচিয়ে দেওয়া হল কৃষ্ণনগর পশ্চিম কেন্দ্রের এম এল এ ও নদীয়া জেলার যুব কংগ্রেস সভাপতি বিদাস মুখার্জীকে। কাশীবাবুর অপরাধ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর তিনি সমালোচক।

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রকাশ্য সভায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম বিতাড়িত মন্ত্রী সন্তোষ রায়ের গলা টিপে ধরতে গিয়েছিলেন, এবং সেই মুহূর্তে তিনি চরম উত্তেজনায় চীৎকার করছিলেন : চোর, বদমায়েস, গুণ্ডা—আজ তোকে শেষ করে দেব। নুরুল ইসলামকে দলের যারা ঠিকমত চেনেন তাঁরা জানেন এই শেষ করে দেওয়ার হুমকী নিছক শব্দ নয়। নুরুলের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা প্রচুর।

তাই নুরুলকে সেই সভায় নিরস্ত করতে ছুটে এসেছিলেন কংগ্রেসের সারির নেতারা ও মন্ত্রীরা —তরুণ-কান্তি ঘোষ, আবদুস সাত্তার এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সন্তোষ রায়ের দিকে দ্রুত ধাবমান নুরুলকে ওরা জাপটে ধরেছিলেন। না হলে হয়ত বা সেদিন অঘটন ঘটে যেতে পারত।

এই চমকপ্রদ ঘটনা গত সপ্তাহে রাজ্য কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভায় ঘটেছে। সভায় উপস্থিত সদস্যরা সরাসরি দুভাগে ভাগ হয়ে যান। তারপর দুঘন্টা ব্যাপী সভায় কেউ কারুর কথা খুব বেশী শুনতে পান নি।

এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে এবং ঝাঁক্তিগতভাবে একে অপরের প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে বেশ্যাপল্লীর রকে বসে থাকা আড্ডাবাজ ছেলেরাও লজ্জা পাবে। তবে একটা ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দুপক্ষই হত্যা ও গুণ্ডামীতে যথেষ্ট হাত পাকিয়েছে। তাই একে অপরকে "গুণ্ডা খুনে" বলে গলাগাল দিলে তা কংগ্রেসী সভায় জলভাত বলে মনে হয়।

নেতৃত্ব জানতেন যে কার্যকরী সমিতির সভা ডাকলে গোলমাল হবে বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সীমানা নির্দ্ধারণের ব্যাপারে নানা পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিতর্কে। নেতৃত্ব এই ব্যাপারে আলোচনা সভায় কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার কথা ছিল রাজ্যে খাদ্য ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলের কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্য সরকারের সাফল্য।

এই আলোচনা হতে পারে নি। সভার সুরুতেই প্রিয় দাসমুন্সী অভিযোগ করেন যে, বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পরিবর্তনের ব্যাপারে তাঁর নামে নানা কুৎসা প্রচারে নেমেছেন কলকাতার চার এম এল এ লক্ষ্মী কান্ত বসু, পঙ্কজ ব্যানার্জী, সোমেন মিত্র এবং বারিদবরণ দাস।

প্রিয়বাবু বলেন যে, সীমানা নির্ধারণ কমিশনের সদস্য ছিলেন তিনি লোকসভার প্রতিনিধি হিসেবে। লক্ষ্মীবাবুরা বলছেন যে, কলকাতার কালীঘাট ও শ্যামপুকুর কেন্দ্র কমিশন বিলুপ্ত করেছে প্রিয়বাবুর প্রভাবে। এ এক গুরুতর অভিযোগ এবং এ ব্যাপারে লোকসভায় প্রিভিলেজ মোশন আনা যায়। আর প্রিয়বাবু উদারতা দেখিয়ে বলেন যে তিনি নিজ দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাইরে বিচারের জন্য না নিয়ে গিয়ে দলের মধ্যেই ফয়সালা করতে চান।

প্রিয়বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই সভায় প্রচণ্ড হট্টগোল। বহু সদস্য একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠেন। ওঁদের বক্তব্য শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যের অন্য অনেক কেন্দ্রের নানা পরিবর্তন করা হয়েছে গোষ্ঠী রাজনীতির স্বার্থে। প্রিয়-সুব্রত-সৌগত গোষ্ঠী নিজেদের দলীয় প্রভাব বাড়াতে চেয়েছে এবং ঐ গোষ্ঠীর বাইরের যাঁরা তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রগুলি লোপাম করার ষড়যন্ত্র করেছে।

কুচবিহারের এক সদস্য বলেন যে এমনকি রাষ্ট্রমন্ত্রী ফজলে হকের কেন্দ্রটিকে হঠাৎ তপশীলি উপজাতি কেন্দ্র করার অনুমোদন এসেছে। এ ব্যাপারে অভিযোগ উঠেছিল বিতাড়িত মন্ত্রী সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ থেকেই সন্তোষ রায় ও নুরুল ইসলামের মধ্যে প্রায় হাতাহাতির সূত্রপাত।

এতদিন যা প্রচার করা হচ্ছিল তা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হল সেদিনের সভায়। কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের কোন মীমাংসা হয় নি। বরং এর তীব্রতা বেড়েছে।

একটি হেলিকপ্টার ও মুখ্যমন্ত্রী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বন্যার ত্রাণ ব্যবস্থার কাজকে দ্রুততর করার জন্যে রাজ্য সরকার তিরিশ লক্ষ টাকা দিয়ে যে হেলিকপ্টারটি ক্রয় করেছিলেন, তা এখন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের বিলাস ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জেলায় যখনই সভাসমিতির কাজে যাচ্ছেন তখনই হেলিকপ্টারটির প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই হেলিকপ্টারের জন্য বিমান বাহিনী থেকে দুজন পাইলট নিযুক্ত করা হয়েছে। কাজ থাকুক বা নাই থাকুক তাদের মাসিক মাইনে ষোলশ থেকে সতেরোশ টাকা। এদের জন্য আবার দুজন পিওনও নিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের মাইনেও কম নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর যদি কখনও শখ হয় তিনি হেলিকপ্টারে চড়েই রাজ্যের কোথাও কিছু পরিদর্শন, উদ্বোধন বা কোন সভায় বক্তৃতা করতে যাবেন, তাহলে তার নির্দিষ্ট একদিন আগে সংশ্লিষ্ট হেলিকপ্টারটির পর্যবেক্ষক ও গ্যাসোলিন ফুয়েল সংগে নিয়ে কয়েকটি গাড়ী যথাস্থানে গিয়ে হাজির থাকে। ফুয়েল কিংবা হেলিকপ্টারের কোন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য তাঁর ফেরার সময় যাতে বিলম্ব না ঘটে তার জন্য এই ব্যবস্থা। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর শখ মেটাতে গিয়ে সেই সঙ্গে বেশ কিছু পেট্রোলও ধ্বংস হচ্ছে। এই হেলিকপ্টারটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে হিন্দুস্থান এরোনটিকস। এই এই জন্যে তাদের প্রতি মাসে দিতে হয় সতেরো হাজার টাকা।

সম্প্রতি বীরভূমে এক বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর বড় সাধ, রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে একটি স্কুল ও একটি করে হাসপাতাল তৈরী হক। কিন্তু তাঁর এই ভ্রমণ বিলাসের একমাসের খরচ যোগ দিলে বড় স্কুল না হক একটা পাঠশালা অন্তত তৈরী হতে পারে নিঃসন্দেহে।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

অবশেষে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণও আমাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিগত শতকের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। তাঁর সমসাময়িক অথবা তাঁর কাছাকাছি সময়ের লোক যে এখনও জীবিত রইলেন না, তা নয়। কিন্তু একমাত্র ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণই সম্ভবত এই শতকের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। আরও পরিষ্কার ভাষায় দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ এবং স্বাধীনতার পররর্তীকালে আমাদের দেশে সমাজ জীবনের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যে অনাচার দুর্নীতি অসততা আদর্শহীনতা দেখা দিয়েছে ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ এই দেশে বাস করে এই দেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে এই দেশের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেও সেই কলুষতার স্পর্শ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। তিনি কত নিখুঁত উচ্চারণে কত ভাল ইংরিজী বলতেন অথবা দর্শন সম্পর্কে কি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছেন তার চেয়ে বড় কথা তিনি নিখুঁত মানুষ ছিলেন। সেইজন্য তিনি রাষ্ট্রপতি থাকার সময় অন্যায় সুবিধা নেন নি, রাষ্ট্রপতি ভবনে আত্মীয় স্বজন নিয়ে সদলবলে বাস করেন নি।

এ ধরণের বহু ঘটনা তাঁর জীবনে। তাই এই অন্ধকার যুগে এই প্রেতনৃত্যের দেশে তিনি আমাদের কাছে এক আলোকবর্তিকা, কিন্তু তাঁর অবস্থান দূর আকাশের নক্ষত্রের মত। আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কারণ তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল যে মূল্যবোধ তাঁর সঙ্গে আমাদের বর্তমানে ফারাক আসমান জমিন।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও বামপন্থী গোষ্ঠী-সঙ্কীর্ণতা

পরেশ ধর

মাও-ৎসে-তুঙ অত্যন্ত সঠিক ভাবেই বলেছেন যে রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে এবং পরে এই উভয় সময়েই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হয়। রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে না পারলে রাজনৈতিক বিপ্লব সফল হয় না এবং পরে যথাযোগ্য ভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালিত করতে না পারলে রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলশ্রুতি ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে এগোতে থাকে। সুতরাং স্থিতাবস্থা চূর্ণ ক'রে বৈষম্যহীন নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হ'লে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য ঘটনা।

কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বরূপ কি, এই বিশেষ বিপ্লব বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা এখনও স্পষ্ট নয়। 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'—এই শব্দ দুটি খুব বাজার-চালু হয়ে পড়েছে। জনসাধারণ যখন তখন শব্দ দুটি ব্যবহারও করে থাকেন। কিন্তু শব্দ দুটির যথার্থ দ্যোতনা সম্পর্কে অধিকাংশ লোকেরই অজ্ঞতা বিস্ময়কর। অনেকেই মনে করেন নাটক, গান, গল্প, কবিতার মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলাটাই হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ। এটা ঠিক নয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভিত্তিমূলে রয়েছে এক বিরাট নতুন জীবন দর্শন—যে জীবন দর্শন শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ প্রসূত ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠিত জীবন দর্শনের বিরোধী। শোষণ-ভিত্তিক শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে কতকগুলি যুগ-সঞ্চিত প্রধান প্রধান সংস্কার ও বিশ্বাস জনগণের মন আচ্ছন্ন করে রাখে। সে সংস্কারগুলি এই রকম: এক অদৃশ্য শক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে; মানুষের জীবনও সেই শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সেই শক্তিকে উপেক্ষা করে তার বিরুদ্ধে মানুষের পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয়; ধনী হওয়া বা দরিদ্র হওয়া পূর্বজন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফল; জগতে ছোট বড় থাকবেই; ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত; মানুষ তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না; লোভ-লালসা মানুষের মনে চিরকালই ছিল এবং চিরকালই থাকবে; মানুষ যদি তীব্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সে যদি সৎ হয়, পরিশ্রমী হয়, তবে সে ধনী হতে পারে; সমাজে সকলের জন্যই সমান সুযোগ রয়েছে; ধনীরা নিজেদের যোগ্যতার বলেই ধনী হয়েছে; দরিদ্রের দারিদ্র্য তার নিজেরই অযোগ্যতার ফল; মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের দ্বারাই সমাজের সব কিছু সমস্যার সমাধান সম্ভব; পার্থিব সম্পদের চেয়ে আধ্যাত্মিক চেতনা অধিকতর কাম্য; জগত মায়ার খেলা; বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর ইত্যাদি।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের এই সব ধ্যান ধারণা বা সংস্কারগুলি মানুষের মনে দৃঢ়মূল হয়ে চেপে বসে আছে। মেহনতী জনসাধারণের মন থেকে এই সব বিষাক্ত বিশ্বাসগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ। এ কাজ করতে হলে প্রচলিত সংস্কারগুলির মূল উৎসটিকে উন্মোচিত করে দেখাতে হয়, আর তা করতে গেলে মার্কস্‌বাদ প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে হলে প্রকৃত সাম্যবাদী বা মার্কস্‌বাদী দলের নেতৃত্বে বিরাট ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে খাঁটি সাম্যবাদী বা মার্কসবাদী দল, অর্থাৎ খাঁটি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কোথায়? পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি তথাকথিত মার্কসবাদী রাজনৈতিক দল আছে—অবশ্য বিভিন্ন নামে। কিন্তু এই সব দলগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে গোষ্ঠী-সংকীর্ণতা অত্যন্ত প্রবল। ফলে প্রগতিবাদী সাহিত্য, সংগীত ও নাটকের শিবির যথেষ্ট জোরদার হয়ে উঠতে পারছে না। ঐক্যবদ্ধ মজবুত সংগঠনের অভাবে বুর্জোয়া প্রেস, সিনেমা, রেকর্ড, পেশাদার মঞ্চ আয়োজিত ব্যাপক অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংস্কৃতি প্রচার প্রসারের কাজ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

এই সব তথাকথিত মার্কসবাদী দলগুলির গোষ্ঠী-সংকীর্ণতা নানা ভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ধরুণ এ, বি এবং সি পশ্চিমবঙ্গের তিনটি মার্কসবাদী দল, অর্থাৎ নিজেদের মার্কসবাদী বলে এরা দাবি করে থাকে। এদের প্রত্যেকেরই সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট আছে। সেই ফ্রন্টের অঙ্গীভূত কিছু পত্র পত্রিকা থাকে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি। এগুলি সরাসরি পার্টির পত্রিকা এবং পার্টি কর্তৃক স্বীকৃত। এ বি সি পার্টি হিসাবে ধরুন এই পত্রিকাগুলির নাম যথাক্রমে পি কিউ আর। পি পত্রিকায় যারা লেখে তারা প্রায় সকলেই এ পার্টির সভ্য কিংবা ঐ পার্টির অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য এবং ঘনিষ্ঠ দরদী। বাইরের কোন লোকের লেখা এই পত্রিকায় স্থান পায় না। এই পি কিউ আর পত্রিকাগুলিতে তাদের ব/ব পার্টির ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে কুক্ষিগত হয়ে থাকার ফলে এই সব পত্রিকাগুলি কোন কালে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে না। তাই ব্যাপক জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সঞ্চারিত করার ব্যাপারে এই সব পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

এবার যে সব পত্রিকার আলোচনা করব, সেগুলি সাংগঠনিক দিক থেকে সরাসরি কোন পার্টির পত্রিকা নয়। কিন্তু এই ধরণের এক একটি পত্রিকা সাধারণত এক একটি পার্টির পরোক্ষ আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়। এ বি সি পার্টির দিক থেকে দেখতে গেলে এই সব পত্রিকাগুলিকে বলা যায় যথাক্রমে এক্স ওয়াই জেড। পার্টি পত্রিকাগুলির চেয়ে এই সব পত্রিকাগুলির জনপ্রিয়তা বেশি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের গোঁড়ামিও অন্তহীন। ফলে বৈপ্লবিক সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এরাও যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এই সব পত্রিকার বিচ্যুতিগুলি এই ধরণের: যেহেতু এক্স পত্রিকা এ পার্টির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এবং ঐ পার্টির সমর্থকরাই পত্রিকার অধিকাংশ ক্রেতা, তাই এক্স পত্রিকায় কোন কালে এ পার্টির সমালোচনা প্রকাশ করা হয় না। ভাবখানা এই রকম—যেন আর সব বামপন্থী পার্টিগুলি হাড়-বজ্জাত, শুধু এ পার্টি ধোয়া তুলসী পাতা—তার গায়ে খাঁটি "আগ মার্কা" লাগানো। ব্যবসায়িক কারণে এই রকম ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি থাকার ফলে এক্স ওয়াই জেড জাতীয় পত্রিকাগুলি মার্কসবাদ থেকে চ্যুত হয়ে পড়েছে। আর মার্কসবাদ থেকে চ্যুত হয়ে কোন পত্রিকা বর্তমান কালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সহায়ক হতে পারে না। এক্স পত্রিকার দ্বিতীয় ত্রুটি হল এখানে যারা লেখে তারা সকলেই এ পার্টির সমর্থক। যদি টের পাওয়া যায় যে এক্স পত্রিকার কোন লেখক এ পার্টিকে সমালোচনা করে থাকে, তবে তার লেখা আর এক্স পত্রিকায় ছাপা হয় না। অর্থাৎ বড় বড় বুর্জোয়া পত্রিকাগুলিতে যে গোষ্ঠী-সংকীর্ণতা বিরাজ করে, তথাকথিত মার্কসবাদী এক্স পত্রিকায়ও সেই একই গোষ্ঠী-সংকীর্ণতার বাসা। বুর্জোয়া পত্রিকার গোষ্ঠীভুক্ত না হয়ে আপনি যদি সেখানে অসাধারণ ভাল একটা গল্প বা কবিতা বা প্রবন্ধ পাঠান, তবে সেটা ছাপা হবে না। কিন্তু গোষ্ঠীভুক্ত হলে আপনার ট্র্যাশ লেখাও ছাপা হবে। এক্স ওয়াই জেড প্রভৃতি পত্রিকাগুলির আচরণও একই ধরণের। আপনি যদি ওদের গোষ্ঠীভুক্ত না হন, তবে আপনার লেখায় যতই উৎকর্ষ থাক, ওরা তা প্রকাশ করবে না। আর গোষ্ঠীভুক্ত হলে অকবির অপাঠ্য কবিতাও গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা হবে—ছাপা হবে নিম্নমানের যত প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এই সব পত্রিকাগুলির তৃতীয় ত্রুটি—এখানে বিপ্লবী গণতান্ত্রিকতার একান্ত অভাব। এদের কোন লেখার নির্মম সমালোচনা করে আপনি যদি চিঠি দেন, তবে সে চিঠি স্থানাভাবের অজুহাতে ছাপা হবে না। অথচ যে লেখকের বিরুদ্ধে আপনি বিরূপ মন্তব্য করেছেন, আপনার চিঠির ওপর সেই লেখকের পাল্টা রচনা ছাপা হবে, যদিও পাঠক সাধারণ জানতে পারল না আপনার চিঠিতে আপনি ঠিক কি কি প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই সব তথাকথিত বিপ্লবী পত্রিকার সাংবাদিক অসাধুতা ঠিক বুর্জোয়া পত্রিকার মতই।

তবে আশার কথা এই যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যারা উপরোক্ত ঐ দূষিত-চক্র থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত মার্কসবাদের পথ গ্রহণ করেছে।

পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে যে বিন্যাস দেখা গেল, সংগীত নাটকের ক্ষেত্রেও সেই একই বিন্যাস বিরাজ করছে। কিছু কিছু সংগীত ও নাট্যগোষ্ঠী সরাসরি পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবার কিছু কিছু গোষ্ঠী কোন কোন পার্টির সমর্থক। বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে এরা সকলেই নিজের নিজের মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংকীর্ণ বৃত্তে ঘুর-পাক খায়। ই এফ জি এইচ পত্র পত্রিকার মত কতগুলি স্বাধীন সংগীত ও নাট্যগোষ্ঠী আছে যারা কোন ভাবেই কোন পার্টির সঙ্গে জড়িত নয়। সর্বহারার সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে তুলবার জন্যে এরা আত্মনিয়োগ করেছে। এরা যে কিছু কিছু ভাল গান আর ভাল নাটক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আন্তরিক বলিষ্ঠ ঐক্য এদের মধ্যেও নেই।

সারা দেশ জুড়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে ছড়িয়ে দিতে হলে সমস্ত মার্কসবাদী সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে আজ নিবিড়তম ঐক্যের প্রয়োজন। অপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থ কি বিপুল শক্তিশালী তা ভেবে দেখতে হবে। বড় বড় পত্রিকা, প্রকাশ সংস্থা, রেডিও, গ্রামোফোন, সিনে —প্রচারের সব মাধ্যমগুলি তাদে করায়ত্ত। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে জীবনবাদী গান নাটক পৌঁছে দিতে হবে হাটে মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে—উন্মুক্ত আকাশের নিচে। প্রগতিবাদী লিটল ম্যাগাজিন পৌঁছে দিতে হবে দেশের ঘরে ঘরে। গ্রামে গঞ্জে মেহনতী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে মার্কসবাদী চিন্তাধারা। এ কাজ মোটেই সহজ নয়। লৌহদৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ, ব্যাপক সংগঠন ছাড়া এ কাজে সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত।

লক্ষ্মী বসুর অভিযোগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বারুইপুর ও কুলপী দুটিই তপশিলীদের সংরক্ষিত আসন ছিল। বারুইপুর কেন্দ্রে তপশিলীর সংখ্যা সাতান্ন হাজার পাঁচশো একানব্বুই, আর কুলপী কেন্দ্রে উনপঞ্চাশ হাজার নয় জন। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ললিত গায়েনের বারুইপুর আসনটি বেশী তপশিলী জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ আসন করে দেওয়া হল অথচ কম তপশিলী জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও কুলপী কেন্দ্রটি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর এম এল এ-র স্বার্থে তপশিলী আসন হিসাবেই সংরক্ষিত থাকল।

কলকাতার জন্য কমিশনের ওয়ার্কিং পেপারে তিনটি আসন কালীঘাট শ্যামপুকুর ও ইন্টালী কেন্দ্র তুলে দিয়ে একটা নতুন আসন বালীগঞ্জ ইষ্ট করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্রিয়বাবু সি পি আই-এর স্বার্থে বালীগঞ্জ ইষ্টের নাম ইন্টালী রাখারই প্রস্তাব করলেন, অথচ ন্যায় বিচারের খাতিরে শ্যামপুকুর ও কালীঘাট কেন্দ্র রাখা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলেন না। যেহেতু ঐ দুটি আসন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর দখলে।

নিজের দক্ষিণ কলকাতা লোকসভার আসনটি সুরক্ষিত করতে প্রিয়বাবু চৌরঙ্গী ও আলীপুর বিধানসভা কেন্দ্র দুটি নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন আর প্রস্তাব করলেন বারো হাজার পোস্টাল ভোট অধ্যুষিত ফোর্ট উইলিয়ামকে তাঁর কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে। কমিশন প্রিয়বাবুর প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।

প্রিয়বাবু চৌরঙ্গীকে তার কেন্দ্রে ঢুকিয়ে নেওয়ার জন্য যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এই কেন্দ্রটির অধিকাংশ এলাকা পুরণো কালীঘাট কেন্দ্রের অন্তর্গত এবং ডি সি সাউথ নিয়ন্ত্রিত। তাই চৌরঙ্গী দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা আসনের মধ্যে থাকবে। নিজের স্বার্থে তিনি কালীঘাট কেন্দ্রের উল্লেখ করলেন, অথচ কালীঘাট কেন্দ্রটি বজায় রাখার জন্য কোন প্রস্তাব দিলেন না।

কলকাতা সংক্রান্ত প্রিয়বাবু প্রস্তাবে অন্যান্য কংগ্রেসী সদস্যদে স্বাক্ষর থাকলেও তাঁরা প্রিয়বাবুর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু জানতেন না বা জানানো হয় নি।

শান্তিপুরে অসমঞ্জ দের নেতৃত্বে গুণ্ডামী : সশস্ত্র সংঘর্ষ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শান্তিপুরে দোল উৎসবে প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলে সাহাপাড়া ও সোনাপট্টির মধ্যে সংঘর্ষের জের হিসাবে প্রকাশ্য রাস্তায় দুই দলের মুখোমুখি লড়াই, মারধোর ইত্যাদির ফলে সমগ্র সহরে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দোলের মিছিলের হাঙ্গামার আক্রোশবশে পরদিন উনত্রিশে মার্চ দিনদুপুরে স্থানীয় কংগ্রেসী এম এল এ অসমঞ্জ দের প্রশ্রয়পুষ্ট গুণ্ডারা কড়বাজারের এক দোকানের কর্মচারী সাহাপাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত প্রামাণিককে (বয়স আঠারো) দোকান থেকে টেনে বের করে সর্বসমক্ষে অমানুষিক মারতে মারতে তুলে নিয়ে চলে যায়। খবর পেয়ে সাহাপাড়ার বহু তরুণ যুবক ও সাধারণ মানুষ প্রশান্তকে গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য বড়বাজার-সোনাপট্টির মোড়ে ধাওয়া করেন। তখন সেখানে দুপক্ষের মধ্যে ইঁটপাটকেল, এসিড বোতল ইত্যাদি ছোঁড়াছুড়ি চলে এবং কয়েকজন আহত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে প্রশান্তকে অর্ধমৃত অবস্থায় একটি ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে এবং হাসপাতালে পাঠায়। বড়বাজার-সোনাপট্টির মোড়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ চলাকালে সাহাপাড়ার কয়েকশ বিক্ষুব্ধ নারীপুরুষ শান্তিপুর পুলিশ থানায় গিয়ে এম এল এ-র আশ্রয়পুষ্ট গুণ্ডা ধানিয়া, নেতা মুখার্জী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, মহাদেব হালদার প্রভৃতির নামে নির্দিষ্ট অভিযোগসহ ডায়েরী করেন এবং তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানাতে থাকেন। এম এল এ অসমঞ্জ দে ঐসময় থানায় গেলে সাহাপাড়ার বিক্ষুব্ধ মানুষেরা গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দেওয়ায় এম এল এ-কে অপমান-অপদস্থ করেন। এরপর পুলিশ এম এল এ-র চাপে সাহাপাড়ার নিরপরাধ যুবকদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করে এবং ঐ পাড়ার বাসিন্দা, সি পি আই এম-এর সক্রিয় কর্মী গোরাচাঁদ প্রামাণিক সহ চারজনকে নানা মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। পরে এরা সকলেই জামিনে মুক্ত হয়। অথচ যে সব গুণ্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে দোকান কর্মচারী প্রশান্তকে কর্মরত অবস্থায় দোকান থেকে তুলে এনে নির্মমভাবে মারধোর করল, তাদের নামে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ আজও তাদের গ্রেপ্তার করেনি। বরং তারা এম এল এ-র আশ্রয়ে থেকে রাস্তায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় এম এল এ এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং আরোপের যে দুরভিসন্ধিমূলক চেষ্টা করছেন, এখানকার সাধারণ মানুষ তার প্রতি ধিক্কার ও নিন্দাবাদ জানিয়েছেন।

হোলি খেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বচসার জের হিসাবে তিরিশে মার্চ সকালে স্থানীয় সিনেমা লাইব্রেরী চত্বরে গোভাগাড় এলাকার মাস্তানেরা লোহার রড, পাইপগান ইত্যাদি নিয়ে ঠাকুরপাড়া এলাকার দুজন মাস্তানকে আক্রমণে উদ্যত হয়। উভয় এলাকার মাস্তানেরাই কংগ্রেসের অনুগ্রহপুষ্ট। স্থানীয় কিছু মানুষ আক্রমণোদ্যত গোভাগার এলাকার মাস্তানদের বাধা দেওয়ায় তারা পাইপগান উচিয়ে তুলে বাধাদানকারী মানুষদের দিকে তাক করে। তখন আরও কিছু মানুষ মাস্তানদের তাড়া করলে গোভাগাড় এলাকার মাস্তানরা ঠাকুরপাড়ার একজনকে সাইকেলে তুলে নিয়ে যায়। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। এই ঘটনার পর সিনেমা এলাকার ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে দিয়ে দলবদ্ধভাবে থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে তাঁদের নিরাপত্তা ও এলাকার শান্তি দাবী করেন। তাঁদের দাবী অনুযায়ী ঐ স্থানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়। কিন্তু ঐদিনই বিকালে কাছাকাছি ডাকঘর মোড়ে অনুরূপ একটি ঘটনায় স্বপন নামে একটি ছেলে প্রহৃত হয়। ঐদিন রাতে স্থানীয় পৌরসভার সামনে একটি চায়ের দোকান লক্ষ্য করে দুটি বোমা ফাটানো হয়। ঐ চায়ের দোকানটিতে ঠাকুর পাড়ার মাস্তানদের আড্ডা। বোমায় অবশ্য কারো বিশেষ কিছু আঘাত লাগেনি। এই ঘটনার পর এম এল এ-র আশ্রিত গুণ্ডারা কংগ্রেসেরই আশ্রয়পুষ্ট গোভাগাড় এলাকার মাস্তানদের খোঁজার নামে ঐ অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি চড়াও হয়ে নিরীহ মানুষদের উপর হামলা করছে। পুলিশ ও প্রশাসন নির্বাক হয়ে রয়েছে এবং তার সুযোগ নিয়ে এম এল এ-র গুণ্ডারা শান্তিপুরের কয়েকটি এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং নাগরিকজীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছে।

দর্পণে প্রতিবিম্ব

শ্রীমোরারজী দেশাই অনশন শুরু করার পর থেকে শ্রীমতী গান্ধী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি প্রমুখ গুজরাটের খরা, ত্রাণকার্য, ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বারবার সংকল্প ঘোষণা করলেন চাপের কাছে নতিস্বীকার নৈব নৈবচ। অবশেষে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে দেখে তেরই এপ্রিল ইন্দিরাজী নতিস্বীকার করলেন, গুজরাটে নির্বাচন বর্ষার আগেই অর্থাৎ জুন মাসে হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং মোরারজীভাই অনশন ভঙ্গ করলেন।

শ্রীদেশাই অনশনের হুমকী দেবার পর থেকে শ্রীমতী গান্ধীরা, গুজরাট-রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীএইচ সি ওগরিন এবং যথারীতি আকাশবাণী ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করেছিলেন। এমনকি সরকারী বিজ্ঞাপনও বেরোল গুজরাটে নাকি দুর্ভিক্ষ। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে অনেক জায়গায় দুর্ভিক্ষ হলেও সরকার কোনদিন তা স্বীকার করেন না। এতে যে সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই আমাদের দেশের হাজার হাজার অনাহার মৃত্যুকে "অপুষ্টিজনিত মৃত্যু" বলে প্রচার করে দেশের ভাবমূর্তি অম্লান রাখেন কংগ্রেসী সরকার।

শ্রীদেশাইয়ের অনশনের সামনে পড়ে সরকার হার মানলেন বলে এবারে বোধহয় সরকারী প্রচারের মূল ধুয়া হবে যে, গণতন্ত্রের প্রতি সরকারের বিশেষ মহান নেত্রীর এমন অবিচল আস্থা যে খরা, দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্য সব নিয়েও গুজরাটে নির্বাচনের আয়োজন করা হচ্ছে।,

জুনে নির্বাচন তো হবে গুজরাটে, কিন্তু কেমন নির্বাচন? জম্মু ও কাশ্মীরে এতোকাল যা ঘটেছে, পশ্চিমবাংলায় কাহাতরে আমরা যা দেখেছি, উত্তর প্রদেশ ও ওড়িষায় বিগত নির্বাচনে অনেক কেন্দ্রে যে কাণ্ড হয়েছে, কিংবা সাম্প্রতিক আসামের বরপেটায় লোকসভা উপনির্বাচনের ঘটনা,—এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে সরকারী পরিকল্পনা সার্থকভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ পেলে ইন্দিরা সরকার যে কোন নির্বাচন জিততে পারবেন। শুধু প্রচার করে যাবেন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে অবাধ স্বাধীন নির্বাচন। মহান নেত্রীর মহিমা অপার। তাই বলি গুজরাটবাসী সাবধান।

●

শেখ আবদুল্লা ক্ষমতাসীন হয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন নিয়েই শুধু তোলপাড় করছেন না, হালে অন্যান্য ছোটখাটো বিষয়েও অলিখিত বিধানে অভিযান চালিয়েছেন। এই তো কিছুদিন আগে, বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে ঘুরে তিনি গণটোকাটুকির বিরুদ্ধে কথাবার্তা বললেন। বেশ নাকি সুফলও পেয়েছেন তাতে।

আবদুল্লা সাহেবের ইদানীংকার এক ব্যক্তিগত অভিযানে শ্রীনগর এবং জম্মু-কাশ্মীরের অন্যান্য অনেক অঞ্চলে নাপিতদের, সেলুনওয়ালাদের কারবারে এখন খুব বাড়বাড়ন্ত। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের প্রবীণ-নবীন অনেক অফিসার কর্মচারীদের মধ্যে সেলুনে গিয়ে লম্বা চুল ছেঁটে ফেলার জন্য হিড়িক পড়ে গেছে। হিপিদের মতো চুল, বাহারী লম্বা-চুল, বাবরি চুল ইত্যাদি রাখার যে ঢেউ চলছে, জম্মু-কাশ্মীরের অনেক সরকারী অফিসারও সেই স্রোতে এতোকাল গা ভাসিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে তাদের বিপদ ঘনিয়ে এল।

শেখ আবদুল্লা লম্বা চুলের ব্যাপারে কোনো সরকারী নির্দেশনামা জারী করেননি। শ্রীনগরের একটি সরকারী দপ্তর পরিদর্শনে গেলে সেখানকার লম্বা চুলওয়ালা মধ্যবয়স্ক দপ্তরপ্রধান তাঁকে নিজের পরিচয় দিলেন। এমনকী পিতৃপরিচয়ও দিলেন অফিসারটি, কেননা সেই অফিসারের বাবা কাশ্মীরের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। হিপি চুলওয়ালার কথার জবাবে শেখ সাহেব আক্ষেপোক্তি করলেন, ও আমি দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমার সেই বন্ধুর মেয়ে। বিদ্রূপটা বুঝতে সেই অফিসারের দেরি হয়নি। দৌড়লেন তিনি সেলুনে। আরেকজন লম্বা-চুল গালপাট্টাওয়ালা পদস্থ অফিসারও নাকি এভাবে অপদস্থ হয়েছেন শেখ আবদুল্লার কাছে।

ঘটনাগুলো লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের নানাদিকে। আর জম্মু ও কাশ্মীরের নরসুন্দরদের অনেকদিনের মন্দা ব্যবসায়ে আবার তেজী লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ অনুগ্রহ করে একবার কলকাতা সফরে আসুন। প্রোটোকল অনুযায়ী প্রথমেই তাঁকে আসতে হবে মহাকরণে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সুদর্শনে। শ্রীনগরের সরকারী দপ্তরে হিপিসদৃশ্য অফিসার দেখে তিনি যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, এখানে দীর্ঘকেশী মুখ্যমন্ত্রী দেখে তিনি ততোধিক বিস্মিত হবেন। শেখ আবদুল্লা সিদ্ধার্থপিতাকে না জানলেও মাতামহের নাম নিশ্চয়ই জানেন। শ্রীনগরের সেই অফিসারটিকে অমুকের কন্যা বলে মনে করে থাকলেও, কলকাতার মহাকরণের মুখ্যমন্ত্রীকে শেখ আবদুল্লার দেশবন্ধুর পুরুষসিংহবৎ দৌহিত্র বলে মনে করা উচিত। পদমর্যাদা অনুযায়ী দীর্ঘকেশ সিংহকেশর বলে মনে হতে পারে বৈকি?

শেখ আবদুল্লার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, আরেকটা কারণেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর লম্বা চুলওয়ালা রূপকে আমরা পছন্দ করি। এই লম্বা চুলের জন্যই তো অনেকটা তার মধ্যে দিল্লীর দেবীর পূজারী রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

শিলাদিত্য

বেঙ্গল পেপার মিল বন্ধ করার চক্রান্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রানীগঞ্জের বেঙ্গল পেপার মিল বন্ধ করার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ উঠে পড়ে লেগেছে বলে জানা গেছে। মিল কর্তৃপক্ষের জুলুমবাজী এবং স্বেচ্ছাচার এখন এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে যে শ্রমিকদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীগুলির এরা কোনদিনই মীমাংসা করেনি, বরং অত্যাচার আর সন্ত্রাস চালিয়ে শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙবার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাঁদের এই স্বেচ্ছাচারী মনোভাব দেশজোড়া কাগজের অভাবের দিনে কাগজ উৎপাদনকে ব্যাহত করছে। সরকারকে এই মর্মে জানানো সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বেঙ্গল পেপার মিল মজদুর ইউনিয়নের (সি আই টি ইউ) নেতৃত্বে শ্রমিকরা উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং বকেয়া পাওনা এক লক্ষ টাকা আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু এই মিলের মালিক কর্তৃপক্ষ পাওনা টাকা না মেটাবার জন্য মিল বন্ধ করবার অজুহাত খুঁজছিল এবং সম্প্রতি আরো একটি ব্যাপারে এই মনোভাব আরও নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। ব্যাপারটি হলো কেন্দ্রীয় সরকার মিল কর্তৃপক্ষের কাছে এক আদেশ পাঠিয়েছেন যে, কারখানায় উৎপাদিত কাগজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (সম্ভবত তিরিশ শতাংশ) নির্দিষ্ট মূল্যে সরকারকে দিতে হবে। এই আদেশ কার্যকরী হলে কালোবাজারে কাগজ বিক্রি করে যে মোটা মুনাফা মালিক ঘরে তুলছিল তার অনেকটাই মাঠে মারা যাবে। তাছাড়া সংবাদে আরও প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার তেয়াত্তর এবং চুয়াত্তর সালের বকেয়া পাওনা হিসাবে প্রায় চারহাজার টন কাগজ চেয়ে বসেছেন। তাই লোভের নির্দেশ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মিল বন্ধ করতে মালিকপক্ষ সবরকম চেষ্টাই চালাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দুই হাজার স্থায়ী শ্রমিককে লে-অফ করা হয়েছে। সাধারণ ভাবে শ্রমিকরা ব্যাপক সংখ্যায় লে-অফের নামে লক-আউটের শিকার হচ্ছেন। সরকার থেকে এই অবস্থার প্রতিকারের কোন চেষ্টা নেই।

সংবাদে প্রকাশ যে, মিল কর্তৃপক্ষ এক তারবার্তায় কন্ট্রাক্টরদের জানিয়েছে বাঁশ ও অন্যান্য কাঁচামাল না পাঠাবার জন্য। মিল কর্তৃপক্ষের হাবভাবে মনে হচ্ছে মিলটি শীঘ্রই লক-আউট হবে।

৬০ জন শ্রমিকের মৃত্যু

জে কে নগর এলুমিনিয়ম খনির ষাট জন শ্রমিক অনাহারে গেছে। এই কারখানাটি দীর্ঘ বৎসর বন্ধ। উল্লেখযোগ্য যে, ই কারখানা বন্ধ থাকায় বছরে এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা সরকারী শুল্কের এবং দেড় কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি হচ্ছে।

॥ ৮ম পর্ব ॥

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস : ১৯৫৯

৩১শে আগস্ট কলকাতা অভিযান।

কিন্তু তার পূর্বেই সুরু হল ব্যাপক দমনপীড়ন। মেদিনীপুর ও ডামমণ্ডহারবারে কৃষক মিছিলের উপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ করল পুলিশ, কৃষ্ণনগর ও বর্ধমানে লাঠি চার্জে আহত হল মানুষ, সারারাজ্য জুড়ে এতাবৎ ৬০০ নারীসহ প্রায় ৭০০০ মানুষকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হল, কুখ্যাত আটক আইনের ব্যাপক প্রয়োগ করা হল, গ্রেপ্তার করা হল হেমন্ত বসু সহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির বহু নেতাকে। দমনপীড়নের বিরুদ্ধে দিকে দিকে আন্দোলনকারী মানুষের প্রতিবাদও ধ্বনিত হল। এই দমনপীড়নের, এই দুঃশাসনের নায়ক খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিটি প্রত্যক্ষ দাবি হিসেবে উচ্চারিত হল মানুষের মুখে মুখে। খাদ্য আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এক গোপন পত্র মারফৎ পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। ডাঃ রায় প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন যে, আন্দোলনের মুখে খাদ্যমন্ত্রীকে সরানো চলে না। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের একাংশও খাদ্যমন্ত্রীর অপসারণ প্রত্যাশা করেছিলেন; যেহেতু সেই সময় খাদ্যমন্ত্রীই তাঁর অবিবেচনাপ্রসূত ভাষণে ও বক্তব্যে সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষের ক্রোধের ও ক্ষোভের শিকার হয়েছিলেন। কংগ্রেসের একাংশ খাদ্যমন্ত্রীকে অপসারিত করে পুলিশমন্ত্রীকে খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালানোর প্রস্তাবও করেছিলেন।

শ্রীজৈনের পদত্যাগের প্রসঙ্গ আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। পদত্যাগের পর শ্রীজৈন যে বিবৃতি দেন তা বিভ্রান্তিকর হলেও তার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে সরকারের খাদ্যনীতি যে মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ ছিল সে কথা উচ্চারিত হয়েছিল। সমসাময়িককালে কৃষি—অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থার রিপোর্টেও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যনীতির সমালোচনা করা হল। বলা বাহুল্য এই সংস্থার রিপোর্ট যাতে সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশিত হতে না পারে সে সম্পর্কে সরকারী মহলে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কোন মন্ত্রীই তাঁদের বক্তৃতায় এই রিপোর্টের সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। এই রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট। অভাবের সময় মূল্য নিয়ন্ত্রণ বাতিল, লেভি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণে উপযুক্ত উদ্যোগের অভাব, জোতদার ও চালকল মালিকদের খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টিতে পরোক্ষ সাহায্য দান প্রভৃতি বিষয় সমালোচনা করে কৃষি অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। কিন্তু আরো অনেক ব্যাপারের মতোই এই রিপোর্ট ধামাচাপা পড়েছিল। এই রিপোর্টের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং যা করা হয়েছে, তাতে বারংবার বিঘ্নিত হয়েছে জনগণের স্বার্থ, এবং বুভুক্ষু, রিক্ত জনগণকে সরকার ক্রমশঃই আরো ব্যাপক আন্দোলনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, সকল শ্রেণীস্বার্থভোগী সরকার যা করেন, অর্থাৎ আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য আরো ব্যাপক দমনপীড়ন অপপ্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে পরোক্ষে আন্দোলনকে আরো ব্যাপক হতে সাহায্য করেন।

কী বললেন, দিল্লী থেকে আগত কংগ্রেসী এম, পি রা! বললেন: পঃ বঙ্গে খাদ্যাভাব নেই, রেশনে চালের অভিযোগও মিথ্যে। চমৎকার। বামপন্থী এম, পি দের পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনের পর কংগ্রেসী এম, পিরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে এলেন পঃ বঙ্গে। এলেন কেরলের কে, পি, কুষ্টি ও কৃষ্ণান সারায়, উত্তরপ্রদেশের তারকেশ্বর পাণ্ডে, মহীশুরের এন, কেশব, মধ্যপ্রদেশের এম, বি, উইদে, পাঞ্জাবের রণবীর সিং চৌধুরী, পঃ বাংলার উপেন্দ্রনাথ বর্মন এবং নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, বিহারের বিভূতি মিশ্র, অন্ধ্রের আকবর আলী খাঁ প্রমুখেরা। পরিদর্শনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ১২ জন কংগ্রেস এম, পির পক্ষে উত্তরপ্রদেশের এম, পি শ্রীমুনীশ্বর দত্ত উপাধ্যায় ঘোষণা করলেন: মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলন হল রাজনৈতিক আন্দোলন। অন্যান্য রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতির সঙ্গে পশ্চিমবাংলার খাদ্য পরিস্থিতির কোন পার্থক্য নেই। তিনি বললেন—"এই রাজ্যে এমন কিছু খাদ্যাভাব নাই যাহাকে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় বৎসরের পর বৎসর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য একটি কমিটিকে জিয়াইয়া রাখিবার কোন অর্থ থাকিতে পারে না। শ্রীউপাধ্যায় মজুতদারদের নিকট খাদ্যশস্য মজুত নাই ইহা স্বীকার করেন না। বাস্তবে চাউলের জনৈক পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট ৭,৮৭৪ বস্তা চাউল এবং ৯১৬ মন ধান্য আছে বলিয়া তিনি জানান। এই রাজ্যের খোলাবাজারে চাউলের যে মূল্য, শ্রী উপাধ্যায় বলেন, অন্য কোন রাজ্যের তুলনায় তাহা অধিক নহে। কেরলের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কেরলে যে কোন চাউলের মূল্য অধিক, সেখানে নিকৃষ্টতম চাউলের মূল্য ৩০/৩২ টাকা। শ্রীউপাধ্যায় বলেন, রেশন দোকানের চাউল খাইবার মত নহে, ইহা তাঁহাদের মনে হয় না।...কাঁকর

দিলীপ মজুমদার

সম্পর্কে তিনি বলেন, কিছু কাঁকর থাকিতে পারে, তবে ইহার পিছনে মুনাফামূলক মনোভাব আছে বলিয়া মনে হয় না।...রেশনে যে চাউল দেওয়া হয় তাহাকে তিনি পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন। মফঃস্বলে রেশন দোকানে আদৌ ভীড় থাকে না বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।" (বসুমতী/১-৯-৫৯)। এ যেন টেপ রেকর্ডের অপর পিঠ। খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সুরেই বেজে চলেছে। সংবাদে প্রকাশ যে এই ১২ জনের প্রতিনিধি দল নাকি কলকাতা, হাওড়া, ২৪পরগণা ও নদীয়া জেলা পরিদর্শন করেছিলেন। কিন্তু কী তাঁরা পরিদর্শন করেছিলেন কে জানে! যুগান্তরের মত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তেও এম, পিদের এই হাস্যকর বক্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটিত হল।—"পশ্চিমবাংলায় চাউলের দর ও সরবরাহের অবস্থা সম্পর্কে পার্লামেন্টে কংগ্রেসী সভ্যদের দ্বারা গঠিত প্রতিনিধি দলের বিবৃতি পড়িয়া জনসাধারণ স্বভাবতঃই বিস্মিত হইবে।...তাঁহাদের উক্তিটি ব্যাখ্যা করিলে ইহাই অর্থ হয় যে, দর যতই চড়ুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বাজারে চাউল মিলিবে, ততক্ষণ প্রকাশ্য বাজারে চাউলের অভাবের কথা উঠতে পারে না। এই যুক্তি মানিয়া লইলে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে সময়ও বাঙলায় চাউলের কোন অভাব ছিল না।...পার্লামেন্টে কংগ্রেসী সভ্যদিগের প্রতিনিধি দলটি পশ্চিমবাঙলায় খাদ্যের অবস্থা সম্পর্কে সত্যের সন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, তাঁহারা অনেকটা ভুল ধারণা লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।" (ভিক্ষার চাউল/সম্পাদকীয়। ১১-৯-৫৯)

কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর ২৮শে আগস্টের বিবৃতিতে! বললেন—"আমাদের কমিউনিস্ট বন্ধুগণ ব্যবসায়ী অথবা মিলমালিকগণ মজুত করিতেছেন বলিয়া যে কোলাহল করিতেছেন তাহা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে সারা রাজ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উৎপাদন কারীরাই বিভিন্ন কারণে মাল মজুত করিতেছেন।" (স্বাধীনতা। ২৯-৮-৫৯)। অর্থাৎ কৃষকদের দোষী সাজাবার জন্যই কোমর বেঁধে আসরে নামলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় মজুতদারের হাতে নয়, রাজ্যের ৪ একরের উপর মালিকানাবিশিষ্ট ১৩ লক্ষ চাষী পরিবারের ঘরেই মজুত ছিল ধান। অর্থাৎ, লোকসভায় পর্যবেক্ষণকারী বিরোধী দলের এম, পি বা পঃ বঙ্গের বিরোধীদলের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কৃষি অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থার রিপোর্টকেই অস্বীকার করলেন! ২৮শে আগস্টে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি শুধু এ কারণেই উল্লেখ যোগ্য নয়। এই বিবৃতিতে আসন্ন আন্দোলনের উপর সরকারী দমননীতিরও ইঙ্গিত ছিল। কেরল সম্পর্কে শ্রীভূপেশ গুপ্তর বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বলতে চাইলেন যে, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম শ্রীগুপ্তের সংস্থা অনুযায়ী বিদ্রোহ ছাড়া আর কী। মুখ্যমন্ত্রীর মতে শ্রীজ্যোতি বসুর 'শান্তি'র ধারণা ও শ্রীগেশ গুপ্তের 'শান্তি'র ধারণা এক নয়। সাবাস মুখ্যমন্ত্রী। আনন্দবাজার বা জনসেবক কোন মহৎ অনুপ্রেরণায় বামপন্থী দলে বিভেদ সৃষ্টির কাজে নামে এখন তা পরিষ্কার হয়ে গেল। আসলে, কূট কৌশলী মুখ্যমন্ত্রী কেরলের কমিউনিস্ট সরকার উচ্ছেদের জন্য সেক্রেটারিয়েট দখল এবং পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের দাবি আদায়ের জন্য সেক্রেটারিয়েট ভবন অভিমুখে যাত্রাকে তিনি একজাতীয় জিনিস বলে গুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অথচ কী ছিল ৩১শে আগস্ট সলর্কে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ঘোষণা! "এই সকল শোভাযাত্রা ১৪৪ ধারার গণ্ডির বাহিরে যেখানে পুলিশ বাধা দিবে সেখানেই পথে বসিয়া পড়িবে। তাহারা সেখানে শৃংখলার সহিত ২ ঘণ্টাকাল অবস্থান করিবে। এবং কমিটির দাবি সমূহ অবিলম্বে পূরণ করিবার দাবি জানাইবে। যদি ইতিমধ্যে দাবি পূরণ করা না হয় তাহা হইলে জনগণ ৭টা ৩০ মিনিটের সময় শান্তিপূর্ণ ভাবে এক একটি ব্যাচ করিয়া পুলিশ কর্ডন ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইবেন। যদি শোভাযাত্রাগুলিকে কলিকাতা ময়দানে যাইতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে যেখানে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইবে, সেখানে এক একটি ব্যাচ করিয়া তাঁহারা শান্তিপূর্ণ ভাবে পুলিশ কর্ডন ভঙ্গ করিবেন।" বোঝা যাচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির এই ঘোষণা পূর্বাহ্নে জানা সত্ত্বেও প্ররোচনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারের তরফ থেকে বিপরীত বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন Statesman-এর একটি সংবাদ, তা হলে বোঝা যাবে যে জনগণের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমনের জন্য সরকার পূর্বেই কী রকম প্রস্তুতি গ্রহণের কথা চিন্তা করছিলেন।—

"The cabinet is understood to have decided that the police would try to prevent demonstrators from districts coming to calcutta with the intention of violating law on August 31." (Statesman/28.8.59)। সব জেনে শুনেও সরকার কী ধরে নিয়েছিলেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিংস দখল করতে? তা না হলে, ৩১শে আগস্টের এমন সুরক্ষিত করে সাজানো হচ্ছে কেন? বসুমতী দৈনিকের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন—"এই দিন পুলিশ রাইটার্স বিল্ডিংসকে একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করে। অপরাহ্ন হইতেই সশস্ত্র পুলিশ রাইটার্স বিল্ডিংস এর চতুর্দিকে কড়া বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সমস্ত ফটকগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ফটকের দ্বারদেশে দুই তিনজন পুলিশ ইনস্পেক্টরসহ পুলিশ প্রহরীগণ দাঁড়াইয়া থাকে। কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। রাইটার্স বিল্ডিংসের কর্ম মুখরিত ক্যানটিনও এইদিন অপরাহ্নের আগেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বেলা ৩টার আগেই রাইটার্স বিল্ডিংস এ প্রায় ছুটি হইয়া যায় এবং অপরাহ্ন ৫টার সময় খুব অল্প সংখ্যক কর্মচারী ছাড়া, রাইটার্স বিল্ডিংসের ভিতরে আর কেহ ছিলেন না। মন্ত্রীদের মধ্যেও কেহ কেহ বেলা ৪টা বাজিবার পূর্বেই বাড়ী চলিয়া যান। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় রাত্রি ৮টা পর্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিংসে ছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংসের সম্মুখ ভাগেও কড়া পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করা হয়। প্রকাশ, পুলিসের নিকট এই মর্মে নাকি সংবাদ আসে যে, বিক্ষোভকারীদের কেহ কেহ হয়তো অস্ত্র কিতে রাইটার্স বিল্ডিংসে আসিয়া ভবনের শীর্ষে বামপন্থীদের পতাকা

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

কলকাতায় ফ্যাসিবাদী হামলা ঃ লোকসভায় আলোচনা

কংগ্রেসী সদস্যরা কেউ নিন্দা করলেন না

কপিল রায়

নতুন দিল্লী, দশই এপ্রিল ঃ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের সামনে গত দোসরা এপ্রিল শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের ওপরে যে হামলা হয়েছিল অবশেষে তা নিয়ে লোকসভায় আলোচনা করবার সুযোগ মিলেছিল সদস্যদের। অবশ্য সদনে কংগ্রেসের "পাশব সংখ্যাগরিষ্ঠতা"র ও তাঁদের অন্তরঙ্গ সহযোগী সি পি আইয়ের কর্মপ্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে এ আলোচনার ফলশ্রুতি সম্পর্কে কারুর মনেই কোন সংশয় ছিল না। তবু এ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল সেটাকেই এখানে যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। কারণ এই প্রসঙ্গে গত সাতই তারিখে অ-সি পি আই বিরোধীপক্ষীয়রা আলোচনা তুলতে গেলে লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীগুরুদয়াল সিং "রাজ্যঘটিত ব্যাপার" বলে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। অ-সি পি আই বিরোধীপক্ষীয়রা এই প্রসঙ্গে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে নানাবিধ যুক্তি ও নজিরের অবতারণা করে তাঁদের মুলতবী প্রস্তাবাদির অনুকূলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মঞ্জুরী আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সদন ত্যাগ করেছিলেন। সদন ছেড়ে যাবার সময়ে সংগঠন কংগ্রেসের নেতা শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্র সদনকে সতর্ক করে গিয়েছিলেন যে অপরাহ্নে এ নিয়ে "গুরুতর পরিণতি" দেখা দিতে পারে।

পরে অ-সি পি আই নেতারা তাঁদের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করে মাননীয় অধ্যক্ষ-মহোদয়ের সঙ্গে তাঁর কামরায় সাক্ষাৎ করে দোসরা এপ্রিলের ঘটনা নিয়ে আলোচনার দাবি আবারও তোলেন এই বলে যে উক্ত ঘটনায় লোকসভার সদস্য শ্রীসমর গুহের ওপরে "মারাত্মক হামলা" করা হয়েছিল। আঠারোই মার্চের এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রবেশ পথে দেশী পিস্তলসহ একজনের গ্রেপ্তারের ঘটনাকে প্রধানমন্ত্রীর ওপরে সম্ভাব্য হামলা হিসেবে ধরে নিয়ে লোকসভায় আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। আর এবারে কলকাতায় জনৈক সদস্যের ওপরে মারাত্মক হামলা হয়েছিল। সদস্যদের অধিকারে যাতে কোন রকম বৈষম্য না ঘটে তার জন্যই কলকাতার ঘটনাটি নিয়েও সদনে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সদনের চোখে সদস্যে সদস্যে কোন ভেদ থাকতে পারে না। বলেন অ-সি পি আই বিরোধীপক্ষীয়রা। যাই হোক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তখন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীরঘুরামাইয়াকে ডেকে এই নিয়ে কথাবার্তা বলেন। মন্ত্রীমশায় পরদিন সদনের বৈঠক শুরু হবার আগেই সরকারের মতামত জানাবেন বলে বলেন। পরদিন সরকারপক্ষ রাজি হলে বিকেল তিনটের সময় এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্রের উত্থাপিত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয় আর শেষ হয় রাত্রি এগারোটা চল্লিশ মিনিটে।

দোসরা এপ্রিলের ঘটনাকে নিন্দা করবার জন্য যে প্রস্তাব তোলা হয়েছিল কংগ্রেস সদস্যরা ভোটের জোরে তা হারিয়ে দিলেন। প্রস্তাবের এই পরিণতিতে এখানকার পর্যবেক্ষক মহলে কোন বিস্ময় দেখা দেয় নি। এই সব মহল মনে করেন যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস স্বীয় দলের লোকজনের অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক কাজকর্মকেও যে কখনও নিন্দা করতে রাজি নন আর একবার সেই কথাটি প্রমাণিত হল লোকসভার এই আলোচনায়। বস্তুত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী তাঁর ভাষণে সাধারণভাবে "জনজীবনে হিংসাত্মক কার্যকলাপে"র নিন্দা করলেও কলকাতার এই ঘটনা সম্পর্কে যা বললেন বাস্তবে তাকে অনেকেই তার সমর্থন বলেই মনে করছেন। কংগ্রেস সদস্যদের অনেকের বক্তব্যেও এই সমর্থনই ফুটে উঠেছিল—সেদিনের হিংসাত্মকতার বিরুদ্ধে তাঁদের কারুর কণ্ঠে কোন নিন্দাবাণী ধ্বনিত হয় নি। দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় কলকাতার এই ঘটনার জন্য "দুঃখ প্রকাশ" করলেও এদিনের লোকসভার আলোচনার সময়ে তাঁর ধর্মপত্নী শ্রীমতী মায়া রায় কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করা বা ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখলেন না। বস্তুত বেশ জোর গলাতেই শ্রীমতী রায় ঘোষণা করলেন যে কলকাতার তরুণ-তরুণীরা যখন দেখলেন যে সাতষট্টি সন থেকে একাত্তর সন অবধি মার্কসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে ধ্বংসতাণ্ডব চালিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে শ্রীজয়প্রকাশ হাত মিলিয়েছেন তখনই সেই তরুণ-তরুণীরা শ্রীনারায়ণের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছেন (রিঅ্যাকটেড)। শ্রীমতী রায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে দিয়ে বললেন যে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বঙ্গদেশে ফিরে যেতে চেষ্টা করলে পশ্চিমবঙ্গের তরুণরা আবার তাঁদের বীতরাগ জাহির করবেন। অর্থাৎ শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আবার বঙ্গদেশে গেলে কংগ্রেসের যুবশক্তি দোসরা এপ্রিলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবেন। শ্রীমতী রায়ের অভিজাত ইংরেজ মহিলাসুলভ কণ্ঠে ও ভঙ্গিতে উচ্চারিত এই সতর্কবাণী শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীকে কতটা প্রভাবিত করবে তাতে যথেষ্ট সংশয় থাকলেও এ বিষয়ে এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহলে কোন সংশয় নেই যে দোসরা এপ্রিলের এই জঘন্য ঘটনা অনুষ্ঠানে যাঁদের প্রকাশ্য ও গোপন হাত কার্যকরী ছিল তাঁরা বিশেষ প্রোৎসাহিত হবেন।

যুব কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর বক্তব্য আরও স্পষ্ট। তিনি জানালেন তাঁরা জয়প্রকাশ নারায়ণের ওপরে কোন রকম হামলা করেন নি। "আমাদের শত্রু জেপি নন। আমাদের শত্রু প্রতিক্রিয়া" বললেন তিনি। তবে জনসমাবেশের জন্য জেপি সি পি আই এমের ওপরে নির্ভর করাতেই এই ঘটনা ঘটেছে আর সি পি আই এম জেপির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। দোসরা এপ্রিলের বিক্ষোভটি ছিল তাঁর মতে "স্বতঃস্ফূর্ত"। আলোচনার গোড়াতে সি পি আই নেতা শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কার্যত মূল প্রস্তাবকে বানচাল করবার উদ্দেশ্যে একটি সংশোধনী তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীগুপ্তের এই সংশোধনটী অ-সি পি আই বিরোধী সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়লেও কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষ থেকে বিপুলভাবে সমর্থন লাভ করে। এই প্রশ্নে যে সব কংগ্রেস সদস্য বলেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন প্রাক্তন যোগাযোগ রাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শের সিং। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্নেহধন্য হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলালের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে অধ্যাপক সিংকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে কিছু দিন আগে। শ্রীগুপ্তের সংশোধনীর বিরোধিতা করে অধ্যাপক সিং বললেন যে মূল প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে দোসরা এপ্রিলের বিশেষ ঘটনাটির আলোচনা করা। কিন্তু শ্রীগুপ্ত বিহার প্রভৃতি ঘটনার সংযোজন করে মূল প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন কাজেই সংশোধনী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মূল প্রস্তাবের লক্ষ্যের সঙ্গে এই সংশোধনীর কোন সংগতি নেই। অধ্যাপক সিংয়ের এই বক্তব্য যে সদনে কংগ্রেসমহলকে একটু অসুবিধায় ফেলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যাইহোক লোকসভার মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীঅধ্যাপক জি জি সোয়েল এই সংশোধনীকে অগ্রাহ্য করেন।

কংগ্রেস মহলকে আবারও একবার এই দিন অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল আলোচনার শেষের দিকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া দোসরা এপ্রিলের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যখন বললেন যে ঘটনার আগে শ্রীসমর গুহ একটি ভীষণ প্ররোচনামূলক ভাষণ দিয়েছিলেন এবং তাতেই জনসাধারণ রেগে গিয়েছিলেন তখন শ্রীসমর গুহ উঠে এই কথা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে এই বিবরণ ঠিক নয়। এই নিয়ে সরকার-পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি যখন হচ্ছিল তখন কংগ্রেস সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীকান্তাম্মা বলেন যে সদনের একটি রীতি হচ্ছে যে অনুসৃত দুইটি বিবরণের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের দেওয়া ভাষ্যকেই সদন সাধারণত গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তা করা হবে কি না। এই সময়ে শ্রীমতী লক্ষ্মীকান্তাম্মার উদ্দেশে শ্রীমতী মায়া রায়কে কিছু বলতে দেখা গেল—কিন্তু গোলমালে কিছু শোনা গেলনা। সেকথার জবাব দিলেন বেশ চড়াভাবে শ্রীমতী লক্ষ্মীকান্তাম্মা। বেশ একটু সময় দুই মহিলা সদস্য কথা কাটাকাটি করলেন। অবশেষে অবস্থা শান্ত হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলতে শোনা গেল—এখন শ্রীমতী লক্ষ্মীকান্তাম্মা ও শ্রীমতী মায়া রায় যখন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসেছেন তখন আর কোন ঝামেলা হবে না। শ্রীমতী লক্ষ্মীকান্তাম্মার মন্তব্যটি যে কংগ্রেস মহলকে অসুবিধায় ফেলেছিল শ্রীমতী মায়া রায়ের ক্রুদ্ধ টিপ্পনীতে তারই প্রকাশ ছিল বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

যাইহোক ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী দোসরা এপ্রিলের ঘটনা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন—তিনি ও তাঁর "বিধ্বস্ত সহযোগী" শ্রীসুব্রত মুখার্জী সেখানে গিয়েছিলেন ক্রুদ্ধ বিক্ষোভকারীদের শান্ত করতে, না হলে সেদিন রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটত তার যথার্থতা সম্পর্কে যাচাই করবার দায়িত্ব সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার। ঘটনার অব্যবহিত পরে শ্রীদাসমুন্সী দেওয়া বলে যে বিবৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে পরে ছাপা হয়েছিল তার সঙ্গে তাঁর লোকসভার এই ভাষণের পার্থক্যটি অনেকের চোখেই পড়েছে। অথবা এও মায়ার খেলা—কে জানে। শ্রীদাসমুন্সী এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি ?

রাজধানী দর্পণ

তাইল্যাণ্ডে গেরিলাদের সাফল্য

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ইন্দোচীন চরম অশান্ত উদ্বেল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলার কঠোর সংকল্পে দৃঢ় আজ ইন্দোচীনের মানুষ। তিরিশ বছর আগে, বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তির দিনগুলোতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দেখা গিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার তেমনি আবার। সেদিনের ভুলের অনেক মাশুল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মানুষ দিয়েছে। এবার তাই সুদে আসলে ফেরত চাই।

কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েত-

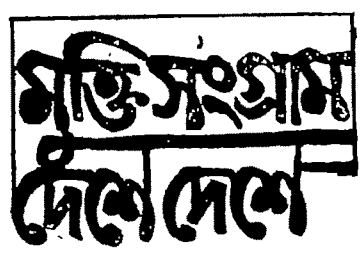

নামের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম এখন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। নমপেনের পতন ঘটেছে।

অন্যদিকে, অন্য মার্কিন পুতুল সায়গন সরকারের অবস্থাও করুণ। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে আর বেশী দেরী নেই। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাঁবেদার "সায়গন সরকার"কে বাঁচানোর জন্যে নানা ষড়যন্ত্র করছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ জীইয়ে রাখার জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ড অতিরিক্ত এক বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করার মতলব করেছে। এদিকে, মার্কিন বোমারু বিমানগুলো মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক এলাকায় নির্বিচারে মানুষ খুন করে যাচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের ফৌজ প্রচণ্ড বিক্রমে মার্কিন বোমারু বিমানগুলোকে ভূপাতিত করছে।

এদিকে যেমন বিপ্লবী মুক্তি ফৌজ কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনামে মুক্তি আন্দোলনকে জয়ের মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে তেমনি দীর্ঘকাল পর আবার তাইল্যাণ্ডে শোনা যাচ্ছে কমিউনিস্ট গেরিলাদের নাম। সম্প্রতি খবরে জানা যায়, লাল ফৌজ উত্তর তাইল্যাণ্ডের থুং চাং জেলায় সরকারী ঘাঁটির ওপর আঘাত হেনে শত্রুপক্ষের সতের জনকে খুন করেছে। এছাড়া, তেইশ জন ভাড়াটে সৈন্য আহত হয়। লাওসের সীমান্ত-অঞ্চলে তাই-গেরিলাদের সাফল্য সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনামে মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার বইয়ে দেবে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঁচ বছর পূর্বে, কাম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনামের বিপ্লবী বাহিনীর প্রধানদের বৈঠকে স্থির হয়েছিল যে, এঁকের আন্দোলন হবে অন্যের পরিপূরক। আজ ইন্দোচীনের গতি দেখে মনে হয়, ইন্দোচীনের মানুষ যে বিপ্লবী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। আর এরই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক সংহতির ভিত্তি।

গুণ্ডা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলুন

ভারতের ধনিক শ্রেণীর প্রধান পার্টি শাসক কংগ্রেস শ্রমজীবী জনগণের নিম্নতম গণতান্ত্রিক দাবীগুলো পূরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়েছে। তাই এখন আর তারা শুধু পুলিশ ও মিলিটারীর ওপর ভরসা করে থাকতে পারছে না। গত চার-পাঁচ বছর ধরে যুব-কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ নামে কয়েকটি ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ধনিকশ্রেণীর উদ্যোগে গড়ে উঠেছে।

সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু, আর এস পি নেতা ননী ভট্টাচার্য, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতৃবৃন্দের অভিমত হচ্ছে যে, সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সন্ত্রাস ও গুন্ডামি ব্যাপকভাবে ধনিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে শ্রমজীবী জনগণের ওপর চালানো হচ্ছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও সন্ত্রাস, গুন্ডামি, হত্যাকান্ড গত চার-পাঁচ বছর ধরেই চলছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে এর আধিক্য রয়েছে। আমরা দেখেছি, আর এস পির উত্তর প্রদেশ রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও দেরাদুনের নির্বাচিত প্রতিনিধি অমরনাথ আনন্দ, সি পি এম-এর কেরল রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও প্রাক্তন এম পি, এ রাঘবন, সোস্যালিষ্ট পার্টির বিহার রাজ্য শাখার নেতা শ্রীসুরজ নারায়ণ সিং এম এল এ প্রমুখ বহু সংখ্যক নেতা নিজ নিজ রাজ্যে গুন্ডাদের দ্বারা নিহত হয়েছেন। পাটনায় সি পি এম নেতা জ্যোতি বসুকে কিভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল, বম্বেতে আর এস পি নেতা ডঃ এ আর দেশাই এবং ত্রিদিব চৌধুরীকে "শিবসেনা" কি ভাবে আক্রমণ করেছিল, হরিয়ানায় গান্ধীজীর সহকর্মী এবং জওহরলাল নেহেরুর বন্ধু সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশকে কি কায়দায় আক্রমণ করা হয়েছিল তাও আমরা দেখেছি। সুতরাং এ বিষয়টি আজ আর শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নয়, সারা ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষের ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোস্যালিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন (এইচ এম পি) নেতা জর্জ ফার্ণান্ডেজ, আর এস পি-র ট্রেড ইউনিয়ন (ইউ টি ইউ সি) নেতা দুর্গা বাগচী, সি পি এম-এর ট্রেড ইউনিয়ন (সি আই টি ইউ) নেতা বি টি রণদিভে, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীজে বি ঘোষে, এম পি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মতে "আগামী দিনে ধনিকশ্রেণী, তাদের সরকার ও তাদের পোষা কমিউনিস্ট পার্টি সম্মিলিতভাবে শ্রমজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে আরও বে-পরোয়া হয়ে উঠবে এবং আরও প্রকট ফ্যাসিস্ট কায়দায় শ্রমজীবী শ্রেণীর বাঁচার আন্দোলনের ওপর আক্রমণ চালাবে। এর প্রতিকার কি? কেউ বলছেন, ধনিকশ্রেণী, তাদের সেবক কমিউনিস্ট পার্টি ও শাসক কংগ্রেসের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর ঘৌথ আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্যই "সম্মিলিত গুন্ডা-প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।" আবার কেউ বলছেন,—"গুন্ডা প্রতিরোধ বাহিনী" গড়তে গেলে, অসময়ে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং শাসক পার্টি তাদের পত্র-পত্রিকা এবং রেডিওর মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে, সিংহলমাতা শ্রীমাভো বন্দরনায়ক যেভাবে চীন, রুশ, বৃটেন ও আমেরিকার সাহায্যে জে ভি পি-র আন্দোলন দমন করেছে ভারতমাতাও সে পথেই এগুবার সুযোগ পাবে।

মতামত

প্রথমোক্ত পথ পরিহার করে কেউ যদি এখনও মনে করেন যে, ধনিক শাসকশ্রেণীর গুন্ডামী ও আক্রমণের হাত থেকে নিস্তার পাবেন, তাহলে মস্ত ভুল করা হবে। বামপন্থী নেতাদের অজানা নেই যে (এক) কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার "লাল ঝান্ডা" ব্যবহার করলেও, আজ তারা সম্মিলিত বামপন্থী আন্দোলনের অংশীদার নয়; (দুই) শ্রমজীবী জনগণকে বেকারত্ব, অনাহার, লাঠি, গুলি ও জেল ছাড়া ভারতের ধনিকশ্রেণীর আর কিছু দেবার নেই এবং (তিন) সেজন্যই আজকে ধনিকশ্রেণী ঘৃণ্য ফ্যাসিস্ট কায়দায় শ্রমজীবী শ্রেণীর বাঁচার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে বদ্ধপরিকর।

১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে ধনিক শাসক শ্রেণী যে পথে ক্ষমতায় এসেছে তা আগামীতে সারা ভারতে যে প্রসারিত হবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়-? শাসক ধনিকশ্রেণী জনগণকে অবাধ ভোটদানের সুযোগ দিয়ে কেন ক্ষমতাচ্যুত হবার ঝুঁকি নেবে? গান্ধীবাদী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ পশ্চিম বঙ্গের প্রধান বামপন্থী শক্তি সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু ও সমর মুখার্জী এবং আর এস পি নেতা মাখন পাল এবং যতীন চক্রবর্তীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন গুন্ডামির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে। শ্রীজয়প্রকাশ মনে করেন, "হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, কলিকাতা এবং বর্ধমানে সি পি এম-এর মুর্শিদাবাদ সুন্দরবন, জলপাইগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুরে আর এস পির যে সংগঠন আছে, তার সঙ্গে সমস্ত বামপন্থী পার্টি এবং কংগ্রেস (সংগঠন) লোকদল প্রমুখ শাসক কংগ্রেসের বিরোধী পার্টিগুলো সম্মিলিতভাবে মদৎ দিলে, শাসকগোষ্ঠীর গুন্ডামীর প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রবল গণআন্দোলনও গড়ে উঠতে পারে।" শ্রীজয়প্রকাশ একজন নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী সর্বোদয় নেতা হয়েও যেভাবে ভাবতে পারছেন, তাও আজ যেন বামপন্থী নেতারা ভাবতে পারছেন না। শুধু তাই নয়, এঁদের ছুৎমার্গিতা দেখলে অতীত দিনের ব্রাহ্মণ-কায়েস্থদের ঝগড়া স্মরণ হয়।

তাই আজকে সি পি এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (দাসপন্থী), বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (কুমারপন্থী), কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল), কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী সমন্বয় কমিটি, বলশেভিক পার্টি, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী) প্রমুখ সকল বামপন্থী পার্টির সভ্য-সমর্থক ও দরদীদের কাছে সবিনয় অনুরোধ সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, লোকদল প্রমুখ শাসক কংগ্রেস বিরোধী শক্তিকে নিয়ে প্রতিটি এলাকায় "গুন্ডা প্রতিরোধ বাহিনী" গড়ে তুলুন।" অন্যথায় আগামীতে যে আক্রমণ আসছে তাতে কমবেশী সকলেই আহত হবে।

জলায়ুর হংস
..মেদিনীপুর

ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা

বিদ্যুৎ সরবরাহের সংকট এবং অক্ষমতা ঢাকবার জন্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ইঞ্জিনীয়ারদের ওপর নানাভাবেই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন। মন্ত্রীরা ইঞ্জিনীয়ারদের বিরুদ্ধে মনগড়া বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণের মন বিষিয়ে তুলছেন।

যেমন দিন কয়েক আগে কোন এক দৈনিক পত্রের সংবাদে পড়লাম "রাজ্য সরকার পর্ষদের কাজের অগ্রগতি এবং ইঞ্জিনীয়ারদের দলাদলিতে অখুসী", এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এই খবরের সত্যতা কতখানি। ১৯৭৪-৭৫ সালের আর্থিক বছরে আটচল্লিশ কোটী টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। এ ব্যাপারে টাকার সত্যিকারের সংস্থান কতটা হয়েছে খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রায় আট-দশ কোটী টাকা মেলেনি। কাজের অগ্রগতি কি হবে তা এর থেকেই বোঝা যায়।

ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে দলাদলি বিভেদের প্রচেষ্টা কাদের? ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কায়েমী স্বার্থ তথা আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা সরকারকেই দায়ী করতে চাই। এব্যাপারে আরও দায়িত্ব জ্ঞানহীন অপপ্রচারের নমুনা হল ঃ "ইঞ্জিনীয়ারের ধর্মঘটের সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে "দু ডজন ইঞ্জিনীয়ারের পদোন্নতি।" গত চুয়াত্তর সালের মে মাসে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ যখন বেশ কিছু ইঞ্জিনীয়ারদের পদোন্নতি ঘটাবার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন তখনই ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশন এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। কারণ এসোসিয়েশনের স্পষ্ট বক্তব্য হল ঃ নীচের তলার সঙ্গে সংগতিবিহীনভাবে ওপর তলায় কিছু পদ সৃষ্টি করা কাজের কখনও সহায়ক হতে পারে না। এই বক্তব্য নিয়ে এসোসিয়েশন গত পয়লা জুন ও তেসরা জুলাই বিদ্যুৎ মন্ত্রী বরকৎ সাহেবের সংগে দেখা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার হস্তক্ষেপের জন্য। তিনি তখন হস্তক্ষেপ করতে রাজী হন নি। সুতরাং "দু ডজন" ইঞ্জিনীয়ারের পদোন্নতি মন্ত্রীর জ্ঞাতসারেই হয়েছে। এবং এসব ইঞ্জিনীয়াররা কখনই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন নি, বরং বিরোধিতা করেছেন।

বিদ্যুৎমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে দুবেলা অভিযোগ করছেন, "পর্ষদ রাজ্য সরকারের নির্দেশ মানছেনা।" কিন্তু গত বছরের পঁচিশে এপ্রিল ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশন পর্ষদ কর্তৃপক্ষের সংগে রাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছিল, সে চুক্তির মূল শর্তাবলী কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে বলা হল রাজ্য সরকারের মুখ্য সচীবের গত বছর তেসরা মে তারিখে প্রচারিত নির্দেশনামা অনুসারে।

আরও পাঁচ কোটী টাকা পর্ষদের পাওনা আদায় বাকী রয়েছে! এ ব্যাপারে হিসেব পত্র খতিয়ে দেখলে ভাল হয়। বছর বছর অডিট রিপোর্টও ছাপা হচ্ছে। ১৯৫৫ সাল থেকে বকেয়া হিসাব চলে আসছে, কিন্তু সত্যিই কি পাঁচ কোটী টাকা বাকী। পর্ষদের হিসাবের খাতা খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, আজ কালের মধ্যেই বকেয়া মাত্র এক দেড় কোটী টাকার পৌঁছেছে। এ নিয়ে গর্ব করছিনা। কিন্তু সত্য সংবাদ পরিবেশনে ক্ষতি কী?

জনৈক ইঞ্জিনীয়ার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ।

এম এল এর অন্যায়

দর্পণের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে, আলিপুর কেন্দ্রের এম এল এ ডাঃ কানাইলাল সরকার শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের (বাংলা বিভাগ) সহ শিক্ষক শ্রীনির্মলচন্দ্র মালাকারের সঙ্গে ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের সামনে বর্বরোচিত ব্যবহার করেন এবং বিদ্যালয় থেকে তাঁকে অপমান করে ও ভয় দেখিয়ে বের করে দেন। শ্রীমালাকার প্রথম থেকে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিদ্যালয়টি গত বছরের এপ্রিল মাসে অনুমোদন লাভ করে। অনুমোদনের পর শ্রীমালাকারকে বিতাড়িত করে সেই জায়গায় এম এল এ এবং কলকাতা দশ নং সার্কেলের এস আস নীলিমা চক্রবর্তীর প্রার্থীকে নিয়োগ করার অপকৌশল চলছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীমনোজকুমার মন্ডলকেও ভয় দেখানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ স্নাতক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা ও শিক্ষা বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে এস আই নীলিমা চক্রবর্তীর অপসারণ দাবী করেন। এম এল এ অন্যায় স্বীকার না করলে শিক্ষক সংগঠন সমূহ আন্দোলনে নামবে বলে ঘোষণা করা হয়।

সংস্কৃতসেবীদের অনশন

গত দোসরা এপ্রিল থেকে চোদ্দ দফা দাবীর ভিত্তিতে সংস্কৃত ভাষা সেবি পন্ডিতরা এসপ্লানেড ঈস্টে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন শুরু করেছেন। তাঁদের দাবীর সমর্থনে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও অনশনে অংশ গ্রহণ করছেন। অনশনরত ছাত্র এবং শিক্ষকরা জানিয়েছেন যে, অবিলম্বে তাদের দাবী না পূরণ হয় তবে পচাশি বছরের বৃদ্ধ মহাকবি শ্রীজিব ন্যায়তীর্থ মহাশয় আজীবন অনশন শুরু করবেন। তাদের মূল দাবী ঃ প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য করতে হবে।

কয়লাখনিতে নিরাপত্তার অভাব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনিগুলিতে বর্তমানে নিরাপত্তার একান্ত অভাব। গত দু বছরের কয়লা খনিতে শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ যে, জুপিটার কোলিয়ারী ও কুজরা কোলিয়ারীতে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বি সি সি এল-এর জন্য। কোল মাইনস অফিসারদের সমিতিও সেফটি রুল না মানার ঘটনার কথা বলেছে। ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীরাম গোয়েঙ্কাও একই সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁদের বার্ষিক সভায়। ন্যাশনাল কোল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন মাসে মাসে কয়েক কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে। হাজারিবাগ গিরিডিতে দুর্ঘটনা চুরি জুয়াচুরি ও যুব কংগ্রেসীদের হামলার জন্য যে ক্ষতি হচ্ছে তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকে ডি মালব্যও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা বলেছেন।

নাট্যাভিনয়

থিয়েটার কমিউনের স্বদেশী নকসা

(দর্পণের সমালোচক)

ইংরাজের অনুরাগী সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের গর্ভ থেকে লোকঠকানো স্বাদেশিকতার বাণী মুখে নিয়ে যে সব জাতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল আজকের শাসকগোষ্ঠী তাদেরই উত্তরাধিকার। আজকের রাজনৈতিক জীবনে হানাহানি, আত্মকলহ এবং রক্তক্ষয়ী বীভৎসা যেখানে পৌঁছেছে, তার শিকড় অনুসন্ধানের জন্য ইংরেজ আমলের 'বাবু সংস্কৃতির' পটভূমিকে আশ্রয় করেছেন নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'স্বদেশী নকসা' নাটকে। প্রযোজনা করেছেন থিয়েটার কমিউন।

হাটুরে আর পাঁচটা নাটক থেকে এ নাটকটি আলাদা নাট্যকারের লেখনীর গুণে। প্রযোজনা প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছোয়নি। নাটকের প্রতিটি সংলাপ, নাট্য মুহূর্ত অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত এবং সম্ভাবনাময়। ফলে মূল রচনাটির প্রতি প্রযোজকদের একটু বেশীই মমতা থাকতে পারে। কিন্তু মঞ্চানুবাদের সময় নিক্তমাপা সম্পাদনার জন্য যে শৈল্পিক নির্মমতার প্রয়োজন হয়, নির্দেশক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত সে কাজে পুরোপুরি সফল হননি। ফলে ধনাঢ্য বাবুটির অতিমাত্রায় বিষাদ বেদনা, এবং যমজ ভাই দুটির অন্তর্কলহ দর্শকের ভাললাগার নির্দিষ্ট মাত্রাটিকে ছাড়িয়ে যায়।

নাটকে প্রহসনের যা চিরাচরিত রীতি তার সবগুণগুলিই এই নাটকে ছিল ; এ কালের আধুনিক প্রহসন হিসেবে খুব ভাল একটি নাটকই থিয়েটার কমিউন পেয়েছেন, তাকে সফল করার জন্য আরো ভাবনা দরকার।

প্রশান্ত ভট্টাচার্যের সংগীত প্রয়োগ দক্ষতার গুণে প্রযোজনার মর্যাদা বাড়িয়েছে। অন্তত গানের জন্য যেখানে সেখানে গান ব্যবহারের ঝোঁক এ নাটকে নেই। মঞ্চসজ্জার জন্য বিশেষ প্রশংসা করতে হয় দেবাশীষ মজুমদারকে। খুব সামান্য উপকরণে শুধু কিছু আইডিয়াকে মূলধন করে তিনি যে মঞ্চ রচনা করেছেন তা এমন তরুণ বয়স্কের কাছে দুর্লভ। কিন্তু গায়ক দলের গান গাইতে আসা এবং দৃশ্যান্তর ঘটানোর জন্য মঞ্চের আসবাব সরানোর যে রীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা দর্শকদের মধ্যে নাট্যরস সঞ্চারে ছন্দ-পতন ঘটাবে বলে মনে হয়। সময় ও পরিবেশের গুরুত্ব না দিয়ে গায়ক দলের মঞ্চে আবির্ভাব, আবার পরের দৃশ্যেই পোষাক পাল্টানো কেমন যেন অনেকটা 'থিয়েটারী নিয়ম মেনেও মানছিনা'র মতো। অভিনয়ে সুব্রত ভট্টাচার্য আংশিক সফল হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সব সংলাপ উচ্চারণ এবং অভিব্যক্তি নাট্য কাঠামোর (স্ক্রিপ্ট) সমস্ত রসটি নিংড়ে নিতে পারে না। যমজ দু ভাইয়ের অভিনয়কে আরো মার্জিত করে নিলে প্রযোজনাটির সাফল্যের দিক থেকে একটি বড় কাজ করা হবে।

সৃজন : মা

কলকাতার নাট্যামোদী দর্শকরা যে নাটকের জাত—বিচারে কত সচেতন তার প্রমাণ নূতন করে মিলল গত ১লা এপ্রিল, 'রঙ্গনা' নাট্যমঞ্চে 'সৃজন' প্রযোজিত গোর্কির 'মা' নাটকের অভিনয়ে। দর্শক পরিপূর্ণ হলঘরটি 'সৃজন'-এর সংগঠন নৈপুণ্যের নিশ্চিত সাক্ষ্য। অভিনয় নৈপুণ্যের বিচারেও তারা প্রত্যাশিত ভাবে সার্থকতা লাভে সমর্থ হয়েছেন —দলগত অভিনয় গুণে।

গোর্কির মহান সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে 'মা'-এর নাট্যরূপ কলকাতার নাট্য রসিকদের কাছে নূতন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তবু 'সৃজন' প্রযোজিত নাটকের নাট্যরূপদানে বিষ্ণু চক্রবর্তীর সার্থকতার সঙ্গে কাজটি করেছেন বলা যায়। নির্দেশক—অভিনেতা জ্যোতিপ্রকাশ নাটকটির অবশিষ্ট ছাড়া ছাড়া; ছড়ানো, প্রলম্বিত ভাবটাকে আরেকটু নাট্য রসঘন করে তুলতে প্রয়াসী হলে 'মা' নিঃসন্দেহে 'সৃজন'-এর শ্রেষ্ঠ একটি প্রযোজনা বলে দর্শকদের স্বীকৃতি লাভে ধন্য হবে।

মঞ্চসজ্জা, প্রেক্ষাপট রচনা এবং সুরারোপ ও শব্দ সংযোজনায় পরিমিতি বোধে নাটকটি আকর্ষনীয় হয়েছে। একক অভিনয়ে মাঝে মাঝে লক্ষনীয় আড়ষ্টতা অপনোদনে তৎপর হলে, অনুশীলন ও অনুভবে গভীরতর হলে 'সৃজন'-এর দলগত সুনাম বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে।

বিপ্লবোত্তর চীনা সাহিত্য

(দর্পণের সমালোচক)

পুঁজিবাদী বা উপনিবেশিক দেশের সাহিত্যের প্রতি যারা অভ্যাসবশত অনুরক্ত তারা চীনা সাহিত্য, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা তার পরবর্তী সাহিত্যকে কখনই শ্রদ্ধা করতে পারবেন না, কারণ যথার্থ দেশপ্রেমিকের ঋজুতা, বিপ্লবী আদর্শ এবং দেশের ব্যাপক কর্মকাণ্ড ও তার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিই চীনা সাহিত্যের ভিত্তি। তাই তথাকথিত পেশাদারী সাহিত্যের কলমের চাইতেও সংগ্রামী অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ একজন কৃষক কিংবা ফৌজী সৈনিকের কলম কম ধারালো নয়। গুণগত তারতম্য অশ্রদ্ধা না করেই চীনে সর্বক্ষেত্রে সকলের অবাধ প্রবেশ।

কিছু তরুণ শ্রমিক, কৃষক, গণফৌজের সৈনিক এবং বুদ্ধিজীবীদের ছয়টি বাছাই করা গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে "চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গল্প" (৬.৫০ পঃ)। বিশেষ করে 'বীজ' 'বুড়ো পাহারাদার' গল্প দুটি অসাধারণ। অতিমাত্রায় সোচ্চার না হয়েও আদর্শনিষ্ঠ। সংগ্রামী আদর্শের সেই নিষ্কলঙ্ক চোখ আর মন যাদের আছে, তাদের হাতে এই গল্প গ্রন্থটি অনন্য উপহার।

নর্ম্যান বেথুন

মাও সে তুংয়ের ভাষায় : "প্রত্যেক কমিউনিস্টেরই তাঁর (বেথুন) কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।" বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োজিত এমন একজন চিকিৎসক ব্যক্তিত্ব বিপ্লবী জনগণের কত গভীর বন্ধু ও সহোদর তার পরিচয় মেলে 'ক্ষত' নামে বেথুনের একটি রচনা ও কিছু উদ্ধৃতি এবং মাওয়ের একটি সংক্ষিপ্ত রচনা সম্বলিত পুস্তিকা থেকে। নাম : ডাঃ নর্ম্যান বেথুন (০.৫০ পঃ)।

নির্বাচনী বিতর্ক

"ভারতের কমিউনিস্টদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ প্রসংগে" যে বিতর্ক দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে উত্তাপ সৃষ্টি করেছে, তার নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় দিককেই গুরুত্ব দিয়ে সুদিন সেন (পরিবেশক, লেখা ও রেখা। দাম : এক টাকা) যে পুস্তিকাটি সম্প্রতি প্রণয়ন করেছেন তার মূল্য অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে বহুমত প্রচলিত থাকলেও তার মার্কসবাদী ভিত্তি এবং প্রয়োগকর্মে বৈপরীত্য ইত্যাদি বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণের সঙ্গে যে আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে নির্বাচন প্রেমিক নেতারা যেমন বিচলিত বোধ করতে পারেন, তেমনি নির্বাচনী বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের কাছেও তা বেশ প্রেরণাদায়ক। লেখকও মার্কসীয় বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য মন্তব্য এড়িয়ে যান নি। অপ্রিয় হলেও সে মন্তব্য অনেককে ভাবিয়ে তুলবে সন্দেহ নেই।

মানুষের অধিকারে

'বিনিপাত' 'কংগ্রেসী শাসনে বুদ্ধিজীবী' এবং 'পেশাদার বিপ্লবী কর্মী' এই তিনটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ নিয়ে একটি পুস্তিকা 'সময় স্বদেশ মনুষ্যত্ব' (১.২৫ পঃ) প্রণয়ন করেছেন অরবিন্দ পোদ্দার। একজন বামপন্থী চিন্তাবিদের চোখ দিয়ে দেখা আজকের দুঃসময় একটু আবেগাপ্লুত ভঙ্গীতে প্রকাশিত। রচনা তিনটি মনুষ্যত্বের স্বপক্ষে এক প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ। এই পুস্তিকাগুলির পরিবেশক বুকমার্ক।

গরম বাড়ছে ঃ বিদ্যুতের অব্যবস্থাও চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বৈশাখের শুরু। গরম এখন বাড়তির দিকে। এবার কলকাতার বিদ্যুৎ পরিস্থিতি কি অবস্থায় থাকবে তা কিছুই হলফ করা বলা যায়না। সাম্প্রতিক কালের দু একদিনের লোডশেডিং সকলকেই ভাবিয়ে তুলেছে। পনেরো শতাংশ বিদ্যুৎ ছেটে নেওয়ার পরও এ বিপর্যয় রোধ করা যায়নি। এই ছাঁটাইয়ের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

নিয়ন্ত্রাদেশ তুলে দিলে কলকাতায় স্বাভাবিক ভাবে গরমের সময় বিদ্যুতের প্রয়োজন ৬১০ মেগাওয়াট। সি ই এস সির নিজস্ব উৎপাদন ২৩০ মেগাওয়াট। অন্যদিকে ডি ভি সি ও ডি পি এল থেকে পাওয়া যাচ্ছে ১৮৫ মেগাওয়াট। এছাড়া ডি ভি সি থেকে সি ই এস সি সরাসরি বিদ্যুৎ নিচ্ছে আরও ১১৫ মেগাওয়াট। সর্বসাকুল্যে ৫৩০ মেগাওয়াট। তবু সান্ধ্যকালীন চূড়ান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে বিদ্যুতের চাহিদার তুলনায় এ পরিমাণ অনেক নীচে। সুতরাং এবার গরমেও নিশ্চিন্ত থাকার কোন গ্যারান্টি নেই।

এছাড়া সরবরাহকারী সংস্থাগুলির প্রতিশ্রুতি মত মূলকেন্দ্রে যথাসময়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে না পারা এবং যান্ত্রিক গোলযোগ যে কোন মুহূর্তেই অবস্থা ঘোরালো করতে পারে। অন্যতম বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা ডি পি এল-এ যে বড় রকমের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে একথা চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী আবু বরকত গণি খান চৌধুরীর কাছে প্রেরিত একপত্রে স্বীকার করেছেন। নির্দিষ্ট চুক্তির বাইরে আকস্মিকভাবে ডি পি এল থেকে ব্যাণ্ডেলের কখনও কম কখনও বেশী বিদ্যুৎ গ্রহণের জন্য এক বড় রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য ডি পি এল-এর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলেও আবেদিন সাহেব জানিয়েছেন। ডি পি এল এবং ডি ভি সি দু জায়গাতে কুয়েলের খরচ দু রকম হওয়ার দরুণ ডি পি এলকে বছরে ৩০ লক্ষ টাকা ওনাগার দিতে হতে পারে।

খাদ্য আন্দোলন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

তুলিতে পারে। সেই কারণে উপরে যাহাতে কেহ যাইতে না পারে তজ্জন্য উপরে যাইবার সমস্ত সিঁড়ির ফটকগুলি চাবি দিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক ফটকের বাহিরে পুলিশ প্রহরা রাখা হয়।" (বসুমতী/১-৯-৫৯)। আসলে এ হল অপরাধীর মনস্তত্ত্ব। বিসৃষ্ট অপরাধবোধই তার মনে ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ আতঙ্কের জন্ম দেয়।

(ক্রমশঃ)

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :
৬১, মদ্ধ লেন, কলি-১৩

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতীয় মুক্তির জোয়ার

● ● চাণক্য সরকার

আন্তর্জাতিক রাজনীতি নতুন মোড় নিতে চলেছে। ইন্দোচীনের তিরিশ বছর ব্যাপী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জয় আসন্ন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ইন্দোচীনের ছোট্ট তিনটি রাষ্ট্রের মূলতঃ কৃষক প্রধান অধিবাসীর মুক্তি আকাঙ্খাকে ব্যাপক হত্যা ও মারণাস্ত্রের মাধ্যমে দমাতে পারে নি।

ইন্দোচীনের মুক্তি সংগ্রামের জয় ইতিমধ্যেই বিশ্বের জনমনে গভীর দাগ কেটেছে। ভারতের পূর্ব দিকে নতুন চেতনার উন্মেষে ও সংগ্রামের নতুন সংগঠন গড়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অবশ্যই অনুভূত হবে।

ইতিমধ্যেই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থাইল্যান্ডে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে মার্কিন সৈন্য, বিমানবাহিনী ও অস্ত্রসম্ভার অপসারণের দাবীতে। সারা বিশ্বে আজ হতচকিত পূর্বাঞ্চলের এই আপাতঃ পশ্চাদবর্তী দেশসমূহে গণজাগরণের ব্যাপকতা এবং মরণপণ সংগ্রামের তীব্রতা দেখে।

দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারছে যে গণ-বিরোধী রাষ্ট্রশক্তি শুধুমাত্র অস্ত্রের সাহায্যে মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করতে পারবে না। মানুষের মুক্তির আকাঙ্খাকে প্রচন্ড শ্রেণী সংগ্রামে রূপান্তরিত করার বৈজ্ঞানিক দর্শন ও তার সঠিক প্রয়োগ আজ বিভিন্ন দেশের মেহনতী মানুষের করায়ত্ত।

ইন্দোচীনের মুক্তিযুদ্ধের জয় আর একবার প্রমাণ করল যে, মার্কিনী নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত দেশের মুক্তিযুদ্ধের কাছে পরাজয় স্বীকারের আগে হত্যা ও ধ্বংসের বন্যা বইয়ে দেবে। সংগ্রামী মানুষকে ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতি ইঞ্চির জন্য দুর্ধর্ষ সংগ্রাম করতে হবে।

ইন্দোচীন মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে আজ পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকার উপনিবেশ থেকে এবং এমন কি নিজ দেশ থেকেও হটে গেছে। মনে রাখা দরকার সুদূর আফ্রিকার বিভিন্ন ঔপনিবেশ ইন্দোচীনের গেরিলা সৈনিকেরা ওখানকার মুক্তিসংগ্রামীদের শিক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। এ শিক্ষা শুধু অস্ত্র ব্যবহারের নয়, এ শিক্ষা সংগ্রামী গণসংগঠন গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করেছে।

সাম্রাজ্যবাদ বরাবর বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামকে দুর্বল করার চেষ্টা করে নানা কৌশলের মাধ্যমে। প্রাথমিক কৌশল হল। সংগ্রামী শ্রেণীসমূহের ব্যাপক ঐক্য প্রয়াসে নানা বিভ্রান্তির চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিশাল অর্থশক্তি কাজ করে যে কোন দেশে উগ্রবাম ও কট্টর দক্ষিণপন্থীদের মদত দেওয়ার জন্য। ভিয়েতনামেও একই কৌশল ওরা প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু ও দেশের নেতৃত্বে ছিলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা কমিউনিষ্ট হো চি মিন, যিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন এবং সংগঠন কৌশল নিজ দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এই কৌশলের মাধ্যমেই ওদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী শরিক হয়েছে, কিন্তু সংগ্রামী নেতৃত্ব থেকেছে কৃষক ও শিল্প শ্রমিকদের দলের হাতে। কট্টর দক্ষিণপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী হত্যা ও উগ্রবামপন্থার ধ্বংস সন্ত্রাস ইত্যাদি নানা বিভ্রান্তির সক্রিয় চেষ্টা করেছে মার্কিনীরা আর তাদের তাঁবেদার স্থানীয় দালালরা। কিন্তু ওদেশের কমিউনিস্টরা প্রমাণ করতে পেরেছে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ দর্শন হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

মুক্ত ইন্দোচীন, থাইল্যান্ড এবং ব্রহ্মদেশ অনতিবিলম্বে চীনের দক্ষিণে এবং ভারতের পূর্বে এক বিরাট শক্তি সমাবেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। ইতিহাসের এই অমোঘগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা হলেও মুক্তি আন্দোলন তার নিজের পথ নেবেই।

ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে এর প্রভাব পড়ছে। এই প্রভাব হয়ত এখনও সম্যকভাবে অনুভূত হয় নি। মানুষের মনে কিন্তু নতুন আশার সঞ্চার হচ্ছে।

পশ্চিম ইউরোপে ইন্দোচীনের মুক্তি সংগ্রামে মার্কিনীদের শোচনীয় পরাজয় নতুন রাজনীতির জোয়ার এনে দিয়েছে। পর্তুগালে আজ কমিউনিষ্ট পার্টি সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। দলের সর্বোচ্চ নেতা কুনহাল আত্মপ্রকাশ করে ঘোষণা করেছেন যে, কমিউনিষ্টদের সংগঠন হঠাৎ একদিনে শক্তিশালী হয় নি। বীভৎস সন্ত্রাসের মধ্যেও কমিউনিষ্টরা আত্মগোপন করে কৃষক শ্রমিক এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে নিরলস কাজ করে গেছে। দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচীর ভিত্তিতে কমিউনিষ্টদের সাংগঠনিক কাজের ফলে সৈন্যবাহিনীতে তরুণ অফিসারদের এক বিরাট অংশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে হটিয়ে একটি সংগ্রামী সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। নানা ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই সরকারের পতন ঘটানোর জন্য যেমনটি হয়েছিল চিলীতে।

ইতালিতেও কমিউনিষ্ট পার্টি অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে যৌথ সরকার গঠনে আহ্বান জানিয়েছে। ওদেশের সর্বোচ্চ কমিউনিষ্ট নেতা বার্লিঙ্গার বলেছেন যে, একক দল হিসেবে কমিউনিষ্ট পার্টি ইতালিতে সবচেয়ে শক্তিশালী। আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্টরা অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সরকার গঠনে সক্ষম।

স্পেনেও ছাত্র ও শ্রমিকদের ফ্রাঙ্কো-বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা বেড়েছে। পশ্চিম ইউরোপের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তিসমূহ বিশ্ব রাজনীতির নানা টানাপোড়েনে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনী থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

সর্বত্রই আন্দোলন নতুন মোড় নিয়েছে। এমন কি ভারতেও। কে ভেবেছিল জনপ্রিয়তার উত্তাল তরঙ্গের শিখরে অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বর্তমান পরিণতির কথা। আন্দোলনের সমানে আজ প্রধানমন্ত্রীকে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে। এক বছর আগেও বিশাল রেল কর্মচারী ও শ্রমিক আন্দোলনকে ব্যাপক সন্ত্রাসের মাধ্যমে চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে পারে। আজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সংগ্রামী দর্শনের সঠিক প্রয়োগে সেই ঐক্য মজবুত করাই আজকের প্রাথমিক কর্তব্য।

রঙ্গদর্শন

সবুজ বিপ্লবের মহিমা

কল্যাণ ঘোষ

কংগ্রেস সরকার এবং তাঁদের কৃষি দপ্তর যে 'সবুজ বিপ্লবে'র কথা বলে এত গর্ব করেন, তা থেকে কাদের লাভ হয়েছে? লাভ হয়েছে ধনী কৃষক এবং জোতদারদের। যে সব কৃষক সাড়ে সাত বিঘে বা তার কম জমির মালিক তাদের লাভ হয়নি। এই তথাকথিত 'সবুজ-বিপ্লবে' শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে সেই সব জমিদার শ্রেণীর লোকদের যারা নামে বেনামে আইনের ফাঁকে বহু বিঘে জমির মালিক। তারা নিজেদের জমিতে সেচের জন্য টিউবওয়েল বসিয়েছে, পাম্প বসিয়েছে, বেশী ফলনশীল উন্নত বীজ ব্যবহার করছে এবং কোথাও কোথাও ট্রাক্টর, কলের লাঙল বা পাওয়ার টিলার লাগিয়ে মজুর খাটিয়ে চাষ করছে। বলা বাহুল্য যে এ সবই চলছে সরকারের 'সবুজ বিপ্লবের' দৌলতে। আবার এরাই গ্রামের মহাজন, সুদখোর। এরাই গরীব চাষীর জমি দেনার দায়ে কিনে নেয়। তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে আগাম দাদনের দায়ে বাঁধা মজুরে পরিণত করে। গ্রামাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা শুরু করে দিয়েছে এই সব সরকারী সাহায্যপুষ্ট জোতদারেরা। এরাই গ্রামাঞ্চলের মোড়ল মাতব্বর। এরাই গ্রামে কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্তম্ভবিশেষ।

এই সব ধনী জোতদারদের দখলে দেশের মোট জোত জমার এক-তৃতীয়াংশের বেশী। দেশের শতকরা ৫৪ ৫৫টি পরিবারের হাতে চাষের মোট জমির বারো-তেরো ভাগের এক ভাগ জমি আছে। এদের ভেতরেও এক তৃতীয়াংশ পরিবারের হাতে যে জমি আছে তাতে কোন চাষ করা সম্ভব নয়। দেশের ছোট জোতের মালিক এবং ভূমি-দরিদ্র আধা-মজুর গরীব চাষীদের জমি-জমার পরিমান কত সে কথা মনে করলে দেশের বেশীর ভাগ কৃষকের দুরবস্থার কারণ নির্ণয় করতে বেগ পেতে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর গত ২৭ বছরে কৃষি ও জমিজমার ওপর নির্ভরশীল কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে তার একটু আলোচনা করা দরকার। বৃটিশের হাত থেকে কংগ্রেসের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভূমি বন্দোবস্ত এবং কৃষির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবর্তন হয়েছে, যথা— (১) পুরনো জমিদারী প্রথা এবং মধ্যসত্বের অবসান; (২) কৃষি জমির মালিকানার উপর একটা নির্দিষ্ট উর্ধ্ব-সীমা বা সিলিং বেঁধে দেওয়া; (৩) কৃষকেরা যাতে আধুনিক উন্নত প্রথায় চাষ করতে পারে তার জন্য সব রকম সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা।

কিন্তু এ সবের ফলে ছোট জমির মালিকদের লাভ হয়নি, বরং বেশী জমির মালিকদেরই লাভ হয়েছে। ছোট জমির মালিকদের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, তার কারণ দেশের বেশীর ভাগ চাষী হচ্ছে ভূমি-দরিদ্র গরীব চাষী। সারা ভারতের হিসেব ধরলে দেখা যায়, জোত-জমার মালিক এমন কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৬ কোটি ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষের জমির পরিমাণ এক একরের অর্থাৎ তিন বিঘের কম। এদের মধ্যে ৯০ লক্ষের জমির পরিমান দেড় বিঘেরও কম। বাকি ১ কোটি ৪০ লক্ষ পরিবারের হাতে জমির পরিমাণ এতই কম এবং তারা এত গরীব যে, তারা জমি চাষ করতে পারে না। আর অত কম জমি চাষ করলে চাষের খরচও ওঠে না।

এই সব অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিকারা আসলে, কৃষি-মজুর ভিন্ন আর কিছু নয়। নিজেদের কিছু থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যের জমিতে বাঁধা মজুর হিসেবে কাজ করে দিন চালায়। ওপরতলার ধনী জোতদারদের মধ্যে যাদের হাতে ৬০ বিঘে বা তার বেশী জমি আছে, দেশে তাদের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৫৮ হাজারের মত। এই সব জোতদারদের হাতে জোত জমার ৩৫—৩৬ ভাগ রয়েছে। জমির উর্ধ্ব সীমা বাঁধা থাকলেও কংগ্রেসী শাসনে আইনের ফাঁকে এবং ভূমি রাজস্ব বিভাগের একশ্রেণীর ঘুষখোর কর্মচারীর সাহায্যে নির্দিষ্ট সিলিং আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দুশো-পাঁচশো, হাজার বিঘে পর্যন্ত বেনামী জমি নিয়ন্ত্রণে রাখা জোতদারদের পক্ষে মোটেই অসুবিধে হয় না। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তর থেকে বাঁকুড়া জেলার ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মাসিক আয় সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার দিকে তাকালে আমরা বুঝবো যে ২৭ বছরের কংগ্রেসী শাসনে খেটে খাওয়া গরীব মানুষ আজ কোথায় এসে দাড়িয়েছে। রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তরের সচিব শ্রীডি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিসংখ্যান ডাইরেকটর ডঃ শ্রীমতী পারুল চক্রবর্তীর অনুসন্ধানে কিছুদিন আগে প্রকাশ পেয়েছে যে, বাঁকুড়া জেলার ভূমিহীন কৃষিমজুরেরা মাসে গড় পড়তা ৭ থেকে ৮ টাকার বেশী আয় করে না। ডঃ পারুল চক্রবর্তী বলেছেন—"এরা কী করে বেঁচে থাকে এবং বেঁচে আছে জানি না; ভারতেও ভয় হয়।"

এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ২৭ বছরের স্বাধীনতার পরিণতি অথচ সরকারের প্রচার যন্ত্র এ আখ্যা দিয়েছে "সবুজ বিপ্লব"।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

লক্ষ্মীকান্ত বসুর সিট মুখ্যমন্ত্রীর সান্ত্বনা পেল

দর্পণ

১৮শ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় আপাততঃ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা লক্ষ্মীকান্ত বসুর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছেন।

লক্ষ্মীবাবুর পদত্যাগের হুমকীতে দিল্লীরও টনক নড়ে। দেবকান্ত বড়ুয়া সিদ্ধার্থবাবুর কাছে লক্ষ্মীবাবুর ক্ষোভের কারণ জানতে চান। যদিও এব্যাপারে লক্ষ্মীবাবুর দেওয়া একটি প্রতিবেদন বড়ুয়া তখন পেয়ে গেছেন। দেবকান্তবাবু এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধার্থবাবু বুঝে যান যে, দলের নেতৃত্ব এখন কোনও রাজ্যে ডিফেকশনের ঝুঁকি নিতে চান না।

এর আগে লক্ষ্মীবাবু যখন সিদ্ধার্থবাবুর কাছে এব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিকার চেয়েছিলেন তখন তিনি এ ব্যাপারে গুরুত্বই দেন নি। তখন সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের গেজেট প্রকাশ হয়নি। লক্ষ্মীবাবু যখন দেখলেন গেজেটেও আগেকার অধিকারগুলিই রয়ে গেছে তখনই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন।

দিল্লীর মনোভাব জানার পরই

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

মুখ্যমন্ত্রীর পরোক্ষ নির্দেশে কাশীবাবুর সভায় হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুখ্যমন্ত্রীর পরোক্ষ নির্দেশই প্রাক্তন মন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্রের সভায় হামলা হয়েছে বলে বিজয় সিং নাহারের ঘনিষ্ট মহলের অভিমত। এই মহলের ধারণা কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় কাশীবাবুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচন্ড ঝগড়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই হামলা সংঘটিত হয়েছে।

মুখ্যত রাষ্ট্রমন্ত্রী ও নদীয়া জেলার প্রভাবশালী নেতা আনন্দমোহন বিশ্বাসের লোক জনেরাই মাঝদিয়া অনুষ্ঠিত কাশীবাবুর সভায় হামলা করে। কিন্তু এর পেছনে মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ না থাকলে আনন্দ বিশ্বাসের এত সাহস হত না।

কারণ কাশীবাবুর সঙ্গে আনন্দর বিরোধ বাহাত্তর সাল থেকেই। কিন্তু এ পর্যন্ত আনন্দর সাহস হয়নি সেই বিরোধকে সশস্ত্র আক্রমণের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার।

কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কাশীবাবুর তীব্র বাকবিতন্ডার পরেই কাশীবাবুর কৃষ্ণনগরের বাড়ী প্রায় জনা পঁচিশেক লোক ঘেরাও করে। কাশীবাবুর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অপমানকর আচরণের অভিযোগ তুলে এই ঘেরাওকারীরা কাশীবাবুর পদত্যাগ দাবী করে। এই ঘেরাও চলাকালীন অবস্থায় একটি পুলিশ ভ্যান থেকে জনৈক লোককে ক্যামেরা হাতে নামতে দেখা যায় যে এই বিক্ষোভের বেশ কিছু ছবি তোলে।

উনিশে এপ্রিলের সভায় যে একটা গন্ডগোল হবে সে খবর জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে ছিল। ডি এম এস ডি ও, এস পি প্রমুখ তাবড় তাবড় জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিনা বাধায় যে ভাবে হামলা ঘটতে দেওয়া হয়েছে তাতে বিজয়বাবুর সমর্থকরা নিঃসন্দেহ যে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্যই কোন ইঙ্গিত ছিল। এই হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, আর টি এ-র ভাইস চেয়ারম্যান ও কিছু সরকারী কর্মচারী জড়িত ছিলেন। পুলিশ জেনেশুনে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি।

নাহার গোষ্ঠীর অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর নিজ দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রকে হত্যা করছেন। বেছে বেছে তাঁর সমালোচকদের শায়েস্তা করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে পর্যন্ত কাজে লাগাচ্ছেন। তবে এই গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত তারা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন।

নাহার গোষ্ঠী যা বলেন নি, তা হল, একাত্তর সাল থেকে সিদ্ধার্থ রায় একই কায়দায় আরও ব্যাপক ভাবে রাজ্যের সি পি এম সহ বামপন্থী দলগুলোকে খতম করার চেষ্টা চালিয়েছেন। একা সি পি এমেরই প্রায় সাতশ-আটশ কর্মীকে খুন করা হয়েছে আর মিথ্যা মামলায় জেলে আটকে রাখা হয়েছে হাজার হাজার নিষ্ঠাবান কর্মীকে।

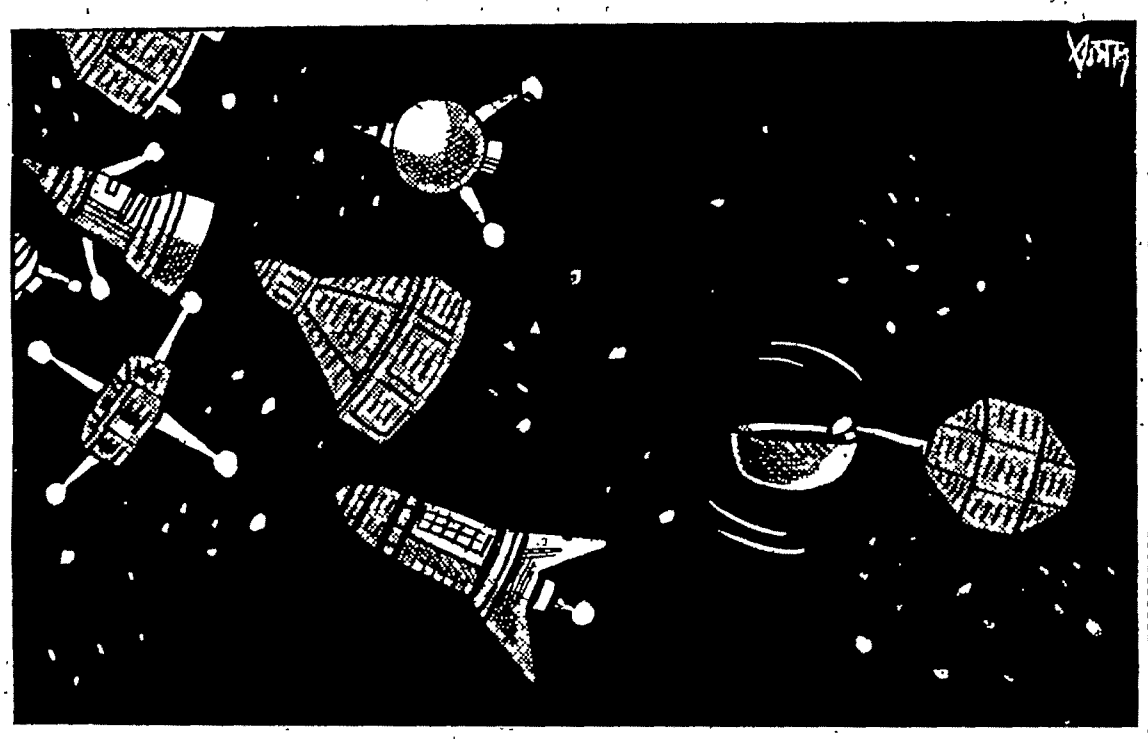

কংগ্রেসীদের বিরোধ অব্যাহত

ঐক্য শুধু কথার কথা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে তরুণবাবু-কেশববাবুর বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। নতুন সীমানা পুনর্বিন্যাসে কেশব ভট্টাচার্যের উত্তর চব্বিশ পরগণার নির্বাচনী কেন্দ্রের হের ফের হয়েছে। অপরদিকে কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও তরুণবাবুর কেন্দ্র শেষ পর্যন্ত ঠিকই রয়ে গেল। বিরোধের সূত্রপাত এখানেই।

গত সপ্তাহে কেশববাবু এরই প্রতিবাদে তরুণবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে শাসিয়ে বলে এসেছেন, আগামী নির্বাচনে কিভাবে জিতবেন দেখে নেব।

উত্তর চব্বিশ পরগণার মধ্যে বিধানসভা সদস্য কেশব ভট্টাচার্য এবং কান্তি চ্যাটার্জী তরুণবাবুর একান্ত প্রিয়ভাজন বলে পরিচিত। সুতরাং তরুণবাবু কেশববাবুর বিরোধে কংগ্রেসী রাজনীতিতে আর একটি গ্রুপ সৃষ্টি হতে চলেছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

নির্বাচন কেন্দ্র নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীতে আপস হয়েছে বলে একুশে এপ্রিল জানান হয়। এবং আঠারো জন এম এল এ-র নির্বাচন কেন্দ্রের কোন পরিবর্তন না করার জন্য সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশনের কাছে আবেদন জানান হবে বলেও প্রদেশ কংগ্রেসের ঐদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীদের মতে, কাশীবাবু-বিজয় সিং নাহারদের ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রী আপাততঃ একটা পাঁচ-আপ করলেন বটে। কিন্তু বিরোধ মিটবে না।

এদিকে লক্ষ্মীবাবুর এন এল সি সির বেলঘরিয়ার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি অনেককেই হতবাক করেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটিই মূল ট্রেড ইউনিয়ান সংস্থা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই লক্ষ্মীবাবু-সুব্রতবাবুর মধ্যে সাম্প্রতিক বোঝাপড়া হওয়ায় তিনি যুব-ছাত্র গোষ্ঠীকে হাতে রাখার জন্যই সম্ভবতঃ নতুন স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করলেন।

সবিনয় নিবেদন

আগামী লয়ই মে সংখ্যা থেকে আমরা দর্পণের দাম দশ পয়সা বাড়িয়ে পঞ্চাশ পয়সা করতে বাধ্য হচ্ছি। এ ছাড়া দর্পণের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষার কোন উপায় নেই। কংগ্রেস সরকারের অনেক ভন্ডামীর অন্যতম হল একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে লড়াই। এ লড়াই ছায়ার লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। যার জন্য অন্যান্য শিল্পের মত সংবাদপত্র শিল্পেও ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার নাভিশ্বাস উঠেছে। পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে প্রথম যা প্রয়োজন সেই কাগজ আজ অগ্নিমূল্য। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত নিউজপ্রিন্ট আজ দর্পণের মত ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের নাগালের বাইরে। ভারতের একমাত্র নিউজপ্রিন্ট কারখানা নেপা মিলের (বর্তমানে যে কাগজে দর্পণ ছাপা হচ্ছে) কাগজের দামও আকাশছোঁয়া। মজার কথা হল, যেখানে নিউজপ্রিন্টের দাম তিন গুণ বেড়ে গেছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের যে ছিটেফোঁটা বিজ্ঞাপন দেন সেই বিজ্ঞাপন আমাদের ছাপতে হয় প্রায় জলের দামে। সে ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি দিলেও কোন উত্তর মেলে না। অপরদিকে একচেটিয়া-বিরোধী শ্লোগানের মুখে ছাই দিয়ে বৃহৎ সংবাদপত্রকে আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি দামে বিজ্ঞাপনের সিংহভাগ দেওয়া হয়। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় পূজারী। তাই দর্পণকে কোন বিজ্ঞাপন দেন না। সরকারের কোন দপ্তরে অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত কোন সংস্থায় বিজ্ঞাপন চাইতে গেলে সভয়ে বলা হয়, "দর্পণে বিজ্ঞাপন? দিতে পারব না—আপনারা গবরমেন্টের বিরুদ্ধে লেখেন।" ভাবখানা এই, সরকারী টাকা যেন শাসক দল ও আমলাদের পৈত্রিক সম্পত্তি।

উনিশশো আটান্ন সালে প্রথম যখন দর্পণ প্রকাশিত হয় তখন থেকেই তার ওপর কংগ্রেস সরকারের কোপদৃষ্টি। সাধারণ মানুষের আনুকূল্যেই প্রায় কপর্দকহীন দর্পণ তার অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে। এবং ভবিষ্যতেও জনসাধারণই দর্পণকে বাঁচিয়ে রাখবে একথাও নিশ্চিত।

দর্পণ

১৮শ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা
শুক্রবার, ২৫শে এপ্রিল ১৯৭৫

মানুষের জয়যাত্রা

ইন্দোচীনে মুক্তিকামী মানুষের জয়যাত্রা সারা পৃথিবীর মানুষকে আশাবাদী করে তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল এবং একচেটিয়া পুঁজিপতি ও তার পৃষ্ঠপোষক মুৎসুদ্দিদের একাধিপত্যই শেষ কথা নয়, তারা ফ্যাসিবাদী কায়দায় জনগণের ওপর যতই দমন পীড়ন চালাক না কেন তার অবসান একদিন ঘটবেই—এই সার কথাটাই প্রমাণ হয়ে গেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।

ভারতবর্ষেও অরস্থার পরিবর্তন ঘটছে, হতাশার অন্ধকার অবসৃত হচ্ছে। মনে হয়েছিল সামরিক বাহিনী সি আর পি পুলিশ ও গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে কংগ্রেস সরকার চিরকাল বুঝি জনগণকে দাবিয়ে রাখতে পারবে। জনগণের মঞ্চে প্রচণ্ড অসন্তোষ থাকলেও নেতৃত্বের অভাবে তা দানা বাঁধতে পারবে না। কারণ সারা ভারতবর্ষে বামপন্থী নেতৃত্ব অত্যন্ত দুর্বল। পশ্চিমবঙ্গ কেরল ও অন্ধ্রে সেই নেতৃত্বকেও পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সন্ত্রাস ও গুণ্ডামী চালিয়ে। কিন্তু শাসক দল কংগ্রেস জানে না, সংগ্রামের তাগিদেই নেতা সৃষ্টি হন এবং জনগণের সংগ্রাম সব সময় যোগ্য নেতৃত্বের হাতে চলে যায়। আজ ভারতব্যাপী ইন্দিরা তথা কংগ্রেস বিরোধী হাওয়ায় নেতৃত্বের শূন্য পদে আসীন হয়েছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা নেই জনসংঘ আদি কংগ্রেস বা পিলু মোদিদের সঙ্গে জোট বেঁধে কংগ্রেস ও ইন্দিরার মত জনগণের শত্রু আর এক প্রতিক্রিয়াশীল দল বা নেতাকে বরণ করে নেওয়ার। জয়প্রকাশ বিশ্বাসঘাতকতা করলে নেতৃত্ব হারাবেন এবং তাঁর স্থান দখল করবেন যোগ্য নেতা। কারণ ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঘোরে না। জনগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করে শাসন ও শোষণের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

তাই শাসক দল ও তার নেতাদের বলতে হয় সমাজতন্ত্রের কথা, প্রতিক্রিয়াশীল ও ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হয় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। কিন্তু এই মেকী-সমাজতন্ত্রী ও প্রগতিশীলদের মুখোশ খুলে পড়তেও দেরী হয় না। তখন এদের উৎখাত করার জন্য জনগণের সংগ্রাম দুর্বার হয়ে ওঠে এবং এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই। ভারতে সেই সংগ্রাম চলছে।

হকারদের পুনর্বাসন সমস্যা

কল্যাণ ঘোষ

শহরের ফুটপাথ থেকে হকারদের হটানোর অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই উদ্যোগকে নাগরিকরা স্বাগত জানিয়েছেন। ফুটপাথ পৃথিবীর তাবৎ শহরে পায়ে চলার রাস্তা, কিন্তু কলকাতা শহরের ফুটপাথ নামেই রাস্তা, আসলে বাজার। সেখানে দোকানপাট, ঘরসংসার, নানা রাজ্যের যত বে-আইনী আস্তানা। পথ চলা দুঃসাধ্য, পদাতিকের স্রোত বাধ্য হয়ে যানবাহনের পথে উপচিয়ে পড়ে। তার ফলে দুর্ঘটনা এবং যানবাহন চলাচলে বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাছাড়া ফুটপাথের এইসব বে-আইনী আস্তানা এবং হাটবাজার নাগরিক জীবনের পক্ষে অস্বস্তিকরও বটে। অনেক হকারের ফুটপাথই ঠিকানা, সেখানেই তার হেঁসেল এবং সেখানেই তার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ। অনেকের ব্যবসা আবার নানা খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা। তাদের পরিত্যক্ত ফলের খোসা ইতাদি শহরের যত্রতত্র জঞ্জালস্তূপ গড়ে তোলে। এতকাল পৌরসভা আর পুলিশের প্রশ্রয়ে এইসব অনাচার চলছে বলেই চিরকাল চলতে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কলকাতার রাজপথ থেকে হকারদের উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবার পর কিন্তু নাগরিকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। শহরের ফুটপাথে এবং রাস্তায় চলবার উপায় ছিল না, এত দোকানপাট ও পসরার ভিড়। তাই অবারিত রাস্তা আর পায়ে চলার নির্দিষ্ট জায়গাটুকু দীর্ঘদিন পর মুক্ত দেখে পথচারীরা তো খুশি হবেনই। কিন্তু সমস্যা টিটো আর শুধু রাস্তা পরিষ্কার রাখার নয়। তাই হকার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই বিবেচক মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এই উৎখাত হওয়া মানুষগুলি যাবে কোথায়? তাদের জীবিকারই বা বিকল্প ব্যবস্থা কি হবে? রাস্তা থেকে বে-আইনী দোকানপাট তোলার চেষ্টা আগেও কয়েকবার হয়েছে। কিন্তু যখনই এতে হাত দেয়া হয়েছে তখনই এসেছে নানা ধরণের রাজনৈতিক চাপ যার ফলে সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্তে অটল থাকা সম্ভব হয়নি। দিনে দিনে হকারের সংখ্যা বেড়েছে।

বলা বাহুল্য, এদের অনেকেরই কোন প্রকার লাইসেন্স নেই। সরকার বা করপোরেশন কেউই এদের কাছ থেকে কোন অর্থ পায়না। পুলিশের নীরব সম্মতি না থাকলে ব্যাপার এতদূর গড়াতে পারে একথা আজ বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। "হপ্তা" নামে যে কথাটি চালু, অনেকেই মনে করেন এটা হকারদের কাছ থেকে কিছু আদায়ের একটি পুলিশী কায়দা মাত্র। একথা নিশ্চয়ই বলা যাবে যে, সরকার আইনানুগ পথেই পথ পরিষ্কার করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সরকারকে ভাবতে হবে হাজার হাজার হকারকে নিশ্চিত বেকারত্বের মুখে ঠেলে দিয়ে শুধুমাত্র পথচারীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করাই যথেষ্ট কিনা। ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। কারণ জীবিকাহীন মানুষ সমাজের বোঝা স্বরূপ এবং সরকারের দুশ্চিন্তার কারণও বটে।

হকারদের পুনর্বাসনের চিন্তা নিশ্চয়ই অবান্তর নয়। বেকার সংখ্যা দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অলিকায় নতুন বেকার যোগ হতে পারে। তবে কথা এই, কলকাতা শহরে আজ ক্রেতা যত, তার চেয়ে বেশি মনে হয় বিক্রেতা, এখানে নতুন দোকানের সুযোগ কি পরিমাণ আছে, সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। তবু হয়তো পুনর্বাসনের যথাসাধ্য চেষ্টা চলবে। কিন্তু স্বভাবতই অনেকে প্রশ্ন তুলবেন, কার পুনর্বাসন? ফুটপাথের দোকানীদের সামান্য অংশই স্থানীয় মানুষ। সেখানে অন্যরাজ্যের ভাগ্যান্বেষীদেরই ভিড় বেশি। তারা ভাগ্যের সন্ধানে দলে দলে কলকাতার দিকে ছুটে আসে, তারপর ফুটপাথ জুড়ে বসে যায়। পয়সা কড়ি যা পায়, মনি অর্ডারে দেশে পাচারকরে, অথচ প্রধানত তাদের জন্যই কলকাতার পথে জঞ্জাল এবং নগরের আজ অন্যরকম চেহারা। সুতরাং পুনর্বাসনের অর্থ, অন্য রাজ্যের ভাগ্যান্বেষীদের ঢালাও আমন্ত্রণ জানানো। তাই নগরের স্বার্থে রাজ্যের স্বার্থে পুনর্বাসনের প্রশ্নটি অন্যভাবে দেখতে হবে। আগে স্থানীয় হকারদের পুনর্বাসন, তারপর অন্যান্যদের। এটা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার কথা নয়, কলকাতার শ্রী ও স্বাস্থ্য ফিরাবার অন্যতম পন্থা হিসেবে ভাবতে হবে। সরকার হকারদের নাম ও পরিচয় বাছাই করলেই বুঝতে পারবেন, কারা প্রকৃত ফুটপাথের দোকানের উপর নির্ভরশীল, আর কারা বড়বাজারের বেনামদার।

বর্তমান সরকার নিজেদের গরীব মানুষের সরকার বলে ঘোষণা করেছেন। গরীবেরা এতদিন পেট চালাবার দায়ে আইন ভঙ্গ করেছে। মরিয়া হয়ে ভবিষ্যতেও তারা আইনভঙ্গ করতে পারে। কারণ যাদের পেটে ভাত নেই তাদের হারাবারও কিছু নেই। সুতরাং এই উৎখাত হওয়া হকাররা যাতে বেকার জীবনে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন, ফুটপাথ থেকে হকার সরানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে বিকল্প জীবিকার উপায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। আমরা যেন আরো কয়েক লক্ষ লোককে ভয়াবহ বেকারত্বের দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে না দেই।

মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাজ্যে চাকুরী ইত্যাদির ব্যাপারে রাজ্যের নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে এই নীতি চালু হয়নি। অনেকে দাবী করছেন ফুটপাথের হকারদের পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে স্থানীয়দের অগ্রাধিকারের সূত্রপাত করা হোক। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা। ফুটপাথে শুধু হকারাই কিন্তু ভিড় জমায়না। অনেক দেওয়াল-দোকানও ফুটপাথ দখল করে আছে। এই অভিযানে তাদের বাদ দেওয়া হলো কেন, এই প্রশ্ন আজ অনেকের মনে।

এই উৎখাত হওয়া হকারদের পুনর্বাসন কি ভাবে করা যায় সে নিয়ে আজ নানা মহলে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। সরকার পক্ষ থেকে "মিনা বাজার" এর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে মিনা বাজারে এ সমস্যার সমাধান তো হবেই না বরং বেড়ে যাবে। তাঁদের মতে অন্যান্য রাজ্যে হকারদের জন্য যে নীতি অনুসৃত হয়েছে এ রাজ্যেও সেই নীতি অনুসরণ করা হোক। পাটনা শহরের হকার মার্কেট, বোম্বাই মাদ্রাজ এবং অন্যান্য রাজ্যের মতই হকারদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট একটি হকার্স মার্কেট করা হোক।

নাট্যকর বৃদ্ধির প্রতিবাদ

রবীন্দ্র ভারতী অনুমো নাট্য সংস্থা সহ সকল অপেশা নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে পৌর বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত একুশে এপ্রি স্টুডেন্টস হলে "অভিনয়" পত্রিকা আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় কলকাতা ও মফঃস্বলের একশ তিরিশটি সংস্থার প্রতিনিধিরা মিলিত হন। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নাটক একাদেমীর সম্পাদক শ্রীঅসীম ঘোষ পৌরোহিত্য করেন। অযৌক্তিক নাট্যকর প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ঃ সর্বশ্রী দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ ধর, নেপাল মজুমদার, দেবকুমার ভট্টাচার্য, অমল রায়, কিশলয় সেন, অনিল দে, চিররঞ্জন দাস, শিশির সেন, কাঞ্চন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ কুণ্ডু, নির্মল সাহা অরুণ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষাল ও পি এল টি, রূপান্তরী, কিক্লোল ও থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রতিনিধিবৃন্দ।

এই সভায় দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বায়ক করে সতেরজন সদস্য সহ "নাট্যকর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি" গঠিত হয়। আগামী আঠাশে এপ্রিল বেলা চারটায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে একটি গণ-ডেপুটেশান পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আত্মসমর্পণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধার্থবাবু লক্ষ্মীবাবুর হুমকীকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। দিল্লী থেকে ফিরেই তিনি কলকাতার চার এম এল এ-কে ডেকে পাঠান পুলিশ মেসেজ দিয়ে। কাউকেই বাড়িতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীবারিদ-পঙ্কজ তখন বেলঘরিয়ায়। এন এল সি সি কনফারেন্সে। সোমেন মিত্র বেপাত্তা। বেলঘরিয়া থানার ও-সি কনফারেন্সে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মেসেজ ঐ তিন এম এল এ-কে পৌঁছে দেন।
পৌঁছে দেয়।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ রাইটার্সে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে তিন এম এল এ প্রবেশ করেন। তখন সেখানে উপস্থিত নূরুল ইসলাম। ওরা দেখলেন এ এক অন্য মুখ্যমন্ত্রী। যার কাছে অনেক অবিচারের অভিযোগ জানিয়েও কোন প্রতিকার হয় নি, সেই যেন এক্ষুণি সব প্রতিকার করে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।

লক্ষ্মীবাবুরা ঘরে ঢুকতেই মুখ্যমন্ত্রী বললেন ঃ লক্ষ্মী এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন। তোমার অভিযোগ পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনকে বলবো। এবং তোমাকে কথা দিচ্ছি এর একটা প্রতিকার হবে। কথা শেষ না হতেই লক্ষ্মীবাবু হুমকীর ঢঙে বলতে শুরু করেন, আপনি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিছুই রাখেন নি, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না।

যে মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় দলীয় এম এল এ-দের ফাইলের ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখেন। এমনকি এই লক্ষ্মীবাবুকেও একদিন ফাইলের ভয় দেখিয়েছিলেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবু নিঃশব্দে বেমালুম লক্ষ্মীবাবুর আক্রমণাত্মক কথাগুলো হজম করে গেলেন।

মুখ্যমন্ত্রী অনেক চেষ্টা করেছিলেন লক্ষ্মীবাবুকে বুঝিয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে কাগজে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু সফল হন নি। লক্ষ্মীবাবু সোজাসুজি বলেছেন কমিশনের চূড়ান্ত ঘোষণা দেখেই তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন, তবে মুখ্যমন্ত্রীর অনেক অনুনয়ের পর প্রিয় মুন্সীর বিরুদ্ধে আপাততঃ আর অভিযোগ তুলবেন না বলে কথা দিয়েছেন। তবে প্রিয় মুন্সীর বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ এনেছেন তা যে সঠিক তা প্রমাণ করার জন্য কমিশনের গেজেট খুলে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং সীমানার নির্দ্ধারিত ব্যাপারে ফয়সালা না করলে আবার প্রিয়বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন বলে জানিয়েছেন।

সতেরোই এপ্রিলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী খুব বেশী কথা বলেন নি। কেবল বলেছেন, "লক্ষ্মী তোমার সব দাবী মেনে নেব।" তুমি এনিয়ে আর চেঁচামেচি করো না। মোটে কথা লক্ষ্মীবাবুর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুখ্যমন্ত্রী তার কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জল ঘোলা না করে বিক্ষুব্ধদের দাবী মেনে নেবেন একথা কেউই বিশ্বাস করছেন না। তবে এই মহলের আশা সুব্রতর সঙ্গে এই গোষ্ঠীর বোঝাপড়া হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী চট্ করে কিছু নতুন প্যাঁচ কষতে সাহস পাবেন না।

কম্বোডিয়ার মুক্তিযুদ্ধ ও কয়েকটি শিক্ষা

সুমন্ত সেন

উনিশশো সত্তর সালের তিরিশে এপ্রিল মার্কিন সামরিক বাহিনীর দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমানা লঙ্ঘন করে জোট নিরপেক্ষ কাম্বোডিয়ায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধ শুরু হয়। ষোল বছর আগে জিনীভা চুক্তি প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধের উপর যবনিকা টেনে দেয় যে যুদ্ধে একদিকে ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং অপরদিকে ভিয়েতনাম লাওস কাম্বোডিয়া নিয়ে যে ভূখণ্ডের নাম ইন্দোচীন সেখানকার সমস্ত সংগ্রামী জনসাধারণ।

কাম্বোডিয়ায় মার্কিন অনুপ্রবেশ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ভিয়েতনামে প্রচণ্ড মার খেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তখন খুঁজছিল এমন একটি দেশ যেখানে দৃঢ়দণ্ড সুস্থির হয়ে বসে সে তার জনস্বার্থবিরোধী সংগ্রাম চালাতে পারে। কাম্বোডিয়ার উপর তার নজর অনেকদিনের। বহুবার ওয়াশিংটন চেষ্টা করেছে কাম্বোডিয়াকে দলে টানতে, তাকে সাউথ ইষ্ট এশিয়ান ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সিয়াটো) এর গোষ্ঠী ভুক্ত করতে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কাম্বোডিয়া তার গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা ত্যাগ করতে রাজী হয় নি। অবশেষে জোর করে উনিশশো সত্তর সালের তরিশে এপ্রিল কাম্বোডিয়া দখল করে নিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন।

কাম্বোডিয়ায় জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের নেতৃত্বে আছেন নরোডম শিহানুক। কে এই নরোডম শিহানুক, কী তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়? এই প্রশ্নের একটি সুন্দর উত্তর পাওয়া যায় মাও-সে-তুং-এর একটি উক্তির মধ্যদিয়ে। উনিশশো সত্তর সালে পিকিংয়ে মে দিবস উৎসবে চেয়ারম্যান মাও শিহানুককে বলেন, "আপনি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, কমিউনিস্ট হওয়ার সবরকম যোগ্যতা আপনার আছে।" মাও সে তুং-য়ের কাছ থেকে এত বড় প্রশংসা আশা করা যায় না। এই সময় শিহানুকের পিকিং প্রবাস সবে শুরু হয়েছে—এর মাস দেড়েক আগে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কাম্বোডিয়া সরকার অন্যায়ভাবে দখল করে নেয় দুই মার্কিন তাঁবেদার লন নল ও সিরিক মাটাক।

শিহানুকের সম্পর্কে মাও সে তুং-য়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটি হচ্ছে কাম্বোডিয়ায় কিছু উগ্রপন্থীদের আচরণ যার ফলে কাম্বোডিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী শক্তি পায় ও বাড়ে করে। ঘটনাটি এইরূপ ঃ

উনিশশো সাতষট্টি সালের আগস্ট মাসে পিকিংয়ে অবস্থিত চীন-কাম্বোডিয়া মৈত্রী সংস্থা তাঁদের নম পেন শাখার সদস্যদের উদ্দেশে একটি বার্তা পাঠান যাতে শিহানুককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুস্পষ্ট ইংগিত ছিল। এই খবর জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই শিহানুক ওই মৈত্রী সংস্থার নম পেন শাখা ভেঙে দেন। সঙ্গে সঙ্গে কাম্বোডিয়ার একশ্রেণীর মাওপন্থী বুদ্ধিজীবী চীৎকার করে ওঠেন যে শিহানুক দক্ষিণপন্থী হয়ে গেছেন। কিন্তু তিনবছর পরে যখন শিহানুক চীনে আশ্রয় নেন তখন চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই তাকে বলেন যে ঐ সংস্থা ভেঙে দিয়ে তিনি ঠিকই করেছিলেন কারণ ওই সময় চীনের বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হচ্ছিল কিছু উগ্রপন্থীর দ্বারা যার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের বিশেষ ক্ষতি হয়। ক্ষতি শুধু চীনেরই হয় নি ওই বার্তার সুযোগ নিয়ে কাম্বোডিয়ার মার্কিন প্রেমী জেনারেল লন নল সমস্ত বামপন্থী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন যার ফলে হাজার হাজার লোক নির্বাসনে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। ভারতীয় পাঠকের কাছে যারা নকশালী আন্দোলন, তৎকালীন পিকিং রেডিওর সমর্থন ও সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড পুলিশী অত্যাচারের খবর রাখেন তাদের কাছে এই ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য কম নয়।

কাম্বোডিয়া ১৯৫৪-১৯৭০

কাম্বোডিয়ায় ষোল বছরের পূর্ণ স্বাধীনতার ইতিহাস এক সংগ্রামের ইতিহাস। সংগ্রাম বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার তাঁবেদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণের। বর্তমানের মুক্তি সংগ্রাম ও শিহানুকের ভূমিকার রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে গেলে এই ষোল বছরের ইতিহাসের উপর চোখ বুলানো দরকার।

উনিশশো চুয়ান্ন সাল অবধি কাম্বোডিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী অথবা ধনতান্ত্রিক শ্রেণী বলতে কিছুই ছিল না। স্বাধীনতা উত্তর যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাস্তা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই শ্রেণীর সাড়া মেলে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে ঘটবে তা নিয়েও বিবাদ দেখা দেয়। পরবর্তীকালের তাঁবেদার গোষ্ঠী লন নল, সিরিক মাটাক, ইয়েম সামবর প্রভৃতি ছিলেন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বপক্ষে। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী শিহানুক এর বিরোধিতা করেন কারণ তিনি জানতেন যে কাম্বোডিয়ার মতন অনগ্রসর দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা গড়ে উঠতে দেওয়ার অর্থ পিছনের দরজা দিয়ে আবার ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকে ঢুকিয়ে দেওয়া। এর বদলে তিনি অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহায়তায় কাপড়, সিমেন্ট, কাগজ, রবারের সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রস্তুতকরক বেশ কয়েকটি শিল্প তৈরী করলেন। এককথায় বলতে গেলে বিদেশী পুঁজিকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত করার চেষ্টায় শিহানুক জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য পালনে উদ্যত হলেন। এইখানেই কাম্বোডিয়া সরকারের অন্যতম খুঁটি, লন নল (যার কব্জায় ছিল সেনাবাহিনী ও পুলিশ)-এর সঙ্গে তাঁর সংঘাতের সূত্রপাত।

কাম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ছিল শিহানুকের অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতির সমর্থক। কিন্তু লন নল ছিল তাঁদের শত্রু। এইখানেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ তাঁদের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধির সুন্দর পরিচয় দেন। লন নলের পুলিশের অত্যাচার এড়াতে এঁরা আত্মগোপন করেন এবং অপেক্ষা করতে থাকেন সেইদিনের জন্য যখন শিহানুক লন নলের দ্বন্দ্ব এমন এক পর্যায়ে আসবে যে শিহানুক হটে যেতে বাধ্য হবেন। সেইদিন যখন এল তখন কাম্বোডিয়ার বিপ্লবীরা শিহানুককে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনার জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তুললেন। যদি এঁরা ধৈর্যশীল না হতেন যদি দ্বন্দ্বের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তার সঠিক মূল্যায়ন না করতেন তাহলে হয়ত এঁদের হঠকারিতা বাধ্য করত শিহানুককে তাঁর শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কোলে আশ্রয় নিতে।

কাম্বোডিয়ার ইতিহাসে এই সময়কার ঘটনাগুলি অতি দ্রুত এবং নাটকীয় ভাবে ঘটতে থাকে। উনিশশো তেষট্টি সালে কিছু বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হঠাৎ "হারিয়ে" যান। এঁদের মধ্যে ছিলেন তিনজন অধ্যাপক, সন সেন, ইয়েঙ সারী এবং সালোত সার। এক বছরের মধ্যে এঁদের স্ত্রীরাও অনুরূপ ভাবে "হারিয়ে" যান এবং নম পেনে গুজব রটে যে এঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন। আসলে প্রতিরোধের ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যাঁরা নম পেন ছেড়ে লুকিয়ে পড়ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এঁরা। ঠিক এই একই সময় মার্কিন সি আই এ গঠিত "খমের সেরাই" নামক দালাল বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে শিহানুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

শিহানুকও বসে ছিলেন না। মার্কিন আক্রমণ যখন ভিয়েতনামে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে সেই সময় তিনি উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাকা করছেন। উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন শিহানুক এবং নিজ দেশে মার্কিন তাঁবেদার গোষ্ঠীকে খর্ব করার জন্য ব্যাঙ্ক আমদানী রপ্তানী ব্যবসা জাতীয়করণ করে ফেললেন। মৎসুদ্দী পুঁজিবাদের ধ্বজাধারী লন নল ও সিরিক মাটার উঠল ক্ষেপে।

তার শিহানুক বিরোধী চক্রান্তের সুবিধার জন্য এই সময় সিরিক মাটার বদলী সে আর পীকিংয়ে রাষ্ট্রদূত থাকতে পারছে না তাকে জাপানে বদলী করা হক। শিহানুক তার দাবী মেনে নিলেন। টোকিওতে গিয়ে সিরিক মাটাক সি আই-এর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করে।

উনিশশো ছেষট্টি সালের এগারই সেপ্টেম্বর কাম্বোডিয়ার সাধারণ নির্বাচন। মার্কিন সরকার দেখল এই সুযোগ। কাম্বোডিয়ার ধনিক শ্রেণীর মাধ্যমে তারা জলের মতন অর্থব্যয় করে চলল। জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তাদের মধ্যে জামাকাপড় ওষুধ মায় সিনেমার টিকিট পর্যন্ত বিলি হতে লাগল। এছাড়া ভীতি প্রদর্শনের জন্য লন নলের সেনাবাহিনী ত ছিলই। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে দক্ষিণপন্থীরা জাতীয় এসেমবলী দখল করে নিল।

এর দু বছর পরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন নিক্সন। তাঁর প্রথম ঘোষণা প্রমাণিত করল যে তিনি ভিয়েতনামে হার স্বীকার করে নেবেন না। নিক্সনের পরামর্শদাতারা তাঁকে বোঝায় যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে, যেমন কাম্বোডিয়া ও লাওস, মার্কিন নীতির সমর্থনকারী ভিয়েতনামের মুক্তি ফৌজকে রোখা যাবে না। কামবোডিয়ায় এর জন্য প্রয়োজন হল শিহানুককে সরানো।

উনিশশো উনসত্তরের আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী লন নল প্যারিসে গেল শরীর সারাতে তার দায়িত্ব ডেপুটি সিরিক মাটাকের উপর চাপিয়ে। ওই বছরের জুন মাসে নল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আবার স্থাপিত করে এবং সিরিক মাটাকের কাজ হল আগেকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা সংক্রান্ত আইনগুলি খারিজ করিয়ে "স্বাধীন অর্থনীতি" যাতে গড়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে বিদেশী পুঁজি আসার পথ সুগম করে দেওয়া। শত চেষ্টা করেও শিহানুক এগুলি রুখতে পারলেন না।

এই সময় কামবোডিয়ায় সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উপরও মার্কিন-সায়গন সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে লন নল-সিরিক মাটাক গোষ্ঠী নিজেদের ভাড়াটে লোক দিয়ে নম-পেনে অবস্থিত উত্তর ভিয়েতনামী ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের দূতাবাসগুলির উপর আক্রমণ চালায়। উদ্দেশ্য শিহানুকে সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা এবং তাঁকে ভয় দেখিয়ে দলে টেনে আনা। এর কোনটিই সাধিত হয় নি।

এর পরে এল উনিনশো সত্তর সালের আঠারই মার্চের জাতীয় এসেমব্লীর অধিবেশন। শিহানুক তখন বিদেশে। লন নল ঘোষণা করল যে শিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে কারণ তিনি কাম্বোডিয়ার জমিতে উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদের আস্তানা নিতে দিয়েছেন। এই ঘোষণার পিছনে একবর্ণও সত্য ছিল না এবং লন নল তা ভালভাবেই জানত। মাঝে মাঝে দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধরত জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সৈন্যরা কাম্বোডিয়ায় সরে আসতে বাধ্য হত কিন্তু তারা কখনো কোন কাম্বোডিয়র গায়ে হাতও দেয় নি। যে সাতশো কাম্বোডিয়ান গ্রামবাসী ওই সময় মারা যায় তারা সকলেই মারা যায় মার্কিন বোমাবর্ষণের ফলে।

জাতীয় এসেমব্লীর প্রতিটি সদস্যকে ভোটপত্র দেওয়া হল এবং বলা হল তাঁরা যে ভোটই দেন না কেন ভোটপত্রে নাম সই করে দিতে হবে। সর্বসম্মতিক্রমে লন নলের প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। শিহানুকের জায়গায় রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নির্বাচিত হল নম পেনে কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান কর্মকর্তা চেঙ হেঙ।

কাম্বোডিয়ার ইতিহাসে এক নতুন পর্যায় শুরু হল।

[১৯৭৩ সালের শারদীয় দর্পণে প্রকাশিত। কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে।]

বর্ধমানে সন্ত্রাস

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ধমান জেলার অনেক গ্রামেই এখন সন্ত্রাসের আবহাওয়া। মানুষের নিরাপদে চলাফেরার সুযোগটুকু পর্যন্ত নেই। সম্প্রতি সদর থানার হাজ গোবিন্দপুরে ধর্মদাস নামে এক গরীব স্বর্ণকারকে (বয়স তেত্রিশ) কংগ্রেসী গুণ্ডারা "চোর" আখ্যা দিয়ে তার "বিচারের" নামে যেভাবে খুন করল, তা সাম্প্রতিককালের একটি ভয়াবহ ঘটনা। কংগ্রেসীরা সমাজসেবার নামে ইদানীং নিরীহ ব্যক্তির সঙ্গে স্বার্থের বিরোধ ঘটলেই এমন "বিচার" করে বেড়াচ্ছে। ধর্মদাসকে খুন করার পর (উনিশে মার্চ) ওরা সেই রাত্রেই তার মৃতদেহ পুড়িয়ে দেয় এবং ঘটনা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর আগস্ট মাসে ঐ গ্রামেই এক মুসলমান যুবক (পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দা) পিচরাস্তা দিয়ে সাইকেলে যাবার সময় রাত্রে রহস্যজনকভাবে খুন হয়। অথচ নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের কেউই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বলে জানা গেছে।

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস : ১৯৫৯

দিলীপ মজুমদার

নবম পর্ব ॥

বহু প্রতীক্ষিত একত্রিশে আগস্ট।

বহু ঘোষিত একত্রিশে আগস্ট।

সরকারী প্রচারযন্ত্র কর্তৃক বহু-নিন্দিত একত্রিশে আগস্ট।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে তবু এসেছে মানুষ। মানুষ মানুষ। মনুমেন্ট ময়দানে অসংখ্য অগুনতি কালো মাথা। অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের হিসেবমত একত্রিশে আগস্ট মনুমেন্ট ময়দানে সমবেত হয়েছে প্রায় তিন লক্ষাধিক মানুষ। সকাল থেকে ট্রেনে বাসে ট্রামে এসেছে মানুষ। পুলিস বাধা দিয়েছে. আটকে রেখেছে হাওড়া ষ্টেশনে, ব্যর্থ করতে চেয়েছে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযান. কিন্তু অবিরাম বৃষ্টিপাত ও সরকারের এই প্রচণ্ডতম অবরোধকে অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার কৃষক এসেছে কলকাতায়। উত্তর ও দক্ষিণ শহরসীমায় গ্রাম থেকে আগত কৃষক-দের অভ্যর্থনার জন্য সে কী বিপুল উৎসাহ। পুলিসের সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিয়ে গ্রামের কৃষকের খাওয়া পরার স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা করে দেয় শহরের সমব্যথী মানুষ। ওদিকে তখন কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংসের মন্ত্রণাসভায় চলছিল জরুরী সভা. সিদ্ধান্ত হচ্ছিল : আজ জনসাধারণকে সরকারের রুদ্রশক্তির কিছুটা পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। লাঠি, রাইফেল. টিয়ারগ্যাস সজ্জিত এবং ঘোরসওয়ার বাহিনী সহ পাঁচ হাজার পুলিস রণসাজে সজ্জিত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গোনে।

কৃষকের পাশে এসে তখন দাঁড়িয়েছে শ্রমিকেরা; বিশ্ববিদ্যালয়ের সভার পর আট-দশ হাজারের এক বিরাট ছাত্র মিছিলও সমবেত হল মনুমেন্ট ময়দানে। শ্রীঅমর বসুর সভাপতিত্বে মনুমেন্টের সংক্ষিপ্ত সভায় শ্রীমোহিত মৈত্র. শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন, শ্রীরমেন ব্যানার্জী. শ্রীচিত্ত বসু. শ্রীমাখন পাল, শ্রীগৌরাঙ্গ সিংহ প্রমুখ বামপন্থী নেতারা বক্তৃতা করেন। বিকেল ছয়টা বাজার দু মিনিট পরে মনুমেন্ট ময়দান থেকে বের হল সুবিশাল মিছিল রাইটার্স বিল্ডিংস অভিমুখে। ছয়টা দশ মিনিটের সময় মিছিলের অগ্রভাগ রাজভবনের পূর্বদ্বারের অনতিদূরে পৌঁছলেই পুলিস বাহিনী গতিরোধ করে মিছিলের। পুলিস অবরুদ্ধ মিছিলের মানুষেরা বসে পড়ল সেখানেই। ধ্বনি দিতে লাগল, বক্তৃতা। সন্ধ্যে সাতটা পঁচিশ মিনিটের সময় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দকে সামনে রেখে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের একটি ক্ষুদ্র দল আইন অমান্য করে কারাবরণ করে। দ্বিতীয় আর একটি দল আইন অমান্যের জন্য পুলিস কর্ডনের ভিতর প্রবেশ করা মাত্র বিনা প্ররোচনায় অতর্কিতে পুলিস তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে। তারপর শুরু হয় নৃশংস বেপরোয়া দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য পৈশাচিক লাঠি চার্জ। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে থাকে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউই বাদ যায় না। প্রত্যক্ষদর্শী রিপোর্টারের ভাষায়—"কেহ মাটিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িলেন. একজনের দেহের উপর আর একজন, তারপরে আরও একজনের দেহ লুটাইয়া পড়িল. কেহ প্রচণ্ড ভীড়ে পদদলিত পিষ্ট হইয়া গেলেন. কাহারও মাথা ফাটিল. কাহারও পা ভাঙ্গিল, রক্তাপ্লুত অবস্থায় বহুলোক রাস্তার উপর পড়িয়া গেলেন।" একত্রিশে আগষ্টের ঘটনা সম্পর্কে সরকার পরদিন যে প্রেসনোট দিয়েছিলেন তার মূল কথা হল : দোষ জনতারই. তারাই প্ররোচনা সৃষ্টি করেছিল। পুলিস তার পবিত্র কর্তব্য পালন করেছে শুধু। —"জনতা সামনের দিকে আগাইয়া আসে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক পুলিসের প্রতি ইঁট. সোডার বোতল ও হাতবোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে পুলিস লাঠিচার্জ করিতে বাধ্য হয়।" অথচ. সরকারের এই বক্তব্যের সঙ্গে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের বিবরণ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে. এমন কি সরকারের অনুগত সংবাদসেবীরাও বিপরীত কথা বলছেন। প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের বিবরণ থেকে নিম্ন তথ্যগুলি প্রমাণিত হয় : (এক) জনতা "পুলিসের প্রতি ইঁট. সোডার বোতল. ও হাতবোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে" বলে পুলিস লাঠি চালিয়েছে—সরকারী প্রেসনোটের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। লাঠি চালাবার সময় জনতা শান্তিপূর্ণ ছিল। (দুই) জনতা শান্তিপূর্ণভাবে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আইন অমান্য করবেন একথা বহু পূর্বে আন্দোলনের নেতারা ঘোষণা করেছিলেন এবং পুলিসও সেকথা জানত। (তিন) আইন অমান্যকারীরা যাতে অগ্রসর হয়ে গ্রেপ্তার বরণ করতে পারেন তারজন্য পুলিস তাদের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ফাঁকও রেখেছিল। "বসুমতীর" রিপোর্টার সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে—ঐ ফাঁকই ছিল আসলে একটি ফাঁদ। জনতাকে অগ্রসর হতে প্রলুব্ধ করার জন্যই ঐ ফাঁক রাখা হয়েছিল. যাতে সুযোগমত পুলিশ তাদের পিটাতে পারে। লাঠিচার্জে হতাহত সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়েছে—"কুড়িজন পুলিশ আহত হয়। পাঁচ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইহার মধ্যে দুই জনের অবস্থা গুরুতর। লাঠির আঘাত, পায়ের তলায় অথবা ইঁট পাটকেলে জনতার মধ্য হইতে বারো জন আহত হইলে তাঁহাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।" অথচ স্টেটসম্যানের মতে আহতের সংখ্যা ৩৪০, আনন্দবাজার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের মতে ৩৫০, যুগান্তর অমৃতবাজারের মতে ৪০০। একত্রিশে আগস্ট মেদিনীপুর জেলার সদরে. তমলুকে ও ঘাটালে—এই তিন স্থানে এবং বর্ধমান. বহরমপুর ও পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে ও কোচবিহারে শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর হিংস্র লাঠিচার্জ হয় ও বহু মানুষ আহত হন। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি সরকারী প্রেসনোটের নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণকে নিন্দা করে সংগ্রামী জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে পরবর্তী কর্মসূচীতে অটল থাকার আহ্বান জানান।

৩১শে আগস্টের রক্তাক্ত ঘটনার পর পয়লা সেপ্টেম্বর পালিত হয় রাজ্যব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট।

সফল ধর্মঘটের পর প্রায় দশ হাজারের এক ছাত্রজনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে সমবেত হয়। সেখানে পি এস ইউর শ্রীতুষার কাঞ্জিলালের সভাপতিত্বে নাতিদীর্ঘ সভায় শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য শ্রীঅরুণেশ ব্যানার্জী, শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন, অতঃপর বের হয় এক বিশাল ছাত্র মিছিল। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছিলেন যে. বিশ্ববিদ্যালয় লন থেকে এই মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে লনেই পুনরায় ফিরে আসবে, তাঁরা ছাত্রসমাজের নিকট আবেদন জানান যেন সমস্ত প্ররোচনা ও উস্কানী সত্ত্বেও এই মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করা হয়। বেলা সওয়া একটা নাগাদ মিছিল মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এমন সময় সম্পূর্ণ আতর্কিতে পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিলের উপর। শুরু হয় প্রচণ্ড অমানুষিক লাঠিচার্জ। —"বহু ছাত্রছাত্রী আত্মরক্ষার্থে পার্শ্ববর্তী বাড়ী, দোকানঘর ও গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। লাঠিধারী পুলিশবাহিনী গলিগুলির মধ্যে তাড়া করিয়া নির্বিচারে লাঠিপেটা করিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আনিতে থাকে। একটি দোকানঘরের মধ্যে পুলিশ ঢুকে সেই দোকানের দরজা বন্ধ করেকজন ছাত্র আশ্রয় লইয়াছিল। পুলিশ সেই দোকানের দরজা ভাঙ্গিয়া ঐ ছাত্রদের গ্রেপ্তার করিয়া টানিয়া হিঁচড়াইয়া প্রিজন ভ্যানে লইয়া আসে। পুলিশের এই বারংবার প্ররোচনার পর কিছু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তাছাড়া আত্মরক্ষার তাগিদও তাহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ছাত্রদের মধ্য হইতেও পুলিশের উদ্দেশ্যে প্রচুর ঢিল পাটকেল নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। পুলিশ—এমনকি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও সমানে ছাত্রদের উপর ইষ্টক বর্ষণ করিতে দেখা যায়। তখন শুরু হয় বড় বড় রাস্তায় ও প্রতিটি অলিতে গলিতে ছাত্র ও জনসাধারণের উপরে নির্বিচারে লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস বর্ষণ। জনসাধারণের মধ্যেও তখন দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। পুলিশের চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সকলে আগাইয়া আসে।" (স্বাধীনতা ২-৯-৫৯)। সন্ধ্যার পর থেকে পুলিশী আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় পুলিশী অত্যাচারের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দক্ষিণ কলকাতায় জগুবাবুর বাজার থেকে হাজরা ধরে টালিগঞ্জ পর্যন্ত জনগণ ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকর্মসূচীতে মানুষের এই স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সরকারের পুলিশ। লাঠি ও টিয়ার গ্যাসের সঙ্গে তারা এবার বন্দুকেরও ব্যবহার শুরু করে। পয়লা সেপ্টেম্বরের ঘটনা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় : "আন্দাজ দুপুর একটার সময় ছাত্রদের একটি মিছিল নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট ধরিয়া অগ্রসর হইবার কালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে দাঁড়ায় এবং কিছুক্ষণ স্লোগান চীৎকার করার পরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে ইঁট পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। তখন ঐ জনতাকে তাড়াইবার জন্য পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাসগোলা ছুঁড়িতে হয়।" অথচ প্রত্যক্ষদর্শী রিপোর্টারদের বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে : (এক) ছাত্র মিছিলটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল। কোনরূপ বিশৃঙ্খলা যাহাতে না ঘটে তার জন্য ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রথম হতেই সচেষ্ট ছিলেন। (মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে ইঁট পাথর ছোঁড়ার কোন ঘটনা উপস্থিত রিপোর্টারগণ কেহই দেখেন নি। বরং ছাত্রদের শান্তিরক্ষার জন্য উদ্বেগের প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। (তিন) পুলিশ পিছন হতে অতর্কিত শান্তিপূর্ণ মিছিলকে আক্রমণ করে। (চার) সরকারী প্রেসনোটে লাঠিচার্জের কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে। (পাঁচ) হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ভাষায় "শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলের উপর লাঠিচার্জের ফলেই ঐ দিনের হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। সরকারী প্রেসনোটের মতে পয়লা তারিখের হতাহতের সংখ্যা : নিহত ছয় জন. এবং আহত একশ দশ জন। কিন্তু আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকার মতে নিহত সাত জন, আহত প্রায় এক হাজার জন। এই দিন মেদিনীপুর জেলার তমলুকে আদালতের সম্মুখে অবস্থানকারী পাঁচ হাজার ঘুমন্ত নরনারীর উপরও পুলিশ নৃশংস লাঠিচার্জ করে, ফলে পঞ্চাশ জন আহত হয়. তন্মধ্যে আঠার জনের অবস্থা সংকটজনক। এতাবৎ গ্রেপ্তার হয় মোট ৭৭৭৬ জন, এঁদের মধ্যে ৬৯৮ জন মহিলা।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির কর্মসূচী অনুযায়ী তেসরা সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য দোসরা সেপ্টেম্বরও সরকারী দমননীতি চলে সমানে। এদিন সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠিচার্জের ফলে চল্লিশ জন মানুষ আহত হয়। রাত্রি সাতটা হতে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন নিম্নপ্রদীপ অঞ্চলে পুলিশের গুলি চালনার সংবাদ পাওয়া যায়। দমদম জংসনের নিকট পুলিশের গুলি চালনার ফলে দুই জন আহত হয়। হাওড়া ময়দানের নিকটস্থ অঞ্চলে পুলিশ লাঠি চালনা করে ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। সবচেয়ে অংপর্যপূর্ণ খবর হল, দোসরা সেপ্টেম্বর কলকাতায় অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর বিংশতি ডিভিসনের সৈন্য বোঝাই মিলিটারী ট্রাককে আজ সকাল দশটা হতে শহরের বিভিন্ন রাজপথে ঘুরতে দেখা যায়। এই মিলিটারী বোঝাই ট্রাক সমূহের সঙ্গে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররাও ছিলেন।

তেসরা সেপ্টেম্বর পালিত হয় রাজব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট।

ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে।

শুধু কলকাতা শহর বা সংলগ্ন শহরতলীতে নয়, সুদূরা জেলাগুলিতেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। সারা রাজ্যব্যাপী হরতাল ও ধর্মঘটের সাফল্যে ক্ষিপ্ত সরকারের সশস্ত্র পুলিশ কলকাতা হাওড়া ও চব্বিশ পরগণায় ব্যাপক গুলি চালায়। হাওড়ার শহরাঞ্চলে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা, তলব করা হয় সৈন্যবাহিনী। বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ হাওড়ায় গুলি চলে। বেপরোয়া গুলি। বেলিলিয়াস রোড, পঞ্চাননতলা. জয়নারায়ণ সাঁতরা রোড গোপাল গোবিন্দ বসু রোড প্রভৃতি রাস্তার মোড়ে গুলি বর্ষণ করা হয়। কলকাতার খিদিরপুর, শোভাবাজার কৈলাস বসু স্ট্রীট, কীডন স্কোয়ার. গিরিশ পার্ক; চব্বিশ পরগণার বেহালা, বরানগর. বজবজ, দমদম সোদপুর, পানিহাটি খড়দায় গুলি চলে। মাত্র এই একটি দিনেই পুলিশের গুলিতে মোট সাতাশ জনের মৃত্যু ঘটে। হাওড়ায় বারো জন নিহত হয়. চল্লিশ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। তেসরা সেপ্টেম্বর বিভিন্ন স্থানে গুলি বর্ষণের যে সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় : কলকাতায় সতেরোটি জায়গায়, চব্বিশ পরগণার আটটি জায়গায়, হাওড়ার মোট পাঁচটি জায়গায় গুলি বর্ষণ করেছে পুলিশ। আহতদের সংখ্যা যুগান্তরের মতে প্রায় একশ পঞ্চাশ জন. আনন্দবাজারের মতে একশ বাহাত্তর জন। পয়লা ও দোসরা সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড দমননীতি চালিয়ে সরকার তেসরা সেপ্টেম্বরের সাধারণ ধর্মঘট বানচাল করতে চেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল শোচনীয়ভাবেই। সফল হয়েছিল সাধারণ ধর্মঘট। এবং তারই মূল্য স্বরূপ সাতাশটি তাজা প্রাণের রক্ত ঝরেছিল সেদিন। কিন্তু শুধু কী আহত ? এই তিনদিনে নিখোঁজ হয়েছিল প্রায় একশ কুড়ি জন মানুষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল, হত্যা করার পর মৃতদেহগুলিকে পুলিশ সরিয়ে ফেলেছিল অন্যত্র। একত্রিশে আগস্টেই ময়দান অঞ্চল থেকে বাইশটি মৃতদেহ সরানো হয়েছিল। নিখোঁজ

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

গদির মোহেই ইন্দিরা পরাজয় মানলেন

কপিল রায়

নতুন দিল্লী, সতেরই এপ্রিল : অবস্থাটা যেন অনেকটা জীবন ভয়ে ভীত কোণঠাসা বেড়ালের মত। তাড়া খেয়ে কোণঠাসা বেড়াল যেমন তার ল্যাজ ফুলিয়ে, গোঁফ খাড়া করে ও ধারাল দাঁত খিঁচিয়ে অধিকতর জোরের সঙ্গে ফোঁস ফোঁস করে থাকে—এটাও যেন তাই। অন্তত পক্ষে এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহলের অনেকেই তেমনই মনে করছেন শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের অনশনের প্রসঙ্গে গত ২ এপ্রিল রায়বেরেলীতে, ১৩ তারিখ খাস রাজধানীতে এবং ১৫ তারিখে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে ভাষণাদি দিলেন সেসব কে এখানকার এই সব মহল তেমন অবস্থাসূচক বলেই মনে করছেন।

এঁরা মনে করেন যে শ্রীদেশাইয়ের অনশনকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে কংগ্রেস সংসদীয় দলের ভেতরে যে অবস্থার আভাস ফুটে উঠছিল তার চাপে পড়েই শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধীকে আচমকা কিছুটা পিছু হটতেই হল। আর এই পিছু হটার ফলে শ্রীদেশাইয়ের জীবনরক্ষার প্রয়াসঘটিত সদিচ্ছার থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিজের গদিরক্ষার তাগিদ অনেক বেশি জোরদার শক্তি হিসেবে যে কাজ করেছে সে বিষয়ে এই সব মহলে তেমন কোন সংশয় নেই।

শনিবার রায়বেরেলীতে একটি মুখ-আলোচনাচক্রে ভাষণ দিতে গিয়ে নাম না করেও শ্রীদেশাইয়ের অনশন প্রসঙ্গে বেশ একটু চড়া গলাতেই ধমক দিয়েছিলেন শ্রীমতী গান্ধী এই বলে যে চাপ সৃষ্টির কৌশলের পায়ে সরকার নতি স্বীকার করতে পারেন না এবং করবেন না। অথচ এই কড়া ভাষণের কয়েক ঘণ্টা পরে রাজধানীতে ফিরে এসেই রাত দুপুর অবধি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উচ্চতম মহলের সঙ্গে আলোচনার পরে তাঁকেই নতি স্বীকার করতে হল এবং এই নতি স্বীকৃতির বার্তা নিয়ে তার সরকারের পক্ষ থেকেই পরদিন রবিবার সকাল সাড়ে সাতটার সময়ে শ্রীমতী গান্ধীরই বিশেষ আস্থাভাজন শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত শ্রীদেশাইয়ের বাসভবনে গিয়ে জানালেন যে সরকার গুজরাটের নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে আনবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হয়েছেন। অর্থাৎ সরকার কার্যত শ্রীদেশাইয়ের মূল দাবি মেনে নিয়েছেন বর্ষা মরশুম শুরু হবার আগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এর পরে শ্রীদেশাইয়ের সঙ্গে শ্রী দীক্ষিতের যে দীর্ঘ আলোচনা হল সেটি ছিল মুখ্যত জরুরী অবস্থাঘটিত সরকারী যে ঘোষণা এখন কার্যকরী আছে তার প্রত্যাহার প্রসঙ্গে। শ্রীদেশাইয়ের উল্লিখিত মূল দাবির সঙ্গে আরও দুইটি আনুষঙ্গিক দাবিও ছিল—অগৌণে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিসার অপপ্রয়োগ বন্ধ। তবে এই দুইটি দাবি ছিল কিছুটা গৌণ—মূল ছিল বর্ষার আগে গুজরাটে নির্বাচন অনুষ্ঠান। গত ৪ঠা এপ্রিল শ্রীদেশাইয়ের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী যে একঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা করেছিলেন তাতে এই বিষয়টি বেশ পরিষ্কার করেই বলেছিলেন শ্রীদেশাই। সেদিন শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনের ব্যাপারে সরকারের পূর্বতন সিদ্ধান্তকেই—অর্থাৎ বর্ষা মরশুমের পরে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করবার সিদ্ধান্তকেই স্থির বলে জানালেন; তার আর নড়নচড়ন করতে রাজি হলেন না। তাই সে দিনের সে আলোচনা ব্যর্থ হল এবং সাতই এপ্রিল থেকে অনশন শুরু করতে হল শ্রীদেশাইকে। তের তারিখে যা শ্রীমতী গান্ধী স্বীকার করে নিলেন গত চৌঠা তারিখের আলোচনার সময়ে সেইটিকে স্বীকার করে নিলেই শ্রীমতী গান্ধীকে এই চাপে পড়ে নতি স্বীকার করবার অবস্থায় পড়তে হত না। বিচক্ষণ রাজনৈতিক মহল তাই বলছেন।

শ্রীদেশাই যে আশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ এবং তাঁর স্বাস্থ্য যে এই বয়সে দীর্ঘ অনশনের উপযোগী নয় এ সব তো সকলেরই জানা। উপরন্তু এই অনশনকে নিয়ে বিরোধীপক্ষীয়রা যে ধরণের চাপ সৃষ্টি করতে পারেন সেটিও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অবিদিত ছিল না। তাছাড়া দশই এপ্রিলে যে শ্রীদেশাইয়ের মূত্রে এসিটোন দেখা দিয়েছিল এবং সেদিন অবধি যে তাঁর ওজন বেশ কয়েক কিলো কমেছিল তা-ও তো শ্রীমতী গান্ধীর সুবিদিত ছিল। এ সব সত্ত্বেও তিনি রায় বেরেলীতে অমন কড়া ধমক দিয়েছিলেন। তাই এখানকার রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে শ্রীদেশাইয়ের অনশনকে কেন্দ্র করে তাঁর নিজস্ব কংগ্রেস সংসদীয় দলের মধ্যে যে তীব্র বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠতে পারে এমন সম্ভাবনাকে প্রধানমন্ত্রী ভাবতে পারেন নি। ভেবেছিলেন যে শ্রীমোহন ধারিয়াকে মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে অপসারিত করে দলের ভেতরকার যাবতীয় বিরোধিতাকে তিনি নির্মূল করেছেন কিংবা তাকে শক্তিহীন, নীরব ও স্তম্ভিত করতে পেরেছেন। এই ভাবনা যে ভিত্তিহীন ছিল শ্রীদেশাইয়ের অনশনের ভেতর দিয়ে তা প্রমাণিত হল।

প্রকাশ্যে কেউ মুখ না খুললেও কংগ্রেস সংসদীয় মহলে শ্রীদেশাইয়ের অচিরে একটা আপোস করে তাঁর জীবনরক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেশ বেড়ে উঠছিল। নিজেদের মধ্যে তাঁদের অনেকেই—বিশেষ করে কংগ্রেসের ভেতরকার সি পি আই বিরোধীরা তথাকথিত "বাম-দক্ষিণ" নিরপেক্ষ পুরানো কংগ্রেসীরা এবং প্রাক্তন পি এস পি আই দলভুক্ত কংগ্রেসীরা বলাবলি করছিলেন যে শ্রীদেশাইকে মরতে দেওয়া চলবে না। বাঁচাতে তাকে হবেই। দরকার হলে তার জন্য নির্বাচনটি বর্ষার আগেই করতে হবে। অনেকেই তাঁরা দাবি করছিলেন যে শ্রীদেশাইয়ের অনশন সম্পর্কে সংসদীয় দলে বিস্তারিত আলোচনা করে দলের নীতি নির্ধারণ করা হোক। বস্তুত এই দাবি জোরদার হয়ে উঠেছিল ১১ তারিখ শুক্রবার লোকসভায় শ্রীমোহন ধারিয়া যখন প্রকাশ্যে শ্রীমধু লিমায়ে প্রভৃতির দাবি—অনশন সম্পর্কে লোকসভায় আলোচনা করার সমর্থন করলেন। শ্রী ধারিয়ার এই অভিমত যে কংগ্রেস মহলের আরও অনেকের সমর্থন পুষ্ট ছিল তা দেখা গেল কংগ্রেস দলভুক্ত ডাঃ কৈলাশ ধারিয়ার বক্তব্যে বাধা সৃষ্টি করতে উঠে শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ প্রভৃতির কাছ থেকে প্রকাশ্যে যে ধমকানি সেদিন সদনের ভেতরেই খেলেন তাতে। সেই সময়ে সদনে শ্রী চ্যবন ও শ্রীজগজীবন রাম দুই জনই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কিছু বলেন নি। ঐ দিন কিছু পরে শ্রীধারিয়া শ্রীমতী গান্ধীকে এক চিঠি দিয়ে আপোষ পথে এগুবার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। গোড়াতে মাননীয় লোকসভার অধ্যক্ষ মহোদয় আলোচনার দাবিটি স্বীকার করতে অরাজি হন। কিন্তু পরে তিনি পরবর্তী মঙ্গলবার নাগাদ (শনি, রবি ও সোমবার সদনের ছুটি ছিল) আলোচনার সুযোগ দিতে রাজি হন। আলোচনার জন্য শ্রী ধারিয়াও একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

সেইদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রী চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে অচিরে কথা বার্তা শুরু করবার জন্য চাপ দেন। ঐ দিনই শ্রী চন্দ্রশেখর শ্রীজগজীবন রামকেও সেন্টাল হলে অনেকের সামনেই "একটা কিছু করবার" জন্য বারংবার অনুরোধ জানান। প্রথমে বিমর্ষ মুখে নীরব থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাবুজীকে বলতে শোনা গেল: "কুছ তো করনেই হোগা"।

শনিবারে এই সব গোষ্ঠীর কর্মতৎপরতা আরও বেড়ে যায়। শ্রীমোহন ধারিয়ার বাসভবনে কিছু সংখ্যক কংগ্রেস সদস্যদের এক সভা হয়—প্রায় জনা চল্লিশেক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। শোনা যায় এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সহানুভূতিশীলের সংখ্যা কংগ্রেস সংসদীয় মহলে অন্যান্য নব্বুই মত ছিল। আপোষের ওপরে জোর দিয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে লোকসভায় আলোচনা উঠলে প্রকাশ্যে তাঁরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবেন।

কংগ্রেস মহলের অনেকেই এ সম্পর্কে প্রায় সুনিশ্চিত ছিলেন যে বর্তমানে গুজরাটে নির্বাচন হলে কংগ্রেস হারলেও অন্যত্র নির্বাচনে তার কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু অনশনে শ্রীদেশাই মৃত্যু মুখে পতিত হলে গোটা দেশে কংগ্রেস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে; তার অস্তিত্ব যদি একেবারে মুছে নাও যায় তাহলেও তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বে। এ সব খবরই শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কানে যায় এবং শনিবার সন্ধ্যায় রায়বেরেলী থেকে ফিরে তিনি তাঁর কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রিসভা সহযোগীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে আলোচনা করেন। সেই সভায় শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও উপস্থিত ছিলেন। শোনা যায় এই সভায় শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রী চ্যবনও নাকি শ্রীদেশাইয়ের জীবন রক্ষার ওপরে বিশেষ জোর দেন এবং একটি আপোষ করবার দাবিকে সমর্থন করেন।

রাজধানী দর্পণ

শ্রীমতী গান্ধীর মত কূটনীতিদক্ষ নেতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবস্থার স্বরূপ ও সম্ভাব্য গতি পরিণতি সহজেই ধরা পড়ে। রায়বেরেলীর সুর নিমেষেই বদলে যায়। এই নৈশ-বৈঠকেই আপোষের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং শ্রী দীক্ষিতকে এই সিদ্ধান্তের বার্তাবহ করে পাঠাবারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কংগ্রেস সংসদীয় দলের মধ্যে নতুন শক্তি বিন্যাসের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে বলে এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এর পরিপুষ্টি যে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান অস্ফুট প্রভাবক্ষয়তাকে প্রকট ও তীব্রতর করে তুলবে না এবং কংগ্রেসের ভেতরকার সি পি আই বিরোধী শক্তিগুলিকে আরও জোরদার করে তুলবে না সে বিষয়ে এই সব মহল তেমন নিঃসংশয় নন। ঐরা আরও মনে করেন যে নিজের গদিকে বাঁচাবার জন্য শ্রীমতী গান্ধীকে এর পরে আরও বেশি এই সব শক্তির ওপরে নির্ভর করতে হতে পারে। ১৯৭১ সনের পরে এই প্রথম কংগ্রেস সংসদীয় দলের মধ্যে তেমন একটা হাওয়ার অবতারণা হয়েছে। এই সব মহল এটাও লক্ষ্য করেছেন যে ১৯৬৯ সনে মুখ্যত যে শ্রীমোরারজী দেশাইকে মন্ত্রিসভা প্রভৃতি থেকে হটিয়ে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নিজের প্রভাবপ্রতিষ্ঠাকে জোরদার করেছিলেন এবং সংসদীয় দলের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিলেন, ১৯৭৫ সনে সেই শ্রীদেশাইকে কেন্দ্র করেই সেই অকুণ্ঠ সমর্থনে কুণ্ঠার ছায়াপাত দেখা গেল আর দেখা গেল শ্রীমতী গান্ধীর প্রভাব প্রতিষ্ঠায় ভাটার টান। ঘটনার এই গতিপরিণতি নিশ্চয়ই তাৎপর্যহীন নয়।

অভাব, তবু অঢেল খরচ

(দর্পণের সুবোদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অকাল প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন শিক্ষাবিদদের চমক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস হল চব্বিশে জানুয়ারী। উপাচার্য মশায়ের হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, এবার ঘটা করে এপ্রিল মাসে এই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা দরকার।

বছর বছর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেওয়াজ নেই। এ বছর একশো আঠারতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন সে দিক থেকে নতুনত্বের দাবী করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তিতে যে উৎসব হয়েছিল, এবারের অনুষ্ঠানে তার চেয়েও জাঁকজমক। নয়ই এপ্রিল থেকে এগারোই এপ্রিল এই তিন দিন ধরে উৎসব চলে। উদ্বোধন করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। গোটা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে প্যাণ্ডেল হয়েছিল। আলোক সজ্জাও অন্যান্য উৎসবকে হার মানিয়েছে। কর্তৃপক্ষের দেওয়া হিসবে অনুযায়ী খরচ হয়েছে আনুমানিক ষাট হাজার টাকা।

এদিকে টাকার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অচল। গত উনত্রিশে মার্চ সিনেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (অর্থ) অরুণ রায় এক করুণ চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, সেদিনের আর বেশী দেরী নেই, যেদিন কন্ট্রাকটর আর বাড়ী মেরামত করবে না, টাকার অভাবে প্রশ্নপত্র ছাপা যাবে না। গবেষণার কাজ হয়ে পড়বে অচল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর সালের হিসাব অনুযায়ী দু-কোটি সতেরো লক্ষ টাকার উপর। এই কঠিন সময়ে একশ আঠারতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে অযথা হাজার হাজার টাকা ব্যয়ের কারণ কি—বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল তা উপলব্ধি করতে পারছেন না।

মিথ্যাবাদী মুখ্যমন্ত্রীর কত ছল কত চাতুরী

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের দোসরা এপ্রিল কলকাতায় আগমন উপলক্ষে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, জে পি পশ্চিমবঙ্গে কোন সমস্যাই নয়। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জী বলেছিলেন যে তাঁরা জে পির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন তবে তাঁর সমর্থনকারীদের মিছিলের পথ অবরোধ করা হবে না। কিন্তু দোসরা এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের সামনের ঘটনাবলী আরও একবার প্রমাণ করলো যে মন্ত্রীদের কাজে ও কথায় মিল থাকেনা। আর এটাও বোঝা গেল যে, জে পি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের কাছে বিরাট একটা সমস্যা।

শ্রীসুব্রত মুখার্জী বলেছেন যে জে পির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ খুব সুস্পষ্ট, শান্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসাবে জানতে ইচ্ছে করে—ইটপাটকেল, সোডার বোতল এবং চম্পল ছোঁড়া কি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের অঙ্গ বিশেষ? আর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাই যে জে পি সমর্থকদের মধ্যে যাঁরা রক্তাক্ত এবং অর্ধ চৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলেন তাঁরা কি নিজেরাই নিজেদের আঘাত করেছিলেন? "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের" প্রীতিলতা ওয়াদেদার বাঙালী মেয়ে ছিলেন আর জে পির গাড়ীর চালে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি আরও কয়েকটি ছেলের সঙ্গে নাচানাচি করলো সেও বাঙালী মেয়ে। অথচ দুয়ের মধ্যে কতো তফাৎ। ভাবতেও লজ্জা লাগে।

সবচেয়ে অবাক হয়েছি তেসরা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় শ্রীমতী ইলা মিত্র সমেত ছাব্বিশ জন কংগ্রেস সি পি আই এম এল এর বিবৃতি পড়ে। এঁরা সকলেই জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে যারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন তাদের জন্য গর্ব বোধ করেছেন। চৌঠা এপ্রিল সকালে যখন সংবাদপত্রে এম এল এ মহোদয়দের বিবৃতি পড়ছিলাম ঠিক তখনই আকাশবাণীর স্থানীয় সংবাদ মারফৎ জানানো হল যে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বলেছেন যে, দোসরা এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে হলে যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল তাদের কেউই যুব কংগ্রেস বা ছাত্র পরিষদের সদস্য নয়। আমার মনে হয় শ্রীদাসমুন্সী বুঝেছেন যে, দোসরা এপ্রিল শ্রীজয়প্রকাশকে কেন্দ্র করে যা যা ঘটেছে সেগুলি সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে পড়ে। স্বভাবতঃই তিনি চাইবেন না যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুব কংগ্রেস বা ছাত্র পরিষদের নাম জড়িয়ে পড়ুক, তাই তিনি উপরোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। শ্রীদাসমুন্সী একজন সর্বভারতীয় যুব নেতা তথা সম্মানীয় ব্যক্তি। আকাশবাণী তাঁর যে বিবৃতি প্রচার করেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে দুটি প্রশ্ন মনে জাগে। (এক) শ্রীসুব্রত মুখার্জী কি দোসরা এপ্রিল মন্ত্রী হিসাবে সমাজ বিরোধীদের বিক্ষোভ পরিচালনা করেছিলেন? (দুই) ছাব্বিশ জন কংগ্রেস-সি পি আই এম এল এ কাদের জন্য গর্ব বোধ করলেন? সমাজবিরোধীদের জন্য?

অসংখ্য ধন্যবাদ বিজয় সিং নাহার মহাশয়কে। কংগ্রেসীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই দোসরা এপ্রিল তারিখের ঘটনার প্রকাশ্যে নিন্দা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার জানাই তথাকথিত গান্ধীবাদী নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে। খবরে প্রকাশ যে, কংগ্রেস সি পি আই এম এল এরা যখন শ্রীজয়প্রকাশের ওপর আক্রমণের জন্য গর্ব বোধ করছিলেন তখন শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজের আসনে চুপচাপ বসেছিলেন। হায়, একজন নির্লোভ (?) মানুষের কি নিদারুন অধঃপতন। বেশ মনে পড়ছে, যুক্তফ্রন্ট আমলে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি একবার সিদ্ধার্থ রায়কে বলেছিলেন যে পুনরায় কংগ্রেসে

মতামত

যোগদান করার আগে তাঁর যেন মৃত্যু হয়। তারপর অনেক জল ঘোলা করে তিনি কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন এবং তাঁর কথামতো মারাও গেছেন—তবে দেহের দিক থেকে নয় আদর্শের দিক থেকে। তা না হলে এক সময়ের সহকর্মী জয়প্রকাশের ওপর জঘন্য আক্রমণের জন্য যখন অন্যান্য এম এল এরা গর্ব বোধ করছিলেন তখন তিনি চুপচাপ বসে থাকতে পারেন কি করে?

সভা অনুষ্ঠানের শেষে যেমন হাস্যরস পরিবেশন করে শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়া হয় ঠিক তেমনভাবেই শ্রীসিদ্ধার্থ রায় আমাদের হাসিয়েছেন তাঁর ছয়ই এপ্রিল দুর্গাপুরের বক্তৃতায় এবং সাতই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রদত্ত ভাষণে। সরকারীভাবে তিনি দোসরা এপ্রিলের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং একই নিশ্বাসে বললেন যে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে জে পি কটু মন্তব্য করায় যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয় এবং তাঁর ওপর হামলা করে কারণ দেশনেত্রীর নিন্দাবাদ ওরা নাকি সহ্য করতে পারেনি। বিধান সভার মেঝেতে দাঁড়িয়ে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এর আগে এতো বড় মিথ্যাভাষণ দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন যে বিধান সভায় শ্রীরায়ের বিবৃতি ডাঃ গোয়েবলসকেও হার মানিয়েছে।

একটি সত্য ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া যায়। কিন্তু সত্য ঘটনাকে বিকৃত রূপ দিতে এবং লজ্জাকর পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূলে আনতে একটু সময়ের দরকার হয়। তাই দোসরা এপ্রিলের ঘটনা সম্পর্কে প্রথম মুখ খোলেন শ্রীরায় ছয়ই এপ্রিল দুর্গাপুরে। মাঝে চারদিন তাঁকে দিল্লী ছোটাছুটি করতে হয়েছে এবং উপরওলাদের নির্দেশ অনুযায়ী ভাষণের বয়ান তৈরী করতে হয়েছে।

দোসরা এপ্রিলের ঘটনার পর শ্রীসুব্রত মুখার্জী, শ্রীপ্রিয় দাসমুন্সী শ্রীবিজয় সিং নাহার ও শ্রীঅরুণ মৈত্র প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং তার ওপর ছাব্বিশ জন কংগ্রেস সি পি আই এম এল এ কিছু না কিছু বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউই একবারও বলেন নি যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে জে পির কটু মন্তব্যই সেদিনকার গণ্ডগোলের কারণ, তবে কি নিজের এবং সরকারের মান বাঁচাতেই শ্রীরায় জে পি-কে গণ্ডগোলের অংশীদার করতে চাইছেন?

বিধান সভায় শ্রীরায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে প্রথমেই পথে বসানো হয়েছে শ্রীদাসমুন্সীকে। শ্রীদাসমুন্সী বলেছেন, যে দোসরা এপ্রিলের ঘটনার জন্য যুব কংগ্রেস বা ছাত্র পরিষদ কর্মীরা দায়ী নন। পক্ষান্তরে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় স্বীকার করেছেন যে জে পির ওপর আক্রমণের কাজটা যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদ কর্মীরাই করেছে। এখন প্রশ্ন কে মিথ্যা কথা বলছেন শ্রীরায় না শ্রীদাসমুন্সী? সংবাদপত্রে পড়েছি যে শ্রীদাসমুন্সী লোকসভায় একটা বিল আনতে চেয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছে যে, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার বা আইনজীবী কারোরই অধিকার থাকবে না রাজনীতি করবার। জানিনা শ্রীসিদ্ধার্থ রায়কে মনে রেখেই শ্রীদাসমুন্সী ওই বিল আনতে চেয়েছিলেন কিনা, তবে তিনি যে কোরেই হোক শ্রীরায়কে যদি আবার ব্যারিষ্টারী লাইনে ফিরিয়ে দিতে পারেন তাহলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বাসী একজন বাচাল মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পায়।

শ্রীজয়প্রকাশ যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত তখন শ্রীরায় বিলাতে নিজের কেরিয়ার গঠনে ব্যস্ত। তাই তাঁর পক্ষে জে পির মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। আর সেই জন্যই তিনি জে পির সমালোচনা করতে নেতাজীকে স্মরণ করেছেন। দুর্গাপুরে (ছয়ই এপ্রিল) শ্রীরায় বলেছেন যে, নেতাজী নাকি কোন এক সময় বলেছিলেন "জয়প্রকাশ যখন তখন মত বদলায়"। পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের মনে নেতাজীর স্থান অনেক উচ্চে, তাই শ্রীরায় নেতাজীর কথা অবতারণা করে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে একটু সুড়সুড়ি দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ নেতাজী যাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তাকে তোমরা মাথায় তুলোনা। ধন্য ব্যারিষ্টারী বুদ্ধি। কিন্তু শ্রীরায় জানেন কিনা জানিনা নেতাজী শ্রীজওহরলাল নেহরু এবং কংগ্রেস সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাহলে পণ্ডিত নেহরুর উচিত হয় নি প্রধানমন্ত্রীত্ব করা বা কংগ্রেসেরও উচিত নয় এখনও শাসন ক্ষমতায় আসীন থাকা।

শ্রীরায় যে একজন কাঁচা উকিল, কেস সাজাতেও জানেনা এবং সাতই এপ্রিল বিধান সভায় প্রদত্ত তাঁর বিবৃতি যে ডাহা মিথ্যা এটা কংগ্রেসের বশংবদ সাংবাদিক শ্রীবরুণ সেনগুপ্তও (আনন্দবাজার এগারই এপ্রিল) স্বীকার করেছেন। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। এই বরুণ সেনগুপ্তই তাঁর গত কয়েকটি প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে একটা ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরেই ভারতের ভাবী প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন শ্রীসিদ্ধার্থ রায়। শ্রীসেনগুপ্তের তোষামোদী মাঠে মারা গেল। একজন কাঁচা উকিল, ডাহা মিথ্যুক ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের অবস্থা কি হবে সেটা না বলাই ভালো।

সমীর বসু

প্রত্যহ হামলা

গত দোসরা এপ্রিল, জয়প্রকাশ নারায়ণের জনসভা পণ্ড করে দেওয়া ও তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা চলছে। কেউ বিস্ময় প্রকাশ করছেন, কেউ বা দুঃখ। পশ্চিমবাংলার যে সব বাসিন্দা গত তিন বছর ধরে দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ ও বিচার করে আসছেন, তাদের কাছে এঘটনা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। রাষ্ট্র মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা হয়েছে। নির্ভীক মতপ্রকাশ আজ দুঃসাধ্য, অপ্রীতিকর সত্যভাষণ আজ আশঙ্কার কারণ। বিধানসভায় যদি মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করা হয়, তবে সেই সদস্যের জীবন ও সম্মান বিপন্ন হতে পারে। যেমন হয়েছে কাশীকান্ত মৈত্রের। (বসুমতী তেরই মার্চ, পঁচাত্তর দ্রষ্টব্য) লাঠির জোরে সত্য নিধন আজ প্রাত্যহিক ঘটনা। স্টার থিয়েটারের সামনে প্রখ্যাত নট উৎপল দত্তের নিগ্রহ, চৌরঙ্গীর প্রকাশ্য দিবালোকে প্রবীর দত্তের হত্যা "দর্পণ" অফিসে তথাকথিত কংগ্রেসী নেতৃবর্গের পরিচালনায় হামলা এই সব ঘটনারই চূড়ান্ত পরিণতি জে পির অপমান ও সভা পণ্ড। পশ্চিমবঙ্গের একজন উঠতি মন্ত্রী দোসরা এপ্রিল এই গণতন্ত্র বিরোধী হামলার নেতৃত্ব করেছেন। একথা সর্বজনবিদিত সত্য। মুখ্যমন্ত্রী ঐ মন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর গদির নিরাপত্তা রক্ষায় ঐ মন্ত্রীর অবদান কম নয়। পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে সর্বভারতীয় নেতার নিগ্রহ উপভোগ করেছে। আগামী বাজেটে যেন পুলিশ খাতে বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর ঐ দিন যে অফিসার ঐখানে কর্তব্যরত (?) অবস্থায় ছিলেন তাঁকে একটি পদক দানের ব্যবস্থা করা হয়।

সুধীন গুপ্ত
কলিকাতা

খাদ্য আন্দোলন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তির আত্মীয়েরা সংবা[illegible] রিপোর্টারদের নিকট কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। যেমন (এক) পুলিশ নিহত ব্যক্তিদে সনাক্তকরণের জন্য সাংবাদিকদের ফটো তুলতে দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের সুযোগ দেন না কেন? (দুই) পুলিশ নিজের ফটোগ্রাফার দিয়ে ফটো তুলিয়ে তা সনাক্তকরণের জন্য টাঙ্গিয়ে দেন না কেন? (তিন) কে সব ক্ষেত্রে নাম ঠিকানা জানা গিয়েছে সেই ক্ষেত্রেও আত্মীয়স্বজনের হাতে মৃতদেহ দেওয়া হয় নি কেন? (চার) সংবাদপত্রে নিখোঁজের যে তালিকা বের হচ্ছে তা আকাশবাণী হতে প্রচার করার বিশেষ ব্যবস্থা কেন হচ্ছে না? এই সব সঙ্গত প্রশ্নের জবাব সেদিন সরকার দেন নি।

কিন্তু এই দমনপীড়ন কী ভেঙে দিতে পারলো মানুষের মনোবল? না, পারলো না। বরং আরো অদম্য উৎসাহে মানুষ সমবেত হল, সংহত হল।

(ক্রমশঃ)

কংগ্রেসী হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত সতেরোই এপ্রিল বেঙ্গল এনামেল কারখানার কিছু সংখ্যক শ্রমিকের ওপর কংগ্রেসী গুণ্ডারা হামলা চালায়। এ হামলা পুলিশ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে উপভোগ করেছে বলে অভিযোগ। আহত হয়েছেন পাঁচজন। দুজনের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহতদের নাম ঃ হরেন বেরা ও বিমান বসু। আক্রান্ত শ্রমিকরা সকলেই বামপন্থী ইউনিয়নের কর্মী। এই জঘন্য হামলার প্রতিবাদে কারখানার কর্মীরা একদিনের ধর্মঘট পালন করেন।

ভ্রম সংশোধন

গত চৌঠা এপ্রিলের দর্পণে "এস ইউ সির রাজনৈতিক চরিত্র" শীর্ষক পত্রে যেখানে লেখা আছে "অতএব কৃষি বিপ্লব ও জনগণতান্ত্রিক, বিপ্লবের স্তরে পৌঁছে গেছি," সেখানে পড়তে হ[illegible] "অতএব কৃষিবিপ্লব বা জনগ[illegible] তান্ত্রিক বিপ্লবের আর প্রয়োজ[illegible] নেই একেবারেই সমাজতান্ত্রি[illegible] বিপ্লবের স্তরে পৌঁছে গেছি।"

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সরকার উদাসীন। মাস্টার প্ল্যানের অপমৃত্যু

[অনার্য মিত্র]

সমাজের "দরিদ্র এবং দুর্বল জনসাধারণের একাংশ" হিসেবে উদ্বাস্তুদের গণ্য করার ফলে দরিদ্রতর জনসাধারণের ক্রমগত অর্থনৈতিক অধঃপতন উদ্বাস্তুদেরও এক গভীর সংকটের আবর্তে ছুঁড়ে ফেলেছে।

মোদ্দা কথা, উদ্বাস্তুদের জন্য চাই অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। অর্থাৎ আত্মনির্ভরতার সঙ্গে খেয়ে পরে থাকা যায়, তার জন্যে পাকাপাকি ভাবে মাথা গোঁজবার ঠাঁই এবং কিছু পুঁজি। ষাট-একষট্টি সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের জন্য যে ডোল রেশন দেওয়া হত, তা তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করে নি। এই সাহায্য তাদের নিম্নতম প্রয়োজনের সীমাকেও স্পর্শ করত না।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের কাজ মোটেই সন্তোষজনক ভাবে এগোয় নি। দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে মাত্র দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এই পুনর্বসতিপ্রাপ্ত পরিবারের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক আবার পরবর্তীকালে বাস্তুহারা হয়েছেন। এর কারণ প্রধানত দুটি।

প্রথমতঃ দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের ভূয়সী প্রশংসা করে যে সব উদ্বাস্তুদের সেখানে পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবার পরবর্তীকালে অনুর্বর এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। বাকীরা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করেই রয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যে সব পরিবার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে দিনমজুরীর ভিত্তিতে বা অন্য যে কোন চেহারাতেই পূর্বের জায়গায় সামান্য কিছু রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তারা একবার প্রলুব্ধ হয়ে সরকারী নির্দেশে দণ্ডকারণ্যে গেলেও সেখানকার ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে আবার সপরিবারে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু ফিরে এসে পূর্বের সেই দখল করা বসতিও আর ফিরে পান নি।

আজ সর্বপ্রথমে এই উদ্বাস্তুদের শর্তহীন পাকাপাকিভাবে একটা বাস্তু দরকার, যাকে আশ্রয় করে তারা স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারবেন। যাতে অন্তত তারা ভাবতে পারবেন এটা আমারই দেশ আমারই [illegible] একথা অনস্বীকার্য রাজ্যের [illegible]ন ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক [illegible]শের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা একটা [illegible]ক্তি। বোধ করি সেই কারণেই [illegible]মবঙ্গের উদ্বাস্তু সংগঠন কেন্দ্রীয় [illegible]স্তুহারা পরিষদ দাবী তুলেছিলেন, [illegible]ই রাজ্যের উদ্বাস্তুদের এই রাজ্যেই পুনর্বসতি দিতে হবে। তাছাড়া অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে বিভাষী অঞ্চলে গিয়ে তারা যে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের সরকারের সম্যক সহযোগিতা পাবেন তা মনে হয় না।

সরকারের মতিগতি দেখে বোঝা গেছে মাষ্টার প্ল্যানের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে সরকারী বেসরকারী কলোনীবাসীর ক্ষেত্রে নিরানব্বুই বছরের লীজ বিলি করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কোন উদ্বাস্তু পরিবারই এই লীজ স্বীকার করে নেন নি। কেন না এই লীজের দলিলটি ভয়াবহরকম শর্ত কন্টকিত। যাতে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রার কোন অস্তিত্বই থাকে না।

এই লীজ দলিলের সূচনাতেই উদ্বাস্তুদের কাছে স্বীকৃতি দাবী করা হয়েছে যে রাজ্য সরকার তাদের পুনর্বাসনের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। অথচ লাঠি গুলির মোকাবেলা করে উদ্বাস্তুরা জবরদখল কলোনী প্রতিষ্ঠা করেছেন। সরকারী কলোনীর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যর্থতার কথা সরকার মাষ্টার প্ল্যানেই স্বীকার করেছেন। তাহলে পুনর্বাসনের সবরকম ব্যবস্থা সরকার করেছেন—এ কথার ভিত্তি কোথায়?

দ্বিতীয়ত লীজ দলিলে বলা হয়েছে, প্লট হোল্ডাররা কেবলমাত্র বসতবাড়ী হিসেবেই জমি ব্যবহার করতে পারবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট জমিতে প্রয়োজনে দোকান ঘর বা ভাড়া দেওয়া চলবে না। এবং ছোটখাটো কোন কুটীর শিল্পই এরা নিজস্ব বাসভূমিতে গড়ে তুলতে পারবেন না। তৃতীয়তঃ লীজের নিরানব্বুই বছরের শর্ত ধরেই প্রতি এক বছর অন্তর সরকারকে অধিকৃত জমির জন্য খাজনা প্রদান করতে হবে। চতুর্থতঃ সবচেয়ে বিপজ্জনক শর্ত হল প্লট হোল্ডাররা উক্ত জমিতে কোন সরকার বিরোধী কাজ এবং ভারতের আইনানুযায়ী গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে কোন রকম নাশকতামূলক কাজকর্ম করতে পারবেন না। অর্থাৎ এই রাজনৈতিক শর্ত অনুযায়ী জবরদখলকারী উদ্বাস্তু পরিবারকে জমির দখল পেতে হলে বা আগামী দিনে সরকারী বেসরকারী কলোনীর উদ্বাস্তুদেরও জমির দলিল পেতে হলে এবং জমিতে বসবাস করতে হলে কোনমতেই সরকার বিরোধী হওয়া চলবে না।

অর্থাৎ জমির লীজ দলিল প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সরকার তার বিরোধী এবং সমর্থক গোষ্ঠীদের দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলতে চান। এতে উদ্বাস্তুদের একতা বিঘ্নিত হবে বলে মনে হয় না। কেন না এই শর্ত কন্টকিত লীজ দলিল সকলেই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এছাড়া প্লট হোল্ডারদের বেআইনী বা নাশকতামূলক কাজের চরিত্র বিচার করবেন সরকার স্বয়ং। সুতরাং কোন কাজটিতে সরকার তুষ্ট হবেন এবং কোন কাজটিতে সরকার রুষ্ট হবেন, তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার পক্ষে দলিলের শর্তই শেষ কথা নয়। কিন্তু সরকার একবার যদি কোন কারণে রুষ্ট হন তাহলে যে কোন সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে অধিগ্রহণ করে নিতে পারবেন।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বছরের প্রতিশ্রুতি আজও উদ্বাস্তুদের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা যে সম্পত্তি পূর্ব পাকিস্তানে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের জমির মূল্য দানের ব্যাপারে সরকার তেপ্পান্ন কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জবরদখল কলোনী এবং সরকার অনুমোদিত কলোনীর উদ্বাস্তুদের এই সাহায্য পাবার কথা। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কত টাকা খরচ হয়েছে? আর তার ফলশ্রুতি কি এই লীজ দলিল, যা উদ্বাস্তুদের স্বাধীন জীবনযাত্রাকে শৃঙ্খলিত করার কৌশল?

শোক সংবাদ

বিগত বাইশে মার্চ মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ডাঃ হিতেন কমল সেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল, দরদী চিকিৎসক ডাঃ সেন আর্ত ও নিপীড়িতের কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

মার্কিনী পুতুলের পতন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

অবশেষে, কাম্বোডিয়ায় মার্কিন পুতুল চক্রের পতন হল। ১৯৭০ সালের আঠারই মার্চ কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রিন্স সিহানুকের অনুপস্থিতির সুযোগে সি আই-এর পৃষ্ঠপোষণায় নল সিরিক ম্যাটক চক্র ক্ষমতা দখল করে। সিহানুক তেইশে মার্চ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করেন এবং সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যম নল চক্রকে উৎখাতের আহ্বান জানান। এই সময় দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী বাহিনী, সিহানুকের জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট, লাওসের মুক্তি ফৌজ, উত্তর ভিয়েতনামের লাল ফৌজের শীর্ষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের সংগ্রামে তাঁদের সংগ্রাম হবে পরস্পরের পরিপূরক। তাঁরা যে তাঁদের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন, তা ইন্দোচীনের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায়।

কাম্বোডিয়ায় জাতীয় মুক্তি ফৌজের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামে চলছে যুগপৎ মুক্তি ফৌজের বিজয়াভিযান। থিউ বিদায় নিয়েছেন। সায়গন অবরুদ্ধ। সায়গণের চতুষ্পার্শ্ব মুক্ত। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী বাহিনী ক্রমেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গন মুক্তির দিকে এগোচ্ছে। কার্যত এখন দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রায় সমগ্র অঞ্চল অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের দখলে।

শুধু মাত্র কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনামেই নতুন করে ইতিহাস লেখা হচ্ছে তা নয়, তাইল্যান্ডেও প্রগতিশীল শক্তি এবার মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। ইতিমধ্যেই তাইল্যান্ডের কমিউনিস্ট গেরিলারা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অন্যদিকে কম্বোডিয়ার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে তাইলান্ডের শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে। তাইল্যান্ডে এখনো মার্কিন ঘাঁটি বর্তমান। ধর্মঘটী শ্রমিকরা রাস্তায় রাস্তায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধ্বনি দিচ্ছে।

কাম্বোডিয়ায় জনগণের বিজয় ইন্দোচীন তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি করবে। সিহানুকের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শরিক হল খামের লালরা অর্থাৎ কাম্বোডিয়ার কমিউনিস্টরা এটা ভুললে চলবে না। এই লাল ফৌজই নমপেন মুক্ত করেছে। ১৯৭০ সালের মার্চে গদীচ্যুত রাষ্ট্রপতি সিহানুকের আহ্বানে প্রথম সাড়া দেয় কাম্বোডিয়ার কমিউনিস্টরা। ১৯৭০ সালের ছয়ই এপ্রিল থিউ সামপানের নেতৃত্বে শ্যামলতে কৃষকদের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে কাম্বোডিয়ায় নয়া ইতিহাস লেখা শুরু হয়ে যায়। মুক্ত শ্যামলতে হয়ে ওঠে মুক্তিবাহিনীর মূল কেন্দ্র।

সর্বশেষ খবরে জানা যায়, কাম্বোডিয়ার নতুন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট দিয়েছে লাল ফৌজের নেতা সামপানের ওপর। সিহানুক রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কাজ চালাবেন। কাম্বোডিয়ার শিক্ষা হল এই যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিপুল সাহায্য সত্ত্বেও কোন প্রতিক্রিয়ার শাসন বেশীদিন টিকতে পারে না, জনতার পদাঘাতে তাকে একদিন যেতে হয়।

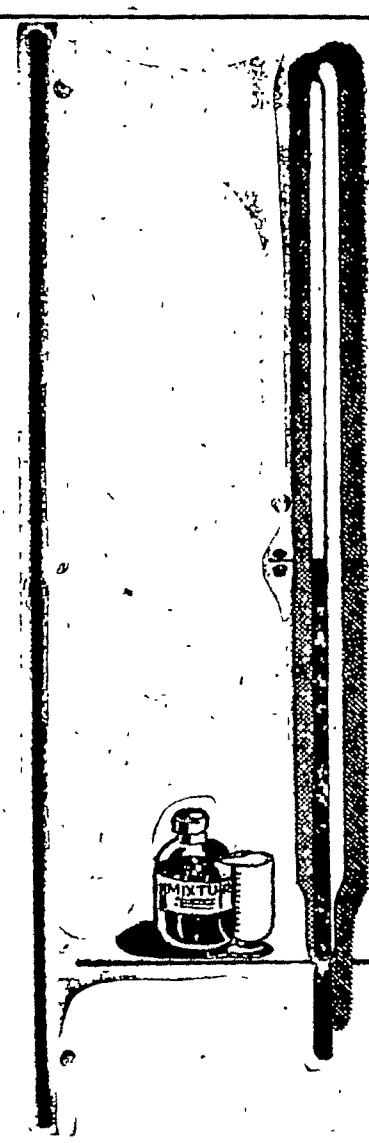

জ্বর
আর সঙ্গে
কাঁপুনি হলে
ম্যালেরিয়া
হতে পারে

অবিলম্বে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে জেনে নিন ম্যালেরিয়া হয়েছে কি না। স্বাস্থ্য কর্মী আপনার শরীর থেকে শুধু এক ফোঁটা রক্ত নেবেন। যদি ম্যালেরিয়া হয় তাহলে অবিলম্বে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

রক্ত পরীক্ষা করানোর জন্যে
পয়সাকড়ি কিছু দিতে হয় না

সব প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা
হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষার
ব্যবস্থা আছে

স্বাস্থ্য বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রক

davp 74/461

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

চতুর্থশ্রেণীর কর্মীদের হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের দাবীর প্রতি রাজ্য সরকার মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা যে বেতন পেয়ে থাকেন তার তুলনায় এখানকার কর্মচারীদের বেতন অনেক কম। রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে এই বৈষম্যকে জিইয়ে রেখেছেন। অথচ কর্মচারীরা ন্যায্য পাওনার দাবী তুললেই সার্ভিস ব্রেক, বেতন কাট, বদলী, শো-কজ মিথ্যা মামলা প্রমোশনের সীমিত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। বহু কর্মচারীকে ওয়ার্কচার্জড কন্টিজেন্ট, মাষ্টার রোল, মরশুমী দৈনিক লেবার প্রথার আওতায় রেখে তাদের চাকুরীগত সমস্ত সুবিধা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের এই নির্লজ্জ বৈষম্য আড়াল করবার জন্য বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী ষোল টাকা মহার্ঘ ভাতা দেবার ঘোষণা করে, আবার তা থেকে আট টাকা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় খাতে জমা রাখবার নির্দেশ দিয়ে যে উদারতা প্রমাণ করলেন, তা হাস্যকর এবং তিনি যে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির দাসত্ব করছেন তা স্পষ্ট।

সামান্য ষোল টাকা মাইনে বাড়িয়ে কর্মচারীদের সাময়িক প্রলুব্ধ করে তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করার যে কৌশল রাজ্য সরকার প্রয়োগ করতে চাইছেন, রাজ্যের সমস্ত চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে গত উনিশে এপ্রিল বারো দফা দাবীর ভিত্তিতে পঁচাত্তর হাজার গণস্বাক্ষর সহ রাজ্য সরকারের কাছে গণডেপুটেশন দেন। পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম চতুর্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন : দাবী সম্পূর্ণভাবে না মেটা পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে।

বন্দিদের অনশন

জামশেদপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দিরা অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এই জেলটি আয়তনে ছোট। দেড়শো জনের জায়গায় এগারোশ বন্দিকে এখানে আটক রাখা হয়েছে। সুস্থ অসুস্থ নির্বিশেষে অখাদ্য খাবার বন্দিদের খেতে দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দিরা নিজেদের উদ্যোগে এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের মাধ্যমে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে এই নারকীয় অবস্থার কথা জানিয়েছেন। কোন ফল হয় নি। বহু রাজনৈতিক বন্দিকে চর্মরোগ এবং নানারকম ছোঁয়াচে রোগে ভুগছে এমন সব বন্দিদের সঙ্গে এক জায়গায় রাখা হয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষের বা সরকারের কোন নজর নেই।

এই জেলের বিক্ষুব্ধ বন্দীরা গত বাইশে এপ্রিল থেকে এই অব্যবস্থার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের লিগ্যাল এইড কমিটি বন্দিদের সুষ্ঠু এবং সম্মানজনক ব্যবস্থার দাবী করে এ ব্যাপারে বিহার সরকারের হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন।

পি. এ. টির
বলিষ্ঠ প্রযোজনা
ম্যাকবেথ' ৭২
১লা/১১ই মে
সকাল দশটা
রঙ্গনা
সাতদিন আগে হলে টিকিট

চীন-ভারত মৈত্রী

গত ছয়ই এপ্রিল শেওড়াফুলিতে চীন-ভারত মৈত্রী সমিতির হুগলী জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠনের দশ জন প্রতিনিধি এবং গ্রাম ও শহর এক মহকুমার দেড়শো জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মূল প্রস্তাবে ভারত-চীন সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণের দাবী জানানো হয়। ভারত-চীন সীমানা সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নেবার, ভারত-চীন জনগণের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগাযোগ অবাধে চালু করতে দেবার এবং ভারতের বুকে ভারত-চীন সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্ব বিরোধী সব কার্যকলাপ ও প্রচার বন্ধ করার দাবী জানানো হয়।

আরেকটি প্রস্তাবে মিসা আইনে আটক হুগলী জেলা ও ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির সদস্য সীতারাম ঘোষ এবং অন্ধ্র-ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির প্রস্তুতি কমিটির আটক সদস্যদের মুক্তি দাবী করা হয়। তৃতীয় একটি প্রস্তাবে কোন কোন বিদেশী দূতাবাস, সংবাদপত্র ও বেতার চীনের বিরুদ্ধে যে সব কুৎসা প্রচার করে ভারত-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিরোধিতা করছে তা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী জানানো হয়।

জেলা শাসকের মৌখিক প্রতিশ্রুতি এবং লিখিত সুপারিশ সত্ত্বেও স্থানীয় পুলিশ প্রকাশ্যস্থানে সভা করতে না দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতনেই প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার লোক সভাস্থলে প্রবেশ করতে না পেরে ফিরে যায়। প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ বিজয় বসু, উৎপল দত্ত প্রমুখ।

প্রতিবাদপ্রতিরোধ আন্দোলন

মেডিকেল প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভস এসোসিয়েশনের একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল বহরমপুরে। মোট সাড়ে তিনশো প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

সম্মেলনে সংগঠন সম্পাদক সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলীর ভাষণ থেকে জানা যায় : রাজ্যে প্রায় পনেরো কোটি ভেষজ সংস্থায় কর্মী বিক্ষোভ চলছে। কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কোন সমাধানের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না।

অল ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল এমপ্লয়িজ সংস্থার সম্পাদক জ্ঞানশঙ্কর মজুমদার বলেন : দেশে ওষুধ কোম্পানীর সংখ্যা দু হাজারের ওপর এবং তাতে বিশ হাজার মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ নিযুক্ত। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ডিসেন্ট ওয়েজের বদলে এই সব প্রতিনিধিদের দারিদ্র্য সীমার নীচে মাইনে দেওয়া হয়।

শ্রীমজুমদার আরও বলেন, শুধুমাত্র বিদেশী কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করে, সমস্যার সমাধান হবে না, সেই সঙ্গে দেশীয় পুঁজিবাদী সংস্থাগুলিকেও জাতীয়করণ করতে হবে। হাতী কমিটি ওষুধের দাম কমানোর কথা বলেছেন শতকরা পঁচিশ ভাগ। কার্যত তা হলে অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। ওষুধ বন্টনের জন্য ন্যাশনাল কর্পোরেশনের প্রয়োজন। পাবলিক সেক্টরের পরিবর্তে বেসরকারী সংস্থাকে ফর্মুলেশন তৈরী করতে দিয়ে সরকার বিদেশী সংস্থাগুলিকে কোটী কোটী টাকা মুনাফা করার সুযোগ দিচ্ছেন।

বাংলা ভাষার দাবী

বাঙলা ভাষা প্রচলন সমিতি রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রশাসন বিচার বিভাগ, কৃষি, প্রযুক্তিবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা সর্বস্তরে বাঙলা ভাষা প্রচলন দাবী করে একমাসব্যাপী আন্দোলনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। বাঙলা ভাষাকে সরকারী মর্যাদা দেবার জন্য এই সমিতির আরও দাবী : (ক) একষট্টি সালের ভাষা আইন সংশোধন করে বলিষ্ঠ এবং কার্যকর আইন বলবৎ করা হোক; (খ) বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য একটি ভাষা উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হোক।

বাঙলা ভাষা প্রচলনের স্বপক্ষে জনমত গঠনের জন্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে পথসভার মাধ্যমে আন্দোলনের বর্তমান পর্যায় চলবে এগারোই মে পর্যন্ত।

মহান লেনিনের জন্মদিনে নবজাতকের দুঃসাহসী ঘোষণা

প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভারতবর্ষের বুকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিনিয়তই তীব্রতর রূপ নিচ্ছে। মার্কসবাদের পথেই এই আন্দোলন পরিচালিত। তাই এই আন্দোলনের যারা কর্মী যারা দরদী প্রত্যেককেই সেই বৈজ্ঞানিক বিশ্বদর্শনের আলোকপ্রাপ্ত হতে হবে।
সেই উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ-এর

আশিস নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম এক মহান গ্রন্থের প্রকাশ। সেই গ্রন্থ ছিল।

স্তালিন রচনাবলী (বাংলা ভাষায় জীবনীসহ চোদ্দ খণ্ডে সম্পূর্ণ)।

বহু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে পাঠকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই উক্ত রচনাবলীর সাতটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অষ্টম ও নবম খণ্ড মে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি ১৯৭৫-এর মধ্যেই বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হবে। পাঠক পাঠিকাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী কালে

মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী (ইংরাজী ও বাংলায়) দুটি ভাষাতেই ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি। ইংরাজীতে দুটি খণ্ড ও বাংলায় একটি খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বাকী খণ্ডগুলি ১৯৭৫-এর মধ্যেই প্রকাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখনও গ্রাহক করা হচ্ছে ও সেই সঙ্গে প্রকাশিত খণ্ডগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে। আমাদের পাঠক পাঠিকাদের বিশেষ অনুরোধ ও তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান নায়ক মহামতি লেনিনের জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে এক দুঃসাহসিকতম পরিকল্পনা হাতে নিয়ে প্রকাশ করছে চলেছি।

লেনিন রচনাবলী

(বাংলা ভাষায় ৫০ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদনা : সুদর্শন রায়চৌধুরী

গ্রাহক হবার চাঁদা : ১০·০০ (দশ) টাকা। আমাদের পূর্ববর্তী রচনাবলীর গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৫·০০ (পাঁচ) টাকা।

১ম খণ্ড এ বছরের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হবে। যাঁরা গ্রাহক হবেন কেবল তাঁরাই প্রতি খণ্ডের নির্ধারিত মূল্যের শতকরা ২৫·০০ টাকা হারে কমিশন পাবেন। আজই আপনার নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করুন।

গ্রাহক সংগ্রহকারীদের বিশেষ সুযোগ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডাকযোগে গ্রাহক হয়ে বই সংগ্রহ করতে পারেন, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। গ্রাহক হবার শেষ তারিখ ৩১শে জুলাই ১৯৭৫।

নবজাতক প্রকাশন।। এ-৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—৭০০০১২

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক ভারত ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ পাবলিশার্স ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৯ই মে ১৯৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

১১ জন সাংবাদিক গোয়েন্দা দপ্তরের টাকা পান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের এগারজন সাংবাদিক রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের সোর্সমাণি থেকে নিয়মিত টাকা পান বলে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারা গেছে। মাস কয়েক আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এক সরকুলার পাঠিয়ে বলে যে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেন্দ্রের কাছে থেকে যে টাকা সোর্সমাণি পাচ্ছে তা কি ভাবে এবং কোন কোন সোর্সকে দেওয়া হচ্ছে তার যেন একটা রিপোর্ট পাঠান হয়।

জানা গেছে, রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাদের যে রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠিয়েছে তাতে তাদের সোর্সদের একটা গোপন তালিকাও আছে। রাজ্যের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামের সঙ্গে ঐ এগারজন সাংবাদিকেরও নাম তালিকায় আছে। দর্পণের সংবাদদাতা আরো জানতে পেরেছেন যে, রাজ্যে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের আগে মাত্র পাঁচজন সাংবাদিক ঐ সোর্সমাণির টাকা নিয়মিত পেতেন। কিন্তু ১৯৭২ সালের পর আরো ছজন সাংবাদিকের নাম ঐ তালিকায় যুক্ত হয়।

আরো জানা গেছে যে তারা গোয়েন্দা দপ্তর থেকে যে টাকা পান তার পরিমাণ প্রতিমাসে আড়াইশ টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। প্রতিবছর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এই বাবদ প্রায় সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা দেয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যে যখন নকশালদের আন্দোলন শুরু হয় তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জনৈক প্রগতিশীল কংগ্রেস নেতা এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর বার বার ঐ নেতার কাছে ঐ টাকার হিসাব চেয়ে চিঠি দিয়েও আজ পর্যন্ত কোন উত্তর পায় নি। বর্তমানে বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি পর্যালোচনা করে দেখছেন।

আগে গোয়েন্দা দপ্তরের সোর্সদের নকশাল ও সি পি এমের গোপন খবর নেওয়ার জন্য টাকা দেওয়া হতো। কিন্তু এখন কাজের কিছু হেরফের করা হয়েছে। এখন রাশিয়া বা কে জি বি সম্পর্কে কেউ কোন কথা বলছে কিনা অথবা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কে কি মন্তব্য প্রকাশ করছে অথবা কমিউনিস্ট বিরোধী কারা কিম্বা আমেরিকার হয়ে দালালী কেউ করছে কিনা অথবা লক্ষ্মীবাবু বা সুব্রত-

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

রক্তচোষা

রক্ত বিক্রী করা টাকার ওপরে ভাগ বসাচ্ছে কিছু মস্তান। একজন রক্ত অনুদানকারী এই মর্মে অভিযোগ করেছেন গোয়েন্দা দপ্তরে। অভিযোগে প্রকাশ, রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান এলাকার কয়েকজন মস্তান নিয়মিতভাবে রক্ত অনুদানকারীদের টাকায় ভাগ বসাচ্ছে। টাকার ভাগ দিতে অস্বীকার করলে সমস্ত টাকাই ওরা কেড়ে নেয়। এই অভিযোগের সূত্র ধরে গোয়েন্দা পুলিশ রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে।

ওষুধ নেই

শ্রীরামপুর হাসপাতালে গত দু মাস ধরে টি বি রোগের কোন প্রতিষেধক ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না বলে সংবাদে প্রকাশ। এই হাসপাতাল থেকে মাসিক দেড় হাজার রোগীকে বিনামূল্যে টি বি রোগের প্রতিষেধক ওষুধ দেয়া হত. বর্তমানে সরকারী সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গরীব রোগীদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছে বলে জানা গেছে।

আক্কেল গুড়ুম

কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে গত উনত্রিশে এপ্রিল দুজন বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধি গড়িয়া এবং শ্যামবাজার বাস টার্মিনাসে কিছুক্ষণ সময় কাটান। পরিবহন ব্যবস্থা দেখে তাঁদের কি ধারণা হয়েছে জানা যায়নি, তবে দু-একবার তাঁদের আঁতকে উঠতে দেখা গেছে। এই দুজন প্রতিনিধি হলেন রিচার্ড উডফোর্ড এবং মিঃ হোরউড।

বাস চলাচল ব্যবস্থা দেখার পর বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন বলে সংবাদে প্রকাশ।

জেলা ছাঁটাই

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন ও পরিধি কমানো দরকার। এই কথা বলেছেন উপাচার্য শ্রীসত্যেন সেন। তিনি বলেন, তিন লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর চলতে পারছে না। পঠন পাঠন পরীক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে স্বাভাবিকতা আনতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার কমানো দরকার। এই জন্য তিনি ছাড়তে চাইছেন নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলাকে। চান্সেলারের কাছে এই মর্মে এক চিঠি পাঠানো হয়েছে। সম্ভবত নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলাকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হবে। কল্যাণীতে বর্তমানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বাকি শুধু অনুমোদক বিশ্ববিদ্যালয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জে পি বিরোধী আন্দোলনে নামলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সতেন্দ্রনাথ সেন প্রকাশ্যে সি পি আই-এর সঙ্গে জয়প্রকাশ বিরোধী আন্দোলনে নামলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় উচ্চতম এবং পবিত্র শিক্ষাঙ্গনের প্রধান রূপে স্বপদে বহাল থেকে খোলাখুলি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার নজির ডঃ সেনই সম্ভবতঃ প্রথম সৃষ্টি করলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বৎসরের সমাবর্তন উৎসবে আচার্য এ এল ডায়াস শিক্ষাবিদদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন ঃ বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতি মুক্ত রাখুন। ঐ উৎসবেই বর্তমান উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু সেই উপাচার্য ডঃ সেনই গত তেসরা মে মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক সভায় ঘোষণা করলেন, জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল। এর মোকাবিলা করার জন্য তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের আহ্বান জানান। ফাসিবিরোধী শিক্ষক সম্মেলনের আহ্বানে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের দুই সম্পাদক সৌগত রায় এবং নিত্যানন্দ দে। আর ছিলেন সি পি আই নেতা অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত, ডঃ মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ফ্যাসিবিরোধী ঐ সভায় যাওয়া আকস্মিক নয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারা গেছে বিগত সপ্তাহে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সৌগত রায়ের সঙ্গে ডঃ সেনের এক গোপন বৈঠক হয়। ছিয়াত্তর সালের পর ডঃ সেনের বর্তমান কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার পর তিনি যাতে আজীবন উপাচার্য থাকতে পারেন সেই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরই নাকি উপাচার্য খোলাখুলি রাজনৈতিক আসরে নামতে সম্মত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

দর্পণের দাম বাড়ছে না

দর্পণের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর দর্পণের বহু পাঠক টেলিফোনে অথবা লিখিতভাবে আমাদের অনুরোধ করেছেন দাম না বাড়াবার জন্য। সেইজন্য আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও আমরা দর্পণের দাম আপাততঃ না বাড়িয়ে ৪০ পয়সাই রাখছি।

বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা সর একঝাট্টা

মুখ্যমন্ত্রী দুইগোষ্ঠীরই বিরাগভাজন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে বিদ্রোহীরা যে ভাবে প্রবীণ এবং নবীন কংগ্রেসকর্মীদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তাতে প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী উদ্বিগ্ন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সাম্প্রতিক মতিগতি বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে বলে মনে করে প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী মুখ্যমন্ত্রীর উপরও ক্ষুব্ধ। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কিন্তু ঐ সম্মেলনের শক্তিসমাবেশ দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

বিদ্রোহী গোষ্ঠীরা স্বভাবতই উৎসাহী। তাঁরা এতটা উৎসাহী যে তাঁরা দক্ষিণ কলকাতা সম্মেলনের ধরণের সারা পশ্চিম বাংলা সম্মেলন ডাকার কথা ভাবছেন।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

আগামী সংখ্যা ভিয়েতনাম সংখ্যা

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যার পরিবর্তে দর্পণের আগামী সংখ্যা ভিয়েতনাম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে।

সিদ্ধার্থর দেবী-বিরোধী অভিযান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সিদ্ধার্থ রায় এবার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লপচপানি বন্ধ করার প্রয়াসে নেমেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেবীবাবুকে পাল্লা দেওয়ার মত কোন কংগ্রেসী সংসদ সদস্য এখন নেই। সিদ্ধার্থবাবু চেষ্টা করছেন আগামী মাসে রাজ্যসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন নামী লোককে মনোনয়ন দেওয়ার।

শোনা যাচ্ছে তিনি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডঃ বি ডি নাগ চৌধুরীকে রাজী করিয়েছেন এ ব্যাপারে। ডঃ নাগ চৌধুরী বহুদিন দিল্লীতে সুপরিচিত। পশ্চিমবঙ্গেও তাঁর ভাবমূর্তি তৈরী করা খুব শক্ত নয়। ভবিষ্যতে ওকে দেবীবাবুর বিকল্প হিসেবে খাড়া করা হয়ত শক্ত হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছয়জন রাজ্য-

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

১৬শ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা
শুক্রবার, ৯ই মে ১৯৭৫

কংগ্রেসীদের চরিত্র

উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসীদের মধ্যে বিরোধে মর্মাহত ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন দলের স্বার্থে ঐক্যের প্রয়োজন। দলের স্বার্থে মানে তাঁর ক্ষমতাসীন থাকার স্বার্থে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেভাবে বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রেও কংগ্রেসীদের ক্ষমতার লাড়াই এবং আখের গুছোনো নিয়ে খেয়োখেয়ি চলছে তাতে ক্ষমতালিপ্সু ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে শঙ্কিত হওয়ারই কথা। এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে, তাঁর নিজের দল কংগ্রেস ও দেশের স্বার্থের প্রতি তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, কোন দিন ছিল না। কংগ্রেস দলটি না থাকলে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের গদি থাকে না, তাই এই দলের অস্তিত্বের প্রয়োজন।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ঐক্যের কথা বললেও কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যের কোন সম্ভাবনাই আজ নেই। কারণ কংগ্রেসে যারা ভিড় করেছে তাদের কোন নীতির বালাই নেই এবং যাদের কিছু অনুগামী আছে তাদের সকলেই এক একজন সেল্ফ-স্টাইলড্ নেতা। এই নেতারা কংগ্রেস দলের বা নেতৃত্বের কোন পরোয়া না করেই নিজেদের প্রভাবের পরিধি বাড়াতে শুরু করে দিয়েছিলেন ১৯৭১ সালে সিপিএম উৎখাতের সময় থেকে। আজ তাঁরা বিভিন্ন ফ্রন্টে নিজের উপদল মারফৎ বিশেষ প্রভাবশালী। এদের সকলকে এক ঘাটে জল খাওয়ানো বাঘ ও গরুকে একঘাটে জল খাওয়ানোর সামিল। "এশিয়ার মুক্তি সূর্যের" পক্ষেও এই অসাধ্য সাধন সম্ভব নয়। তাই রাজ্যে মন্ত্রিসভার তালগোড় চলছে। সব ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীই বিরোধী গোষ্ঠী গজিয়ে উঠছে এবং তার সংখ্যাও একাধিক। বিরোধীরা একজোট হলেই মন্ত্রিসভার পতন ঘটছে। আপসে মুখ্যমন্ত্রী বদল হলেও ঘটনার চরিত্র এক। নির্বাচন, মনোনয়ন নিয়েও একই গোষ্ঠীবিরোধ ও ল্যাং মারামারি। মনোনয়ন না পেলেই ডামি প্রার্থী দাঁড় করিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে কুপোকাৎ করার চেষ্টা। একদিকে দুর্নীতি ও অন্যদিকে গোষ্ঠী লড়াই—এই কংগ্রেসীদের চরিত্র। এবং এর আদর্শ প্রতীক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

গোপালদাস নাগ দিল্লী যেতে চান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে চাইছেন এবং রাজ্যসভায় তাঁকে একটি আসন দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছুদিন আগে অনুরোধ করেছেন বলে ডঃ নাগের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে।

ডঃ নাগ নানা কারণে এর আগেও রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। শুধু মুখে নয় একবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগ পত্রও পেশ করেছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা গ্রহণ করেন নি।

আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার খোঁজেই ডাঃ নাগ দিল্লী যেতে চাইছেন। মন্ত্রি হিসাবে ডাঃ নাগ খুবই যোগ্য এই অভিমত সিদ্ধার্থবাবু সহ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের। অবশ্য অনেক তরুণ নেতা সে ধারণা পোষণ করেন না। তাদের বক্তব্য গত চার বছরে ডঃ নাগের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যে সম্ভাবনা ও যোগ্যতা নিয়ে ডাঃ নাগ একাত্তরে মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন, আজ তা পুরোপুরি মালিকদের স্বার্থে নিয়োজিত হচ্ছে।

সে যাই হোক ডাঃ নাগের ধারণা রাজ্য মন্ত্রিসভার রাজনীতিতে খুব বেশী পদোন্নতির সম্ভাবনা তাঁর নেই। সে ক্ষেত্রে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হলে ডাঃ নাগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পাবেন বলে আশা করেন এবং নিজ যোগ্যতা দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হবেন। জানা গেছে মুখ্যমন্ত্রী এ পর্যন্ত তাঁর মতামত ডাঃ নাগকে জানান নি।

ভিয়েতনাম বিজয়োৎসব

(দর্পণের প্রতিনিধি)

"আরও ত্যাগ, আরও রক্ত, আরও বলিদান প্রয়োজন হবে ভারতবর্ষে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে। ভিয়েতনাম বিজয় উৎসব পালনের জন্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত গত বুধবার শহীদ মিনারের এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে জনগণের প্রতি এই আহ্বান জানান মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত।

শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে আরও বলেন ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ লেনিনবাদের সঠিক প্রয়োগ করে ঐ দেশের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল করেছিলেন। জনগণের অসীম ত্যাগ ও সঠিক নেতৃত্ব আজ ভিয়েতনামকে মুক্ত করেছে। শুধু ভিয়েতনাম নয় সমগ্র ইন্দোচীনে যে মুক্তির জোয়ার এসেছে তা [illegible] ভারতবর্ষও পিছিয়ে থাকবে না। [illegible] জন্য জনগণকে আরও ত্যাগ স্বী[illegible] করতে হবে।

কলকাতা ও আশেপাশের জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে এই সভায় যোগ দেন। রক্তরঞ্জিত পতাকায় সজ্জিত মঞ্চে হো-চি-মিনের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছিল।

শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। শ্রীবসু বলেন, ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়া সমগ্র ইন্দোচীন প্রমাণ করেছে সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল করতে পারলে শতগুণ বেশী সামরিক শক্তি নিয়েও

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সাব-ইঞ্জিনীয়ারদের আন্দোলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারদের চাকুরীগত দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন কি আবহমান কাল ধরেই চালাতে হবে? রাজ্যের সাড়ে তিন হাজার সাব এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারের মুখে আজ এই একটিই প্রশ্ন। রাজ্যের সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক কাজেই এই ইঞ্জিনীয়ারদের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। তবু সেই মান্ধাতা আমলের তিনশো-ছয়শো টাকা বেতন কাঠামো সম্পন্ন অচল অনড় দুর্দশাজীর্ণ অবস্থার মধ্যেই এরা মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছেন।

এল আই সি, ব্যাঙ্ক, মার্কেন্টাইল সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত সার পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি যে কোন সংস্থার কর্মীদের বেতনের সঙ্গে এই সাব এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের পার্থক্য তিনশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা। ত্রিপুরা আসাম অরুণাচল মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যের অনুরূপ কর্মচারীদের সঙ্গেও এদের বেতন পার্থক্য দেড়শো থেকে একশো পঁচাশি টাকা পর্যন্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনাথ চাটার্জী সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন : জনসাধারণ ও কর্মচারীদের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য কিছুদিন আগে তথাকথিত সিলেকশন গ্রেড, মহার্ঘভাতা, ডি এ পে এবং বহির্বিভাগীয় কর্মীদের জন্য অতিরিক্ত টি এ ইত্যাদির নামে যা ঘোষণা করা হয়েছে তা রীতিমত ধিক্কারের যোগ্য। এর ফলে আশি শতাংশ লোক কোন কালেই কোন সুবিধা পাবেন না এবং গ্রেড কার্যকরী হলেও নানান জটিলতা দেখা দেবে। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত ইঞ্জিনীয়াররা পাঁচশো টাকা বেতন পর্যন্ত বাড়ীভাড়া ভাতা পান এবং সাড়ে পাঁচশো টাকা বেতন হলেই আর কোন ভাতা পান না। ট্রাইব্যাল ওয়েল ফেয়ার, সোস্যাল রিলিফ, টেস্ট রিলিফ ব্রিক প্রোডাকশন, কনস্ট্রাকশন বোর্ড লোকাল ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতি দপ্তরে পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা নেই। আই বি এম কোম্পানীর সঙ্গে গোপন চুক্তির মাধ্যমে সরকার প্রতিটি ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের কাজ ইলেকট্রনিক কমপিউটারের মাধ্যমে করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে অবিলম্বে সরকারের পক্ষের ইঞ্জিনীয়ার উদ্বৃত্ত দেখানো সম্ভব হবে। সরকারের ষড়যন্ত্র আজ সর্বব্যাপী।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাব এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়াররা আবার আন্দোলনে নামছেন আগামী উনিশে থেকে। চব্বিশে মে পর্যন্ত প্রতিটি ইউনিটে সাধারণ সভা থেকে প্রস্তাব গ্রহণ এবং অফিস কর্তৃপক্ষ মারফৎ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তা প্রেরণ করা হবে। সাতই জুন সারারাজ্যে গণতান্ত্রিক কনভেনশন ও একুশে জুন জেলায় জেলায় আট ঘন্টা গণ-অবস্থান। এছাড়া সারা মাস ব্যাপী গণস্বাক্ষর অভিযানও চলবে।

এ বি টি এর সম্মেলন

গত ছাব্বিশে-আঠাশে এপ্রিল এ বি টি-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার ত্যাগরাজ হলে। প্রায় সহস্রাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এবারের সম্মেলন সফল হয়েছে। সম্মেলনে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সুস্থ জীবন জীবিকার প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন কাঠামোর পরিবর্তনের নামে সরকারী বঞ্চনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে মিসা ডি আই আর ও জরুরী অবস্থা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবীও জানানো হয়েছে এই সম্মেলনে।

সম্মেলনে মোটামুটিভাবে স্থির হয়েছে যে আগামী জুন জুলাই মাসে মাধ্যমিক শিক্ষকরা রাজ্যব্যাপী লাগাতার বিভিন্নমুখী আন্দোলন শুরু করবেন। তিন দিনের এই সম্মেলনের বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অশোক মিত্র, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং এছাড়া রাজ্যের শিক্ষক প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

পুস্তক ব্যবসায়ী কর্মচারী সমিতি

গত ছাব্বিশে এপ্রিল মহাবোধি সোসাইটি হলে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক ব্যবসায়ী কর্মচারী সমিতির চতুর্বিংশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীদুলালচন্দ্র দাস। অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন নিখিল ভারত পুস্তক ব্যবসায়ী কর্মচারী ফেডারেশনের শ্রীনৃপেন নন্দী ও শ্রম আদালতের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী শ্রীঅনিলদাস চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রীতিরঞ্জন দাস তাঁর বিস্তারিত রিপোর্টে বলেন যে সপ্তম শ্রম আদালতের রায়ের সঙ্গে সঙ্গে সমিতির প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন শেষ হয়েছে। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু করতে হবে। সমগ্র পুস্তক

প্রতিবাদপ্রতিরোধ আন্দোলন

ব্যবসায়ে বেতনের হার ইত্যাদি প্রবর্তনের জন্য শিল্পভিত্তিক ট্রাইব্যুন্যাল গঠনের দাবী নিয়ে এবং তার সাংগঠনিক ও অন্যান্য প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। শ্রীবিমল গুপ্ত ও শ্রীমনোজ সেন সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে

পণপ্রথার বিরুদ্ধে গত ছয়ই মে মহিলারা বিধান সভা অভিযান করেন। প্রায় পাঁচশো মহিলার সংগঠিত এক মিছিল পরিচালিত হয় গীতা মুখার্জী ও ফুলরেণু গুহ প্রমুখের নেতৃত্বে। মিছিল মেয়ো রোডে পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পঁচিশ জনের এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিন দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করেন। দাবী তিনটি হল : (এক) বর্তমান পণপ্রথা আইনের সংশোধন করে, এই পণব্যবস্থাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করতে হবে, (দুই) এই অসৌজন্য মূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে আদালতের আই[illegible] বিষয়ক সব খরচ খরচা সরকার[illegible] বহন করতে হবে। (তিন) বিবাহি[illegible] জীবন থেকে বিতাড়িত এবং আই[illegible] সিদ্ধান্তের ফলে অনাথ মেয়েদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা স্বয়ং সরকারকেই করতে হবে।

কিছু কংগ্রেসী সদস্য পি এ সির গোপনীয়তা ভাঙলেন

রাজধানী দর্পণ

কপিল রায়

নতুনদিল্লী, পয়লা মে ঃ নিছক দলীয় স্বার্থে কংগ্রেস যে কিভাবে সংসদীয় প্রথা ও রীতিকে পদদলিত করে থাকেন তার আর একটি নতুন নজির দেখা গেল এ সপ্তাহের রাজ্যসভা ও লোকসভায়, সংসদের পাবলিক আকাউন্টস কমিটির সদ্য পেশ করা ১৯৭৪-৭৫ সনের ১৫৯ নম্বরের প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে। গত কাল তিরিশে এপ্রিল শেষ হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সনের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির আয়ুষ্কাল। আর শেষ হয়েছে তার চেয়ারম্যান শ্রীজ্যোতির্ময় বসুর দুই বছরের কার্যকাল। আজ পয়লা মে নতুন পাবলিক আকাউন্টস কমিটি কার্যভার গ্রহণ করেছেন আর তাঁর চেয়ারম্যান হয়েছেন শ্রীহীরেন মুখার্জী।

সংসদের ব্যাপারে মুখ্যত বৃটিশ হাউস অব কমন্সের রীতিনীতি ও প্রথাদি অনুসরণ করলেও ক্ষমতাসীন দল অর্থাৎ কংগ্রেস কিন্তু গোড়াতে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদের সম্পর্কে বৃটিশ প্রথাকে মান্যতা দেন নি। তাই গোড়ার দিকে পাবলিক আকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদটি কংগ্রেস দলের কুক্ষিগত ছিল। অথচ বৃটেনে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে সব সময়ে থাকেন বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধি। সরকারের হিসাবপত্রঘটিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রশ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজ নিয়ে দেখবার দায়িত্ব থাকে এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পি এ সি) হাতে। তাই অনেক গোপন তথ্য ও দলিলপত্র এই কমিটির নজরে আসবার সম্ভাবনা। এহেন কমিটির চেয়ারম্যান পদটি তাই নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এ হেন পদ বিরোধী পক্ষের হাতে গেলে তার ভেতর দিয়ে কংগ্রেস সরকারের অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হবার আশঙ্কা থেকে যায়। আর ঠিক সেই কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কংগ্রেস সতত সচেষ্ট ছিলেন সেই পদটিকে বিরোধীপক্ষীয়দের নাগালের বাইরে রাখতে। কিন্তু তাঁদের সেই কায়েমী স্বার্থপ্রয়াস শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারা গেল না। ১৯৬৭ সনে সারা ভারতে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বেধড়ক মার খেয়ে হেরে গেলে, এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে শুরু করে পূর্বে পশ্চিমবাংলা রাজ্যগুলিতে অবধি। অ-কংগ্রেস সরকার গঠিত হবার পর কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার বিরোধী পক্ষের চাপে পড়ে পি এ র চেয়ারম্যানপদ বিরোধী পক্ষের -তে তুলে দিতে রাজি হন, বৃটিশ াকে মান্যতা দেন। বিরোধীপক্ষের কে যিনি সর্বপ্রথম পি এ সির চেয়ারম্যান হলেন তিনি হচ্ছেন স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীমিনু মাসানী। শ্রীমাসানীর পরে পি এ সির চেয়ারম্যান হয়েছিলো জনসংঘ নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী তার পরে ঐ পদে এসেছিলেন ডি এম কে নেতা শ্রীএরা সেঝিয়ান। আর তারপরে চেয়ারম্যান হয়েছিলেন শ্রীজ্যোতির্ময় বসু।

পি এ সির চেয়ারম্যান পদের কার্যভার ত্যাগ করবার আগে বিদায়ী চেয়ারম্যান শ্রীজ্যোতির্ময় বসু অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সদনে পেশ করেছেন পি এ সির পক্ষ থেকে। আর এই সবের ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নানা দুর্নীতির ও গাফিলতির অনেক গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেছে। এমনই একটি প্রতিবেদন ছিল পি এ সির উপরোক্ত ১৫৯ নম্বরের প্রতিবেদনটি।

গত আঠাশে এপ্রিল পি এ সির পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদনটি রাজ্যসভায় পেশ করতে উঠলেন রাজ্যসভার সদস্য এবং পি এ সির অন্যতম সদস্য শ্রীটি এন সিং। প্রশ্নোত্তরকালের পরে শ্রীসিং উক্ত প্রতিবেদনের চারটি কপি সভায় পেশ করামাত্রই পি এ সির অন্যতম সদস্য ও কংগ্রেস সংসদীয় দলের ডেপুটি লিডার শ্রীভি বি রাজু উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবেদন পেশ করার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। শ্রীরাজুর এই আপত্তি উত্থাপনে সদনে অনেকেই হতচকিত হয়ে পড়েন। কারণ পি এ সি প্রভৃতি কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কে উক্ত কমিটির কোন সদস্যকে ইতিপূর্বে কোন দিন প্রকাশ্য সদনে কোন রকম আপত্তি তুলতে দেখা যায় নি। সংসদীয় কমিটিগুলির রীতি হচ্ছে যে তার সভার কোন কার্যবিবরণী প্রকাশ করা অবৈধ—আর এই সবকমিটিতে ভোটাভুটির ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না এবং কমিটিতে কোন রকমের মিনিট অব ডিসেন্ট বা মতবিরোধনামা পেশ করবারও রেওয়াজ নেই। অর্থাৎ মতপার্থক্য যদি কিছু ঘটে তা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে নিয়ে প্রতিবেদন পেশ করা হয়—কোন সদস্য তাঁর মতপার্থক্য সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না। সেই কারণেই শ্রীরাজুর এই আপত্তি উত্থাপনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম নির্বাচিত সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর (ইনিও রাজ্যসভায় কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য) তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সদনেই বলেন যে প্রতিবেদনটি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ও লোকসভার অধ্যক্ষ দ্বারা সদনে পেশ করবার জন্য নির্দেশিত হয়েছে। তাই সদনে তার বিরোধিতা করা শ্রীরাজুর পক্ষে অত্যন্ত অশোভন ও সুপ্রতিষ্ঠিত সংসদীয় শালীনতার বিরোধী।"

শ্রীরাজু অবশ্য শ্রীচন্দ্রশেখরের মত মেনে নিলেন না। তিনি বললেন যে এই প্রতিবেদনের সঙ্গে পি এ সি সদস্য হিসেবে তাঁর নামও জড়িত এবং এই প্রতিবেদন তাঁর অনুমোদন লাভ করে নি। তাঁর মতে প্রতিবেদনটি সকলের অনুমোদনে পাকাও হয় নি। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁ নিজের অবস্থাটি পরিষ্কার করবার জন্য তিনি আপত্তি উত্থাপনে অধিকারী এবং তাই তিনি করছেন। পি এ সির অন্যতম কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য শ্রীমোহম্মদ উসমান আরিফ শ্রীরাজুর বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। জনসংঘের শ্রীআদভানী, বি এল ডির শ্রীরবি রায় ও কংগোর শ্রীটি এন সিং শ্রীচন্দ্রশেখরের অভিমতকে সমর্থন করলেন। অবশ্য এস পি দলভুক্ত সদস্য শ্রীএন জি গোরে বললেন যে প্রতিবেদন গৃহীত হয় নি। তাই সেটি পেশের ব্যাপারে পি এ সির সদস্য হিসেবে শ্রীরাজু আপত্তি উত্থাপনে অধিকারী। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান শ্রীবি ডি জাত্তি অবশ্য বললেন যে প্রতিবেদনগুলি সদনে পেশ করা হয়েছে কারণ সেগুলি লোকসভার সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এই পেশকরা রুখবার অধিকার রাজ্যসভা সেক্রেটারিয়েটের নেই, এ ব্যাপারে তাঁরা নিছক "ডাকঘরের কাজ" করছেন। তবে সদনের কার্যবিবরণীর এই অংশটুকু লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন তাঁর স্পষ্টীকরণের জন্য। এই ঘটনা ঘটল আঠাশে এপ্রিল।

পরদিন লোকসভায় শ্রীরাজুর বিরুদ্ধে বিশেষাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব আনতে চাইলে শ্রীমধু লিমায়ে, শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্র ও শ্রীজ্যোতির্ময় বসু। কংগ্রেস পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবের ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা করা হল। পি এ সির অন্যতম সদস্য শ্রীওয়াই এস মহাজন (কংগ্রেস) বললেন প্রতিবেদনটি কমিটি দ্বারা আদৌ অনুমোদিত হয় নি। শ্রীবিভূতি মিশ্র (কংগ্রেস) বললেন যে পি এ সির এই সভাটি মহাবীর জয়ন্তীর দিনে ডাকা হয়েছিল ছুটির দিনে সভা ডাকা অবৈধ এই কথা বলে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সভায় যোগ দেন নি।

শ্রীমধু লিমায়ে প্রমুখরা বললেন যে পি এ সির বৈঠকে কি হয়েছে বা না হয়েছে সে কথা প্রকাশ করা বিশেষাধিকারভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে আর বৈঠকের সব কিছুই গোপনীয়। পি এ সির এই সব সদস্যরা তাঁদের এই সব বক্তব্যের ভেতর দিয়ে সেই গোপনীয়তাকে ভঙ্গ করছেন। এ সব অত্যন্ত খারাপ নজির। ভবিষ্যতে পি এ সি প্রভৃতি সংসদীয় কমিটির কাজকর্ম এর ফলে বাহত হবে। শ্রীমধু লিমায়েরা এও বললেন যে পঁচিশে এপ্রিল তারিখে এই প্রতিবেদনটি যখন লোকসভায় পেশ করা হয় তখন কেউই তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি করেন নি কিংবা কেউ মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়ের কাছে চিঠিপত্র দিয়েও কখনও জানান নি যে প্রতিবেদনটি পি এ সির বৈঠকে অনুমোদিত হয় নি। এ অবাথস্থ উনত্রিশে তারিখে এই সব ওজর আপত্তি তোলাটা পশ্চাৎ চিন্তার ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরাই এই সব কমিটিতে সংখ্যাগুরু। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে এধরণের প্রথা ও রীতি বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হলে ভবিষ্যতে এই সব কমিটির কাজ অর্থহীন হয়ে পড়বে। লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিশেষাধিকার ভঙ্গ প্রসঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত রুলিং পরে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কি রুলিং দেন এখন সেটাই লক্ষ্যণীয়। তবে এখানকার সচেতন রাজনৈতিক মহলের ধারণা ভবিষ্যতে এধরণের কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কে বিরোধীপক্ষের কেউ ভিন্নমত পোষণ করলে তা যে তিনি সদনে প্রকাশ করবেন তাতে কোন সংশয় নেই। কংগ্রেস সদস্যরা তাঁদের কাজের ভেতর দিয়ে তার পথটি খোলসা করে দিলেন। অর্থাৎ দলীয় স্বার্থে কংগ্রেস সংসদীয় কমিটিগুলির গোপনীয়তার আবেষ্টনীকে চিরদিনের মত ভেঙ্গে দিলেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের শিক্ষা

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মুক্তি যুদ্ধের অসাধারণ সাফল্য এশিয়া-আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার আরো নতুন নতুন সাফল্য নিয়ে আসবে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ এটা প্রমাণ করে দিয়েছে মানুষের দেশপ্রেমের জোর পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের শক্তিমত্তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সর্বমোট যে পরিমাণ বোমা পড়েছিল তার সাড়ে তিন গুণের বেশী বোমা ফেলা হয়েছে এই ছোট্ট দেশে। এই ছোট্ট দেশটাকে

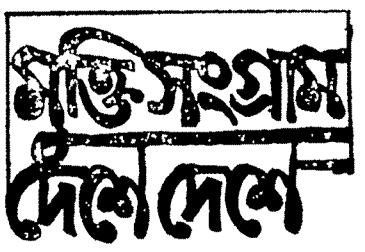

চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পঁচাত্তর লক্ষ টন বোমা ফেলেছে। আর খরচ করেছে দেড়শ বিলিয়ন ডলার। লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করেও ভিয়েৎনামের মানুষকে দাবিয়ে রাখা যায় নি। ভিয়েৎনাম মুক্তিযুদ্ধের একটি বড় শিক্ষা এই যে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকলে সেই মুক্তিযুদ্ধের জয় অনিবার্য। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদের কুপ্রভাব যাতে ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপরে না পড়ে সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি দিয়েছেন ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধরা।

কাম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন ভারসাম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারত দরিয়ায় জলকেলির নাম করে দিয়াগো গারসিয়া সামরিক ঘাঁটির যে চক্রান্ত করছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার না হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অর্জিত মুক্তির বিপদ আছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে কিছুটা পিছু হটেছে। তার মানে এই নয়, সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখনো তাইল্যান্ডে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলদের শাসন বর্তমান। ফিলিপাইনে এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন পুতুল সরকার বর্তমান।

এটা ঠিক যে, এই সব অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই পুরনো কায়দায় ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করবে না। নতুন কায়দায় অর্থনৈতিক সাহায্যের ছদ্মবেশে সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ করবে। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে সেই চিরাচরিত কুৎসা প্রচার তো আছেই। সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর স্বাধীন অর্থনীতি গড়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যে সাহায্য করে যাচ্ছে তাকে ছোট্ট করে দেখানো বা বিকৃত করে দেখানোর কৌশল সি আই এ বহু পূর্বেই নিয়েছে। কারণ এখন আর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সরাসরি দালালি করে মানুষের মনকে জয় করা সম্ভব নয়। তাই কৌশল ভিন্ন।

সুতরাং বর্তমানে ভিয়েৎনামে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উৎসবকে নিজের মনে করতে হলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কৌশল সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। সুখের কথা, ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়ার মুক্তিযোদ্ধরা এ বিষয়ে সতর্ক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বশেষ খবরে জানা যায় তাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট গেরিলারা প্রতিক্রিয়াশীলদের বহু ঘাঁটি ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফিলিপাইনেও কমিউনিস্ট গেরিলাদের গতিবিধির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট গেরিলাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকার এখন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছে: ওদিকে দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন পুতুল সরকার আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে কঠোর আইন জারী করছে। কমিউনিস্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার, পিটুনি চলছে। ওদের ভয় এই বুঝি কমিউনিস্টরা দেশটা দখল করে নেয়।

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস : ১৯৫৯

দিলীপ মজুমদার

এগার পর্ব ॥

তবে কী চৈতন্যোদয় হল আনন্দবাজার পত্রিকার? তা না হলে আঠারই সেপ্টেম্বর এমন গরম সম্পাদকীয় লেখা বেরুল কেমন করে? যে আনন্দবাজার স্তাবকতায় এত পারদর্শী, যে আনন্দবাজারে ছয়ই সেপ্টেম্বর সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয়েছিল একত্রিশে আগস্ট থেকে তেসরা সেপ্টেম্বরের ঘটনা হল—"রাজনীতি ও গুণ্ডানীতির মধ্যে অশুভ পরিণয়"—সেই আনন্দবাজারে আঠারই সেপ্টেম্বর "তদন্ত প্রয়োজন" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হল, "ইহা নিশ্চিত যে, মাত্র পাঁচ দিনে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুলিশী গুলিবর্ষণে হতাহতের অসাধারণ স্ফীতকায় সংখ্যাটি অনেকের নিকটেই ভীতিপ্রদ হইয়াছে। ..... মামুলী প্রশাসনিক তদন্তের ভরসা দিবার কোন সদর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার কর্তৃক লাল ফিতা দুরস্ত তদন্তে মন্ত্রীগণের মুখরক্ষা হইতে পারে, জনমত তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না।" একত্রিশে আগস্ট থেকে তেসরা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘটনার তদন্ত সত্যই প্রয়োজন ছিল। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি সহ বহু প্রগতিশীল সংগঠন এবং বিবেকমান মানুষ তদন্তের দাবি জানিয়ে সরকারের নিকট আপন আপন বক্তব্য পেশ করেছিলেন। সরকার লোক দেখান একটা তদন্তের আয়োজন করার উদ্যোগ দেখাচ্ছিলেন। তার প্রতিবাদ করে মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল—"কলিকাতা, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণায় সম্প্রতি যে গুলিচালনা হইয়াছে সে সম্পর্কে পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার্যকরী বিভাগের তদন্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ জনসাধারণকে লাঠি গুলি দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকারের যে কার্যকরী বিভাগ ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহারাই সীমাবদ্ধভাবে প্রহসনসম এক তদন্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সরকারের এই শয়তানী সিদ্ধান্তকে প্রতিরোধ কমিটি গুরুতর অপমানসূচক মনে করে এবং ইহাকে ধিক্কৃত করিতেছে।" (স্বাধীনতা, ১৮-৯-৫৯)। কিন্তু এত গেল সরকারের ভাষায় "কমিউনিস্ট" অথবা "কমিউনিস্ট সুলভ" লোকেদের কথা। অবশেষে ব্রুটাস তুমিও! আনন্দবাজারও অবশেষে তদন্তের দাবি জানাল! আসলে জনতার রুদ্ররোষে আনন্দবাজার সেদিন ভবিষ্যত অস্তিত্বের ব্যাপারটি সম্পর্কে সচেতন হতে চেয়েছিল।

কিন্তু অচল অনড় পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সম্ভবতঃ এই প্রথম এত ব্যাপকভাবে মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া সম্ভব হল তার পক্ষে। নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের তাজা রক্ত। তার আলাদা আকর্ষণ, আলাদা উন্মাদনা। তাই দেখা গেল, খাদ্য আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় সরকারের প্রবল অনীহা। কোন রকম মীমাংসার সূত্র অনুসন্ধানে তার আগ্রহ নেই বিন্দুমাত্র। তাই ব্যর্থ হয়ে গেল অধ্যাপক, লেখক ও শিল্পীদের সদিচ্ছা ও আবেদন, ব্যর্থ হল শ্রীত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখের দৌত্য। "আগে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে"—এই হল সরকারের নবতম কৌশল; অতঃপর তাঁরা বিবেচনা করবেন খাদ্য সম্পর্কিত দাবি সঙ্গত না অসঙ্গত। কোন বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব নয় যে, উক্ত কৌশলের পেছনেই রয়েছে সুপরিকল্পিত দুরভিসন্ধি। তা না হলে উনিশে সেপ্টেম্বরের সরকারী প্রেসনোটেও কেন সরকার তাঁর পুলিস ও প্রশাসনের কৃতকর্ম সম্পর্কে ন্যূনতম সত্যভাষণের সততা দেখালেন না? উনিশে সেপ্টেম্বরের সরকারী প্রেসনোটে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিককার ঘটনা সম্পর্কে "নির্জলা নির্ভুল তথ্য প্রকাশিত হল। "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবে কলিকাতায় পুলিসের আঘাতে নিহতের সংখ্যা সতেরো জন এবং জনতার হিংসাত্মক কার্যের ফলে নিহতের সংখ্যা তিন জন। পরে হাসপাতালে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে এই হিসাবে তাঁহাদেরও ধরা হইয়াছে। পনেরো জনের মৃতদেহ তাঁহাদের আত্মীয়ের নিকট দেওয়া হইয়াছে। তিন জনের মৃতদেহ সনাক্ত করা যায় নাই এবং দুই জনের মৃতদেহ সনাক্ত করা হইলেও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনেরা মৃতদেহ সম্পর্কে কোন দাবি করেন নাই। এই পাঁচজনের মৃতদেহ হিন্দু সৎকার সমিতি মারফৎ দাহ করা হয়।" বিকৃত তথ্য, আশালীন উপস্থাপনা এবং সর্বোপরি মৃতের প্রতি ন্যূনতম সমানবোধের নজিরব্যতীত এই বক্তব্য সরকারী মনোভাবকে যথার্থভাবেই প্রতিফলিত করেছে। শুধু কী তাই? যে "স্বাধীনতা" পত্রিকায় খাদ্য-আন্দোলনের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করা হচ্ছিল সেই স্বাধীনতা পত্রিকার উপরেও নেমে এল আক্রমণ। বিশে সেপ্টেম্বর উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত খাদ্য আন্দোলনের রিপোর্ট সম্পর্কিত মূল দলীল ও রেকর্ড সন্ধানে পুলিশ পত্রিকা দপ্তরে চালাল খানাতল্লাশী। তল্লাশী পরোয়ানায় দেখা গেল যে, তেরোই সেপ্টেম্বর স্বাধীনতা পত্রিকায় "দাশ নগরে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কে" শীর্ষক একটি পত্রের জন শ্রীআলামোহন দাশের পুত্র শ্রীপ্রভাত কুমার দাশের অভিযোগক্রমেই পুলিশ এই পবিত্র কর্তব্যে উৎসাহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িককালে এ ছাড়াও স্বাধীনতা পত্রিকার বিরুদ্ধে আরও তিনটি মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সদস্যদের বলেছিলেন যে, কলকাতা-চব্বিশ পরগণা ও হাওড়ায় পুলিশ নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই গুলি চালায়; বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত হতে থাকলে অবস্থার চাপেই তারা গুলি চালায়। শুধু তাই নয়, এতাবৎকাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা শুধু ভাত খান, রুটি খেতে চান না; কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে তিনি জানালেন যে অবাঙ্গালীরা অর্থাৎ রুটিভোজীরাও এখন আবার আটা অপেক্ষা ভাতই বেশী পছন্দ করছেন। সত্যই তো, খুবই সমস্যার কথা! সকলেই যদি ভাত খেতে চান, তাহলে এত চাল সরকার যোগান কী করে!

এই সকল মিথ্যাভাষণ আর অপপ্রচার সরকারের "আপোষহীন" মনোভাবকেই প্রতিফলিত করছিল। না, কোনরকম আলাচনায় আসতে তাঁরা রাজী নন। এদিকে আবার খোলাবাজারে চালের দাম বাড়তে শুরু করেছিল। আগস্ট মাসের শেষদিকে খাদ্য আন্দোলনের গতিবেগ বাড়তে থাকে বলেই চালের দামও কমের দিকে যায়। দোসরা সেপ্টেম্বর চালের সর্বনিম্ন দাম এসে দাঁড়ায় মণ প্রতি চব্বিশ টাকায়। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায় হত্যাকাণ্ডের পর একচেটিয়া চাল ব্যবসায়ীরা আবার ধাপে ধাপে চালের দাম বাড়াতে শুরু করে। অবশ্য তাদের মুখে ছিল "প্রবল বর্ষার" অজুহাত। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতেই দেখা গেল ঃ ইতিমধ্যে মণপ্রতি মোটা চালের দাম হয়েছে আঠাশ-উনত্রিশ টাকা, মিহি বা মাঝারি চাল তিরিশ-একত্রিশ টাকা এবং অতিমিহি চাল চৌতিরিশ টাকা।

ফলতঃ এরূপ পরিস্থিতিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখা ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

তাই আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি। প্রতিরোধ কমিটির কোন কোন ছদ্মহিতৈষী অবশ্য সুকৌশলে তাঁদের পথভ্রষ্ট করার কাজে নেমেছিলেন। মৃদুস্বরে তাঁরা মন্ত্রণা দিচ্ছিলেন যে এখন আন্দোলন স্থগিত রাখাই উচিত। কারণ, (এক) "রাজ্য সরকার নাকি ধীরে ধীরে জনমতের নিকট আসিতেছেন, কারণ তাঁহারা কলিকাতা ও হাওড়া হইতে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন, আটক ব্যক্তিদের মুক্তিদান করিতেছেন ইত্যাদি। (দুই) যখন বিধানসভায় অধিবেশন শুরু হইতে যাইতেছে তখন বিধানসভার বাহিরে সংগ্রাম বন্ধ করিয়া বিধান সভাকেই অভিযোগ, অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্র করাই কর্তব্য।" কিন্তু এই ছদ্মহিতৈষণার স্বরূপ বোঝা প্রতিরোধ কমিটির নেতাদের নিকট কঠিন ছিল না। এসব পরামর্শ সঙ্গতভাবে প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা তৃতীয় পর্যায়ে আন্দোলনের নিম্ন কর্মসূচী ঘোষণা করলেন ঃ পনেরোই সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ কোর্টে আইন অমান্য, ষোলই—ময়দানে গণসমাবেশ, উনিশে—খিদিরপুরে কেন্দ্রীয় সমাবেশ, বিশে—হাওড়ায় গণসভা, একুশে—বিধানসভায় গণঅভিযান (ঐ দিন পুলিশ বাধা দিলে তারা পথে বসে পড়বে, ১৪৪ ধারা অমান্য করবে না), বাইশে—বিধানসভার সম্মুখে গণমিছিল (১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আইন অমান্য), ছাব্বিশে—কলকাতার কোন এক স্থানে শহীদবেদীর ভিত্তি স্থাপন। এক বিবৃতির মাধ্যমে তাঁরা জানালেন,—"শুভেচ্ছা থাকিলে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য সরকার কমিটির ন্যায্য দাবিসমূহ অবিলম্বে মানিয়া লইতে পারেন। কিন্তু সরকার মিথ্যা মর্যাদাবোধকে আঁকড়াইয়া থাকায় তাহাদের দাবি আদায়ের জন্য কমিটির পক্ষে আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।" (স্বাধীনতা, ১৬-৯-৫৯) এই বিবৃতিতে পুনরায় পূর্বতন দাবিসমূহ উল্লিখিত হয়েছিল।

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হল বিধানসভার অধিবেশন। অধিবেশনের প্রথম দিনেই প্রমাণিত হয়ে গেল খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে সরকার কোন রকম মীমাংসায় আসতে রাজী নন। সভাকক্ষে খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক মিনিট দণ্ডায়মান থেকে নীরবতা পালনের প্রস্তাব তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন, বিরোধী নেতাদের "গুণ্ডা" আখ্যায় ভূষিত করা হল এমন কি পি এস পি কর্তৃক বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিও মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উপেক্ষিত হল। পুলিস মন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখার্জী যখন পুলিসের লাঠি-গুলিতে হতাহতদের জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখপ্রকাশ না করে সরাসরি জনসাধারণের উপর দোষ চাপিয়ে, কটূক্তি করে বক্তৃতা শুরু করলেন তখন বিরোধীদের পক্ষে আর ধৈর্য সংবরণ করা সম্ভব হল না। তাঁরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এবং পুলিসমন্ত্রীকে ক্রমাগত বাধা দিতে লাগলেন। অতঃপর শুরু হল এক দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। রিপোর্টারের ভাষায় —"এই সময় কংগ্রেস দলের পিছনের সারি হইতে কতিপয় সদস্যকে বিরোধীপক্ষের দিকে ধাবিত হইতে দেখা যায় এবং হট্টগোলের মধ্যে অকস্মাৎ উভয়পক্ষ হইতে জুতা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হইয়া যায়। পুলিসমন্ত্রীর উপর কয়েক পাটি জুতা পড়িতে দেখা যায় এবং মন্ত্রী মহাশয়কেও বিরোধীপক্ষের প্রতি জুতা ছুঁড়িতে ও সামনের মাইক মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতে দেখা যায়। হট্টগোলের মধ্যে জুতা ছাড়াও খাতাপত্র, মাইকের ডাণ্ডাও নিক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অনুরূপ ঘটনা এই প্রথম।" (স্বাধীনতা/

(শেষাংশ মূল পৃষ্ঠায়)

একজন বাবু মগি কম্মিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়িখানি মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেঁকচাঁদ ঠাকুরের পঞ্চীরাজ বংশ। বেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ্ চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, 'শিরোমনি মহাশয়! আমার গাড়িতে আসুন'। তাহাতে তিনি উত্তর কম্মিলেন, 'বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে'।

(রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' থেকে)

কলকাতা রাজনারায়ণের কলমে

রাজনারায়ণ বসুর কলমে যে-কলকাতার ছবি, সেটা গত শতকের গোড়ার। কিন্তু আজকের এই দ্রুতগামিতার যুগেও কলকাতার বহুমানুষের মনের কথাটা যেন সেকালের শিরোমনি মশায়ের মতই। শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে, অতএব হাঁটাই শ্রেয়। এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই। যানবাহনের গতিহীনতা। কলকাতা শহরে জনতা বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে। জনপথ বাড়ে নি। বাড়ন্ত জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ। তাই প্রতি মুহূর্তেই যানবাহনের গতি মন্থর। দ্রুতগামী যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা।

এই সংকটের একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল। তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। আমরা এগিয়ে দিয়েছি শ্রমের মুঠি। এই দুয়ের যোগফলে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা। গতি এবং প্রগতির।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

চীনের পার্টি লাইন ও সি পি আই (এম) নেতৃত্ব

শ্রীকান্ত বসুরায়

চীনের নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের পর সি পি আই এম পলিটবুরো দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। যারা এতে নিরাশ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই আশা করেছিলেন যে ভবিষ্যতের উদাহরণ থেকে পি বি এ বিষয়ে ঘটনার বিশ্লেষণে অপেক্ষাকৃত বাস্তবজ্ঞান ও বস্তুমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেবেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের বিবৃতির অনেকটা সংশোধন করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, চীনের দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরও তারা এরূপ কোনও সংশোধনী বিবৃতি প্রকাশ না করায় অনেকেই নিরাশ হয়েছেন। সুতরাং ধরে নিতে পারা যায় যে, নবম কংগ্রেসের উপর প্রকাশিত উক্ত বক্তব্যগুলো আজ অবধি সি পি আই এম-এর আন্তর্জাতিক লাইনের প্রামাণ্য দলিল। পলিটবুরোর কোন কোন সদস্যের এবং অন্যান্য কিছু সদস্যের সাম্প্রতিক কালীন পিকিং বিরোধী লেখা ও বিবৃতিগুলি তারই প্রতিফলন মাত্র।

চীন সম্পর্কে, চীনের বিপ্লব সম্পর্কে, চীনের পার্টির রাজনৈতিক লাইন ও জনগণতান্ত্রিক চীনের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণের বিশেষতঃ রাজনৈতিক কর্মীদের আগ্রহ স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। তাই সাধারণ কর্মী ও জনসাধারণের সজাগদৃষ্টি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পি বির বক্তব্যের যে দ্বন্দ্ব আজ ব্যাপকহারে ফুটে উঠেছে, তারই পটভূমিকায় আজ সি-পি আই এম-এর লাইন সম্পর্কে আলোচনা এক জরুরী রাজনৈতিক কাজ।

সাধারণভাবে মনে হয় এ আলোচনাটা নিম্নলিখিত কয়েকটা প্রধান-প্রশ্নে ভাগ করলেই চলে—যথা, বিশ্বের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব, লিন্ পিয়াও ও সংবিধান সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব, চীনের বিপ্লব ধারার আলোচনা (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে), মাও সে-তুঙের চিন্তা ও সামগ্রিক সাম্রাজ্যবাদ। (শেষোক্ত বিষয়টির উপর আলোচনা ইতিপূর্বে দর্পণের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে)।

বিশ্বের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে

সাধারণ লাইন বা বিশ্বের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে পি বি যে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন তা হল মস্কো সম্মেলনে গৃহীত লাইন ও চীনের পার্টির নবম কংগ্রেসে গৃহীত লাইনের পার্থক্য সম্পর্কে। দেখা যাক সে লাইন দুটি কি ও তাদের পার্থক্য কোথায় এবং কেন?

(ক) ১৯৫৭ সালের মস্কো সম্মেলনে গৃহীত লাইন।

(i) Contradictions between the socialist camp and the imperialist camp,

(ii) Contradictions between the proletariat and the bourgeoisie in capitalist countries,

(iii) Contradictions between the oppressed nations and imperialism,

(iv) Contradictions among the imperialist countries and among monopolist groups.

(খ) ১৯৭০ সালে চীনের নবম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে নতুন সাধারণ লাইন তা হল

(i) Contradictions between oppressed nations on the one hand and imperialism and social imperialism on the other,

(ii) Contradictions between the proletariat and bourgeoisie in the capitalist and revisionist countries,

(iii) Contradictions between imperialist and social imperialist countries and among imperialist countries.

(iv) Contradictions between socialist countries on the one hand and imperialism and social imperialism on the other.

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আন্তর্জাতিক শক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক গুরুতর পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে এ লাইনগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে (পি বি-র তাইতেই ঘোর আপত্তি)। বলাবাহুল্য সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে এক চরম বাস্তব হিসেবে চিহ্নিত করার ও তার চ্যালেঞ্জকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে এ পার্থক্য—যেমনি দুটি সাধারণ লাইনের মধ্যে তেমনি চীনের পার্টি ও সি পি আই এম নেতৃত্বের মধ্যে। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে পি বি এব্যাপারে বক্তব্য রাখতে যতটা উৎসাহী, এর কারণ অনুসন্ধানে সে পরিমাণ গরজহীন। অথবা পি বি হয়ত এটা ভাবেন না, কিংবা বোঝেন না, কিংবা প্রকাশ করতে চান না, কিংবা অন্য কিছু। সে যাই হোক, বুর্জোয়া পণ্ডিতদের "মার্কসবাদী" দৃষ্টিভঙ্গীতে যারা ইতিহাসকে বিচার করেন, পি বি এ বিষয়ে সাধারণভাবে তাদের প্রতিধ্বনি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পি বির বক্তব্য বর্তমানকে অতীতে আবদ্ধ করে বিচার করতে হবে অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালকে ১৯৫৭ সালের ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির পটভূমিকায় ও গন্ডীতে আটকে পড়া অবস্থায় বিচার করতে হবে অর্থাৎ মেনে নিতে হবে যে ইতিহাস ও তার প্রক্রিয়াগুলি আমাদের ভালালাগা না লাগা অনুযায়ী অচল হয়ে যায়। কিন্তু তা হয় না।

১৯৬৩ সালের উল্লিখিত সাধারণ লাইন সম্পর্কে প্রথমেই যে ব্যাপারটা পি বির বক্তব্য ও চিন্তার স্থান পায়নি তা হলে উক্ত চোদ্দই জুনে চিঠিতে সংগ্রামের স্তরচিহ্ন। দ্বিতীয়তঃ এ দুয়ের সাধারণ লাইনের মধ্যে পার্থক্যের প্রসঙ্গে যে সত্যকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে তা হল এর নির্ধারক ঘটনাটি (determinant phenomenon) অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ অচেনা, চূড়ান্ত জটিল দ্বন্দ্বের বিশ্বব্যাপী অভ্যুদয়; এরূপ দ্বন্দ্বে জড়িত শক্তিগুলির সংগ্রামের নীতির ও লাইনের পরিবর্তন। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে এ পরিবর্তিত পরিস্থিতির কেন্দ্রীয় কারণ হল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থান।

শোধনবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের লড়াই যে কারণে দুই রাস্তার মধ্যে লড়াই (struggle between two roads), সেই একই কারণে এরূপ লড়াইয়ের স্তর থাকা স্বাভাবিক—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ায়। তা ছাড়া, দুই দেশের দুই পার্টির মধ্যে লড়াইকে আরও পৃথকভাবে দেখতে হবে, কেন না বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এরূপ লড়াইগুলি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শক্তির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে বাহ্যিক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনাও থাকে। এ প্রসঙ্গে দলত্যাগীদের চক্র সম্পর্কে লেনিনের উক্তিটিকে মনে করা যেতে পারে

"Socialism in words, imperialism in deeds, the growth of opportunism into imperialism" (Lenin —the Tasks of the Third International)—

এমনিতরো ঘটনা পৃথিবীতে বার বার দেখা দিতে পারে। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গ আলোচনায় (দর্পণ : বাইশে, উনত্রিশে নভেম্বর, তেসরা, দশই ডিসেম্বর, চুয়াত্তর সংখ্যাগুলিতে)।

রুশ শোধনবাদের বিরুদ্ধে চীনের পার্টির সংগ্রামকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম স্তর সি পি এস ইউ-এর বিশতম পার্টি কংগ্রেস থেকে "মহাবিতর্ক" (দি গ্রেট ডিবেট) পর্যন্ত এবং তারই ভিত্তিতে চীনের তেং শিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে রুশ পার্টির সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত, যার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই স্তর শেষ হয়; এখানে তেং শিয়াও পিং-এর বিদায় ভাষণ উল্লেখযোগ্য—তেং ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপর এ ব্যাপারের মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় অবস্থা তেং-এর আলোচনার পর থেকে আজ অবধি, এবং আরো চলবে। বলাবাহুল্য, বিবাদের প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তরণকে ঠেকাবার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবেই ঐ চোদ্দই জুনের চিঠিকে বিচার করতে হবে। সোভিয়েৎ শোধনবাদের বর্তমান সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে উনিশশো সাতান্ন সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে সেই একই প্রচেষ্টা চলেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত শক্তিকে তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বে এক যুক্তফ্রন্টে সামিল করা, যে যুক্তফ্রন্টের রণনীতি ও রণকৌশল প্রধানতঃ নিম্নরূপ ছিল :

(এক) সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত রেখে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপ্লবী চরিত্র ও ঐক্যকে সংহত করা, দেশে দেশে সর্বহারার নেতৃত্বকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোধনবাদকে দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ও পঙ্গু করে তোলা,

(দুই) বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ঠেকানো ও বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা,

(তিন) সাম্রাজ্যবাদ-ধনতন্ত্রবাদের তৎকালীন মুমূর্ষু পর্যায়ে তাকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা থেকে আত্মরক্ষাত্মক (defensive) ভূমিকায় ঠেলে দেওয়া, ইত্যাদি।

"The whole world has a population of 2.7 billion of which various socialist countries have nearly one billion; the independent, former colonial countries more than 700 million; the countries now struggling for independence 600 million; and the imperialist camp only 400 million" (New China News Agency, dated, 10-11-57).

"I am of the opinion that the international situation has now reached a new turning point, There are two winds in the world: the East wind and the West wind . . . . . I think the characteristic of the situation today is the East wind prevailing of the West wind . . . The socialist forces are overwhelmingly superior to the imperialist forces"—Mao Tse-tung: Imperialism and All Reactionaries are Paper Tigers—1958.

এখানে উল্লেখযোগ্য, ইতিপূর্বেই যুগোস্লাভিয়া তার বর্তমান "মাহাত্ম্যে" আত্মপ্রকাশ করেছে; তবু রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশের পার্টিগুলি মাওয়ের "নিউ টার্নিং পয়েন্টকে" ও তার আনুসঙ্গিক সংগ্রামের নীতি ও কৌশলকে অস্বীকার করেন। তারপরও বহু রুশ-চীন পত্রবিনিময় ও আলোচনা হয়েছে (১৯৫৮ সালে পিকিং-এ মাও খ্রুশ্চেভ আলোচনা সহ) কিন্তু পার্থক্য শুধু বেড়েই চলছিল আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে। ক্রমে ক্রমে এলো ১৯৬০ সাল যা দুটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য—একটি মস্কো সম্মেলন, অপরটি মস্কোর সামাজিক উগ্র-জাতীয়তাবাদের (social chauvinism) আত্মপ্রকাশ। লিউ শাও চির নেতৃত্বে চীনের প্রতিনিধিদল মস্কো সম্মেলনে এক স্বার্থবোধক, সমঝোতাপূর্ণ দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল (চীনের ক্ষেত্রে যার অর্থ হলো ঐক্য ও সংগ্রামের কৌশল হিসেবে পিছু হটা) যার মধ্যে এমনিতরো বক্তব্যগুলো ছিল, যার নির্গলিতার্থ হলো—অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাই আন্তর্জাতিক সর্বহারার সংগ্রামের শ্রেয় পথ; ন্যায় যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রামকে এড়িয়ে চলাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায়; সর্বহারার সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে নয়, ধনতন্ত্রের "ভেঙেপড়ার" পথেই সর্বহারা ক্ষমতায় আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

চোদ্দই জুনের চিঠিকে এ সমস্ত কিছুর পটভূমিকায় বিচার করতে হবে।

আবার, সেই একই ১৯৬০ সাল, চীনের ইতিহাসে শতাব্দীর সব চাইতে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি ও ফসল ক্ষতির বৎসর। তারই সুযোগ নিয়ে চীনের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার তাগিদে যখন মস্কো একতরফা ভাবে শত শত রুশ চীন সহযোগিতার চুক্তিকে ছিঁড়ে ফেলল, তখনও সংগ্রামের স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে ঐক্যপ্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর চীন হাল ছাড়েনি। ১৯৬৩ সালের চোদ্দই জুনের চিঠিখানিই তার প্রমাণ।

চীন বিপ্লবের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে তাহল কোনও ঘটনার শেষ না দেখে চীন শেষ কথা বলেনা। ১৯৬১-৬৩ সালের মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেল, ১৯৬৩ সালে প্রস্তাবিত সম্মেলনও হল না, কিন্তু ১৯৫৭-সালের চীনের পার্টির স্ট্রাটেজীকে যখন ১৯৬৩ সালে বাঁচানো গেল না, বুর্জোক্রেট একচেটিয়া ধনতন্ত্রী শ্রেণীর অভ্যুত্থানকে যখন আর ঠেকানো গেল না তখন যা ঘটবার তাই ঘটলো—সোভিয়েত শোধনবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী যুগে প্রবেশ করলো, আর বিশ্বের শ্রেণীশক্তিগুলি এবার নতুন দ্বান্দ্বিক বিন্যাস পেলো—ভিয়েৎনামের যুদ্ধ জনযুদ্ধের (People's war) নীতিতে বিপুল বেগে এগিয়ে চললো, রুশ জনগণও আবার সেই "রাষ্ট্র ও বিপ্লবের" মৌল সমস্যাগুলির প্রশ্নে জড়িয়ে পড়লো, দুনিয়ার সর্বহারা ও সমাজতান্ত্রিক শক্তি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়ালো, রুশ রাষ্ট্র ও চীন রাষ্ট্র মুখোমুখি হলো।

(ক্রমশঃ)

এস ইউ সির বিরুদ্ধে অপপ্রচার

আপনার কাগজের গত চৌঠা এপ্রিল সংখ্যায় "এস ইউ সির রাজনৈতিক চরিত্র" শিরোনামায় প্রকাশিত পত্রে শ্রীশম্ভুনাথ সরকারের অভিযোগ, যখনই দেশে বামপন্থী গণগণতান্ত্রিক আন্দোলন একটা উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয় তখনই এস ইউ সি তাকে কুঠারাঘাত করে। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রমাণ করতে হলে দরকার ছিল তথ্য দিয়ে সত্যটা তুলে ধরা। কিন্তু তার বড়ই অভাব দেখা গেল শ্রীসরকারের বক্তব্যে। এ থেকে একটা কথাই বলা যায় তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কুৎসাপূর্ণ।

তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন তুলেছেন, শিবদাস ঘোষ ও তাঁর দল যেভাবে ভারতের রাষ্ট্র চরিত্র ও বিপ্লবের স্তর নির্ণয় করেছেন তা ভ্রান্ত, কিন্তু এখানেও তিনি শিবদাস ঘোষ কোথায় ভ্রান্ত তা মার্কসীয় চিরায়ত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করতে পারেন নি।

শ্রীসরকারের তৃতীয় বক্তব্য, এস ইউ সি বিপ্লবী বুলির আড়ালে শাসক শ্রেণীর দালালি করছে। লক্ষ্য করুন এখানেও শ্রীসরকার কোন তথ্য প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি। কিন্তু আমি শ্রীসরকারকে তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখাতে পারি শাসক শ্রেণীর দালালি যদি কেউ করে থাকে সি পি এম করেছে, এস ইউ সি নয়। সি পি এম-এর সর্বভারতীয় দলীয় মুখপত্র "পিপলস ডেমোক্রেসী"র ৩-৮-৬৯ সংখ্যায় বলা হয়েছে,

"The nationalisation of such institutions can not but be a big event . . . . the main point is that the measure has opened up some new possibilities, and the progressive forces of the country should intervene to beat back determined reactionary opposition and see that the nationalised banks truly become a tool for fighting monopoly interests."

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের "রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি সত্যই একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে", সি পি এমের এই ধরণের অদ্ভুত যুক্তি সম্পূর্ণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। অথচ সে জায়গায় এস ইউ সি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে স্পষ্টই বলেছে, "একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বুর্জোয়ারা যখন জাতীয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ করে, তখন তারা সেটা পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থে, বিশেষ করে একচেটিয়া পুঁজি ও রাষ্ট্রের মিলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে কার্যতঃ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের অধীনস্থ করার উদ্দেশ্যেই করে থাকে। এই পথেই ফ্যাসিবাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।" (প্রোলেটারিয়ান এরা ৩-১০-৬৯) অরও দেখুন সি পি এম তার কেন্দ্রীয় কমিটির এক বিবৃতিতে বলেছে,

". . . . the Indira Gandhi wing also contains within its fold a healthy trend which hates big landlords and monopolists . . . . it has raised certain slogans and taken certain measures which are in tune with the anti-monopoly democratic aspirations of the people." (People's Democracy, 15-2-70)

ভেবে দেখুন, ইন্দিরা গান্ধী ও তার দল সম্পর্কে এর চেয়ে বড় গুণগান আর কি হতে পারে। কোন সাচ্চা কমিউনিস্ট তো দূরের কথা যারা উদারনৈতিক বুর্জোয়া তারা পর্যন্ত ইন্দিরা সম্পর্কে এ ধরণের সার্টিফিকেট দিতে পারে নি।

আর একটি অভিযোগ এস ইউ সির কজন কংগ্রেসীদের হাতে আহত নিহত বা গৃহছাড়া হয়েছেন? তা যদি দেখতে চান, তার প্রমাণ মিলবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, বীরভূম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ কুচবিহার, বর্ধমানের দুর্গাপুর ফরিদপুর কলকাতা প্রভৃতি জেলা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কি এস ইউ সির কর্মী ও নেতারা আহত নিহত ও গৃহহারা হয়েছেন।

তাজমহম্মদ
বর্ধমান

মতামত

খাদ্য আন্দোলন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

২২-৯-৫৯) এদিকে প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে রাজভবনের দক্ষিণদ্বারে তখন পঁচিশ হাজার নরনারী সমাবেশে সামিল হয়েছেন খাদ্যের দাবিতে। উদ্দীপনাময়ী ভাষণে এ. কে. গোপালন বলে চলেছেন, "জনতার শক্তিই চূড়ান্ত শক্তি এবং এই শক্তির জয় অনিবার্য।"

বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম দিনই সরকারের পক্ষ হতে সদস্যদের মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে একটি মুদ্রিত বিবৃতি প্রচার করা হয়। বলাবাহুল্য এর মধ্যে নূতন কোন বক্তব্য ছিল না। এতে প্রতিরোধ কমিটির সব কটি দাবিই কোন-না-কোন কারণে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বিবৃতির মূল কতকগুলি বিষয় উল্লেখযোগ্য ঃ (এক) প্রথমে দেখা গিয়েছিল যে রাজ্যে খাদ্যের ঘাটতি নয় লক্ষ টন, এখন দেখা যাচ্ছে তা হল ষোল লক্ষ টন, (দুই) কেন্দ্রীয় সরকারের "উদার সাহায্য" (১২.৬ লক্ষ টন) সত্ত্বেও ঘাটতির তুলনায় সাহায্য অনেক কম, (তিন) উনিশশো উনষাট সালের মাঝামাঝি খোলাবাজারে চালের (অমন) মূল্য মণ প্রতি পঁচিশ টাকা বিরানব্বুই পয়সা, (চার) আন্তঃস্তরীণ সংগৃহীত বেঙ্গল ফাইন ও সুপারফাইন চালের দাম উনষাট সালের চোদ্দই হতে মণ প্রতি দু টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, (পাঁচ) ধানের দর বারো-তেরো টাকার মধ্যে ধার্য করার প্রস্তাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত, (ছয়) সংশোধিত রেশনে চালের পরিমাণ এক সের থেকে দেড় সের করার প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয় ইত্যাদি। ঐ দিন বিধানসভায় খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যসঙ্কটের স্ব-উদ্ভাবিত কারণ সমূহের অপরূপ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, হঠাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, পাটচাষের জমি বৃদ্ধি, সরকারী নানা উন্নয়নমূলক কাজের ফলে মুদ্রাস্ফীতি, অবাঙ্গালীদের রুটির বদলে ভাত বেশী খাওয়া, ধানের দর বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদনকারী কৃষকদের ধান চাল ধরে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি—ইত্যাদি কারণের জন্যই খাদ্যসঙ্কট। এই বিবৃতিকে সঙ্গতভাবেই পরের দিন বিধানসভার অধিবেশনে কমিউনিস্ট নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার মজুতদারের বন্ধুর প্রকাশকারী নীতি বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ "রক্তস্নানে পশ্চিমবাংলাকে রঞ্জিত করিবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিবৃতি এখন হইতে শেষ পর্যন্ত অসত্য, বিকৃত ও বানানো তথ্যে পূর্ণ। ইহাতে সুপরিকল্পিতভাবে মজুতদারদের স্বার্থরক্ষা করা, তাহাকেই সুন্দর করিয়া দেখাইবার অপচেষ্টা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে সরকারী নীতি চমৎকার, দায়ী শুধু লোকের ভাল অবস্থা, ভাল খাইতে চাওয়া, দলের উন্নয়ন ঘটা আর তের লক্ষ কৃষক পরিবার। ইহাকে মজুতদারের দালালী ছাড়া আর কী বলা যায়?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিবেচনার আশ্বাস কার্যকরী হয়নি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পাওয়ারলুমের ছোট ছোট ইউনিটগুলির উপরে এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটে যে অত্যধিক হারে কর ধার্য করা হয়েছে আজও তা প্রত্যাহৃত হয় নি। এর ফলে, এই ক্ষুদ্র শিল্পে সঙ্কট এবং ব্যবসায়ে মন্দা শুরু হয়েছে। সরকার বর্ধিত হারের ঐ ধার্য কর অবিলম্বে প্রত্যাহার না করলে পাওয়ারলুম শিল্পের ছোট ছোট বহু ইউনিট বন্ধ হয়ে যাবে এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদেরও ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা দেখা দেবে। ক্ষুদ্রশিল্পের সংশ্লিষ্ট মহল থেকে এই অভিযোগ করা হয়েছে।

এ্যাসোসিয়েশন অব স্মল পাওয়ারলুম ইউনিটস অব ওয়েস্ট বেঙ্গলের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ্যামল দাশগুপ্ত জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতের পাওয়ারলুম শিল্পের ছোট ছোট ইউনিটের প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীসি সুব্রহ্মনিয়ম এবং বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বর্ধিত হারে ঐ ধার্য কর প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন। যদিও তাঁরা বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন তথাপি আজও তা কার্যকরী হয় নি।

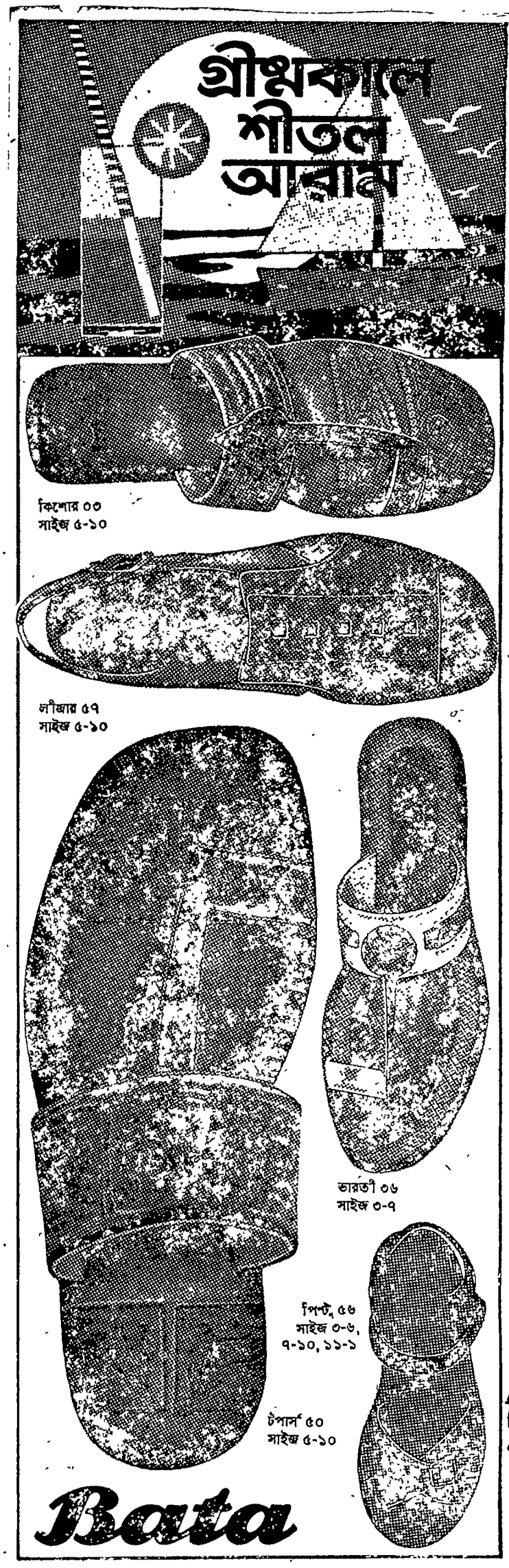

প্রসাধন দ্রব্যে ভেজাল

কলকাতার ক্যানিং স্ট্রীট এলাকায় ওষুধ এবং সস্তা প্রসাধন দ্রব্যে ভেজাল মিশানোর ঘটনা সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ধরা পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ড্রাগ কন্ট্রোলার শ্রীএস কে কর ক্যালকাটা জেনারেল মার্চেন্ট, ম্যানুফ্যাকচার্স এ্যান্ড সাপ্লাইয়ারস-এর সম্মেলনে গ্রান্ড হোটেলে বলেছেন ওষুধ ও প্রসাধনে ভেজালের বিরাট চক্রান্ত ক্রমশঃই ভারতীয় দ্রব্যাদির মান নষ্ট করছে। লন্ডন, চেকোস্লোভাকিয়া এবং স্কান্ডানেভিয়ান দেশ ও আরবের মুসলিম দেশগুলি লক্ষ লক্ষ টাকার প্রসাধন দ্রব্য ও সুগন্ধি কাঠ, সুরমা ক্রয় করতো ভারত থেকে।

সুরমায় ভেজাল থাকার জন্য লক্ষ টাকার অর্ডার নষ্ট হয়েছে এবং ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। সমিতির সভাপতি বকশিষ সিং ভেজাল ও অন্য অসুবিধা দূর করে ব্যবসায়ীদের সচেতন হতে বলেন।

পাঁচ কোটি টাকার হিসেবে গরমিল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ সংগ্রামের সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে খাদ্য, অর্থ প্রভৃতি বন্টনের যে ব্যবস্থা করেছিলেন সেই হিসেবে পাঁচ কোটি সাতান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকার গরমিল আছে বলে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির অভিযোগ। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে যে, এমন বহু বে-সরকারী সংস্থাকে বন্টনের জন্য টাকা এবং জিনিষপত্র দেয়া হয়েছে যাদের অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে সমস্ত সংস্থা হিসেব দাখিল করেনি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, যে সব সংস্থা হিসেব দাখিল করেছে সেগুলির সত্যতা যাচাই করা হয়নি।

শরণার্থী শিবিরে সাহায্যদানের ব্যাপারে বে-সরকারী সংস্থাগুলি যেসব খরচপত্তর করেছে তার হিসেবেও প্রচুর গরমিল রয়েছে। কমিটির অভিযোগ বন্টনের উদ্দেশে বিভিন্ন সংস্থাকে প্রদত্ত টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

বিদ্রোহীরা এককাট্টা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ছাত্র পরিষদ এবং যুব-কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করেই ক্ষান্ত হয়নি রাজ্য সরকারের কার্যকলাপেরও সমালোচনা করেছে।

এই সম্মেলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং সরকারের নেতা অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন কারণে যে সব গোষ্ঠী ক্ষুব্ধ তারা সকলেই এখানে মিলিত হবার চেষ্টা করেছেন। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীগুলি গত তিন বৎসরের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি। শ্রীবিজয় সিং নাহার এবং কাশীকান্ত মৈত্র ও কৃষ্ণকুমার শুক্লা সরাসরি দক্ষিণ কলকাতা সম্মেলনে যোগ না দিলেও তাঁদের আশীর্বাদ এই সম্মেলনের পক্ষে আছে। প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীশান্তিমোহন রায় প্রকাশ্যে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। তেমনি প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীশচিত দাশগুপ্ত তাঁর ফোরামের সব লোকজন নিয়েই সম্মেলনকে সফল করে তুলতে সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন জেলা থেকে বহু প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। এই সম্মেলন থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর এবং সি পি আই প্রভাবান্বিত গোষ্ঠীর বিরোধীরা এককাট্টা হচ্ছেন। সম্মেলনে সি পি আই বিরোধী প্রস্তাব থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সি পি আই কংগ্রেস আঁতাতের বিরোধীরা নিজেদের মধ্যেকার ছোট-বড় ঝগড়া মিটিয়ে ফেলে আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়েই লড়বেন।

অবশ্য এথেকে যাঁরা মনে করেন যে কংগ্রেস আবার দ্বিখণ্ডিত হতে চলেছে তাঁরা নিশ্চয়ই ভুল করবেন। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মতই বিদ্রোহীরা ভয়ানকভাবে বামপন্থী বিরোধী। লক্ষ্মীকান্ত বসুর গোষ্ঠী কোনদিন সি পি আই এম বা অন্য কোন বামপন্থীকে বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তাঁরা আসন্ন নির্বাচনের আগে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন যাতে লোকসভা এবং বিধানসভার প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে এই গোষ্ঠী বেকায়দায় না পড়েন। এরা চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে এদের চেষ্টা হবে যাতে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনেও তাঁরা প্রাধান্য লাভ করতে পারেন। এরা আশা করেন এভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে ভবিষ্যতে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বতো বটেই এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর পদেও তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিই যেতে পারবেন কিংবা যিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন তাঁকে এই গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে হবে।

স্বভাবতই সর্বশ্রী অরুণ মৈত্র সৌগত রায়, নিত্যানন্দ দে এবং প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী প্রমুখেরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এন এল সি সির সম্মেলনে যোগদান এবং এই সব তথাকথিত বিদ্রোহী এম এল এ প্রকাশ্যে সাংগঠনিক বিধি ভেঙ্গে সমাবেশ করা সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী না হওয়ায় সৌগতবাবুরা ক্ষুব্ধ। এজন্যই সৌগতবাবু আবার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন। উদ্দেশ্য চাপ সৃষ্টি।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সভা সদস্যের মেয়াদ শেষ হবে আগামী মাসে। এদের মধ্যে তিনজন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মনোরঞ্জন রায়, নীরেন ঘোষ এবং সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী। সি পি এম এখন বিধান সভায় নেই তাই উপরোক্ত তিনজন আর নির্বাচিত হতে পারবেন না।

এই তিনজনের জায়গায় তিনজন কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হবেন। ডঃ নাগ চৌধুরীকে এই শূন্যস্থানে মনোনয়ন দিয়ে নিয়ে আসা হবে। অপর দুইজনের মধ্যে একজন হবেন মহিলা সদস্য আর একজন মুসলমান। প্রতিমা বসু হয়ত মনোনয়ন পেতে পারেন। মুসলমান সদস্যের নাম এখনও ঠিক হয় নি। প্রার্থীদের মধ্যে আছেন একজন হাওড়ার ও অপরজন মুর্শিদাবাদের।

গতবারে নির্বাচিত প্রণব মুখার্জী ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবারও মনোনয়ন পাবেন। সি পি আই সদস্য কল্যাণ রায়কে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে সি পি পি আই বিরোধী অংশ কল্যাণ রায়ের জায়গায় একজন কংগ্রেসী সদস্যকে মনোনয়ন দিতে চান। তাদের ইচ্ছে হুগলীর শান্তিমোহন রায়কে নির্বাচিত করা হোক।

রাজ্য বিধানসভায় সি পি আই-এর সদস্য সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। কল্যাণবাবুকে পুনর্নির্বাচিত করতে হলে কংগ্রেসীদের সমর্থন দরকার। এই ব্যাপারে কংগ্রেস পার্টির কি নির্দেশ হবে তা নিয়ে কোন্দল তীব্র হয়েছে।

বিজয়োৎসব

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে লড়াই জেতা সম্ভব হয় না। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে আমেরিকানরা যে অত্যাচার ভিয়েতনামের ওপর চালিয়েছেন তাতে ঐ দেশের মানুষ ভেঙ্গে পড়েন নি। শ্রীবসু বলেন, যখন একদিকে আমেরিকা বোমারু বিমান থেকে টন টন বোমা ফেলে হাসপাতাল, স্কুল ব্রীজ উড়িয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে ভিয়েতনামের দেশপ্রেমিক মানুষ রাতারাতি তা গড়ে তুলেছে।

এই যুদ্ধ থেকে ভারতবর্ষের জনগণকে শিক্ষা নিতে আহ্বান জানিয়ে শ্রীবসু বলেন, আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের সমস্ত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গ্রামে শহরের মানুষকে সঠিক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।

উপাচার্যের সঙ্গে রফা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এতদিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ডঃ রমা চৌধুরীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছিল।

এদিকে আচার্য বারে বারে দেখা করার জন্য উপাচার্যকে তাগিদ দিচ্ছেন, কিন্তু উপাচার্য দেখা করতে নারাজ। জানা গেছে যে আচার্যের সঙ্গে এক অলিখিত চুক্তিতে স্থির হয়েছে যে ডঃ রমা চৌধুরী কাজে যোগ দিয়ে ইস্তফা দেবেন। কিন্তু ডঃ রমা চৌধুরীর ইচ্ছে—এ বছরটি বিশ্ব মহিলা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে তাই মহিলা উপাচার্য হিসেবে এ বছরটা তিনি থাকবেন। কিন্তু আচার্য তাতে রাজী হন নি বলে সংবাদে প্রকাশ।

শিক্ষক অশিক্ষক ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলির দাবী হল উপাচার্যকে আমরা এক শর্তে আসতে দিতে পারি। তা হল আগে আচার্যের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে হবে, তারপর উপাচার্যকে কাজে যোগ দিতে দেয়া হবে এবং যোগ দেবার পরেই তাকে ছুটি নিতে হবে এবং পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে।

জলের কল অকেজো

হাওড়ার বিলিলিয়াস রোড, টিকিয়া পাড়া, জোলাপাড়া, মুন্সীলেন এলাকায় দশটি জলের কল অকেজো। জল ওঠেনা। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভ্রুক্ষেপ নেই। সি এম ডি এ-র তৈরী শৌচাগারে পয়ঃপ্রণালীও হয়নি। নোংরা জলে বস্তি নরপকুণ্ড। এই সব অঞ্চলে জলের তীব্র অভাবের জন্য বেশী দামে জল বিক্রী হচ্ছে। বস্তি উন্নয়নের জন্যে এসব অঞ্চলে কিছু কাজ হলেও সি এম ডি এর টাকায় কিছু কিছু ব্যক্তিগত শৌচাগার তৈরী হয়েছে বলে অভিযোগ। এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বাড়ীর মালিকদের সঙ্গে কিছু "লেনদেনও" হয়েছে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য টাকা খরচ হল, কিন্তু টিকিয়া পাড়া অঞ্চলে এক পয়সাও খরচ হলনা।

সাংবাদিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাবু কার সঙ্গে কোথায় কিভাবে মিটিং করছেন তার খবর দেওয়াই এখন সোর্সদের কাজ।

দর্পণের সংবাদদাতা আরো জানতে পেরেছেন যে ১৯৭৬ সালের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেন্দ্রীক সোর্সমণির পরিমাণ বাড়ানর কথা বলবে। কারণ তখন আরো নতুন নতুন সোর্সকে নিয়োগ করতে হবে।

এগারজন সাংবাদিকের গোপন রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কলকাতার একটা বিখ্যাত দৈনিকের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা এবং তিনজন সাংবাদিককে ভারতরক্ষা বিধিবলে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর গ্রীণ সিগন্যাল না দেওয়ায় রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পেছিয়ে যেতে হয়।

রাজ্যের সতের জন সাংবাদিকের টেলিফোনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তারা কার সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলছেন তা টেপ করে রাখা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এই টেপের অংশ মুখ্যমন্ত্রীকে প্রায়ই শোনান হয়।

উপাচার্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থাকাকালীন সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করা সঙ্গত কি না এ নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। গত মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের একশো আঠারোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সিন্ডিকেট সদস্যদের রাজনীতি না করার জন্য উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের খোদ কর্তা স্বয়ং উপাচার্যই যখন রাজনীতিতে নামলেন তখন শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের মধ্যে এর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

হারেন বসুর
রাজনৈতিক উপন্যাস

আগুনের দিন

এই উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাদিক। এককালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন। পুত্র বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছে। পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ করেছেন। এই তিন পুরুষের রাজনৈতিক অভিঘাত এবং সমকালীন সমাজসত্য বর্তমান উপন্যাসে প্রতিফলিত।

মূল্য পাঁচ টাকা

বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯
দর্পণ কার্যালয়েও পাওয়া যাবে

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

রাজ্যশিল্পের সর্বব্যাপী সংকট

চাণক্য সরকার

গত রবিবার রাইটার্স বিল্ডিংএ রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা পর্ষদের সভায় তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বেকার সমস্যা সম্পর্কে আট ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা হয়েছে।

আলোচনার পর এই সভায় অংশ গ্রহণকারী দুই প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কালী মুখার্জী ও ষতীন চক্রবর্তী বলেছেন, সকলেই এই রাজ্যের গভীর সংকটে উদ্বেগ প্রকাশ করে উদাত্ত বক্তৃতা করেছেন, এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও। কিন্তু লাভ হয়নি কেন। সমস্ত পরিচিত সমস্যার কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সমস্যার কোন নিশানা মেলে নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সব ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। অথচ পর্ষদের সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ডাকা হয়েছিল রাজ্যের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র কি করতে পারে তার কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য।

সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি পাঁচ পাতার বিবৃতি অংশ গ্রহণকারীদের কাছে আগেই পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল যে সভায় অংশগ্রহণকারীরা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আগে থেকে ভেবে আসবেন সমস্যার সমাধানের পথ সম্পর্কে। কিন্তু দেখা গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর রাজ্যের সমস্ত বক্তব্য এড়িয়ে গেলেন। অবশ্য ওঁদের করার কিছুই নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নয়না ইঙ্গিতে বলেছেন যে, বিভিন্ন শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নিরূপক শাখা-সমূহকে কব্জা করে রেখেছে। সরকারের পক্ষে এই কব্জা থেকে নিজেকে মুক্ত করা খুব শক্ত।

পাটশিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজ্য শ্রমমন্ত্রী বলেন যে, উৎপাদন শতকরা পঁচিশ ভাগ কমে গিয়েছে এবং সেই অনুপাতে এই শিল্পে নিযুক্ত আড়াই লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে প্রায় ষাট হাজার ছাঁটাই বা লে-অফ হতে চলেছে।

ইঞ্জিনীয়রিং কারখানার মূলে অংশ ওয়াগন তৈরীর শাখা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এতে নিযুক্ত প্রায় একলক্ষ শ্রমিকের কি হবে তা অনিশ্চিত। কাপড় তৈরী কারখানার পঞ্চান্ন হাজার লোক যে কোন সময় পথে বসতে পারে কারণ পশ্চিমবঙ্গের তুলো বাইরের রাজ্য থেকে আমদানী করতে বেশী রেল ভাড়া দিতে হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ব ভারত থেকে কয়লা এবং ইস্পাত উত্তর ও পশ্চিম ভারতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, রেলভাড়া সমস্ত অঞ্চলের জন্য একরকম, দূরত্ব যাই হোক না কেন।

মোটর তৈরী কারখানা উত্তরপাড়া হিন্দ মোটরে প্রায় বার হাজার লোক কাজ করে। আগে বছরে ত্রিশ হাজার গাড়ী হত। এখন দশ হাজার হয় না। প্রতিদিন পাঁচ হাজার শ্রমিককে লে-অফ করতে হয়। মালিকপক্ষ বলছে লে-অফ থাকার দরুণ শ্রমিকদের পাওনা বেতন দেওয়া শিল্পের পক্ষে সম্ভব নয়।

রাজ্য শিল্পমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ জোরালো ভাষায় বলেন পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ ক্রমশঃ তীব্র হচ্ছে। এ রাজ্য ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে —আর অন্যান্য রাজ্যে এখান থেকে অর্জিত টাকা লগ্নী করে শিল্প গড়ে উঠছে। এ ব্যবস্থা আর কতদিন চলবে?

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ বলেন যে এ রাজ্যের পাটকল মালিকদের একাংশ এই শিল্পকে ক্রমাগত শুষে নিয়ে একেবারে শেষ করে ফেলেছে। পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। রপ্তানীর ব্যাপারে নানা কারচুপি করে কোটি কোটি টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে। চাষীদের কাঁচা পাটের জন্য কোন সময়েই ন্যায্য দাম দেওয়া হয় নি। ফলে এই শিল্পের এখন নাভিশ্বাস।

শ্রমমন্ত্রী বলেন অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই শিল্প পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিগত মালিকানার হাত থেকে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনা দরকার। এর জন্য এখনই প্রয়োজন একটি সরকারী সংস্থা। যে সমস্ত পাটকল অক্ষম পরিচালনার দরুণ প্রায় অচল হয়ে এসেছে সেইগুলিকে অবিলম্বে এই সরকারী সংস্থা পরিচালনার জন্য নিয়ে নিতে পারে। ভবিষ্যতে এই সংস্থার সম্প্রসারণ করা সম্ভব। তুলাজাত বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারে এই ধরণের সরকারী সংস্থা যদি থাকতে পারে তাহলে পাটশিল্পে আংশিক সরকারী কর্তৃত্ব গড়ে তোলার কোন বাধা থাকার কথা নয়।

উত্তর দিতে ওঠেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জোরালো ভাষায় সবাইকে চমকে দিয়ে বলেন যে পাটশিল্প মালিকরা দেশের সর্বনাশ করেছে। বিগত দু দশক ধরে ওরা মুনাফার পাহাড় তৈরী করেছে, পাটচাষীকে শোষণ করেছে। কিন্তু কানাকড়িও খরচ করে নি শিল্পোন্নয়ণের জন, নানা ধরণের উন্নতমানের পাটজাত দ্রব্য তৈরীর ব্যাপারে গবেষণার জন্য। আজ পাটকল মালিকরা চেঁচাচ্ছে তাদের মাল বিদেশী বাজারে রাসায়নিক সুতাজাত চট বা অন্যান্য উৎপন্নের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। এই অবস্থার জন্য দায়ী পাটশিল্প মালিকরা।

কিন্তু ডাঃ নাগের জাতীয়করণ বা আংশিক সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবীর ব্যাপারে দেবীবাবু নারাজ। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন এ প্রশ্ন ওঠেই না। কেন্দ্রীয় সরকার কোন মতে এ শিল্পে হাত দেবে না। এ ধরণের চিন্তা কেন্দ্রীয় সরকারের মাথায় কোনদিন আসে নি। দেবীবাবু নতুন রাজনীতিতে নেমেছেন, তবে নিশ্চয়ই সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান অবস্থায় পাটকল মালিকদের মত শক্তিশালী গোষ্ঠীসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব নয়।

কেন্দ্রের অর্থ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীও বিড়লাগোষ্ঠী পরিচালিত হিন্দ মোটর কারখানার নানা সমালোচনা করে বলেন স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই গোষ্ঠী গাড়ী তৈরীর ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে এসেছে আর বহু মুনাফা লুটেছে। কিন্তু কারখানার উন্নতি বা উৎপন্নের উৎকর্ষতা বাড়াবার কোন ব্যবস্থাই করে নি। এখন যে গাড়ী তা নতুন অবস্থাতেই প্রায় অচল বলে নানা অভিযোগ তার কাছে আছে।

কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন গাড়ীর ওপর সরকারী শুল্ক অথবা পেট্রলের ওপর সরকারী নানা ট্যাক্স কমাবার যে প্রস্তাব এসেছে তা বিচার করার উপযুক্ত জায়গা হল কেন্দ্রীয় সংসদ, রাজ্য শ্রমপর্ষদ নয়। অতএব এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে না। অর্থাৎ হিন্দ মোটর কারখানায় কিভাবে শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই বন্ধ হতে পারে সে বিষয়ে প্রণববাবু কোন হদিশ দিতে পারেন না।

শেষ পর্যন্ত যখন বক্তৃতার পালা সাঙ্গ হল তখন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী রঘুনাথ রেড্ডী একটি অভিনব পথ বাৎলে দিলেন। তিনি বললেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পের যা অবস্থা তা আরও গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। আর একসঙ্গে সমস্ত শিল্পের আলোচনা সম্ভব নয়। প্রতিটি শিল্পের সমস্যা একক্ভাবে বিচার করতে হবে।

তাই রঘুনাথ রেড্ডী প্রতিটি শিল্প মালিকদের কাছে আবেদন করলেন যে প্রত্যেক কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা, বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপন্নের বাজার, কারখানার নিখুঁত লাভলোকসানের হিসেব ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য তৈরী করে তারা যেন দশদিনের মধ্যে সরকারের কাছে পেশ করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি শিল্পের সমস্যা বিচার ও তার সমাধানের জন্য দিল্লীতে আলাদা সভা বসবে আগামী মাসে।

সবটাই এড়িয়ে যাওয়ার কায়দা। মালিকদের কাছে তথ্য দেওয়ার আবেদন—এ এক হিড়িক। তাদের তথ্য ছাপার অক্ষরে বছর বছর প্রকাশিত হয়। সবটাই দু নম্বর খাতার হিসেব অনুযায়ী। এই সত্য সরকারের অজানা নয়। আর অছিলা সরকারের বরাবরের কাজ হল মালিকদের দাবী দ্রুত মেনে নেওয়া আর শ্রমিকরা কিছু চাইলেই নানা গড়িমসি। যেমন পাটকল মালিকরা দাবী করল পাটজাত উৎপন্নের ওপর রপ্তানী কর তুলে নেওয়ার। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিরুক্তি না করে মালিকদের দাবী মেনে নিল।

এই সব কাণ্ড দেখে এখন এই ধারণা ব্যাপক হয়েছে যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এ রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট অথবা শিল্পে সংকট সমাধানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। তা ছাড়া নির্বাচন প্রায় এসে গেল। এ রাজ্যের কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠীকে চটান সরকারের পক্ষে মুস্কিল।

বিদেশী তৈল কোম্পানীর চক্রান্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিদেশী তেল কোম্পানী বার্মা-শেলের নেপথ্য কাজকর্মের বিরুদ্ধে ভারতীয় পেট্রোল ডিলাররা রীতিমত সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশন থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বার্মাশেল কোম্পানীকে জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অযৌক্তিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া জনসাধারণকে অসুবিধায় ফেলবার উদ্দেশ্যে কোম্পানী বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে পেট্রলজাত দ্রব্যাদির সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছেন।

পেট্রোল ডিলারদের সর্বভারতীয় সংগঠনের সম্পাদক শ্রীশচীন দত্ত জাতীয় স্বার্থে অবিলম্বে বিদেশী তেল কোম্পানী বার্মাশেল এবং ক্যালটেক্সকে জাতীয়করণের দাবী জানিয়েছেন। পেট্রোল ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশন থেকে সমস্ত পেট্রোল ক্রেতার কাছে এক নিবেদনমায় বলা হয়েছে যে, বার্মাশেল কোম্পানী কর্তৃক যে কোন সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টার প্রতিরোধ করুন। কোম্পানীর কোনরূপ চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে যৌথ প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তুলুন।

পেট্রোল ডিলারদের পক্ষে এ্যাসোসিয়েশন থেকে দাবী করা হয়েছে যে, কোম্পানী কর্তৃক কোন প্রকার মাসিক ভাড়া বৃদ্ধি করা চলবে না। ডিলারদের প্রয়োজন মত সমস্ত রকম পণ্য সরবরাহ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কোম্পানীর যে কোন সম্পত্তি বিক্রী বা হস্তান্তর বন্ধ রাখতে হবে। কোন অজুহাতেই ডিলারদের কাছ থেকে কোন আমানত গ্রহণ করা চলবে না।

পরিশেষে এ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশনামায় বলা হয়েছে যে, "দেশের আইন জনগণের পক্ষে, তাই বিদেশী এই তেল কোম্পানীর অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ান।"

সমতট পত্রিকা আয়োজিত

ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

মৌলিক ও অপ্রকাশিত গল্প দুটি পাঠানো যাবে। পাঠানোর শেষ তারিখ ২৪শে মে। রচনাকারের জীবনী (১০০ শব্দের মধ্যে), সেই গল্প পাঠানোর ও যোগাযোগের ঠিকানা :

সমতট ॥ ৫১ বি দেশপ্রিয় পার্ক ইস্ট, কলিকাতা-২৯

বিচারকমণ্ডলী : লীলা মজুমদার, তারাপদ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত।

১ম পুরস্কার—১০০ টাকা।

যে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ধনকুবেরের দল বুদ্ধিজীবী আর ধর্মধ্বজী ভাবকের দলকে সৃষ্টি কিম্বা ক্রয় করে তারই নাটক

পটভূমি দৃশ্যমান

মুক্তঅঙ্গনে

১৫ই মে ॥ বৃহস্পতি ॥ সন্ধ্যা ৭টায়

নাটক ও নির্দেশনা ॥ অগ্নিমিত্র মঞ্চ পরিকল্পনা ॥ রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

আলোক সম্পাত ॥ প্রদ্যোৎ সমাদ্দার আবহ সঙ্গীত ॥ প্রশান্ত দত্ত

প্রযোজনা ॥ সুরভারতী

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

রাজ্য সভার প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে কংগ্রেসীদের মধ্যে তুমুল বিরোধ

১৮শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৬ই মে ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যসভার শূন্য আসনে পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী মনোনয়ন প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একাংশ ছাড়া আর কেউ সি পি আইকে আসন ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে বিক্ষুব্ধদের দাবী মেনে না নেয়া হলে রাজ্যসভার শূন্য আসনের নির্বাচনের প্রশ্নে বিদ্রোহী বলে আখ্যাত কংগ্রেসীরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতেও পিছপা হবেন না বলে নিশ্চিত আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের প্রধান বক্তব্য হল যে কংগ্রেস-সি পি আই জোট যখন ভেঙ্গে গেছে, সি পি আই যখন সরকারীভাবে বিরোধী আসনে বসেছে তখন কংগ্রেসের বাড়তি ভোট দিয়ে সি পি আইকে জিতিয়ে নিতে হবে কেন? বিদ্রোহীরা বলছেন যে সি পি আইকে আসন ছেড়ে দিতে হলে হয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আর না হয় কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়াকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে যে সি পি আই-এর সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত আছে সর্বভারতীয় পর্যায়ে। সেজন্যই সি পি আইকে জেতাতে হবে।

আসলে কংগ্রেসের মনোনয়ন নিয়েও বিদ্রোহী বলে আখ্যাতরা ভীষণ ক্ষুব্ধ। ছয়টি শূন্য আসনের দাবীদার অন্ততঃ পনেরোজন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির মনোনয়নের ওপর এম এল এরা আস্থা রাখতে পারছেন না। এ পর্যন্ত মনোনয়নের ব্যাপারে যে পাঁচটি নাম উঠেছে অর্থাৎ যে পাঁচজনকে মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন দিতে

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সুব্রতর বিদেশ ভ্রমণের নেপথ্যে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পৌরমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জীর সস্ত্রীক রোম যাত্রাকে কেন্দ্র করে সুব্রত বিরোধী গোষ্ঠীর নেতারা নানা কথা বলতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ বলছেন—"সুব্রত অন্যায়ভাবে বিশ্ব মেয়র সম্মেলনে যোগদান করেছে। আসলে বিদেশ যাবার লোভটা সুব্রত সামলাতে পারেনি।" কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর জনৈক প্রভাবশালী তা দর্পণের প্রতিনিধির কাছে বলেছেন—আমন্ত্রণটা আসলে এসেছিল পৌরপ্রশাসক শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের নামে। যদিও শ্রীসমাদ্দার মেয়র নন কিন্তু তিনি প্রশাসকের পদে থাকায় তিনিই মেয়রের স্থলাভিষিক্ত। পৌরমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী আমন্ত্রণ-পত্র পান এবং ঠিক করেন তিনি নিজেই রোমে যাবেন এবং সেইমত তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিজের নাম পাঠান অনুমোদনের ছাড়পত্রের জন্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রার্থনা করে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঐ নাম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং এক পত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একজন মন্ত্রীকে পাঠানোর কারণ জানতে চান। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর চিঠি পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুব্রতকে ডেকে পাঠান এবং বলেন—এটা তোমার উচিত হয়নি, অন্তত নাম পাঠানোর আগে আমাকে তোমার জানানো উচিত ছিল। সুব্রত নানাভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন লাভ হয়না। তখন সুব্রত উপায়ান্তর না দেখে মোক্ষম অস্ত্র ছেড়ে বলেন, যদি আপনি আমার রোম যাত্রার সুপারিশ না করেন তবে আমি আপনার বিরোধিতা করব। এই বার কাজ হয়। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে অর্থমন্ত্রীকে সুব্রতর রোমে যাবার ছাড়পত্র অনুমোদনের অনুরোধ জানান।

নৃশংস অত্যাচারেও ছেলেটি মুখ খোলেনি, অতঃপর ওকে গুলী করে মারা হয়

ভিয়েতনাম

ইতিহাসের নতুন পাতা

চাণক্য সরকার

চীনের পর ভিয়েতনাম—ইতিহাসের সবচেয়ে উগ্র আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ দু দুবার পরাজিত হল পশ্চাদপদ কৃষক-মেহনতী মানুষের সংগ্রামী দৃঢ়তার কাছে। এ কোন অঘটন নয়। এ ঘটনা আবার ঘটবে, বার বার। অস্ত্র যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সঠিক রাজনীতি, সাধারণ মানুষের ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে সংগ্রামী সংগঠন এবং বাস্তব অবস্থার অনুকূলে যুদ্ধ কৌশল সমস্ত শক্তিকেই পরাজিত করতে পারে। এ দৃষ্টান্ত চীনে ও ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরা শোচনীয় পরাজয়ে প্রমাণিত হল। এ কথা সত্য যে, এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকে স্পেনে আর হাল আমলে ইন্দোনেশিয়া, লাতিন আমেরিকায় বহু দেশে এবং বিশেষ করে চিলিতে সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক অস্ত্র ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সাময়িকভাবে সংগ্রামী মানুষের আশা আকাঙ্খা চূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই চীনের ও ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে বিশেষ অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধ ইতিহাসে নজীরবিহীন। নাদিরশাহ, এাটিলা, চেঙ্গিস খান প্রভৃতি বহু নৃশংস আক্রমণকারীর নানা অত্যাচারের কথা মধ্যযুগীয় ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তিন কোটি অধিবাসীর ছোট্ট দেশ ভিয়েতনামে গত ত্রিশ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদ যে বিধ্বংসী আক্রমণ চালিয়েছে এবং গণ হত্যার মারণাস্ত্র ব্যবহার করেছে তার কোন নজীর ইতিহাসে নেই। চীনেও অনুরূপ আক্রমণ ওরা চালিয়েছে। কিন্তু বিশাল দেশে অগণিত মুক্তি যোদ্ধা কৌশলের দিক থেকে পেছিয়ে যাওয়ার ব্যাপক অঞ্চলের সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছে। ভিয়েতনামে সে সুযোগও ছিল না। তাদের ভরসা ছিল দেশের বিরাটত্ব নয়, সাধারণ মানুষের দৃঢ় সমর্থন। এবং এই সমর্থনের জন্য মানুষকে প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই জীবনপণ করতে হয়েছে। সারা দেশে সর্বাধুনিক বোমা ও আগুন ছড়ানোর যন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করেছে মানুষকে ব্যাপক হত্যার মাধ্যমে স্তব্ধ করতে। তারা পরাজিত হয়েছে বারবার, প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ আরও মরীয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নৃশংস প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের নিজের বেতনভুক সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের নিজের ঘাঁটি মার্কিন মুলুকে

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

তরুণকান্তি সিদ্ধার্থ রায়ের ওপর দারুন ক্ষুব্ধ

জগজীবন রামের কাছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তথা অন্যতম কংগ্রেস নেতা শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন যে তিনি আর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের অপমান সহ্য করতে রাজী নন। তিনি জগজীবনবাবুকে আরো জানান যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পেটোয়া এম এল এদের দিয়ে দিনের পর দিন যেভাবে তাঁকে অপমান করে চলেছেন তাতে একজন প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা হিসাবে তাঁরপক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব নয়।

শ্রীঘোষ সংবাদে জানিয়েছেন যে মানুদার চেয়ে তিনি কোন অংশে কম নন। মানুদার পেছনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর (তরুণবাবুর) পেছনে দলের অধিকাংশ এম এল এ আছেন। শ্রীঘোষ জোরের সঙ্গে শ্রীরামকে জানান যে তিনি যদি মনে করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে উত্তর প্রদেশ বা বিহারের মতো অবস্থা করতে পারেন। তাই বিজয়বাবু বা কাশীবাবুরা যখন প্রকাশ্যে মানুদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তখন তিনি (তরুণবাবু) ও সাত্তার সাহেব তার মোকাবিলা করার জন্য পুরোপুরি ফিল্ডে নেমেছিলেন।

তরুণবাবু আরো জানান যে তিনি ডাঃ রায়ের আমল থেকে মন্ত্রী। তাই মন্ত্রিত্বের লোভে মানুদার এই অপমান সহ্য করতে রাজী নন। রাজনীতিতে তাঁরও অভিজ্ঞতা নেহাত কম নয়। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর সম্বন্ধে যে সমালোচনা করা হচ্ছে তা শুধু তাঁর একার দায়িত্ব নয়। দলনেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়েরও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। খাদ্যনীতি সফল হচ্ছে না বলে শঙ্করের যে দোষ দেওয়া হচ্ছে তা মোটেই উচিত নয়। কারণ খাদ্য-

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

১৮শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা
শুক্রবার, ১৬ই মে ১৯৭৫

খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর হয়ে আসছে। বড় বড় কাগজগুলোতেও জেলায় খাদ্যাভাবের খবর প্রায়ই প্রকাশিত হচ্ছে। চালের দাম ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর কাছে বারম্বার গম চেয়ে বিফল মনোরথ হয়েছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ঃ এবার পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফলন হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে সংগ্রহ ঠিকমত হয়নি বলেই খাদ্যাভাব।

সংগ্রহ যে লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক দূরে একথা সরকারও স্বীকার করেছেন। খাদ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এ ব্যাপারে এম এল এদের ওপর দোষারোপ করেছেন। ফেন্টার ব্যাপারে হাজার হাজার মামলা আদালতে ঝুলছে। আর এ-দেশে বিচার ব্যবস্থা এতই দীর্ঘসূত্রী যে এইসব মামলার অশু মীমাংসার কোন সম্ভাবনা নেই।

ফসল ওঠার মুখে মুখ্যমন্ত্রী সহ তথাকথিত কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন। গন্ডারের মতই অবশ্য। কিন্তু এরা যত গর্জায় তত বর্ষায় না। তাই খাদ্য সংগ্রহের অবস্থা দাঁড়াল গত বছরের মতই। সরকারের ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। বড় চাল গিয়ে জমা হয়েছে কালোবাজারীদের ঘরে। সারা রাজ্যে খাদ্যের জন্য হাহাকার আর সেই খাদ্য চড়া দামে বিক্রী করে চালকল মালিক ও জোতদাররা ভালো মুনাফা ঘরে তুলছে।

সামনের বছর কংগ্রেস নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবে এই কালো মুনাফার সাহায্য নিয়ে। তাই শিল্পপতি ব্যবসায়ী জমির মালিক সকলকেই নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

উপরের কথাগুলো নতুন কিছু নয়। দেশের লোক মোটামুটি এসব জানে। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের এই শয়তানি থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি ? সরকারকে কি করে বাধ্য করানো যায় কালোবাজারীদের কবল থেকে চাল উদ্ধার করতে ? আন্দোলন শুরু হয়েছে। আট পার্টির নেতৃত্বে গত বুধবার সারা পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের দাবীতে মিছিল হয়েছে, সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। আঠারোই জুন বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ আসছেন। সব মিলিয়ে আন্দোলনকে লাগাতার আন্দোলনে পরিণত করা দরকার।

দুটি গানের জন্ম

সাধন গুহ

বছর বারো আগের কথা। ভিয়েতনাম অর্থাৎ ভিয়েতনামের বীর মুক্তি যোদ্ধাদের সংগ্রামের অবর্ণনীয় সাফল্য তখন দৈনন্দিন সংবাদপত্রের শিরোনাম। ভিয়েতনাম অর্থই সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষের বুকে তখন বয়ে আনছে এক বৈদ্যুতিক স্পন্দন। দমদমের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে (তখনও পার্টি ভাগ হয়ে যায়নি) গণনাট্য সংঘের কয়েকজন সভ্য ও সভ্যা আমাকে ধরলেন ভিয়েতনামের ওপর গান লিখে দিতে। আমি ভয়ে ভয়ে তাদের কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু যখনই কলম ধরেছি তখনই যেন দুটো হাত অসাড় হয়ে এসেছে। বারবার ভেবেছি, আমাদের বিরাট দেশের একটা রাজ্যের চেয়েও আয়তনে ছোট্ট একটা দেশ ভিয়েতনামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা কোন যাদু স্পর্শে "ধনুকের মত বাঁকা পিঠগুলো টান করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে" ঘৃণ্যতম সাম্রাজ্যবাদী দস্যু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তাদের তো কিছুই নেই। না প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। না প্রচুর পরিমাণ জমানো খাদ্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় যা তাদের ছিল তা হচ্ছে তাদের সংগ্রামী নিষ্ঠা, তাদের দেশের পার্টির সঠিক নেতৃত্ব এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগের প্রদীপ্ত মহিমা। এমন যে দেশ, এমন যে দেশের বীর নরনারী তাদের কাছে নিজেকে যেন বারবার করুণার পাত্র মনে হয়েছে।

এদিকে গানের জন্য দৈনন্দিন তাগাদা। কিন্তু গান আর লিখতে পারছিনা। কলকাতার পোষাকী মধ্যবিত্ত বিপ্লবের গান লেখা সহজ হলেও ভিয়েতনামকে নিয়ে কি লিখবো। আর তা লেখার অধিকারই বা আমি কোথায় পাবো। ভেবেছি। বারবার ভেবেছি শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে, আমার দেশে বসেই এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি সহযোদ্ধার আনুগত্য জ্ঞাপনের মধ্য দিয়েই আমাকে অর্জন করতে হবে সংগ্রামের উত্তরাধিকার। ভিয়েতনামকে ছড়িয়ে দিতে হবে গানের সুরে মানুষের মনে। আমার চোখে তখন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে মুক্তির দীপশিখা ভিয়েতনাম।

রাত তখন প্রায় বারোটা। দু এক লাইন করে লিখছি আর ছিঁড়ে ফেলছি। কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না। সাধারণত সুর প্রথম করে নিয়েই আমি কথা বসাই। কিন্তু কোন সুরই তখন আমার মন ভরাতে পারছে না। কোন্ ভাষায়, কোন্ সুরে আমি পৌঁছে দিতে পারি ভিয়েতনামের এই বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে সাধারণ মানুষের কাছে তারই যন্ত্রণায় তখন তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি আমি। একদিন ট্রামে যেতে যেতে কয়েকজন যুবকের মধ্যে ভিয়েতনাম সংক্রান্ত আলোচনা আমার কানে আসছিল। হঠাৎ একটি বাক্যাংশ "সারা পৃথিবীর বজ্রমুঠি" আমার শ্রুতিকেই ভীষণ ভাবে দোলা দিল। সেই রাতেই আমি লিখেছিলাম আমার গান "সারা পৃথিবীর বজ্র-মুঠির অগ্নিশপথে লালসেলাম / তারি সাথে আজ সারা ভারতের কোটি কোটি জন মন দিলাম / লালসেলাম ভিয়েতনাম, লালসেলাম। মনে আছে গানটি লিখতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার কলমের মুখে বেরিয়ে গেল, "তোমার মাটিতে চিতার আগুনে যুদ্ধের শেষ পরিণাম আমি লিখে দিলাম"। স্তবকটি ছিল এইরকম, "(ঐ) মার্কিনী যত দস্যুর চক্রান্তের জাল ছেঁদিয়া/(তোমরা) ওঠালে আকাশে নতুন সূর্য রাত্রির বুক ভেদিয়া/(তাই) মাটিতে পাহাড়ে প্রতিরোধ/জ্বলছে চোখের আগুনে প্রতিশোধ/(আজ) তোমার মাটিতে চিতার আগুনে যুদ্ধের শেষ পরিণাম আমি লিখে দিলাম/লালসেলাম ভিয়েতনাম, লালসেলাম।"

গানটি যখন গণনাট্য সংঘের কর্মীদের হাতে তুলে দিলাম, ওরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন, এতে সুরারোপ করেছিলেন গণনাট্য সংঘেরই সভ্য দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সম্ভবত এই গান সংগ্রামী হৃদয়বৃত্তি-সম্পন্ন প্রতিটি মানুষকেই দোলা দিয়েছিল। কারণ, সি পি আই (এম) কর্মীরাও এই গান যেমন গেয়েছেন এবং গেয়ে থাকেন, নকশালপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরাও এই গান গেয়েছেন। এমন কি, সি পি আই দলের অনেকেও এই গান গেয়েছেন। এতক্ষণ ধরে এই গানের জন্মরহস্য বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য আমার আত্মপ্রচার নয়। এর মূল কারণ, আমার স্বপ্ন সাফল্যের গর্ব। আমি ভাবতেই পারি নি যে, সত্যি সত্যি আমি ভিয়েতনামের মাটিতে চিতার আগুনে যুদ্ধের শেষ পরিণাম দেখে যেতে পারবো। আমার গর্ব, আমি দেখে গেলাম। স্বরচিত গানের এমন বাস্তব রূপ নিয়ে গর্ব প্রকাশ করা কি আত্মপ্রচার ? সম্ভবত, না।

উনিশশ উনসত্তর সাল। হো চি মিনের মৃত্যু হল। প্রকাশ্যে না হলেও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে একটা চাপা উল্লাস। হো চি মিনের মৃত্যুর পর ভিয়েতনামের ঐতিহাসিক প্রতিরোধ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে—এই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের ধারণা এবং কলকাতার বাজারী কাগজেও ঘুরিয়ে ফিরেয়ে সে আভাষ দেওয়া হয়েছে। স্বীকার করছি আমিও তখন ভীত। যদি হো চি মিনের মত শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্বের অভাবে ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম পর্যুদস্ত হয়ে যায়। "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" নীতি প্রয়োগের নামে সোবিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়করা যদি মাঝপথে একটা আপোষের দেয়াল তুলে দেন। যদিচ চীন আছে তাই সহজে সেটা সম্ভব হবে না—এই আশা নিয়েই তখন বেঁচেছি।

হো চি মিনের মৃত্যুর তিন-চার দিন পর হুগলীর ইটাচুনা কলেজের ছেলেরা একটি স্মৃতিসভার আয়োজন করেন এবং তারা হো চি মিনের ওপর একটি গান লিখে দিতে বলেন। আবার সমস্যা। কিভাবে চিত্রিত করবো সেই অপরাজেয় পুরুষকে। খর্বাকৃতি সাদামাটা সেই মানুষটিকে তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার মাথায় একটি কল্পনা ঘুরে-ঘুরে করছিল। মনে হচ্ছিল গভীর জঙ্গলে মুক্তিযোদ্ধারা যখন অতন্দ্র প্রহরায় রত, রাইফেলের ট্রিগারে হাত রেখে এ্যাকশনের জন্য যখন তারা প্রস্তুত তখন তাদের কাছে খবর এলো হো চি মিন বেঁচে নেই। গভীর বেদনা তাদের বুকে। যাঁহাতে ট্রিগার চেপে ডানহাতে লাল সেলাম জানালেন প্রয়াত মহানায়কের উদ্দেশে। কমিউনিস্ট হলেই তার প্রিয়জন বিয়োগে বেদনা থাকতে নেই—এবম্বিধ উদ্ভট "বৈপ্লবিক" চিন্তা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য নয়। কমিউনিস্টরাইতে—

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

তুমুল বিরোধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চান তাঁদের মধ্যে দুজন হাড়া অন্য তিনজনকেই বিদ্রোহীরা মেনে নিতে রাজী নন। দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে মনোনয়ন দান সকলেই স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন। বাকী শ্রীমতী প্রতিমা বসু, ধীরেন বসু, মহম্মদ সোহারাব বিষ্ণু ব্যানার্জী অথবা শিশির গাঙ্গুলী প্রভৃতি প্রত্যেকের নামেই আপত্তি। একটা প্রভাবশালী অংশের দাবী শান্তিমোহন রায়কে মনোনয়ন দিতে হবে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কিছুতেই শান্তিবাবুকে মনোনয়ন দেবে না।

আপাততঃ বিদ্রোহীদের একটি দাবী জয়যুক্ত হয়েছে। তাঁরা এই মনোনয়নের ক্ষমতা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের হাত থেকে কেড়ে এনে কংগ্রেস কর্মসমিতির কাছে উপস্থাপিত করার অধিকার আদায় করেছেন। স্বভাবতই কংগ্রেস কর্মসমিতির মনোনয়ন সংক্রান্ত বৈঠকে প্রচন্ড ঝড় উঠবে।

বলা বাহুল্য ষষ্ঠ আসনটি সি পি আইকে ছেড়ে দেবার প্রশ্ন নিয়েই বিরোধীরা তাদের বিক্ষোভ জানাবেন। যদিও এই বিক্ষোভের পিছনে নানা ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দলাদলিই প্রধান কারণ তা হলেও বিদ্রোহীরা কৌশল হিসাবে সি পি আইয়ের বিরোধিতাকেই প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবেন।

এই ব্যাপারে অবস্থা এত জটিল হয়ে পড়েছে যে নয়াদিল্লীর কড়া হস্তক্ষেপ না হলে ত্রিপুরার মতো পশ্চিমবাংলাতেও কয়েকজন প্রথমসারির কংগ্রেস নেতা নির্দলীয় হিসাবে মনোনয়ন পত্র পেশ করবেন। এটা যদি কংগ্রেস বন্ধ না করতে পারে তাহলে এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর জয়লাভ করাও মুস্কিল হয়ে উঠতে পারে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিপদ তত বেশী নয়। কারণ তিনি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নেতা। তাঁর জেতার পক্ষে যে কয়টি ভোট দরকার তা নিজের উপদল থেকেই সংগ্রহ করতে পারবেন। কিন্তু প্রণববাবুর মুস্কিল হচ্ছে যে তাঁর নিজের কোন গোষ্ঠী নেই। বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিবাদের তিনি বলি হয়ে যেতে পারেন। এটা বুঝেই সম্প্রতি প্রণববাবু অন্যতম বিদ্রোহী নেতা লক্ষ্মীকান্ত বসুর সঙ্গে একটি দীর্ঘ গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অপর দুই নেতা পঙ্কজ ব্যানার্জী ও সুনীতি চট্টরাজও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে প্রণববাবু বলেছেন যে আই এন টি ইউ সি বনাম এন এল সি সির বিরোধে তাঁর সমর্থন রয়েছে এন এল সি সির পিছনে। তাছাড়া তিনি আদৌ সি পি আই সমর্থক নন বলেই লক্ষ্মীবাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন।

সি পি আইয়ের আসন লাভের আর একটা বড় বিপদ হল যে সি পি আইয়ের হিসাব অনুসারে যে সুব্রত মুখার্জী এতদিন পর্যন্ত প্রগতিশীল হিসাবে অভিহিত তিনিও এখন আর সি পি আইকে সমর্থন করতে রাজী নন। এনিয়ে প্রিয় মুন্সীর সঙ্গে সুব্রতবাবুর বিরোধও আর গোপন নেই। তবে সি পি আইয়ের মুরুব্বীরা জয়নাল আবেদীনকে পক্ষে আনতে পারায় তাদের কিছুটা সুবিধা হয়েছে। ডঃ আবেদীনকে কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল বলে সি পি আই এতদিন চিহ্নিত করে রেখেছিল। নির্বাচনের আগে কংগ্রেস সভাপতির পদলাভ করে নির্বাচনী তহবিলের দায়িত্বে আসার আশায় ডাঃ আবেদীন কংগ্রেসে সি পি আইয়ের মুরুব্বীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। ফলে ডাঃ আবেদীনও এখন সি পি আইয়ের কাছে প্রগতিশীল।

সি পি আই কিন্তু এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না। তাদের প্রার্থী কল্যাণ রায়ের বিরুদ্ধে বহু মানের কংগ্রেসীরা সোচ্চার। তারা কিছুতেই সি পি আই সদস্যদের ভোট দেবেন না বলে জানিয়েছেন। সি পি আইয়ের মাত্র চার-পাঁচটি অতিরিক্ত ভোট প্রয়োজন নিজেদের কয়টি ছাড়া। তাদের পক্ষ থেকে আর এস পির তিনটি ভোট আদায়ের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাদের হতাশ হতে হয়েছে। আর এ পি এই ভোটে অংশ গ্রহণ করবে না বলে সি পি আইকে জানিয়ে দিয়েছে। গোর্খা লীগ সংগঠন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থনও সি পি আই পাবে না। যদি শান্তিমোহন রায় সহ একাধিক ব্যক্তি মনোনয়ন পত্র পেশ করেন তাহলে সি পি আইয়ের পক্ষে আসন লাভ করা মুস্কিল হতে পারে। এমন কি কংগ্রেসের সরকারী কোন কোন প্রার্থী বিপদ্ন হয়ে পড়তে পারেন।

ভিয়েতনাম ঃ তিরিশ বছরের ইতিবৃত্ত

ভিয়েতনাম একটি ছোট্ট দেশ (পশ্চিমী মানদণ্ডে বিচার করলে প্রচণ্ড দরিদ্র দেশ। একজন সাধারণ আমেরিকান এক সপ্তাহে যা আয় করে এক বছরে একজন সাধারণ ভিয়েতনামী সেই অর্থ আয় করে। এই ছোট দেশটি ওয়াশিংটন থেকে ন হাজার মাইল দূরে অবস্থিত কিন্তু কারিগরী বিদ্যায় একশো কিম্বা এক হাজার বছর পেছনে।

ভিয়েতনামে ভিয়েতনামী সংস্কৃতির জীবন্ত অংশ হিসেবে রয়েছে বৌদ্ধ ক্যাথলিক চীনা আদিম পার্বত্য উপজাতি কাম্বোডিয় থাইরা। চীনারা ভিয়েতনামে এক হাজার বছর রাজত্ব করেছে আর ফরাসীরা আশী বছর।

ভিয়েতনামীরা গর্বের সঙ্গে খৃষ্টজন্মের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত প্রসারিত সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আজও স্মরণ করে। বিদেশী আধিপত্য এবং ঘন ঘন বিদেশী আক্রমণে ভিয়েতনামীদের স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে দৃঢ়মূল। জনসংখ্যার বিভিন্নতাই ভিয়েতনামীদের মধ্যে জাতীয় সত্তা গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে। ইতিহাস দেখিয়েছে এই সত্তা রক্ষার জন্য তারা অবিশ্বাস্য ? রকমের কষ্টও সহ্য করতে পারে।

শারীরিক সৌন্দর্যে ভিয়েতনামীরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জাতিদের অন্যতম। এবং অদের শান্তিতে থাকতে দিলে তারা সবচেয়ে শান্ত।

ফরাসীদের দখলে

১৮৫৮ সালে ফরাসীরা বলপূর্বক ভিয়েতনাম দখল করে এবং ১৮৮৪ সালের মধ্যেই বর্তমানে ভিয়েতনাম লাওস ও কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত দেশগুলোর ওপর পুরোপুরি নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে যাতে তাদের অর্থনীতি সব সুবিধাটুকু ভোগ করতে পারে। পশ্চিমী আদব কায়দা দুরস্ত একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত গোষ্ঠী গড়ে তোলা হল যারা বিপুল কৃষক জনসংখ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন। এই গোষ্ঠীকে সামনে রেখে এবং পেছনে সামরিক শক্তি এবং নিজস্ব অফিসারদের নিয়ে ফরাসীরা বিভিন্ন শ্রেণীর জনসংখ্যাকে শাসন করে। সারা ইন্দোচীনে ফরাসী কর্তৃত্ব।

ফরাসী শাসনে কৃষক জনসাধারণ প্রচণ্ড দুর্দশার সম্মুখীন হয়। ইন্দোচীন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ চাল ও রবার রপ্তানীকারক দেশে পরিণত হয়, কিন্তু জনসাধারণ দরিদ্রই থেকে যায়। ১৯৩৯ সাল পনেরো লক্ষ টনের বেশি অর্থাৎ মোট উৎপাদনের চল্লিশ শতাংশ চাল রপ্তানী করা হয়, কিন্তু মাথা পিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ তিরিশ শতাংশ কমে যায়। অতিরিক্ত পরিমাণ কর বসিয়ে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের সমস্ত খরচ তোলা হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মত লবণের ওপর কর ধার্যের ফলে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়। ফরাসীরা আফিম মদ তামাক ও লবণ বিক্রয় নিজেদের হাতে রাখে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এইসব দ্রব্যের ওপর কর থেকে উপনিবেশের মোট আয়ের পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ আসত।

জমি ভোগ দখলের যে নিয়ম এবং যে প্রচণ্ড ভাড়া ও সুদ তাতে ভিয়েতনামী কৃষকরা চরম দুর্দশায় পড়ে। ঋণ শোধে অক্ষমতার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়।

ভিয়েতনামী অর্থনীতির ওপর ফরাসী শাসনের মোট প্রতিক্রিয়া খুবই সর্বনাশা। এতে মুষ্টিমেয়র ধনসম্পদ ও অধিকাংশের দুর্গতির মধ্যে ফারাক বেড়েছে। বিশ দশকের শেষদিকে চাল রবার রপ্তানীর চার ভাগের এক ভাগ দাঁড়ায় আর আমদানীর পাঁচ ভাগের তিনভাগ গাড়ি, সুগন্ধি কার্পাস ও গার্হস্থ্য দ্রব্য যা শুধু ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক এবং গুটিকয় ভিয়েতনামী অভিজাতদের প্রয়োজন।

ষাট বছর রাজত্বের পর দেখা গেল ফরাসীরা একাশিটি কারাগার চালাচ্ছে—প্রমশিবিরগুলোকে এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না। মাত্র দুই শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পেত; মাত্র এক শতাংশের অর্থৈক মাধ্যমিক স্কুলে যেত, একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সমগ্র লাওসে একজন মাত্র দেশীয় ডাক্তার ছিল। ১৯৪৩ সালে ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষা পাঠাগার ও হাসপাতালের ওপর মোট ব্যয়ের পাঁচ গুণ বেশ করেন আফিম কিনতে।

এই হল ভিয়েতনামে ফরাসী শাসনের চেহারা।

প্রতিরোধ

ফরাসীদের শাসনকালে বারবার কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দয় হাতে তা দমন করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভিয়েতনামীদের সহযোগিতা পাবার জন্য তাদের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফলে প্রায় এক লক্ষ ভিয়েতনামী সৈন্য অথবা শ্রমিক রূপে কাজ করার জন্য ফ্রান্স গিয়েছিল। কিন্তু ফরাসীরা সে প্রতিশ্রুতি রাখে নি। যুদ্ধের পরে ভিয়েতনামের অবস্থা বদলায় নি।

চরম অবিচারের মধ্যে তাদের অসহায়তা, সমস্ত বিরোধীদের নির্মম হাতে দমন এবং ফরাসী শাসকদের গোঁয়ার্তুমি ভিয়েতনামীদের মর্যাদায় আঘাত করে।

যুদ্ধের পর ফ্রান্সে নির্বাসিতদের মধ্যে উনত্রিশ বৎসর বয়স্ক নগুয়েন থাই কৃষক নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পরে হো চি মিন নামে পরিচিত হন। তিনি ভিয়েতনামীদের অবস্থা সম্পর্কে ভার্সাই সম্মেলনের আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। ফরাসী উনপিবেশের ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সর্বদা আন্দোলন ও ইস্তাহার প্রকাশ, এবং ভিয়েতনামের স্বাধীনতার দাবী তাঁকে দেশপ্রেমিক হিসেবে বেশ খ্যাতিমান করে তোলে যখন তিনি ভিয়েতনামে প্রত্যাবর্তন করেন।

উনিশশো তিরিশ ও একত্রিশ সালের মধ্যে ভিয়েতনামে কয়েকটি অভ্যুত্থানের চেষ্টার পর ফরাসীরা সমস্ত জাতীয়তাবাদী দলগুলোকে দমন করার প্রচণ্ড চেষ্টা করে এবং সারা দেশে সন্ত্রাস কায়েম হয়। বহুসংখ্যক ভিয়েতনামীকে— কমিউনিস্ট, জাতীয়তাবাদী উদারনৈতিক—কারারুদ্ধ করা হয়। হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে হত্যা করা হয়। সমস্ত জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীকে নির্দয়ভাবে দমন করার কাজে প্রাদেশিক প্রশাসকদের মধ্যে যে ব্যক্তি ফরাসীদের সাহায্য করেছিল তার নাম নো দিন দিয়েম—ভিয়েতনামী অভিজাত পরিবারের লোক। এই দিয়েমকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৪০ সালে জাপানীরা ভিয়েতনাম দখল করে। ফরাসী সরকারের আদেশে ফরাসী গভর্নর জেনারেল জাপানীদের হাতে দেশটিকে ছেড়ে দেয়। ফরাসী আমলাদের মারফৎ জাপানীরা ভিয়েতনামে প্রশাসন চালায়। ১৯৪৫ সালে পরাজয়ের কিছুকাল আগে তারা ফরাসীদের বদলে একজন ভিয়েতনামী অভিজাত ব্যক্তি বাও দাইকে পুতুল "সম্রাট" রূপে খাড়া করে তার মারফৎ ভিয়েতনামে প্রশাসন চালায়। জাপানী অধিকারের সময় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত সমস্ত গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হয় "দি লীগ ফর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ ভিয়েতনাম"—পশ্চিমী লেখকরা যাকে "ভিয়েতমিন" বলে উল্লেখ করেছেন। হো চি মিন এর প্রতিষ্ঠাতা।

স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৪৫ সালের দোসরা সেপ্টেম্বর হ্যানয়ে এক বিপুল উল্লসিত জনগণের কাছে হো চি মিন "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" পড়ে শোনান। বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই করেছেন। অতএব ১৬৯ বছর আগে আমেরিকানদের অনুরূপ ঘোষণা তাদের পক্ষে স্মরণ করা স্বাভাবিক। ভিয়েতনামের "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" মুক্তিসংগ্রামীদের চিরকাল অনুপ্রেরণা দেবে।

"সব মানুষ জন্মেছে সমান হয়ে। তাদের স্রষ্টা তাদের কতকগুলো অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়েছে, যার মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের অন্বেষণ।"

১৭৭৬ সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণায় এই অমর বিবৃতি দেওয়া হয়। ব্যাপক অর্থে এর মানে ঃ সমস্ত মানুষ জন্ম থেকে সমান, সমস্ত মানুষের বাঁচবার সুখী হবার ও মুক্ত থাকবার অধিকার আছে .....

যদিও আশী বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বাধীনতা সমতা ও মৈত্রীর মানদণ্ডের অপব্যবহার করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের পিতৃভূমিকে পদানত করে রেখেছিল এবং আমাদের দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল....

তারা অমানুষিক আইন বলবৎ করেছিল; আমাদের জাতীয় ঐক্য ভাঙবার জন্য এবং আমাদের দেশের মানুষের ঐক্যে বাধা দেবার জন্য তারা ভিয়েতনামের উত্তর মধ্য ও দক্ষিণে তিনটি পরিষ্কার রাজনৈতিক শাসন প্রবর্তন করেছিল।

তারা বিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি কারাগার তৈরি করেছিল। তারা আমাদের দেশপ্রেমিকদের নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে; তারা আমাদের অভ্যুত্থানকে রক্তের নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছে। তারা জনমতের কণ্ঠরোধ করেছে; আমাদের জাতিকে দুর্বল করার জন্য আমাদের আফিম ও মদ খেতে বাধ্য করেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, আমাদের জনগণকে দরিদ্র করেছে এবং আমাদের দেশ লণ্ডভণ্ড করেছে।

তারা আমাদের ধানক্ষেত, আমাদের অরণ্য, আমাদের কাঁচামাল থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে।

তারা অনেক অন্যায় কর আবিষ্কার করেছে এবং আমাদের জনগণকে, বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়কে চরম দারিদ্র্যের অবস্থায় এনেছে।

ফরাসীরা পালিয়েছে, জাপানীরা পরাজিত, সম্রাট বাও দাই নতিস্বীকার করেছেন। যা প্রায় এক শতাব্দী ধরে তাদের আবদ্ধ করে রেখেছিল আমাদের জনগণ সেই শৃঙ্খল ভেঙেছে এবং পিতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

এইসব কারণে আমরা ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা পৃথিবীর কাছে পবিত্র ঘোষণা করছি যে, ভিয়েতনামের অধিকার আছে মুক্ত ও স্বাধীন দেশ হবার—এবং প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই সে তা। তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সমগ্র ভিয়েতনামী জনগণ তাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি একাগ্র করতে বদ্ধপরিকর।

স্বাধীনতার অন্তর্ঘাত

কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যরা যখন জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করছিল সেই সময় তারা ফরাসীদের ছেড়ে দিল, যাদের ভিয়েতনামীরা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য কারারুদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশরা ইতিমধ্যে ফরাসী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল। "আমি পেঁছতে (সায়গনে) ভিয়েতমিনরা স্বাগত জানাল", ব্রিটিশ বাহিনীর কম্যাণ্ডার জেনারেল গ্রেসি লিখলেন, "আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের দূর করে দিলাম।" সায়গনে স্বাধীনতার স্থায়িত্ব, মাত্র তিন সপ্তাহ।

উত্তরে ফরাসী অফিসাররা ভিয়েতনামীদের খোলাখুলি ঘৃণা করত। ছেচল্লিশ সালের ছয়ই মার্চ ফরাসী ইউনিয়নের কাঠামোয় ভিয়েতনামকে স্বাধীনতা দিয়ে ফরাসীরা হো চি মিনের সঙ্গে এক চুক্তি করল। অবিলম্বে বোঝা গেল ফরাসীরা ঐ চুক্তিকে সম্মান দিতে চায় না। ফরাসীরা ভিয়েতনামে তাদের দখল পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তেইশে নভেম্বর হাইফং বন্দরে বোমা বর্ষণ করল। হো চি মিন নতুন প্রজাতন্ত্রের রক্ষার জন্য, ভিয়েতনামের জনগণকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বললেন।

আমেরিকা এগিয়ে এল

ফরাসীরা দেখল তাদের শত্রুপক্ষ এক সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী—তাদের পেছনে রয়েছে ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনামী জনগণ। সাতচল্লিশ ও চুয়ান্ন সালের মধ্যে ফরাসীরা তাদের

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

জ্যোতি ভট্টাচার্যের লেখা
রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস—
২য় পর্ব
আগুনের ফুলকি
প্রকাশিত হয়েছে
গ্রন্থের বিষয়সূচী—১৯০০-১৯০৩ সালে লেনিনের 'ইসক্রা' পত্রিকার কাহিনী এবং রুশবিপ্লবের প্রস্তুতির তৎকালীন ইতিহাস। লেনিনের বিভিন্ন প্রবন্ধ—"আমাদের আন্দোলনের জরুরী কর্তব্য", "চীনে যুদ্ধ", "কোথায় সুরু করতে হবে?" ইত্যাদির সরল সারানুবাদ ও ব্যাখ্যা।
শতাধিক পৃষ্ঠা ॥ ডিমাই ॥ সাত টাকা

সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি বিষয়ে তিনটি মৌলিক প্রবন্ধের সংকলন
পরিপ্রশ্ন
২৮৮ পৃষ্ঠা ॥ ডিমাই ॥ পনের টাকা
প্রাপ্তিস্থান—নাথ ব্রাদার্স, দে বুক স্টোর্স, বুক মার্ক, সান্যাল কোং, ভি. এম. লাইব্রেরি, নবজাতক প্রকাশন প্রভৃতি পুস্তকালয়
● সুপত্রা ●
৪১বি, কালী দত্ত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও প্রতিরোধ সংগ্রাম

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে চলল এবং এক সময়ে ভিয়েতনামে যুদ্ধরত ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াল দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।

এই সময় আমেরিকা ভিয়েতনামের যুদ্ধে সক্রিয় আগ্রহ নিতে শুরু করে।

উনিশশো উনষাট সালে চীন বিপ্লবের সাফল্য সমগ্র দূর প্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটায়। এই সময় ডালেসের নীতি অনুসরণ করে আমেরিকা ফরাসীদের সামরিক প্রচেষ্টার সমর্থনে এগিয়ে এল।

আমেরিকা প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ফরাসী উপনিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তারা সাহায্য করতে চায় নি। পঞ্চাশ সালে এই দোদুল্যমানতার সমাধান পাওয়া গেল। বাও দাইকে 'প্রেসিডেন্ট' করে ফরাসীরা ভিয়েতনামকে "স্বাধীনতা" দিল। এই বাও দাই জাপানী আমলে পুতুল "সম্রাট" ছিল এবং যাকে জনগণ একেবারেই পছন্দ করে না।

ভিয়েতনামে ফ্রান্স গঠন করল "তাঁবেদার রাষ্ট্র"। নামেই সে স্বাধীন। তখন থেকে ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব হল ভিয়েতনামে তাদের যুদ্ধকে "কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ" রূপে প্রচার করা। তারা নিজেদের বিশ্বের কাছে দেখল "লাল" ঢেউয়ের বিরুদ্ধে বাও দাইয়ের "স্বাধীন ভিয়েতনামে"র রক্ষাকর্তা রূপে। আমেরিকা এটাই চাইছিল।

আমেরিকার কোন আগ্রহ ছিল না ভিয়েতনামে ফরাসীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার। এই অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তাদের ইচ্ছা। ১৯৫৩ সালের চৌঠা আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নরদের সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের কণ্ঠে এই ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সালের চৌঠা এপ্রিলের "ইউ এস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে" লেখা হয় ইন্দোচীন যারা জয় করবে তাদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী অঞ্চল উন্মুক্ত হবে। ইউ এসের ক্রমবর্ধমান চিন্তার পেছনে এটাই কারণ..... টিন রবার চাল, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা মাল নিয়েই আসল লড়াই। ইউ এস জয়গাটকে যে কোন রকমে দখলে রাখার মত মনে করছে।

ভিয়েতনামীদের প্রতিরোধ

ভিয়েতনামীরা তাদের দেশকে ফরাসীদের কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। প্রচুর আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র পেয়েও ফরাসীরা অবিলম্বে বুঝতে পারল যে, পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর ভিয়েতনামের কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে লড়াই করা সহজ নয়, যেকথা আমেরিকানরা বুঝেছিল দশ বছর পরে। মুক্তি বাহিনীর শক্তির উৎস কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ১৯৪৮ সালে পাঁচই এপ্রিল হো চি মিন সৈন্যবাহিনীর কাছে এক আদেশ পাঠান, যাকে তিনি বলেছেন দ্বাদশ সূত্র। এই সূত্রগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রতিরোধ আন্দোলন কি ভাবে দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

দ্বাদশ সূত্র

নিষিদ্ধ ছয়টি কাজ

এক ॥ এমন কিছু করবে না যা জমি ও ফসলের ক্ষতি করতে পারে অথবা জনগণের বাড়ি ও জিনিসপত্র নষ্ট করতে পারে।

দুই ॥ জনগণ যা কিনতে বা ধার করতে ইচ্ছুক নয় তেমন কিছু কেনার বা ধার করার জন্য জেদ করবে না।

তিন ॥ পার্বত্য অধিবাসীদের বাড়িতে কখনও মুরগী আনবে না।

চার ॥ আমাদের কথার খেলাপ করবে না।

পাঁচ ॥ জনগণের বিশ্বাস ও প্রথাকে আঘাত করবে না (যেমন বেদির সামনে শয়ন করবে না, চুল্লীর ওপর পা দেবে না ইত্যাদি)

ছয় ॥ এমন কিছু করবে বা বলবে না যাতে জনগণের মনে হয় আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি।

ছয়টি কর্তব্য

এক ॥ জনগণকে দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করা (ফসল ফলানো জ্বালানি সংগ্রহ, কাঠ বহন করা, সেলাই করা প্রভৃতি)

দুই ॥ যখনই সম্ভব বাজার থেকে যারা দূরে থাকে তাদের জন্য জিনিসপত্র কেনা (ছুরি লবণ সুচ সুতো কাগজ কলম প্রভৃতি)

তিন ॥ অবসর সময়ে প্রতিরোধের পক্ষে প্রয়োজনীয় মজার, সহজ ও ছোটগল্প বলা, কিন্তু কখনও গোপন তথ্য প্রকাশ নয়।

চার ॥ জনগণকে জাতীয় অক্ষর ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি শেখানো।

পাঁচ ॥ প্রত্যেক অঞ্চলের আচার ব্যবহার শেখা তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যাতে সহানুভূতির আবহাওয়া তৈরি করা যায়, তারপর তাদের কুসংস্কার দূর করার জন্য ধীরে ধীরে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা।

হো চি মিন তাঁর সৈন্যবাহিনীর প্রতি এই আদেশ শেষ করেছেন একটি কবিতা দিয়ে ঃ

ওপরে লেখা দ্বাদশ সূত্র
সবার কাজেই স্পষ্ট।
দেশ যার কাছে প্রিয়
তার কাছে এগুলো চিরদিনই
অবিস্মরণীয়।
জনতার আয়ত্ত যখন একটি
অভ্যাস
সকলে মিলে যেন এক মানুষ
নিপুণ যোদ্ধা ও একনিষ্ঠ
জনগণই
দিতে পারে সাফল্যের বিজয়
গৌরব।
শিকড় যেখানে গভীর
গাছ সেখানে দীর্ঘজীবী হয়
এবং বিজয়ের ভিত্তি রচনা করে
জনগণ।

দিয়েন বিয়েন ফু : ফরাসীদের পরাজয়

আমেরিকার জোরদার সমর্থন এবং নিজেদের দক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা সত্ত্বেও ১৯৫৪ সালের বসন্তকালে ফরাসীরা পরাজয়ের সম্মুখীন হল।

দিয়েন বিয়েন ফুতে তাদের চূড়ান্ত সংকট ঘনিয়ে এল। ফরাসীরা এখানে আশা করেছিল মুক্তি বাহিনীকে যুদ্ধে ঘায়েল করবে উল্টে তারা নিজেরাই ফাঁদে পড়ল। সমস্ত পৃথিবী জানল তেরোই মার্চ থেকে অবরোধ শুরু হয়েছে। মুক্তি বাহিনী দ্বারা ঘেরাও ফরাসী সৈনদের বিমানে সরবরাহ পাঠাতে হল। আট সপ্তাহ তিক্ত যুদ্ধের পর সাতই মে ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করল। দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধে পরাজয়ের পর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ফরাসীদের সামরিক প্রভাব খতম হল। ভিয়েতনামে ফরাসীদের পরাজয় ঘটল কারণ তারা গায়ের জোরে ভিয়েতনামীদের ওপর একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপাতে চেয়েছিল।

নতুন "উন্নত" যে নাপাম বোমা মার্কিনীরা ভিয়েতনামে ব্যবহার করেছে তার স্পর্শে এই মেয়েটি চিরকালের মত পঙ্গু।

জেনেভা

১৯৫৪ সালে জেনেভাতে সম্মেলন ডেকে চেষ্টা হয়েছিল ইন্দোচীনে ফরাসীদের ঔপনিবেশিক শাসনাবসানের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যা চিরকালের জন্য সমাধান করার।

এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিল নয়টি দেশ : ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কাম্বোডিয়া লাওস চীন প্রজাতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্স গ্রেট ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্র এবং "ভিয়েতনাম রাজ্য" (বাও দাই শাসন)। একেবারে বিরোধী শক্তি পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য নিয়ে জেনেভায় মিলিত হয়েছিল।

প্রথম মাসে সম্মেলনে বিশেষ কিছু অগ্রগতি দেখা গেল না। মার্কিন প্রতিনিধিরা অবস্থাকে আরও ঘোরালো করে তুললেন। তাঁরা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, এমন কোন সমাধানে তাঁরা রাজী নন যাতে যুক্ত ভিয়েতনামকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং তাঁরা ভাব দেখালেন যেন সম্মেলনের কোন অস্তিত্ব নেই।

আটই জুন এই অচলাবস্থার অবসান ঘটালেন হ্যনয় সরকারের প্রতিনিধি যাঁর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। তাঁরা উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাময়িক পৃথকীকরণে রাজী হলেন এবং ভিয়েতনামের অর্ধেক অংশে তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিলেন, যদিও তখন তিন-চতুর্থাংশে তাঁদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। এই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল কেবল কতকগুলো অতি স্পষ্ট শর্তে এবং তা হল ভিয়েতনামের প্রশাসনিক পৃথকীকরণ সাময়িক এবং একে কোনভাবেই ভিয়েতনামের স্থায়ী বিভাগ বলে ধরা হবে না; দেশের সংযুক্তিকরণের জন্য দু বছরের মধ্যেই নির্বাচন হবে; ইতিমধ্যে কোন অংশ আন্তর্জাতিক মোর্চা করতে পারে না বা বাইরে থেকে সামরিক সাহায্য নিতে পারবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তথাকথিত বাও দাই শাসন ছাড়া সম্মেলনের সব সদস্যই শর্তগুলো মেনে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও মার্কিন প্রতিনিধি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলপ্রয়োগ অথবা বলপ্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা তাঁরা এই শর্ত পরিপূরণে বাধা দেবেন না।

সম্মেলন সমাপ্ত হবার ঠিক দুদিন পরে ডালেস ঘোষণা করলেন সম্মেলনের অন্যতম ভাল দিক হল এতে "দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল "প্রিভেন্ট দি লস অফ ভিয়েতনাম ফ্রম হিডিং টু দি এক্সটেনশান অফ কমিউনিজম থ্রুআউট সাউথ ইস্ট এশিয়া"।

ডালেস একা নন। সম্মেলন সমাপ্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকার ঘোষণা করলেন বাও দাইকে তাঁরা ভিয়েতনামের একমাত্র আস্থা বলে স্বীকার করে যাবেন। অতএব প্যারিস ও হ্যানয়ের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার এখানেই গঙ্গাযাত্রা।

মার্কিনীরা দিয়েমকে আনলেন

জেনেভা সম্মেলন যখন চলছিল তখনই মার্কিন সরকার ব্যবস্থা পাকা করেছিলেন যাতে তাদের মনোনীত লোক দক্ষিণ ভিয়েতনামে ক্ষমতার শীর্ষে বসে। ডালেস ফরাসীদের বলেন তারা যদি ভিয়েতনামে তাদের প্রভাব বজায় রাখতে চায় তবে যেন বাও দাইকে আদেশ করে নো দিন দিয়েমকে প্রধানমন্ত্রী করার। তাই হয়। তারপর এক "গণভোটে"র প্রহসনের পর বাও দাইকে বিতাড়িত করে দিয়েম ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের "রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী" হয়ে বসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে পুরো মদত দেয়।

নো দিন দিয়েমকে নির্বাচন করে এবং তাকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের সর্বময় কর্তারূপে সমর্থন দিয়ে মার্কিনীরা এই দেশটাকে এক স্বৈরাচারীর খেয়ালখুশির ওপর ছেড়ে দিল। দিয়েম একদিনও টিকতে পারত না যদি মার্কিনীরা তাকে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাপয়সা না জোগাত এবং তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হত। দীর্ঘ এবং ভয়ঙ্কর আট বছর পরে যখন মার্কিনীরা দিয়েমের ওপর থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল তখনই সে গুলী খেয়ে মরল এবং জনগণ আনন্দে ফেটে পড়ল।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

হো চি মিনের শেষ ইচ্ছাপত্র

ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
স্বাধীনতা—মুক্তি—সুখ
১০-৫-৬৯

যদিও মার্কিনী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির জন্য আমাদের জনগণের সংগ্রাম আরও দুঃখকষ্ট এবং আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে পারে তথাপি সর্বাত্মক বিজয় আমাদেরই হবেই।

এ অবধারিত।

যখন তা আসবে, আমি আমার বীর দেশবাসীদের, ক্যাডার এবং যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাতে দেশের উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় অংশে পরিভ্রমণ করবো। সাক্ষাৎ করবো বৃদ্ধদের সঙ্গে এবং আমাদের প্রিয় যুবক ও শিশুদের সঙ্গে। এই আমার ইচ্ছা।

তারপর, আমাদের জনগণের পক্ষ থেকে আমি যাবো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলিতে; যাবো সারা দুনিয়ার সমস্ত বন্ধু দেশগুলিতে; মার্কিনী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণের দেশপ্রেমিক সংগ্রামে আন্তরিক সমর্থন ও সাহায্যের জন্য জানাবো তাঁদের ধন্যবাদ।

চীনের তাং যুগের বিখ্যাত কবি তু ফু লিখেছেন—"সত্তরে পা দিয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা চিরকালই মুষ্টিমেয়।"

এবছর উনআশিতে পদার্পণ করায় আমি নিজেকে ইতিমধ্যেই সেই "মুষ্টিমেয়দের" একজন বলে গণ্য করতে পারি। গত কয়েক বছরের তুলনায় আমার স্বাস্থ্যের কিছু অবনতি ঘটলেও আমার মন এখনও সম্পূর্ণ সতেজ। সত্তরের বেশী বসন্ত যে দেখেছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতেই পারে। এতে অবাক হবার কিছু নেই।

কিন্তু আর কতদিন আমি বিপ্লব, পিতৃভূমি এবং জনগণের সেবা করতে পারবো তা কে বলতে পারে?

তাই, যখন আমি চলে যাব এবং কার্ল মার্কস, ভি আই লেনিন ও অন্য বিপ্লবী পূর্বজদের সঙ্গে মিলিত হব, সেই দিনের কথা ভেবে এই কয়েকটি পংক্তি রেখে যাচ্ছি; এতে দেশব্যাপী আমাদের জনগণ, পার্টিতে আমাদের কমরেডরা এবং দুনিয়ায় আমাদের বন্ধুরা হতচকিত হবেন না।

প্রথমে পার্টি সম্পর্কে—আমাদের পার্টি ঘনিষ্টভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং শ্রমিকশ্রেণী, জনগণ ও পিতৃভূমির প্রতি সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত। এই কারণেই প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই আমাদের পার্টি আমাদের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করতে এবং এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামে সাফল্যের পর সাফল্যের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে।

ঐক্য আমাদের পার্টি ও জনগণের একটি সর্বাধিক মূল্যবান ঐতিহ্য। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে নিচের সেল পর্যন্ত সমস্ত পার্টি কমরেডকে পার্টির অভ্যন্তরে এই ঐক্য এবং চিন্তার অভিন্নতাকে চোখের মণির মত অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

পার্টিকে সুসংবদ্ধ করা এবং পার্টির সংহতি ও ঐক্য বিকশিত করার সর্বোত্তম উপায় হোল পার্টির অভ্যন্তরে প্রশস্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং নিয়মিত ভাবে ও গুরুত্ব সহকারে আত্মসমালোচনা ও সমালোচনা অনুশীলন। কমরেডসুলভ প্রীতি পার্টির মধ্যে বিরাজ করা উচিত।

আমাদের পার্টি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। প্রতিটি পার্টি সদস্যকে প্রতিটি ক্যাডারকে অবশ্যই বিপ্লবী নৈতিকতার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হতে হবে এবং কর্মক্ষমতা, মিতব্যয়িতা, অখণ্ড সততা দৃঢ় ন্যায়পরায়ণতা, জনগণের স্বার্থে পূর্ণ আত্মনিয়োগ, এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের পার্টিকে তার পূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে এবং জনগণের নেতা ও অতীব বিশ্বস্ত সেবকের ভূমিকা পালনের যোগ্যতা সপ্রমাণ করতে হবে।

শ্রমজীবী যুব ইউনিয়নের সভ্যবৃন্দ এবং আমাদের সাধারণ যুবকেরা চমৎকার। তারা সর্বদাই এগিয়ে আসতে প্রস্তুত, বাধাবিঘ্ন সম্পর্কে ভয়লেশহীন এবং অগ্রগতির জন্য ব্যগ্র। পার্টি অবশ্যই তাদের বিপ্লবী গুণাবলীকে পরিপুষ্ট করবে এবং সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে তাদেরকে আমাদের "লাল" এবং "বিশেষজ্ঞ" উত্তরাধিকারী হবার প্রশিক্ষণ দেবে।

বিপ্লবী উত্তরপুরুষদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কাজ।

আমাদের শ্রমজীবী জনগণ সমতলভূমি তথা পার্বত্য অঞ্চলে বংশ পরম্পরায় দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, সহ্য করেছেন সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক নিপীড়ন এবং শোষণ। এর উপরেও তাঁদের রয়েছে বহু বছরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা।

তথাপি, আমাদের জনগণ মহান বীরত্ব, সাহস উৎসাহ এবং অধ্যবসায় দেখিয়েছেন। পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই তাঁরা পার্টিকে সর্বদা নিঃশর্ত অনুগতের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন।

বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য পার্টিকে অবশ্যই কার্যকর পরিকল্পনা রচনা করতে হবে যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের জনগণের জীবনের উন্নতি বিধান করা যায়।

মার্কিনী অগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। আমাদের জনগণ আরও জীবন ও সম্পদ বিসর্জনের মুখোমুখি হতে পারেন। যাই ঘটুক না কেন, পরিপূর্ণ বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের সংকল্প আমরা অবশ্যই অবিচল থাকব।

আমাদের পর্বতরাজি চিরকাল থাকবে
চিরকাল প্রবাহিত হবে আমাদের নদনদী
থাকবে চিরকাল আমাদের জনগণ;
হানাদার আমেরিকানরা পরাস্ত হবে
আমরা নতুন করে গড়বো আমাদের দেশ
দশগুণ সুন্দর করে।

সামনে যতই বাধাবিঘ্ন ও দুঃখকষ্ট থাক না কেন; আমাদের জনগণ পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনে স্থিরনিশ্চয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অবশ্যই চলে যেতে হবে। আমাদের পিতৃভূমি নিশ্চয়ই পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হবে। দক্ষিণ এবং উত্তরের আমাদের দেশবাসীরা নিশ্চিতরূপে একই আচ্ছাদনের নিচে পুনর্মিলিত হবেন। আমরা, একটি ছোট্ট জাতি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে, ফরাসী ও আমেরিকা এই দুই বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করার এবং পৃথিবীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ্য অবদান রাখার বিশিষ্ট গৌরবের অধিকারী হব।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে—বিপ্লবের জন্য তার সারা জীবন উৎসর্গ করেছে এমন এক মানুষ হিসাবে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে আমি যেমনই গর্বিত, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে বর্তমান মতভেদে আমি তেমনই বেদনাহত।

আমি আশা করি আমাদের পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে, যুক্তি এবং ভাবাবেগ উভয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উপায়ে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর অবদান রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি এবং দেশসমূহকে আবার ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে—সারা জীবন ধরে আমি আমার সমস্ত শক্তি এবং অন্তর দিয়ে পিতৃভূমি, বিপ্লব ও জনগণের সেবা করেছি। আজ যদি আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়, আমার দুঃখ করার কিছু থাকবে না। শুধু দুঃখ থাকবে, আরও বেশী দিন ধরে আরও বেশী সেবা করতে পারলাম না।

যখন আমরা জীবনাবসান ঘটবে তখন জাঁকজমকপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিহার করা উচিত যাতে জনগণের সময় এবং অর্থের অপচয় না হয়।

পরিশেষে, সমগ্র জনগণ সমগ্র পার্টি, সমগ্র সৈন্যবাহিনীর প্রতি আমার ভ্রাতৃষ্পুত্র ও ভ্রাতৃষ্পুত্রীদের প্রতি, তরুণ ও শিশুদের প্রতি আমি রেখে যাই আমার অফুরন্ত ভালবাসা।

আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই বিশ্বব্যাপী আমাদের কমরেড ও বন্ধুদের; তরুণ ও শিশুদের।

আমাদের সমগ্র পার্টি এবং জনগণ ঘনিষ্টভাবে নিজেদের প্রয়াসকে যুক্ত করে গড়ে তুলবেন এক শান্তিপূর্ণ, পুনর্মিলিত স্বাধীন গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ ভিয়েতনাম এবং বিশ্ব বিপ্লবের ক্ষেত্রে রাখবেন এক মূল্যবান অবদান—এই আমার শেষ ইচ্ছা।

হ্যানয় মে ১০, ১৯৬৯
হো চি মিন

[ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), কলকাতা জেলা কমিটির সৌজন্যে]

হো চি মিনের রচনাবলী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

"লেনিনের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হই তাঁর বিবৃত স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কিত তত্ত্ব; কমিউনিজমের প্রতি তখনও নয়। .....

"পরে ক্রমশঃ জেনেছি যে একমাত্র সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদই নির্যাতীত জাতি ও মেহনতী মানুষকে শৃংখলমুক্ত করতে পারে।"

"খাঁটি দেশপ্রেম আর প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচারিত উগ্র জাতীয়তাবাদ মোটেই এক নয়। প্রকৃত দেশপ্রেম আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত।"

"বিপ্লবের কাজ পুরনো সমাজকে পরিবর্তন করে নতুন সমাজ গড়া খুবই গৌরবজনক, কিন্তু একাজ বড় দুরূহ জটিল, দীর্ঘস্থায়ী এবং কঠোর সংগ্রামের। একজন সবল লোকই পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে দীর্ঘ পথ যেতে পারে।"

"পার্টি ও বিপ্লবের জন্য নিজের সব কিছু উৎসর্গ করা, পার্টির প্রতি আনুগত্য, ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে পার্টি ও জনগণের স্বার্থকে বড় করে দেখা ও সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ক্রমশ আত্মস্থ করে তার সঠিক প্রয়োগ করার জন্য অপ্রাণ চেষ্টা—এইগুলি "বিপ্লবী নৈতিকতার" মূলমন্ত্র। এরই বুনিয়াদের উপর একজন বিপ্লবীকে দাঁড়াতে হবে।"

"আমাদের পার্টি বহু লড়াইয়ে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। তার অর্থ এই নয় যে আমরা সব দোষ ত্রুটির ঊর্ধ্বে। আমাদের ভুল যখনই হয়েছে তাকে কখনই আমরা গোপন করার চেষ্টা করিনি। বরং খোলাখুলিভাবে আমাদের আত্মসমালোচনা করেছি। আমাদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। সাফল্য আমাদের মাথা গরম করে দেয়নি অথবা আমরা আত্মসন্তুষ্টি হয়ে বসে থাকিনি। অন্যান্য দেশের আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি—"

"আত্মকেন্দ্রিকতা সমাজতন্ত্র গড়ার পথে একটা বড় বাধা। সেজন্য সমাজতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।"

"ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে এই নয় যে ব্যক্তিগত স্বার্থ একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হবে। প্রত্যেকেরই একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আছে তার কোন বিশেষ কাজ করার নিপুণতা; অছাড়া রয়েছে একান্ত ব্যক্তিগত জীবন ও নিজের পরিবার। যতক্ষণ ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে সমষ্টির স্বার্থের সংঘাত না হয় ততক্ষণ মঙ্গল। এই সঙ্গে একটি কথা সকলেরই বোঝা উচিত এবং তা হল এই যে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক শাসনেই ব্যক্তিজীবন, নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয় বিশেষ গুণাবলী সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।"

"বৈপ্লবিক নৈতিকতা" আকাশ থেকে পড়ে না। প্রতিদিনের সংগ্রামের মাধ্যমে নিয়ত অনুশীলনের সঙ্গে এই নৈতিকতা গড়ে ওঠে। সোনা তখনই খাঁটি যখন তাকে গলানোর পাত্রে ঢালা হয়।

"কোন কোন কমরেড মনে করেন যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে গুটি কয়েক বই মুখস্ত করলেই সব কিছু জানা হয়ে গেল। এঁদের আবার ধারণা যে তাঁরা অন্যের চেয়ে অনেক বেশী জানেন ও বোঝেন। কিন্তু এরা যখন একটি বাস্তব সমস্যার সামনাসামনি হন তখন একেবারে যান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেন না হয় চরম বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়েন"—

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস : ১৯৫৯

দিলীপ মজুমদার

অভিযুক্তরাই অভিযোগ করতে শুরু করল। অভিযোগ শুধু নয়, সামান্যতম সৌজন্যবোধও সেদিন বিলুপ্ত হয়েছিল তাঁদের। মৃত মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতেও তাঁরা অন্ততঃ বাহিরের দিক থেকেও উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। অতঃপর বিরোধীদের পক্ষে ক্ষোভ সংবরণ করা সম্ভব হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই তা হয় নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সহ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কিন্তু বিধানসভায় বিপর্যয়ের সমূহ দায় কমিউনিস্ট সদস্যদের উপর চাপিয়ে দিলেন।

তেইশে সেপ্টেম্বর বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি চাওয়া হয়। একটি অনাস্থা উত্থাপন করেন শ্রীজ্যোতি বসু সহ বিরোধী সদস্যরা, অন্যটি উত্থাপন করেন পি এস পি সদস্য শ্রীশিশির দাস। নির্ধারিত দিন অনুযায়ী—আঠাশে সেপ্টেম্বর মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে বিরোধী নেতা জ্যোতি বসু সংযত ধীরভাবে কিন্তু স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে বলেন যে, "গত দু মাস ধরে রাজ্যব্যাপী খাদ্য আন্দোলনে, দু-দুটি সাধারণ ধর্মঘটে, সহস্র সহস্র মানুষের বিক্ষোভ ও আইন অমান্যে, হাজারে হাজারে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে সমগ্র পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ নিঃসন্দিগ্ধভাবে এই মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাঁদের অনাস্থা ঘোষণা করেছেন। বিধানসভার মধ্যে আমরা তাঁদেরই প্রতিনিধি, সেই জনগণেরই কণ্ঠস্বরকে প্রতিধ্বনিত করে আমরা এই কলঙ্কিত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একবাক্যে অনাস্থা ঘোষণা করছি।" কিন্তু কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ নয়, আত্মসমালোচনা নয়, নয় যুক্তির ক্রমঅনুসরণ—কংগ্রেসী সদস্যরা একজোটে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করলেন ৬৪—১৫৭ ভোটে। বলাবাহুল্য পি এস পি বিরত ছিল ভোটদানে। এবং শ্রীশিশির দাস উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাবও ৮৩—১৫৬ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

পঁচিশে ডিসেম্বর বিধানসভায় সাম্প্রতিক হত্যালীলা সম্পর্কে তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হন বিরোধীরা এবং সেদিন বিধানসভায় দাবি করেছিলেন (এক) জনসাধারণের আস্থাভাজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সরকারী আচরণের প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। তদন্তের অন্যতম সুনির্দিষ্ট বিষয় হবে ঘটনাবলীতে মন্ত্রিসভার আচরণ, মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিসমন্ত্রীর আচরণ, সংশ্লিষ্ট অফিসার—পুলিস ও মিলিটারীর আচরণ। (দুই) অভিযোগ নির্বিশেষে খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। (তিন) লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও গুলিতে হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু এই দাবিও অগ্রাহ্য হয়। ১৩৩—৭১ ভোটে পাশ হয়ে যায় কংগ্রেসী প্রস্তাব। এবং তাহলে এই হল কংগ্রেসীদের আকাংখিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ফল।

বিধানসভায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের দ্বিতীয় দিন—চব্বিশে সেপ্টেম্বর—বিরোধী নেতারা খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করে খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্যাপী বক্তৃতার শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের সাফ কথা বলে দিলেন—"যতদিন প্রয়োজনবোধ করিব ততদিন শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে আমি রাখিব। তাঁহাকে দশ বৎসর পূর্বে আমি বাছাই করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ছয় জন খাদ্যমন্ত্রী বিদায় হইয়াছেন। কিন্তু এই ব্যক্তি গোলযোগ ও অসুবিধার মধ্যে একটানা দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার বহন করিয়াছেন।" এবং এই ব্যক্তি উনত্রিশে সেপ্টেম্বর বিধান পরিষদে অপরিসীম দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেন: "১৯৫১ সালে কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলনের সময় জনতার উপর গুলি বর্ষণ করিবার পর কংগ্রেস প্রার্থীরা অধিকতর ভোট পাইয়া পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছে।—এই কথা ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন, জনতার আস্থায় গদীতে সমাসীন। তাই আমরা পদত্যাগ করিব না।" সরকারের এই অবিচল অমানুষিক গোঁয়ার্তুমির মুখে দাঁড়িয়ে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি স্থবিরগ্রস্ত হলেন।

একথা ঠিক যে এই খাদ্য আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশে সৃষ্টি করেছিল ব্যাপক গণজাগরণের জোয়ার, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে। এরই প্রভাবে অনুরূপ আন্দোলন বিকশিত হয়ে উঠেছিল, মানসিকভাবে সরকার নতিও স্বীকার করেছিল, কিন্তু এখন সেপ্টেম্বরের শেষদিকে উপস্থিত হয়ে সরকারের "অবিচল দৃঢ়তার" সম্মুখীন হয়ে চিন্তা করতে হল এই রূপে এই আন্দোলনকে কতদূর এবং কতদিন অব্যাহত রাখা যাবে।

তাছাড়া ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা বিধ্বস্ত হয়েছে বন্যায়। প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়েছে হাজার হাজার মানুষের। আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে গেলে বন্যার্ত মানুষের প্রতি অবহেলা করা হবে। তাদের আশু প্রয়োজন যে সামান্য সাহায্যটুকু তার দাবি মেটানোই ছিল তখন জরুরী কাজ।

এই সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েই সম্ভবতঃ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি বহমান-রূপে আন্দোলন অব্যাহত না রাখা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অবশ্য পূজাবকাশে প্রচার আন্দোলন অব্যাহত ছিল। জনসাধারণকে পবিত্র পূজা উৎসব কলঙ্কিত না করার অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা এক বিবৃতিতে জানালেন, কংগ্রেসী অপশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত এই ঘৃণ্য হত্যার নায়করা যেন উক্ত অনুষ্ঠানে স্থান না পান।—"পূজার উৎসব উপলক্ষে জনসাধারণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বা কংগ্রেস নেতাদের যেন অংশগ্রহণ করিতে না দেওয়া হয়। পুলিসের উদ্যোগে যে সকল তথাকথিত কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হইবে তাহাতেও কোনরূপ অংশগ্রহণ করা উচিত হইবে না।" এছাড়া পূজা উৎসবে শহীদবেদী নির্মাণ, চিত্র প্রদর্শনী, দমনমূলক নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করতে তাঁরা অনুরোধ করলেন জনগণকে। রাষ্ট্রপতির নিকট মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে একটি মুদ্রিত খোলা চিঠিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর শনিবার বিকাল চারটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ভাবগম্ভীর পরিবেশে খাদ্য আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে এক শহীদ স্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। বলা বাহুল্য, এখন উক্ত স্থানে ঐ স্তম্ভটি স্থায়ী স্তম্ভরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

(সমাপ্ত)

হো চি মিনের উক্তি

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এমনভাবে চর্চা করতে হবে যাতে নিজের দেশের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী এই তত্ত্বের সার্বজনীন সত্যকে সৃজনশীল কাজে প্রয়োগ করতে পারা যায়। তত্ত্বের সঙ্গে তার নিয়ত অনুশীলন ও প্রয়োগ একান্তভাবে দরকার।"

"যাদের মন দ্বিধাগ্রস্ত ও হতাশাভরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই : এখন হাতি বনাম ফড়িংয়ের লড়াই চলছে। আগামী দিনে এই হাতিটি একেবারেই অবসন্ন হয়ে পড়বে। সাম্প্রতিক ঘটনা প্রমাণ করেছে যে এই পরদেশ আক্রমণকারী হাতিটির দম ফুরিয়ে এসেছে আর আমাদের সেনাবাহিনী ক্রমশই একটি বলবান বাঘে পরিণত হয়ে পড়েছে"—

"প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে একটি প্রশ্ন করতে চাই : ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকা হাজার হাজার মাইল দূরে। ভিয়েতনাম ও আমেরিকার লোকেদের মধ্যে কোন ঝগড়া নেই। তাহলে কোন যুক্তিতে আপনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর একটা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন; আর আমেরিকার জনসাধারণের কোটি কোটি ডলার অপচয় করে ভিয়েতনামবাসীর কাছে বহু নিন্দিত অপদার্থ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত একটি স্বৈরাচারী শাসনকে সমর্থন করছেন? কোন অধিকারে আপনি হাজার হাজার তরুণ আমেরিকান যুবককে গৃহছাড়া করে এনে ভিয়েতনামের অসংখ্য নিরীহ লোককে খুন করতে বাধ্য করছেন এবং একটা অত্যন্ত অন্যায় এবং জঘন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করছেন।"

"এইমাত্র সংবাদ পেলাম যে জাতীয় পরিষদ আমাকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চাইতে বড় সম্মান—সোনালী রক্ত তারকায় ভূষিত করতে চান। এই সংবাদে আমি আনন্দিত এবং গভীরভাবে অভিভূত। ..... কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ এর জন্য আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান স্থগিত রাখুন। .....আমরা সবাই একটি দিনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছি যেদিন দক্ষিণাঞ্চল পুরোপুরি মুক্ত হবে, গোটা দেশে শান্তি ফিরে আসবে, উত্তর ও দক্ষিণ আবার এক যৌথ পরিবার মিলিত হবে। সেদিন দক্ষিণের ভাইদের কাছ থেকে এই সম্মান মাথা পেতে নেব। তাহলে দেশের সব মানুষ খুশি হবে, আমরাও উৎফুল্ল হব।"

"সারাজীবন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। সেজন্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতিতে যতটা গর্ব বোধ করি তার চেয়ে অনেক বেশি বেদনা বোধ করি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যেকার সাম্প্রতিক মনোমালিন্য দেখে।"

"আমি আশাকরি আমাদের পার্টি এই পার্টিগুলির মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যাবে। তাদের এই প্রচেষ্টা হবে স্বভাবতই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার আদর্শের ভিত্তিতে যার সঙ্গে যুক্তি ও দরদ মিশে রয়েছে।"

"আমি সারাজীবন মাতৃভূমি, বিপ্লব ও জনসাধারণকে সেবা করে এসেছি আমার সর্বশক্তি দিয়ে মনে প্রাণে। আজকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমার কোন খেদ নেই; একমাত্র আপশোষ যে আমি আর সেবা করতে পারব না।"

ডাকাতের ভূমিকায় পুলিশ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পুলিশ – এবার ডাকাতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ঘটনাটি ঘটেছে গত পয়লা মে ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ। ঘটনাস্থল বৈচাবাটি তারকেশ্বর রোড এবং দিল্লী রোডের সংযোগস্থল।

ঐদিন কলিকাতাগামী একটি লরীকে ভদ্রেশ্বর থানার টহলদারী পুলিশ ভ্যান আটক করে এবং লরীর চালকের কাছ থেকে নগদ আশি টাকা এবং ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। উক্ত লরীর চালক অপরাপর ট্রাক থামিয়ে ঘটনাটি জানায়। এই ঘটনা শোনার পর সব ট্রাক ড্রাইভাররা একসঙ্গে পুলিশ ভ্যানটির পিছনে ধাওয়া করে এবং ভ্যানটি আটক করে এবং এর কোন বিচার না হওয়া অবধি তারা পথ অবরোধ করবে বলে স্থির করে। সকাল নয়টা নাগাদ ঘটনা জানতে পেরে, মন্ত্রী গোপালদাস নাগ শ্রীরামপুর থানার এক বিরাট পুলিশ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং লরীচালকদের বলেন "পথ অবরোধ তুলে নিন, এইভাবে আপনারা আইন নিজেরা হাতে নেবেন না।" উত্তরে ট্রাক ড্রাইভাররা জানান "এই ঘটনার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমরা পথ অবরোধ তুলবো না।" মন্ত্রী ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। পরে স্থানীয় জনসাধারণ এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের মধ্যস্থতায় বেলা তিনটে নাগাদ পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে যে সংবাদ প্রতিদিন নিহত হয় দৈনিক পত্রে, দর্পণ আপনাকে সে সংবাদ পরিবেশন করে নির্ভীক মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষাণ্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

যোগাযোগের ঠিকানা :
সার্কুলেশন ম্যানেজার
৬১নং মট লেন
কলিকাতা-৯

ভিয়েতনামের সংগ্রাম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে।

এই সংকটের প্রথম প্রকাশ গত দশকের শেষ দিকে। মার্কিন সেনাবাহিনীতে জোর করে ধরে আনা আমেরিকান ছোকরারা ভিয়েতনামের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রমাণ পেয়েছে যে, সাধারণ চাষী এবং মেহনতী মানুষ সকলেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সক্রিয় গেরিলা। হাজারে হাজারে মার্কিন ছেলেরা প্রাণ দিয়েছে। প্রথমে পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার অহংকার ওদের পেয়ে বসেছিল। ওদের অনেককেই বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ছেলে মেয়ে, বুড়ো শিশু সবাইকে হত্যা করে নিজেদের ক্ষয় ক্ষতির বদলা নিতে চেয়েছে। পরে ওরা বুঝেছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সংজ্ঞা কি; কি চেতনা এবং জারীয় ঐক্য এবং সংগ্রামী দৃঢ়তার বিরুদ্ধে ওদের লড়াই। সেই মুহূর্তে মার্কিন সেনাবাহিনীতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার ঘটনা আছে যেখানে সাধারণ মার্কিন সৈন্য সেনাপতির আদেশ অমান্য করে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে আসতে চায় নি। কারণ ওরা জানত সেনাবাহিনীর ঘেরা জায়গার বাইরে যাওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। মার্কিনীদের লেখা অনেক বই আমি পড়েছি যাতে প্রকাশ সাধারণ মার্কিনী সেনারা তাদের ইউনিট কম্যাণ্ডারকে হত্যা করেছে। এই সমস্ত তথ্য যখন একদিকে প্রকাশ পাচ্ছে তখন মার্কিন সমাজে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়েছে। তারা বুঝেছে প্রতি বাড়ি থেকে যুবকদের আবিশ্বাসে যুদ্ধে যোগদানের অর্থ দেশের সমস্ত যুব সম্প্রদায়কে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেওয়া। মার্কিন মূল্যকে ভিয়েতনামীদের সংগ্রামী দৃঢ়তা ও কৌশল সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

এই অবস্থাতেই সারা মার্কিন মুলুকে মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যাপক বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে কিন্তু মুখ খোলেননি মার্কিনী বুদ্ধিজীবীরা। হাজার হাজার মাইল দূরে একটা ছোট্ট দেশের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গিয়ে কেন হাজার হাজার তরুণ প্রাণ বলি দেবে এই প্রশ্ন উঠেছিল মার্কিন সমাজে। পরে ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধের আদর্শের কথাও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মোট প্রায় বিশ লক্ষ মার্কিন তরুণ অন্ততঃ একবছর করে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বেতনভুক সৈন্য হিসেবে কাজ করে এসেছে। নিহত হয়েছে অন্ততঃ বাট হাজার আর বিকলাঙ্গ হয়েছে কমপক্ষে দুলক্ষ। অবশ্য এর অনেকগুণ বেশী ক্ষতি হয়েছে ভিয়েতনামীদের। কিন্তু যে সমাজে তরুণদের বিশেষ কোন রাজনৈতিক আদর্শ নেই, যে সমাজ বিলাস ও পণ্যভোগের জন্য তৈরী সেই সমাজের পক্ষে আদর্শবাদী তীব্র লড়াইয়ের সম্মুখীন হওয়া শক্ত।

মার্কিনীরা চেষ্টা করেছে নিজেদের দেশের তরুণদের পরিবর্তে অন্য তাঁবেদার দেশসমূহ থেকে সৈন্য নিয়োগ করার। সে চক্রান্ত কার্য্যকরী হয়নি। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ওরা তাঁবেদার সরকার নিয়োগ করে বেতনভুক ভিয়েতনাম সেনাবাহিনী গড়তে চেয়েছে। এতে মার্কিনীদের বিপর্যয় আরও বেড়েছে। মুক্তি ফৌজের হাতে মার্কিনীদের অস্ত্র সম্ভার আরও বেশী পরিমাণে চলে গিয়েছে।

এই অবস্থাতেই ওরা বাধ্য হয়ে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। চুক্তি অনুযায়ী মার্কিনীরা স্বীকার করে নেয় ভিয়েতনামের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব, সমস্ত মার্কিনী সৈন্য অপসারণ, দেশের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং দেশবাসীর ভোটে নির্বাচিত সরকার গঠনের অধিকার।

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল আগের বছর অক্টোবর মাসে। কিন্তু মার্কিনীরা চার মাস সময় নানা অজুহাতে কাটিয়ে দেয়। আসলে ওদের উদ্দেশ্য ছিল থিউ সরকারের হাতে আরও বেশী পরিমাণ অস্ত্র সম্ভার তুলে দিয়ে ব্যাপক আক্রমণের ব্যবস্থা করার।

ভিয়াত্তরের চুক্তি সই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে, চুক্তির প্রতিটি শর্ত ভঙ্গ করে তাঁবেদার থিউ সরকার মার্কিনীদের নেতৃত্বে ও নির্দেশে সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের দখলীকৃত অঞ্চলসমূহে ব্যাপক আক্রমণ চালাল। সারা পৃথিবী দেখেছে কিভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক চুক্তির অবমাননা করে। ক্ষমতার দম্ভ ওদের পেয়ে বসেছে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা চুক্তি করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিল সাম্রাজ্যবাদী কৌশল কি হতে পারে তারা তৈরী ছিল। প্রতিটি আক্রমণ মুক্তি ফৌজের প্রতিআক্রমণে বিধ্বস্ত হতে লাগল। বেতনভুক ভিয়েতনামী সেনাবাহিনী যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সমস্ত সামরিক সম্ভার হয় মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়েছে নয়ত দলে দলে গিয়ে মুক্তি ফৌজে যোগ দিয়েছে।

বিগত দু বছর ধরে প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধাস্ত্র দিয়েছে মার্কিনীরা। তার প্রায় অধিকাংশই মুক্তি ফৌজের হাতে চলে গেছে। আমাদের অঙ্কের টাকায় দাঁড়াবে প্রায় চব্বিশ শো কোটি টাকার অস্ত্র।

এ বছরে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত মার্কিন প্রশাসনের অন্যতম খুঁটি ডঃ কিসিঞ্জার মার্কিন কংগ্রেসের কাছে আরও এক হাজার মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ভিয়েতনামে পাঠানোর প্রস্তাব রাখেন। কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্যরা বলেন এই অস্ত্র দেওয়ার অর্থ মুক্তি ফৌজকে আরও শক্তিশালী করা। কারণ সারা ভিয়েতনামে থিউ সরকারের কোন দাঁড়াবার জায়গা নেই। সৈন্যবাহিনী সমস্ত অস্ত্র মুক্তি ফৌজের হাতে তুলে দেবে। যে ভাষায় এই স্বীকারোক্তি কংগ্রেস সদস্যরা করেছেন তাতে প্রমাণ মেলে যে মুক্তি ফৌজের দৃঢ়তা পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদকে ভীত সচকিত করতে পারে।

মার্চ মাস থেকে সুরু করে এপ্রিল মাসের ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত মাত্র একায় দিনে ভিয়েতনামের মুক্তি ফৌজ সারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরাসরি আক্রমণ করে জিতে গেল। এই আক্রমণের মুখে মার্কিনী উপদেষ্টা বাহিনী বেতনভুক থিউ সরকারের তাঁবেদার বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাতে পারল না। সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। সারা দেশ তৈরী ছিল প্রশাসন শত্রুদের হাত থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য। এত দ্রুত সামরিক অগ্রগতি পৃথিবীর সমর ইতিহাসে নজীরবিহীন।

একটা কথা কিন্তু বলে রাখা দরকার যে, চীনের মত ভিয়েতনামের নেতারাও কিন্তু সর্বদাই বলে এসেছেন যে তাঁরা মীমাংসা, চুক্তি, নির্বাচন ইত্যাদি প্রচলিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই দেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কাঠামো গঠন করতে চান। সবসময়েই অতি বিনীত প্রস্তাবের কথা বলে এসেছেন সশস্ত্র সংগ্রাম এড়াবার জন্য। কারণ তাঁরা জানতেন সশস্ত্র সংগ্রাম ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। তবে নিজেদের আদর্শ ও সংগঠন সম্পর্কে তাঁদের সংশয় ছিল না। তাই নানা সংশয় তাঁরা কাটিয়ে উঠেছেন নিজেদের জাতীয় অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে।

মনে রাখা দরকার যে, চীনের মুক্তি সংগ্রামের আদর্শ ও কৌশল অনেকাংশে ভিয়েতনামকে প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে চীনের জাতীয় মুক্তি বাহিনী ও কমিউনিষ্ট পার্টি চিয়াং কাইশেকের কাছে বারবার প্রস্তাব পাঠিয়েছে জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠনের।

মার্কিনীদের অনেকে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৪৫ সালে চীনা কমিউনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চল ইয়েনানে মার্কিন রাষ্ট্রের তরফ থেকে ডিপ্লি মিশন পাঠানো হয় মীমাংসা সূত্র নিয়ে মাও সে তুং-এর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন হারলি মাও-এর মীমাংসা চুক্তি যুক্তিগ্রাহ্য মনে করে তাতে স্বাক্ষর করেন। এবং হারলির সঙ্গে মাও সে তুং ও চৌ এন লাই ইয়েনান থেকে চুং কিং-এ আসেন চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে আলোচনার জন্য। কিন্তু মার্কিনীরা নিজেদের কথার খেলাপ করে এবং দাবী করে যে, সমস্ত চুক্তির আগে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সশস্ত্র বাহিনীকে চিয়াং নিরস্ত্র করবে। এ এক অসম্ভব দাবী। মাও সে তুং হারলিকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেন: আপনার হয়ত চিয়াং-এর আগেকার ইতিহাস জানা নেই। আমরা নিরস্ত্র হওয়ার অর্থ হল চিয়াংকে আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে সাহায্য করা। এটা কি আপনার কাছে সঙ্গত মনে হচ্ছে।

মার্কিনী প্রশাসনের অনেকেই যাঁরা ডিপ্লি মিশনের সদস্য ছিলেন মাও-এর যুক্তি সমর্থন করেন।

কিছু পরেই এই সমস্ত সমর্থকদের কয়েকজনকে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসে চলে যেতে হয়। আর কেউ কেউ নিজেদের চাকরী বাকরী হারিয়ে বাড়িতে নজরবন্দী থাকেন।

মাও-এর কোয়ালিশন সরকার গঠনের দাবী মেনে নিয়েও, তা কার্যকরী না করার ফলে শেষ পর্যন্ত চার বছর ব্যাপী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সুরু হয়। কি পরিণতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হয়েছে তা সকলেরই জানা।

কিছু পরেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়াতে আক্রমণ সুরু করে। সেখানেও প্রচণ্ড পরাজয়ের মুখে মার্কিন সৈন্যবাহিনী সরে পড়ে।

মার্কিনী প্রশাসন বোঝেটে। এদের কাছে মীমাংসা, চুক্তি কোন আন্তর্জাতিক আচার ও পদ্ধতির কোন মূল্য নিই। ভিয়েতনাম লড়াই করে এদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, বোম্বেটেগিরি সব সময় কার্যকরী নয়।

সাম্রাজ্যবাদ মরীয়া। ইতিহাস ওদের বিরুদ্ধে, তাই ওরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চায় না।

ভিয়েতনামের পর ওরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে নতুন তাঁবেদার অঞ্চল তৈরী করতে চাইবে ষড়যন্ত্র, খুনজখম রাষ্ট্রকাঠামোর প্রভাব বিস্তার বা রদবদল ইত্যাদির মাধ্যমে। এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে পূর্ব ভারত। আমাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন এসেছে।

তরুণবাবু ক্ষুব্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নীতি সফল না হলে গোটা মন্ত্রিসভার দোষ। একটা বড় সংসারে একজনের দায়িত্ব থাকতে পারে না, সকলেরই দায়িত্ব আছে।

দর্পণের সংবাদদাতা আরো জানতে পেরেছেন যে, তরুণবাবু তাঁরা দুই প্রভাবশালী সহযোগী শ্রীকান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জী এম এল এ ও শ্রীগফফর এম এল একে ডেকে তাঁর ভবিষ্যত কর্মপন্থা জানিয়েছেন। প্রয়োজন হলে চব্বিশপরগণার এম এল এ-দের প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বলা হয়েছে।

আরো জানা গেছে জগজ্জীবনবাবু তরুণবাবুর কথা মন দিয়ে শুনেছেন এবং গুজরাটের নির্বাচনের আগে কোন অঘটন না ঘটানোর জন্য তরুণবাবুকে বলেছেন।

অপরদিকে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় জগজ্জীবনবাবুকে শ্রীবিজয় সিং নাহার সম্বন্ধে বলেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি এও জানিয়েছেন যে শতবাবু আর তরুণবাবুর জন্য লক্ষ্মী-সুব্রত গ্রুপ এক হয়ে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পারছে না। কারণ লক্ষ্মীকে সর্বদাই বলা হচ্ছে "মানুদার টোপ গিলিস্ না, তাহলেই মরবি।"

শ্রীরায় জগজ্জীবনবাবুকে এও জানিয়েছেন যে তিনি (জগজ্জীবনবাবু) যেন এ ব্যাপারে শতবাবু ও তরুণবাবুকে কিছু উপদেশ দেন। শোনা যাচ্ছে এ ব্যাপারে সিদ্ধার্থবাবু জগজ্জীবনবাবুর মন ভেজাতে পারেন নি।

দুটি গানের জন্ম

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

সবচেয়ে বড় প্রেমিক, সবচেয়ে বেশী সুন্দরের পূজারী, সবচেয়ে বেশী সমব্যথী। দরদী। এই চিন্তা মাথায় রেখেই আমি গানটাকে ইংরেজী এবং বাংলায় চেন করে লিখলাম, "নো নো নো ফর নেভার উই শেড টিয়ার্স ফ্রম আওয়ার আইজ / নো নো নো ফর নেভার আওয়ার হার্টস ক্যান বি ব্রোকেন / হিয়ার ইন দয় বেট্‌ল্ ফিল্ড উই বিড ইউ গুডবাই কমরেড্/ এ্যাণ্ড উই শট্ দ্যা গানস এ্যাট দ্যা এনিমিস্ ক্যাম্প এ্যাট দ্যা সেম্ টাইম / ইয়েট উই ফীল আওয়ার গ্রেট টিচার ইজ নো মোর উইথ্ আস/ উই বিড ইউ গুড বাই।" এ পর্যন্ত লিখেই মনে হলো সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের অনমনীয় শপথকে ভাষা দিতে হবে গানে। লিখলাম, "(এ্যাণ্ড) উই প্লেজ বাই দা নেম্ অব্ ইওর্স টু কীপ দ্যা রেড ফ্ল্যাগ হাই / প্লেজ বাই দ্যা নেম অব ইওর্স টু কীপ এলার্ট দ্যা আইজ্ / টু কীল্ দ্যা ফোজ্ এ্যাণ্ড মেক মোর ক্লোজ দ্যা হ্যাণ্ডস্ অব্ ফ্রেণ্ডস টু টাই / লং লিভ্ হো চি মিন ইওর নেম্ নেভার টু ডাই।"

হো চি মিনের নামে রক্তপতাকা তারা উড্ডীন রেখেছেন। সেই পতাকা আজ বিজয় গৌরবে উড্ডীয়মান সায়গনের প্রশাসনিক ভবনশীর্ষে।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনীদের নৃশংসতা

অমর ভিয়েতনাম

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

দিয়েমের রাজত্বে জনগণের ওপর অত্যাচার মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। জনগণের দুর্দশার সীমা ছিল না। চরম বেকারী। একদিকে কালোবাজারী আর মজুতদারী অন্যদিকে অনাহার। হাজার হাজার নিরাপরাধ লোককে জেলে পুরেছে ফাঁসী দিয়েছে। হাজার হাজার লোকের ওপর চলেছে অমানুষিক নির্যাতন। দিয়েমের পরবর্তী সরকারও জনগণের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। কারণ তারাও মার্কিনী অর্থ ও অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে সারা দেশে স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়েছিল।

জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট

মার্কিন-দিয়েম সরকারের অত্যাচার ও সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য ১৯৬০ সালে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠিত হয়। দু বছরের মধ্যে এই ফ্রন্ট আশী শতাংশ গ্রামাঞ্চলকে নিজেদের প্রভাবে নিয়ে আসে। এইসব এলাকায় ফ্রন্ট কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি, স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট সায়গনের একজন আইনজীবী নগুয়েন হু থো যাঁকে ফরাসী ও মার্কিন-দিয়েম শাসন বারবার কারারুদ্ধ করেছে তাঁর বিদেশীনিয়ন্ত্রিত সরকারের বিরোধিতার জন্য। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে বৌদ্ধ ক্যাথলিক ব্যবসায়ী কমিউনিস্ট সোস্যালিস্ট উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী এবং কৃষক সংগঠন ও সংখ্যালঘু পার্বত্য গোষ্ঠী সকলেই আছেন।

ফ্রন্ট সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি বিস্ময়কর দশ দফার এক কার্যসূচী প্রচার করে। জনগণের সমর্থন তারা পেয়েছিল। কার্যসূচীতে কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে অবিলম্বে সংযুক্তির কথা বলা হয়নি।

এদিকে গেরিলা যুদ্ধ চলতে লাগল। প্রথমে গেরিলারা দেশে তৈরী প্রায় আদিম জাতের অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে লাগল। কিন্তু শীঘ্রই তারা মার্কিনী অস্ত্র দখল করতে শুরু করল।

মার্কিনী অংশগ্রহণ

যদিও ভিয়েতনামে মার্কিনী সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হতে থাকল, কিন্তু বলা হল তারা "উপদেষ্টা"। একথা অবশ্য কেউই বিশ্বাস করেনি। ১৯৬২ সালে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াল দশ হাজার। সরকারীভাবে বলা হল তারা যুদ্ধে লিপ্ত নয়। কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা ডেভিড হলবারস্ট্যাম লিখলেন "আমেরিকান ও ভিয়েতনামীরা একসঙ্গে মার্চ করছে, যুদ্ধ করছে ও মরছে। এর চেয়ে বেশি জড়িত থাকা শক্ত।"

দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছিল এবং সেই সঙ্গে সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতকের সংখ্যাও। দিয়েমের পরবর্তী রাজত্ব সম্পর্কেও জনগণ মোহমুক্ত। অতএব ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যদিনা আমেরিকা অধিকতর পরিমাণে অংশগ্রহণ করে তাহলে যুদ্ধ জেতা যাবে না। এবং তার পর থেকেই মার্কিনী সৈন্য ও অস্ত্রের সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে বাড়তে লাগল।

মারণাস্ত্রের পরীক্ষাগার

সামরিক শক্তিতে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন দেখল যে তারা মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না তখন তারা জয়লাভের জন্য অন্য উপায় খুঁজতে লাগল। তারা "ভিয়েত কংদের" (পশ্চিমীদের ভাষায়) বিরুদ্ধে জঙ্গলে পর্বতে মরুভূমির তুল্য জায়গায় লড়াই করার অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিল—ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল যাকে বলেছে "দি রেডি-মেড লেবরেটরি অফ সাউথ ভিয়েতনাম।" এইভাবে আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামে নানারকম গ্যাস ও বোমা ব্যবহার করতে থাকে, যাতে জঙ্গল পত্রশূন্য হয়, ধানক্ষেত নষ্ট হয়, গ্রাম জ্বলে যায়, অসামরিক জনসংখ্যা নিঃশেষ হয়। এসব অস্ত্রশস্ত্র ক্রমেই বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে লাগল। এর ভুক্তভোগী কে? নিশ্চয়ই জনগণ।

১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে লাগল। সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতকের সংখ্যা বহুলাংশে বেড়েছে। মুক্তি বাহিনী সর্বাধুনিক মার্কিনী অস্ত্রের সামনেও অপ্রতিহত। আমেরিকা ভাবল এই অবস্থায় যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে পারলেই বুঝি জয়লাভ সম্ভব হতে পারে। ১৯৬৫ সালের দোসরা মার্চ থেকে মার্কিনীরা উত্তর ভিতেয়নামে চব্বিশ ঘন্টা বোমাবর্ষণ শুরু করল। এখান থেকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের নতুন অধ্যায়। সারা বছর ধরে তারা প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করেছে। পঁচানব্বুই শতাংশ উত্তর ভিয়েতনামী গ্রামে থাকে। বোমাবর্ষণে বহু গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে দক্ষিণে মার্কিনী-বিরোধিতা বাড়তে শুরু করে। যুদ্ধবিরতির জন্য ছাত্র ও অন্যান্যদের বিক্ষোভ দমনের কাজে বহুবার সৈন্যবাহিনীকে ডাকতে হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিভিন্ন শহরে যুদ্ধ ও মার্কিনীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বেরোয়।

এদিকে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টও দুর্বার বেগে এগিয়ে শহর দখল করতে থাকে। মার্কিনী ও সায়গন সরকার বিপর্যস্ত। ফলে "প্যারিস বৈঠক"। সেখানে মার্কিনীদের টালবাহানা। অবশেষে ১৯৭৫ সালের তিরিশে এপ্রিল। সায়গনের পতন।

ভ্রম সংশোধন

দর্পণে নয়ই মে সংখ্যায় "সমতটের" বিজ্ঞাপনে কার্যালয়ের ঠিকানা ভুল ছাপা হয়েছে। সংশোধিত ঠিকানা, ৫/১/ বি দেশপ্রিয় পার্ক, ইস্ট কলিকাতা ২৯

প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন

ফার্মাসিউটিক্যাল কর্মচারীদের বিক্ষোভ

দাবী পূরণের ব্যাপারে সরকারের ওপর চাপ দেওয়ার জন্য মেডিক্যাল ও ফার্মাসিটিক্যাল শিল্পের দু হাজার কর্মচারী সম্প্রতি সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। গত অক্টোবর মাসে তারা সরকারের কাছে এগারো দফা দাবী পেশ করেন। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কর্মচারীরা যখন বিক্ষোভ জানাচ্ছিলেন তখন তাঁদের মধ্যে থেকে দুশো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রয়োজন ভিত্তিক বেতন, বিদেশী ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ, নারী কর্মচারীদের মেটারনিটি বেনিফিট দেওয়া, কন্ট্রাক্ট লেবার প্রথা বিলুপ্তি প্রভৃতি দাবীতে ঔষধ প্রস্তুত ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীরা কিছুদিন ধরে আন্দোলন করছেন।

ফিলিপস কোম্পানীতে কর্মী ছাঁটাই

ফিলিপস কারখানায় সম্প্রতি প্রায় একশ পঞ্চাশ জন শ্রমিককে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিক ভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। এই সমস্ত শ্রমিকরা গত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবত কোম্পানীর মুনাফার পাহাড় সৃষ্টি করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। অন্যায়ভাবে এঁদের অস্থায়ী করে রাখা হয়, এমনকি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ থেকেও এদের বঞ্চিত করা হয়। দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষ যখন মুখে রক্ত তুলছে তখন মুন্দার অজুহাতে মালিক শ্রেণীর জুলুম শ্রমিক শ্রেণীর উপর আরও তীব্র হচ্ছে। বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির কারবারী ফিলপস পরিচালন কর্তৃপক্ষও এই সুযোগ নিয়ে চক্রান্ত করে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করেছে। অন্যদিকে ম্যানেজমেন্ট স্টাফের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ ৩ লক্ষ টাকায় নূতন ডিরেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রমিকদের কাজের বোঝা বাড়ানো হচ্ছে, মেকানাইজড করে শ্রমিকের কাজ সংকোচন করা হচ্ছে ও অধিক মুনাফালিপ্সু কর্তৃপক্ষ আরো ছাঁটাই করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক ছাঁটাই করে বেনামীতে বাইরে থেকে কারখানার ভিতরের কাজ করিয়ে আনা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রমিক কর্মচারীগণ ফিলপস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রতিবাদ করে আসছে। এই ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ দাবী করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনভাবের দরুন কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিক অসন্তোষ দিন দিন তীব্র হচ্ছে।

মতামত

নারী জাতির প্রতি বৈষম্য

.. আমাদের দেশে নারীজাতির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের এক জ্বলন্ত নিদর্শন বিশ্ব নারী বর্ষে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আপনারা জেনে শঙ্কিত হবেন যে ওষুধ শিল্পে নিযুক্ত অজস্র নারী কর্মী সন্তান ধারণের সময়ে সবেতন ছুটি পান না। এটা একটা অমানবিক ও নির্দয় ব্যবস্থা। সারা ভারত কেমিকেল ও ফার্মাসিউটিকাল এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি দিল্লীতে পার্লামেন্টের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও গ্রেপ্তার বরণ করে এর প্রতিবাদ জানান ওষুধ শিল্পে নিযুক্ত অজস্র নারী ও পুরুষ কর্মচারী।

জয়া ঘোষ
কলিকাতা

হীরেন বসুর
রাজনৈতিক উপন্যাস

আগুনের দিন

এই উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাদিক। এককালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন। পূর্ব বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছে। পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ করেছেন। এই তিন পুরুষের রাজনৈতিক অভিঘাত এবং সমকালীন সমাজসত্য বর্তমান উপন্যাসে প্রতিফলিত।

মূল্য পাঁচ টাকা

বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯
দর্পণ কার্যালয়েও পাওয়া যাবে

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মউ লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

আন্দোলন ঠেকাতে ৪০ হাজার সি আর পি চাই

দর্পন

১৮শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৩শে মে ১৯৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

কেন্দ্রের কাছে রাজ্য সরকারের গোপন বার্তা

পশ্চিমবঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন ঠেকাতে রাজ্য সরকার চল্লিশ হাজার সি আর পি চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক গোপন বার্তা পাঠিয়েছেন। রাজ্যের কল-কারখানায় ব্যাপক ছাঁটাই ও লে-অফ, যুব ছাত্রদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং সর্বোপরি দক্ষিণ কলকাতায় পাল্টা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গঠনের প্রস্তুতি সব মিলিয়ে রাজ্য সরকার আর ঝুঁকি নিতে চান না।

মুখ্যমন্ত্রীর গোপন নির্দেশে স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাজ্যের জেলায় জেলায় সার্ভে করে গ্রাম বাংলার এক ভয়াবহ চিত্রের রিপোর্ট করেছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আশংকা, শক্ত হাতে মোকাবিলা না করলে জয়প্রকাশজী নেতৃত্বে সরকার বিরোধী আন্দোলন এখানে ব্যাপক আকার ধারণ করবে।

প্রকাশ, স্বরাষ্ট্র দপ্তর ঐ গোপন রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছে, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পাঁচই জুন নব নির্মাণ সমিতি ও আট পার্টির গণ মিছিলে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ হবার সম্ভাবনা আছে।

জে পির আন্দোলন সি পি এমের বক্তব্যকেই শক্তিশালী করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সি পি এম দলের মধ্যে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ব্যাপারে আত্মিক ও সাংগঠনিক বিরোধ কমেছে।

এখন দলের নেতৃত্ব ও সক্রিয় কর্মী নেতারা মোটামুটি একমত যে, অবিলম্বে আন্দোলনে নেমে পড়া দরকার।

প্রশ্ন থাকছে এই আন্দোলনের বামপন্থীরা ছাড়া অন্যান্য শরিকদের সম্পর্কে। আন্দোলনের অন্যতম

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

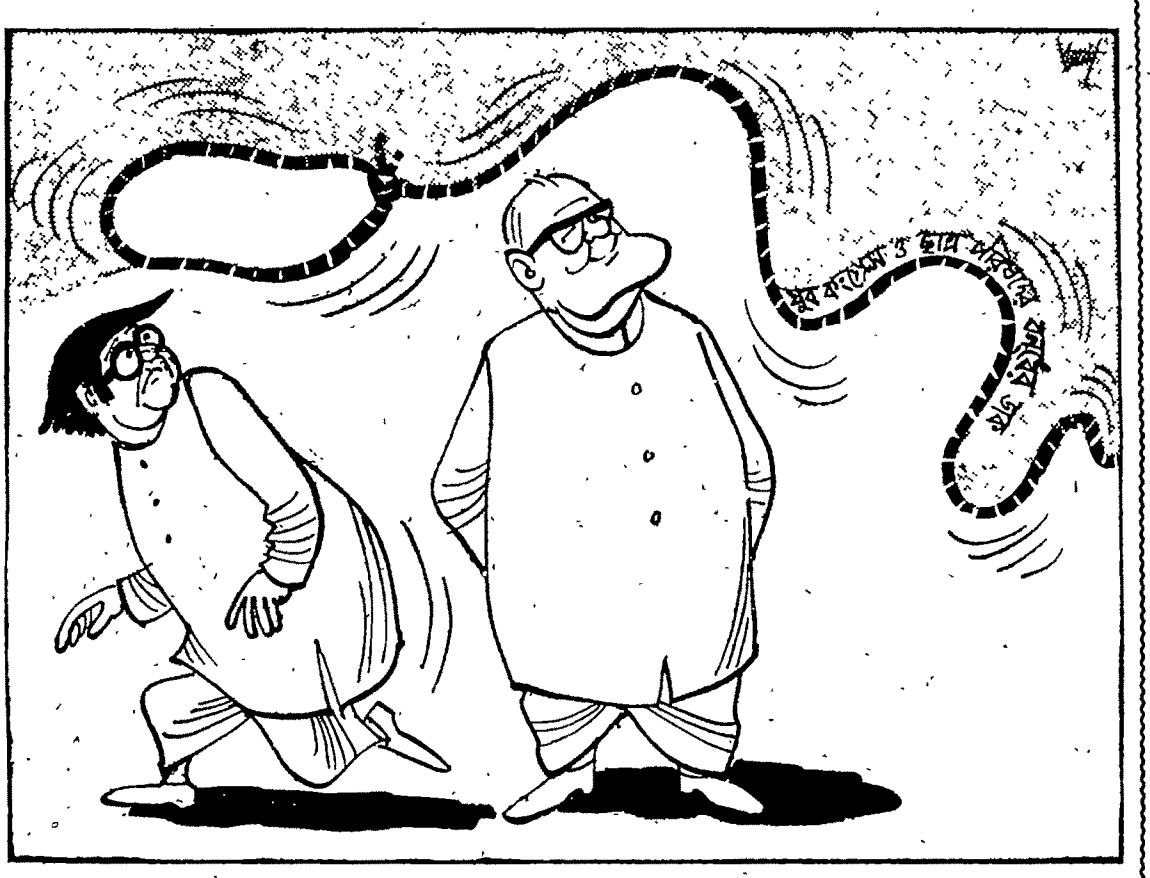

আট বামের আন্দোলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে কতখানি বিক্ষুব্ধ তার প্রমাণ পাওয়া গেছে চোদ্দই মের ভুখ মিছিলে এবং পনেরোই মে বেতন কাটার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিবাদ আন্দোলনে। আট বামের যুক্ত ফ্রন্ট এখন পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে আগামী এক মাসব্যাপী আন্দোলনের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

ন্যায্যমূল্যে খাদ্য এবং হয় উন্নয়নমূলক কাজ দাও অথবা সাহায্য দাও—এই দাবীতে বি ডি ও অফিসের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে সারা রাজ্যে প্রচার অভিযান।

জনগণের শত্রু জোতদার ও মজুতদারদের কাছ থেকে মজুত উদ্ধার এবং সেই খাদ্যশস্য সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে অর্থাৎ এক টাকা পঁচিশ পয়সা কে জি দরে গরীব জনগণের মধ্যে বিক্রয়।

পথসভা, প্রচার পুস্তিকা বৈঠক মারফৎ সারা রাজ্যে জনগণকে তাদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

আটটি বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের বন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচারিত বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রচার আন্দোলন প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা পুনরায় আমাদের কর্মসূচী ঘোষণা করছি।

এক, চোদ্দই মে সারা পশ্চিম বাংলায় সফল ভুখ মিছিলের পর

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক অরুণ মৈত্রকে কড়া চিঠি দিয়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক নরসিং রাও এক পত্রে প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান অরুণ মৈত্রের কার্যকলাপে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। গত সতেরো তারিখে এ আই সি সির স্থায়ী সম্পাদক শ্রীকেশ্টগোপাল অরুণবাবুর হাতে এই চিঠিটি পৌঁছে দিয়েছেন।

শ্রীরাও অরুণবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে বলেছেন কোন অধিকারে উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি পাল্টা অফিস খুলেছেন এবং দুই জনা নতুন সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ করেছেন? আপনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে কেন এই ডব-আইনী কাজের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নি। এই ধরণের কার্যকলাপ থেকে জেলার সভাপতি অনন্ত ভারতীকে বিরত করুন অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাহাত্তর সালে প্রফুল্লকান্তি ঘোষ মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার পর অনন্ত ভারতীকে সভাপতি এবং বারিদবরণ দাস ও মুকুল রায়চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি এ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয় এ আই সি সির নির্দেশে। অনন্ত ভারতীর সঙ্গে বারিদবাবুদের বিরোধ বাধে গোষ্ঠীগত রাজনীতি নিয়ে। শুরু হয় জেলা দখলের রাজনীতি। বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের জেলা অফিসে বারিদবাবুরাই দলে ভারি হয়ে পড়েন। এদিকে বাহাত্তর সালে সক্রিয় সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজার সাতশো। এই বাবদ আদায়ীকৃত পুরো টাকাই অনন্তবাবুর হেফাজতে ছিল। এর পরিমাণ প্রায় নব্বুই হাজার টাকা। এর থেকে তিরিশ হাজার টাকা প্রদেশ কংগ্রেসের পাওনা মেটানোর পরও যে ষাট হাজার টাকা অনন্তবাবুর কাছে থাকার কথা তার কোন হিসেব পাওয়া যায় না। বারিদবাবুরা বার বার অনন্তবাবুর কাছে হিসেব চাইতে থাকেন। কিন্তু কোথায় হিসেব? শেষ পর্যন্ত অনন্তবাবু বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের অফিসে যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন। অজিত পাঁজা ও সৌগত রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বিডন স্ট্রীটে জেলার পাল্টা অফিস খুললেন। শুধু তাই নয় মদত পেয়ে দুইজন নতুন সাধারণ সম্পাদকও নিয়োগ করলেন। এ ঘটনা চুয়াত্তর সালের শেষের দিকে।

বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর তাত্ত্বিক নেতা বারিদবরণ দাস অনন্তবাবুর পাল্টা অফিস খোলা ও দুইজন নতুন সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাছে এক পত্রে অনন্তবাবুর কাজের প্রতিবাদ জানান। অরুণবাবু এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

দেবীপ্রসাদের ডিগবাজী কংগ্রেসী কোন্দল চরম পর্যায়ে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের এক বিশেষ গোষ্ঠীর নেতারা মনে করেন সাধারণ মানুষ যে কোন আন্দোলনের জন্য মানসিক দিক থেকে তৈরী, কংগ্রেস এগিয়ে না এলে বিরোধীরা বাজার মাৎ করবে।

তাই ওরা বন্ধ ডেকেছে নিজেদের সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনায়। সিদ্ধার্থবাবু মহা খাপ্পা। তাঁর ধারণা যে প্রিয়-সৌগতরা তাঁকে হেয় করার ষড়যন্ত্র করছেন।

প্রিয় সৌগত গোষ্ঠী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বসেছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে ওরা বোঝাবার চেষ্টা করে বন্ধ ডাকার যৌক্তিকতা সম্পর্কে। মানুষের বিক্ষোভকে কংগ্রেসী নেতৃত্বে সংগঠিত করতে না পারলে সি পি এম আবার এ রাজ্যে নিজেদের পুর্বেকার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

প্রদীপ-নরুল-লক্ষ্মী গোষ্ঠী ভিন্নমত পোষণ করে। তাদের মতে প্রিয়-সৌগতরা মনস্থকে বিক্ষুব্ধ করে কংগ্রেস-সি পি আই যুক্ত মোর্চা গড়ে তোলার যুক্তি খাড়া করতে চায়। আসলে বন্ধ ডাকা হয়েছে সি পি আই-এর প্ররোচনায়।

প্রিয়-সৌগত গোষ্ঠী মনে করে যে, মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর দিকে বেশী আকৃষ্ট। একমাত্র আন্দোলনের চাপেই বোঝানো যাবে শক্তি কাদের বেশী।

শিলিগুড়িতে কংগ্রেসের একাংশের আহ্বানে সেদিন বন্ধ পালিত

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

জ্যোতির্ময় বসুর অভিযোগ

পাবলিক আকাউন্টস কমিটির বিদায়ী চেয়ারম্যান লোকসভার সি পি এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার দিন লোকসভায় অভিযোগ করেন যে পি এ সি বহুক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা পায়নি, বহুক্ষেত্রে তাদের জ্ঞাতব্য তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

শ্রীমধু লিমায়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবসু এই অভিযোগ করেন।

শ্রীলিমায়ে প্রশ্ন করেছিলেন—এক, পি এ সির কোন রিপোর্ট এখনও বাকি আছে কিনা এবং দুই, পি এ সিকে তথ্য অথবা ফাইল সরবরাহে সরকারের অস্বীকৃতিই কি এই বিলম্বের কারণ?

শ্রীজ্যোতির্ময় বসু উত্তরে জানান যে, পাঁচটি রিপোর্ট দিতে এখনও বাকি আছে।

শ্রীবসু কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রক থেকে প্রায় আটষট্টিটি প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। কমপিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসিং ও অ্যাকাউন্টিং মেসিন সরকারী দপ্তর কর্তৃক ক্রয় অথবা ভাড়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এখনও দেওয়া হয়নি। মন্ত্রিসভা সংক্রান্ত দপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জনস্বার্থে এই তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। অর্থকরী সহায়তা সংক্রান্ত পি এ সির সাব কমিটি রপ্তানীকারক নয়টি সংস্থাকে অর্থ সাহায্য সম্পর্কে তথ্য চাইলে পঁচিশে এপ্রিল তারিখের চিঠিতে তাদের জানানো হয় যে, এই বিষয়ে তথ্য দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত। খবর ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং কিভাবে এর মোকাবিলা করা যাবে সে সম্পর্কে মন্ত্রিসভার কাছে ৪·৮ ১৯৭২ তারিখে প্রদত্ত নোটের কপি সরবরাহ করা হয়নি।

শ্রীবসু আরো বলেন যে, ডি এ ভি পি অর্থাৎ ডাইরেক্টরেট অফ অ্যাডও-ভিসুয়াল পাবলিসিটির কাছ থেকেও কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায় নি বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও। তথ্য চাওয়া হয়েছিল এই সম্পর্কে—(ক) বিভিন্ন সরকারী সংস্থার বিজ্ঞাপন এজেন্টের তালিকা; (খ) গত তিন বছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ও স্মারকগ্রন্থ যেখানে ডি এ ভি পি সরকারী বিজ্ঞাপন দিয়েছে; (গ) ইণ্ডিয়ান অবজার্ভারের বিরুদ্ধে মামলার বিস্তারিত বিবরণ; (ঘ) সরকারী সংস্থায় বিজ্ঞাপন বাবদ খরচের বিস্তারিত বিবরণ; (ঙ) সরকারী সংস্থা বা সরকারী কোম্পানী বিজ্ঞাপন সংস্থা মারফৎ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয় কি দামে।

পি এ সির কাজ সরকারের আয়ব্যয় ঠিকমত হচ্ছে কি না দেখা, দুর্নীতির ঘটনা উদ্ঘাটিত করা এবং এ সম্পর্কে সংসদকে ওয়াকিবহাল করা। শ্রীজ্যোতির্ময় বসু তেয়াত্তর-চুয়াত্তর এবং চুয়াত্তর-পঁচাত্তর সালে পি এ সির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর আমলে সরকারের অনেক কেলেঙ্কারী উদ্ঘাটিত হয়েছে এ তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত নয়, যদিও কেলেঙ্কারীর বহু ঘটনা বাজারী সংবাদপত্রগুলো চেপে দেবার চেষ্টা করেছে অথবা খুব গুরুত্বহীন ভাবে বা ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশ করেছে।

সরকারের বিরুদ্ধে পি এ সিকে প্রয়োজনীয় তথ্য না দেওয়ার অভিযোগ খুব গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দিরা গান্ধীর প্রচণ্ড বিরোধিতার মধ্যে জ্যোতির্ময় বসু পি এ সির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। ধুরন্ধর মহিলা হয়ত আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, শ্রীবসুর মত লোককে পি এ সির চেয়ারম্যান করা কংগ্রেস সরকারের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

শ্রীবসুর অভিযোগ থেকে এটা পরিষ্কার যে, শাসক শ্রেণী, মন্ত্রী ও আমলাদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ লোকচক্ষুগোচর করার যে সামান্য সুযোগ আছে তারও সদ্ব্যবহার করতে গেলে কংগ্রেস সরকার জনস্বার্থের অজুহাতে তার সামনে চীনের প্রাচীর তুলে দেন। কারণ দুর্নীতি না থাকলে কংগ্রেস সরকারের অস্তিত্বও থাকে না।

দেবীপ্রসাদের ডিগবাজী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। প্রিয়-সৌগত গোষ্ঠী এর উদ্যোক্তা আর এর বিরোধিতায় নেমেছিল প্রদীপ-নরেন গোষ্ঠী। দুই গোষ্ঠীরই মিছিল বেরিয়েছিল পরস্পরের সমালোচনা করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ ভেল্কী দেখিয়েছেন। তিনি কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করেন।

পরে রাজ্য কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠকে দেবীবাবু জোরালো বক্তৃতা করেন বন্ধ-এর বিপক্ষে। এতদিন প্রিয়-সৌগত গোষ্ঠী দেবীবাবুর যথেষ্ট কাছাকাছি ছিল। হঠাৎ দেবীবাবুর এই ভোল বদলে ওরা বিশেষ বিব্রত।

দেবীবাবু বুঝেছেন রাজনীতিতে থাকতে গেলে সিদ্ধার্থবাবুর কথায় ওঠা বসা করতে হবে। উপায় নেই।

জয়প্রকাশের আন্দোলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান উদ্যোক্তা নবনির্মাণ সমিতি, অর্থাৎ সংগঠন কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটি মোর্চা যার মধ্যে জনসংঘ প্রভৃতিরা অন্তর্ভুক্ত। এই মোর্চার সঙ্গে বামপন্থীরা যুক্ত হলে হয়ত বা তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এই সংশয় ছিল অনেক মার্কসবাদীদের মধ্যে।

কিন্তু উচ্চ ও নিম্নতম পর্যায়ে নানা আলোচনার পর এই সংশয় কেটেছে। সি পি এম-এর নেতৃত্ব ও কর্মীরা একমত যে, জয়প্রকাশের নেতৃত্বে যুক্ত আন্দোলনের দাবী-দাওয়া আসলে সি পি এম-এর গত তিন বছরের বক্তব্যকে শক্তিশালী করে।

আজ নবনির্মাণ সমিতি এবং জয়প্রকাশজী নিজে স্বীকার করছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই, অবাধ নির্বাচন বাহাত্তরে হয় নি বা এখনও হওয়ার অবস্থা আসে নি এবং এই আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য ব্যাপক গণআন্দোলনের প্রয়োজন।

যে কোন গণআন্দোলনা তৈরী করতে পারলে মানুষের মনে আশার সঞ্চার হবে, সন্ত্রাসের আবহাওয়া

আট বামের আন্দোলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শহর ও গ্রামাঞ্চলে চলবে এক মাস ধরে বিক্ষোভ সভা কনভেনশন।

দুই, পাঁচই জুন কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশ।

তিন, খাদ্য, বস্ত্র স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে এবং ওয়েজ ফ্রীজ, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে আঠারোই জুন সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করা হবে।

ছাত্র পরিষদ যুব কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির বিভেদকামী কৌশলের কথা উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, "জনগণের কাছে আমাদের আবেদন, এই বিভেদকামী কৌশলের মোকাবিলা করে আমাদের কলকাতার সমাবেশ এবং সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল সম্পূর্ণ সফল করে তুলুন।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ষোলই প্রকাশিত একটি কুৎসামূলক সংবাদের প্রতিবাদ করে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বামপন্থী দলগুলির আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির জন্যই বামপন্থী দলগুলি, বিশেষ করে সি পি আই এম-এর বিরুদ্ধে নির্লজ্জ কুৎসা প্রচার করা হয়েছে। আর্টটি বামপন্থী দলের বৈঠকে আলোচনা সম্পর্কে সি পি আই এমের দুই সর্বোচ্চ নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসুকে জড়িয়ে এই পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন: প্রমোদ দাশগুপ্ত (সি পি আই এম) অমৃত ঘাষ (ফরোয়ার্ড ব্লক) হেমেন মুখার্জী (ওয়ার্কার্স পার্টি) বিশ্বনাথ মিত্র (এস পি) সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী (মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক) অজিত সেন (বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস)।

কাটবে এবং আন্দোলনের গতিতে যারা প্রতিক্রিয়ার শক্তি তারা পেছিয়ে পড়বে। এই ত সাধারণ নিয়ম।

নবনির্মাণ সমিতির নেতাদের অনেকেই বুঝেছেন সি পি এম-কে সঙ্গে নেওয়ার ঝুঁকি কি। দক্ষিণপন্থীদের কথা বাদ দিয়েও সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা সমর গুহ শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন থেকে সি পি এমকে বাদ দেওয়ার আবদার করে।

জয়প্রকাশজীর কাছে দরবার করে সমরবাবু বলেছেন, খররদার সি পি এমকে সঙ্গে নেবেন না। ওরা আন্দোলনের নেতৃত্বকে কব্জা করে ফেলবে। তখন আর উপায় থাকবে না। সাতষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে সমরবাবু বলেন যে, সি পি এম-এর জোরদার সংগঠন, তাই ওদের নিজেদের দিকে ঝোল টানার ক্ষমতা বেশী।

সমরবাবুর বক্তব্যের সমর্থনে নবনির্মাণ সমিতির আর এক শরিক নেতা সুশীল ধাড়া এগিয়ে আসেন। সুশীলবাবু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ দিয়ে বলেন যে, সি পি এমকে এক মোর্চায় টানলে সর্বনাশ হবে।

সোস্যালিস্ট দলের বিমান মিত্র কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলে গেছেন যে সি পি এমকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কোন বৈপ্লবী আন্দোলনের অর্থ নেই। একমাত্র সি পি এম-এর রাজনৈতিক সংগঠন আছে এবং এই সংগঠন অন্যান্যদের সহায়তায় ব্যাপক গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলতে পারে।

প্রফুল্ল সেন প্রথম দিকে সি পি এম সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত জয়প্রকাশজীর তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন যে, গণআন্দোলন ব্যাপক হলে নেতৃত্বের অন্যান্য অংশ সজাগ থাকলে সি পি এম-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হতে বাধ্য। জয়প্রকাশজী বলেন যে, ইতিমধ্যেই ভারতের অন্যান্য রাজ্যে জনসংঘের রাজনৈতিক বক্তব্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় গোঁড়ামি এখন জনসংঘে আর তেমন প্রবল নয়।

জয়প্রকাশজীর বক্তব্য বিভিন্ন দলের মধ্যে রেষারেষি এড়াতে গেলে আন্দোলনে কোন দলের পতাকা দেখানো চলবে না। আন্দোলন কোন দলের বা দলসমষ্টির নয়, সাধারণ মানুষের। অতএব দলের পতাকা আন্দোলনে অপ্রাসঙ্গিক।

এই পতাকার ব্যাপারে সি পি এম-এর মধ্যে তীব্র সংশয় ছিল। বিহারেও এই একই ব্যাপারে সি পি এম দ্বিমত প্রকাশ করে যুক্ত আন্দোলনে যোগ দেয় নি।

পরে সি পি এম নেতৃত্ব স্বীকার করেছে যে বিহারে পতাকা নিয়ে এত হৈ চৈ করার দরকার ছিলনা। যদি গণআন্দোলন এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এখানকার একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য হয় তাহলে যে কোন শক্তিই এই আন্দোলনের জন্য আসবে তাদের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য সি পি এম এর প্রস্তুত থাকা উচিত।

তত্ত্বের দিক থেকে সি পি এ দলের বক্তব্য হল যে মার্কসবাদী কখনও বৃহৎ আন্দোলনকে ভয় না আন্দোলনের নামে শিউরে ওঠে দক্ষিণপন্থীরা।

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণপন্থীরা বাধ্য হয়ে সি পি এমকে সঙ্গে নিতে চাইছে। এই আহ্বানে সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ মার্কসবাদীদের অন্ততঃ থাকার কথা নয়।

আর পতাকা নেওয়া বা না নেওয়া খুব একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার নয়। কারণ এখানে যে কোন আন্দোলন গড়ে উঠবে আর তাতে যদি সি পি এম-এর সম্পর্ক থাকে তবে সাধারণ মানুষের ধারণা হবে সি পি এম-এর শক্তিতেই আন্দোলন চলছে। পতাকা না নিয়েও সি পি এম অধিকতর শক্তিশালী হবে।

এ আই সি সি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশ করেন না। শেষ পর্যন্ত বারিদবাবু দিল্লীতে দরবার শুরু করেন।

এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদকের কাছে এক পত্রে বারিদবাবু জেলার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে জানতে চেয়েছিলেন এ আই সি সির নির্দেশে গঠিত কোন জেলা কংগ্রেস কমিটি ভঙ্গা বা পুনর্গঠন করার অধিকার জেলা কংগ্রেস সভাপতির আছে কি না?

এ মাসের গোড়ার দিকে এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক নরসিং রাওয়ের সঙ্গে বারিদবাবু এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। বারিদবাবু ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কিভাবে তাদের প্রতি অবিচার করছেন তার উল্লেখ করে সুবিচার প্রার্থনা করেন সব শুনে শ্রীরাও বিবেচনার আশ্বাস দেন।

এ আই সি সি সূত্রে জানা গেছে নরসিং রাও অরুণ মৈত্র ও অনন্ত ভারতীকে এক নির্দেশ পাঠিয়েছেন। তাতে বলা বলা হয়েছে বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটের অফিসই উত্তর কলকাতার স্বীকৃত জেলা অফিস। পাল্টা অফিস অবিলম্বে বন্ধ করুন। নতুন দুই জন জেলা সম্পাদক নিয়োগকে বাতিল করুন। কারণ এই জেলা কমিটি কোন রকম পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ক্ষমতা জেলার সভাপতি এমন কি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিরও নেই। বাহাত্তর সালের সক্রিয় সদস্যদের চাঁদা বাবদ পাওয়া টাকার হিসাব অবিলম্বে দিন। অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর অরুণবাবুকে শ্রীরাও নির্দেশ দিয়েছেন জেলায় জেলায় এই ধরণের কাজ বন্ধ না করলে আপনার বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চিঠি পেয়ে অরুণবাবু ও অনন্তবাবু খুবই ঘাবড়ে গেছেন।

পশ্চিম বাংলার গ্রামে এখন অন্ন আর জলের জন্য হাহাকার ঃ ভাগচাষী উচ্ছেদ বাড়ছে

(দর্পণের প্রতিনিধি)

এই রাজ্যের গ্রামগুলোতে গেলে দেখা যাবে খরা বিধ্বস্ত এক ভয়াবহ শ্মশানের রূপ। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া কিংবা বর্ধমান জেলার বিহার সংলগ্ন সীমানার কথা ছেড়েই দিলাম, এমনকি হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণার গ্রামগুলোতেও হাহাকার। অন্নের হাহাকার তো আছেই। হাহাকার জলেরও। এসব বেশ কয়েকটি গ্রাম আমি পায়ে হেঁটে ঘুরেছি, দেখেছি কি দুঃসহ জলের হাহাকার। বৃষ্টি না হওয়ায় মাটি প্রায় পাথর, ঘাসগুলো জ্বলে গেছে। গ্রামের ছোট ছোট পুকুরগুলো শুকিয়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে কুয়োগুলো। যে সব বাড়ীতে টিউবওয়েল আছে সেখানেও ভাল জল আসছে না, কারণ অগভীর এবং গভীর টিউবওয়েল বৈদ্যুতিক গতিসম্পন্ন হবার ফলে মাটির জল টেনে নিচ্ছে।

বিশেষভাবে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া এবং পোলবা থানার গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখেছি এবং সমস্যা অনেক বেশী কট। সিথিরা, চাপতা, ইটাচুনা-খ্যান, বেলুন-ধামাসিং, সিমলাগড় ভিটাসিং, বাটিকা (অগভীর) নলকূপ মাটির জল টেনে নেবার ফলে গৃহস্থ বাড়ীর নলকূপগুলোতে জল প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না। গৃহস্থবাড়ীর নলকূপের গভীরতা এসব অঞ্চলে ১৫০ থেকে ২৫০ ফুট পর্যন্ত। অবশ্য বেশীর ভাগই ১৮০ থেকেই ২০০ ফিটের মধ্যে। মাঠের গভীর এবং অগভীর নলকূপের গভীরতাও সমপরিমাণ। আঞ্চলিক প্রশাসকরা অবশ্য আমাকে নলকূপের ফিল্টারের ত্রুটিই গৃহস্থ বাড়ীর নলকূপে জল না ওঠার কারণ বলে বোঝাতে চেয়েছেন। তাদের মতে আগে পিতলের ফিল্টার দেওয়া হতো এবং বর্তমানে অন্য ধাতুতে তৈরী ফিল্টার ব্যবহারের ফলেই জল ঠিকমত উঠছে না। কিন্তু, আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে, সমগভীর স্তরে বাড়ীর নলকূপ এবং সরকারী গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রোথিত থাকায় বিদ্যুৎ চালিত গভীর ও অগভীর নলকূপ মাটির জল অনেক বেশী পরিমাণে টেনে নেবার ফলেই জলের হাহাকার দেখা দিয়েছে। যেখানে বাড়ীর নলকূপের টাইপ ১০০ ফুট গভীর সেখানে জল দুষ্কলভ্য। রাত্তে ডীপ টিউবওয়েল কিংবা স্যালো বন্ধ থাকে। তখন বাড়ীর কলে জল পেতে অসুবিধা হয়না। স্যালোর পাম্প গ্রাউণ্ড লেবেল থেকে ১০-১২ ফুট নীচে নাবাতে হচ্ছে।

সরকারী খালে জল নেই

এ সমস্ত অঞ্চল ঘুরতে গিয়ে দেখেছি সরকারী খালে জল না থাকায় বোরো চাষ রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা অসহায় কণ্ঠে বললেন, বি. ডি. ওকে বারবার বলেও কিছু ফল হয় না। বস্তুত. গ্রামাঞ্চলে বি. ডি. ও প্রমুখ সরকারী অধিকর্তার জোতদার মহাজনদের হাতের পুতুল, মান্দারণ গ্রামে কথা হল বিশিষ্ট কৃষক নেতা শিবু মুখার্জীর সঙ্গে। মুখার্জী বেশ শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বললেন, "মশাই সরকার চাষীদের খালের জল দিচ্ছেন না বলবো কেমন করে। জল দিচ্ছে, জল দিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে।" আমি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "মজা হচ্ছে এই যে, যখন জলের প্রয়োজন তখন জল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বীজ বুনবার সময় যে জলের দরকার খালে সে সময় সে জল থাকে না। কিন্তু এখন ধান কাটার সময় হয়ে এলো। এখন অসময়ে খালে জল ছেড়ে দেওয়ার ফলে বেলুন ধামা সিং এবং সিমলাগড় ভিটাসিং অঞ্চলে অনেক জমির বোরো ধান ডুবে গেছে।"

ধানের দাম কমছে

গ্রাম্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা প্রসংগে শিবু মুখার্জী জানান যে গত কয়েকদিন ধরে পুরোনো ধানের দর কমতির দিকে। ১০৫ টাকা থেকে নেমে ৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। কারণ প্রসংগে বললেন যে, বোরো ধানের মীষে দুধ জমার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রায় বিক্রী হতে সুরু করেছে। অনেকে পাটা (থামার) থেকেই বিক্রী করে দিচ্ছে। নতুন ধান বাজারে আসার মুখে তাই পুরোনো ধানের দাম কমছে। লক্ষণীয় যে, চালের দাম কিন্তু কমছে না। শিবুবাবু এবং খন্যানের একজন শিক্ষক গৌর মোদক বললেন যে, গত ৩ সপ্তাহের মধ্যে এতদঞ্চলে চালের দাম ৪০ থেকে ৫০ পয়সা বেড়ে গেছে। ৩ সপ্তাহ আগেও চালের কিলো ছিল ২-৫০ থেকে ২-৬০ এবং বর্তমানে তা বিক্রী হচ্ছে কিলো প্রতি ৩ টাকা দরে। ধানের ফলন মোটামুটি খারাপ না হলেও গ্রামে অনাহারে সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, কারণ ধান সীমিত সংখ্যক লোকের হাতে থেকে যাচ্ছে। এসব মুনাফাশিকারীর দল প্রয়োজনমত বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে চালের দাম বাড়াচ্ছে আর অন্যদিকে জমি থেকে উচ্ছন্ন চাষী, খেতমজুর এবং ভাগচাষীর হাতে অর্থ না থাকায় তারা একটানা অনাহারের শিকার হচ্ছে।

ভাগচাষী উচ্ছেদ বেড়ে যাচ্ছে

কৃষক নেতা শিবু মুখার্জী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং তা হচ্ছে ভাগচাষীর নির্বাচনী উচ্ছেদ। তিনি হুগলী জেলার পোলবা থানার পাটনা গ্রামের উল্লেখ করে বলেন যে, এখানে প্রায় ৪০।৫০ জন ভাগচাষীকে মৌখিকভাবে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে রামধন টুডু প্রমুখ আদিবাসী কৃষকও আছে। পোলবা এবং পাণ্ডুয়া থানায় ব্যাপকভাবে ভাগচাষী উচ্ছেদ হচ্ছে। এখানে যেসব সীমানায় এখন সেটেল্‌মেন্টের কাজ চলছে সেখানে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জমি রেকর্ড হয়ে যাবার ভয়ে প্রতিদিনই ভাগচাষী উচ্ছেদ চলছে। জোতদাররা উস্কানি দিয়ে মাঝারি মালিকদেরও আতংকগ্রস্ত করছে। শিবুবাবু স্পষ্ট করেই বললেন যে, পোলবা সার্কেলের জে. এল. আর ও ভাগচাষীদের আইনের আশ্রয় দেওয়াতো দূরের কথা, তিনি এতদঞ্চলের জোতদারদের হাতের পুতুল।

ওয়াক্ফ ছাত্রাবাসে কংগ্রেসী মস্তানদের হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শিয়ালদহ এলাকার ওয়াক্ফ্ ছাত্রাবাস কাইড়ারে হঠাৎ স্থানীয় যুব কংগ্রেসী মাস্তানরা তাদের বন্ধুদের ধরে এনে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয় এবং জোর করে বিনা ভাড়ায় এদের থাকার জায়গা করে দেওয়ার অযৌক্তিক দাবীতে হৈ হল্লা করে। শোভন মজুমদার নামে এক "নেতা" হোস্টেল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকীও দেয়।

এই ঘটনায় ছাত্র বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়। মন্ত্রী আবদুল সাত্তার সাহেব যুব নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাত্রে বাসায় ডেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। সুদীপবাবু সঙ্গে সঙ্গে সোমেন মিত্রকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। কদিন আগে স্থানীয় কারমাইকেল ছাত্রাবাসে স্থানীয় কংগ্রেসী ক্ষুদে সেনারা ঢুকে ফুলগাছ ছেঁড়া থেকে শুরু করে হোস্টেলের ভিতরে ছোট্ট মাঠে দুবেলা খেলাধুলা গানবাজনা শুরু করেছিল। জয়নাল আবেদিন

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

আপনি কি জানেন?

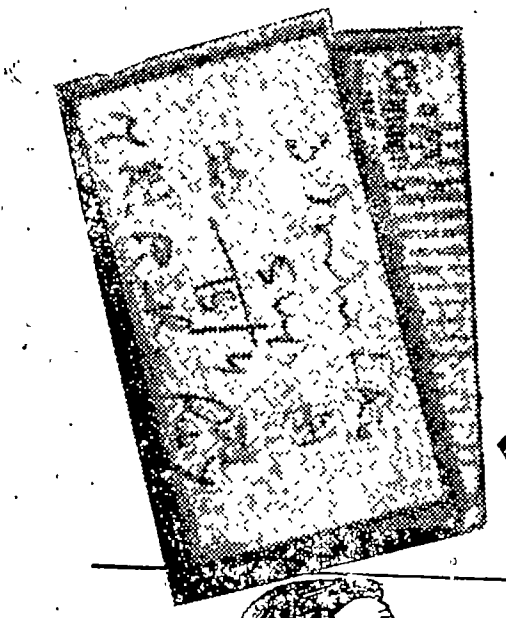

যে আসন আপনার নামে সংরক্ষিত নয়, তা'তে ভ্রমণ করা অপরাধ।

অন্যের নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে হয়ত সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত এই বেনামী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন না। যে কোন সময়েই তো ধরা পড়তে পারতেন! ঝঞ্ঝাটের শেষ থাকতনা!

পুরো ভাড়া এবং জরিমানা, মাঝ পথেই বাধ্য হয়ে নেমে যাওয়া; ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস, ভাগ্য খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে।

অথৈ জলে শুধু শুধু ঝাঁপ দিতে যাবেন কেন? মান-সম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে!

পূর্ব রেলওয়ে-তে অন্যের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য লোক ধরা পড়ছেন।

টাকা দিয়ে ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন না। অনুমোদিত সংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট কিনবেন।

INDIAN RAILWAYS

পূর্ব রেলওয়ে

medium

চীনের পার্টি লাইন ও সি পি আই (এম) নেতৃত্ব (২)

মহাচীনের বিপ্লবধারা ও মাও সে তুঙের চিন্তা

শ্রীকান্ত বসুরায়

চীনের বিপ্লব অবিরাম এগিয়ে চলেছে, ধনতন্ত্রবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে নতুন নতুন সক্রিয় ব্যবস্থা নিয়ে ষ্ট্যালিন বলেছেন—"The easiest way to capture a fortress is from within"—Problems of Leninism.

চীনের পার্টি মনে করে বিপ্লবকে জনগণের চেতনায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে ও সংহতিতে ফুটিয়ে তুলতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে বিপ্লবের নেতৃত্বকে তত্ত্বগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক (বিজ্ঞান চর্চাসহ) ইত্যাদি সমস্ত কর্মকাণ্ডে—

"Politics in command", "To change the objective world and and at the same time their own subjective world—to change the cognitive ability and change the relations between the subjective and the objective world"

এর পতাকাকে তুলে ধরে। নীচে তারই একটা সাধারণ আংশিক পরিচয়—বিপ্লবের শিক্ষার ভাণ্ডারে যেগুলির অবদান ঐতিহাসিক ও অনন্য।

(এক) নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার আগামী বিপ্লবের চরিত্র)—অর্থাৎ দুনিয়ার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যার মুক্তির রণনীতির দিশারী।

(দুই) জনযুদ্ধ গণবিপ্লবের রণবিজ্ঞান। অস্ত্র নয়, জনগণই বিপ্লব করে, ইতিহাস সৃষ্টি করে; অস্ত্র তার হাতিয়ার মাত্র। জনযুদ্ধের স্তরে স্তরে জনগণ আরো উন্নত বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করে।

(তিন) দুই লাইনের সংগ্রাম (জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে অবিরাম শ্রেণীরসংগ্রামে পজিটিভ নিগেটিভ শিক্ষার প্রয়োগ)—যে সংগ্রাম (জাতীয় স্তরে) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক, তত্ত্বগত ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে; যে সংগ্রাম (আন্তর্জাতিক স্তরে) সারা দুনিয়ার সমস্ত বিপ্লবের প্রধানতম সাধারণ সমস্যা পাতিবুর্জোয়া প্রবণতার বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াইয়ের বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগকে এক ব্যাপকতম ও উচ্চতমপর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং আরও এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আধুনিক সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তারই ঘনীভূত প্রকাশ (কনসেনট্রেটেড এক্সপ্রেসন)।

(চার) জনগণের মধ্যেকার বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সমাধানের সংগ্রাম—বিরামহীন বিপ্লব গড়ে তোলার উপায়।

(পাঁচ) উপরিকাঠামোর সঙ্গে ভিত্তির দ্বন্দ্ব বিষয়ক সংগ্রাম—প্রধানতঃ "জনগণ থেকে জনগণের নিকট" প্রক্রিয়ার সাহায্যে "বিপ্লবকে আয়ত্ত কর উৎপাদন বিকাশের পথে বাধাগুলি খান খান হয়ে যাবে" নীতির সাহায্যে, "বিপ্লবী কমিটি" মারফৎ, বিপ্লবের উৎস জনগণকে বিপ্লবী ক্ষমতা প্রয়োগে প্রত্যক্ষ অধিকারী হওয়ার সাংগঠনিক ব্যবস্থা দ্বারা ও "উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদক শক্তির দ্বন্দ্বের" সমাধানের পথে।

(ছয়) মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব (জি পি সি আর; জনগণের চিন্তায়, প্রেরণায় ও কাজে প্রলেতারীয় রূপান্তর)—ধনতন্ত্রবাদ, যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও সমস্ত রকমের সুবিধাবাদকে নির্মূল করার সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ সংগ্রাম।

(সাত) সংগ্রাম সমালোচনা-রূপান্তর (যার প্রধান হাতিয়ার বিপ্লবী কমিটী অর্থাৎ পার্টি গণসংগঠন ও গণফৌজের বৈপ্লবিক ঐক্য)—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিপ্লবকে সংহত ও সুরক্ষিত করতে, রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বের ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার বিভিন্ন কাজে সংগঠিত জনগণের সচেতন কার্যকরী ভূমিকার প্রসার; সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের ও কার্যকলাপের মূলোচ্ছেদ এবং প্রশাসন, উৎপাদন ও সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লবী শক্তিগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বিপ্লবের দুর্গে পরিণত করা।

এবারে পি বিকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা চলে, এগুলো কি বিপ্লব, হঠকারিতা প্রতিবিপ্লব? হ্যাঁ এগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি বিপ্লব, এই কারণে যে এরা বস্তুর, ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের গুণগত পরিবর্তন নির্ণয় করে।

হ্যাঁ, উপরোক্ত বিপ্লবগুলি সত্যি সত্যি একটি দেশের ঘটনা—নাম তার চীন। চীনের পার্টির নবম কংগ্রেস সংক্রান্ত পি বির বক্তব্যের মধ্যে মাত্র দু-একটাকে শুধু মাত্র মৌখিক স্বীকৃতিদান ছাড়া বাদবাকীগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাওয়া হয়েছে।

মাও চিন্তাধারার প্রসঙ্গে

"মহাচীনে বিপ্লবের ধারা" প্রসঙ্গে বেছে বেছে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; এদের প্রত্যেকটি এক একটি অভূতপূর্ব বিপ্লব—জনগণের সংগঠিত সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে গুণগত পরিবর্তন। প্রথম দুটি যেমন এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার অধিবাসী দুনিয়ার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যার মুক্তির দিশারী, বাকীগুলোও তেমনি দুনিয়ার সমস্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই কঠিনতর ও উচ্চতর পর্যায়ে শ্রেণীসংগ্রামের অজেয় পতাকাবাহী। অন্যভাবে বলা যায়, অনুন্নত দেশগুলিতে (লেনিনের বর্ণনায় আনইভেন ডেভেলপমেন্ট দ্রষ্টব্য) বিপ্লবের কাজে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজ্ঞান মাও সে তুং-এর এক বিস্ময়কর অবদান; এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঠেকানোর পদ্ধতি-বিজ্ঞান মাও নেতৃত্বের দ্বিতীয় মহান অবদান। তার উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় শোধনবাদের অভ্যুত্থান ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে তার পরিণতি পৃথিবীর ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ অচেনা, সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব পরিস্থিতি নিয়ে এসেছে, বিশেষতঃ এই আণবিক যুগের অতিশক্তির দাপটের দিনে; তার পাল্টা রণনীতি ও কৌশল গড়ে তোলা ও সর্বহারা বিপ্লবকে রক্ষা করা ও উন্নত করা (the power of the proletariat lies, not in its numerical strength, but in its political strength"—Lenin)

মাও নেতৃত্বের তৃতীয় মহান অবদান। এক কথায় এই তিনটি অবদানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের মধ্যেই মাও চিন্তাধারার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

সর্বহারার আন্দোলনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যেমন আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিবিপ্লবী শক্তির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টাকে ঠেকানো। এ আবশ্যিকতার ভিত্তিতে সোভিয়েত বিপ্লবের ও চীন বিপ্লবের সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলিকে আমাদের জানতে হবে। আর সর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতিতে রুশ বিপ্লবের পাশাপাশি চীন বিপ্লবের অবদানগুলিকে বুঝতে মাও অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

মহান অক্টোবর বিপ্লব দেশে দেশে সর্বহারার নেতৃত্বে বিপ্লবগুলিকে প্রেরণা যুগিয়েছে, পথ দেখিয়েছে; চীন বিপ্লবও তেমনি দুনিয়ার দেশে দেশে বিপ্লবের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকক্ষেত্রে দুর্বল করে তুলছে; বিপ্লব প্রধান বিপদগুলিকে উদ্ঘাটিত ও বিচ্ছিন্ন করে চলেছে, এক অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিপ্লবের পক্ষে শক্তিগুলিকে বিভিন্ন ভিত্তিতে সমবেত করতে ও প্রধান প্রধান সাধারণ শত্রুর সম্মুখীন হতে সাহায্য করে চলেছে, নিজদেশে সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে উন্নত করার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির সামনে উদাহরণ ও প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে, দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ও সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামনে "বর্তমান-পূর্ব ইউরোপীয় অধঃপতনকে" ঠেকানোর সম্ভাব্য পথ দেখাচ্ছে। অভাবে বলা যায়, রুশ বিপ্লব যেমন চীন বিপ্লব সহ অন্যান্য বিপ্লবকে একাধারে সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করেছিলো, চীন বিপ্লবও নতুন এক তীব্র পরিস্থিতিতে বর্তমান ও আগামী দিনের বিপ্লবগুলিকে (আগামী দিনের রুশ বিপ্লব সহ) আরো সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সামর্থ্য অর্জন করেছে।

তাই অক্টোবর বিপ্লব ও চীন বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক। এক বিপ্লবের নেতৃত্বে যেমন লেনিন, অপর বিপ্লবের নেতৃত্বে তেমনি মাও সে-তুঙ। তাই মহান লেনিন ও মহান মাও পরস্পরের সাথী ও পরিপূরক।

আজ লেনিনোত্তর যুগে যখন লেনিন ও লেনিনবাদকে ডুবানোর চেষ্টা চলছে, সে সময় লেনিনের সার্থক আন্তর্জাতিক উত্তরাধিকারী মাও এক মহান শিক্ষক ও দিশারী, বিশেষতঃ আণবিক ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের এ যুগে।

লেনিন যে সমস্ত হুঁশিয়ারী রেখে গেছেন, সি পি এস ইউ তার অনেকটাই সমঝে নিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সি পি এস ইউ এর ব্যর্থতার মধ্যে যে নেতিবাচক শিক্ষা ফুটে উঠেছে, সি পি সি তার সঠিক বিশ্লেষণ করেছে; শুধু তাই নয়, সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান স্তরের বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সি পি সি তার নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ সমস্ত সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগপদ্ধতি উদ্ভাবন করে চলেছে ও গড়ে তুলছে। এক কথায় সি পি এস ইউ এর ব্যর্থতা ইতিহাসের কাছে যে প্রশ্নগুলো তুলে ধরেছে, সি পি সি তারই উত্তর রেখে চলেছে—তার বিশ্লেষণে, তার বাস্তব প্রয়োগপদ্ধতিতে, নিজ দেশে অনেকগুলো বিপ্লব সমাধার মধ্য দিয়ে ও আন্তর্জাতিক বহুমুখী সংগ্রামের মধ্যে।

বলা বাহুল্য, চীন বিপ্লবের ইতিহাস ও মাও নেতৃত্বের ইতিহাস অভিন্ন; মাও নেতৃত্বে চীনের পার্টি দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে বিরাট বিরাট ঐতিহাসিক সাফল্যের এক মালা গেঁথে চলেছে (সঙ্গে সঙ্গে পার্টির অভ্যন্তরে দু লাইনের সংগ্রাম দশ দশটি বিপজ্জনক মোড় পেরিয়ে)। তাই লেনিনের যোগ্য উত্তরাধিকারী মাও প্রকৃত অর্থে লেনিনোত্তর যুগের লেনিন।

মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব দৃষ্টিভঙ্গীকে সাম্রাজ্যবাদের যুগের বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণের ও রূপায়নের মধ্যে লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠিত। (Lenlnism is Marxism of the era of imperialism. To be more exact, Leninism is the theory and practice of the proletarian revolution in general the theory and tactics of the dictatorship of the proletariat, in particular"—Stalin : The Foundations of Leninism.)

লেনিন অনেক কিছু করে যেতে পারেননি (অবশ্যই অকালমৃত্যুর জন্যে) অনেক কিছু দেখেও যাননি (যেমন বর্তমানকালের সংশোধনবাদের শাসক শক্তিতে দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমশঃ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণ ইত্যাদি) আবার একই কারণে লেনিন অনেক কিছু বলেও যাননি (যেমন আণবিক অতিশক্তির যুগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ও বিপ্লবের সমস্যা ইত্যাদি)। শোধনবাদেরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের বাস্তব নির্দেশকে রূপায়ণের (সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের যুগের সাধারণ ও বিশেষ দ্বন্দ্বগুলিকে অনুধাবণের ভিত্তিতে) মধ্যে দেখা দিয়েছে মার্কসবাদের নতুন বিকাশ। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে সর্বহারার একনায়কত্বের বর্তমান অবস্থা—যে সব দেশে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের অনেকগুলোতেই আজ নয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যার আক্রমণ সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত; সে সব দেশেও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জটিল ও কঠিন সংগ্রামের হাতিয়ার এই মাও বিজ্ঞান।

অতএব, সর্বহারা বিপ্লবের সামনে সমস্যা। এর আগে কখনই এত জটিল এত কঠিন ছিল না যেমনটি হয়েছে আজ। মরীয়া সাম্রাজ্যবাদের হাতে মহাবিধ্বংসী আণবিক অস্ত্র নিশ্চয়ই রাশিয়ায় ও পূর্ব ইউরোপে শোধনবাদের বিজয়যাত্রাকে সহজ করে তুলেছিলো, সচ্চা মার্কসবাদের পক্ষে একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু দেশে দেশে শোধনবাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ফলে সর্বহারার রণনীতি ও রণকৌশল এক নতুন অচেনা স্তরে প্রবেশ করলো; কেন না, শোধনবাদী রাষ্ট্র ও রাজনীতি ক্রমশঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বহারার আন্দোলনের ভেতরে ও বাইরে তার সংহতি ও প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হলো; যখন নতুন শ্রেণীভিত্তিতে (নয় বুর্জোয়া) তারা নতুন এক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার (সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ) পৃথক পৃথক ও

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

ওয়াক্‌ফ ছাত্রাবাস

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

লোমেন মিত্রকে বলে ওদের তাড়িয়ে ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য, দুবছরে ঐ সংখ্যালঘু ছাত্রাবাসে দুবার সাম্প্রদায়িক হামলা হয়ে গেছে। হোস্টেলটি সারাবার জন্য এবং কিছু কামরা বাড়াবার যে প্রস্তাব ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাও নাকচ করে দিয়েছেন। হোস্টেলে একদল ছাত্র নামে অভিহিত বাসিন্দা দশ বছর আগে পাশ করে এখনও সিট দখল করে আছেন। ফলে নতুন ছেলেরা ভর্তি হতে পারছে না। পুরনো বাস্তু ছেলেদের চক্রান্তে কংগ্রেসী হামলা হচ্ছে বলেও ছাত্র সমিতির মীনহাজ শেখ দর্পণকে জানিয়েছেন। শিয়ালদহের কিছু দূরের জুবিলি ছাত্রাবাসটি ওয়াক্‌ফের হলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নামক কলেজ ঐ ঘর দখল করেছে। সংখ্যালঘু ছাত্ররাও বেপাত্তা।

রেলকর্মীদের দিল্লী অভিযান

সাধন গুহ

গত বাইশে এপ্রিল রাজধানী দিল্লীর বুকে প্রায় তিরিশ হাজার রেল শ্রমিক কর্মচারীর যে মিছিলটি পার্লামেন্ট অভিযান করে প্রধানমন্ত্রী রেলমন্ত্রী প্রমুখকে সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবী পেশ করল, দেশের বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলো সে খবর বেমালুম চেপে গেছে। দিল্লীর কাগজের অতি অবহেলিত কোণে দুচার লাইন খবর পরিবেশিত হলেও কলকাতার কোন কাগজে তার উল্লেখমাত্র নেই। এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ ধর্মঘট চলাকালীন অপপ্রচারের ঢক্কানিনাদ করে বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত কাগজগুলো যে চরিত্রিক বৈশিষ্ট প্রকাশিত করেছে তাদের কাছে সঠিক সংবাদপ্রাপ্তির আশা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। কিন্তু গত বছরের আটই মে থেকে এই বছরের আটই মে এই এক বছর ধরে যে গোটা দেশে রেলকর্মী বিক্ষোভ ক্রমশই আর এক বিস্ফোরণের মুখে এসে যাচ্ছে দিল্লীর এই মিছিল তার উজ্জ্বল নজির।

অবিস্মরণীয় দৃশ্য

ঢেউ শুধু দিল্লীর রাজপথে নয়, ঢেউ গোটা দেশের প্রতিটি রেলকর্মীর বুকে। উনিশে এপ্রিল এগার নং আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে ইস্টার্ণ রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের যে অংশ হাওড়া থেকে যাত্রা করেন তাঁদের সঙ্গে আমি যোগ দিই বর্ধমান ষ্টেশনে। সে এক দৃশ্য। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল স্লোগান। টি সি ও টি টি ই-সহ অসংখ্য রেলকর্মী এসে জড় হলেন গাড়ীর সামনে। জড় হলেন অপেক্ষারত যাত্রীর দল। একজন বর্ষীয়ান টি টি ইর অশ্রু ছলছল চোখ। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করতে না পারার বেদনা তার বুকে।

চীনের পার্টি লাইন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

যুদ্ধ অক্রমণের মোকাবিলা করার উপযোগী তত্ত্বগত, সংগঠনগত ও রণনৈতিক বিজ্ঞান স্বাভাবিক কারণেই শ্রমিক শ্রেণীর জানা ছিল না। একে উদ্ভাবন করা, আয়ত্ত করা উন্নত-করা ও বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে যে নেতৃত্বকে ইতিহাস চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলো মাও সেতুঙ তারই যোগ্য উত্তর। তাই তো সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক রাজনীতি পর্যন্ত তার অক্ষম আক্রোশে আজ অসাড় (কাগুজে বাঘ)।

তাই আমরা দেখি, লেনিনবাদ যেমন সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদ, সেই একই অর্থে মাও সে তুঙের চিন্তা (বাদ) সাম্রাজ্যবাদের শেষ অবস্থা ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

পটনা, দানাপুর আরা, বক্সার মোগলসরাই, চুনার, এলাহাবাদ কাণপুর, আলিগড় সর্বত্র সেই একই দৃশ্য। কলকাতার প্রতিনিধিরা গাইছিলেন, বড় মধুর শোনাচ্ছিল সুরে বেঁধে নেওয়া তাদের তিনটি স্লোগান "মাঙ হমরা জয়েস হ্যায় ভুলো মৎ ভুলো মৎ। ছিনকর ইয়ে মাঙ লেনা হ্যায় ভুলো মৎ ভুলো মৎ। লড়াই হমারা জারী হ্যায় ভুলো মৎ ভুলো মৎ।"

ভুলতে পারবনা শিবাজী পার্কের সেই দৃশ্য যেখান থেকে শুরু হয়েছিল মিছিল। কনট সার্কাসের মোড় থেকে রাস্তাটা একেবারে ঢালু হয়ে নেমে এসে আবার মিন্টো ব্রিজের নীচ থেকে উঁচু হয়ে এসে মিশেছে ভবভূতি মার্গে। এখানেই শিবাজী পার্ক। লাল ফেষ্টুনে একাকার বিভিন্ন অঞ্চলের মিছিলগুলো যখন এ পথ ধরে আসছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন এগিয়ে আসছে টুকটুকে লাল ঢেউয়ের মালা গাঁথা এক অনমনীয় শপথদৃপ্ত সাত্বিক ভবিষ্যৎ। এ যেন এক সমাসন্ন ঝড়ের সংকেত। ধর্মঘটের এক বছর পর আর এক সংগ্রামের ডাক।

"মাঙ মিলেতো কাম করেঙ্গে ঔর না চাক্কা জাম করেঙ্গে", "দেখো ইন্দিরাকে খেল, মাঙে রোটি ভেজে জেল", "ইন্দিরা তেরি লাঠি গোলী বদখ লিয়া দেখেঙ্গে" "এক ধাক্কা অউর দো রেলবে বোর্ডকো টোর দো" "বেটা বানাওয়ে কার মা বানাতা বেকার" "ছু ছু ইন্দিরা হায় হায়"—এসব ছিল সারাপথ জুড়ে মিছিলের স্লোগান। ভারতীয় রেলের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সংগ্রামী শপথে দৃপ্ত তাদের মুখ। বরখাস্ত সহ কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে নেবার প্রতিজ্ঞায় তারা অবিচল। মিছিলে অংশগ্রহণকারী শতকরা ষাটজনই ছিলেন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। কথা বলেছি ইজ্জত নগরের আর কে সাকসেনা, কিষেণগড়ের এল কি ব্যাস, উদয়পুরের হীরা সিং, বম্বের মদন যেশী প্রমুখ অনেকের সঙ্গে। সকলের মুখেই এক কথা। রেল কর্মীদের ঐক্য জোরদার করতে হবে, "সংঘর্ষ সমিতিকে" (এন সি সি আর এস) বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রেল ধর্মঘটের এক বছর পর ভারতীয় রেল শ্রমিকদের এই মনোবল, এই ঐক্যবোধ না দেখলে অনুভব করা যায় না। বেইমানী আর বিশ্বাসঘাতকতার শাণিত কৃপাণে বিদ্ধ হয়ে ধর্মঘট মাঝপথে প্রত্যাহৃত হলেও ভারতবর্ষের রেল শ্রমিক কর্মচারীরা যে শালপ্রাংশু মহীরুহের মতোই অনতিশির দিল্লীর এই মিছিল আর একবার সে কথা প্রমাণ করেছে। কিন্তু?

এন সি সি আর এস
ঐক্যের প্রতীক

কিন্তু, এ আই আর এফ-এর নেতৃবৃন্দ সে সত্যকে অস্বীকার না করলেও এটাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়নি। বোট ক্লাব ময়দানের দীর্ঘকালীন সমাবেশে জর্জ ফার্ণান্ডেজ অত্যন্ত মামুলীভাবে দু একবার এন সি সি আর এস-এর উল্লেখ করেছেন মাত্র। তাঁর ভাষায়, "ইউনিয়ন কমজোর হো যায়তো তব্ সংঘর্ষ সমিতি জিন্দা রহেগা?" না মিঃ ফার্ণান্ডেজ, ইউনিয়ন কমজোরী হলে সংঘর্ষ সমিতি সত্যিই বেঁচে থাকবেনা। কিন্তু, সংঘর্ষ সমিতিকে গৌণ রেখে ইউনিয়নকে জোরদার করেও কি ভারতীয় রেলের বিভিন্ন স্তরের সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীর সমাহার ঐক্যকে বজায় রেখে নতুন এবং বলিষ্ঠতর কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব? তা যে সম্ভব নয়, অতীতে বারবার তা প্রমাণিত হয়েছে। এ কথা ঠিক যে, বাইশে এপ্রিলের এই অভিযানের উদ্যোক্তা এ আই আর এফ। এবং একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, এই সমাবেশে রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের নেতারা তাদের সাংগঠনিক কথাই প্রধানত বলবেন, কিন্তু যেহেতু এ আই আর এফ রেলকর্মীদের প্রাচীনতম সংগঠন এবং যেহেতু এ আই আর এফ সভাপতি জর্জ ফার্ণান্ডেজই এন সি সি আর এস-এর কেন্দ্রীয় কনভেনর সেইহেতু রেলকর্মী সংগ্রামে এন সি সি আর এস এর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে পুরোপুরি নীরবতা অংশগ্রহণকারী রেলকর্মীদের অনেককেই বেদনাহত করেছে। এমন কি, ফার্ণান্ডেজ এন সি সি আর এস এর যে জাতীয় কনভেনশন কলকাতায় হবার কথা, সে সম্পর্কেও কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। অথচ, এন সি সি আর, এস কে চূর্ণ বিচূর্ণ করার সরকার সি পি আইয়ের যৌথ চক্রান্ত সম্পর্কে যে তারা অনবহিত তাতো নয়।

বোট ক্লাবের অদূরেই রেলভবন। এখানেই চুয়াত্তর সালের দশই এপ্রিল থেকে তিরিশে এপ্রিল পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে চলেছে এন সি সি আর এস-এর প্রতিনিধিদের আলোচনা। এখন সরকার যখন বলছে যে, তারা এন সি সি আর এস-এর সঙ্গে আলোচনা করেনি তার প্রতিবাদ কি ফার্ণান্ডেজের পক্ষ থেকে। আসা উচিত ছিলনা? এটা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে, এন সি সি আর এস হচ্ছে রেলকর্মী সংগ্রামের বজ্রদৃঢ় ঐক্যের প্রতীক। ভারতীয় রেল একই সঙ্গে দেশের বৃহত্তম শিল্প এবং বৃহত্তম পরিবহন শিল্প। অতএব, এই শিল্পশ্রমিক সংগ্রামকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলছে ও চলবে এবং সেই ষড়যন্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ করতে হলে চাই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। একমাত্র এন সি সি আর এসই পারে সেই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। এ আই আর এফ এই স্পষ্ট সত্যকে পদদলিত করবে কিনা একমাত্র তার ওপরই নির্ভর করবে তাদের ভবিষ্যত। ভারতের এই বৃহত্তম পরিবহন শিল্পের বিশ লক্ষ কর্মীর সংগ্রামের তীব্রতার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর শ্রমিক আন্দোলনের ভবিষ্যত সাফল্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দলীয় রাজনৈতিক মুনাফা নয়

চুয়াত্তর সালে রেলকর্মী ধর্মঘটকে পুঁজি করে কংগ্রেস এবং সি পি আই দল যেমন রাজনৈতিক মুনাফা অর্জনে তৎপর পক্ষান্তরে কোন কোন বামপন্থী দলও এ থেকে দলীয় রাজনৈতিক মুনাফা অর্জনে জোর দিয়েছে বেশী। ফলে এন সি সি আর এস-এর সংহতি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রসংগত ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী) এবং এস ইউ সি দলের কথা উল্লেখ করা যায়। এই দলের মতে ধর্মঘট মাঝপথে প্রত্যাহৃত হওয়ার জন্য সি আই টি ইউ এবং সি পি আই এম প্রধানত দায়ী। এমনকি, এদের দলীয় পত্রিকায় লোকো রানিং স্টাফ এসোসিয়েসনকে সি পি আই এম প্রভাবিত আখ্যা দিয়ে এই সংগঠনের ওপর সরকারী আক্রমণকে প্রশস্তভাষায় করতে এবং রেল শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে এরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। এস ইউ সি দলের প্রীতিশ চন্দের উপস্থিতিতেই কিন্তু চুয়াত্তর সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত এন সি সি আর এস-এর এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার অর্থ রেলকর্মীদের পরাজয় নয়। বরং নতুন এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের ঐক্য দৃঢ়তর হয়েছে। এর পরও, এস ইউ সি দলের পক্ষ থেকে রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতার চিত্রাঙ্কন নিঃসন্দেহেই রহস্যজনক। আমরা ইতিপূর্বে রেল ধর্মঘটের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে রেলকর্মী ঐক্যের কথা বারবার বলেছি। এখনও বলছি। দলীয় রাজনৈতিক মুনাফা নয়, ব্যাপকতর এবং বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলুন। সংগ্রাম তীব্রতর হলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে কারা শ্রমিকের পক্ষে এবং কারা বিপক্ষে।

ইণ্ডিয়া মেসিনারীতে লুণ্ঠনের মহড়া চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দাশনগরে শিল্পপতি আলামোহন দাস প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী বর্তমানে আই আর সি আই কর্তৃক দুর্বল শিল্প সংস্থা হিসাবে অধিকৃত হলেও পুরনো মালিক শ্রেণী ও বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের চক্রান্তে বর্তমানে পুনরায় অচল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

আই আর সি আই কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করবার পর যে কয়েকজন সুযোগ্য অফিসারের উপর কারখানা পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয় তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় ও শ্রমিক ইউনিয়নের সহযোগিতায় কারখানাটির স্বনির্ভরতার পথে অগ্রগতির পরিচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দুই বৎসর কালের মধ্যেই কোম্পানীর উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংস্থাটির কোন নতুন লগ্নী নেওয়ার প্রয়োজন হয় নি। একমাত্র যে সমস্ত ছিদ্রপথে সংস্থাটির লাভের টাকার একাংশ কালো পথে অন্যত্র হস্তান্তরিত হত তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে কোম্পানীর প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য পূর্বতন ব্যবস্থা দালালী প্রথা বন্ধ করার ফলে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়।

স্বভাবতই সৎ অফিসারদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। ফলস্বরূপ শ্রীআর এন ঝানাজী, অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, তার দায়িত্ব থেকে অপসৃত ও কর্মচ্যুত হয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে ফিনানসিয়াল কন্ট্রোলার, লিয়াসোঁ অফিসার ইন্টারনাল অডিটর প্রভৃতি সৎ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে অপসারণ করে ঐ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তাদের লুঠপাটের রাজত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৎপর হয়। গত বছর পূজার আগে কয়েক হাজার টাকার স্টীল প্লেট কোম্পানী আয়রণ স্টীল কন্ট্রোলারের বরাদ্দ মারফৎ পেয়েছিল। অথচ ঐ সময়ে কাঁচা মাল হিসাবে জয়েস্ট দরকার ছিল। নতুন করে জয়েস্ট কেনার টাকা কোম্পানীর হাতে না থাকায় পারচেজ কমিটির সভায় ও শ্রমিক ইউনিয়নের পূর্ণ সম্মতিসহ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে অপ্রয়োজনীয় কাঁচা মাল যা স্টকে আছে তাহা সরকারী নির্ধারিত মূল্যে বদলে (এক্সচেঞ্জ) জয়েস্ট সংগ্রহ করা হোক। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু থাকে, কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান বাঁচানো ও আশু ছাঁটাই সম্ভাবনাও ঠেকানো সম্ভব হয়। অধিকন্তু শ্রমিকদের আঠার শতাংশ বোনাস দেওয়া সম্ভব হয়। প্রায় বারো লক্ষ টাকা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয়, কোম্পানীর চরম সংকট মুহূর্তে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মন নিয়ে অফিসারবৃন্দ যে ব্যবস্থা নিলেন তা বর্তমান চেয়ারম্যানের সমর্থন পেলো না। বরং ঐ সমস্ত সৎ অফিসারদের বিতাড়নের জন্য তিনি (চেয়ারম্যান) ও তাঁর সহযোগী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠলেন। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নোত্তরে আমরা জানতে পারি যে পূর্বে উল্লিখিত বিনিময় পদ্ধতি সম্বন্ধে সি বি আই তদন্ত চলছে। প্রশ্নোত্তরকালে ইস্পাতমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব মাননীয় সদস্যদের জানিয়েছেন যে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

জেলে বন্দী হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

শুক্রবার শেষরাত থেকে শনিবার ভোরের মধ্যে ভেতর পর্যন্ত হাওড়া জেলে এই সরকারের পুলিশ ও জেল কর্মচারীরা, সি পি আই (এম এল)-এর কর্মীসমেত ব্যাপক বন্দীদের ওপর লাঠি বন্দুক চালিয়ে পাঁচজনেরও বেশি রাজনৈতিক বন্দীকে হত্যা করেছে। গুরুতর আহতের সংখ্যাও অনেক। বন্দুকবাজ এই সরকার যে ব্যাপক গণহত্যার প্রকাশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারই জের জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ করে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার ঘটনাগুলো। দমদম, মেদিনীপুর বহরমপুর জলপাইগুড়ি আসানসোল বর্ধমান আলিপুর সেন্ট্রাল আলিপুর স্পেশ্যাল সমেত প্রায় প্রতিটি জেলে গত পাঁচ-সাত বছরে এই সরকার শ্বেতসন্ত্রাস চালিয়ে কয়েকজন কমিউনিস্ট বিপ্লবীকে হত্যা করেছে। সরকারের পাঁচটি অঙ্গুলেই এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা মাফিক চালু আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইংরেজ আমলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের একত্রিশ সালে মেদিনীপুরের হিজলী জেলে গুলি-চালনার মতো অসংখ্য বর্বর অত্যাচারকেও এই সরকারের দমন-পীড়ন অনেক ক্ষেত্রেই ছাপিয়ে উঠেছে। মেহনতী জনগণের ওপর দমনপীড়নের ঘৃণ্য হাতিয়ারগুলো জেলের মধ্যে আরও জোরালো। আমরা প্রেসিডেন্সী জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং ইন্দিরা সরকারের অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছি।

ঐ নিহত যুবকরা আলিপুর কোর্টে বিচারাধীন ছিলেন। তা সত্ত্বেও কোন "প্রশাসনিক কাজের সুবিধার" জন্য তাদের একে একে আলিপুর সেন্ট্রাল, প্রেসিডেন্সী প্রভৃতি জেল থেকে বদলি করে, কয়েক মাস আগে হাওড়ার মতো একটি ছোট জেলে একসঙ্গে রাখা হয়েছিল, এবং কি উদ্দেশ্যে ও কাদের নির্দেশে সে কথা কি আজ এই সরকার জনসাধারণের কাছে গোপন রাখতে পারবে? এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর শনিবারের রক্তাক্ত ভোর, হাওড়া জেলে রেখে গেছে, অর্থাৎ একমাত্র হত্যা করার উদ্দেশেই এ কাজ করা হয়েছিল।

বেয়নেট খুবই ধারালো এবং গুলী গুলীই—এ কথা আমরা চার দেয়ালের মধ্যে ভালই জেনেছি। কিন্তু এটাই সব নয়। ইতিহাস বড় নির্মম বিধাতা। সারা দেশব্যাপী অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাবার পরেও আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে, সেই "নির্মম বিধাতার" প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হবে না, তবে আপনারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। গুলী ফাঁসীকাঠ অথবা কারাগার, এর কোনটাই ভারতবর্ষের মানুষকে কোনদিন সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে নি।

প্রেসিডেন্সী জেলে আটক
রাজনৈতিক বন্দীরা

মতামত

পরীক্ষকদের গাফিলতি

আমি চুয়াত্তর সালের বি এ পার্ট ওয়ানের একজন নিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিলাম। আমার ঐচ্ছিক বিষয় দুটি ছিল—সংস্কৃত ও দর্শন। সংস্কৃতের প্রথম পত্রে আটত্রিশ নম্বর পেয়ে আমি অবাক হয়েছি। সাধারণত সংস্কৃত প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ও ছন্দমূলক প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট মোট পঁয়তাল্লিশ নম্বরের ঠিকমত উত্তর দিতে পারলে অঙ্কের মত নম্বর পাওয়া যায়। পরীক্ষার পর আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ছন্দমঞ্জরীর সাহায্যে জানতে পারলাম যে পঁয়তাল্লিশ নম্বরের মধ্যে পঁয়ত্রিশ নম্বরের আমি সঠিক উত্তর দিয়েছি। তাই যদি হয় তাহলে কি বাকি পঞ্চাশ নম্বরের মধ্যে আমি মাত্র তিন নম্বর পেয়েছি?

দ্বিতীয়ত দর্শনের দ্বিতীয় পত্রে বিয়াল্লিশ নম্বর পেয়ে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। কারণ যেভাবে আমি উত্তর দিয়েছি তাতে আমি আশা করেছিলাম এ বিষয়ে আমি ফার্স্ট ক্লাশের বেশি নম্বর পাব। ইংরেজী সম্পর্কেও আমার একই বক্তব্য।

এ অবস্থায় আমার মনে হচ্ছে শিক্ষাটা যেন প্রহসনতুল্য। একদিকে গণটোকাটুকি, অন্যদিকে এক শ্রেণীর পরীক্ষকদের গাফিলতির ফলে পরীক্ষার্থীদের পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ
বসিরহাট মহাবিদ্যালয়

ভিয়েনতিয়েনে প্রচণ্ড মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ

প্যাথেট লাও বাহিনীর অগ্রগতি

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

মুক্তিযুদ্ধের বিরাট বিরাট সাফল্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশগুলির এক নম্বর দুশমন এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চলে গেলেও এখনো এই অঞ্চলের নানা দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বহু ঘাঁটি আছে। এখনো লাওসে ভিয়েনতিয়েনে দক্ষিণপন্থী শক্তি রয়েছে। কিছুকাল পূর্বে অবশ্য লাওসে ভিয়েনতিয়েনে দক্ষিণপন্থী নিরপেক্ষ ও বামপন্থী প্যাথেট লাওয়ের মধ্যে শান্তিচুক্তি মারফৎ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চুক্তি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভিয়েনতিয়েনে দখলদার দক্ষিণপন্থী শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওকালতি করছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও লাওসের এই প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটিকে নানাভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে। সুখের কথা, লাওসের বামপন্থী শক্তি পূর্বাপেক্ষা সজাগ।

নয়ই মে খাস ভিয়েনতিয়েনে কয়েক হাজার মানুষ যে ধরণের বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তা সবিশেষ উল্লেখ্য। হাজার হাজার মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে মার্কিন দূতাবাসের সামনে যান এবং দূতাবাস লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়েন। ফলে দূতাবাস-ভবন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা মার্কিন পতাকা টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন। তাঁরা ভিয়েনতিয়েনে ইউ এস এড সংস্থার দপ্তর বন্ধ করার দাবী করেন। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংস্থার আড়ালে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের নীতি চালাচ্ছে। এছাড়া তারা লাওসের ভিয়েনতিয়েন সরকারের পাঁচজন দক্ষিণপন্থী মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেছেন। ভিয়েনতিয়েনে বামপন্থী শক্তির এতবড় বিক্ষোভ সম্প্রতিককালের উল্লেখ্য ঘটনা। জাতীয় সংহতি সংক্রান্ত গণসংগঠনা এই দিন ভিয়েনতিয়েনে স্টেডিয়ামে একসভা করে। এই সমন্বয় কমিটিতে লাওসের একুশটি গণসংগঠন রয়েছে। লাওসের বামপন্থীরা তিন দিন ভিয়েন তিয়েনের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

কয়েকদিন পূর্বে লাওসের প্যাথেটলাও বাহিনী ভিয়েন তিয়েনের একশ তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর মুংকাশি মুক্ত করেছে। আধঘন্টার কম সময়ের মধ্যে এই শহর দুটি মুক্ত হয়। সামরিক দিক থেকে এই দুটো শহরের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার ফলে ভিয়েনতিয়েনস্থিত দক্ষিণপন্থীদের বড় বড় চাঁইরা লাওস ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

অমর ভিয়েতনাম

সাতই মে দক্ষিণ ভিয়েতনামের হো চি মিন শহরে এক বিশাল সমাবেশ হয়। প্রশাসক ত্রাণ ভান তা তার ভাষণে ভিয়েতনাম জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের উজ্জ্বল দিকগুলো তুলে ধরেন। দিয়েন বিয়েন ফুর পতনের পর এই সায়গন পতনের ঘটনা ভিয়েতনামীদের জীবনে সবচেয়ে বড়

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

ঘটনা। ১৯৫৪ সালের আটই মে দিয়েন বিয়েন ফুর পতনের পর হো চি মিন ভিয়েতনামবাসীকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের জয় সুদূর প্রসারী। কিন্তু এ সবে শুরু।"

আজ সায়গনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েতনামের জনগণের বিজয়ের এক পর্যায় শেষ হল। ভিয়েতনামের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের একটি বড় নিদর্শন। ভিয়েতনামের ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী এক বিবৃতিতে বলেছেন, "ভিয়েতনামের সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং অন্যান্য ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ।" ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ত্রিংশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত প্রস্তাবে ভিয়েতনামের বীর বিপ্লবী পার্টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, "ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত লাল ফৌজ ও বিশ্বজনগণের মিলিত মোর্চার ঐতিহাসিক জয়ের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হয় অবসান। এই বিজয়ের ফলে উদ্ভূত হয়েছে একের পর এক সমাজতান্ত্রিক দেশ যার ফলে গড়ে উঠেছে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।" ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধের শিক্ষা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যালকাটা মেরী মেকার্স অভিনীত 'ছোবল'

(দর্পণের সমালোচক)

শুধুমাত্র সত্য কথাটি সাহসের সঙ্গে বলাই নয়, সেই সত্যকে বিশ্বস্ত কাহিনীর মোড়কে সময়োচিত বাস্তবতার নিরিখে উপস্থিত করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ক্যালকাটা মেরী মেকার্স তাদের "ছোবল" নাটকের প্রযোজনায়। দলীয় তথা ব্যক্তিস্বার্থে তথাকথিত সমাজবিরোধীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল তৈরী করা যাদের কাজ, তাদের নৃশংস পৈশাচিক উল্লাসের অনেক গভীরে গিয়ে নাট্যকার সারথী আবিষ্কার করেছেন সাম্প্রতিককালের খুনজখমের নেতৃত্ব দিচ্ছে কারা? তথাকথিত প্রচারমুখী নাটকের সাধ্যে কুলোবে না ঠিক এমনভাবে প্রযোজনার কোন গুণগত উৎকর্ষ ছাড়াই শুধুমাত্র নাট্যকাহিনীর সত্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠতার জোরে দর্শককে অনুপ্রাণিত করা।

সত্যি কথা বলতে মেরী মেকার্সের প্রযোজনার আনুষঙ্গিক দিকটা গৌণ। মস্তান মাণিকের চরিত্রে নীলমণি সেনের অভিনয় ছাড়া দলগত অভিনয়, মঞ্চস্থাপত্য (থিয়েটার সেন্টারের মতো মঞ্চে সুযোগও কম) বা আলো প্রযোজনার সামগ্রিক রসকে ঘনীভূত করতে পারেন নি নির্দেশক পিকলু নিয়োগী। আরো অনুশীলন এবং প্রয়োজনীয় মাত্রা সংযোজনের জন্য মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। নাহলে নাটকে উপস্থাপিত দুঃসাহসের মন থাকে না। নাটকের নামকরণও দুর্বল।

সায়ক : অভিশপ্তা

সায়ক নাট্যসংস্থার "অভিশপ্তা" একটি মঞ্চসফল প্রযোজনার সম্মান পাবে। অভিনয় ও আঙ্গিকের একটি

নাট্যাভিনয়

হৃদয়গ্রাহী সমন্বয় ঘটেছে এ প্রযোজনায়। কুসংস্কারের চাপে প্রেমের সফল পরিণতি থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রীতা নামে একটি মেয়ের অন্ধবিক্ষয়ের চরমসীমায় পৌঁছনোর কাহিনীতে নাটকীয়তার গতানুগতিক মেজাজ থাকলেও শিবানী ভট্টাচার্য, স্বপনা মিত্র ও সরোজদের সংযত অভিনয় প্রযোজনার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

মৃত্যুদণ্ড রদ করার দাবী

অন্ধ্র রাজ্যের মুর্শিরাবাদ জেলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দুজন নকশালপন্থী কর্মী কেষ্টগোদ এবং ভূমাইয়ার গত এগারই মে ফাঁসী হয়ে যাবার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইনগত কারণে তা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ঐ দুই রাজনৈতিক কর্মীর ফাঁসীর আদেশ রদের দাবী জানিয়ে বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন, বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক উৎপল দত্ত এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক মিত্র গত বারোই এপ্রিল ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেছেন।

অপর একটি বিবৃতিতে এই মৃত্যু দণ্ডাদেশের তীব্র বিরোধিতা করেছেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি।

পুলিশ নিষ্ক্রিয়

দমদম এলাকার মার্কসবাদী কর্মী অরবিন্দ গুহরায়কে গত আঠাশে এপ্রিল যে রকম নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এমের চব্বিশ পরগণা জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রভাস রায় অপরাধীদের শাস্তি দাবী করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেছেন যে পুলিশ সমস্ত ঘটনা জানা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয়। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। অথচ হত্যাকারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিজয়ী ভিয়েতনামের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে চীনের নেতাদের অভিনন্দন বাণী

সুওয়েন হু থো, : দক্ষিণভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি

হুইন তান ফাট, : রাষ্ট্রপতি, দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার,

তন ডাক থাঙ, : রাষ্ট্রপতি, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র,

লে হুয়ান, : প্রধান সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি,

ফ্রয়োং চিন, : চেয়ারম্যান, স্ট্যাকিং কমিটি, ভিয়েতনাম জাতীয়সভা,

ফ্যাম ভান দং, : প্রধানমন্ত্রী, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র,

—সমীপেষু,

দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈনিক ও অসামরিক জনগণ দীর্ঘকাল সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ক্রীড়নক সরকারকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস সাধন করেছেন এবং চূড়ান্তভাবে সায়গনকে মুক্ত করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের ও সমগ্র ইন্দোচীনের জনগণের দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক সশস্ত্র অবিচলিত সংগ্রামের এটা এক বিরাট বিজয়। চীনের জনগণ এইসব আনন্দ সংবাদে নিরতিশয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের সরকার ও চীনের জনগণের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের মুক্তিফ্রন্ট ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার, ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সরকার তথা উত্তর ও দক্ষিণের সমগ্র ভিয়েতনামী জনগণকে আমাদের উষ্ণতম অভিনন্দন ও সর্বোচ্চ অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

নিজেদের পিতৃভূমির স্বাধীনতা ও জাতির মুক্তির জন্য ভিয়েতনামের বীর জনগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, সংগ্রামের ও বিজয়ের এবং রাষ্ট্রপতি হো চি মিন-এর সমুজ্জ্বল পতাকা উচ্চে তুলে ধরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে গেছেন, পরিচালনা করেছেন অবিচল ও চরম সুকঠিন সংগ্রাম দশকের পর দশক ধরে, একের পর এক পরাভূত করেছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের আয়োজিত বিশেষ যুদ্ধবিগ্রহ, আঞ্চলিক যুদ্ধ ও ভিয়েতনামীকৃত যুদ্ধবিগ্রহকে এবং অর্জন করেছেন একের পর এক সুমহান বিজয়। পারিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরবর্তী নূতন পরিস্থিতিতে পারিস চুক্তি লঙ্ঘনের অপরাধের বিরুদ্ধে, জাতীয় সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করে সায়গনের ক্রীড়নক চক্র আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মদত পেয়ে নির্বিচারে জনগণকে হত্যার যে তাণ্ডব চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালিয়ে ভিয়েতনামের জনগণ এখন প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছেন এবং সমগ্র ভিয়েতনামকে মুক্ত করে চমৎকার বিজয় অর্জন করেছেন। আপনাদের এক নূতন যুগের ভিয়েতনামের মুক্তির যুগের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে এবং তার এক বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে। আপনাদের বিজয় সংগ্রামরত সকল নিপীড়িত জাতি ও জনগণকে নিদারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈপ্লবিক লক্ষ্যের সামনে তা প্রতিষ্ঠা করেছে এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভিয়েতনামী জনগণের বিজয় নূতন একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে একটি জনগণ তা তারা ক্ষুদ্র একটি দেশের জনগণ হলেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও মুক্তি অর্জনের ন্যায্য লক্ষ্য সাধনে ও জাতীয় মুক্তি অর্জনে যতক্ষণ তারা সংগ্রামে রুখে দাঁড়াবেন, অস্ত্রহাতে নিয়ে ন্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে একটা অন্যায় যুদ্ধের মোকাবিলা করবেন, অবিচলিতভাবে সংগ্রাম করে চলবেন, কোন বাধাবিপত্তিকেই আমল দেবেন না, কোন আগ ও পিছুহটাকেই পরোয়া করবেন না ততক্ষণ তাদের পক্ষে যে কোন বাইর থেকে আপাতদৃশ্যমান শক্তিশালী শত্রুকে সুনিশ্চিতভাবে পরাজিত করা সম্ভব এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা সম্ভব।

চীন আর ভিয়েতনাম ঠোঁট আর দাঁতের মতো নিবিড়ভাবে বিজড়িত প্রতিবেশী এবং আমাদের দুটি জনগণ সহযোদ্ধা ও ভাইয়ের মতো বাধাবিঘ্ন, দুঃখবিপত্তি ভাগ করে এসেছি। আমরা চীনের জনগণ সব সময়ই ভিয়েতনামের জনগণের সংগ্রামকে মনে করে এসেছি আমাদের নিজেদের সংগ্রাম হিসাবে, তাঁদের বিজয়কে মনে করে এসেছি আমাদের নিজেদের বিজয় হিসাবে। অতীতের দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক সংগ্রামে আমাদের জনগণ একে অন্যকে সমর্থন ও উৎসাহ জ্ঞাপন করে এসেছে। আগামী দিনগুলোতেও, চীনের জনগণ অবিচলিতভাবে ভিয়েতনামের জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আমরা ঐকান্তিকভাবে আশা করি, ভিয়েতনামী জনগণ তাদের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে নূতন ও মহত্তর একটানা বিজয় অর্জন করে চলবেন। সুনিশ্চিতভাবে গড়ে তুলবেন স্বাধীন, মুক্ত, ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ এক নূতন ভিয়েতনাম।

মাও সে-তুঙ; চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় কমিটি; চীনের কমিউনিস্ট পার্টি;

চুতেহ; চীন গণসাধারণতন্ত্রের জাতীয় গণকংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান;

চৌ এন-লাই; প্রধানমন্ত্রী; চীন গণসাধারণতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদ।

পিকিং

৩০শে এপ্রিল ১৯৭৫

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা

কল্যাণ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ বোধকরি বেকারী। লক্ষ লক্ষ যুবক এই রাজ্যে কর্মহীন। যৌবনের এই দারুণ অপচয় পৃথিবীর আর কোথাও হয় বলে আমাদের জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখতে বোধহয় ভুলে যাচ্ছে। জীবনের সিঁড়ি বেয়ে তারা ওপরে উঠতে চায়না। তারা শুধু চায় একটি কাজ। বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম জীবিকা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের কাছে বেঁচে থাকার সব রাস্তা প্রায় বন্ধ। দপ্তরে দপ্তরে "নো-ভ্যাকান্সির" নোটিস যেন মুখ থিঁচিয়ে আছে কর্মহীন বেকার যুবকদের দিকে। চাকুরী নেই। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত। বিচিত্র এই দেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত যুবকদেরও কোন ভবিষ্যত নেই। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয় হাজার হাজার ছাত্র। এরা স্নাতক। কিন্তু ছাত্র জীবন শেষ হবার পরে তাদের সামনে থাকে বিরাট এক জিজ্ঞাসা—অতঃ কিম? জীবনের কোন রাস্তায় তারা যাবে? কি উপায়ে সংসার প্রতিপালন করবে? আর তাদের জীবনের সব চাইতে বৃহত্তম আকাঙ্খা নিজের জন্য ছোট্ট একটি সংসার, শান্তির নীড়, জীবনের নিভৃত অবকাশ, হয়তো কোনদিনই আসবেনা।

মিথ্যাই তারা ছোটে অফিসে এমপ্লয়মেন্টে এক্সচেঞ্জের সামনে পড়ে দীর্ঘ লাইন। একটা কেরাণীর কাজ, জীবনের দুর্লভ প্রত্যাশা। তবু চাকুরী মেলে না। কেবল কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কাগজপত্রে চাকুরীপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে চলে দিনের পর দিন। তবু জীবনযুদ্ধে পরাজিত, ক্ষত বিক্ষত পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা আশা ছাড়েনা। অফিসে অফিসে ধর্ণা দেয় একটা কেরাণীর পদের জন্য। নিদেনপক্ষে একটা পিওন বা দপ্তরীর পদ পেলেও তা স্বর্গলাভের সমান। থাকলই বা ললাটে আঁকা সদ্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। ওটা আজ আর তাদের কাছে উপাধি নয়, জীবনের নিষ্ঠুর প্রহসন। কেরাণী দপ্তরী পিওন কোন পদ খালি নেই। কেবল নৈরাশ্য, হতাশা আর ক্লান্তি। ভয়ঙ্কর এক সর্পীসুপের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে এই দেশের যুব সমাজকে। সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজ আজ অবক্ষয়ের পথে। যুব সমাজের মধ্যে আছে যে উচ্ছৃঙ্খলতা উগ্র রাজনীতির প্রতি ঝোঁক, অসহিষ্ণুতা, হয়তো তা এই নৈরাশ্য ও হতাশার একটি অভিব্যক্তি মাত্র। রাষ্ট্রের কাছে, সমাজের কাছে কিছুই না পেয়ে এই অভিশপ্ত যুবকের দল বোধ হয় ক্রোধে ফেটে পড়তে চায়। দামাল শিশুর মতো সামনে যা পায় তা ভেঙে ফেলতে চায়। কিছু না পাওয়ার আক্রোশে আঘাত করতে চায় সকলকে। আমরা ওদের ক্রোধটাকেই বড় করে দেখি, ওদের বেদনা উপলব্ধি করি না। করি না বলেই ওদের এই শিশুসুলভ আচরণের উপর এন্টে দিই উচ্ছৃঙ্খলতার লেবেল।

পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ার স্নাতকরা চাকুরী পায়না। ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন ও আশা নিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ছাত্ররা পাঠ আরম্ভ করেছিলেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে তাঁরা দেখলেন তাদের জন্য কাজ নেই। মহাকবি সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডির চেয়েও এই অবস্থা আরও মর্মান্তিক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে এই দেশের মানুষ আশা করেছিলেন তাঁদের বংশধররা জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে। শিক্ষা কেবল উপাধির মধ্যে সীমিত থাকবেনা। শিক্ষাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হবে দেশ গঠনের কাজে। বিশেষভাবে সমাদৃত হবে প্রযুক্তিবিদ্যা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর সিকি শতাব্দী পার হয়ে গেলো, অথচ এ দেশের শিক্ষিত যুবকরা কাজ পান না। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, গত উনিশশো একাত্তর সালে উনিশ হাজার ইঞ্জিনীয়ার স্নাতক চাকুরীর সন্ধান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ভয়াবহ। একটা কেরাণীর পদ খালি হলে হাজার হাজার চাকুরীর আবেদন পত্র জমা পড়ে। এই সব চাকুরী প্রার্থীদের মধ্যে থাকেন উচ্চমাধ্যমিক থেকে এম এ এম এস সি পাশ যুবক।

একটা স্কুল মাষ্টারি জোটানোও যেন দুঃসাধ্য তপস্যা। স্নাতক যুবকেরা একটা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতা পাবার জন্য হাজার হাজার আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী ক্রমশই মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। ওটা যেন জীবনের একটা ভার বোঝা। ওটা না থাকলে হয়তো রাস্তায় ফিরিওয়ালার কাজও করা যেত। কিন্তু স্বাভাবিক সংকোচের জন্য যুবকরা ঐ কাজও করতে পারছেন না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একদা বাঙালীকে ব্যবসা করবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই উপদেশ ঋষির আপ্তবাক্য হয়ে আছে। বাস্তবের চিত্র ভিন্ন। কি নিয়ে বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসা করবে? ব্যবসা করতে গেলে প্রারম্ভিক পুঁজি চাই। সে পুঁজি আসবে কোথা থেকে? সরকার অবশ্য ছোটখাট ব্যবসা করার জন্য ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু লালফিতার বন্ধন ছিঁড়ে সেই ঋণ বের করার অলৌকিক ক্ষমতা কজন বাঙালী যুবকের আছে জানি না। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সরকারী হিসাবের খাতা থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে শহরের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এগারো লক্ষ। সরকারী মতে পশ্চিমবঙ্গে মোট বেকার সংখ্যা আঠাশ লক্ষ, কিন্তু বে-সরকারী হিসাবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ। এই বিপুলসংখ্যক বেকার নিরুপায় হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকার ছাড়াও আছে শিল্প-শ্রমিক বেকার সমস্যা। গত পঁচিশ বছর ধরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বহু পরিকল্পনা আর কমিটির সমীক্ষা চালানো হয়েছে। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হয় নি, হয়েছে টাকার শ্রাদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক বছর ধরে শিল্পক্ষেত্রে চলেছে মন্দা। বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। লক-আউট লে-অফ ক্লোজারের ফলে ছাঁটাই হয়েছেন অসংখ্য শ্রমিক কর্মচারী। ফলে শিল্পক্ষেত্রেও চলছে বেকারী।

ইণ্ডিয়া মেসিনারী

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

নেওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে ঐ ঘটনার সুযোগ নিয়ে বর্তমান চেয়ারম্যান ফিনানসিয়াল কন্ট্রোলার লিয়াসোঁ অফিসার ও ইন্টারনাল অডিটর প্রভৃতিকে অপসারণের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন।

ইতিমধ্যেই একজন নতুন ফিনানসিয়াল কন্ট্রোলারকে পরিচালক মণ্ডলীর বিনা অনুমতিতেই নিযুক্ত করা হয়েছে। যতদূর জানা যায় এই নতুন ফিনানসিয়াল কন্ট্রোলার বর্তমান চেয়ারম্যানের সর্বশেষ পরিচিত ও আত্মীয়স্বজন। আরও জানা গেছে শীঘ্রই তার এক নিকট আত্মীয় কোম্পানীর উৎপাদিত দ্রব্যাদির সেলিং এজেন্ট নিযুক্ত হতে যাচ্ছেন।

চেয়ারম্যানের কোম্পানীর স্বার্থ বিরুদ্ধ কাজের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর বিক্ষোভ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। যে কোন মুহূর্তেই বিস্ফোরিত হতে পারে। ইন্ডাসট্রিয়াল কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনের এবার তৎপর হওয়া দরকার।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উনপঞ্চাশতম সম্মেলন বিগত নয়, দশ ও এগারোই মে উলুবেড়িয়া কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে শিক্ষা ও শিক্ষকদের আন্দোলনের নানা সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শিক্ষাজগতের দুঃসহ নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সহ সকলেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনাচক্রে প্রবীণ শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায় সহ বহু শিক্ষাবিদ অংশ গ্রহণ করেন

এবারের কর্মকর্তা নির্বাচনে কার্যকরী কমিটিতে বামপন্থী প্রতিনিধিরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। শাসক কংগ্রেস ও সি পি আই প্রার্থীরা সমিতিকে পাশ কাটিয়ে প্রশাসনের বেনামিতে কাজকর্ম করার মূল্য হিসাবে সাধারণ শিক্ষকদের বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে পরাজিত সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন।

প্রধান জোটবহির্ভূত শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে কার্যকরী কমিটিতে অধ্যাপক প্রভাস সিংহ ও সুধীন্দ্র চক্রবর্তীর জয়লাভ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু আন্দোলনের সামগ্রিক প্রয়োজনে কর্মকর্তা নির্বাচনে সার্বিক ঐক্যের নীতি সকলেই মেনে নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে সভাপতি, অধ্যাপক সন্তোষ মিত্র ও অমিতোষ চক্রবর্তীকে সহ-সভাপতি এবং দিলীপ চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেছেন।

নূতন বেতনহারের সুষ্ঠু প্রয়োগ, বিভিন্ন কলেজের নানাবিধ সমস্যা, নৈহাটী কলেজের জনৈক শিক্ষকের পদচ্যুতির চক্রান্ত, বিরাটী কলেজের তরুণ অধ্যাপক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারারুদ্ধ করে চাকরীতে যোগদানে বাধাদান প্রভৃতি নানা সমস্যা নিয়ে সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমিতির সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে ঐকমতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। সংবিধান তিন মাসের মধ্যে সংশোধন করে সমিতির নির্বাচন পদ্ধতির বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সম্মেলনের প্রকাশ্য পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ার মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। শিক্ষকদের বেতনক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা, শিক্ষা বিষয়ে নানা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সেন-র‍্যালে গোষ্ঠীর মালিকদের শ্রমিকবিরোধী কার্যকলাপ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সেন র‍্যালে গোষ্ঠীর মালিকরা এখনও শ্রমিকবিরোধী কার্যকলাপে তৎপর রয়েছেন। কল্যাণী এবং আসানসোলে অবস্থিত সেন র‍্যালের কারখানাগুলির পরিচালন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশীর ওপর চলছে। উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ থেকে এই কারখানা এক বছর বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তারপর ব্যাঙ্ক ও আই আর সির সাহায্য নিয়ে কারখানা আবার চালু হবার পর আজ আবার কর্তৃপক্ষ নতুন সংকট সৃষ্টি করে অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছেন।

সাতমধ্যে কল্যাণীতে তিরিশ জন কর্মীকে লে-অফ করা হয়েছে। আরও আড়াইশো জনকে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আসানসোলেও তিনশো আশী জন ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

এই অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন? আই এন টি ইউ সি পরিচালিত সেন পণ্ডিত এাণ্ড এঞ্জিনিয়ারী এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন যে বন্ধের পর কারখানাগুলি পুনরায় চালু হবার সময় ষ্টেট ব্যাঙ্ক, আই আর সি আই, আই এফ সি আই ও অন্যান্য সূত্র থেকে বাহাত্তর লক্ষ টাকা ঋণ পাওয়া সত্ত্বেও সেন র‍্যালে কর্তৃপক্ষ প্রচার করে চলেছেন যে কোম্পানীর প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোচ্ছে না। কিন্তু কেন? এই সময়ের মধ্যে কোন শ্রমিকের অসহযোগিতার কোন ঘটনা ঘটে নি সাইকেলের চাহিদা স্বদেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও বিস্তৃত। উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ারও কোন কারণ নেই। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এম এল এ জগদীশ দাস জানান: কল্যাণীর ও কল্যাণীর কারখানাকে নির্জীব করে রাখা হয়েছে। এখানকার মূল্যবান মেশিনপত্র ও দক্ষ কর্মীদের ঠিকমত ব্যবহার করা হচ্ছে না। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই দুটি কারখানায় উৎপন্ন হতে পারে এমন অনেক যন্ত্রপাতি ইচ্ছাকৃতভাবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে আমদানী করা হচ্ছে। কল্যাণীর বিভিন্ন শাখায় প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার মালপত্র অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে।

পুলিশী জুলুম

লেভি আদায়ের নামে যে অন্যায় জুলুম চলছে তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের সংবাদ এসেছে আমাদের দপ্তরে। ঘটনাটি ঘটেছে চব্বিশ পরগণা জেলার কাকদ্বীপে। সংবাদে প্রকাশ, যে, কাকদ্বীপের অনিল সর্দার, কেশব সর্দার, খগেন সর্দার ও মধু সর্দারের নামে লেভির নোটিশ জারী করে বলা হয় যে এরা জোতদার এবং তেতাল্লিশ একর জমির মালিক। কিন্তু উপরোক্ত ব্যক্তিরা জানায় যে তেতাল্লিশ একর জমি তাদের নেই হয়তো মান্ধাতার আমলে কোনদিন ছিল এই বলে তারা লেভি দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। কোন কিছু বিবেচনা না করেই এদের মিসায় আটক করা হয়। এরকম পুলিশী জুলুমের সংবাদ আরো কয়েক জায়গা থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রতিবাদপ্রতিরোধ আন্দোলন

এ ছাড়া আরো অভিযোগ পাওয়া গেছে যে আটষট্টি সাল থেকে কারখানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই বাধ্যতামূলক জমাপ্রকল্প বাবদ টাকা পয়সা নিয়ে তা যথাস্থানে জমা দেন নি। ইউনিয়নের নেতাদের ধারণা, কোম্পানীর তরফ থেকে কানপুর ও বোম্বেতে বাড়ী তৈরীর যে পরিকল্পনা চলছে যেখানে অন্য একটি কারখানা খোলা হবে বলেই এই কারখানাগুলির প্রতি ঔদাসীন্য। এই সংকটজনক অবস্থার প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং অবিলম্বে এই কারখানাগুলিকে জাতীয়করণ করে শ্রমিক কর্মচারীদের অনিশ্চিত অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করার দাবী জানিয়েছেন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন।

অন্যদিকে সিটু পরিচালিত সেন পণ্ডিত এঞ্জিনিয়ারী ইউনিটস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সুবোধ গাঙ্গুলী জানিয়েছেন: বাজার মন্দার অজুহাতে কর্তৃপক্ষ বিগত বছরগুলিতে শ্রমিক কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার ও সুযোগ সুবিধাগুলি বন্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ক্যান্টিনের সুযোগ ও চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ। বর্ধিত ডি এ-ও দেওয়া হচ্ছে না। অপরদিকে প্রায় নিয়মিতই কংগ্রেস দলের এম এল এ ও নেতাদের নির্দেশে লোক নিয়োগ চলছে। এই সব নবনিযুক্ত কর্মীদের কর্তৃপক্ষ আন্দোলন ধ্বংস করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

কারখানা খোলার সময় গরিষ্ঠ সংখ্যক শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধি সি আই টি ইউ নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়নের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি হয়েছে। আজ সেই ইউনিয়নের সম্পাদক সুবোধ গাঙ্গুলী ও বারোজন নেতৃস্থানীয় কর্মী কংগ্রেসীদের গুণ্ডামীর জন্য কাজে যেতে পারছেন না।

আরো অভিযোগ যে আই আর সি আইয়ের দুজন মনোনীত ব্যক্তি নানাভাবে কোম্পানী থেকে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করছে। সেন র‍্যালে গোষ্ঠীর সঙ্গে আই আর সি আইয়ের গোপন আঁতাতের সূত্র এই ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হত্যার তদন্ত দাবী

সম্প্রতি হাওড়া জেলে পাঁচজন বন্দীদের পলায়ন এবং সংঘর্ষের অজুহাতে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবী করেছেন অষ্টরাম নেতৃবৃন্দ। সম্মিলিত এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন সরকারী যুক্তি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিরপেক্ষ তদন্ত হলে কংগ্রেসের নৃশংস চেহারা ফুটে উঠবে। তদন্তের সময় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বন্দীদের সাক্ষ্য একান্ত প্রয়োজন।

নাট্যকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন

অযৌক্তিকভাবে পৌরকর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিভিন্ন নাট্য ও সংস্কৃতিক কর্মীরা নাট্যকর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে মিছিল সহ পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন গত আঠাশে এপ্রিল। কর্তৃপক্ষ বিবেচনার জন্য সময় চেয়েছিলেন এক সপ্তাহ। প্রায় একমাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পৌর কর্তৃপক্ষ নীরব। জানা গেছে সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জীও বিষয়টির গুরুত্ব সহকারে ভাবছেন। তিনিও নাকি এই আকস্মিক কর বৃদ্ধি সমর্থন করেন না।

এদিকে সুবিবেচনার ইঙ্গিত না পাওয়া পর্যন্ত নাট্যকর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। আগামী তেইশে মে শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় পৌরকর্তৃপক্ষের এই উদাসীনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতি নেবার জন্য নাট্যঅঙ্গনে (হিন্দী সিনেমার বিপরীতে) নাট্য কর্মীদের এক সমাবেশ আহ্বান করা হয়েছে।

'সংস্কৃতি'র উৎসব

চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান "সংস্কৃতি" গত দশই মে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সংস্থার সপ্তদশ বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে সারা রাত্রিব্যাপী গণসংস্কৃতির আসর বসানো হয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীবৃন্দ ও অন্যান্য লোকশিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সংস্থার সদস্যরা কবি নিমাই মাম্মার নির্দেশনায় সুনীল দত্ত "শেকল ছেঁড়ার গান" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন—দিলীপ মাম্মা (মহারাজ অবন্তী) কৃষ্ণ কোঙার (দেবতোষ), অশোক দে (প্রিয়তোষ), সমীর মাম্মা (নরপ্রিয়), উৎপল মাম্মা (জয়ন্ত কাশী দে (বিদূষক) কেলু দোয়ারী (দেবাচার্য), বরাল পাত্র (শ্রেষ্ঠী) বিল্ল পাত্র (শংকরাদিত্য) অমিয় মাম্মা (তাঁতী), প্রভাত মালী (কর্মকার) অশোক কোঙার (ঘাতক), নদু দোয়ারী (ব্রাহ্মণ), প্রশান্ত মাম্মা (প্রথম শাস্ত্রী) উত্তম পাত্র (দ্বিতীয় শাস্ত্র) এবং জনতার চরিত্রে রূপ দেন পল্টু দোয়ারী, স্বরূপ মাম্মা ভৈরব কোঙার ক্ষুদী মাজী, উত্তম মাম্মা প্রেমাংকুর মাম্মা প্রমুখ। নাটকটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গোপাল রাণা। সংস্থার সভাপতি কবি নিমাই মাম্মা গণসংস্কৃতির ওপর সুদীর্ঘ আলোচনা করেন এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হোতে বলেন। ইন্টারন্যাশনাল পরিবেশনের সঙ্গে উৎসবের কাজ শেষ হয়। কয়েক হাজার মানুষ সারারাত্রিব্যাপী এই অনুষ্ঠান আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করেন।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

"সাংস্কৃতিক সংকটের এই ক্লান্তিময় সময়ে নিষ্ক্রিয়তাকে আমরা অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করি।" এই কথা ঘোষণা করে এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নিয়ে হুগলীর নবজাত সাংস্কৃতিক সংস্থা "ঐহিক" যাত্রা শুরু করেছে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের সামাজিক ভূমিকা। প্রবন্ধ জমা দেবার শেষ তারিখ একত্রিশে মে। ঐহিকের নামে নীচের যে কোন ঠিকানায় লেখা জমা দেওয়া যেতে পারে: সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা দুই নং চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা তেরো; বিবেকানন্দ বুক হাউস, পূর্ণানন্দ সরণী, মিশনপাড়া, রহড়া; নিউ মেডিকেল স্টোর্স, স্টেশন রোড রহড়া।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস

৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১৩

ফোন: ২৪১৯৪৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৩০শে মে ১৯৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

সঙ্কটের আবর্তে রাজ্য কংগ্রেস কিন্তু যেমন চলছে তেমনি চলবে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের নেতারা কারো কথায় কর্ণপাত করে নি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাদের কাছে বন্ধ প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। অরুণ মৈত্র তরুণকান্তি ঘোষ ও সুব্রত মুখার্জী বন্ধ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাণী যুব ও ছাত্র নেতাদের গতিবিধির খোঁজ না পাওয়ার জন্য তাদের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দিতে পারেন নি বলে প্রচার করা হয়েছে। অতএব বন্ধের ডাক অব্যাহত ছিল। ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের দাবী বন্ধ সফল। এদিকে বিরোধীরা বলছেন বন্ধ ব্যর্থ হয়েছে। সরকারী মহল থেকেও একথাই প্রচার করা হচ্ছে। এখন শুধু সাগ্রহে লক্ষ্য করার বিষয় যে, সাতই জুনের বন্ধ প্রত্যাহার করা হয় কিনা।

বন্ধকে কেন্দ্র করে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস বর্তমানে দুই বিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজের গদি বজায় রাখার জন্য চিরকালই দুই নৌকোয় পা দিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা পুরোপুরি সম্ভব হয় না বলে কখনও প্রিয়-সুব্রত গোষ্ঠীকে আস্কারা দিচ্ছেন, আবার কখনও লক্ষ্মী-বারিদ গোষ্ঠীকে কোলে তুলে নিচ্ছেন। এটা নির্ভর করছে দুই গোষ্ঠীর বারগেনিং ক্ষমতার ওপর। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এন এল সি সির সম্মেলনে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যাপারে লক্ষ্মীকান্ত বসু ইত্যাদির প্রতি একটু বেশি ঝুঁকেছিলেন। তাঁর পক্ষে সেটাই কাল হয়েছে। তাই সুদীপ-কুমুদের এত আস্ফালন।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

লোড-শেডিং ও দর্পণ

প্রায় প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা করে ছাপাখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার জন্য প্রতি সপ্তাহে দর্পণ প্রকাশে বিলম্ব ঘটছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি পড়লে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিভিন্ন অঞ্চলে লোড-শেডিং করছে। আর যেহেতু সব ব্যাপারেই এখন দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বই নিয়ম সেইজন্য লোড-শেডিংয়ের ব্যাপারেও একই অবস্থা চলছে। অতএব পাঠকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমাদের আর কি করার আছে?

সি পি এম সহ বামপন্থী কর্মীদের ওপর নতুন আক্রমণ শুরু হয়েছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ভয়ে শঙ্কিত কংগ্রেস এখন বামপন্থী দলগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। এই আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য, জুন মাসে আটটি বামপন্থী দলের নেতৃত্বে ধর্মঘট সহ আন্দোলনের যে ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তা বানচাল করে দেওয়া। এই কাজে কংগ্রেসের প্রধান সহায়ক সি পি আই।

এরই মধ্যে জলপাইগুড়ি মেদিনীপুর ও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে সি পি এম সমর্থক ও কর্মীদের ওপর ব্যাপক আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়িতে সি পি এমের পার্টি অফিস কংগ্রেসের গুন্ডাবাহিনী আক্রমণ করে এবং জ্বালিয়ে দেয়। সি পি এম সমর্থক রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চলছে। মেদিনীপুরেও জোতদার কংগ্রেসের গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশের ত্রিমুখী আক্রমণ চালান হয়েছে এই দলের কর্মী ও সমর্থক চাষীদের ওপর।

একই অবস্থা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে। অনেকদিন ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে থাকার পর যে সব পার্টি কর্মী বাড়িতে ফিরেছিলেন তাদেরকে আবার এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচই জুন জয়প্রকাশের নেতৃত্বে যে মহামিছিল বেরুবে তাতে যাতে বেশী সংখ্যায় মানুষ যোগ দিতে না পারে তার জন্য নানারকম শলা-পরামর্শ চলছে কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে। এ কাজে ওরা প্রশাসনের সাহায্যও নেবেন।

প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, এই মিছিল সংগঠিত করার কাজে মিছিলের সমর্থক দলীয় কর্মীদের বাধা দেওয়া হবে। তাছাড়া সাধারণ মানুষকে নানারকম ভয় দেখিয়ে মিছিলে যোগদান করা থেকে বিরত করা হবে। এ কাজে নিযুক্ত করা হবে এলাকার পরিচিত সমাজবিরোধীদের যাতে বাস লরি ও ট্রেনে করে মিছিলে যোগদানকারীরা না আসতে পারে। বাসের মালিক ও রেলকর্তৃপক্ষের সাথেও কথা হয়েছে। দরকার হলে গ্রাম থেকে শহরে আসার সমস্ত যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কংগ্রেসের বি টীম সি পি আইও কোমড় বেঁধে নেমে পড়েছে আট বামের আন্দোলনকে বানচাল করতে ক্ষমতার অংশীদার না হয়েও কংগ্রেসের নির্ভেজাল দালালী করার সুবাদে যে ছিটেফোটা সরকারী সুযোগ সুবিধা দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্ব পাচ্ছেন তা হারানোর ভয়ে ওরা ভীত। নিজেদের সীমিত শক্তিতে আট বামের আন্দোলনকে রোখা যাবে না এ কথা সি পি আই নেতৃত্বের জানা। তাই

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী অ্যাড হকের দাবী জানাতে দিল্লী যাচ্ছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর তিন এম এল এ রাজ্য কংগ্রেস কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে এ্যাড হকের দাবী জানাতে জুন মাসের প্রথম দিকে দিল্লী যাবেন বলে জানা গেল। এই তিন এম এল এ হচ্ছেন, সোমেন মিত্র, বারিদবরণ দাস ও পঙ্কজ ব্যানার্জী।

বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অভিমত বর্তমান নেতৃত্ব রাজ্যের সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে দলে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র নিজেই গোষ্ঠী স্বার্থে কাজ করছেন। এবং দলের মধ্যে ফ্যাক্টারী সৃষ্টি করেছেন।

এই গোষ্ঠীর অভিযোগ, বর্তমান নেতৃত্ব আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকলে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন লড়া যাবে না। কারণ অন্যান্য গোষ্ঠীর মনোনীত না হলে যোগ্য প্রার্থীকেও নির্বাচনে দলের টিকিট দেওয়া হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে কেন্দ্রে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ানোর প্রবণতা বাড়বে। আর তাতে করে নির্বাচনে দলের সরকারী প্রার্থীর জয় অনিশ্চিত হয়ে উঠবে এবং সামগ্রিকভাবে নির্বাচনে বিপর্যয় দেখা দেবে।

এই গোষ্ঠী হাইকমান্ডের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে খুবই উৎসাহিত। সম্প্রতি এ আই সি সি সাধারণ সম্পাদক নরসিংরাও হুগলী ও উত্তর কলকাতার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পাল্টা জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মনোবল দারুণ ভাবে বেড়ে গেছে।

এই গোষ্ঠী মনে করছে দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে রাজ্যের সংগঠনিক অবস্থা ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারলে সুফল পাওয়া যাবে।

জানা গেছে রাজ্যের কংগ্রেস নেত্রী এবং এ আই সি সির অন্যতম সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী কেন্দ্রের নেতাদের সঙ্গে তিন যুব নেতার বৈঠকের প্রাথমিক কাজগুলো সেরে রাখছেন। পূরবী মুখার্জীর চূড়ান্ত নির্দেশ পেলেই নেতারা দিল্লী রওনা হবেন।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে

জনৈক ছাত্রকে বেদম প্রহার ও গালাগাল দেওয়ার অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার গায়ে নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের এককালে প্রচুর সুনাম ছিল। এখন নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে ছাত্রদের এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে।

সম্প্রতি একটি সাংঘাতিক ঘটনার কথা জানা গেছে। দশ বছরের একটি ছেলে দেবাশীষ সেন নরেন্দ্রপুরের স্কুল থেকে বাড়ী ফিরেছে। দেহে প্রচন্ড প্রহারের নানা বীভৎস চিহ্ন নিয়ে। মুখের ডান দিকটা প্রায় সবটাই অসাড় হয়ে গেছে। সারা শরীরে ছড়া ছড়া কালশিরের দাগ।

বিদ্যালয়ের জুনিয়র সেকশনের বর্তমান প্রধান শিক্ষক হলেন অমল মহারাজ। বারীন ব্রহ্মচারী অপর এক শিক্ষক। এরা ছাত্রদের অনেককেই "শুয়োরের বাচ্চা" বলে ডাকেন। আর কথায় কথায় বেদম প্রহার করেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে।

দেবাশীষের বাবা অনেক আশা নিয়ে ছেলেকে নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন। ছেলে দেবাশীষ মেধাবী, দমদমের কোন এক স্কুলে পড়ত। বছর বছর প্রথম হয়ে এক ক্লাস থেকে অপর ক্লাসে উঠেছে।

পঞ্চম শ্রেণীতে এই বছর ভর্তি হয়েছে প্রবেশ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ক্লাসে পড়াশুনায় সেরা। মাঝে মাঝে যে সব পরীক্ষা ইতিমধ্যে হয়েছে তাতে তার মেধার প্রমাণ মেলে।

কিন্তু অমল মহারাজ তাতে খুশি নন। তিনি "শুয়োরের বাচ্চা" বলে সবাইকেই সম্বোধন করেন আর মারধোর করেন।

বাচ্চাদের মধ্যে তিনি এক গোয়েন্দাবাহিনী তৈরী করেছেন। বাবা মা বা আত্মীয় স্বজন দেখা করতে এলে ছেলেরা কি বলে তা গোপনে শোনার জন্য। যে সব ছাত্ররা মা বাবার কাছে অমানুষিক ব্যবহারের কথা জানায় তাদের আর রক্ষে নেই।

দেবাশীষের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এক রবিবারের ঘটনা। মা বাবা দেখা করতে এলে দেবাশীষ বলে তাকে বেদম প্রহার করা হয়েছে। ডান দিক গালে এমন চড় মারা হয়েছে যে, সে দিকটা প্রায় অবশ হয়ে গেছে।

অসম্ভব ব্যাপার। মা বাবা তখনই ছেলেকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ গররাজী। তখন পুলিশ আদালতের সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থার কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত দেবাশীষ বাড়ী ফেরে।

নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ে দেবাশীষের ও অন্যান্য ঘটনার উল্লেখ করে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু করেছেন বলে মনে হয় না।

এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার। আমাদের সব কিছুই ত যেতে বসেছে। মিশন বিদ্যালয়ের একটা সুনাম ছিল। মাত্র দু-একজন অযোগ্য ব্যক্তির জন্য এ সুনাম নষ্ট হবে কেন? অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

সম্পাদকীয়

বেপরোয়া লে-অফ ও ছাঁটাই

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে পরিস্থিতি রীতিমত উদ্বেগজনক। সঙ্কটের ধুয়া তুলে মুনাফাগৃধ্নু একচেটিয়া মালিকরা বেপরোয়া ছাঁটাই ও লে-অফ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় লক-আউটও ঘোষণা করা হচ্ছে। গত তিন মাসে এক লক্ষেরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী হয় ছাঁটাই, না হয় লে-অফ হয়েছেন। চটকল শিল্পগুলিতে সর্বাপেক্ষা বেশি ছাঁটাই লে-অফ। হিন্দ মোটরের চোদ্দ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ছ হাজার শ্রমিককে পালা-ক্রমে লে-অফ করা হচ্ছে। দীর্ঘ-কাল ধরেই সুতাকল শিল্পের দৈন্যদশা। এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা অধিকাংশ সময় কর্মহীন কিম্বা কাজ থাকলেও ঠিকমত বেতন পান না।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কারসাজি ও কংগ্রেস সরকারের সহযোগিতায় শিল্পে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্কটের দোহাই দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা একের পর এক কারখানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই আঠারোটি বড় বড় কারখানা অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে।

আসলে শিল্পে সঙ্কটের কথাটা অনেকাংশেই ব্লাফ। ১৯৭২ সাল থেকে সমস্ত জিনিসের দাম অর্থগৃধ্নু মালিকরা যে হারে বাড়িয়েছে শুধুমাত্র কয়েক গুণ বেশি মুনাফা লাভের জন্য (এর ওপর আছে কর ফাঁকি দেওয়া কালো টাকা) তাতে যদি উৎপাদিত মাল বাজারে তেমন ভাবে না বিকোয় তার দায়িত্ব কি শ্রমিকদের? তাছাড়া শ্রমিকদের রক্ত নিঙড়ে, তাদের পরিশ্রম সস্তায় কিনে যেখানে মালিকরা মুনাফার পাহাড় গড়ছে সেখানে মুনাফার পরিমাণ একটু হ্রাস পেলেই শ্রমিকদের ছাঁটাই লে-অফ করতে হবে এ কেমন কথা? আর "সমাজতন্ত্রের" জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কংগ্রেস সরকারই বা তা বরদাস্ত করেন কি করে? গত রবিবারের "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি সংবাদ থেকে উদ্ধৃতি দিলেই মালিকদের চেহারা উদ্ঘাটিত হবে। "যুগান্তরের" প্রথম পৃষ্ঠায় "ফিলিপসের ৭০০ কর্মী লে-অফ" শিরোনামে লেখা হয়েছে—"ফিলিপস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রায় ৭ শত কর্মচারীকে লে-অফ করেছেন। কর্তৃপক্ষ লে-অফের যে নোটীশ দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে মন্দার দরুণ উৎপাদিত মাল বিক্রয় না হওয়ায় কারখানা চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে।" অপরদিকে ঐ দিনেরই "যুগান্তরের" পঞ্চম পৃষ্ঠায় "ফিলিপস ইণ্ডিয়ার বিক্রী ও মুনাফা বেড়েছে" শিরোনামে লেখা হয়েছে—"১৯৭৪ সালে ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিঃ-এর বিক্রী ও মুনাফা দুই-ই উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। আগের বছরের তুলনায় বিক্রির অঙ্ক ২২ শতাংশ বেড়ে ৬১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা দাঁড়িয়েছে। মোট মুনাফার অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৭৩ সালে মুনাফার পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। ....এ বছর প্রতি শেয়ার বাবদ একটি করে বোনাস শেয়ার দেওয়া হচ্ছে। ফলে শেয়ার মূলধনের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা।" অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে যে-শ্রমিকদের সাহায্যে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ হয়েছে ১৯৭৫ সালে তাদেরই লে-অফ করা হচ্ছে।

এই হল মালিকদের চরিত্র। কিন্তু এদের শায়েস্তা করবে কে? কংগ্রেস সরকারের সে সাধ্য নেই। কারণ তারা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে। সামনেই নির্বাচন। টাকার দরকার। এই টাকা দেবে শহরের শিল্প-মালিকরা আর গ্রামের জোত-দাররা। তাই শ্রমিকদের পক্ষে লাগাতার সংগ্রাম ছাড়া বাঁচবার অন্য পথ নেই।

বন্ধ সমর্থন ও বিরোধিতার রাজনীতি

চাণক্য সরকার

কংগ্রেসের তরুণ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। কারণ, সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় নেতাদের হুমকী ও চাপ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের আন্দোলনের কর্মসূচীর প্রতি অন্ততঃ আংশিকভাবেও নিষ্ঠাবান ছিলেন। একই দলের অপর যে তরুণগোষ্ঠী এই আন্দোলনের বিরোধিতায় নেমেছেন তাঁরাও আন্দোলনকারী-দের বক্তব্যের সংগে একমত। তাঁদের বিরোধিতার কারণ আদিক নিয়ে, বিষয়বস্তুতে দুই গোষ্ঠীই একমত।

ওরা সকলেই মনে করে যে, সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভা গত তিন বছরে রাজ্যের কোন উপকার করতে পারে নি। বরং মানুষের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হয়েছে। এখন রাজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ সারা বছর দারিদ্র্য সীমার নীচে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে বাস করে।

দুপক্ষের তরুণ নেতৃত্ব জানে কিভাবে সিদ্ধার্থ রায় ক্ষমতায় এসে-ছেন। কত খুন জখম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মন্ত্রিসভা গদীতে বসেছে। কিন্তু লাভ কি হয়েছে? সিদ্ধার্থবাবু নিজের প্রতিপত্তি বাড়িয়েছেন। তিনি কেন্দ্রের কাছে প্রমাণ করেছেন যে, একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল পশ্চিমবঙ্গে এই অঘটন ঘটানোর। যুবশক্তির একাংশকে তিনি দলে এনেছেন এবং তাদের ডাণ্ডাবাজীতে বামপন্থীরা হটে গেছে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধার্থ রায়ের ক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়েছে প্রথম থেকেই। এখানে বিধাননগর কংগ্রেস অধিবেশন থেকে সুরু করে সব কিছুতেই সিদ্ধার্থবাবুর ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ হয়েছে। কেন্দ্রের প্রায় সমস্ত প্রভাবশালী কমিটির সদস্য তিনি।

রাজ্যে নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য তিনি তরুণ কংগ্রেসীদের মধ্যে সুরু থেকেই বিভেদের পথ বেছে নিয়েছেন। এমনভাবে মন্ত্রি-সভায় তরুণদের বেছেছেন যাতে গোষ্ঠীকোন্দল বাড়ে। আর এই কোন্দলে একবার এই গোষ্ঠী, পর-মুহূর্তেই অন্যগোষ্ঠীকে মদত জুগিয়ে দলের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া বাড়তে সাহায্য করেছেন।

এই সত্য আজ তরুণ কংগ্রেসী-দের দুই গোষ্ঠীই প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে। ওরা এখন বুঝছে যে, এই অবস্থা বেশীদিন চলতে দেওয়া যায় না। কারণ সাধারণ মানুষের সহ্যের সীমা আছে। কংগ্রেসের ভাবমূর্তি বলতে আর কিছুই নেই। সন্ত্রাস ছড়িয়ে বেশী-দিন লোককে ধরে রাখা যাবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের একগোষ্ঠী আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়। তাদের বক্তব্য: সিদ্ধার্থমন্ত্রি-সভা ব্যর্থ। জনগণের কোনও মঙ্গল হয় নি। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র রাজ্যের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরিবর্তে উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট সাহায্য দিচ্ছে না। মন্ত্রীরা জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন। ব্যাপক গণ আন্দোলনের চাপ ছাড়া মন্ত্রিসভাকে দিয়ে কোন কাজ করানো যাবে না।

রঙ্গদর্শন

তাই তারা সভা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক বন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে গণ আন্দোলন করতে চেয়েছে। উত্তর-বঙ্গে বন্ধ আংশিক হলেও উদ্যোক্তারা শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচীতে অবিচল থেকেছেন। সিদ্ধার্থবাবু বন্ধ বানচাল করার জন্য নানা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বন্ধ কর্মসূচী অন্ততঃ উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রত্যাহৃত হয়নি।

উদ্যোক্তাদের প্রথম সারির নেতা হলেন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র, দুই সাধারণ সম্পাদক সৌগত রায় ও নিত্যানন্দ দে, যুব কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছাত্র পরিষদ নেতা কুমুদ ভট্টাচার্য।

অপর দিকে নুরুল ইসলাম, প্রদীপ ভট্টাচার্য, লক্ষীকান্ত বসু, বারিদবরণ দাস, সোমেন মিত্র, পঙ্কজ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতারা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেও বন্ধ ডাকার বিরোধী। মুখে বলেছেন, বন্ধ আন্দোলনে কমিউনিউটদের গন্ধ আছে এবং বন্ধ রাজ্য অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক। আসলে এই গোষ্ঠী ভাবছে যে, আন্দোলন করে অপর গোষ্ঠী নিজে-দের শক্তি বৃদ্ধি করবে। তাই আন্দোলনের বিরোধিতায় ওরা নেমেছে উভয়পক্ষের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য।

সাধারণ মানুষ মোটামুটি বোঝে যে, শাসন ক্ষমতায় যারা আছে তাদের কল্যাণে গ্রামের জমির মালিকরা নানা কায়দায় ভূমিহীন চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে জোরদার একচেটিয়া পুঁজিবাদ চা, পাটশিল্প এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাসমূহকে প্রায় ধ্বংসের পথে এনে ফেলেছে। বড় জোতদার, চালকল মালিক একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দুই গোষ্ঠীকেই সমানে অর্থ সাহায্য করে চলেছে যাতে এ রাজ্যে আর আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে। কায়েমী স্বার্থের ধারণা যে, পয়সা কড়ি আর অন্যান্য সুযোগ সুবিধে দিয়ে যুব-শক্তিকে বিভক্ত রাখা যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক নানা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। দৈনিক সংবাদ-পত্রে ফলাও করে ছাপানো হচ্ছে কিভাবে যুব সম্প্রদায়, এমন কি ছাত্র ছাত্রীরা এখন ব্যাপক ভাবে দৈহিক সম্ভোগে গা ঢেলে দিয়েছে। এই দশকের সুরুতে যে সন্ত্রাস ছড়িয়ে ছাত্র যুব সমাজের নেতৃস্থানীয় কর্মী-দের হয় হত্যার নয় দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসের মাধ্যমে সমাজ জীবন থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যুব সম্প্র-দায়ের একাংশের সামরিক নৈরাশ্য। এই নৈরাশ্য থেকেই নানা বিকৃতি।

মহল্লায় মহল্লায় শুধু সহরে নয়, সুদূর গ্রামেও মানুষ অতিষ্ঠ। যত বকাটে ছোকরার দল পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতায় নেতা সেজে বসে আছে। এদের জীবিকার জন্যে কোন কাজকর্ম করতে দেখা যায় না। অথচ নানা কু-কাজে এদের টাকাকড়ির কোন অভাব হয় না।

এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না।

সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নদীয়া জেলার পাটুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সম্প্রতি পরপর কয়েকটি দাঙ্গা ঘটে গেছে। এখানকার অঞ্চল প্রধান পঞ্চানন ঘোষের নেতৃত্বে সমাজবিরোধীদের প্রকাশ্য অভিযান চলছে। এই জেলার বীরপুর হাটরা তেঁতুলবেড়িয়া মোটা প্রভৃতি গ্রামে কংগ্রেসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। নদীয়ার জেলা-শাসক সম্প্রতি ঐ অঞ্চল পরিদর্শনের পরেও দুজন আবার গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে। পাটুয়াডাঙা থানার সব দারোগার বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল। থানার বড়বাবু ডি জি চ্যাটার্জী জানাচ্ছেন যে তার সহকর্মীর বিরুদ্ধে এতসব কেস লেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

হাওড়া জেলে বন্দীহত্যার ঘটনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়া জেলে গত তেসরা মে বন্দী হত্যার কিছু সংবাদ আমাদের কাছে এসেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, জেলের ভেতরে নকশাল বন্দীরা ভিয়েতনাম বিজয় উপলক্ষে নিজেদের মধ্যে একটি সভা করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চায়, কিন্তু অনুমোদন না পাওয়ায় বন্দীরা নিজেদের দায়িত্বেই সভা করতে চায়। এই সভা করার ঘটনা নিয়েই জেলের ওয়ার্ডারদের সঙ্গে বন্দীদের বচসা হয়। জেল কর্তৃপক্ষ নেতৃস্থানীয় কিছু নকশাল বন্দীকে কারা আইনের সাহায্যে দোষী সাব্যস্ত করে ডান্ডা বেড়ি দিয়ে নির্জন সেলে বন্দী করতে চায়। বন্দীরা আপত্তি করে এবং সেলে যেতে অস্বীকার করে। তখন কারারক্ষী বাহিনী বলপ্রয়োগ করে। দীর্ঘদিন ধরে বিনাবিচারে আটক বন্দীরা এই অন্যায় আচরণের জন্য প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। জেলের অফিসাররা ঘটনাস্থলে এসে বন্দীদের বলেন নিজেদের ওয়ার্ডে ফিরে যেতে, কিন্তু বন্দীরা স্থান ত্যাগ করতে অস্বীকার করে। তখন অফিসারের আদেশেই বন্দীদের ওপরে শুরু হয় লাঠি চার্জ, ফলে কয়েকজন বন্দী বাধা দেয়। তখন অফিসারের আদেশে গুলী চালান হয়। স্থানীয় লোকজনের কথাতেও এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। জনৈক মহিলা বলেন যে, জেলের ভেতর থেকে আমরা অনেকক্ষণ ধরেই চীৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাই, গুলী চলে তারও অনেক পরে।

সরকার পক্ষ থেকে বলা হল যে, বন্দীরা পালাতে চেষ্টা করেছিল তাই গুলী চালনা হয়েছে। সরকারী ভাষ্য যে মিথ্যা তা তাঁদের বক্তব্যেই প্রমাণ। জেলের ভেতরে একমাত্র সেন্ট্রাল টাওয়ার ছাড়া আর কোথাও বন্দুক পাহারা থাকে না। জেলের প্রহরীদের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে যে বন্দুক থাকে তা রাইফেল নয়, মাস্কেট—যাতে একটির বেশী গুলি ভর্তি করা যায় না। যদি সরকারী ভাষ্যকেই আমরা মেনে নি তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, বন্দীরা পালাচ্ছিল হঠাৎ প্রহরী তাদের দেখতে পায়। বন্দীরা একের পর এক এসে বন্দুকের সামনে বুক পেতে গুলী খেয়ে মারা গেল। এ ঘটনা জনসাধারণকে বোকা বানানোর জন্য বলা হয়েছে। সরকার পক্ষের ধারণা যে জেলের নিয়ম কানুন সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়।

কিন্তু জেলখানার সঙ্গে পরিচয় আছে এমন মানুষও তো থাকতে পারে সাধারণ মানুষের মধ্যে একথা ভুলে গেলে চলবে কেন? যদি কোন কারণে জেলখানার পরিস্থিতি প্রহররত প্রহরীদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন বাঁশি বাজানো হয়. সেই বাঁশির আওয়াজে সোচ্চার হয়ে ওঠে জেলখানা এবং বেজে ওঠে পাগলাঘন্টি। পাগলাঘন্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গে জেলের প্রহরীরা বারাক থেকে ছুটে আসে জেলখানার প্রধান ফটকে এবং প্রবেশ করে জেলের ভেতরে এবং শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। তারপরে আসে জেলের অফিসারগণ এবং তখন বের হয় বন্দুক বাহিনী। এই হল জেলখানার ভেতরের নিয়ম। বর্তমানে অবশ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জেলখানার বাইরেও সশস্ত্র বাহিনীর পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে সব সময়ের জন্য।

সরকারী ভাষ্য যে কতদূর মিথ্যা এবং হাস্যকর হতে পারে, হাওড়া জেলে বন্দী হত্যার ঘটনার বিবৃতি তার আরও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলগুলিতে নকশাল বন্দী নিহতের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেল। আহত প্রায় শ চারেক। আর প্রত্যেক বারই এক কথা বলা হয়—"বন্দীরা পালাচ্ছিলো তাই গুলী চালাতে হয়েছে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য।"

হাওড়া জেলের বন্দী হত্যা নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ যে বিবৃতি দিলেন তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া গেল না রেডিওর সংবাদে। তাহলে কোনটা আসল? সরকারী ভাষ্য না রেডিও? সরকারী বিবৃতিতে বলা হয় বন্দীরা বোমা ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ করেছিল কারারক্ষীদের, কিন্তু আকাশবাণী কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে সরকারী বিবৃতির সমর্থন পাওয়া গেল না।

ভারতই বোধহয় একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে বিনা বিচারে যে কোন লোককে যতদিন খুশি জেলে আটক রাখা যায় এবং প্রয়োজনে তাদের হত্যা করতেও বাঁধে না।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা

ষান্মাসিক এগারো টাকা

ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা ঃ

৬১, মদ্ট লেন, কলি-১৩

পুলিশী অভিযানের নেপথ্যে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অতর্কিতে হানা দিয়ে নানা নির্জন সীমানা থেকে মদ্যপানরত এবং অশোভন আচরণরত তরুণ-তরুণীদের পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তারের খবরটা আজকাল প্রায়ই বাজারী সংবাদপত্রে শিরোনামা হচ্ছে। এমনকি, বিভিন্ন অভিজাত এস্টেটে হানা দিয়ে দুপুর বেলায় মদ্যপানরত গিন্নীদেরও নাকি পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। খবরে প্রকাশ যে, হাওড়া শিয়ালদা ইত্যাদি স্টেশনেও নাকি মহিলা হোমগার্ড নিয়োগ করে স্টেশন চত্বরে ভ্রষ্ট চরিত্র নারীদের হাতেনাতে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ইতিপূর্বে বহুবার বহুভাবে আমরা মহানগরীর আনাচে কানাচে, লোকের দ্বারে, বিভিন্ন রেস্তোরাঁয়, চৌরঙ্গীর মত রাজপথের ফুটপাতে প্রকাশ্য মদ্যপান এবং নারীদেহ মৃগয়ার বিভিন্ন কাহিনীর উল্লেখ করেছি। মন্ত্রিসভা কিংবা পুলিশের কানে জল যায়নি। হঠাৎ এই অভিযান শুরু করার পেছনে তবে কোন রহস্য বিদ্যমান? হাওড়া স্টেশনের পিলগ্রিম্‌স্ প্লাটফর্মের সাইডিংয়ে জি আর পির রেসিডেন্ট রেকগুলোতে ভ্রষ্টচরিত্র মেয়েছেলের দিবারাত্রি আনাগোনা এবং মধুচক্র-জনিত আড্ডার কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। হাওড়া স্টেশনের ভি আই পি প্লাটফর্মের সাইডিংয়ে সি আর পির রেসিডেন্ট রেকগুলোতেও আমরা একই দৃশ্যাবলীর কথা বলেছি। এমন কি, সি আর পি কর্তৃক প্লাটফর্মের প্রান্ত সীমানায় এই সব দেহপসারিনীদের প্রকাশ্যভাবে হাত ধরে টানাটানি এবং কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর কথাও বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। গয়া প্যাসেঞ্জার ইত্যাদি দূরপাল্লার গাড়ীগুলিতে নারীমেধ যজ্ঞের নিয়মিত অনুষ্ঠানের কথা আদৌ গোপন ঘটনা নয়। এসবই রেল পুলিশ এবং আর পি এফের সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্তের ভিত্তিতে চলেছে এবং চলছে। রেল সীমানার বাইরে যা চলছে সেখানেও পুলিশ নির্দিষ্ট প্রাপ্তির ভিত্তিতেই নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকছে। সম্প্রতি ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসীদের ঘরোয়া বিবাদের ফলে এসব কেচ্ছা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে উদ্ঘাটিত হচ্ছে এবং এর সঙ্গে অনেক পুলিশী কর্তার নামও জড়িয়ে গেছে। ফলেই, রাতারাতি অশালীন কার্যবিরোধী এই পুলিশী অভিযান সুরু হয়েছে।

বাহাত্তর সালে এই রাজ্যে সিদ্ধার্থবাবুর রাজত্ব কায়েম হবার পর থেকে কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস নামক ভৈরববাহিনী তো পঞ্চ ম-কারের পবিত্র সলিলে নিত্য অবগাহন করেই দিল্লীবাসিনী মা জননীর গরিবী হটাও মার্কা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ বীরবিক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ হোস্টেলগুলির অধিকাংশতেই কায়েম হয়েছে মদ্যপ এবং লম্পটদের রাজত্ব। কলকাতার এম এল এ হোস্টেলে মধুচক্রের বহু কাহিনী দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। তার কোন প্রতিকার হয়েছে কি? হয় নি। সেখানে হাত দিলে তো সিদ্ধার্থবাবুর গদী উল্টে যাবে।

এমন কি রাজনৈতিক অভিযোগে ধৃত নারী বন্দীদের ওপরও মাতাল পুলিশের অশালীন আচরণ কোন পর্যায়ে যেতে পারে অসীমা পোদ্দার তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রেসিডেন্সী

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

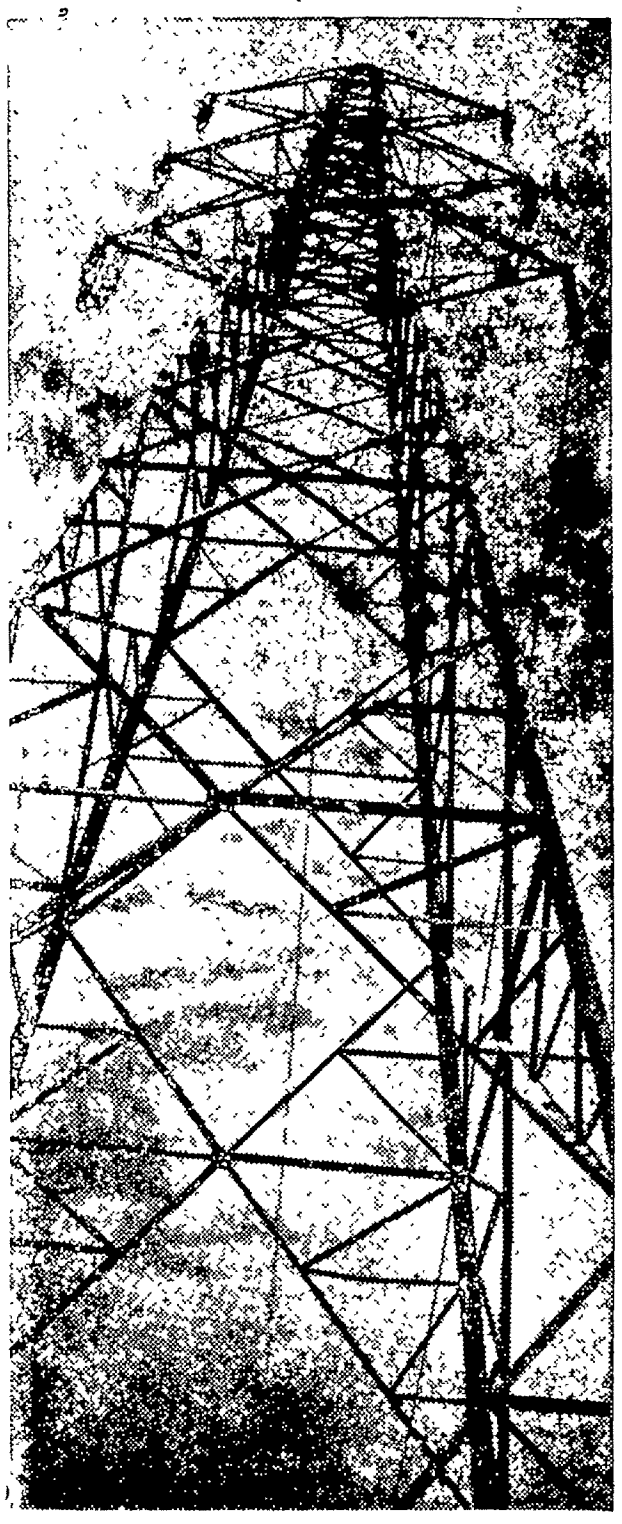

প্রগতির পথে ২০ বছর

আমাদের কুড়ি বছরের জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ১৯৫৫ সালে প্রায় শূন্য হাতেই আমরা কাজ শুরু করেছি এবং ব্যাণ্ডেলে আমাদের প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তার এক দশক বাদে। এরপর ১৯৭৪ সালে সাঁওতালডিহি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। গতমাস থেকে ২৫০ কি.মি. দীর্ঘ ২২০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে সাঁওতালডিহির বিদ্যুৎ সরাসরি কলকাতায় আসতে শুরু করেছে। এই সময়ের মধ্যে, জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও চালু হয়ে গেছে। এছাড়া, আগামী দু' মাসের মধ্যে সাঁওতালডিহির ১২০ মেগাওয়াটের দ্বিতীয় ইউনিটও তৈরি হয়ে যাবে।

মাত্র ৪.০৯ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে কাজ শুরু করে পর্যতের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বেড়েছে ৫৪২.১৭ মেগাওয়াট পরিমাণ। পর্যতের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১,০০০ থেকে বেড়ে ৩,০০,০০০ এর বেশী দাঁড়িয়েছে এবং কর্মীসংখ্যা ৭০০ থেকে এখন ৩০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে।

সাঁওতালডিহি এবং ব্যাণ্ডেল—দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রেই বর্তমানে সম্প্রসারণের কাজ চলছে। কোলাঘাটে ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন তিনটি ইউনিট স্থাপনের কাজও শুরু হয়েছে। উপরন্তু উত্তরবঙ্গে জলঢাকা ও কাশিয়াঙের দুটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের কাজও ভালোভাবেই এগোচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যতের আরেকটি উল্লেখজনক অগ্রগতি গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে। তিনবছরের কম সময়ের মধ্যে পর্যৎ ৭০০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে, ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০,০০০টি গ্রামে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ দিয়ে পৌঁছেছে।

আধিক অনটন প্রায়ই পর্যতের কাজকর্ম জোরকদমে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাসত্ত্বেও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও কর্মনিষ্ঠা নিয়ে পর্যৎ এ রাজ্যের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

TCP/WB/68 22240/75

চীনের পার্টি লাইন ও সি পি আই (এম) নেতৃত্ব (৩)

চীনের পার্টি গঠনতন্ত্রে লিন্ পিয়াওয়ের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে পি বি চীনের পার্টির অভ্যন্তরের লালঝাণ্ডা ও 'নীল' ঝাণ্ডার লড়াইয়ে (দুই লাইনের লড়াই) নীতির ব্যাপারটি স্বচ্ছন্দে একেবারে এড়িয়ে গেলেন। চীনের পার্টির দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে পি বি নিশ্চয়ই অনেক কিছুর ব্যাখ্যা পেয়ে থাকবেন। অতএব সে সব আলোচনায় যাচ্ছি না। তবু যে প্রশ্ন থেকে যায় তা হলো পি বির দৃষ্টিভঙ্গীর। চীনের ইতিহাস যারা পড়েছেন তারা জানেন চীনের পার্টিতে দু-লাইনের লড়াইয়ের প্রক্রিয়া বার বার পার্টি-নেতৃত্বে ঘনীভূত সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। এ সত্যকে বেমালুম উপেক্ষা করে আলোচ্য লিন্ পিয়াও প্রসঙ্গকে বিচার করা এবং সেভাবে সমগ্র পার্টি-সদস্য ও ব্যাপক জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা নিশ্চয়ই এক বুর্জোয়া শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধতি।

চীনের পার্টির রিপোর্ট ও অন্যান্য সূত্র থেকে আজ একথা পরিষ্কার যে চীনের বিশেষ পরিস্থিতির এক বিশেষ পর্যায়ে লিন্ পন্থীদের উচ্চাশার সঙ্গে প্রকৃত মার্কসবাদীরা এক সাময়িক বুঝাপড়ার পজিসন্ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্যাপারটি কোন নিয়মতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের নীতিগত ব্যবস্থা নয়। এ ছিল দু-লাইনের লড়াইয়ের এক উচ্চতম স্তরের স্বীকৃতি; নীতিগত ও কৌশলগত ভাবে দ্বন্দ্বের পূর্ণতম বিকাশের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের সমাধানের পথ (Working out the contradiction through maximum development of the contradiction-)।

তাই একদিকে লিন-চেন (চেন পোতা) পন্থীদের দিক থেকে লিন্-এর উত্তরাধিকারের স্বীকৃতির ব্যাপারটা দেখা দিয়েছিল পার্টি-নেতৃত্বের সহজ 'লিনীকরণের' (Lin-isation of leadership) উপায় হিসেবে কিংবা বলা যায় লিন্‌কে মাওয়ের বিকল্প হিসেবে স্বীকৃতিআদায়ের প্রাথমিক কার্যকরী ধাপ হিসেবে। লক্ষ্য করুন "On his (Lin's) part, there was a process of development and self-exposure"—Chou. (এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাংবাদিক উইলফ্রেড বার্চেটের 'দি লিন পিয়াও প্লট—ফার ইস্টার্ন রিভিউ ২০-৮-৭৩ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু অপরদিকে, কমিউনিস্টরা সব রকমের কঠিন অবস্থায় সংগ্রাম করতে জানে। যারা নবম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টকে মার্কসবাদী ভাষায় পড়তে জানেন, তারা বুঝতে পারেন যে, পার্টির গঠনতন্ত্রের ধসড়ায় যে বৈপ্লবিক রণকৌশলগত পশ্চাদপসরণ নেওয়া হয়েছিল পার্টির রাজনৈতিক প্রস্তাবের মধ্যে তার পাল্টা সঠিক ব্যবস্থাও নিশ্চিত করে রাখা হয়েছিলো; "On one part there was also a process of getting to know him"—Chou En Lai. অবশ্যই নবম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে নিহিত কার্যধারা ও পদ্ধতির মাধ্যমে। দশম কংগ্রেসের রিপোর্টই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। পি বির একথা জানা উচিত ছিল যে, যে জনগণ বিপ্লব করে সেই জনগণই বিপ্লবকে রক্ষা করতে পারে যদি পার্টির সাংগঠনিক লাইন সঠিক হয় এবং পার্টি সঠিক ম্যাস লাইনের মাধ্যমে (এখানে "from the people, to the people") জনগণকে পরিচালনা করে। সামগ্রিক পিছুহটা বিপ্লবী সংগ্রামেরই একটা কৌশল মাত্র।

এগুলি বুঝতে না চাওয়া যেমন ভদ্রলোকী বিপ্লবীয়ানা, তেমনি পার্টি সংবিধানের ক্ষেত্রে পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ও গণলাইনের দ্বান্দ্বিক তাৎপর্যগুলিকে মেনে নিতে অনীহাও একটা শোধনবাদী বিচ্যুতি একথা সি পি আই (এম) নেতৃত্বের মেনে নেওয়া উচিত। বিশেষতঃ, খানিকটা যান্ত্রিক, খানিকটা ভাববাদী 'বিশেষ' ভঙ্গীতে ("Mao Tse-tun and his political-idiological lines, no matter whether he follow correct Marxist-Leninist policies or not"—P. B.) মাও নেতৃত্বের ভিত্তি সম্পর্কে একটা কাল্পনিক অপপ্রচার সংগঠিত করার উৎসাহ এবং পার্টি-সংগঠনের সক্রিয় উন্নত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে উপহাস করে পার্টিকে 'বিল্ট অন ফেথ' হিসেবে দেখানোর অপচেষ্টা অবশ্যই একটা পাঁতি বুর্জোয়া চালাকী মাত্র।

(বিঃ দ্রঃ—ইতিমধ্যে আলোচ্য খসড়াটি পার্টি কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়েছে)

বার্তা-সমৃদ্ধ পুবের হাওয়া

যারা গত পঞ্চাশ বৎসরের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সাহায্যে বিশ্লেষণ ও পাঠ করতে সক্ষম তারা নিশ্চয়ই জানেন যে দেশের জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির সঠিক সমাধার লক্ষ্যকে সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা ও তাকে অবিরাম উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথমেই হয়েছে চীনে। প্রকৃত মার্কসবাদীরা জানেন, জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলিকে সমাধা না করতে পারলে ধনতন্ত্রের বীজকে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। চীনের জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলিকে দ্রুত ও ধাপে ধাপে সমাধা করার যে জরুরী প্রয়োজন ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি চীনের পার্টির উপর বর্তেছিল, সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণাও যাদের আছে, তারা স্বীকার করেন যে, চীন যদি এ কাজে ব্যর্থ হত তাহলে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আজ কোন বিপর্যয়ের আবর্তে গিয়ে ঠাঁই পেতো তা ভাবা যায় না। রাশিয়ার গত দু দশকের ইতিহাস সেরূপ পরিস্থিতির একটা আংশিক রিপোর্ট মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলিকে সমাধার মধ্য দিয়ে জনগণের প্রলেতারীয়করণের বাস্তব ভিত্তি গড়ে উঠে। বিশ্বের সর্বহারা আন্দোলনের ইতিহাসে চীনের সমাজতান্ত্রিক সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ সংগ্রামগুলি এক একটি মহত্তম অবদান। পি বি স্বীকার না করলেও এ ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যাবে না, দুনিয়ার আগামী বিপ্লবগুলির উপর এর প্রভাব হারাবে না।

অপরদিকে, শোধনবাদ কখনও নিজেকে শোধনবাদ বলে না, যেমন করে সাম্রাজ্যবাদও নিজেকে সাম্রাজ্যবাদ বলে না; সামাজিক সাম্রাজ্যবাদই বা কেন নিজেকে আসল নামে পরিচয় দেবে? আসলে বিপ্লবীরাই এদের এভাবে চিহ্নিত করে থাকে। আমাদের হাতের কাছে সাম্প্রতিক দলিলগুলোই কি যথেষ্ট পরিচয়পত্র নয়? আমরা অবশ্যই ভারত-সোভিয়েৎ "শান্তি-মৈত্রী চুক্তি" ভারত-সোভিয়েৎ অর্থনৈতিক চুক্তি, রুশ-মার্কিন মস্কো চুক্তিগুলি ও ওয়াশিংটন চুক্তিগুলোর কথাই ধরছি। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও সামরিকক্ষেত্রে রুশ অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপগুলোর কথাই সামনে তুলে ধরে প্রশ্ন করি, এ অনুপ্রবেশ, এ হস্তক্ষেপ কি সমাজতান্ত্রিক? কিংবা ব্রেজনেভ্-নিক্সনের ১৯৭২, ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালের প্রায় অর্ধশত চুক্তি ও প্রটোকলগুলো কোন্ দেশের সর্বহারার "শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের" জন্যে—আমেরিকার, কিংবা চুক্তি বর্ণিত "তৃতীয় দেশ-গুলির"? চড়া মুনাফায় অস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসা, "আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন" নীতি, বাজার দখলের প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে মূলধন লগ্নী ও বিনিয়োগ, বুর্জোয়া কমোডিটি প্রোডাক্সানের কাঠামোয় দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় মূলধন বিনিয়োগ ইত্যাদি কোন্ আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে—আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের কিংবা আন্তর্জাতিক সর্বহারার? শুধু মাত্র উপরোক্ত দলিলগুলো সামনে তুলে ধরে পি বিকে বলি, তথাকথিত "সমদূরত্বের নীতি" কার্যতঃ কোন্ শ্রেণীর সেবায় কোন শ্রেণীকে বলিদানে সহায়তা করে? (তৎসহ দর্পণের ৩রা, ১০ই ও ১৭ই মের সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য)

প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতা দখলের পর বিপ্লবের কঠিনতর পর্যায় শুরু হয়। একথাটার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্যটা বুঝতে পি বিকে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে; তাহলো, বিশ্বের জনসমাজের এক চতুর্থাংশের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলিকে বিপ্লবের অনুকূলে সমাধান করা (Correct handling of the contradictions among the masses), উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদক শক্তিগুলির ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্বের সমাধান ও অন্যান্য বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রলেতারীয়করণ ও তার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রেণীশত্রুগুলিকে (আন্তর্জাতিক শোধনবাদ সহ) মোকাবিলা করার ও বিপ্লবকে দ্রুত ও অবিরাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে অসাধারণ নেতৃত্ব, চেতনা ও প্রতিভা থাকার প্রয়োজন চীনের পার্টির তা আছে। মনে রাখতে হবে আন্তর্জাতিক সর্বহারা ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার (শোধনবাদ সহ) দুনিয়া জোড়া দ্বন্দ্বের এক ব্যাপকতম প্রক্রিয়ার মধ্যে চীনের অভিজ্ঞতার ভিত্তি নিহিত। এ ব্যাপকতম দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে চীনের রণনীতি ও রণকৌশলের সমৃদ্ধ বিজ্ঞান। এ অভিজ্ঞতা, এ বিজ্ঞান ও এ সংগঠন শক্তিকে সরাসরি অস্বীকার করার অর্থ বর্তমান যুগের বিপ্লবের ইতিহাস ও তার শিক্ষাকে কার্যতঃ অস্বীকার করা। এর ইচ্ছাকৃত কিংবা অজ্ঞান বিকৃতি কার্যতঃ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির বিরোধিতা, যার ফলে শুধু নিজেকেই প্রতারণা করা যায়, অন্য কাউকেই বা ইতিহাসকে ঠকানো যায় না। তার চাইতে নিজেদের সজাগ দৃষ্টি, বাস্তবতাবোধ ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাটুকুকেও যদি আমরা কাজে লাগাই যদি, সি পি সির দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে এগুলোকে মিলিয়ে দেখতে এখনো তৎপর হই এবং নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলোকে সংশোধনে সচেষ্ট হই, পথ নিশ্চয়ই খুলে যাবে; পার্টি গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারবে। পক্ষান্তরে ভুলত্রুটি ঢাকতে গেলে আরও ভুলপথ নিতে হয়; সে এক সাংঘাতিক রাস্তা, আত্মহননের পথ।

বিপ্লবী সংগ্রামের সামনে সমস্যাগুলি আজ যখন ইতিহাসের সব চাইতে জটিল ও কঠিন পর্যায়ে রূপ নিয়েছে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলিকে নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে আরো বিস্তৃত, আরো গভীর ভাবে পরিচিত হতে হবে, বাস্তব ঘটনার বিচারে তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিতে হবে যার জন্যে প্রয়োজন সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গী, বৈপ্লবিক দায়িত্ববোধ ও উচ্চমানের শ্রেণীচেতনা। বিপ্লবী চরিত্র বিপ্লবের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠে না, টিকতে পারে না, এ সত্য পার্টির সম্পর্কে যেমন খাটে, ব্যক্তির সম্বন্ধেও তেমনি। সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যেমনি পার্টি গড়ে ওঠে এবং বাড়ে, তেমনি বিপ্লবী চরিত্রও উন্নত হয়।

আত্মসমালোচনার প্রয়োজন সকলেরই আছে, পার্টির পক্ষেও তা আবশ্যিক; কেননা পরবর্তী পদক্ষেপটা সঠিকভাবে করতে যাবার পক্ষে প্রাথমিক প্রস্তুতির এ হলো একটা অবিসম্বাদিত উপায়।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে আন্দোলনের সঠিক রণনীতি ও রণকৌশলের সঙ্কট বারে বারে দেখা দিয়েছে। অভিজ্ঞতাগুলোকে উপযুক্ত গুরুত্বে কাজে লাগাতে নেতৃত্বের বার বার ব্যর্থতা, পার্টির সঠিক সাংগঠনিক লাইন ও গণলাইনের অভাব, আত্মসমালোচনার অভাব ও অন্যান্য কারণে পার্টির সাংগঠনিক দুর্বলতা এক স্থায়ী রোগে পরিণত হয়েছে; পাঁতি-বুর্জোয়া প্রবণতা বা শোধনবাদী বিচ্যুতিগুলি নিয়মিত ডান ও বাম বিকারে পার্টিকে অক্ষম করে রেখেছে। ফলে, ভারতের কি শ্রমিক পার্টিগুলি, কি জনগণ ক্রমেরই বৈপ্লবিক শ্রেণী শিক্ষা ও চেতনার মান বিশ্বের সর্বহারা আন্দোলনের অগ্রগামী বাহিনীগুলির চেতনার নিক্তিতে একান্তই প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেনি।

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

বার্তাসমৃদ্ধ পুবের হাওয়া

শ্রীকান্ত বসুরায়

শহরের পরিবহন ব্যবস্থায় চরম অরাজকতাঃ বাসযাত্রীদের দুর্ভোগের একশেষ

অনার্য মিত্র

কলকাতায় বাসযাত্রীদের দুর্ভোগ চরম সীমায় পৌঁছেছে। প্রত্যেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। বাস বোঝাই যাত্রীরা ভীড়ের চাপে ক্রমেই ক্ষিপ্ত হচ্ছেন। এক যাত্রী অপর যাত্রীর মুণ্ডপাত করছেন। কণ্ডাক্টর ড্রাইভারদের ওপর ক্রুদ্ধ বাসযাত্রীদের প্রহারের ঘটনা হামেশাই ঘটছে। ফলে নিয়মিতভাবে কলকাতার কোন না কোন রুটে প্রতিবাদ স্বরূপ বাস বন্ধ থাকছে। যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে, ক্রোধ আরও বাড়ছে বিশেষ করে এই অসহ্য গরমের দিনে এ দুর্ভোগ আরও অসহ্য।

বেসরকারী বাসের উচ্ছৃংখল পরিচালন ব্যবস্থা কারুও অজানা নয়। জোর জবরদস্তি করেও যখন বাসের ভাড়া বাড়ানো সম্ভব হল না, তখন থেকেই তাদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ। বাস মালিকদের মুনাফা বাড়িয়ে দিতে পারলে কণ্ডাক্টরদেরও দু পয়সা হত। কিন্তু প্রাত্যহিক দুর্ভোগে জর্জরিত যাত্রীদের কাছ থেকে কোনপ্রকারেই সে সুবিধা আদায় করা সম্ভব হয় নি। অনেক যাত্রীই বাসভাড়া বাড়ানোর বিনিময়ে বাসের চলাচল ব্যবস্থায় উচ্ছৃংখলতা দূর করার দাবী জানিয়েছিলেন। তারা চেয়েছিলেন রুটে নির্দিষ্ট বাসের সংখ্যা খেয়ালখুশীমত না কমিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বাস চলুক; বাসের সংখ্যা আরও বাড়ানো হক। এ ব্যাপারে কোন গ্যারান্টিই বাস মালিকরা দিতে পারেন নি। বিবাহ উৎসবে পালাপার্বণে ভাড়া খাটার লোভ তারা সামলাতে পারেন নি।

এই অব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারী বাসের প্রশাসনিক অপদার্থতা। কোন দিন কোন রুটে কত সংখ্যক বাস চলবে তা কেউ বলতে পারে না। ফলে বাসের জন্য যাত্রীদের অনন্তকাল প্রতীক্ষা এবং বসের দেখা মিললেও তার ভীড়ের চাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে বাধ্য। বিকল্প হিসাবে শহরের সীমিত আয়ের যাত্রীদের সামনে রয়েছে মিনিবাস। সেখানকার ভীড়ও বাস ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। বেশী পয়সায় ঘাড় নীচু করে মনুষ্যেতর জীবের ভঙ্গীতে তারা যেভাবে (অতি কষ্ট করে খরচ করা। তাও প্রতিদিন সম্ভব হয় না) মিনিবাসে শেয়ারের ট্যাক্সিতে যাবার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা টার্মিনাসগুলিতে লাইন দিয়ে থাকেন, তা দেখে বিস্ময় প্রকাশের দিন চলে গেছে। এসব দৃশ্য আজ গা-সহা।

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের দুরবস্থার জন্য যে সব আমলা মন্ত্রী দায়ী, তারা যাত্রীদের এই গা-সহা ভাবের সুযোগটিই নিচ্ছেন। সর্বব্যাপী অরাজকতার মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থাটাই বা বাদ যাবে কেন।

বিভিন্ন ডিপোয় স্থিরীকৃত নির্দিষ্ট সংখ্যক বাসের এক তৃতীয়াংশ মাত্র রুটে ছাড়া হয়। বাকী বাস অকেজো। সংখ্যার হিসাবে অনেকগুলির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর ওপর যে সংখ্যক বাস রুটে ছাড়া হয়, তার অনেকগুলিই মাঝপথে বিকল হয়ে পড়ে থাকে। সরকারী বাস ব্রেকডাউন হবার ঘটনা শহরের যাত্রীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। যেমন পাইকপাড়া ডিপোতে একশো তেরো চোদ্দখানা বাস পথে বেরুনোর কথা। গাড়ী অকেজো হয়ে পড়ে থাকা এবং অন্য ডিপোয় গাড়ী কম থাকার জন্য কয়েকটি গাড়ী স্থানান্তরিত করা ইত্যাদি কারণে পথে গাড়ী বের করা সম্ভব হয় ষাট থেকে পঁয়ষট্টিটি। তার মধ্যে ব্রেকডাউন হয়ে যায় কমপক্ষে কুড়িটি। অর্থাৎ মাত্র চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি গাড়ী সচল থাকে। সুতরাং যাত্রীদের দুর্ভোগ পোয়াতেই হবে।

মাঝপথে গাড়ী ব্রেকডাউন করার ব্যাপারেও একটা চক্রান্ত আছে। যে পরিমাণ টিকিট বিক্রয়ের ভিত্তিতে কনডাকটররা রিওয়ার্ড বা পুরস্কার পেয়ে থাকেন, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। ফলে যেদিন পরিশ্রমের তুলনায় তেমন লাভজনক বিক্রীর সম্ভাবনা থাকে না, সেদিন ড্রাইভারের সঙ্গে চুক্তি করে কণ্ডাকটররা মাঝপথেই ব্রেকডাউন করে দেন। ড্রাইভারের সঙ্গে বাস কণ্ডাকটরের আঁতাত বরাবরের। বিক্রয় লাভজনক হলে এবং বাসে যতে ভীড় উপচে পড়ে, সেজন্যে গাড়ীর গতি মন্থর করে দিলে, কণ্ডাকটরদের টিকিট বিক্রয়ে যে সুবিধা হয়, তার কিছু লাভের ভাগ কখন কদাচিৎ ড্রাইভারদেরও দিতে হয়। কেন না গাড়ী চালানোর ওপর টিকিট বিক্রয় অনেকাংশে নির্ভরশীল। এছাড়া কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল যুবকের (খেলার মাঠ এবং সিনেমা হল ফেরৎ) গায়ের জোরে টিকিট না দেওয়ার জন্যও অনেক কনডাকটর বিরক্ত হয়ে ব্রেকডাউন করেছেন। আবার কখনও ব্রেকডাউনের ঘটনা ড্রাইভারের একার মর্জির ওপর নির্ভর করে, যে কারণে অনেকক্ষেত্রেই কনডাকটরকে ড্রাইভারদের তোয়াজ করে চলতে হয়।

পথের মাঝে আকস্মিক এই ব্রেকডাউনের ফলে আরেক রকমের অশান্তির সৃষ্টি হয়। বেসরকারী বাসের ক্ষেত্রে মাঝপথে বাস অচল হয়ে গেলে যাত্রীদের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত ভাড়ার পয়সা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া যেমন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে, সরকারী বাসের ক্ষেত্রে সে নিয়ম নেই। নিয়ম আছে, পয়সা ফেরৎ না দিয়ে পরবর্তী বাস এলে কণ্ডাকটর সেই বাসে এইসব যাত্রীদের তুলে দেবেন এবং পুনরায় যাতে তাদের টিকিট কাটতে না হয়, সেজন্য পরবর্তী বাসের কণ্ডাকটরকে বলে দেবেন। কিন্তু যাত্রীদের বিক্ষোভের কারণ হল পরবর্তী বাসটি কতক্ষণে আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, এলেও সে বাসের ভীড়ে সকলের ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে; সর্বোপরি ইদানীং সরকারী বাসের কনডাক্টর ড্রাইভার যাত্রীদের মুখোমুখি হবার ভয়ে ব্রেকডাউনের সময় বাস থামিয়েই সরে পড়ে।

ইদানীং অর্থাৎ এই মে মাসে ব্রেকডাউনের ঘটনা দ্বিগুন ঘটে গেছে। এর প্রধান কারণ হল কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান যতীন্দ্র সেনগুপ্তের সম্প্রতি প্রচারিত এক অভিনব বিজ্ঞপ্তি। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তিনি পরিবহনের সর্বস্তরের কর্মীরই উপকার সাধন করতে চেয়েছেন। গত পয়লা মে থেকে বলবৎ করা নতুন নিয়মে বলা হয়েছে ড্রাইভারদের ট্রিপ এালাউন্স, ট্রিপ কমপ্লিশন এলাউন্স দৈনিক উপস্থিতির জন্য এবং কণ্ডাক্টরদের টিকিট বিক্রীর ভিত্তিতে যে পুরস্কার বা রিওয়ার্ড দেবার প্রথা রয়েছে, তা তুলে দেয়া হল এবং সেই সঙ্গে ডিপো মেকানিকদের আর ইনসেনটিভ বোনাসও দেয়া হবে না। ড্রাইভর কণ্ডাক্টরদের পুরস্কার বাসের আয়ের ওপর নির্ভর করবে। মেকানিক, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর জোনাল ইন্সপেক্টর, রুট ইন্সপেক্টর, টিকেট পরীক্ষক ও স্টার্টার প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অনুরূপ নিয়ম চালু হল। এই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে, যারা এই পুরস্কার পাবেন তাদের প্রত্যেককেই ফেব্রুয়ারী মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে কমপক্ষে একুশ দিন রুটের বাসে কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র উপস্থিতি নয়, সিটিয়ারিং ডিউটি) করতে হবে। ফেব্রুয়ারী মাসের ক্ষেত্রে বিশ দিন কাজ করলেই চলবে।

রুটে গাড়ী কম ছাড়ার সুযোগে এটা কর্মীদের বঞ্চিত করার কৌশল। কণ্ডাক্টর ড্রাইভাররা বলছেন মাসে প্রতিদিনই তাঁদের গাড়ী পাবার সুযোগ দিলে তারা এ নিয়মকে আমন্ত্রণ জানাতে রাজী। এ ব্যাপারে আরও একটি নিয়ম করা হয়েছে যে বাসের দুজন কণ্ডক্টরের বিক্রয়ের ভিত্তিতে পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন কণ্ডাক্টর এককভাবে বিক্রয়ের মাধ্যমে রিওয়ার্ডের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলেও অপরজন যদি রিওয়ার্ডের নিম্নতম সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে, তবে দুজনের কেউই রিওয়ার্ড পাবেন না। এক্ষেত্রেও টিকিট বিক্রয় দুজনের কত হচ্ছে, তা পরস্পরের জানার সব সময় সুযোগ থাকছে না। ফলে নিয়মগুলির কোনটাই ড্রাইভার কণ্ডাক্টরদের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কমপক্ষে দৈনিক আয়ের একটা হিসেব দিয়ে বলা হয়েছে, এই পরিমাণ এবং এর বেশী আয় হলে ডিপো মেকানিকদের শতকরা দেড়টাকা দেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষের এ টাকাও দেওয়ারও প্রয়োজন হবে না; কেননা কমপক্ষে দৈনিক আয়ের যে পরিমাণ ঘোষণা করা হয়েছে, সেই পরিমাণ আয় অধিকাংশ দিনই হয় না। কণ্ডাক্টর ড্রাইভার এই নিয়ম চালু হওয়ার ফলে ক্ষুব্ধ। ফল স্বরূপ দ্বিগুণ ব্রেকডাউন শুরু হয়েছে। তবে এই নিয়মে শুধুমাত্র ড্রাইভার কণ্ডাক্টর ছাড়াও গাড়ী চলাচল ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে প্রতিবাদী শক্তিরা আরো দলে ভারী হলো। এর আগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম চালু ছিল।

পরিবহন সংস্থার উন্নতির আন্তরিক আগ্রহ থাকলে এই অভিনব নিয়মের চাপ শুধু কণ্ডাক্টর ড্রাইভারদের ওপরই আসতো না কর্তৃপক্ষ ও আমলাদের চুরি জোচ্চুরি দুর্নীতি দমনের জন্যেও যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া হত। অন্তত বণিনাজী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের শাস্তির ব্যবস্থা হত।

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

চিলিতে নতুন ষড়যন্ত্র

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চিলিতে ফ্যাসিস্ত শাসক পিনোচেৎ নতুন এক ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো বন্দী দেশপ্রেমিকদের নির্বিচারে খুন করা। কিন্তু এই খুনের কাজটাকে আড়াল করার জন্যে কিছু সাজানো ঘটনা দরকার। সেকারণে পিনোচেৎ জেলপালানোর এক আজব কাহিনী তৈরী করতে চায়। গল্পটা এভাবে সাজাতে চায় যে, রিতোকে-বন্দীশালা থেকে বন্দীরা পালানোর চেষ্টা করলে রক্ষীরা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক বন্দী নিহত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রিতোকে জেলখানায় লুই করভালান, জোসে কাদেমারতোরি, জর্জে মনতেস প্রমুখ প্রখ্যাত বামপন্থী নেতারা রয়েছেন। পিনোচেৎ সর্বজনপ্রিয় এই সব দেশপ্রেমিকদের খুন করতে চায়। একারণে রাজধানী সান্তিয়াগোতে সম্প্রতি গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, রিতোকের বন্দীরা পালাবার চেষ্টা করছে। এবং এই জেলের গেটে সশস্ত্র পাহারা আরো জোরদার করা হয়। এই খুনের পরিকল্পনার পরামর্শ দাতা হল প্রাক্তন নাৎসী গোয়েন্দা পুলিশ ভালটের রাউফ। এই কুখ্যাত নাৎসীটি সাজা এড়িয়ে বহাল তবিয়তে চিলিতে রয়েছে।

পিনোচেতের এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়ায় পিনোচেৎ এই গণহত্যা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। তবে প্রতিহিংসাপরায়ণ পিনোচেৎ নির্বিচারে মানুষকে জেলে পুরছে। সম্প্রতি লুই করভালনের আইনজীবী মানুয়েল ফার্নান্দো অন্তর্নলাকে পিনোচেতের গোয়েন্দা পুলিস তার অফিস থেকে ধরে নিয়ে গেছে, অন্তর্নলকে এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয়, পিনোচেৎ যেসব গুম খুন করেছে তার সঙ্গে আরো একটি সংখ্যা যোগ হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পিনোচেতের বর্বর শাসনে চিলির অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। কলেরা প্লেগ, মহামারীতে দেশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর হার বাড়ছে। এছাড়া পিনোচেৎ পাঁচ সাত হাজার দেশপ্রেমিক খুন করেছে। হাজার হাজার বন্দীতে জেলখানা ঠাসা। গ্রেপ্তার পিটুনি শাসানিতে গণতন্ত্রের নিত্য কণ্ঠরোধেই এসব সত্ত্বেও চিলির মানুষ মরেনি। মরেনি চিলির কমিউনিস্টরা, সমাজতন্ত্রীরা। মাঝে মাঝেই রাজধানী সান্তিয়াগোতে দেয়াল লিখন : পিনোচেৎ তোমার শেষ দিন আসন্ন, "ফ্যাসীবাদ ধ্বংস হোক", "চিলির মানুষ মরেনি", "শহীদ কমরেড আলান্দে দীর্ঘজীবী হোক" এছাড়া বিভিন্ন কারখানা ও সুদূর গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝে ব্যাপক গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ পিনোচেতের সরকারী কর্তাদের সঙ্গে অসহযোগিতার আন্দোলন শুরু করেছে। চিলির প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে।

শুভ সূচনা : লাওস-ভাইলাণ্ড

ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ার পর লাওসের ঘটনাবলী দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে আনন্দ সংবাদ। লাওসে মার্কিন বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভের শুভ সূচনা থেকে লাওস মন্ত্রিসভা থেকে একে একে দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিদের বিদায় লাওসে নতুন যুগের সূচনা করছে। শুধু মন্ত্রী বিদায় নয়, প্রতিক্রিয়াশীল সেনানায়করা পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। লাওস সরকার লাওসস্থ মার্কিন সংস্থা ইউ এস এডের অফিস বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লাওসের বামপন্থী ছাত্ররা এই সংস্থাটিকে সি আই এর আড্ডাখানা হিসেবে চিহ্নিত করে এই অফিস বন্ধ করার দাবী করে যাচ্ছিলেন। লাওসে মার্কিন বিরোধী প্রবল বিক্ষোভের ফলে

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সুবিধাবাদী ঐক্য

সম্প্রতি বামপন্থী মহলে এক নূতন ধরণের ঐক্যের চিন্তা উদিত হয়েছে। এই ঐক্য শাসক কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত দলের ঐক্য। বর্তমানে সীমিত প্রশ্নে অর্থাৎ বাক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অবাধ নির্বাচনের দাবীতে এই ঐক্যনীতির প্রয়োগ ঘটছে। ঘটনা যেভাবে গড়িয়ে চলেছে, অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ অরও ব্যাপকতর প্রশ্নে এই ঐক্যনীতি প্রযুক্ত হবে। সকল বিরোধী দলের ঐক্যের মূল প্রবক্তা সোসালিষ্ট পার্টি। বামপন্থীদের মধ্যে থেকে তরা এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সম্প্রতি পুনরায় রাজনৈতিক মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করায় এবং তাঁর কণ্ঠ থেকে "সার্বিক ঐক্য" ও "সার্বিক বিপ্লব" শ্লোগান উত্থিত হওয়ায় সোসালিস্ট পার্টির পক্ষে এই "ঐক্যনীতির" পক্ষে ওকালতি করার সুযোগ বেড়েছে। এমনকি মর্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, যারা তাদের ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির দিল্লী অধিবেশনে এই প্রকার সুবিধাবাদী ঐক্যনীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়েছিল তারাও আজ প্রভাবিত হচ্ছে। অন্য বামপন্থীদের কথা বলা বাহুল্য। একমাত্র আর সি পি আই দল গণ-আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর এই নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

ঐক্যের আগিদ কোন কারণ থেকে উদ্ভূত হচ্ছে দেখা যক। ভারতে পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছে জনগণের উপর এবং গণ-আন্দোলনের উপর। আক্রমণ দ্বিমুখী। এক, তারা পুঁজিবাদী সংকটের বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, তীব্রতম বেকার সমস্যা, ছাঁটাই লে অফ, লক-আউট, বেতন হ্রাস, কৃষক উচ্ছেদ ইত্যাদি তার প্রকাশ। দুই, জনগণের দীর্ঘদিনের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ। জরুরী অবস্থা, ভারত রক্ষা আইন, মিসা প্রভৃতি কালাকানুনের প্রয়োগ এবং পুলিশ সি আর পির সহযোগিতায় সমাজবিরোধী গুণ্ডাবাহিনীর সাহায্যে ফাসীবাদী কায়দায় গণ-আন্দোলন ও বামপন্থীদের উপর আক্রমণ। প্রথমোক্ত অর্থনৈতিক আক্রমণের প্রয়োজনেই দ্বিতীয় ধরণের রাজনৈতিক আক্রমণ। সুতরং বাক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম অর্থনৈতিক বোঝা চাপানর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন থেকেই আসে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি হয় না। এই দ্বিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

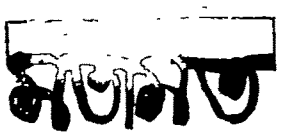

করার জন্য প্রয়োজন জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য—শক্তিশালী ও সংগ্রামী ঐক্য।

যে সমস্ত বামপন্থী দল ভাবছে, এই দুটি প্রশ্নকে আলাদা করা যাবে, তারা ভুল করছে। জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস, লোকদল ইত্যাদির সঙ্গে মিলেমিশে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম হবে একদিকে, আর একদিকে বামপন্থী নেতৃত্বে শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে এবং একে অপরের পরিপূরক হবে—এ চিন্তা ভুল। শোষণ এবং নিপীড়ন এই দ্বিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে বামপন্থীদেরই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। এই লড়াইয়ে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির কারও প্রগতিশীল ভূমিকা থাকতে পারে না। জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস, লোকদল এরা কেউ প্রগতিশীল নয়, গণতন্ত্রের পূজারীও নয়। এরা আজ সরকারী ক্ষমতায় নেই বলেই জনপ্রিয় শ্লোগানগুলি ব্যবহার করছে এবং তার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এরাই আবার ক্ষমতায় এলে গণতন্ত্র হত্যাকারীর রূপ নেবে। সংগঠন কংগ্রেস নেতা মোরারজী দেশাই, কামরাজ, প্রফুল্ল সেনেরা শাসন কর্তৃত্বে থাকাকালীন গণতন্ত্র প্রীতির কোন পরিচয় দেননি। ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে সিণ্ডিকেট কংগ্রেস, জনসংঘ স্বতন্ত্র জোটের প্রার্থীর বিরুদ্ধে বামপন্থীরা ভোট দিয়েছিলেন এঁদের হাত দিয়ে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে বলেই। বস্তুতঃ সেদিন এঁরা কেউ কেউ কমিউনিস্ট দলগুলিকে অবৈধ ঘোষণার প্রস্তাবও রেখেছিলেন। পশ্চিম বাংলায় সভা শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ বিলের উদ্যোগী ছিলেন একদা মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন।

বাস্তব সত্য এই যে, প্রতিক্রিয়ার কোন অংশকে সমর্থন করে প্রগতির আন্দোলন আরম্ভ হবে না, গণতন্ত্র রক্ষা পাবে না, বরং প্রতিক্রিয়াই শক্তিশালী হবে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যেমন দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পুষ্ট করছে, গণ-আন্দোলনের অশেষ ক্ষতি সাধন করছে এবং কার্যতঃ বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছে; তেমনি অন্য বামপন্থীরা সরকার বিরোধী প্রতিক্রিয়ার দলগুলির সঙ্গে হাত মেলালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই দুর্বল করবে, প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

দুর্বলতা আজ বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যে। মতবাদের দুর্বলতা, মতবাদের বলিষ্ঠ প্রয়োগে দুর্বলতা। এই দুর্বলতা থেকেই আসছে নানান বিভ্রান্তি, সংশয় ও দোদুল্যমান মনোবৃত্তি। আজ সারা দেশে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের মনে যে আশা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে, তার কারণও বামপন্থী নেতৃত্বের দুর্বলতা। আমরা শ্রীনারায়ণের প্রতি কোন অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাই না। আমরা এও মানি যে, বিহারের গণ-আন্দোলনের উপর কংগ্রেস সরকারের তীব্র আক্রমণের সামনে তিনি জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নি। তাঁর দাবী মূলতঃ বিধানসভা বাতিল ও নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনপ্রিয় শ্লোগান তিনি সামনে এনেছেন। কিন্তু দুর্নীতির মূল উৎস যে দেউলিয়া পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, তাকে আঘাত হানার কোন লক্ষণ তাঁর কর্মসূচীতে নেই। তিনি সার্বিক বিপ্লবের কথা বলেছেন; অথচ তাঁরা নানান বক্তব্যের মূল কথা বর্তমান সমাজব্যবস্থার সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ। তিনি বলছেন জনসংঘ, সংগঠন, লোকদল, প্রগতি পার্টিদের সঙ্গে যারা কায়েমী স্বার্থের পোষক ও বিপ্লব বিরোধী এইসব প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির সঙ্গে সার্বিক ঐক্যের স্রোতে বামপন্থীদের যোগ দেবার জন্য তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন। একটি সুস্পষ্ট জননীতির উপর দাঁড়িয়ে, কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, সমস্ত প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তিনি বামপন্থীদের ডাকছেন না।

সংকটাপন্ন পুঁজিবাদের তীব্রতম আক্রমণের সামনে জনগণের সংগ্রাম অনিবার্য। বলিষ্ঠ জননীতি ও সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হতে পারলে বামপন্থী নেতৃত্ব এবং শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট শক্তিই আন্দোলনের পুরোভাগে আসবে।

বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব বিদ্যালয়ের মর্যাদাহানি

নয়ই মের দর্পণে ডঃ সত্যেন সেনের প্রকাশ্যে ইন্দিরা-কংগ্রেসী রাজনীতিতে নামার খবর বেরিয়েছে। সম্মানীয় উপাচার্য পদে আসীন থেকেই তাঁর এই পদক্ষেপ শুধু অসংগত ও ঐতিহ্যবিরোধীই হয় নি, এর দ্বারা তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাহানিও ঘটিয়েছেন।

জাতির শত্রু ভ্রষ্টাচারী কংগ্রেস যে দুটি রণ-পায়ে ভর করে এই রাজ্যের অনিচ্ছুক ঘাড়ে বাহাত্তর সালে চেপে বসেছে এবং অবস্থান করছে তার একটি পা ছত্র পরিষদ নামক বিরাট গুণ্ডাবাহিনী এই কীর্তিমান ডঃ সেনের ছত্রছায়াতেই হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে বেড়ে ওঠে এবং বর্তমান সময়ে তারাই এবং তাদের প্রতিনিধি মস্তানরাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র প্রশাসন, পরীক্ষা-ব্যবস্থা, ফলাফল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এই উপাচার্য মশাই তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের "শায়েস্তা" করার উদ্দেশ্যেই এক সময়ে এদের পিঠ চাপড়াতেন, আজ এরাই এদের কথা শুনতে তাঁকে ও তাঁর নিম্নবর্গীয় অফিসরদের নির্দেশ দেয়।

বিগত দোসরা এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় যে নির্লজ্জ ফ্যাসিবাদী কাণ্ড বহির্বঙ্গে পশ্চিমবাংলার মাথা নীচু করে দিয়েছিল তার অন্যতম প্রধান নায়ককেই মাননীয় ডঃ সেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের একশো আঠারো তম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে "প্রধান অতিথি" করে বসাতে কুণ্ঠিত হন নি!

শিক্ষক হিসেবে অযোগ্য প্রমাণিত সত্যেনবাবু এখন পশ্চিমবাংলাকে শেখাতে ব্যস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা কাকে বলে! সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এই পশ্চিমবাংলা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপব্যয়, দুর্নীতি, অরাজকতা শ্রীসেনের আমলেই রেকর্ড করেছে। এবং এই বঙ্গ-সন্তানই এই বিদ্যাপীঠকে দিল্লীর শ্রীহস্তে তুলে দিতে আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন।

না, এই ছোট্ট পদে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে মানায় না।

আয়েশা মহসীনা,
কলকাতা

চীনের পার্টি লাইন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও একথা গুরুতর ভাবে সত্যি। বৈপ্লবিক রাজনীতির অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার ফারাক অনেকটা ভূগোলের লেখা পড়ে সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সমজাতীয়, একথা সকলেই মানবেন। প্রতিক্রিয়ার (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) বিভিন্ন রণনীতি ও রণকৌশলগুলি সম্পর্কে এবং সে অনুযায়ী বৈপ্লবিক কর্মসূচী গড়ে তোলা সম্পর্কে আমাদের চেতনার নিয়মান আমাদের অসাফল্যের বিপুল রেকর্ডে পরিস্ফুট। অবস্থাটা এমন যে অন্যদের কথা ছেড়ে দিন, বৃহত্তম বামপন্থী দল সি পি আই (এম) ভারতের মেহনতী মানুষের এক বিরাট অংশকে সংগঠিত করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এ পার্টি ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ভ্যানগার্ড কিনা এ গুরুতর প্রশ্নের সঠিক ভাবে সম্মুখীন হতে পি বি রাজী হবেন না, এ প্রায় নিশ্চিত। প্যারী কমিউনের দেশ ফ্রান্স, সে দেশের পার্টির কি হাল?

রণনীতি সঠিক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটা যেমন জাতীয় তেমনি আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, একথা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। আর এ কাজ করতে গিয়ে ভুলে গেলে চলবে না যে, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থান পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবকে ইতিহাসের সব চাইতে জটিল ও কঠিন এক পরিস্থিতি ও লাইনের সামনে দাঁড় করিয়েছে। এ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নীতি ও জটিল কৌশলগুলিকে অতি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিনে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী মোকাবিলার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে।

ভারতীয় বিপ্লবের পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলির সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে একদিকে যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার (সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সহ) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটগুলির দিকে নজর রাখতে হবে, অপর দিকে তেমনি দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলির উপযুক্ত নেতৃত্বের সঙ্কট, লাইনের সঙ্কট ও সাংগঠনিক সঙ্কটগুলিকে কাটিয়ে উঠতে হবে; এ ছাড়া উপায় নেই।

[সমাপ্ত]

মহিলা প্রধানমন্ত্রীর গৌরব

ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব প্রান্তের রাজ্যের দরিদ্র বঞ্চিত জনসাধারণ সরকারের কাছে মোটা ভাত ও কাপড় চায়। এটুকু পেলেই তারা দু হাত তুলে জয়ধ্বনি করবে।

কিন্তু ভারতের অবস্থা তো দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছেই, গত এক বছরে কাপড়ের দামও হঠাৎ ওপর দিকে মহাবেগে লাফ দিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের স্বার্থরক্ষার জন্য তুলোর দাম বাড়ানোই এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ। সম্প্রতি লোকসভায় যে সব আলোচনা হল তাতে বোঝা যায় তুলোর দাম আরও বাড়বে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বাংলার মেয়েরা কাপড়ের অভাবে আত্মহত্যা করেছে। মনে হচ্ছে এবারে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে গ্রামের চিরবঞ্চিত মেয়েরাও কাপড়ের অভাবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে। আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে মহিলা প্রধানমন্ত্রীর রাজত্বের পক্ষে কি গৌরবময় দৃশ্যই না হবে।

স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের প্রতিশ্রুতি যে ফাঁকা বুলি তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। গরীবের পেটের ভাত তো গেছেই, পরণের কাপড় কেড়ে নিয়ে এ কোন সমাজবাদী রাজত্ব চলছে?

জনৈকা মহিলা
কল্যাণী

নার্সিং ষ্টাফের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে খোদ কলকাতার বুকে গত একুশে মে তারিখে নীলরতন সরকার হাসপাতালে এম, এম, ডি ওয়ার্ডে যে ঘটনা ঘটে গেলো তার জন্য নার্সরা সংঘটের পথে পা বাড়ান। ঐ তারিখে রাত্রিতে জনৈক ডাক্তার জনৈকা নার্সকে চরম অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন, এমন কি তিনি ঐ নার্সিং—এর অনুপযুক্ত এবং অযোজন মনে করলে তাঁরা শিয়ালদহ থেকে নার্স জোগাড় করতে পারেন একথাও বলা হয়।

তার পরের দিন অর্থাৎ বাইশে তারিখে বেকার ওয়ার্ডের লেবার রুমে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। কিছু নার্সিং স্টাফ যখন সেখানে যান তাঁরা দেখতে পান লেবার রুমে ট্যুইস্ট নাচ চলছে। এতে বিরক্ত হয়ে জনৈকা নার্স নৃত্যকারীদের চলে যেতে বললে তিনিও অশালীন ব্যবহার ও নানারকম গালিগালাজের সম্মুখীন হন।

এ রকম ঘটনা যে এবারেই প্রথম তা নয়, নার্সিং স্টাফদের প্রতি একশ্রেণীর ডাক্তারদের এই রূপ মনোভাবের পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। নার্সিং স্টাফদের দাবী সংশ্লিষ্ট ইন্টার্ন ডাক্তারদের শাস্তির ব্যবস্থা না করলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন। কারণ তাঁদের পেশার সম্মান, নিরাপত্তার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত আছে।

কংগ্রেসে সঙ্কট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রক্ষার সতের দফা প্রতিশ্রুতি পালন পালন করতে পারেন নি বলে জনগণের জন্য এত অশ্রুপাত। এমন কি মহান নেত্রীকেরও অস্বীকার।

তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িত। সাতই জুনের প্রত্যাহারের ব্যাপারে ছাত্র-যুবদের অন্যতম শর্ত হল রঞ্জিত গুপ্তকে সাতই জুনের আগে আই জির পদ থেকে সরাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী নাকি অব্যাপারে টালবাহানা করছেন। উল্লেখযোগ্য যে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস দীর্ঘকাল ধরে রঞ্জিত গুপ্তের অপসারণের দাবীতে আন্দোলন করছে। এমন কি তারা গত বছরে চালের প্রাকিওরমেন্টের ব্যাপারে ব্যর্থতার জন্যও শ্রীগুপ্তকেই দায়ী করেছিল। এই পটভূমিতে মাস কয়েক আগে সমকালীন "হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে" একটি খবর দেওয়া হয় যে, রঞ্জিত গুপ্তকে আই জির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার সংবাদটা সম্প্রতি আবার চালু হয়েছে এবং সেইজন্যই ছাত্র-যুব নেতারা জেদ ধরেছেন।

অতএব পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী রাজনীতি এখন চূড়ান্ত সংকটে। বিবদমান দুই ছাত্র-যুব গোষ্ঠী মারমুখী—আঠাশে মে উত্তরবঙ্গ বন্ধের দিন তাদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটেনি এটা নেহাৎ ভাগ্যের কথা। মুখ্যমন্ত্রী সুদীপ-কুমুদদের আচরণে বিরক্ত এবং পালিয়ে বাঁচতে চাইছেন। অরুণ মৈত্র বন্ধওলাদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। "মহান নেত্রী"র সম্মানও ধূলায়বলুণ্ঠিত।

কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এগুলোই শেষ কথা নয়। ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেসী ছাত্রযুবদের বিরোধ শুরু হয়ে যায় এবং এই বিরোধ কখনও তুঙ্গে ওঠে, আবার কখনও ঐক্য আলোচনার নামে কিছুকালের জন্য ধামাচাপা পড়ে যায়। এই বিরোধ এবার একটু জটিল আকার নিয়েছে বটে, তবে তার মানে এই নয় যে, এদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাটল ধরবে।

হীরেন বসুর
রাজনৈতিক উপন্যাস
আগুনের দিন

এই উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাদিক। এককালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন। পুত্র বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছে। পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ করেছেন। এই তিন পুরুষের রাজনৈতিক অভিঘাত এবং সমকালীন সমাজসত্য বর্তমান উপন্যাসে প্রতিফলিত।

মূল্য পাঁচ টাকা

বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯
দর্পণ কার্যালয়েও পাওয়া যাবে

নাট্যকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে সমাবেশ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

রবীন্দ্র ভারতীর অনুমোদিত সংস্থা সহ সমস্ত অপেশাদার নাট্য গোষ্ঠীর প্রতিটি নাট্যানুষ্ঠানের ওপর কলকাতা পৌর প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত উচ্চহার নাট্যকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে নাট্যকর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে গত তেইশে মে সন্ধ্যায় নাট্য অঙ্গনে সাংবাদিক সম্মেলন এবং নাট্যকর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় টেপরোহিত্য করেন সংস্কৃতি আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রবীণ নেতা সুধী প্রধান। সভায় প্রত্যেক বক্তাই নাট্য আন্দোলনের ওপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে নাট্যকর্মীসহ সমস্ত শিল্পকর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আজ তিরিশে মে বিকেল চারটায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে গণডেপুটেশন দেবার কথা। এইদিন নাট্যকর্মীদের একটি মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বের হয়ে এই গণডেপুটেশন দেবে বলে কমিটির সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। নাট্য অঙ্গনের সভায় বক্তব্য রাখেন দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস সেন পরেশ ধর রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঞ্চন দাশগুপ্ত কিশলয় সেন, শিশির সেন, ধূর্জটি ভট্টাচার্য, তরুণ সেন শর্মা এবং দুলাল দত্ত। নাট্য কর্মীদের বিগত কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবের সফল রূপায়ণ এবং তিরিশে মের গণডেপুটেশনে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন চিররঞ্জন দাস এবং প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন সাধন গুহ। নাট্য কর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি জানিয়েছেন যে, শুধু নাট্য কর্মীরাই নন, মৃণাল সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চলচ্চিত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও এই আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন।

পাঁচিশে মে এ বি টিএ হলে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর এক সভাতেও নাট্যকর বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে জানিয়ে আজকের গণডেপুটেশনকে সফল করার আহ্বান দেওয়া হয়েছে। এই সভায় অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য পরেশ ধর, অরুণেশ মুখোপাধ্যায় এবং ইন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন

ভ্রম সংশোধন

"চীনের পার্টি লাইন ও সি পি আই (এম) নেতৃত্ব" শীর্ষক রচনার পঞ্চম কলামের ত্রয়োদশ পংক্তি হবে "শোধনবাদীদের বিকৃত ব্যাখ্যায়" এবং তারপর পড়তে হবে "যার নির্লজ্জতার্থ" হলো।"—এই পংক্তিটি।

পুলিশী অভিযান

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

জেলে আটক মহিলা রাজবন্দীরা। কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ছাত্রীদের একাংশ মদাপ হয়ে ক্লাশে ঢুকছে বাহাত্তরের মধ্যভাগ থেকে এ দৃশ্য আদৌ নতুন নয়। এবং, যে পুলিশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবনৈতিক অভ্যাস সঞ্চারমান সেই পুলিশ নেমেছে অশালীন কার্যকলাপ বিরোধী অভিযানে। যুব কংগ্রেসীদের ধন্যবাদ যে তাদের অন্তর্কলহে এই সুন্দর পুলিশী প্রহসনটি দেশবাসী প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেল।

আক্রমণ শুরু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চেষ্টা চলছে কংগ্রেসী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সাহায্য পাবার।

কোন চক্রান্তই মেহনতী মানুষের আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না। হয়ত সাময়িক ভাবে এই আন্দোলনকে কোণঠাসা করা যেতে পারে। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দীক্ষায় সঠিক পদক্ষেপে মেহনতী মানুষের আন্দোলনের জয় অবশ্যম্ভাবী। ভিয়েতনামের অসংখ্য শহীদের রক্তে ইতিহাসের পাতায় একথা আবার নতুন করে লেখা হল।

মুক্তি সংগ্রাম

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

মার্কিন মিশনের বেশীর ভাগ অফিস বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মনে হয়, লাওস মার্কিন সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটবে। লাওসে দেশপ্রেমিক শক্তির বিজয়ের ফলে ইন্দোচীনে বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নতুন এক ভারসাম্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন বিরোধী এক দেশপ্রেমিক পরিমণ্ডল উঠেছে। ফলে তাইল্যান্ড আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে। মনে রাখা দরকার, তাইল্যান্ডে প্রবল মার্কিন বিরোধী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইল্যান্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে তাই ভূখণ্ড ব্যবহারের জন্য (তাই বিমান ঘাঁটি) ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছে। তাইল্যান্ড আজ বুঝেছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচরগিরি করে আখেরে পস্তাতে হয়। যেমন হয়েছে নলচক্রকে কাম্বোডিয়ায়। এছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আবহাওয়ায় তাইল্যান্ডের পক্ষে একটি পথই খোলা তা হল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে তাইল্যান্ডকে গড়ে তোলা এবং এটা কেবল সম্ভব তখনই যখন মার্কিনী শেকল তাইল্যান্ড পুরোপুরি ছিঁড়ে ফেলতে পারবে, তার আগে নয়।

পঞ্চনগরের ধানবীজ এসেছে
বিনা পারমিটে অবাধ বিক্রয়

উন্নতধরণের সরু রত্না, ডয়ো আই আর ৮ পাবেন

পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা মেটাতে ডিলারগণ যেন অবিলম্বে ধান বীজ ডেলিভারী নিয়ে চাষীভাইদের সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। চাষীভাইগণ যদি পঞ্চনগরের স্থানীয় ডিলারের কাছে ধানবীজ না পান তাহলে আপাততঃ নীচের ঠিকানায় ডিসট্রিবিউটরস-এর কাছ থেকে দরকার মত চাষের জন্য ধানবীজ নিয়ে যেতে পারেন। এখন আর কোন প্রকার পারমিটের প্রয়োজন হবে না।

কিছু জানতে হলে যোগাযোগ করুন ঃ

শ্রীআর কি সাহা, রিজিওন্যাল মার্কেটিং অফিসার—

তরাই ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ

পি-৮৫/২, সি আই টি রোড, ইস্টালী পদ্মপুকুরের মোড় কলিকাতা-১৪

টেলিফোন : ৪৪-৭৫০২, গ্রাম : তরাইনিগম, বাস রুট ১০, ৩৩, ৩৯, ৪৫

ডিসট্রিবিউটর্স (সারা পশ্চিম বাংলা)

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
কৃষি বিভাগ
৩৭এ, ৪৩/২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪
টেলিফোন-২৪-৪৩৮১,৮২ টেলিগ্রাম-রাইসকিংস

অফিস খোলা ঃ প্রতিদিন সকাল ১০টা হতে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ
শনিবার বেলা ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAI

নরঘাট সেতুর কাজে দেরী কেন ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯৭৫ সালের মধ্যেই নরঘাট সেতুর কাজ শেষ হবে এবং ওই সেতু সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেয়া হবে।

নরঘাট সেতুর কাজ শেষ হওয়া দূরের কথা, আবার নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। এবারকার টেন্ডারে বরাদ্দ করা হয়েছে এক কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকা এবং দায়িত্ব নিয়েছে একটি বে-সরকারী সংস্থা। কিন্তু পূর্বেকার দায়িত্বে ছিল চন্দ্র এন্ড কোং। তারা ১৯৬৭ সালে মাত্র ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকায় কাজ শেষ করার দায়িত্ব নিয়েছিল, পরে অবশ্য তাদের অনুরোধে সরকার বরাদ্দীকৃত অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে করেন পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। কিন্তু তাতেও কাজ এগোয়নি। সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্যই পঁচাত্তর লক্ষ টাকার কাজকে এক কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকায় করার জন্য নতুন করে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। তমলুক মহকুমার নরঘাটে হলদী নদীর উপর নরঘাট সেতুর কাজ নতুন করে শুরু হতে চলেছে। কাজের যে শম্বুকগতি লক্ষ করলাম তাতে আগামী পাঁচ বছরেও শেষ হবে কিনা বলা যায় না। অথচ একথা জোর করেই বলতে পারা যায় যে সরকারী প্রশাসন যদি একটু তৎপর হয় এবং বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীভোলা সেন যদি এদিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি দিতেন তাহলে হয়তো দুই তিন বছরের মধ্যেই ব্রীজটি চালু করা যেত এবং গরীব জনসাধারণের প্রায় দু কোটি টাকা জলে যাবার হাত থেকে বাঁচত।

তমলুক, কন্টাই, ঘাটাল এই তিনটি মহকুমা নিয়ে তাম্রলিপ্ত জেলা হবার প্রস্তাব হয়েছে এবং তা কার্যকরী করার জন্য তমলুকে বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। যদি তাম্রলিপ্ত জেলা করার সদিচ্ছা সরকারের আদৌ থেকে থাকে তাহলে সেদিক থেকেও এই নরঘাট সেতুর কাজ ত্বরান্বিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। তমলুক মহকুমার জনসাধারণ এবং কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে, প্রত্যেকেরই ধারণা যে, নরঘাট সেতুর কাজে বিলম্ব হওয়ার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। স্থানীয় বিধান সভা সদস্যের অভিযোগ যে, বিধান সভায় এই নরঘাট সেতু প্রসঙ্গে বার বার প্রশ্ন তুলেও কোন লাভ হয়নি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সৃষ্ট সামুদ্রিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দীঘার গুরুত্ব অসাধারণ। প্রতি-বছর বেশী রাজ্যগুলি থেকে অনেকেই আসেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র দীঘাতে শরীর সারাতে এবং ছুটির অবসর বিনোদনের জন্য। সরাসরি রাস্তা না থাকায় সকলকেই খড়গপুর হয়ে ঘুরে আসতে হয়, ফলে যাত্রীদের সময় এবং অর্থক্ষতি স্বীকার করতে হয়। যি এই নরঘাট সেতুর কাজ শেষ হ- দীঘার দূরত্ব ষাট মাইলের মত যেত। তাছাড়া দীঘা জুনপুটের কলকাতার বাজারের মাছের অ মেটায়। জনৈক মাছ ব্যবসায়ীর অ মত—"দীঘা বা জুনপুটে মা- কেনা দাম যা পড়ে তার থেকে প বহন ব্যয় পড়ে অনেক বেশী। স- বেশী লাগার জন্য বরফ সেও খরচও পড়ে বেশী, ফলে কলকা মানুষকে দীঘা জুনপুটের কমদ- মাছ বেশী দাম দিয়ে কিনতে হ- অনেক সময় আবার সাধারণ ম ষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে দীঘা এবং জুনপুটের মাছ।"

ফিলিপস কারখানায়
৭০০ কর্মী লে-অফ

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

বাইশে মে ফিলিপস্ কারখানার কর্তৃপক্ষ এক আদেশ জারী করে কলিকাতায় তাঁদের তিনটি কারখানার প্রায় সাতশত শ্রমিককে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য প্রতি সপ্তাহে দু দিন করে লে-অফ করেছেন। প্রায় পাঁচশত মহিলা শ্রমিক এই লে-অফের আওতায় পড়েছেন।

লে-অফ আদেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে তিনটি কারখানার শ্রমিক কর্মচারীগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ফিলিপস্-এর প্রধান কারখানার গেটে (ক্যানেস্ট রোড) রাত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অবস্থান করেন ও পারসোনেল ম্যানেজারের নিকট গণ ডেপুটেশন দেন।

অবিলম্বে এই বে-আইনী লে-অফ এর আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে সকল কারখানার শ্রমিক কর্মচারীবৃন্দ দুই ঘন্টার জন্য প্রতীক কর্ম-বিরতি পালন করেন ও লে-অফ শ্রমিকরা কারখানার অভ্যন্তরে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

রেডিও লাইট প্রচুর পরিমাণে স্টক হয়ে যাওয়ার জন্য এবং প্রতিকূল বাজারের অজুহাতে মালিক পক্ষ এই "লে অফ" আদেশ জারী করেছেন এবং আরও শ্রমিক কর্মচারীকে লে-অফের আওতায় ফেলার চক্রান্ত করছেন। এছাড়া কর্তৃপক্ষ গত দু মাসে একশ পঞ্চাশ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছেন। এই লে-অফ ও ছাঁটাইয়ের কোন যৌক্তিকতা নেই। লে-অফ আদেশ প্রত্যাহার ও ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবীতে শনিবার চব্বিশে মে শ্রমমন্ত্রী ও শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর দপ্তরে শ্রমিক কর্মচারীর তরফ থেকে গণ-ডেপুটেশান দেওয়া হয়।

MOVEMENT IN BIHAR!

Bokaro Steel launches Bihar into the vanguard of India's industrial revolution.

Bihar today A place of activity. Of social ferment. And Bokaro, situated in the mineral-rich belt of Bihar, contributes to the changing order a movement of its own. A movement towards national prosperity, growth and progress.

Towards self-sufficiency

To India, Bokaro means a variety of different things which ultimately culminate in one word . progress. Technical self-sufficiency, increased production, economic prosperity and the promise of a better tomorrow Bokaro is a symbol of all these projections into the future.

Bokaro is not only the biggest industrial undertaking in the country, it is also India's biggest single step towards technical and economic self-sufficiency Because right from its inception Bokaro was conceived as India's first indigenous steel plant. Most of the sophisticated equipment utilised for the complex has been made in India for the first time, especially for Bokaro.

Towards rapid industrialisation

An undertaking of Bokaro's unprecedented size and complexity,-with its planned capacity of 5 5 million tonnes, symbolises the rapidity of India's industrial progress Because a few short years ago, where Bokaro stands today there was nothing Nothing but a vast area of sparsely cultivated land. With an unrealised potential for wealth and progress. Suddenly that potential was realised dramatically. The industrial movement gained ground rapidly. And Bokaro, the country's largest steel complex, emerged.

Towards employment opportunities

Immediately, tremendous employment opportunities were created. People of the area, displaced as a result of land acquired for the project, were absorbed into the complex. New skills were taught and rapidly mastered, new crafts learned. People from all parts of the country, from all walks of life, found themselves acquiring technical know-how and specialised training at Bokaro.

Towards a better future

And these people, living symbols of a new industrial culture, make Bokaro what it is today—the pride of new India. Committed to fulfilling the great responsibility of producing 4.75 million tonnes of steel by the end of the Fifth Plan —more than one-fourth the country's total supply. Impelling the nation steadily along the road towards national prosperity And building a brighter future for coming generations

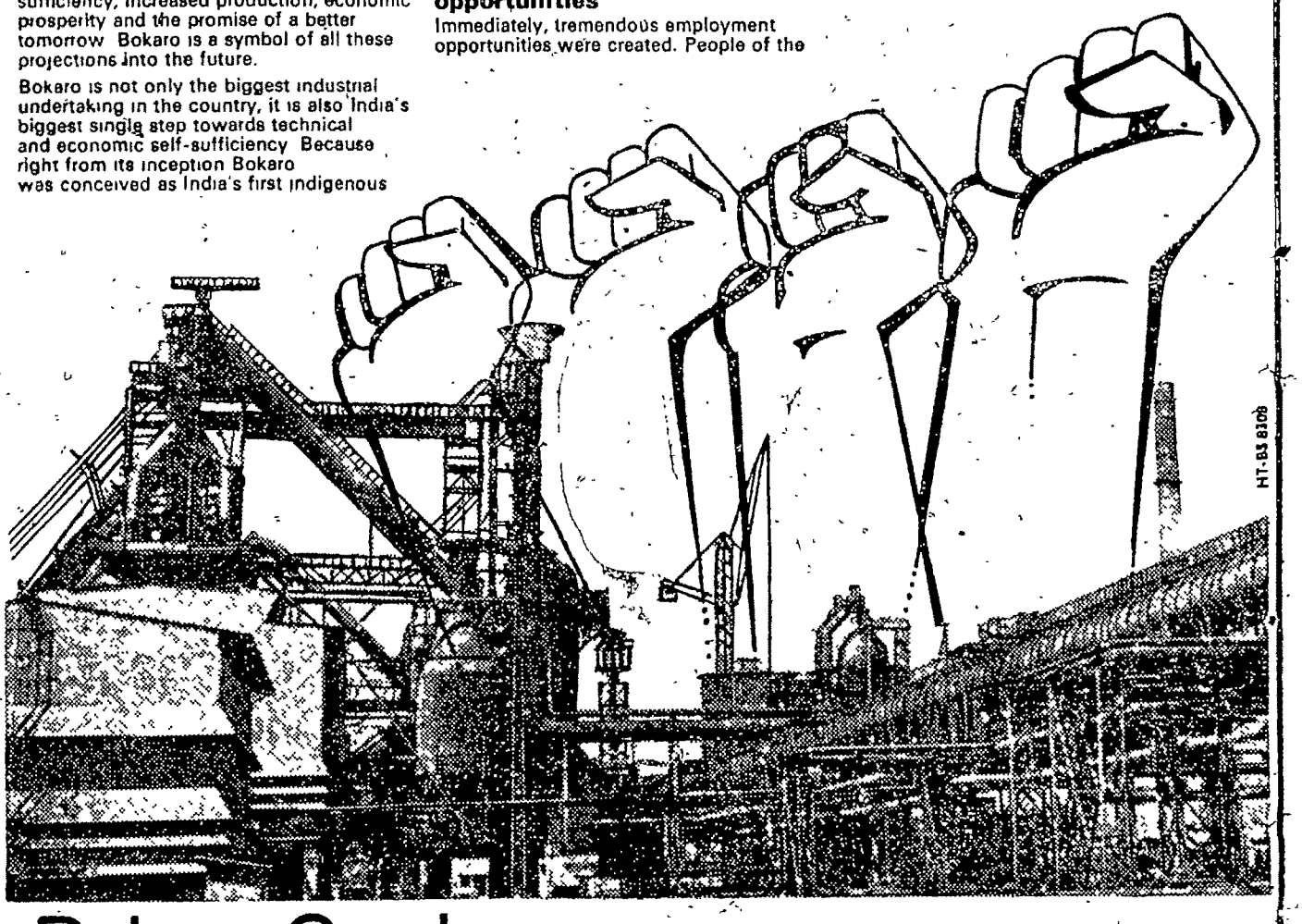

HT-83 8108

Bokaro Steel—INDIA'S LARGEST STEEL COMPLEX

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক অভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

বিরোধী শক্তির **দর্পণ** সার্বিক ঐক্য চাই

১৮শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৬ই জুন ১৯৭৫ ॥ দাম ৩০ পয়সা

সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে : জনসমাবেশে জয়প্রকাশের আহ্বান

চাণক্য সরকার

ছবিতে ব্রিগেড পরেড মাঠে বিরাট জনসমাবেশের একাংশের চেহারা দেখা যাচ্ছে। ছবি তোলার মুহূর্তে মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ (কেন্দ্রে জয়প্রকাশ আর বাঁদিকে জ্যোতিবাবু ও ডানদিকে প্রফুল্ল সেন) সমাবেশের সঙ্গে একযোগে হাত তুলেছেন সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবের পক্ষে।

প্রস্তাব পেশ করেন ডঃ অশোক মিত্র। পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাবেশ একযোগে হাত তুলে ঘোষণা করে দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজত্ব বিরাজ করছে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে কিছু নেই এবং সভ্য আইনের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবী করে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে :

"পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মতামতের মানুষের এই সমাবেশ পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর পরিকল্পিত ও ক্রমাগত আক্রমণের জন্য, সমস্ত বিরোধীপক্ষ ও ভিন্ন মতের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে, সন্ত্রাস ও হিংস্র পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য এবং অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার থেকে মানুষকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করার জন্য সরকার, শাসকদল ও তার মিত্রদের কঠোর নিন্দা করছে।

"এই সমাবেশ এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করছে যে, জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং শাসক দলের স্বার্থেই জরুরী অবস্থা বহাল রাখা হয়েছে। তেমনি মিসা এবং ডি আই আর এর মত বে-আইনী আইনগুলিও কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিরোধীদের বিনা বিচারে আটক করার জন্য এবং জনসাধারণের আন্দোলনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

"পুলিশের সাহায্য নিয়ে শাসকদল ও তার মিত্ররা যে গুণ্ডামির দ্বারা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে কলকাতায় ১৯৭৫ সালের ২রা এপ্রিল ছাত্র ও যুব সমাবেশে বক্তৃতা দিতে দেয়নি, এই সমাবেশ সে ঘটনা সম্পর্কেও গভীর ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই সমাবেশ এই রাজ্যে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আইনের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জরুরী অবস্থা, মিসা, ডি আই আর ও অন্যান্য অগণতান্ত্রিক অর্ডিন্যান্সগুলির প্রত্যাহার দাবি করছে। যে জরুরী ও ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যে কলকাতায় আজ এই সমাবেশ আহ্বান করা হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ও সারা ভারতের মানুষের কাছে এই সমাবেশ আবেদন জানাচ্ছে।"

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সি পি আইয়ের মিছিলে ৮ হাজারের বেশি লোক হয়নি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেস সরকারের দরাজ সাহায্য পেয়ে ও বহু টাকাপয়সা খরচ করেও সি পি আই চার তারিখের জয়প্রকাশ বিরোধী মিছিলে বেশী লোক জমাতে পারে নি। কংগ্রেস মিছিলে লোক দেয় নি বলে রাজ্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গোপাল ব্যানার্জী খুব দুঃখ করেছেন।

রাজ্যের সমস্ত জেলার পার্টি ইউনিটকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সর্বাধিক সংখ্যায় লোক নিয়ে মিছিলে উপস্থিত থাকার জন্য। কিন্তু জেলাগুলি থেকে খুব বেশী লোক আসে নি।

মিছিল শুরু হওয়ার একটু আগে এসে দাঁড়িয়েছিলাম রাণী রাসমণি ও জওহরলাল নেহরু রোডের সংযোগস্থলে। বিরাট মিছিলটি সারি পার হতে সময় নিচ্ছিল এক মিনিট। প্রতি সারিতে লোক ছিল চার জন করে। ঐ ক্রশিং-এ মিছিলটি শেষ হতে সময় নেয় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এই হিসাবে মিছিলে যোগদানকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় সাত হাজার পঁচিশো ষাট জন। সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃবর্গ মিলিয়ে মোট সংখ্যা আট হাজার অতিক্রম করে নি।

মিছিলে একদল চাঁংড়া ছেলে হিন্দী ফিল্মের কায়দায় টুইস্ট নেচে শ্লোগান দিচ্ছিল। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। কিন্তু তাঁরা সি পি আই-এর এই অধঃপতন দেখে আশ্চর্য হন

মহামিছিল

পাঁচই জুনের কলকাতা নবরূপে উদ্ভাসিত। সভার শেষে বের হয় মিছিল। পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের মিছিল। সামনে মোটর সাইকেলের পাইলট। পরে জীপে দাঁড়ায়মান জয়প্রকাশ নারায়ণ। তারপর একটি জীপে দণ্ডায়মান জ্যোতি বসু ও যতীন চক্রবর্তী। পরবর্তী জীপে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কোন দলীয় নিশান ছিল না, কিন্তু রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কর্মীদের দণ্ড মকুব ও গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী সম্বলিত অসংখ্য প্লেকার্ডে মিছিলটি ছিল সুসজ্জিত। সর্বাগ্রে একটি জীপে ছিলেন প্রশান্ত শূর ও অশোক দাশগুপ্ত এবং তারাই মিছিল পরিচালনা করছিলেন। চৌরঙ্গী, ধর্মতলা, সার্কুলার রোড, হ্যারেসন রোড ও সেন্ট্রাল এভিনিউ মিছিল এসে শেষ হয় শহীদ মিনারে।

এদিন পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাণ্ডেল, নৈহাটি এবং রাণাঘাট ইত্যাদি স্টেশনে মিছিলে যোগদানের জন্য প্রস্তুত যাত্রীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করা হয় এবং অসংখ্য কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্পাদকীয়

কারা প্রকৃত ফ্যাসিবাদী

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীরা অবশেষে ক্ষমতার লড়াই, মেয়েলি কোঁদল এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানানো আপাততঃ মুলতুবি রেখে প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশে "অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী" জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে আগামী ৭ই জুন রাজপথে নামছেন। যেদিন থেকে জয়প্রকাশ কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং সক্রিয় আন্দোলনে নেমেছেন প্রায় সেদিন থেকেই প্রধানমন্ত্রী ও তার পারিষদবর্গ এবং ভক্তবৃন্দ ফ্যাসিবাদের ধুয়া তুলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। নিজেদের ক্রিপ্টো-ফ্যাসিস্ট চরিত্র আড়াল করার জন্যই যে তারা গলা ফাটাচ্ছেন একথা বুঝতে আজ আর কারো বাকি নেই।

বামপন্থী শ্লোগানের আড়ালে কংগ্রেস দল ও সরকারের চরিত্র পুরোপুরি ফ্যাসিস্ত। জন-বিরোধী মিসা আইন প্রকৃতপক্ষে এদেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করে নিয়েছে। কংগ্রেস দল ও সরকারের স্বার্থে যে কোন সময় যে কোন লোককে আটক করার ঘটনা আকছার ঘটছে। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে বিনা বিচারে কারান্তরালে। বছরের পর বছর বিচারের নামে প্রহসন চলছে। একবার ছাড়া পেলেও বামপন্থী কর্মীদের আবার গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। জেলে বন্দী হত্যা এখন নিয়মিত ব্যাপার।

অপর দিকে মন্ত্রী ও কংগ্রেসী নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা মহা অপরাধ। "ফ্যাসিবাদ-বিরোধী" এইসব নেতাদের মস্তান বাহিনী এইসব কাগজের অফিসে চড়াও হয়ে জিনিসপত্র ভাঙছে, কাগজ ও বইয়ে আগুন লাগাচ্ছে বা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, লোককে মারধর করছে। বলা বাহুল্য এইসব কাগজের লোকবল অর্থবল কোনটাই নেই। অতএব এরা অসহায়। কংগ্রেসী মস্তানদের হামলা আর মানহানির মামলার খড়্গ এদের মাথার ওপর নিরন্তর ঝুলছে।

কংগ্রেস নেতা মন্ত্রী, এমন কি সাধারণ এম এলএ এম পিও সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে কি পরিমাণ সম্পদ জমিয়েছেন একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হলে হয়ত জানা যেতে পারে। ভারতবর্ষ যদি সত্যিই গণতান্ত্রিক দেশ হত, তাহলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি একথা বলেই দায়মুক্তির স্বস্তিশ্বাস ফেলতে পারতেন যে, মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের সম্পদের তালিকা দিয়েছে এটাই যথেষ্ট? প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব কংগ্রেসীই বোঝেন যে, তারা কি ভাবে ধীরে ধীরে এদেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন।

গণতন্ত্রের প্রতি সবচেয়ে বড় আঘাত সুপ্রীম কোর্টের তিনজন বিচারপতিকে সুপারসিড করার ঘটনা। নির্বাচনে কারচুপি, ভাড়াটে মস্তান বাহিনী দিয়ে নির্বাচন কেন্দ্রে সন্ত্রাস সৃষ্টি, বামপন্থী কর্মীদের হত্যা ও প্রহার, নির্বাচনে কালো টাকার খেলা—এ সবই গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিবাদের মহড়া।

কংগ্রেসীরা সব ব্যাপারেই এখন প্রতিক্রিয়াশীল আর সি আই এ জুজুর ভয় দেখিয়ে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রকৃত ও ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়াশীল হল কংগ্রেস দল ও কংগ্রেসীরা। আর বোধহয় সি আই এর কথা এত বেশি করে বলা হয় কেজি বি-র কার্যকলাপ আড়াল করার জন্য।

এল এন মিশ্র হত্যাকাণ্ড রাইখস্ট্যাগে অগ্নিসংযোগের ঘটনা মনে পড়িয়ে দেয়। অন্যান্য অনেক চাঞ্চল্যকর ব্যাপারেও যেমন, মিশ্র হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেও তেমনি তদন্ত ধামাচাপা পড়ে গেল। কিন্তু রাইখস্ট্যাগের ঘটনার আড়ালে ফ্যাসিস্ত ষড়যন্ত্রের কথা কেউ চাপা দিতে পারেনি, অতএব কংগ্রেসীদের অপপ্রচারও একদিন ব্যর্থ হবে।

জনসমাবেশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সু-শৃঙ্খল সভা। আগের স্বীকৃত ব্যবস্থানুযায়ী কোন বিশেষ দলের পতাকা কোথাও দেখা যায় নি। পতাকার চেয়ে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের ঐক্য বড় কথা। এই কথাই সভার ঘোষণা। আজ বিচারের সময় নেই কে প্রতিক্রিয়ার দালাল আর কেই বা প্রগতির পক্ষে। মানুষের দাবীর জন্য লড়াইয়ে কারা এগিয়ে আসছেন এই অবরুদ্ধ অবস্থা অবসানের জন্য তাই বর্তমান অবস্থায় বিচার্য।

সমাবেশে একমাত্র বক্তা জয়প্রকাশ বলেছেন: শুধুমাত্র প্রস্তাব পাশ করে বাড়ী গিয়ে ঘুমোলে চলবে না। অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নামতে হবে, বর্তমান অপশাসনের বিরুদ্ধে। মহল্লায় মহল্লায় ছাত্র যুব ও অন্যান্য মানুষের সংগ্রামী সংগঠন গড়তে হবে। আর সারা রাজ্যস্তরে থাকবে লোক সংগ্রাম সমিতি। এই সমিতির নেতৃত্বে থাকবেন সমস্ত বিরোধীদলের নেতারা আর সমাজের বিভিন্ন অংশের ছাত্র, যুব, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, জজ, ইত্যাদি মানুষের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা।

মঞ্চে উপবিষ্ট জ্যোতিবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জয়প্রকাশ বলেন পশ্চিমবঙ্গে বাহাত্তরের নির্বাচনে জ্যোতিবাবুর নির্বাচনী কেন্দ্র বরানগরে সকাল দশটার মধ্যে ভোট শেষ হয়ে যায়। দুঃখের কথা গোটা কয়েক তথাকথিত ছাত্র পরিষদ যুব কংগ্রেসের ছোকরারা বোমা ছুঁড়ে পিস্তল দেখিয়ে সমস্ত নির্বাচনী বুথকে কব্জা করে নিল।

জয়প্রকাশ বলেন এই ধরণের অবস্থা আবার ঘটবে হিয়াত্তরের লোকসভা নির্বাচনে, যদি না সাধারণ মানুষের সংগঠন গড়ে ওঠে। আবার যদি ওরা বোমা পিস্তল নিয়ে এগিয়ে আসে মানুষ ওদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

তিনি বলেন: "আমি মানুষকে হিংসার পথ নিতে বলছি না। সংগঠিত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিরোধই একমাত্র পথ।"

তবে জয়প্রকাশের সন্দেহ থেকে যায় এই সামাজিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন সম্ভব কিনা। এই কাঠামোয় মিলমালিক চোরা ব্যবসাদাররা শাসক দলকে প্রচুর টাকা দেয়ে নির্বাচনে নানা ফন্দী ফিকির করার জন্য। টাকা ত আর অমনি দেবে না। বদলে তারা আরও টাকা লোটার ব্যবস্থা পাকা করতে চাইবে।

যুব কংগ্রেসী নেতার বেআইনী নিয়োগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সার্ভিস কমিশন ছাড়া খোদ মন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা পৌরসভায় বে-আইনী অফিসার নিয়োগের ঢালাও কারবার শুরু হয়ে গেছে। পৌর মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী স্বয়ং নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মকানুন বরবাদ করে তাঁর একান্ত প্রিয়জন যুব কংগ্রেস নেতা বীরেন মহান্তিকে সরাসরি ডেপুটি এডুকেশন অফিসার পদে বসিয়ে দেওয়ায় পৌর কর্মচারী মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

পৌরসভার আইন অনুসারে কোন বিভাগের কোন অফিসার নিয়োগ করতে হলে তার জন্য প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদি উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার। এছাড়া উপযুক্ত প্রার্থীর মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন ছাড়াই বীরেনবাবুকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয় এবং উনত্রিশে মে তিনি কাজে যথারীতি যোগদান করেন।

বীরেনবাবু কলকাতা পৌরসভার কর্মী নন। তিনি পৌর মন্ত্রীদ্বয় পঞ্চায়েতের একজন নেতা এবং সুব্রতবাবুর অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলে পরিচিত। বীরেন মহান্তিই ডেপুটি এডুকেশন অফিসার পদে নিযুক্ত হবার একমাত্র যোগ্যতম প্রার্থী কিনা পৌর পদস্থ অফিসার মহলে তা নিয়ে কানাঘুসা চলছে। তবে মন্ত্রী মশাই যেখানে প্রধান খুঁটি, বে-আইনী হলেও তা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে কেউ সাহস করছে না।

তবে সংগঠিত মানুষের সার্বিক ঐক্যের মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান নিহিত। তাই জয়প্রকাশজী সমস্ত বিরোধী শক্তির ঐক্যের ওপর জোর দেন।

তাঁর ধারণা এই ঐক্য সম্ভব। যদি ১৪টি দল ও গোষ্ঠী নিজেদের পতাকার উর্দ্ধে উঠে এই সমাবেশ সংগঠিত করতে পারে তবে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যও এই ঐক্য প্রসারিত হওয়া সম্ভব।

সমাবেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন নবনির্মাণ সমিতির সাতটি দল আর মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সমেত সাতটি বামপন্থী দল। শেষোক্ত দলগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই তত্ত্ব বহু সংগ্রামে পরীক্ষিত বাস্তব সত্য। সঠিক তত্ত্বই বড় কথা নয়, নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে এর সঠিক প্রয়োগের জন্য।

রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য সমাজের কল্যাণে মানুষের সার্বিক ঐক্য সাধন। এই ঐক্যে সংকীর্ণতার কোন স্থান নেই। মার্কসবাদ-লেলিনবাদে যাঁদের প্রত্যয় ও নিষ্ঠা আছে তাঁদের দক্ষিণপন্থী বা উগ্র বামপন্থী ইত্যাদি ব্যাপারে কোন সংশয় থাকার কথা নয়।

বাস্তব অবস্থায় কয়েকটা মূল দাবীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গড়ে তোলাই আজকের দিনের একমাত্র পথ। যদি দলের পতাকা এই ঐক্যে বাধা হয়, কি দরকার পতাকার?

স্মরণ রাখা দরকার, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নেতা হো চি মিন ভিয়েতনামে কমিউনিষ্ট পার্টি নামটাই বিলোপ সাধন করেছিলেন ঐক্যের খাতিরে। পরিণতিতে মানুষের সার্বিক ঐক্য আজকের দুনিয়ার দুর্ধর্ষ বোম্বেটে সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ত্রিশ বছরের নিরলস সংগ্রামে পরাস্ত করল।

জয়প্রকাশ সমাবেশে ঠিক কথাই বলেছেন: মানুষ ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব চাইছে। দেশে বৈপ্লবিক অবস্থা বর্তমান। সংগঠন ও সঠিক ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ছাড়া সার্বিক বিপ্লব সম্ভব নয়।

কংগ্রেসীদের সংঘর্ষ

বর্ধমান, দোসরা জুন, মঙ্গলকোট থানার জবগ্রাম থেকে পলাশবন্ধু পথে শাসক কংগ্রেসের দু দল লোকের মধ্যে গত সাতাশে মে বিকেলে এক সংঘর্ষের সময়ে বন্দুকে গুলীতে শ্রীমতী কমলাবালা দত্ত নামে একজন মহিলা আহত হয়েছে বলে পুলিশের সূত্রে জানা গেছে।

জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, শাসক কংগ্রেসের সমর্থক গঙ্গাধর রায় কয়েকজন সঙ্গীসহ জবগ্রাম থেকে যখন পলাশবন্ধু যাচ্ছিলেন তখন দিলীপ দাঁ নামে অপর একজন শাসক কংগ্রেস কর্মী শ্রীরায়ের প্রতি গুলী বর্ষণ করে।

এর পরেই গঙ্গাধর রায় দলবল সহ দিলীপ দাঁর বাড়ীতে গিয়ে হামলা করে বাড়ীর লোকদের প্রচণ্ড মারধর করেছে। দিলীপ দাঁর বাবা পুলিশের কাছে শেষোক্ত অভিযোগ করেছেন।

ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি : একটি সমীক্ষা

সাধন গুহ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী? নিজের দলে অথবা প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে তিনি কি একজন দক্ষ নায়িকা হিসেবে বিবেচিত? অধুনা সৃষ্ট "যুগ যুগ জিও" ইত্যাদি ধ্বনির অন্তরালবর্তী তাঁর যে রূপটি বহুবিধ বিশেষণাত্মক অভিধাযুক্ত প্রশংসার শিরোনামা দিয়ে গোপন রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস চলছে তা বোধহয় খুব সফল পরিণতি লাভ করছেনা। সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম ব্যর্থতা এখন সাংবাদিকদেরও বিস্মিত করে তুলেছে। আমার সাম্প্রতিক দিল্লী সফরের সময় রাজধানীর সাংবাদিক বন্ধুদের একজন স্পষ্টতই বললেন, "মোর সি ইজ গাইডেড এ্যাণ্ড লেসার সি ক্যান গাইড।" অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর অতিমাত্রায় আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরতাই এই মন্তব্যের উপলক্ষ।

সাংবাদিক বন্ধুরা যেসব মন্তব্য করেছেন তার নির্গলিতার্থ এই দাঁড়ায় যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র শ্রীমতী গান্ধীকে ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারছে বলেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা আপাতদৃষ্টিতে নিরঙ্কুশ। অন্য যে কোন ব্যক্তির তুলনায় আমলাতন্ত্র শ্রীমতী গান্ধীকেই বেশী পছন্দ করে এবং ইন্দিরাজীর পছন্দসই তোষামোদেও তারা অভ্যস্ত এবং ব্যস্ত। আমলাতন্ত্রীদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন যারা কোন নির্দেশের যথার্থ্য উত্থাপন করে কদাচিৎ কিছু কিছু প্রশ্ন পেশ করে থাকেন। প্রসঙ্গতঃ, সিকিমকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার প্রশ্নটি ধরা যায়। আমলাতন্ত্রীদের কেউ কেউ নাকি চোগিয়ালের প্রাসাদরক্ষীদের নিরস্ত্রীকরণের আইনগত অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, ১৯৭৩ সালের মে চুক্তি অনুযায়ী প্রাসাদ প্রহরীরা সরাসরি চোগিয়ালের এক্তিয়ারভুক্ত এবং এই চুক্তি লঙ্ঘন করে হঠাৎ প্রাসাদরক্ষীদের নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে বলেও নাকি এইসব আমলারা আশংকা প্রকাশ করেছিলেন।

এইসব আমলাদের আর একটি প্রস্তাবও ছিল যে, গণভোটের দিন আরও পিছিয়ে দেওয়া হোক। এটা অবশ্যই সত্য নয় যে, এইসব আমলারা গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব কথা বলেছেন। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্বজনমতকে ভাঁওতা দেওয়া অর্থাৎ, সিকিমের বহু গ্রামাঞ্চল এখন তুষারাবৃত। সেখানকার মানুষের পক্ষে গণভোটে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে, গণভোটের ফাঁকিবাজি যাতে ধরা না পড়ে তার লোক দেখানো একটা মহড়ার প্রস্তাবই এরা দিয়েছিলেন। কিন্তু, ইন্দিরাজী তা শুনতে রাজী হন নি, কারণ যে কোন মূল্য দিয়েই হোক আসন্ন নির্বাচনে (যদি তা আদৌ অনুষ্ঠিত হয়) তাঁর ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথটি তিনি সুগম রাখতে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি তিনি এসব আমলাদেরও জব্দ করার পথ পরিষ্কার করতে চাইছেন। আগামী ২।৩ মাসের মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দপ্তরের কয়েকটি সেক্রেটারীর পদ খালি হবে অবসরজনিত কারণে। সিনিওরিটির প্রশ্ন বরবাদ করে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেলকে প্রেরিত এক নির্দেশে এতদ্‌ক্ষেত্রে "সিলেকটিভ এ্যাপ্রোচের" কথা বলা হয়েছে। এই নির্দেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সিনিয়র অফিসারদের একটি তালিকা পাঠানো হয়েছে রিসার্চ এ্যাণ্ড এনালাইসিস উইং (যে দপ্তরের ভূমিকা সি, আই, এ এবং কে, জি, বির সমতুল্য)-এর কাছে। এসব অফিসারদের সার্ভিস রেকর্ডও এদের হাতে দেওয়া হয়েছে এবং এই গোয়েন্দা শাখার অনুমোদন সহ তালিকা চলে গেছে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক প্রতিবেদনে সুদক্ষ সাংবাদিক অশ্বিনী সারিন সংশ্লিষ্ট আমলাদের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন, "Senior officers of the Indian Administrative service are reported to have formed an action committe to fight what one of them descrited as a political whealer dealing in top appointments."

এই ঘটনা থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ব্যক্তিত্ব বিস্তার করে প্রশাসনিক আমলাদের পরিচালনা করার যোগ্যতা অদ্যাবধি অর্জন করতে পারেননি এবং উত্তরোত্তর যুক্তি দিয়ে আমলাদের যুক্তিকে খণ্ডন করে নির্দেশ পালনে বাধ্য করার ক্ষমতাও তাঁর নেই। ফলে বশম্বদ সচিবমণ্ডলী গঠনের দিকেই তাঁর প্রথম এবং প্রধান নজর। শ্রীমতী গান্ধী সচেতন অফিসারদের ভবিষ্যতও বোধহয় সোজা হাতেই নির্ধারিত করতে চান, কারণ অশ্বিনী সারিনের মতে, "There is a lurking fear that a purge of officers, whose political loyalty to the Government is suspect, is in the offing."

একথা বলাই বাহুল্য যে, প্রশাসনের ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের আমলাতান্ত্রিক উপদলীয় চক্রান্তের অতি সহজ শিকার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এটা নিশ্চয় একজন দক্ষ নায়িকা অথবা প্রশাসকের পরিচায়ক নয়। সম্ভবতঃ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই চরম দুর্বলতা কেন্দ্র এবং রাজ্যের আমলাতন্ত্রের নখদর্পণে বলেই আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি এক চরম পর্যায়ে এসে গেছে। প্রধানমন্ত্রী সেখানে অসহায়, কিছু বলবার, কিছু করবার ক্ষমতা তাঁর নেই, কারণ, তাহলে তাঁর মসনদে টান পড়বে—এটা তাঁর অজানা নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাহ্যতঃ যত বেপরোয়া ভাবই দেখাননা কেন, বিরোধী পক্ষের সঙ্গে মোকাবিলার ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতা অত্যন্ত সুবিদিত। একই সংগে দিল্লী বম্বে এবং মাদ্রাজ থেকে প্রচারিত একটি প্রভাবশালী সংবাদ সাপ্তাহিকের নয়াদিল্লীস্থ সংসদীয় সংবাদদাতা এ সম্পর্কে উক্ত কাগজের ২০শে এপ্রিলের দিল্লী সংস্করণে লিখেছেন,

(১) From her faltering days as a parliamentarian the Prime Minister has learned a great deal but peahaps not enough. Her Conguinding speeches are known for her trite sentences laboriously written up. As for answering questions she has left much of the Job to her deputies. Very seldom does she speak in debates.

(২) Often when the house is seized for tricky a vital issues, the opposition finds the Prime Minister almost invariably absent and her colleagues in the treasury benches look helpless for want of guidance.

বস্তুতঃ, সংসদীয় কার্য পরিচালনায় ইন্দিরা গান্ধীর অনভিজ্ঞতা তাঁকে বিরোধী পক্ষের নামে সর্বদাই আতঙ্কিত করে রাখে। ইন্দিরাজী যখন প্রধান মন্ত্রী হয়ে আসেন তখন তিনি ছিলেন রাজ্যসভার তৃতীয় সারির সদস্য। শাস্ত্রী মন্ত্রিসভায় স্থান পাবার পর তিনি সংসদীয় রাজনীতির প্রথম সারিতে আসার সুযোগ পান। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ ইন্দিরাজীর এই অনভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন এই ভেবে যে, ওঁকে দিয়ে ইচ্ছেমত কাজ চালানো যাবে। কিন্তু ইন্দিরাজী পিতার বিদ্যা কিংবা মনীষার বিন্দুমাত্র অধিকারী না হলেও উপদলীয় চক্রান্তের কায়দাটি ভালভাবেই রপ্ত করেছেন এবং প্রধান মন্ত্রীর আসনটি দখল করেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে দলীয় রাজনীতিতে নিজের আসনটি কায়েম করে নিয়েছেন।

দিল্লীর সাংবাদিক মহলে ইন্দিরাজী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে, ভদ্রমহিলা বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে পড়াশুনার ধার ধারেন না

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

পূর্ব রেলওয়ে

হিল কনসেশন রিটার্ন টিকিট এবং শ্রীনগরের জন্য রেল-বাস রিটার্ন টিকিট

দেশের বিভিন্ন শৈলনগরীতে ভ্রমণের জন্য কেবলমাত্র রেলপথের অংশটুকুর জন্য দেড়াভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধাজনক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রি গত পয়লা এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। টিকিটের মেয়াদ তিনমাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। যে কোন যাত্রাশুরুর স্টেশন থেকে শৈলনগরীর দূরত্ব কমপক্ষে ৮০০ কিলোমিটার হতে হবে। এই ধরনের টিকিট ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

শ্রীনগরের জন্য এই সুবিধাজনক ভাড়ার যাতায়াতের টিকিট হাওড়া, শিয়ালদহ এবং কলিকাতা ও হাওড়ার সিটি বুকিং অফিসগুলি হ'তে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পূর্ব রেলওয়ের পাটনা, ধানবাদ, গয়া, ভাগলপুর ও আসানসোল স্টেশন থেকেও পাওয়া যাবে। রেলভাড়া ছাড়াও জম্মু তায়ই ও শ্রীনগরের মধ্যবর্তী অংশটুকুর জন্য ৪০ টাকা হারে যাতায়াতের বাসভাড়া একই সঙ্গে নেওয়া হবে, তবে ভ্রমণের সময়ে চালু বাসভাড়া অনুযায়ী এই হারের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তিন-বছরের উপর এবং বারো বছরের কম বয়স্ক শিশুদের জন্যও একই হারে বাসভাড়া লাগবে।

তবে কোনক্রমেই ১৯৭৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যরাত্রির পরে শৈলনগরী অভিমুখে যাত্রা করা যাবে না।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে কলিকাতা ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলওয়ের ইনফরমেশন ব্যুরোর সুপারভাইজারের সঙ্গে, অথবা বিভিন্ন স্টেশনে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেন্ট
পূর্ব রেলওয়ে
কলিকাতা

TCP/ER 280/75 R2 BEN

সারা বাংলাদেশে শ্বেত সন্ত্রাস

শেখ মুজিব আজ বাংলা দেশে শ্বেত সন্ত্রাস কায়েম করেছেন। ভারতীয় যুব কংগ্রেসের কায়দায় বাংলাদেশেও ফ্যাসিস্ট যুব সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। যার অন্যতম পান্ডা শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ মণি। এই নয়া রাজাকার বাহিনী, আর সরকারী পুলিশ রক্ষী বাহিনী সারা দেশে জেল-জুলুম, গুম-খুন চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক পশ্চিমবাংলার কায়দায় ওখানে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। ওখানেও অস্ত্রের ভাষায় সরকার বিরোধীদের বক্তব্য বানচাল করা হয়েছে। লুঠ দাঙ্গা নারী ধর্ষণ প্রতিদিনের ঘটনা। কোন প্রতিকার নেই, কোন প্রতিরোধ নেই। থানা-পুলিশ নিষ্ক্রিয়। সরকার সমর্থক মস্তানদের হাতে অঢেল অস্ত্র—আধুনিক অস্ত্র। এই সব অস্ত্র নিয়ে এরা যা খুশি তাই করে।

বাংলাদেশেরে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আরেক দাঙ্গাবাজ নেতা শেখ মুজিবের পুত্র শেখ কামাল। এর বিরুদ্ধে নানা ধরণের অভিযোগ শোনা যায়। পল্টনের এক মিটিংয়ে একবার বাংলাদেশের বিরোধী নেতা আবদুর রব শেখ কামালের বিরুদ্ধে এক অভিযোগে বলেন "বাংলাদেশ ঝাঁকে ডাকাতি করতে গিয়ে শেখ কামাল পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন—এই অভিযোগের তদন্ত হোক।" তিনি শেখ কামালের বিরুদ্ধে দাঙ্গাবাজী ও লুঠতরাজের নানা অভিযোগ এনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে ব্যঙ্গ করে বলেন "প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তিনি নাকি বাংলাদেশের জনগণকে তিন বছর কিছু দিতে পারবেন না। কিন্তু এটা ঠিক নয় তিনি বাংলার জনগণকে তাঁর অদ্ভুত পুত্র শেখ কামালকে উপহার দিয়েছেন।" শেখ কামাল সম্বন্ধে বাংলাদেশের মানুষের কাছে অনেক অভিযোগ শোনা যায়। অতি আধুনিক অস্ত্র নিয়ে তার বেপরোয়া মস্তানীতে অনেকেই অতিষ্ঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন বানচাল এবং ব্যাপক খুনোখুনির ব্যাপারে শেখ কামালকে নাকি মুখ্য ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছিল। বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সভাপতি মাহবুল হক্ এবং সম্পাদক মান্নাকে এই কামালই নাকি অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও আরো নানা ধরণের অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে শেখ কামাল যুক্ত বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

পশ্চিমবাংলার মতো ওখানেও নির্বাচনের সময় জাল জুয়াচুরির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। প্রার্থী অপহরণ ব্যালটবাক্স ছিনতাই সন্ত্রাস গুম-খুন সব কিছুর আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। আতাউর রহমানের মতো প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাকেও অপহরণ করা হয়েছিল। সারা দেশে বেপরোয়া গ্রেফতারে বাংলাদেশ এক বৃহৎ কারাগারে পরিণত হয়েছে। তেয়াত্তর সালের উনত্রিশে নভেম্বর বাংলাদেশের বিরোধী পত্রিকা "গণকণ্ঠে" প্রকাশিত এক খবরে জানা যায় স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ছিয়াশি হাজার লোককে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাহাত্তর সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো উননব্বই জনকে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো তিন জনকে। অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসের হিসাব এখন পর্যন্ত দরকারী খাতায় যোগ করা হয়নি। তবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রেপ্তারের যে মাসিক গড় ছিল তাতে এই দু মাসে অন্তত আরো প্রায় আট হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঐ খবরে আরো বলা হয় হয় "অভিজ্ঞ মহলের মতে এই হার পৃথিবীর সকল স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের গ্রেপ্তারের হারকে ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি পাকিস্তান আমলেও প্রতিদিন এতো বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করা হয় নি।"

আজকে বাংলাদেশে যে সার্বিক ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে তার একটা বড় রকমের মহড়া হয়ে যায় চুয়াত্তর সালের সতেরই মার্চ ঢাকায়। ঐদিন ঊনত্রিশটি দাবী আদায়ের সমর্থনে পল্টনে লক্ষ জনতার সভাশেষে বিরোধী দল জাসদের নেতা আবদুর রব ও মেজর জলিলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও হয়। তখন পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী জনতার উপর লাঠি চার্জ ও গুলী বর্ষণ করে। তার ফলে তিপান্ন জন নিহত হয়। এবং রব, জলিল, মমতাজ বেগম সহ বহু মানুষ গ্রেপ্তার হন। ঐদিন রাতে "গণকণ্ঠে" রক্ষী ও পুলিশী হামলা হয়। এবং গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মামুদের বাসভবন থেকে তাকে গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই থেকে রব-জলিলও বাংলাদেশের কারাগারে বন্দী থাকেন।

কে এই রব? কে এই জলিল? এই অল্প বয়সী তরুণ যুব নেতা রব এক সময়ে মুজিবের ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন। তিনি অবিভক্ত ছাত্র লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন। অনেক দিন থেকেই ছাত্র সমাজের মধ্যে রবের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। একাত্তর সালের তেসরা মার্চ পল্টনের জনসমাবেশে এই রবের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ছাত্র সমাজ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেদিন স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন রবের অন্যতম সহযোগী সেদিনের ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে লক্ষ জনতা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের দুর্জয় শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই রব, সেই সিরাজ স্বাধীন বাংলায় কারারুদ্ধ হন।

মেজর জলিল ছিলেন একজন মুক্তি যোদ্ধা। বরিশালে তার সংগ্রামের অনেক স্বাক্ষর আছে। এরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের দুর্নীতিপরায়ণ আওয়ামী লীগারদের মতো ভারতে বসে বিবৃতি দিয়ে বিপ্লব করেন নি বা আনন্দে দিন কাটান নি। জীবনকে বাজি রেখে রীতিমত ঝোপে জংগলে লড়াই করেছেন।

এঁদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সেই বস্তাপচা অভিযোগ—জাতীয়তা বিরোধিতার অভিযোগ। কিন্তু এই ধরণের অভিযোগের কায়দা এতই বাসী হয়ে গিয়েছে যে এ মাল আর বাজারে চলে না। পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধেও বিদেশের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। অনেকেরই মনে আছে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" কথা। চিরকালই শাসকগোষ্ঠী সরকার-বিরোধীদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করে থাকে। পাকিস্তান আমলের জননেতা শেখ মুজিব আজ জবরদস্ত শাসক। আজেই তাকেও আজ আয়ুব, ইয়াহিয়ার ভাষা আয়ত্ত করতে হয়েছে। তাকেও আজ সব মিথ্যা অভিযোগ এনে সরকার বিরোধীদের শায়েস্তা করতে হচ্ছে। পাকিস্তান আমলে তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে যার কৃতিত্ব ছিল সব থেকে বেশী সেই মৌলানা ভাসানিকেও তিনি তাঁর গৃহে অন্তরীণ করে রেখেছিলেন। "আগরতলা মামলা"র আরেক আসামী বিধানকৃষ্ণ সেনকেও শেখ মুজিব কারারুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এই ধরণের অত্যাচার অনাচারই শেষ কথা নয়, আছে প্রতিরোধের অঙ্গীকার। শেখ মুজিব জেলে থাকাকালে বাংলায় শ্লোগান উঠেছিল : "জেলের তালা ভাংগবো, শেখ মুজিবকে আনবো" আর আজ শেখ মুজিবের শাসনে বাংলায় শ্লোগান উঠেছে : "জেলের তালা ভাংগবো, রব-জলিলকে আনবো।"

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিসনে ট্রেন চলাচলে অরাজকতার জন্য দায়ী বড় বড় আমলারা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে যেখানে গড়ে প্রতিদিন ছয় বা সাতটি ইঞ্জিন অকেজো হয়ে পড়ত। সেখানে বর্তমানে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সত্তর থেকে পঁচাত্তর। এর ফলে গোটা রেলওয়ের ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে।

বড় বড় আমলারা ঘন ঘন বৈঠক করেও এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারছেন না। প্রতিদিনই ট্রেনের গতিবিধির অনিশ্চয়তার জন্য বিক্ষোভ ও অশান্তি লেগে রয়েছে। সমচাইতে অসুবিধা হয়েছে মালগাড়ী চালানো নিয়ে। এত ব্যাপক হারে ইঞ্জিন বিকল হয়ে থাকার নজির নেই; কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষে রাতারাতি এই অবস্থার উন্নতি করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ইঞ্জিন মেরামত করা এবং সেগুলি যথাযথভাবে চালু রাখার দায়িত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এমন লোকোমেটিভ ওয়ার্কশপের কর্মচারীদের মতে এই অবস্থার জন্য ওপরতলার আমলারাই দায়ী। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গার জন্য ঢালাওভাবে কংগ্রেসী গুন্ডা দিয়ে প্রতিটি কারখানা ভর্তি করা হয়েছে। যারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক তাদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

"ছাগল দিয়ে ত হালচাষ করানো যায় না"—বললেন একজন প্রবীণ লোকো ফোরম্যান। অতীতে ইঞ্জিন মেরামত এবং সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য পূর্ব রেলওয়ের শ্রমিকরা বিদেশী পর্যটকদের কাছে প্রশংসা অর্জন করেছে। অন্য দেশে যে সব ইঞ্জিন বহুকাল আগে বাতিল হয়ে গেছে সে সব বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এদেশে চালানো সম্ভব হয়েছে এই সব দক্ষ শ্রমিকদের প্রচেষ্টায়।

আজকে এই সব শ্রমিকের অভাব অভিযোগের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়ে, তাদের কাজের কোনরকম স্বীকৃতি না জানিয়ে কতকগুলো অদক্ষ এবং সমাজবিরোধীদের হাতে গোটা লোকোমেটিভ বিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে। তারই পরিণতিতে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অরাজকতা।

যে সব শ্রমিক ইঞ্জিনগুলির সঙ্গে দীর্ঘদিন পরিচিত, এগুলির কোথায় এবং কিভাবে মেরামত করলে সঠিকভাবে চালু করা যায় এসব তথ্য জানে তারা আজ উপেক্ষিত এবং বঞ্চিত। এর উপরে আছে নানান হয়রানি। ফোরম্যানদের মধ্যে যারা এই সব শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নিতে চাওয়ার জন্য সুপারিশ করেন অরাও আজ কর্তৃপক্ষের সুনজরে নেই। এদেরও অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক অপমাননা সহ্য করতে হয়। কেউ কেউ চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এবং স্বাস্থ্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদী ছুটি নিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। একটা বড় রকমের বিপর্যয় যে কোন সময় ঘটে যেতে পারে। তখন যদি ওপরতলার ঘুম ভাঙ্গে। তবে যা ক্ষতি ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে তা রোধ করা আর সম্ভব হবে না এখন।

মতামত

নারীত্বের অবমাননা

বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের ন্যায় আমাদের ভারতেও চলছে আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসর। সমাজে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকারের প্রশ্ন তোলা হয়েছে। একদিকে যখন নারীকে আপন অগ্রগতি জয় করবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারই পাশাপাশি বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নারীর মাতৃত্ব রূপকে ঢেকে দেবার অপচেষ্টা চলছে। বিজ্ঞাপনের ভাষাগুলো এখানে আর উল্লেখ করলাম না। এছাড়া আছে ক্যাবারে, স্ট্রিপটিজ প্রভৃতি অ-ভারতীয় অসাংস্কৃতিক নাচ। অবশ্য এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, নারীত্বের এই অবমাননার পেছনে নারীদেরও অবদান কিছু পরিমাণে আছে। তা না হলে প্রতি বৎসর "বিউটি কনটেস্ট" হয় কি ভাবে?

উনিশ শতকে যে নবজাগরণের ঢেউ এসেছিল তাতে আমরা নারীকে তার যথাযোগ্য সম্মান দিতে শিখেছিলাম, এবং সেই শতকের নারীরাও সম্মান আদায় করতে জানতেন। যার ফলে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বহু বীরাঙ্গণার পরিচয় পাই।

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হলেই দেশ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং ব্যভিচারের স্রোতে নিয়ে যেতে সাহায্য করে নারী। স্বাধীনতার আঠাশ বৎসর পরেও যদি আমাদের চেতনা না হয়, তাহলে আমরা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি, এটা ভাববার বিষয়।

তপন সান্যাল

সরকার সচেষ্ট হন

নিউজপ্রিন্ট সংকটের অজুহাতে বড় বড় সংবাদপত্রগুলির দাম আবার বৃদ্ধি করা হল। দেশে নিউজপ্রিন্ট সংকট আছে জেনে সাধারণ পাঠক সংবাদপত্রের দাম বৃদ্ধিকে সহজভাবে নিয়েছিল। কিন্তু ক্রমাগত দাম বৃদ্ধিতে আমরা সাধারণ পাঠকেরা সত্যিই শংকিত। সংবাদপত্রের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠা সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে, আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপন প্রচারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্রে সংবাদের পরিবর্তে বিজ্ঞাপন ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। এই সব সংবাদপত্রের একপেশে মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করছি।

সৌম্য দত্ত
বোলপুর

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তি প্রসঙ্গে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দীদের মুক্তি প্রসঙ্গে লেখা একটি চিঠি সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রলেখক দমদম জেলের যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কিছু বন্দী। এ সম্পর্কে খবর নিয়ে জানা গেল যে, যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারটা নির্ভর করছে পুলিশ রিপোর্টের ওপর।

আদালত যখন সাজা দেয় তখন আসামীদের শোনানো হয় যে, 'সাক্ষ্য প্রমাণে ইহা প্রমাণিত যে, তুমি অপরাধী অতএব আদালত তোমাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিল।' যাবজ্জীবন দণ্ড সাধারণত খুনের মামলাতেই হয়। যদিও আইনের অন্যান্য ধারাতেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে, তবে তার সংখ্যা খুবই কম। আদালত থেকে সদ্য সাজাপ্রাপ্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা তখন আসে জেলখানায়। এদের মানসিকতা লক্ষ্য করবার জন্য এদের তখনই আটক করা হয় স্বল্প পরিসর একটি ঘরে যার নাম 'সেল'। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে যাবজ্জীবন সাজা শুনে পাগল হয়ে গেছে অনেকে, তাই তাদের ওপরে নজর রাখবার জন্য সেলে বন্দী করার নিয়ম আছে জেল কোডে।

সেলে বন্ধ করার আগে অবশ্য ডাণ্ডাবেড়ী বা শিকলি বেড়ী নামক লোহার বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয় বন্দীর দু-পায়ে। ওজন প্রায় সের পাঁচেক তো হবেই। যেদিন নতুন বন্দী জেলে এল তার পরের দিন তাকে "কেস টেবিলে" হাজির করানো নিয়ম। কেস টেবিল মানে এইদিন সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের হাতে দেওয়া হয়ে থাকে একটা টিকিট যার নাম হিস্ট্রী টিকিট, এতে লেখা থাকে কোন ধারায় কতদিন সাজার মেয়াদ নিয়ে সে এসেছে, কবে ছাড়া পাবে, ওজন, উচ্চতা, শরীরের বিশেষ কোন দাগ এবং তার সাজার মেয়াদ চলাকালীন সব ঘটনার ইতিহাস এতে লিপিবদ্ধ হবে। এই দিনই এদের দেয়া হয়ে থাকে কারাগারের পোষাক। এইখান থেকেই কে কি ধরণের কাজ করবে তা বলে দেওয়া হয়।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের জেলের পরিভাষায় বলা হয় লাইফার বা ডাম্বলি। এই বন্দীদের সাজার মেয়াদ খাতায় লেখা হয় ২০ বৎসর অর্থাৎ বছরে তিন মাস রেমিশান বাদ সাজার মেয়াদ থেকে বাদ যাবে তা বাদ দিয়ে এই বন্দীরা ১৪ বৎসর সাজা ভোগ করবার পর মুক্তি পাবে বলে তাদের বলা হয়। আসলে এটা একটা ভাঁওতা, কেননা যদিও রিলিজ রেজিস্টারে এবং হিস্ট্রি টিকিটে ২০ বৎসর লেখা থাকছে কিন্তু এডমিশান রেজিস্টারে এবং রেকর্ডে লেখা থাকছে যাবজ্জীবন বা লাইফার বলে। তবে ১৪ বৎসর সাজা খাটবার পরে, যে জেলা থেকে সাজা দেওয়া হয়েছে সেই জেলার পুলিশ সুপারকে জানানো হয় যে অমুক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীর মেয়াদ শেষ; একে মুক্তি দেওয়া যাবে কি না—এই মর্মে এক রিপোর্ট চাওয়া হয়। রিপোর্ট আসতে আসতে বছর দুই লেগে যায়। সাধারণত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট বন্দীর বিপক্ষেই যায়, তবে যাদের সুপারিশ করার লোক আছে তাদের রিপোর্ট ভালই আসে এবং সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে মুক্তি দেয়া হয়। সুপারিশ অর্থে টাকা পয়সার লেনদেন।

পুলিশ রিপোর্ট চাওয়া হয়, কারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতরা তো আর সাধারণ বন্দী নয় যে মেয়াদ ফুরোলেই ছেড়ে দেয়া যাবে। এদের মুক্তির সঙ্গে জন-জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত বলেই পুলিশ রিপোর্টের ওপর এদের মুক্তি নির্ভর করে। ১৪ বৎসর থেকে ২০ বৎসর সাজার মেয়াদের মধ্যে অনেককে ছেড়ে দেয়া হয় বা হয়েছে। সাধারণত জেল কর্তৃপক্ষ ২০ বৎসরের হিসেব ধরেন, কারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কথা শুনে অনেকে পাগল হয়ে যায় বা আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

তাছাড়া আরও প্রশ্ন রয়েছে, যেমন—যে ব্যক্তি ১৪ বৎসর আগে জনজীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে রয়েছে চার দেয়ালে বাঁধা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতরে সেকি এতদিন পরে মুক্তি পেয়ে বর্তমানের চলমান জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে পারবে? মুক্তি পেয়ে সে যখন দেখবে, যেরকম ভাবে সে পৃথিবীকে দেখে গিয়েছিল তা পাল্টে গেছে, এবং তার গায়ে রয়েছে এক অপরাধীর ছাপ যা তাকে জনজীবন থেকে সরে যেতে বাধ্য করবে, তখন হয় সে আত্মহত্যা করবে আর নয়তো অপরাধ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তার মধ্যে। এক অর্থে চিন্তা করতে গেলে, ইংরেজ আমলের দ্বীপান্তর বা কালাপানি অনেক ভাল ছিল। কারণ সেকালে দ্বীপান্তর মানেই ছিল ফিরে না আসা। দ্বীপান্তরের কষ্টকে জয় করে যারা বেঁচেছে তারা থেকে গেছে আন্দামান দ্বীপে কোন কাজ বেছে নিয়ে।

আন্দামানে এককালে যারা খুনের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে দ্বীপান্তরিত হয়েছিল তাদের বংশধররা আজ সেখানে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছে। যারা এককালে জঘন্য অপরাধের আসামী তারা ওখানে কোন প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে অস্বস্তি বোধ করেনি, কারণ সকলেই ছিল একই ধরণের অপরাধী। কিন্তু দণ্ড পাবার আগের পরিবেশ তাদের পক্ষে কোনক্রমেই অনুকূল নয়। সেখানে নানারকম প্রশ্ন, হীনতা এবং সন্দেহ।

যেদিন ওরা সাজা নিয়ে প্রবেশ করেছে কারা-আইনের সীমিত গণ্ডির আওতায় সেদিন থেকেই বঞ্চিত হয়েছে সমস্তরকম মানবিক এবং মৌলিক অধিকারের থেকে, যদিও কারা-আইনে অনেক রকম সুযোগ সুবিধার উল্লেখ আছে কিন্তু তা কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ।

উরুগুয়েতে

ফ্যাসিস্ত অত্যাচার চরমে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

লাতিন আমেরিকার একটি সুন্দর দেশ উরুগুয়ে। ১৮৬৯২৬ কিলোমিটার বিশিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করেন ২৮ লক্ষ ২৭ হাজার মানুষ। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এই দেশটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনের লক্ষ্যস্থল। তাই, সি আই এ উরুগুয়েতে নানা ষড়যন্ত্র করে চলেছে। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উরুগুয়েতে প্রগতিশীল শক্তির সহায়তায় দেশপ্রেমিক সৈন্যবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছিল। এই দেশপ্রেমিক শক্তি উরুগুয়েকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গড়তে চেয়েছিল। উরুগুয়ের এই সরকার সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় নেমেছিল। উরুগুয়ের রাজধানী মন্তেভিদিয়ো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থল হয়েছিল। উরুগুয়ের কমিউনিষ্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্রীরা এসে দাঁড়িয়েছিল এই নতুন সরকারের পেছনে। কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীরা একটা ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার চেষ্টা করছিলেন। এই অবস্থায় উরুগুয়েয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নতুন এক ষড়যন্ত্র করে এবং সেই ষড়যন্ত্রে তারা সাফল্য লাভ করে। উরুগুয়ের বামপন্থী শক্তির অসতর্কতার সুযোগে ১৯৭৩ সালের ২৩শে জুন প্রতিক্রিয়া চক্র একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করেছে।

উরুগুয়ের সৈন্যবাহিনীর প্রতিক্রিয়া চক্রটি ক্ষমতা দখল করে উরুগুয়েতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। ফ্যাসিস্তরা হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে। উরুগুয়ের কুখ্যাত কারাগারগুলো রাজনৈতিক বন্দীদের দিয়ে ভরিয়ে তোলা হচ্ছে। ফ্যাসিস্ত পুলিশ যখন তখন নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। গায়ে সিগারেট ছেঁকা থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক শক প্রভৃতি জঘন্য অত্যাচারের পদ্ধতি ব্যবহার করছে ওরা। উরুগুয়ের কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্রী দলগুলি বে-আইনী। কমিউনিষ্ট পত্রপত্রিকা, যেমন বে-আইনী কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র কার্তা, সে মানাল, এল পপুলার পত্রিকাই আজ উরুগুয়েতে নিষিদ্ধ নয় ক্যাথলিক পত্রিকার সম্পাদক হেক্টর বোরাৎ-ও ফ্যাসিস্তদের হামলা থেকে রেহাই পাননি, তাঁকেও সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি যে দিবস উপলক্ষে আরো প্রায় তিন হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবছর ফ্যাসিস্তদের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে শত শত শ্রমিক জাঠা বেরোয় রাজধানী মন্তেভিদিয়োতে।

সামরিক জুন্টা সর্বশক্তি দিয়ে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। তারা উরুগুয়ের শ্রমিকনেতা পার্লামেন্টের সদস্য জাইমি পেরেজ, এদোয়ার্দো ভিয়েরা প্রমুখকে কুখ্যাত কারাগার পুংনা কারেতা সে রেখেছে। পেরেজ শুধু শ্রমিকনেতা হিসাবেই জনপ্রিয় নন, উরুগুয়ের মানুষের কাছে, এমন কি লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও এই নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। পেরেজকে কোন মিথ্যে মামলায় জড়াতে না পেরে ফ্যাসিস্তরা সামরিক আদালতে বিচার করে তাকে ১৮ মাসের সাজা দিয়েছে। তেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে অনুষ্ঠিত লাতিন আমেরিকার লোকসভাসমূহের সম্মেলনে পেরেজের অবিলম্বে মুক্তির দাবী করা হয়েছে। এই সম্মেলনে উরুগুয়ের লোকসভা বাতিলের নিন্দা করা হয়েছে। এছাড়া বেআইনী কমিউনিষ্ট পার্টি উরুগুয়ের মানুষকে ফ্যাসিস্ত শাসন অবসানের জন্য ব্যাপক সংগ্রাম সংগঠিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেক্রেটারী এবং দলীয় পারিষদদের শেখানো বুলিই তিনি তোতা পাখীর মত বলে যান। বিরোধী পক্ষে জ্যোতির্ময় বসু প্রমুখ জাঁদরেল সদস্যরা চেপে ধরলে কখনও তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে যান অথবা প্রসংগ ছেড়ে এসে অবান্তর কিছু কথা দিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটাতে চান। অতএব, সংসদীয় বিতর্ককে তিনি ভীষণ ভয় করেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিবিষয়ক বিতর্কের সময়ও তিনি সংসদে তাঁর উপস্থিতি সযত্নে পরিহার করে চলেন। সাম্প্রতিক মোরারজী দেশাইর অনশনের কথাই ধরা যাক। বিরোধীপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের জবাব দেবার তারিখে তিনি রাজধানী ছেড়ে যান বোম্বে হাই অয়েল প্রজেক্টের লাঞ্চে যোগদানের জন্য। জবাবের বরাত দিয়ে গেলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বহ্মানন্দ রেড্ডীকে। জবাব দানের দিন সংসদে একটি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। স্পীকারের ঘণ্টা বেজে গেছে। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রেড্ডীর দেখা নেই। সংসদবিষয়ক মন্ত্রী রঘুরামাইয়া পাগলের মত ছুটোছুটি করছেন। রেড্ডী বেপাত্তা। বেচারী এসে হাত চেপে ধরলেন সরাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী মহসীনের। কিন্তু মহসীন তাঁর ওপর কোন নির্দেশ না থাকায় অজুহাতে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। সময় পেরিয়ে যাবার অনেক পরে হন্তদন্ত হয়ে যখন রেড্ডী সংসদে প্রবেশ করেন তখন বিরোধীপক্ষ ক্রোধে ফেটে পড়ে জানায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর জবাবের কোন কপি এখনও তাদের দেওয়া হয়নি। স্বভাবতই আলোচনা বন্ধ থাকে এবং কয়েক ঘণ্টা পর জবাবের মুদ্রিত কপি সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এরপর রেড্ডীর যে অবস্থা হয়েছিল তা নাটকের একটি করুণ দৃশ্যের সঙ্গেই তুলনীয়। এই ঘটনার নেপথ্য ইতিহাস হচ্ছে এই যে, শ্রীমতী গান্ধী নির্দিষ্ট জবাবের কোন মুসাবিদাও করে যাননি। ফলে, তিনি যখন পুণায় গর্জন গর্জন করে রাজধানীতে ফিরে এলেন তখন ক্রুদ্ধ সহকর্মীদের কাছে নতশির হয়ে তাঁকে গুজরাটে নির্বাচনী তারিখ ঘোষণা করতে হল।

[আগামীবারে সমাপ্য]

গ্রন্থ সমীক্ষা

বিপ্লবী সূর্য সেনের জীবনেতিহাস

(দর্পণের সমালোচক)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সশস্ত্র বিপ্লবের মহানায়ক সূর্য্য সেনের জীবন-ইতিহাসের উপর লেখা "বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য্য সেন" (তুষারকান্তি দাশগুপ্ত ও দিলীপ-কুমার সেন। পরিবেশক : প্রতিভা মন্দির ৩০/১ বি কলেজ রো, কলি-৯ দাম : বারো টাকা।) সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি এবং বিপ্লবে আত্মাহুতি দানের আহ্বান আসে মহানায়ক সূর্য্য সেনের কাছ থেকে। এক অলৌকিক আকর্ষণ-শক্তির দ্বারা তিনি চট্টগ্রামের যুবশক্তিকে "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" করে বিপ্লবে অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে তেজোদীপ্ত আহ্বান ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। সে সব কথা ও কাহিনী এই বইটিতে সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বিপ্লবীদের জীবন-চিত্র সার্থক ভাবে অঙ্কন সত্যই দুরূহ কাজ। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মন না হলে সার্থক ভাবে বিপ্লবী জীবন অঙ্কন করা যায় না। সে-দিক দিয়ে লেখকদ্বয় সফল হয়েছেন। ঐতিহাসিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও জীবনীকারের আন্তরিক নিষ্ঠা একত্রে সামঞ্জস্য লাভ করে পুস্তকের রচনাশৈলী বিশেষ আকর্ষণীয় হওয়ার ফলে পুস্তকটি বার বার পড়তে ইচ্ছা জাগে। সশস্ত্র বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা এবং সাধারণ পরিবারের মানুষ মাষ্টারদার চরিত্রের বৈপরীত্য অতি নিখুঁত ভাবে বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। মাষ্টারদার সহযোদ্ধা বিপ্লবী শ্রীগণেশ ঘোষ বইটি আদ্যপান্ত পাঠ করে মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে বইটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। মাষ্টারদার আপন ভ্রাতুষ্পুত্র লেখকদ্বয়ের মধ্যে একজন। অতএব সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতিটি ঘটনা যে বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমান যুব-ছাত্র সমাজ এক বিভ্রান্তির পথে ঘুরপাক খাচ্ছে। যুবসমাজ বুঝতে পারছে না যে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে তাদের সমস্ত যুবোচিত উন্মাদনা মাদকতায় মাতিয়ে রেখে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি যুবকের মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের দেশপ্রেমের মহান আদর্শ গভীর ভাবে অনুসরণ করা উচিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস লেখার সময় এবং গবেষণামূলক কার্যে এই পুস্তকটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হবার যোগ্যতা রাখে।

কবিতায় সময় চেতনা

সম্প্রতি কবিতার সংসারে অনেক নতুন মুখ নতুন কণ্ঠ সোচ্চার। যাদের কবিতার বহ্নিমান শব্দমালা এই বিপর্যস্ত সময়ের পাঁজর বিদ্ধ করছে, শুদ্ধ করছে আত্মার আগ্নেয় বিস্ফোভ। প্রথাসিদ্ধ উদাসীন নৈরাশ্যকে দূরে ঠেলে এই মুহূর্তের অনন্ত জিজ্ঞাসাই এইসব কবিদের কবিতায় ঝংকৃত। কবি সুনীল হাজরা তাঁর 'সুতরাং ভাল আছি' (পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ। দাম : দুই টাকা) গ্রন্থের 'এখন গৌরব' কবিতায় যখন বলেন 'প্রতিদিন দলাদলি/দলবাজি এখন গৌরব,/মস্তানী হয়েছে পেশা/কে কার তোয়াক্কার ধারে ধার' অথবা 'প্রগতির জারসি খুললে/দেখা যায়/সেই মুখ অবিকল/হিটলারের প্রেতাত্মা কী বসে' তখন কবির হৃদয়ের অঙ্গার ন্যুব্জ ভাবনাকে মুহূর্তের জন্যে ঝলসে দেয়। শান্ত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে "সতর্ক থাকুন/একটা পুড়েছে বলে বাকী-গুলো ঠিকমতো ফ্রিজেতে রাখুন" এমন কথা কবি বললেও কঠিন সত্যকে আহ্বান জানিয়ে "রক্তেতে লাগুক না আগুন/মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে জীবন জলুক" একথা উচ্চারণ করতে ভোলেন নি। তবে নীরেন্দু হাজরার 'আত্মার করতলে সূর্য প্রতীক্ষা'র (সীমান্ত প্রকাশনী/৬নং স্কট লেন কলিকাতা ৬/দাম : চারটাকা) কবিতাগুলির প্রার্থনা একরকম হলেও তুলনামূলকভাবে সুগভীর ভাবানুষঙ্গে সুসংবদ্ধ। সময়-সত্যটিও কাব্যিক গৌরবতায় সমৃদ্ধ। যেমন : জননীর রক্তে ভ্রূণ, ভ্রূণে যুব মনুষ্যত্বে,/অন্ধকার ভবিষ্যত বী-রী করে অরণ্য রাজত্বে। কিংবা কবির অনুপম জিজ্ঞাসা : "পৃথিবীর জলসাঘরে অন্বেষা কিসের?···সূর্যের আত্মজ আমরাও, রূপ রঙ আলো চোখে—অথচ বৃথাই কেন সূর্য খোঁজা জলসাঘরে।" এই বৃথা অন্বেষণ দূর করতে কবির প্রার্থনা : রক্তের অলিন্দে বিচ্ছিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা মানুষের—/একটি বাগান করো, সেরে যাবে মনের অসুখ।" এমন অজস্র লোভনীয় শব্দমালায় সমৃদ্ধ কবির বর্তমান গ্রন্থটি। তাঁর ভাবরাজ্যের এই আলোড়নের স্থায়িত্ব কামনা করি।

প্রবীণ কবি ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভিয়েতনাম ভারতবর্ষ' কাব্যগ্রন্থটিও (পরিবেশক : বুকমার্ক/দাম : দেড় টাকা)। যাদের "বুকের ক্ষতচিহ্ন রৌদ্রে মেলে শুকোতে দেয় মানুষ;/ যতই ভিন্ন ধমনী থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ওঠে/ ততই তারা আরো কঠিন আঘাত থেকে উত্তরণের মন্ত্রে যায়" সেই ভিয়েতনামের মানুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতামালা এই কাব্যগ্রন্থের বড় প্রেরণা হল গত বছরে ২০শে জুলাই ভিয়েতনাম দিবসে কলকাতার কার্জন পার্কে পুলিশী বর্বরতায় প্রবীর দত্তর মৃত্যু।

সংগ্রামী সংগীত

অস্ত্রের শ্রীকাকুলামে বন্দুক হাতে সশস্ত্র লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কবি সুব্বারাও পাণিগ্রাহী। সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতাই তার সংগীতের প্রেরণা। বেঙ্গা না বিশ্বনাথম তেলেগু ভাষা থেকে তাঁর কিছু বিখ্যাত সংগীতের অনুবাদ করেছেন। "যারা খেটে খায়, আমরা তাদেরই আমরা কমিউনিস্ট / আমাদের মত মানো বা না মানো আমরা রবো সে ইস্ট। আমরা কমিউনিস্ট।" এমনি কয়েকটি প্রেরণাদায়ক সংগ্রাম সংগীত নিয়ে এই 'সংগ্রহটি' প্রকাশ করেছে অনুষ্টুপ পত্রিকা (পরিবেশক : বুকমার্ক/এক টাকা)।

সন্ত্রাস বিরোধী সাহিত্য

শাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বাহিনী, যারা জনকল্যাণের নামে পশ্চিমবঙ্গে সশস্ত্র সন্ত্রাস কায়েম করেছে, তাদের নিয়ে তিনটি ধারালো ছোট্ট গল্প লিখেছেন সত্যপ্রিয় ঘোষ। গ্রন্থের নাম 'অমৃতের পুত্রেরা' (যুবকণ্ঠ প্রকাশনী/দাম দু টাকা)। অফিস, ট্রেন, এবং বস্তি এই তিন পটভূমিতে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী লুম্পেন বাহিনীর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। লেখক তথাকথিত বিদ্বেষ থেকে গল্পের চরিত্র আঁকেন নি। দুর্মর সময়ের প্রেক্ষাপটে এই দুর্বহ যন্ত্রণা এই গল্প তিনটির আবেদন অসামান্য।

নাট্যচিন্তা

নরমেধ

সি পি এ টির নবতম প্রযোজনা 'নরমেধ' 'কলকাতার হ্যামলেটে'র মঞ্চসাফল্যের পর দুটি ক্লান্তিকর প্রযোজনার (মৃত্যুহীন প্রাণ এবং ১৭৯৯) অবস্তি দূর করতে সক্ষম হলেও প্রযোজনাগত অলংকরণ এবং গুণগত তাৎপর্যে দর্শকের কাছে নতুনতর শিল্পস্বাদ বা অভিজ্ঞতা বহন করে আনেনি শুধুমাত্র ঘটনার ভিন্নতা ছাড়া। বিস্মিত না হলেও, ব্যথিত হয়েছি এই জন্যে যে 'কলকাতার হ্যামলেটে'র যা কিছু ছিল সবচেয়ে দুর্বল অংশ, অর্থাৎ নাটকের মূল প্রতিপাদ্যের বাইরে ছুটে গিয়ে কৃত্রিম জনপ্রিতার জন্য দর্শককে চমকিত করার সেই স্থূল রঙ্গরসিকতাই 'নরমেধ' নাটক বেশীরকম প্রাধান্য পেয়েছে। বলতে গেলে টিট্‌কিরি টীকা-টিপ্পনীই কাঠামোগত দিক থেকে এ নাটকের কড় ভরসা। এটাও ততটা দোষের ছিলনা, যদি না নাটকের শেষে আরোপিত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য ভাবগম্ভীর পরিমণ্ডল রচনা করা হত। ফলে নাটকের প্রারম্ভিক লঘু চালের গতি সবশেষে একরকম গায়ের জোরেই গম্ভীর রসে উপনীত হয়েছে।

জনৈক বিদেশী চোরাপথে বিষ্ণুমূর্তি কিনতে এসে সৌভাগ্যক্রমে 'ইসে' কমিশনের কাছে জনৈক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী এক ব্যক্তির ছিন্ন মুণ্ড লাভ করেন। এই ছিন্ন মুণ্ডের উৎস সন্ধানই নাটকে উপজীব্য। পুলিশ মন্তান সহযোগে রাতদুপুরে যখন পাড়ার সমস্ত মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস চালিয়ে সাক্ষ্যদানকারীর অনুসন্ধান করছে—নাটকের সেই অংশে সবচেয়ে বেশী প্রাণের স্পন্দন এবং নির্দেশকের মুনিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করেছি। কিছু অশ্লীল সংলাপ এবং আতিশয্য বাদ দিলে এই দৃশ্যটি যথার্থ সংবেদনশীল চেহারা পাবে।

কিন্তু নাটকের মূল ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত কিছু দৃশ্যাবলীও নাটকে সংযোজিত হয়েছে যা নির্দেশকের আত্মপ্রকাশের নেশা থেকে উদ্ভূত মনে হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন হিটলার ও গোপাল ভাঁড় সংলাপ এবং উত্তেজনামুখর দৃশ্যের পরেই কাব্যিক মেজাজের আকস্মিক ব্যালে প্রযোজনার অতিরিক্ত কোন মাত্রা যোগ করেনা। এ নাটকের যা বিষয় তা স্বল্প পরিসরেই বিধৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাকে দীর্ঘায়ত করার জন্য এ অপ্রাসঙ্গিকতা মেনে নেওয়া যায়না। হিটলারের সঙ্গে গোপাল ভাঁড়ের কল্পিত সাক্ষাৎকার এবং গোপালের মুখে "এদেশে পথেঘাটে শতসহস্র হিটলার" কথাটি ভাঁড়ামি হিসেবও অনেকে ক্ষমা করবেন কিনা সন্দেহ।

পুলিশ মন্ত্রী হিটলারকে নিয়ে ভাঁড়ামি করার যে প্রবণতা ইদানীং অনেক নাটকেই লক্ষ্য করা যায়, সি পি এ টির 'নরমেধ' তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এই প্রযোজনা দেখে পূর্ববর্তী দুটি নাটকের ক্লান্তি বা অবস্তি দূর হবার কারণ হল দলগত অভিনয়ে সাফল্য এবং প্রযোজনায় একরকমের আকর্ষণীয় পরিচ্ছন্নতা। যদিও বৃদ্ধের চরিত্রে অসিত বসুর অভিনয়ে বয়স্কের জড়তা এবং স্বরনিক্ষেপ যথার্থ বলে মনে হয়নি। নির্দেশক যদি স্লাইড ব্যবহারে, আবহ সুরে, উপস্থাপনার মেজাজে কলকাতার হ্যামলেটের সীমাকে ছাড়িয়ে যেতেন, যদি 'মানুষের অধিকারের' অনুরূপ দৃশ্যসজ্জা বর্জন করে মৌলিকতার পরিচয় দিতেন তবে আরো খুশি হতাম।

উল্লিখিত ত্রুটি সত্ত্বেও তরুণতম নাট্যকার রঞ্জত ঘোষ নাটকটি যেমন করে বেঁধেছেন ও কোথাও কোথাও বিদ্রূপের রস যেরকম ঝাঁঝালো হয়েছে তা দেখে তাকে আরো সচেতনতার সঙ্গে বাংলামঞ্চে আমন্ত্রণ না জানিয়ে পারা যায়না।

ন্যান্সি নাট্য উৎসবে পরাজিত নায়ক

গত দশ বছর ধরে ফ্রান্সের ন্যান্সী সহরে বিশ্ব নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এপর্যন্ত ২৫০টি নাট্য গোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসে নিজেদের মাতৃভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করেছে। এ বছরও আটই মে থেকে উনিশে মে বিশ্ব নাট্য উৎসবের আসর বসে। এবার জার্মানী জাপান পোল্যাণ্ড ব্রেজিল স্পেন ইংল্যাণ্ড ইটালী প্রভৃতি ৩০টি দেশ থেকে ছোট বড় নাট্য গোষ্ঠী আসে এবং নিজেদের ভাষায় নাটক প্রযোজনা করে।

ভারতীয় নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য দিল্লীর ন্যাশানাল স্কুল অফ ড্রামা আমন্ত্রিত হয়েছিল, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত আসেনি। কলকাতার থিয়েটার সেন্টার ধনঞ্জয় বৈরাগীর "পরাজিত নায়ক" মঞ্চস্থ করে শনিবার সতেরই মে। দুটি চরিত্রের এই নাটকে অভিনয় করেন তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায়। তাদের সাহায্য করেন গুজরাটি নাট্যকার শিবকুমার যোশী এবং বোম্বাইয়ের আই এন টির গৌতম যোশী।

নাটকের আগে ফরাসী ভাষায় নাটকের সারাংশ বলে দেওয়া হয়। ঘন ঘন করতালি দিয়ে বিদেশী দর্শকরা এই ভারতীয় নাটকটিকে স্বাগত জানায়। নাট্য উৎসবের কর্তৃপক্ষ ১৯৭৭ সালের বিশ্ব নাট্য উৎসবে আরও বড় দল নিয়ে যাবার জন্য থিয়েটার সেন্টারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জুন মাসের বারো ও তেরো তারিখে "সাংস্কৃতিক" সংস্থা লণ্ডনে এই নাটকটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে অ্যাড হকের দাবী জোরদার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিতে বললেন। সাম্প্রতিক দিল্লী সফরকালে শ্রীরায় প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভাপতির কাছে সাংগঠনিক স্বার্থে বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিতে বলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর প্রচণ্ড ভাবে ক্ষেপে আছেন তা প্রায় সাধারণের জানা। বিশেষ করে অরুণ মৈত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের এত অবনতি ঘটেছে যে, কথাবার্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

অরুণবাবুর সঙ্গে প্রথম গন্ডগোল বাঁধল ছাত্র যুবদের উত্তরবঙ্গ বন্ধকে কেন্দ্র করে। মুখ্যমন্ত্রী অরুণবাবুকে পাঠিয়েছিলেন কুমুদ ও সুদীপকে বন্ধ করতে নিষেধ করার জন্য। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খবর আছে যে, অরুণবাবু শিলিগুড়ির সহ উত্তরবঙ্গে বন্ধ পালন করার জন্য প্রভাব খাটিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখার জনৈক অফিসার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বন্ধ সম্পর্কে গোপন রিপোর্টে একথা বলেছেন।

এরপর মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসী যুব-ছাত্রদের ঝগড়াকে কিছুটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য যখন সাতই জুন জয়প্রকাশ বিরোধী সমাবেশের প্রস্তাব দেন। তখন অরুণবাবু এর বিরোধিতা করেন। জানা গেছে, অরুণবাবু সোজাসুজি সিদ্ধার্থবাবুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আই এন টি ইউ সি, ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের নেতারা আপনার ওপর অসন্তুষ্ট।

অরুণবাবুর একথাতে সিদ্ধার্থবাবুর কোন উত্তেজনা প্রকাশ করেন নি। শুধু মুখখানা গম্ভীর হয়ে যায়। অরুণ মৈত্রের সঙ্গে কথাবার্তার বেশ খানিকক্ষণ পরে সিদ্ধার্থবাবু যখন রাইটার্স থেকে বেরিয়ে আসেন তখনও তার মুখখানা বেশ গম্ভীর ছিল।

সিদ্ধার্থবাবু দিল্লী যাওয়ার আগে তার ঘনিষ্ট মহলে অরুণবাবুর ঔদ্ধত্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এবং তিনি যে অরুণবাবুর এ আচরণ সহ্য করবেন না সে কথাও ঘনিষ্ট মহলে জানিয়েছিলেন।

সিদ্ধার্থবাবু যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিতে বলবেন এ কথা সুব্রত মুখার্জী বুঝতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত তাঁর গোষ্ঠীর লোকজনদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

লক্ষ্মী-বারিদ গোষ্ঠীরা ক্রমাগত এ্যাডহকের দাবী জানাচ্ছেন। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে হাই কমান্ডের বেশকজন প্রভাবশালী নেতা এই দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল। তারপর মুখ্যমন্ত্রীও সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে একই পরামর্শ দেবেন। ফলে রাজ্য কংগ্রেসে এ্যাড হক প্রায় অনিবার্য।

এই অবস্থায় ঠিক হয় সুব্রতও দিল্লী যাবেন বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটির দাবী জানাতে। উদ্দেশ্য যাতে নতুন কমিটিতে সুব্রতদের নিরঙ্কুশ প্রভাব থাকে। এ ব্যাপারে প্রিয়বাবুর সঙ্গে সুব্রতবাবুর আলোচনা হয়েছে।

সুব্রতবাবু দিল্লী গিয়ে এ্যাড হক কমিটি গঠনের কথা বলেছেন, এবং এই কমিটিতে যাতে যুব-ছাত্ররা প্রাধান্য পায় তার জন্যও দরবার করে এসেছেন।

অরুণ মৈত্র নিশ্চিত যে, কোন অঘটন না ঘটলে তিনি আর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে থাকতে পারবেন না। যাদের জন্য তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রী ও বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে ঝগড়া করলেন সেই প্রিয়-সুব্রতও বেগতিক দেখে তার ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছেন।

অরুণবাবু এখন রোজই গভীর রাতে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবী ঘোষজীর সঙ্গে পরামর্শ করছেন কি ভাবে নিজেকে বাঁচানো যায়।

নাট্যকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে স্মারকলিপি

(দর্পণের প্রতিনিধি)

রবীন্দ্র ভারতীর অনুমোদিত নাট্য সংস্থা সহ সমস্ত অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিটি প্রযোজনার ওপর কলকাতা পৌর প্রশাসন কর্তৃক উচ্চহার কর আরোপের প্রতিবাদে তিরিশে এপ্রিল নাট্য কর্মীদের একটি সুসজ্জিত মিছিল পৌরসভা ঘরের রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দিকে অগ্রসর হলে মিশন রোডে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। পরে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, অভিনয়), জেছন দস্তিদার, শিশির সেন ও অজয় ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধিদল মহাকরণে গিয়ে পৌরমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তার একান্ত সচিবের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে। উল্লেখযোগ্য যে, মন্ত্রীর পূর্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মন্ত্রী উপস্থিত থাকেননি।

জানা গেছে, পৌরমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী গত তেসরা জুন নাট্যকর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটিকে এক পত্রে জানিয়েছেন যে তিনি এ ব্যাপারে পৌর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন। কিন্তু এই পত্রে তিনি কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ করেন নি।

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মচারী সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

বাঁকুড়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার দ্বাইশতম জেলা সম্মেলন সতেরোই এবং আঠারোই মে স্থানীয় বঙ্গ বিদ্যালয়ে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলন সুরু হওয়ার আগে সুসজ্জিত একটি মিছিল প্রতিনিধিদের নিয়ে শহর পরিক্রমা করে সতেরোই মে তারিখে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুকোমল সেন। তিনি তার উদ্বোধনী ভাষণে সারা ভারতের শ্রমিক কর্মচারী, বিশেষ করে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেন। পশ্চিমবাংলার কঠিন অবস্থার মধ্যেও বিগত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলনে আগামী দিনে যে লাগাতার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার সাংগঠনিক ও মানসিক প্রস্তুতিকে আরও জোরদার করার জন্য তিনি আহবান জানান। বারোই জুলাই কমিটি, এন সি সি আর এস, সিটু প্রভৃতি সংগঠন থেকে প্রতিনিধিরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আগামী আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

এর পরই প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আটান্ন জন প্রতিনিধি (দর্শক প্রতিনিধি সহ) এই সম্মেলনে যোগ দেন। জেলা সম্পাদক শ্রীপার্থ ঘোষ তার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে কর্মচারী আন্দোলনের বিভিন্ন দিকগুলির পাশাপাশি শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের উপর শাসকশ্রেণীর হিংস্র আক্রমণগুলিকে তুলে ধরে আগামীদিনে লাগাতর আন্দোলনের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করার আহবান জানান। বিভাগীয় সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলি তিনি তুলে ধরেন। খাদ্য করপোরেশনকে কেন্দ্র করে যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে ঐ সংস্থায় কর্মরত খাদ্য বিভাগের কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে চলেছে। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের নামে ডেপুটেড কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যাবলীর উপর আঘাত হানার জন্য রাজ্য দরবারের কাছ থেকে এফ সি আই কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা কব্জা করা এবং সংগঠন ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে যে কোন ডেপুটেড কর্মচারীদের বিভাগে ফেরৎ পাঠাবার ক্ষমতা ইত্যাদি কর্মচারী স্বার্থবিরোধী বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চলেছে। সম্পাদক তার প্রতিবেদনে কর্মচারীদের এর বিরুদ্ধে সজাগ থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। তিনি স্বার্থহীন ভাষায় কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারী দেন কর্মচারীদের অন্ধকারে রেখে কোন গোপন চুক্তি করা চলবে না। ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

উপস্থিত প্রতিনিধিরা দীর্ঘক্ষণ ধরে সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে অধিকারগত ও বিভাগীয় দাবীর উপর উপস্থাপিত খসড়া প্রস্তাব কিছু সংযোজনী সহ সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক সুনীল চক্রবর্তী উপস্থিত থাকেন। তিনি বিভাগীয় বিভিন্ন সমস্যাগুলি, বিশেষ করে এফ সি আই-এর সমস্যাগুলি তুলে ধরেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে

প্রতিবাদপ্রতিরোধ আন্দোলন

আগামী দিনে যে কোন বিভাগীয় আন্দোলনে প্রতিটি কর্মচারীকে সামিল করার জন্য প্রতিনিধিদের আহবান জানান।

আগামী বছরের জন্য অরুণ মিত্রকে সভাপতি, পার্থ ঘোষকে জেলা সম্পাদক বাসুদেব দেকে সংগঠন সম্পাদক সুভাস দাসকে অফিস সম্পাদক এবং দুলালচন্দ্র শীটকে কোষাধক্ষ্য করে উনিশ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

সি আই টি ইউ ইউনিয়নের ওপর কংগ্রেসীদের হামলা

গত উনত্রিশে মে সকাল সাড়ে আটটার সময় হাইড রোডের এ্যালায়েড রেজিন এন্ড কেমিক্যাল কারখানার শ্রমিকদের ওপর কংগ্রেসী লেবার সেলের বিপুল গুহরায় গোষ্ঠীর মস্তান বাহিনী সশস্ত্র হামলা চালায়। হামলার ফলে শীতল পাছাল, মিহির মন্ডল, বিশ্বেশ্বর হালদার, রবীন দাস, উদয় শাসমল, আশুতোষ গিরি প্রভৃতি অল্পবিস্তর আহত হয়। গুন্ডারা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার ডঃ পি কে বসু রায় চৌধুরীর ঘর তছনছ করে এবং সি আই টি ইউকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ইদানীংকালে এই কারখানার একশ সত্তর জন শ্রমিকদের তিনটি ইউনিয়ন। একটি সি আই টি ইউ একশ পঞ্চাশ জন, বিপুল গুহরায় গোষ্ঠী দশ জন, আর এন এল সি সির দশজন।

গত দুই বছর ধরে গুহরায় গোষ্ঠী মালিকের সাহায্য নিয়ে বারে বারে শ্রমিকদের ওপর হামলা চালিয়েও সি আই টি ইউ ইউনিয়ন ভাঙতে পারেনি। সি আই টি ইউ-এর সভ্য হওয়ার অপরাধে ইতিমধ্যেই নয়জন বরখাস্ত, আঠারো জন সাসপেন্ড এবং তিনটি মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। শ্রমিকদের মনোবল ভাঙতে না পেরে আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়েছে। এখন প্রকাশ্যেই তারা বলে বেড়াচ্ছে যে, সি আই টি ইউ ইউনিয়নের অন্যতম সংগঠক ও সহ সভাপতি প্রণব মুখার্জীকে হয় খুন করা হবে নতুবা আর কোনদিন চাকুরীতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গত দুই বছর ধরে কারখানার গেটে শ্রমিকদের বাধা দেওয়া, কারখানার ভেতরে ঢুকে শ্রমিকদের মারধোর করা, লাল পতাকা ছিঁড়ে ফেলা বোমা ফাটানো, পাইপ গান দেখানো, মালিকদের দিয়ে সাসপেন্ড ও বরখাস্ত করানো নিয়মিত চলছে। এবার আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়েছে। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এর মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন এবং এদের এই নোংরা কার্যকলাপ শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভের ও ঘৃণার সৃষ্টি করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষে প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের প্রত্যাশা আজ প্রায় স্বর্গ চাওয়ার সামিল। তাদের যেটুকু সামান্য বেতন তাও ঠিক সময়ে দেওয়া হয় না, শিক্ষকের আত্মহত্যার ঘটনাও সরকারকে টলাতে পারেন। সরকার এই মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে ঘোষিত বেতন কাঠামো আজও বলবৎ করা হয়নি। তিন তিনবার বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা সত্ত্বেও শিক্ষা দপ্তর এ ব্যাপারে এখনও অন্ধকারে। স্কুল বোর্ডের অফিসে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যাপারে শিক্ষকরা খুশি নন। তাদের পেন্সন সম্পর্কে প্রচার চালানো হলেও তা কার্যকর করার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কংগ্রেসের গোষ্ঠী-কোঁদলের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাটাও প্রহসনে পরিণত। শিক্ষক ছাত্র ও অভিভাবকদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার আজ অপহৃত।

এই পটভূমিতে সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিলিগুড়িতে আগামী সাতই ও আটই জুন। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল
মিহির আচার্য সম্পাদিত
শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ৬.০০
মার্কসবাদী মহলে উচ্চপ্রশংসিত গ্রন্থ
প্রাপ্তিস্থান ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা-১২
বুক মার্ক, c/o অগ্রণী ক্লাব, এ-১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISA

গণবিক্ষোভের সম্ভাবনায় কংগ্রেসীরা আতঙ্কিত

(দর্পণের প্রতিনিধি)

নবনির্মাণ সমিতি এবং সাতটি বামপন্থী দলের যৌথ উদ্যোগে এবং পাঁচই জুন জয়প্রকাশ নারায়ণের উপস্থিতিতে কলকাতায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যে কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপকতর গণবিক্ষোভের পথ প্রশস্ততর হতে চলেছে তার ভয়াবহ পরিণতির আশংকায় একদিকে যেমন কংগ্রেস দল ও রাজ্য সরকার বেসামাল হয়ে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে নিজেদের অস্তিত্ব সংকটের ভয়ে ম্রিয়মান হয়ে উঠেছে সি পি আই। আর বাকবিধবার ঈর্ষাকাতর চপলতায় উন্মাদ হয়ে উঠছে বামপন্থী বেশভূষায় সজ্জিত ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক এস ইউ সি। বিভ্রান্ত বোধ করছে কংগ্রেসী ভৈরব বাহিনী ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস।

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, পাঁচই জুনের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সি পি এমের রাজনৈতিক জয় ঘোষিত হয়েছে, কেননা বাহাত্তর সালের নির্বাচনী জালিয়াতি, গণতন্ত্র হত্যা এবং এই রাজ্যে জঙ্গলের শাসন প্রবর্তন সম্পর্কে এই পার্টিই বিগত তিন বছর ধরে ক্রমাগত রাজনৈতিক বক্তব্য রেখে আসছে এবং অবশেষে আজ সেই সত্য ঘোষিত হচ্ছে বহুজনের, বহু দলের সোচ্চার ও সম্মিলিত সমাবেশের মধ্য দিয়ে। কংগ্রেসের ভয় যদি পশ্চিমবাংলার জনচিত্তে আস্থা ফিরে আসে, যদি সি পি এম দলের কর্মীরা আবার যার যার এলাকায় ফিরে যেতে পারে, যদি আবার এই রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া কালবৈশাখীর ইঙ্গিত আনে তাহলে সিদ্ধার্থবাবুর পুলিশ গুণ্ডা নির্ভর রাজত্বে বেশ একটু দোলা লাগবে বৈ কি। উপরন্তু, যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করতে হয় তাহলে এই পুনর্জাগ্রত জনমতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাহাত্তর সালের একচেটিয়া রিগিং চালিয়ে নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে গদী দখলের সহজ পন্থাটাও কথঞ্চিৎ জটিল হবে।

এদিকে দলীয় নেতৃত্ব নিয়েও ইতিমধ্যেই মারামারি শুরু হয়ে গেছে। কারণ, আগামী নির্বাচনে প্রার্থীপদের জন্য উপদলীয় টানাপোড়েন ক্রমেই বাড়ছে। ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসী নেতারা এতদিন পরে বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন যে, বাহাত্তর সাল থেকে পুলিশী প্রহরায় এবং নিজেদের ভৈরব বাহিনী ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের মিলিত শক্তি নিয়ে বীভৎস সন্ত্রাস চালিয়ে ফাঁকা মাঠে যে গোল তারা করে আসছিলেন অতঃপর সেই নির্ভেজাল খুনে রাজনীতির দাপটে চালানো সম্ভব হবে না। সি পি আই এম-এর কয়েকশো কর্মীকে হত্যা করে তারা ভেবেছিলেন যে, রাজ্যের মুকুটহীন রাজা তারাই। পাঁচই জুনের সম্মিলিত কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বৃহত্তর অথবা বৃহত্তম গণবিক্ষোভের সূচনার অনিবার্য সম্ভাবনায় তাই ওরা খুবই আতঙ্কিত। ফলে যে দাবীগুলো এতদিন ধরে প্রধানতঃ সি পি আই এম বারবার জানিয়ে আসছিল; নিজেদের পায়ের তলার মাটি ঠিক রাখার জন্য এবার ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসও কোচে গণ্ডুষ করে সেই দাবী নিয়েই বন্ধ-এর কর্মসূচী সহ ময়দানে নামতে হয়েছে। এখানেও সি পি আই এম-এর আর এক দফা রাজনৈতিক জয় সূচীত হয়েছে।

কিন্তু, সিদ্ধার্থবাবু (কলকাতার একটি দৈনিকের জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিকের মতে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক গৃহভৃত্য!!) যাত্রার আসরের ভীমের মত আর একবার গদা ঘোরাবার চেষ্টা করছেন।

ধনঞ্জয় ঘোষ বন্ধুবর সাতই জুন জয় প্রকাশ বিরোধী বিক্ষোভের প্রস্তাব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কংগ্রেসী ভৈরব বাহিনীর দ্বিধা বিভক্ত গোষ্ঠীর পারস্পরিক খুনোখুনির খেলাটাকে সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ওদের সম্মিলিত গুণ্ডামীকে বামপন্থী বিশেষ করে সি পি আই এম-এর বিরুদ্ধে নির্দেশিত করা। মনে হয়না যে, পলিটিক্যাল ক্লাউন সিদ্ধার্থশঙ্করের এই বস্তাপচা কৌশল কোনভাবেই কার্যকরী হবে। তবু, একথা প্রায় অনিবার্যভাবেই বলা যায় যে, কংগ্রেস মরণকামড় হিসেবে আর একবার সন্ত্রাস ও বিভীষিকার ঢালাও মহড়া দেবার চেষ্টা করবে এবং যদি তা করে (সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মত রাজনৈতিক অর্বাচীনের পক্ষে সে পথে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী) তাহলেও সি পি আই এম সহ সহযোগী বামপন্থী দলগুলোর আর একটি রাজনৈতিক জয় সূচীত হবে।

কৌশল-পার্টি অর্থাৎ সি পি আই পড়েছে ভীষণ বিপদে। ইতিপূর্বে জয়প্রকাশজীর ওপর কংগ্রেসী ভৈরব বাহিনী এবং ওদের দলের "আঁতেল" মাস্তানদের জঘন্য আক্রমণে উল্লসিত হয়ে ওদেরই দলের "সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক" (এখন আর স্তালিন নন্দিনী নয়) ইলা মিত্র যেতো ভীমাবৎ নৃত্যসহযোগে এই রাজ্যের সাজানো বিধানসভার চত্বরে পুরপ্রতিমা সুব্রতকে "প্রায় 'দেহিপদপল্লবমুদারম্" কায়দায় অভিনন্দিত করেছে। হায়রে, এমন "বীর রমণীর" উচ্ছ্বাসকে পদদলিত করে শেষ পর্যন্ত সুব্রতরা কিনা কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে বসল। তবু, কৌশল পার্টি হাল ছাড়েনি। পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েই চলেছে, কারণ, ওরাও তো ভাল করেই জানে যে, সন্ত্রাস আর বিভীষিকা ক্ষীয়মান হলে ওদের সুবিধাবাদী রাজনীতিও বাজারে বিকোবে না।

সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হচ্ছে এস ইউ সি দলের। এই রহস্যজনক রাজনৈতিক দলটির সি পি আই এম সহ সমস্ত বামপন্থী দলের মধ্যেই সুবিধাবাদী ঝোঁক দেখতে পাচ্ছে। ওরাই শুধু "শুদ্ধসত্ত্ব বামপন্থী"। ওদের প্রধান ভয়, যদি ব্যাপক গণবিক্ষোভের ফলে আবার রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিরোধী শক্তি জাগ্রত হয় তবে আবার সি পি আই এম তার হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করবে।

কংগ্রেসীদের সশস্ত্র সংঘর্ষ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শাসক কংগ্রেসের বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যখন ঐক্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলছে তখন দলের মধ্যে উপদলীয় সংঘর্ষ ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করছে। কোথাও কোথাও মারপিট, দাঙ্গা লুঠ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটছে বলে পুলিশের সূত্রে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

বেশী দিনের কথা নয়, এই সেদিন অর্থাৎ গত ষোলই মে রাত আটটা নাগাদ দক্ষিণ শহরতলীর কেয়োলা থানার ঠাকুরপুকুর এলাকার উদয়ন পল্লীর এক দোকানে ঢুকে আই এন টি ইউ সির সমর্থক একদল যুবক লক্ষ্মীকান্ত বসুর এন এল সি সির কয়েকজন সমর্থকের উপরে প্রচণ্ড হামলা হয়েছে। পুলিশ বলেছে যে, আইএন টি ইউ সির হামলাকারীদের মধ্যে ছিল বড়িষা পূর্ব পাড়ার পিন্টু, বিপুল, স্বপন এবং আরও সাত-আট জন। আর যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এন এল সি সির সমর্থক উদয়নপল্লীর বুলু চন্দ, কে বসু এবং আরও কয়েকজন।

আই এন টি ইউ সির সমর্থকরা অকস্মাৎ ঐ দোকানে ঢুকে প্রচণ্ড হামলা সহ বেপরোয়া বোমাবাজী করেছে। এদের এই হামলার কবলে পড়ে সেখানে অপেক্ষমান দালালীপদ নামে একজন তরকারী বিক্রেতা বোমার আঘাতে গুরুতর রূপে আহত হয়েছেন।

বর্ধমানে সংঘর্ষ

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত কাষ্ঠশাল বাজারে গত দশই মে বেলা প্রায় পৌনে এগারোটা নাগাদ দু দল শাসক কংগ্রেসীর মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট হয়েছে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি বাড়ীতে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে যদিও কোন জীবনহানি হয় নি, তথাপি স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন পূর্বাহ্নে পূর্বস্থলী থানা চুঁপি গ্রামের নুরুল ইসলাম নামে একজন শাসক কংগ্রেসী যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন কাষ্ঠশাল বাজারে অসিত ভট্টাচার্য নামের অপর একজন শাসক কংগ্রেসীর সঙ্গে তাঁর পার্টির ব্যাপারে কথাকাটাকাটি হয়। এই কথাকাটাকাটির সূত্র ধরে পরে তাঁদের দু দল সমর্থকের মধ্যে মারপিট এবং দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়।

অভিযোগে প্রকাশ, এর পরে অসিত ভট্টাচার্য এবং কালু শেখ সহ তাঁর আরও কয়েকজন কংগ্রেসী সমর্থক নুরুল ইসলামের বাড়ীতে গিয়ে হামলা করে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেখানে একটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

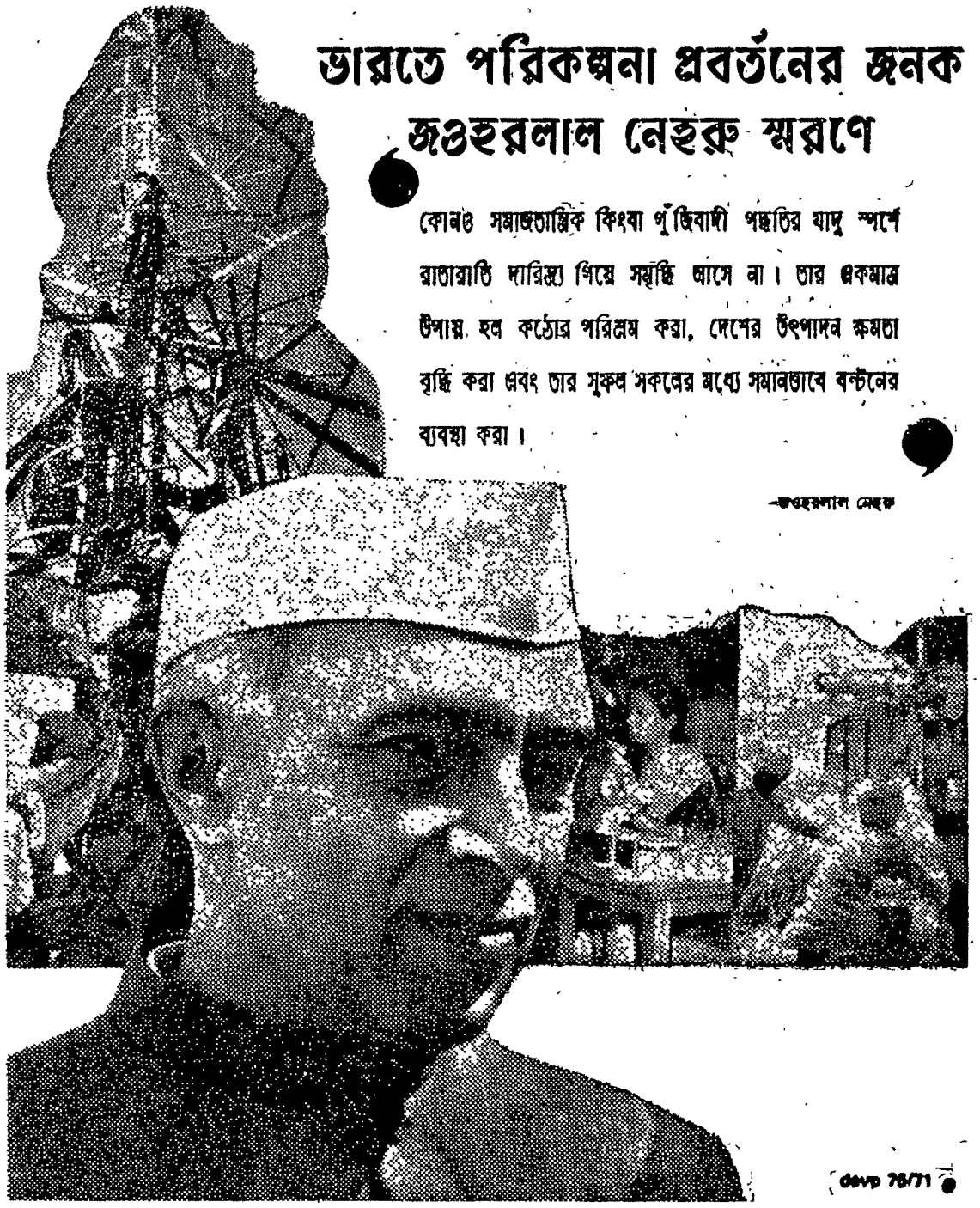

ভারতে পরিকল্পনা প্রবর্তনের জনক জওহরলাল নেহরু স্মরণে

কোনও সমাজতান্ত্রিক কিংবা পুঁজিবাদী পদ্ধতির যাদু স্পর্শে রাতারাতি দারিদ্র্য গিয়ে সমৃদ্ধি আসে না। তার একমাত্র উপায় হল কঠোর পরিশ্রম করা, দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং তার সুফল সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করা।

—জওহরলাল নেহরু

DAVP 78/71

সম্পাদক—হীরেন বসু

দর্পণ কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

নির্বাচনী মামলায় প্রধানমন্ত্রীর পরাজয়

(দর্পণের প্রতিনিধি)

বৃহস্পতিবার : এলাহাবাদ হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীজগ-মোহনলাল সিনহা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন নাকচ করে দিয়েছেন। একাত্তর সালে সোস্যালিস্ট পার্টির প্রার্থী শ্রীরাজনারায়ণের বিরুদ্ধে রায়বেরিলী লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছিলেন।

মাননীয় বিচারপতি বলেছেন, জনপ্রতিনিধি আইনের ১২৩(৭) ধারায় শ্রীমতী গান্ধী দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য।

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

২০শে জুনের বন্ধ্ সমর্থনের প্রশ্নে সি পি আই দলে তুমুল বিরোধ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আট পার্টি আহূত বন্ধ সমর্থনের প্রশ্নে সি পি আইয়ের অভ্যন্তরে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়েছে। যারা আট পার্টির সঙ্গে আন্দোলনে নামতে চাইছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বনাথ মুখার্জী, গুরুদাস দাশগুপ্ত প্রভৃতি। সোমবার ও মঙ্গলবার সি পি আই রাজ্য পরিষদের সভায় এই সম্পর্কে আলোচনায় তুমুল মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটিতে বিশ্বনাথবাবুরা আঠারো—ছয় ভোটে পরাজিত হন। কমিটির তিরিশ জন সদস্যের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন চব্বিশ জন।

বিশ্বনাথবাবুদের বক্তব্য ছিল, উত্তরবঙ্গে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের বন্ধকে যখন আমরা সমর্থন করেছি তখন বিশ তারিখের বন্ধকেও আমাদের সমর্থন করা উচিত। কারণ প্রায় একই দাবীতে বিশ তারিখে আট পার্টি বন্ধ ডেকেছে।

কিন্তু যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কংগ্রেসকেও শরিক করতে চান তাদের বিশ তারিখের বন্ধে সামিল হতে ঘোরতর আপত্তি। কারণ এতে কংগ্রেসের মধ্যে সি পি আই সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেবে বলে তারা মনে করেন।

পাঁচই জুন জয়প্রকাশ নারায়ণের মিছিলের চেহারা দেখে সি পি আইয়ের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পারছেন তারা ক্রমশঃ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন এবং এইভাবে চললে অদূরভবিষ্যতে সাইনবোর্ড ছাড়া সি পি আইয়ের আর কিছু থাকবে না। সাতই জুন কংগ্রেসের মিছিলের চেহারাও তারা দেখেছেন। এর ফলে তাদের ঐ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

বিশ্বনাথবাবুরা তাই বামপন্থীদের সঙ্গে গণ-আন্দোলনে নামতে চাইছেন। কিন্তু রাজ্য পরিষদে কংগ্রেসপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য তাদের আপাততঃ পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বিশ্বনাথবাবু সি পি এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তর সঙ্গে কৃষক ফ্রন্টে যুক্ত আন্দোলনা প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেন সে সম্পর্কে যদিও কিষাণ সভার পক্ষ থেকে এই মর্মে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে যে, প্রমোদবাবুর সঙ্গে পার্টিগতভাবে কোন আলোচনা হয়নি, তবু সেই বিবৃতিতে জনসাধারণের স্বার্থে বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে সি পি আই এম ও অন্যান্য বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির (অবশ্য কংগ্রেসের মধ্যেকার গণতান্ত্রিক শক্তির কথাও উল্লেখিত) সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনের কথাও বলা হয়েছে।

বিশ্বনাথবাবুর রাজ্য পর্ষদের সভায় যদিও ভোটে পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু তারা মনে করেন ভোটাভুটিতে তাদের প্রকৃত শক্তি প্রতিফলিত হয়নি। কারণ কার্যকরী সমিতির সদস্য সংখ্যাকে শতকরা হিসেবে ভাগ করলে তাদের শক্তি দাঁড়ায় চল্লিশ।

কলকাতা থেকে জি ডি আরের দূতাবাস উঠে যাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আগামী তিরিশে জুনের মধ্যে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কলকাতাস্থ কনসাল জেনারেলের অফিস গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেছে। এই দপ্তর এখান থেকে গুটিয়ে নেয়া হলে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী কর্মহীন হবেন। আরও জানা গেছে যে, এই দপ্তর গুটিয়ে নেবার পিছনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

কলকাতার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে এই কনসাল অফিস তুলে নেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে তা বোঝা না গেলেও এটা বোঝা যাচ্ছে যে এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে।

৭ই জুন ময়দানে কংগ্রেসের আধা-সামরিক বাহিনীর সমাবেশ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জনসমাবেশ ও মিছিলের নামে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস গত সাতই জুন কলকাতার মানুষকে তাদের আধা-সামরিক গুণ্ডাবাহিনীর শক্তিসমাবেশ দেখিয়ে দিল। এরা এসেছে লরীতে করে। বিনা পয়সায় চারশো লরী জোগাড় করা হয়েছিল। এরা এসেছে বিনা টিকিটে কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় আগের দিন বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স ও ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশনের কর্তাদের ডেকে আদেশ দিয়েছিলেন সাত তারিখে

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

১৮শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৩ই জুন ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

কংগ্রেসী সমাবেশেও যুব-ছাত্রদের মধ্যে মারপিট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত সাতই জুন ময়দানে কংগ্রেসী সমাবেশে সভামঞ্চের দখল নিয়ে যুব-ছাত্রদের মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে যায় এক সময় মনে হয়েছিল সভা বুঝি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু প্রবীণ কংগ্রেসীর হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে আসে।

সভা শুরু হওয়ার আগে সন্দীপ সৌগত, কুমুদ প্রভৃতি মঞ্চে উঠে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে। ওদের দাবী সন্দীপ ব্যানার্জীকে বলতে দিতে হবে।

মঞ্চের নিচে উপস্থিত ছিলেন নুরুল ইসলাম, বারিদবরণ দাস, সোমেন মিত্র, প্রভৃতি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর যুব নেতারা। ওরা শুনে ক্ষেপে লাল।

এই নিয়ে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কয়েকজন যুব নেতার সঙ্গে সৌগত রায়ের কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। সৌগত বলতে থাকেন সন্দীপকে বলতে দেওয়া উচিত। এর মধ্যে কেন অন্যায় নেই। পাল্টা গোষ্ঠীর নেতারাও কিছুতেই ওদের মঞ্চে যেতে দেবেন না, বলতেও দেবেন না। এর পরে শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। সৌগত রায়কে একদল যুবক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সৌগতবাবুর সমর্থকরাও রুখে দাঁড়ায়। এই নিয়ে শুরু হয়ে যায় মারপিট। ময়দানে উপস্থিত সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মিটিং ভেঙে যাওয়ার উপক্রম।

বেগতিক দেখে অরুণ মৈত্র পকেট মার পকেট মার বলে চেঁচাতে শুরু করেন। ফলে বিরাজমান সকলেই কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে যায়। এরই মধ্যে কিছু প্রবীণ কংগ্রেসীর হস্তক্ষেপে উভয়গোষ্ঠী শান্ত হন।

জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য আহূত সভায় নিজ দলের খেয়োখেয়ি দেখে গ্রাম থেকে আসা অনেক কংগ্রেসীই বিস্মিত।

সম্পাদকীয়

সি পি এমের বিরুদ্ধে কুৎসা

সাতই জুন ময়দানের কংগ্রেসী সমাবেশে সিদ্ধার্থবাবু অরুণবাবুরা সি পি এম তথা যুক্ত ফ্রন্টের বিরুদ্ধে আবার সেই পুরনো কুৎসা গেয়েছেন, সেই তথাকথিত জঙ্গলের রাজত্ব, সেই খুনের রাজনীতির জন্য সি পি এমকে দায়ী করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন। বেকায়দায় পড়লেই কংগ্রেসীরা এই কথাগুলো ঘেউ ঘেউ করে লোককে বোঝাবার চেষ্টা করে। যদিও সিদ্ধার্থবাবু অরুণবাবুরা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পাঁচই জুনের সমাবেশে মাত্র পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাজার লোক হয়েছে বলে জেগে ঘুমোবার চেষ্টা করেছেন, তবু একথা বুঝতে কারো বাকি নেই যে, ওদের হৃদকম্প শুরু হয়েছে। তাই নিজেদের মনে সাহস সঞ্চারের জন্য সাতই জুন ময়দানে কংগ্রেসী আধা-সামরিক গুণ্ডা বাহিনীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল।

নাজী জার্মানীর প্রচারবিদ গোয়েবলের মন্ত্রীশিষ্যরা সেই একই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মিথ্যাকে বারবার উচ্চারণ করে সত্যে পরিণত করতে। তাই গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত বলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম খুনোখুনির নায়ক, সি পি এম জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছিল, "সি পি এমের রাজত্বে" এই রাজ্যে দুঃস্বপ্নের রাত্রি নেমেছিল। কিন্তু যুক্ত ফ্রন্টের আঠারো মাসের শাসনকাল কাদের কাছে দুঃস্বপ্ন? যারা সামান্য অজুহাতে শ্রমিকদের ছাঁটাই ও লে-অফ করে, নিজেরা মুনাফার পাহাড় গড়ে আর শ্রমিকদের পশুর জীবন যাপনে বাধ্য করে সেই শিল্প-মালিকদের কাছে। চাষীকে বঞ্চিত করে গ্রামে হাজার হাজার বিঘে জমি ভোগদখল করে যে জোতদার শ্রেণী তাদের মনে যুক্তফ্রন্ট ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। যুক্তফ্রন্টের আমলে শাসক শ্রেণীর দীর্ঘকালের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষক রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাই জঘন্য ষড়যন্ত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে রক্তের নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আসল হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটার পর থেকে। সাধারণ মানুষ সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো ভোলেনি। শাসক শ্রেণীর নিজস্ব মুখপত্রগুলো—আনন্দবাজার যুগান্তর স্টেটসম্যানের পাতায় সেই কাহিনী ইতিহাস হয়ে আছে। প্রতিদিন আটটা দশটা করে খুন, সি পি এমের শত শত কর্মী সমর্থক খতম হচ্ছে, পাড়ায় পাড়ায় গুণ্ডাদের বেপরোয়া সন্ত্রাস, পুলিশ নিষ্ক্রিয় কিন্তু সন্ত্রাসের প্রতিরোধ করলেই পুলিশ সক্রিয় হয়ে সি পি এম কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে। বারাসাতের রাস্তায় বারোটি মৃতদেহ—আজ পর্যন্ত সেই হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা হল না, সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ড—আসল আততায়ীরা আত্মগোপন করেই রইল। তবে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয়েছিল কাশীপুর-বরানগরে। সিঁথি ও বি টি রোডের মোড়ে পুলিশ পাহারা দিয়েছে আর কংগ্রেসী গুণ্ডার দল কাশীপুর-বরানগর অঞ্চলে শত শত ছেলেকে খুন করেছে, তারপর ঠেলাগাড়ি ইত্যাদিতে করে তাদের মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে। গুণ্ডাদের হাত থেকে মহিলারাও রেহাই পায়নি। পশ্চিমবঙ্গে তখন রাষ্ট্রশক্তির বকলমে কংগ্রেসী শাসন।

১৯৭২ সালে নির্বাচনে জাল-জুয়াচুরি কারচুপি করে ক্ষমতায় আসার পরও খুন বন্ধ হয়নি। গত তিনবছর সি পি এমের প্রায় দুশো কর্মী খুন হয়েছে এবং কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় সংঘর্ষেও বহু যুবক নিহত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেসী শাসকদের। তারা ঘৃণ্য নৃশংস খুনী। তারাই পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছে। এখনও আমরা জঙ্গলের রাজত্বেই বাস করছি। আর খুনীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চিট ফাণ্ডের চিটিংবাজী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চিট ফাণ্ডের চিটিংবাজী একে একে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে দেখে অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। বিশেষ করে যে সমস্ত ব্যক্তি এই চিট ফাণ্ডগুলিতে চড়া সুদের প্রলোভনে টাকা জমা রেখেছিলেন তারা "মার" যাবার ভয়ে গচ্ছিত সমস্ত টাকা তুলে নিতে চাইছেন।

উত্তরবঙ্গের কুচবিহারে এইরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক রাতারাতি ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে উধাও হয়ে যাবার পর এরকম আরও বড় ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি মালদহ থেকেও চিট ফাণ্ডের একটি প্রতারণামূলক ঘটনার খবর জানা যায়। এখানে উনিশশো চুয়াত্তর সালের শেষের দিকে সামশী হাটখোলায় "ফেমিনা ক্রেডিট এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী" এক অফিস খুলে প্রথম দিকে কিছু "লোন" দিয়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ম্যানেজার জনৈক আবুল কাশেম। হেড অফিস কিষাণগঞ্জ থেকে বার কয়েক এক ম্যানেজিং ডিরেক্টরও এসে ঘুরে গেছেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে লোন দেওয়া বন্ধ হওয়ায় অনেকে তাঁর কাছে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তিনি সাড়া দেন নি। অবশেষে গত পয়লা মে (পঁচাত্তর) রাত্রে "হোটেলে খেতে যাচ্ছি" বলে রাতের অন্ধকারে বাড়ী থেকে সবকিছু নিয়ে মধুনেজার উধাও। পরদিন কয়েকজন গ্রামবাসী ছুটলেন কিষাণগঞ্জ। সেখানে আরেক অভিনয়। ডাইরেক্টর "এক্ষুণি থানায় ডায়েরী করছি" বলে ওদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ফেরৎ পাঠালেন। পরে জানা গেল এই চক্রান্তে হেড অফিস ব্রাঞ্চ অফিস সবাই জড়িত। উপরন্তু ম্যানেজার সামশীর কড়ার দোকানদার অন্যলোকের কাছ থেকে টাকা ধার করে পালিয়েছে। কয়েকদিন আগে "ফর্মাল চিটফাণ্ড কোম্পানীর" ম্যানেজারও সামশীতে তার অফিস তালাবন্ধ করে পালিয়েছে। এ খবর দিয়েছে মালদহ থেকে প্রকাশিত "মালদার খবর"।

বছর দুয়েক ধরেই সারা রাজ্যে "চিটফাণ্ড" ও "সেভিংস স্কীম" নাম নিয়ে প্রচুর ভুঁইফোড় অর্থ আমানতকারী সংস্থা গজিয়ে উঠছে। কলকাতা শহরের অলিতে গলিতেও এই ধরণের বেশ কয়েকটা সংস্থা রয়েছে। ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে এই রকম একটি সংস্থা রয়েছে, যেখানে চিটফাণ্ড এবং সেভিংস স্কীম দুটো শাখাই বর্তমান। "চিটফাণ্ড" ঋণ দেবার জন্য এবং "সেভিংস স্কীম" ঋণ গ্রহণের জন্য। এই সংস্থার মালিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন সাধারণ কর্মচারী। ব্যবসা চলছে বেনামীতে। একে একে দুটো প্রাইভেট কার, স্কুটার এবং লেক টাউন অঞ্চলে সুরম্য ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে। একথায় রাতারাতি ফুলে ফেঁপে ঢোল। এই সংস্থায় অর্থ সঞ্চয়কারীদের ক্ষেত্রে ১২% সুদ লিখে অলিখিত এবং বে-আইনীভাবে চল্লিশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট সুদ দেওয়া হচ্ছে। এই সুবিধা সাধারণের জন্য নয়, একান্ত ঘনিষ্টদের জন্য। গোপনীয়তাই এর উদ্দেশ্য। এই বে-আইনী এবং বেশী পরিমাণ সুদের লেনদেন কখনই অফিসে বসে হয় না। প্রাপকের টাকা গাড়ী করে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দালাল বা ফড়ে নির্দিষ্ট রয়েছে। সংস্থার মালিকও স্বয়ং জানেন, যে কোন মুহূর্তেই ব্যবসা লাটে উঠতে পারে, তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পাকা চাকরীটিও। হাতছাড়া করতে রাজী নয়।

নানারকম বে-আইনী কারবার এই সমস্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে চলছে। কোন কোন সংস্থার ব্যবসায়িক সীমা আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। সরকারী তৎপরতায় অনুসন্ধান চললে অনেক অভাবনীয় রহস্য উদ্ঘাটিত হবে সন্দেহ নেই।

কংগ্রেসের সমাবেশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বেলা একটায় সব কলকারখানায় ছুটি দেওয়ার জন্য। এবং সত্যিই যে ছুটি দেওয়া হয়েছিল আট তারিখের স্টেটসম্যানের প্রথম পৃষ্ঠায়ই তার প্রমাণ রয়েছে। ঐ দিনের সংবাদে প্রকাশ, সাত তারিখে সকালে কলকাতায় বিদ্যুতের ঘাটতি ছিল নব্বুই মেগাওয়াট, কিন্তু দুপুর একটার পর সেই ঘাটতি দাঁড়ায় মাত্র দশ মেগাওয়াটে। এই সংবাদে এটা পরিষ্কার যে অধিকাংশ কলকারখানা বেলা একটার পর বন্ধ করার জনই ঘাটতি এত কমেছে।

মুখ্যমন্ত্রী রেল কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন, বেলা একটার পর শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশন থেকে সমস্ত টিকিট চেকার তুলে নিতে। তাই গেটে কোন চেকার ছিল না। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে কংগ্রেসের আধা-সামরিক গুণ্ডা বাহিনীর লোকেরা বিনা বাধায় স্টেশন থেকে বেরিয়ে ময়দানের দিকে রওনা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ময়দানে ঐ দিন তিরিশ হাজারের বেশি লোক হয়নি।

এদের বলা হয়েছে "ভৈরব বাহিনী"। কিন্তু "ভৈরব বাহিনী" বললে এদের গৌরব দেওয়া হয়। কারণ এরা খুনে গুণ্ডা বদমাইস ছাড়া আর কিছু নয়। এই গুণ্ডা বাহিনীই পাড়ায় পাড়ায় সন্ত্রাস চালিয়েছে, সি পি এম কর্মী খুন করেছে, নির্বাচনের সময় বোমা ফাটিয়ে ভোটারদের নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরবর্তীকালে এদেরই বিভিন্ন কলকারখানায় চাকরী দেওয়া হয়েছে। এদের জনই কংগ্রেসের অন্যতম উপদলীয় নেতা লক্ষ্মীকান্ত বসু তার গুণ্ডা বাহিনী নিয়ে সেদিন ময়দানের মধ্যে ঢুকতে পারেন নি। কিছুদূরে ঘুরে বেরিয়ে ফিরে চলে গেছেন।

লোকভর্তি লরী এসেছে ময়দানে পুলিশের চোখের সামনে। পুলিশের চারজন ডেপুটি কমিশনার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। অথচ পাঁচ তারিখে লালবাজারে সাংবাদিকদের প্রশ্নে উত্তরে পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী বলেছিলেন ট্রাক বা লরীতে লোক আনা মোটর ভেহিকলস আইন বিরুদ্ধ। এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে, জয়প্রকাশের সমাবেশে ট্রাক বা লরীতে লোক আসেনি।

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কংগ্রেসে উপদলীয় খেয়োখেয়ি আজ এমন পর্যায়ে গেছে যে, সাতই জুনের মিছিলেও তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ যে গাড়িতে আসছিলেন বিডন স্ট্রীট ও লেনিন সরণির সংযোগস্থলে সেই গাড়ির ওপর সোডার বোতল ছোঁড়া হয়। অঞ্চলটি কংগ্রেসের বিদ্রোহী গোষ্ঠী অর্থাৎ লক্ষ্মী-বারিদ গোষ্ঠীর প্রভাবাধীন। খাদ্যমন্ত্রীর গাড়ির সামনে হঠাৎ তিনটি মোটর বাইক এসে পড়ে। আরোহীরা পুলিশকে ডেকে বলে খাদ্যমন্ত্রীর গাড়িতে একজন খুনের আসামী আছে। নাম হেমেন মণ্ডল। পুলিশের সামনেই তারা গাড়ি লক্ষ্য করে সোডার বোতল ছোঁড়ে। তখন গাড়ি থেকে হেমেন মণ্ডল ও অন্য কয়েকজন লাফিয়ে পড়ে মোটর বাইক আরোহীদের তাড়া করে। ওরা চম্পট দেয়। পুলিশ পরে হেমেন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে।

নির্বাচনী মামলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিচারপতি তাঁর রায়ে আরও বলেছেন যে, শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনে জয়লাভের পথ সুগম করার জন্য উত্তরপ্রদেশের গেজেটেড অফিসারদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের স্পেশাল ডিউটিতে নিযুক্ত শ্রীযশপাল কাপুরের সহায়তাও গ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বিচারপতি আরও বলেছেন, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য শ্রীমতী গান্ধী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পি ডবলু ডির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং রায়বেরিলীর হাইডেল বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারদের সহায়তা গ্রহণের অপরাধেও অপরাধী।

শ্রীমতী গান্ধী ছয় বছরের জন্য কোন লোকসভা বা বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না বলে আদালত নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।

ইন্দিরার পদত্যাগ দাবী

শ্রীরাজনারায়ণ এবং সি পি এমের পলিটবুরো অবিলম্বে শ্রীমতী গান্ধীর পদত্যাগ দাবী করেছেন। সি পি আই নেতা ভূপেশ গুপ্ত এ সম্পর্কে কোন মতামত দিতে রাজী হন নি।

"জনগণের ক্ষমতা" সম্পর্কে জয়প্রকাশের ভাবনা

শান্তি সোম

"জনগণের ক্ষমতাই মুক্তির পথ" কথাটা কোন জনগণতন্ত্রী বা মার্কসবাদীর নয়। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ এলাহাবাদে যুব সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে তার রাজনৈতিক বক্তব্যটা এই ভাষাতেই বলেছেন এবং এই কথাটির উপরই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এর মাধ্যমে জয়প্রকাশজী কি বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি কি বলতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের হাতে ক্ষমতা নেই? কারণ জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকলে তাকে অর্জন করা এবং তা অর্জন করার জন্য উর্পযুক্ত হাতিয়ার সংঘর্ষ-সমিতি গড়ে তোলার দরকার হত না। নেই বলেই তিনি জনগণের মতামত ব্যক্ত করার উপায়গুলোর পরিবর্তন চান, পরিবর্তন চান নির্বাচন পদ্ধতির, চান আইনসভা বা লোকসভা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি চালু করতে। চান বর্তমান, শাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধি পাঠাতে, চান সংঘর্ষ সমিতির হাতে আইনসভা ও লোকসভার কাজের তদারকি করার ক্ষমতা। সমস্ত সমাজ সম্পর্কগুলি বজায় রেখে এইগুলি পাওয়াকেই তিনি বলতে চেয়েছেন বিপ্লব। কিন্তু ভারতের শাসকশ্রেণী ১৯৪৭ সাল থেকেই অবিরাম বলে আসছে যে পৃথিবীর বৃহত্তম এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র জনগণ। কারণ পাঁচ বৎসর অন্তর তাঁরাই বিধানসভা ও লোকসভায় তাঁদের মনোমত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত করেন। যারা মন্ত্রিসভা গঠন করেন, আইন প্রণয়ন করেন ও দেশ পরিচালনা করেন জনগণের ইচ্ছানুসারে। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এ দেশের জনগণের ইচ্ছাই শেষ কথা। সুতরাং চালু শাসন ব্যবস্থা বদল করার কোন প্রয়োজন নেই। যারা বদল করতে চাইছেন তারা আসলে ব্যক্তিগত বা দলগত কারণে জনগণের ক্ষমতার নাম করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছেন।

জনগণের ক্ষমতার প্রশ্নে জয়প্রকাশজীর সঙ্গে ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বটা যে ভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তাতে এমন এক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে জয়প্রকাশজীর সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বটা মৌলিক এবং যে চলতি ব্যবস্থাটা রয়েছে শাসকগোষ্ঠী তার সমর্থক আর জয়প্রকাশ সেটার বদল চান। বহু কালের শোষণ বঞ্চনা ও অধিকারহীনতা এ দেশের মানুষকে চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এমনভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে যে তাঁরা চলতি ব্যবস্থাকে পাল্টাবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিহারের আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতাটা রয়েছে কি না? জয়প্রকাশজীর ধারণা আজকের চোরাকারবার, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, দুর্নীতি ও অপশাসনের মূল কারণ হচ্ছে ভারতের ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচনে মালিক, কালোবাজারী প্রভৃতিদের টাকার খেলা, বাধাহীন জালভোট প্রয়োগ ও জনগণকে ধাপ্পা দেবার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেছে এবং গণতন্ত্রের প্রতি জনগণকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। এই পদ্ধতি দীর্ঘকাল চালু থাকলে এখানে একনায়কতন্ত্র জন্ম নেবে। নির্বাচন পদ্ধতির ত্রুটির জন্যই শতকরা ৫০ শতাংশের কম ভোট পেয়েও কংগ্রেস বহু রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পেরেছে ও পারছে। স্বভাবতই বেশীর ভাগ জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হচ্ছে না। উপরন্তু নির্বাচকদের কোন নিয়ন্ত্রণ নির্বাচিতদের উপর না থাকায় একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে তাঁদের পক্ষে জনসাধারণের ইচ্ছার তোয়াক্কা করার প্রয়োজন হয় না। এই সব কারণেই জয়প্রকাশজী নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন চান। পরিবর্তনগুলির কিছু নমুনাও তিনি দিয়েছেন। যেমন—(১) আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যায় প্রাপ্ত ভোটের প্রতিফলন ঘটে। (২) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার নির্বাচকদের দিতে হবে। (৩) জনপ্রতিনিধিদের উপর নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার জন্য জনগণের ক্ষমতা বা গণকর্তৃত্বের স্থায়ী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যেমন বুথ ভিত্তিক ও নির্বাচন কেন্দ্র ভিত্তিক গণকমিটি। তাছাড়া ভাল প্রার্থী দাঁড় করানোর জন্য ভোটার পরিষদ গঠন করার কথাও তিনি বলেছেন। গণকমিটির সদস্যদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে তাঁরা দল নিরপেক্ষ, জাত নিরপেক্ষ, ও শ্রেণী নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হবেন। গণকমিটির সদস্যদের ৫০ শতাংশ ছাত্রদের মধ্য থেকে নেওয়া হবে। এই সব সংস্কারের সঙ্গে অহিংসার প্রশ্নটি জুড়ে দিলে জয়প্রকাশের গণতন্ত্র রক্ষার পুরো ছকটি পাওয়া যাবে। আন্দোলন অহিংস ও শান্তিপূর্ণ রাখার একটা অদ্ভুত যুক্তি তিনি কলকাতার ময়দানে দিয়েছেন। তাঁর মতে অস্ত্র কখনো সমগ্র জনগণের হাতে থাকে না, থাকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে, ফলে সশস্ত্র ক্ষমতায় মুষ্টিমেয় লোকই ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হয়। এই কারণে তিনি বিপ্লবকেও অহিংস ও শান্তিপূর্ণ রাখতে চান।

জয়প্রকাশজী যখনই নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন চান তখনই তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যে অস্থায়ী অঙ্গটা গঠিত তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন ও তার সংস্কার দাবী করেন এবং আদর্শ একটি বিতর্ক সভার সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু রাষ্ট্রের যে একটি স্থায়ী সংগঠন আছে সেই সামরিক ও পুলিশ বাহিনী, আমলাতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থা যেগুলি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত কোন সংস্থা নয় তার প্রতি কোন রকম অঙ্গুলি নির্দেশ করেন না। কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কি আমাদের এই শিক্ষা দেয় না যে রাষ্ট্রের এই স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সব সময় মন্ত্রীদের বা আইন প্রণয়নকারীদের হুকুম তামিল করার যন্ত্র নয়। তাই জনগণও এর প্রভু নয়। কোন রাজ্যে যখন আইনসভা, এম, এল, এ বা মন্ত্রিসভা থাকে না, রাষ্ট্রের এই স্থায়ী সংগঠনগুলো কিন্তু তখনও জনগণের বুকের উপর দিয়ে চলে বেড়ায়। এদের কর্তারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়, সুতরাং জনগণ এদের সরাতেও পারে না। অথচ আমলাদের হামলার চোটে জনগণের প্রাণান্ত হয়। বর্তমান রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে এই সব স্থায়ী দমনমূলক সংগঠনগুলো। সব থেকে উদার কোন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রাষ্ট্র সাময়িক ভাবে হলেও কখনও পুলিশ, মিলিটারী, আমলা বা বিচারকদের বাদ দিয়ে চলতে পারে না, কিন্তু জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা না থাকলেও চলে। জনগণকে এই ভাবে প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে রাখার কারণ নির্বাচন পদ্ধতির গলদ নয়, তার কারণ রাষ্ট্রের এই অপরিহার্য অঙ্গগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণের কোন ব্যবস্থাই এতে রাখা হয়নি বা হয় না। প্রশাসনের অধিকার, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও বিচারকদের নির্বাচিত করার অধিকার থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত রেখেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে জনগণকে আসল চাবিকাঠিটি দেওয়া হয় না। বুর্জোয়ারাই এই সব স্থায়ী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ দখল করে। স্থায়ী সংগঠনগুলোর আকৃতি ও কাঠামো এমন ভাবে গঠিত যে তা শাসকশ্রেণী বা শোষকশ্রেণীর সেবাতেই লাগে। আইন সভার চাবিকাঠি যদি কখনও সাময়িক ভাবে হাতছাড়াও হয়, তবুও স্থায়ী যন্ত্রটা আসল প্রভুর সেবা করেই চলে। বুর্জোয়ারা সাধারণ মানুষের উপর যে জুলুম চালায় তার কারণ এই নয় যে তারা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, অন্তপক্ষে চালায় এই কারণে যে এই স্থায়ী সংগঠনগুলোর আসল মালিক তারাই এবং স্থায়ী সংগঠনগুলো কেবলমাত্র তাদেরই হুকুম তামিল করে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণ যাতে নিজেদের অধিকারহীন বলে মনে না করেন তার জন্য ভোটের অধিকার ও সার্বভৌমত্বের ঘুমপাড়ানির গান গাইতে গাইতে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ ও তাদের প্রসাদপ্রাপ্ত ক্রীতদাসরা গলা ফাটিয়ে ফেলেন।

জয়প্রকাশজীও এদের মতই দোষ চাপিয়েছেন নির্বাচন পদ্ধতির উপর। তার সুপারিশে বলা হয়েছে "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে।" কিন্তু এই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হুইমার জার্মানীতে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের চতুর্থ রিপাবলিকে ছিল। স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে এখনো এই ব্যবস্থা রয়েছে। তবুও সেখানকার জনগণ কি এখনও প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত নয়? আর রাষ্ট্রক্ষমতার আসল পরিচালকদের উপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার কোন ব্যবস্থা না করে, রাষ্ট্রের স্থায়ী সংগঠনগুলির উপর জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করে "আইনসভা থেকে প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার" শুধু মাত্র ফাঁকা আওয়াজই নয়, এক বিরাট ধোঁকাও। স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে এই ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই সব দেশের নির্বাচকদের শতকরা ১৫ ভাগ নির্বাচক নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি লিখে পুনঃনির্বাচনের দাবী করতে পারেন। কিন্তু এতেও কি এসব দেশের জনগণ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন? হুইমার জার্মানী, ফ্রান্সের চতুর্থ রিপাবলিকের বা স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে এই সব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যদি জনগণ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে থাকেন তাহলে ভারতীয় মাটিতে এমন কি মহামন্ত্র রয়েছে যে এই অধিকারগুলো এখানে জনগণকে প্রকৃত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবে?

আর একটা প্রশ্ন। আইনসভা কি সত্যিই আইন প্রণয়ন করে? যে আইনগুলো আইনসভার আলোচনার পর আইনে পরিণত হয় সেগুলো রচনা করে কারা? তাঁরা কি জনগণের নির্বাচিত আইনসভার প্রতিনিধি, নাকি তাঁরা সেই আমলা, আইন উপদেষ্টা, প্রশাসন বিশেষজ্ঞ ও ভাড়াটে অর্থনীতিবিদের ধুরন্ধর শিরোমণিরা যাঁরা জনবিরোধী কাজের জন্য নানাভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশেষ বিশ্বাসভাজন? সর্বোপরি অর্ডিনেন্সের কথা আর বলার দরকার নেই। কারণ আইনসভার বাইরে থেকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া গত কয়েকটি অর্ডিনেন্সের অভিজ্ঞতা ভারতীয় জনগণ এখনও ভুলতে পারেনি। আমলারাই এই সব অর্ডিনেন্সে বিষয়বস্তু ও বয়ান রচনা করেন। ছয় মাসের মধ্যে এর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছাপ মেরে দেওয়া ছাড়া আইনসভার আর কোন কাজ নেই। বিরোধীদলের কাজ হচ্ছে এই বিলের উপর সমালোচনা করে কিছুক্ষণ বিতর্কের সৃষ্টি করা ছাড়া মূলত আর কিছুই নয়। সুতরাং এই ঠুঁটো জগন্নাথের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কাজটাকেই জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র কাজ বলে চিৎকার করে জয়প্রকাশজী কি প্রকৃত ক্ষমতা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার চেষ্টাই করেছেন না?

নির্বাচনী সংস্কার নীতির তাৎপর্য

জনগণের ক্ষমতার আধার

জয়প্রকাশজীর পরিকল্পনা মত জনগণের ক্ষমতার আধার হলো গণকমিটি যেগুলিতে শতকরা ৫০ জনের মত ছাত্র প্রতিনিধি থাকতে পারবে। এ ছাড়া ভোটের পরিষদ গড়ে তোলা হবে। গণকমিটির সদস্যদের দল, জাত ও শ্রেণী নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা চাই। ভোটার পরিষদ আইনসভার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজে বার করবে। আর নির্বাচনের পর গণকমিটি তাদের

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি ঃ একটি সমীক্ষা (২)

সাধন গুহ

সংসদে ঔড্ডীর এই লাঞ্ছনা অর্থাৎ বিরোধীপক্ষের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়ায় ঘটনাটি কিন্তু কংগ্রেস পরিষদীয় দলের এক বিরাট অংশের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। তাই, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রাজধানীতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে এই অসন্তোষের মোকাবিলা করতে হয়। সহকর্মীদের বিপাকে ফেলার জন্যই শুধু নয়, পুণায় মোরারজীর অনশনকে কেন্দ্র করে যে তর্জনগর্জন তিনি করে এসেছেন তার জন্যও তাঁকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাধ্য হয়েই তাঁকে সেই রাতেই মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্য এবং দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়েছে এবং নতশিরে বর্ষার আগেই গুজরাটে নির্বাচনের দাবী মেনে নিতে হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী যে দলে নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের অধিকারী নন, এই ঘটনাটি তার অত্যুজ্জ্বল এক নজির। মাত্র কয়েকঘণ্টা আগেই যিনি রায়বেরিলীর সভায় বলে এলেন যে, কোন চাপের কাছেই তিনি নতি স্বীকার করতে রাজী নন, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তাঁকেই মোরারজীর মূল দাবী মেনে নিতে হলো। কারণ, ঐ একই রাত্রিতে পরিকল্পনা দপ্তরের বয়খাস্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মোহন ধরিয়ার বাড়ীতে চল্লিশজন সংসদ সদস্যের গোপন বৈঠকেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, গুজরাটে অনতিবিলম্বে নির্বাচনের দাবী মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে। ইন্দিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ক্ষমতাগর্বী গোঁয়ারতুমি বিনা প্রতিবাদে তাঁর দলীয় সদস্যরা মেনে নেবেন—এমন অবস্থার অবসান ঘটেছে।

বস্তুতঃ, কোন ঘটনাকে ভাল করে পর্যালোচনার যথেষ্ট রাজনৈতিক মনীষা তার নেই। সর্ব্বদাই তাঁকে দলের মধ্যে ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী নির্ভর হয়ে থাকতে হয়। এবং লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, কোন লোকই বেশীদিন তার সুনজরে থাকতে পারেনি। একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে কাজে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ হাসিল করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাদের বর্জন করেন এবং কেউ মাথা চাড়া দিতে চাইলেই সেখানে রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেলিংএর কৌশলটি প্রয়োগ করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকায় অনেকের অনেক কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর দলিল তাঁর হাতে থাকায় সেগুলোকে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে তিনি বিন্দুমাত্র কসুর করেন না। উপরন্তু, এমন ভয়ও অনেকের মধ্যেই আছে যে, প্রয়োজন হলে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে উস্কানি দানেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেনা। ললিতনারায়ণ মিশ্রের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের পর এই সন্দেহটা অনেকের মনেই দৃঢ়মূল হয়েছে। ইন্দিরা যেমন বিহারে ললিতবাবুর প্রভাবকে কাজে লাগাবার জন্য তার মত অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকেও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দিয়ে মন্ত্রিসভায় রেখেছিলেন ললিতবাবুও ঠিক ততোধিক চাতুর্যের সঙ্গেই তার দুর্নীতির বহর চালাচ্ছিলেন ক্ষিপ্রগতিতে। কিন্তু, সি, পি, আই (এম) দলের বাধা সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসু প্রমুখদের কল্যাণে যখন বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ ঘটতে সুরু হলো তখন আন্তর্জাতিক দরবারে মুখ বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রীকে সূত্র খুঁজে বের করার জন্য অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ললিতবাবুর মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, ললিতবাবুকে বাদ দেওয়া কি খুব সহজ ছিল ইন্দিরার পক্ষে? সম্ভবত —না। যে কারণে জগজীবন রাম কিংবা চ্যবনকে সহ্য করতে না পারা সত্বেও তাদের বাদ দেওয়ার সাধ্য ইন্দিরার নেই, ঠিক সেই একই কারণে ললিতবাবুকে বাদ দেওয়াও তাঁর পক্ষে সহজ ছিলনা। কারণ, জগজীবন রাম, চ্যবনের মতোই ললিতবাবুও ছিলেন অন্যতম উপদলীয় শিরোমণি। ঠিক এই সময়েই ললিতবাবুর হত্যা নানা সন্দেহকে পরিপুষ্ট করে বৈকি এবং সন্দেহটি আরও ঘনীভূত এইজন্যে যে, বিহারে মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল করা হল ললিতবাবুরই ভাই জগন্নাথ মিশ্রকে। অর্থাৎ, মিশ্রের উপদলটিকে তিনি হাতে রাখলেন। শোনা যায় যে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেদার পাণ্ডেকে তিনি প্রকারান্তরে হুমকী দিয়ে ঠাণ্ডা করেছেন।

বিগত আটাশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের ইতিহাস আগাগোড়াই দুর্নীতি এবং বেইমানির ইতিহাস। কিন্তু, ইন্দিরার পিতা কিংবা লালবাহাদুরের স্বল্পকালীন প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে কিন্তু রাজ্য প্রশাসনিক স্তরে আজকের মত প্রকাশ্য উপদলীয় খেয়োখেয়ি শুরু হয়নি। এই উপদলীর লড়াইয়ের সূচনা করলেন ইন্দিরা গান্ধী। উদ্দেশ্য, নিজের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে নিরুপদ্রব রাখা। এবং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বরাজ্যে ক্ষমতা খর্ব করা। দিল্লীর একজন রাজনৈতিক সংবাদদাতা "শম্বুক" নামের আড়ালে এক্সপ্রেস গ্রুপের একটি কাগজে এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "In the given situation all she can do is to make the Congress a sleeping organisation with the administration of a soporific her own charisma. She needs the party as a democratic facade. She has been ruling mainly on the strength of bureaucracy and the forces of law and order. The executive and the legislature, two of the three organs of State are under her domination. The third, the judiciary, is partly, but not yet fully under her control She needs the Congress party essentially for elections."

"এশিয়ার মুক্তিসূর্য" ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই ঘটনাগুলোকে নেপথ্যে রেখে তা করা সম্ভব নয়। চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেও জওহরলাল অন্ততঃ তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত ব্যক্তিত্ব দিয়ে নিজের দলের ওপর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কন্যা ইন্দিরার বিদ্যাও নেই, রাজনৈতিক কোন ঐতিহ্যও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী নেই বলেই তাঁকে আমি অশিক্ষিত বলছিনা। কমিউনিষ্ট দুনিয়ার অনেক বরণীয় নায়কেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিলোনা, কিন্তু তত্ত্বগত অধীত বিদ্যার্জন এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ শরিকানার মধ্য দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার সর্বজনস্বীকৃত শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত। ইন্দিরার কোনটাই নেই, না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, না কোন রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ শরিকানার অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের সময় বয়সেতো তিনি কচি খুকিটি ছিলেন না। তখন তিনি তিরিশ বছরের যুবতী। কিন্তু কোন সংগ্রামেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন নি। ফলে, তাঁর ব্যক্তিত্ব নিজস্ব দল অথবা লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করবে কোন্ কৃতিত্বের গৌরবে? বর্তমানে সারা দেশের বাজারী কাগজগুলোতে তাঁকে অতীত রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রথম সারির নেত্রী বলে প্রচারের মূল উদ্দেশ্য তো দেশের পুঁজিবাদী চক্রের স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়ার প্রয়াস। পিতার বদমেজাজটি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছেন। তাঁর নিজের পিসী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ভাষায় ইন্দিরা পিতার তুলনায় অনেক বেশী ধূর্ত এবং অনেক বেশী নির্মমও। এ বছরের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীর অন্যতম বিশিষ্ট সাংবাদিক কে, আম, সুন্দররাজনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসংগে বিজয়লক্ষ্মী বলেছেন,

The present prime minister is no doubt shrewder than Jawaharlal. But I must say she is also more ruthless.

সংসদীয় রাজনীতি প্রসংগে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজয়লক্ষ্মী বলেছেন, Defections are being honoured and encouraged in the most cynical fashion.

এবং, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিধানসভা ও সংসদে দলছুট রাজনীতিকে ইন্দিরা যেভাবে মদৎ দিচ্ছেন তার ভবিষ্যত পরিণতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজয়লক্ষ্মী বলেছেন,

There many be no authoritarianism as such but one is fearful that if some of the present trends are not checked in time it may result in the emergence of authortarianism ultimately.

মনে রাখা দরকার যে, এই মন্তব্যটি সুন্দরাইয়া, রণদিভে, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত কিংবা ত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দের নয়। মন্তব্যটি করেছেন এমন একজন যিনি নিজেও দেশের ঘোরতর কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী আন্দোলনের এবং রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মুখপাত্র। বিজয়লক্ষ্মীর এই মন্তব্যের মধ্যে কিন্তু হুঁসিয়ারীর স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যদিও তা আদৌ জনগণের সপক্ষে নয়। হুঁশিয়ারী এই অর্থে যে, ক্রমবর্দ্ধমান গণবিক্ষোভকে দমন করতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ধাঁ ধাঁ সৃষ্টি না করে নিজেদের স্বরূপ প্রকটভাবে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা। অতএব, ইন্দিরা যতখানি নিপুণ দলবাজ ততখানি নিপুণ রাজনীতিক নন। ইন্দিরার কোন ভাবমূর্তি জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে—এই প্রচারকে তখনই স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হতো যখন ইন্দিরার সমস্ত কার্যকলাপের নেপথ্য সত্যটা লোকচিত্তে অস্পষ্ট থাকতো।

ইন্দিরার ব্যক্তিত্ব বলতে যে কিছুই নেই, তার একটি ছোট্ট অথচ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নজির হচ্ছে এই যে, প্রধানমন্ত্রীর আসনে থেকেও একজন বিদেশী সাংবাদিকের সংগে আলোচনা প্রসংগে তিনি বলে বসলেন যে, তাঁর এগারোটি সন্তানের জননী হবার বাসনা ছিল। আরও মজার কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের বুর্জোয়া প্রেসগুলো সেই কথাটা ফলাও করে প্রচার করলেন। অর্থাৎ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদৌ অংশগ্রহণ না করে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর মত ঘুরে বেড়ালেন তাঁর পক্ষে কি সম্ভব স্বকীয় সাংস্কৃতিক রুচি গোপন রাখা?

পরিশেষে, যে কথাটি স্পষ্ট করে বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, ইন্দিরার ভাবমূর্তির আড়ালে গোপন থাকছে অতি সাধারণ এক মহিলার রূপ। ইন্দিরা—রাষ্ট্রশক্তি-নির্বোধের আস্ফালন। পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ রায়, বিহারে জগন্নাথ মিশ্র, উত্তরপ্রদেশে বহুগুণা, উড়িষ্যায় নন্দিনী শতপথী, আসামে শরৎ সিন্‌হা, অন্ধ্রে ভেঙ্গল রাও, হরিয়ানায় বংশীলাল, মধ্যপ্রদেশে প্রকাশচন্দ্র শেঠি প্রমুখ পোষ্য বাছা অথবা রাজনৈতিক গোপালদের সামনে রেখে তিনি একদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং অন্যদিকে নিজস্ব দলের নামে সমাজবিরোধী গুণ্ডা থেকে সুরু করে বাজারের বারবণিতাদের পর্যন্ত কাজে লাগান নিজস্ব ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য। এই প্রসংগে চুয়াত্তরের রেলকর্মী ধর্মঘট বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁকে শিখণ্ডী রূপে দাঁড় করিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। এর সাম্প্রতিতম নজির বাংলাদেশ, ভারতের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে সবাই সবকিছু করে নিয়েছে। ভারতীয় তর্জনগর্জনকে পদদলিত করে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিতে হয়েছে নিঃসর্তে। ইন্দিরার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকলে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতীয় বিবৃতি অনেক বেশী সতর্ক মন্তব্য হতো। ভারতীয় কৌশল পার্টি (সি, পি, আই) অবশ্য এতদ্‌সত্বেও এহেন ইন্দিরার মধ্যে প্রগতির মশাল দেদীপ্যমান দেখতে পাচ্ছে এবং ইন্দিরার ভাবমূর্তি তাদের কাছেও দেবীসদৃশ (হায় মার্কস, হায় লেনিন!)।

শেষ কথা ভারতীয় পুঁজিবাদী চক্র এবং দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট সুবিধাবাদীদের মিলিত এবং সযত্ন প্রচারে ইন্দিরার যে কোন ভাবমূর্তিই সাজানো হোক না কেন, মহাদেবী ইন্দিরার স্বরূপটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ফলপ্রার্থী পোষ্য বাছাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে, তাঁর নিজের আসনও টলটলায়মান। ব্যক্তিত্ব দিয়ে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। কিন্তু, গ্ল্যামার দিয়ে তা করা যায়না।

লাতিন আমেরিকায় মার্কিন বিরোধী হাওয়া

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আবহাওয়া দেখা দিচ্ছে। দীর্ঘকালের ধরে অকুণ্য পানামা কলম্বিয়া ভেনেজুয়েলা পেরু উরুগুয়ে মেক-সিকোয় মানুষ মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মুক্তিসংগ্রামের একটি শ্লোগান হল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ লাতিন আমেরিকা ছাড়ো। লাতিন আমেরিকার বেশীরভাগ দেশেই সামরিক শাসন চলছে। এবং এই সামরিক শাসকদের অনেকেই মার্কিন মুলুকে তালিম পাওয়া। তবু, আজ দেশে দেশে উত্তাল গণবিক্ষোভের ফলে বিভিন্ন লাতিন আমেরিকার দেশ মার্কিন নাগপাশ থেকে নিজে-দের কিছুটা মুক্ত করতে সচেষ্ট।

সম্প্রতি পানামার সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। পানামার জনগণ দীর্ঘকাল পানামাখাল অঞ্চল থেকে মার্কিন ঘাঁটি সরিয়ে নেবার দাবী তুলে আসছেন। সম্প্রতি পানামার পর-রাষ্ট্রমন্ত্রী আলেতিনিও তাক আর্জে-ন্টিনা সফরকালে স্বার্থহীন ভাষায় দাবী তুলেছেন যে, পানামাখাল অঞ্চল থেকে মার্কিন ঘাঁটি গুটিয়ে নিতে হবে। প্রসঙ্গত শ্রীতাক উল্লেখ করে-ছেন যে, এই অঞ্চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বারোটি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। বর্তমানে পানামা ও মার্কিন সরকারের মধ্যে ঘাঁটি সংক্রান্ত আপোষ আলোচনা এখন এক অচলাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন পানামার মানুষের সামনে একটিই পথ। তা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। সম্ভবত পানামার মানুষ সেই পথের কথাও ভাবছেন।

পানামা সরকারের প্রধান জেনারেল ওমর তোরিজোগ সম্প্রতি মার্কিন সরকারকে এই বলে সতর্ক

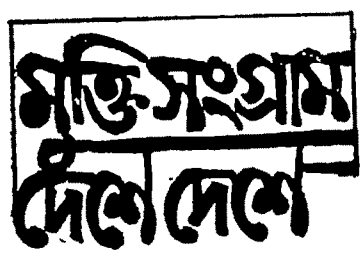

করে দিয়েছেন যে, যদি পানামার বুক থেকে ঔপনিবেশিক অবশেষ সরিয়ে নেওয়ার শান্তিপূর্ণ আলো-চনা ব্যর্থ হয় তবে পানামার মানুষ অন্য পথ নেবে। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, যদি আমা-দের আলোচনা ব্যর্থ হয় তবে যুদ্ধ ছাড়া পথ থাকবে না আমাদের সামনে। তোরিজোগের কথা প্রতিটি পানামাবাসীর মনের কথা। প্রতিদিন পানামা শহরে বড় বড় মার্কিন বিরোধী মিছিল বেরোচ্ছে।

তবে বিপদও আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে লাতিন আমেরিকা কব্জা করে বসে আছে। এই কব্জা করার একটি যন্ত্র হচ্ছে ও এ এস বা অর্গানাইজেসন অব আমেরিকান স্টেটস। আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে "সম্প্রতি ও সাহযোগিতার" জন্য এই সংস্থার উৎপত্তি। আসলে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদ এতকাল এই সংস্থার মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার খবরদারি করত। কিন্তু লাতিন আমেরিকার বুকে কিউবা সৃষ্টির পর লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে স্বাধী-নতা সার্বভৌমত্বের প্রতি ঝোঁক দেখা দেয়। লাতিন আমেরিকা আর সাম্রাজ্যবাদের মৃগয়া ক্ষেত্র নয়—এই কথা কারাকাস থেকে শুরু করে পানামার পথে পথে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে আজকাল। মার্কিন সাম্রা-জ্যবাদ অর্থনৈতিক বয়কট থেকে শুরু করে ট্যাঙ্গাড়ে বাহিনী পাঠা-নোর ষড়যন্ত্র করে গেছে এতদিন। এখন লাতিন আমেরিকার অন্য মুখ। সে ফুঁসে উঠতে শিখেছে। কিউবার অর্থনৈতিক অবরোধের সিদ্ধান্তের সময়কার ছটি দেশ কলম্বিয়া, পানামা, পেরু, ভেনে-জুয়েলা। আর্জেন্টিনা এবং মেক্সিকো আজ কিউবার সঙ্গে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করেছে। ফলে এখন ও এ এসে ফাটল বাড়ছে।

তিন এম এল এর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতার তিন এম এম এল এ অনন্ত ভারতী, ইলা রায় ও নন্দ ঝানাজীর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অন্যা-তম যুবনেতা বারিদবরণ দাস।

এক চিঠিতে বারিদবরণ দাস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছেন যে, দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সীমানা কমি-শনের সামনে বক্তব্য রাখার অভি-যোগে কেন এদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে শাস্তি দেওয়া হবে না।

গত দোসরা জুন সীমানা পুন-র্বিন্যাস কমিশনের সামনে কল-কাতার বিধানসভার আসনগুলি নিয়ে বক্তব্য রাখার দিন ধার্য ছিল। সেই মত কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মত কলকাতায় তেইশটি আসন বজায় রাখার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতে লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী দীপঙ্কর গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও শ্যাম-পুকুর ও কালীঘাট কেন্দ্র তুলে না দেওয়ার আরজী জানাতে যথাক্রমে বারিদবাবু ও রথীন তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

বারিদবাবু টানা আধ ঘন্টা ইংরেজীতে শ্যামপুকুর কেন্দ্র তুলে না দেবার আবেদন জানান নানা যুক্তি উপস্থাপিত করে।

কিন্তু অনন্ত ভারতী ইলা রায় ও নন্দ ঝানাজী এই তিন কংগ্রেসী এম এল এ কমিশনের সামনে শ্যামপুকুর ও কালীঘাট কেন্দ্র দুটি তুলে দেবার কথা বলেন।

অনন্তবাবু যখন কমিশনের সামনে বক্তব্য রেখে একটি চেয়ারে এসে বসেছিলেন তখন বারিদবাবুর সমর্থক বেশ কিছু যুব কংগ্রেসীকে দেখা গেল অনন্তবাবুকে নানাভাবে অপদস্ত করতে। অনন্তবাবু অপ-রাধীর মত সব হজম করে গেলেন।

এর পরেই বারিদবাবু এই তিন এম এল এর নামে নালিশ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি পাঠান।

শ্রমদপ্তরে যথেচ্ছাচার চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রমদপ্তরের অফিসারদের খেয়াল খুশির জন্য হাজার হাজার শ্রম-বিরোধ মামলার কোন নিষ্পত্তি হচ্ছে না। সরকার পক্ষের অজুহাত হচ্ছে অফিসারের অভাব। অথচ বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, অফিসারের অভাব কথাটা ভিত্তিহীন। শ্রমদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন সেকশানে দায়িত্বশীল অফিসারদের দিয়ে কেরাণীর কাজ করানো হয়। সংবাদে প্রকাশ যে, সৎ এবং দক্ষ কর্মীদের বদলী করে রাখা হয় স্ট্যাটিসটিকস সেকশানে। শ্রমদপ্তরের কর্মীদের ভাষায় এই সেকশানকে বলা হয় "ডাম্পিং গ্রাউন্ড"। এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সব সৎ এবং দক্ষ কর্মীদের আজেবাজে কাজে আটকে রাখা হয়। এমনও অভিযোগ আছে যে অফিসারদের অনভিপ্রেত কাজ না করিয়ে শুধু শুধু আটক করে রাখা হয়।

সম্প্রতি গেজেটেড পদে প্রমো-শন নিয়ে ডবলিউ বি সি এস অফি-সারদের সঙ্গে নমিনেটেড অফিসার-দের বিরোধকে কেন্দ্র করে শ্রমদপ্তরে জল বেশ ঘোলা হয়ে উঠেছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে শ্রম-বিরোধের মীমাংসা হচ্ছে না। শ্রমদপ্তরের জনৈক অফিসারকে ট্রেড ইউনিয়ন সেকশানে শুধু বসিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ তাঁর মত দক্ষ অফিসার শ্রমদপ্তরে খুব কমই আছে। শ্রমদপ্তরের সপশ্ এন্ড এস্টাব্লিশমেন্ট সেকশানেও এই ধরণের দুর্নীতি চলছে। সরকারী অমলাদের খেয়াল খুশির জন্য শ্রমিকরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে পারছেন না।

জনগণের ক্ষমতা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

নিয়ন্ত্রণ করবে। যাতে তাঁরা বিপথ-গামী না হতে পারেন।

শ্রেণীনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংস্থা কোন শ্রেণীর ক্ষমতা? শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি কোন না কোন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি। সকলেই স্বীকার করেন যে আমাদের সমাজটা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সুতরাং শ্রেণী নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ জয়প্রকাশজী কোন গ্রহ থেকে জোগাড় করবেন? আসলে তাঁর পরিকল্পিত "শ্রেণীনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির" আসল রূপটা হবে হয় শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির নিরপেক্ষ নতুবা সর্বশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একটি খিচুড়ি সংস্থা যা মূলত বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থাকে বজায় রাখার সংগঠন। শেষোক্ত রূপটাই জয়প্রকাশজীর কল্পিত রূপ কেননা তিনি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী শ্রমিক কৃষকদের বাদ দিয়ে গঠন করতে চেয়েছেন। এর একটা কারণও আছে। ছাত্র সমাজ বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসা জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সংস্থার কারা আধিপত্য করবে? যাদের প্রচারের মাধ্যমের উপর দখল আছে, যাদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও টাকার জোর আছে যারা নানাভাবে সমাজের বিভিন্ন সুযোগগুলি ভোগ দখল করছে। বলাবাহুল্য তারাই এই ধরণের সংস্থায় আধিপত্য কায়েম করবে। তাহলে জনগণের ক্ষমতা অর্জনের জন্য জয়প্রকাশজী যে ধরনের সংস্থার পরিকল্পনা করেছেন সেটা আসলে ধনীদের স্থায়ী সংস্থাগুলোর লেজুর হতে বাধ্য, এটাই তাদের ভবিষ্যত। ইতিহাসে যে সংস্থাগুলো জনগণের ক্ষমতার সত্যিকারের আধারে পরিণত হতে পেরেছিল, যে কম্যুন বা সোভিয়েত সেগুলো কখনই সার্ব-জনীন বা শ্রেণীনিরপেক্ষ বলে নিজেদের দাবী করে নি। বরং বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত নিরস্ত্র ও ক্ষমতাহীন করার জন্য শ্রমিকদের নিজস্ব সংস্থা হিসাবেই গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং জয়প্রকাশজী আইনসভাকে কিসের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করবেন? জনগণের দ্বারা আইন প্রণয়নের প্রস্তাব গোনা কর্মসূচীতে রাখায় এঙ্গেলস বলেছিলেন—"জনগণের দ্বারা আইন প্রণয়নের যে ব্যবস্থা সুই-জারল্যাণ্ডে আছে এবং যাতে ভালোর চেয়ে মন্দই হয় বেশী। জনগণের দ্বারা প্রশাসন, সেটা বরং কাজের হত।" জনগণের দ্বারা প্রশাসন চালানো দূরের কথা, জয়প্রকাশজী জনগণের দ্বারা আইন রচনা পর্যন্ত যেতে সাহস করেন নি। তিনি যে শ্রমিকশ্রেণীকে তার পরিকল্পিত সংগঠনগুলিতে পাত্তা দেন নি সেই শ্রমিকশ্রেণী কিন্তু জনগণের ক্ষমতার সংগঠনগুলোকে শুধুমাত্র সাজিয়ে রাখতে চান নি। বীর কম্যুনার্ডরা কম্যুনকে একাধারে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের সংস্থায় পরিণত করে-ছিলেন প্রশাসনিক কর্তাদের ক্ষমতা-চ্যুত করে, তাদের সুযোগ সুবিধার অবসান ঘটিয়ে, কায়েমীস্বত্ব ভেঙ্গে দিয়ে, নির্বাচিত, অপসারণযোগ্য ও শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন। একই অবস্থা করা হয়েছিল পুলিসদের ও বিচারকদের। কম্যুনকে সাজানো বিতর্কসভা থেকে তৈরী করা হয়েছিল প্রকৃত কাজের সংস্থায় ও রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশ-গ্রহণকে সহজতর করা হয়েছিল। কম্যুনের সময়ে জনগণ নিজেরাই নিজেদের প্রকৃত প্রভু হয়ে উঠে-ছিলেন।

ইতিহাসের এই শিক্ষা থেকে দেখা যায় জনগণের ক্ষমতার রূপ কি, রাষ্ট্রক্ষেত্রে জনগণের সচেতন হস্ত-ক্ষেপে কি আমূল পরিবর্তন আসতে পারে, জনজীবনে সৃষ্টি করতে পারে কি কর্মোন্মাদনা? জয়প্রকাশজীর পরিকল্পিত "জনগণের ক্ষমতা" জনগণের প্রকৃত ক্ষমতার তুলনায় কতই না অকিঞ্চিৎকর।

পরীক্ষা দিয়েও 'অনুপস্থিত'

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অব-স্থার জন্য ছাত্ররা হতাশ হয়ে পড়ছেন। সংবাদে প্রকাশ যে, নৈহাটি কলেজের কতিপয় ছাত্র বাহাত্তর সালে বি-এ পরীক্ষায় সাপলিমেন্টারী পাওয়ায় সাপলিমেন্টারি এবং পার্ট টু পরীক্ষা একা সঙ্গে দেন। কিন্তু তাদের জন্য কোন এ্যাডমিট কার্ড পাঠান হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ অধ্যক্ষের পরামর্শক্রমে ছাত্ররা রোল নম্বরের জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় রেজিষ্ট্রেশান সংখ্যা দিয়ে পরীক্ষা দেন। পরীক্ষা হয়ে যাবার পর এ্যাড-মিট কার্ড আসে।

পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল ছাত্ররা পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের অনু-পস্থিত করা হয়েছে। ছাত্ররা আট মাস যাবত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটাছুটি করছেন কিন্তু কোন ফল হয় নি।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল
মিহির আচার্য সম্পাদিত
শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ৬.০০
মার্কসবাদী মহলে উচ্চপ্রশংসিত গ্রন্থ
প্রাপ্তিস্থান ॥ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা-১২
বুক মার্ক, c/o অগ্রণী ক্লাব, এ-১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

এস ইউ সির চরিত্র প্রসঙ্গে

চৌঠা এপ্রিলের দর্পণ পত্রিকায় "মতামত" কলমে "এস ইউ সির রাজনৈতিক চরিত্র" শিরোনামে প্রকাশিত আমার লেখার প্রতিবাদে বর্ধমাননর জনৈক তাজ মহম্মদ ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে বসেছেন। কোন পার্টির বা ব্যক্তির সমগ্র বক্তব্য উল্লেখ না করে অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিয়ে সেই পার্টির বা ব্যক্তির নীতি ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কুমতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন আজকাল হামেশাই ঘটছে। মহামতি লেনিনের বা মাও-এর লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে নিজের মনোমত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যা অনেকেই করছে। এমনকি হাল আমলের ইন্দিরা মার্কা কংগ্রেসীরাও ঐ সব মহান নেতাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করে চলেছে। সুতরাং তাজ মহম্মদ তার ব্যতিক্রম কিছু নন। তবুও তাঁর জেনে রাখা ভাল বিজ্ঞানের একশাখা গেস্টল্ট স্কুল অব সাইকোলজীতে বলে কোন ব্যক্তির বা কোনকিছুর বিচার বিশ্লেষণ খণ্ড খণ্ড আকারে করা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। কোন কিছুকে সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করতে হলে তার সামগ্রিক ইতিহাস আকার, অবয়ব এবং পরিবেশ বিচার করেই করতে হয়। নচেৎ সে বিশ্লেষণে মারাত্মক ত্রুটি থেকে যেতে পারে এবং সেটা হয়ে দাঁড়ায় বাস্তব ভিত্তিবিহীন সাবজেকটিভ বিশ্লেষণ।।

শাসকশ্রেণী কাকে প্রকৃত শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছে এবং সে তার সমস্ত আক্রমণ কার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করেছে? গত কয়েকবছর ধরে সি পি আই এম-এর উপর যে আক্রমণ চলছে অর্থাৎ যত নেতা ও কর্মী নিহত হয়েছেন, গৃহহারা হয়েছেন, জীবিকাচ্যুত হয়েছেন এস ইউ সির বন্ধুরা কি তার কণা মাত্র স্বাদও পেয়েছেন? তা যদি পেয়ে থাকেন তাহলে যে সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় সি পি আই এম কর্মীরা আজও প্রবেশ করতে পারেন না সে এলাকায় এস ইউ সির কর্মীরা নির্ভয়ে প্রচার চালান, দেওয়াললিখন লেখেন, চাঁদাও তোলেন কি করে? এতদসত্বেও নাকি সি পি এম ইন্দিরার দালালী করেছে এবং এস ইউ সি বিপ্লবের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে—এই কথা আমাদের মত মূর্খ দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তাজ মহম্মদ সাহেব। দর্পণের যে সংখ্যায় তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন সেই সংখ্যাটাই খুলে দেখুন। শাসকশ্রেণী তার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সোর্সমানি কাদের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য খরচ করে সাংবাদিক - বুদ্ধিজীবী নিয়োগ করেছে।

একদা তথাকথিত কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়ার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে—এরূপ ঘটনা কি ইতিহাসে নজিরবিহীন? এ দেশের কথাই ধরুণ—শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, ভূপেশ গুপ্ত হীরেন মুখার্জী এবং অধুনা কংগ্রেসী প্রয়াত মোহন কুমারমঙ্গলম নন্দিনী সৎপথি বড়ুয়া চন্দ্রজিৎ যাদব অর্জুন অরোরা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অরুণ মৈত্র এবং আরও অনেকে আজ কোথায়? সুতরাং পিপলস ডেমোক্রেসীতে যদি লেখা হয়েই থাকে একদা কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি কংগ্রেসে আশ্রয় নিয়েছে এবং কিছু কিছু প্রগতিশীল কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে গোটা

মতামত

কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র পাল্টে গেছে? ইতিহাসে এটাই দেখা যায় যে বিপ্লবীরা দীর্ঘকালের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে জনমানসে বিপ্লবী প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করতে যখন সক্ষম হন তখন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী বাধ্য হয়েই মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য প্রগতিশীলতার ভাণ করে কিছু কিছু অপকর্ম করে থাকে। গোটা পৃথিবীতে যখন সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা বাস্তব সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে তখন আমাদের দেশের ধুরন্ধর একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্ত অধিপতিদের প্রতিভূ কংগ্রেসী সরকার বাধ্য হয়েই ঝাঁক কোলিয়ারী জাতীয়করণ ইত্যাদির নাম করে পরোক্ষে তাদের শোষণকে বজায় রাখারই ব্যর্থ প্রয়াস করে চলেছে। পিপলস ডেমোক্রেসীতে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব সামগ্রিকভাবে ঐ কথাই বলার চেষ্টা হয়েছিল।

শম্ভুনাথ সরকার
কলকাতা

মদের হুল্লোড় এবং পুলিশ

কলকতার লেকে ময়দানে মদ মেয়েমানুষ নিয়ে যে হুল্লোড় চলছে পুলিশের পক্ষ থেকে পাওয়া এমন কয়েকটি সংবাদ সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শহরের মানুষের কাছে এ চাঞ্চল্য তাৎক্ষণিক। অনেকটা বুদ্বুদের মতো। সংবাদের উষ্ণতা থিতিয়ে এলেই সব কিছু ভাবনার আড়াল হয়ে যাবে।

সান্ধ্য মজলিশ বা মুক্তবায়ু ভ্রমণের নামে কলকাতার পথে ঘাটে অলিগলিতে যে নোংরামি এবং অশালীন চিত্রমালার সঙ্গে গোটা শহরের মানুষ পরিচিত, পুলিশ দু একজনকে গ্রেপ্তারের অজুহাতে আকস্মিকভাবে সে সব ঘটনার অতি সামান্যই হাজির করে বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করেছে। যেন পুলিশের দীর্ঘকালীন তৎপরতায় এসব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। তারা যেন এসব ঘটনার কিছুই জানতো না।

দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে প্রায় প্রকাশ্য দিবালোকে যে সব ঘটনা ঘটে থাকে, তার কোন ঘটনাই পুলিশের না জানার কথা নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে বিকেল চারটে থেকেই লেকের ভেতরে গাছের ছায়ায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত যুবকদের গাঁজার আসর বসে যায়। এই সব যুবকদের গাঁজা ও মদ সরবরাহ কারীরা আড্ডার আশে পাশেই ঘুরে বেড়ায়। অধিকাংশরাই কোকাকোলা বা ঠান্ডা পানীয় বিক্রয়ের ভূমিকা নিয়ে থাকে। মদ পরিবেশন করা হয় কোকাকোলার বোতলে। রতনে রতন চেনে। তাই বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না কার কি চাহিদা।

গত সপ্তাহে কয়েকজন অফিস ফেরৎ যুবককে চৌরঙ্গীর ট্রাম রাস্তার ধারে বসে গাঁজা খেতে দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। অনেক পথচারীই দৃশ্য দেখেছেন আর দেশনেত্রীর নামে কটুকাটব্য করতে করতে বাড়ী ফিরে গেছেন। ট্রাম রাস্তার ধারে এদের বসা থেকেই আমি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছি। লক্ষ্য করলাম, এক রিক্সাওয়ালা তার রিক্সার সীটের তলা থেকে বের করে গাঁজার সমস্ত উপাদানই ওদের হাতে তুলে দিল দেখে মনে হল, পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি ছাড়া একাজ সম্ভব নয়।

পুলিশ কি জানে না ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে ক্যাথেড্রাল রোডের ধার ঘেঁষে রোজ বহু ট্যাক্সী কেন সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর বাজারে মেয়েদের ভীড়ে এলাকা ছেয়ে যায়। এ ঘটনা অনালোকিত লোকালয়ের বাইরের ঘটনা নয়। এর চাইতে আরও ভয়ঙ্কর হল নিরীহ তরুণীদের নিরাপত্তার অভাব। দিন কয়েক আগে জনৈকা তরুণীকে জোর করে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে ঐ অঞ্চলে তুলকালাম ঘটে যায়। চলন্ত ট্যাক্সি থেকে মেয়েটির চিৎকার শুনে পথচারীরা মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়িয়ে এক মাতালের কবল থেকে সেদিন তাকে উদ্ধার করে। পুলিশের জানা, অথচ চোখের আড়ালে এঘটনা হামেশা ঘটছে।

এ সব ঘটনা অভ্রান্ত সাধারণ মানুষকে যেমন আজ আর ভাবায় না তেমনি পোড় খাওয়া কেন রাজনৈতিক নেতাও বিচলিত বোধ করেন না। রাজনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নে এসব নিয়ে বেশী হৈ চৈ করলে আশু মুনাফা হয়ত কিছুই জুটবে না।

পুলিশ এসব ঘটনায় অংশীদার না হলে এহা অসহা অবস্থা সৃষ্টি হতে পারেনা। শুধু মাত্র স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের দায়ী করে ফিল্ম ম্যাগাজীনের ধাঁচে রগরগে সংবাদ পরিবেশন করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, এর কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বড় দায় এসে পড়বে, তা সামলাবে কে। যে সব আমলা মন্ত্রীরা এর বিহিত ব্যবস্থা করবেন তাদের নগ্ন অবর্ণনীয় উচ্ছৃংখলতার খবর এই সব উন্মার্গগামী উৎকেন্দ্রিক যুবক-যুবতীদের অজনা নয়।

বছরের পর বছর বেকার বসে থাকতে হবে, স্কুল কলেজে পড়াশুনো হবে না, পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাবে না, সর্বস্তরে ঘুষের রাজত্ব, নোংরা ফিল্ম ম্যাগাজিন আর কুৎসিৎ হিন্দী ছবি বাজারে চলবে, মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স মিলবে রু ফিল্ম, বিদেশী পোষাক আর এমপ্লিফায়ারের সর্বগ্রাসী বাহুল্যের মধ্যে এই সব যুবক যুবতীরা কি শুধু আজীবন সর্বত্যাগী বৈষ্ণব থেকে গয়ায় পিন্ডি দেবার জন্যে জন্মেছেন?

বিভা চাকী

বন্দী হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী

জেল থেকে ছাড়া পেতে পেতে দেরী হয়ে গেল অনেক। তাই তেসরা মের কুৎসিত ন্যক্কারজনক ইতিহাস লিখতেও হয়ত বা দেরী হয়ে গেল। তবু ইতিহাস ইতিহাস-ই। তেসরা মে হাওড়া জেলে যেভাবে ফ্যাসিস্ত কায়দায় পিটিয়ে পাঁচজন বিপ্লবীকে হত্যা করা হল তা যে কোন সভ্যদেশের কর্তাদেরই লজ্জা দেয়।

জেলে বন্দী হত্যা এই প্রথম নয়। এর আগেও ফ্যাসিস্ত সরকার দমদম, বহরমপুর এবং আলিপুর ও হাজারিবাগ জেলে হত্যাকান্ড চালিয়েছে। কিন্তু হাওড়া জেলে বন্দী হত্যা এই প্রথম। এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েই এ চিঠি লিখছি।

হাওড়া জেলের সমস্ত ঘটনাই আমার চোখে দেখা। সামনের কম্পাউন্ডে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে শ্যামল (তরুণ) দাস, প্রতীপ ঘোষ (মান্না), তপন ঘোষ এবং মদন দাসকে। প্রদীপ রায়চৌধুরী (ভাই)-কে গুলী করে হত্যা করা হয়। জেলগেটে পিটিয়ে হত্যার পেছনে যে সিপাইরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল তাদের নাম যথাক্রমে মিঠু পালোয়ান, ছবি সিং হরিনারায়ণ, গোরখ সিং এবং গৌরাঙ্গ।

জেলের ভেতর দিকের গেটে এদের জমাট রক্তের দাগ কোদাল দিয়ে চেঁছেও তুলতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। শুনলাম নাকি কমিশন বসবে। সেদিন এবং পরদিন গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হাজির হয়েছিলেন আই জি সাহেব এবং জেলমন্ত্রী জ্ঞানসিং সোহনপাল।

শেষমেষ একটা করে পুলিশ পদক পাবে মিঠু পালোয়ান, গোরখ সিং আর গৌরাঙ্গ সেপাইয়ের দল প্রজাতন্ত্র দিবসে।

তাই কমিশনের ভাঁওতা নয়, আসুন আমরা সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব সামনে রেখে নতুন ভরত গড়ার শপথ নি। তাহলেই এই সমস্ত শহীদের বদলা নেওয়া হবে।

সন্দীপ সেন
হাওড়া

সরকারী হাসপাতালে এক্স-রে প্লেটের অভাব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সরকারী হাসপাতালগুলিতে এক্সরে প্লেটের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে রুগীরা উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছেনা না। সাধারণতঃ চিকিৎসার জন্য যারা সরকারী হাসপাতালে আসেন তাদের অধিকাংশই গরীব এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত। তবুও চিকিৎসার জন্য তাঁদের ছুটতে হয় অন্যান্য জায়গায় এবং পয়সার বিনিময়ে চিকিৎসা করাতে হয়। অনেকের আবার পয়সা খরচ করার মত সঙ্গতি না থাকায় চিকিৎসার অভাবে তাদের অসুখ দুরারোগ্য হয়ে পড়ছে। অথচ সরকারী কাগজে কলমে চিকিৎসাখাতের 'ব্যয়' বেড়েই চলেছে।

'অভিনয়' পুরস্কার

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

১৯৭৪ সালে কলকাতা ও মফঃস্বল বাংলার অপেশাদার মঞ্চে প্রযোজিত প্রগতিবাদী নাটকগুলির উৎকর্ষতার মান বিচার করে নিম্নলিখিত সংস্থা ও ব্যক্তিকে 'অভিনয় পুরস্কার' দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : লু-সুনের গল্পো (পালাওয়ালা)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : শ্যামাকান্ত দাস (আলিবাবা পাঁচালী) পি, এ, টি। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : আশীষ দাশগুপ্ত (বিদ্রোহী সংবাদ) অদিরা। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : শুভ্রা ঘোষ (ন্যায়-অন্যায়) কার্টুন থিয়েটার ও গীতা ভট্টাচার্য (উল্টো-রথের ভেঁপু) অনুভব। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার : মধুময় রায় (গাধা) পপ থিয়েটার। মফঃস্বল বাংলায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : রণক্ষেত্রে আছি (অন্বেষক)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক আশীষ চট্টোপাধ্যায় (লাস বিপণী) ইউনিট থিয়েটার। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সত্যেন ভদ্র (মিস খেঁদিবালা) শিল্পায়ন।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা :
৬১, মট লেন, কলি-১৩

খুন করে কংগ্রেসীরা ইতিহাসের চাকা ঘোরাতে পারবেনা—জ্যোতি বসু

(দর্পণের প্রতিনিধি)

বোলপুরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রকাশ্য সম্মেলনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন—খুন করে ইতিহাসের চাকা কংগ্রেসীরা ঘোরাতে পারবে না, মানুষ তার পথ নিজেরাই বেছে নেবে। আমরা যদি শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাজের পরিবর্তন আনতে চাই তাতে কংগ্রেস সরকারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর প্রবল আপত্তি। তাই ওরা আমাদের কর্মীদের খুন করছে এবং বিনা বিচারে আইনের সাহায্যে আটক করে রাখছে। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, এদেরও বিচার হবে। তার প্রমাণ ভিয়েতনাম। আত্মত্যাগ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেক করেছেন, আরো করতে হবে। ভিয়েতনামের মতো সংগ্রাম করতে হবে। গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর হল গ্রামের আসল শক্তি, শ্রেণী সংগ্রামে এই শক্তিকে একত্রিত করতে হবে, সামনে বিরাট লড়াই।

উনত্রিশে মে থেকে পয়লা জুন পর্যন্ত বীরভূম জেলার বোলপুরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার চব্বিশতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বীরভূম জেলায় এই প্রথম প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্মেলন। স্বভাবতই কৃষকসভার সম্মেলনের প্রভাব সারা জেলার ওপরে পড়েছিল। গরীব মানুষ তাদের দৈনন্দিন খাদ্য থেকে চাল বাঁচিয়ে দান করেছেন। উদ্দীপনার ছবি ফুটে উঠেছিল বোলপুর শহরে।

সম্মেলন স্থানের নাম দেওয়া হয়েছিল "হরেকৃষ্ণ নগর" হরেকৃষ্ণ নগরের উদ্বোধন করেন কৃষকনেতা মহঃ আবদুল্লাহ রসুল রক্ত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। রক্তপতাকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন—কৃষক, খেতমজুর এবং সারা বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের বিপ্লবের প্রতীক এই রক্তপতাকা।

প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি শ্রীবিনয় চৌধুরী সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। এই সভায় গণ আন্দোলনের প্রয়াত নেতা এবং কর্মীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বীরভূম জেলার অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরে সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন সংসদ সদস্য ডাঃ শরদিন্দু রায়। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় এবং প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ।

কৃষক সভার সম্পাদক শ্রীশান্তিময় ঘোষ তাঁর সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন। পয়লা জুন সকাল পর্যন্ত প্রতিনিধি সম্মেলনের পর বিকেলে বোলপুরের ডাকবাংলো মাঠে অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য সম্মেলন। কৃষক সভার এই সম্মেলনের প্রভাব যে গোটা বীরভূম জেলাতেই পড়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল পয়লা জুন। বিরাট উদ্দীপনা নিয়ে দূর গ্রামাঞ্চল থেকে মিছিল করে ভোর রাত থেকেই গ্রামের কৃষকরা এসে জমায়েত হতে শুরু করেন ডাকবাংলোর মাঠে।

বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা বর্ধমান থেকেও মিছিল এসেছে। বোলপুরের মানুষ এমন দৃশ্য আর কোনদিন দেখেন নি। বোলপুরের প্রতিটি রাস্তা যেন লাল মালায় মুড়ে রাখা হয়েছে।

এদিকে প্রকাশ্য সমাবেশের প্রস্তুতি চলছে, অন্যদিকে মিছিলের পর মিছিল এসে জমায়েত হচ্ছে ডাকবাংলোর মাঠে। অগণিত এই মিছিল পরিণত হল এক বিশাল সমাবেশে। বোলপুরের মানুষ বলছিলেন, এত বড় সমাবেশ নাকি তারা কোনদিন দেখেন নি।

প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পি সুন্দরাইয়া, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, সুহৃদ মল্লিকচৌধুরী, আবদুল্লাহ রসুল, বিহারের কৃষক নেতা রামানন্দ সিং বিনয় চৌধুরী এবং শান্তিময় ঘোষ।

পি সুন্দরাইয়া বলেন—আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস সত্ত্বেও আমরা শ্রমিক কৃষক এবং জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে যাই নি। জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতকে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন—ভূমি বিপ্লব সমাধা করতে হবে, এই সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে নতুন সমাজ কায়েম করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করবার জন্য জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে।

জ্যোতি বসু তার দীর্ঘ ভাষণে বলেন—আমাদের ভূমি বিপ্লব করতেই হবে। জমিদার জোতদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে হবে। তাতে গোটা দেশই উপকৃত হবে। তিনি বলেন—কংগ্রেস সরকার এই দেশটাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছে।

অজিত পাঁজার কাজে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার কাজে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। গত সোমবার তিনি রাইটার্সে গিয়েই অজিত পাঁজাকে ডেকে পাঠান। অজিতবাবু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবু তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তুমি খুব বেড়ে গেছ। পেশাগত কারণে তুমি অনেকদিন ধরে আমার খুব ঘনিষ্ট। কিন্তু মায়া ছাড়ালে তোমাকে আমি শেলটার দিতে পারব না।"

ঘটনাটা বুঝে নেবার জন্য অজিত পাঁজা সিদ্ধার্থবাবুকে কিছু বলতে যান। এক ধমকে সিদ্ধার্থবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন, "কেন তোমার ছেলেরা শতর গাড়ী এ্যাটাক করেছিল?" অজিতবাবু বলেন, মানদা শতবাবুর (খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ) লোকরাই আমাদের মিছিল আক্রমণ করে, তারপর আমাদের ছেলেরা পাল্টা জবাব দেয়। শতবাবুর ওপর কোন আক্রমণ হয় নি।

অজিতবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই সিদ্ধার্থবাবু বলেন, "আমার কাছে পুলিশ রিপোর্ট আছে। তোমার লোকজনই শতর গাড়ীতে আক্রমণ করেছিল। তুমি কাগজে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছ। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে তোমাকে আবার বিবৃতি দিতে হবে।

গত সাতই জুন ময়দানে কংগ্রেসী সমাবেশে যোগ দিয়ে উত্তর কলকাতার মিছিলটি যখন দেশবন্ধু পার্কে ফিরছিল তখন বিডন স্ট্রীটের মোড়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারী দুই গোষ্ঠীর সমর্থকদের মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে যায়। অজিত পাঁজার সমর্থক একদল যুবক প্রফুল্লবাবুর গাড়ীর ওপর আক্রমণ করে। প্রফুল্লবাবুর সমর্থক একদল যুবক পাল্টা আক্রমণ করতে এলে প্রফুল্লবাবু ওদের থামিয়ে দেন এবং গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য পথে চলে যান, ফলে ঘটনা আর বেশী দূর এগোয় নি।

প্রফুল্লকান্তি ঘোষের গাড়ীর ওপর হামলা হওয়ার কিছু পরেই সিদ্ধার্থবাবু ঘটনাস্থলে এসে পড়েন। রাস্তা অবরোধ করে সিদ্ধার্থবাবুর নেতৃত্বে মিছিলটি আটকে দেওয়া হয়। এরা অজিত পাঁজার সমর্থক। সিদ্ধার্থবাবু অবরোধকারীদের সরে যেতে বললে অবরোধকারীরা নানা বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে। পরে ওদের কয়েকজন মুরুব্বি এসে অবরোধকারীদের সরিয়ে নেয়।

বারিদবরণ দাস সিদ্ধার্থবাবুর কাছে এ ঘটনার প্রতিকার দাবী করেন। বারিদবাবু কাগজেও একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, দোষীদের শাস্তি না দিলে পাল্টা মার শুরু হবে। তখন আইন শৃঙ্খলার কোন দায়দায়িত্ব আমাদের থাকবে না। বারিদবাবুর সঙ্গে এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, মুকুল রায়চৌধুরী ভূপেন সেনগুপ্ত সহ জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সকল সদস্য।

এর পরই সিদ্ধার্থবাবু সোমবার রাইটার্সে গিয়েই অজিত পাঁজাকে তলব করেন।

কলিযুগের ছড়া। পরেশ ধর

১

গণতন্ত্র রক্ষা করতে ওরা যে আজ দৃপ্ত
প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র ভাঙতে হল ক্ষিপ্ত।
জয়প্রকাশের গাড়ির চালে
তাই ত কেমন তাল-বেতালে
উগ্র রণ-রঙ্গিণী এক করছে তাথৈ নৃত্য।

২

তিনি হলেন এই দেশেতে সাম্যবাদী মস্ত
মিল-মালিকের ছ' লাখ টাকায় ভরল তাঁহার হস্ত।
এ সব মালিক প্রগতিশীল
দেশপ্রেমিক প্রশস্ত-দিল
সমাজতন্ত্রের ভিত্তিটাও এদের পরেই ন্যস্ত।

৩

বারোই এপরিল্ সভার মাঝে
ঘোষণা যে হয়:
চাপের কাছে কোন রকম
নতি স্বীকার নয়।
তেরোই এপরিল চিঠি এল
হঠাৎ সরল গন্তে:
নির্বাচন হবেই নাকি দশোই
জুনের মধ্যে।

৪

ইন্দিরাজী কাঠগড়াতে
গণতন্ত্রের বিজয় তাতে
আইনী শাসন একেই বলে খাঁটি!
সামচাচা তাই হি হি হাসেন
গণতন্ত্র ভালবাসেন
বলেন, ধন্য এই ভারতের মাটি।

৫

"অর্ডার অব্ লেনিন" পাওয়া মস্ত সাম্যবাদী
আজ পেরেছেন জানতে,
দ্বন্দমূলক থিয়োরী মার্কস সাহেবের নয়
লেখা ছিল বেদান্তে।
সেখান থেকেই মার্কস করেছেন চুরি
এই থিসিসের আছে কি আর জুড়ি?

৬

জঞ্জাল-স্তূপ জমলেই বা
শহর কলকাতায়
নয়ন-মোহন সুন্দরী ট্রাম
চলছে ত সেথায়!
মানুষ কুকুর আঁস্তাকুড়ে
খেলেই বা এক সাথে
বিয়ে বাড়ির মস্ত ভোজের
হয় কি ব্যাঘাত তাতে?

৭

ডাণ্ডা মেরে লোকটা হল
গণতন্ত্রী পাক্কা
ডাণ্ডা খেলো যেজন সে ত
উগ্র ফ্যাসিস্ট ছাঁকা।

৮

টাটা বিড়লা থাকবে এবং
আসবে সমাজতন্ত্র
এই দেশেতে এটাই মোদের
নতুন মহামন্ত্র।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

জেলায় জেলায় ভাগচাষী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় ভাগচাষী উচ্ছেদের প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে। অগ্রদ্বীপ মিংগি, শ্রীখণ্ডী অঞ্চলে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ভাগচাষীরা ঐক্যবদ্ধ। গাজীপুর অঞ্চলে এই প্রতিরোধ সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে।

এই বছরেই গাজীপুর অঞ্চলে শুয়োগাছিতে একটি ভাগচাষী উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। রাধাবল্লভ ঘোষ নামে জনৈক ভাগচাষীকে জমি থেকে উৎখাত করা হয়। গত সাতাশে মে কংগ্রেসী যুবকরা শ্রীদ্বেষের ধান জোর করে কাটতে গেলে কৃষক সমিতির প্রতিনিধিরা সক্রিয় ভাবে বাধা দেয়। মরীয়া হয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী কংগ্রেসী নেতাদের আশ্রয় নেয়। পুলিশ অন্যায়ভাবে শুয়োগাছি গ্রাম থেকে বলরাম মন্ডল রাধাবল্লভ ঘোষ, নীলদুর্গা মন্ডল ও তিনকড়ি মন্ডল প্রমুখকে গ্রেপ্তার করে।

বাঁকুড়ার সিমলাপাল, ইন্দপুর, এবং ছাতনার বাগনান প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকেরা সরাসরি জোতদারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে। সম্প্রতি ইন্দপুরে ঝন দেউলীতে জোতদারের গুলি ছোঁড়ার ঘটনা নিয়ে কৃষক ও সাধারণ গ্রামবাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ক্ষেত মজুররা ন্যূনতম আট টাকা মজুরীর দাবীতে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে।

ঝানাকুল কৃষক সমিতির পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত সতেরোই মে। মোট একশ পনেরো জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা ষাট জন ছিলেন খেত মজুর। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে লোকসভা সদস্য মনোরঞ্জন হাজরা জেলা কৃষক সভার পক্ষে বিজয় মোদক ও অরবিন্দ দাশগুপ্ত বক্তব্য রাখেন।

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীদের রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির বাইশতম রাজ্য সম্মেলন সম্প্রতি মালদহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মালদহ সহ বিভিন্ন জেলার বিশ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। ওয়েস্টবেঙ্গল মিনিস্টেরিয়াল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তাঁর ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে রাজ্য কো-অর্ডিনেসন কমিটির ভবিষ্যত আন্দোলনকে তীব্রতর করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের বিভাগীয় আন্দোলনকেও জোরদার করার আহবান জানান। যুগ্ম সম্পাদক বিজয় সরকার তার বক্তব্যে কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়ার মীমাংসার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন

ক্যাল কেমিকোতে লক-আউট

ক্যালকাটা কেমিকাল কোম্পানীর মালিক গোষ্ঠী আকস্মিকভাবে গত একত্রিশে মে রাত্রি দশটা থেকে কারখানায় লক আউট ঘোষণা করেছেন। কারণ দেখিয়ে মালিকপক্ষ বলেছেন, কিছু শ্রমিক একজন ডাইরেক্টরেটকে মারধর করার জন্যই তারা লকআউট করতে বাধ্য হয়েছেন। ক্যালকেমিকো মজদুর ইউনিয়নের প্রতিনিধি শচীন সেন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন : মালিকপক্ষের এই বক্তব্য প্রতারণাপূর্ণ ও ষড়যন্ত্রমূলক।

দেড়মাস পূর্বে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাছে মালিকপক্ষ আত্মসমর্পণ করেন এবং আগামী আগস্ট মাসে দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। দেড়মাস পর হঠাৎ এই ঝগড়ার অজুহাত কেন? এটা কর্মচারীদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। পনেরোশ শ্রমিক কর্মচারীর ওপর এই আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন মজদুর ইউনিয়ন।

বেসরকারী বাস শ্রমিকদের দাবী সপ্তাহ

নয়ই থেকে ষোলই জুন বেসরকারী বাস শ্রমিকদের দাবী সপ্তাহ। তাঁদের দাবীগুলি হল : শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স এ্যাক্ট, বদলী শ্রমিকদের নিয়মিত কাজ, ৮.৩৩% হারে বার্ষিক বোনাস, টারমিনাসে বিশ্রামাগার ও সস্তায় খাদ্য সরবরাহ, রুটে রুটে নির্দ্ধারিত বাস চালু রাখা এবং বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, মোটরশিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপরে সরকারের অস্বাভাবিক কর বন্ধ করা ইত্যাদি।

সরকারের কাছে এই দাবী বহুবার উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তারা কোন কর্ণপাত করেন নি। আগামী দিনে ব্যাপক আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসেবেই এই দাবী সপ্তাহ।

লোকো রানিং স্টাফ সমিতির সম্মেলন

লোকো রানিং স্টাফ এসোসিয়েশনের দক্ষিণ পূর্ব রেল শাখার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন গত সাতাশে আটাশে মে খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট তিনশ বাষট্টি জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন।

এল আর এস এর দক্ষিণ পূর্ব রেল শাখার বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক এস কে ধর সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করার পর সাতাশ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। রিপোর্ট গৃহীত হয়।

সাব-ইঞ্জিনীয়ারদের কনভেনশন

গত সাতই জুন পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসেস এসোসিয়েশনের ডাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিন সহস্রাধিক সাব এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের বিভিন্ন বিভিন্ন দাবীর সমর্থনে সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদরের সঙ্গে কলকাতায় ভারত সভা হলে একটি গণতান্ত্রিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-ছাত্র প্রভৃতি ছাব্বিশটি সংগঠনের উনচল্লিশ জন প্রতিনিধি সহ এক ব্যাপক সংখ্যক কর্মচারীর উপস্থিতিতে এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য-কোর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ। সভার প্রারম্ভে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধিদের সামনে সাব-এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের সমস্যা সমূহ উত্থাপন করার পর গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন বারোই জুলাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধি দীপেন ঘোষ। এর পর প্রস্তাবের সমর্থনে একে একে বক্তব্য রাখেন আশিস সেন, (সাধারণ সম্পাদক, সারা-ভারত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি) শান্তিরঞ্জন দে (সাধারণ বীমা কর্মচারী সমিতি), নির্মল সেন (জীবন বীমা কর্মচারী সমিতি) শান্তি দে, (টি ইউ সি) প্রমুখ।

সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবে প্রতিটি সাব এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের উপর থেকে গেজেটেড আদেশ প্রত্যাহার, বৈষম্যমূলক বেতন কাঠামোর পরিবর্তন করে সমিতিগত দাবী অনুযায়ী বেতন কাঠামোর পরিবর্তন, সিলেকশন গ্রেডের পরিবর্তে সিনিয়র গ্রেড, অটোমেশন ও ছাটাই বন্ধ মজুরী সংকোচনের আইন প্রত্যাহার করে বর্তমানে প্রদত্ত ষোল টাকার অঙ্কিচার-মূলক মহার্ঘভাতার আদেশ প্রত্যাহার ও কেন্দ্রীয় হারে বকেয়াসহ সমপরিমাণ মহার্ঘভাতা, সর্বপ্রকার দমন-পীড়ন বন্ধ করার দাবী জানান।

নাট্যকর্মীদের মিছিল

নাট্যকর বৃদ্ধি প্রতিবাদে নাট্যকর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েছেন। আগামী চোদ্দই জুন উত্তর কলকাতায় নাট্য কর্মীদের প্রতিবাদ মিছিল হবে। বারোই জুন ধর্মতলায় লেনিনের মূর্তির পাদদেশ থেকে নাট্যকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথসভা এগিয়ে চলবে উত্তর কলকাতার দিকে। ষোলই জুন পৌরভবনের সামনে বেলা দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট চলবে।

দর্পণ কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেসায়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক
সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদকীয়

আদালতের রায় ও প্রধানমন্ত্রী

তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা সম্পর্কে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়েছেন—একথা বুঝতে কারো বাকি নেই। মাননীয় বিচারপতি শ্রীজগমোহন লাল সিংহ রায় দিয়েছেন বৃহস্পতিবার সকালে। তারপর থেকে প্রতিদিন তাঁর প্রতি কংগ্রেসীদের আস্থাজ্ঞাপনে যেমন বিরাম নেই, তেমনি বিরোধীদের প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর বিষোদগারেও কোন ছেদ পড়ছে না। শ্রীমতী আদালতের রায়ে এমন বিচলিত হয়েছেন, ক্ষমতা হারাবার আশঙ্কায় এতই ভীত যে প্রতিদিন শ্রেফ আবোল তাবোল বকছেন আর খবরের কাগজে সেগুলো ফলাও করে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হচ্ছে। না হলে কেউ নিজের ভাবমূর্তির কথা বলে লোক হাসায়? "আদালতের রায় মানছিনা মানব না", শ্লোগান দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মিছিল, কংগ্রেসীদের বক্তৃতা ও বিবৃতি এবং আচার আচরণে আদালতের রায়কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার উদ্দাম আগ্রহ ইতিমধ্যে আদালতের যথেষ্ট অবমাননা ঘটিয়েছে। যেখানে খোদ প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির মত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা আদালতের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিতে পারেন? সেখানে ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোজীদের সম্পর্কে অভিযোগ করে লাভ কি?

আদালতের রায় যাই হক প্রধানমন্ত্রী এখন ক্ষমতা ত্যাগ করবেন না একথা পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে। যদি দরকার হয় লোকসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন এশিয়ার মুক্তিসূর্যের সুবিধার্থে স্থগিত রাখা হবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় শ্রীমতীর বিরুদ্ধে গেলেও আইনতঃ তাঁর পদত্যাগ করার কোন দরকার নেই—একথা প্রমাণ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন অনেক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, প্রাক্তন বিচারপতি, আইনজীবী এবং এমন কি আমাদের ব্যারিস্টার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ও। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রশ্নটি যতখানি আইনগত, তার চেয়ে অনেক বেশি নীতিগত। যেখানে একটি একটি রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত দুর্নীতির দায়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন বাতিল করে দিয়েছেন গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে সেই ব্যক্তির এক মুহূর্তও ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা উচিত নয়। শ্রীমতী ইন্দিরার পিতা যে দেশ থেকে ভারতবর্ষে পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্রের আমদানি করেছেন সেই দেশে এমন ঘটনা ঘটলে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী আদালতের রায় জানার সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করতেন। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই আচরণই শ্রেয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ঘৃণ্যতম ক্রিমিনালদের মধ্যেও যে ন্যূনতম নীতিবোধ থাকে, অনেক কংগ্রেসীদের মধ্যে তারও অসদ্ভাব তাই দলের লোকের গলায়ও ছুরি বসাতে এদের হাত কাঁপে না। তাই কোন রকম নীতিবোধ এদের কাছে আশা করবেন কি করে?

আদালত বলেছেন, যশপাল কাপুরের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিচারপতির শ্রীসিংহর রায় পাঠ করলে শ্রীমতী গান্ধীর সাক্ষ্য সম্পর্কেও একথাই মনে হয়। রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সাক্ষে যা বলেছেন তাকে মাননীয় বিচারপতি বলেছেন পরস্পরবিরোধী। শ্রীমতী গান্ধী শপথ নিয়ে বলেছেন রায়বেরিলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন ১৯৭১ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ যেদিন মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয় সেদিন এবং তার আগে এ সম্পর্কে কোন ঘোষণা করেন নি। এই প্রসঙ্গে আবেদনকারী শ্রীরাজনারায়ণের পক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর একটি টেপ (লক্ষ্ণৌয়ে শ্রীমতী গান্ধীর একটি সাংবাদিক সম্মেলনের) রেকর্ড আনা হয়। সেখানে একটি প্রশ্ন—"A short-while ago there was a meeting of the opposition leaders and there they said that Prime Minister is changing her constituency from Rae Bareli to Gurgaon?"

প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন—"No, I am not."

আদালত বলেছেন—"When the Respondent No. 1 entered the witness box and the aforesaid question and answer were put to her by her own counsel as the examination-in-chief with a view to bringing on record her explanation to it, she stated that her reply did not necessarily mean that she would not change her constituency and that she only meant that she would not contest from Gurgaon constituency. She was again questioned on that point during cross-examination and she then stated.

"It is wrong to assume that while giving the reply marked B in the transcript (EXH 132) I conveyed that I was not changing my constituency from Rae Bareli at all and emphatically held out that I would contest election again from Rae Bareli. In my opinion there is no basis for this assumption."

"I have given my very careful and dispassionate consideration to the aforesaid reply given by the Respondent No. 1 during her cross-examination and I regret my inability to accept it...."

সংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী যা বলেছেন তার পরিষ্কার অর্থ এই যে, তিনি রায়বেরিলি থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অথচ জেরার উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেন তিনি যা বলেছেন তাতে একথা মনে করা ভুল যে, আমি বলেছি রায়বেরিলি থেকে আমার আসন একেবারেই পরিবর্তন করছি না। দুঃখের বিষয় তিনি একথাই বলেছেন যে.

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

বন্ধ 'রুখতে' কংগ্রেসীদের ঝামেলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশে জুনের পশ্চিমবঙ্গ বন্ধ ঠেকাবার জন্যে রাজ্য কংগ্রেসের দুই বিবদমান গোষ্ঠী সাময়িক ঐক্য স্থাপন করলেও নতুন ঝামেলা বেঁধেছে পুলিশকে নিয়ে। এক গোষ্ঠী মনে করে যে, বন্ধ ঠেকাতে গেলে কিছু মারপিট অনিবার্য এবং এ ব্যাপারে পুলিশকে "নিরপেক্ষ" থাকতে হবে। এই গোষ্ঠীর ধারণা যে, এই ফাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী কলকাতা পুলিশের ওপর প্রভাব খাটিয়ে হয়ত বা অন্য গোষ্ঠীর জঙ্গী ছেলেদের গ্রেপ্তার করিয়ে দেবে।

রাইটার্স বিল্ডিংএ বন্ধ বিরোধী সাংগঠনিক প্রস্তুতির জন্য মঙ্গলবার দুই মন্ত্রীর ঘরে দুটি সভা হয়। একটি অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের ঘরে অপরটি শিল্পমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের ঘরে। লক্ষ্মী-বারিদ-সোমেন প্রমুখ নেতারা শঙ্কর ঘোষের ঘরে সভায় যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা তরুণবাবুর ঘরে সভায় হাজির হয়ে বলেন অন্য গোষ্ঠীর নেতারা সবাই দিল্লী চলে গিয়ে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই চরম সংকটে ওঁদের দিল্লী চলে যাওয়া দল বিরোধী কাজ কর্মের সামিল।

দুই মন্ত্রীর ঘরের সভাতে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বড়কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পুলি-

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২০শে জুন ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

টাকা পয়সা পাওয়ার নেশা তরুণ কংগ্রেসী নেতাদের পেয়ে বসেছে

—প্রফুল্লকান্তি ঘোষ

গুজরাটে নির্বাচনী বিপর্যয়ে কংগ্রেসীদের একাংশ মহা চিন্তিত। গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী দেবী চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় এসে দুদিন কাটিয়ে গেলেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিয়ে তিনি অনেক রুদ্ধকক্ষ সভা করেছেন।

তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার। ইন্দিরা গান্ধী গুজরাটে নির্বাচনী প্রচারের জন্য একশো আটত্রিশটি সভা করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসের আসন সংখ্যা একশো বিয়াল্লিশ থেকে পঁচাত্তরে নেমে গেছে।

এই বিপর্যয় সম্ভব হয়েছে কংগ্রেস বিরোধীদের একাংশের

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে ইন্দিরাকে সমর্থনের জন্য আহূত সভায় প্রচণ্ড গণ্ডগোল

অধিকাংশ আইনজীবী প্রধানমন্ত্রীর গদি আঁকড়ে থাকার বিরুদ্ধে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন রাজ্যের বাঘা বাঘা আইনবিদদের সমর্থন সংগ্রহ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন।

দিল্লী থেকে সিদ্ধার্থবাবুর নির্দেশ পাবার পরই শঙ্কর ঘোষ রাজ্যের খ্যাতনামা আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করে অথবা টেলিফোনে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে বিবৃতি দেন। মাত্র কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ খ্যাতনামা আইনজীবী শঙ্করবাবুর অনুরোধে সাড়া দেন নি।

এদিকে কিছু কংগ্রেস সমর্থক আইনজীবী গত সোমবার গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে একটি প্রস্তাব নেওয়ার জন্য সভা ডেকেছিলেন। এই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ট যশপাল কাপুর ও জয়সুখলাল হাতীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা আসেন নি। অবশেষে রাজ্যের এ্যাডভোকেট জেনারেল গৌরী মিত্র সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার শুরুতেই ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব আনতে গেলে প্রচণ্ড গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। উপস্থিত শ দেড়েক আইনজীবীর মধ্যে অধিকাংশই একযোগে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। বেগতিক দেখে গৌরীবাবু বিক্ষুব্ধ আইনজীবীদের কয়েকজনকে মঞ্চে এসে

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাগবাজারের সাম্প্রতিক একটি ছোট্ট ঘটনা। বিবাহিত এক ভদ্রমহিলা স্বামীর সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, সন্ধ্যা নাগাদ। হঠাৎ ছুরি হাতে দুই তিন জন মস্তান এসে ভদ্রমহিলার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিল।

এ ধরণের ঘটনা কলকাতায় প্রায়ই ঘটছে কয়েকবছর ধরে। কেউ পুলিশে নালিশ জানাতে যায় না, কোন লাভ হয় না বলে। সাধারণ মানুষের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে কেউ কিছু বলত না। কারণ গুন্ডাদের বিরুদ্ধে বললে জান নিয়ে টানাটানি।

কিন্তু এবারে বাগবাজারে ঐ এলাকার সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। ছিনতাইকারীদের ওরা তাড়া করেছে সবাই একযোগে। দু একজনকে ধরেও ফেলে।

এ প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, সাধারণ মানুষের মেজাজ বদলাচ্ছে। মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে। সন্ত্রাস আর বেশী দিন চলবে না।

সিদ্ধার্থ রায় সম্পর্কে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গলেন অশোক দত্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার এক সংবাদপত্রে বলা হয় যে, সিদ্ধার্থ রায় হয়ত বা অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন। এই সংবাদে কংগ্রেসের উচ্চপদের নেতারা মহাখাপ্পা, বিশেষ করে প্রবীণ নেতা জগজীবন রাম। তিনি প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে চিঠি লিখে বসেন : যদি কাউকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে হয় তবে তিনিই একমাত্র যোগ্য প্রার্থী।

সিদ্ধার্থবাবু বেকায়দায় পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের সংবাদের প্রতিবাদে বলেন যে সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা এবং কল্পনাপ্রসূত।

এ পর্যন্ত বোঝা যায়। কিন্তু প্রতিবাদপত্রে আর যা লিখেছেন তা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

শ্রীমতী ইন্দিরার প্রতি আনগত্য প্রকাশের চরম আগ্রহে তিনি বলেন যে তিনি ১৯৬৬ সালে শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসের সর্বময় নেত্রী হওয়ার পরই কংগ্রেসে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। সংবাদে কোথাও সিদ্ধার্থবাবুর শ্রীমতীর প্রতি অনুগত্য অথবা তাঁর কংগ্রেসে যোগদান সম্পর্কে কোন বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। এই ধরণের অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যে এই কথা মনে হতে পারে যে, শ্রীমতী গান্ধী সিদ্ধার্থবাবুর উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে হয়ত বা কিছুটা সন্দিহান।

তবে প্রতিবাদপত্রে কংগ্রেসে তাঁর যোগদানের তারিখ বলার ফলে তাঁকে একটু বিপদে পড়তে হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সংগঠন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অশোক দত্ত একটি পাল্টা বিবৃতিতে বলেছেন যে সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেসে ফিরে আসার কথা যা বলেছেন তা "সত্যের অপলাপ"।

অশোকবাবু যা বলেছেন তার সারাংশ নিম্নরূপ। ১৯৫৮ সালে সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেস ছেড়ে বামপন্থী শিবিরে যোগ দেন। সঙ্গে সঙ্গে বিধান রায় ও প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার করতে থাকেন।

১৯৬২ সালে প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী হলে সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেসে ফিরে আসার জন্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করা হয়।

বার বার অনুরোধ করার পর কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে সিদ্ধার্থবাবুর দু বছর শিক্ষানবীশির ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ঠিক হয় যে, বিধানসভায় বিরোধী আসনে বসে তিনি প্রফুল্ল সেন ও তাঁর সরকারের সমর্থনে সর্বসময়ে বক্তৃতা করে যাবেন।

এই প্রস্তাবে সিদ্ধার্থবাবু সম্মত হন এবং দীর্ঘ দু বছর বিধানসভায় তিনি সরকারের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। বিধানসভার সেই সময়কার মুদ্রিত বিবরণে সিদ্ধার্থবাবুর প্রফুল্লবাবু ও তাঁর সরকারের সমর্থনে বক্তৃতার নমুনা দেখা যেতে পারে।

সিদ্ধার্থবাবুর আনুগত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে কংগ্রেস তাকে সভ্যপদ ফিরিয়ে দেয় ১৯৬৪ সালে, ১৯৬৬ সালে নয়। এই সময়ে শ্রীমতী গান্ধী দেশের সর্বময় নেত্রী নন। অতএব ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে তিনি প্রফুল্ল সেনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে কংগ্রেসে ফিরে আসেন।

অশোক দত্তের বিবৃতিতে অবশ্য সিদ্ধার্থবাবুর বামপন্থীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লিখিত হয় নি। তিনি বিরোধী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু নির্বাচক মণ্ডলীর বিরুদ্ধাচারণ করে নিজের আখের গোছাতে কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর সততার প্রমাণ পাওয়া যেত যদি তিনি সদস্যপদ ছেড়ে দিয়ে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হতেন।

তরুণ কংগ্রেসী নেতাদের সম্পর্কে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঐক্যের ফলে। কংগ্রেস বরাবর বিরোধীদের অনৈক্যের সুযোগে কম ভোট পেয়েও শাসক দল হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে। এখনই যদি সাংগঠনিক ও প্রচার ব্যবস্থা জোরদার না করা যায় তবে আবার সাতষট্টি সালের মত বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকরী ঐক্য স্থাপনের নানা চেষ্টা দেবীবাবু বহুদিন ধরে করে আসছেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা বেশীদূর এগোয় নি। অবশ্য ব্যর্থতার নানা কারণ আছে।

কিছুদিন আগে দেবীবাবু তাঁর রিচি রোডের বাসস্থানে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য ছিল বিষদ আলোচনার। নিমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, প্রিয় সুব্রত সৌগত সুদীপ ইত্যাদি আর অপরদিকে সোমেন মিত্র এবং শত ঘোষ।

আলোচনায় প্রিয়বাবু একটু দেরীতে আসেন। কৈফিয়তে বলেন যে তাঁর ছোটভাই অসুস্থ এবং কলকাতার সবচেয়ে ব্যয়সাপেক্ষ নার্সিং হোম বেলেভুতে বিশেষ অনুসন্ধান কক্ষে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেছেন।

আলোচনা চালাবার জন্য দেবীবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যবস্থানুযায়ী ঐক্যের তত্ত্ব ও ফর্মুলা লিপিবদ্ধ করে তিনটি টাইপ করা কাগজ সবাইয়ের পড়ার জন্য দেন। আলোচনা শুরু হয় দেবীবাবুর বক্তব্যকে ভিত্তি করে।

নানা সারগর্ভ বক্তৃতা হতে থাকে বহুক্ষণ। এদিকে পাশের ঘরে খেতে বসার আয়োজন চলতে থাকে। শত ঘোষ চুপ করে শুনতে থাকেন। তরুণ নেতারা বলেন প্রবীণ নেতাদের গোপন হাতের ফলেই আজ দলে এত বাদবিসম্বাদ। প্রবীণেরা সরে দাঁড়ালেই তরুণ নেতৃত্ব একজোট হয়ে কাজ করতে পারবে।

শেষে দেবীবাবুর বিশেষ অনুরোধে শতবাবু বলতে শুরু করেন বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে।

শতবাবু যা বলেন তার সারাংশ এইরূপ। এখানে প্রিয় এসে বলছে যে বেলেভুতে বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য ছোটভাইকে ভর্তি করেছে। এই ব্যবস্থার জন্য দৈনিক খরচ অন্ততঃ পাঁচশো টাকা। মাত্র তিন-চার বছর আগে প্রিয় আর তার তিন ভাই একটা ঘরে কোনরকমে দিন চালাত। আর ঘোষ পরিবার থেকে কিছু কিছু অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল।

সুদীপ আজ এই সভায় এসেছে যে পাল্ট স্যার্ট পরে তার দাম অন্ততপক্ষে শ ছয়েক টাকা।

দেবীবাবু নিজে প্রতি মাসে এদের হাতে তেত্রিশ হাজার টাকা করে পাঠান। আর তাছাড়া এদের প্রত্যেকের নতুন নতুন গাড়ী। ড্রাইভার গাড়ী চালায়। মাত্র তিন চার বছরে এই সমৃদ্ধি। কোথা থেকে এল এই টাকা?

লবণ হ্রদে কংগ্রেসের অধিবেশন হল এবং সেই সূত্রে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সব টাকাটাই এই সব ছেলেদের জিম্মায় ছিল। সেই টাকার হিসেব এখনও পাওয়া যায় নি।

উত্তেজনায় শত ঘোষের গলা কাঁপতে থাকে। অতুল্য ঘোষ প্রফুল্ল সেনকে লোকে দুর্নীতিপরায়ণ বলত। কিন্তু তাদের আমলে রাজ্য কংগ্রেসের নেতাদের ব্যবহারের জন্য মাত্র চারখানা গাড়ী ছিল। আর এখন?

শত ঘোষ বলেন : "আমি মনে করি টাকা পয়সা পাওয়ার নেশা এই তরুণ কংগ্রেসী নেতাদের পেয়ে বসেছে। ওদের বিবাদ এই নিয়ে। এই দুর্নীতি বন্ধ না করতে পারলে ঐক্য সুদূরপরাহত।"

কংগ্রেসীদের ঝামেলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তাদের কাছে সঠিক লিখিত নির্দেশ না দিলে পরে পুলিশকে গোলমালে পড়তে হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুলিশ দোসরা এপ্রিলের ঘটনার কথা উল্লেখ করে। জয়প্রকাশ নারায়ণ কলেজ স্কোয়ারে সভা করতে এলে তার ওপর পুলিশের সামনে কংগ্রেসী ছাত্র যুব গোষ্ঠী চড়াও হয়। এই আক্রমণের নেতৃত্ব করেন প্রিয় দাসমুন্সী ও সুব্রত মুখার্জী। পুলিশ নির্বাক দর্শক হয়ে থাকে। পরে এই আক্রমণকে কেন্দ্র করে সারা দেশে আলোড়ন ছড়িয়ে যায় এবং পরোক্ষে পুলিশের ওপরদিয়ে দায়িত্ব এসে পড়ে।

দুই মন্ত্রীর ঘরের সভাতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। তবে ঠিক হয়, বন্ধ বিরোধী সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঠিক কতটা মারপিট করা হবে তার সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় দিল্লী থেকে ফিরলে ঠিক হবে।

কংগ্রেসীদের সব গোষ্ঠীই মনে করে যে, মার্কসবাদীরা এবং ওদের সহযোগী অন্যান্য বামপন্থীরা রাস্তায় নেমেছে প্রচার অভিযানে বিভিন্ন পথ সভা ও দেয়াল লিখন এবং পোষ্টারের বহর দেখে ওদের মনে হয়েছে বামপন্থীদের সংগঠন জোরদার। অবিলম্বে এর মোকাবিলা না করলে সমূহ বিপদ।

মোকাবিলার একমাত্র পথ বেদম পেটাই। আবার নতুন বামপন্থী নিধন শুরু করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন "জঙ্গী" ছেলে ছোকরাদের। কিন্তু এরা ত আর বিনা পয়সায় কাজ করবে না। তাই অর্থ যোগানের বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আর এই অর্থ সমানভাবে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, দ্বিতীয় প্রশ্ন পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গী। এই নিধন ব্যবস্থায় পুলিশের সার্বিক সাহায্য প্রয়োজন। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে পুলিশ অফিসাররা নিজেদের খেয়াল খুশীমত কাজ করছে আর মুখ্যমন্ত্রী নিজ প্রয়োজনে দুই গোষ্ঠীর "জঙ্গী" ছেলেদের ব্যবহার করছেন। কংগ্রেসের এক গোষ্ঠী অভিযোগ করে যে, মুখ্যমন্ত্রী এখন নিজের "জঙ্গী" বাহিনী তৈরীর কাজে নেমেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ মন্ত্রী গণি খাঁন চৌধুরীর সহযোগিতায় নানা ব্যবস্থা করছেন।

এদিকে খাদ্যমন্ত্রী শত ঘোষ তাঁর দলবলকে বলছেন যে অন্যপক্ষ যদি দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে এবং আখের গোছায় তাহলে তারাও সব কাজ কর্ম ছেড়ে দিল্লী গিয়ে বসে থাকবে।

তিনি তাঁর প্রিয়জনদের আদেশ দিয়েছেন একশো জন দিল্লী যাওয়ার এবং সেখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

তবে সবাই আশা করছে মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফিরলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ মোটামুটি কয়েক শো বামপন্থী কর্মী গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেছে।

সম্পাদকীয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তিনি রায়বেরিলি কেন্দ্র পরিবর্তন করছেন না।

আদালতে প্রদত্ত লিখিত বিবৃতি ও সাক্ষ্যে শ্রীমতী গান্ধী অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীন কথা বলেছেন বিচারপতি শ্রীসিংহর রায় পাঠ করলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

অর্থাৎ আদালতের কাছে শ্রীমতী গান্ধী অনেক ক্ষেত্রে অসত্য কথা বলেছেন। তাঁর কৌঁসলী আদালতকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, শ্রীমতী গান্ধীর কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে নেওয়া উচিত। কারণ তিনি উচ্চ পদ অধিকার করে আছেন, এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আদালত তাঁর বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছেন।

ইনিই হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, যাঁর ব্যক্তিগত সংকট ও তাঁর দলের সংকটকে দেশের ও জাতির সংকটরূপে দেখানোর চেষ্টা করছে ক্ষমতালোভী কংগ্রেসীরা। কিন্তু ইন্দিরা মানে ইন্ডিয়া নয়।

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্য রাখতে বলেন। চার পাঁচ জন আইনজীবী জোরালো ভাষায় ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগের দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এই সব বক্তারা যখন তাঁদের বক্তব্য রাখছিলেন তখন অনেকেই হাততালি দিয়ে তাদের সমর্থন জানাতে থাকেন।

ক্রমে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। গৌরীবাবু বার বার শান্ত হওয়ার আবেদন জানিয়েও কোন সাড়া পান না। ফলে কোন রকমে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হল বলে ঘোষণা করে আধঘন্টার মধ্যে সভা ভেঙে দিয়ে গৌরীবাবু সভা ত্যাগ করে চলে যান।

এই ঘটনার পরই কংগ্রেস আইনজীবী সেলের আহ্বায়ক শরদিন্দু বিশ্বাস শঙ্করবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেস সমর্থক আইনজীবীদের এক সভা ডাকার তোড়জোড় করছেন। যাতে কিছু দালালদের দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করানো যায়।

রাজ্যের হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন এপর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। দলমত নির্বিশেষে রাজ্যের ঘাঘা ঘাঘা আইনজীবীরা এই সংস্থার সদস্য। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে এই এসোসিয়েশনের অধিকাংশই সদস্যই মনে করেন ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন থাকা আইনবিরুদ্ধ। ঐ সূত্রে আরও জানা গেছে এই সংস্থা এক এক বৈঠকে সরকারী ভাবে তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

ইন্দিরা গান্ধী ও গণতন্ত্র

সাধন গুহ

শ্রীমতী গান্ধীর ভাবমূর্তির এক সমীক্ষা প্রসঙ্গে আমার পূর্ব-পর্যায়ের দুই নিবন্ধে বলেছিলাম যে, ক্ষমতা দখলে রাখার জন্য ইন্দিরা যে কোন কাজ করতে পারেন এবং গণতন্ত্রের বুলিটা হচ্ছে তাঁর সেই আশা চরিতার্থ করার পথে এক অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার মাত্র। বারোই জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় প্রকাশের পর সেই কথাটাই আর একবার প্রমাণিত হলো।

রায়বেরিলী মামলায় সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা

উনিশশো একাত্তর সালের চব্বিশে এপ্রিল এলাহাবাদ হাইকোর্টে জাস্টিস ব্রুম কর্তৃক রাজনারায়ণের অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হলে শ্রীমতী গান্ধী হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল দায়ের করেন কিন্তু বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় শেষ-পর্যন্ত তিনি আপীলের আবেদন প্রত্যাহার করে নেন। মনে রাখা দরকার যে, জাস্টিস হেজের কোর্টেই আপীলের শুনানী হচ্ছিল। পরবর্তীকালে সংসদে বিরোধীপক্ষের তরফে অভিযোগ ওঠে যে, ইন্দিরাজীর নির্দেশে পরিচালিত হতে চান নি বলেই জাস্টিস হেজকে প্রধান বিচারপতি করা হয় নি। এলাহাবাদ হাইকোর্টে জাস্টিস ব্রুম যশপাল কপূরের প্রসঙ্গটি মামলার অন্তর্ভুক্ত করতে রাজী না হলে রাজনারায়ণের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা হলে বাহাত্তর সালের পনেরোই মার্চের রায়ে সুপ্রীম কোর্ট বিষয়টি মামলার অন্তর্ভুক্ত করার স্বপক্ষে রায় দেন। এর পনেরো দিন পরই জাস্টিস ব্রুম অবসর গ্রহণ করেন। এই মামলায় দলিল হিসেবে ইউ পি সরকারের 'ব্লু বুক' আদালতে হাজির করার জন্য রাজনারায়ণের দাবী যখন হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত হয় তখন ইউ পি সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা হয় কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্টের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন। তখন হাইকোর্টে মামলার বিচারপতি ছিলেন মাননীয় শ্রীবাস্তব। তিনিও অবসর গ্রহণ করার পর মামলা আসে মাননীয় বিচারপতি জগমোহন লাল সিনহার হাতে। এসব মধ্যবর্তী ঘটনার পর সুপ্রীম কোর্টে ইন্দিরার জয় অনিবার্য বলে ঘোষণা করা এই মুহূর্তেই তাই আর সম্ভব নয়। এটা শ্রীমতী গান্ধীও জানেন এবং তাই আজ কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের পোষা সরমেয় সি পি আই দলে তোলপাড় সুরু হয়ে গেছে।

ইন্দিরা-যশপাল মিতালী

কে এই যশপাল কাপুর? উনিশশ একান্ন সালে যশপাল প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে একজন ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন। এই সময়েই সুদর্শন যশপালের সঙ্গে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের প্রসাদেই যশপাল প্রয়াত জওহরলাল নেহেরুর স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্টের পদে উন্নীত হন। চৌষট্টি সালে ইন্দিরা শাস্ত্রী মন্ত্রিসভায় যোগদানের পর যশপাল তাঁর একান্ত সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন এবং সাতষট্টি সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে যশপাল কংগ্রেস কর্মী হিসাবে নাম লেখান এবং সাতষট্টি সালে প্রধানমন্ত্রীর রায়বেরিলী নির্বাচন কেন্দ্রে ইন্দিরার স্বপক্ষে প্রচার চালান। নির্বাচন শেষ হবার পরই আবার তিনি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের বিশেষ কর্তব্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত হন। একাত্তর সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখে আবার যখন তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দেন তখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, "হি গট ফেড আপ উইথ দা গভর্ণমেন্ট সার্ভিস" অর্থাৎ সরকারী চাকরীতে সে হাঁফিয়ে উঠেছে। এবারও সেই একই চাল। যশপাল ইন্দিরার ইলেকশন এজেন্ট নিযুক্ত হলেন (পয়লা ফেব্রুয়ারী, একাত্তর) উপরন্তু ইউ পি থেকেই যশপাল রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। এরপর ইন্দিরা-যশপাল মিতালীর রহস্য লোকলোচনে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। যশপালের স্ত্রীও বহু সরকারী পারমিট ভাগ্যের ভাগ্যবতী। কিন্তু, এসব কেচ্ছাকাহিনী তো সাধারণের জানার কথা নয়। বর্তমানে ভারতীয় বুর্জোয়া শিবিরের আভ্যন্তরীণ লড়াইটা চরমে উঠেছে বলেই অনেক কাহিনীই প্রকাশিত হচ্ছে এবং আরও অনেক হয়তো ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।

ইন্দিরা পদত্যাগ করুন

এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক নির্বাচন বাতিল হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ইন্দিরার উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করা। সংসদীয় গণতন্ত্রে সেটাই রীতিসম্মত বিচারপতি সিনহা তাঁর মূল রায়ে কিন্তু নির্বাচন বাতিলের আদেশ কার্যকরী করা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন নি। কুড়িদিন সময় প্রার্থনা করা হয়েছে ইন্দিরার পক্ষ থেকে। বিচারপতি সেটা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু রায়দান এবং পরবর্তী আদেশের মধ্যবর্তী কালেই ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। তিনি সুপ্রীম কোর্টের রায় সাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে দলের অন্য কারো হাতে সাময়িকভাবে ভার দিতে পারতেন। তা তিনি করেন নি। কারণ, দলের প্রয়োজনে তাঁর নিজ ক্ষমতা দখলে রাখার জন্য দলের কারো ওপরেই তাঁর আস্থা নেই। সদাই তিনি ভীত, সন্ত্রস্ত।

এলাহাবাদ কোর্টের রায় বেরোনোর পর আমরা যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়ার সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত ঠিক তখনই কলকাতায় কংগ্রেসের ভৈরববাহিনীর মিছিলের ধ্বনি ছিল, "হাইকোর্ট মানি না, নির্বাচন মানি না—ফ্যাসিবাদকে রুখতে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকছে, থাকবে।" ঝোলা থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়লো। ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের এমন "মহৎ সংকল্পে" বোধ হয় স্বয়ং হিটলারও লজ্জা পেতো। শুধু হাইকোর্টের রায়ই নয়, গুজরাটে এবারের নির্বাচন ছিল "প্রেস্টিজ ফাইট"। ইন্দিরা মাটি কামড়ে পড়েছিলেন গুজরাটে। কিন্তু, গুজরাটও তাঁকে বাতিল করে দিয়েছে। "গুজরাটের পুত্রের" ঘরে আগুন জ্বালানো "পুত্রবধূকে" এই রাজ্য বরণ করে নেয় নি।

কোশল পার্টির দালালী

মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগে দণ্ডিত ইন্দিরার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে সি পি আই নেতা পুনাপ্পালোক মহামতি" ডাঙ্গে—ইংরেজ শাসকের কাছে দালালীর দাসখৎ লিখে দেওয়াটাই যার "বিপ্লবী" জীবনের উজ্জ্বলতম নজির। রাজনৈতিক গণিকাবৃত্তির পরিপোষক এই দলের চোখে ইন্দিরার দুর্নীতি খুবই মামুলী ধরণের। সি পি আই (যা অনেকের মতে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্দিরা) তার দলীয় চরিত্র বজায় রেখেছে এবং প্রাণের দায়েই তা করতে হয়েছে কারণ রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ লালন ছাড়া ওদের আর বেঁচে থাকার পথ নেই। এবং, সি আই এ বনাম কে জি বি-র ঠাণ্ডা লড়াইয়েও আজ রাশিয়ার শোষনবাদী শাসকচক্র অন্ধভাবে ইন্দিরাকে মদৎ দিতে বাধ্য।

বামপন্থীরা সংঘবদ্ধ হোন

ভারতের বুর্জোয়াদের এই আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন আরও বিপর্যস্ত হবে। এক ইন্দিরা যাবে আর এক ইন্দিরা আসবে, কিন্তু এই আসা যাওয়ার গাণিতিক বিশ্লেষণে দেশের মানুষ সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাবে না। এই মুহূর্তে যদি বামপন্থী দলগুলো সংঘবদ্ধ হয়ে চূড়ান্ত সংগ্রামের ময়দানে সামিল না হতে পারেন তবে ইতিহাস তাদের ধিক্কার দেবে। ইন্দিরারা কখনও ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়নি, দেয় না, দেবেও না। ওদের ঘাড় ধরে নামাতে হবে। বুর্জোয়াদের আভ্যন্তরীণ সংকটের সুযোগই বামপন্থীদের অগ্রগতির নিশানা।

মার্কিনীদের নতুন ঘাঁটির সন্ধান!

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ইন্দোচীন যুদ্ধে পরাজিত বিব্রত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখন সারা পৃথিবী জুড়ে নতুন ধরণের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে সুরু করে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ করেছে। নতুন কোন ঘাঁটি চাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটির জন্যে তৈরী। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দহরম মহরম করে যাচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রচারমন্ত্রী 'কর্নেলিউস মান্ডার ওয়াশিংটনে সফরকালে যা বলেছেন তা ইঙ্গিতবহ। তিনি নাশনাল প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সাইমনটাউন নৌ ঘাঁটি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করতে চায় তাতে তাদের আপত্তি নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত মহাসাগরে দিয়াগো গার্সিয়া ঘাঁটি গড়া নিয়ে বিশ্বে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য একটি ঘাঁটি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে খুঁজছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ঘাঁটি থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে হামলা চালাতে বা খবরদারি করতে পারবে।

বেশ কিছুকাল ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ আফ্রিকায় সামরিক ঘাঁটি গড়ছে। যদিও এখনো সরকারী ভাবে এই ঘাঁটি গড়ার কোন স্বীকৃতি নেই তবুও ওরা যে ঘাঁটি করছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন বিভিন্ন দেশের মার্কিন বিরোধিতার জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক জায়গা থেকে সরে যেতে হচ্ছে। যেমন গ্রীস। গ্রীস সরকার সরাসরি গ্রীসের বুক থেকে ন্যাটোর ঘাঁটি সরিয়ে নিতে বলেছেন। কিছুকাল পূর্বে গ্রীস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক আলোচনা হয়। যুক্ত ঘোষণায় ঠিক হয় যে, মার্কিন ষষ্ঠ বহর আর এলফসিস বন্দর ব্যবহার করতে পারবে না। গ্রীস সরকার এথেন্স বিমানবন্দরে মার্কিন বিমান ঘাঁটি বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে পর্তুগাল সরকার ন্যাটোর কোন ধরণের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ ন্যাটোর অন্যান সাম্রাজ্যবাদীদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে।

ষোল ও সতেরোই জুন কালিফোর্ণিয়ার মন্টেরিতে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক হবে। এই বৈঠকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পর্তুগাল এই সম্মেলন বর্জন করেছে। পর্তুগাল ন্যাটোর অন্যান্য দেশগুলোকে জানিয়েছে যে, পর্তুগালের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কোন বাসনা নেই এবং সে তার ভূখণ্ডে এইসব ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে দেবেও না। ন্যাটোর পারমাণবিক পরিকল্পনা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম জার্মানি ও গ্রেট ব্রিটেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পটসডাম চুক্তিতে জার্মান ভূখণ্ডে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে পশ্চিম জার্মানীতে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মিত হচ্ছে। আবার য়ুরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা দেখা

চলতি ট্রেনে চুরি ছিনতাই

যাত্রীরা পুলিশের সাহায্য পান না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত বারোই জুন নাইনটিন আপ মিথিলা এক্সপ্রেস রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ হাওড়া প্ল্যাটফর্ম থেকে চলতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই একটি দুর্বৃত্ত জানালার ধারে বসে থাকা (বগী নং—সি টি এস একশ চুয়ান্ন—এস আর) জনৈকা মদ্রদেশীয় মহিলার গলার হার ছিনিয়ে নেয়। বগীটি ছিল টুরিষ্ট কোচ। গাড়ীর যাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে চেন টানে কিন্তু হালে চেন প্রথা তুলে দেওয়ায় গাড়ী থামে না। ঐ বগীর যাত্রীরা চীৎকার করে প্ল্যাটফর্ম পুলিশকে দুর্বৃত্ত চিনিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কোন ফল পাওয়া যায় নি। গাড়ী যখন ব্যান্ডেল জংশনে আসে তখন ঐ ভদ্রমহিলার (টিকেট নং সি এক লক্ষ পাঁচ হাজার ছশ বাষট্টি) পক্ষ থেকে একজন এসে ব্যান্ডেল পি এ-কে (প্ল্যাটফর্ম এ এস এম) ঘটনা জানিয়ে জি আর পিকে দয়া করে খবর দেবার অনুরোধ জানান, কিন্তু কর্তব্যরত পি এ সেই অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে যাত্রীকেই জি আর পিতে ডায়েরী করতে বলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ব্যান্ডেল জংশনে জি আর পি ষ্টেশন থাকা সত্ত্বেও প্ল্যাটফর্মে ঐ সময়ে একজন পুলিশ কিংবা অফিসারও ছিল না। স্বভাবতঃই, সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীকে হতাশ হতে হয়। এমন কি, ঐ ট্রেনের গার্ড শ্রীপি কে ব্যানার্জী যখন এ সম্পর্কে মেমো দিতে চান, ব্যান্ডেলের ডিউটিরত পি এ সেটাও গ্রহণে অস্বীকৃত হন।

অথচ, ব্যান্ডেল জংশনের প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয় দুটি (পুরুষ ও স্ত্রী) সমাজবিরোধীদের স্থায়ী আস্তানায় পরিণত হয়েছে। চুরি, ছিনতাই ওয়াগনভাঙ্গা এবং নারী ধর্ষণের কুখ্যাত নায়কদের অবাধ লীলার ঘাঁটি হচ্ছে এই ওয়েটিং রুমগুলো। রাতে এখানে বসে মদ মেয়েছেলের সান্নিধ্যপুষ্ট মধুচক্র এবং তা চলে পি এ, চেকিং ষ্টাফ এবং জি আর পির প্রকাশ্য সহযোগিতায়। বারবার অভিযোগ সত্ত্বেও অদ্যাবধি এর কোন প্রতিকার হয় নি। চোদ্দই জুন আমি যখন রামপুরহাট প্যাসেঞ্জারে আসছিলাম, তখন দেখেছি দু হাজার দুশ চৌরাশি নং টি, সি, একটি অবাঙ্গালী মহিলার হাত ধরে টানছে। অভিযোগ, ঐ মহিলার কাছে নাকি চাল পাওয়া গেছে। আমি পুটলীটি দেখেছি। সম্ভবতঃ কিলো দেড়েকের বেশী চাল তাতে ছিল না। কিছুক্ষণ পর একজন এসে ঐ টি, সি-র হাতে নগদ কিছু গুঁজে দিলে মহিলা রেহাই পায়। ইস্টার্ন রেলের ভিজিলেন্স এবং কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনটি সম্পর্কে তদন্ত করবেন কি?

শরৎ চাটুজ্যের বেতের লাঠি ও চটি জুতো

বীরেন চক্রবর্ত্তী

না, পানিত্রাস না। গাঁয়ের নাম সামতাবেড়ে। দুটোই পাশাপাশি গাঁ। বাঁধের একদিকে রূপনারায়ণের কূলে সামতাবেড়ে। বাঁধের আরেক ধারে পানিত্রাস। বাঁধ এখন পথ। পানিত্রাসের প্রশস্ত চত্বরে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সাম্প্রতিক বিগত মেলা। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবাসস্থল, বাঁধের পথ ধরে একটু এগিয়ে, নদীর গায়ে সামতাবেড়ে গ্রামে। দোতলা বাড়ি, অনেকটা বাংলোর ধাঁচে। বারান্দা, ব্যালকনি, ইত্যাদি ইত্যাদি সবই রয়েছে। অথচ এই দোতলা দেহলি মাটির। মাটির দেয়ালের বুকে পিঠে পালিশ করা চুনকামের পলেস্তারা দেখলে ভ্রম হয়। অন্তরে মাটি। খাঁটি খাঁটি তো! ইদানীং কালে দেউলটি স্টেশনে নেমে খুব একটা দূরে না, আবার একেবারে কাছেও না। কথাসাহিত্যিককে কিন্তু যেতে হোত নদীপথে। এমনতর আখছার রাস্তাঘাট, হুইসেলের হল্‌ট, তখনো হাতিয়ার হয় নি। মাথায় রোদ্দুর আবডাল করার জন্যে চাদর ফেলে, হাতে মোটা বেতের লাঠি নিয়ে, আর পায়ের চটি কখনো হাতে কখনো খচরণে গলিয়ে তিনি নাকি ঘুরতেন। আলপথে একটু ভিরিয়ে, চাষীদের চাষ আবাদের খবর নেয়ার প্রথাই ছিল দিকপাল এই সাহিত্যিকের। সবচেয়ে তখন তিনি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা আলোচিত। চাষীদের যে সব সন্তানগণ সান্‌কিতে বেঁধে বাপের জন্যে পান্তা বহন করতো তারা এখনো অনেকে জীবিত। তারা বাপের সঙ্গে চাটুজ্যে মশাইয়ের কথোপকথন শুনেছে। কথার তুরুপ ছাড়লে দাঁড়ায় এই যে কেন জন্মভূমি দেবানন্দপুর না, কেন মামার বাড়ি ভাগলপুর না? কেন কলকাতার অভিজাত পল্লী বালিগঞ্জ কিম্বা অন্ততম আস্তানা বাজে শিবপুরের পুরীগুলো ছেড়ে অখ্যাত সামতাবেড়ের শরণ? সদনের একটা ঘরেই রক্ষিত রয়েছে বাঁকানো বেতের লাঠি এবং ক্ষয়ে যাওয়া চটি। কাদের উদ্দেশ্যে?

অপরিজ্ঞাত স্মৃতির অস্ফুট অর্চি

জন্মকাল থেকে শৈশব কেটেছে বাপের ভিটের দেবানন্দপুরে। গাঙের ধারে গাঁ। কৈশোর এবং অর্ধ যৌবনের দোলায়মান কালযাপন ঘটেছে ভাগলপুরে। সেটাও নদীর কাছাকাছি এবং অঞ্চল তখন এতটা নাগরিক নহবত বাজায় নি। তাই বুঝি পরবর্তী জীবনের উত্তুঙ্গ সময়ে খুঁজে খুঁজে বোনের বাড়ির কাছাকাছি আবার সেই নদীতীরে পল্লীজীবনে নির্বাসনে সাহিত্যের অর্চি। জন্ম ভিটের কাছাকাছি কেন ফিরে গেলেন না, কেন গেলেন না মাতুলালয়ের গাঙ্গেয় আওতায় তা বুঝতে পারা একটা বোবা বিশেষ। অভিমানে গলদঘর্ম হয়ে গিয়েছিলেন কি? আত্মীয় গাজনের বাজনা অদ্যাবধি বাজছে। অনেক সন্ন্যাসীতে শুনেছি গাজনও নষ্ট হয়। সম্ভবত সৎ উদ্দেশ্যেই বেতের লাঠি আর চটি জোড়া ব্যবহার করতেন জেনেচিনে। সামতাবেড়ের গৃহে না রেখেও উপায় নেই। মুস্কিল হচ্ছে এক জায়গায়। বাংলা পাড়ার বাঙালী এঁতেল কাঁতালদের মাথায় তা না পড়ে।

অসঙ্গত উল্লেখ

চাষীকেন্দ্রিক কাহিনী 'মহেশ', বিদ্রোহী মানসিকতার পূর্ণ 'পথের দাবী', অস্পৃশ্য শ্রেণীভিত্তিক ট্রাজেডি 'অভাগীর স্বর্গ' নিয়ে ঢের শব্দ প্রযোজনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রোডিগ্নি আবিষ্কৃত হবারও দাবি রাখে। এখানে স্বল্প প্রচারিত সুদৃঢ় 'পল্লী সমাজ', লেখকের জীবনের কয়েক টুকরো শর্করা এবং সাম্প্রতিক কালের অপকেন্দ্রিক জাঁতলেমির বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করে কিঞ্চিৎ দাগরাজির জন্যে কর্নিক ধরা হচ্ছে। কেননা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিক্ষেপ করা ব্যঙ্গের কর্পূর আজও উঠে যায় নি। কর্মজীবীদের কর্মান্তর ঘটলেও মতান্তরে মন্দা হয় নি তেমন।

নারীপাঠ্য নায়ক

যেমন শরৎবাবু নারীপাঠ্য লেখক। বলতে শুনেছি প্রচণ্ড পুস্তককীট মেধাধারীদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির জিহ্বা থেকে। হয়তো এই পণ্ডিতপুঙ্গব বলতে চেয়েছেন মেয়েরাই শরৎচন্দ্রের পাঠিকা, নয়তো ইঙ্গিত করেছেন কাহিনীগুলো মেয়েলি কান্নার দরদে অর্পিত। নইলে গোগ্রাসে গিলে বদহজমের ফলে মান্য পণ্ডিতপ্রবর জানাতে চেয়েছেন পুরুষগণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বই পাঠ করে না। এর কোনোটাই যদি সঠিক না হয় তবে তাঁকে গোটাকয় বাস্তব প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন, সর্বভারতীয় ভাষায় অনূদিত শরৎচন্দ্রের গল্পগ্রন্থগুলোর সঙ্গে বাংলা ভাষার মূল পুস্তকগুলোর হিসেব করলে এই একমাত্র ঔপন্যাসিকই ভারতবর্ষে বেস্ট্ সেলার। সরকারী সাব্যস্ত অনুসারে এদেশের শিক্ষার ডিবায় যে কয়জন অক্ষর পরিচয়ের পান সুপারী চিবোতে পারেন, তাদের শতকরা অত্যন্ত সামান্য অংশই নারী শ্রেণীবর্গের। গড়পড়তা হারে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের বর্ণপরিচয়ের পরিচিতি কম। এ হেন পোড়া কপাল দেশে যে লেখকের লেখা সর্বাধিক বিক্রি হয় তাদের ক্রেতা নিশ্চয়ই পুরুষবর্গ। যিনি 'নারীপাঠ্য' বলে নাড়ী টিপে ছিলেন তিনিও তো বেটা মানুষ। তাহলে কি ধর্তব্যের খাতায় উনি সমেত তাবৎ শরৎ পাঠকই হ্লাদিনী রাধিকা? মেয়েলি কান্নার ধ্বনন কতখানি ধূমায়মান আর অসার ধেয়ান মেলে 'পল্লীসমাজ' পড়লে। ধূমোদ্গারে সিদ্ধহস্ত তেওড়া হিংসুক ঐঁতেলরা গামলা বোকাই খোলা চর্বণের নিমিত্তই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আস্তাবলের খুঁটিতে রজ্জুকণ্ঠে কামধেনু সেজেছেন।

যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়

উদ্ধৃত বাক্য 'পল্লীসমাজ' থেকে গ্রহণ করা হলো। উপন্যাসখানার হাঁকডাক নেই। সেই জন্যেই আজকের লেখকদের কামড়ায়। আর তার দরুণই প্রচার সীমাবদ্ধ। গোটা গল্পে ছোটখাটো নারীচরিত্র বাদ দিলে রমা আর জ্যাঠামশাই প্রধান। তাও সমগ্র কাহিনীর বাবদ শরৎচন্দ্র ওই দুই ভদ্রমহিলার জন্য মোট পাঁচ ছয় পৃষ্ঠাও ব্যয় করেছেন কিনা সন্দেহ। হয়তো একটু বর্ধমান অঙ্কই হলো। লেখক নারীচরিত্র অঙ্কনে একপেশে স্বভাবের পরিচয় দিয়ে সব নারীকেই মর্যাদা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রন্দন বিগলিত হয়েছেন....প্রভৃতি যে সব ফরমান জারী করা হয় তা যে কতখানি অলীক অপবাদ জাবরতৃণ বিশেষ সেগুলো উঁকি মেরে দেখলেই ঠাওরে আসে। প্রথম দিকে নায়ক রমেশের মনে রমার উপরে বিশ্বাস এবং ভালবাসা দুইই ছিল। ঘটনা পরম্পরায় যখন বুঝতে পারে যে রমা সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করে নি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবং বারম্বার রমেশের বিরুদ্ধাচরণ করছে তখন লেখক সাফ কথায় বিশ্লেষণ করলেন, 'রমার ভয়-ব্যাকুল নির্বন্ধতার অখণ্ড স্বার্থপরতার চেহারা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহার (রমেশের) অন্ধ হৃদয়েরও আজ চোখ খুলিয়া গেল।' নির্মল কথাঘাত। আজকের দিনের যে কোনো মেয়ে, যার একটু মাত্রও কাণ্ডজ্ঞান আছে, সে রমাকে ভাল চোখে তো দেখেই না উপরন্তু রমার সহস্র হাহুতাশ দীর্ঘশ্বাসকেও বিশ্বাস করে না। অপর নারী পাঠিকাদের হৃদয়ে লেখক এই যে রমার অসহায়তার প্রতিপক্ষে ক্ষোভ এবং তজ্জনিত ঘৃণা এবং তৎপ্রজাত বিদ্রোহের মানসিকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন,...কৈ হালকালের ক্রয়েডীয় গুহাখননকারী লেখকের দল কেউ তো তার এক কণাও উদ্রেকে সমর্থ হচ্ছেন না? আর বিশ্বেশ্বরী জ্যাঠাই মা? তিনি অপর্যাপ্ত জননীসুলভ প্রকৃতির প্রমাণ রেখে এবং প্রচুর উপদেশ দিয়েও অবশেষে অনুষ্ঠা রমাকে নিয়ে কাশীবাসী হতে চললেন। এই পলায়ন মনস্কাম কোনো পাঠক পাঠিকার কাছেই মুনাসিব না। পলায়নেই যখন অতি পটিয়সী তখন আবার অত জ্ঞান কিসের বাপু! এ কথা আমি পাঠিকাদের মুখ থেকেই শুনেছি। অর্থাৎ লেখক কারো পক্ষে ঢলে পড়েন নি। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে নারী চরিত্রের উত্তম-অধম দুটো দিকেরই সামাজিক পটভূমিকায় সাজিয়েছেন। অর্থাৎ সার্থক ঔপন্যাসিকের বিচার নিরপেক্ষতার আত্মমুক্ত স্বভাব 'পল্লী সমাজ' এর প্রতি ছত্রে এবং চরিত্রে বিদ্যমান। আবার নিরপেক্ষতা দেখাতে গিয়ে রোগ উৎপত্তির কারণ এড়িয়ে যান নি বর্তমানের এনাদের মতো। স্বভাবতই অক্ষম লেখকেরা হাঁকে ডাকে অধিক, অপবাদে অপরূপ। 'পল্লী সমাজ' এর পাঠক পাঠিকারা বিদ্রোহী মনে গর্জায়।

ঢাকায় কাজী মোতাহার হোসেনকে হক কথা

'বাংলা দেশের মধ্যে আছে হিন্দু ও মুসলমান। তার কেবল একটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে সেটা ভাল ঠেকবে না।' কথাটা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। বলেছিলেন ঢাকায় কাজী মোতাহার হোসেনকে। দ্রাব্য দেশাচার বলে কথাটাকে নুনের পুতুলের মতো সমুদ্রে নিক্ষেপ না করে কিয়দংশে নাড়াচাড়া করা বিধেয়। বোধহয় কিছু পক্ষোদ্ধারের প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীনোত্তর নায়ক যুগে শুনে থাকি পশ্চিম বংলার উপন্যাসের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বেনো জলে প্রাণ আইঢাই করছে। তাই যদি ঘটনা ঘটে তবে এই দুর্ধর্ষ অপ্রতিরোধ্য বিশুদ্ধ বন্যায় কতগুলো মুসলমান সমাজের ঘটনা, কতগুলো মুসলমান চরিত্র, কতগুলো মুসলমান সমাজকেন্দ্রিক সুখদুঃখের শামুক-গুগলি-ঝিনুক পশ্চিম বাংলার পাঠক পেয়েছে তা জানতে পারি কি? যদি পশ্চিম বাংলায় কি মুসলমান সমাজ নেই? না, হিন্দু লেখকেরা খবর রাখেন না। দয়া করে লোক গণনার হিসেবের কড়চাখানা একটু উল্টে দেখবেন কি? পশ্চিম বাংলায় বাঙালী মুসলমান পাঠক পাঠিকারা কি শুধু হেঁদু চরিত্তির উপাখ্যানই গপগপ করে গিলবেন? শরৎচন্দ্র থেকে যদি আমরা আরও এক কদম এগিয়ে যাই তবে দেখবো যে পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্রধারী বস্তুর ভিতরে রয়েছে এমন সব সম্প্রদায় যাদের মধ্যে প্রায় পনেরো হাজারের মতো চৈনিক লোক কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, দুই তিনটে জেলায় কয়েক লক্ষ সাঁওতাল, উত্তরবঙ্গের নেপালী সংখ্যার মানুষ, মালদা প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীগণ। এরা সবাই পশ্চিম বাংলার ভোটার। ঢাক ঢোল পেটানো তথাকথিত বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় পশ্চিম বাংলার সাহিত্যে এই সব সম্প্রদায়ের চরিত্র অনুপস্থিত, এদের আচার-আচরণ-জীবনপদ্ধতির উল্লেখ নেই, এদের মানসিক গতিপ্রকৃতির প্রকরণ অননুপ্রবিষ্ট। এমন কি সাহিত্যিকেরা এদের সন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলেও মনে হয় না। আধুনিক পশ্চিম বাংলার সাহিত্য পড়ে যদি কেউ ভেবে নেয় এখানে বাঙালী হিন্দু ব্যতীত অন্য কেউ বাস করে না তবে কি খুব অন্যায় হবে? শরৎচন্দ্র কিন্তু গফুর, গহর, আকবর প্রভৃতি জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তো একবার বলেই ফেলেছিলেন, 'আমার মতো করে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা করতে হ'ত, তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখতেই পারতে না। এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ী বাগ্দীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাসিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টিকিটকাড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা ঃ

৬১, সট লেন, কলি-১৩

বইপাড়ায় নাভিশ্বাস

অনার্য মিত্র

কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ায় সংকট যে আগ্রাসী রূপ নিয়েছে তার সঙ্গে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক সংকটের যোগ অবশ্যই রয়েছে। দুর্মূল্য সব কিছুরই। মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা অসম্ভব দ্রুত গতিতে কমছে একথা সবাই জানেন। সুতরাং নিম্নতম অস্তিত্বের সংকটকে হজম করে বইপাড়ায় দ্বিতীয় ক্ষুধা মেটানোর প্রয়োজনে আগ্রহী পাঠকের যাতায়ত ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এটা ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যবসায়ী এবং প্রকাশকের জীবিকার প্রশ্নে যেমন মর্মান্তিক তেমনি গ্রন্থ প্রকাশনার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঘটনাটি হতাশব্যঞ্জক।

অনেক ব্যবসায়ী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে বিকল্প জীবিকার সন্ধান করছেন, কেউ কেউ নিশ্চিহ্ন হওয়ার শেষ সম্ভাবনাটুকু সম্বল করে বিষণ্ণ মুখে গালে হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রকাশক টাকার অভাবে গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করতে পারছেন না। তবু এর মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন বা আদর্শকে সামনে রেখে প্রকাশক হিসেবে যারা বইপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত কিংবা কোন সংবাদপত্র বা বাজার-চলতি পত্রপত্রিকার আশ্রয়পুষ্ট যে সমস্ত প্রকাশক রয়েছেন, একমাত্র তারাই বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সচল। এর মধ্যে অবশ্য নীতিজ্ঞানের বালাই নেই এমন অনেক প্রকাশক আছেন, যারা বইয়ের বাজার এবং পাঠকের মানসিকতার প্রতি সুচতুর দৃষ্টি রেখে গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকেন। তাদেরও অবস্থা মোটামুটি ভাল।

যারা প্রকাশক নন, শুধুমাত্র বই বিক্রেতা, তাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। পাঁচমিশেলি কিংবা আদর্শবাদী কোন জাতের বই বিক্রেতারই এই সংকট থেকে রেহাই নেই। এর সবচেয়ে বড় কারণ বইয়ের দাম অসম্ভব বেড়ে যাওয়াই নয়, ক্রেতারা বিরক্ত হচ্ছেন আরও একটি কারণে। একই পরিমাপ এবং আয়তনের বইয়ের দাম এক একজন প্রকাশক এক একরকমভাবে স্থির করে থাকেন। অনেক সময়ে বইয়ের দামে দশ বারো টাকার ফারাক লক্ষ্য করা যায়। ফলে অসম্ভব কাগজের দাম এবং ছাপা খরচের অজুহাতে বইয়ের ব্যবসা যে বর্তমানে একটি জালিয়াতি—এই ধারণা বেশীরভাগ ক্রেতাসাধারণের মধ্যেই বদ্ধমূল।

প্রকাশকদের অজুহাত একেবারে মিথ্যে নয়। কাগজের দাম প্রতিনিয়তই ওঠানামা করছে। সেই কারণে বইয়ের দামও নির্দিষ্ট স্তরে ধরে রাখা সম্ভব নয়, যে যেরকম পারছে দাম বসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকাশকরা কখনই তাদের স্বরচিত সংকটের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না।

ধরা যাক, একটা বইয়ের দাম দশ টাকা। বইটির সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে তিন টাকা। তাহলে দামটা দশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কেন? পাইকারী বিক্রেতাদের জন্য কমিশন শতকরা তিন টাকা তেত্রিশ পয়সা (খুচরো বিক্রেতাদের জন্য এর থেকে শতকরা পঁচিশ ভাগ কমিশন দিতে হয়)। লেখকের রয়ালটি গড়ে শতকরা পনেরো ভাগ। বিজ্ঞাপনের খরচ শতকরা সাত থেকে দশ ভাগ। প্রকাশকের লাভ বারো ভাগ অর্থাৎ একটাকা কুড়ি পয়সা। বলাবাহুল্য এই খরচের সব থেকেই কিছু কিছু কমানো সম্ভব। মূলতঃ যে দুটো খরচ কমানো যেতে পারে তা হল পুস্তক বিক্রেতাদের কমিশন ও বিজ্ঞাপন। বইয়ের দাম কম থাকলে বিক্রী অবশ্যই বেশী হয়। সুতরাং একদিকের ক্ষতি আরেকদিকে পুষিয়ে দেয়া সম্ভব। আর পাঠকেরা বিজ্ঞাপনের জোয়ারে বই কিনতে আগ্রহী না হয়ে যদি গুণবিচারে আগ্রহী হন, তাহলে বই প্রকাশিত হবার পর পাঠকদের জানানোর জন্য এক আধবার বিজ্ঞাপন দিয়েই থামা যায়। পাতার পর পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারপর তার বাড়া আবার পাঠকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি থেকে পাঠক মুক্তি পেতে পারে।

এতো গেল ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য বা বিভিন্ন উপলক্ষে উপহার হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে বই কেনার কথা। সংকট যত বাড়বে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বইয়ের ক্রেতা স্বাভাবিক ভাবেই কমবে। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে গ্রন্থাগারের আন্দোলন গত কয়েক বছরে অনেক এগিয়েছে এবং বাংলা বইয়ের নির্ভরযোগ্য মূল ক্রেতা আজ গ্রন্থাগারগুলি। আর বই বাজারে এই অর্ডার সরবরাহের ব্যাপারে চলছে চূড়ান্ত নোংরামি। সরকারী অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সূত্রে যে বিপুল পরিমান বই কেনা হয়, সে ব্যাপারে সর্বত্রই কিছু ফড়ে দালাল রয়েছে। এরা জানে, কোন অফিসের কাকে দু-পয়সা দিলে শয়ে শয়ে কপি বইয়ের অর্ডার একসঙ্গে করানো যাবে। প্রকাশকের কাছ থেকে বেশী কপি একসঙ্গে বিক্রী হয়ে যাবার প্রলোভনে এরা বেশী কমিশন (কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০% পর্যন্ত) আদায় করে। ফলতঃ এসব কীর্তিকলাপের সংগে পরিচিত প্রকাশকেরা প্রথম থেকেই বইয়ের দাম ধার্য করেন চড়ায়, যাতে এত সমস্ত দিয়েও মুনাফা ঠিক থাকে। তাই এরা তিন টাকার বইয়ের অবলীলাক্রমে দশ টাকা দাম হাঁকিয়ে বসতে পারেন। গ্রন্থাগারের জন্য যারা সরাসরি বই কেনেন, তারাও কমিশন বেশী পাওয়ার ফাঁদ তৈরী করেছেন। তারা একবারও খতিয়ে দেখছেন না একজন প্রকাশক বা সাধারণ পুস্তক বিক্রেতা গ্রন্থাগারকে পঁচিশ-তিরিশ ভাগ শতকরা কমিশন দিচ্ছেন কি করে? এমন প্রচুর সংখ্যক বই গ্রন্থাগারের কাছে বিক্রী করা হচ্ছে, যার দাম প্রকাশকরা ঠিক করেন নি। অর্থাৎ প্রকাশকরা যে দাম নির্দিষ্ট করেন, দালাল বা ফড়েরা তার ওপরেও দু তিন টাকা দাম বাড়িয়ে রবার স্ট্যাম্প মারেন।

পাঠ্য পুস্তকের ব্যাপারেও নানারকম দুর্নীতি চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। এমন অনেক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যারা নতুন পাঠ্য বইয়ে তাদের নাম ব্যবহার করতে দিয়েই মোটা টাকা রোজগার করেন। বই প্রকাশকদের পক্ষ থেকে স্কুলের জন্য পুস্তক তালিকা ছাপিয়ে দেওয়া, ঘড়ি বা আলমারী কিনে দেওয়া বা স্কুলে ডোনেশান দেওয়া, শিক্ষকদের ডায়েরী ক্যালেন্ডার উপহার দেওয়া ইত্যাদি বহুবিধ প্রলোভনের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া সরাসরি প্রধান শিক্ষকদের ঘুষ দেওয়া, সরকারী গ্রান্টের জন্য বোর্ডে প্রধান শিক্ষকদের যেতেই হয়— সেই সুযোগে, বোর্ডের লোকজনদের টাকা দিয়ে বই নির্বাচনে চাপ সৃষ্টির করার মতো অজস্র দুর্নীতি রয়েছে। প্রকাশকরা বইয়ের দামে এই সব খরচের টাকা তুলে নেন না?

এর ওপর নতুন সিলেবাস নিয়ে অভিনব দুর্নীতি চালু হয়েছে। অনুমোদনের জন্য বোর্ডে যে বই দিতে হত, তাতে প্রকাশক ও লেখকদের নাম থাকতনা। এক্ষেত্রে তবু খানিকটা গুণ অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচনের সুযোগ ছিল। এখন বোর্ডে পাণ্ডুলিপি নয়, ছাপা বই অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হচ্ছে। পাঁচ কপি আর এগারোশ কপি ছাপতে কাগজের দাম ছাড়া বাকী খরচ প্রায় সমান। তাই সবাই বেশী কপিই ছাপেন। তারপর বোর্ড বইটি নির্বাচন না করলে পুরো টাকাটাই জলে গেল। তাই মরিয়া প্রকাশকেরা অর্থদণ্ড দিয়েও বই বোর্ড থেকে যেনতেন প্রকারে নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার রাস্তা ধরেছেন। এর সঙ্গে আবার দিতে হয় বোর্ডকে তিন কপি বই ছাড়াও প্রতি বই পিছু ষাট টাকা করে স্ক্রুটিনি ফি।

ঘুষ বা বইয়ের গুণে বই নির্বাচিত হলেও নিশ্চিন্ত নেই। বোর্ড বইয়ের দুই রকম দাম বেঁধে দিয়েছে। সরকারী কাগজে ছাপালে একদাম, বাইরের কাগজে ছাপালে বেশী। পাবলিশার্স এসোসিয়েশন কাগজ বন্টন করছে এবং নিয়ম অনুযায়ী পুরো কাগজের কোটা প্রকাশককে একসঙ্গে নিতে হবে। বেশীর ভাগ ছোট প্রকাশকেরই দশ পনেরোটা বই থাকে। বই জমা দেবার সময় যে প্রথম কিস্তি এগারোশ ছাপা হয়ে থাকে তা থেকেই স্কুলে স্কুলে স্পেসিমেন কপি দেওয়ার কাজ হয়ে যায়।

এর পর বই নির্বাচিত হলে ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন বই ছাপার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সমস্যা হল, একসঙ্গে পুরো কাগজ কিনে রাখা ছোট প্রকাশকদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে। অথচ কোটা না তুললে পরের বার আর কাগজ পাওয়া যাবে না। তাই তারা বড় প্রকাশকদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। বড় প্রকাশকরা নিজেদের কোটা ছাড়াও ছোট প্রকাশকদের কোটা তুলে নিচ্ছেন। এর ফলে ছোট প্রকাশকেরা বাইরে থেকে বেশী দামে কাগজ কিনেও কম দামে এই কিস্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর বড় প্রকাশকেরা নিজেদের সরকারী কাগজের কোটাতে ছাপার পরও যত রিপ্রিন্ট করছেন, তা সরকারী কাগজে (ছোট প্রকাশকদের দুর্বলতার সুযোগে) ছেপেও বাইরের কাগজে ছাপাবার মতো বেশী দাম ধার্য করছেন।

এ ছাড়াও ক্যানভাসার ফড়ে এবং জেলায় জেলায় শিক্ষক কমিতিগুলির নানান ছলচাতুরী রয়েছে। ছোট প্রকাশকদের ঢেঁকি গেলার অবস্থা। সবাই বুঝছেন ব্যবসা উঠে যাবে, তবু ধ্বংসের শেষ মুহূর্তটাকে যত পেছানো যায়।

পুস্তক ব্যবসার সঙ্গে শুধু কয়েক লক্ষ লোকের রুজির প্রশ্নই জড়িত নয়। এ ব্যবসার ভবিষ্যতের সঙ্গে সমাজের ভবিষ্যতও অনেকাংশে জড়িত, তাই আজ যখন দেখি, দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত লোকেরা পুঁজি গুটিয়ে নিয়ে জমি কেনার বা বাড়ী কেনাতেই উদ্যোগী হচ্ছেন, নতুন বই ছাপতে নয়, তখন দুশ্চিন্তা হয়। এই ব্যবসার সঙ্গে সমাজের ব্যাপক অংশের স্বার্থ জড়িত।

এই সংকট রোধের জন্য প্রাথমিক কিছু প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে। (ক) সমস্ত প্রকাশকদের বইয়ে পাইকারী বিক্রেতাদের শতকরা পঁচিশ ভাগ এবং খুচরা বিক্রেতাদের শতকরা কুড়িভাগ কমিশন নির্দিষ্ট করা হক; (খ) ফর্মা প্রতি বইয়ের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হক। এই দুটি ব্যাপারে পাবলিশার্স এসোসিয়েশনকে উদ্যোগী হতে হবে। এই দুটি করতে পারলে বহুলাংশে বইয়ের দাম কমবে এবং অসম বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে। (গ) গ্রন্থাগারের জন্য শতকরা দশভাগ নির্দিষ্ট কমিশন থাকবে, এতে বাকী দশ বা পনেরো ভাগ বিক্রেতার ইনসেনটিভ থাকবে। অহেতুক গ্রন্থাগারকে বেশী কমিশনের প্রলোভন দেখিয়ে টেনে গিয়ে পুস্তক বিক্রেতাদের অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হবে না।

বইয়ের বাজারে এই সংকট ঘনীভূত হবার পর থেকেই পুরোনো বইয়ের দোকানে পাঠকদের ভীড় বেড়েছে। এই মুহূর্তে সংকট রোধের ব্যবস্থা না করলে দুর্নীতি পুরোনো বইয়ের দোকানেও ব্যাপকহারে সংক্রমিত হবে এবং হচ্ছেও তাই।

নব নির্মাণ সমিতির মাতব্বরি মানব না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আর সি পি আই দলের সাধারণ সম্পাদক সুধীন কুমার সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান পশ্চিমবঙ্গে জয়প্রকাশের আন্দোলনের ব্যাপারে তারা নবনির্মাণ সমিতির মাতব্বরি মানতে রাজী নয়। এখানে সংগঠন কংগ্রেস লোকদল জনসংঘের মত প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি একজোট হয়েছে। আজ বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলন করবার উদারতা দেখালেও এদের যে কোন আন্দোলনের পুরোভাগে আসতে দেওয়ার অর্থ বামপন্থী শক্তিকে আরো হীনবল করা এবং জনসাধারণের আস্থা হারানো। কংগ্রেসী শাসনে যে সর্বব্যাপী সংকট তার প্রতিরোধ আন্দোলন কখনই কোন প্রতিক্রিয়ার শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারে না।

এই বিচারেই আর সি পি আই পশ্চিম বাংগলার বামপন্থী দলগুলির কাছে প্রস্তাব রেখেছিল যে বামপন্থী নেতৃত্বেই মিছিল এবং জমায়েত হক। এই মিছিল তথা রাজ্যের যে কোন আন্দোলনে জয়প্রকাশের অভিজ্ঞতালব্ধ আন্দোলনের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করা হক। তবে এই মিছিল ও সমাবেশের ব্যাপারে সুধীনবাবু পরিষ্কারভাবে বলেছেন ঃ রাজ্যের জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে যে দাবীগুলি সামনে রেখে এই মিছিল সংঘটিত হয়েছে তার সঙ্গে তাঁর দলের কোন দ্বিমত নেই বরং পূর্ণাঙ্গ সমর্থন রয়েছে।

দলের দশম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে দেশের অর্থনীতি বর্তমানে গভীর সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ওপর নির্ভরতা রাষ্ট্রীয় ব্যবসা এবং সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া মুনাফা পুঁজিবাদের রাস্তা আরো পাকা করছে। কালো টাকাই এখন অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। কালোবাজারী এবং স্মাগলারদের বিরুদ্ধে অভিযান সরকারী ধোঁকায় পরিণত হয়েছে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ দেখা দিয়েছে দ্রব্যমূল্যে অনিশ্চয়তা, ছাঁটাই লে-অফ, বেতন সংকোচন এবং জনসাধারণের ওপর অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা।

এই মুহূর্তে প্রকৃত বিপ্লবী কমিউনিস্ট দলের বড় কাজ হল, জনগণের আরো কাছে যাওয়া, লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে অগ্রণী শক্তি হিসেবে তাদের আন্দোলনে স্থান দেওয়া।

বিদ্যুৎকর্মীদের ধর্মঘটের ডাক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিদ্যুৎ কর্মীরা আগামী পনেরোই জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। বিদ্যুৎ শিল্পের ক্ষেত্রে অজস্রী নির্দেশক কমিটিতে জাতীয় ভিত্তিক আলোচনার ব্যর্থতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ বিদ্যুৎ কর্মীর ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুৎ কর্মীদের দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম হল, পাঞ্জাব হরিয়ানার বিদ্যুৎ কর্মীদের ওপর থেকে সমস্ত দমন পীড়ন বন্ধ করা।

চরম অরাজকতা এবং অবিচার

শতাধিক বৎসর ধরে ভারতের বিভিন্ন শহরে ইস্পাত লোহা ইঞ্জিনীয়ারিং সুতা বাগিচা প্রভৃতি শিল্প দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের সাহায্যে গড়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বোম্বাই, হরিয়ানা কানপুর এবং পাটনা প্রভৃতি বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনবানদের জন্য এবং তাদের উচ্ছিষ্টভোগীদের জন্য, আর কিছু চরিত্রহীন এবং আদর্শহীন বাবুদের জন্য তৈরী হয়েছে বড় বড় বিলাসবহুল হোটেল। এ ছাড়া শহরের এধারে ওধারে, এ গলিতে সে-গলিতে, নামে বেনামে সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে চলছে নানা ধরণের যৌন ব্যাভিচারের লীলাখেলা।

আজকাল পুজো পার্বণের ঘটা একটু বেশী। দুই দিনের পুজো পাঁচ দিনে, তিন দিনের পুজো দশ দিনে শেষ হয়। একটানা এই কয়টা দিন পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে উপার্জনহীন বকাটে ছেলেদের জোর করে আদায়ীকৃত বারোয়ারী পুজোর চাঁদার টাকায় পথে পথে মদ্যপান জুয়া খেলা আর মেয়ে নিয়ে হুল্লোড় বাজী করতে দেখা যায়। তার সঙ্গে নানা রংয়ের আলোর ঝলকানির মধ্যে সুর বে-সুরের কর্ণ বিদারক সংগীতের ঘ্যানঘ্যানানি। দীর্ঘ রাত ধরে মাইক বাজান আজকাল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এর বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার নেই। প্রতিবাদ করলে রাস্তাঘাটে বার হওয়া যায় না। এমন কি অশ্লীল বাক্যবাণে বাড়ীর বৌ ঝিরা পর্যন্ত বাড়ীর বারান্দায় বার হতে পারে না। ছেলে মেয়ে নিয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা আজকাল দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেওয়ালগুলোর দিকে নজর পড়লে দেখা যায় যে সুন্দরী ছায়াচিত্রাভিনেত্রীর অশ্লীল পোষ্টার। এ ছাড়া শহরের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে অশ্লীল নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে গোটা জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে ফেলার ইংগ-মার্কিন অপসংস্কৃতির অপকৌশল। এই সব ব্যাপারে কিছু হিন্দী ছায়া ছবি এবং কিছু বিদেশী ছায়াছবি ইন্ধন যোগাচ্ছে। বাংলা ছবিও ঐ পথে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়ের এক অংশ এই অপসংস্কৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই দেশের সুখদুঃখ অভাব অনটন কোন কিছুই ঐ সকল যুবকদের মনে দাগ কাটে না। সামান্য কয়েকটা টাকার বিনিময়ে ঐ সকল যুবকেরা আজকাল একটা লোককে খুন করতে পারে। আদর্শ বলতে ওদের কিছুই নেই। ঐ সকল যুবকদের একমাত্র আদর্শ "পিও জিও লুটো।"

এই সব ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতার মধ্যে আর একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস নিপীড়িত খেটে খাওয়া মানুষের ইতিহাস। ভারতের বিভিন্ন গ্রাম বস্তি কলকারখানা এবং খেত খামার থেকে একদল বুভুক্ষু শতচ্ছিন্ন বস্ত্র-পরা

মতামত

অর্ধ উলঙ্গ সাধারণ গরীব মানুষ শহরের বিভিন্ন স্থানে জমা হয়েছে। শহরের আনাচে-কানাচে, বস্তি অঞ্চলের সরু গলির এধারে ওধারে, পার্কের এ কোণে সে কোণে, খালধারের ব্রীজের নিচে এবং হাওড়া ও শিয়ালদা ষ্টেশনের দুই ধারে হাজার হাজার কাট পাতার ছোট ছোট ঘরগুলি শত শত নিরাশ্রয় লোকের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এইসব বুভুক্ষু নরনারীর ভিক্ষা বৃত্তি, হোটেল ও বিয়েবাড়ীর উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত খাদ্য ক্ষুধা নিবৃত্তির, বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন। জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ ব্যাপক খাদ্য সংকট, আকাশ ছোঁয়া জিনিষের দাম, বেকারী, লক-আউট ক্লোজার এবং ছাঁটাই প্রভৃতির জন্য সাধারণ মানুষের একটা অংশ আজ ভিখারীতে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলের বাস্তব চিত্র কি? বারাকপুর, শিবপুর, বজবজ, চা-বাগিচা এবং কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন আজ বর্ণনাতীত। দৈনিক আহারের কথা ত ছেড়েই দিলাম। শ্রমিক অঞ্চল ঘুরলে বর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার নরক দর্শন করা যায়। শ্রমিক অঞ্চলে এক একটা ঘরে পনের বিশ জন করে লোক বাস করে। মুরগীরা মুরগীর খাচায় অনেক শান্তিতে থাকে। আজকাল হাজার হাজার লোক মুক্ত আকাশের নিচে শুয়ে থাকে। রাত সাড়ে বারোটার পর হাওড়া শিয়ালদা এবং কালীঘাট ষ্টেশনের আশে পাশে ঘুরলে মুক্ত আকাশের নিচে হাজার হাজার নরকঙ্কাল দেখা যায়। মাংসহীন কতকগুলি কংকালসার ঘুমন্ত মানুষকে জীবন্ত মানুষ বলে মনে হয় না। শহর ও শহরতলীর একদল লোককে আজও পর্যন্ত রিকসা টেনে জিবীকা নির্বাহ করতে হয়। আমরা সভ্যতার বড়াই করি। শিল্পাঞ্চলের সামাজিক পরিবেশ অত্যন্ত মর্মান্তিক ও করুণ। মোড়ে মোড়ে জুয়ার আড্ডা। গলিতে গলিতে মদ ও তাড়ির দোকানে। এলাকায় এলাকায় লোহা লক্কর এবং তামা পিতলের প্রকাশ্য অবাধ চোরাই কারবার। গলির আনাচে কানাচে পতিতালয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক অসাম্যের জন্য শ্রমিকরা আজ অগ্নিগর্ভ। সামাজিক নিষ্ঠুরতা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। একটি মাত্র ঘটনা আমি এখানে লিখছি। কিন্তু এই ধরণের হাজার হাজার ঘটনা ঘটেছে।

বেলঘরিয়ার দেশপ্রিয় নগরে বহুদিন ধরে এক বিধবা ভদ্রমহিলা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাস করছেন। শতচ্ছিন্ন বস্ত্রপরিহিত অবস্থায় এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে রাণাঘাট এবং মধ্যম গ্রাম থেকে কয়েক কিলোগ্রাম চাল ক্রয় করে কলোনী বাজারে বিক্রয় করে কোনরকমে তিনি সংসার নির্বাহ করতেন। প্রতিদিনের মত একদিন রাত সাড়ে দশটায় অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি বেলঘরিয়া ষ্টেশন থেকে বাড়ী ফেরার পথে একদল কুখ্যাত সমাজ বিরোধী ঐ মহিলাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাধা দিলে ঐ মহিলাদের টেনে হিঁচড়ে চড় চাপড় দিয়ে স্থানীয় এক সরু গলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। অধিক রাত পর্যন্ত ঐ সকল হতভাগিনীদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি।

আজ সর্বস্তরের মেহনতী মানুষ ধনবানদের অর্থনৈতিক নাগপাশে আবদ্ধ। ঐ সকল খেটে খাওয়া মানুষের সুখদুঃখের কথা কজনেই বা লেখেন? বাজারী পত্রপত্রিকাগুলির পক্ষে আজ আর তা সম্ভব নয়। বর্তমান ধনবানদের কাছ থেকে অঢেল কালো ও সাদা টাকা প্রাপ্তির আশায় বহু নামী-দামী, অখ্যাত, লেখক আজ সাহিত্যের ব্যভিচারে লিপ্ত।

চরম অরাজকতা এবং ব্যভিচারের মধ্যে আজ রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলছে। চরম সন্ত্রাস আজ পশ্চিমবঙ্গে এক ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা আজ পদদলিত। শাসক দল কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের ঘরে আগুন লাগিয়েছে। শাসক দলের অত্যাচারে হাজার হাজার বিরোধী দলের কর্মী আজ নিহত অথবা চিরতরে পংগু হয়ে গেছে। কারাগারে হাজার হাজার বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মী মৃত্যুর জন্য দিন গুনছে। একই দেশের নাগরিক হয়ে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় এক এলাকা থেকে আর এলাকায় যাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানেই প্রগতিশীল পত্রপত্রিকা পড়ার কোন সুযোগ নেই। যারা সক্রিয়ভাবে এখনও আছেন তাদের মধ্যে দু একজনের সঙ্গে চলার পথে দেখা হয়। চরম অত্যাচার এবং সন্ত্রাস শাসক দলের কসাইরা ওদের মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারে নি। শত অভাব, অনটন, এবং নিপীড়নের মধ্যে ওরা ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়েছে। সমগ্র অঞ্চলে আজ এক থমথমে ভাব। সমগ্র এলাকায় আজ এক নীরবতা বিরাজ করছে। শ্মশানের নিস্তব্ধতা। এই নিস্তব্ধতার মানে এই নয় যে সমগ্র এলাকায় রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষ সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গেছে। এই নিস্তব্ধতা রাজনৈতিক ঝড়ের পূর্বাভাস।

জনৈক পাঠক

আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন

সরকারের চরম ঔদাসীন্যে, বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভংগ করা এবং প্রতিহিংসামূলক দৃষ্টিভংগীর ফলে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের দাবীতে রাজনৈতিক বন্দীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘটের পথে নামতে পারেন—এই খবরে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সমিতি এই খবর দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার এবং তাকে কেন্দ্র করে তার সীমিত শক্তি অনুযায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এই আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গণসংগঠন ও সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক নরনারীদের সামিল করার জন্য সমিতি তার সর্বশক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালাবে। আজকের বিশেষ পরিস্থিতির বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ কাজে সচেতন উদ্যোগীর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে সমিতি সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আবেদন রাখছে।

সঞ্জয় মিত্র
সাধারণ সম্পাদক, গণতান্ত্রিক
অধিকার রক্ষা সমিতি

কলিযুগের ছড়া।

পরেশ ধর

১

চাল নাই ডাল নাই চাকরিও নাই
ভান-ঘেঁষা পাজিদের কারসাজি ভাই।
দাম বাড়ে লাফে লাফে চলে না ত কল
অতি-বাম দলগুলি করেছে অচল।
খরা আর বন্যা দেশে আনে হাহাকার
মূলে আছে সি. আই. এ—জানা তা সবার।

২

সমাজতন্ত্রী শ্রমমন্ত্রী চলেন গলা ছেড়ে:
লে-অফ্ যদি না মেনে নাও—চাকরি নেব কেড়ে।
অর্ধ উদর হাওয়ায় ভরো—বাকি অর্ধেক ভাতে
গোটা দেশের স্বাস্থ্যটা যে ভাল থাকবে তাতে।

৩

'ভাত ভাত' করেই ম'লো হাড়-হাভাতের দল
তুচ্ছ ভাতের জন্যে এরা হয়েছে পাগল।
কত কিছু দিলাম আমি—মস্ত স্টেডিয়াম
নতুন নতুন ঝকঝকে আর সুন্দরী সব ট্রাম
আরো দেব অনেক কিছু শোন সমাচার
মীনা বাজার তৈরি করে বসাবো হকার।
ওভার ব্রিজ, পাতাল রেল—সবই দেব আমি
দেশের তরে ভাবনা আমার জানে অন্তর্যামী।
ময়দানটা করব আমি আলোয় ঝলমল
সেই আলোতে চলবে খেলা নৈশ ফুটবল।
তবে কেন অন্ন চেয়ে কর জ্বালাতন
এই জীবনে অন্নটা কি এতই প্রয়োজন?

৪

কেরালার সি-পি-আই নেতা কুমারণ
আজ বলেন হেঁকে:
পি-এম্ প্রগতিবাদী কিছুতেই নন্
তিনি গেছেন বেঁকে।
লেজুর-বৃত্তি মোরা তবু করবোই
তাঁকে প্রগতির পথে টেনে ধরবোই।

৫

আর্যভট্ট ভারতীয়—মেল্লো পাখা সে
সোভিয়েতের মাটি থেকে উড়লো আকাশে।
এই দেশে মাধ্যাকর্ষণ বড্ড বেশি তাই
রুশ দেশের ভূমি ছাড়া ওড়ার সাধ্য নাই।

ভো হাই হিয়েনের সম্বর্ধনা

(দর্পণের প্রতিনিধি)

ভিয়েতনাম সংহতি কমিটি আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় গত তোরাই জুন শহীদ মিনার ময়দানে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের প্রতিনিধি ভো হাই হিয়েনকে সম্বর্ধনা জানান হয়। ঘড়িতে ঠিক বিকেল ছটা। ভো হাই হিয়েন মঞ্চে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত বিশাল জনতা তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। ভিয়েতনাম প্রতিনিধি তার উত্তরে দু হাত তুলে জনতাকে অভিনন্দন জানান। বিভিন্ন গণ-সংগঠন এবং জনতার তরফ থেকে ভো হাই হিয়েনকে নানা উপহার দেয়া হয়। জনৈকা মহিলা ভিয়েতনাম প্রতিনিধির কপালে রক্তচন্দনের টিপ পরিয়ে দেন। তিনি একটি ফুটফুটে শিশুকে কোলে তুলে নেন।

ভিয়েতনাম সংহতি কমিটি আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জ্যোতি বসু। শ্রীবসু তাঁর ভাষণে বলেন, ভিয়েতনাম আজকের যুগের বিস্ময়। ভিয়েতনামের কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। ছোট একটা দেশ কি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তারা লড়াই করেছে তা চিন্তা করা যায় না। পশ্চিমবাংলার চেয়েও ছোট এই দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা লড়াই করেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ভিয়েতনাম প্রমাণ করেছে যে মুক্তিকামী মানুষকে কখনো দাবিয়ে রাখা যায় না। মানুষের কাছ থেকে কখনোই তারা বিচ্ছিন্ন হন নি। আমরা জানি চীনেও বিপ্লব হয়েছে, কিন্তু ইদানীংকালে এতগুলো সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে ভিয়েতনাম জয়ী হয়েছে তা তুলনাহীন ভারত সরকার সম্প্রতি ভিয়েতনামকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু আরো আগে স্বীকৃতি দেয়া উচিত ছিল।

ভো হাই হিয়েন তাঁর ভাষণে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আপনাদের এই উষ্ণ অভিনন্দন আমার কাছে এক অভাবনীয় ঘটনা। আমরা দীর্ঘ তিরিশ বৎসর লড়াই করেছি। আমাদের দেশ পাহাড় এবং নদী দিয়ে ঘেরা ছোট একটা দেশ। যুদ্ধে আমরা বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, হারিয়েছি বহু দেশবাসীকে। আমেরিকানরা বহু ভিয়েতনামবাসীকে ধরে নিয়ে চলে গেছে, তারা যদি এখন ফিরে আসে আমরা তাদের সাদরে ফিরিয়ে নেব। বহু লোক পঙ্গু হয়ে গেছে। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের দেশকে আবার নতুন করে গড়ে তুলবো। তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। হো চি মিন আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু ভিয়েতনাম তাঁর স্বপ্নের দেশ। তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মধ্যে। সভাশেষে তিনি তিনটি গণসংগঠনকে তাঁর তাঁর দেশের পতাকা উপহার দেন।

সরকারের ভ্রান্তনীতি

চোলাই মদের ফলাও কারবার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আবগারী বিভাগের দুর্নীতি ও গাফিলতিতে সারা রাজ্যে বে-আইনী চোলাই মদের ফলাও কারবার চলছে। আজকাল বে-আইনী তাড়িও বিক্রি হচ্ছে একেবারে রাস্তার ওপর হাওড়া ব্রীজ, শিয়ালদা স্টেশন ও লেনিন সরণিতে। এই অস্বাস্থ্যকর চোলাই মদ খেয়ে গত কয়েক বছরে বহু লোক মারা গেছে। একথা জানিয়েছেন অল বেঙ্গল ওপিয়াম এন্ড এক্সাইজ লাইসেন্সীজ এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক।

শ্রীপ্রামাণিক বলেছেন, রাজ্য সরকার অত্যধিক হারে আবগারী শুল্ক চাপানোর ফলে দেশী মদের বিক্রি কমে গেছে এবং বিক্রেতারা দারুণ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। গত বিশ বছরে তাদের লাভের পরিমাণ বাড়েনি, কিন্তু আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ বেড়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক গুণ। ফলে অনেকেই দোকান বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন। ইতিমধ্যেই হুগলী ও চব্বিশ পরগণার কয়েকটি দোকান তাদের লাইসেন্স সরকারের কাছে প্রত্যর্পণ করেছে।

১৯০৯ সালে বেঙ্গল এক্সসাইজ আইন প্রবর্তনের সময় থেকে আবগারী বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল চোলাই ও বিষাক্ত মদ যাতে বাজারে চালু না হয় তার জন্য দেশী মদের দাম কম রাখা। কিন্তু ৭৩-৭৪ সালে দেশী মদের ওপর আবগারী শুল্ক চারবার বাড়ানো হয়েছে। ফলে বহু খরিদ্দার দেশী মদ ছেড়ে এখন চোলাই ধরেছেন। চোলাইয়ের দাম অনেক কম। কিন্তু সরকারের আবগারী বিভাগ আত্মতৃপ্ত কারণ বিক্রি কমে গেলেও আবগারী শুল্ক বৃদ্ধির জন্যে তাদের আয় বেড়েছে।

দেশী মদ বিক্রেতাদের আর একটি সমস্যা ডিসটিলারী থেকে ঠিক মত মদ সরবরাহ করা হয় না। তার ফলে অনেক সময় দোকান বন্ধ দিতে হয়। অথচ আয় বাড়াবার জন্য সরকার এন্তার নতুন লাইসেন্স দিচ্ছেন। এতে চোলাই মদের কারবার আরও বাড়বে বলে এসোসিয়েশন মনে করে। কারণ এসব দোকানে মদ না পেলে খরিদ্দাররা চোলাইয়ের আস্তানায় ভিড় করবে।

প্রতিবাদপ্রতিরোধ আন্দোলন

খাদ্য ও পানীয় জলের দাবী

হাওড়ার ঘোষপাড়া, নিশ্চিন্দা, দুর্গাপুর, শাঁপুইপাড়া ও জয়পুরের জনসাধারণ গত দশই জুন খাদ্য ও পানীয় জলের দাবীতে হাওড়া জেলা শাসকের অফিসের সামনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই সব অঞ্চলে খোলা বাজারে চালের দাম তিন টাকার ওপরে। সাপ্তাহিক রেশনের পরিমাণ নিয়মিত ভাবে অনির্দিষ্ট। দশই জুনের বিক্ষোভ সমাবেশের নেতৃত্ব দেয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নিশ্চিন্দা লোকাল কমিটি। পদ্মনিধি ধরের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি এডিশনাল জেলা শাসকের সঙ্গে এই এলাকার খাদ্য ও পানীয় জলের দাবী নিয়ে আলোচনা করেন।

খাদ্যের দাবীতে সম্প্রতি জলপাইগুড়ির কাঠালবাড়ী অঞ্চলেও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি স্থানীয় অঞ্চল প্রধানের কাছে গণডেপুটেশন দেয়। দাবীপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে; (ক) অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলে রেশন চালু করতে হবে, (খ) দুঃস্থদের খয়রাতি সাহায্য দিতে হবে (গ) যাদের রেশন কার্ড নেই, তাদের রেশন কার্ড দিতে হবে, (ঘ) গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে হবে, মিসা সহ সমস্ত কালাকানুন বন্ধ করতে হবে।

রোগীদের অনশন

মেডো হাসপাতালের রোগীরা নরককুণ্ডের মধ্যে দিন যাপন করছেন। প্রতিটি শয্যা নোংরা। বালিশের ওয়ার ও চাদর পাল্টাবার কোন ব্যবস্থা নেই। রোগীর বিছানামাত্রেই ছারপোকার বাসা। এ অবস্থায় সুস্থ ব্যক্তিরও রোগ হওয়া স্বাভাবিক। দুঃসহ কষ্টে অনিদ্রায় রাত্রি কাটাতে হচ্ছে রোগীদের। অতি সামান্য পরিমাণ খাবার রোগীদের দেওয়া হয়। এতে দু বছরের শিশুরও পেট ভরে না। ওষুধপত্রেরও শোচনীয় অবস্থা।

গত নয়ই জুন থেকে রোগীরা অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না।

বিড়ি শ্রমিকদের প্রতীক ধর্মঘট

সর্বভারতীয় বিড়ি ও সিগার ওয়ার্কার্স কমিটি আগামী ১৫ই জুলাই সারাভারতব্যাপী প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক উৎসাহের সঙ্গে এই ধর্মঘট পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কমিটির দাবী: ১৯৬৬ সালের বিড়ি এ্যাণ্ড সিগার (কণ্ডিশন অব এমপ্লয়মেন্ট) এ্যাক্ট সারা দেশে চালু করতে হবে, হাজার বিড়ি কাটার জন্য নূনতম আট টাকা মজুরী দিতে হবে, নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান কাজের জন্য সমান মজুরী দিতে হবে ইত্যাদি আঠারো দফা দাবী এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত।

উষা অটোমোবাইল কর্তৃপক্ষের চক্রান্ত

উষা অটোমোবাইল ইণ্ডিনীয়ারিং লিমিটেড কর্তৃপক্ষ তেষট্টির সালে ত্রিপাক্ষিক ইণ্ডিনীয়ারিং (শিল্প ভিত্তিক) চুক্তি এখনও পর্যন্ত কার্যকরী করেনি। শ্রমিকদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিরও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

উষা অটোমোবাইল এ্যাণ্ড সিদ্ধার্থ ইণ্ডাষ্ট্রিজ এমপ্লয়িজ এ্যাণ্ড মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ৭৩-৭৪ সালের বোনাস সম্পর্কিত বিরোধের এখনও পর্যন্ত কোন মীমাংসা করেনি। ইউনিয়নের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ কাজের বোঝা বাড়াবার জন্য চক্রান্ত করছে। শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য কর্তৃপক্ষ অসংখ্য ছাঁটাই নোটীশ দিয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে নীরব।

সি আই টি ইউনিয়ন নেতা আক্রান্ত

গত ১০ই জুন ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে সেখানকার শ্রমিক কর্মচারীরা দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে হেড অফিসে গণ-ডেপুটেশন দেবার সময় ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক মনোতোষ চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন কংগ্রেসী ইউনিয়নের গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যই এই আক্রমণ। সিটুর সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন রায় এক বিবৃতিতে এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন।

শরৎ চাটুজ্যে

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লী সমাজ। তা ছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।' কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই, খোলাখুলি স্বীকার।

এমতাবস্থায় যদি কোনো খোদকার

হালফিল কিছু কিছু কাহিনী খোদকারদের খোদাই কর্মের ভোজবাজি বিয়োগ করলেও পণ্ডিতদের অনেকরকম ব্যবহারের চশমখোর প্রায়শ্চিত্ত আচমকা দৃষ্টিকটু ঠেকে। এই যেমন কিছুদিন আগেকার ঘটনা। পানিত্রাসের শরৎ সাহিত্য মেলার আলোচনাচক্রে যখন একজন বামপন্থী প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বক্তৃতা করছেন, ঠিক তখনই মঞ্চে উপবিষ্ট একজন ডি, লিট টিকিধারী বিশেষ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক কানে ট্রানসিস্টর লাগিয়ে ক্রিকেট টেস্ট খেলার ধারাবিবরনী শুনছিলেন। অথবা তরুণদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই বিরাট আয়োজনে নিমন্ত্রিত একজন বর্তমান কালের পুরস্কার লেজবিশিষ্ট যুগধুরন্ধর সাহিত্যিক কাম সম্পাদক কাম সমালোচক কাম প্রখর কলমের অধিকারী কাম সবজান্তা হোয়াট নট ব্যক্তি আগেভাগেই খোঁজ করছিলেন কোথায় একটু সুরা পাওয়া যায় এবং রাত্রের নিরাপদ আরামপ্রদ বিছানায় শুয়ে পানীয় গলাধঃকরণের ব্যবস্থা আছে কি না। বেতের লাঠি আর চটিজুতো কি খুবই অসহনীয়?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

'সম্রাটের মৃত্যু' মঞ্চস্থ

দোসরা জুন ইউ বি আইয়ের ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি (হাতিবাগান শাখা) নাট্যকার শচীন ভট্টাচার্যের "সম্রাটের মৃত্যু" মঞ্চস্থ করেন। তমাল লাহিড়ীর সার্থক পরিচালনায় নাটকটি সর্বতোভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সুবোধ সেন, প্রদীপ ঘোষ শম্ভু পাল কল্পনা মুখার্জী প্রমুখ বিভিন্ন চরিত্রে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PA

ইন্দিরার বিরুদ্ধে আদালতের রায় প্রসঙ্গে

চাণক্য সরকার

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অধিযোগের কয়েকটি আদালত গ্রহণযোগ বলে মনে করেছে। এত উচ্চপদে এই ধরণের দুর্নীতির পরিণাম মারাত্মক হতে পারে বলে আদালত বলেছে যে শ্রীমতী গান্ধী আগামী ছয় বছরের জন্য কোন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

অভিযোগ যে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী গান্ধী সরকারী ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছেন নিজের নির্বাচনী প্রচারে। যশপাল কাপুর নামে এক সরকারী অফিসার তাঁর নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা করেছেন। কাপুরের পদত্যাগ বিষয়ে যে কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় তা আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি।

তবে এই কাপুর ভদ্রলোকের এলেম আছে। নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেবনজরে থাকার ফলে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন। আর স্ত্রীর নামে চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি কিনেছেন।

আদালতের জেরায় সম্পত্তির টাকা কোথা থেকে এল তার কোন সদুত্তর যশপাল কাপুর দিতে পারেন নি। আদালতের রায়ে এই বিষয়ে

রঙ্গদর্পন

কাপুরের কৈফিয়ৎকে দুর্বল আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধী এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করবেন। অবশ্যই তিনি এবং তাঁর পারিষদেরা আশা করেন যে সুপ্রীম কোর্ট শ্রীমতীকে রক্ষা করবে।

এই সূত্রে শ্রীমতী গান্ধীর দূরদর্শিতার তারিফ করতে হয়। তিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিজ পছন্দমত এ এন রায়কে নিয়োগ করেছেন।

প্রায় চার বছর আগে বিরোধী দলের নেতা রাজনারায়ণ ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে নির্বাচন খারিজ করার আবেদন করেন।

কিছুদিন মামলা চলার পর শাসকদলের মনে হয় হয়ত বা আদালতের রায় শ্রীমতীর বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বাঁচার রাস্তা খোঁজ হতে থাকে। দুর্জনেরা বলছে যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিকে প্রভাবিত করার জন্য বহুগুণাকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করে আনা হয়। বহুগুণা বিচারকের একজন পুরানো বন্ধু। বহুগুণা কিন্তু পরে জানিয়ে দেন যে, তাঁর পক্ষে বিচারকের কাছে তদ্বির করা সম্ভব নয়। কারণ বিচারক খেয়ালী লোক হয়ত বা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে দেবেন।

অন্যদিকে চেষ্টা হয় সুপ্রীম কোর্টকে ঢেলে সাজাবার জন্য। কংগ্রেসী নেতারা প্রচার করেন যে, বিচারকদের বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া দরকার। এই উদ্বুদ্ধ বিচারকমণ্ডলী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করে বিভিন্ন মামলায় তাদের আইনের ব্যাখ্যা করবেন এবং অনুকূলে রায় দেবেন।

এই অজুহাতেই এ এন রায়কে অন্যান্য সিনিয়র বিচারপতিদের টপকে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করা হয়। এখন বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন তখন এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

তবে সুপ্রীমকোর্ট যাই রায় দিক না কেন কিভাবে কংগ্রেসী নির্বাচন হয় সে সম্পর্কে মানুষের কোন ভ্রান্তি নেই। ১৯৫২ সালে নির্বাচনের সেই প্রথম দিন থেকে কংগ্রেসীরা বিভিন্ন রাজ্যে কিভাবে নির্বাচন চালাচ্ছে এবং কোথা থেকে অর্থ আসছে তার সমস্ত ইতিবৃত্ত মানুষের জানা।

আজ কংগ্রেসের প্রচণ্ড সাংগঠনিক সঙ্কট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কট প্রকট হয়েছে। উচ্চমহলের সমস্ত কংগ্রেসী নেতার মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি শুরু হয়েছে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে। প্রায় দল ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। এই পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ দেশব্যাপী মড়াকান্না কংগ্রেসীদের শ্রীমতী ইন্দিরার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে।

আদালতের রায়ে শ্রীমতীর নির্বাচন বাতিল হয়েছে। আদালত কোথাও বলেনি বা বলার এক্তিয়ারও প্রসঙ্গও ছিল না যে, শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস দলের সর্বময় নেত্রী নন। তবে হঠাৎ শ্রীমতীর বাড়ির সামনে এত আস্থাজ্ঞাপনের মহড়া কেন? এর একমাত্র উত্তর হতে পারে যে, পার্টির সাংগঠনিক সঙ্কট এবং ওপর মহলে অনেকের শ্রীমতীকে হটাবার চেষ্টা।

যেভাবে সারাদেশে কংগ্রেসীরা চেঁচামেচি সুরু করেছে একজন নেত্রীকে কেন্দ্র করে তাতে যথেষ্ট আশঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। এই ধরণের প্রচার এবং আচরণ বিধি শেষ পর্যন্ত দেশকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। ত্রিশ দশকের ফ্যাসীবাদের আচরণবিধির সঙ্গে শাসক দলের আজকের প্রচারভঙ্গির সাদৃশ্য আছে।

রায়বেরিলির রায়

অনার্য মিত্র

হাওয়ায় কান্দে পোহার কাছে
আর কান্দে মায়,
কি ক্ষণে শুনাইলি যাদু
রায়বেরিলির রায়।
কাইন্দোনা মা মুক্তিমাতা
আছে ন্যায়পুতি,
তাগো লইয়া সুখে থাকো
আর আছে মারুতি।
পিতৃভাগ্যে পাইলা শশি
ছিল দাশের দাসী
শেষের কয়দিন করবা কি
থাক গিয়া কাশী।
সিংহ দিয়া করলা বিচার
নিজে পাইলা শোক
এরেই কয় বিনা দোষে
কপালের দুর্ভোগ।
নীতির শিরোমণি তুমি
দূর করলা নীতি,
এই দেশে কেউ বোঝে না
আসল দেশপ্রীতি।
দুঃখে আমার বুক জ্বলে
জনগণের হিয়া
ঐ পারে বসিয়ে কান্দে
তোমার মুজিব মিঞা।
সিয়া কান্দে সিকিম কান্দে
কান্দে সি পি আই
দুঃখে শোকে বোবা হইল
মুখেতে রা নাই।
ভাইরে আমার ভাই—
আর কান্দিস নাই,
তোর মায়রে মন্দ কইয়া
কপাল যে চাপড়াই।
কারে ধরে হাঁটবিরে তুই
আঁচল পাবি কই,
কার কোলে বা নিদ্রা যাবি
কারে করবি সই?
হায়রে হায়রে হায়
কান্দে আমার মায়
মুক্ত করিবে কে যে
বন্দী এশিয়ায়।
কাইন্দোনা মা দাশের দাসী
বৃন্দাবনে যাও
জনম ফিরা পাইলে আবার
সাজাইয়া দিমু নাও।

ঐ দেখ, আবার কান্দে
কান্দে খালি খালি
আর চোখের কাজল গইলা
তোমার মুখ যে হইল কালি

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডি
প্রেস
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কো
কলিকাতা-১৩
ফোন: ২৪১৯৪৩

ধান চাষের-এই তো মরশুম---

ধান চাষে এফ সি আই-এর সুফলা ও ইউরিয়া সার ব্যবহার ক'রে কম খরচে বেশি ফসল ঘরে তুলুন। আজকাল চাষবাসের কাজে অনেকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এফ সি আই-এর সার ব্যবহার ক'রে কম খরচে লাভের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে তুলছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি এফ সি আই-এর রাসায়নিক সারে উচ্চ গুণমান পুরোপুরি বজায় থাকে। নিজস্ব রঙ থাকায় ভেজালের ভয় থাকে না। দানাযুক্ত ব'লে প্রয়োগের সময় নষ্ট হয় না, আর সহজেই জলে গুলে ছিটোনো যায়।

প্রয়োজনমত সারের জন্য আপনার এলাকার এফ-সি আই ডীলার বা কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁরা আপনাকে সবরকম সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্য সবসময় প্রস্তুত।

চাষের কাজে
বেশি ফলন ও
বাড়তি লাভের জন্য
ব্যবহার করুন—

সুফলা
২০ : ২০ : ০
১৫ : ১৫ : ১৫
ইউরিয়া

FCI
দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

আঞ্চলিক শাখা : মুচিপাড়া, দুর্গাপুর-১২ ● ক্ষুদিরাম বসু রোড, মেদিনীপুর ● শহীদ সূর্য সেন স্ট্রীট, মুর্শিদাবাদ ● বিধান রোড, শিলিগুড়ি ● ৫৮, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

Progressive/FCI/1-75

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেসিয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মি
সম্পাদক—হীরেন বসু

কংগ্রেসীরা আবার সন্ত্রাসের মহড়া শুরু করেছে

দর্পন

১৮শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৭শে জুন ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

বন্ধে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেখে কংগ্রেসীরা বিচলিত। আবার প্রস্তুতি সুরু হয়েছে। সন্ত্রাসের। তারই মহড়া হিসেবে ঠনঠনিয়া এলাকায় সাজানো গল্প ছাড়া হয়েছে যে. মার্কসবাদীরা কংগ্রেসী এম এল এ সামসুজ্জোহার ওপর বোমা ছুঁড়েছে। সি পি এম নেতৃত্ব এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন এ ঘটনার সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। বামপন্থীদের কেউ কেউ মনে করেন যে, এই বোমা ছোঁড়ার ব্যাপার সম্পূর্ণ কংগ্রেসীদের ঘরোয়া কোন্দলের পরিণতি।

সামসুজ্জোহা সাহেব স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার স্নেহধন্য। অজিতবাবু ঐ এলাকার কংগ্রেসীদের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সঙ্গে বরাবর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। শত-বারিদ-সোমেন গোষ্ঠী এই এলাকায় প্রতাপশালী। বোমা ছুঁড়ে এই কথা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে যে, সামসুজ্জোহা সাহেব অজিতবাবুর সঙ্গে থেকে বেশীদিন আত্মরক্ষা করতে পারবেন না।

একটিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা হয়েছে। বোমা ছোঁড়ার পরই পুলিশ সারা এলাকায় মার্কসবাদীদের গ্রেপ্তার করার অভিযান চালায়। মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

জরুরী অবস্থা ঘোষণা

শেষ মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল, রাষ্ট্রপতি জনাব ফকরুদ্দীন আলি আমেদ সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন, কারণ ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন এবং দেশের অভ্যন্তরেও সঙ্কট।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রাক্কালে জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই ও বিরোধী দলের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা চরণ সিং, রাজনারায়ণ, পিলু মোদী, সমর গুহ, আদবানী, অশোক মেটা প্রভৃতিকে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য চন্দ্রশেখর এবং রাম ধনকেও এই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। এরা দুজনে জয়প্রকাশের সমর্থক এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। দিল্লীর একটি দৈনিক "মাদারল্যাণ্ড"র সম্পাদককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সকাল আটটায় এক বেতার ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী এক "ব্যাপক ষড়যন্ত্র" এবং "গণতন্ত্র রক্ষার নামে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা" এবং জনগণ ও সামরিক বাহিনীকে "উত্তেজিত" করার কথা বলেছেন।

জানা গেছে, সরকার সংবাদের ওপর প্রি-সেন্সরশিপের ঘোষণা করেছেন।

উত্তর কলকাতা ও শহরতলীতে বাংলা বন্ধ

ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টারের নোট বই থেকে

বিশে জুন "বাংলা বন্ধে"র সকালে উত্তর কলকাতা ও শহরতলীতে ভ্রামমাণ এই রিপোর্টারের নোট বই থেকে ঃ

সকাল সাতটা ঃ দমদম বিমানবন্দর—ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের প্রতিনিধি বললেন, অন্যান্য দিন এই সময়টাতে নতুন টার্মিনাল বাড়ির লাউনজ বাজার হাটের মত গমগম করে। অথচ আজ সব নিস্তব্ধ। দূরে দূরে সোফায় হেলান দিয়ে একএকটি পরিবার, কয়েকটি বিদেশী দম্পতি। সন্ধ্যাবেলা আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ধরার জন্য আগের দিন থেকেই

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

বাংলা বন্ধের দিন বাগবাজারের কন্ট্রোল রুম থেকে শতকান্তি টেলিফোনে পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছেন

রাজনারায়ণের কৌঁসলীকে অশোক সেন আইনগত পরামর্শ দিচ্ছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী সুপ্রীম কোর্টে যে আপীল করেছেন, সেই আপীলের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী নেতা রাজনারায়ণের কৌঁসুলীকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বর্তমান কংগ্রেসী সংসদ সদস্য অশোক সেন আইনগত পরামর্শ দেবেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

সম্প্রতি সমাজতন্ত্রী নেতা রাজনারায়ণের এক বিশেষ দূত দিল্লীতে অশোক সেনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে রাজনারায়ণের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টে মামলা লড়ার জন্য অনুরোধ জানান। শ্রীসেন রাজনৈতিক কারণের কথা উল্লেখ করে সরাসরি রাজনারায়ণের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টে মামলা লড়ার অসুবিধার কথা জানান।

শ্রীসেনের এই মনোভাব জানার পর রাজনারায়ণ আবার দূত মারফৎ শ্রীসেনকে তাঁর পক্ষের (রাজনারায়ণের) কৌঁসুলীর আইনগত পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতে অনুরোধ জানান। জানা গেছে, শ্রীসেন এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এবং তিনি এই মামলায় রাজনারায়ণের কৌঁসুলীর লীগাল কনসালট্যান্ট হিসাবে থাকবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীসেন ভারতবর্ষের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম আইন উপদেষ্টা এককালে শ্রীসেনের জুনিয়র হিসাবে কাজ করেছেন।

কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর মামলার ব্যাপারে অশোক সেনের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলেছিলেন। প্রিয় মুন্সী তো প্রধানমন্ত্রীর হয়ে সুপ্রীম কোর্টে মামলা লড়ার জন্য অশোক সেনের নাম প্রস্তাবই করেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু ঘোরতর বিরোধিতা করেন।

সিদ্ধার্থবাবুর ভয় প্রধানমন্ত্রী এই মামলায় অশোক সেনের পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকলে আইনজ্ঞ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর কদর কমে যাবে। এককালের সহকারী হিসাবে আইন বিষয়ে শ্রীসেনের পাণ্ডিত্য সিদ্ধার্থবাবুর অজানা নয়। তাই সিদ্ধার্থবাবু প্রধানমন্ত্রীকে শ্রীসেন অপেক্ষা পাল্কীওয়ালার পরামর্শের ওপর নির্ভরশীল হতে বলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা ভুলে আইনজগতে পাল্কীওয়ালারার খ্যাতির কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রীও আর এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা প্রকাশ করেন নি।

কংগ্রেস নেতৃত্বের অনেকেই প্রধানমন্ত্রীর আইনজীবী হিসাবে পাল্কীওয়ালার নিয়োগ সত্বেও অশোক সেনকে সহযোগী হিসাবে রাখতে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুর ঘোরতর বিরোধিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। প্রথম দিকে আগ্রহ প্রকাশ করলেও

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

বাংলা বন্ধের দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুপস্থিত কর্মচারীদের পেটানো হচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের পরোক্ষ নির্দেশে বিশে জুন বাংলা বন্ধের দিন অনুপস্থিত কর্মীদের পেটানো শুরু হয়েছে।

একুশে জুন সকাল এগারোটার পর সশস্ত্র একদল যুবক জনৈক ছাত্র নেতার সঙ্গে পরামর্শের পর ক্যাশ ও একাউন্টস বিভাগের কর্মীদের উপর নৃশংস হামলা চালায়। হামলায় আহত জনৈক কর্মীকে শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীরা কংগ্রেস নামধারী গুণ্ডা বাহিনীর এই হামলায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং দপ্তরে দপ্তরে এর প্রতিবাদে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

ডঃ সেনের কার্যকাল ছিয়াত্তর সালে শেষ হচ্ছে। এই পদে পাকাপোক্ত ভাবে থাকার জন্য ইতিমধ্যেই তিনি সি পি আই-এর সঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি করা শুরু করে দিয়েছেন। গত আঠারোই জুন সমস্ত পূর্বের নজির ভঙ্গ করে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা জানিয়ে দৈনিক কালান্তর পত্রিকায় তিনি এক বিবৃতিও দিয়েছেন।

এরপরই আসে বিশে জুন বাংলা বন্ধের ডাক। বন্ধের আহ্বান হলে তা যে রাজনৈতিক দলই ডাকুক না কেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা রাজ্যের অন্যান্য ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়। এবং এটাই চিরাচরিত রীতি। ডঃ সেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও সি পি আই

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাস ও দেওয়ালের লিখন

পাড়ায় পাড়ায় কংগ্রেসী মস্তানদের ভীতি প্রদর্শন, হাজার পাঁচেক বামপন্থী কর্মী গ্রেপ্তার, মাইক্রোফোন লাগানো জীপ নিয়ে কংগ্রেসীদের সারা কলকাতায় টহল এবং বন্ধের বিপক্ষে "জ্বালাময়ী" চিৎকার সত্ত্বেও বিশে জুন কলকাতার স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর ট্রাম-বাস চলেছে, প্রায় লাইন দিয়ে। সরকারী পদাধিকারীরা বলেছেন, অন্যান্য দিনের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। কিন্তু পিক-আওয়ারে অর্থাৎ সকাল নটা দশটায় ডালহৌসী-চৌরঙ্গী অঞ্চলে ছুটির দিনের আমেজ অনুভূত হয়েছে। কর্মব্যস্ত উপচে-পড়া মানুষের ভীড় সেখানে ছিল না। ট্রাম-বাসগুলো ট্রারমিনাস থেকে ট্রারমিনাসে যাতায়াত করেছে। কিন্তু ট্রাম-বাসগুলোয় যে সময়ে তিল ধরণের জায়গা থাকবার কথা নয়, সেই সময় মুষ্টিমেয় যাত্রী সেদিন দুর্লভ বিলাসিতা উপভোগ করেছেন। অর্থাৎ স্পষ্টতই আটটি বামপন্থী দল ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট কর্তৃক আহুত বাংলা বন্ধের দিনটি অন্যান্য দিনের মত কর্মতৎপর দিন ছিল না। মফঃস্বল বাংলায়, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অতএব আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলে সিদ্ধার্থবাবুদের সুখনিদ্রা লাভের কোন উপায় নেই। সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। কংগ্রেসী মস্তানদের গুণ্ডামী, পুলিশী অত্যাচার, সন্ত্রাস দিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। ১৯৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর পাড়ার গুণ্ডা (নকশালপন্থী নাম নিয়ে, পরে স্বমূর্তিতে) পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগ প্রধান-মন্ত্রীর রিসার্চ ও অ্যানালিটিকাল উইং এই রাজ্যে যে বিভী-ষিকার রাজত্ব কায়েম করেছিল সেই রাজত্বই আজ ভারী পাথরের মত পশ্চিমবঙ্গের বুকের ওপর চেপে বসে আছে। কিন্তু সন্ত্রাস অত্যাচার আর দমনপীড়নই শেষ কথা নয়, সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ একদিন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত শাসনযন্ত্রের ওপর আছড়ে পড়ে তাকে খতম করে আর শাসকশ্রেণী রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। কারণ মুষ্টিমেয় উৎপীড়ক—তার পেছনে গুণ্ডা পুলিশ সামরিক বাহিনী যাই থাকুক না কেন—ব্যাপক জনসাধারণকে কখনও দাবিয়ে রাখতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসীদের একটানা সন্ত্রাস ও গুণ্ডামী এবং দুঃশাসনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। প্রতিরোধ দানা বাঁধছে। বাংলা বন্ধ তার প্রথম ধাপ। সক্রিয় প্রতিরোধ বানচাল করার জন্যই শুরু হয়েছে বামপন্থী কর্মীদের ওপর নতুন করে আক্রমণ। কলকাতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কয়েকশত কর্মীকে কাজে যোগদান করতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা বন্ধে যোগ দিয়েছে বলে কংগ্রেসী গুণ্ডারা তাদের বাধা দিচ্ছে। চিত্তরঞ্জন লোকো-মোটিভ ওয়ার্কস লেবার ইউনিয়নের সহ সভাপতি মিহির দেকে গত ২২শে জুন তাঁর কোয়ার্টারের মধ্যে কংগ্রেসী গুণ্ডারা হত্যা করেছে বলে শ্রীজ্যোতি বসু ও সি আই টি ইউ নেতা শ্রীমনোরঞ্জন রায় অভিযোগ করেছেন। ইউনিয়নের জীপ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কো-অপারেটিভ স্টোর লুণ্ঠন করা হয়েছে। গুণ্ডারা মহিলাদেরও নিগৃহীত করেছে। তাঁরা আরও অভিযোগ করেছেন, কলকাতা ও চব্বিশ পর-গণায় বন্ধে সামিল হওয়ার জন্য সি আই টি ইউ অনুগামী শ্রমিকদের কাজে যোগদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের লেক ডিপোর দুজন মহিলা সহ বত্রিশজন কর্মীকে তাঁদের কর্মস্থল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

কিন্তু আরও সন্ত্রাস, আরও গুণ্ডামী, আরও ডাণ্ডাবাজির আগে সিদ্ধার্থবাবুরা একবার দেওয়ালের লিখন পড়বার চেষ্টা করলে ভাল হয় না ?

আনন্দবাজারের সন্তোষজনক ডিগবাজী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আনন্দবাজার পত্রিকা পরিষ্কার একটি ডিগবাজি খেল। বকলমে ডিগবাজি খেলেন আসলে "সন্তোষ-কুমার ঘোষের কলম"-এর লেখক এবং অন্যতম সম্পাদকীয় লিখিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকার মালিক সম্পাদক শ্রীঅশোক-কুমার সরকারের ধমকে। তাতেই উলটে গেল মতটা। তেরই জুন থেকে যে "কলম" এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রসঙ্গে ক্রমাগত গণতন্ত্রের বাণী উদ্গীরণ করছিল সেই কলমেই? পঁচিশে জুন সুপ্রীম কোর্টের স্থগিতাদেশে স্বস্তিবাচন উচ্চারিত হয়েছে।

গত বারোই জুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলার রায় বেরোবার পর থেকে বোম্বাই দিল্লী ও কল-কাতার বৃহৎ পুঁজিপতি পরিচালিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় কলমে কয়েকদিন এই কথাই পাকে প্রকারে বলা হচ্ছিল যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনোর পর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদত্যাগ করাই উচিত ছিল এবং এটাই নাকি গণ-তান্ত্রিক রীতি। যারা আনন্দবাজারের এই গণতন্ত্র প্রেমে অবাক হয়েছিলেন এবং যারা মুগ্ধ হয়েছিলেন এই পত্রিকার বুধবারের সম্পাদকীয় পড়ে তাদের সকলেরই চক্ষু ছানাবড়া। "স্থিতি তথা স্বস্তি" শিরোনাম দিয়ে এই সম্পাদকীয়তে স্বস্তি প্রকাশ করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রীভি আর কৃষ্ণ আয়ারের আদেশে স্থিতাবস্থা বজায় রইল বলে। এতে লেখা হয়েছে—

"প্রবাহিত ধারাকে অব্যাহত রাখিয়া বিচারপতি যে প্রশাসনিক কর্মকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছেন নানা মহল তাহাতে অবশ্য হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে।—হাইকোর্টের রায়ের প্রয়োগ মুলতুবি রাখিয়া বিচারপতি আয়ার সামান্য যে শর্তটুকু রাখিয়া দিয়াছেন সেটাও খুব একটা কণ্ঠক-প্রতিম নয়। সংসদে শ্রীমতী গান্ধীর খালি ভোট দেওয়ার অধিকারটাই থাকিবে না।—এই যে একটুখানি শর্ত, ইহাতে তেমন স্বর্গমর্ত্য তোল-পাড় হওয়ার কথা নয়। একটা ভোটে কী বা আসে যায়, যেখানে শাসক দলের পক্ষে গরিষ্ঠতা বিপুল।—তিনি প্রধানমন্ত্রী বলিয়াই তো উদ্বে-গের উদ্বেলতা এত? প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রাধান্য যাঁহার গেল না, লোকসভার সদস্যপদও প্রকৃতপক্ষে রহিয়াই গেল অর্থাৎ আপাতত এই রাষ্ট্রদেহে কোনও শূন্য, কোনও দৈন্য কোনোখানে দেখা দিতেছে না, কি স্বস্তি যে, সকলই পূর্ণ। বাকি রহিল ভোট দেওয়ার অক্ষমতাজনিত ওই ছোট একটু ক্ষত! ওটা যেন চাঁদের কলঙ্ক—ওটা আছে বলিয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় কখনও কি একটুও ঘাটতি পড়ে? কখনই নয়।"

এর পাশাপাশি এলাহাবাদ হাই-কোর্টের রায় বেরোবার পরদিন অর্থাৎ তেরই জুন তারিখের সম্পা-দকীয় পড়ুন—

"—আরও একবার প্রমাণ মিলিল যে, সাচ্চা গণতন্ত্রী বলিয়া বড়াই করিলেও এদেশের নেতৃত্ব এখনও এমন কি এখনও নিকসনের সমতুল্যও না। হইলে পরবর্তী প্রতিক্রিয়া আর ঘটনা অবশ্যই অন্য এক ধারায় বাহিত আশায় আশায় আপীলের নামে সুপ্রীম কোর্টের দুয়ারে ধরণা দেও-য়ার দৃশ্য দেখা যাইত না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহা ন্যায়াধিকরণ উলটানো টেবিলটি ফের সোজা করিয়া দিতে পারে—ঠিক। একুশ দিনের জন্য গদি-টির জান-মান-রক্ষার করুণা ওই নিম্নতর আদালতের রায়েই রহিয়াছে, ইহাও সত্য। তথাপি সাধারণ ধার-ণায় বলে, চূড়ান্ত আপীলের ফলা-ফল বাহির না হওয়া অবধি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সাময়িক ভাবে সরিয়া দাঁড়ানোই হয়ত বা সুস্থতর ইতি-কর্তব্য ছিল।"

আবার রবিবার পনেরই জুন একই সন্তোষী কায়দায় একই ধরণের বক্তব্য লেখা হল "প্রথম অঙ্কের পরে" শিরোনামের সম্পাদকীয়তে। বলা হয়েছে—

"—ইহা ঠিক যে, একটি প্রতি-মার ভাব-মুখচ্ছবি গর্জনের তেলে আগে যতটা জ্বলজ্বলে দেখাই-য়াছে, আর ততটা উজ্জ্বল দেখাইবে না। ইহাকেই বুঝি ইংরাজীতে বলে—"ইট উইল নেভার বি দি সেম এগেন!" অর্থাৎ সে গৌরবশশী "ফিরিবে না ফিরিবে না," একটি কবিতায় যেমন বলিয়াছে। আদালতের নির্দেশ মানিয়া লইয়া (একই আদা-লত নির্ভীক নিরপেক্ষ সাহস প্রকাশে দেখাইলেনই যদি, তবে কেন যে সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট চেম্বারের অন্তরালে কুড়ি দিনের স্থিতাবস্থার হুকুম জারী করলেন, সেই রহস্যটাও দুর্বোধ্য) সরিয়া দাঁড়াইলে ক্ষমতা পত্রপাঠ যাইত বটে, তবে দূরতর? দৃষ্টির বিচারে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সুনাম দিকে দিকে ছড়াইত।"

এখানেই শেষ নয়, "গণতন্ত্রের অ আ ক খ", "ইনডিয়ার নতুন বানান", "দল, দেশ আর দরকার" শিরোনামে তিনটি অতি দীর্ঘ সম্পা-দকীয়তে এবং "সন্তোষকুমার ঘোষের কলমেও" "নিজস্ব" কায়দায় স্বনাম-ধন্য সন্তোষকুমার ঘোষ একই ধর-ণের বক্তব্যে ইন্দিরার সমর্থনে কংগ্রেসীদের সমাবেশ ও আস্থা-জ্ঞাপনের সমালোচনা করে গণতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন।

আনন্দবাজারের মালিক-সম্পাদক অশোকবাবু কলকাতায় ছিলেন না যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক ভবি-ষ্যৎ নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। ফিরে এসে তার চক্ষু স্থির। এরা আর ব্যবসা ট্যাবসা করতে দেবেনা দেখছি। সিদ্ধার্থকে ত ক্ষেপিয়ে রেখেছে আবার খোদ প্রধানমন্ত্রীকেও চটাচ্ছে একি মারাত্মক সম্পাদকীয়।

সন্তোষবাবু ধমক খেলেন, সেই সঙ্গে নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অভীককেও, যিনি আনন্দবাজার গোষ্ঠীর একাধিক পত্রিকার সম্পাদক। এই ধমকেই সন্তোষবাবুর এই নিখুঁত ডিগবাজি।

কর্মীদের পেটানো হচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নেতা ভূপেশ গুপ্তের সঙ্গে গোপন পরামর্শের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বিশে জুন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নে। শুধু তাই নয়। ঐ দিন সিনডি-কেটের বিশেষ সভাও আহ্বান করা হয়। উল্লেখযোগ্য এই শিক্ষাবিদই গত সাতই জুন মুখমন্ত্রীর "মহা-মিছিলে"র জন্য এম এ পরীক্ষা স্থগিত রাখেন এবং সিনডিকেটের সভাও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

এদিকে উপাচার্য মহাশয়ের সমস্ত হুমকি সত্ত্বেও শতকরা সত্তর জন কর্মী বিশে জুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে আসেন নি। দপ্তরের পর দপ্তরে শুধু ফাঁকা চেয়ার টেবিল। কোন কোন বিভাগে একুশ জন কর্মীর মধ্যে দুজন এবং একাউন্টস বিভাগে একান্ন জনের মধ্যে ষোলো জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিভা-গেরও ঐ একই হাল।

কর্মীদের উপর খাপ্পা ডঃ সেন তাই একহাত নেবার জন্য তাঁর একান্ত স্নেহভাজন জনৈক কুখ্যাত ছাত্র নেতার স্মরণাপন্ন হয়েছেন। বিশে জুন রাত্রি আটটা পর্যন্ত ঐ ছাত্র নেতার নেতৃত্বে উপাচার্যের নির্দেশে অনুপস্থিত কর্মীদের নাম ঠিকানা বাছাই চলেছে। দু-একদিনের মধ্যেই গুণ্ডা বাহিনী অপারেশন চালিয়ে যাতে ধর্মঘটী কর্মীদের সমুচিত শিক্ষা দেয় ডঃ সেন নাকি ঐ ছাত্র নেতাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ডঃ সেন অবশ্য অকৃতজ্ঞ নন। তাই ছাত্র নেতার পরীক্ষার জন্য ইন-ছাত্র নেতার পরীক্ষার জন্য ইন-ভিজিলেটর ছাড়া বিশেষ একটি ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

মানার উদ্বাস্তুরা পাশবিক অত্যাচারের মুখোমুখি

-(দর্পণের প্রতিনিধি)

বাংলার মাটিতে দীর্ঘ একযুগ পরে ওরা আবার ফিরে এসেছেন। এরা স্বাধীনতার বলি। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু এরা। এরা ভারতে এসেছিলেন উদ্বাস্তু হয়ে। আজও তাদের পরিচয় উদ্বাস্তু।

মধ্যপ্রদেশের মানা উদ্বাস্তু শিবির থেকে দলে দলে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসছেন। প্রথম দল এসে পৌঁছেছে হাওড়া ষ্টেশনে সতেরই জুন। দ্বিতীয় দল এসেছে আঠারই জুন। সংখ্যায় এরা কয়েক হাজার

আঠারই জুন হাওড়া ষ্টেশনে যখন গিয়ে পৌঁছাই তখন মানা থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ছোট ছোট দলে যে যার সংসার সাজিয়ে বসে আছে হাওড়া ষ্টেশনের চত্বরে। ভবিষ্যত অনিশ্চিত। এক জায়গায় দেখলাম কয়েকটি শিশু তাদের মাকে ঘিরে বসে আছে তাদের বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে। দেখলাম একটা ছেলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে বিরাট হাওড়া ষ্টেশন, জনসমাগম।

ছেলেটির নাম রতন। প্রশ্ন করেছিলাম তাকে তাদের ক্যাম্প জীবন সম্পর্কে। ঐটুকু ছেলের মুখে যা শুনলাম তা, রীতিমত ভয়ানক। ওর মতে স্বল্প পরিসর ত্রিপলের ছাউনিতে থাকতে হয় দশবার জনকে এক সঙ্গে। বর্ষায় জল পড়ে, গরমে রোদ আটকায়না ঐ ছাউনি দিয়ে। তার উপর আছে ওখানকার স্থানীয় লোকদের অত্যাচার। মেয়েদের ওপরেই অত্যাচারটা বেশী। রতনের দিদি হারিয়ে গেছে ঐ ক্যাম্প থেকে। বয়স্ক এক ব্যক্তি বললেন, "রতনের দিদিরে ত ওরা টাইনা লইয়া গ্যাছে, পরে শুনছি যে রতনের দিদিরে কৈ জানি বিক্রি কইরা দিছে; আহা বড়! লক্ষ্মী আছিল মাইয়াটা।" উনি আরও বললেন ওখানকার অত্যাচারের কথা। তাঁদের চলে আসার কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, আমাদের উপরে যে কি ধরনের অত্যাচার হয়েছে তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। ঐ দেশের লোকেরা তো আমাদের মানুষ মনে করেনা। তাছাড়া আছে পুলিশের অত্যাচার। মেয়েদেরও ওরা রেহাই দেয়নি। একটি গর্ভবতী রমণী তো মারাই গেল পুলিশের অত্যাচারে। অন্যান অল্পবয়সী মেয়েদের ওরা বাধ্য করেছে দেহ বিক্রয় করতে। আমরা দেখেছি আমাদের মা-বোন-স্ত্রীর ওপরে কি অমানুষিক আচরণ করেছে পুলিশ এবং স্থানীয় লোকজন মিলিত ভাবে। প্রতিবাদ করার উপায় ছিলনা। প্রতিবাদ করলেই ক্যাশডোল বন্ধ হয়ে যেত, ক্যাম্প থেকে বার করে দেয়া হত। তবে সম্প্রতি চলে আসবার কারণ ক্যাম্প থেকে পঁয়ষট্টি মাইল দূরে এক জায়গাতে খাল কাটতে যাবার জন! সরকারী নির্দেশ এল—যেখানে যেতে হবে সেখানে থাকার জায়গা নেই এবং রোজ সেখান থেকে আসা অসম্ভব। আমরা যেতে অস্বীকার করি। ফলে অত্যাচার চরমে ওঠে। পুলিশ স্থানীয় লোক এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের অত্যাচারে বাধ্য হলাম আমরা মানা শিবির আগ করতে।

অত্যাচারিত কয়েকটি মহিলার সঙ্গেও কথা বলেছি। দেখলাম তাঁদেরই একজনের কোলে একটি ছ-বছরের মেয়েকে। মেয়েটির মা ঐ অত্যাচারের বলি, বেঁচে আছে কিনা কেউ জানেনা, যেদিন ওই জানোয়ারেরা ওর মাকে ধরে নিয়ে যায় তার পর আর ফিরে আসেনি ওর মা।

সকলেই একবাক্যে বললেন—মরতে যদি হয় তো বাংলাদেশের মাটিতেই মরব, তবুও ফিরে যাবনা আর মানাতে। ওখানে আমাদের ইজ্জত কেড়ে নেওয়া হয়। কোনমতেই আমরা যাব না।

কিন্তু ওরা জানেন না যে ওদের জোর করে মানা ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে। ষ্টেশান থেকে একদল আস্তানা গাড়তে গিয়েছিলো ব্রিগেড প্যারেড মাঠে, কিন্তু বাদ সেধেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পুলিশ দিয়ে ওদের ফেরৎ নিয়ে এসেছে হাওড়ায়। উদ্দেশ্য ফেরৎ পাঠানো। রাজ্যের মুখ্য সচিব মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টই বলেছেন যে, এরাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, নতুন করে কোন দায়িত্ব আর সরকার নেবেন না। কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সমিতির মতে মোট একচল্লিশ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে দশ লক্ষ এখন পুনর্বাসনের অপেক্ষায়। সেই দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মতানৈক্য চলছে।

রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দুজন অফিসারকে পাঠানো হচ্ছে মানা শিবির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। পুলিশ দিয়ে জোরকরে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে এবং টিকিট কাটতে বাধ্য করে এ জনস্রোত বন্ধ করা যাবে না। কেননা মানা প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের সাফ কথা কোন মতেই আর আমরা ফিরবনা। সরকার এদের দায়িত্ব অস্বীকার করছেন এই অজুহাতে যে এদের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছেন। কিন্তু এরা তো বাঙ্গালী উদ্বাস্তু, সুতরাং দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে কেন?

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়েও ওঁরা বিচলিত নন। ওদের হাবভাবে কথায় কার্তায় তাই বোঝা গেল। দেখলাম ওরা একে অপরের প্রতি কত সহানুভূতিশীল। খাবার যার কাছে যা ছিল সকলকে ভাগ করে খেতে দেখলাম।

মানা শিবিরের উদ্বাস্তুদের দোষ দিলেই শুদ্ধ হবে না। দায়িত্ব শিবির পরিচালকদেরও কম নয়। উদ্বাস্তুদের মুখেই শুনেছি, শিবির ত্যাগ করবার সময় এদের কোন বাধাই দেওয়া হয়নি।

বিভিন্ন প্রাপ্ত সংবাদে আরও জানা গেছে যে, মানা উদ্বাস্তু শিবির থেকে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন প্রতিরোধ করবার জন্য সমগ্র মানা উদ্বাস্তু শিবির পুলিশ বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল ও অন্যান্যদের। ওখানকার উদ্বাস্তু মহিলাদের অভিযোগ যে, পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সব উদ্বাস্তু স্পেশাল ট্রেনে করে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল তারা পথিমধ্যে জোর করে গাড়ি থেকে নেমে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সীমান্তবর্তী রেলষ্টেশনগুলিতে সতর্ক প্রহরা বসিয়েছে যাতে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে না আসতে পারেন।

মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল ব্যাঙ্কের নিয়ম ভাঙলেন। প্রশাসনের কাজে নবাবী চাল

(দর্পণের প্রতিনিধি)

মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীএস এন সিংহকে স্বর্গত জওহরলাল নেহরু সাগতভাবেই নবাব সাহেব বলতেন। শ্রীসিংহ মধ্যপ্রদেশকে তাঁর বিহারী জায়গীরের অংশ বিশেষ বলেই মনে করেন। না হলে এমন ঘটনা কি করে ঘটে যে, স্টেট ব্যাঙ্কের ভূপাল অফিসের লোকেরা রাজ্যপাল সিংহের আদেশে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে রাজভবনে জীপে করে উপস্থিত হল। রাজ্যপালের খুচরা নোট বেশি টাকার নোটে বদলে দেওয়ার জন্য, কারণ দুই লক্ষ দুই হাজার টাকার খুচরো নোট নাড়াচাড়া করতে কষ্টই অসুবিধা।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপি সি শেঠী অবশ্য বলেছেন যে, "ব্যক্তিগতভাবে সার্ভিস" দেওয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত। বিধানসভায় বিরোধীরা বহুবার দাবী তোলার পর মুখ্যমন্ত্রী এই বিবৃতি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য রাজ্যপাল ২০২,০০০ টাকাকে বদলে উচ্চ হারের নোটে রূপান্তরিত করেছেন? এবং এই পরিবর্তন করা হয়েছে ষোলই জানুয়ারী (বিরানব্বই হাজার টাকা) ও আটই ফেব্রুয়ারী (এক লক্ষ দশ হাজার টাকা)। ব্যাঙ্কের নিয়মিত কার্যকালের আগে স্ট্রং রুম খোলা হয়েছে বলে তিনি অস্বীকার করেন। বা কারণ কি? জানা গেছে স্টেট ব্যাঙ্কের যেসব কর্মচারী এই সম্পর্কে সামান্যও আভাস পেয়েছিলেন এবং বলেন যে, "ব্যাঙ্কের কার্যকালের" মধ্যে কাজটি সমাধা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী একথা স্বীকার করেন যে, কাউন্টারে গিয়ে নোট বদলানোর সাধারণ নিয়ম এক্ষেত্রে লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং জীপে করে রাজভবনে সমস্ত নোট নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শ্রীসিংহ সুগন্ধ ভালবাসেন এবং তোষামোদকারীও। তিনি কিছু কিছু কাগজের লোকদের ব্রিফিংয়ের জন্য ডেকে বলেন তিনি চিরকালই পয়সাওলা লোক এবং এককালে জমিদার ছিলেন। যখন তিনি মন্ত্রী নন তখনও তিনি একটি সুন্দর বাইক চড়াতেন। নোট বদলানোর ব্যাপার সম্পর্কে তিনি বলেন কিছু শেয়ার বেচে তিনি দেশে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর নাতি কোন এক শিল্পোদ্যোগে টাকা বিনিয়োগ করবে বলে।

কিন্তু বোকা লোকেরা স্বভাবতই কিছু প্রশ্ন করতে পারে। কোন কোম্পানী শেয়ারের দু লক্ষ টাকা খুচরো নোটে দিয়েছে? এবং তাঁর নাতি কেন নগদ টাকা দিচ্ছে? শ্রীসিংহ বিহারের যে অঞ্চলের লোক সেটা অনুন্নত অঞ্চল হলেও সেখানে কয়েকটি বিশ্বস্ত ব্যাঙ্ক আছে। ব্যাপারটা এমনভাবে গোপন রাখারই ব্যাঙ্কের যেসব কর্মচারী এই সম্পর্কে সামান্যও আভাস পেয়েছিলেন তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে তারা কোথাও মুখ না খোলেন।

এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিয়মও ভঙ্গ করা হয়েছিল। এক নম্বর, সশস্ত্র প্রহরা ছাড়াই টাকা রাজভবনে পাঠানো হয়েছিল; দুই নম্বর, টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাঙ্কের রেজিস্টারে লেখা হয়নি; রাজভবন থেকে খুচরো নোট নিয়ে আসার পরই রেজিস্টারে লেখা হয়েছে। তার মানে ব্যাঙ্কের এক বিপুল পরিমাণ টাকা কয়েক ঘন্টার জন্য হিসেবের বাইরে ছিল।

জানা গেছে যে, স্টেট ব্যাঙ্কের হেড অফিস থেকে ব্যাঙ্কের ভূপাল অফিসকে ভবিষ্যতে এই ধরণের সার্ভিস দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

এই কেলেঙ্কারীর কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়েছে এমন এক সময়ে যখন ন্যাশানাল হেরাল্ড জনৈক ভি আই পির বিরুদ্ধে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছে। চব্বিশে ফেব্রুয়ারী এই কংগ্রেসী দৈনিকটিতে প্রকাশিত হয়েছে যে, জনৈক ভি আই পি কয়েক কোটি টাকার কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্পের কন্ট্রাক্ট দুটি প্রাইভেট কোম্পানীকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এই দুটি কোম্পানীর পূর্ববর্তী রেকর্ডই শুধু খারাপ তাই নয়, এদের টেন্ডার সবচেয়ে কম টাকারও নয়। এই হস্তক্ষেপের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি দীর্ঘকাল ধরে বিলম্বিত রয়েছে, যার ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থের অপচয় ঘটছে। অফিসাররা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা যখন চাপের কাছে নতিস্বীকারে অস্বীকৃত হন তখন উক্ত ভি আই পি অফিসারদের কটূক্তি এবং মন্ত্রীদের ভীতিপ্রদর্শন করেন।

যদিও ন্যাশনাল হেরাল্ড এই ভি আই পির নাম উল্লেখ করে নি, তবু ভূপালের সকলেই জানে ইনি রাজ্যপাল শ্রীএস এন সিংহ। সংবাদটি কাগজে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল হেরাল্ডের ভূপাল প্রতিনিধিকে রাজভবনে ডেকে পাঠিয়ে রাজ্যপাল হুমকী দেন, তিনি ব্যাপারটি এডিটর চলাপতি রাও এবং ম্যানেজিং এডিটর ইউ এস দীক্ষিতকে বলবেন। রাজ্যপাল প্রথমে প্রেস কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ করতে চেয়েছিলেন। পরে মত বদলে তিনি বলেন, "প্রেস কাউন্সিলের হাতে অনেক কাজ। এখনও ভাগির্সের মামলা চলছে।" পরে তিনি তিনজনের এক কমিশন গঠন করে সাংবাদিক অশোভনতার অভিযোগের বিচার করবেন বলেছিলেন। কিন্তু কোন ক্ষমতাবলে তিনি একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে "কমিশন" গঠন করবেন সেকথা পরিষ্কার করেন নি।

এই প্রথম রাজ্যপাল সংবাদপত্রের ওপর খড়্গহস্ত হন নি। তিনি সমালোচনা সম্পর্কে ভীষণ স্পর্শকাতর। গত বছর টাইমস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি তার রোষবহ্নির স্পর্শ পেয়েছিলেন। ব্যাপারটা অপরাধ কি? তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে অব্যবস্থা ও দৈনন্দিন কাজে অকারণ হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছিলেন।

রাজ্যপাল শ্রীসিংহ এক ধরণের ডি ফ্যাক্টো মুখ্যমন্ত্রী। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনিই নিয়ে থাকেন। তিনি সরকারী অফিসারদের টেলিফোনে বলে দেন কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়।

রাজ্যপালের সবচেয়ে হাস্যকর কাজ হল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বিভাগের একজন সাধারণ কর্মীর দুটি ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া। কারণ কি? এই কর্মচারীটি নিজের অধিকারবলেই একজন লেখক এবং পরবর্তীকালে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত। এর এত বড় স্পর্ধা সমকালীন হিন্দী কবিতা সম্পর্কে রাজ্যপালের মতামতের ইনি সমালোচনা করেন।

লজ্জাহীনার রাজ্যপাট

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় সম্প্রচারিত হবার পর বিরোধীদের নিরবচ্ছিন্ন পদত্যাগের দাবী ছাড়াও শ্রীমতী ইন্দিরাকে কিছু সাংবাদিক এবং তাঁর উচ্ছিষ্টভোজী কিছু ভক্ত পাকেচক্রে সাময়িকভাবে পদত্যাগের সদুপদেশ দিয়ে চলেছেন। কিন্তু অধিকার বিচ্যুত দুর্নীতিবাজ বিরোধীদের সমর্থন করে নৈতিক অধিকার বিচ্যুত দুর্নীতিবাজ প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী তুলতে তারা রাজী নয়। এঁরা প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা সংরক্ষণের ভাড়াটে বাহিনী। কিন্তু এই সদুপদেশ বর্ষণকারীদের মগজে একটা কথা কিছুতেই ঢুকছেনা যে শ্রীমতীর অবিলম্বে পদত্যাগ তার আরো বিপদ ডেকে আনবে।

এলাহাবাদের রায়ের পরে সারা দেশের মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি যেভাবে কালিমালিপ্ত হয়েছে তা তাঁর এই দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রিত্বের জমানায় জমে ওঠা পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির তুলনায় তা খুবই সামান্য। তবে এই ঘটনাটি অসামান্য এই কারণে, তাঁর নিজের স্বার্থে স্ব-আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিচারালয় তাকেই দুর্নীতির অভিযোগে গদি থেকে ঘৃণার সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। এই অভাবনীয় সিদ্ধান্ত দেশের তাবৎ মানুষের মধ্যে আলোড়ন এনেছে। কিন্তু মারুতি, নাগরওয়ালা, এল এন মিশ্র হত্যা এবং কালোবাজারী বাদশাদের সঙ্গে তার মহব্বতের ঘটনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অজস্র জিজ্ঞাসা বাসা বেঁধেছে তার উত্তর খুঁজতে গেলেও প্রধানমন্ত্রী কতটা রেহাই পাবেন সন্দেহ। এই সন্দেহকে আরও স্পষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে প্রধানমন্ত্রী রাজী নন। আজ যদি নির্লজ্জের মতো গদি আঁকড়ে না থেকে সাময়িকভাবেও তিনি সরে দাঁড়ান, তাহলে প্রধানমন্ত্রীর স্বদলীয় রাজনৈতিক অরাজকতার দৌলতে তার বহুমুখী দুর্নীতির রহস্য ভেদ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ হতে পারে। এই গায়ের জোরে চাপা দেওয়া রহস্য উদ্ঘাটনে বিরোধীরা পাছে আরো তৎপর হয়, সেই কারণে ইন্দিরার এই মুহূর্তেও আইনের দোহাই দিয়ে গদি আঁকড়ে থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

সুপ্রীম কোর্টে সোসালিস্ট নেতা রাজনারায়ণের সঙ্গে ইন্দিরার যে "আইনী যুদ্ধের" প্রস্তুতি চলছে তার ফয়সালা হতে কমপক্ষে ছয়মাস সময় লাগবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কিন্তু ছয়মাস সময়টা কি ইন্দিরার মতো দুর্নীতিবাজ মহিলার পক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব। তার ওপর সারা দেশ জুড়ে দলীয় কোঁদল যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে তাতে এই ছয়মাসে রাজনীতির হাওয়া, সাংগঠনিক চেহারা কিরূপ নেবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আজ যারা ইন্দিরার বাসভবনের সামনে আস্থাজ্ঞাপনের মহড়া দিচ্ছেন; দলীয় ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরও সকলের অবস্থান এক রকম নয়। এদের মধ্যে কেউ একবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া তুললে ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রিত্বতো দূরের কথা তার পূর্বকৃত অজস্র পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার রাস্তা থাকবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং পদত্যাগ কোন মতেই নয়।

বিহারে গফুরের পদত্যাগের দাবীর প্রশ্নে, গুজরাটে মোরারজী দেশাইয়ের নির্বাচনের দাবীর প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী দুবেলা বলেছেন ঐ দাবীর কাছে নতি স্বীকার করলে আমার পদত্যাগ করাই শ্রেয়; সে হেন ভদ্রমহিলা যখন আদালত থেকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা পাবার পরও পদত্যাগে রাজী নন, বরং দীর্ঘকাল দেশের স্বার্থে (নাকি সর্বনাশের জন্য?) জনগণের দাসীবৃত্তি করতে আগ্রহী, তখন বুঝতে হবে তার আরও কিছু অপকর্ম বাকী রয়েছে, যা শেষ না করে তিনি নড়ছেন না। তবুও ইন্দিরার অপকর্ম এবং দুর্নীতি যে পর্যন্ত পৌঁছেছে তার নথিপত্র রাজধানীর মাটিতে কবরস্থ তার পিতার টাইম ক্যাপসুলের পাশেও বেমালান একথা সবাই স্বীকার করবেন।

অনিকেত চৌধুরী

মতামত

শিক্ষকদের বেতন বিভ্রাট

বর্তমানে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে শুনতে পাই। কিন্তু শিক্ষাদান কার্যে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সুস্থ দেহ মন না থাকলে সুশিক্ষার শিক্ষাদান কোনদিনও সম্ভবপর কি? এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত বেতন দানের নিশ্চয়তা। সরকার এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে শিক্ষার প্রসার সম্ভব নয়, শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালনও সম্ভব নয়। আর্থিক চিন্তার মধ্যে শিক্ষাদান একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

একটু চেষ্টা করলেই মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের বেতন সরকার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রদান করতে পারেন—প্রয়োজন শুধু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ত্যাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একান্তর সাল পর্যন্ত যে সব মাধ্যমিক স্কুল অনুমোদন করেছেন, সেই সব স্কুলের ক্ষেত্রে সাধারি ডেফিসিট স্কীম চালু করেছেন। ছাত্র প্রদত্ত বেতন বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকার সবটাই সরকার দেন। কিন্তু অনিয়মিত ও বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে সারা বছরের কোন স্কুলের বেতন দিতে যা খরচ হয় তার নব্বুই শতাংশ সরকার গ্রান্ট হিসাবে দেন। একটু সামান্য বেশী দায়িত্ব নিলেই সরকার নিজ তত্ত্বাবধানে সরকারী কর্মচারীদের মত মাস পয়লা বেতন দিতে পারবেন। ছাত্র প্রদত্ত বেতন সরকারী তহবিলে জমা দেওয়ার নির্দেশ স্কুলগুলিকে দিতে হবে—অবশ্য আর্থিক বছরের মধ্যে। যে সব ছাত্রদের বেতন তিন মাসের বেশি বাকি থাকবে তাদের নাম বাদ দিতে হবে, নতুবা তাদের বেতনও সরকারকে দিতে হবে।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সরকার নিজ দায়িত্বে সরকারী কর্মচারীদের মত নিয়মিত বেতন দিতে পারবেন। এতে স্কুল তহবিল তছরূপের সম্ভাবনা থাকবে না। নিয়মিত বেতন পেলে মন প্রাণ দিয়ে শিক্ষকরা পড়াতে পারবেন, শিক্ষার প্রসার ঘটবে ও শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা পাবে।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কেও সামান্য কথা ভেবে দেখা দরকার। দেড়শো দুশো টাকার সরকারী কর্মীদের যদি বদলির ব্যবস্থা থাকে তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষকদেরও বদলীর ব্যবস্থা কেন থাকতে পারে না? নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হলে এ বিষয়ে কারো আপত্তি থাকবেই বা কেন?

উপযুক্ত শিক্ষক যাতে নিযুক্ত হতে পারেন তার ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রয়োজন। বর্তমানে স্থানীয় লোকের অজুহাতে সার্টিফিকেটের গুণসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের স্থান হচ্ছে না। এ বিষয়ে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে—শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, গ্রামা দলাদলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কুপ্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

সরকার যদি জরুরী ভিত্তিতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই সামান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা হলে তাঁরা শিক্ষক সমাজে প্রশংসা পাবেন, শিক্ষার প্রসার ঘটবে। বর্তমান কাঠামোতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব।

তপন সান্যাল

জেলবদলীর ষড়যন্ত্র

গত বারই জুন বেলা দুটো নাগাদ প্রেসিডেন্সী জেলে আটক (মিসা) রাজনৈতিক বন্দী পূর্ণেন্দু-শেখর মুখার্জীকে জেল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ "অফিস কল" বলে জেল গেটে ডেকে নিয়ে যায় এবং তাঁকে বলপূর্বক হাতকড়া পরিয়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে দমদম জেলে বদলি করার চক্রান্তকে কার্যকরী করতে যায়। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই চতুর্থ ট্রাইব্যুনালের রাজনৈতিক বন্দীরা কোর্ট থেকে ফিরে জেল গেটে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের এবং এই জেলে আটক অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সমবেত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক বন্দীদের শাস্তিমূলক জেল বদলির চক্রান্তকে সাময়িকভাবে বাতিল করতে বাধ্য হয়।

গত বছর যে সমস্ত দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা লাগাতার অনশন ধর্মঘট করেছিলেন, তার অন্যতম একটি দাবী ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের তাদের পছন্দমত জেলে রাখতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই জেল ট্রান্সফার চলবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম সদস্য কোয়ারমন্ত্রী জ্ঞানসিং সোহনপাল এই দাবী মেনে নেন। অথচ বাস্তবে আমরা দেখেছি, এই "ভদ্রলোকের চুক্তি"কে প্রতিমুহূর্তে কর্তৃপক্ষ দুপায়ে মাড়িয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন জেলের রাজবন্দীদের বলপূর্বক কুখ্যাত বহরমপুর স্পেশাল জেলে পাঠান, ঐ একই কারণে বর্ধমান প্রভৃতি জেলে ডাণ্ডাবাড়ি মাত্র কিছুদিন আগে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের তিনজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজবন্দীকে ঐ একই অন্ধকূপে প্রেরণ এবং সর্বশেষ গত বারই জুনের ঘটনা এটাই প্রমাণ করছে, যে চার দেওয়ালের ভেতর কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নিপীড়নের জন কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রত্যঙ্গই সদা সক্রিয়। এটা সর্বজনবিদিত, যে বিভিন্ন জেলের প্রাঙ্গণ অনবরত রাজবন্দীদের রক্তে রঞ্জিত করাটা এই সরকারের একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা একথা ভুলিনি যে, অতি সম্প্রতি বিভিন্ন জেল থেকে নির্দিষ্ট কয়েকজন রাজবন্দীকে হাওড়া জেলে নিয়ে গিয়ে তাঁদের পূর্বপরিকল্পনামাফিক হিটলারী কায়দায় হত্যা করা হয়েছে। বর্তমানে দমদম জেলকে কি আরেকটি হাওড়া জেল বানানোর চেষ্টা চলছে?

কলকাতার বাসিন্দা যে কোন ব্যক্তির প্রতি মিসা আইন প্রযুক্ত হলে তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রাখাই সরকারী আদেশ। সরকার তার স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ অবিচ্ছিন্নভাবে চালানোর স্বার্থে, এমনকি তার নিজের প্রদত্ত আদেশ নিজেই ভাঙছে।

আমরা প্রেসিডেন্সী জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা শাস্তিমূলক জবরদস্তি জেলবদলির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে আরও জানাচ্ছি যে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা কোনক্রমেই বরদাস্ত করব না এবং দমন পীড়ন অব্যাহত থাকলে আমাদের লাগাতার লড়াইয়ে নামা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর থাকবে না।

প্রেসিডেন্সী জেলের রাজবন্দীরা

বঙ্গবন্ধুর বঙ্গনিষ্পেষণ

সম্প্রতি এক সরকারী আদেশে বাংলাদেশের বে-সরকারী সব দৈনিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র তুলে দেওয়া হল। বাংলা দৈনিক "দৈনিক বাংলা" এবং ইংরেজী "বাংলাদেশ অবজারভার" এতকাল সরকারের তাঁবেদার হয়েই কাজ করছিল। সেই সঙ্গে "ইত্তেফাক" এবং "বাংলাদেশ টাইমস"ও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা হল। গত চব্বিশে জানুয়ারী বাংলাদেশে "দ্বিতীয় বিপ্লবের" মাধ্যমে মুজিবুর রহমানের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর এই তাঁর আরেকটী উল্লেখযোগ্য কীর্তি। মানুষ এখন শুধু প্রতিদিন সংবাদপত্রে সরকারের সুললিত বাণী আর প্রতিশ্রুতি গিলবে। তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলবার জন্য দ্বিতীয় আর কোন মাধ্যম রইল না। এছাড়া সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য যে ঢাকা বেতারকেন্দ্র, তা সরকারী প্রচারযন্ত্রেরই নামান্তর। অন্যদিকে মুজিবের স্বনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন দলের অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর একনায়কত্বে বঙ্গ নিষ্পেষণের ষোলকলা পূর্ণ হতে চলেছে।

সরকার বিরোধী সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়ার ফলে দেশের মানুষ এখন গভীর অন্ধকারে থাকবে। সরকারের মনঃপূত হবে না এমন কোন সংবাদ তাদের কাছে আর পৌঁছুবে না। গোটা দেশে এখন ভয় ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব আরও তীব্র হবে। বাংলাদেশে মুজিব কর্তৃত্ব গ্রহণের পর থেকে প্রশাসক হিসেবে যে এই ভদ্রলোক কতখানি অযোগ্য এবং অপদার্থ তার প্রমাণ দিয়েছেন বহুবার। প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাষ্ট্রপতি হওয়া, আবার রাষ্ট্রপতিত্ব ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। বিরোধী কণ্ঠ বন্ধ করবার জন্য নিজ দলের গুণ্ডাবাহিনী এবং পুলিশ দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি, বিরোধী পত্রিকার সম্পাদকসহ (গণকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক আলতাফ মাহমুদ) বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মী গ্রেপ্তার করেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না বলেই তার "দ্বিতীয় বিপ্লবের" প্রয়োজন হল। দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে এককভাবে বিপ্লব সম্পন্ন করার এমন বিচিত্র দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

বিরোধী সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ সাহেব বলেছেন ঃ দেশে সুস্থ সাংবাদিকতার স্বার্থেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভাবটা এই রকম, পৃথিবীতে যে দেশেই বিরোধী সংবাদপত্র রয়েছে, সেখানকার প্রশাসক এবং সাংবাদিকরা যেন অসুস্থ। কোন স্বার্থান্বেষী মূর্খ ছাড়া এ যুক্তি অচল। একসঙ্গে এতগুলি সাংবাদিককে অকেজো এবং কর্মহীন করে দেওয়া মুজিবের মতো ক্ষমতালিপসু একনায়কের পক্ষেই সম্ভব। এখন প্রশাসনিক স্বার্থে যত খুন জখম হত্যা, গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটবে, সরকারী দুর্নীতি চুরি জোচ্চুরির ঘটনা যত ঘটবে তার কোন খবরই দেশের মানুষ জানতে পারবে না। স্বাধীনতার চার বছর অতিক্রম না করতেই দেশে এই অবস্থা।

শুভময় গুপ্ত

শরৎ চাটুজ্যের বেতের লাঠি ও চটি জুতো (২)

বীরেন চক্রবর্ত্তী

'I think attainment of Swaraj an be only helped by soldiers nd not by spiders' . . . . .

···এই কথন-কৃপাণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। একই বক্তৃতা মঞ্চে সে মুখের উপরে বলেছিলেন মাহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে। তখন ান্ধীজী ছিলেন এমন এক রূপক য়ক যাঁর আঙুল হেলনে নাকি রতীয় গণসমুদ্রে লহরি উঠতো। 'লহরে' ওঠা উক্তি গান্ধী- ই! তা এহেন নেতার মুখের রে চরকায় সুতোকাটা নিয়ে ব্যঙ্গ রার হিম্মৎ সাহসী লোকের পক্ষেই ম্ভব। তার উপরে শরৎচন্দ্র নিজেই ন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের াপতি।

তাই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যাবতীয় চারের গোড়াতেই গেড়ে বসলো াজামিল। যারা গোঁড়া গান্ধী- দীর দল তাদের মনে ধাক্কা লাগা- ই কথা। সেইজন্যে শরৎ প্রসঙ্গ লেই স্বাধীনতা আন্দোলনে কম্প- ারী ধনীর দুলালেরা পাড়া- নসিকতায় টইটুম্বুর লেখ- জাদুলভ সহিংস বল্লমের ার মতো উক্তিকে পাশ কাটিয়ে লো। আবার আরেক দিকে ভববাদী বামপন্থী বিপ্লবীরাও রৎচন্দ্র সম্বন্ধে গান্ধীপন্থী জমিদার ষ্ঠীর অলীক প্রচারে পরোক্ষে তি জানিয়ে ফেললো অজান্তেই। ক নম্বর, সত্যিই তো শরৎবাবু স্বয়ং গ্রেসের লোক। দুই নম্বর, ঈশ্বর- ইত্যাদি অর্থে চাটুজ্যে মশাই ববাদী লোক। জমিদাররা মুচকি নলো। প্রচার কাজে লেগেছে। ই লেখক হলেন একঘরে।

অস্বীকার করে লাভ নেই শরৎ- ংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ং লেখক হিসাবেও ভাববাদের ান্তরিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ই অজুহাতে আমরা কি এক ঘরে রে রাখবো তাঁকে? তলস্তয় তো ই, এমন কি গর্কি অথবা লু সুনও রাপুরি ভাববাদের আগ্রাসী ছক কে বেরিয়ে আসতে পারেন নি নেক সময়ে। অথচ মহান লেনিন লস্তয় এবং গর্কিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে হণ করেছিলেন একটাই কারণে। হলো এই মহৎ শিল্পীরা গণ- বনেরই ঘোষক। আর লু সুন? ৮-১০ ৩৯ তারিখে লু সুনের প্রথম র্ষিকী অনুষ্ঠানে যাও সে তুং ভাষণ দিয়েছিলেন তারই দু এক গা সামান্য উল্লেখ করছি।

"···লু সুন কমুনিস্ট পার্টির লোক হলেও তাঁর ভাবনা, কর্মপদ্ধতি এবং লেখনী ছিল মার্কসবাদের স্বপক্ষে। ···লু সুন সামন্ততান্ত্রিক পরিবারেরই বংশধর। কিন্তু তিনি জেনেছিলেন কি করে এই দুর্গন্ধযুক্ত পচা সমাজ এবং অসৎ সাম্রাজ্যবাদী ধারকদের বিপক্ষে লড়াই করে নস্যাৎ করতে হয়।···তমাচ্ছন্ন সমাজের রূপ বর্ণনায় সুতীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে কলমকে তিনি ব্যবহার করেছেন।···বাস্তবিকই তিনি সুদক্ষ রূপকার। জীবনের শেষদিন অবধি সর্বহারা ও জাতীয় মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করেছেন।···আমার দৃষ্টিতে লু সুন আধুনিক চীনের ঋষি"

জহরি জহর চেনে। মহৎ লোকই অপরের মহত্বকে স্বীকার করতে পারেন। অক্ষমেরা টিটকারি দেয়। আজ অবধি বাঙালী ডক্টরেট হ্যাংলার দল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে যত কাগজের বাজে বিনষ্ট করেছে এবং বাক্যব্যয়ের ব্যবসা ফেঁদেছে তার অধিকাংশই মিথ্যা। তাঁকে বিচার করতে গেলে ওই সব বানানো তথ্যের উপরে নির্ভর না করে লেখকের জীবন প্রণালী এবং লেখাই বিচার্য। অনেক ভুলের অবসান ঘটবে। ত্রুটি শরৎচন্দ্রের নিশ্চয়ই ছিল, তবে সামগ্রিক ভাবে সেই ত্রুটির পঙ্কের উপরে পঙ্কজই পরিলক্ষিত হয়। নায়েবদের কথায় কান দিয়ে এগোলে প্রজাদের বিভ্রান্তি আসতে পারে। তবে একথা সম্ভব বলা যায় যে গণ সৈনিকরাই মুক্তি আনে। 'আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না। তাকে জোর করে নেবালেও সে আশে-পাশের জিনিষ তাতিয়ে দিয়ে যায়।' 'পল্লীসমাজ'-এর বাক্য।

পল্লীসমাজ

পল্লীগ্রামের সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায় নানাবিধ মন্তব্য করেছেন নিরন্তর। বিভিন্ন আলোচনার অন্দর থেকে কয়েকটা মূল্যবান মিছরির টুকরো আহরণ করা অপরাধের না। সৌকর্যে টুকরোগুলো স্ফটিকবৎ অটুট আজ পর্যন্ত।

(ক) কলকাতা বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে ধারণা, 'সেখানে কে থাকতে পারে বল্। যেমনি ধোঁয়া তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়ি ঘোড়া চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস ত জানবি তোর বাপের পুণ্যি!' আজকের দিনে কলকাতাবাসীদের এই অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের।

(খ) পাড়াগাঁয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার যৎকিঞ্চিৎ জল্পান, 'চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না।···উপস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে যে তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই।···মাস্টার কহিল, রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার, পাই তের টাকা পোনর আনা···গভর্ণমেণ্টের হুকুম কিনা, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সব ইন্সপেক্টারবাবুকে দেখাতে হয়—নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

···খালের ওপারে পিরপুর গ্রাম।···এখানে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া···উপস্থিত হইল। এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে যদিও তাঁহারা···প্রজা, তথাচ তাহাদের ছেলেপুলেকে মুসলমান বলিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্তি হইতে দেওয়া হয় না।' ইত্যাকার ব্যবস্থা বর্তমান যুগেও গ্রাম ঘুরলে দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

(গ) কোর্ট কাছারী আদালতের আদল ব্যাখ্যায়, 'আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু সাক্ষী ফাঁদে পড়িল।···তাহার বাস্তুটা ক্রোক করিয়া নীলাম করিয়া লইয়াছে।···যথারীতি শমন বাহির হইয়াছে; কে তাহা ভৈরবের নাম দস্তখৎ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্বলের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে; অথচ সরকারের আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় সহজ নহে। আইন মত সমস্ত মিথ্যা ঋণ বিচারালয়ে গচ্ছিত না করিয়া কথাটি কহিবার জো নাই।···সুতরাং রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত মাথার উপরে, থাকিলেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে।' আইনের এই ফাঁকে ধনীরা গরীবদের উপরে কেমন ভাবে শোষন চালায় তা বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। আজও সৎ সাথীদের ফাঁদে পড়তে হয়, তাদের বাড়িতে হামলা চলে। পাড়ায় পাড়ায় ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে সাথীদের নির্যাতন পদ্ধতির কতটুকু রদবদল হয়েছে তা চিন্তনীয়। সরকারী আইন কি তবে বড়লোকের স্বার্থে? শরৎচন্দ্রের প্রশ্ন বহুদূর প্রসারিত।

(ঘ) আচমকা শ্রেণী সংগ্রামের বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রের উপরে প্রয়োগ করলে খটকা বাধতে পারে। মূল শিকড়ে হাত না দিলেও সন্ধানের যে চেষ্টা ছিল তার উদাহরণ, 'সমাজে যাকে ছোটজাত করে রাখা হয়েচে, সে যে বড়কে হিংসা করবে, এই ছোট হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে—সে ত খুব স্বাভাবিক।'

(ঙ) কৃষকদের মৌলিক সমস্যার সন্ধানের ফলাফল, 'প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অধিক; অনেকেরই এক ফোঁটা জমি জায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে, "জন" খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দুদিন কাজ না পাইলে কিম্বা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে।···শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অতি বৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়।' অবস্থার কতখানি পরিবর্তন হয়েছে তা প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য!

(চ) আমাদের অনেকের মনেই অসম্পৃক্ত ধারণা রয়েছে যে কৃষক মানেই সৎ, সহজ, সরল, উদারচেতা। পল্লীগ্রামের লোকেরাও বুঝি তাই। বাস্তবে ঘটনাটা সর্বাংশে সত্য না। শিক্ষিত নেতার বক্তৃতা শুনে যে চাষীদের মিছিল দলবদ্ধ ভাবে বি-ডি-ও অফিস অথবা থানা ঘেরাও করলো তাদেরই আবার কেউ কেউ হয়ত বটতলায় অমুক দেবতা বা দেবীর কাছে সন্ধ্যার পরে প্রার্থনা করে আসে সতীর্থ কারো ছেলেটাকে যেন সাপে কেটে খায়। অথবা মিছিলের সামিল অপর কারো নামে পরের দিন সদর আদালতে মামলা রুজু করে আসে। অথবা হয়ত এক ইঞ্চি আলের জমির একটু বেশি লাঙলের ফলা ডোবানোর জন্যে মাঠের মধ্যেই আলদখলের কুরুক্ষেত্র বাধায়। কার্ল মার্কস ব্যক্তিমানুষ এবং গোষ্ঠীমানুষের গ্রন্থি চমৎকার চিনেছিলেন। সর্বহারা শ্রেণীর লোকগুলোকে ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকে সৎ এমন ধরে নিলে ভুল হবে। গোষ্ঠীহিসাবে তাদের শ্রেণী চৈতন্যে সচেতন করে সংগ্রাম মুখরতার দিকে যেতে বলাই বৈপ্লবিক প্রথম কর্ম। কেন না ব্যক্তিগতভাবে তারা সর্বহারা; তাদের যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অসুস্থ রাখা হয়েছে শোষণের সুবিধার্থে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাখতে পারলে যে শোষকেরই মওকা···এই চেতনাই তো অনেকের নেই।

যে শরৎচন্দ্র চাষীদের হয়ে অত বলেছেন তিনিই আবার ব্যক্তি চাষীদের বিচার করছেন, 'ইহারা দরিদ্র, নিরুপায়, অল্প বুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু বজ্জাতি-বুদ্ধিতে ইহারা কম নহে। ধার করিয়া শোধ না দিবার প্রবৃত্তি ইহাদের যথেষ্ট এবং ফাঁকি দিতে জানে। প্রতিবেশীর স্ত্রী কন্যার সম্বন্ধে সৌন্দর্যচর্চার সখও মন্দ নাই। পুরুষের স্বাস্থ্যও অতিশয় দূষিত। সমাজ ইহাদিগের আছে—তাহার শাসনও কম নয়, কিন্তু পুলিশের সহিত চোরের যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিত ইহারা ঠিক সেই সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছে।'

এত দোষারোপ চাপিয়ে লেখক যা আবিষ্কার করলেন তা আশ্চর্যজনক, 'অথচ সর্বসমেত ইহারা এমন পীড়িত, এত দুর্বল, এমন নিঃস্ব যে রাগ করিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব।' প্রত্যেকটা শব্দচয়ন লক্ষ্য করার মতন। অর্থাৎ এরা পীড়িত, দুর্বল এবং নিঃস্ব বলেই কলুষিত পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। একেবারে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গভীরতায় পৌঁছে প্রকাণ্ড কাণ্ডটাকে নাড়া দিলেন। আজকের দিনের লেখকদের মতো শুধু দোষ উদ্ধার করেই গা ঢাকা দিলেন না, কিম্বা ব্যক্তি বিশ্লেষণ না করেই বিশুদ্ধ বলে ছাপ দিলেন না। রোগটাকে ধরলেন, এবং ওষুধও বাতলে দিলেন।

(ছ) আরোপিত নেতৃত্বের অপরাধ, ত্রুটি, অসাফল্য যে কতখানি তার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা অনেক সময়ে অনেকের ঝকমারি। সন্তর্পণে সৌষ্ঠব বাঁচানোর তাগিদে অনেক লেখকেরই প্রচেষ্টা। শরৎচন্দ্র ব্যতিক্রম। নেতা করে দেয়া আর

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাসিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা:
৬১, নট লেন, কলি-১৩

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকী

সর্বাণী গৌতম

প্রত্যেক দেশের আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই সে দেশের সমকালীন সাহিত্য সংস্কৃতির গতি নির্দেশ বিচার করা দরকার। বুর্জোয়া শাসিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আই সাহিত্য সংস্কৃতির দুইটি ধারা সমান্তরাল গতিতে বহমান। একটি ধারা পরিপুষ্ট করে শোষিত মানুষের স্বাধিকার অর্জনের রাজনৈতিক চেতনাকে, আর একটি ধারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে মেহনতী মানুষের প্রতিরোধী চেতনাকে বিপথগামী করে নৈরাশ হতাশা এবং নারকীয় উল্লাসের পঙ্ককুণ্ডে ডুবিয়ে দিতে। পরোক্ত ধারা শাসক এবং শোষক চক্রেরই লালিত সম্পদ।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, বাজারী সাহিত্য শিবিরের নামী দামীরা একদিকে যেমন নারী দেহের গোপন ভাঁজের সীমিত গন্ডীতে ঘোরা ফেরার মধ্য দিয়েই তাদের "মহৎ সাহিত্য" সৃষ্টি করে চলেছেন, পাশাপাশি তাঁরা এই দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গৌরবময় সুকৃতিকেও মসীলিপ্ত করে জনমনে সৃষ্টি করছেন এক রহস্যজনক প্রহেলিকা। জনৈক "সমরবিজয়ী" বসুকুলতিলকের সৃষ্ট চরিত্র ইন্দিরদা তার সম্প্রতিতম প্রমাণ। এদের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ করে কিছু লাভ নেই, কারণ সাংস্কৃতিক অপক্রিয়ার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গড়ে তোলার একমাত্র শর্ত হচ্ছে মেহনতী মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের পরিগন্ডী থেকে আহৃত সম্পদকে শিল্পায়িত করা। পশ্চিমবাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে এই প্রতিরোধী চেতনা রূপে রেখায় ও লেখায় কতখানি শক্তিশালী সে বিচারে যাবার আগে অতীব দুঃখের সাথেই স্বীকার করে নিতে হবে যে, একদা প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত অনেক সাহিত্যকর্মীও বর্তমানে বাজারী সমরবিজয়ীদের কুৎসিৎ যৌনাচারী জঘন্য ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন।

কিছুদিন আগে পাভলভ ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য সেমিনারে সি পি আই পন্থী লেখক শিল্পীরা সরাসরি সমর্থন করে গেলেন বাজারী লেখকদের নারীদেহে রতির অবাধ লুণ্ঠনের পাশবিক উল্লাস সমন্বিত সাহিত্যকৃতিকে(!)। সেমিনারে আলোচ্য বিষয় ছিল "বাংলা সাহিত্যে বিকৃতি—যুদ্ধ পূর্ব ও যুদ্ধোত্তর।" এই সভায় কমিউনিস্ট গোপাল হালদার মহাশয় স্পষ্টতই বলে গেলেন যে, কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস দিয়ে নাকি কোন সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম বিচার্য নয়। তার মতে, সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি হচ্ছে জীবনের উপস্থিতি আছে কি নাই তার বিচার করা। কিন্তু, বুর্জোয়া সমাজে "জীবন" বলতে যে মেহনতী মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামকেই বুঝায় হালদার মশায় কিন্তু সেই মন্তব্যে যানান কারণ অহলে যে তার দলীয় রাজনীতিরই বিরোধিতা করতে হয়। গোপালবাবু হয়তো বর্তমানে কার্ল মার্কসের বিখ্যাত উক্তিটি সযত্নে পরিহার করেছেন। উক্তিটি হল,—

"Art is always and every where the secret confession and at the same time the immortal movement of its itme."

এই আলোচনাসভায় এই বাংলার প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ সুধী প্রধান মহাশয় যখন তারাশঙ্কর সহ অনেকের নামোল্লেখ করে সাহিত্যে বিকৃতি প্রসঙ্গটিকে পুংখানুপুংখ রূপে বিশ্লেষণ করছিলেন তখন তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হয়। সৌজন্যের খাতিরে বাধ্য হয়ে সুধীবাবুকে অনিচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত টেনে নিজস্ব বক্তব্য শেষ করতে হয়। অথচ এই সভাতেই সি পি আই পন্থী দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় বলে গেলেন যে, "বিবর" হচ্ছে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য জগতের একটি মাইলস্টোন। দীপেনবাবুর মতে "শ্রেণী সংগ্রাম," "বিপ্লব" ইত্যাদি শব্দগুলো সাহিত্যে খুবই মামুলী কথা। তাঁর মতে, দেশের বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠী "বিবর" জাতীয় সাহিত্যের অনুরাগী। তিনি এমনও বলেন যে, যুক্তফ্রন্টের আমলোতো প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার বিক্রী পড়েনি অথচ দেশ ইত্যাদির প্রচার নাকি দারুণ বেড়ে গেছে। প্রসঙ্গত তিনি "পরিচয়" পত্রিকার বিক্রী কমে যাওয়ার উল্লেখ করেন। দীপেনবাবুর সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেতো বলতে হয়, যে, যেহেতু এই রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মাণিকের চেয়েও বিক্রীর মাপকাঠিতে মোহন সিরিজের শশধর দত্ত কিংবা একালের আবধূত, নীহার গুপ্ত প্রমুখরা অনেক অগ্রগামী সেইহেতু পরবর্তীরাই বাংলা সাহিত্যের আসল মুখপাত্র। কিংবা, যেহেতু এই রাজ্যে বাহাত্তর সালের পর থেকে নারীর ইজ্জত ধূলায় অবলুন্ঠিত এবং এই নারীধর্ষণ কারীরাই দীপেনবাবুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগী এবং পুলিশী প্রহরায় তারাই বলবান সেই হেতু এই রাজ্যে নারীর ইজ্জতও খুবই অপ্রাসঙ্গিক দাবী। কারণ নারীমেধের পুরোহিতদেরইতো বর্তমানে রাজত্ব। আসলে দীপেনবাবুরা এখন পুতুলবৎ কাজ করে যান। তাই, ওরা এখন করুণারই পাত্র।

নাটক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে "মহাবিপ্লবী" নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়লের মত বলে গেলেন যে, কোন নাটকই নাকি রচিত হচ্ছেনা। তিনি আরও শুনিয়ে গেলেন যে, নাট্যকার এবং নাট্যকর্মীরা নাকি তাঁর হাত থেকে পুরস্কার পাবার জন' উদগ্রীব হয়ে থাকেন। আত্মপ্রচারকারী এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিও অবশ্যই করুণার পাত্র। ইনি দেখেও দেখেন না যে, প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন এক ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই সরকার আজ হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই নাট্য আন্দোলনের ওপর। নাটক সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রেও নির্মল দাহা, চিররঞ্জন দাস প্রমুখদের বাধা দেওয়া হয়েছে সময়ের অজুহাত দেখিয়ে। কিন্তু, ডাঃ অজিত ঘোষ মহাশয় সভাপতিত্বের সুযোগ নিয়ে বলে গেলেন ছেচল্লিশ মিনিট এবং নান্দীমুখেই বলে নিলেন যে, তিনি পাভলভ সম্পর্কে কিছুই জানেননা। তিনি বস্তাপচা কিছু ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আউরে গেলেন।

এতকথা বলার পর যে কথাটা আমি বিশেষ করে তুলে ধরতে চাই তা হচ্ছে এই যে, এই শহরের গণসংস্কৃতি আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে পরিচিত কেউ কেউ ঐ আলোচনা সভায় এই দুষ্কৃতির কোন প্রতিবাদ করেননি। প্রসংগত ডঃ সরোজ মোহন মিত্রের কথা বলা যায়। অবশ্য, সরোজবাবুর প্রগতিশীলতা আমার কাছে আগাগোড়াই দুর্বোধ্য। একই কলমে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বনফুলের জয়গান করেও তিনি নাকি একজন বাঘা বিপ্লবী সাহিত্য সমালোচক। মিত্র মশায় অনেক লেখকের রচিত জীবনী গ্রন্থকেও অনায়াসে ছোট গল্প বলে চালিয়ে দেন। ভাদুগোনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে ঐতিহাসিক দলিল বলে লিপিবদ্ধ করেন। তার সম্প্রতিতম বিপ্লব হচ্ছে শরৎচন্দ্রকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া। এতদ্ সত্ত্বেও তিনি যখন যে কোন কারণেই হোক এই রাজ্যের বলিষ্ঠতম রাজনৈতিক মতসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর একজন বলেই পরিচিত তিনি কেমন করে সুধীবাবুর ওপর পূর্ববর্ণিত অন্যায় হস্তক্ষেপকে হজম করে গেলেন? তরুণ লেখক তপোবিজয় ঘোষইবা কেন সেদিন এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন নি? আজকের সংস্কৃতি আন্দোলনে এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গা বাঁচিয়ে প্রগতিশীলতার মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁকিটা লোকলোচনে ক্রমেই বড্ড বেশী করে ধরা পড়ছে। যে রাজনীতির জন্য জীবন দিলেন অসংখ্য ছেলেমেয়ে, সেই রাজনীতির বুলি কপচিয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নাম করে কেউ কেউ দু-কূলই রক্ষা করবেন—এ অবস্থা আর চলতে পারে না। চলতে দেওয়া যায় না।

মুর্শিদাবাদে বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলন

জিয়াগঞ্জ ঃ পনেরোই জুন বিকেল ছয়টায় মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে দুগড়া ভবনে স্থানীয় ছাত্র যুবক শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের বিষয় ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নির্মলকুমার মজুমদার। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল উৎস কি, এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা কাদের ছিল, ভারতীয় সংবিধানে এর কতটুকু মূল্য দেওয়া হয়েছে, সম্প্রতি এই অধিকার খর্বিত হচ্ছে কিনা এবং চলতি ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ফাসিবাদের দিকে ঝুকছে কিনা—এসব ব্যাখ্যা করে সম্মেলনে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা। উক্ত বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে বক্তৃতা দেন অধ্যক্ষ শ্রীমৃণালকান্তি দত্ত, শ্রীদুর্গাপদ সিংহ, শ্রীশৈলেন অধিকারী, অধ্যাপক শ্রীকানাই গোস্বামী ও শ্রীপ্রদীপ নন্দী। স্থানীয় মহিলা সংস্কৃতি সংঘ কর্তৃক দুখানি সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার উদ্বোধন হয়। প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এই কনভিনশনে আহ্বায়ক ছিলেন শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা ও শ্রীদীপ্তিকুমার মজুমদার। ইতিপূর্বে জিয়াগঞ্জ শহরে এই জাতীয় কনভেনসন হয়নি।

শরৎচন্দ্র

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

নেতা হয়ে ওঠার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। সে সব আলোচনার অভ্যন্তরে না প্রবেশ করেও কেন্দ্রাভিগ স্থান নির্দিষ্ট থাকে। যেমন সহর থেকে বৈপ্লবিক আদর্শে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত হয়ে গ্রাম্য জীবনের নেতৃত্ব দিতে গেলে অনভিজ্ঞতা সুলভ নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য। সেই কারণে রমেশ চরিত্র সংস্কারক হয়েও পলায়মান প্রথম দিকটায়। ওতপ্রোত গণজীবনের অভিজ্ঞতা নেই বলেই তার এই ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি মনস্কাম। এই যুগেও প্রচণ্ড বৈপ্লবিক সত্তার উত্তরাধিকার পেয়েও অজস্র করে দেয়া নেতার গ্রাস ছেড়ে পালিয়ে আসার অসারতার অভাব হবে না। রমেশকেও শরৎচন্দ্র ছেড়ে কথা বলেন নি। আদর্শের বুলি আওড়ালেই হয় না। গ্রাম্য —অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞায় গড়ে উঠে তাদের কথাকেই ক্রমোৎকর্ষনের মাধ্যমে বৈপ্লবিক আদর্শের রসায়ণে গণজীবনে ফিরিয়ে দিলেই নেতা হয়ে ওঠা। তখন তারা আপনজন মনে করে। রমেশ যখন পলায়নী মনোবৃত্তি ত্যাগ করে সমস্যার ভিতর থেকে নিজের উত্তরণ ঘটার তখনই অপরের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'তুমি দূরে থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা বিঘ্ন পেয়েচ। আমরা নিজেদের দুর্গতির ভাবে তোমাকে নাবিয়ে এনে এখন ঠিক জায়গাটিতেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েচি।...তখন তুমি গ্রাম্য সমাজের অতীত ছিলে, আজ তুমি তারই একজন হয়েচ। তাই এ আলো তোমার ম্লান হবে না।' রমেশও আর গ্রাম ত্যাগ করে নি।

(জ) উৎকৃষ্ট সাহিত্য কর্মের লক্ষণ কিছুটা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার চিন্তার স্ফুলিঙ্গ। শরৎচন্দ্র বিশ্বেশ্বরীর মুখ থেকে আদায় করলেন, 'শুধু আলো জেলে দে রে, শুধু আলো জেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল।' কৃষি-কেন্দ্রিক অর্থনীতির কাঠামোয় ভারত ভরসাপ্রাপ্ত। নগরগুলো গড়েও উঠেছে সেই দেহের মস্তিষ্ক রূপে। অতএব গ্রাম না বাঁচালে যে ভারতীয় নগরগুলো বাঁচবে না সেটা বাস্তব অর্থনীতির সাক্ষর। শরৎচন্দ্র সেই সাক্ষরতার স্বার্থে অক্ষর অর্পণ করলেন। সহরের জন্যে সহরে চিন্তা ভারতীয় ভাবনা পদ্ধতিতে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী বৈদগ্ধ্যেরই নমুনা। এই বৈদগ্ধ্য বৈগুণ্যের কল্যাণে বর্তমানের আবর্তিত শ্লোগান 'কলকাতা বাঁচাও' 'কলকাতা সাজাও' 'কল্লোলিনী কলকাতাকে তিলোত্তমা করো' 'আতংক নিদ্রার নগরী' ইত্যাদি। একদম আজকের দিনেও য়ুরোপীয় গোষ্ঠী মাঝে মধ্যে যে কলকাতার জন্যে কলকাতা বাঁচানোর সদুক্তি করে তাও নিতান্ত প্রচ্ছন্ন বাণিজ্যিক কারণে। একটু খোঁস না হলেই ধরা যাবে যে ইংরাজগণ দিল্লীর চেয়ে বোম্বাই এবং কলকাতাকেই উন্নীত করার চেষ্টা করেছিল অধিক কারণ দুটো...সৈন্য এবং ব সখারাম দেওয়ার অথবা লা দের মতন কতিপয়কে বা শরৎ চাটুজ্যে নামক এক বাঙাল কথাশিল্পী বেশ একটু জোরের সঙ্গে এই সাম্রাজ্যবাদী বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে খোদ কথাটা বলে ফেললে 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসে।

হিমালয়ের হরিণ দুদিকে

একদিকে সেই দেশ যার ন চীন। আরেক দিকে ভারতবর্ষ মাত্র কয়েক বছরের এদিক সেদিক তুলনায় লু সুন এবং শরৎচন্দ্র চট্টো পাধ্যায় প্রায় সমকালীন লেখক দুজনেরই উপজীব্য অধিকাংশ ক্ষে সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের গ্রাম্য গন্ধব কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্র রূপায় দুজনেই অত্যন্ত নিরপেক্ষ অথচ মু কারণ উদ্ঘাটনে সিদ্ধহস্ত। সেগুলো অর্থনীতি-রাজনীতির রস ভরপুর। তাতে যদি শেষ বে তস্কর সন্ধানের ফলে কর্তৃপক্ষে স্কন্ধে লাঠি পড়ে তবে তাঁরা ত বরেছেন। পাশাপাশি উভয় লে কের পুস্তকগুলো পড়ে গবেষকে রায় দিতে অনুনয় জানালে অন্য হবে না। না। চার্লস্ ডিকে কিম্বা এমিল জোলা নন। ক পচে গেছে।

বেতের লাঠি ও চটি জুতো

শেষ নিরিধ্যাসন সামভাবেদে ঘরে রক্ষিত একজোড়া চটি ও একখানা বাঁকানো মোটা বেতে লাঠি। কা দের কুলাভিমানে আঘাত দেয়ার জন্যে? তা কালের সাহিত্যিক? দেশ বি যাদের মাথাব্যথার কিনারা ে তাদের নাকের ডগায় ছুঁড়ে মার জন্যে?

[সমাপ্ত

স্পেনে বর্বর নির্যাতন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

পর্তুগালের ছোঁয়াচ লেগেছে স্পেনে। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে কিছুকাল পূর্বে স্পেনের সেনাবাহিনীর বেশ কিছু অফিসার, লেখক বুদ্ধিজীবী আন্দোলন শুরু করেছেন। তাঁদের অন্যতম দাবী, স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। এই দাবীর পেছনে রয়েছেন পাদ্রী থেকে শুরু করে শ্রমিক-ছাত্র পর্যন্ত। এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গত বছর থেকে প্রবল আকার ধারণ করছে। আবার মাদ্রিদ, বার্সিলোনা রূপকথার নায়ক-নায়িকা হয়ে উঠছে। ১৯৩৭ সালে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত শাসন কায়েম হবার পর কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী ক্রিশ্চান দল পর্যন্ত বে-আইনী। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক দলগুলোর সমন্বয়ে জাতীয় মোর্চা গঠনের আহ্বান জানিয়েছে। এই আহ্বানে এখন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এতদিন কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে যা খুশি তা করা হয়েছে। খুন, জখম, পিটুনি দিয়ে কমিউনিস্টদের শেষ করা যায় নি। এমন কি, সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত বা মাঝারি ধরণের অফিসার তারাও দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে।

আতঙ্কিত প্রশাসন নতুন করে জনসাধারণের ওপর হামলা চালাতে শুরু করেছে। শুধুমাত্র বিস্কে ও গিউপাজকোয়ার সম্প্রতি দু হাজার

মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশে

মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি ফ্যাসিস্তরা হানা দিচ্ছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে স্পেনের বিশিষ্ট লেখক কবি পাদ্রী আইনজীবী অধ্যাপক শিক্ষক শ্রমিক ছাত্র রয়েছেন। ধৃতব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচশ জনকে বিনাবিচারেই আটক রাখা হয়েছে।

আতঙ্কিত প্রশাসন সমগ্র বাস্ক অঞ্চলে জরুরী অবস্থা জারী করেছে। বিলবাও ও স্যানসেবাসতিয়ানের কনসেনট্রেশান ক্যাম্প ও কারাগারগুলি এখন ভরে গেছে। নির্মম ফ্যাসিস্ত অত্যাচার সত্ত্বেও বাস্কে অঞ্চলের মানুষ আবার মরীয়া হয়ে উঠেছে।

বাস্কে অঞ্চলের সংগ্রামের কথা যাতে দেশের অন্যত্র পৌঁছতে না পারে তার জন্য সরকার কড়া সেন্সর বসিয়েছে খবরের কাগজগুলোর ওপর। কিছু কিছু খবরের কাগজ সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে সমগ্র অঞ্চলে অসংখ্য বেআইনী পত্রপত্রিকা গজিয়ে উঠছে। নানা বিচিত্র ইস্তাহার কে বা কারা বাড়ি বাড়ি ছড়িয়ে যাচ্ছে। ইস্তাহারের একটি মাত্রই দাবী : স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। কখনো বা দেয়াল লিখন : বাস্কের মানুষ রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না।

অন্যদিকে, বাস্কের জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সারা স্পেনকে আলোড়িত করে তুলেছে। সরকারী রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে বার্সিলোনার মানুষ সেদিন রাজপথে শত সহস্র নেমে পড়ে বাস্কের জনগণের আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানায়। সেই মিছিলে ছিল বাস্কের জনগণের বীরত্বের প্রতীক বাস্কের লালপতাকা ও কাতালোনিয়ার জনগণের পতাকা। বার্সিলোনায় সাম্প্রতিককালে এতবড় বিক্ষোভ মিছিল দেখা যায় নি।

বাংলা বন্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিদেশীরা চলে এসেছে, পাছে "বন্ধে" আটক পড়ে যায়। কলকাতা-বোম্বাই সকালের ফ্লাইটে সচরাচর একশ দশটি আসন বুক হয়—আজ হয়েছে সাতাইশ। লাউনজে প্রবেশ মূল্য লাগছে না; টিকিট বিক্রি করবার লোক গরহাজির।

সকাল আটটা : নাগেরবাজার পরপর চারটি জীপ ও দুটি তিন-চাকার ভ্যান যশোর রোডে দাঁড়িয়ে। পিছনে পাহারা দিয়ে চলেছে পুলিশের কালো গাড়ি। "প্রেস"-সাঁটা আমাদের গাড়ি দেখেই মুহুর্মুহু "বন্দে মাতরম্"। অতঃপর জীপ থেকে চরজনের অবতরণ। একজন আমাদের হুকুম দিল, "ছবি তুলুন"। মেঘমেদুর সকালে গাঢ় কালো চশমা পরা একটি ভীমকায় যুবক হাতে ত্রিবর্ণ-পতাকা ওড়ানোর লাঠিটি তুলে এবার সামনের বন্ধ পানের দোকানে পেটাতে লাগল। হিস্টিরিয়া। কোথাও কেউ নেই, অথচ চীৎকার, "দরজা খোলো"। ফটোগ্রাফার তাড়াতাড়ি দরজা পেটানোর ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা তাক করল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, "এই, খবরদার। গাড়ি জ্বালিয়ে দেবো। বন্দে মাতরম।"

সকাল নয়টা : শ্যামবাজার মোড়—বাস আছে, যাত্রী নেই। ট্রাম আছে, অফিসের বাবু নেই। মিনিবাস আছে, লোক-ও আছে। সেই সব লোক যাদের একদিনের পরিবহন খরচে গ্রামের একটা পরিবার অন্ততঃ তিনদিন অনাহার থেকে রক্ষা পায়।

সকাল সাড়ে নয়টা : শ্যামবাজার মোড়—নেতাজী স্ট্যাচুর উল্টোদিকে ফুটপাথে গুটি পঞ্চাশ ছেলে। একজনের হাতে পোর্টেবল্ মাইক্রোফোন। টুলের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। বক্তৃতার বয়ান হচ্ছে, "মহাভারতের পাণ্ডবকুল এবং ভারতের কংগ্রেস এই দুই-ই সত্যের প্রতীক। যেমন পাণ্ডবস্বার্থে যুধিষ্ঠির একটা মিছে কথা বলেছিলেন তেমনি এলাহাবাদের রায় অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধী একটা ওরকম কিছু করে থাকতে পারেন। ইন্দিরা গান্ধী আমাদের যুধিষ্ঠির। কৌরবদের আমরা ধ্বংস করবই"। প্রচুর বাহবা। এমন সময়ে বি টি রোডের দিক থেকে তিনটি জীপ এসে দাঁড়ালো। ঠিক নেতাজীর মত নামলেন বেলঘরিয়ার নায়ক ইন্দু মিত্র। তার এক সাকরেদ জানালেন, বেলঘরিয়ার "এক ঝাটা সি পি এমকে" তারা এক "মেয়েছেলে" সমেত থানায় পুরে দিয়ে এসেছেন।

সকাল দশটা : কামারহাটি—আগরপাড়া জুট মিলের দরজা বন্ধ। অথচ বাইরে কোন পিকেট নেই। ভিতরে কাজকর্ম চলছে। ম্যানেজার বললেন, শতকরা একশোজন উপস্থিত। ইউনিয়ন সিটু-র হাতে। আমরা সিটু ইউনিয়নের সভাপতি-র সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। "না, একমাত্র সে-ই আজ আসে নি"। "তবে দ্বিতীয় নেতাকে ডাকুন"। "না, সেও নেই।" তৃতীয় ? "না, সে-ও আজ ডুব দিয়েছে। "তবে যে বললেন সবাই এসেছে। ম্যানেজার নিরুত্তর।

সকাল এগারোটা : বাগবাজার স্ট্রীট—উত্তর কলকাতার ভৈরব বাহিনীর জীপ অনবরত যাতায়াত করছে পত্রিকা অফিসে। তিনতলায় শতকান্তিবাবুর বৈঠকখানা হয়েছে বন্ধ ভাঙ্গার কনট্রোল রুম। ও-সি কনট্রোল—শতবাবু স্বয়ং। পত্রিকা অফিস কাজে লাগিয়েছে মোট পাঁচটা জীপ। উপরে বৌদি বিতরণ করছেন সন্দেশ। চাকর শতবাবুর পা টিপছে। আর উনি অবিরাম ফোনে নির্দেশ দিয়ে চলেছেন—"সুখরঞ্জন (সুখরঞ্জন ব্যানার্জী—ডি সি নর্থ), অন্ততঃ গোটা দশেক কনস্টেবল ভাইকে নিয়ে তুমি কলেজ স্ট্রীটে চলে যাও। সেমেনের ছেলেগুলোর তো আবার মাথা গরম। আমার দেওকী ভাই (দেওকীনন্দন পোদ্দার) বলছিল ওরা নাকি নিজেদের মধ্যেই মারামারি করছে, কিংবা, "টাকার ব্যাপারটা ভাই তুমি শ—র সঙ্গে বলে নাও। আমার বারিদ ভাই শ্যামবাজারে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলে নাও। দেখবে, শোভাবাজারে এক ব্যাটাও যেন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ না রাখে। ইলা রায় অজিত পাঁজাদের দেখিয়ে দাও যে "বন্ধ" ভাঙ্গতে গেলে কলকাতায় এখনো শতকে আর তার ভাইদের-ই দরকার হয়। এরই মাঝে আরেকটা ফোনে আরেকজনের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ। আলাপীর নাম —অতুল্য ঘোষ।

বেলা বারোটা : সিটু অফিস—"হ্যালো, খবরের কাগজ থেকে বলছি। কেমন রিঅ্যাকশন আছে ?"

—"না, না। কোন রি-অ্যাকশন নেই। বন্ধ সফল।

পুলিশী হামলা

নাটকের বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত সতেরই জুন বেলা দুটো থেকে দশটা পর্যন্ত কলকাতা পৌর ভবনের সামনে এক অবস্থান ধর্মঘটে জমায়েত হয়েছিলেন বিভিন্ন নাট্যদলের কর্মীরা। অস্বাভাবিক কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শ্লোগান, স্মারকলিপি পেশ ছাড়াও গান নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করেন বিভিন্ন নাট্যদল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় হঠাৎ পুলিশের দাবী : গান নাটক বন্ধ করে এই মুহূর্তেই জমায়েত সরিয়ে ফেলুন, পথচারীদের অসুবিধে হচ্ছে। পুলিশের এই হুমকীকে পরোয়া না করে তখন একটি নাটক অভিনয় হতে থাকে। পুলিশ বেগতিক দেখে দুজন অভিনয়রত শিল্পীকে প্রিজন ভ্যানে তোলে এবং কিছুদূরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। এছাড়া গণনাট্য সংঘের কর্মী শিশির সেন, কিশলয় সেন ও অভিনয় পত্রিকার সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘটে পুলিশের এই জুলুম দেখে সমস্ত দর্শক শ্রোতা এবং নাট্যকর্মীরা ক্ষুব্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এই ঘৃণ্য হামলার প্রতিবাদে মিছিল করে আসেন এবং নিন্দার প্রস্তাব নেন।

'নাট্যকাল' গোষ্ঠীর দুটী নাটক

(দর্পণের সমালোচক)

"প্রতিকৃতি"র সৌজন্যে দিল্লীর "নাট্যকাল" গোষ্ঠী সম্প্রতি অবনমহলে "অহো বিজ্ঞাপন" ও "চালচিত্র" নামে যে দুটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করে গেলেন, তার আঙ্গিক ও প্রযোজনার খুঁত ধরতে কলকাতার নাট্যদলগুলির বিশেষ অসুবিধে হবে না। তবে নাটক দুটির বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও বিন্যাসে "নাট্যকাল" ভারতীয় অর্থনীতি রাজনীতি ইতিহাসের যে জ্ঞান ও চেতনার পরিচয় রেখেছে তা কলকাতার মঞ্চে ইদানীং দুর্লভ বললে অত্যুক্তি হবে না। একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রবন্ধ থেকে যে কোন নাটকের জন্ম হতে পারে তা "অহো বিজ্ঞাপন" না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। নাটকের উৎস বিনয় ঘোষের একটি প্রবন্ধ, যার বিষয় কিভাবে আধুনিক কনজিউমার সোসাইটিতে নিছক মুনাফাবৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন না বাড়িয়ে বিলাস-ব্যসন অবসর ভোগের উপকরণ ক্রেতার হাতে তুলে দেয় নানান বিজ্ঞাপনের মোহিনী ছলাকলার সাহায্যে। ফলে যার প্রয়োজন নেই সাধারণ মানুষের কাছে, তাই প্রচারের প্রাবল্যে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে দিন দিন।

নাটকে এই সত্যটিকে সমাজজীবনের নানান স্তরের টুকরো দৃশ্যের মাধ্যমে টীকা টিপ্পনী সহ পরিবেশন করা হয়েছে। মঞ্চের পশ্চাৎপটে বিজ্ঞাপনের টুকরো দিয়ে সাজানো নকশাটি তাই এত অর্থবহ। বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের পুরুষ মডেলটির যান্ত্রিক পুতুলসুলভ আচরণ যেন আমাদেরই প্রতীক—এই দৃশ্যের পরিকল্পনা উচ্চ প্রশংসার দাবী করতে পারে, যেমন পারে দৌড় প্রতিযোগিতার দৃশ্যটি, যেখানে

নাট্যাভিনয়

উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে টিউশানি করা শিক্ষক দৌড়তে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যায়। মধ্যবিত্ত দর্শকের কাছে এই আত্মদর্শন বড় জরুরী এখন। দুঃখের বিষয়, কলকাতার নাট্যগোষ্ঠীগুলি মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন বিভ্রান্তির এই ট্র্যাজেডী উন্মোচনে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না।

"নাট্যকালে"র দ্বিতীয় নাটক "চালচিত্র" বর্তমানকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য অতীতে নিয়ে যায় প্রথমে। ঢাকের বাজনায় বোধনের সুর, কবির লড়াইয়ের আঙ্গিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত কৃষক ও জমিদারদের সাঙ্গীতিক কথোপকথন, এবং তারপর বেদীতে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহহীন এক উদ্ভট চালচিত্রের সামনে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ইত্যাদির নামে এক অদ্ভুত প্রহসন। জাতীয় ইতিহাসের মূল ধারাটি যেন কালিঘাটের প্রাচীন ব্যঙ্গাত্মক পটচিত্রের চেহারা নিয়ে হাজির।

বিষয়বস্তু ও নাট্যরূপের মূল পরিকল্পনা উভয়ক্ষেত্রেই নাট্যকালের পরিণত মনীষা সামাজিক পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তি সুস্পষ্ট তবে পাশাপাশি অভিনয় অভিনেতাদের প্রবেশ প্রস্থান, দৃশ্য পরিবর্তন আলোকসম্পাত, পোষ্টার প্রদর্শন, সর্বোপরি অনাটকীয় বক্তৃতাধর্মী টিকা টিপ্পনী জ্ঞান দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিচালক ও তার দলের অপরিপক্কতা বড় বেমানান। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে দিল্লীর "নাট্যকাল" কলকাতার মধ্যবিত্ত অথচ মধ্যবিত্ত নই এমন মনোভাবাপন্ন দর্শক ও নাট্যদলগুলোর বিপ্লবী রোমান্স প্রীতিতে একটা বড় আঘাত দিয়ে যেতে পারতো।

অশোক সেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধার্থ রায়ের মনোভাব জানার পর অশোক সেন প্রধানমন্ত্রীর মামলার ব্যাপারে আর কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

মন্ত্রিসভা থেকে বাদ হওয়ার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ হওয়ার পর অশোক সেন নিয়মিত ভাবে আইন ব্যবসা করছেন। তাই রাজনারায়ণের প্রস্তাবটি যখন তাঁর কাছে এলো, কংগ্রেসী হিসাবে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও একজন আইনজীবী হিসাবে তিনি রাজনারায়ণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। রাজনরায়ণের কেঁসুলীর লীগাল কনসালটান্ট হিসাবে শ্রীসেনের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

সারাদেশ কংগ্রেসীদের সম্পর্কে মোহমুক্ত

চাণক্য সরকার

এমন কি গ্রামে গঞ্জেও সাধারণ মানুষ শাসক দল কংগ্রেস এবং তার একচ্ছত্র নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বর্তমান অস্বস্তিতে মোটামুটি খুশি। গত কয়েক বছরে সারা দেশে ইন্দিরা-ভক্তদের চেহারা দেখে মানুষ স্তম্ভিত। সর্বত্র দুর্নীতি, ছোকরা কংগ্রেসীরাই নাটের গুরু। এর আগে তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এত অসততা কখনও দেখা যায় নি। যে রাজনীতি কংগ্রেস পয়দা করেছে তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সমাজজীবনে এই অবস্থা। রাশি রাশি টাকা খরচ করছে শাসকদল ছোকরা ধরার জন্য। এই ছোকরাদের মধ্যে যারা সৎ শিক্ষিত এবং ঐকান্তিকতা নিয়ে রাজনীতি করতে এসেছিল তাদের অনেকেই এখন গা এলিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি তরুণ নেতাকে এখন নিজের গুণ্ডা বাহিনী রাখতে হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন টাকার। আর তা ছাড়া ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না, তাই যে যা পারছে গুছিয়ে নিচ্ছে।

এই অবস্থা সবচেয়ে বেশি প্রকট পশ্চিমবঙ্গে। এখানে বামপন্থী রাজনীতি ঠেকাতে ওদের কাঠখড় পোড়াতে হয় অনেক। এবং এই সুবাদে কলকাতায় বহু যুব-ছাত্র নেতা গজিয়ে উঠেছে। পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় এরা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদের প্রায় সব ঐতিহ্যই মুছে দেবার চেষ্টা করেছে। গত কয়েক বছরে নকশাল বা উগ্রপন্থী অথবা মার্কসবাদী এই অজুহাতে অন্ততঃ হাজার পাঁচেক তরুণ প্রাণ এদের হাতে বিনষ্ট হয়েছে। সারা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাস।

যারা টাকা পয়সার বিনিময়ে এই ত্রাসের সঞ্চারে নিযুক্ত তাদের মধ্যে অর্থবন্টনের ব্যাপারে গোষ্ঠী বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। যেদিন থেকে ভুয়ো নির্বাচন মারফৎ কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে সেদিন থেকেই কোন্দল শুরু হয়েছে। এই কোন্দলের কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। কোন্ গোষ্ঠী সরকারের পুলিশের প্রশাসনের সহায়তায় ও সমর্থনে গুছিয়ে নিতে পারছে তাই নিয়ে ঝামেলা। এর ফলে রাজ্যের সর্বনাশ। যে সামান্য উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তাতে চুরির বহর অবিশ্বাস্য। যেমন কলকাতা উন্নয়নে সি এম ডি এ প্রায় দেড়শ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এখন সরকারের পক্ষ থেকেই স্বীকার করা হয় যে, টাকার বেশির ভাগ অংশই অপব্যয় হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে কয়েক হাজার পেটোয়া লোক ঢুকিয়ে পর্ষদের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। আর পর্ষদের খরচ বাড়ার ফলে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চেপেছে বর্ধিত বিদ্যুৎ হারের বোঝা। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় পরিবহনে একই অবস্থা। বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে। ওখানকার রাষ্ট্রীয় পরিবহন মোটামুটি ভাল অবস্থাতেই ছিল। মন্ত্রী ও এম এল এরা নিজেদের মস্তানবাহিনীকে এই পরিবহনে ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিয়ে এই ক্ষতি পূরণের চেষ্টা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী রাজনীতির চেহারা এত দ্রুত এই অবস্থায় পৌঁছবে এটা কিন্তু আগে ভাবতে পারেন নি অনেক পণ্ডিত। সাধারণ মানুষের শুরু থেকেই বুঝতে ভুল হয় নি। কংগ্রেসের "বিরাট নির্বাচনী জয়ে" অথবা সিদ্ধার্থবাবু যেদিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মন্ত্রীদের নিয়ে ঢুকলেন সেদিন সাধারণ মানুষ আনন্দে ফেটে পড়ে নি বা লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনয় বাদল দীনেশ বাগে এসে জড়ো হয় নি, যেমন হয়েছিল দুবার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সময়।

এ ঘটনা কংগ্রেসীদের দৃষ্টি এড়ায় নি। তারা বুঝতে পেরেছে তাদের পেছনে জনসমর্থন নেই। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী বামপন্থীদের ওরা নির্মূল করতে চেয়েছে সন্ত্রাসের পথে।

এই আবহাওয়া গত তিন বছর ধরে চলে আসছে। বামপন্থী দলসমূহ এবং এদের নেতৃত্ব এই পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিল না। তাই তারা আত্মরক্ষার তাগিদে নিঃশব্দে দূরে দাঁড়িয়ে দর্শকের ভূমিকা নিলেন। তাদের সংগঠন কত দুর্বল তা প্রথম আঘাতেই বোঝা গেল। দুর্বল সংগঠন নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা না করে বোধহয় ভালই করেছেন বামপন্থীরা। তাতে আরও তরুণ প্রাণ নষ্ট হত।

এদিকে সারা দেশে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন ফেটে পড়ছে। যার ফলে গুজরাটে কংগ্রেস সরকার হটে গেল। বিহারে ছাত্র যুব শক্তি কংগ্রেস বিরোধিতায় সোচ্চার। সার্থক বামপন্থী নেতৃত্বের অবর্তমানে বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে এসেছেন দক্ষিণপন্থীরা। আর প্রবীণ নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

মূল কথা হচ্ছে যে, সারা দেশে কংগ্রেস এবং ইন্দিরা বিরোধিতার ঝোঁক প্রবল হয়েছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে সাধারণ মানুষ মনে মনে খুশি। নির্বাচনে সরকারী যন্ত্র ব্যবহার বা যথেচ্ছ ব্যয় এ ঘটনা ত মানুষ দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু আদালতের রায়ে অন্ততঃ কংগ্রেস এবং ইন্দিরা গান্ধী একবার একটু পাঁচে পড়েছেন এতেই মানুষের আনন্দ।

এমন কি কংগ্রেসীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের নিঃস্বতায় লজ্জিত। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ নেই এই প্রচার রাজনীতিতে দেউলেপনার এক নতুন নজীর সৃষ্টি করল। এমনকি সুপ্রীম কোর্টেও ইন্দিরা গান্ধীর উকিল একই কথা বলতে চেষ্টা করেছেন।

দিল্লীর ওয়াকিবহাল মহলের খবর যে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সাময়িকভাবে বিদায় নিতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কে নেতৃত্বে আসবেন এ নিয়ে প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হয় এবং দল ভেঙ্গে যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন ইন্দিরা গান্ধী অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ান। তাছাড়া ওঁর নিজেরও ভয় ছিল হয়ত বা যিনি সাময়িকভাবে নেতৃত্বে আসবেন তিনি হয়ত পাকাপাকি থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। যে কোন স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্বের এই ভীতি স্বাভাবিক।

কংগ্রেসীরা যতই শ্রীমতীর প্রতি আস্থা প্রদর্শনের জন্য দেশ জুড়ে কার্নিভালের ব্যবস্থা করছে ততই সাধারণ মানুষ কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কি পদ্ধতিতে কংগ্রেসীদের মিছিলে লোক জোগাড় হচ্ছে তার বিশদ বিবরণী এখন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যাপক বিক্ষোভই যথেষ্ট নয়। সার্থক নেতৃত্ব রাজনীতি ও সংগঠন প্রয়োজন বিক্ষোভকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে। কিভাবে এই সংগঠন গড়া যায় তা রাজনীতিবিদদের বিবেচ্য। তবে একথা পরিষ্কার যে সংকীর্ণতাবাদের কোন ভবিষ্যত নেই, যেমন হঠকারিতার বা উগ্রপন্থার।

রঙ্গদর্পন

আবার সন্ত্রাসের মহড়া সুরু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেশের অন্যান্য জায়গার মত এখানেও কংগ্রেসীরা বুঝতে পারছেন তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। বিশে জুন বন্ধে সারা রাজ্যে মানুষের সাড়া এই কথা প্রমাণ করেছে। কংগ্রেসীরা বন্ধ ব্যর্থ হয়েছে বলে যতই চীৎকার করুক মানুষের মতিগতি কোনদিকে তা বুঝতে ওদের দেরী হওয়ার কথা নয়।

রবিবার সন্ধ্যায় কংগ্রেস অফিসে রাজ্য কংগ্রেস কর্ম সমিতির বৈঠক হয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মামুলি আনুগত্য জানিয়ে সভা শেষ হওয়ার কথা।

সভাপতি অরুণ মৈত্র প্রস্তাব করেন যে, জেলা কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করা দরকার, যাতে তারা আরও বেশি জনসমাবেশ করতে পারে। এই কাজের জন্য টাকার দরকার। তাই অরুণবাবুর প্রস্তাব ছিল রাজ্য কংগ্রেস তহবিল থেকে বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটির কাছে টাকা পাঠানো হোক।

খাদ্যমন্ত্রী শত ঘোষ পাঁচটা ধরতে পারেন। অর্থাৎ রাজ্য কংগ্রেস তহবিল থেকে টাকা দিয়ে অরুণবাবু এবং তার গোষ্ঠী নিজের দলবলকে শক্তিশালী করতে চাইছেন। শতবাবু প্রশ্ন করেন জনসমাবেশ করার জন্য টাকার কি দরকার। কংগ্রেসকে কি লোক ভাড়া করতে হবে নাকি? তারপর শতবাবু জোর দিয়ে বলেন যে, এই সমস্ত টাকা জেলায় পাঠানোর অর্থ কয়েকজনের পকেট ভারী করার ফিকির।

সভায় হৈ চৈ পড়ে যায়। অরুণবাবু বলেন কংগ্রেসীদের সততার প্রতি এই কটাক্ষ সহ্য করা যায় না। তিনি শতবাবুর কাছে তার বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানান। শতবাবু মুখে বৈষ্ণব—যা বলার তা যখন বলা হয়ে গেছে তখন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করতে তাঁর আপত্তি নেই।

মূল কথা দাঁড়াচ্ছে যে কংগ্রেসীরা আবার চেষ্টা করছে নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দল মিটিয়ে আবার ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে। কিন্তু পদে পদে বাধা। অনেক কংগ্রেসী মনে করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। এবং এই মনে করার ব্যাপারেও গোষ্ঠী স্বার্থ আছে।

ব্যাপক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে গেলে যে আর্থিক ও সাংগঠনিক সামর্থ্য দরকার তা রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষে জোগাড় করা শক্ত। তাছাড়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এখন কেবল পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। তাই কেন্দ্রের পক্ষ বাহাত্তর সালের মত সব শক্তি নিয়ে এই রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়ত সম্ভব নয়।

সম্পাদক: ফতেহ্ আলম ইণ্ডিয়া নেয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক
সম্পাদক—হীরেন বসু

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৪ঠা জুলাই ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

ভারত ইঁদুর-বিপ্লবের মুখোমুখি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সারা দেশে ইঁদুরের উপদ্রব তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলে বিপুল পরিমাণে যেমন খাদ্যশস্যের হানি ঘটছে, তেমনি ক্রমাগত ইঁদুরের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে অনেকেই দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ছেন। ভারতের "রোডেন্ট কন্ট্রোল বোর্ড" ইঁদুরের এই বংশবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে ইচ্ছুক। গত উনত্রিশে জুন এই সংবাদ দিয়েছে দিল্লীর ইংরেজী দৈনিক "হিন্দুস্থান টাইমস"।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে যা গেছে যে ইঁদুরের এই সংখ্যা- এবং উৎপাত হঠাৎই বেড়ে রোডেন্ট ডেমোগ্রাফাররা বলছেন, যদি শীঘ্রই ইঁদুরের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা না যায়, তাহলে দেশে বড় রকমের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতি আড়াই লক্ষ গ্রাম পিছু দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার ইঁদুর বংশ বিস্তার করে চলেছে। বড় জাতের ইঁদুর বা খেড়ে ইঁদুর তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম হলেও গ্রামাঞ্চলে এরাই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য খেয়ে ফেলে।

বিজ্ঞান বিষয়ক বিশিষ্ট ভাষ্যকার শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বলেছেন, ভারত এখন ইঁদুর বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সংক্রামক রোগ সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কমিউনিকেবল ডিজিজ বলেছে যে, নানারকম সংক্রামক ব্যাধি এই ইঁদুরের মহল থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়ায়। এই রকম রোগের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। লিপটোসপাইরাল জনডিস, ইঁদুরে কামড়ানো জ্বর, বুবোনিক প্লেগ—এইসব রোগগুলির অন্তর্ভুক্ত। এই সব রোগের ফলে এপর্যন্ত পঁচিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

শ্রীচন্দ্র আরো বলেছেন, ইঁদুরের এই বংশবৃদ্ধি রোধের কাজে জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে।। এই বছরের বিজ্ঞান কংগ্রেসেও দেশে "ইঁদুর বিস্ফোরণকে" এক বিপজ্জনক ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়। ইঁদুরের সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ না করলে, সংশ্লিষ্ট রোগগুলিও দূর করা সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সমাজে ইঁদুরের উৎপাত নিয়ে প্রচন্ড দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন প্রতি ছয়টি ইঁদুর বছরে একজন মানুষের খাদ্য খেয়ে ফেলে।

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

এ সপ্তাহের খবর

অনার্য মিত্র

সপ্তাহটাক বাদে এবার দিচ্ছি কিছু খবর,
হয়তো শুনে জ্যান্ত মানুষ ছেড়ে আসবে কবর ঃ
জুঁই গাছেতে সেদিন নাকি ফুটেছিল টগর
সেই খবরে বোস গিন্নী করল কি এক রগড়।
খবর শুনে হুতোম প্যাঁচা ধরল কি এক কান্না
বদ্যি এসে বলল শেষে 'আর কেঁদোনা আর না।'
রায় মহাশয় করল যে তার গালটি টিপে আদর
তারই মাথায় ধরল ছাতা তিন তিনটে বাঁদর।
এই খবরে টিট্‌কিরি দেয় বে-আক্কেলে মানুষ
খেয়াল রাজা রাণীর সাথে ওড়ায় রাতে ফানুস।
ভাতের হাঁড়ি করল ভ্যানিস সেদিন পি সি সরকার
তাই না শুনে চাঁদের বুড়ি কাটছে সুতো চরকার।

এসব খবর, ভাবলে গুজব কানে ধরবে পচন
রাগ করলে শুনিয়ে দেবো মিষ্টি মধুর বচন

মুরগীদের ঠোকরাঠুকরি রোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, এভিয়ান লিউকোসিস, ম্যারেক্স রোগ, ইনফেকসাস লেরিঙ্গোট্রেকাইটিস, ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস, এভিয়ান এনকেফাইলোমাইলাইটিস এবং আরেক প্রকারের রোগ মুরগীদের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করেছে যার নাম মুরগীর ঠোকরাঠুকরি রোগ বা ক্যানিব্যলিজম।

আমেরিকার তিরুবাতি পশু বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জেমস ক্রিস্টোফার এক প্রতিবেদনে বলেছেন ঃ পোলট্রি পালকদের কাছে মুরগীর ঠোকরাঠুকরি রোগ বা কনবিলিজম একটি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ঠোকরাঠুকরি প্রবণতার ফলে অনেক মুরগীই প্রাণ হারাচ্ছে। ফলে খামারীদের মুরগীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ব্যবসায় ঢের ক্ষতি হচ্ছে। মুরগীর ঝাঁকে এই রোগ দেখা দেওয়ার সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি। খুব যত্নের সঙ্গে যারা পাখির ঠোঁট কেটে দেন, তারাও অনেক সময় পরিত্রাণ পান না। এই রোগ বা বদঅভ্যাসগুলির কারণ সম্বন্ধে নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কেউ বলেন মুরগীর ঠোকরানোর সাধারণ স্বভাব থেকেই এর জন্ম। কেউ বলেন মুরগীদের মেয়েলি স্বভাবের জন্য এটা ঘটছে। কারো মতে এটা হল মুরগীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই।

অপুষ্টি বা গাদাগাদি করে পাখিদের রাখা এই ঠোকরাঠুকরির বদ স্বভাবের জন্য অনেকাংশে দায়ী। সাধারণতঃ খাদ্যে প্রোটিন ও এমিনো এসিডের ঘাটতি থাকলে পাখিদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্ষুধা থেকে যায়, ফলে তারা খাবার জিনিষ ছাড়াও অন্যান্য জিনিষ, যেমন পোলাট্রি ঘরের দরজা, তারের জাল ইত্যাদিতে ঠোকর মারে। এই রকমভাবে ঠোকরাতে ঠোকরাতে অবশেষে কাছাকাছি নিজ সংগী সাথীর গায়েও দু চারটি ঠোকর মারে। ফলে এই অভ্যাস তৈরি হয় এবং কিছুদিন পরে মাংসের আস্বাদ পেলে এই অভ্যাস অপ্রতিরোধ্য রোগে দাঁড়ায়।

পশুপালন দপ্তরের বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাতো বেশ কিছুকাল আগে পশ্চিমবঙ্গ পোলট্রি গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশনের সভায় খামারীদের সব অভিযোগের প্রতিবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পশু গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালিয়ে মুরগীর সংশ্লিষ্ট রোগ প্রতিরোধের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে অনেক খামারীর একটা বড় রকমের দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং রাজ্যেরও প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সম্ভব।

অন্য মনে অন্য কথা

সে কথা থাক। তোমায় যে কথা বলিতে আজ মন উতলা, সে কথা থাক। যে কথা প্রাণে প্রাণে বেজে ওঠে গানে গানে, কেঁপে ওঠে মন্দ্রিত তানে আর ঝংকারে, সে কথা থাক। যে কথা লোকালয়ের আঁধার দিগন্তে আজ নীরবে নিহত হবে, সে কথা থাক। যে কথা ভাষাহারা শব্দহীনার মতো অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলে দিক দিকে চারদিকে করুণ আলপনা আঁকে, সে কথা থাক। নৈঃশব্দের ধ্বনি দিকে দিকে অনুরণিত আগ্নেয় উত্তাপ আজ ভিন্ন ভাষার টানে খুঁজে পায় পাষাণ মহিমা। শান্ত সমাহিত নিঃসীম নিথরতা তোমায় আহ্বান করে, নিখিরের অধীরতা করে নিবেদন। ভাষার ঘরণী তুমি শব্দের শয্যা ছেড়ে আলুথালু অনাথিনী উদ্বাস্তু পিপাসা সে কথা থাক, থাক পড়ে সেই সব কথা।

এসো, অন্যমনে বলি অন্য কথা। এসো, হিমায়ত শব্দমালা দিয়ে গড়ি হিমেল প্রতিমা। নিরুত্তাপ, বাষ্পহীন নিস্পন্দন। এসো হাতে রেখে হাত, ভাষাহীন শব্দহীন বিশ্বের বর্ণমালা শিখি, শৈশবী উল্লাসে শিখি হিমেল কথার যাদু। হিমবাহে সিক্ত হবে স্বদেশের মাটি। অন্য কথার টানে তুমি আমি চলে যাবো নিরুত্তাপ ভাষার স্বদেশে, যেখানে প্রতিবেশী ভাই বোন পরিজন অপরিচয়ের বিস্ময় মাখা দূরশ্রুত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, যেখানে তোমার ভাষা আমার ধ্বনি নিশ্চিত নশ্বর। তবু চলো, যেতে হবে, যেহেতু সে কথা নয়, অন্য মনে চাই অন্য কথা।

পাঠকদের কাছে নিবেদন

সম্পাদকীয়

অভূতপূর্ব সঙ্কট মুহূর্তে

ভারতীয় ঐতিহ্য ও শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন

জবা বন্দ্যোপাধ্যায়

একদা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে লেখা চিঠিতে তাঁর পিতা প্রয়াত জহরলাল নেহেরু ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে অক্লান্ত গবেষণার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। একটা জাতিকে জানা যায় তার প্রাচীন ঐতিহ্যের দর্পণে। ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশের ইতিহাস তো তৈরী করেছিলেন প্রধানতঃ ইংরেজ আমলা ভিনসেন্ট স্মিথ। আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ থেকে শুরু করেই বস্তুতঃ আমাদের দেশের ইতিহাসের পঠন শুরু হয়। অথচ সিন্ধু সভ্যতা কিম্বা তারও পূর্ববর্তী কালের ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির আজও অনাবিষ্কৃত এবং এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে তার অধিকাংশ হয় কল্পিত না হয় অপ্রমাণিত। এদেশের কলেজ কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ক পড়াশুনার জন্যে যেমন কোন উল্লেখযোগ্য পাঠ্যসূচি নেই তেমনি উপযুক্ত গবেষণার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরীও নেই। স্বভাবতঃই এতদ-সম্পর্কিত গবেষণায় কোন ছাত্র-ছাত্রীর আকুল আগ্রহ থাকলেও সুযোগ নেই। প্রত্যেক সমাজ-তান্ত্রিক দেশে এমনকি ধনতান্ত্রিক দেশেও এধরণের গবেষণার জন্য ছাত্র এবং শিক্ষকদের নানাবিধ সুযোগের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় আর্থিক বৃত্তিরও বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এধরণের সুযোগ কিম্বা আর্থিক বৃত্তি তো দূরের কথা, কোন কোন ছাত্রছাত্রী কিম্বা কোন শিক্ষক যদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস প্রণয়নে ইচ্ছুক হন তবে দেশের সরকার তাকে আপ্তবাণী বিতরণ করে তাকে নিরাশ করতেই বেশী অভ্যস্ত।

এই প্রশ্নটা তোলার কারণ হচ্ছে আজকাল অপসংস্কৃতি কথাটা প্রায়ই আমরা ব্যবহার করে থাকি। সাধারণভাবে আমরা অপসংস্কৃতির প্রচলিত অর্থে ধরে নিই যে যাকিছু নিরাবরণ তাই অশ্লীল। অর্থাৎ নারীরূপ বর্ণনায় যদি তার অনাবৃত রূপের চিত্রায়ণ হয় তবে সেটা নিগলিতার্থে অপসংস্কৃতি। আমার মনে হয় এধরণের সাংস্কৃতিক চিন্তা ভুল। কারণ সাহিত্যে এবং শিল্পে কোনরূপের বর্ণনাই অশ্লীল নয় যদি তার উদ্দেশ্য হয় মহৎ সৃষ্টি। হিটলারের আমলের জার্মানির ফাসিবাদী নারকীয় অত্যাচার

চিত্র আঁকতে গিয়ে কোন লেখক তার গল্প কিম্বা উপন্যাসে নাৎসী সেনাদের

পাশবিক ধর্ষণের সুনিপুণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে পারেন তবে তা অশ্লীল হয়না কারণ ঐ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পাঠকমনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে নরপশুদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা এবং বিদ্বেষ। যাতে প্রথম বিপ্লব উত্তেজনা কোনমতেই বাড়েনা। এই একই দৃশ্য যদি কোন চিত্রকর তাঁর তুলিতে জীবন্ত ভাবে এঁকে রাখতে পারেন তবে যুগে যুগে সেই ছবি মানুষের মনে গড়ে তোলে পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অদমনীয় প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা। সাহিত্য অথবা শিল্পে চিত্রকল্পের শ্লীলতা অথবা অশ্লীলতার পরিমাপ হয় এর নেপথ্য উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।

সাহিত্য এবং শিল্প চিন্তায় শিল্পীর ধ্যান ও ধারণা স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ হতে পারে তার দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের সংস্কৃতির স্পর্শে। শিল্পে নারীরূপ কল্পনা চিরদিনই প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার পরিকল্পনে বাবৃত। তার চিন্তার আরোপিত বৈশিষ্টই তথাকথিত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ সম্পদ। অথচ, লোকায়ত যুগে নারী কেমন-করে কৃষিব পত্তন করেছিল, কেমন-করে নারী যাযাবর পুরুষকে গৃহস্থ করে তার শ্রমশীল শক্তিকে নিয়োজিত করেছিল তার স্থায়ী সৃষ্টির নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, সেই ইতিহাস সেই ঐতিহ্যের বিস্তৃত বিবরণ যদি আমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে না পারি তবে নারী পুরুষের বর্ণনায় শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার প্রশ্নটি চিরদিনই আপেক্ষিক হয়ে থাকতে বাধ্য। সামন্ততান্ত্রিক তথা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লোকায়ত যুগের সামাজিক উৎসবগুলোকে ধর্মীয় রূপের আড়ালে অলৌকিক করে রাখা হয়েছে। একদা ক্ষেতের আলের পাশে নারী পুরুষ অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর যৌনক্রিয়া যে শস্য-ফলনের আকাঙ্খার সমার্থক ছিল লোকায়তযুগের ইতিহাসের পরিপূর্ণ পাঠ ছাড়া তাতো কোনমতেই জানা সম্ভব নয়। অথচ এই যৌনাচারকে পরবর্তীকালে সামন্ততান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক বিশারদরা অশ্লীলতার স্মারক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। লোকায়ত যুগে নারী ছিল পুরুষের সহচরী, সহকর্মী, সহমর্মী। সেদিন নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থাকে কোন ভেদাভেদ ছিল না এবং পুরুষের তুলনায় নারীর অধিকার খর্বিত হয়নি বলেই সেযুগে নারী পণ্যে পরিণত হয়নি। আজকের সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতির বিতর্কে তাই ঐতিহ্যের প্রশ্নটিই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রফলকে অনেকসময় নর পুরুষের মৈথুনরত চিত্রগুলোকে অশ্লীল অভিধায়ে ভূষিত করা হয়ে থাকে। অতীতদিনের জীবনের প্রতি কর্তব্যের সাথে যৌন জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের অনাবিল রূপটি তখনই বোধগম্য হতে পারত যখন তৎকালীন যুগের সামাজিক ইতিহাসের বাঁধাধরা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। ঐতিহ্যের সন্ধান তাই এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় কথা।

ঐতিহ্যের সন্ধান আর একটি বিশেষ কারণেও প্রয়োজনীয়, সে শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তবতা তাৎপর্য বুঝতে গেলেও ইতিহাসকে অবশ্যই জানতে হবে। আজ যাদের আমরা ছোটলোক বলি অর্থাৎ কাগদী, কাওড়া অথবা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় যারা আমাদের চোখে ব্রাত্য সেই অষ্ট্রিক অথবা অষ্ট্রেলিয় বংশধররাই তো একদা গ্রামীণ সভ্যতা তথা গ্রামীণ সংস্কৃতির পত্তন করেছে। সামন্ততান্ত্রিক যুগে এদের হাত থেকেই তো ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র। সে যুগের ইতিহাস আমাদের ধারণায় স্পষ্ট হলেই আমরা বুঝব শ্রেণীহীন সমাজস্থাপনের সর্বহারা লক্ষ্য ঐতিহাসিক কারণেই যুক্তিসঙ্গত এবং শোষক শ্রেণী যে সমাজের পরগাছা সে বোধটুকুও আমাদের সমাজেই জাগ্রত হতে পারে। তাই ঐতিহ্যের সন্ধান সবচেয়ে বড় কথা।

ছড়া

অথ শৃগাল কথা

কালান্তরের লংমার্চে মার্কস-এঙ্গেলসের কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো

অমিত মিত্র

একদা ইউরোপ যে ভূত দেখে আঁতকে উঠত আজ সারা বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রতিটি মহাদেশের ঝোপেঝাড়ে সেই ভূতের ছায়া দেখে ভির্মি খাচ্ছে। সেদিন কমিউনিজম বিরোধিতায় পোপ, জার, মেটারনিখ আর জার্মান পুলিশ একাকার হয়ে হয়ে গিয়েছিল, আর আজ দুনিয়া জুড়ে এর বিরোধিতায় এক সামিয়ানার নীচে চার শক্তির জোট ঃ সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র ও মুৎসুদ্দি আরলাতন্ত্র। তফাৎ এই যে, সেদিন প্রতিক্রিয়ার শক্তি যে কোন প্রতিপক্ষকে দেখেই "কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট" বলে পাড়া জড় করত, কিন্তু আজকের প্রতিক্রিয়া অনেক চতুর বাক্য-বিন্যাসে কোথাও বা কমিউনিজম-এর দোহাই পেড়ে কমিউনিজম বিরোধিতার নামে। ১৮৪৮ থেকে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নির্দেশিত পথে মানুষের অব্যাহত জয়যাত্রা—প্রাক-ইতিহাস গুহা ছেড়ে ইতিহাসের ইপ্সিত তীর্থের দিকে মানুষের দৃপ্ত পদচারনা। এই জয়যাত্রা তাই ১৯৪৮ এর ম্যানিফেষ্টোরই জয়যাত্রা।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর সক্রিয় উদ্যোগে ১৮৪৭-এ গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট লীগ। গড়ে ওঠার পেছনে দুটি ইতিবৃত্ত এঙ্গেলসের রচনায় আছে। এ ইতিহাসের সূত্রপাত ১৮৩৪ সালে প্যারিসে কিছু সংখ্যক জার্মান আশ্রয়প্রার্থীদের দ্বারা গঠিত একটি গোপন সংঘ, যার নাম ছিল এক-জাইলস লীগ বা নির্বাসিতের সংঘ। দু বছর যেতে না যেতে এই নির্বাসিতদের সংঘে ধরল ভাঙন; চরমপন্থী সর্বহারা শ্রেণীর সদস্যরা ফেডারেশন অব দি জাষ্ট বা ন্যায়নিষ্ঠদের সংগঠন নাম নিয়ে স্বতন্ত্র সংগঠন সৃষ্টি করলেন। কিছু প্রচারমূলক, কিছু ষড়যন্ত্রমূলক কাজের এই গোপন সংগঠন পরবর্তীকালে লন্ডনকে মূল কর্মকেন্দ্র হিসেবে বেছে নিল। লন্ডনে স্থানান্তরিত হবার পর ন্যায়নিষ্ঠদের সংঘ সাংগঠনিক চরিত্রের দিক থেকে আর কেবল জার্মান রইল না বরং এক আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি পেল। বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের প্রতিনিধিরা এর আওতায় এলেন। সদস্যপত্রে অন্ততঃ কুড়িটি বিভিন্ন ভাষায় যে স্লোগানটি লেখা থাকত তা হল ঃ সব মানুষ ভাই ভাই।

এমনিধারা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ফেডারেশন যখন এগুচ্ছে, তখন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ-এ মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে একটি সংহত রূপ দিয়ে গড়ে তুলেছেন, কিন্তু আদর্শগত দূরত্বের কারণে তাঁরা ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হতে অস্বীকার করে আসছেন ফেডারেশনের তরফ থেকে পৌনঃপুনিক অনুরোধ সত্ত্বেও। ফেডারেশনের প্রাজ্ঞ সদস্যরা ক্রমশই মার্কসীয় দর্শনের সঠিকতা ও নিজেদের ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। এমনি সময় সাতচল্লিশ সালে ফেডারেশনের তরফ থেকে মেসল এলেন ব্রাসেলসে মার্কস ও প্যারিসে এঙ্গেলসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ফেডারেশনের নীতিগত ও পদ্ধতিগত পুনর্গঠনের দায়িত্ব অর্পিত হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ইতিহাসতত্ত্বের জনক, সাম্যবাদী ভাবাদর্শের বৈজ্ঞানিক রূপকার এই দুই মহামনীষীর হাতে।

আঠারোশ সাতচল্লিশের গ্রীষ্মে ফেডারেশনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল লন্ডনে, উদ্দেশ্য ঃ সংগঠনের পুনর্গঠন। সংগঠনের এতদিনের রহস্যময় ষড়যন্ত্রমূলক চরিত্র নীতিগতভাবে বিসর্জিত হলেও সংগঠনের গোপনীয়তা ছিল ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। সংগঠনের নতুন নামকরণ হল কমিউনিস্ট লীগ। যার মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হল। প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা হল ঃ "লীগের লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা, সর্বহারার শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, শ্রেণী সংঘর্ষভিত্তিক পুরনো বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, এবং শ্রেণীহীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিশূন্য সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি-স্থাপন।"

ঐ বছরই লীগের দ্বিতীয় অধিবেশনে মার্কসের বৈজ্ঞানিক দর্শন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। মার্কস ও এঙ্গেলসের ওপর ন্যস্ত হল সাম্যবাদী দলের ইস্তেহার রচনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এই ইস্তেহার-এর জনকদের ভাষায়, "এ ডিটেলড থিয়োরিটিক্যাল এ্যান্ড প্রাকটিকাল প্রোগ্রাম অব দি পার্টি।" প্রথম মুদ্রণ জার্মান ভাষায় লন্ডনে। পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বে শত শত ভাষার মধ্য দিয়ে ঘটেছে এর কালজয়ী পরিক্রমা। "সব মানুষই ভাই ভাই"—স্লোগানটিকে বরবাদ করে দিয়ে ইস্তেহার তার আদর্শ লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করল ঃ "সমস্ত দেশের সর্বহারা জোট বাঁধ"। এই বলিষ্ঠ ঘোষণাই হল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার প্রথম সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

মার্কসবাদের সমগ্রতা, ব্যাপ্তি ও বিশালতাকে অস্বীকার করার মত কোন মূঢ়তা না রেখেই যদি বলি তৎকৃত-এর ম্যানিফেষ্টোই হল মার্কসবাদ, তাতে হয়ত অতিভাষণের কোন মৃদু অভিযোগ আশঙ্কা করি না। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার ওপর ভিত্তি করে রচিত সাম্যবাদী দলের এই ইস্তাহারে প্রতিফলিত হয়েছে জীবন, জগত ও জীবনজগতের ধারাবাহিকতা, যাকে বলি ইতিহাস তার সম্বন্ধেও শ্রমিক শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভংগী—দার্শনিক পরিভাষায় যার নাম দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বতত্ত্ব বা বস্তুবাদ কোনটিই যদিও মার্কসের মৌলিক অবদান নয় এবং যদিও মার্কস এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরীদের অবদান সবিনয়ে স্বীকার করেছেন তবু বলতে হয় হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভ্রান্তি ও মার্কসপূর্ব বস্তুবাদের অসম্পূর্ণতাকে বিসর্জন দিয়ে এঙ্গেলসের সহযোগিতায় যে বিজ্ঞান-নির্ভর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন তিনি গড়ে তুললেন তা পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিক মতবাদের থেকে স্বতন্ত্র একটি সম্পূর্ণ নতুন বিশ্ববীক্ষাই শুধু নয়, মানুষের এতাবৎ কালের সমাজবিজ্ঞানের সর্বোত্তম আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের সুসংক্ষিপ্ততম অথচ চরম সুসংহত রূপের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৪৮-এর ইস্তেহারে। তাই বলি, কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তির ঝুঁকি নিয়েই বলি, ম্যানিফেষ্টোই হল মার্কসবাদ। বলি আরো এই কারণে যে, মার্কসবাদের মৌল বৈশিষ্ট্য পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করায় নয়, তাকে পরিবর্তন করায়; আর কমিউনিস্ট ম্যানিফেষ্টোর মধ্যেই মার্কসীয় দর্শনের এই বৈশিষ্ট্যের সার্বাধিক সোচ্চার প্রকাশ। ম্যানিফেষ্টো পৃথিবীকে কেবল ব্যাখ্যাই করেনি, তার পরিবর্তনের জন্য বর্তমান ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টিকে নির্দেশ দিয়েছে।

বিশ্বের ইতিহাসই যেহেতু যে কোন মতবাদ বা তত্ত্বের বিচারশালা তাই ১৯৪৮-এর পর ১২৭ বছরের ইতিহাসই কমিউনিস্ট ইস্তেহারের সঠিক মূল্যায়ন আমাদের সামনে হাজির করছে। ১৯৪৭ সালের কমিউনিস্ট লীগের মুষ্টিমেয় সদস্যদের নিয়ে গড়ে ওঠা সাম্যবাদী আন্দোলনের একটি ক্ষীণধারায় আজ সারা বিশ্ব প্লাবিত হচ্ছে। জন্মের পর ম্যানিফেষ্টো যে বিশ্বপরিক্রমা শুরু করেছিল তার অপ্রতিরোধ্য, অব্যাহত গতির সমাপ্তি সম্ভবতঃ দুনিয়াজোড়া সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্যে; দুনিয়াজোড়া সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্যে; ততদিন চলবে এই কালান্তর পরিক্রমা।

জন্মমুহূর্ত থেকেই ম্যানিফেষ্টোর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বৈপ্লবিক মর্মবাণীর ওপর একের পর এক অনেক আক্রমণ নেমে এসেছে। অসংখ্য আদর্শগত বৈরিতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির শক্তিকে চূর্ণ করে তাকে এগোতে হয়েছে। মার্কসবাদের খণ্ডন বা অপপ্রমাণ প্রয়াসে কত অসংখ্য প্রচারসচিব ও প্রতিবিপ্লবী ধর্মযোদ্ধারা আসরে নেমেছেন রীতিমত কোমর বেঁধে, তাঁদের বিচিত্র তত্ত্বজালের বিন্যাসে এবং প্রচলিত সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচার মাধ্যমগুলির কল্যাণে জনমানসে নিতান্তই ক্ষণকালীন কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে; বারবার সে কুয়াশার জাল ছিন্ন করে ম্যানিফেষ্টো সূর্যের দীপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর প্রচারসচিব প্রতিবিপ্লবী জেহাদীরা—ক্যাভেনাক থিয়ের্স, বিসমার্ক, কোলচাক, হিটলার, ডালেস— এক এক করে সারিবদ্ধভাবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের পথে পা বাড়িয়েছে ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিক্রমে। কমিউনিজম বিরোধিতায় উপরোক্তদের ভূমিকা স্পষ্ট সোচ্চার। প্রতিক্রিয়ার শিবিরে এদের অবস্থান সম্পর্কে কোন ছায়া নেই। সরাসরি মার্কসবাদ বিরোধিতায় এদের সঙ্গে ফ্রান্সের প্রুধপন্থীরা ইংলন্ডের ওয়েনপন্থীরা, ট্রেড ইয়নিয়নবাদীরা, জার্মানীর লাসালেপন্থীরা ও ইটালীর ম্যাটসিনিপন্থীরা যখন পর্যুদস্ত হল তখন সাম্যবাদী আন্দোলনের ভেতর থেকে শুরু হল শত্রুতামূলক অন্তর্ঘাত। ইস্তেহারের যে পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোকে প্রথমোক্তরা সরাসরি এবং দ্বিতীয়োক্তরা ঘুরিয়ে আক্রমণ করেছে সর্বাধিক তাকে নীচে সংক্ষিপ্তভাবে তালিকাবদ্ধ করা হল ঃ

(এক) শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংঘর্ষের অনিবার্যতা।

(দুই) নতুন সমাজ গঠনে বলপ্রয়োগের অবশ্যম্ভাবীতা।

(তিন) সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের অপরিহার্যতা।

(চার) রাষ্ট্রের শ্রেণীভিত্তি।

(পাঁচ) সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভংগী।

লক্ষ্য করবার বিষয় হল মার্কসবাদের রংবেরঙের প্রতিপক্ষরা আক্রমণের সাধারণ লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে মার্কসীয় দর্শনের শ্রেণী দৃষ্টিভংগী এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী বলপ্রয়োগের বিষয়টি। আর এই লক্ষ্যে আক্রমণ পরিচালনা করে তারা জীবন জগতকে পরিবর্তনের মানুষের একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার মার্কসবাদকে ভোঁতা করে দিতে চেয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ঘটনা ঘটে ১৮৭১-এ প্যারিসে। প্যারি কমিউনের শিক্ষাকে মাথায় নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৭২-এ ম্যানিফেষ্টোর জার্মান সংস্করণের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করলেই শ্রমিক শ্রেণী তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না, বলপ্রয়োগের সাহায্যে ঐ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে শ্রমিক শ্রেণীকে গড়ে তুলতে হবে তার নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্র। পরবর্তীকালে ১৮৯৩-এ ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস যখন কমিউনিস্ট ইস্তেহারের ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখতে বসেন তখন দেখি শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি প্রথমেই স্মরণ করছেন ১৮৪৮-এর আঠারই মার্চ তারিখটিকে, যেদিন ইস্তেহারের প্রথম প্রকাশ চিহ্নিত হয়ে আছে ঐ তারিখে সংঘটিত মিলান ও বার্লিনে দুটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে ইস্তেহারের স্মরণীয় সেই শেষ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি ঃ "কমিউনিস্টরা তাদের তাদের মতামত ও লক্ষ্যগুলোকে গোপন করতে ঘৃণাবোধ করে। তারা খোলাখুলি ঘোষণা করছে যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বলপূর্বক উচ্ছেদ ছাড়া তাদের লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে না। দুনিয়া জোড়া শাসক শ্রেণীগুলো একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয়ে কাঁপতে থাকুক। শৃঙ্খলটুকু ছাড়া সর্বহারাদের হারানোর কিছুই নেই, জয় করে নেবার জন্য পড়ে রয়েছে একটা গোটা দুনিয়া। সমস্ত দেশের শ্রমিক এক হও।"

কমিউনিস্ট ইস্তেহার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নির্দেশনামা, আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের পথপ্রদর্শক বিপ্লবী তত্ত্ব ও প্রয়োগ-পদ্ধতি। বর্তমান দুনিয়ার তাবৎ সংগ্রাম—তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম থেকে শুরু করে মহাচীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব পর্যন্ত

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

উদ্ধৃতি

"আজ এ দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার জো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই, তাহা সিডিশন। অথচ দেখিতে পাই রড়লাট হইতে শুরু করিয়া কনেস্টবল পর্যন্ত সবাই বলিতেছেন সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা—এমন কি তীব্র ও কটু হইলেও—নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই যাহাতে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়, চিত্তের কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয়—এমনি।"

—শরৎচন্দ্র (সত্য ও মিথ্যা)

"বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন।"

"পুরাতনের গুণগান করতে পারাটাই বড় গুণ নয়। তাছাড়া, আমরা বিপ্লবী, পুরাতনের মোহ আমাদের জন্যে নয়। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু সুমুখের দিকে। পুরাতনকে ধ্বংস করেই তো শুধু আমাদের পথ করতে হয়। এর মধ্যে মায়া-মমতার অবকাশ কই?"

"সুন্দরবনের মধ্যে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী প্রচার করলে বাঘ-ভালুকের খুশি হবারই কথা।"

—শরৎচন্দ্র (পথের দাবী)

দেশের কৃষিব্যবস্থায় বহুবিধ সংকট

কল্যাণ ঘোষ

ভারতবর্ষের কৃষিপ্রথা অনগ্রসর। এই অনগ্রসরতার প্রধান কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি। বৃটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষে শিল্প বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে কায়েম করেছিল সামন্ততন্ত্রী শোষণ ব্যবস্থা। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এম নানাবতী বলেছেন, বৃটিশ-ভারতে আবাদী জমির সত্তর শতাংশ ভাগ ছিল জমিদারদের হাতে। ইংরেজ আমলে জমিদার এবং মহাজনদের শোষণ এদেশের কৃষককে ভূমিহীন করেছে। ইংরেজ আমলেই সৃষ্টি হয় উপ-মধ্যস্বত্বভোগীর। তখন কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

স্বাধীনতার পরেও কিন্তু ভারতের কৃষি ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় ১৯৫১ সালে, অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়। কিন্তু পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরও ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার সার্বিক রূপান্তর হয়নি। সম্ভব হয়নি কৃষি ব্যবস্থাকে সমস্যার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা। আজ এদেশে অসংখ্য ভূমিহীন কৃষক।

১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষি শ্রমিক পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় অপেক্ষা গড় ব্যয় ছিল একশ আশি টাকা বেশি। ১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষিশ্রমিক পরিবারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল একশো তেতাল্লিশ কোটি টাকা। উনিশশো একান্ন সালের গ্রামীণ ঋণ-জরিপ কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, ছোট কৃষকেরা কৃষিকার্যের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করেছিল তার অর্ধেকই তারা খরচ করেছিল সংসার প্রতিপালনের জন্য। একষট্টি সালের জরিপ কমিটির রিপোর্টেও দেখা গেল যে কৃষকদের অবস্থা পূর্বের মতই আছে, বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

কৃষকদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য "জাতীয় কৃষিঋণ তহবিল" (১৯৫৬), "জাতীয় কৃষিঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল" (১৯৬৮-৬৯), "কৃষিজ পণ্য (উন্নয়ণ ও সংরক্ষণ) করপোরেশন আইন" (১৯৫৬) মারফৎ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা

"দি ইকনমিক টাইমস" সংবাদপত্রের রিপোর্টার বাহাত্তর সালের একুশে জানুয়ারী সংখ্যায় লিখেছেন যে, প্রথম পরিকল্পনায় পনেরো বিঘা জমির মালিক এমন চাষী পরিবারের গড়পড়তা আয় ছিল পাঁচশো ষোল টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চারশো চল্লিশ টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় চারশো দশ টাকা। সেই অনুপাতে দেড়শো বিঘা জমির মালিক ধনী চাষীর আয় বেড়েছে অনেক। ধনী চাষীর আয় বৃদ্ধির হার প্রথম পরিকল্পনায় সাত হাজার একশো ছিয়াত্তর টাকা; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দশ হাজার চারশো পচাশি টাকা; তৃতীয় পরিকল্পনায় চোদ্দ হাজার ছয়শো উনচল্লিশ টাকা। সংখ্যাবৃদ্ধি আমাদের কৃষি-ব্যবস্থাকে উন্নতির জন্য কৃষকদের উন্নতির জন্য কৃষকদের উন্নত ধরণের বীজ সার, রাসায়নিক ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। সেচ ব্যবস্থায় খরচ হচ্ছে প্রচুর অর্থ। এমনকি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। তথাপি ছোট কৃষকেরা ঋণের চাপে ভূমিহীন হচ্ছে।

একদিকে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পরিকল্পনা অন্যদিকে ছোট চাষী ও ধনী চাষীর মধ্যে এই বিরাট আয় বৈষম্য এবং ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাবৃদ্ধি আমাদের কৃষি-ব্যবস্থাকে কোথায় নিয়ে চলেছে একথা ভাবতে হবে। কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে কৃষি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আজ ভারতবর্ষের কৃষকদের ঋণের পরিমাণ দেড় হাজার কোটি টাকা। এই ঋণের অঙ্ক থেকেই বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থার ভয়াবহ চিত্রটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতের কৃষি-সমস্যার প্রধান কারণ ভূমি সংস্কারের অভাব। বৃটিশ আমলে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থা ছিল তিন স্তরে বিভক্ত। জমিদারী, মহালওয়ারি এবং রায়তওয়ারি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারের নীতি গৃহীত হয়। যথা (এক) রাষ্ট্র ও কৃষিজীবীগণের মধ্যে সকল প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর অপসারণ; (কৃষকদের জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান; (তিন) খাজনা হ্রাসের জন্য প্রজাস্বত্ব সংস্কার; (চার) জোতের উর্ধতন মাত্রা নির্ধারণ এবং এর মাধ্যমে জমির পুনর্বণ্টন; (পাঁচ) এ ছাড়াও আছে জোতের সংহতি সাধনের দ্বারা কৃষির পুনর্বাসন সমপদ্ধতিতে কৃষিকার্য এবং সমবায়িক গ্রাম ব্যবস্থার প্রসার।

কিন্তু এত ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও ভারতের কৃষি জীবনে রূপান্তর এল না। কারণ জমিদার প্রথা বিলোপ আইন রয়ে গেল কাগজে কলমে। আইনের ফাঁক দিয়ে জমিদারগণ বেনামীতে জমির মালিক রয়ে গেলেন। ১৯৪৭ সালে "কুমারাপ্পা কমিটি" নামক কৃষি সংস্কার কমিটি দেশের ভূমি সমস্যার ব্যাপক সংস্কারের সুপারিশ করেন। সুপারিশে কমিটি বলেছেন,—ভারতের ভূমি ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের কোন স্থান নেই। জমির প্রকৃত মালিক চাষী।

"জমিদারী উচ্ছেদ" প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ভূমি ব্যবস্থায় কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ, জমিদারী বিলোপ সত্ত্বেও জমিদারগণই বেনামীতে জমির মালিক। পরন্তু, ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের সিন্দুকে উঠেছে প্রচুর টাকা।

ভারতের কৃষি সমস্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পতিত জমি উদ্ধার। ভারতবর্ষের মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ ৩২·৬৮ কোটি হেক্টর। এর মধ্যে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ১৫·৮ কোটি হেক্টর। অনাবাদী জমির পরিমাণ ১·১১ কোটি হেক্টর এবং ১·৭৩ কোটি হেক্টর জমি চাষযোগ্য, কিন্তু অনাবাদী হিসেবে পড়ে আছে।

ভারতবর্ষের মোট আয়ের অধিলোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত। এছাড়াও শতকরা উনিশ জন লোক পরোক্ষভাবে কৃষির ওপরে নির্ভরশীল। মোটের উপর ভারতীয় অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি। ১৯৪৯-৫০ সালে "ফিসক্যাল কমিশনের" রিপোর্টে ভারতের এই কৃষিনির্ভরতার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"Agriculture is not merely an occupation. It is a way of life which for centuries has thoughts and outlooks of many millions of people".

ভারতবর্ষের মোট আয়ের অধিকাংশ উপার্জিত হয় কৃষি থেকে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪৫·৩ ভাগ উপার্জিত হয়েছিল কৃষি থেকে।

ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার বিবিধ সমস্যার মধ্যে প্রধান বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ব্যবস্থা, রাসায়ণিক সারের যোগান, উৎকৃষ্ট শস্যবীজ সরবরাহ, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ফসল সংরক্ষণ ইত্যাদি। এইসব ব্যবস্থার উন্নতির উপর নির্ভর করছে ভারতের কৃষি সাফল্য। স্বাধীনতা লাভের আঠাশ বৎসর পরেও ভারত খাদ্য উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে পারেনি। খাদ্যের জন্য অন্য দেশের অনুগ্রহের ওপরে নির্ভর করতে হয়।

ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে উন্নত করতে হলে সবার আগে কৃষি সমস্যার সমাধান প্রয়োজন এবং তার জন্য কৃষকদের হাতে জমি দেয়া দরকার।

প্রায় দুই দশকের ঐতিহ্য নিয়ে "দর্পণ"-এর জয়যাত্রা আজও অব্যাহত।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষাণ্মাসিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার
৬১নং মট লেন
কলিকাতা-তেরো

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের হুমকি

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম য়ুরোপে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বড় রকমের চোট খেয়েছে। বিশেষ করে কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদপসারণের ঘটনা সবিশেষ উল্লেখ্য। থাইলাণ্ডে প্রতিকূল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। অই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারত দরিয়ায় দিয়াগো গার্থিয়ায় ঘাঁটি শক্ত করে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর শান্তি বিঘ্নিত করছে। সম্প্রতি মার্কিন সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা হুমকির সঙ্গে দিয়াগো গার্থিয়ার ঘাঁটির কথা জোর দিয়ে বলেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আরো ভয় ঢুকেছে। যদি দক্ষিণ কোরিয়া ভিয়েতনামের পথ নেয়। যদি ওখানের মানুষ লাওসের পথ নেয়। সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষা সেক্রেটারী জেমস স্লেলিজার উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ যদি তাদের দেশের জঙ্গী শাহী উৎপাদন করেন তবে তার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করবে। উত্তর ভিয়েতনামের নানদান এই মার্কিন হুমকিকে পারমাণবিক ব্লাকমেল বলে উল্লেখ করেছেন।

সম্প্রতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সুকৌশলে নতুন ধরণের কুৎসা শুরু করেছে। ওয়াশিংটনের মুখপাত্রের কুৎসার নমুনা এইরূপ ঃ "পূর্ব এশিয়ার কিছু অকমিউনিষ্ট দেশ আশংকিত কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেলে আসা অস্ত্রের সাহায্যে হানয় আক্রমণ চালাতে পারে।" সম্প্রতি গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের মুখপত্র নানদান এই মার্কিনী কুৎসার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিকা থেকে বিশ্বের জনগণের দৃষ্টি বিপথগামী করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই অপপ্রচার চালাচ্ছে। পূর্ব এশিয়ার কোন দেশে ভিয়েতনামের কোন সামরিক ঘাঁটি নেই, কোন দখলদার সৈন্যও নেই কিংবা এই দেশের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র ভীতি প্রদর্শনও সে করেনি। অন্যদিকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে সামরিক ঘাঁটি ও দখলদার সৈন্য রেখে দিয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নানা ছুতোয় স্বাধীনতাকামী মানুষের ওপর হামলা করার মতলব করছে। শুধু দক্ষিণ পূর্ব পশিয়ায় নয়, পশ্চিম য়ুরোপে বিশেষ করে ইতালিতে নির্বাচনে ইতালির কমিউনিস্টদের বিপুল জয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ। তাই, এখনই বলতে শুরু করেছে, কমিউনিস্টরা গণতন্ত্র মানে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইতালির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের মতলব করছে।

গ্রন্থ সমীক্ষা

উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস

নেপাল মজুমদার

"সামনে লড়াই" তপোবিজয় ঘোষের রাজনৈতিক উপন্যাস। (সামনে লড়াই ঃ তপোবিজয় ঘোষ, নবজাতক প্রকাশন। দাম ঃ আট টাকা) তপোবিজয় সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নন। ইতিমধ্যেই ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থকারের এইটেই প্রথম উপন্যাস। লেখক ভূমিকায় লিখেছেন, "উপন্যাসের কাল-সীমা মোটামুটি উনিশশো ষাট থেকে সত্তর-এর এপ্রিল মে। এই সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ও আন্দোলন এতে স্থান লাভ করেছে। রাজনীতিই এই উপন্যাসের কুললক্ষণ।"

কথা হচ্ছে, এই ধরণের অতি-সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে নিয়ে কোন সার্থক নাটক-উপন্যাস রচনা করা যায় কিনা বা করলেও তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে কিনা। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম দীনবন্ধুর "নীল দর্পণে"র কথা মনে আসে। এই নাটকে শুধু নীলকুঠিদের অকথ্য অত্যাচারের কথাই বর্ণিত হয় নি, তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধও সৃষ্টি করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কোনো রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেন নি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "গোরা" "ঘরে বাইরে" ও চার অধ্যায় সমসাময়িক জাতীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যভাগে লেখা। "পথের দাবী" সার্থক উপন্যাস কিনা অথবা রোমান্টিক রাজনীতির ইন্ধন যুগিয়েছিল কিনা—সে আলোচনা উহ্য রেখেও বলা যায়, এই রচনাটি হাজার হাজার তরুণ ও যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছে। এইখানেই সমসাময়িক রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রধান সার্থকতা—এবং এই অর্থেই তা সৃজনশীল সাহিত্য। যে সাহিত্য বৃহত্তর জনগণকে প্রগতিশীল সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়, সেই আদর্শের জন্য মরণপণ করে লড়াইয়ের ময়দানে হাজির করে সেই সাহিত্যই সত্যিকারের অর্থে সৃজনশীল।

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা এবং শ্রমিক ও গণ-আন্দোলন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লেখক ও শিল্পীরাও চরিত্র ও মানগঠন অনুযায়ী মোটামুটি দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে দেশ স্বাধীন হবার পর। একদল মার্কসবাদ ও গণ-আন্দোলনের পক্ষে অন্যদল এর বিপক্ষে।

কমিউনিস্ট ভাবধারা বা গণ-আন্দোলনের প্রসার রোধ করা গেল না। দিনের পর দিন তা বাড়তেই লাগল। কেননা কমিউনিজমের অভ্রান্ত সত্যতা তো "ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা" বা "ঈশ্বর আছেন কি নাই" গোছের দার্শনিক তর্ক-মীমাংসা নয়—বাস্তব কারণেই সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আজ তার বিজয়-অভিযান অব্যাহত। আজ বিংশ শতাব্দীর সর্বত্রই মানুষ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম করছে। মানুষ চাইছে এক শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা। অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু সংকট জর্জর পুঁজিবাদী সমাজ চাইছে শোষিত মানুষের এই সংগ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে গুঁড়িয়ে দিতে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ শোষক ও শোষিত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। এই চূড়ান্ত হার-জিতের লড়াইয়ে (final decisive war) নীচের তলার মানুষকে, বৃহত্তর মানুষকে উদ্বোধিত করাটাই একদিন প্রগতি লেখক শিল্পীরা তাঁদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন, এই লড়াইয়ের স্বপ্নই তারা এতকাল দেখে এসেছেন।

তপোবিজয়ের "সামনে লড়াই" সেই আগামী অবশ্যম্ভাবী মহাসমরেরই শঙ্খ ধ্বনি। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গভীর ইতিহাস বোধের এক চমৎকার শিল্প দলিল।

এ উপন্যাসের রচনাশৈলী নতুন নয়, রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" এই আঙ্গিকেই লেখা, কিন্তু উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর সজীবতা ও নাটকীয়তা। লেখক এর ঘটনা ও চরিত্র কল্পনা থেকে সৃষ্টি করেন নি অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করেছেন। এর পাত্রপাত্রীদের এই বাংলার যে-কোনো মফঃস্বল শহরেই দেখা যায়।

আমাদের জীবন ও জীবিকার শত্রু মিত্র এই উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ।

প্রগতি-সাহিত্য ও গণআন্দোলনের সঙ্গে যারাই যুক্ত আছেন, তাঁদের কাছে "সামনে লড়াই" একটি অবশ্য পাঠ্য উপন্যাস।

কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

সবই এই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ। এই সুবিস্তৃত পটভূমিতে প্রকাশ্য শত্রুদের প্রকাশ্য বিরোধিতা যে চ্যালেঞ্জ গড়ে তোলে তার চাইতে অনেক তীব্র চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে ছদ্মবেশীরা যারা আজও পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে আত্মগোপন করে মুক্তিকামী জনতার সংগ্রামী চেতনার নিম্ন মানের সুযোগ নিয়ে নিজেদের অপকর্ম ও অপকৌশল প্রয়োগ করে সর্বহারা আন্দোলনের সংহতিকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই ছদ্মবেশীদের নাম আধুনিক সংশোধনবাদ যার আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের হাতে। এই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদই বলশেভিক রাশিয়ার ভাবমূর্তিকে মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও স্বাধীনতাকামী দেশগুলোতে অনুপ্রবেশ করছে. অর্থনৈতিক সহায়তার নামে চালাচ্ছে অর্থনৈতিক লুণ্ঠন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গড়ে তুলছে বশংবদ একটি গোষ্ঠী যারা বাইরে থেকে বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করছে ও ভেতর থেকে বিভ্রান্ত করছে।

ম্যানিফেষ্টোর কালান্তর পরিক্রমার পথে যে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি প্রতিকূলতার অচলায়তন গড়ে এই পরিক্রমাকে প্রতিহত করতে চেয়েছিল আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ তার ঐতিহাসিক পরিণতি প্রত্যক্ষ করছে। উনিশশো আটচল্লিশ-এ যেমন আজ উনিশশো পঁচাত্তর-এ তেমনি সমস্ত প্রতিকূল আদর্শ ও বৈরী প্রচারের মুখে ছাই দিয়ে ইস্তেহারের বিজয়ী লঙ মার্চের অব্যাহত ধারা মার্কস থেকে মাওয়ে।

প্রতীক্ষা

দীপু মৈত্র

আকাশটা হঠাৎ মেঘে ঢেকে গেল।
বর্ষণের শুরুতেই ভাবনা,
আর যাওয়া যাবে না ঐ উন্মুক্ত প্রান্তরে
যেখানে শুধু খোলা বাতাস।

যে সূর্যটাকে সকালে দেখেছিলাম
সম্ভাবনা ছিল তার
তাপদগ্ধ প্রচণ্ড রৌদ্রে
সে হঠাৎ হারিয়ে গেল
মেঘের আড়ালে।
অনন্ত নীল আকাশে
সাদা সাদা মেঘগুলো
ঘুরে ফিরে খেলছিলো,
রোমান্সের আবেশ ছিল তাতে।

হঠাৎ সব বদলে গেল
মেঘগুলো জমাট বাঁধলো কালো হয়ে
প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া মেঘের গর্জন
আর বিদ্যুৎ চমকে মেঘের সূত্রপাত।

অবিশ্রান্ত বর্ষণে ক্লান্ত আমি
সারাদিন ঘরে বসে
জানলা দিয়ে আকাশটা দেখি
দিন শেষ হয়, অন্ধকার নামে
নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে জেগে থাকি প্রতীক্ষায়
আবার সূর্য উঠবে।

মতামত

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

ন্যায়যুদ্ধের জয় অবশ্যম্ভাবী ঃ ভিয়েতনাম যুদ্ধের শিক্ষা

জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের কাছে সায়গনের পতন এত দ্রুত এবং এর প্রতিক্রিয়া অমন চমকপ্রদ যে, যে থাইল্যান্ড আমেরিকার টাকার ওপর এত নির্ভরশীল ছিল এবং ইন্দোচীন যুদ্ধে এত বেশি জড়িত ছিল সেও "শেষ পর্যন্ত শুনে খুশি যে, সমস্ত ভিয়েতনামবাসীর নিজের দেশকে পুনর্মিলিত করার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমরা (থাইরা) তাদের উত্তম সাফল্য কামনা করি।" আমেরিকার আর এক খরিদ্দার-রাষ্ট্র ফিলিপিনস, যারা একইভাবে যুদ্ধে জড়িত, সায়গন সরকারের শর্তহীন আত্মসমর্পণকে স্বাগত জানিয়েছে। কিসিংগারের মতে "সায়গনের আত্মসমর্পণ ঘটেছে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে দ্রুত।" তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নিয়েরেরের মতে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের বিজয় "উৎসাহব্যঞ্জক"। তিনি আরও বলেছেন, "ভিয়েতনামীরা যা করেছে আমরা যদি তার এক শতাংশও করতে পারি তাহলে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে আমরা স্বাধীনতা আনতে পারব।"

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও নৃশংস যুদ্ধ। একদিকে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ মানুষ "যারা এমন কি বাইসাইকেলও তৈরি করে না" যাদের সংখ্যা চার কোটির কিছু বেশি এবং সামর্থ্য একেবারেই সীমিত। অপরদিকে বিরোধী পক্ষের সামর্থ্য প্রচণ্ড পরিমাণ এবং তারা বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রগামী দেশ। যখন এই বৃহৎ শক্তির কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা ভিয়েতনামকে জয় করতে পারবে না তখন তারা এই দেশটিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করল। ধ্বংসের বিপুলতা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, কেবল দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ ফুট চওড়া ও পাঁচ থেকে কুড়ি ফুট গভীর দু কোটি গর্ত তৈরি হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বিভিন্ন ধরণের রাসায়ণিক অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে এক-অষ্টমাংশ কৃষিজমি উর্বরতাশক্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে।

আজকের ইন্দোচীন বিগতকালের চীন ও কোরিয়ার বৃহৎ সংস্করণ, যেখানে আমেরিকা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যখন দেশীয় স্বৈর-শাসকরা জনগণ কর্তৃক উৎখাত হওয়ার মুখে। তার প্রতিবেশীদের তুলনায় শক্তিশালী হবার পর এবং অতিশক্তি (সুপার-পাওয়ার) বা সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হবার অনেক আগে এই ছিল আমেরিকার নীতি স্পেনের উপনিবেশবাদের সময় থেকেই লাতিন আমেরিকার দেশগুলো এর উদাহরণ। সবসময় লক্ষ্য ছিল, দেশীয় স্বৈর-শাসকদের পতনের হাত থেকে রক্ষা করে সেই দেশে নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কায়েম করা। এমন কি পেন্টাগন পেপার্স থেকেও এটা পরিষ্কার, যেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখানো হয়েছে আমেরিকা কিভাবে ইন্দোচীন যুদ্ধে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়েছে। এতে বলা হয়েছে ১৯৪২ সালের তিরিশে ডিসেম্বর জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতিক্রমে এশিয়ায় কমিউনিজমের অধিকতর সম্প্রসারণ (সিক) রোধ করার জন্য আমেরিকা সক্রিয় হয়েছে। স্মরণীয় যে, সেই সময় ভিয়েতনাম বা চীন কোনও দেশই কমিউনিস্ট হয়নি; পরন্তু কমিউনিস্টরা তখন মিত্রশক্তির মিত্র ছিল। 'কমিউনিস্ট অগ্রগতিকে' বাধা দেবার প্রয়াসে আমেরিকা সবসময় সারা বিশ্বের বিশেষ করে এশিয়ার সবচেয়ে জন-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে অদত্ত দিয়েছে। এবং সকলেই জানেন মার্কিন অস্ত্র ও ডলার পেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা জনগণের ন্যূনতম দাবিকেও নির্মমভাবে দমন করেছে।

দিয়েন বিয়েন ফুর সময় থেকে থিউ শাসনের শেষ পর্যন্ত আমেরিকার প্রধান নীতি হল জেনেভা চুক্তিতে উল্লিখিত ভিয়েতনামের পুনর্মিলনে বাধা দেওয়া। কারণ পরিষ্কার। আমেরিকা ভালভাবেই জানে যে, ইন্দোচীন সংগ্রামের সাফল্যের প্রভাব পড়বে পৃথিবীর অন্য দেশে, বিশেষ করে এশিয়ায়। উপরন্তু জনগণের বিজয় বহু অঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে উৎখাত করবে এবং দুর্বল করবে। সাম্রাজ্যবাদ এটা মেনে নিতে রাজী নয়। সেইজন্য ইন্দোচীনে এত ঘটনা এবং আমেরিকাতেও। সেইজন্য সমগ্র মার্কিন সমাজের সামরিকীকরণ। সেইজন্য আক্রমণ চালাতে সারা বিশ্বে দু হাজার সামরিক ঘাঁটি। সেইজন্য ইন্দোচীনে ষোল কোটি কোটি ডলার, লক্ষ লক্ষ ভাড়াটে সৈন্য জাহাজভর্তি হাজার হাজার ন্যাপাম, বায়োলজিক্যাল ও কেমিক্যাল বোমা এবং হাজার হাজার বিমান প্রেরণ। সেইজন্য ভিয়েতনামকে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে আমেরিকার পক্ষে প্রতিরক্ষার প্রথম সারি হিসেবে।

ভিয়েতনাম দুই বিরোধী শক্তির আধিপত্য লাভের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। শোষিত শ্রমজীবী মানুষ যারা উৎপাদন করে ও শাসক যারা কেড়ে নেয় এবং তাদের মতাদর্শ। ইন্দোচীন যুদ্ধের ফলাফল এই ঐতিহাসিক সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে যে, জনগণের বৈপ্লবিক শক্তি অপরাজেয় কারণ তারা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রতিভূ। তারা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ আকার নেয়। ১৭৭৫-৮৩ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তখনকার সর্ববৃহৎ শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি (যার লোকসংখ্যা তিন কোটি) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার উত্তর আমেরিকার কলোনীতে নব্বুই লক্ষ সৈন্য পাঠিয়েছিল। আমেরিকার লোকসংখ্যা তখন মাত্র তিরিশ লক্ষ। তাদের ছিল মাত্র কয়েকটি মান্ধাতা আমলের বন্দুক, কয়েকটি গেরিলা বাহিনী ও কিছু সামরিক বাহিনী। প্রথমে আমেরিকানরা অনেক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশের বহু ভূখণ্ড ব্রিটিশ আক্রমণকারীদের কাছে হারিয়েছিল। কিন্তু জনগণ ও প্রগতিশীল শক্তির দ্বারা সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে শেষ পর্যন্ত তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ন্যায়যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল যার পরিণতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হয়েছিল।

সমস্ত দেশের পরজীবীরা জোট বেঁধেছিল ভিয়েতনামের ক্লেদকদের দাবিয়ে রাখার জন্য এবং তার ফলেই শুরু হয়েছিল ভিয়েতনামের যুদ্ধ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের শিক্ষা ঃ মানুষকে চিরকাল দাবিয়ে রাখা যায় না, পরজীবীদের ধ্বংস অনিবার্য, ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হবেই একদিন। যেখানেই অত্যাচার সেখানেই ভিয়েতনামের পথ একমেবাদ্বিতীয়ম।

ইঁদুর বিপ্লব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের ইঁদুর দেখতে পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায়, নেংটি, মাঝারি ও ধেড়ে ইঁদুর। এরা পুরোনো দুর্গন্ধযুক্ত জুতো থেকে শুরু করে সুস্বাদু সুগন্ধি মাখন পর্যন্ত সবই খায়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রক দেশের "শস্য সংরক্ষণ" অভিযানের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৩৩,৯০০,০০০ টাকা অনুমোদন করেছেন। এর মধ্যে ৫,০০০,০০০ টাকা অনুমোদিত হয়েছে ইঁদুর জাতীয় জীব প্রতিরোধের জন্য।

ধান চাষে এফ সি আই-এর সুফলা ও ইউরিয়া সার ব্যবহার ক'রে কম খরচে বেশি ফসল ঘরে তুলুন। আজকাল চাষবাসের কাজে অনেকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এফ সি আই-এর সার ব্যবহার ক'রে কম খরচে লাভের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে তুলছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি এফ সি আই-এর রাসায়নিক সারে উচ্চ গুণমান পুরোপুরি বজায় থাকে। নিজস্ব রঙ থাকায় ভেজালের ভয় থাকে না। দানাযুক্ত ব'লে প্রয়োগের সময় নষ্ট হয় না, আর সহজেই জলে গুলে ছিটোনো যায়।

প্রয়োজনমত সারের জন্য আপনার এলাকার এফ সি আই ডীলার বা কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁরা আপনাকে সবরকম সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্য সবসময় প্রস্তুত।

চাষের কাজে বেশি ফলন ও বাড়তি লাভের জন্য ব্যবহার করুন—

সুফলা
২০ : ২০ : ০
১৫ : ১৫ : ১৫

ইউরিয়া

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিঃ

আঞ্চলিক শাখা : মুচিপাড়া, দুর্গাপুর-১২ ● ক্ষুদিরাম বসু রোড, মেদিনীপুর ● শহীদ সূর্য সেন স্ট্রীট, মুর্শিদাবাদ ● বিধান রোড, শিলিগুড়ি ● ৫৮, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

Progressive/FCI/1-73

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান কোঅপারেটিভ কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

দর্পন

১৮শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৮ই জুলাই '৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

পাটকলওয়ালাদের নতুন আবদার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পাটকল মালিকরা কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বায়না ধরেছে যে রপ্তানীর জন্য পাটজাত পণ্যের ওপর সরকারী অনুদানের প্রয়োজন। অর্থাৎ মালিকরা যে দাম পেতে চায়, বিদেশের বাজারে দাম তার থেকে কম। যতটা কম সেইটে কেন্দ্রীয় সরকার নিজ তহবিল থেকে মালিকদের পকেটে দিক। মোটামুটি ওদের এই আবদার। যুক্তি হিসেবে ওরা বলছে ভারতীয় কাপড়কল মালিকরা বস্ত্র এবং অন্যান্য তুলাজাত পণ্যের জন্য অনুরূপ অনুদান পেয়ে থাকেন।

এই বায়না শুনে দেবীবাবু বেশ ক্রুদ্ধ। মাত্র কয়েকদিন আগে মালিকদের সমস্ত যুক্তি বিশ্লেষণ করে পাটজাত পণ্যের ওপর রপ্তানী শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছে। মালিকরা বলেছিল এই শুল্কের জন্যই বিদেশীবাজারে আমাদের জিনিসের দাম বেশী হয়ে যায়। সুযোগ পেলেই মালিকরা শুল্ক প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে। নানা ধরণের চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। যেমন, উৎপাদন শতকরা বারো থেকে পনেরো ভাগ কমিয়ে দেয় আর বদলী শ্রমিকদের ছাঁটাই করে দেয়। এমন হাল্লা তোলে যেন পাটশিল্প প্রায় উঠে যাওয়ার অবস্থা।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী কলকাতায় সাম্প্রতিক এক সম্মেলনে পাটকল মালিকদের তিরস্কার করে বলেন ঃ তোমাদের অনেক সুবিধে দেওয়া হয়েছে। আর তোমরা তার বদলে শিল্পের উন্নতির জন্য কিছুই কর নি। এই ব্যবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না। আর বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে তোমাদের তুলনা হতে পারে না। ওরা কমদামী কাপড় তৈরী করে অন্ততঃ কিছুটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। আর তোমরা পাট চাষীকে মেরে, শিল্প শ্রমিককে ঠকিয়ে আর রপ্তানীর দামে কারচুপি করে খালি নিজেদের মুনাফার পাহাড় তৈরী করছে গত দুই দশক ধরে। অতএব তোমাদের আব কোন সুযোগ দেওয়া যায় না।

দেবীবাবু বলেছেন যে, এত মুনাফা অথচ তার সামান্যতম অংশ

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে রামমোহন

কল্যাণ ঘোষ

দেশীয় সংবাদপত্রের বিকাশে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম সাময়িকপত্রকে রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রামমোহনের কলকাতায় বসবাস শুরু হবার কয়েক বছর পর শ্রীরামপুরে মিশনারীরা প্রথম বাংলা পত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। মিশনারীরা পর পর "দিগ্‌দর্শন" ও "সমাচার দর্পণ" প্রকাশ করলেন আঠারোশো আঠার সালে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মের মহাত্ম্য প্রচার। এ ছাড়া "সমাচার দর্পণ"-এর "পত্র প্রেরকের বক্তব্য স্তম্ভে তাঁরা হিন্দুধর্মের প্রতি কটাক্ষ করতেন। বহুদিন ধরেই রামমোহন একটি বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের কথা ভাবছিলেন। মিশনারীদের আক্রমণের মুখে দেশীয় সংবাদপত্রের প্রয়োজন আরো বেশি করে অনুভূত হল। আঠারোশো একুশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন একাই দ্বিভাষী মাসিক "ব্রাহ্মণ সেবধি" (ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন) প্রকাশ করেন। এই দু'পাতার পত্রিকাটি তিনি শিবপ্রসাদ রায় ছদ্মনামে প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকাটি খৃষ্টান মিশনারীদের প্রশ্নের জবাবদানের জন্য ব্যবহার করা হত।

রামমোহনের "ব্রাহ্মণ সেবধি" চেহারা ও চরিত্রের দিক থেকে কোনমতেই সংবাদপত্র ছিল না। এটি ছিল ইস্তাহারের উন্নততর রূপ। তাই আঠারোশো একুশ সালের চৌঠা ডিসেম্বর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও রামমোহনের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রকাশিত হল "সংবাদ কৌমুদী"। রামমোহন এই পত্রিকায় চিন্তামূলক রচনা লিখতে শুরু করেন। ভারতীয় স্বার্থবিরোধী বৃটিশ আইনকানুনের বিরুদ্ধেও তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। আঠারোশো পঁচিশ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া জুরি বিল গৃহীত হল। এই বিলের নির্দেশানুসারে শুধুমাত্র খৃষ্টানদের নিয়েই "গ্রাণ্ড জুরী" গঠিত হবে। রামমোহন এই বিলের কঠোর সমালোচনা করে বললেন—"ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিচারকদের সমন্বয়ে সাধারণ বিচারকমণ্ডলী গঠন করা উচিত"। এক কথায় নতুন যুগের উন্মেষশালী চিন্তার ছাপ ঐ পত্রিকায় বিধৃত ছিল।

রামমোহন আঠারোশো বাইশ সালের এপ্রিল মাসে ফার্সী ভাষায় "মীরাৎ-উল-আখবার" প্রকাশ করেন। কিন্তু আঠারোশো তেইশ সালের মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক কঠোর আইনের প্রতিবাদে তিনি ঐ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেন। ঐ পত্রিকা তাঁর পরিপক্ক চিন্তার নানা সাক্ষ্য বহন করছে। এই পত্রিকাটি স্বল্পায়ু হওয়া সত্ত্বেও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সুদূর প্যারিসেও এই পত্রিকাটির গ্রাহক ছিল।

এছাড়া রামমোহন আঠারোশো উনত্রিশ সালে প্রকাশিত "ব্রহ্মপত্র" পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

আঠারোশো তেইশ সালে অস্থায়ী বড়লাট অ্যাডম ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে একটি কুখ্যাত আইন জারী করেন। আঠারোশো তেইশ সালের সতেরই মার্চ এই আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন ও তাঁর পাঁচ বন্ধু সুপ্রীম কোর্টে ও পরে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করেছিলেন। রামমোহনের বন্ধুরা হলেন—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ ব্যানার্জী। তাঁদের আবেদন অবশ্য যথারীতি অগ্রাহ্য হয়। আবেদন অগ্রাহ্য হবার পরই রামমোহন "মীরাৎ-উল-আখবার" বন্ধ করে দেন এবং শেষ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন—"যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয় কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।"

পরে রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী সোফিয়া ডপসন উপরিউক্ত অগ্রাহ্য আবেদন পত্রটিকে তুলনা করেন মিল্টনের "এ্যারিওপ্যাজিটিকা"র সঙ্গে।

চিলি কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা লুই করভালের জীবন বিপন্ন

চিলি কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী লুই করভালের জীবন বিপন্ন। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে এবং তাঁকে অজ্ঞাত কারণে ট্রেস আলামোজ বন্দিশিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

করভালের জঘন্য অত্যাচারের আশঙ্কা রয়েছে। সামরিক জুন্টা করভালের জনপ্রিয়তায় ভীত, তাই তাঁকে খতম করার চেষ্টা করছে।

তেয়াত্তর সালের উনত্রিশে সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট সালভাদোর অ্যালান্দেকে রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করার আঠারো দিন পর চিলির কমিউনিস্ট নেতা করভালকে গ্রেপ্তারের খবর প্রচার করা হয়।

গত বছর মেক্সিকান দৈনিক একসেলসার খবর দিয়েছে যে, করভাল একটি আন্তর্জাতিক কমিশনকে বলেছেন তাঁকে এবং অন্য সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে (যাঁরা ডসন দ্বীপে আছেন) ভোর দুটায় উঠে একটি নোংরা খাল পরিষ্কার করতে হয় এবং সেখানকার জল নিয়েই বন্দিদের জন্য রান্না হয়। তাঁদের আরও অভিযোগ যে, বন্দিদের আত্মীয়রা যেসব আহার্য দিয়ে যায় অফিসাররা সেগুলো চুরি করে।

অ্যালান্দে সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জর্জ তাপিয়া যিনি রিটে.কে করভালের সঙ্গে কারারুদ্ধ ছিলেন কয়েকদিন আগে বলেছেন যে, ফ্যাসিস্তরা করভালের ওপর বিশেষভাবে জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছে। তাঁকে চুয়াত্তর সালের মাঝামাঝি ওখানে নিয়ে যায় এবং বাধ্যতামূলক শ্রম হিসেবে তাঁকে বালি বা কালির বস্তা ও ইঁট ভর্তি গাড়ি ঠেলে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভারী কাঠের গুঁড়িও তাঁকে বহন করতে বাধ্য করা হয়।

এ খবরও পাওয়া গেছে যে, ফ্যাসিস্তদের অত্যাচার করভালের মনোবল ভাঙ্গতে পারে নি। তাঁর সংগ্রামী মনোভাব সম্পূর্ণ অটুট।

দু বছর ধরে সামরিক জুন্টা একটা মামলা খাড়া করার চেষ্টা করছে যাতে সামরিক আদালতে করভালের বিচার করা যায়। চুয়াত্তর সালের উনত্রিশে মে ঘোষণা করা হয় কুইলোটা ক্যাভেলরি স্কুলে তাঁর বিচার হবে। কিন্তু এখনও সেই বিচার হয় নি—অন্ততঃ প্রকাশ্যে।

ফ্যাসিস্ত জুন্টা করভালের প্রকাশ্য বিচারে ভয় পাচ্ছে। তাই বার বার বিচারের ঘোষণা সত্ত্বেও তারা পেছিয়ে যাচ্ছে। ফ্যাসিস্ট জুন্টা করভালের পক্ষসমর্থনের জন্য কোন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীকে চিলিতে আসতে দিতে রাজি নয়। চিলির অ্যাটর্নি ফার্নান্দো অসটোরনলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তিনি আজও কারাগারে।

সম্প্রতি করভালের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দেয় যখন রটে যায় যে, জেল থেকে পালানোর অজুহাত সৃষ্টি করে তাঁকে এবং অপর কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দিকে হত্যা করা হবে।

করভালের জীবন এখনও বিপন্ন এবং যতদিন তিনি ফ্যাসিস্তদের কারাগারে থাকবেন ততদিন বিপদমুক্তির কোন আশা নেই।

সামান্য বিদ্যুৎ বিলের জন্যও সারচার্জ

বালিচক, তেসরা জুলাই ঃ বালিচক ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে মোমবাতি জ্বালিয়ে ক্যাশ ক্লার্ক বিল নিচ্ছেন। বিলের পরিমাণ বেশির ভাগ গ্রাহকদের এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা থেকে পাঁচ টাকা অব্দি। দশ টাকা বিল হয়েছে এমন গ্রাহকের সংখ্যা নেই বললেই হয়। এরকম বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাতে গ্রাহকদের সারচার্জ দিতে হচ্ছে।

সাট্টা খেলা পুরোদমে চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার সর্বত্র এখনও সাট্টা খেলা চলেছে। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে সাট্টা খেলার প্রবণতা বেশি। এছাড়া বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, গৃহিনীদের মধ্যেও সাট্টা জনপ্রিয়। সাট্টা খেলায় এক টাকা বাজি রাখলে পাওয়া যায় নয় টাকা, একাশি টাকা এবং একশো টাকা। বাজি ধরার আবার তিন ধরণের নিয়ম আছে। ডবল, সিঙ্গল ইত্যাদি।

ঠিক রেসের বুকির মত, এই খেলার জন্য রয়েছে পেনসিলার। এই পেনসিলাররা আবার কমিশন পায়। এই সব পেনসিলারদের ওপরে আছে বড়বাজারের মাথা। খেলা হয় বোম্বাইতে। দিনে দুবার খেলা হয়। টেলিফোন মারফৎ সংবাদ আসে। খেলার ফলাফল জানবার জন্য ছোটছুটি হয়। জনসাধারণ যারা বাজি ধরেছেন তারাও উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেন খেলার ফলাফলের জন্য, কেননা তাতে তাদের ভাগ্য জড়িত।

সরকার এই খেলাকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছেন। তা সত্ত্বেও এই খেলার প্রসার দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় অনেকে চিন্তিত। বিশেষ করে যুবসমাজকে এই সাংঘাতিক খেলার জাল থেকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে এই খেলা বন্ধ করা দরকার।

কমিউনিষ্ট সমাজ ও মানুষের প্রয়োজন

সঞ্জয় সেন

মৌলিক প্রয়োজনগুলি পূরণ না করতে পারলে মানুষ বাঁচে না, কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন ও কৃত্রিম প্রয়োজন সম্পর্কে সে কথা খাটে না। প্রকৃত প্রয়োজনগুলির যেমন কার্যকারিতা ও উপযোগিতা আছে কিন্তু কৃত্রিম প্রয়োজনগুলি মানুষ কেবল অভ্যাসবশে পেতে আগ্রহী হয়। জীবনযাত্রার তথাকথিত মান-উন্নয়ন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের নামে নিত্য নূতন প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকর পণ্য তৈরী করে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ক্রমশ মানুষকে ঐ সব জিনিস ব্যবহার করায় অভ্যস্ত করা হয়েছে, ফলে ঐ পণ্যগুলির বাজার ক্রমশই বাড়ছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি চা, কফি প্রভৃতি প্রথমে কিভাবে নামমাত্র মূল্যে বাজারে ছেড়ে মানুষকে ঐগুলিতে অভ্যস্ত করা হয়েছে। প্রকাশ্যে বা গোপনে মানুষের কাছে নানা প্রকার মাদক দ্রব্য পৌঁছে দিয়ে তাকে নেশার দাস করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে এইগুলির প্রতি যত আশক্তি বাড়ছে, ততই মুনাফা বাড়ছে। কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে। অভ্যাসও তাই। মানুষ অভ্যাসের দাস। যত বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারের অভ্যাস বাড়ছে, ততই কাম্য অথচ এমন বহু জিনিস ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত, যেগুলির ব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় জিনিস না পেলে অভাব ও অশান্তি বাড়ছে, মানুষ তত্ই অসুখী হচ্ছে। মানুষ পেটে ভাত না থাকলেও বিলাসকাঁসন ও বিকৃত উপভোগের পেছনে অন্ধের মত ছুটছে। ফলে অতি দ্রুত পণ্য-সঞ্চালন হচ্ছে এবং মুনাফার পাহাড় গড়ে উঠছে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এক দিকে আছে অল্প কিছু "হ্যাভ"-এর দল, যারা উৎপাদন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাদের হাতে বিপুল সম্পদ, তারা যখনই যা প্রয়োজন মনে করে ছিনিয়ে নেয় এবং নিত নূতন উৎপাদনের মধ্য দিয়ে তথাকথিত প্রয়োজনের পরিধিকে বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও কোটি কোটি "হ্যাভ-নট"-এর দল ভালভাবে মৌলিক প্রয়োজনটুকুও পূরণ করতে পারে না। এইটাই কিন্তু তাদের জীবনের চরম ট্রাজেডী নয়, তাদের জীবনের চরম ট্রাজেডী হচ্ছে, তারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে শোষকশ্রেণীর বিকৃত অভ্যাসগুলির দাস হয়েছে। তাদের যার পক্ষে যখনই সম্ভব তারা শোষকশ্রেণীর উপভোগের উপকরণগুলির ছিটে ফোঁটা সংগ্রহ করে এবং স্বপ্ন দেখে, তাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা এলে তারা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে যাবতীয় কাম্যবস্তু।

তারা শোষক শ্রেণীর জীবনদর্শনের পাল্টা জীবনদর্শনকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে না। ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক শৃংখলকে তারা অপূর্ব সাহস, আত্মত্যাগ ও সংগঠন শক্তিতে ছিন্ন করে মুক্তিলাভ করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করে, কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু ধনিক শ্রেণীর পাল্টা জীবনদর্শন, সংস্কৃতি ও সুস্থ প্রয়োজনবোধকে দৃঢ়ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনা। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের নামে তারা ধনিক শ্রেণীর উপভোগের অভ্যাস ও উপকরণগুলিকে ক্রমশ আয়ত্তে আনার মধ্যে সুখের সন্ধান করে। অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত সর্বহারা শ্রেণীর জীবনের একটা বড় অংশ পূর্বার্জিত অভ্যাসগুলি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

লেনিন সতর্ক করে দিয়ে লিখেছিলেন

The dictatorship of the proletariate is a persistent struggle—bloody and bloodless, violent and peaceful—military and economic, educational and administrative, against the forces and traditions of the old society.

The force of habit of the millions and tens of millions is a most terrible force.

(Left-wing communism An Infantile Disorder.)

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্ধশতাব্দীর বেশী দিন হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত সর্বহারাশ্রেণী কি ঐ লেনিনোক্ত "ফোর্সেস অব হ্যাবিট" থেকে মুক্ত হয়ে সর্বহারাশ্রেণীর পাল্টা জীবনদর্শন, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং হ্যাবিটে অভ্যস্থ হয়েছে? স্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের তীর্থযাত্রা কি সার্থক হয়েছে? বাস্তব দৃষ্টান্ত বার বার প্রমাণ করছে, না তা হয়নি। অন্যদিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্র আমেরিকায় বেশ একটা বড় সংখ্যার মানুষ আজ জীবনযাত্রার যে উপকরণগুলি ভোগ করে আমাদের মত গরীব দেশের বেশ ধনী লোকেরাও তা পায় না। কিন্তু তারা কি সুখী হয়েছে? গাঁজা, কোকেন, মদ, অবারিত যৌন-উপভোগ এমনকি হত্যা লুন্ঠন—সব কিছু করেও তারা সুখ পাচ্ছে না, হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছে, অনেকে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। বৈচিত্র্যের সন্ধানে কিছু মানুষ মাথায় টিকি রেখে, গায়ে নামাবলি জড়িয়ে কীর্তন শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে আজ স্টালিন দুহিত সুখের সন্ধানে ধনিক রাষ্ট্রের অতিথি। কৈশোর থেকে "সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে" লালিত পালিত হয়েও বেশ কিছু মধ্যবয়স্ক বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক সুখের সন্ধানে একই পথের পথিক।

মানুষ তাহলে কি পেলে সুখী হবে, শান্তি পাবে? সুখ শান্তি আসে পরিতৃপ্তি থেকে। মানুষ আজও অনেক কিছু পায়নি সত্য, কিন্তু পেয়েছেও অনেক। জীবন যাত্রার মান আজ কত "উন্নত"। কিন্তু তবুও মানুষ সুখী নয়, তৃপ্ত নয়। লেনিন সুখী মানুষের কথা বলতে গিয়ে সেই কমিউনিস্টদের কথা বলেছেন, যারা কমিউনিস্ট সমাজ গঠন করবে।

Communist labour in the narrower and stricter sense of term is labour performed in gratis for the benefit of the society. Labour performed not as a duty, not for the purpose of obtaining right to a certain product—labour performed without expectation of reward. Labour performed out of a habit of working for common good and out of a conscious realisation (because of habit) of the necessity for common good—labour as the requirement of healthy organism. (The Great Beginning.)

অর্থাৎ মানুষ যখন কিছু পাওয়ার তাগিদে পরিশ্রম করবে না, পরিশ্রম করবে সমাজের মঙ্গল করার অভ্যাস বশে, পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করবে, তখনই মানুষ প্রকৃত সুখী হবে। তখন আর তার প্রয়োজনবোধ আত্মকেন্দ্রিক থাকবে না এবং তার প্রয়োজনের প্রকৃতি, পরিমাণ ও পরিধি এমন সুস্থ সমাজ-সচেতন অভ্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে যে, তখন "প্রত্যেককে তার প্রয়োজন মত" দেওয়া সম্ভব হবে।

কমিউনিস্ট সমাজের রূপ-রেখা এখনও অস্পষ্ট এখনও বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে ও চলবে বহু সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। তবে একটা ভুল ধারণা নিশ্চয়ই ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য যে "টু ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ নীড" বলতে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, কমিউনিস্ট সমাজে যে যা চাইবে তাই পাবে। ২+২=৪ এর সরল গণিতিক সূত্রের মত তো অন্যান্য দেশ সহ আমাদের দেশেরও কমিউনিস্ট এম পি ও এম এল এরা বলতে পারেন যে জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের পথে তাঁরা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন। একমাত্র স্থায়ী মস্তিষ্ক ছাড়া ভোগ সুখ ও প্রভাব প্রতিপত্তির বেশ একটা সিংহভাগ তাঁদের কপালে জুটেছে। না কমিউনিজমের ধারে কাছেও তাঁরা যাননি এবং কোনদিন যেতে চাননি। ঐ একই সূত্র অনুযায়ী "প্রত্যেককে তার প্রয়োজন মত" অর্থে যদি মনে করা হয় যে কমিউনিস্ট সমাজে যে যা চাইবে, তাই পাবে, সকলে যদি একটি করে মোটর গাড়ী চায়, আবার কিছুদিন পরে একটি করে এরোপ্লেন চায়, দেওয়া সম্ভব হবে, তো মারাত্মক ভুল ধারণা করা হবে। এই রকম উৎপাদন ব্যবস্থার কথা একমাত্র উন্মাদেরাই ভাবতে পারে।

কমিউনিস্ট সমাজে প্রত্যেককে তার প্রয়োজনমত দেওয়া সম্ভব হবে এই জন্য যে কমিউনিস্ট সমাজ গড়বে নতুন মানুষেরা, যারা অভ্যাস বশে মৌলিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের বাইরে কোন কিছুর জন্য অভাববোধ করবে না। কোন কিছুরই অপরিমিত উপভোগের অভ্যাস তার মনকে প্রভাবিত করবে না। প্রভাব প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মোহ, খ্যাতি বা প্রশংসার লোভ এবং নিজের স্বার্থে কিছু করার অভ্যাস থেকে সে সম্পূর্ণভাবে এবং স্বেচ্ছায় মুক্ত হবে। পরিশ্রম তার কাছে সৃষ্টির ও আনন্দের সিংহদ্বার খুলে দেবে। বহু কঠোর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সে অতীতের ক্ষয়িষ্ণু অভ্যাস ও আচরণের শৃংখলকে ছিন্ন করে নব সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্তির পারাবারে মহামানবকে অভিযান জানাবে। পৃথিবীকে আবার মানুষের বাসযোগ্য করে তুলবে। জীবযাত্রার ইতিহাসে এ সাধনা হচ্ছে মহা বিপ্লবের সাধনা। এ বিপ্লবে পার্লামেন্ট বা পর্ণ কুঠির যেখানেই একজন কমিউনিস্ট থাকবেন, নিজের জীবনে ও সামাজিক জীবনে প্রয়োজনের প্রকৃতি, পরিমাণ ও পরিধিকে মৌলিক ভাবে বদলাবার কাজে নেমে পড়তে হবে। বিকৃত পঙ্কিল জীবন যাত্রায় গা ভাসিয়ে দিয়ে মার্কস, এংগেলস, লেনিন স্ট্যালিন মাও সে তুং-এর "কোটেশন" মন্ত্রের মত পাঠ করলে ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপেই শেষ অবধি স্থান হবে।

নতুন আবদার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মাত্রও শিল্পকে আধুনিকীকরণের জন্য খরচ করা হয় নি। পাটচাষে কিভাবে অধিক ফলন হতে পারে, শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা পাট থেকে মামুলী পণ্য না তৈরী করে নানা ধরণের জিনিষ তৈরী করার গবেষণা ইত্যাদি কিছুতেই শিল্প মালিকরা নজর দেয় নি। ফলে আজ শিল্পের দুস্থ অবস্থা। এর জন্য মালিকরাই সম্পূর্ণ দায়ী।

ভারতীয় পাটকল সমিতির চেয়ারম্যান বি জি বাঙ্গুর বয়সে নবীন, কিন্তু পাকা মাথা। মন্ত্রীর ভর্ৎসনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শিল্পের নানা উন্নতি যে সম্ভব তা মেনে নেন অতি বিনীতভাবে। বলেন, মালিকদের সত্যিই অনেক কিছু করণীয় আছে। মালিকরা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কিন্তু বিদেশের বাজারে যদি মাল বিক্রী না হয় তার কি ব্যবস্থা হবে?

বাঙ্গুর, ঘাঙ্গুরিয়া, মোটা সিংহানিয়ার দল জানে যে সরকারী ভর্ৎসনা গায়ে মাখলে চলবে না। নিজেদের দাবীর কথা বার বার বলতে হবে। এই কৌশলে আগে কাজ হয়েছে। ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই হবে এই ওদের বিশ্বাস।

এদিকে পাটচাষের অবস্থা ভাল নয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাটচাষ প্রায় উঠে যেতে বসেছে মোট তের লক্ষ একরে পাট চাষ হত। আর প্রায় কুড়ি লক্ষ পরিবার এই চাষের বিভিন্ন কাজ কারবারে জড়িত ছিল। তাদের অবস্থা খুব খারাপ। সরকারী হিসেব মতে চলতি মরশুমে মাত্র ছয় লক্ষ একরে পাটচাষ হয়েছে। অর্থাৎ জমিওয়ারী হিসেবে অর্ধেকেরও কম। এ থেকে পাট উৎপাদন চল্লিশ গাঁট থেকে কমে বিশ লক্ষ গাঁট হয় কিনা সন্দেহ।

কৃষিমন্ত্রী আবদুস সত্তার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন চাষীরা পাটের দাম পায় না। তাই পাট চাষে ওদের আগ্রহ নেই। বরং ওরা পাটের জমিতে আউস ধান বুনে বেশী দাম পেতে পারে।

পাটের দাম যাতে ফাটকাবাজরা কমাতে না পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পাট কর্পোরেশন গঠন করে তিন বছর আগে। কিন্তু কর্পোরেশন নানা বাধার মধ্যে ঠিকমত বাজারে নামতে পারে নি। আর তাছাড়া ফাটকাবাজরা চাষীদের ঘরে গিয়ে দাদন দিয়ে ফসল ওঠার আগেই উৎপাদন কব্জা করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পাট কর্পোরেশনকে নিজ অস্তিত্বের তাগিদে সরাসরি চাষীর কাছ থেকে পাট না কিনে কিছু পাট এই ফাটকাবাজদের কাছ থেকে কিনতে হয়। গত বছর কর্পোরেশন ঠিক করেছিল বিশ লক্ষ গাঁট পাট কিনবে। কিনেছে ছয় লক্ষ গাঁট। এবং তাও চাষীর কাছ থেকে নয়। মালিকদের পেটোয়া ফড়িয়াদের কাছ থেকে।

পাট চাষ ও শিল্পের ইতিহাস অধুনালুপ্ত নীল চাষের মতই ভয়াবহ। পরে আরও বিশদ আলোচনা করা যাবে। সকলেই আশা করে যে দেবীবাবু এইবার পাটকল মালিকদের সায়েস্তা করবেন।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস

৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৪১৯৪৩

Space Donated by a welwisher

নেহরুর চোখে সোভিয়েত রাশিয়ার কারাগার

শিবাজী ভট্টাচার্য

আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার পর যখন থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, তখন থেকেই দেখা দেয় দমন-পীড়নের যন্ত্র ও কারাগার। দাস-প্রভুরা বন্দীশালায় ক্রীতদাসদের সামনে ক্ষুধার্ত সিংহ ছেড়ে দিয়ে নারকীয়, পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করত। সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতেও কারাগার আছে। এই তো সেদিনকার খবরে প্রকাশ যে, আমেরিকায় ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে তাপনিয়ন্ত্রিত বহুতলবিশিষ্ট কারাগার তৈরী করা হচ্ছে। আমাদের এই রাজ্যের ষোলটি জেলায় বাহান্নটি কারাগার আছে। দুর্গাপুরে আর একটি বান্দনোর কথা চলছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কারাগার থাকবেই। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও কারাগার আছে, যেহেতু সেখানে এখনও শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান হয় নি। উনিশশো আঠাশ সালে যখন আমাদের আশাভরসার স্থল ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যেখানে স্তালিনের নেতৃত্বে পাঁচশালা পরিকল্পনা চালু হয়েছিল, তখন পণ্ডিত নেহেরু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণে যান এবং জনজীবনের সর্বস্তরে পরিকল্পিত ব্যাপক উন্নতি দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। সেখানকার বন্দীশালা দেখে তিনি বলেছিলেন, "নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাশিয়ার কোন কারাগারে বন্দী থাকা, ভারতের যে কোন কারখানায় দৈনিক দশ-এগারো ঘন্টা খাটার পর পশুর মত অন্ধকার, বাতাসহীন বস্তিতে বাস করা অপেক্ষা অনেক ভালো।"

নেহেরু ও তাঁর সঙ্গীরা মস্কোর এক জেল পরিদর্শনে গেলে সেখানকার গভর্ণর তাঁদের ইচ্ছামতো যে কোন সেলে যাবার অনুমতি দেন। নেহেরুর মতে, সেলগুলো সরু এবং প্রতিটি সেলে দুটো অথবা তিনটে খাটিয়া থাকতো। হাড়-কাঁপানো শীত এড়ানোর জন্য সেলে জানালা বসানো হত না। খুব যে একটা পরিষ্কার, তাও নয়। কিন্তু প্রতিটি সেলে বেশ কিছু বই রেখে দেওয়া হতো এবং দুটি সেলে রেডিও সেটও নেহেরু দেখেছিলেন।

ঐ কারাগারে সাড়ে চারশোর বেশি বন্দী ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত ছিলেন। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘমেয়াদের অর্থ দশ বছর এবং বন্দীজীবনে সৎ ও ভালো আচরণ দেখালে ঐ মেয়াদও দু-তিন বছর কমানো হত (এখানে যেমন, দোসরা অকটোবর, পনেরোই আগস্ট অথবা ভোটের আগে প্রয়োজনে দণ্ডিত অরাজনৈতিক সমাজ-বিরোধীদের মেয়াদ কমানো হয়)। গভর্ণর সহ বাহান্ন-তিপ্পান্ন জন কর্মচারী ঐ কারাগার দেখাশুনা করতেন। এরা তিন শিফটে আট ঘন্টা করে কাজ করতেন। ওয়ার্ডারদের নিরস্ত্র রাখা হত, কিন্তু প্রধান গেটের দুজন রক্ষীমাত্র বেয়নেট নিয়ে থাকতেন। দোষীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে দোষমুক্ত সৎ নাগরিক করে তোলার জন্যই সেখানে কারাগার তৈরী করা হয়েছিল। বস্তুতঃ প্রতিহিংসা ও শাস্তির পুরনো পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত "কারাগার" কথাটি ব্যবহার করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

বন্দীর মানবিক মূল্যবোধগুলোকে ধ্বংস করে নয়, দোষ-ত্রুটিগুলো শুধরে দেওয়া, অর্থাৎ "রোগ সারিয়ে রুগীকে বাঁচানো"ই সরকারের উদ্দেশ্য। সেখানে বন্দীদেরকে ডোরাকাটা জামা-পাজামা দেওয়া হয় না। সাধারণ পোষাক দেওয়া হয়। যে উঠানে তারা ঘোরাফেরা করে সেখানে বাস্কেটবল সহ বেশ কয়েক ধরণের খেলা চলে।

আজ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে বন্দীদেরকে চব্বিশ ঘন্টা লক-আপে ডাণ্ডা-বেড়ী পরিয়ে রাখা হয়, প্রতিবাদে বন্দীরা অনশনের পথে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু মস্কোর কারাগারের গভর্নরকে ডাণ্ডা-বেড়ী ব্যবহার করা হয় কি না জিজ্ঞাসা করলে, সেই গভর্নর হেসে তাঁদের বলেছিলেন যে, "ঐ সব জিনিসগুলো আজ আমাদের মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। আপনারা যদি ওগুলোর ব্যবহার দেখতে চান তবে বুর্জোয়া দেশের কারাগারে যেতে হবে। এমনি কি বন্দীদেরকে বাইরে নিয়ে যাবার প্রয়োজনই হলেও ডাণ্ডা-বেড়ী পরানো হয় না।

বন্দীরা দৈনিক আটঘন্টা কাজ করতেন। কয়েকজন বাদে বেশিরভাগ বন্দীই জেলের লাগোয়া একটী সুতোকলে কাজ করতেন। সেই বৃহৎ অংশে সুতো কাটা তাঁত বোনার মেশিন বসানো হয়েছিল। কারাগারের কোন চিহ্নই রাখা হতো না। উৎপাদনের সংগ্রামে জড়িয়ে রেখে সরকার বন্দীদের মগজে সুস্থ ও সঠিক জ্ঞান ফেরাবার কথা ভাবতেন। কর্তৃপক্ষ জেলের মধ্যস্থ ঐ সব শ্রমিকগণকে যতদূর সম্ভব অবাধ ট্রেড ইউনিয়নগত সুযোগ-সুবিধা দিতেন। বাইরের শ্রমিকগণ যা মজুরি পেতেন, তার ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বেতন জেলের ভিতরকার ঐ সব শ্রমিকরা পেতেন। ঐ বেতনের তিনভাগের দু ভাগ সংরক্ষিত তহবিলে রাখা হত, যা বন্দীরা ব্যবহার করতে পারতেন না। মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অর্থ এবং অন্য কিছু পাওনা থাকলে তা সব হিসেব বুঝিয়ে বন্দীদের হাতে দেওয়া হত। এর ফলে মুক্তির পর ঐ সকল ব্যক্তিগণ নতুন উদ্যমে নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ পেতেন। এবং বেতনের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা বন্দীরা জেলের মধ্যস্থ দোকান অথবা বাইরে থেকে প্রয়োজনমত কেনাকাটা করতে পারতেন। জেলের ঐ দোকানে সিগারেট, খাদ্যদ্রব্য এবং টয়লেট প্রভৃতি পাওয়া যেত এবং একজন বন্দীকে এর দায়িত্ব দেওয়া হত। ঐ দোকানে বইও পাওয়া যেত। বন্দীদের হাতে নগদ টাকা-পয়সা দেওয়া হত না, তাঁরা দোকানে গিয়ে ভাউচারে সই করতেন এবং জেল কর্তৃপক্ষ বন্দীদের ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে তা বিয়োগ করতেন, বাইরের বন্ধু অথবা আত্মীয়রা টাকা অথবা জিনিষ নির্দিষ্টে পাঠাতেন।

বন্দীরা যে কোনো সময়ে ধূমপান এবং পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করতে পারতেন। জেলের মধ্যে একটা ভালো সেলুন ছিল। বন্দীরাই ঐ সেলুন চালিয়ে রোজগার করতেন। বন্দীরাই চুল-দাঁড়ি কামিয়ে পয়সা দিতেন। দাঁড়ি কামাবার পর ও-ডি কলোন স্প্রে করতেও নেহেরু দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

তখন কারাগারে মাত্র দুজন রাজনৈতিক কারণে আটক ছিলেন, একজন রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেকোস্লাভাকিয়ার পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করার দায়ে দশ বছর দণ্ডিত হয়েছিলেন। ভদ্রলোক সুশিক্ষিত এবং ভাল সুরশিল্পী ছিলেন। তিনি জেলের মধ্যস্থ সঙ্গীত স্কুলের ডাইরেক্টর হয়েছিলেন। নিজের পারিশ্রমিকের অর্থে তিনি একটী বেতার যন্ত্র কিনেছিলেন।

দ্বিতীয় রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন রুশ লাল ফৌজের সদস্য। রুশ বিপ্লবের পর, যখন জারের সৈন্যাধ্যক্ষরা মিত্র সরকারগুলোর সঙ্গে যোগসাজসে সদ্যগঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্র ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, দ্বিতীয়জন তখনা লাল ফৌজ ত্যাগ করে শত্রুর সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। পরে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু সোভিয়েত সরকার মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে দশ বছর কারাদণ্ড দিয়ে তাঁর প্রতি ক্ষমা দেখান। তাঁকে জেলের মধ্যে বৈদ্যুতিক কাজ দেখাশুনার ভার দেওয়া হয়। তাঁর সেলেও নেহেরু ও তাঁর সঙ্গীরা একটি রেডিও এবং বেশ কিছু বই দেখেছিলেন।

নেহেরু লিখেছিলেন যে, "ভারতবর্ষের কারাগার এবং বন্দীদের উপর ডাণ্ডা বেড়ী ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে, তারা অবশ্যই বন্দীশালার ব্যবহার প্রসঙ্গে দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ বুঝে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানাবেন। জেল জীবনের মানবিক দিকগুলো বন্দীদের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য মস্কোর জেল কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট দেখেছি। আমি মনে করি যে, জেল সম্পর্কে এই সামগ্রিক নীতি আমাদের মনে রাখা উচিত এবং সেই অনুযায়ী, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এমন কি জেলের বাইরেও তা প্রয়োগ করা উচিত।"

নেহেরু ও তাঁর সঙ্গীরা সেন্ট্রাল জেল দেখেছিলেন, যেখানে দেশদ্রোহী, নরহত্যার অপরাধীরা ছিলেন। সাধারণতঃ মৃত্যুদণ্ড অথবা দশ বছরের জন্য এঁদের কারাদণ্ড দেওয়া হত। লঘু অভিযোগে অভিযুক্তদের যে সকল জেলে পাঠানো হত, সেগুলোতে আরও বেশি পছন্দমত ব্যবস্থা ও স্বাধীনতা বন্দীরা পেতেন। গৃহে যাবার জন্য তাঁরা কয়েকদিনের জন্য প্যারোলের অনুমতি পেতেন। কৃষকদের ক্ষেত্রে ফসল তোলার সময়ে এই ছুটি মঞ্জুর করা হত।

স্তালিনের জন্মস্থান জর্জিয়ার টিফলিস শহরে বলশেভিক কারাগার দেখে মিস ফ্রেডা আটলী "দি সোস্যালিস্ট রিভিউ" পত্রিকার আঠাশ সালের মার্চ সংখ্যায় এক চমৎকার প্রবন্ধে কারাগারের মধ্যে বন্দীদের প্রতি কেমন সদয় ব্যবহার দেখিয়ে তাঁদের সুশিক্ষিত করা হচ্ছে তা লিখেছিলেন। বর্বর ব্যবহার নয়, মানবিক ব্যবহার দেখিয়ে বন্দীদেরকে সুনাগরিক করে গড়ে

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

আধুনিক বাংলা গান ও আধুনিকতা (২)

সুভাষ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন এবং সুর দিয়েছেন নিজস্ব প্রেরণায় তা রেকর্ড কোম্পানীর জন্য, বা রেডিও-র জন্য নয়। রেডিও বা রেকর্ড কোম্পানী তার প্রচার দায়িত্ব নিয়েছে মাত্র। অতুলপ্রসাদের ক্ষেত্রেও তা সত্য। কিন্তু নজরুলের অবস্থান অন্যরকম। তিনি রেকর্ড কোম্পানীতে কাজ করেছেন বহুদিন, কোম্পানীর নির্দেশে গান রচনা করেছেন, কলকাতায় থিয়েটারের চাহিদা অনুযায়ী সুর দিয়েছেন, ফলে তাঁর সুরে, বিশেষ করে কথায় এমন একটা শৈথিল্য দেখা যায় যা অনুপ্রাণিত শিল্পীর লক্ষণ নয়। নজরুলের এই দিকটিই পরবর্তী বাংলা গানে ক্রমশঃ প্রধান দিক হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রপ্রভাব (ভাষা ও সুরে) ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকে। এর জন্য নজরুলকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা অসম্ভব, কারণ এর জন্য দায়ী ধনতান্ত্রিক বাজারের নিয়মকানুন। বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়তে পেরেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথকে বাইরের ধনতান্ত্রিক প্রচার-মাধ্যমের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে হয় নি। তাই তাঁকে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর নির্দেশে গান রচনা করতে হয়নি। কিন্তু নজরুল থেকে আজকের সুরকার পর্যন্ত কেউই রবীন্দ্রনাথের মত অর্থনৈতিক বাজারের নিয়মকানুনের বাইরে স্বাধীন শিল্পসৃষ্টির এরকম সুযোগ পান নি। বাংলা গান নজরুলের সময় থেকেই ক্রমশঃ রেকর্ড কোম্পানী, সিনেমা ও রেডিওর অনুসরণ করে চলেছে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মানুসারে শ্রোতা এখানে রসিক নয়, ক্রেতা মাত্র, আর গান গান নয়, বেচাকেনার সামগ্রী। প্রথমদিকে ব্যক্তিপ্রতিভার স্বাধীন প্রেরণা কিছু ছিল, কারণ তখন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ছিল কম, তারপর যতই রেকর্ড ও সিনেমার বাজার ছড়িয়েছে এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতাও বেড়েছে, এ অবস্থায় শিল্পী মালিক পক্ষের কর্মচারী মাত্র, আর শ্রোতাও কনজিউমার মাত্র। তিরিশ দশক থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সিনেমা, থিয়েটারে ও সাহিত্যে যে প্রক্রিয়া দেখা যায় বাংলা গানের ক্ষেত্রেও তারই উপস্থিতি লক্ষণীয়, তবে গান যেহেতু অনেক তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে যায় বিশেষ করে রেকর্ড সঙ্গীত, তাই এখানে চাহিদা মেটানোর চেষ্টাও অনেক বেশী তড়িৎ গতিতে হয়, ফলে এই ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার প্রভাবে গান ও গানের ভাষা আর পাঁচটা ভোগ্য-দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের মতো ক্রমশঃ চটকদারী হতে শুরু করে।

সঙ্গীত ব্যবসায়ীরা অবশ্য একটা কাল্পনিক জনরুচিকে এ সবের জন্য দায়ী করেন—শ্রোতারা চান, আমরা কি করতে পারি! কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞাপনের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান অর্জন করলেই বোঝা যায় যে জনরুচি বলতে বা বোঝানো হয় তা মুনাফাখোর সাংস্কৃতিক ব্যবসায়ীদেরই সৃষ্টি। ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন অনুসারে তাদের প্রতিটি সামগ্রীই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং অবশ্যই ক্রয়যোগ্য, এই যুক্তি দিনের পর দিন কানে প্রবেশ করলে আমরা নিজের ইচ্ছে অনুসারে আর কিনি না, অনেকটা মোহাবিষ্ট হয়ে কিনি। সাধারণ ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেই যদি ব্যবসায়ীদের এরকম মোহিনী শক্তি থাকে, তবে মন নিয়ে যাদের কারবার, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ব্যবসায়ীরা আরো বেশী দক্ষ হবে এ ব্যাপারে তাতে আর সন্দেহ নেই। রেকর্ড কোম্পানী নানান ধরনের সুর পরীক্ষামূলক ভাবে বাজারে ছাড়ে, তারমধ্যে যেটা জনপ্রিয় হয় সেটাই তাদের 'মডেল' হয়ে ওঠে। তারা জানে যে স্থূল প্রবৃত্তি জাগাতে পারলে শ্রোতারা তাড়াতাড়ি বশীভূত হয়, তাই এমন সুরের সৃষ্টি হয়, যাতে এই প্রবৃত্তির সাড়া মেলে। কয়েক বছর আগে 'এই, এদিকে এসো···প্লীজ' এ রকম কথার একটি যৌনরসাত্মক সুরের গান হঠাৎ জনপ্রিয় হয়, তারপর থেকে দেখা গেলো ঐ ধরনের গানের ছড়াছড়ি। প্রথম ঐ গানটির জন্য কি জনসাধারণ দাবী জানিয়েছিলো? না, জনসাধারণ জানতোই না যে সিনেমার বাইরে ওরকম আধুনিক নায়িকাসুলভ 'প্লীজ' যুক্ত গান হতে পারে। কিন্তু এরকম একটি গানেই তাদের পুরানো রুচি হঠাৎ বাঁক নিতে পারে, তারপর এরকম গানই তারা চাইবে।

আজকের দিনে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাগরিক জনরুচিকে যে দুটি বস্তু নিরন্তর নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তা হলো সিনেমা ও রেকর্ড কোম্পানি। পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের সিনেমার প্রধান পার্থক্য এইখানে যে গান ছাড়া এখানে সিনেমার অস্তিত্ব ভাবা যায় না; (সত্যজিত প্রভৃতির ছবি ব্যতিক্রম মাত্র)। একটি ছবির প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেলেও তার গান মাইকে বাজে। আর রেকর্ড কোম্পানী সিনেমার গান যেদিকে যায় সেদিকেই তাদের সুরকার ও গীতিকারকে হাঁটতে বাধ্য করেছে। একটা সময় ছিল যখন সুর ও মেজাজে পুজোর রেকর্ডগুলি সিনেমার গান থেকে বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু ষাটের দশক থেকে ক্রমশঃ সে পার্থক্য ঘুচে গেছে। এখন সিনেমার বাইরের গানও ভাষা ও সুরে সিনেমার অতি পরিচিত দৃশ্যের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। যতদিন বাংলা সিনেমা মোটামুটি শিক্ষিত রুচিকে সম্মান জানিয়েছে ততদিন তার গানও অশালীন হয় নি, (স্মরণ করা যেতে পারে, 'মুক্তি' 'উদয়ের পথে' 'পাশের বাড়ি' 'অগ্নি পরীক্ষা' 'শাপ মোচন' 'একদিন রাত্রে' 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ইত্যাদির গান,) কিন্তু আজ বাংলা সিনেমাই হিন্দি সিনেমার ছায়া হয়ে উঠছে, তাই কুসংস্কৃতির রাজধানী বম্বের কু-প্রভাবও এখানকার সঙ্গীতের বিকৃতি ঘটাতে পারছে। ইদানীং হিন্দি ছবি ও হিন্দি গানের জনপ্রিয়তা বাঙালীদের কাছে এত বেড়েছে যে আশঙ্কা হয় কিছুদিনের মধ্যে বাংলা ছবি ও বাংলাগানের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে। সুতরাং অস্তিত্ব রক্ষাই যেখানে মূল কর্তব্য সেখানে ভালোমন্দের বিচারটা অবান্তর, তাই আমাদের সুরকার গীতিকারেরা নিরুপায়। বাংলা গানের অবক্ষয়ের জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব যতটুকু তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী বিভিন্ন সামাজিক শক্তির টানাপোড়েন। শিল্প সাহিত্যের ক্ষয়রোগের মূলে যে অর্থনৈতিক—সামাজিক ব্যবস্থা সঙ্গীতের বর্তমান অবস্থার জন্যও সেই একই অর্থনৈতিক—সামাজিক অবস্থা দায়ী। একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির ইচ্ছেয় এই অবক্ষয় দূর হতে পারে না; তাই বলে অবশ্য সেই ইচ্ছেটাও মূল্যহীন নয়। আসল কথা, গোটা সমাজব্যবস্থার ওপর মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই একজন বা কয়েকজনের স্বাধীন ইচ্ছেই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্যের প্রধান ভরসা। এই ইচ্ছেই যদি সংগঠনের রূপ পায় তবে তাঁর শক্তিকে ব্যবসায়ীরাও অগ্রাহ্য করতে পারে না। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে আই, পি, টি, এ তার প্রমাণ দিয়েছিল। বাংলা গান সে সময় এক নতুন খাতে বইতে শুরু করেছিল।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর প্রভৃতিরা যে গান রচনা করেছিলেন তা বাংলা গানে সৃজনশীলতার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। এ সম্পূর্ণ নতুন গান, শুধু সুরে নয় কথাতেও। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ প্রতিবাদের ভাষাও যে গানে স্থান পেতে পারে তা এতদিন রবীন্দ্রানুসারী ভাবতেই পারেন নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার এমন দুঃসাহসিক অথচ সফল প্রচেষ্টা এমন ব্যাপক ভাবে কখনও আর হয়নি। যদি বলি যে আই, পি, টি, এ-র অবদান থিয়েটারে যতটা সঙ্গীতে আরো বেশী তবে অত্যুক্তি হবে না। একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরকার ও গীতিকারেরা যদি শিল্পের স্বার্থে, আত্মরক্ষার স্বার্থে ও প্রগতির স্বার্থে সংঘবদ্ধ হন তবে তার প্রভাবকে প্রভাবশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোও অস্বীকার করতে পারে না। আই, পি, টি, এ ভেঙে গেলেও তার বিখ্যাত অনেক গান পরবর্তীকালে রেকর্ড কোম্পানীই প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে। সুতরাং শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধতাই বর্তমান সাংস্কৃতিক নৈরাজ্যের একমাত্র উত্তর হতে পারে। কিন্তু যে যে রাজনৈতিক সামাজিক কারণে আই পি টি এ ভেঙে গিয়েছিল এখনও সেই কারণগুলি বর্তমান, তার সঙ্গে আরো জটিল কারণের যোগ্য হয়েছে। তাই আধুনিক বাংলাগান বেলেল্লাপনার ক্রীড়াক্ষেত্রে হয়ে উঠলে দেখা যায় আই পি টি এর প্রাক্তন নেতারা হয় উদাসীন নয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বামপন্থী রাজনীতি আমাদের সংস্কৃতির একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দিককে উপেক্ষা করে আজ সে ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবসায়ীদের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে এবং সঙ্গীত জনরুচিকে ঠিক পথে নিয়ে যাবার কোন উপায় রাখে নি।

একদিকে বামপন্থী রাজনীতির সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি, অন্যদিকে অ-বামপন্থী অথচ সংস্কৃতি-সচেতন বুদ্ধিজীবীদের উদাসীনতা বাংলাগানকে যথেচ্ছাচার করার অবাধ সুযোগ দিয়ে আসছে গত দু'দশক ধরে। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতই যথেষ্ট, তার পর আর বাঙলাগান বলে কিছু নেই, থাকতেও পারে না, হয়তো অতুলপ্রসাদ ও নজরুলকে খানিকটা মূল্য দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার বাইরে আর কেউ নেই, যা আছে তা হলো অশিক্ষিত ম্লেচ্ছ জনতার জলসা। ভাবতে অবাক লাগে যে একটি দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সব কিছুকে 'আধুনিক' করার পক্ষপাতী কিন্তু সঙ্গীতের আধুনিকতা সম্বন্ধে এতটা উদাসীন। অনেক দিন আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস কিছু গান লিখেছিলেন, সাম্প্রতিক কালে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তারাশঙ্করও কিছু গান উপহার দিয়েছেন, কিন্তু আই পি টি এ-র পর বাংলা গানে তেমন উল্লেখযোগ্য কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় নি। আমাদের কবি সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা বাংলাগানের ইতিবাচক ধারাটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেন নি, তাঁরা শুধু 'আধুনিক' বাংলাগানের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত উদাসীনতা দেখিয়ে গেছেন। কেউ কেউ আধুনিক গানের প্রতি ক্ষণিক মনোযোগ নিক্ষেপ করে হয় তাকে একবাক্যে খারিজ করেন (যেমন 'দেশ' পত্রিকার সনাতন পাঠক) কিম্বা আধুনিক গানের উন্নতি ও অগ্রগতিতে চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন কোম্পানীও রেডিওর ভূমিকার প্রশংসা করেন, এই তিন সংস্থা যে কতটা সর্বনাশ করছে বাংলা গানের তা খেয়াল রাখেন না (যেমন নারায়ণ চৌধুরী, 'চার দশকের বাংলাগান, ভূমিকা দ্রঃ)। বস্তুতঃ কলকাতা রেডিও-র প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত ছিল বাংলাগানের স্বাস্থ্য রক্ষা করা, কিন্তু 'রম্যগীতি' নামক পরিকল্পনাটি কোনোভাবেই সার্থক হয় নি। কারণ আমাদেরই রেডিও মূলতঃ কি নেশা ও গ্রামোফোন কোম্পানীর বিখ্যাত গায়ক ও সুরকারদেরই সেবা করে থাকে, তার নিজস্ব আ বলে কিছু নেই। ইদানীং আধু কবিতায় সুরারোপের চেষ্টা হয়েছে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' বা জীবনানন্দের 'হায় চিল' স্মরণীয়, কিন্তু তা কোনো নবজাগরণের ইঙ্গিত বহন করছে না, তা শুধু একটি দুটি শিল্পীর খেয়ালীপনাই থেকে গেছে। একদা তারাপদ চক্রবর্তী বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচলন করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকেও আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসে নি। বিষ্ণু দে কিম্বা সন্তোষকুমার ঘোষের মত বুদ্ধিজীবীরা হয় বীঠোফেন নয় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে সময় কাটালে তাতে তাঁদের উচ্চমানের রুচির পরিচয়

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাসিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা ঃ
৬১, মট লেন, কলি-১৩

উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে

তপোবিজয় ঘোষ

বছর তিনচার পূর্বে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কিছু কিছু সদস্যের মধ্যে স্কুল কলেজ পোড়ানো ও মূর্তি ভাঙার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। উনিশ-শতকের অনেক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবির প্রস্তরমূর্তি, যা কলকাতা শহরের বহুস্থানের শোভাবর্ধন করছিল, তাদের হাতে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতি-গ্রস্ত বা বিকৃত হয়েছে। সেই বিকৃতির নিদর্শন এখনও পীড়াদায়ক ভাবে ইতস্ততঃ চোখে পড়ে।

এই কাজ তারা কেন করছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে তারা বহুবার খোলাখুলি ঘোষণা করেছে, আমাদের স্কুল-কলেজে যা শেখানো হয় তা মূলতঃ বিপ্লব বিরোধী, শ্রমিক ও কৃষক স্বার্থ বিরোধী এবং যে সমস্ত মনীষীর মূর্তি প্রস্তরীভূত আকারে নিত্য আমাদের দ্বারা বন্দিত হয় তাঁরা আসলে এক একটি শক্ত প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি, শ্রমিক ও কৃষকজীবনের ঘৃণ্য শত্রু।

বলা বাহুল্য উগ্রপন্থীদের এই মূল্যায়নের মধ্যে অনেক ভুল আছে। একটা সংস্কারের মোহের উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে তারা নিজেরাই বিপরীত দিক থেকে আরেকটা সংস্কার বা মোহের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। উগ্র ব্যক্তিপূজার দ্বারা লালিত-চর্চিত একটা মূর্তি ভাঙতে গিয়ে আর একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক মোহের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

ইতিহাসকে তার সমকালীন ভূমিকায় কার্যকারণের মধ্যে দেখাই থেকে দেখা। তার ধারাবাহিকতা থেকে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন করে কোনো অংশকে দেখা কোনোক্রমেই বিজ্ঞানসম্মত হয় না। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সেই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণীর আবির্ভাব ও তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই ইতিহাস নির্ভুল গতিতে অগ্রসর হয়। ব্যক্তির ভূমিকা এখানে গৌণ, মুখ্য ভূমিকা সমাজের, সামাজিক উৎপাদন প্রণালী, তার বিকাশ ও দ্বন্দ্বের। আমাদের ছেলেরা, যারা ভীষণরকমের ক্রুদ্ধ হয়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে—তারাও যেমন ইতিহাসের সামগ্রিকতা ভুলে ব্যক্তিকেই মুখ্য উপাদান বলে মনে করেছে—অন্যদিকে আমাদের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণও সমাজবিকাশের দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে বা তার সম্পর্কে পুরোপুরি অন্ধ ও অজ্ঞ থেকে ব্যক্তিকেই সমাজ শক্তির প্রধান নিয়ামক বলে উপস্থিত করেছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিপূজার মনোভাবের, ব্যক্তিসর্বস্ব ইতিহাস চিন্তার। এই ভ্রান্ত ঐতিহাসিকদের কল্যাণেই আমাদের শিখতে হয়েছে, রামমোহনের হাতেই আধুনিক বঙ্গভূমির জন্ম, কিংবা "সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই আমাদের প্রথম স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা!"—এবং এইভাবে কালক্রমে রামমোহন-বঙ্কিম সহ এইসব ব্যক্তি মানুষেরা ভ্রান্ত ইতিহাসের সঙ্গে নানা কল্পনা ও কিংবদন্তির মিশ্রণে আমাদের স্কুল কলেজের পাঠ্য-পুস্তকে প্রায় অবতার কল্প মহাপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং দেবতার মতোই পূজিত হচ্ছেন।

একদিকে ব্যক্তিপূজার প্রাবল্য এমন বল্গাহীন হয়ে উঠেছিল বলেই সম্ভবত প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছিল অমন উগ্রভাবে, বোমার আঘাতে শহরের বুক থেকে তাদের মূর্তি নির্মূল করার ক্রোধও বল্গাহীন হয়েই জেগে উঠেছিল।

অথচ ইতিহাসকে তার সত্যস্বরূপে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করলে মূর্তিগড়ার ও মূর্তিভাঙার কোনটারই প্রয়োজন হত না। ঘটা করে ফুলের মালা গলায় দুলিয়ে দেওয়া ও পরক্ষণেই তা খুলে নিয়ে কাদার তাল ছুঁড়ে দেওয়া—দুইই নিরর্থক বলে গণ্য হত।

একথা পরিষ্কারভাবে আমাদের বোঝা দরকার যে, কোনো দেশে কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তি-মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে না এবং কোনো প্রতিভাই একক স্বয়ং সম্পূর্ণ বা স্বয়ম্ভু নয়। ইতিহাসের বিশেষ অবস্থায় সামাজিক শক্তিগুলির বিশেষ বিন্যাস প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই অনিবার্যভাবে ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাব ঘটে এবং তার মধ্যে প্রতিভা যদি কিছু লক্ষ্য করা যায়—তা সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি সমাজসংস্কার আন্দোলন প্রভৃতি যে ক্ষেত্রেই বিকশিত হোক না কেন—আসলে সেই প্রতিভা সামাজিক সম্পদ, সমাজ বিকাশেরই অনিবার্য ফল। রামমোহন রায়ের চরিত্র সেই সামাজিক নিয়মেরই ফল। এবং বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ থেকে বর্তমান কালের জয়প্রকাশ নারায়ণ পর্যন্ত সকলেই এর অন্তর্ভূত। কেউই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একক কোনো শক্তি হয়ে উঠতে পারেন না।

ইতিহাস বিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উনিশশতকের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাজকর্ম ও চরিত্র বিচার প্রয়োজন। অন্যকোন মানদণ্ড প্রয়োগ করলে তাঁরা "দেবতা" অথবা "শয়তান" দুই-ই হয়ে উঠতে পারেন এবং তার কোনটাই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

যে সমাজ-বিন্যাসের মধ্যে সেকালে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আবির্ভূত ও পরিপুষ্ট হয়েছিলেন—তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা পুরোপুরি বজায় ছিল এবং ইংরেজ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকের উপর এই শোষণ আরো ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করেছিল। উচ্চশ্রেণীর ভূস্বামী বা সামন্ত প্রভুগণ আপন স্বার্থেই বিদেশী শোষক ইংরেজদের সঙ্গে অশুভ ঐক্যের গাঁটছড়া বেঁধেছিল ও শাসনকার্যে তাদের সাহায্যকারী বা সহযোগী ছিল। আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে যে মধ্যশ্রেণীর ভূস্বামীবর্গের আবির্ভাব ঘটেছিল—তারা ছিল শহরবাসী, ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি-বাকরি ও শিক্ষাদীক্ষার সূত্রে বিদেশী ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। এই মধ্যশ্রেণীভুক্ত মানুষের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষাই ছিল সর্বোত্তম আদর্শ, ইংরেজ-প্রভুদের মনোরঞ্জনই ছিল শ্রেষ্ঠ কর্ম, ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্বের জন্যই ছিল তাঁদের প্রাণপাত প্রচেষ্টা। জমির প্রশ্নে এরা বরাবরই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক এবং এ কারণেই জমিকেন্দ্রিক শোষণের প্রশ্নে সর্বদা কৃষক-সংগ্রাম বা কৃষক আন্দোলনের বিরোধী।

এই মধ্যশ্রেণীর হাতেই আমাদের উনিশশতকের তথাকথিত নবজাগরণ বা রেনেসাঁর জন্ম। এই রেনেসাঁর সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন সম্পর্ক ছিল না। এই নবজাগরণ সমস্ত দিক দিয়েই ছিল ইংরেজ-অনুগত, কৃষকস্বার্থবিরোধী মধ্যশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের হাতিয়ার। রামমোহন থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সকল বুদ্ধিজীবীই এই শ্রেণী থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সুতরাং যদি কেউ আশা করেন, রামমোহন মধুসূদন বঙ্কিম বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীর আচরণ ও চিন্তার মধ্য দিয়ে শোষণবিরোধী কোন মৌলিক বৈপ্লবিক তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটবে, তাহলে তিনি নিশ্চিতই ভুল করবেন। এই শ্রেণী, জমিতে কৃষকের অধিকার স্থাপনের প্রশ্নে, শোষণমুক্তির প্রশ্নে অথবা এদেশে ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্বের প্রশ্নে কখনোই কোন বিরুদ্ধ মত পোষণ করতে পারেনা না। তাঁদের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস মনে রাখলে এইটেই তো স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমরা কেন তাঁদের কাছে অতিরিক্ত কিছু আশা করেছি এবং আশা করে না পেয়ে অকারণে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে মূর্তি ভাঙতে প্রবৃত্ত হয়েছি?

রাজা রামমোহন রায় বহু ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং ব্যবসায়িক সূত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের ভূসম্পত্তি সংরক্ষণ, বৃদ্ধি ও ভোগের জন্যই তিনি একদিকে যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থন করেছেন, অন্যদিকে ভারতে নীলচাষ বিশেষ লাভজনক বলে মনে করেছেন। নীলচাষীদের বিদ্রোহ তাঁর কাছে "সংস্কারাবদ্ধ মনের অদূরদর্শী আস্ফালন" বলে মনে হয়েছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজ রাজত্বের প্রশংসা করেছেন এবং ভারতে তার দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি এই ব্যক্তিপূজার দেশে "ঋষি" রূপে খ্যাত, তাঁর চরিত্রও এই শ্রেণীস্বার্থের উর্দ্ধে ছিল না, বরং সে যুগে তিনি তাঁর নিজের শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ তিনি সমর্থন করেন নি, নীলদর্পণ ও জমিদার দর্পণ নাটকের বিরুদ্ধে কঠোরভাষায় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মুক্ত কণ্ঠে ইংরাজ রাজত্বের জয়গান গেয়েছিলেন, উপন্যাসের আঙ্গিকে গীতার ধর্মতত্ত্ব প্রচারে প্রবৃত্ত হয়ে সমকালীন পাঠকে পৌরাণিক ধ্যান ধারনার প্রতি বিশ্বস্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং জীবনের সকল অবস্থাতেই কি সিপাহীবিদ্রোহ কি অন্যান্য কৃষক-বিদ্রোহ—যে কোনো কৃষক সংগ্রামের প্রাণপণ বিরুদ্ধতার মাধ্যমে ইংরেজের কাছে নিজের বশংবদত্ব উজ্জল রাখবার যত্ন করেছিলেন। এ সমস্তই ঘটনা এবং সত্য ঘটনা। এমন কি, এদেশে "মহর্ষি" নামে যিনি খ্যাত, রবীন্দ্র পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং "করুণাসাগর" রূপে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এঁরাও কোনো অর্থেই কৃষক দরদী ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের জমিদারী পরিচালনার ইতিহাস তাঁকে তাঁর যথেষ্ট "আধ্যাত্মিক জ্ঞান গরিমা" সত্ত্বেও একজন প্রজা শোষকরূপেই পরিচিত করায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি প্রত্যক্ষভাবে এই দেশের বহু সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তিনিও সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধতা করেছিলেন এবং তাঁর সময়কালেই অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে নীরব ছিলেন। সাঁওতালদের সরলতায় বিদ্যাসাগর মুগ্ধ ছিলেন কিন্তু বিদ্রোহী সাঁওতালদের প্রতি তাঁর কোনো মমতা ছিল না। বাংলাদেশের বালবিধবাদের জন্য তাঁর চক্ষু সুগভীর করুণায় অশ্রুসিক্ত হয়েছিল কিন্তু ইংরেজের গুলিগোলা কামানের বর্বর আক্রমণে সহস্র সহস্র সাঁওতাল বীর বিদ্রোহী প্রাণ দিয়েছিলেন—তাদের জন্য "করুণাসাগরে"র অন্তর কখনো ব্যথিত হয় নি!

মধুসূদন যখন বাংলা কাব্য ও নাটক রচনায় ব্যাপৃত তখনই এই দেশে বৃহত্তম নীলবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু মধুসূদনের চিন্তায় ও চেতনায় তার কোনো ছাপ নেই, নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ করা দূরে থাকুক—ঐ ইংরেজি গ্রন্থ তিনি কখনো চোখেও দেখেন নি (এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের "চতুষ্কোণ" বৈশাখ ১৩৮০ ভুক্ত "নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ ও মাইকেল মধুসূদন" এবং ঐ পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত "নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ ও মধুসূদন প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য।) তিনি তখন তাড়াতাড়ি তার সাহিত্যকর্ম সমাপ্ত করে ব্যারিস্টারী পড়ার উদ্দেশে বিলেত যাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহসের সঙ্গে নীল বিদ্রোহের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে তাঁর ভূমিকা কি ছিল? তিনি কি প্রাণপণে এই মহাবিদ্রোহের বিরুদ্ধতা করেন নি? অথবা যে দীনবন্ধু মিত্র "নীলদর্পণ" রচনা করেছিলেন তিনি কি যথার্থই কৃষকের ভূমি সমস্যার কোন মৌলিক সমাধান চেয়েছিলেন? অবশ্যই না। "নীলদর্পণ" নাটকে নীলকর বিরোধিতা আছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধতা নেই।

বরং মহারানী ভিক্টোরিয়ার অকৃপণ প্রশস্তি আছে ঐ গ্রন্থের ভূমিকায়। মাতৃরূপা মহারানী ভারত-শিশুকে আপনা ক্রোড়ে নিয়ে স্তন্য-পান করালেই সকল সমস্যার সমাধান ঘটবে—এমন কথাও বলা হয়েছে। আসলে সরকারী চাকুরিয়া দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" লেখার কোন ঝুঁকি ছিল না। তৎকালে এই দেশের ইংরেজ প্রশাসনের মুখ্য অংশ নীলচাষের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। গ্র্যান্ট এবং সীটনকার তো প্রত্যক্ষভাবেই নীলকরদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটির প্রচারের দায়িত্বও তাঁরাই গ্রহণ করেছিলেন। গ্র্যান্ট এবং সীটনকারকে অপদস্ত করার জন্যই নীলদর্পণ মামলা পরিচালিত হয়েছিল। দীনবন্ধু উপলক্ষ ছিলেন মাত্র (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দুটিতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।) "নীলদর্পণ" রচনার জন্য সরকারী মহলে দীনবন্ধুর কোনো ক্ষতি হয় নি। বরং তিনি "রায়বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। চাকুরী ক্ষেত্রে প্রমোশন পেয়েছিলেন।

উনিশশতকের এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীর চরিত্র এইভাবে, অর্থাৎ ঐ সময়ের কৃষকজীবনা কৃষক আন্দোলন বা কৃষকশ্রেণীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগে যদি বিচার করা যায় তাহলে অনেক ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাই লক্ষ্য করা যায়। তখন অনেক "মহাত্মা" কে ক্ষুদ্রাত্মা বলে বোধ হয়, অনেক "ঋষি" ও "মহর্ষি"র ঋষিত্ব বা মহর্ষিত্ব ঘুচে যায়। আমাদের প্রচলিত ইতিহাসের প্রধান ত্রুটি এই যে, উনিশশতকের বুদ্ধিজীবী চরিত্রের এই শ্রেণীস্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতাকে কখনো সাহস করে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশ করে নি। করে নি তার কারণও ঐ শ্রেণীস্বার্থের মধ্যেই নিহিত। এ দেশে যারা ইতিহাস লেখেন ও প্রচার করেন তারাও ব্যাপকভাবে ঐ মধ্যশ্রেণীরই অন্তর্গত। ফলে সত্যকারের ইতিহাস রচিত হয় না মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে।

রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা যা ছিলেন—সেই সত্যরূপেই তারা যদি প্রতিষ্ঠিত হতেন, তাহলে আগেই বলেছি, মূর্তি গড়ার বা ভাঙার কোনোটারই প্রয়োজন হত না।

উনিশশতকের কোনো বুদ্ধিজীবীই "মহাত্মা" "ঋষি" বা "মহর্ষি" ছিলেন না। তাঁরা সার্থকভাবেই ছিলেন আপনার শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে কেউ নিজের ব্যক্তিত্বকে বেশী জোরে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, কেউ পারেন নি। যিনি যতটুকু পেরেছেন ইতিহাসে তার ভূমিকা ততটুকুই।

নিজের শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপেই রামমোহন একদিকে যেমন সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার সপক্ষে ওকালতি করছেন—অন্যদিকে তেমনি নানা সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছেন। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠায়, নারীশিক্ষা বিস্তারে

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

গ্রন্থ সমীক্ষা

শতবর্ষের আলোকে শরৎ মূল্যায়ন

(দর্পণের সমালোচক)

শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবর্ষ আসন্ন। চতুর্দিকে তাঁর স্মৃতিবাসরের আয়োজন চলছে। এই স্মৃতিচারণা এবং পূজাপার্বণের মধ্যে প্রকৃত শরৎচন্দ্র অর্থাৎ তাঁর জীবন-সাহিত্য-রাজনীতি মানস কতটা নিখুঁত অর্থে ধরা দেবে তা নিয়ে কারো কারো মনে সন্দেহের অবকাশ থাকলে সেটা খুব অবিবেচকের কাজ হবে বলে মনে হয় না। কেন না যেখানে স্মৃতিচারণ অর্থে মোহান্ধ ভক্তির আত্মপ্রকাশ, সেখানে আরাধনার আড়ম্বর আর বাক্ কাহুলোর অন্তঃস্থল থেকে প্রকৃত মানুষটিকে খুঁজে বের করে আনা মুশকিল।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পালনের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না নানা কারণে। প্রথমতঃ শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার সঙ্গে যাঁরা গলা মিলিয়েছেন কিংবা যারা নারী-প্রেমিক শরৎচন্দ্রকে ঘরোয়া সমাজসীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন—তারা উভয়ই শরৎচন্দ্রকে সঠিক অর্থে উপলব্ধি করেন নি। এ কথা আরও মর্মান্তিক বেদনার সঙ্গে অনুভব করলাম মিহির আচার্য সম্পাদিত "শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র" (শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ঃ সম্পাদনা/মিহির আচার্য। পরিবেশক ঃ মুকমার্ক। দাম ঃ ছয় টাকা) গ্রন্থে প্রকাশিত সম্পাদকেরই একটি প্রবন্ধ পড়ে। প্রবন্ধটিতে শরৎচন্দ্রের জীবনের কয়েকটি অনালোচিত ঘটনা এবং দু একটি চিঠিপত্র এবং তাঁর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্রের জীবন-সাহিত্য-রাজনীতিকে এক জায়গায় টেনে এনে পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধটি পড়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রহস্যাবৃত ভাবনার অনেক জট খুলে যায়।

মিহিরবাবু প্রবন্ধের সূচনায় বলেছেন ঃ "নতুন করে পরিণত মন নিয়ে শরৎচন্দ্রকে পড়তে আরম্ভ করে বুঝেছি এই জনপ্রিয়তা লেখকের সমগ্র চরিত্র বুঝতে কী প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘকাল লেখক ও অর সাহিত্যের আদর্শ বলতে শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র স্ট্যান্ডার্ড। রবীন্দ্রনাথ জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন।..শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে ভালোমন্দ কোন কিছু গোপন করতে রাজী নন, সাহিত্যে তিনি উচিৎ বক্তা। অর্থাৎ জীবনে ও সাহিত্যে শরৎচন্দ্র রক্তমাংসের ধরাছোঁয়ার উর্দ্ধে নন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে এবং সাহিত্য-স্বভাবে স্পর্শের বাইরে নিজেকে পর্বে পর্বে মেলে গেছেন। বিশাল সৃষ্টির আড়ালে প্রচুর বিষয়-মাহাত্ম্যের কারণে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যক্তিমানসটী চাপা পড়ে গেছে। ফলে যে কোন বিশ্বাসের মানুষ রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে তাঁর অভীষ্টকে খুঁজে পাবেন। অপরদিকে শরৎচন্দ্র তার নিজস্ব জীবনদৃষ্টির দৌলতেই স্বদেশ সাহিত্য-রাজনীতিকে সোজাসুজি লক্ষ্যবিদ্ধ করেছেন। তিনি বড় লেখক কি মাঝারি লেখক এ প্রশ্ন অবান্তর, তিনি তাঁর যুগে জীবন্ত মানুষ রূপে বেঁচেছিলেন। সাহিত্যে যে কোন নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সরব, রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় কর্মী, বিপ্লবী আন্দোলন এবং তারও ঊর্দ্ধে সোস্যালিস্ট নিউক্লিয়াস সৃষ্টির তিনি প্রেরণা।"

ব্যক্তিজীবনে মদ্যে-মাতাল অথবা নারীজাতি সম্পর্কে উচ্ছৃংখলতার অপবাদও মাথা পেতে নেন নি। শরৎচন্দ্র অকপটে বলেছেন ঃ বড় দরিদ্র ছিলাম—বিশটি টাকার জন্য এগজামিন দিতে পারি নি। এমন দিন গেছে, যখন ভগবানকে জানাতাম, আমায় কিছু দিনের জন্য জ্বর করে দাও তাহলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না। উপোস করেই দিন কাটবে।" এ কণ্ঠের কথা তিনি বালাবন্ধু চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কেও লিখেছিলেন ঃ "চারু, আমার মত করে যদি তোমাদের উপন্যাস রচনা করতে হত, তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখতেই পারতে না। এমন দিন গেছে যখন দু তিন দিন অনাহারে থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে গ্রাম ঘুর বেড়িয়েছি। কত বাড়িতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে,—তারা বড় লোক। কত ছাড়ি বাগদীর বাড়ীতে আহার করেছি।"

নারী জাতির উচ্ছৃংখলতা সম্পর্কেও শরৎচন্দ্র অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছেন "নারীজাতি সম্পর্কে আমার চরিত্র কোন কালেই উচ্ছৃংখল ছিলনা, এখনও নয়, নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি—অন্তত মাতাল অবস্থাতেও তাদের দেহের ওপর লালসা হয়নি, তার কারণ এ নয় যে আমি নীতিবাগীশ, কারণ এই যে ওটা চিরদিনই রুচিতে ঠেকেছে।"

শরৎচন্দ্র জীবিতকালে যাদের কাছে "একঘরে" হয়েছেন, যারা তাঁর অনিষ্টের জন্য শশব্যস্ত ছিল, যে দুরাচার, অন্যায়, শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রকে শক্তমুঠোয় কলম ধরতে হয়েছিল—তাদের উত্তরসূরীরা দেশ থেকে মুছে গেছে, একথা ভাবার কোন কারণ নেই। হয়ত তারাই স্বরচিত পাপকে আড়াল করবার জন্যে আসন্ন শতবর্ষে একটু বেশীই মাতামাতি করবেন।

পরাধীন ভারতের যন্ত্রণা প্রকাশে শরৎচন্দ্রের যে তেজোদীপ্ত মহিমা ফুটে উঠেছিল, তার মূল্য দ্বিগুণ তেজে আজও হয়ত আমাদের মনে বিস্ফোরণ ঘটাবে। পরাধীনতার গ্লানি বুকে অকে বলতে হয়েছিল, "যে রাজ্যের শাসনতন্ত্রে সত্য নিন্দিত যে দেশের গ্রন্থাগারকে জানিয়াও মিথ্যা লিখিতে হয়, লিখিয়াও ভয়ে কন্টকিত হইতে হয়, সেদেশে মানুষ গ্রন্থকার হইতে চায় কেন?" বৃটিশ-ভারতে একটি দুর্গত জেলা পরিদর্শন করে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ এ চিত্র দুঃখের চিত্র, বেদনার ইতিহাস, অন্ধকারের ছবি; কিন্তু এই কি শেষ কথা? এই অবস্থাই কি এ জেলার লোক নীরবে শিরোধার্য করে নেবে? কারও কোন কথা, কোন ত্যাগ, কোন কর্তব্যই কি দেখা দেবে না? যারা দেশের সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছে, যারা কোন প্রতিকূল অবস্থাকেই স্বীকার করতে চায়না, যারা গভর্ণমেন্টের কাছেও পরাভব স্বীকার করেনি, তারা কি শেষে দেশের লোকের কাছেই হার মেনে ফিরে যাবে? আপনারা কি কোন সংবাদই নেবেন না? (আমার কথা)।

এই রকম সোচ্চার সবাক সরব ছিলেন শরৎচন্দ্র। সুতরাং সাহিত্য, ব্যক্তিজীবন শিল্প রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যে "কুসুম পেলব লবঙ্গলতিকা" নন এই কথাটি তথ্য প্রমাণসহ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই বোধকরি মিহির আচার্যের আলোচ্য গ্রন্থটি প্রণয়ন। তথ্যভিত্তিক এই শরৎ মূল্যায়নটি ছাড়াও বর্তমান গ্রন্থে, শরৎচন্দ্রের ঝাঁঝালো উদ্ধৃতি শরৎ গ্রন্থাগারের ব্যক্তিগত সংগ্রহের তালিকা, জীবনপঞ্জী চিঠিপত্রের আলোকে শরৎচন্দ্র এবং সাহিত্য ও শিক্ষাবিষয়ক শরৎচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্র ব্যালে

অশোক সেন

এখানে চণ্ডালিকা, তাসের দেশ এবং বাল্মীকি-প্রতিভার মঞ্চরূপায়ণের কথা লিখবো। এবার আশ্রমিক সংঘ আকাডেমীতে প্রদর্শনী করছে। কাহিনী নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ এসব কাহিনী সবারই জানা। চণ্ডালিকার কাহিনী শুধু রবীন্দ্রনাথেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ২৬৫ খৃষ্টাব্দে এর চাইনিজ অনুবাদ হয়েছিল। রিচার্ড ভাগনারও আনন্দ প্রকৃতি উপাখ্যান পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং প্রথমে তাঁর ওপেরাটা সুইটজরে এবং পরে তাঁর বিখ্যাত ওপেরা পার্সিফলে এর ব্যবহার করেন।

চণ্ডালিকার গানের দিকটা এবার অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। কিন্তু নাচের দিকটা এত ভাল হয়েছে যে গান নিয়ে দর্শকরা মাথা ঘামায় নি। নাচের এই উচ্চমানের সমস্ত কৃতিত্ব এদের ব্যালেরিণা পূর্ণিমা ঘোষের। তাঁর শিষ্যা শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তাও ভাল নেচেছেন। ভাবে, ভঙ্গীতে, জেসচারে, চোখের এক্সপ্রেসানে পূর্ণিমাকে ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে ফেলা যায়। এ আমার বাড়িয়ে বলা কথা নয়। কারণ রাশিয়া জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহু ব্যালে আমি দেখেছি এবং তার সঙ্গে তুলনা করেই পূর্ণিমা সম্বন্ধে বলছি। চন্দ্রোদয় ঘোষ ভাল —তাঁকে আনন্দের ভূমিকায় নামানো উচিত ছিল। আনন্দের ভূমিকায় যতীন্দ্র সিং সম্পূর্ণ অচল। ইনি পিওর মণিপুরী স্টাইলে নাচেন। কিন্তু মঞ্চে এঁকে দেখলে মনে হয় একটি রোবোটকে নাচতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে—মঞ্চে নামবার ব্যক্তিত্ব এঁর নেই।

তাসের দেশ আশ্রমিক সংঘের একটি সেরা প্রযোজনা। এ নাটকের গানের দিকটা মোটামুটি ভালই হয়েছে। আর নাচের দিকটাকে সাবলীলতায় হাইটে নিয়ে তুলেছেন পূর্ণিমা ঘোষ। শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তা, মিহির ঘোষ, চন্দ্রোদয় ঘোষও বেশ ভালই নেচেছেন।

বাল্মীকি প্রতিভায় গানের প্রাধান্য। কোরাস গানের দিকটা তেমন আশাপ্রদ হয় নি। দস্যুদের নাচ এবং গান অবশ্য খুব উপভোগ হয়েছে। শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তার সরস্বতী সমস্ত দর্শকের প্রশংসা লাভ করেছে। বালিকার গানও অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হয়েছে।

এবার অশোক সাউর বাল্মীকির কথা বলবো। আগে এ ভূমিকায় নামতেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু অশোক সাউয়ের বাল্মীকি রূপায়ন অনেকাংশেই অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে ভাল হয়েছে। অশোকতরু ভাবাহত হয়ে গান গাইতেন। কিন্তু অশোক সাউ ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে গান করেন। আশ্রমিক সংঘের অন্যান্য নাটকগুলি মঞ্চস্থ হবার পর সে বিষয়ে পরে লিখবো।

আধুনিক গান

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাঁদের সামাজিক দায়িত্বহীনতাও স্পষ্ট হয়। আমাদের সমাজ সচেতন প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীরাও ঐ বাক-বীঠোফেন—রবীন্দ্রনাথ—কিম্বা নিধুবাবুর টপ্পায় মশগুল, সুতরাং আধুনিক বাংলা গানও অবাধে কতিপয় ব্যবসায়ীদের পকেট ভরানোর জন্য বাইজি নাচে মত্ত। কোনো যোগাযোগ নেই এ দুই জগতের মধ্যে—একদিকে উন্নাসিক আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রগোষ্ঠীবদ্ধ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্যদিকে ধূর্ত সাংস্কৃতিক ব্যবসায়ীদের বাঁশীর আওয়াজে হাজার হাজার তরুণ প্রাণ অপমৃত্যুর দিকে ধাবমান।

দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে এই অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর ইচ্ছে যদি আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বা বামপন্থীদের থাকতো তবে তাঁরা অন্ততঃ বাঁচানোর পথটি নিয়ে আলোচনা করতেন, মাথা ঘামাতেন, তর্ক করতেন। আলোচনার অযোগ্য বলে খারিজ করতেন না, কারণ "জঞ্জাল না ঘেটে জঞ্জাল সরানো যায় না।" তাঁদের যখন সম্বিত ফিরবে তখন আশা করা যায় তাঁদের দেরী হলেও বুঝতে অসুবিধে হবে না যে সেই পথটি 'আধুনিক বাংলা গান'কে পুরোপুরি অস্বীকার বা খারিজ করার মধ্যে পাওয়া যাবে না, সেই পথটিকে পাওয়া যাবে বাংলা সঙ্গীতের অতীত ঐতিহ্যের ইতিবাচক দিকটির যোগসূত্র স্থাপন করার মধ্যে। আধুনিক গানের কোনটি ইতিবাচক দিক তা যদি তরুণ সম্প্রদায়কে বোঝানোর দায়িত্ব গ্রহণ করা হতো তবে হয়তো এতদিনে মাইকের অশ্রাব্য গান শুনে আর ঘন ঘন কান বন্ধ করতে হতো না তাঁদের। [সমাপ্ত]

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে ২৪ জুলাই

শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। আক্ষরিক অনুবাদ। ৩৭টি নাটক, চারটি দীর্ঘ কবিতা এবং ১৫৪টি সনেট। চার খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রাহকমূল্য ষাট টাকা। পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হোন। সুদৃশ্য জ্যাকেট এবং মজবুত বাঁধাই। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

মপাসাঁ রচনাবলী (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)

দুই খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ। সুদৃশ্য জ্যাকেট ও মজবুত বাঁধাই। গ্রাহক মূল্য চল্লিশ টাকা। পাঁচ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (১ম) শেখর সেনগুপ্ত (২য়) সুনীলকুমার ঘোষ (৩য়)

* গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানাই তিন খণ্ডের পরিবর্তে 'মপাসাঁ' চার খণ্ডে সমাপ্ত হচ্ছে সে-জন্য দশ টাকা মূল্য বৃদ্ধি হলো। এজন্য দুঃখিত।

ভীষ্ম সেন-এর

মার্কসবাদ বনাম সুবিধাবাদ ১৫৲

ভুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

'আজকের স্পার্টাকাস' : রূপান্তরী

(দর্পণের সমালোচক)

রূপান্তরীর নবতম প্রযোজনা "আজকের স্পার্টাকাস" চূড়ান্ত অর্থে একটি রাজনৈতিক নাটক। সত্তর দশকের গোড়াপত্তনের সময় একটি ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনের ছায়ানুসরণে যে উত্তাল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তথাকথিত অর্থে তার শ্রেণী সংগ্রাম ভিত্তিক মূল্যায়নই এই প্রযোজনার উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিহত্যার রাজনীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে পাল্লা ভারী করার জন্য একই রাজনীতির সতীর্থ অনিরুদ্ধ এবং আনন্দের মধ্যে যে বাকযুদ্ধের কয়েকটি দৃশ্য রচিত হয়েছে, তা অভিনেতাদের আভিনয়িক শিল্পগুণে উত্তীর্ণ হলেও উভয়ের তর্কের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ গতিশীলতা এবং গভীরতা যথেষ্ট কম। এটা হয় নির্দেশকের অনুশীলধৎসু চিন্তাশক্তির অভাব, অথবা অনুসন্ধানে অনাগ্রহ। এই তথাকথিত উগ্রপন্থী রাজনীতির ভ্রান্ত লক্ষণ বিচারের ক্ষেত্রে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী এবং অন্ধ বিরুদ্ধাচারীদের মুখে যে অভিযোগগুলি প্রায়ই শোনা যায়—এ নাটকে তাই স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই চর্বিতচর্বণের জন্য এ নাটক কেন?

নাট্যকার এবং নির্দেশকের বিচারের মধ্যেও ত্রুটি থাক ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধারণ স্তরের চিন্তার ঊর্ধ্বে তিনি কিছু বলবেন এটাই তো সাধারণ দর্শকের প্রত্যাশা। জোছনবাবু সে প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হননি। ব্যক্তিহত্যায় বিপ্লবের কাজ তরান্বিত হয় না, বরং বিপরীতার্থক ক্ষতিই বেশী হয়—অনিরুদ্ধ এ যুক্তি দেখালেও আনন্দ যখন এর বিরোধিতা করছে, তখন নাটকের খাতিরে তাকে আত্মপক্ষাবলম্বী যুক্তি প্রদর্শনের আরও সুযোগ দেওয়া উচিত। শুধু "যা বলবার পার্টি মিটিংয়ে বলবে" কিংবা "পার্টির নির্দেশ তোমাকে মানতে হবে" এ যুক্তি দিয়ে তর্ককে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের ত্রুটি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে দর্শকের চিন্তাশক্তি তীক্ষ্ণতর হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। ফলে এই রাজনীতি সম্পর্কে ভাবনার দিক থেকে দর্শক হিসেবে যে যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন। অথবা রাজনৈতিক বিচ্যুতি সম্পর্কে সব প্রশ্ন যদি অনিরুদ্ধকে পার্টি মিটিংয়ে বলবার সুযোগ দেওয়া হত, সে-ক্ষেত্রেও প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনা ছিল।

একটি ভুল রাজনীতির জন্য দলীয় কর্মীর হাতেই বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অনিরুদ্ধকে মৃত্যুবরণ করতে হলেও আনন্দের প্রতি দর্শকের কিঞ্চিৎ মমত্ববোধ থেকেই যায়, তার কারণ একজন বিপ্লবী চরিত্রের অনুমিত অধিকাংশ গুণাবলী তার নাটকে রয়েছে। এই গুণাবলীর রাজনৈতিক গুরুত্ব কতখানি, সে বিশ্লেষণের জন্য আনন্দকে আত্মপ্রকাশের আরও সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। তা দেওয়া হয়নি বলেই নাট্যকারের বক্তব্যও কোন সুনির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হয় না। যার সমালোচনা করার জন্য এই নাটক, তার প্রতিও অবশেষে নাট্যকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থেকে যায়। তাইই যদি নাট্যকারের উদ্দেশ্য হবে, তাহলে নির্দেশকের উপস্থাপনার ভঙ্গী হওয়া উচিত ছিল আত্মসমালোচনামূলক। কেননা অনিরুদ্ধ দল ছেড়ে দিয়ে সঠিক রাজনীতির সপক্ষে আত্মনিয়োগ করবে বলে শেষ পর্বে যে ঘোষণা রেখে যায়, তা অনেকটা শূন্যগর্ভ বলেই মনে হয়। এর পেছনে অনিরুদ্ধর চরিত্র চিত্রণও অনেকটা দায়ী। অর্থাৎ ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করেও একের পর এক "পার্টির নির্দেশের" অজুহাতে যে এই কাজ অংশ গ্রহণ করে, তার কাল্পনিকতাভিত্তি সম্পর্কে অবশ্যই সন্দেহ জাগে।

তবুও বলব, জোছনবাবু নাটকের পরিকল্পনা যে আঙ্গিকে রচনা করেছেন, তা যে অনেকাংশেই বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই। ধোপাদের দৈনন্দিন কর্মময় জীবনের একটি পটভূমিকে সামনে রেখে আনন্দর চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের আন্তরিকতার প্রকাশ স্পষ্ট। কিন্তু নাটকের সূচনায় স্পার্টাকাস ও দাস-বিদ্রোহীদের ব্যর্থতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উগ্র রাজনীতির সম্পর্কে রচনার যে প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল, তা বহুলাংশে ব্যর্থ বলেই মনে হয়। প্রথমতঃ স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহের বিপ্লবী মেজাজ এবং পটভূমির সঙ্গে আজকের অবস্থার সামান্য মিলই খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, গণ বিদ্রোহের মূল্যে স্পার্টাকাস যে অর্থে সম্মানিত, এই রাজনীতি সে অর্থে তর্কাতীত নয়। তাছাড়া সূচনায় স্পার্টাকাসের ঐ ভূমিকাটুকু বাদ দিয়েই দর্শকরা নাটক উপভোগ করে থাকেন। কেননা মূল নাটকের সঙ্গে এই ভূমিকাটুকুর বন্ধন খুবই কাঁচা।

এছাড়া প্রযোজনাগত পরিমিতির দিক থেকেও রূপান্তরী এ নাটকে যথেষ্ট অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকে প্রতিটি দৃশ্যান্তরের মুহূর্তে সময়জ্ঞানের (টাইমিং) যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা গেছে। ধোপাদের কাপড় কাচার অসংলগ্ন ধ্বনি, দৃশ্য শেষ বা শুরু হবার আগেই হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠা কিংবা নিভে যাওয়া বেশ পীড়াদায়ক। অন্তত "ভূতের বেগার" প্রযোজনায় এই ত্রুটিগুলি বহুলাংশেই অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। আনন্দকে গ্রেপ্তারের মুহূর্তে মাইক্রোফোনে নেপথ্য ভাষ্যে আরও নাটকীয়তা প্রয়োজন।

অভিনয়ে সুজিত ঘোষ (আনন্দ) পার্থ মিত্র (অনিরুদ্ধ), বিজয় চক্রবর্তী (ভগবান প্রসাদ) চন্দ্রা দস্তিদারের (সাবিত্রী) অবদান প্রযোজনাকে অনেক মার্জিত করেছে। আনন্দর বাবার চরিত্রাভিনেতা অভিনয় স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও ঘরোয়া পরিবেশে তার পোষাকের ধোপদুরস্ত ভাব দৃষ্টিকটু লাগে। অন্যদিকে চন্দ্রা দস্তিদারের সাবলীল অভিনয় তার কণ্ঠস্বরের দৈন্যকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। মঞ্চপরিকল্পনা পুরোপুরি নাটকের ক্ষুধা মেটায় না। একই সেটে বহু দৃশ্য সম্বলিত নাটকে সেটের বহুমুখী ডাইমেনশন থাকা দরকার।

নেহরুর চোখে

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

তোলার জন্য দীর্ঘকাল ধরে মনোবিজ্ঞানীরা যে কথা বলে আসছেন, স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার তা প্রয়োগে সচেষ্ট হলেন। শিক্ষা, বোঝাপড়ার অভাব এবং মন্দ পরিবেশের জন্যই অপরাধ প্রবৃত্তি দেখা দেয়। যে কারণে অপরাধীদেরকে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার শিকার, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও অজ্ঞ হিসাবে দেখতে হবে এবং সমাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য সুশিক্ষা দিতে হবে।

নেহেরু সেবারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ শেষে লিখেছিলেন যে, "বলশেভিক সরকারের তহবিলের স্বল্পতা মনে রাখতে হবে। বলশেভিক সরকার শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা এবং কৃষির জন্য সবকিছু খরচ করতে রাজী। বিশাল কারাগার গড়ে তা সমাজাতে তাঁরা ইচ্ছা পোষণ করেন না। তাঁরা আগামী দিনে আরও ভালো সমাজ গড়ে বেশির ভাগ কারাগার অবলোপ করার আশা পোষণ করেন। কেন বৃথা জেলের পেছনে টাকা খরচ করা হয়? এখন তাঁরা পুরানো জার সরকারের কারাগারগুলো দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, মস্কো এবং বড় শহরগুলোর জেলগুলোর অবস্থা ভালো কিন্তু সম্ভবত অন্য প্রদেশের জেলগুলো ভালো নয়। সোভিয়েত সরকার কিন্তু সেগুলোর উন্নতি বিধানে টাকা খরচ করবেন না। কিন্তু মহৎ সামাজিক আদর্শ এবং অপরাধীদের প্রতি মানবিক আইনের ব্যবহার ভালো জেলবাড়ীর থেকে প্রয়োজনীয় এবং শিক্ষণীয়। যদি এই নীতি মেনে চলা হয়, তাহলে হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও রাশিয়া অবশ্যই উন্নতি করবে।

(সূত্র—নেহেরুর প্রবন্ধ, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ ৫ ২৮)

রোডেশিয়ার বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিস্ত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

রোডেশিয়ার বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিস্ত সরকার নতুন করে নির্বিচারে খুনখারাপি শুরু করেছে। আয়ান স্মিথ ভেবেছে, খুন-জখম, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রোডেশিয়ার জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে। সে আশা বৃথা। কারণ রোডেশিয়ার মানুষ এ এন সির (আফ্রিকান জাতীয় পরিষদ) নেতৃত্বে যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছে তার গতি রোধ করার সাধ্য কারো নেই। রোডেশিয়ার বহু অঞ্চল ইতিমধ্যেই এ এন সির বিপ্লবী ফৌজ দখল করে নিয়েছে। এ এন সির সমর্থকরা অনত্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে শুরু করে অন্যান্য ধরণের আন্দোলন সংগঠিত করছে। সম্প্রতি আয়ান স্মিথের ভাড়াটে ফৌজ তেরো জন দেশপ্রেমিককে হত্যা করেছে। সলেসবেরীর এই ঘাতকরা গুলি চালিয়ে আরো আঠাশ জন দেশপ্রেমিককে আহত করেছে।

অন্যদিকে সারা রোডেশিয়া জুড়ে চলেছে আয়ানস্মিথের বর্বর পিটুনি অভিযান। ব্যাপক গ্রেপ্তার, ধর্ষণ, পিটুনি এখন আয়ান স্মিথের "নৈতিকতার" অঙ্গ। সমস্ত রোডেশিয়ায় হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্মিথ সরকার গড়ে তুলেছে বেশ কয়েকটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। ইলেকট্রিকশক থেকে শুরু করে অন্যান্য পৈশাচিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে স্মিথের চেলারা। বেহায়া স্মিথ গুলিচালানোর সাফাই গেয়ে বলেছে যে, কাজটা ঠিকই হয়েছে। শিক্ষা দেওয়ার মতই এটা একটা দৃষ্টান্ত বটে। স্মিথ নাকি এ এন সির সঙ্গে একটা আপোষ আলোচনা করতে চায়। অন্তত, স্মিথের পশ্চিমী বন্ধু ব্যাদাররা এটা প্রচার করছে এ এন সির মধ্যে ভাঙন ধরানোর জন্যে।

ব্রিটেন, মার্কিন, পশ্চিম জর্মান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে আফ্রিকার বুকে এই বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিবাদী সরকারটি টিকে আছে। বর্তমানে রোডেশিয়ার বুকে থেকে ফ্যাসীবাদী ভাড়াটে গুণ্ডারা অ্যাংগোলার অর্জিত মুক্তিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে নানভাবে। এই শয়তানের ঘাঁটিকে প্রত্যক্ষভাবে তালিম দিচ্ছে পৃথিবীর জঘন্যতম শত্রু, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার সি অই এ। সম্প্রতি জিমবাবে মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নেতা কানান বানদা বলেছেন যে, রোডেশিয়ার বর্তমান ফাসিবাদী প্রশাসন ইতিমধ্যে ভেঙ্গে পড়ত যদি না পশ্চিমী দেশগুলি তাকে মদত দিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জর্মানি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো রোডেশিয়ার বর্তমান ফ্যাসিস্ত সরকারকে বাঁচিয়ে রাখছে অর্থনৈতিক, সামরিক সাহায্য দিয়ে।

সম্প্রতি লুসাকায় এ এন সির বৈঠকের পর একটি প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাংবিধানিক কোন ব্যাপারে এ এন সি আয়ান স্মিথের সরকারের সঙ্গে কোনরূপ আপোষ আলোচনায় বসবে না। রোডেশিয়ায় শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে এ এন সি যে সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা অব্যাহত থাকবে বলে আরো ঘোষণা করা হয়।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধাচরণে তাঁর ভূমিকা কে অস্বীকার করতে পারে এ সবই তিনি করেছিলেন মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠালাভ, আত্মবিকাশ ও আধিপত্যবিস্তারের মৌলিক প্রেরণা থেকেই; কিন্তু এর দ্বারা সামগ্রিকভাবে এই দেশের মধ্যবিত্ত জীবন ও জীবনকেন্দ্রিক আন্দোলন লাভবান হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির শত অনুদারতা সত্ত্বেও তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছে বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প, সমুন্নত হয়েছে ভাষাভঙ্গি। বিদ্যাসাগরের প্রবল পৌরুষ হিন্দুধর্মের প্রথাবদ্ধ অচলায়তনের বিরুদ্ধে বারবার আঘাত করেছে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমারের হাতেই গড়ে উঠেছে "তত্ত্ববোধিনী"—যুক্তিতর্ক নির্ভর সেকালের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা। এই মধ্যশ্রেণীই একহাতে কৃষকবিদ্রোহ নিবারণ ও ইংরেজ স্তুতি করেছেন, অন্যহাতে গড়ে তুলেছেন আধুনিক বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি-কাব্যসাহিত্য-সাময়িকপত্র, সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক মানবতাবাদ, চিন্তা ও চেতনাবোধ। রামমোহনের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও একথাও আমরা কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না যে এই দেশে তিনিই প্রথম মানুষ যিনি স্পেনদেশের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে আনন্দিত হয়ে কলকাতার টাউন হলে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন কিংবা ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে গর্বিত হয়ে বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। রামমোহনের এই উপলব্ধিও সত্য এবং গভীরভাবেই আন্তরিক!

বস্তুত দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই মধ্যশ্রেণীর এই মানুষেরাও আপন শ্রেণীগত গন্ডীর মধ্যেই নানা স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই স্ব-বিরোধিতাই তাঁদের মূল চারিত্র্য লক্ষণ। এরই জন্য সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন গণতান্ত্রিক শক্তির জয়ে উল্লসিত, এরই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র "সাম্য" রচনা করেও তা প্রত্যাহার করেন, এরই জন্য জমিদারী পরিচালনা এবং ইংরেজের প্রতি অখন্ড আনুগত্য সত্ত্বেও ঠাকুরবাড়ীর মানুষেরাই আবার স্বদেশাত্মক "হিন্দুমেলা"রও উদ্বোধন ঘটান!

এবং এই স্ববিরোধিতার জন্যই রামমোহন থেকে অক্ষয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের দুরবস্থার বিষয়ে আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেও এবং তাদের উপর দুঃসহ কর ভারের প্রতিবাদ জানিয়েও শেষপর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই নিঃশর্ত সমর্থক থাকেন, সমাজবিপ্লবকে নিতান্ত গর্হিত কাজ এবং বিপ্লবীদের আত্মঘাতী বলে মনে করেন।

উনিশশতকের বুদ্ধিজীবীদের সম্যকভাবে বুঝতে হলে সমকালীন পটভূমিতে এই শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ও স্ববিরোধিতাকে একত্রে বুঝতে ও বিচার করতে হবে।

Regd. No. WB/CC-32 PRICE: 40 PAISE

কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

কলকাতা আমার নয় আমি কলকাতার

অনার্য মিত্র

তখন কি জানতুম দিনে দিনে কলকাতা এই হবে। কলকাতাকে যখন দেখিনি, কলকাতার মাটি যখন ছুঁইনি, সেই সাড়ে সাত বছর বয়সে অবাক চোখে কলকাতার যে আলপনা এঁকেছিলুম আপন মনে, তাকে ফিরে পাইনি। শুধু ফিরে পাইনি নয়, আমার স্বপ্নে আঁকা আলপনা প্রথম দিনের ভোরে পাওয়া কলকাতার কুয়াশা চিরতরে মুছে দিয়েছে।

কলকাতা ঘিরে আমার স্বপ্নকে আমি সম্ভাব্যতার সীমায় বাঁধতে পারিনি কেন? আজ বুঝতে পারি, কেন পারিনি। ওপারের রংপুর জেলায় জন্মেছিলুম আমি। গ্রামের আরণ্যক পরিবেশে অশান্ত নদীর কিনারায় যে সহজিয়া মানুষের গা ঘেঁষে বর্ণ পরিচয়ের দরজা ডিঙিয়ে একে একে পৃথিবীর অতলান্ত মাধুরী লেহন করছিলুম, তার সঙ্গে কলকাতার মিলন ঘটুক—তা চাইনি একথা ঠিক, কিন্তু কলকাতায় পা দিতে না দিতেই আমার অবুঝ মনের সহজিয়া রস কলকাতা তার আগ্রাসী উত্তাপ দিয়ে দুদিনেই নিকিয়ে নেবে—এ আমি ভাবিনি কোনদিন।

সাড়ে সাত বছরের স্বপ্নে দেখা কলকাতা আমার কাছে ছিল জামরুল, আপেল আর নাশপাতির কলকাতা। বাবা যখন কলকাতায় আসতেন এখানে দাদাদের দেখাশোনা করার জন্য, তখন আমার কলকাতা ছুটে আসার ইচ্ছেকে শাসন করতো একমাত্র আপেল জামরুল আর নাশপাতি। ঐ একটা লোভ মিটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেই আমি ঠাণ্ডা।

আমাদের পাশের বাড়ীর পলুর মা তার মেয়ে ময়নাকে বলত: তার বিয়া দিমু কৈলকাতায়। গায়ে গতরে বেশ রি রি বেড়ে উঠছিল ময়না। ওর মায়ের ধারণা ছিল, কলকাতা ছাড়া এ মেয়ের সুপাত্র জুটবে না। অবশ্য ময়না কি স্বপ্ন দেখত জানি না। কিন্তু বছর কয়েক পরেই ময়নারা যখন সত্যি সত্যি ওখানকার ভিটে মাটি বেচে কলকাতায় এলো, তখন নাকি শিয়ালদহ প্লাটফর্মে পা দিতে না দিতেই ভীড়ের ভেতর থেকে তাকে কারা টেনে নিয়ে গেছে। ময়নার হয়তো এতদিনে বহু সুপাত্র জুটেছে।—আমি এ খবর শুনেছি, কলকাতায় এসে ময়নার মার মুখ থেকেই।

আর আমি যখন আপেল আর জামরুলের নেশা ধরানো গন্ধ নাকে জড়িয়ে কলকাতায় পা দিলুম, তখন প্লাটফর্মের ভীড় থেকে আমায় কেউ ছিনিয়ে নেয়নি। কেননা আমি তো আর ময়না নই। কিন্তু আমার সেই সহজিয়া 'আমি'কে দু দিনেই ছিনিয়ে নিয়েছিল কলকাতা। মনে পড়ে, ছেলেবেলা থেকে বরাবর শান্ত ছিলাম বলে ময়নার মা আমায় মাকে বলতো: তোমার পোলার গায়ে কৈলকাতার হাওয়া না লাগলে মানুষ হইবো না। কৈলকাতার চ্যাংড়াগো ছাখো না, কেমন চোখে মুখে কথা কয়। আজ দেখা হলে বলতাম, ময়নার মা, ছাখেন আমি কেমন মানুষ হয়েছি।

কলকাতায় পা দিয়েছি আজ আঠারো বছর। নয়া পয়সা আর বিদ্যুত চালিত ট্রেনের যুগ শুরু হওয়া থেকে এই পাতাল রেল আর টেলিভিশানের যুগ পর্যন্ত আমি কলকাতায়। এখানে কলেজেরও পাট চুকিয়েছি আজ সাত বছর। কানাগলি থেকে বিশাল রাজপথ পর্যন্ত কম হাঁটিনি কলকাতার বুকে। অনেক মানুষ, অনেক উৎসব বৈচিত্র্যের রং ফলিয়ে কলকাতার বুকে রূপের ঢল নেমেছে। এই শহরের মোহিনী রূপে বিরূপ হবার মতো আমার চোখ নিঠুর না হলেও ঐ রূপের আড়ালে যে নৈশাচিক নির্মমতা লুকিয়ে আছে তা আমার চোখের আড়াল হয়নি। রূপের মোহিনী পলেস্তারা দিয়ে যে আড়ালে থেকে শাসন করতে চায়, তা আমার কাছে হিংস্র শ্বাপদের মতো ভয়ঙ্কর। আমার কলকাতার বন্ধুরা বলেন: তুমি খুব সেন্টিমেন্টাল, তাই সব কিছু তলিয়ে দেখতে যাও, জীবনে তোমায় ঠকতে হবে। আমার এই কলকাতা-প্রেমিক বন্ধুরা কলকাতাকে সত্যিই ভালবাসে, তাই ওরা সেন্টিমেন্টাল নয়, ওরা কখনও ঠকে না।

আমি যে কলকাতায় থেকে ঠকেছি একথা ঠিক, কিন্তু আমি যে হারিনি সে খবর আমার বন্ধুরা রাখেন না। আমি যে কলকাতায় এসে ঠকেছি তার হদিস তো নিজেরই বাড়ীতে আমার কলকাতা-প্রেমিক দাদাদের কাছে পেয়েছি। আমার কেতাদুরস্ত সাহেবী প্যাটার্নের দাদারা আমি আনস্মার্ট বলে আমাকে প্রথমটায় কলকাতায় লেখাপড়া শেখাতেই রাজী ছিলেন না। ওরা টাকা পয়সা খরচ করে 'ভোম্বল মার্কা' ছেলে তৈরী করতে চান না। দিন কয়েক পরে যখন রেডিওর নব ঘুরিয়ে রেডিও চালাতে শিখলুম, টেলিফোন ধরতে শিখলুম, দাদা বাড়ীতে থাকলেও তার কাছে কেউ চাকরীর ব্যাপারে তদ্বির করতে এলে তাকে মুখের ওপর 'বাড়ীতে নেই' বলে দিতে শিখলুম,—তখন আমি খানিকটা স্মার্ট ও লেখাপড়া শেখার যোগ্য হয়ে উঠেছি। জামার আস্তিন গুটিয়ে, গায়ে শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে যারা ইস্কুলে যাচ্ছিল, তারা আমার এক ক্লাসের বন্ধু হয়ে গেল।

কলকাতায় এসে দাদার কাছে আমি প্রথম জানলুম যে এখানে মুখে কথা বলে কারো কুশল জিজ্ঞাসা করাটা ছ্যাবলামো। মৃদু হেসে চোখ নাচিয়ে কুশল সংবাদ নেওয়াটাই স্মার্টনেস।

তথাকথিত এই স্মার্টনেসের অনেক কিছুই আজও আমার দখলে আসেনি। তাই আজও ঠকছি। কিন্তু হারছি কিনা তার হিসেব করবার দিন আসেনি। আজ শহরে আমি শিক্ষিত আর পাঁচটা যুবকের মতো উদ্‌ভ্রান্ত, হয়তো কিছুটা আলাদা। তবুও আমার মতো আলাদা দুর্ভাগা যুবকও হয়তো কলকাতায় কম নেই, কিন্তু বিজ্ঞাপনে মোড়া আত্মপ্রতারক এই শহরের এমনি গুণ যে কাউকেই আলাদা বৈশিষ্ট্যে চেনবার কোন উপায় নেই রাতের ষ্টেশনে প্লাটফর্মে ঘুমিয়ে থাকা হাজারো উদ্বাস্তু পরিবার যেমন একটি নিরাভরণ রহস্যের রূপে থমকে থাকে, তেমনি আমার মতো অনেক সেন্টিমেন্টাল যুবকের গায়ে গা জড়িয়ে হেঁটে চলেছে অগুন্তি কলকাতা-প্রেমিক মানুষ। নিজেকে নিজের চিনে নেওয়া মুস্কিল। থামতে চাইলেই থামা যায় না। কলকাতা প্রেমিকরা ঠিক চালিয়ে নিয়ে চলবে। যাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে আজ আমি যুবক হলাম, তাদের পা দুটো আজ আমার কাঁধে। আমরা যাকে সভ্যতা বলি, এখানে তা অপরের কাঁধে পা দিয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া লোকদের দখলে।

কলকাতার মতো শহরে প্রতিষ্ঠা চাইনি, কিন্তু অনির্ভরতায় বাঁচতে চাওয়াটা আমার মতো সেন্টিমেন্টাল যুবকের পক্ষে যে অপরাধ তা কলকাতা আমাকে মানে অপমানে পদে পদে বুঝিয়ে দিয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অসততাই বড় শর্ত, কিন্তু অপরের সততার মূলধনও যে তাতে নিয়োগ করতে হয়—এ ব্যাপারে আমার প্রথম শিক্ষক কলকাতা। আমার কলকাতা-প্রেমিক অনেক বন্ধু আত্মপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠার পেছনে নিয়োজিত আমার মূলধনের মাশুল আমি আজও তুলতে পারিনি। ওরা এখন যে কলকাতা দিয়ে গাড়ী চড়ে যায় আমি সে কলকাতা দিয়ে পায়ে হাঁটি না। আমার কলকাতা অন্য কলকাতা।

ভিন্ রাজ্যে আর বিদেশে কলকাতার কতো সুনাম। কত প্রবাসী কলকাতার রূপকে উপভোগ করতে আসেন। কিন্তু যারা কলকাতাকে ভোগ করতে আসেন না, জানতে আসেন, তারা কি কখনোই আমাকে খুঁজে পান না। আজ মনে হয় আমি কলকাতার উপযুক্ত নই। আমার জন্যে কলকাতার কতো অপমান। ময়নার মার সঙ্গে দেখা হলে আরেকবার বলতাম: ময়নার মা, আমার গায়ে কলকাতার হাওয়া লেগেছে, কিন্তু আমি এখনও চোখে মুখে কথা বলতে শিখিনি। কলকাতায় পা দিয়েই বিস্ময়ের চোখ নিয়ে মনে মনে সেদিন যে ছড়া কেটেছিলুম, তা আজ আমার কাছে দ্বিগুণ সত্যি মনে হয়: "কলকেত্তার হাওয়া লাগে যদি গায়/দণ্ড দুয়েক পরেই কপাল ফিরে যায়/আমার কপাল পোড়া তাই ভাগ্য ধুঁকে মরে/কলকেত্তার প্রেমিক আমার ভাগ্য চুরি করে।"

ভাগ্য নিজের হাতে গড়তে হয় এ বাণী কে দিয়েছিল জানি না, কিন্তু ভাগ্যচোরদের দৌলতে কি করে নিজের ভাগ্য ছিনিয়ে নিতে হয়, তা কলকাতা শেখায় না। ভাগ্যচোরেরা এখানে টালিগঞ্জের বালিগঞ্জের কেতা দুরস্ত পাড়া দিয়ে গাড়ী চড়ে বেড়ান, কিন্তু আমার মতো হতভাগা যুবকেরা হাঁটে জঞ্জাল নগরী, মাটি খোঁড়া ডিগিং অথরিটির কর্মযজ্ঞ আর উদ্বাস্তু ঠাসা কলকাতার ফুটপাত দিয়ে। আমি এই পচা গলা ক্ষয়িষ্ণু মাটি কামড়ে যুবক হয়েছি।

দুর্ভিক্ষের ভয়াল রূপ আমি দেখিনি সত্যি। তবু গাঁ গ্রামে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গেছেই সংবাদপত্রে দেখেছি: ফ্যানের থালা নিয়ে সমস্ত মানুষ শহরের দিকে ছুটে আসছে। শহরের বাবুদের পা জড়িয়ে তারা কাঁদছে। এই অন্নপ্রার্থীদের কলকাতা আমার সাহেবী প্যাটার্নের দাদাদের জন্যে নয়, কিংবা আমার কেতা-দুরস্ত কলকাতা-প্রেমিক বন্ধুদের জন্য নয়। আমি যে কলকাতা দিয়ে হাঁটি সে কলকাতায় অন্নপ্রার্থী আর কর্মপ্রার্থীর ভীড় বেশী। আমি যে কলকাতা দিয়ে হাঁটি সেখানে উলঙ্গ সংস্কৃতি জয়ঢাক বাজে, রাত্রির নিথরতা ভেদ করে কুৎসিত হিন্দী গানের কলি, ব্লু-ফিল্মের চটকে সে কলকাতার পথ বিজ্ঞাপনে মোড়া থাকে, সে পথে অনাথিনী উদ্বাস্তু দিনে দুপুরে বেচে চোলাই, সাট্টায় বাঁটোয়ারা হয় লুম্পেনদের ভাগ্য, জঞ্জাল স্তূপের পাশে যৌনসুখ ভোগ করে তারা, নিরুপায়ী যুবতীরা মেলে ধরে দেহের মহিমা। সুন্দরী ট্রাম দিয়ে, পাতালের রেল দিয়ে গঙ্গার সেতু দিয়ে কলকাতার এই রূপ লেহন করা যাবে কি?

যখন কলকাতার মুখ দেখে তখন দেখেছি, কলকাতা ফেরৎ বাবুরা আমাদের গাঁয়ে কত সম্মান পেয়েছে, যেন বিলেত ফেরৎ সাহেবের মতো। তাকে কে জল এগিয়ে দেবে, কে খাবার এগিয়ে দেবে তাই নিয়ে হুলুস্থুলু পড়ে যেত। কিন্তু আজ আমার মতো সেন্টিমেন্টাল 'মুখে চোখে না কথা বলা' একজন যুবক গাঁয়ে ফিরে গেলে কি সেই সম্মান পাবে? ময়নার মার কি মন চাইবে আমাকে কলকাতার ছেলে হিসেবে ময়নার জন্য সুপাত্র ঠাওরাতে?

মিছিল নগরী কলকাতার মেজাজ সারা ভারতই জানে। রক্তে রাজপথ সিক্ত করার ঘটনা শুধু একদিনের নয়, প্রতিদিনের। সন্ত্রাস নগরী কলকাতা কি ভাবে সেদিন আমার বন্ধুর ভাইকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেই অজস্র ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলীর মধ্যে আমি যুবক হয়েছি। আজ এই কলকাতাকে আমার গাঁয়ের সেই সহজিয়া মন নিয়ে ভালবাসতে বাঁধছে। প্রেম একতরফা হয় না। আমি তো কলকাতায় আমার সেই নেশা-ধরানো আপেল নাশপাতি আর জামরুলের গন্ধ ফিরে পাইনি, তার বদলে পেলাম রক্ত আর বারুদের গন্ধ। তবু কলকাতার যুবক আমায় কলকাতায়ই থাকতে হবে। কিন্তু কলকাতা আমার নয়, আমি কলকাতার।

সম্পাদক—হীরেন বসু

দর্পণ কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ বউ লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার টুকে এম এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে ধরা পড়েছেন

১৮শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৫শে জুলাই ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবার এম এ, এম কম পরীক্ষায় একদল ছাত্র যেমন পরীক্ষার সবরকম আইন কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন তেমনি এই ছাত্র দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার। এই অফিসার ব্যক্তিটি প্রায় বিশ বছর আগে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। ১৯৭২ সালে বিনা বিজ্ঞাপনে তিনি সরকারী অফিসার পদে নিয়োগ লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার পদে যোগ দেবার পূর্বে তিনি পূর্ব

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

বিদায় আমলাতন্ত্র ঃ বাংলাদেশে এবার থেকে সরকার চালাবে ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ সরকার বুরোক্রেসী অর্থাৎ তথাকথিত আমলাতন্ত্রকে শীঘ্র বিদায় দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান সেক্রেটারিয়েটের অবলুপ্তি ঘটিয়ে "ঔপনিবেশিক শাসনের" শেষ চিহ্ন মুছে দিতে চাইছেন। অতঃপর সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করবে পার্টির লোকেরা।

পরিকল্পনা মত কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সেক্রেটারিয়েটের প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে। পেট্রো-বাংলা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে সেক্রেটারীর বাড়তি ডিউটি দেওয়া হয়েছে। পাট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকেও একইভাবে বাড়তি কাজ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীকৃত শিল্পবিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্রমশঃ কর্পোরেশনের সংখ্যা বাড়বে এবং তার চেয়ারম্যানরা প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রীর অধীনে কাজ করবেন।

অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা সেক্রেটারীদের কাজ করবেন। তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও কর্পোরেশনের মধ্যে তাঁরা সমন্বয় সাধন করবেন, এর আগে সেক্রেটারীরা যে কাজ করতেন। অবশ্য মন্ত্রিসভা থাকছে সমন্বয় সাধনের সর্বোচ্চ সংস্থা রূপে। এই উপায়ে রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসন ও উন্নয়নের কাজের ওপর তদারকী করবে। নীতি নির্ধারণ করবে দলের কার্যকরী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি।

বলা হচ্ছে যে, প্রশাসনিক পুনর্গঠনের ফলে সরকারী কাজকর্ম দ্রুতগতিতে সমাধা হবে, দুর্নীতির সুযোগ কমবে এবং কর্মসূচী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোবে। এসব উদ্দেশ্য সাধন হোক বা না হোক আমলাতন্ত্রের মৃত্যুঘন্টা ধ্বনিত হচ্ছে। আরও একটা কথা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ সরকারের কাছে রাজনৈতিক ভাবে নিরপেক্ষ প্রশাসকের কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুতঃ শেখ মুজিব যে শাসন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তাতে এই ধরণের প্রশাসকের স্থানও একেবারেই নেই। এই ব্যবস্থায় সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে শেখ মুজিবরের দলের রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। বর্তমান মনোলিথিক কাঠামোয় সকলকেই যখন একই "লক্ষ্যের" দিকে এগোতে হচ্ছে, তখন অফিসাররা দলের সদস্য হলেই ভাল হয়।

মালিকদের দেশস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মালিকপক্ষের অবাধে কারখানা বন্ধ করে দেবার অধিকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এই অবস্থা বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে আইনের সংশোধন দরকার।

গত সপ্তাহে শ্রমমন্ত্রীর ঘরে আহূত সম্মেলনে উপস্থিত কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপরোক্ত দাবী জানানো হয়েছে।

উপস্থিত তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপাল দাস নাগের কাছে অবিলম্বে বন্ধ কারখানা খোলার জন্য দাবী জানান। উক্ত প্রতিনিধিরা একথাও বলেন, যেসব মালিক সরকারের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কারখানা বন্ধ রাখবেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জনৈক তরুণ নেতা বলেন, বর্তমানে দেশের সংকট মুহূর্তে প্রয়োজন উৎপাদন। এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদন বাড়ানোর জন সহযোগিতা করছেন। কিন্তু মালিকপক্ষ তুচ্ছ কারণে কারখানা বন্ধ করে দিয়ে জাতীয় উৎপাদন ব্যাহত করছেন নিছক নিজেদের লাভ লোকসানের দিকে নজর রেখে।

জরুরী অবস্থায় কিছু কিছু অত্যাবশ্যকীয় শিল্পে ধর্মঘট বেআইনী করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণী এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্লোজার লক-আউট নিষিদ্ধ করে সরকারী অর্ডিন্যান্স জারী করা দরকার। এ ব্যাপারে প্রতিনিধিরা ডঃ নাগকে সচেষ্ট হতে বলেন।

শ্রমমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন বর্তমান আইনে এই সব সমস্যা সমাধান করা যাবে না। তার জন্য আইনের পরিবর্তন দরকার। এটা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে। তার করার কিছু নেই। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন এই সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মেটাল বক্স, ওরিয়েন্ট ফ্যান, ইণ্ডিয়া ফ্যান প্রভৃতি বড় বড় কারখানাগুলোর মালিকরাই লক-আউট ঘোষণা করেছে।

বর্তমানে কোন মালিকের বিরুদ্ধে ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করে শাস্তি বিধান করলে বড় জোর এক হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। তাও আবার কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

এম এল এদের সম্মান দেখাবেন

কর্মচারীদের প্রতি সরকারী নির্দেশ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এম এল এরা সম্মানিত ব্যক্তি অতএব তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয়। রাজ্য সরকার এই মর্মে এক নির্দেশ পাঠিয়েছেন, সমস্ত সরকারী অফিসে ও বিভিন্ন সংস্থায়। সরকারী নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, এম এল এরা কোন অফিসে গিয়ে সাধারণ কর্মী বা পদস্থ অফিসারদের কাছে অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চাইলে তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত করতে কর্মী বা অফিসাররা বাধ্য থাকবেন। কোন কারিগরি বা জটিল বিষয় এম এল এর জানা না থাকলেও তাকে ধৈর্য সহকারে ঐ বিষয় বুঝতে সাহায্য করতে হবে।

নকল ইনভিজিলেটর

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত বারোই জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষা হলে এক নকল ইনভিজিলেটরকে হাতে নাতে ধরা হয়। ঐ ব্যক্তি পরীক্ষা হলের মধ্যে প্রবেশ করে টোকাটুকির সুযোগ দেবার বিনিময়ে ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছিল।

অপরিচিত একটি মুখকে টাকা সংগ্রহ করতে দেখে একদল পরীক্ষার্থীর মনে সন্দেহ হয়। বিষয়টি কথা কাটাকাটি থেকে অনেক দূর গড়িয়ে যায়। এরপর আসল কর্তারা এসে দেখেন, এ লোক সে লোক নন, অনাহূত অতিথি অবশ্য সংগৃহীত টাকা ফেরৎ দিয়েছেন এবং অন্যায় স্বীকার করেছেন।

আনন্দবাজারে তল্লাসী

বহু আপত্তিকর জিনিষপত্র পাওয়া গেছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর মালিকদের বাসস্থান এবং পত্রিকার কার্যালয়ে সম্প্রতি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও অন্যান্য সরকারী গোয়েন্দা দপ্তর হানা দিয়ে বেআইনী অলঙ্কার হিসাব বহির্ভূত বিদেশী মুদ্রা ও আপত্তিকর কাগজপত্র পেয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, দেশের প্রধান সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এই সংবাদ প্রচার করতে অস্বীকার করে। পরে অবশ্য তারা এই সংবাদ প্রচারে বাধ্য হলেও পত্রিকা গোষ্ঠীর নামটি চেপে যায়।

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জরুরী অবস্থার সুযোগে কয়েকজন শিল্প-মালিক কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ ও বিক্ষোভ সঞ্চারের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এর ফলে শ্রমিকরা যেমন তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি কর্মচ্যুতিরও আশংকা দেখা দিয়েছে। প্রেমচাঁদ জুট মিলের ম্যানেজার সম্প্রতি পর পর দুটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে শ্রমিকদের জানিয়েছেন যে মিলের রাত্রির কাজ "সি" শিফটে আগামী আটই আগস্ট থেকে বন্ধ করে চোদ্দশ শ্রমিককে ছাঁটাই এবং শ্রমিক পিছু দ্বিগুণ কাজের বোঝা চাপিয়ে আরও এক হাজার শ্রমিককে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমল সরকার রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী গোপালদাস নাগের কাছে এক পত্রে এই অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিকার দাবী করেছেন। বর্তমানে বিষয়টি শ্রম অধিকারের বিবেচনাধীন।

অন্যদিকে কেশোরাম রেয়নের ধর্মঘট পরিস্থিতি নিয়ে শ্রমমন্ত্রী যে

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থ রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকছেন না?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্তমান লোকসভা অধিবেশন সমাপ্ত হবার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল হবে বলে অনেকে আশা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের এবার একটি উল্লেখযোগ্য পদ পাবার সম্ভাবনা।

হরিয়ানায় সব রকম প্রকাশনার ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ। ফিল্ম সেন্সরশিপে আরও কড়াকড়ি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হরিয়ানায় সর্বরকম প্রকাশনার ব্যাপারেই সেন্সরশিপ জারী হয়েছে। সরকারী নির্দেশে বলা হয়েছে : সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রে এবং কোন ডকুমেন্ট হিসেবে প্রকাশিতব্য যে কোন রচনা প্রকাশের আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে হবে। রাজ্যের সব মুদ্রক, প্রকাশক ও সম্পাদককে সব রকম প্রকাশিতব্য রচনা অনুমোদনের জন্য সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই জমা দিতে হবে। এর ফলে সবরকম বইপত্র প্রকাশের ব্যাপারটিও এখন থেকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন। পশ্চিমবঙ্গে এখনও এ নির্দেশ জারী হয়নি।

যতদূর খবর পাওয়া গেছে, সরকার এ পর্যন্ত জবলপুরের একটি, ইন্দোরের আটাশটি ও উজ্জয়িনীতে সাতটি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করে দিয়েছেন। দিল্লী থেকে প্রকাশিত জনসংঘের মাদারল্যান্ড ও অর্গানাইজার নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক দুটিও বন্ধ হয়ে গেছে।

চলচ্চিত্র সেনসারেও আমূল পরিবর্তনের জন্য শীঘ্রই নতুন বোর্ড গঠিত হবে। উনিশশো চুয়াত্তর সালের সিনেমাটোগ্রাফ (সংশোধন) আইন অনুসারে এই ব্যবস্থা গৃহীত হবে। এ ক্ষেত্রে সেনসর করা চলচ্চিত্রের একটি কপি একবছরের জন্য বোর্ডের কাছে জমা রাখতে হবে ছবি মুক্তির দিন থেকে। ছবিটি প্রদর্শনের সময় বোর্ডের কর্তিত অংশের বিবরণ সহ দুই কপি সেন্সার সার্টিফিকেট পর্দায় উপস্থিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রেলের গুডস্ ইন্সপেক্টর ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তাঁর হঠাৎ ইসলামিক ইতিহাসে এম এ পরীক্ষা দেবার শখ হল। কিন্তু অর জন্য যে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করা দরকার সে কথা তার খেয়াল থাকলেও সে অনুমতি নেবার তিনি প্রয়োজন মনে করেন নি। এমন কি যেদিন তিনি পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিচ্ছেন সেদিন তিনি তার অফিসের হাজিরা খাতায়ও উপস্থিতির স্বাক্ষর করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা দেবার জন্য যে ছুটির দরখাস্ত করার কথা তাও তিনি করেন নি।

এই অফিসার ব্যক্তিটি কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। ঐশলামিক ইতিহাসের তৃতীয় পত্রের দিন সহ উপাচার্যের (শিক্ষা) কাছে খবর এলো স্পোর্টস অফিসার পরীক্ষা দিচ্ছেন, এবং তাও পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে নয়, স্নাতকোত্তর ভবনের এমন একটি ঘরে যেখানে পরীক্ষার কোন আসনই বন্টন করা হয়নি। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সহ-উপাচার্য ডক্টর পি কে বসু মহাশয় কন্ট্রোলার, ডেপুটী কন্ট্রোলার ও স্নাতকোত্তর বিভাগের সহ-সম্পাদককে ঐ ঘরে গোপনে পরিদর্শন করার জন্য পাঠালেন। নির্দেশ মত তারা ঐ বিশেষ ঘরে উপস্থিত হয়েই থ হয়ে গেলেন। যে যার ইচ্ছামতো জায়গা বদল করছে, এ ওর কাছ থেকে বই নিচ্ছে, চেঁচামেচি হচ্ছে এবং এদের মধ্যে পূর্বোক্ত স্পোর্টস অফিসার স্বয়ং বি থেকে কিছু লিখছেন। পরিদর্শক টীমের সদস্যরা ফিরে এসে সহ-উপাচার্যকে যখন এই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন তখন ঐ ঘরে একজন নামী সাংবাদিক বসেছিলেন। তাদের মুখ থেকে। উক্ত স্পোর্টস অফিসারের পরীক্ষা দেবার কায়দা শুনেই সহ-উপাচার্য কন্ট্রোলার ডেপুটী কন্ট্রোলার সহ উপাচার্যের ঘরে উপস্থিত হয়ে ঘটনা সম্পর্কে পরিদর্শকদের রিপোর্ট মৌখিকভাবে জানালেন।

ঐ অফিসারের পরীক্ষা দান সম্পর্কে কন্ট্রোলার ও ডেপুটী কন্ট্রোলারের গোপন রিপোর্ট সিন্ডিকেটের সভায় পেশ করার দাবী জানানো হয়েছে এবং ঐ অফিসারের সাসপেনসানের দাবী জানিয়েছেন কয়েকজন সদস্য।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর থেকে স্পোর্টস অফিসারের এম এ পরীক্ষা দেবার আবেদন পত্রটি নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ আবেদন পত্রটি এমন এক অফিসার ফরোয়ার্ড করেছেন যিনি ঐশলামিক ইতিহাস বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

আরও জানা গেল, অফিসার ভদ্রলোকটি দুটি দোকানের মালিক। দুটি দোকানই হেদুয়ার পারে অবস্থিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গত ডিসেম্বর মাসে ক্রিকেটের টিকিট বন্টনের কারচুপির অভিযোগ এনে ছাত্র পরিষদ সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্য স্পোর্টস বোর্ড অফিসে তালা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই স্পোর্টস অফিসারের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

Space Donated

by a wellwisher

ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সুপারিশ করেছেন, তা শুনে বি পি টি ইউ সির সম্পাদক অরুণ সেন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন বিড়লা পরিচালিত এই কারখানায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক গত দশই ফেব্রুয়ারী থেকে কয়েকটি দাবীর ভিত্তিতে যে ধর্মঘট চালিয়ে আসছেন, সে ব্যাপারে শ্রমমন্ত্রীর সুপারিশকে আই এন টি ইউ সি সমর্থন করায় শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই ধর্মঘটের উদ্যোক্তা ছিল আই এন টি ইউ সি, বি পি টি ইউ সি ও সিটু। শ্রীসেনের আবেদন, মালিকরা যেন শ্রমিকদের দেশপ্রীতির অপব্যবহার না করতে পারে।

আদ্যিকালের বদ্যিরাজার গপ্পো

ইন্দু সাহা

এক যে ছিলো আজব দেশ নামটি গেছি ভুলে
পড়লে ছড়া বুঝতে পাবে মগজ রাখো খুলে।
হোক যে নামই সেই দেশটার রাজা ছিলেন গবু
মন্ত্রী ছিলো পঁচিশ ভজন নাম সবারই হবু।
গবু রাজার মন্ত্রী হবুর জুল্‌ফি ইয়া বড়
কোরলে আইন প্রজারা সব গাধার পিঠে চড়।
যেমন তেমন নয়কো গাধা ছয়টা হবে পা
হতেই হবে তেমন গাধা রামছাগলের ছা।

গবু রাজার নিত্যি বাতিক নতুন কিছু চাই
পুরাণ টুরাণ বদ্‌লে কেবল আধুনিকের বাই।
রাত্রে ক্যানো চিরদিনই উঠবে বলো চাঁদ?
হুকুম হলো চাঁদকে ধরার লাগাও বিরাট ফাঁদ।
দিনের বেলায় যুগ যুগান্ত উঠবে ক্যানো রবি?
বদলে দিতে হবেই হবে এসব পুরান ছবি।
রাজ্যসভায় ডাক পড়ে তাই প্রধান পুরোহিতের
হবু মন্ত্রী বললে হেঁকে করুন একটা চোস্ত উপায় বের।
পুরুত মশাই চাইলো তখন চিন্তা করার মাল
নস্যিটা চাই বস্তা দশেক পাঁঠা একশো পাল,
হাজার বস্তা মিহিন চাল আর হাজার গ্যালন মদ,
কিন্তু সে মদ তৈরী কোরতে চাই শোণিতের হ্রদ।
যেমন তেমন হ্রদ নয়কো একশো হাজার লোক
ধরে এনে তাদের মাথায় মারলে খাঁড়ার কোপ
ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ধারায় বইবে যেমন বান
রাজার হুকুম তেমন সুরা পুরুত ঠাকুর চান।
মন্ত্রী হবু হেসেই মরে এ আর কঠিন কি
এর জন্যে সকল রকম খাজনা ট্যাক্স ফ্রি।
ছুটলো গবুর হুকুম পেয়ে মন্ত্রী হবুর সেনা
লক্ষ লোকের মুণ্ডু কেটে এক্ষুনি চাই আনা।

দেশটা জুড়ে উঠলো যেন শোক সাগরের ঢেউ
শিশু বুড়ো নারী পুরুষ বাদ গেলো না কেউ।
লক্ষ লোকের রক্ত দিয়ে তৈরী হলো হ্রদ
চেখে বললেন গবু রাজা—আহা ফাইন মদ।
তৃপ্তি কিসে প্রাণটা যেন স্বর্গে গেল উড়ে
মিলবে নাকো এমন সুরা এই পৃথিবী ঘুরে।
পুরুত ঠাকুর মন্ত্র পড়েন উঠবে দিনে চাঁদ
রাজ্য জুড়ে রাজ্য জুড়ে গজিয়ে ওঠে ফাঁদ।
এক দিকেতে গবুর সেনা খড়্গ হাতে ঘোরে
অন্য দিকে ফাঁদের মধ্যে মানুষ আটকে মরে।

তাই হবু পায় নোবেল প্রাইজ রাজা গবুর হাতে
এমন যজ্ঞ কেউ দেখেছে! সূর্য ওঠে রাতে?
দিনের বেলা চাঁদের মেলা রাতের বেলায় রবি
নরমেধে তৈরী সুরা পান করা তার হবি!

আদ্যিকালের বদ্যি রাজা গবুর নামে তাই
চ্যালারা সব শ্লোগান তোলে জিও জিও ভাই।

কলকাতায় বাস বিভ্রাট ঃ যাত্রীরা নাস্তানাবুদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতায় বাস বিভ্রাটের হাত থেকে যাত্রীরা এখনও পুরোপুরি মুক্ত নয়। যদিও রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান যতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত কলকাতার কয়েকটি রুটে সার্টল এবং ডিলাক্স বাস চালু করেছেন। কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার ফলে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না।

আপাতত শহরের ছয়টি রুটে নতুন করে সার্টল বাস চালু হয়েছে। এই বাসগুলি শুধুমাত্র অফিস-যাত্রীদের সময় সীমার মধ্যে অর্থাৎ সকাল সাড়ে আটটা থেকে বেলা এগারোটা এবং বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত চলু থাকে। অন্যদিকে টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ এবং শ্যামবাজার থেকে যে ডিলাক্স বাসগুলি ডালহৌসী স্কোয়ার হয়ে ধর্মতলা পর্যন্ত যাতায়াত করে তার সময়সীমাও অনুরূপ। আপাতত এই ডিলাক্স বাসের সংখ্যা মোট বারো। শহরের যাত্রীদের দাবী এই বাস-গুলি চলাচলের সময়সীমা এবং ডিলাক্স বাসের সংখ্যা না বাড়ালে শুধুমাত্র অফিস যাত্রীদের সমস্যাই মিটবেনা। এছাড়া অন্যান্য যাত্রীদের সংখ্যাও কম নয়, যারা অফিসযাত্রী-দের ভীড়ে বাসে ঝুলে যাবারও সুযোগ পান না।

এছাড়া যাত্রীদের আরও অভি-যোগ, নির্দিষ্ট রুটের বাস যথা-সময়ে টার্মিনাসে দেখতে পাওয়া যায় না। এর সবচেয়ে বড় কারণ শহরের রাস্তাঘাটের দুরবস্থা এবং প্রতিনিয়ত ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে তৎপরতা না বাড়া-লে যে সংখ্যক বাস চালু আছে, তাতে যাত্রীদের আংশিক প্রয়োজন মেটানোও সম্ভব হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেক টাউন এবং গড়িয়াহাটা অঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক যাত্রী সংশ্লিষ্ট রুট গুলিতে ডিলাক্স বাস চালু করার জন্য রাষ্ট্রপরিবহনের চেয়ারম্যানের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, প্রত্যুত্তরে চেয়ারম্যান শ্রীসেনগুপ্ত জানিয়েছেন, এব্যাপারে অবিলম্বেই কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

ডিলাক্স, মিনি এবং অন্য কয়েকটি রুটের সাটল বাসের যাত্রী-দের ওঠা নামার ব্যাপারে শৃঙ্খলার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অধি-কাংশ যাত্রীরা বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে ওঠার জন্য বাসের নির্দিষ্ট টার্মি-নাসে দীর্ঘ লাইন দিয়ে অপেক্ষা করেন। কিন্তু টার্মিনাসে বাস এসে পৌঁছানো মাত্রই লাইন ভেঙে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাসে ওঠার জন্য যে অসহ্য বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তা দেখার জন্য টার্মিনাসগুলিতে পরিবহনের কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক সুযোগসন্ধানী যাত্রী লাইনে প্রতী-ক্ষার দুর্ভোগ এড়াবার জন্য টার্মি-নাসের অনেক আগে গিয়ে বাসে উঠে বসে থাকেন—এ নিয়ে লাইনে অপেক্ষমান যাত্রীদের সঙ্গে তাদের অপ্রীতিকর তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার জন্যে শহরে ইতিমধ্যে যাত্রীদের পরস্পরের মধ্যে মারামারি হাতাহাতি ও কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই ঘটনা অনেকেই সমর্থন করেন না।

কনডাকটরদের বক্তব্য

বিশেষত ডিলাক্স বাসে ডিউটি করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কনডাক-টরদের একটি আর্জি আছে। এই সব বাসের কনডাকটরদের সকাল এবং বিকেল দুই শিফটেই ডিউটি করতে হয়। সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা এবং বিকেল তিনটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এই বাস চলে। যদিও এই দুটি শিফটের মধ্য-বর্তী সময়ে কনডাকটরদের টিফিনের জন্য প্রতিদিন তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হয়। তথাপি তাদের বক্তব্য, ঃ একজন কনডাকটরের পক্ষে দুই শিফটে ডিউটি করা বেশ শ্রমসাধ্য। মাত্র চল্লিশজন যাত্রীবাহী এই বাসে ভীড় থাকে না ঠিকই, কিন্তু একজন কনডাকটরের পক্ষে একটানা দশ-এগারো ট্রিপ ডিউটি করা স্বাভাবিক সহ্যসীমার বাইরে।

তাদের আরও বক্তব্য ঃ অধি-কাংশ দিনই দেখা যায় কয়েকটি রুটে বাসের সংখ্যা কম থাকায় কিছু কনডাকটর "সারপ্লাস" হয়ে থাকেন। তাদের মধ্যেও যদি একটা শিফট বন্টন করা হয়, তাহলে সারপ্লাস এবং অধিক পরিশ্রমের হাত থেকে উভয় কনডাকটররাই রেহাই পেতে পারেন। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান শ্রীসেনগুপ্ত পরিবহনের আয় বৃদ্ধির জন্য কনডাকটরদের "রিওয়ার্ড" অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে মাসে একুশ দিন যে বাধ্যতামূলক উপস্থিতির নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে সফল করার জন্যও ডিলাক্স বাসে দুটি শিফটে দুজন কনডাকটর নিয়োগ করা দরকার। সেক্ষেত্রে সারপ্লাস হয়ে যারা ফিরে আসেন এবং যাদের বাস না পাওয়ার জন্য মাসে একুশ দিন পূরণ হয় না, এমন কয়েকজনকে অনায়াসেই একটি শিফটে ডিউটি দেওয়া যেতে পারে। কনডাকটররা এ ব্যাপারে চেয়ারম্যানের সুস্থ সিদ্ধান্তের প্রত্যাশী।

প্রাইভেট বাস মালিকদের খেয়ালীপণা

প্রাইভেট বাস মালিকরাও যাত্রীদের দুর্ভোগ দূরীকরণে যথেষ্ট সাহায্য করছেন না। তাদের বাস চালানোর গড় হিসেবের কোন ঠিক থাকেনা। যে সব রুটে গড়ে নয় দশটি করে বাস চলবার কথা, সে সব রুটে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন চার। রুটের কনডাকটরদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, "বাস ব্রেকডাউন"। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বাস বিয়ের বরযাত্রী, বিলাসভ্রমণেচ্ছু পিকনিক পার্টিদের জন্য ভাড়া খাটতে গেছে। কিন্তু যাত্রীদের দুর্ভোগ দূর করার জন্য এই অব্যবস্থার মূলে হাত দেবে কে?

খেলাধুলোর জন্য বাসবিভ্রাট

ফুটবলের মরশুমে শহরের বাসযাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। কলকাতার মাঠে আকর্ষণীয় কোন ফুটবল খেলা থাকলেই যাত্রীরা ধরে

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

কলকাতায় শনি পূজার নামে ফলাও ব্যবসা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা শহর শনি বিগ্রহে ছেয়ে গেছে। পথের মোড়ে মোড়ে শনিপূজোর ধুম। প্রতি শনিবার ঢাক ঢোল কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে দিকে দিকে শনির আরাধনা চলছে। শনি দেবতার পায়ে সর্বস্ব উজাড় করে দেবার মতো ভক্তের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফুটপাত সংকীর্ণ হলে হবে কি, তার মধ্যে দেবতা ঠিক তার স্থান করে নিয়ে-ছেন। ভক্তেরা মুড়ি মুড়কির মতো পয়সা ছুড়ে দিচ্ছেন দেবতার বেদী-মূলে।

পূজা অর্চনাদির এই ভীড় ঠেলে পথচারীদের পথ করে নেও-য়াই মুশকিল। প্রতি শনিবারে এই পূজো নিয়ে ধুমধাম হয় বটে, কিন্তু পূজার স্থানে সারা সপ্তাহ ধরেই শনি বিগ্রহ বসানো থাকে। আর সেই বিগ্রহের পাদপদ্মে শোভা পায় একটি কাঁচের বাক্স। সেই বাক্সের ওপরে লেখা থাকে "শনির প্রণামী দিবেন।" ভক্তবৃন্দের দেওয়া সেই প্রণামী দিয়ে সপ্তাহান্তে পূজো হয়, এবং পূজা অন্তে সিন্নী ফল-প্রসাদ এবং চরণামৃত ও মধুপক্ক ভক্তদের বিতরণ করা হয়।

দিকে দিকে শনিপূজার ধুমধাম কেন? জনৈক ধর্মপরায়ণ পথচারী মন্তব্য করেন ঃ কলকাতার মাথার ওপর এখন দুস্টগ্রহ ভর করেছে। সেই দুস্টগ্রহের আরেক নাম শনি। শিয়ালদহ অঞ্চলে পথের ওপর অব-স্থিত শনির বিগ্রহের মালিকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম ঃ চতু-র্দিকে এই পূজোর তোড়জোড় কেন? তিনিও অনুরূপ যুক্তি দিয়ে বলেন ঃ কলকাতার ঘাড়ে এখন শনি চেপেছে। পঞ্জিকা এবং পণ্ডিতদের মতানুসারে এই পুরো বছরটাই কলকাতার ওপর শনির অবস্থান করার কথা। শহরের মাথার ওপর থেকে দ্রুত এই গ্রহ দূর করার জন্যই শনি দেবতাকে তুষ্ট করতে পূজা অর্চনাদির ব্যবস্থা। জানতে চাইলাম ঃ কলকাতার মাথার ওপর শনি অবস্থানের কুফল কি? তিনি ভক্তি আপ্লুত কন্ঠে জানান ঃ এ প্রশ্ন অবান্তর। কুফল চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছেন না? প্রতিদিন কল-কাতার বুকে অগ্নিকান্ড, বাস দুর্ঘটনা অপঘাত মৃত্যু কি রকম হারে বেড়ে গেছে। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? "তিনি" এত পাপ সইবেন কেন?

শনি, শীতলা, মনসা দক্ষিণা কালী ইত্যাদি দেবতার পূজার সংখ্যাও সম্প্রতি বেড়ে গেলেও এর সূচনা আজ থেকে নয়। প্রকৃত-পক্ষে এই পূজোর প্রাচুর্য একটা বড় রকমের ব্যবসা। কোন রকম পুঁজি নিয়োগ ছাড়াই এই ব্যবসায়ে সফল হওয়া যায়। তাই এই সহজ অর্থ রোজগারের পথ ধরেছে অনে-কেই। কলকাতার কোন পথই এই পূজো আর্চ্চার অত্যাচার থেকে মুক্ত নয়। জলন্ত হুকার ভিখারীতে আগলে থাকা ফুটপাতের ওপর পূজা, অর্চনার এই প্রাবল্য পথ-চারীদের কাছে একটি দৈনন্দিন দুর্ভোগ। পথের ওপর এবং ফুটা-পাতে কলকাতায় মন্দিরাদির সংখ্যা কম নেই। পুরমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় গত বছর বলেছিলেন যে কলকাতার মন্দিরগুলি পুর-সভার নিয়ন্ত্রণেই চলবে। এব্যাপারে তিনি আর অগ্রসর হলেন না কেন জানিনা।

মন্দিরময় কলকাতার এই মন্দির এবং পূজোআচ্চার সঙ্গে শহরের অনেক ধনী ব্যবসায়ীদের সংযোগেরও সন্ধান পাওয়া যায়। অন্তরালে অনেক রহস্যের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে বলে অনেকের অনুমান।

মঠ মন্দিরের এই ব্যবসার কুফল গড়িয়েছে বিভিন্ন শহরতলী ও মফস্বল শহরেও। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাসযাত্রীদের ওয়েটিং শেডের বদলে রাতারাতি ছোট ছোট শান বাঁধানো বেদী তৈরী হচ্ছে। সে সব জায়গায় কোন দেবদেবীর মূর্তি বসানো হয়নি। কালে কালে এই সব জায়গায়ই মন্দির গজিয়ে উঠবে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এই সব বেদী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অনেক বেকার যুবক যুক্ত হয়ে পড়েছে। পথচারী ভক্তদের দেওয়া প্রণামীর বাঁটোয়ারা নিয়ে এদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি লেগে রয়েছে। সিনেমা দেখা, নেশা ভাঙ অন্যান্য কু-অভ্যাস চরিতার্থ করার কাজে এইসব প্রণামী খরচ করা হয়।

কলকাতা এখন বহুমুখী পরি-কল্পনায় নবরূপে নবসাজে সজ্জিত হচ্ছে, তারই মাঝে মন্দির আর এই পূজার্চনার প্রকোপ একদিকে যেমন পথচারীদের কাছে সমস্যা ও লোক ঠকানোর কৌশল, তেমনি বেকার তরুণদের বিপথগামী করার মাধ্যম। এদিকে সরকারীতরফে কোন দৃষ্টি না দিলে আশু রূপবতী কলকাতার অপ-রূপের আরেকটি সমস্যা থেকেই যাবে।

কিছু কালোয়ার ক্রেতাদের ঠকাচ্ছে এবং সরকারের কর ফাঁকি দিচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের কিছু কালোয়ার লোহার নির্ধারিত দামের চেয়ে ক্রেতাদের কাছ থেকে বেশী দাম নিচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি সরকারী নির্দেশ পাওয়ার পর সমস্ত ব্যবসায়ীরা দোকানে দোকানে মূল্য তালিকা টাঙিয়ে রেখেছেন। কালোয়াররাও এর ব্যতিক্রম নয়। দোকানের সামনেই বিভিন্ন ধরণের লোহার নির্ধারিত দর টাঙানো আছে। কিন্তু ক্রেতাদের জিনিস কেনার সময় নির্ধারিত দর থেকে প্রায় চারগুণ দাম দিয়ে জিনিস কিনতে হয়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

যেমন জে কে-র স্ক্রাপ তারের দাম প্রতি ম্যাট্রিক টন সাতশ টাকা হিসাবে বোর্ডে টাঙানো আছে। কিন্তু ক্রেতারা যখন কালোয়ারদের কাছ থেকে ঐ তার কিনতে যান তখন দাম নেওয়া হয় আড়াই হাজার টাকা।

এই ভাবে প্রতি জিনিসেরই নির্ধারিত দামের থেকে বেশী দাম নেওয়া হচ্ছে। এ জিনিস আজকে নয়। বহুদিন ধরেই চলছে। ক্রেতারা এতদিন আসল দর জানতেন না। জানার কোনও উপায়ও ছিল না। কারণ এই কালোওয়াররা বিভিন্ন কোম্পানী থেকে লোহার রড, পাত, তার প্রভৃতি কি দরে কেনেন তা খরিদদারদের জানাতেন না। সম্প্রতি সরকারী নির্দেশে কালোয়াররা মূল্য তালিকা টাঙানোয় আসল দাম জানা যাচ্ছে।

সাধারণতঃ ছোটখাটো বাঙালী কারখানাগুলিই এই সব মাল কেনেন। কারণ পুঁজি কম থাকায় নতুন মাল কিনে ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। তাই কালোবাজারীদের অতি মুনাফার চোটটা প্রায় পুরো-টাই যায় এই সব ছোট বাঙালী ব্যবসায়ীদের ওপরই। তাছাড়া প্রকৃত যে দর খরিদ্দারদের কাছ থেকে নেওয়া হয় সেই অঙ্ক অনু-যায়ী যে বিপুল পরিমাণ সেল ট্যাক্স সরকারের পাওয়ার কথা তা থেকে সরকারকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। সেই মত ইনকাম ট্যাক্সও এই সব কালোয়াররা ফাঁকি দিচ্ছে। সরকারের এ ব্যাপারে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

সাহিত্য কী করে হাতিয়ার হয়

দুর্বাসা

সাহিত্য কী কোরে হাতিয়ার হয়, সে প্রসঙ্গে যাবার আগে সাহিত্য কাদের জন্যে—এই প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। জবাব যদি হয়—জনসাধারণের জন্যে, তাহলে আবার প্রশ্ন হবে—জনসাধারণ বলতে কাদের বুঝি?—শ্রমিক, কৃষক, শহরাঞ্চলের স্বল্পবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীর একাংশ হলো এই 'জনসাধারণ'। শ্রমিকরা বিপ্লবের অগ্রগামী দল; কৃষকরা সংখ্যায় বিপুল তো বটেই (মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগ), বিপ্লবের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাথীও। এছাড়া শহরাঞ্চলের স্বল্পবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ—যাদের মধ্যে আছে কারিগর-মিস্ত্রি, ধোপা-নাপিত, দোকান-কর্মচারী-ফেরিওয়ালা, এছাড়া শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার, উকিল ইত্যাদির একাংশ, যাদের মোটামুটি বিপ্লবের সহযোগী বলা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জনসাধারণ বলতে কোনো সমসত্ত্ব সমাবেশ বোঝায় না।—এবং শ্রেণী-বিভাগ যখন আছে, তখন বুদ্ধি-মনন মানসিকতারও বিভিন্নতা বর্তমান। বিশেষ কোরে আমাদের জনসংখ্যায় শতকরা ৭০ জনই নিরক্ষর। বাকী ৩০ জনেরও একটি ক্ষুদ্র তথাংশেরই সাহিত্য ও নন্দন-তত্ত্বের উচ্চতর বিকাশকে বোঝার মত শিক্ষা আছে। এখন এই বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত মানুষের জন্য যে সাহিত্য সৃষ্টি করবো, তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে?—অবশ্যই প্রলেতারিয় দৃষ্টিভঙ্গি। এবং প্রলেতারিয় দৃষ্টিভঙ্গি বলতে তাকেই বুঝি, যে দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের বিকাশের বিশেষ স্তরটিতে প্রলেতারিয়েতদের গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং সামগ্রিক ভাবে প্রলেতারিয়েতদের সংঘবদ্ধ করতে, শিক্ষিত করতে, সমাজ পরিবেশের পরিবর্তনে আগ্রহী করতে নিযুক্ত। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সাহিত্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব।

সাহিত্যকে দুধারি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। একদিকে জনজীবনের অনিষ্টকারী কালো শক্তিগুলির আসল চেহারাটা দেখিয়ে দেওয়া এবং তার পাশাপাশি জনগণের সংগ্রামের ছবি উজ্জ্বল করে তুলে ধরা। অপরদিকে জনসাধারণের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিগুলিকে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমে সংশোধনে সাহায্য করা। এই প্রসঙ্গে মাও সে তুং বলেছেন: "বিপ্লবী সাহিত্য-শিল্পে বাস্তব জীবন থেকে তুলে আনা সবরকম চরিত্রকেই হাজির করতে হবে এবং জনগণকে নতুন ইতিহাস রচনায় মদৎ দিতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সমাজের মধ্যে ক্ষুধা-শীত-অত্যাচারে পীড়িত মানুষ এবং অত্যাচারী শোষক এই দুই শ্রেণীর মানুষই আছে। এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাগুলিকে ছন্দবদ্ধ কোরে ধারালো কলমের আঁচড়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় কোরে তুলে এবং প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র নির্মাণ কোরে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা যায়, জোটবদ্ধ এবং সংগ্রামমুখী কোরে তোলা যায়।"

এখানে অবশ্য কৌশলগত খুঁটিনাটি প্রশ্ন এসে পড়ে। কি কোরে ব্যঞ্জনা আনা যায়, কেমন কোরে একটি চরিত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক কোরে গড়ে তোলা যায়—এই সব। এ ব্যাপারে বাঁধা ধরা ছক দেওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যিককে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এটি আয়ত্ত করতে হবে। গোর্কি টাইপ চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং তার নির্মাণগত দিকটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর 'কেমন কোরে লিখিতে শিখি' প্রবন্ধে। প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "চরিত্র নির্মাণ, বিশেষ কোরে টাইপ চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কল্পনা ও সৃজনী শক্তির সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। যদি কোনো লেখক একজন দোকানদার, সরকারী কর্মচারী বা শ্রমিকের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে হুবহু চরিত্রটিকে তোলেন তাহলে, সেটি হবে ফটোগ্রাফী; কিন্তু যত নিখুঁতই হোক না কেন তার মধ্যে সমাজ জীবনের কোন তাৎপর্য যদি ফুটে না ওঠে, সাহিত্য হিসেবে তার মূল্য হবে অকিঞ্চিৎকর।

"কিন্তু লেখক যদি বিশ পঞ্চাশ বা একশো দোকানদার, সরকারী কর্মচারী বা শ্রমিকের হাবভাব, পছন্দ-অপছন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং বিশেষ ভঙ্গি—যার মধ্যে দিয়ে তাদের শ্রেণী-চরিত্র প্রতিফলিত হয়, তাকে একটিমাত্র দোকানদার সরকারী কর্মচারী বা শ্রমিকের চরিত্রের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য ও স্বাভাবিক কোরে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাহলে সেটি হয়ে যায় টাইপ চরিত্র এবং লেখাটি হয়ে ওঠে সাহিত্য পদবাচ্য।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন: "মানুষ তার ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে কল্পনা করেছে; কিংবা বলা যেতে পারে যে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিতে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে ঈশ্বরের মধ্যে। আসলে গতানুগতিক ও দারিদ্র্যের মধ্যে প্রোথিত থেকেও মানুষ তার জীবনকে সমৃদ্ধ, সুন্দর ও নিরাপদ কোরে তোলার অলস স্বপ্ন দেখে (vague urge), এই থেকেই সর্বশক্তিমান নায়ক পরিকল্পিত হয়েছে। সে জন্যেই ঈশ্বর সবরকম গতানুগতিকতার ঊর্দ্ধে। পারিপার্শ্বিক এবং টিকে থাকার লড়াইয়ের মধ্যে যে সমস্ত সাধ ও গুণপনার কোনো ঠাঁই করতে পারে নি, সেগুলোই গিয়ে জমা হয়েছে ঈশ্বরের মূর্তির মধ্যে।

"কিন্তু আজ যখন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মেহনতী মানুষ তার শ্রেষ্ঠ গুণপনার অবাধ বিকাশের রাস্তাটি খুঁজে পেয়েছে, তখন ঈশ্বর একটি অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এখন মানুষের সাধগুলি সাধ্যায়ত্ত এবং তার গুণপণাকে এই পৃথিবীর বাস্তবতার মধ্যেই গড়ে তোলা সম্ভব।

"সাহিত্যে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র নির্মাণের ব্যাপারটাও এই রকমই। প্রথমতঃ চরিত্র লক্ষণকে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তারপর নির্দিষ্ট আধারে স্থাপন। বহু বীর নেতার চরিত্র থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে এইভাবে হারকিউলিস কিংবা রুশ উপকথার নায়ক ইলিয়ার চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। ঐভাবেই ফাউস্ট, হ্যামলেট, ডন কুইকসোট নির্মিত হয়েছে, এবং রুশ চিরায়ত সাহিত্যে তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি কিংবা গগচারভ তাঁদের চরিত্রগুলিকে গড়ে তুলেছেন। ঐ সব চরিত্রের বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু এ ধরণের অনেক চরিত্র ছিল, তবে তুলনামূলক ভাবে হয়তো ব্যক্তি চরিত্রে কিছুটা ন্যূন। ঠিক যে ভাবে স্থপতিরা ইঁট সাজিয়ে মন্দির অথবা স্তম্ভ নির্মাণ করেন, সাহিত্যিকও সেভাবেই মানবিক গুণপণা নিয়ে তৈরী করেন প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র যেমন ঈর্ষাতুর সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত চরিত্র বলতে বুঝি ওথেলাকে, একজন খাঁটি মিথ্যুক হিসেবে চোখে ভেসে ওঠে গোগলের সৃষ্ট চরিত্র খেলাস্টকভ, ইত্যাদি।"

প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র দু ধরণের হতে পারে। এক ধরণের চরিত্র যাকে আপনি জনগণের মধ্যে থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ উন্নততর চেতনার স্তরে তুলে নিয়ে গিয়ে আদর্শ হিসাবে দাঁড় করাতে পারেন। যেমন গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের শ্রমিক চরিত্র পাভেল, নিকলে অস্ত্রভস্কির 'ইস্পাত' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র করচাগিন, অথবা চিন চিং-মাই-এর উপন্যাস 'বিপ্লবের গান'-এর মূল চরিত্র ওয়াং হাই। আর এক ধরণের চরিত্র হলো জনগণের বাস্তব অবস্থার যথাযথ প্রতিরূপ, তার বিশেষ শ্রেণী-চরিত্রের নিরিখে তার সামাজিক অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্কের যথার্থতায় তাকে তুলে ধরা। যেমন 'অভাগী', 'পল্লী সমাজে'র বেণীমাধব বা 'বামুনের মেয়ে'র গোলকনাথ কিংবা লু শুনের সৃষ্ট চরিত্র 'আ কিউ'। এ ধরণের চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, এদের চিনিয়ে দেওয়া। একটা উপন্যাস কিংবা নাটকে এ দু টাইপ চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক অবস্থাটা তুলে ধরা এবং শ্রেণীসংগ্রামের চিত্রটিকে পরিস্ফুট করা সম্ভব। তবে ছোট গল্প কিংবা একাঙ্ক নাটকের ছোট ক্যানভাসে সেটা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ছোট ছোট স্কেচ অথবা 'ফ্লাশ' আঙ্গিকের সাহায্য নিতে হবে। ছোট্ট ঘটনার মধ্যে দিয়ে কোন চরিত্রের বিশেষ একটি দিক এভাবে তুলে ধরা যেতে পারে, কিংবা ঘটনাটিকে বিশেষ ইঙ্গিতবাহী কোরে তোলা যেতে পারে।

এতো গেল প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র নির্মাণের পদ্ধতিগত দিক। কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি চরিত্র সৃষ্টি করতে গেলে জনগণকে ভালভাবে জানা ও বোঝা দরকার। সেটা গ্রন্থাগারের নিয়ন আলোর তলায় বসে পুঁথি পড়ে হয় না। তার জন্য জনগণের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে। এ প্রসঙ্গে মাও বলেছেন: "একথা মনে রাখতে হবে যে, বিপ্লবী সাহিত্য কিংবা শিল্পে তাৎপর্য আনতে গেলে জনগণের সান্নিধ্যে আসতে হবে, তাদের অনুভূতি চিন্তাধারা আবেগকে স্পর্শ করতে হবে এবং তাদের বিশ্বস্ত বাহক হতে হবে। একমাত্র জনগণের স্বপক্ষে থেকেই জনগণকে শিক্ষিত করা যায় এবং যতক্ষণ না জনগণের কাছে শিক্ষা নিতে পারছেন, জনগণের শিক্ষক হবার যোগ্যতাও আপনি অর্জন করতে পারছেন না।"

প্রসঙ্গত আর একটি মূল্যবান আলোচ্য বিষয় হলো 'Attitude'। জনগণের বিপরীত শিবিরের লোকের চরিত্র আঁকবার সময় আপনার কলম থেকে শ্লেষ-বিদ্রূপের অভিব্যক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বেরোতে পারে—এই পদ্ধতিটি হলো 'exposure'। কিন্তু জনগণের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ যখন করবেন, তখন আপনার কলমকে খানিকটা নরম করতেই হবে। কারণ জনগণকে যে অবস্থায় দেখছেন, তা হলো বহু যুগের শোষণ, বঞ্চনা আর নানারকমের কুসংস্কার ও উদ্ভট চিন্তা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ফল। এসব থেকে মুক্ত কোরে তাকে পুরোপুরি মানুষ কোরে তোলাই আপনার উদ্দেশ্য। সুতরাং আপনাকে সহানুভূতির সঙ্গে তার অবস্থাটা বুঝতে হবে এবং গঠনমূলক ভাবে তুলে ধরতে হবে। এবং এই পদ্ধতিটির নাম হলো 'Criticism'।

উপরের আলোচনা থেকে যে জিনিষটা বেরিয়ে আসছে, তা হলো জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইটিকে ঠিকমত বোঝা এবং সাহিত্যির নির্মিতির মধ্যে তাকে উচ্চতর পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া। এবং সেটি করতে গেলে সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি এবং ইতিহাসের বিকাশের ধারাটি, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণী-চরিত্র খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সোজা কথায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে অবশ্য অনেকের মনেই নানারকম খুঁত-খুঁতে ভাব আছে। "আমরা বলতে শুনেছি যে, মার্কসীয় তত্ত্ব পড়তে বলা হচ্ছে সাহিত্য [illegible] মার্কসীয় ফরমুলা প্রয়োগ ক[illegible] বলার নামান্তর এবং তার ফলে আমাদের সৃষ্টির আবেগ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বজগৎ সমাজ ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্যই মার্কসীয় তত্ত্বের অনুশীলন করা দরকার। তার মানে এই নয় যে, আমাদের সাহিত্য কর্মকে তাত্ত্বিক আলোচনায় পর্যবসিত করবো। শুকনো তত্ত্বকথা নিশ্চয়ই সৃষ্টির আবেগকে ধ্বংস করে, এমন কি তা মার্কসবাদকেও ধ্বংস করে। ওভাবে ফরমুলায় ফেলার চেষ্টাই মার্কসবাদ বিরোধী। মার্কসবাদ বলতে আমরা কতগুলো ধুয়াকে (catch words) বুঝি না, বুঝি বিকাশশীল মার্কসবাদকে, যা বাস্তব জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্যে সচল।" দ্বান্দ্বিকভাবে দেখতে না পারলে আপনার বিশ্লেষণে, কাজে কাজেই সিদ্ধান্তে অনেক অনেক মনগড়া জিনিষ ঢুকে পড়বে এবং তার ফলে আপনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন তা আঙ্গিকের দিক থেকে যত উন্নতই হোক না, রাজনীতির দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত হবে। জনগণের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পিছিয়েই দেওয়া হবে তাতে করে—সুতরাং সাহিত্যকে হাতিয়ার কোরে তুলতে হলে মার্কসবাদের অনুশীলন অপরিহার্য।

এবং শেষ কথা হলো, "আমরা

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

আমাদের চোখে মেয়েরা

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

এটাকে বলা হয় মহাকাশ যুগ। মানুষ আজ চাঁদের বুকে পা রাখছে। সভ্যতার আজ কত বিকাশ পৃথিবী আজ কত এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সভ্যতার এত অগ্রগতি সত্বেও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা আজও আদিম। নারীর প্রতি আমাদের মনোভাব আজও সামন্ততান্ত্রিক, অবৈজ্ঞানিক, অশ্লীল, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে হাস্যকর। আমরা "উম্যান লিবারেশন" নিয়ে বড় বড় কথা বলি আর রাস্তায় বেরিয়ে মেয়ে দেখলেই একচোখ বন্ধ করি। এই তো আমাদের নৈতিকতা নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। সভ্যতার অনগ্রসরতার বাঁপারটা অনেকটা "মেডিক্যাল সায়েন্সের অনগ্রসরতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষ যেখানে চাঁদে পা-রাখছে, দানবিক সব অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করছে, সেখানে ক্যানসার সারাতে পারে না। আরো কত রকমের রোগ যে পুরোপুরি সারানো যায় না। অনেক রোগেরই "সেরে" যাওয়ার পর ডাক্তারেরা নাকি "কিওরড" না লিখে "এ্যারেস্টেড" লিখে থাকে। ঠিক তেমনি এ পৃথিবীতে আমরা কত ব্যাপারে মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিই, অথচ নারীদের ব্যাপারে—।

এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ পিছিয়ে পড়া দেশের কৃষকরা যেমন ঋণ নিয়ে জন্মায়, ঋণ নিয়ে বড় হয়, ঋণ নিয়েই মারা যায়, নারীরাও তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে (অন্য ক্ষেত্রে তো বটেই) বঞ্চনা নিয়ে জন্মায়, বঞ্চনা নিয়েই বড় হয়, বঞ্চনা নিয়েই মারা যায়।

আমার আত্মীয় -স্বজন এবং বহু পরিচিত পরিবারে দেখেছি, বাড়িতে যদি কারো মেয়ে হয় তো সবার মুখ কালো হয়ে যায়। নবজাত শিশুটিকে ভাল করে আদরও করতে পারে না। মেয়ে হয়ে জন্মে নিষ্পাপ শিশুটি যেন মহা পাপ করে ফেলেছে। কি অদ্ভুত সব নিয়ম কানুন! কি অমানবিক সব ব্যাপার স্যাপার! এই ভাবেই মেয়েরা ঘৃণা, ঔদাসিন্য আর বঞ্চনা নিয়েই পৃথিবীতে আসে। আর মৃত্যু পর্যন্ত এই জিনিস চলতে থাকে। কত রকমের বৈষম্য যে তাদের সহ্য করতে হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই।

কিছুদিন আগে রাণাঘাটে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছি। একদিন ভোর বেলা টুথ-ব্রাশ হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। দেখলাম পাশের বাড়ির একটি তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে ওদের বারান্দার সিঁড়িতে বসে আছে। দেখলেই বোঝা যায় কেবল ঘুম থেকে উঠে এসেছে। ঘুমের রেশ কাটানোর জন্য ও হঠাৎ আড়মোড়া ভাঙ্গল, তারপর দুই হাত উপরদিকে উঠিয়ে হাই তুললো। এ-সময় খুব স্বাভাবিক কারণেই ওর বুকটা সামনের দিকে চিতিয়ে যায়। তাই দেখে পাশে দাঁড়ানো আমার বৃদ্ধা ঠাকুমা আমাকে বলে উঠল ঃ "দেখ ছাড়া ও মাগীর ঠাঁট কত, অ্যামনি করে (ঐ কিশোরীটির ভঙ্গিমার নকল করল) হাই তোলে।" আমি আর একবার ঐ নিষ্পাপ কিশোরীটিকে (মুখ দেখলেই বোঝা যায়) আর আমার ঠাকুমাকে দেখলাম। ভাবলাম। ভাবলাম—কি বিষাক্ত চিন্তাধারা আমার ঠাকুমার মাথায় ঢুকে আছে। ঐ রকম বিষাক্ত চিন্তাধারা নিয়েই ঠাকুমা সারাটা জীবন কাটিয়ে দিল। এবং ঐ রকম চিন্তাধারা নিয়েই ঠাকুমা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। শরীরে ক্লান্তি এলে, আলস্য এলে মানুষ হাই তোলে। এ তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষের জন্মগত অধিকার। অথচ মেয়েটি ঘুমের আলস্য কাটাবার জন্য হাই তুলতে পারে না? ঠিক উল্টোপাল্টা সব নিয়ম কানুন। আর প্রতিনিয়ত মেয়েদের এই ধরণের অন্যায় নিয়ম কানুনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

কদিন আগে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথায় কথায় মেয়েদের চাকরি করার প্রসঙ্গটা উঠল। আমার বন্ধুটি তো মেয়েদের চাকরি করার ব্যাপারে ভীষণ উত্তেজিত। তার কথা ঃ মেয়েরা চাকরি করছে বলেই ছেলেদের বিশেষ চাকরি হয় না। মেয়েরা মেয়ে—তারা চাকরি করবে কেন? মেয়েদের কোন মতেই চাকরি করা উচিত নয়। ওদের শুধু রান্না-বান্নাই করা উচিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব শুনলে আমার এত রাগ হয় যে তর্ক করতে ইচ্ছে করে না। তবুও সংযত হয়ে বন্ধুটিকে বললাম ঃ মেয়েরা মেয়ে এর মানে কি রে? সবার আগে তারা মানুষ তার পরে মেয়ে। প্রত্যেকটা মানুষেরই সমান অধিকার আছে। এটা মৌলিক অধিকার। যারা এসব মানে না তারা হয় মূর্খ, না হয় শয়তান। আমি আরো বললাম ঃ মেয়েদের চাকরি করার যুক্তি নেই বেন? তোরা তো চাকরির টাকার অনেকটাই মাল খেয়ে আর মেয়েবাজি করে নষ্ট করবি। আর ওরা চাকরির টাকার পুরোটাই বাপ মা ভাই বোনের জন্যে শেষ করবে। বরং ওরা চাকরি পেলেই টাকাটার উপযুক্ত খরচ হবে।

ট্রেনে-ট্রামে মেয়েদের আলাদা লেডিস কম্পার্টমেন্ট থাকতেও আমার বন্ধুটির ভয়ানক আপত্তি। ও বলতে চায় সব জায়গায় মেয়েদের সুবিধা দেওয়া হবে কেন। মেয়েদের জন্যই নাকি ট্রামে বাসে জায়গা পাওয়া যায় না। আমি রাগের মাথায় বলেই ফেললাম—মেয়েদের আলাদা কম্পার্টমেন্ট থাকায় গুতোগুতি করতে অসুবিধা হয় বুঝি?

ভীড়ের সময় গাড়ীতে উঠতে গিয়ে একজন ছেলেকে শুধু জামা-কাপড় আর পকেটের দিকে নজর রাখলেই চলে, কিন্তু একজন মেয়েকে তার পোশাক ছাড়াও তার শরীরের দিকে নজর রাখতে হয়। মেয়েদের যে কত রকমের ঝামেলা! এত নজর রেখেও সব সময় সামাল দেওয়া যায় না। তাছাড়া এক ধরণের লোভী পুরুষ ভীড়ের মধ্যে হাতের চোরা চালানের জন্য তৈরীই থাকে। আর কিছু না হোক অন্তত শরীরের যে কোন অংশে একটু চাপ..। কেউ যদি প্রতিবাদ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু হয়ে যাবে ঃ "দেখে কথা বলবেন", "ভদ্রতা জানেন না!" "কি এমন রূপসী!" ইত্যাদি। কলকাতায় প্রতিদিন অফিস টাইমে এই এক দৃশ্য। কদিন আগে এসপ্ল্যানেডে দেখলাম ট্রামে বাসে কেউ ঝুললেই পুলিশ ঝুলন্ত অবস্থাতেই পিটাচ্ছে। কিন্তু ট্রামে বাসে মেয়েদের ওপর যারা অসভ্যতা করে তাদের কবে পিটানো হবে?

এই আমি যে এত প্রগতিশীল কথাবার্তা বলছি—আমার পরিবারেও কয়েকজন নারী মুক্তি নিয়ে বড় বড় কথা বলে, অথচ আমি দেখেছি আমাদের বাড়ীতে যেদিনই যত বড় গোটা ইলিশ মাছই আসুক না কেন আমার মার ভাগ্যে কিন্তু ঠিক ঘাড়ের কাছের কাঁটাওয়ালা মাছটা পড়বেই। সব বাড়িতেই এই একই অবস্থা। কেন? নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে খেতে পারবে না কেন? তাদের জিবে স্বাদ কম? তাদের খাবার আকাঙ্খা কম? তাদের পুষ্টির দরকার নেই? এই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেই যে মেয়েদের আরো কত রকমের বৈষম্য ভোগ করতে হয়। পরিবারের মেয়েরাই নাকি সবার পরে খাবে। কেন? তাদের ক্ষিদে কি দেরীতে লাগে? আমার ঠাকুমাকেই দেখেছি তাঁর পূজার প্রসাদ খাবার জন্য যদি তার কোন নাতির আগে কোন নাতনি হাত বাড়ায় তাহলে খিঁচিয়ে ওঠে—ছেলেদের আগে মেয়ে! কি বিচিত্র সব নিয়ম! শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোরই যদি এই দশা হয় তাহলে পিছিয়ে থাকা গ্রামের পরিবারগুলোতে যে কি অনাচার চলে!

রাস্তায় কোন তরুণী দেখলেই ছেলেদেরকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুনেছি—দেখ মাইরি, মাল আসছে।—মাল? সে কি বস্তু? সে তো দোকানে পাওয়া যায়। বিক্রির জন্য দোকানে রাখা জিনিসপত্র। মেয়েরা কি বিক্রয়যোগ্য পণ্য? এখনও মানুষ বিক্রি হয়? সে তো ছোটবেলায় বোধহয় ইতিহাসে পড়েছিলাম। কিন্তু এখনও। হ্যাঁ, এখনও মেয়েরা পণ্যের মতই ব্যবহৃত হয়। তবে অনেক ভদ্রবেশে। তাই দোকানের সাজিয়ে রাখা জিনিসপত্রের মতই মেয়েরা আমাদের কাছে আজো "মালই"। তাই একজন পুরুষ একজন অপরিচিত নারীকে দেখলেই তার মুখের দিকে যতটা না তাকায় তার থেকে বেশী দেখতে থাকে শরীরের অন্য অংশগুলো।

কদিন আগে ইউনিভার্সিটির সামনের বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাশে কতগুলো ছেলে আড্ডা মারছিল। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা মেয়ে হেঁটে যেতেই ঐ ছেলেগুলোর মধ্যে একজন বলে উঠল—দেখ মাইরি, মেয়েটার বুক দুটো ঠিক কাশ্মিরী আপেল, আর একজন বলে উঠল—পাছাটা ঠিক ডাঁসা পেয়ারা। ছেলে দুটি জিব দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় চুক চুক আওয়াজ করতে লাগল, চোখগুলো ওদের জ্বল জ্বল করছিল। ওরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে ঠেলা মারতে লাগল। আমি চমকে উঠলাম।

একটা ছেলে যখন প্রেম করে বা নারী ঘটিত কোন অপরাধ করে তখন সবাই বলে—ও কিছু না, যৌবনে সবাই একটু ওরকম করেই থাকে। আর কোন মেয়ে যদি কিছু করে, তাহলে সবাই "হাই হাই" করে ওঠে, ও মাগীর চরিত্র খারাপ—আরো কত কি। হয়ত দেখা গেল মেয়েটির বিয়েই হল না। কোন কুমারী মেয়ে যদি হঠাৎ সন্তানসম্ভবা সবাই একবাক্যে মেয়েটিকে নিন্দা করবে, তাকে অন্য চোখে দেখবে। ভাবখানা এমন যেন সব দোষ মেয়েটার। ক্ষণিকের ভুলের বোঝা তাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়।

উরুগুয়েতে ফ্যাসীবিরোধী লড়াই

চিলির মহান শিল্পী হেনরিকজের মুক্তির দাবী

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

উরুগুয়েতে এখন কমিউনিস্ট দলন চলছে, শুধু কমিউনিস্ট নয় অন্যান্য গণতন্ত্রীদের ওপরও হামলা করা হচ্ছে। উরুগুয়ের বর্তমান ফ্যাসিস্ত সরকার দেশটাকে একটা বড় রকমের কয়েদখানায় পরিণত করেছে। গ্রেপ্তার, পিটুনি, গুপ্তহত্যা ইত্যাকার ফ্যাসিস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। উরুগুয়ের শ্রমজীবী মানুষ নীরবে এসব সহ্য করছে না। মাঝে মাঝেই লাল ইস্তাহার দেখা যাচ্ছে উরুগুয়ের আনাচে কানাচে। "উরুগুয়ের মানুষ শান্তি চায়", "উরুগুয়েতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত কর" ইত্যাকার শ্লোগান দেখা যায় পথে ঘাটে। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কাগজ, কার্তা সেমানাল শ্রমজীবী মানুষের মনোবল টিকিয়ে রাখছে। সম্প্রতি কার্তা সেমানাল একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ("অত্যাচার বন্ধ কর"—শিরোনামায়) অবিলম্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে।

শিল্পী হেনরিকজের মুক্তি চাই

চিলির বর্বর ফ্যাসিস্ত সরকার খুন জখম গ্রেপ্তার করেও মানবতার কণ্ঠরোধ করতে পারে নি, পারবেও না। তার বড় প্রমাণ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী হেনরিকজ। গিলার্মো ন্যুনেজ হেনরিকেজের বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ হলেও শিল্পী হেনরিকজ পৃথিবীর প্রথম সারির শিল্পীদের একজন। য়ুরোপ, আমেরিকা লাতিন আমেরিকা, এশিয়া-আফ্রিকায় তাঁর বেশ কদর। আলান্দে সরকারের আমলে হেনরিকজ ছিলেন সমকালীন ললিতকলা মিউজিয়মের ডাইরেক্টর। এহেন ব্যক্তিকে ফ্যাসিস্ত পিনোচেৎ সহ্য করতে পারবে না তা সহজেই অনুমেয়। পিনোচেতের জল্লাদ-

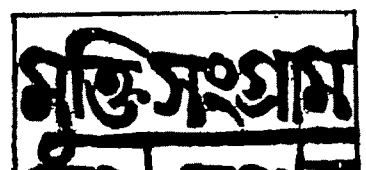

বাহিনী চিত্রশিল্পী হেনরিকজকে হত্যার উদ্দেশ্যে চুয়াত্তর সালের তেসরা মে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু হেনরিকজের গ্রেপ্তারের কথা পৃথিবীময় জানাজানি হয়ে গেলে পিনোচেৎ ওঁকে নয়ই অকটোবর পর্যন্ত আটক করে। এর পর নানা দেশের শিল্পী-লেখকদের প্রতিবাদের চাপে পিনোচেৎ শিল্পী হেনরিকজকে প্যারোলে মুক্তি দেয়। মুক্তির পর, হেনরিকজ যথারীতি ছবি আঁকায় মন দেন।

সম্প্রতি চিলিতে চিলি ফ্রান্স সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে ফরাসী সরকার শিল্পী হেনরিকজের এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সেই প্রদর্শনী দেখে পিনোচেতের জল্লাদেরা খেপে যায়। কারণ হেনরিকজের শিল্পকর্মে নাকি পিনোচেৎ বিরোধী বক্তব্য আছে। তাই তাঁরা জোর করে চিত্রগুলো নিয়ে যায়। শিল্পী হেনরিকজের প্রদর্শনীতে কয়েকটি চিত্রের বিষয় ছিল পাখীর খাঁচা, যে খাঁচাগুলোর মধ্যে কিছু মানুষের হাত-পা দেখা যাচ্ছে।

ফরাসী দূত অবশ্য পিনোচেতের জল্লাদদের কার্যাবলীর প্রতিবাদ করেন। তখন তাকে বলা হয় যে, শিল্পীর প্রাণনাশের কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু পিনোচেৎ সেদিনই এক দঙ্গল ফ্যাসিস্তকে পাঠায় শিল্পী হেনরিকজকে গ্রেপ্তার করতে। গ্রেপ্তারের সময় শিল্পী বেশ্র অসুস্থ ছিলেন কারণ ইতিপূর্বে হেনরিকজের দু দুবার হৃদরোগের আক্রমণ হয়ে গেছে।

হেনরিকজের গ্রেপ্তারের সংবাদে আতঙ্কিত হয়ে নানা দেশের শিল্পী লেখকরা তাঁর মুক্তির দাবী করে পিনোচেতের কাছে প্রতিবাদ পাঠাচ্ছেন। ভারতের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসীবাদ বিরোধিতার ঐতিহ্য আছে, আশা করা যায়, ভারতের, বিশেষ করে বাঙালি লেখক-শিল্পীরা শিল্পী হেনরিকজের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন করবেন এবং এই ভাবেই তারা ফ্যাসী বিরোধী ঐতিহ্যকে তুলে ধরবেন। যেমন করছেন কিউবার লেখক শিল্পীরা।

প্রথম পাতার খবর

সত্যেন সেনগুপ্ত

তিরিশ বছর আগে রিপোর্টার-দের কাজের পরিবেশের সঙ্গে এ যুগের তফাৎটা আমার খুব বেশী করেই মনে হয়। সাংবাদিকতায় হাতে খড়ির সেই ১৯৪২ সাল আমার কাছে অবিস্মরণীয়। চারটি মহাদেশ জুড়ে বিশ্বযুদ্ধ নানা চমকপ্রদ ঘটনার উত্তাল বন্যা তুলে চলেছে। নিউজ-প্রিন্টের অভাবে নিয়ন্ত্রিত ছ'পাতা কাগজের প্রায় সবটা স্থান জুড়েই যুদ্ধ আর যুদ্ধ। নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের রহস্যময় অন্তর্ধানের পর দেশে ঢিমেতালের রাজনীতিতেও যেন একটা নতুন প্রাণসঞ্চার হয়েছে। তাকেও আর উপেক্ষা করবে কার সাধ্যি?

সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে খবরের কাগজে ঢুকেছি। মাইনে প্রথম ছ'মাস নগদে ২৫ টাকা মাসে আর একখানা ট্রামের অল সেকশন মান্থলি। এম এ ক্লাশের সহপাঠিরা কেউ বা প্রফেসার হয়েছে আবার কেউবা অন্য চাকরিতে ঢুকেছে। দু একজন লড়াইয়ের প্রয়োজনে যে সব নানান ধরণের অফিস গজিয়ে উঠেছে তার মাঝে স্থান করে নিয়ে হিল্লী দিল্লী করে বেড়াচ্ছে। ওদের সবারই কৌতূহল আমার সম্বন্ধে প্রবলতম। কি আমায় করতে হয় খবরের কাগজের অফিসে, কাজ শেষ করতে রাত্তির হয় কেন, কে আমায় কাজ দেন, কার কাছে লেখা দিই, কিভাবে খবর পাই ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন ওদের। আর এসবের সঙ্গে যেটা সবারই কমন সে হচ্ছে আমার মাইনে ও কাজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে। তখনকার বিবরণ শুনে অনেকেই হতাশার শব্দ করে বলেন আর তার সাথে নেমে আসে শ্রাবণের ধারাবর্ষণের মত নানা সতর্কবাণী।

আমার কাগজ যুগান্তরের বয়স তখন মাত্র পাঁচ। এর মাঝেই এক-বার মি লি টা রী র কোপদৃষ্টিতে অফিসে তালা পড়ে গেছে। অনেক করে শেষ পর্যন্ত নানা বিশিষ্ট নেতা-দের চেষ্টায় সেবারের মত মাফি পেয়ে আবার চালু হয়েছে। সম্পাদক বিবেকানন্দবাবুর খোলা কথা আমার বেশ লাগত। হ্যাঁ মশাই, ভাববার কি আছে এতে? কাগজ বন্ধ হলে সবাই দাঁড়াব পথে তখন আপনারও যা আমাদেরও তাই।

ইতিহাসের ছাত্র তাই ঘটনাবহুল ওই যুগে দেশবিদেশের নানান খবরের মাঝে কেমন যেন একটা অনুভূতিতে ভরপুর হয়ে যেত সারা মনটা। একি আবার একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে? বিরাট অশ্বত্থ গাছের আরম্ভ যেমন বীজ থেকে কোঁটা ছোট্ট অঙ্কুরে আগামী দিনের সুবিশাল বিবর্তনও হয়ত সুরু হয় সামান্য ঘটনা থেকে। কিন্তু কি করে চিনে বের করব ওই যে টেলিপ্রিন্টারের বিরামহীন লেখার মত বয়ে চলেছে যে ঘটনার বিপুল প্রবাহ তাদের মাঝে কোনটি সম্ভা-বনায় মহীয়ান আর কোনটি সাধা-রণ। এ বেছে বের করা ত যার তার কর্ম নয়, এর জন্য চাই পাকা জহুরী। নিউজরুমে প্রবাণ সাং-বাদিক ও বার্তাসম্পাদক অমূল্য-বাবুর মধ্যে আমি সেই পাকা জহুরীর মূর্ত ছবি দেখতাম।

রুক্ষ কঠিন বহিরাবরণের পিছনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত সুপণ্ডিত অমূল্যবাবুর স্নেহশীল হৃদয়ের কথা আমাকে বলেছিলেন বিবেকানন্দ বাবুই। এডিটোরিয়াল রুমে ওঁর সাথে দেখা করে আনন্দ চাটার্জী দোতলায় নামবার জন্যে পা বাড়িয়েছি বিবেকানন্দবাবু আবার এক-বার ডেকে আমায় অমূল্যবাবুর কথা বললেন। রিপোর্টিংই বলুন আর এডিটিংই বলুন শেখাতে পারেন এমন লোক ওঁর জুড়ি আর কেউ নেই। ওঁর কাছে surrender করুন দেখবেন কত সহজে pick up করছেন।

তিন বছর যুগান্তরে কাজ করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই যেন বিবকানন্দ-বাবুর উপদেশের সারবত্তা অনুভব করেছি। হাজার হাজার কথার ইংরাজীতে নিবন্ধ, সংবাদের জটিল ভাষ্য, বৈজ্ঞানিক কাহিনী অমূল্য-বাবুর হাতে মাত্র কয়েক মিনিটের মাঝে যেভাবে ঝরঝরে প্রাঞ্জল সুপাঠ্য সংবাদে রূপান্তরিত হত তার তুলনা মেলেনা। শুনেছি আনন্দবাজারে থাকতে উনি 'পরিস্থিতি' শব্দটিকে সংবাদ রচনায় প্রথম ব্যবহার করে একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়ে-ছিলেন। যু গা ন্ত রে আমাদের চোখের সামনেই ওঁর দেওয়া ইংরেজী bomber এর বাঙলা 'বোমারু বিমান' কেমন সহজ ভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হল তা হয়ত আজও অনেকের মনে আছে। ইংরেজী ঘেষা বাংলা অনুবাদের উনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। একটা সংবাদ রচনায় 'কুম্ভীরাশ্রু' কথাটি দেখে দারুণ রেগে যান অমূল্যবাবু। পরদিনই আমাদের বার্তাবিভাগে ওঁর যে guide book ছিল তাতে ওর লেখা পেলাম—"ইহা 'কুম্ভীরাশ্রু' নয় ইহা 'মায়াকান্না'।"

ভারতের পূর্ব সীমান্ত ব্রহ্মদেশ অবধি তামাম দক্ষিণপূর্ব এশিয়া জাপানী কবলিত; ইউরোপে হিট-লারের নাৎসী বাহিনী ককেশাসের তৈলখনি অঞ্চলের দিকে ধাবমান, এদিকে বোম্বাইয়ে ইংরেজের সদি-চ্ছায় বীতশ্রদ্ধ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎ কর্মধারা নিরূপণের জন্য বোম্বাই সহরে ঐতিহাসিক নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের আয়োজন করছেন। মহাত্মা গান্ধী এই এ আই সি সিতে উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন বলে খবর বেরুতে এই বৈঠকের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রচুর জল্পনা কল্পনা সুরু হয়েছে। চারি-দিকে আকাশে বাতাসে একটা চাপা উত্তেজনা যেন একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠছে। খবর সংগ্রহের উপর ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলসের বিপুল খড়্গ ঝুলছে।

বোম্বাই কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের সংবাদ বলে দিতে দিতে অমূল্যবাবু আমাকে বললেন আগামী দিনগুলিতে নতুন নতুন খাতে ঘটনা প্রবাহের জন্য তৈরী থাকতে। "অনেক কিছুই ঘটতে পারে কিন্তু আপনি ত নতুন আর একা কিই বা করবেন!" বললেন উনি আমাকে।

৯ই আগস্ট ১৯৪২ ছিল রবিবার। খেয়ে দেয়ে অমনিই আপিসে গেছি সাড়ে আটটায়। কাগজের অফিস চাঞ্চল্যে যেন ফেটে পড়ছে। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ কারা-রুদ্ধ। ক্রুদ্ধ জনতাকে রুখতে বোম্বায়ে পুলিশ মারমুখো। কং-গ্রেস কমিটি বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা। মাত্র ৩৯ দিনের রিপোর্টারী বৃত্তি আমার। যে খবরের প্রবাহ আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত নাড়া দিলে তাঁর বাইরে কোন প্রকাশ হবে না কোন মতে। স্থির থাকতে না পেরে দু-দুবার অমূল্যবাবুকে অধীর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কিছুই কি করার নেই আমার? হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন উনি। "তাইতো কিই বা করবে তুমি।" উনি আমায় অফিসে থাকতে বললেন। গোটা কলকাতা মহানগরী যেন পঙ্গাঘাত-গ্রস্ত নিথর। পরদিন ১০ই আগস্ট অমৃতবাজার নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের খবর ছাপল প্রথম পাতার প্রথম কলমে আর সেই সঙ্গে যত সব প্রথম পাতার বিজ্ঞাপনকে ভিতরের পাতায় চালান করে দিয়ে। ভারতরক্ষা আইনের রীতিমাফিক দু-কলমে হেডিং এর বিধি অমান্য না করেও এই প্রথম পাতায় এনেই খবরের যে গুরুত্ব আরোপিত হল তা নাড়া দিলো শহরবাসীকে প্রচণ্ড ভূমি-কম্পের মত। এটাই আমাদের এখানে front page খবরের আরম্ভ।

[প্রেস ক্লাবের স্মারকগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

সাহিত্য কী করে হাতিয়ার হয়

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

চাই রাজনীতি ও শিল্পরীতির সমন্বয়, আধার ও আধেয় যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। সঠিক রাজ-নীতির সঙ্গে উচ্চতর কলা-কৌশলকে মেলাতে হবে। একটি শিল্পকর্ম রাজনীতির দিক থেকে যতই সঠিক হোক, শিল্পগুণে ন্যূন হলে, তা ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। সেই জন্য আমরা এক-দিকে যেমন ভুল রাজনীতির অপর দিকে তেমনি স্লোগানধর্মী ও সাহি-ত্যিক গুণশূন্য রচনার বিরোধিতা করবো সমান জোরের সঙ্গে।"

একথা ঠিক যে, প্রচলিত কলা-কৌশলের সাহায্যে আপনার বক্তব্য সব সময় হাজির করা যাবে না, সে ক্ষেত্রে নতুন কলারীতির প্রবর্তন করতে হবেও সে জন্যে সাহসের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্যই আমরা আমাদের সাহিত্যের ভাঁড়ারঘর ভালো করে খুঁজে দেখবো, বিদেশী সাহিত্যের ভাঁড়ারেও হাত বাড়াবো, কিন্তু বিনা বিচারে কিছুই নেবো না; গ্রহণ, বর্জনের মাধ্যমে আমাদের বক্তব্যকে উপযোগী করে নেবো। এখানে অবশ্য আর একটি জটিল প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। জনসাধারণের একটা বড় অংশই যেখানে নিরক্ষর এবং চিত্ত বিকাশের নাচু স্তরে আটকে আছে, সেখানে উচ্চতর শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ কোথায়? এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন: "শিল্প জনগণের সম্পদ। ব্যাপকতম মেহ-নতী মানুষের জলের ঠিক গভীরেই তার শিকড় যাওয়া দরকার। তাকে হতে হবে এই জনগণের কাছে বোধগম্য ও প্রিয়। তাদের অনু-ভূতি, ভাবনা ও অভিপ্রায়কে সম্মি-লিত ও উত্থিত করতে হবে তাকে। তাদের মধ্যকার শিল্পীকে জাগিয়ে তুলতে হবে, বিকশিত করতে হবে। শ্রমিক কৃষক জনগণের যখন প্রয়ো-জন কালো রুটির, তখন অল্প কিছু লোকের জন্যে মিহি কেক দেব কি আমরা?" (ক্লারা সেৎকিনের 'আমার স্মৃতিতে লেনিন' থেকে উদ্ধৃত)। সুতরাং প্রাথমিক দায়িত্ব —শ্রমিক-কৃষক ও বল্পবিত্ত থেকে খাওয়া মানুষের মধ্যে শিল্পসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঠিক যে স্তরে তাদের অবস্থিতি, সেখান থেকে উচ্চতর বিকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া। এটা খুব জটিল প্রক্রিয়া। ব্যক্তি শিল্পী সাহিত্যিকের পক্ষে এই বিপুল দায়িত্বভার পালন করা সম্ভব নয়। যৌথভাবে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃত্বেই এটা একমাত্র সম্ভব। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও চীন-ভিয়েত-নামে যে জিনিস সম্ভব হয়েছে, এখানে এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। কিন্তু জনগণকে স্পর্শ করার অনেক মাধ্যম ছড়িয়ে আছে আমাদের হাতের কাছেই। তরজা পাঁচালি-গাজির গান-ছড়া। অভিনেতাদের জন্যে আছে যাত্রাপালা এবং নতুন আয়ুধ পথ-নাটিকা। আঁকিয়েদের হাতে আছে পট, কার্টুন। সঙ্গীত শিল্পীদের হাতেও আছে জোরালো হাতিয়ার 'গণ-সঙ্গীত' (গণ চরিত্র-বিহীন লোক-সঙ্গীত নয়)। এছাড়া প্রাচীর-পত্রকেও সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব। এবং জনগণের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মানে এই নয় যে উচ্চ গুণ-সম্পন্ন সাহিত্য-শিল্পকর্ম বন্ধ থাকবে। কিন্তু আপনি যে স্তরেই কাজ করুন মূল দৃষ্টিভঙ্গীটি ঠিক রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আপনার সাহিত্য জনগণের জন্যে। সুতরাং ব্যাপক জনগণের কাছে আপনাকে পৌঁছোতেই হবে। এবং এ ভাবেই সাহিত্য আপনার হাতে হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।*

* মাও-এর উদ্ধৃতিগুলি 'ইয়েনান ফোরামে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রায় দুই দশকের ঐতিহ্য নিয়ে "দর্পণ"-এর জয়যাত্রা আজও অব্যাহত।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষাণ্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

যোগাযোগের ঠিকানা:
সার্কুলেশন ম্যানেজার
৬৯নং মট লেন
কলিকাতা-১৩

প্রয়াসী প্রযোজিত হ য ব র ল

(দর্পণের সমালোচক)

প্রায় অপরিচিত একটি নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে হ-য-ব-র-ল-র মতো ফ্যান্টাসী ভিত্তিক নাটক মঞ্চস্থ করবার দুঃসাহস ধৃষ্টতারই নামান্তর। কিন্তু দেখা গেল—নিয়ামক নাট্য-রূপকার বিক্রম সেনের ধন্যবাদ প্রাপ্তির দাবী নিঃসন্দেহ সুপ্রতিষ্ঠিত।

ফিল্মের কথা কিছু স্বতন্ত্র। আলোকচিত্রের বিস্ময়কর, প্রয়োগশিল্পের সহায়তায় একটা অবাস্তব বাতাবরণ গড়ে তোলা দুরূহ হলেও সম্ভব নয়। দুই-ডাইমেনশন পর্দায় প্রতিফলিত ছবিতে ইলুশন সৃষ্টি কাজটাও অনেকটা সরল। কিন্তু আলোকিত তিন-ডাইমেনশন মঞ্চে প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সামনে জ্বলজ্যান্ত রক্ত মাংসের মানুষগুলি ঘোরাফেরা করবে, সামনাসামনি কথা বলবে আর অরই মাধ্যমে সৃষ্টি করতে হবে একটি কল্পলোক, একটি মায়াময় স্বপ্নজগৎ, এমন ফরমাস খুবই লম্বা। কিন্তু, কাজটি এঁদের দ্বারা সার্থকভাবে রূপায়িত কিছু শোধনযোগ্য ত্রুটি সমেত। অবশ্য, সহজেই বোঝা যায় সে-ত্রুটির কারণ সীমিত অর্থানুকূল্য।

প্রথম উল্লেখের দাবী করে শিশু চরিত্রে কুমারী কামিনী সেনগুপ্তর অভিনয়। শিশু অভিনেতা হিসেবে এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। অভিনয় কালের পূর্ণ সময়টিতে এর মঞ্চে উপস্থিতি এক মুহূর্তের জন্যও দর্শকের আকৃষ্ট দৃষ্টির বাইরে যায় না। আর এতো দীর্ঘ সময় ব্যাপী চোখে মুখে বিস্ময়-বিহ্বল কৌতূহল কৌতুক কখনওবা অন্যদের মূর্খতা অজ্ঞতায় বিরক্ত-বিব্রত-মজার একটি অতিস্বাভাবিক ভাব ধরে রাখা খুব সামান্য অভিনয় প্রতিভার পরিচায়ক নয়। সংশ্লিষ্ট শুভার্থী জ্যেষ্ঠদের কাছে অনুরোধ এক্ষে একটু ঝুঁড়ো কিছু সুযোগের সন্ধান করে দেওয়া দরকার। আর খুবই তাড়াতাড়ি, কারণ শিশু অভিনয়ের আয়ুষ্কাল সীমিত। মনে হয়, এর কাছে যাকে বলে "আউটস্ট্যান্ডিং" কিছু নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। ফিল্মে বিদেশী শ্রেষ্ঠমানের শিশু অভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কিছু বিচিত্র মনে হয় না।

নাটকের সামগ্রিক উপস্থাপনায় বেশ কয়েকটি তীক্ষ্ণ নিবিড় শিল্পমন একযোগে কাজ করে গেছে। আলো, আবহসুর সংগীত, সংলাপ এবং সর্বোপরি অভিনয়ে বিভিন্ন জন্তুর ম্যানারিজম, সুসংযত গভীর তীক্ষ্ণ কৌতুকরস যা চিরন্তন সুকুমার রায়ের শিশুকাব্য গ্রন্থগুলির মূল সুর পুরোপুরি বজায় রাখতে পেরেছেন এঁরা। সব মিলিয়ে জ্বলজ্যান্ত চোখের সামনে নির্দ্বিধায় গড়ে উঠলো মায়াময় এক কল্পলোক, একটি শিশুর স্বপ্নের জগৎ।

অভিনয়ের দিক থেকে ম্যানারিজমের শ্রেষ্ঠ অভিনয় ছাগল (শ্যামল ভট্টাচার্য) ও দাঁড়কাকের (কুমার আবীর বোস)। তবে দাঁড় কাকসুলভ গলা অতি কর্কশ করার প্রয়াসে সংলাপ জায়গায় জায়গায় দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে তাতে কিছু মাধুর্যহানি ঘটেছে। আবহ সঙ্গীতের সহযোগিতাও একটু নিষ্প্রভ। এ জাতীয় কুহেলিকা সৃষ্টিতে ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তার সুস্পষ্ট কোনো চিহ্ন অনুপস্থিত। সঙ্গীত পরিচালনা ও পরিবেশন প্রশংসার দাবী রাখে। এতগুলি সুরকুশলীর একত্র সমাবেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশেষজ্ঞ ন্যাড়ার (মলয় মুখোপাধ্যায়) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শিতা ও সুরেলা কণ্ঠস্বর আমাদের মুগ্ধ করেছে। এঁর সুযোগের পরিধি একটু বাড়ালে রস-সৃষ্টির আরও সহায়ক হোতো। অভিনয়ও সুন্দর এবং চরিত্রোপযোগী। শিয়াল-উকীলের (অমিতাভ দত্ত) অভিনয় ভালো, তবে অন্যদের তুলনায় কস্টিউম ও ম্যানারিজম-এ কিছু অমনোযোগ লক্ষ্য করা গেল। সংগীতের রাগ নির্বাচনে মুন্সিয়ানা লক্ষিত হল। সমবেত উদাত্ত কণ্ঠে ইমন সুনির্বাচিত ও সুপরিবেশিত। তবে রাগ-পরম্পরা নির্দেশে কিছু ঔদাসীন্য আছে বলে মনে হোলো।

বাস বিভ্রাট

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

নেন, বাস পাওয়া যাবে না। অথবা দু-একটি রুটে বাস পাওয়া গেলেও তাতে ভীড় ঠেলে ওঠা দুঃসাধ্য। খেলার দিনগুলিতে অধিকাংশ রুটেই দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাস দেখতে পাওয়া যায় না। এই সব বাসের কনডাকটরদের অভিযোগ : বাস কোথাই ক্রীড়াপ্রেমিকরা বাসের ভাড়া দিতে চায় না। দশজন বন্ধুর একটা গ্রুপ বাসে উঠে মাত্র তিনজনের টিকিট কাটে। ওরা বলে, আগে চাকরী পাই, তারপর ভাড়া শোধ করে দিয়ে যাব। এই অব্যবস্থায় আমাদের পক্ষে লোকসান দিয়ে বাস চালানো অসম্ভব। কনডাকটরদের এই অভিযোগ বহুলাংশে সত্য। এই জুলুমবাজী থেকে পরিত্রাণের জন্য কিছুসংখ্যক বাস টার্মিনাসে না এসেই অন্য রুট দিয়ে ফিরে যায়। এই সব সম্ভাব্য অস্থায়ী রুটের খবর সব যাত্রীদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ফলে অনেক যাত্রীকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিশেষ করে মহিলা এবং বয়স্ক যাত্রীদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। তাছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমস্যা এড়াবার জন্য অফিসযাত্রীদের আগেভাগে অফিস থেকে বেরুনো সম্ভব নয়। তার কারণ কাজকর্মে শৃঙ্খলা আনার জন্য কড়াকড়ি। যাত্রীদের এই সংকট সমাধানের কথা যাদের ভাবার দায়িত্ব তারা কি ভাবছেন জানিনা।

অথ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য কথা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেমন কমেছে, বেড়েছেও অনেক। সরষের তেল আর চিনি ও ডালের দাম মোটামুটি কমা দেখে অনেকেই আশা করেছিলেন অন্যান্য জিনিসের দামও কিছু কিছু করে কমবে। এ আশা পূরণ হয় নি। অন্যান্য জিনিসের দাম ওঠানামা যার সঙ্গে সম্পর্কিত সেই চালের দামই কমে নি। তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকার মধ্যে চালের দাম লাফালাফি করছে।

এ ব্যাপারে দোকানদাররা সরাসরি বলছেন, আমরা এই জিনিস বেচেই অন্য পাঁচজনের মত খেয়ে পরে থাকি। চালের বাজার তো আর আমাদের মতো চুনোপুঁটি দোকানদারদের জন্য সস্তা হয়ে যায় নি। এছাড়া রেশনেও চালের পরিমাণ বাড়ে নি।

শহরাঞ্চলে কন্ট্রোলে যে কেরোসিন পাওয়া যায় তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। তাই অনেকেই অন্য দোকান থেকে বেশী দামে কিনতে হয়। এই কেরোসিন তেলের দাম এখন এক টাকা চল্লিশ পয়সা। রাজ্য সরকার অবশ্য সম্প্রতি এক প্রেসনোটে জানিয়েছেন, উন্নত মানের কেরোসিন তেলের দাম নিয়ন্ত্রিত মূল্যে আরো সাত পয়সা বাড়ছে। এর ফলে দাম হওয়ার কথা এক টাকা বারো পয়সা। এই দামে কেউ কেরোসিন কিনতে পারছেন বলে শুনিনি।

মাছের বাজার আগুন। গত সপ্তাহে গ্রে স্ট্রীটে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাঁর মা বললেন, এখানে শোভাবাজারে মোরলা মাছের কিলো সতেরো টাকা। মাছের দামে এই উত্তাপ কলকাতা কেন শহরতলীর সব বাজারেই। খানাখন্দ খাল বিল থেকে চুনোপুঁটি নিয়ে যে সব মহিলারা বাড়ী বাড়ী ফিরি করে বেড়ায়, তারাও দশ টাকার নীচে দাম হাঁকায় না। ওদের বক্তব্য, এক ঝুড়ি মাছ বেচেলে, জিনিসের যা দাম তা একদিনেই "গুষ্টির তুষ্টি করতে কাবার হয়ে যায়।" কাতলা চোদ্দ থেকে ষোল টাকার নীচে দাম নেই। ইলিশ গোটা বারো থেকে চোদ্দ টাকা। পেটের রোগীদের জন্য সিং মাগুর কিনতে গেলেও ট্যাঁক ভারী রাখতে হবে। সেখানেও দাম দশ থেকে বারো টাকা। সাধারণ বাঙালীর কাছে মাছ এখন "আদিম জলজ প্রাণী"। মাছের বাজার আগুন দেখে ডিম ব্যবসায়ীরা মওকা পেয়ে গেছে। কেউ কেউ এক টাকা কুড়ি-তিরিশ জোড়া হাঁকাচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে আসা আমার আত্মীয়ার মুখে শুনলাম, ওখানকার বাজারে মাছই পাওয়া যাচ্ছে না। মাছের পাইকাররা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।

মোটা কাপড়েরও একই অবস্থা। নিয়ন্ত্রিত বস্ত্রের দাম বেড়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী দেবী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : ভাল বস্ত্রের জন্য একটু বেশী দাম দেওয়া ভাল। যদিও তিনি টেক্সটাইল কমিশনারদের দিয়ে বস্ত্র সমস্যার ব্যাপারে গবেষণা চালাবেন বলে জানিয়েছেন। বস্ত্রশিল্পের একশো কোটি টাকা লোকসান কাটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত বস্ত্রের দর প্রতি মিটার আশি পয়সা বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু আনুপাতিক হারে বাজারে তার দাম আরও বেশী।

ধান চাষে এফ সি আই-এর সুফলা ও ইউরিয়া সার ব্যবহার ক'রে কম খরচে বেশি ফসল ঘরে তুলুন। আজকাল চাষবাসের কাজে অনেকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এফ সি আই-এর সার ব্যবহার ক'রে কম খরচে লাভের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে তুলছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি এফ সি আই-এর রাসায়নিক সারে উচ্চ গুণমান পুরোপুরি বজায় থাকে। নিজস্ব রঙ থাকায় ভেজালের ভয় থাকে না। দানাযুক্ত ব'লে প্রয়োগের সময় নষ্ট হয় না, আর সহজেই জলে গুলে ছিটোনো যায়।

প্রয়োজনমত সারের জন্য আপনার এলাকার এফ সি আই ডীলার বা কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁরা আপনাকে সবরকম সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্য সবসময় প্রস্তুত।

চাষের কাজে বেশি ফলন ও বাড়তি লাভের জন্য ব্যবহার করুন—

সুফলা
২০ : ২০ : ০
১৫ : ১৫ : ১৫

ইউরিয়া

ধান চাষে এফ সি আই-এর সুফলা ও ইউরিয়া সার ব্যবহার ক'রে কম খরচে বেশি ফসল ঘরে তুলুন

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

আঞ্চলিক শাখা : মুচিপাড়া, দুর্গাপুর-১২ ● ক্ষুদিরাম বসু রোড, মেদিনীপুর ● শহীদ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, মুর্শিদাবাদ ● বিধান রোড, শিলিগুড়ি ● ৫৮, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

Progressive/FCI/1-75

Regd. No. WB/CC-32 PRICE: 40 PAISE

কলকাতা ফিরে এসো সেই কলকাতায়

নীলকান্ত দাশ

না-পারছি না। কোত্থেকে শুরু করবো। বর্ত্তমান না অতীত। নাকি ভবিষ্যত। কলকাতা, আমার কলকাতার কোন কথা আগে শোনাবো। বর্ত্তমানে কলকাতার ভাঙা চোরা, মুক নিস্তব্ধ লাঞ্ছনো গোছানো চেহারার কথা দিয়েই যদি শুরু করি। বলবো—ক ল কা তা জুড়ে চলছে এখন এক মহাযজ্ঞ। উন্নয়ণ ও উন্নতির কর্মযজ্ঞ। সবুজ মাঠ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ইট সিমেন্ট আর পাইপ ফাউণ্ডেসনের কড়া ঘাপটে। পার্ক ষ্ট্রীট, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। রেস্তোরা হোটেলে পাশ্চাত্ত্য সংগীত আর ঠুং ঠাং আওয়াজের বিচিত্র কোরাস এখন আরও সোচ্চার। মিনি-ম্যাক্সির ধাক্কায় পথ সরগরম। সেখানে কমনীয়তা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য খুজে পাওয়া ধৃষ্টতার নামান্তর। এরই সাথে চলেছে একদল মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম। মিছিল, মিটিং, মুঠিবদ্ধ হাতের সদর্প উত্তোলন—সব মিলিয়ে চলতি হাওয়ার প্রতিবাদ—সবই আজ কলকাতায় যথার্থ অর্থেই সমুপস্থিত। কিন্তু কোথায় যেন এরই মধ্যে আমি হারিয়ে যাচ্ছি। ডুবে যাওয়ার মুহূর্ত্তেও কেন যেন আমি বেঁচে ওঠার প্রাণকাঠির নাগালটা পাচ্ছি না। খোলা আকাশের নীচে প্রাণভরা হাওয়া নিয়েও এর হদিশ আজও আমি ঠাওর করে উঠতে পাচ্ছি না। মনে হয় আমার ছোটবেলার স্বপ্নের কলকাতা এখন যেন বাস্তবের কঠোর নির্মম আঘাতে কাচের মত খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে। দু'হাত আগলেও তা সামাল দিতে পারছি না। বরং উবু হয়ে ভাঙা কাচ কুড়ুতে গিয়ে পদে পদে নাকাল হচ্ছি। তবে কি স্বপ্নের সাত রাজার এক ধন কলকাতার কাছে আমি সত্যিই প্রত্যাবর্ত্তিত বঞ্চিত। কথাটা ভালো করে বলার জন্যই আমি পায়ে পায়ে কয়েকটা বছর পিছিয়ে যাই।

সবে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছি। থাকি হাওড়ার এক সুদূর গ্রামে। পাড়ায় রোদ চশমা পরে কেউ ঢুকলেও তখন আমরা হা করে দেখি। কলকাতার মানুষ এলে কলজেটা হাতে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকি মুখের দিকে। আগন্তুকের কাছে কিছু শোনার আশায়। কলকাতার অভিধির ছোঁয়া পেলে একটু প্রশ্রয় পেলে ধন্য হয়ে যাই। তখন আমাদের দৌড় বড়জোর একটা সিনেমা। তাও স্কুল পালিয়ে। নয়ত বাড়ী থেকে লুকিয়ে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কোন ক্রমে পাঁচ আনা হলেই সিনেমা। রঙীন পর্দায় যত হৈ চৈ দেখি না কেন—তখনও মনে মনে কলকাতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। শুধু গল্পই শোনা। প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেনি। সুযোগ এসে গেল—বরং বলা ভালো নিয়ে এলো—স্কুল ফাইন্যালে পাশের সার্টিফিকেট। এটি নিয়েই দুরু দুরু বক্ষে আমার হাওড়া ব্রীজ পার হওয়া। অর্থাৎ কলকাতায় প্রবেশ। পড়ার তাগিদে কলকাতার কলেজে এ্যাডমিশন। সম্ভবত কলকাতার বন্ধুদের কাছেও আমি এ্যাডমিটেট হয়ে গেলাম। কিন্তু আদপ কায়দাগুলো রপ্ত হলো না। কলেজের ভর্তির পর বন্ধুদের মতে যেগুলো অবশ্য করণীয় তা করা আমার দ্বারা হয়ে উঠলো না। আশৈশব লেগে থাকা গাঁয়ের মাটির গন্ধ আমার আর গেল না। তবুও আশ্চর্য্যের কথা—কলকাতার বন্ধু মহলে আমার সভ্যপদ খারিজ হল না। চৌকস কথাবার্তার চাঁদা না দিয়েও ওটা আমার বজায় রইলো। কিন্তু আমার এক নতুন বাতিক দেখা দিলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাঙ্গনে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। প্রতিদিন ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ। বোম, কাঁদানে গ্যাস, গুলি আর ধোঁয়ায় তখন কলেজ ষ্ট্রীট সরগরম। আমার কাজ হলো প্রতিদিন নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে এসব প্রত্যক্ষ করা। সেদিন হুলুস্থুলু কাণ্ড। শুধু কলেজ ষ্ট্রীট নয়—গণ্ডগোলের বিস্তৃতি সেদিন বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমার কাজে বিরতি নেই। ঝাঁক ঝাঁক পুলিশ-ভ্যান সতর্ক প্রহরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। মাঝে মধ্যে বোম ফাটার কর্ণবিদারী আওয়াজ। লাইট পোষ্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাওড়ার গণ্ড গ্রামের ছেলেটা তখন অবাক বিস্ময়ে সব প্রত্যক্ষ করছে। যেন কলকাতায় এসব দেখার জন্যই সে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ হাতে এক হ্যাচকা টান। বয়েস আটেক বড় এক মেয়ের প্রশ্ন, মজা দেখছো? চলো। কিছু বলার আগেই মেয়েটা মায়ের স্নেহে গলির মোড়ে এক বাড়ীর দোতলাতে নিয়ে এলো। ধমকানোর তখনও শেষ নেই। হঠাৎ কলেজ ষ্টুডেন্টের সেন্টিমেন্টে আমি রুখে উঠতে গেলাম কিন্তু এলোমেলো চুলগুলো সাপটে ঠিক করার কাজে ব্যস্ত ওর হাতটা সরিয়ে দিতে গিয়েই আমি থমকে গেলাম। কৃষ্ণাঙ্গী কালো মেয়ের গভীর কালো চোখে আমি যেন মাকে দেখতে পেলাম। চোখ আমার জ্বালা করে উঠলো।

এতো বেশিদিনের কথা নয়। কিন্তু কলকাতার এরই মধ্যে কত বদলে গেছে। প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। কর্মসূত্রে ধোপ দুরস্ত কোট-টাই স্ট্যার্টাস মহলে পদচারণা করতে গিয়ে শুনতে পাই আত্মকেন্দ্রিকতার গুঞ্জন। কোথায় যেন বিরাট কিছু একটা ধ্বসে পড়ছে। কলকাতা যেন তার নিজের অগোচরেই কি যেন হারাচ্ছে। কলকাতায় যে হাত, যে উষ্ণ হৃদয় আমার বিপদের মুখে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে—আমি দেখেছি একুশ বছরের বুক থেকে বীভৎস উথলে ওঠা রক্ত দেখেও সেই হাত, সেই হৃদয় আর এগিয়ে আসেনি। বরং ওরা যেন পিছিয়ে গেছে। দেখেছি সরু রাস্তার মুখে বেচে ওঠার তাগিদে কারোও দু-চোখের আকুল প্রার্থনা নিষ্পাপ মুখের ওপরেই সটাসট দরজা জানলা বন্ধ হয়ে যেতে। মনুষ্যত্বের এই পাইকারী হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি ঘটনার সাথে আজকের আমার এই কলকাতা রয়েছে জড়িয়ে। কৃষ্টি সংস্কৃতির পীঠস্থান—কলকাতায় এখন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃত সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটছে। শ্বাসরোধকারী এই অবস্থাকে কসমেটিক লাগিয়েও আর উজ্জল করা যাচ্ছে না। যান্ত্রিক সভ্যতা আর বিজ্ঞানের জাড়িজুড়িতে কলকাতার বাহ্যিক চাকচিক্য এলেও মনুষ্যত্বের সে লাবণ্য বোধ হয় আর ফিরে আসছে না। এ সবই কি হতাশার সুর। বলতে গিয়েও কোথায় যেন বাধছে।

আমার ছোট বোনের কচি গলার আবদার। দাদা—কলকাতার কথা বল। কি বলবো ওকে। বলবো কলকাতায় চলে প্রাণ নিয়ে প্রাণের সওদা। ইজ্জত নিয়ে চলছে জুয়ো। সততা এখানে বোকামি। ভালবাসাটা অপরাধ! ও বিশ্বাসই করবে না—ওর প্রিয় দোয়েল পাখিরা কলকাতার হাটে টাকা পয়সার দরে বিকোয়। বাগানের তরতাজা জুই বেলি আজলা ভরে নিয়ে যে ফুলের গন্ধে ও পাগল হয়ে ওঠে সেগুলোও এখানে তেজাল। এসব শুনে ও ভীষণ কষ্ট পাবে। যদি বলি কলকাতা বদলেছে—সাথে আমিও—জানি ওর মুখটা নিকষ অন্ধকারে মলিন হয়ে উঠবে। ফলসা গাছে বসে থাকা চন্দনা পাখির দিকে তাকিয়ে থাকার মতো চোখ নিয়ে বলবে—এই না সেদিন চাদমারির জলার কাছে পুকুরটার থেকে আমরা শাপলা ফুল তুলে নিয়ে এলাম। দাদা—এরই মধ্যে এত বদলে গেলে। কি করে বলি—ঝলমলানো প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার মুখে রোমিওর মত ভিখিরীটাকে দেখে আজ আমিও শহুরে সভ্যতায় নাক সিঁটকোই। অবন মহলের করিডোরে দাঁড়িয়ে এরই নীচে বালিগঞ্জের বস্তিটাকে দেখে বলি: ছিঃ কি ন্যাসটি! কে কাকে বদলালো। আমি কলকাতাকে না বদলালে। আমি কলকাতাকে আমার। এর উর্ত্তর আগামী দিনের, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক।

কিন্তু জানি—যতই বদলাই—কৃত্রিম রঙে মনকে যতই ছোপাই—ঐ সুদূর গ্রামে পিটুলী গোলা দিয়ে আলপনা আকা মাটির ঘরটার কাছে বোন আমার দাঁড়িয়ে। ভাইফোঁটার দিনে শ্বেত চন্দনের থালা নিয়ে আমার অকল্যাণ দূর করার মন্ত্র পড়বেই। আমিও হয়ত পরিবর্ত্তিত হৃদয় নিয়েই একদিন কাক না ডাকা ভোরবেলার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কুয়াশা ঘেরা কলকাতার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলবো কলকাতা পঁচাত্তরের কলকাতা তুমি আগের কলকাতায় ফিরে এসো। তোমার উষ্ণ হৃদয় দিয়ে আমায় আপন করে নাও। রুদ্ধ দরজা খুলে মনের পবিত্র মন্দিরকে আবার উজ্জল করে তোলো। আমি আশাহত নই। কলকাতাকে ভালবাসি বলেই—নাছোড়বান্দা আশা নিয়ে আমি এখনও বসে রয়েছি। কথা দাও—বোনকে এবার যেন কিছু নতুন কথা শোনাতে পারি।

চিত্তরঞ্জন লোকসেটিভ ওয়ার্কার্স লেবার ইউনিয়নের বিপুল ভোটে জয়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত পনেরোই জুলাই অনুষ্ঠিত চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কার্সের ষ্টাফ বেনিফিট ফাণ্ডের নির্বাচনে মোট চোদ্দটি আসনের মধ্যে লেবার ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা দশটি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এই সাফল্য সাম্প্রতিককালে চিত্তরঞ্জনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও ঐ নির্বাচন বিভিন্ন বিরোধিতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তবুও শ্রমিকদের মনোবল অটুট থাকে এবং তারা তাদের প্রিয় সংগঠনকে (লেবার ইউনিয়ন) সর্বতোভাবে সফল করে। এবারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ঘটনা এই যে, যে সব আসন পূর্বে লেবার ইউনিয়ন কখনও পায় নি সেগুলিতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এই আসনগুলির মধ্যে ওয়ার্কস অফিস, জেনারেল স্টোর্স অফিস প্রভৃতি বিভাগের নাম উল্লেখযোগ্য। এই নির্বাচনের ফলাফল সাম্প্রতিককালে চিত্তরঞ্জনের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি করে।

মার্কারী ট্রাভেলসে ছাঁটাই আদেশ প্রত্যাহার : কর্মীদের কাজে যোগদান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত এক বৎসর যাবৎ মার্কারী ট্রাভেলসের কলকাতা অফিসের শ্রমিক কর্মচারীরা মালিকের বে-আইনী ছাঁটাই লক-আউট ও ক্লোজারের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ও কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে মালিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাছে নতি-স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তেইশ জন ছাঁটাই শ্রমিক কর্মচারীর ওপর থেকে ছাঁটাই আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী গত পয়লা জুলাই থেকে ঐ কোম্পানীর অফিস খুলেছে এবং শ্রমিক-কর্মচারীরা কাজে যোগদান করেছে।

দীর্ঘদিন সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ এবং গণসংগঠনগুলি তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা ও সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন, কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক রবীন চক্রবর্তী।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক ৬৩।৭ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ সি লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

রপ্তানীমূল্যে কারসাজী

দেশ কোটি কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা থেকে বঞ্চিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৮ই আগস্ট ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রপ্তানী মূল্যে কারসাজির ফলে ভারত সরকার কোটি কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই ব্যাপারে জড়িত রয়েছে কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী। তাদের তৈরী জিনিসপত্র রপ্তানীতে তারা এখন খুব উৎসুক, এটা তাদের কাছে শাপে বর।

জানা গেছে, একটি বিদেশী কোম্পানী ইউরোপে তার প্রধান সংস্থাদের কাছে পঞ্চাশ পয়সা দামে এক একটি ল্যাম্প পাঠায়। ঐ সংস্থাগুলো সেই ল্যাম্প তাদের আন্তর্জাতিক লেবেলে দশগুণ বেশী দামে বিক্রী করে। অর্থাৎ যে ল্যাম্পের জন্য আমাদের দেশ মাত্র পঞ্চাশ পয়সা পেতে পারে সেখানে একটি ধনী ইউরোপীয় দেশ পাচ্ছে পাঁচ টাকার বিদেশী মুদ্রা।

দামের এই ফারাক কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রকের নজরে আসে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক একটি বিদেশী কোম্পানীর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা পরীক্ষা করতে গিয়ে। আরও দেখা যায় যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে যেসব জিনিস এদেশ থেকে রপ্তানী করা হয়েছে তাতে ভারতে অবস্থিত কোম্পানীর প্রধান সংস্থার বহুল পরিচিত নামের লেবেল লাগানো। এইসব লেবেল ভারতেই লাগানো হয়েছে যাতে জিনিসগুলো বিশ্বের বাজারে সহজে গৃহীত হয়। অনেক সময় জিনিসগুলো ভারতীয় দামে এক জায়গায় পাঠানো হয় এবং তারপর দাম বাড়িয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এইভাবে ভারত সরকারকে বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। কারণ বিদেশী মুদ্রা আইন অনুসারে যদি সরকার কোন কোম্পানীর লভ্যাংশ বিদেশে প্রেরণ নিয়ন্ত্রিত করতে চান সেক্ষেত্রে কম দামে জিনিস রপ্তানী করে তাকে বানচাল করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন জাতীয় জীবন জঞ্জালমুক্ত করার সময়।— বাহিনী প্রস্তুত।

(শংকরস উইকলীর সৌজন্যে)

ভুবনেশ্বর-কটকে

নারীদেহের ফলাও কারবার : কয়েকজন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পুলিশ সম্প্রতি ভুবনেশ্বর ও কটকের কয়েকজন নারী ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ ছয়জন মেয়েকে উদ্ধার করেছে। তার মধ্যে তিনজনকে কটক থেকে, দুজনকে ভুবনেশ্বর থেকে আর একজনকে পারাদ্বীপ থেকে। তারা কটকের একজন বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে, যিনি তার নিজের হোটেলে মেয়েদের রেখে দেহ বিক্রীর ব্যবসা চালাতেন।

দালালরা বেশীর ভাগ ফুলবণী জেলার, যেখানে আদিবাসীর সংখ্যাই বেশী। তাদের মধ্যে কলাবতী নামে এক মহিলা ছিল প্রধান দালাল, যে ফুলবণীর পার্বত্য অঞ্চল থেকে মেয়ে সংগ্রহ করে ভুবনেশ্বর ও কটকে বিভিন্ন দালালের কাছে চালান করত। পুলিশ দুজন দালালকে ধরেছে বটে, কিন্তু আসল মক্কেল কলাবতী গা ঢাকা দিয়েছে।

কলাবতী ও নাগ প্রধান তাদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে সম্পর্কিত যুবতী মেয়েদের নিয়ে আসত। তারা গরীব বাপ-মাকে বলত ভুবনেশ্বর ও কটকে তাদের মেয়েদের ভাল কাজ দেবে এবং তার জন্য প্রাপ্য বেতন মাসে মাসে নিয়মিত পৌঁছে দেবে। আত্মীয়দের বিশ্বাস করে বাপ-মারা মেয়েদের তাদের সঙ্গে শহরে পাঠিয়ে দেন।

ভুবনেশ্বর ও কটকে আনার পর মেয়েদের হোটেলে রেখে দেওয়া হত কয়েকদিনের জন্য। সেখানে তারা মদ খেতে ও "খদ্দেরদের" আপ্যায়ন করতে শিখত।

পুলিশ জানতে পেরেছে ভুবনেশ্বর ও কটকের অনেক ব্যবসায়ী ও আইনজীবী এইসব হোটেলে যাতায়াত করতেন। এমন কি কিছু পুলিশ অফিসার, উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার ও রাজনৈতিক নেতাও এব্যাপারে লিপ্ত।

মেয়েদের নাম বদলে দেওয়া হত এবং তাদের এক জায়গায় এক সপ্তাহের বেশী রাখা হত না।

দালালরা খদ্দেরদের কাছে চড়া দাম হাঁকত এবং হয় তাদের বাড়িতে মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হত অথবা মেয়েরা যেখানে থাকত সেখানেই খদ্দেরদের "আপ্যায়ন" করা হত। খদ্দেরের বাড়ি গেলে দুশো থেকে তিনশো টাকা লাগত। কিছুদিন পরে মেয়েদের টাকার বিনিময়ে অন্য দালালদের দেওয়া হত। এক একটি মেয়ের দৈনিক আয় ছিল পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তারা পেত মাত্র দু টাকা—বাকিটা যেত দালালদের পকেটে।

পুলিশ মেয়েদের উদ্ধার করে তাদের বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এস এফ প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফি বাড়ল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

স্কুলফাইনাল প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নাম রেজিস্ট্রেশনের ফি আবার হঠাৎ বেড়ে গেল। গত মে মাসে "পর্ষদ বার্তা" নামে বোর্ডের যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতে উল্লেখ ছিল যে যারা নতুন কোর্সে পরীক্ষা দেবে তাদের এক টাকা করে ফি দিয়ে বোর্ডে এসে নাম লেখাতে হবে। গত জুন মাসে হঠাৎ সেই ফি বাড়িয়ে পাঁচ টাকা করা হয়েছে। আকস্মিকভাবে এই ফি বেড়ে যাওয়ায় বোর্ডের পক্ষ থেকে বারবার সময়সীমা বাড়ানো সত্ত্বেও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই এখনও নাম রেজিস্ট্রি করার সুযোগ পায়নি।

বোর্ড কয়েক বছর ধরেই পরীক্ষার ফি বাড়িয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কাগজের দাম ও ছাপা খরচ অনেক বেড়েছে। উপরন্তু এ বছর স্ক্রুটিনি ফি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। খরচ সামলাতে পারবেনা ভেবে স্কুলগুলি প্রাইভেট টেস্ট পরীক্ষার ঝামেলা এড়াতে চাইছে।

এছাড়া স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রীর ফলাফল এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল কবে বেরুবে তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যায় না। সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের একটি বছর নষ্ট হবার মুখে।

ত্রিবান্দ্রামে এম এল এ হোষ্টেল মধুকুঞ্জে পরিণত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ত্রিবান্দ্রাম : দুজন কংগ্রেসী এম এল এর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা এম এল এ হোস্টেলকে মধুকুঞ্জেও পরিণত করেছে।

হোস্টেলের ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডকে গত সপ্তাহে একদিন রাত জাগতে হয় এই "অ্যাডভেঞ্চারে"র ফলে সৃষ্ট গণ্ডগোল রুখতে।

একজন এম এল এর—প্রভাবশালী হরিজন নেতা—সঙ্গে আসে কোট্টায়ামের একজন মহিলা ডাক্তার ও তার নয় বৎসর বয়স্ক ভাই। আর একজনের সঙ্গে আসে শহরতলী থেকে আম্মাম্মা নামে একটি মেয়ে।

মহিলাসহ দুই মন্ত্রীর কাছে এদের পাঠানো হয়, যারা নারী-সঙ্গের বিনিময়ে অনুগ্রহ বিতরণ করেন।

মন্ত্রীদের সঙ্গ দিয়ে মহিলা ডাক্তার তার ভাইকে নিয়ে হরিজন নেতার ঘরে সহজেই ঢুকে যান। কিন্তু আম্মাম্মাকে নিয়ে দ্বিতীয় এম এল এ বিপদে পড়েন। তিনি তার ঘরের লাগোয়া একটি ঘর ভাড়া করেন আম্মাম্মার জন্য। কিন্তু হোস্টেলের একজন আইনের ছাত্র আম্মাম্মাকে দেখে ফেলে। সে এই "নৈশ লীলা" বন্ধ করবে বলে ঠিক করে।

সে আম্মাম্মাকে অনুরোধ করে তাকে একটা কনট্রাক্ট জোগাড় করে দেবার জন্য। আম্মাম্মা তার কথায় প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। সে মেয়েটির সঙ্গীকে বলেও ধমক খায়।

তখন ছেলেটি এম এল এর ঘরের সামনে "ধর্ণা" দেয় এবং যখনই এম এল এ উঁকি মারে তখন সে হল্লা শুরু করে।

ক্ষেপে গিয়ে এম এল এ ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডকে ডেকে ছেলেটিকে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে বলে। তাতে সে উগ্র হয়ে উঠে স্লোগান দেয় : "এম এল এ হোস্টেলে বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ কর।"

ভোর হলে এম এল এ আম্মাম্মাকে ট্যাক্সিতে নিয়ে নিরাপদ জায়গার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন।

যাত্রার জয়যাত্রা ঃ উৎস থেকে মোহনায় (২)

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

বৌকুণ্ডুর আসল নাম মুক্তামণি দাসী। মুক্তামণির যত দাপট তা কুণ্ডু বাড়ীর বৌ হয়ে আসবার পর। নবদ্বীপের প্রখ্যাত তিলি ব্যবসায়ী ছিলেন জয়মণি কুণ্ডু। এই জয়মণিবাবুর দুই ছেলে। একজন হলেন নীলমণি কুণ্ডু অপর জন রত্নমণি কুণ্ডু। নীলমণি কুণ্ডুর স্ত্রী হলেন মুক্তামণি। ওরফে বৌকুণ্ডু।

নীলমণির সঙ্গে রত্নমণির সম্পর্ক বিন্দুমাত্র মধুর ছিল না কোনদিন। দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিল রেষারেষি। নবদ্বীপের এই প্রসিদ্ধ কুণ্ডুবাড়ীতে রাসের সময় রীতিমত উৎসব হতো। উৎসবের প্রধান অঙ্গ-ছিল যাত্রাগান। যে বছর রত্নমণি কুণ্ডুর রাসের পালা পড়ত, তার পরের বছরের পালা পড়ত নীলমণি কুণ্ডুর। রত্নমণি চটিয়ে যাত্রা গানের আসর বসাতেন মতিলালের জন্য। কারণ আগেই বলেছি মতিলালের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক এবং আপন-জনের মত ছিলেন রত্নমণি। সুতরাং রাসের উৎসব নীলমণি অপেক্ষা রত্নমণির প্রাচুর্যে একটু বেশী মাত্রায় জাঁকজমক হতো। এটা মুক্তা-মণি দাসের কাছে ছিল অত্যন্ত অপমানের।

এরপর নীলমণি কুণ্ডুর মৃত্যুর পর মুক্তামণি দাসীর মনে আত্মীয় স্বজন বিদ্বেষ প্রবল হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, স্বামীর মৃত্যুর পর যখন রাসের পালা তাদের ওপরে ন্যস্ত হলো, তখন মুক্তামণির অনু-রোধ সত্ত্বেও মতিলাল রায় রাসে যাত্রা গান করেননি। অন্তরায় ছিলেন রত্নমণি কুণ্ডু। এই ব্যাপারের পর মুক্তামণি আর মুখ বুজে থাকেননি। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি তাঁর জামাই রজনীকান্ত কুণ্ডুর দ্বারা বহু অর্থ ব্যয় করে যাত্রা দল তৈরী করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এ সব ১২৮৪ বা ৮৫ সনের কথা।

এই সময়ে একদিন মতিলাল রায় সদল বলে চারখানা নৌকা করে যাচ্ছিলেন শান্তিপুরের প্রখ্যাত বড় গোস্বামী পাড়ায় যাত্রা করতে। মুক্তামণি সেই সুযোগের অপব্যবহার করলেন না। তিনিও মুহূর্তে প্রভূত অর্থ ব্যয় করে লোক পাঠালেন নৌকা যোগে, মতিলালের নৌকা থেকে পথের মাঝখান থেকে অর্থের লোভ দেখিয়ে মতিলালের দল থেকে বাছাই বাছাই অভিনেতা এবং যন্ত্রীদের ভাগিয়ে আনতে। হলো তাই। মুক্তামণি দাসীর লোক নদীবক্ষ থেকেই টাকার লোভ দেখিয়ে মতিলালের দল ভাগিয়ে লোকজন ফিরিয়ে আনল নবদ্বীপে।

সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা দল তৈরী হয়ে গেল। নামকরণ হলো বৌ কুণ্ডুর দল। মতিলাল অসম্ভব রক-মের বিপন্ন হয়ে পড়লেন। মুক্তামণি দাসীর কাছে অনুরোধ করলেন অন্ততঃ শান্তিপুরে যাত্রাগান গাই-বার জন্য দলের লোকদের ফিরিয়ে দিতে। বৌ কুণ্ডু রাজী হলেন না। বৌ কুণ্ডুর দল আসরে নামলেন প্রহ্লাদ চরিত্র, ব্রজলীলা পালা নিয়ে। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ নাম করল বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সে দল মতিলাল রায়ের নতুন করে সাজানো দলের দাপটে ম্লান হয়ে গেল।

এরপর জন্ম নিল "ব্রজলালের দল।" এই ব্রজলাল ছিলেন মতি-লালের খুড়তুতো ভাই, হরিচরণ রায়ের ছেলে। মতিলাল তাই ভাইকে ভালবাসতেন শুধু নয়, নিজের দলে তাকে সব বিষয়ে পারদর্শী করে তুলেছিলেন। ব্রজলাল ছিলেন মতি-লালের প্রধান সহকারী। সব কিছু দিয়ে মতিলাল বিশ্বাস করতেন ভাইকে। সেই ব্রজলাল যখন বেশ খানিকটা পাকলেন ঠিক তখন তিনি ছোবল মেরে বসলেন মতিলালকে।

একবার মতিলাল যাচ্ছিলেন যাত্রা করতে। সঙ্গে ছিলেন ব্রজ-লাল। পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুযায়ী ব্রজ-লাল পথ থেকে বৌকুণ্ডুর মত মতি-লালের দল থেকে লোক ভাঙিয়ে নিয়ে এসে নিজেই দল তৈরী করে-ছিলেন। নিমতলা স্ট্রীটে একটা বাসা ভাড়া করে সেখানে দলের অফিস করেছিলেন। মাত্র চার বছর ব্রজলাল তাঁর দল চালিয়েছিলেন। ১৩০১ থেকে ১৩০৫ সাল পর্যন্ত "ব্রজলালের দল"-এর অস্তিত্ব ছিল। ব্রজলাল রায় যাত্রা পালাকার হিসেবে বেশ সুনাম পেয়েছিলেন। তাঁর "কাশীখণ্ড" এবং "জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা" পালা খ্যাতির সঙ্গে আসর হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে মতিলাল রায়ের সময় থেকেই যাত্রার প্রসার দ্রুতভাবে বাড়তে থাকে। যাত্রা গানের ক্ষেত্রে মতিলালের দোর্দণ্ড প্রতাপেই বহু লোকের মনের গভীরে যাত্রার প্রসার প্রসঙ্গে একটা প্রবণতা দেখা যায়। সে সব কথা এখন থাক। তার আগে আজকের যাত্রাভিনয়ের এক ক্রম বিবর্তন প্রসঙ্গে কিছুটা আলোক-পাত করি।

বাংলা দেশে "যাত্রাগান" কবে কি ভাবে এল, কত প্রাচীন এই "যাত্রা" তার বিশ্লেষণ করা এখানে মুস্কিল। "যাত্রা"র জন্ম প্রসঙ্গে অনেকের অনেক মত। যেমন ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের উল্লেখ আছে। যেখানে "সম্বাদ সূক্ত"-এর একটা প্রাধান্য ছিল। অনেকে মনে করেন সেই সম্বাদ সূক্তই হলো যাত্রা গানের আদি। আবার অনেক ইতিহাসবেত্তার মতে বাংলা ভাষায় লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-ই হলো যাত্রাগানের প্রাথমিক পর্যায়। আবার এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে কবি জয়দেবের "গীতাগোবিন্দম্" বাঙ্গালার যাত্রা গানের আদি রূপ। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব নবদ্বীপের চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ীতে একবার সদলবলে "কৃষ্ণ-লীলা" অভিনয় করেছিলেন।

আজকের আধুনিক যাত্রাগান বা যাত্রাপালা অথবা যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের "কৃষ্ণলীলা"র কোথাও কোন মিল ছিল কিনা তা বলা সম্ভব নয়, তবে একথা ঠিক যে এখন যেমন শুধু "সংলাপ"-এর মাধ্যমে অভিনয় হয়, তখন কিন্তু সেই যাত্রাভিনয় হতো গানে গানে। সেই হেতু এই কৃষ্ণলীলাকে যাত্রার প্রাথমিক চেহারা ধরা চলে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আর চৈতন্যদেবের কৃষ্ণলীলার মধ্যে কালীয়দমন পালা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তাই অল্প সময়ের মধ্যে এই কৃষ্ণযাত্রার অনুসরণে অনেকেই যাত্রার প্রসার শুরু করলেন, নানা-ভাবে, নানা চিন্তাধারায়, নানা বিষয় নিয়ে। যেমন, চণ্ডীযাত্রা, মন-সার ভাসান যাত্রা, রাম যাত্রা, চৈতন্য যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। এই সব যাত্রা আস্তে আস্তে মানুষের চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হতে থাকল। ফলে দেবতার প্রতি ভক্তি রসের যে ভাবধারা কৃষ্ণলীলার মধ্যে স্পষ্ট ছিল, তা সরে যেতে যেতে কবি গানের প্রাধান্য বেশী পেতে থাকল। ফলে প্রত্যেক যাত্রাগান এখন হয়ে উঠল অশ্লীল, এবং রুচিবিকৃতির একটা বাহক। ফলে একটা সর্বনাশ দেখা দিল সাধারণ মানুষের ভিতরে।

এক শ্রেণীর মানুষ এই সব যাত্রাগান দেখতে মরিয়া হয়ে উঠল, আর এক শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা ঘরের বাইরে এসে সেই যাত্রাগান দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন। এই যাত্রাগান দেখলে মেয়েদের সমাজের চোখে বাড়ির চারিণী, কুলটা ইত্যাদি হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল, তাই মেয়েরা এই যাত্রাগান দেখা প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করে দিলেন।

এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্য এই সময়ে এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটল, যিনি যাত্রাগানের এই রুচি ভেঙ্গে দিয়ে, যাত্রা গানের মাধ্যমে উন্নত রুচির প্রসার শুরু করলেন। তাঁর নাম শিশুরাম অধিকারী। এই শিশুরাম অধিকারীর সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না, তবে অধি-কারী শিশুরামের পদবী নয়, বোধ-করি তিনি যখন যাত্রাগানে আত্ম-প্রকাশ করেন তখন যাত্রাগানের সেই দলের প্রধান হিসাবে "অধিকারী" হলো শিশুরামের খেতাব।

এরপর ঐ "কালীয়দমন" যাত্রার উপস্থাপনার মধ্যে সুরুচি আনেন শ্রীদাম আর সুবল। এরা হলেন দুই ভাই। এঁদের বলা হতো যাত্রাওলা। এরা হলেন শিশুরামের ঠিক পরেই যাত্রা গানের প্রচারক, অর্থাৎ হিসেব কষলে দেখা যায় উনিশ শতকের গোড়ায় এঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

শ্রীরামপুরে কালীয়দমন যাত্রা গাইতে গিয়ে শ্রীদাম ওলাওঠা রোগে মারা যান। শ্রীদাম আর সুবল দুজ-নেই কবি গাইয়ে ছিলেন। কালীয়-দমন যাত্রাগানের গোড়া পত্তনে কবিরা তাঁদের কথা রাখার এবং সেই গান উপস্থাপনার মধ্যে যে বিকৃত রুচি এবং অশ্লীলতার প্রকাশ ঘটা-তেন, শ্রীদাম-সুবল তেমন কবি ছিলেন না। প্রসিদ্ধ টপ্পা গাইয়ে নিধুবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এঁরা প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এক সময় যে মেয়েদের পক্ষে আসরে বসে কিংবা চিকের আড়ালে বসে যাত্রাপালা দেখা নিষিদ্ধ ছিল, শ্রীদাম-সুবলের জন্যই সেই মেয়েরাই আবার যাত্রাপালা দেখে, যাত্রা-গান শুনে যেন একটা বিরাট অভি-শাপ থেকে মুক্তির স্বাদ নিতে শিখল। কালে কালে সেই মেয়েরাও এলেন আসরে। যাত্রাওয়ালী নামের মালা পরে। কেমন করে এলেন, কারা এলেন। মেয়ে যাত্রার দলের আগে আরও একটু বিস্তারিত বলি শ্রীদাম-সুবলের পর এলেন পরমা-নন্দ।

মহারাজ সিতাংশুমৌলী দীর্ঘজীবী হোন

বহ্নি সেন

নরোত্তমপুরের মহারাজা সিতাংশুমৌলী প্রাত্যহিক রাজকার্যে বসেছেন। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। তাঁর আচার নিষ্ঠা সম্পর্কে ঘোর শত্রুরও সংশয় নেই। প্রতিদিন সভার কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলকামনায় তিনি একশ আট-বার নাম জপ করেন। নাম জপ শেষে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তবে তিনি কাজে হাত দেন।

সেদিনটা ছিল চৌঠা আষাঢ়। বুধবার। রাজা সিতাংশুমৌলী সবে-মাত্র জপমালা নিয়ে বসেছেন। এমন সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে খয়ের খাঁর প্রবেশ। খয়ের খাঁ মহারাজের বিশ্বস্ত উজির। মহারাজের সব বিপদ আপদ তার বুদ্ধির দৌড়েই উৎরে গেছে। এহেন উজিরকে উদ্বিগ্ন দেখে মহারাজ ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হে খাঁ সাহেব, সব কুশল তো? নতমস্তকে উজির খয়ের খাঁ বলল ঃ "মহারাজ অভয় দেন তো বলি। সিতাংশুমৌলী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বৃদ্ধ খয়ের খাঁর গালের চামড়া কুঁচকে গেছে। সব চুলগুলিই সাদা। একটু দম নিয়ে সে বলতে শুরু করল ঃ মহারাজ আপনার অন্নে পালিত উত্তর ও পূর্বের সুর-পুরের প্রজারা ন্যায়াধীশের কাছে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ এনেছে। তাদের অভিযোগ, মহারাজ রাজ-কার্যে যথেচ্ছাচার করছেন।

বিস্মিত, ক্রুদ্ধ মহারাজ রাগে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। মহারাজের দিকে তাকিয়ে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে খয়ের খাঁ বলল, শুধু তাই নয় মহারাজ, এর পেছনে নায়েব ত্রিলোচনের হাত আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়া ঐ নচ্ছার প্রজাদের এতবড় স্পর্ধা হতেই পারে না।

ত্রিশ বছর ধরে রাজকার্য চালাচ্ছেন সিতাংশুমৌলী। এমন উদ্বিগ্ন হতে কেউ তাঁকে কোনদিন দেখে নি। খয়ের খাঁর কথা শেষ হতেই সম্বিত ফিরে পেলেন মহা-রাজ। সেদিনকার মত সভার কাজ স্থগিত রেখে, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিত্য সঙ্গী, দুর্দিনের বন্ধু খয়ের খাঁকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ ঢুকলেন অন্তঃপুরে।

চিন্তায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে সিতাংশুমৌলীর কপালে। এতবড় স্পর্ধা, জটিল চক্রান্ত তাঁরই রাজত্বকালে—এ তিনি কখনও কল্পনাও করতে পারেন নি। এই তো সেদিন। রাজকোষ শূন্য। খাজনার হার বাড়াতেই প্রজাদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ দেখা দিল। শূলে চড়িয়ে দিলেন ঐ বজ্জাত চাষীদের জনাকয়েক পাণ্ডাকে। ব্যস্ সব ঠাণ্ডা। খয়ের খাঁ সেদিনও মহারাজের পাশে ছিল। ব্যবস্থা শুনে বলল, সাধু, সাধু। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ আরও আরও দীর্ঘজীবী হন। আর আজ কিনা খোদ মালিকের বিরুদ্ধেই নালিশ।

শঙ্কিত হয়ে পায়চারী করতে লাগলেন রাজা সিতাংশুমৌলী, হঠাৎ খয়ের খাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে ক গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, "ন খাঁ সাহেব এ চলতে পারে না যেমন করেই হোক উপায় বাতলাতে হবে।" চিন্তিত খয়ের খাঁ মাথা নু বলল ঃ "মহারাজ এ রাজদ্রোহিতার সামিল। ঐ হাভাতে হাড়গিলগিলে প্রজাগুলো রাজার বিরুদ্ধাচরণ করবে—তা হতে পারে না। দুষ্টের দমন জরুরী প্রয়োজন। শাসনকার্যে যথেচ্ছাচার চলছে কিনা তার বিচার করবেন খোদ ঈশ্বর। মহারাজ, আমা দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ বেটা নায়েবের চক্রান্তে, প্রজাবিদ্রোহের এটা পূর্ব প্রস্তুতি।"

সিতাংশুমৌলী উজিরের কথা সায় দিলেন। এরপর শুরু হল গভীর শলাপরামর্শ। খয়ের খাঁ তৃপ্তির সুরে বলল ঃ মহারাজ! আপ ন্যার কৃপায় আমার লক্ষ্মীর ঘড় পূর্ণ, সম্মানও কম নয়। আপনার ভুবন জোড়া খ্যাতিতে আমিও খ্যাতি মান। তাই বেইমানী তো করতে পারব না মহারাজ। তবে খুব সন্ত পর্ণে, খুব সাবধানে কাজ হাসিল করতে হবে মহারাজ। ফাঁস হয়ে গেলে বিদ্রোহ অনিবার্য।

বৃহস্পতিবার, পাঁচই আষাঢ় ঢোল শহরতের কাঁড়া-নাকরার আও য়াজে গোটা নরোত্তমপুর সাত-সকালে জেগে উঠেছে। ঢোল বাদকে সঙ্গে রাজকর্মচারীরা চিৎকার করে ঘোষণা করছে ঃ প্রজা হিতার্থায় রাজাধিরাজ ঈশ্বরবৎ সিতাংশুমৌলী সুবিস্তৃত মহান সাম্রাজ্যের উত্তর-

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

রাজ্যের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ব্যবস্থায় তীব্র সঙ্কট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সরকারী সচেতনতা সত্ত্বেও রাজ্যের হোমিওপ্যাথী শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও এক ভয়াবহ সঙ্কটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে 'সরকারী সচেতনতা' বলতে যা বোঝায় তা নিতান্তই সাম্প্রতিককালের ঘটনা, কিন্তু তার আগে অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল থেকে ফ্যাকাল্টির মাধ্যমে যখন রাজ্যে হোমিওপ্যাথী বিস্তার লাভ করছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথীকে জনপ্রিয় করার জন্য যা করা হয়েছে, তা খুবই সামান্য।

রাজ্যের হোমিওপ্যাথী কলেজগুলিতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকদের কাছে সরাসরি এই প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সত্ত্বেও এই চিকিৎসা মাধ্যমটি অবহেলিত কেন? ওরা বললেন: এই 'কেন'র উত্তর এক কথায় হয় না। অজস্র কারণ রয়েছে। ওদের জবাবের নির্গলিতার্থ হল: গোড়া থেকেই এই চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য দৈতিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মতো অবহেলা করা হয়েছে। এই অবহেলার মূলে প্রধানত একটি রাজনীতিই কাজ করেছে তা হল, এলোপ্যাথীর দিনে দিনে সম্প্রসারণ এবং হোমিওপ্যাথীর জনপ্রিয়তা যেন কোন রকমেই একে ছাপিয়ে না যায়। এই ভাবনা যে শুধু এলোপ্যাথী চিকিৎসকদের স্বার্থকেই সংরক্ষণ করেছে তাই নয়। বিদেশী ওষুধ কোম্পানীগুলিও এই একপেশে চিন্তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। ফলে হোমিওপ্যাথীর গুণাগুণ সম্পর্কে এ দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছেন। অথচ, বলাবাহুল্য ভারতের মতো দরিদ্র দেশে হোমিওপ্যাথীর বিস্তার আরও দ্রুত প্রয়োজন ছিল।

কলকাতা ডি এন দে হোমিওপ্যাথিক কলেজ এ্যাণ্ড হসপিটালের জনৈক চিকিৎসক—অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত আমাকে জানালেন, রাজ্যের পরিচালন ব্যবস্থার থেকে যারা এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুষম বিকাশে সাহায্য করতে পারতেন, তাদের বরাবরের ঝোঁক ছিল এলোপ্যাথীর দিকে। ফলে ছাত্ররা পরিপূর্ণ চিকিৎসক হবার যেজাজ নিয়ে হোমিওপ্যাথী পড়তে আসেন নি। হোমিওপ্যাথী শিক্ষার জন্য রাজ্যে যে কটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার সবই কোন না কোন প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকের উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে।

আজও গ্রামেগঞ্জে যে সমস্ত চিকিৎসক শুধু 'মেটিরিয়া মেডিকা' পড়ে চিকিৎসা চালাচ্ছেন তাদের সকলকে এখনও রেজিস্ট্রেশন দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় আনরেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের সংখ্যা কম নয়। এই অপরিণত চিকিৎসকদের ওপর এই চিকিৎসা ব্যবস্থার সুনাম দুর্নাম অনেকটা নির্ভর করছে। যাঁরা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাদের রেজিস্ট্রীকৃত করার জন্য যে সরকারী বিধি নির্দিষ্ট হয়েছে, তা মোটেই দক্ষ বা সফল চিকিৎসক সৃষ্টির সহায়ক নয়। এদের রেজিস্ট্রেশনের আগে যথার্থ পরীক্ষা নেওয়া এবং ট্রেনিংয়ের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

অনেক উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী শহরে হোমিওপ্যাথীর পসার দেখে আজকাল কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু যখন পাশ করে বেরুচ্ছেন তখনও তিনি হোমিওপ্যাথীকে পুরোপুরি ভালবাসতে পারেন নি. তাকে পেশার অন্তর্ভুক্ত করা তো দূরের কথা। ছাত্রদের মধ্যে এই দ্বৈত মানসিকতা সৃষ্টির কারণ কি?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে এই প্রশ্নের জবাব দিলেন ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথী কলেজেরই দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র। তিনি বললেন: এ রাজ্যে সব হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলোতেই আমাদের দুরকম শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয়। এলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী এই দুই পরস্পর বিরোধী স্কুলিং-এর শিক্ষকরাই আমাদের পড়ান। এই দুরকম চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে আমূল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারী পড়তে গেলে ফিজিওলজি, গায়নকোলজি, সার্জারী প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় উভয়মুখী ছাত্রদেরই পড়তে হয়। এই কমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে লেকচারার হিসাবে এলোপ্যাথী প্রাকটিশনারদেরই নিযুক্ত করা হয়। ফলে হোমিওপ্যাথীর ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদের কাছ থেকে ক্লাশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের চাইতে হোমিওপ্যাথী বিরোধী বিষোদ্গারই বেশী শুনতে হয়। ক্লাশে লেকচার দেবার সময় তাদের হোমিওপ্যাথীর ওপর কোন আনুগত্য থাকে না। ফলে দুর্বল মানসিকতার ছাত্রদের কাছে হোমিওপ্যাথিক লাইনে ডাক্তারী পড়তে আসাটা মারাত্মক ভুল বলে মনে হয়। অনেকের মধ্যে সহজে সোজা রাস্তায় কোন রকমে পাশ করে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যারা পাশ ক'রে ডিগ্রি হাতে পান, তাদের অনেকেই বড় হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ না থাকলে পুরোপুরি হোমিওপ্যাথিক লাইনে চিকিৎসা করেন না। অধিকাংশরাই চলে যাচ্ছেন মিক্সড্ ট্রিটমেন্টের দিকে। প্রয়োজনে ওরা এলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী দুটোই করেন। ফলে কোন ইনফ্লুয়েঞ্জার রোগীর যদি অনেক সময়ে রাস টক্সিকোতে দ্রুত কাজ না হয়, চিকিৎসক নিজেই অধৈর্য হয়ে এনাসিন বা এ্যাসপিরিন খাবার পরামর্শ দেন। এতে রোগীর যেমন ক্ষতি তেমন চিকিৎসকেরও বদনাম।

ঠিক এই একই অভিযোগ শোনা যায় মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক কলেজ এ্যাণ্ড হসপিটালের বিরুদ্ধে। রাজ্যের অন্যান্য কলেজের তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানটি কেতা-দুরস্ত। অথচ এই হসপিটাল হোমিওপ্যাথীর চেয়ে এলোপ্যাথিক ওষুধপত্রেই ঠাসা। কেউ কেউ এই প্রতিষ্ঠানটিকে মার্সিং হোমও বলে থাকেন।

ছাত্ররা আরও অভিযোগ করেছেন যে অধিকাংশ কলেজেই সার্জারীর কোন সুব্যবস্থা নেই। পাশাপাশি নতুন কোন রোগের জন্ম না দিয়ে (সাইড এফেক্ট) রোগ নির্মূল করাই যে চিকিৎসার উদ্দেশ্য সেক্ষেত্রে কলেজের নিজস্ব আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সার্জারীর ব্যবস্থা না থাকাটা একটা বড় রকমের সমস্যা।

চলতি বছর থেকে হোমিওপ্যাথী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে। সকলেই আশা করছেন, এবার এই অব্যবস্থা দূর হবে। আগে কলেজে লেকচারাররা খুব সামান্যই টাকা পেতেন, এখন সরকার থেকেই তাদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কলেজগুলিতে আলাদা সরকারী অনুদানের ব্যবস্থাও হচ্ছে, এক্ষেত্রে যদি হোমিওপ্যাথী শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুই উন্নতি না ঘটে, তবে পাশ করা ডাক্তার ছাত্ররা হতাশ হয়ে পড়বেন, প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্নীতির অভিযোগও এড়ানো যাবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবে মাত্র রাজ্যের চারটি কলেজের অনুমোদন দিয়েছেন, বাকী কলেজগুলির কথাও তাদের ভাবতে হবে। অন্যথায় এই চারটি কলেজে সব আগ্রহী ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান হবে না। গবেষণার ক্ষেত্রেও হোমিওপ্যাথীর সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

ভোজন পুরাণ

অনার্য মিত্র

খাদ্যরসিক

আমার মামা খাদ্যরসিক
খাবার খেতে জানতেন,
মাইনে পেলে অফিস ফেরৎ
বেলুন কিনে আনতেন।
সময় পেলেই সেই বেলুনে
ভরে রাখতেন বায়ু,
যায়ু খেয়েই হোঁৎকা মামার
বাড়ছিলো বেশ আয়ু।
হঠাৎ সেদিন ভাতের লোভে
বায়ু খেতে যেই ভুললেন,
রক্তবমি করে শেষে
মায়া পটল তুললেন।

কুটুম বাড়ী

এক পয়সায় খাবায় তুই
পাঁচ পয়সায় খা,
পয়সা যদি না থাকে তো
কুটুম বাড়ী যা।

কুটুম বাড়ী মাংস পোলাও
কোর্মা পিঠে পুলি,
সেখান থেকে আনবে তোকে
দশ দশটা কুলি।

বল দেখি তুই, কে সে কুটুম?
সম্বন্ধ কীসে?
আর যাই হোক, নিশ্চয়ই সে
জমিদারের পিসে।

লাট সাহেবের ছা

লাট সাহেবের ছা
তুই পেট পুরিয়ে খা
এখন আমি অন্ধচোখে
দেখতে পাবনা।

খা তুই, দুগ্ধ দধি পায়েস
তাকিয়ে ঠেসে গুলতানি কর
ডানলোপিলোয় আয়েস।

গরীব লোকের ছেলে,
খেয়ে পেটটা যদি ফোলে —
রাজ্যের পাইক এসেই
তাহার কানটি দেবে মলে

মৎস্য রসিক

এই তো সেদিন তুমি জন্মেছ বৎস,
এত তাড়াতাড়ি কেন খেতে চাও মৎস্য।
দুদিন সবুর কর মেওয়া কিছু ফলবেই,
দোকানীর হৃদয়টা অবশেষে গলবেই।
সবচেয়ে আগে চাই শৃঙ্খলা ধৈর্য,
মৎস্য পাবেই পাবে পাবে ঐশ্বর্য।
কি মাছ খাইবে বলো, ট্যাংরা না ভেট্‌কী,
গলদা চিংড়ী, কৈ, ল্যাটা নাকি লেট্‌কী।
যে মাছেতে ডিম আছে, দেহ তৈলাক্ত
তুমিও কি সস্ত্রীক সে মাছের ভক্ত?
মাছের অভাবে যারা ঘরে ঘরে পস্তায়
তাহারা "ধুকিব" করো বস্তায় বস্তায়।
মৎস্যরসিক যারা, লেখও না নামটা
জিভ কেটে জমা দিও মৎস্যের দামটা।

গ্রন্থ সমীক্ষা

সোমেন চন্দর উপন্যাস

ইরাবান বসুরায়

"সন্ধ্যার আগে তালবনের নীচে বর্ষার জল দেখিয়া রাতে মালতী নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিতেছিল"—প্রথম লাইনেই পাঠক মনে করতে পারেন, একে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন রচনার সূত্রপাত। অথচ এ উপন্যাস (বন্যা: সোমেন চন্দ। নবজাতক প্রকাশন। দাম: পাঁচ টাকা) যখন লেখা হয়, ১৯৩৮ সালে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য জগতে তখনও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নন, আর এ উপন্যাসের রচয়িতা সোমেন চন্দর বয়স তখন আঠারো।

লেখক সোমেন চন্দ বহুকাল ধরেই পাঠক সমালোচক মহলে উপেক্ষিত। বামপন্থী মহলেও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকত প্রধানতঃ তাঁর রাজনৈতিক কর্মেই। একজন তরুণ মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, মার্কসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত সেই রাজনীতির জন্যই প্রাণ দিয়েছিলেন—এ সবই সোমেন চন্দ সম্পর্কে উল্লেখনীয় মনে করা হত। তার সাহিত্যকর্ম আলোচনাতেই আসত না। সাম্প্রতিক কালে দিলীপ মজুমদারের সম্পাদনায় সোমেনের রচনাবলী সঙ্কলিত হওয়ায় এই অকাল-নিহত তরুণের শিল্পী চরিত্রটি পাঠকের সামনে উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে। 'বন্যা' সেই সুযোগেরই সম্প্রসারণ।

স্বল্পায়তন রচনা, ঘটনাও কম। চরিত্রও খুব বেশী নয়. প্রধানত একটি পরিবারই উপন্যাসের কেন্দ্র, একটি চরিত্র এই পরিবারে বহিরাগত। বস্তুতঃ বন্যা—এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই এ উপন্যাসের মূল চরিত্র, এই বন্যার সূত্রেই উপন্যাসের মানবচরিত্রগুলি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে আর রজত বাইরে থেকে এসে দাঁড়িয়েছে এই পরিবারটির মধ্যে। এই পরিবারটি গ্রামীণ মধ্যবিত্ত। সোমেন নিজেই জানিয়েছিলেন "গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর।"

বন্যাজনিত যে আর্থিক বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে এই পরিবারকে তার কয়েকটি টুকরো ছবি এখানে আছে—ঘরে চাল নেই, অসহায় মানুষগুলো কান্না আর লক্ষ্যহীন ক্রোধে পরস্পরকেই বিদ্ধ করছে, গরু বিক্রী করে টাকা আনতে হচ্ছে—সেখানে মিশে থাকছে গৃহপালিত আশ্রিত জীবের জন্য মমত্ব আর বেদনাবোধ, এর সঙ্গে টাকা পাবার আনন্দ, আর এরই মাঝে মালতী—সে শুধু স্বপ্নই দেখছে, বন্যার বিধ্বংসী চেহারাও তার কাছে মায়াময়। এই পরিবারের সঙ্গে এর পরে যোগাযোগ ঘটলো রজতের—রিলিফ পার্টির সদস্য। আলাপ থেকে ঘনিষ্টতা। রজত সেই সুবাদে এদের বোঝাতে চায় অভাবের কারণ একদল মানুষের পরিশ্রমের ফসল ভোগ করে মুষ্টিমেয় দু' একজন, বোঝাতে চায় শ্রেণীভেদের কথা আর সেই সঙ্গে রূপকথার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের কায়দা-কানুনের কথা, মালতীকেও সে স্বপ্নের জগত থেকে টেনে এনে রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড় করাতে চেয়েছিল। তারপর একদিন রজতকে চলে যেতে হয়। উপন্যাসের এটুকুই ঘটনা।

গ্রামীণ মধ্যবিত্তের মানসিকতার বিশ্লেষণে সোমেন যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। প্রিয়নাথ পরিবারের কর্তা মধ্যবিত্ত মানসিকতার সার্থক প্রতিনিধি। অভাবের সামনে সে অসহায়, প্রতিকারের রাস্তা জানা নেই, অভাব মেটাতে গরু বিক্রী করা ছাড়া তার কাছে অন্য কোন উপায় জানা নেই, গ্রামের জোত-জমির মালিক তারক বিশ্বাসের কাছে ফুল খোলার জন্য সাহায্য চেয়ে সে নিজের ভদ্র পরিচয়কে তুলে ধরতে চায়। তারক বিশ্বাসের ভণ্ডামি প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সে বড়জোর বিস্মিত হয়, তবুও মধ্যবিত্ত মানসিকতায় কোন প্রতিবাদ জোগায় না। রজতকে তার ভালো লেগেছিল। এই ভালো লাগার ফলেই রজতকে সে ঘরে জায়গা দিয়েছিল আর মধ্যবিত্ত সঙ্কীর্ণতায় সেই সঙ্গে রজতকে আশ্রয় করে মেয়ের সুখী ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চেয়েছিল। যে মুহূর্তে রজত চলে গেল, স্বপ্ন ভঙ্গের ধাক্কায় প্রিয়নাথ সেই মুহূর্তেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। এক মুহূর্তে রজত সম্পর্কে সমস্ত দুর্বলতা বিরূপতায় রূপান্তরিত হওয়াটা সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি, কিন্তু সেই স্বার্থবুদ্ধি সন্তানের মঙ্গল কামনা থেকেই জাত। এই মধ্যবিত্ত মনটিকে সোমেন চিনতে ভুল করেননি। ফলে প্রিয়নাথ চরিত্রকে অত্যন্ত সাভাবিক রক্ত মাংসের মানুষ বলেই মনে হয়।

এ ছাড়াও কখনো সখনো অল্প আঁচড়ে দু একটি চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা আর সেই সঙ্গে বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরায় সোমেনের সার্থকতা দেখা যায়। অন্ধকার রাতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল রজত, হঠাৎ দেখা গেল একটি মানুষের মুখে দাড়ি চোখদুটি লাল, উরু পর্যন্ত পরনে এক কাপড়, শরীরটা এমন যে, "কঙ্কালকেই মনে করাইয়া দেয়"। রজতের হত থেকে হয়ত সে সাহায্য পেয়েছিল, তাই রজতকে সে ডাকল দেবতা বলে। অন্ধকারে নিঃশব্দ বসে আছে সে, ভীম, আর রজতের জিজ্ঞাসার জবাবে হঠাৎই হেসে ভাঙা গলায় সে দেখিয়ে দেয় একটি বিকৃত মৃতদেহ, তার ছেলে। "তোমার ছেলে?" "হুঁ, দেবতা।" কখন মারা গেল? তিন চার ঘণ্টা আগে। কী হয়েছিলো? তার জবাবে ঠোঁট ওল্টায়। এই প্রায় স্বাভাবিক কথোপকথনের মধ্যে সোমেন দেখেছিলেন ভারতবর্ষের সেই সাধারণ মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে মার খেতে খেতে যারা মার খাওয়াটাকেই নিয়ম বলে মেনে এসেছে, প্রতিবাদ করার জোর হারিয়ে ফেলেছে তাদেরই। এই অংশে, বা উপন্যাসের অন্যত্রও সোমেন আবেগের প্রশ্রয় দেননি—অত্যন্ত নির্মম, নিরাসক্ত ভাবে বর্ণিত, কিন্তু লেখক সোমেনের পক্ষে এই পরিণতিকে মেনে নিতে পারা সম্ভব নয়, তাই ভীম যখন বলে "মা কালীকে কতো জানালাম, ছেলেটাকে ভালো করে দাও মা, সেরে উঠলে যেমন করে হোক, তোমাকে কার্তিক মাসে দেবো পূজা, মা ভালো করে দাও। তখন—দেবতা রাগিয়া গেল, জোরে বলিল চুপ, চুপ, চুপ। প্রার্থনা! অজ্ঞাত দেবতার কাছে প্রাগৈতিহাসিক তোষামুদি। রাজনীতি বুঝতে শেখা সোমেনকে চেনা যায় এখানেই, আর এ অংশটুকুই অবধারিত ভাবেই মনে পড়ায় আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। গ্রামীণ জোত-জমার মালিকদেরও চিনতেন লেখক।

কয়েকটা ত্রুটি এবারে দেখা যেতে পারে। উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র মালতী ও রজত। মালতী স্বপ্ন দেখা কিশোরী। বিভূতিভূষণের কিশোর চরিত্রের মত না হলেও বাস্তব-সত্য বিমুখ বিস্ময়বোধ তার অপরিসীম। আর এই স্বপ্নবিলাস থেকে সে কখনও মুক্ত হতে পারেনা। রজত তার কাছে রূপকথার নায়ক, তার কাছে রজতের আবির্ভাব ও প্রস্থান দুইই রূপকথার মত। তার মুগ্ধতার সুবাদে রজত তাকে অনেক সত্যের সন্ধান দিতে চেয়েছে, কিন্তু মালতীর মধ্যে তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল কিনা লেখক তা দেখাননি। ফলে উপন্যাসের শেষেও সেই রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসই দেখা যায়—"মালতী চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কাহাকে যাইবে দেখায়? কে আসিবে ওই প্রান্তর পার হইয়া।" এই আচ্ছন্ন স্বপ্নবিলাস মালতীকে অনেকাংশেই অস্বাভাবিক করে তুলেছে। তাকে মাটির ওপর দাঁড়াতে দেয়নি। আর শুধু মালতী নয়, রজতও শেষ পর্যন্ত কোন প্রভাব রেখে যেতে পারল না প্রিয়নাথদের পরিবারে কারও ওপরেই। বস্তুতঃ উপন্যাসের মৌল ত্রুটি এটাই—রজত শুধু প্রিয়নাথদের পরিবারেই বাইরের মানুষ নয় উপন্যাসেও বাইরের চরিত্র থেকে গেছে। শুধু মালতী নয়, উপন্যাসের কোন চরিত্রেই এগোয়নি, টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্যে পাক খেয়েছে।

কিন্তু এ উপন্যাস লিখেছিলেন সোমেন চন্দ, তখন যার বয়স মাত্র আঠারো, যিনি একটি রাজনৈতিক জীবনবোধে দীক্ষা নিচ্ছিলেন, যিনি মোহাবিষ্ট দৃষ্টির বদলে বস্তুবাদের আলোয় জীবনকে চিনে নিতে চাইছিলেন। শিল্প ও জীবনকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন সোমেন চন্দ, সার্থক না হলেও 'বন্যা' সেই প্রয়াসের নিদর্শন। সচেতন পাঠক এ জন্যই 'বন্যা'কে স্বাগত জানাবেন।

পেরুতে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র: জনগণ ঐক্যবদ্ধ

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

কিউবার পর পেরুতে নতুন সব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত রকমের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পেরু এসে দাঁড়িয়েছে কিউবার পাশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আমেরিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর এক সম্মেলনে কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্টকরণের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রায় এগারো বছর পূর্বে এই ও. এ. এস সংগঠন কিউবাকে বয়কট করেছিল। এবার এই সংগঠন কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক করার প্রস্তাব নিয়েছে। এই সব প্রচেষ্টার মূলে পেরুর নেতৃত্ব এটা অস্বীকার করা যায় না।

পেরুর বর্তমান সরকার দেশে অনেকগুলো শিল্পকে জাতীয়করণ করেছেন। এবার দেশের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ প্রকল্পটি জাতীয়করণ করা হচ্ছে। পেরু সরকারের এই কাজে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীচক্র আতঙ্কিত। দ্বিতীয়ত, পেরুর সরকার দেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে বেশ কড়াকড়ি করেছেন। পেরু সরকার বিদেশী পুঁজিকে বিনিয়োগ করতে তখনি দেবেন যেখানে স্বদেশী পুঁজির সিংহভাগ থাকবে। তাছাড়া, নানা বাধা নিষেধ আরোপ করেছেন সরকার। পেরু সরকারের এই কাজে চিলির ফ্যাসিস্ত সরকার বেশ অসুবিধায় পড়েছে। সেজন্য, নানা অনুরোধ-উপরোধ করছে পেরু সরকারকে যাতে তারা বিদেশী পুঁজি বিষয়ক ধারার কিছু সংশোধন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চিলির ফ্যাসিস্ত সরকার নিজের দেশে চাকা ভালোভাবেই ঘোরাবার ষড়যন্ত্র করছে। যেমন, আলান্দে সরকার যে কতগুলো সংস্থা জাতীয়করণ করেছিলেন সেগুলো এখন চিলির বর্তমান ফ্যাসিস্ত শাসক বিদেশীদের কাছে বিক্রয় করে দিতে চাইছে। সেজন্য দেশে দেশে উমেদারীও করছে, এমন কি পেরুতেও।

পেরু সরকার কৃষক-শ্রমিকদের জীবনেও কিছুটা আস্থার ভাব ফিরিয়ে এনেছেন কৃষি ও অর্থনীতিতে কিছু প্রগতিমূলক সংস্কার সাধন করে। বিদেশী পুঁজিও কিছু বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অস্বাভাবিক উর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্য এখন আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি সমেত গণতন্ত্রী দলগুলো পেরুর বর্তমান শাসক ভেলাসকো আলভারাদোকে সমর্থন করছে। পেরুতেও সি-আই-এ চেষ্টা করছে সরকার উৎখাতের। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া নানাভাবে তৎপর। তৎপর প্রতিবিপ্লবের শক্তি। সৌভাগ্যের কথা, পেরুর রাষ্ট্রপতি আলভারাদো এই প্রতিবিপ্লবী শক্তি সম্পর্কে কিছুটা সচেতন। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি আলভারাদো বিপ্লবী দেশপ্রেমিক কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এই প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহকে উৎখাতের আহবান জানান। প্রতি বিপ্লবীদের অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশ করে এই প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে উৎখাতের জন্য বলেন। এমন কি তিনি টেলিভিশন দপ্তরে প্রতিবিপ্লবীরা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিপ্লবী দেশপ্রেমিক কমিটি আয়োজিত এক বিশাল বিপ্লবী সমাবেশকে টেলিভিশন ইচ্ছাকৃত ভাবে ছোট করে দেখায়। বলংগেসি স্কোয়ার থেকে সরকারী প্রাসাদ পর্যন্ত এই দীর্ঘ তিন কিলোমিটার অঞ্চল ছিল লোকে লোকারণ্য। পেরুর শ্রমিক কনফেডারেশন, পেরুর

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

কলকাতা আমার কে?

অরিন্দম মিত্র

আমি টপগ্রাফার নই, তবুও কলকাতা সম্পর্কে আমার নিজের কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করে। কলকাতার সব রাস্তা চেনা হয়েছে এমন কথা বলতে পারলে আনন্দ পেতাম। বিশ বছর ধরে মহানগরীর রাজপথ থেকে জনপথে মানুষ খুঁজছি। সন্ধান পেয়েছি অনেক মানুষের। যাদের আজো সন্ধান পেলাম না তাঁরা হলেন সমাজতান্ত্রিককুলের মানুষ। মাঝে মাঝে এক আধজন ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট-মানহাইম-মামফোর্ড আর টি এস এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড হাতড়ে মেট্রোপলিটন মনের খবর লিখলেন। সে মেট্রোপলিটন মনে আমার মনের মাধুরী মেশানো নেই। সে মেট্রোপলিটন মনে সমাজতান্ত্রিকরা প্রাণ সঞ্চারে সচেষ্ট হন, আমি সেই অবসরে অন্যত্র একটু ঘোরাফেরা করি।

কলকাতার প্রতি মমতার প্রশ্নে আমাকে সর্বদাই বিচলিত থাকতে হয়। বিষ্ণু দের "নিজ বাসভূমে পরবাসীর" উপলব্ধিতে আমি অন্তত আস্থাবান। বাঙাল হবার যন্ত্রণাতেই অহরহ পীড়িত হচ্ছি। আক্ষরিক অর্থে ঠিক উদ্বাস্তু না হয়েও আমাকে যাযাবর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। মফঃস্বল শহরের ছেলে। দেশ সেবার তাগিদে সামরিক জীবন, তারপর সেখান থেকে সম্পূর্ণ এক নোতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার আমার ফিরে পাওয়া কৈশোরের শিল্পী জীবন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "এ্যান এ্যাক্টর হ্যাজ নো হোম টাউন"। সেটা যদিও আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল, আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল জীবন ও জীবিকার মেল বন্ধন ঘটাবার জন্য।

কলকাতার সঙ্গে অন্য কোন কারণে সখ্য পাতাইনি। থিয়েটারের প্রতি ভালবাসার টানে টানে কলকাতার সঙ্গে ভাব হল অনেক ছোট বেলায়। নব্বুই মাইল দূরের ঝাটোয়া শহর থেকে স্কুল-কলেজ পালিয়ে কলকাতায় থিয়েটার দেখে গেছি। কেমন যেন মোহাবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম ক্রমশঃ। মোহমুক্ত হল দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় পড়াশুনা করতে গিয়ে। কলকাতার উদ্বাসিক ও সবজান্তা লোকগুলোকে দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদমী—ললিতকলা আকাদমীর চারপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখে বুঝলাম এরা কত লোভী! অথচ কলকাতায় বসে এসব বোঝা যায় না। অনেকে "মূল নীতি" মাটির তলায় লুকিয়ে রেখে লন্ডন মস্কো করে বেড়াচ্ছেন রাতদিন। তাই এতদিনে মনে হচ্ছে ওটাই ঠিক কথা—"ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা"। আমার কাছে কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী নয়, "কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে" এ সুখস্বপ্নও আমি দেখি না। সুনীল গাঙ্গুলীর মত আমার কখনও বলতে ইচ্ছে করে না, "কলকাতা তোমায় আমি সে'কো বিষ খাওয়াবো।" মীরাট থেকে মেটেবরুজের সব রাস্তাই আমার কাছে সমান আদরণীয়। বাইরে থাকবার সময় প্রবাসী বাঙালী অথবা অবাঙালীদের মুখে কলকাতার নিন্দেয় অপমানিত বোধ করেছি, প্রতিবাদ করেছি। এখন ভাবি সে সব অন্যায় করেছি। কলকাতাবাসীর যে অপরাধ প্রবণতা তকে আমি প্রশ্রয় দেবার কে? তাদের বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের (যাদের আমি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি) উদ্বাসিকতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিক জীবনের অনুদারতাকে আমার ঘৃণা করা উচিত, অশ্রদ্ধা করা উচিত। শহরের নিম্নবিত্ত বা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে আরো কাছ থেকে আরো এক যুগ আগে না দেখতে পাওয়ার যন্ত্রণায় আমি পীড়িত হচ্ছি।

অথচ পীড়নটাকে বিলাস বলে মনে হতে পারে। তাই এ বিলাসিতাটুকুও অর্থহীন হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। যখন মনে করি কিছুটা সন্ধ্যতার আলো দেখা এক মফঃস্বলের ছেলে নগরকেন্দ্রিক জীবনের আলোছায়ায় নিজেকে নিঃশেষ করার কথা ভাবে কেন? হয়তো নিঃশেষ নয়, কলকাতা আমার বোধের আলোকে আরো উন্মুখ করার শক্তি ধরে, আমার সীমিত জ্ঞানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে হয়তো আরো তীব্র আলোর ছটা ফেলার ক্ষমতা রাখে। হয়তো আরো কিছু।

সারা ভারতের দৃষ্টি কলকাতায়। কলেজে পড়া মেয়েরা প্রকাশ্য দিবালোকে লেকের ধারে বসে মদ খায়, সেই মেয়েরাই প্রয়োজনে বোমা-পাইপগানকে উপেক্ষা করে রজনীগন্ধা বেলফুলের মালা জড়ায় খোঁপায়। পরিসংখ্যান বলছে পশ্চিমবঙ্গে যৌনরুগীর সংখ্যা পঁচিশ হাজার। তাদের বেশির ভাগই ছাত্র। হয়তো এর বেশির অংকটাই কলকাতার দখলে। পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়েছে এ খবরে আমি চমকে উঠি, বিশেষ করে যখন আমি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের রাস্তা ধরে হাঁটি। সন্ধ্যে বেলায় বিশ বছরের নিচের কচি কচি মেয়েরা নিছক দারিদ্রের চাপে সমস্ত রাস্তা জুড়ে মানুষ শিকারের জন্য ঠাসাঠাসি ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন্ কোন্ কারণে একটা ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েকে বেশ্যা হতে হয় এটা আজকে সমীক্ষা করে জানা দরকার। এবং সমীক্ষা করেই দায়িত্ব আমাদের শেষ হয় না, যদি না তা নির্মূলনের দায়িত্বও সরকার ও সমাজতাত্ত্বিকরা নেন। ডাঃ জ্যোতির্ময় মজুমদার সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, বিয়ের আগে বরকনেকে ডাক্তারি পরীক্ষা করা দরকার। এতে কোন যুবক-যুবতী অপমানিত বোধ করবেন কিনা জানিনা। তবে এটুকু জানি ডাঃ জ্যোতির্ময় মজুমদারের মত অজস্র ডাক্তারবাবু গণোরিয়া সিফিলিসের রোগীকে ভালকরার আগে রোগট যাতে না ছড়ায় তার দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারেন। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থায় ডাক্তারদের দায়িত্ব শুধু বক্তৃতা করা নয়, তাদের কাঁধে আরো কঠিন দায়িত্ব থাকে। সে দায়িত্ব পালনে তাদের কখনই সচেষ্ট হতে দেখিনি আমি।

এই শহরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে মাস্তানের দল। অপছন্দ ছাত্র-ছাত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার খাতা মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এই কলকাতা শহরেই। কফি হাউসে সদ্য কলেজে ঢোকা ছেলে মেয়েরা অনর্গল প্রেমের গল্পই করে, অল্প বর্ষাতেই প্রতি বছর সমস্ত শহর ডুবে যায়, বাসে ট্রামে গরু ভেড়ার মত মহিলা পুরুষ রোজ যাতায়াত করে এবং না চাওয়া অবধি কেউ টিকিট কাটেন না, একবারের বেশি দুবার টিকিট চাইলে কন্ডাক্টারের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হন এমন মানুষের সাক্ষাৎ একমাত্র এ শহরেই পেয়েছি। শিয়ালদহ ষ্টেশনের ক্ষুধার্ত মানুষেরা এখন সারা শহরে ছড়িয়ে গেছে, শহর প্রায়ই নিষ্প্রদীপ থাকছে, বাবুসাহেবদের রান্নাঘরের জঞ্জাল এখন বড়রাস্তা দিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে যাচ্ছে, হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা আর গুনে শেষ করতে পারি না। এ সবের মধ্যেই হাজার হাজার শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী এ শহরে বাস করে নির্বিকার-উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে। তার মধ্যেও দু একজন মৃণাল সেন, রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন আছেন। মৃণালবাবু কাকদ্বীপের কৃষক রমণী অহল্যাকে চিনতে চেষ্টা করেছেন বার বার। আমি রক্ত মাংসের অহল্যাকে চিনিনা। থিয়েটারের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে ধীবর রমণী অহল্যার বাক্যহার বাবুদের চিনি। তারা কিসের এক অজানা আশংকায় অহল্যাকে মঞ্চস্থ করতে ভয় পাচ্ছে আজ। সেই বাবুরা আমার খুব চেনা।

এই শহরেই হাইকোর্টের একজন মারোয়াড়ী সলিসিটারকে জানি যিনি কিঞ্চিৎ খ্যাতি পেয়েছেন হিন্দী থিয়েটারের কল্যাণে। লম্পট ও নিচ চরিত্রের মানুষ। তাকে বেছে বেছে ঘৃণা করিনা আমি। কারণ আরো অনেক বাঙালী সাহেবদের চিনি যাদের মধ্যে কেউ কেউ নগ্নদেহে আলো ফেলে আলোর যাদুকর কেউ কেউ অন্যখাতে খ্যাতিমান—তারাও সকলে সেই মারোয়াড়িটির মতই নিচ। সুতরাং অবাঙালীরাই আমাদের সব কিছু লুণ্ঠন করল এ ধারণায় আমার বিশ্বাস নেই। হৃদয়হীনতায় এবং শয়তানিতে সবাই সমান। এ সবের বাইরেও কিছু হৃদয়বান বাঙালী-অবাঙালী বন্ধুবান্ধবী আছে বলেই এখনও শহরটাকে আমার মৃত মনে হয় না।

১৯১৪ সালে "চতুরঙ্গে" রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "কঠিন কলকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল।" ১৯৭৫-এ আমেরিকান চিত্র পরিচালক কনরাড্ রুক্স্ বলেন "ইট হ্যাজ নো সেকেন্ড"। তার ছবির নায়িকার জন্য সুন্দরী মেয়ের মুখ খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে যদি একদিন সুন্দরী ট্রামে চড়ে তিনি একটা অসুন্দর বস্তির দিকে চলে যান তাহলে জিয়ফ্রে মুরহাউসের মত তাকেও বলতে হবে, "ক্যালকাটা ইজ এ ডেফিনিশন অব্ অবসীনিটি"। সত্যিই তাই। "ক্যালকাটা ইজ দ' কালচারাল ক্যাপিটাল অব্ ইণ্ডিয়া" বলে যাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাঁরা এখনও বোধহয় জানেন না যে এ শহরের প্রায় সমস্ত কালচারের ঝোঁকটাই এখন অবসীনিটি ও পর্নোগ্রাফির দিকে। হিন্দী ও মার্কিনী ফিল্মের সেক্স্ ভায়োলেন্সের প্রভাব আগেই ছিল। আমার চোখের সামনে আমেরিকা থেকে এল মারিয়ুয়ানা, গাঁজা, হাশিশ, এল এস ডি, হেরোয়িন নামক উৎকট সব ড্রাগ্স্। চোখের সামনে সুস্থ সরল সুন্দর ছেলেদের মরে যেতে দেখেছি এর প্রভাবে। সরকার থেকে কড়া নিয়ম করে এর বিক্রী বন্ধ করতে হবে। যেমন করে তারা সেক্স ও ভায়োলেন্সের ছবি বন্ধ করার চেষ্টা হাতে নিয়েছেন। পর্নোগ্রাফি বিক্রী করে লাভ যাদের হচ্ছে তারা চিরকালের জন্য কলকাতার অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী, যুবক যুবতীদের রসাতলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা এ নিয়ে হয়তো চিন্তিত হয়েছেন, কিন্তু সকলের মিলিত চিন্তাতেই এ পাপে পলেস্তারা পড়বে।

প্রায়ই শুনি কলকাতার মানুষেরা বেশি মাত্রায় রাজনীতি সচেতন। আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারে সকলেই সচেতন। আত্মত্যাগের প্রশ্নে প্রায় সকলেই কুণ্ঠিত। শহরের চুয়াত্তরটি নগরাঞ্চলে একাত্তর লক্ষেরও বেশি মানুষ যারা বাস করে তারা সমস্ত পুকুরেই কেবল জল ঢেলে চলেছে। জল সরিয়ে দুধ ঢালার দায়িত্ব নিয়েছেন সি এম পি ও এবং সি এম ডি এ। নাগরিক চেতনাহীন জল ঢালার মানুষেরা সি এম ডি এ-কে গালাগালি করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করছে।

কলকাতা আগের মত মাথা উঁচু করে থাকলে আমার মাথাটাও উঁচু থাকবে মনে করি। যদি সবার সামনে কলকাতার মাথাটা হেঁট হয়ে যায় তাহলে আমি-ই বা আর গর্ব করব কি নিয়ে। নাই বা হল কলকাতা আমার আত্মার আত্মীয়।

কলকাতার বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আর পাঁচটা মানুষের মত মিছিল নগরীতে আমিও শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। পথ চলায় কখনও যদি ক্লান্তি আসে অজস্র কৃষ্ণচূড়া আর বকুলের ছায়ায় দুদণ্ড বিশ্রাম নিয়ে নেব। রোজ রাত্রে স্বপ্ন দেখি কলকাতার ন্যাসান্যাল থিয়েটারের আমি একজন অভিনেতা।

মফঃস্বলের লোকেরা আগের মতই এখনও কলকাতাকে বিদেশ ভাবে। তাই দেশ থেকে মা প্রত্যেক চিঠিতেই লিখছেন, "কলকাতার দিকে একটা বাড়ি দেখ, এখানে আর থাকতে ভাল লাগছে না।" মাকে যে কি লেখা যায় সেটাই এখন ভাবছি।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাসিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা :
৬১, ঝাউ লেন, কলি-১৩

মহারাজ সিতাংশু

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

পূর্বের সুরপুরের প্রজারা হুণরাজা ধেয়ুর নন্দন এবং মহারাজের নায়েব ত্রিলোচনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। মহারাজের অনুগত সামন্তদের নৈপুণ্যে তারা সম্পূর্ণ পরাস্ত। বিশ্বাসঘাতক নিমকহারাম ত্রিলোচনকে প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছানুসারে কোতল করা হয়েছে।

সুরপুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল। মহারাজ সীতাংশুমৌলী খয়ের খাঁর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিলেন। মহারাজের মহামারণ যজ্ঞে সুরপুরের ঘরে ঘরে যে কান্নার রোল উঠেছিল, আজও কান পাতলে তা শোনা যায়। কিংবদন্তি আছে, সুরপুরের আর কোন শস্ত্রসমর্থ জোয়ান ছিল না। ত্রিলোচনের বাড়ীর উপর দিয়ে মহারাজ হাতি চালিয়ে দিয়েছিলেন।

নরোত্তমপুরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খনন কার্য চালাচ্ছেন। ওখান থেকে ঘুরে এসে নাকি আর কেউ ওদিকে যেতে চাইছেন না। বিদগ্ধ নগরীর শত শত নর-নারীর প্রেতাত্মা নাকি আজও মহান রাজাধিরাজ সিতাংশুমৌলী ও খয়ের খাঁকে খুঁজে বেড়ায়।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

ভারতে মাদাম সান ইয়াৎ সেন

শিবাজী ভট্টাচার্য

বাইশে ডিসেম্বর (১৯৫৫) মাদাম সান্ ইয়াৎ সেন এক বিশেষ বিমান যোগে আগ্রা হয়ে বোম্বাইতে এসে পৌঁছান। তেইশে ডিসেম্বর বোম্বাইতে ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘ আয়োজিত এক ভোজসভায় মাদাম বলেন যে, "ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বিভিন্ন দেশে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি কার্যকর করার জন্য চীন ও ভারতের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, শান্তির এলাকা সম্প্রসারিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভূমিকাই হল ভারত ও চীনের মৈত্রীর ভিত্তি। আমাদের সুপ্রাচীন বন্ধুত্ব নতুনভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আমরা একত্রে মানবজাতির লক্ষ্য বিশ্ব প্রগতির দিকে অগ্রসর ইচ্ছি। শান্তি ও প্রগতি আজ আর স্বপ্ন নয়—জনশক্তি আজ শান্তি ও প্রগতির পক্ষে। বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রী—ইহা অপেক্ষা শক্তিশালী, ইহা অপেক্ষা চিরস্থায়ী আর কিছু হতে পারে না। গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত বান্দুং সম্মেলন থেকে জুলাই মাসের জেনেভা সম্মেলনের মধ্যে শান্তির শক্তি সম্প্রসারিত হয়েছে। যুদ্ধের বিপদ কিছুটা কমেছে। (স্বাধীনতা ২৪ ১২ ৫৫) পরের দিন মালাবার হিলের কমলা নেহেরু পার্কে মাদামকে এক নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। সহস্রাধিক নিমন্ত্রিত অতিথি এই সভায় যোগ দেন। ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রের একাধিক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাইয়ের মেয়র শ্রীএন সি পুপালা অভিনন্দন বাণী পাঠের সময় চীনের মুক্তি আন্দোলনে শ্রীমতী সুং এর অবদানের কথা উল্লেখ করেন, চৌপাট্টি এবং মেরিন ড্রাইভের মাঝপথে হাজার হাজার জনতা মাদামকে দেখে, হাত নেড়ে চীন-ভারত মৈত্রীর প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা জানান।

মহারাষ্ট্রের সংযুক্ত নারী সংগঠন, উত্তর বোম্বাই নারী যুক্ত কমিটি দক্ষিণ বোম্বাই নারী যুক্ত কমিটি, বোম্বাই নারী কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং কেরালা মহিলা সমাজ যুক্ত ভাবে এইদিন এক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেন। এই মহিলা সমাবেশে মাদাম এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, "ভারত ও চীনের নারীরা দুনিয়ার ভবিষ্যৎ গঠনে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। আমরা শান্তি চাই, সমৃদ্ধি চাই, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের স্বামী ও সন্তানদের হারাতে চাই না।

পঁচিশে ডিসেম্বর বিকেলে নাগপুর হয়ে কলকাতা আসার পথে নাগপুরের শোন গাঁও বিমান ঘাঁটিতে মাদামকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। চীনা গণ কংগ্রেসের সদস্য মিঃ লিয়াও চ্যাং চিন্ ও চীন ভারত মৈত্রী সঙ্ঘের সহ-সভাপতি মিঃ চ্যান্ হ্যান সেং ও ভারতস্থ চীনের রাষ্ট্রদূত সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারত চীন মৈত্রী সঙ্ঘের তরফ থেকে তাঁকে একটি নাগপুরী শাড়ি ও চীনা ভাষায় অনূদিত রামায়ণ সহ বেশ কিছু বই উপহার দেওয়া হয়। বিমান বন্দরে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে তিনি কলিকাতার পথে যাত্রা করেন। সন্ধ্যেবেলা দমদম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। হাজার হাজার দর্শক সেখানে "মাদাম সুং জিন্দাবাদ" ও "হিন্দী চীনী ভাই ভাই" ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

বিমান ঘাঁটিতে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রায়, উদ্বাস্তু মন্ত্রী রেণুকা রায় ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘের সভাপতি স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, চীনা কনসুলেটের প্রতিনিধি সহ অনেকেরা ফুলের তোড়া ও মালা দিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানান।

সাতাশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতার বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এক সম্বর্ধনা সভায় মাদাম সুং ভারতের নারী সমাজকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "পঞ্চশীলের মহান নীতির পেছনে ভারত ও চীনের প্রায় পঞ্চাশ কোটির মত নারীশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে শান্তি আসবেই। বর্তমান দুনিয়ায় নারীজাতির বিশেষ সমস্যার সঙ্গে বিশ্বে শান্তি রক্ষার সমস্যা অভিন্ন হয়ে গেছে। পঞ্চাশটিরও বেশি মহিলা সমিতি ও গণসংগঠন ইয়ং উইমেনস্ ক্রীশ্চিয়ান এসোসিয়েশন (ওয়াই ডব্লু সি এ) হলে এই সভার আয়োজন করেন।

আলপনা ও পুষ্পসজ্জিত মঞ্চে মাদাম আসন গ্রহণ করলে সমবেত মহিলারা করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। এরপর সিল্কের কাপড়ের উপর লেখা একটি মানপত্র পাঠ করা হয়। মানপত্রে লেখা ছিল, "আপনার জীবন নারী সমাজের কল্যাণ ও সেবায় অনুপ্রাণিত। আপনি দুনিয়ার নারীজাতির আদর্শ। আপনি দেশের অন্যতম নেত্রী শুধু নন, মহাচীনের জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। আপনার জীবনের মহান আদর্শ বিশ্বের নারী সমাজের কর্মধারকে কল্যাণ ও শান্তির পথে চালিত করে। মানপত্রটি শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত (প্রাক্তন বিধান পরিষদের সদস্যা) পাঠ করে শোনান।

রাজ্যের তদানীন্তন পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় এই মহিয়সী অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "চীনের সঙ্গে তাইওয়ানের অন্তর্ভুক্তির দাবিকে আমরা সমর্থন করি। অনুরূপভাবে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে গোয়ার ভারতঠান্তির দাবিকে আপনারা সমর্থন করেন।"

মাদাম্ তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে "একতাই শক্তি" এই ঘোষণা করে "ভারত ও চীনের পঞ্চাশ কোটি নারী জাতির ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক এই ধ্বনি তোলেন, সভাস্থলে মাদামকে বহুবিধ পটচিত্র ও লোকশিল্প উপহার দেওয়া হয়।

তিনদিন কলিকাতায় অবস্থানের পর আঠাশে ডিসেম্বর সকাল দশটায় মাদাম সুং দমদম থেকে বিমানে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হন।

ভারত-চীন মৈত্রীর প্রতীক হিসেবে মাদাম সান্ ইয়াৎ সেনের ঐতিহাসিক ভারত সফরের পর গত বিশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঘটেছে একের পর এক বিরাট পরিবর্তন, দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় উনষাট সালে প্রতিক্রিয়াশীল তিব্বতীয়রা তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তিব্বতের জনগণ ও সমাজতান্ত্রিক চীন সরকার দৃঢ় হস্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা চীন বিপ্লবের পর থেকেই চীনকে একঘরে কোণঠাসা করে জাতিসঙ্ঘে তার ন্যায্য আসন লাভের থেকে এতদিন বঞ্চিত করে রেখেছিল।

কিন্তু আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশঃই পিছু হঠছে। ডলার সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য আমেরিকার ধনকুবেরদের প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট নিক্সন গত বাহাত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারী পিকিংয়ে যান। সত্তর কোটি লোকের বিশাল তম বাজারে বাণিজ্য করার সুবিধে ভিক্ষে চান। এ ঘটনার কিছুদিন আগেই গণচীন জাতিসঙ্ঘে বিশাল ভোটের সমর্থনে তার ন্যায্য আসন লাভ করে। আন্তর্জাতিক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের দু-চীন নীতি পর্যুদস্ত হয়।

"কখনও বসন হলে ছিন্ন
যতনে সেলাই তারে করা যায়
জাফর, হৃদয় হলে ভিন্ন
ভালা বুক জুড়িবেনা কভু হায়!"
শেষ মোগল সম্রাট কবি—আবু জাফর বাহাদুর শাহের গজল।
অনবদ্য কাব্যরূপ—**মহাকাল**
(পরবর্তী বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন)

একটি চাঞ্চল্যকর মামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিদ্যা জৈন হত্যা মামলায় অনুমিত ব্যক্তিরাই অবশেষে অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। বিদ্যা জৈনের স্বামী দিল্লীর বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডঃ নরেন্দ্র সিং জৈন ও তার প্রেয়সী চন্দ্রেশ শর্মা এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামী। বস্তুতঃ এই প্রেমিক যুগলের গোপন পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রেই বিদ্যার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের চৌঠা ডিসেম্বর এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। তারপর থেকেই মামলা চলছিল। সম্প্রতি দিল্লীর জেলা ও সেসান কোর্টের বিচারক কে এস সিধু বিচারের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করে জৈন ও চন্দ্রেশ সহ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আরও ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারকের এই চূড়ান্ত নির্দেশ শোনার পর প্রেমিকযুগল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কিঞ্চিৎ অশ্রুমোচন করে।

বিদ্যা চন্দ্রেশ আর ডঃ জৈনের মধ্যে প্রেম ঈর্ষার ত্রিমুখী যুদ্ধের পরিণতিই এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। ডঃ জৈন স্ত্রী বিদ্যার নজর এড়িয়ে বহুদিন ধরেই চন্দ্রেশের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছিলেন। যদিও দুটি সন্তানের জনক ছিলেন ডঃ জৈন।

অপরূপা সুন্দরী বিদ্যা কিছুদিনের মধ্যেই এই গোপন প্রেমলীলার উৎস আবিষ্কার করতে পেরেছিল। সেই থেকেই জেগে ওঠে পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস।

বিচারক কে এস সিধু তাঁর রায়ে বলেছেন যে জৈন ও চন্দ্রেশের এই কীর্তিকলাপ বহুদিন ধরেই চলছিল। জৈনকে বিয়ে করার ব্যাপারে চন্দ্রেশ উদগ্র বাসনাও পোষণ করছিল। কিন্তু মাঝখানে বাধা স্বরূপ ছিল বিদ্যা। আর সেই জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল হত্যার। জানা গেছে, জৈন ও চন্দ্রেশ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় ষাট দশকের শেষের দিকে।

চন্দ্রেশের জীবনে এটা তার প্রথম প্রেম নয়। সে প্রথম বিধবার বেশ পরেছিল ষাট সালে। তখন তার বয়েস মাত্র কুড়ি। ঠিক তার চার বছর পরেই সে বিয়ে করে সামরিক বিভাগের এক ক্যাপ্টেনকে। সে বিয়েও ভেঙে যায়। আইনগত বিচ্ছেদের জন্য ওরা কোর্টে যে আবেদন করেছিলেন তার রায় শোনার মতো চন্দ্রেশের তখন সময় ছিল না। জৈনের সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে সে ছুটে গিয়েছিল শ্রীনগরে। সেখানেই ওদের প্রেম তুঙ্গে ওঠে।

বিচারক শ্রীসিধু আরও বলেছেন : জৈনের সংস্পর্শে এসে চন্দ্রেশ তার ভাগ্যের এই চূড়ান্ত উত্তরণকে ঈশ্বরের দান বলে মনে করতে থাকে। তার মনে হতে থাকে, জৈনের পক্ষে স্ত্রী হিসেবে বিদ্যা মোটেই উপযুক্ত নয়। বিদ্যা স্বামীর এই স্খলন দেখে নিজের মানসিকতা স্থির রাখতে পারে নি। সে-ও "বন্ধুত্বের" বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে জনৈক পি কে গুপ্তর সঙ্গে। জৈনের আবার এই বন্ধুত্ব পছন্দ ছিল না।

হত্যাকাণ্ডের সেই সন্ধ্যায় ডঃ জৈন বাইরে থেকে বিদ্যাকে টেলিফোনে জানায়, "তুমি তৈরী হয়ে নাও, আমি তোমাকে নিয়ে বেরোব।" এই টেলিফোন প্রথম ধরেছিল সেই পি এন গুপ্ত। বলা বাহুল্য, হত্যার পরিকল্পনায় এই টেলিফোনটি ছিল একটি জরুরী ঘটনা। মামলা চলাকালীন জানা যায়, বিদ্যাও গুপ্তর সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে কাশ্মীর যায়, এবং সেখানে উভয়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হয়। উভয় পক্ষে এই ব্যাপার স্যাপারের সঙ্গে জৈন ও বিদ্যার লোক দেখানো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিকই অব্যাহত ছিল।

জানা যায় যে, সরাসরি হত্যা ছাড়াও, তার আগে বিদ্যাকে পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছিল। এ ব্যাপারে জৈনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তার পুত্রের জনৈক কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক।

এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে, তা বিস্ময়ের। চন্দ্রেশ হত্যার জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। কারণ সিং নামে একজন গুণ্ডা হত্যাকাণ্ডটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য এগারো হাজার দুশো টাকা পকেটস্থ করে এবং ঘটনার দি অনুপস্থিত হয়। পরে রাকেশ কৌশিক নামে এক অভিযুক্ত ব্যক্তি রামকিষণ নামে একজনকে ধরে আনে। তাকে জৈনের বাড়ীর চাকর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সেও এ কাজে কৃতার্থ হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের মূলে নায়ক ছিল সামরিক বিভাগের একজন হাবিলদার রাকেশ কৌশিক। রাকেশ ভগীরথ, কল্যাণ গুপ্ত, উজ্জগর সিং এবং কার্তার সিং নামে চার ব্যক্তিকে পঁচিশ হাজার টাকার বিনিময়ে রাজস্থানের এক গ্রাম থেকে ধরে আনে। বিদ্যাকে হত্যা করে উজ্জগর। কাজ শেষ করে বিদ্যার দেহটি কাছাকাছি নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে। তার দেহে চোদ্দবার ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। বিদ্যার ক্ষত বিক্ষত দেহটি বাড়ীর সামনে জৈনের গাড়ীর পাশে পড়েছিল। কার্তার সিং এবং জৈন ভয়াবহ রক্তাক্ত দেহটির সামনে কৃত্রিম বিস্ময়ের চোখ নিয়ে দু একটি শোকাতুর মন্তব্য করেছিল মাত্র।

পেরু

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল এর বড় উদ্যোক্তা। কিন্তু টেলিভিশন ইচ্ছাকৃত ভাবে এদের ছবিতে দেখায়নি, এমন কি রাষ্ট্রপতি আলভারেদোকে পেছন থেকে এমন ভাবে দেখিয়েছে যেন তিনি শূন্যে হাত আন্দোলিত করছেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক নবভারত ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পন

১৮শ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২২শে আগস্ট ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে পালাবদল

বাংলাদেশে আকস্মিক সামরিক অভ্যুত্থান এবং সপরিবারে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা যেমন সকলকে বিস্মিত করেছে, তেমনি মর্মাহতও। বাংলাদেশের জনসাধা-? রণের এই অভ্যুত্থান এবং এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তেমন কিছু সংবাদ জানা যাচ্ছে না। দু এক জায়গায় সংঘর্ষ চলছে বলে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে।

এটা পরিষ্কার যে, সামরিক বাহিনী এই অভ্যুত্থানে সহায়তা করেছে। খবরে প্রকাশ, সামরিক বাহিনীর একাংশ অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু খোন্দকার মুস্তাক আহমদের রাষ্ট্রপতিত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। যারা বাদ গেছেন তারা শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বলে পরিচিত।

অর্থাৎ বাংলাদেশে অভ্যুত্থান ও নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে রাষ্ট্রীয় চেহারায় মৌল কোন পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু শেখ মুজিব অনুপস্থিত। যিনি আর কোনদিন ফিরবেন না। যিনি বিগত দীর্ঘ কয়েক বছর, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ববঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে বাংলা দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয় অধিকার করে নিয়েছিলেন।

এই পশ্চিমবঙ্গে, এই কলকাতায় বসে বলা মুস্কিল শেখ সাহেব গত কয়েক বছরে সেই জনপ্রিয়তা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশে হারিয়েছিলেন কিনা। তাহলেও একথা সকলেরই বোধগম্য যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার জনপ্রিয়তার অনুকূল ছিল না। সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থা একেবারেই সঙ্গীন। শেখ সাহেবের ঘনিষ্ট আত্মীয়দের দুর্নীতি ও স্বৈরাচারে সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তার ডান হাত জি. জি এম অর্থাৎ গাজী গোলাম মোস্তাফা ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছিল, এমন কি সামরিক বাহিনীর অফিসারও তার নারকীয় অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি। অতএব সামরিক বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অসাধারণ আত্মসন্তোষ নিয়ে ভেবেছিলেন তার জনপ্রিয়তা অম্লান, তার আসন বাংলাদেশের তাবৎ জনসাধারণের হৃদয়ে অটুট।

শেখ মুজিবের পক্ষে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, তিনি তার শত্রুপক্ষ ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিহত হলেন তারই অনুগামীদের হাতে। ইতিহাস বড়ই নির্মম।

ভাড়া বৃদ্ধি ও যাত্রীদের মনোভাব

(দর্পণের প্রতিনিধি)

গত পয়লা আগস্ট থেকে ট্রাম বাসের ভাড়া বেড়েছে। দশ পয়সার ভাড়া বেড়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ কুড়ি পয়সা হয়েছে। চুয়াত্তরের পয়লা ডিসেম্বর থেকে যখন এই ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তখন সাধারণ যাত্রীরা বাড়তি ভাড়া দিতে গররাজি ছিলেন। সেই সময়ে দিন কতক কনডাকটর আর যাত্রীদের মধ্যে বচসা চলছিল। অবশেষে ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কনডাকটররা চুপ হয়ে গেছে। যাত্রীরা পুরনো ভাড়ার হিসেবে যা দিয়েছে, তাতে ওরা আপত্তি করে নি। তখন অধিকাংশ যাত্রীদেরই দাবী ছিল : বাসের সংখ্যা বাড়ান, সার্ভিস ঠিক সময়মত চালু করুন—বাড়তি ভাড়া দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

ইতিমধ্যে কলকাতায় মিনিবাসের সংখ্যা কিছু বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি রুটে ডিলাক্স বাস চালু হয়েছে। কিন্তু যে বাস-

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সঙ্গীত-অজ্ঞের আস্ফালন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

আনন্দবাজারের সন্তোষকুমার ঘোষ বর্তমানে বঙ্গসংস্কৃতির "পরম পিতা ব্রহ্মা" সেজে বসেছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, চিত্রাঙ্কন, চলচ্চিত্র ছাড়াও ঘোষ মহাশয় সম্প্রতি সঙ্গীত সম্পর্কেও বাণীদান করছেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এমন কি, এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কেও এক হাত নিয়েছেন। সর্বোপরি, প্রভুসেবার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বামপন্থীদের ঠুকতে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বসে লিখে দিলেন, "বিড়ি বিক্রেতার রুচি নিয়ে বামদলবদ্ধতার দোহাই পেড়ে অধুনা যারা এ গানে কর্ণপাত করছেন তাদের কথা তোলাই বৃথা।" এ গান অর্থ রবীন্দ্রসঙ্গীত। সন্তোষবাবু হয়তো ভেবেছিলেন যে, কেউ তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু, দেখা গেল তারই এককালের সহকর্মী একজন বামপন্থী সাংবাদিক ও গণসঙ্গীতকার কঠোর ভাষায় সন্তোষ ঘোষকে জবাব দিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত তো দূরের কথা, সঙ্গীতের অ আ ক খ না জেনেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা বিচারের অধিকার সন্তোষবাবু কোথায় পেলেন। ব্যাস। নাটক জমে উঠলো।

সাতাশে আষাঢ়, তেরোশ বিরাশি তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার সন্তোষ ঘোষের কলমে "কিছু কথা কিছু কাহিনী" শীর্ষক উত্তর সম্পাদকীয় রচনায় সন্তোষবাবু "থলে থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে" প্রবাদ অনুসরণ করে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে পূর্বোক্ত লেখককে সরাসরি "শ,য়োরের বাচ্চা" বলে বসলেন। সন্তোষ ঘোষ লিখেছেন, "শূকর শূকরীর প্রসব বেদনার শুধু আর্তনাদ শুনেই বিদায় নিয়েছিলেন কবি জীবনানন্দ। প্রসবের অসংখ্য ফসলে আর ফলে আজ চরাচর ছেয়ে গেছে এই রূঢ় সত্যটা দেখে যাওয়ার পোড়াকপাল তার হয় নি।" মনে হয় অতিরিক্ত কারণ ক্রিয়ার বশেই ঘোষ মহাশয় খিস্তিটি করে বসেছেন। মদো মাতালদের কথায় দোষ ধরতে নেই। নেশার ঘোরে কখনও ওরা রাজা, কখনও বা প্রজা, কারণক্রিয়ার ফলে অনেক সময় ওরা জননীর মুখেও বারবণিতার ছায়াপাত দেখতে পায়।

এহেন সন্তোষবাবু পূর্বোক্ত

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

নারীবর্ষে নারীর অসম্মান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণামত দুনিয়াজুড়ে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের উৎসব চলছে। পশ্চিম বাংলাতে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়েছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সকালে মেয়েদের দুপুরে ছেলেদের একই বাড়িতে স্কুল চালানোয় নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে ছাত্রীদের অসুবিধা দূর করার জন্য। এসব সত্বেও সেদিন যা দেখলাম তাতে আশ্চর্য হতে হয়।

ঘটনাটি ঘটে শনিবার নয়ই আগস্ট দেশজুড়ে তখন শহীদ দিবস পালন করা হচ্ছে। ডাউন শান্তিপুর লোকাল বেলা দুটো নাগাদ উল্টাডাঙ্গা স্টেশন ছেড়ে ছাইগাদার কাছে এসে থামতে জনৈক ভদ্রমহিলা চালের পুটলি নিয়ে নামামাত্রই পেছনের কামরা থেকে এন ভি এফের দুজন কর্মী লাফিয়ে তাঁর পেছন ছুটতে লাগলেন। অবশেষে তাঁকে ধরতে পেরে শুধু শুধু চালের পুটলি কেড়ে নেওয়াই নয়, বিবস্ত্রা করে লাইনের উপর শুইয়ে দিয়ে বড় বড় খোয়ার উপর দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে টানতে লাগলেন। এদিকে এক নম্বর লাইনে আপে গাড়ি এসে পড়ায় বেগতিক বুঝে তাকে ঐখানে ফেলেই এন ভি এফের ঐ দুজন শেয়ালদা অভিমুখে দৌড়ে পালিয়ে যান।

সরকারী আদেশ ছিল "বাধ্যতামূলক সঞ্চয়" সম্পর্কে। কিন্তু উনি "বাধ্যতামূলক" শব্দটা দেখেই ভেবেছিলেন বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ। [শঙ্করস উইকলীর সৌজন্যে]

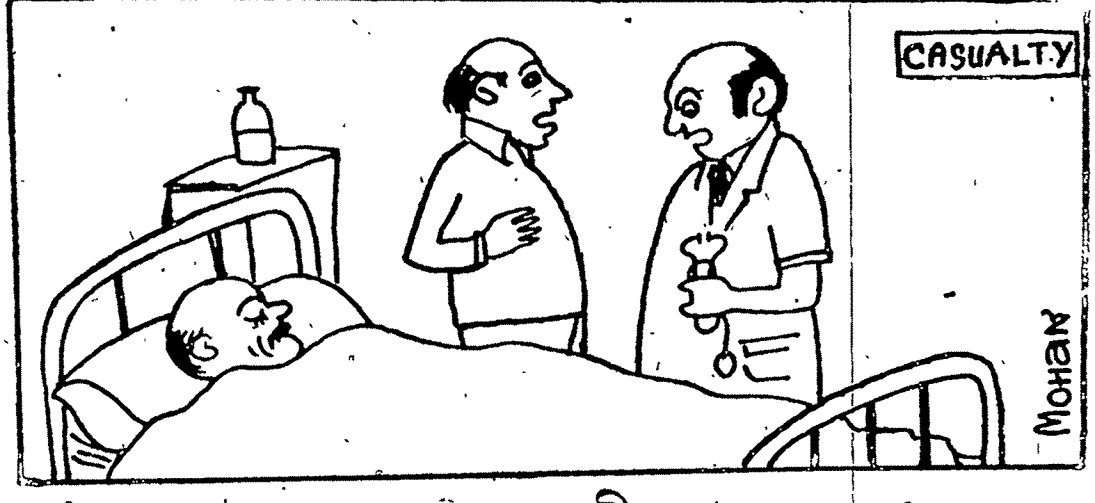

গরীব রোগী ও 'মহানুভব' ডাক্তার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বারুইপাড়ায় থাকে সবিতা রানী দাস। বয়স আঠার। শৈশবেই পিতৃহারা অভিভাবিকা তার বিধবা মা। গ্রামের একান্তই গরীব মানুষ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় এদের সাংসারিক অবস্থা। বেশ কয়েক বছর থেকে ধীরে ধীরে তার শ্রবণশক্তি কমে আসছিল। এখন প্রায় শুনতেই পায়না। চিকিৎসার আশায় এ হাসপাতাল ও হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে যায় রিষড়া সেবাসদনে। শুনেছিল ওখানে অনেক বিশেষজ্ঞ আসেন, বিনা পারিশ্রমিকে রুগীদের দেখেন, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং "সাক্সিপশন" দেন। গত বছর দোসরা ডিসেম্বর পঞ্চাশ পয়সার আউটডোর কুপন করিয়ে (নাম্বার ১০৮৯৯ এবং ১০৯০০) সবিতা ওখানকার ই এন টি সার্জেন্ট ডাঃ শঙ্কর গুপ্ত, এম এসকে দেখায়।

সবিতার আউটডোর টিকিট নাম্বার—ই এন টি ডিপার্টমেন্ট, ১২৩০। ডাঃ শংকর গুপ্ত তাকে দেখলেন, বিনা পারিশ্রমিকে তাকে উপদেশও দিলেন—"to attend chamber at Chabighar more, G. T. Road, Barabazar, Chandannagar Monday—Friday 6-30 P. M.—8 P. M. Charge Rs 25/-." স্বাভাবিক ভাবেই পঁচিশ টাকা চার্জ দিয়ে সবিতার পক্ষে ডাঃ গুপ্তকে আর দেখানো সম্ভব হয়নি। ডাঃ শংকর গুপ্তের মতো এমনি অনেক চিকিৎসকই বেষড়া সেবাসদনের মতো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই এমনি এক একটি চেম্বার আছে। এই সেবামূলক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে হাজিরা দিয়ে তাঁরা চিকিৎসার জন্য রোগী সংগ্রহ করেন, রোগীদের কানে কানে তাঁদের চেম্বারে দেখা করার জন্য নির্দেশ দেন। তবে ডাঃ শংকর গুপ্ত এদিক থেকে অনেক সৎ ও নিষ্ঠাবান। তিনি আউটডোর টিকিটের কোণাতেই তাঁর হাজির হওয়ার জন্য উপদেশ লিখে দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি, দ্বিধাবোধ করেন নি তাঁর চার্জ যে পঁচিশ টাকা সেটা লিখে দিতেও। সবিতার মতো এদেশের শত সহস্র গরীব রোগীরা এই সব "মহানুভব" ডাক্তারদের কি বলবেন?

একটি অবিস্মরণীয় আন্তর্জাতিক ইস্তাহার

[প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তে যারা সেই যুদ্ধ করেছিলেন এমন কিছু ফরাসী, জার্মান, অষ্ট্রীয়, হাঙ্গেরীয় ও ইংরেজ নাগরিক বারবুস, রোলাঁ হর্জ্কপ্স ও নিকোলাইএর নেতৃত্বে একটি যুদ্ধ বিরোধী সংঘ গঠন করেন। সংঘের নাম : ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ ক্লারাইট (ক্লার্তে)। ঠিকানা : পোস্ট বক্স ৮৬৬ মঁ ব্লাঁ, জেনিভা, সুইৎজারল্যাণ্ড।

I Will Not Rest গ্রন্থে রোঁলা ক্লার্তে প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখ করেছেন। এই ক্লার্তে গ্রুপ পনেরো দফা সম্বলিত একটি ইস্তেহার প্রচার করেন। তখনও ফ্যাসীবাদ বিশ্বের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন নয়। তবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের অস্থির ও জটিল পরিস্থিতিতে ফ্যাসীবাদের অভ্যুত্থানের শর্তগুলি রচিত হচ্ছিল, ইস্তেহারটি এই শটভূমিতে রচিত। বহু মনীষীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

এই দলিলটি দেশবরণ্য বিপিনচন্দ্র পালের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পাল মহাশয়ের সূত্রে পেয়েছি। বিপিনচন্দ্রের পুরনো নথিপত্রের ফাইলে ছিল। জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বক্তব্য প্রকাশ, বিপিনচন্দ্র তৎ-প্রদত্ত এক ভাষণে (কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা, বারোই ডিসেম্বর ১৯১৯) ইস্তেহারটির দফাওয়ারি উল্লেখ করেন। তিনি এটি পান শিকাগোর "ইউনিটি" পত্রিকা থেকে। যতদূর জানা আছে—বাঙলায় এই ইস্তেহার ইতিপূর্বে প্রচারিত হয়নি।

সংগ্রাহক ও অনুমাদক]

(এক)] আমাদের সমাজব্যবস্থাটাই ভুল। এই ব্যবস্থার পরিণাম স্বল্প সংখ্যকের সুবিধা, স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়ন এবং হত্যা। (দুই) অদ্যাবধি বেশির ভাগ মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখা হয়েছে। পরম্পরাগত কুসংস্কারের বশে, মুষ্টিমেয়র খামখেয়াল চরিতার্থ করতে অধিকাংশকে পেষণ ও জবাই করা হয়। সমস্ত শক্তির আধারের চেয়েও অজ্ঞতার দাপট হয়ে উঠেছে অনেক বেশী। বর্তমান সমাজের মোটা কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে অসঙ্গতির ওপর ভর দিয়ে। (তিন) ভুল থেকে ভুলেরই জন্ম, প্রগতি থেকে প্রগতির। আধা-মিথ্যার পরিণাম আরও খারাপ। যতক্ষণ সবকিছু পাল্টানো না হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই বদলানো শম্ভব নয়। (চার) ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থার মৌল নীতিগুলি সরল। মহৎ ভাবুক, মহৎ নীতিবিদ; সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারা চিরকালই উক্ত মৌলনীতির প্রশ্নে এক মত। (পাঁচ) আদর্শের মতোই ক্ষমতাও সবার আয়ত্তে থাকা চাই। দৈহিক বা মানসিক যে প্রকারেই হক, একমাত্র শ্রমই সম্মানীয়। এক-মাত্র শ্রমেরই পুরস্কৃত হওয়া উচিত। মুনাফাবাজী গরিষ্ঠ সংখ্যকের বিরুদ্ধে অপরাধ, উত্তরাধিকার চৌর্যের সামিল। (ছয়) সকল মানুষকে হুবহু একই রকম সামাজিক সুযোগ সুবিধা দেওয়াতেই সামোর প্রকাশ। শ্রেণী সমূহের বিলোপসাধনই শ্রেণী সংগ্রামের লক্ষ্য। (সাত স্ত্রী-পুরুষ ভেদে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ করা যায় না। (আট) বিশ্বজনীন মানবহিতের সোপান হিসেবে রাষ্ট্রবিশেষের কল্যাণ সাধন মহৎকর্ম, কিন্তু নিছক সেখানেই ছেদ টানাটা হবে অপরাধ, (নয়) যে কোন প্রস্তুতিই যাবতীয় যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে। আঞ্চলিক সীমানা ও আর্থনীতিক বিধিনিষেধগুলি উপর্যপরি ভুল পথে নিয়ে চলে। (দশ) পৃথিবীতে রকমারী ব্যক্তিস্বার্থ থাকলেও সার্বজনীন মঙ্গলের স্বরূপ এক। যেহেতু ন্যায় এবং নীতি—এ দুটি সর্বমানবিক সুতরাং কেউ বহিরাগত নয়। (এগারো) আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনসমষ্টির অভ্যুত্থানের ফলে অধুনা খ্রীষ্টীয় যুগের চেয়েও পবিত্রতর ও মহত্তর এক নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। (বারো) সব রকম প্রগতির গোড়ার কথা চিন্তা। দুনিয়ার অগ্রগতির অভিপ্রায়ে মননশীল ব্যক্তিদের উচিত আত্মোৎসর্গ করা। (তেরো) রক্ষণশীলেরা আসলে স্থিতাবস্থারই ঢাক পেটায়। (চোদ্দ) রাজনৈতিক ধর্মঘট সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। এটাই হচ্ছে বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যবর্তী শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। (পনেরো) ক্ষমতাসীনেরাই বিপ্লবের কারণ। বিপ্লবকে রক্তাক্ত করে তোলে প্রতিবিপ্লবীরা। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত তারা নন, পক্ষান্তরে দমনকারীরাই যে কোন ধরণের যুদ্ধের জন্য দায়ী—স্বাক্ষরকারী : আঁরি বারবুস, রোমাঁ রোলাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস, নর্মান আঞ্জেল, এলেন কো, জর্জ ব্রান্ডেজ, আন্দ্রিয়া লজকো, জর্জ বার্ণার্ডশ, এইচ জি ওয়েলস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হর্জ্কপ, নিকোলাই, সেলমা লাগের ল্যাফ।

[অনুবাদ / প্রবীর সেন। ইশ্তিহারটি "পরিচয়" পত্রিকার ফ্যাসী-বিরোধী সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

বাসযাত্রীদের মনোভাব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গুলিতে শহরাঞ্চলের নব্বই শতাংশ মানুষ যাতায়াত করেন সে বাসের সংখ্যা বাড়ে নি। ডিলাক্স ও মিনিবাসের সঙ্গে সাধারণ বাসগুলির ভাড়া আকাশপাতাল ফারাক। তা সত্ত্বেও বাস ট্রাম ভাড়ার বৃদ্ধির প্রশ্নে এবারে গত বছরের চেহারা ফুটে ওঠে নি। বরং ঠিক উল্টো। সবাই নীরব নিস্তব্ধ। গাদাগাদি বাসের মধ্যে ঘর্মাক্ত দাঁড়িয়ে আঁটোসাঁটো ভঙ্গীতে ঠিক যে যার ভাড়াটি বের করে দিয়েছেন। কনডাক্টর চাইবার আগেই যাত্রীরা বাড়তি পয়সা নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যারা পুরনো দিনের চেহারায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, তাদের জন্য পুলিশী সতর্কতার ত্রুটি হয়নি। বাসের কনডাক্টরদেরও এবার একটু খুশী খুশী ভাব। দেখি বাছাধন ভাড়াটা বলে অনেক যাত্রীকে ওরা প্রথম দিনেই সম্বোধন করেছে। কেউ কেউ এই অস্বাভাবিক সম্বোধনে ক্ষেপে গেছেন কিন্তু তেমন কিছু বলেন নি। শুধু নির্বিঘ্নে নির্ঝঞ্ঝাটে ভাড়া আদায় করা যাচ্ছে এই জন্যেই কি কনডাক্টররা খুশী? এ নিয়ে তাদের আখেরে কি সুবিধে হচ্ছে জানিনা। হয়ত বাড়তি কমিশন কিছু মিলতে পারে, কিন্তু কত? সরকারী বাসের ক্ষেত্রে অন্ততঃ কনডাক্টরদের বাড়তি প্রাপ্য ঘটছেনা।

তবে পরিবহনমন্ত্রী জ্ঞান সিং সোহনপাল খুশী হয়েছেন। তিনি বাড়তি ভাড়া আদায়ের সাফল্য দেখে কনডাক্টার ও যাত্রীদের একযোগে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভাড়া বাড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি হিসেব কষে বলে দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় পরিবহনের আয় শতকরা ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নীরবতার যদি ভাষা থাকে, তবে ভাড়া বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রীদের কিছু বলার ছিল। যারাই বাসযাত্রী তারাই জানেন তাদের পরস্পরের বক্তব্য। সাধারণ মানুষের আয় বাড়েনি, জিনিসপত্রের মূল্যও উর্ধগতি এ অবস্থায় বাড়তি ভাড়া না মেনে নেওয়াই স্বাভাবিক।

বাড়তি ভাড়া চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আটা ইয়ারকি দিয়ে বোঝাকে অনেকে হালকা করে নিতে চেয়েছেন। কিন্তু একটা চাপা অসন্তোষ রয়েই গেছে।

পয়লা আগস্ট। বেলা দশটার সময় যাত্রী ছিলাম তিরিশ মি বাসে জনৈক মহিলা তার মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতে যাচ্ছিলেন। বাড়তি ভাড়া দেবেন না বলে কনডাক্টরের সঙ্গে তর্ক শুরু করেছেন। তার বক্তব্য : মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ও নিয়ে আসার জন্য এতদিন চল্লিশ পয়সা খরচ হত। ভাড়া বেড়ে গিয়ে তা হল প্রায় এক টাকা। ছেলে পুলেকে শেষে স্কুলে পাঠানোও বন্ধ করতে হবে? দূরপাল্লার যাত্রীদের কথা ছেড়ে দিলেও নিকটতম গন্তব্যের যাত্রীদের বাজেট বেড়ে গেল দ্বিগুণ।

ক্ষিপ্ত ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রায় কোন যাত্রীই গলা মেলান নি, কিন্তু ঐ বাসেই অনুরূপ সমস্যার মুখোমুখি যাত্রীর সংখ্যা নিশ্চয়ই কম ছিলনা। কনডাক্টর মহিলার আপত্তি শোনে নি, গম্ভীর গলায় শুধু বলেছিল : গলাবাজী করে লাভ নেই দিদি, সময় অল্প নয় পয়সাটা বার করুন। পেছনের সিট থেকে কে একজন কনডাক্টারের উদ্দেশে মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন : ভাড়া নিচ্ছেন নিন; ইয়ে হয়েছে বলে কি মনের কপাজাও খুলে বলতে দেবেন না? জবাবে কনডাক্টরের লঘু পরিহাস : মনের কথা মনের মানুষের কাছে গিয়ে বলুন না! বাসে কেন? গোটা বাসটা ভক্‌ভকানো হাসিতে দুলে উঠল। নিমেষেই মিলিয়ে গেল বাড়তি ভাড়ার চাপা অসন্তোষ। কিন্তু সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল কি?

আস্ফালন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লেখকের সঙ্গীতের অ আ ক খ না জেনে সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনার অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলবার সাহস পান নি যে ঘোষ মহাশয় সঙ্গীত সম্পর্কে আদৌ কিছু জানেন। বরং, তিনি শিশুসুলভ যুক্তি প্রয়োগ করে বলেছেন, "বটেইতো যুক্তিটি খাঁটি হলে ফুটবল নিয়ে লেখার হক থাকত খালি চুনীবাবু কিংবা অনুরূপ কোন খেলোয়াড়বাবুর।" আমি সন্তোষবাবু এবং পূর্বোক্ত লেখকের এতদসম্পর্কিত সব লেখাই পড়েছি। প্রতিবাদী লেখক কোথাও বলেননি যে, সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গায়ক হতে হবে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে, সঙ্গীত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন না করে গানের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করা সম্ভব নয়। অনুরূপ ক্রীড়া সমালোচককে যে খেলোয়াড় হতে হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু খেলা তাকে বুঝতে হবে। ফলে সন্তোষবাবু যখন যুক্তি দিয়ে পূর্বোক্ত লেখকের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে পারেননি তখনই তাকে খিস্তির সাহায্য নিতে হয়েছে। নইলে একজন প্রতিবাদী লেখককে কোন সুস্থ মানুষ "শুয়োরের বাচ্চা" বলতে পারেনা। এই অপরাধের যন্ত্রণা ভোগের ইত অনুভূতি সন্তোষবাবুর নেই। সেই যন্ত্রণা ভোগ করবেন তার জননী, তার সহধর্মিনী, পুত্র এবং স্বামীর অপরাধের জন্য আর এক মানবীর কাছে মনে মার্জনা ভিক্ষা করে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করবেন এই দুই নারী। হায় সন্তোষকুমার ঘোষ!

সাহিত্য সেমিনার প্রসঙ্গে

তপোবিজয় ঘোষ আমার জবাব দিয়ে বলেছেন যে তিনি নাকি ঐ সভায় সুধীবাবুর সপক্ষে সোচ্চার ছিলেন এবং সভায় উপস্থিত প্রত্যেকেই নাকি ঐ সভায় সুধীবাবুর লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তপোবিজয়বাবু এ বিষয়েও নাকি নিঃসন্দেহ যে, আমি আদৌ সে সভায় উপস্থিত ছিলাম না। নথিপত্র হাজির করে তা প্রমাণ করার প্রয়োজনও আমি অনুভব করছি না, প্রশ্ন শুধু : তপোবিজয়বাবু কি সত্য কথা বলছেন?

সুধী প্রধানের সেদিনের বক্তব্যের গোটাটাই ইতিমধ্যে প্রবন্ধাকারে পত্রান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। এটা পড়তে বড়জোর পনেরো মিনিট লাগতো। অথচ, সেদিন সুধীবাবুর গোটা প্রবন্ধ পড়া উচিত কি উচিত নয় সেই সম্পর্কে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে ছয়জন বক্তা খুব কম করেও বারো মিনিট সময় নিয়েছেন। অতএব, সময়ের অজুহাতে বক্তব্য সংক্ষিপ্তকরণের দাবীটা কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়? বন্ধুবর ধনঞ্জয় দাশ সময়ের অজুহাত তুলে এবং তপোবিজয়বাবুদের বক্তৃতার নাম করে সুধী প্রধানের বক্তব্যে বাধা দিলেও তিনি কি তপোবিজয়বাবুদের বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন? ছিলেন না। কাজ হাসিল করে চলে গেছেন। অর্থাৎ, ধনঞ্জয়বাবুদের সাহিত চিন্তা বিরোধী কোন বক্তব্যই তারা বরদাস্ত করতে রাজী নন বলেই তপোবিজয়বাবুদের বক্তৃতার নাম করে সময়ের অজুহাত তোলা হয়েছিল। তপোবিজয়বাবুরা সেই ফাঁদে অত্যন্ত সরল মনে পা দিয়ে বসেছেন। এখানেই আমার আপত্তি এবং সেই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম। আমি নির্দ্বিধচিত্তে বলছি, তপোবিজয়বাবু সেদিন এই চক্রান্তের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেন নি। বরং, সরল মনে তিনি সুধীবাবুর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার সপক্ষেই বলে ফেলেছেন। রফাৎ এই যে, ধনঞ্জয়বাবুদের মত তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কিছু করেন নি। তাই, তার বিরুদ্ধে আমি অনুযোগ করেছিলাম, অভিযোগ নয়। সর্বশেষে বলি, সুধী প্রধানের বক্তব্য সভার প্রত্যেকেই উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করেছেন বলে তপোবিজয়বাবু যা বলেছেন তা ঠিক নয়, কারণ, তাহলে সময়ের অজুহাতে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার দাবী তুলে সময় নষ্ট করার উদ্দেশ্যটা প্রকট হয়ে উঠতো না। আশা করবো এই বিতর্কের এখানেই অবসান ঘটবে। তপোবিজয় আমার বন্ধু—শত্রু নন।

সর্বাণী গৌতম

উদ্ভট কবিতা

(আবোল তাবোল মনে রেখে)

এক : হাটিমা টিম্‌টিম্‌
হাট্টিমা টিম্‌টিম্‌;
তারা সভায় পাড়ে ডিম।
তাদের ঝাড়া দুটি শিং;
তারা হাট্টিমা টিম্‌টিম্‌ ॥

দুই : ট্যাশগরু
ট্যাশগরু গরু নয়, আসলে সে কচ্ছপ;
হারুদের অফিসে তাই নিয়ে মচ্ছব ॥

তিন : হালুম-ভূত
হালুম-ভূত তাড়াবে ট্যাশগরু,
এই আমার গল্প হলো সুরু।
চার দিকে তার "হা-রে, রে-রে-রা-রা!"
এই আমার গল্প হলো সারা ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মতামত

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্ষেত্র নির্বাচন

প্রবোধ দাস মহাপাত্র

মাধ্যমিক শিক্ষাধারাকে দেশ ও কালোপযোগী এবং "জীবন কেন্দ্রিক" করে তোলার জন্য সারা ভারতে শিক্ষাক্রমের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং তৎপরে দু বছরের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো তারই ফলশ্রুতি। পশ্চিম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত উচ্চ-মাধ্যমিক কাউন্সিল সেই অগ্রগতির প্রতীক। সেই নবগঠিত কাউন্সিল ইতিমধ্যে দু বছরের শিক্ষাসূচী স্থির করেছে। পাঠক্রম রচিত হচ্ছে। শীঘ্রই তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে বলে প্রকাশ। কিন্তু শিক্ষক, শিক্ষাকেন্দ্র এবং অভিভাবক সর্ব মহলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার স্থান নির্বাচন প্রশ্নটি এখন সব চাইতে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কলেজ অধ্যক্ষরা এই শিক্ষাধারাকে কলেজের সঙ্গে যুক্ত করার দাবী করেছেন। কোন এক শিক্ষক সংস্থা একে বিদ্যালয় ও কলেজে উভয় ক্ষেত্র থেকে পৃথক করার অভিমত দিয়েছেন। আবার কোন কোন শিক্ষক সংস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিদ্যালয় এবং কলেজের উপযুক্ত ক্ষেত্রে এর অবস্থান সমর্থন করেছেন। অভিভাবকদের একটি সংস্থা আবার এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ কলেজের সংগে যুক্ত করার পক্ষে।

বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে "পাওয়ার" বা ক্ষমতা আজকাল সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক। তাই প্রেসার পলিটিকসের উর্ধে বা নিম্ন চাপের ফলে প্রস্তাবিত নয়া উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাধারা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার মত স্থান দখলে রাখতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রকৃতপক্ষে যখন শিক্ষা-নীতি অপেক্ষা রাজনীতির প্রাধান্য বেশী, তখন দু বছরের শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষার শৃংখলা ও শুচিতা এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজন কতখানি রক্ষিত হবে সেইটাই মুখ্য প্রশ্ন।

সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে এর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও তাৎপর্য লক্ষ্য করেই দু বছরের মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ কোনটির সংগেই যুক্ত রাখা হয়নি। পক্ষে বিপক্ষে বহু আলোড়নের ফলশ্রুতি স্বতন্ত্র কাউন্সিল। ১৯৫৯ সালের স্যাডলার কমিশনের সুপারিশের বাস্তব রূপায়ণ। এ ক্ষেত্রে কোন আবেগ প্রবণতা এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্যের যুক্তি একেবারে পক্ষপাতমূলক নয় কি? আবার কলেজের সংগে যুক্ত হলেই শিক্ষার মানগত উৎকর্ষতা বাড়বে এমন যুক্তিও কতটা সারবহুল তা বিচারের বিষয়। তাছাড়া কলেজ ও বিদ্যালয় উভয়ের সংগে যুক্ত করে দেওয়ার জোড়াতালি নীতিও কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিশেষভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজন। এই অতি প্রয়োজনীয় জটিল বিষয়টি সম্পর্কে নবগঠিত কাউন্সিল এখনও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসেন নি।। এ যাবৎ সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার কেন পায়নি তা সত্যই রহস্যাবৃত। উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া কি উচ্চ ফলনশীল বীজ সফল হয়? শিক্ষাও তেমনি ক্ষেত্র-নিরপেক্ষ নয়। শিক্ষাসূচী এবং পাঠক্রম তা যতই বাস্তবধর্মী হোক না কেন, তার রূপায়নের স্থাননির্বাচনও আদৌ গৌণ নয়। স্থান নির্বাচনেই আবার শেষ নয়। তার উপযুক্ত পরিবেশ রচনারও যথেষ্ট সময় প্রয়োজন।

তাই স্থান নির্বাচন প্রশ্নটি এখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নের সমাধান এই শিক্ষাধারার মূল লক্ষ্যের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি (CABE) এই দুই বছরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার অঙ্গ ও অংশ বলেই উল্লেখ করেছেন। এবং এই অংশের শিক্ষাপদ্ধতি বিদ্যালয়-ধর্মী করার সুপারিশ করেছেন। তাছাড়া তারা এই শিক্ষাকে অতীতের ইন্টার মিডিয়েট শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁদের মতে এই শিক্ষাধারা হবে অধিক বৃত্তিমূলক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। রাজ্য যোজনা পর্ষদের শিক্ষা সেলও দশ বছরের সাধারণ শিক্ষার শেষে দু বছরের এই ফোরামে পেশাগত ও বৃত্তিগত শিক্ষাকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে প্রকাশ। নবগঠিত উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলও এই স্তরের শিক্ষাকে প্রধানত— (এক) উচ্চতর সাধারণ শিক্ষার প্রস্তুতি, (দুই) উচ্চতর বিশেষীকরণের প্রস্তুতি এবং (তিন) জীবনের পেশা বৃত্তি নির্বাচনের উপযোগী করার পক্ষপাতি। এই ত্রিমুখী লক্ষ্যের পটভূমিতে কাউন্সিল পূর্বের সাতটি ধারার পরিবর্তে সাধারণ ও ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক দুটি ধারা চালু করবেন ঘোষনা করেছেন। বাস্তবতার দিক থেকে ঘোষিত এই শিক্ষাসূচী সমর্থনযোগ্য। তবে কেবলমাত্র শিক্ষাসূচী নয়, এর বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচী ও তার বাস্তব প্রয়োগের উপর সার্বিক সাফল্য নির্ভরশীল।

এখন উল্লেখিত লক্ষ্য বর্ত-, মানে প্রচলিত ডিগ্রী কলেজ এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কোন ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ সেইটাই বিচার্যের বিষয়। যদি এই দুই বছরের শিক্ষার লক্ষ্য কেবল মাত্র উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তুতি বলে ঘোষিত হতো, তাহলে কলেজের সংগে যুক্ত রাখার দাবীটি অধিক গ্রহণযোগ্য হতো। যেহেতু লক্ষ্য ত্রিবিধ এবং শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ ও বয়ঃসন্ধিকালের ছাত্র-ছাত্রী এই স্তরের শিক্ষার সংগে যুক্ত, সেই হেতু এই শিক্ষা কলেজের সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে যে আদৌ সফল হবার নয় তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান নিম্ন এবং বিদ্যালয় শিক্ষকদের যোগ্যতা আশানুরূপ নয়, এমন যুক্তিও আজকাল খাটে না। কারণ অনার্স বা মাস্টার ডিগ্রী ছাড়াও বিদ্যালয় শিক্ষকদের পেশাগত ট্রেনিং আবশ্যিক। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ যখন ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী শিক্ষা পরিচালনায় অতি ভারাক্রান্ত তখন আবার প্রায় দু লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার দায়িত্ব তাঁদের হাতে অর্পণ করা সমীচিন হবে কি?

অপরদিকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংগে এই দুই বছরের শিক্ষার সংযুক্তিকরণের পক্ষে সার্জেন্ট রিপোর্ট থেকে শুরু করে শ্রী কমিটি, রাধাকৃষণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন এবং সর্বশেষের কোঠারী কমিশন অকপটে সুপারিশ করেছেন, তাছাড়া পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে ইংলণ্ডে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তেরো বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা, আমেরিকায় বারো বছরের, রাশিয়া এগারো বছরের চীনে এগারো বছরের, জাপানে বারো বছরের, ফ্রান্সে বারো বছরের এবং পশ্চিম জার্মানীতে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত তেরো বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা প্রচলিত আছে। আবার আমাদের রাজ্যে প্রচলিত একাদশ শ্রেণীর উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা একেবারে বিফল হয়েছে এমন কথাও কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না। বিদ্যালয় শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং কৌলিণ্য বিধান করলে আশাতিরিক্ত সুফল ফলে এমন দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নয়।

অতঃপর আগেকার দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে বহুমুখী বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে গিয়ে প্রায় ষাট কোটি টাকার মত সরকারী অর্থ ও সম্পদের যে বিনিয়োগ এতদিনে হয়ে এসেছে, দশম শ্রেণীতে পরিবর্তিত হলে তার কি অপচয় হবে না? ডি পি আই তালিকাভুক্ত এবং বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত প্রায় আট হাজার শিক্ষক এবং প্রায় এক হাজার শিক্ষাকর্মীর অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে সে দিকটাও ভাববার বিষয়। কলেজে প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অবলুপ্তি ঘটলে কলেজের ঘাটতি পূরণে রাজ্য সরকার ছাড়াও ইউ জি সি আছে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব কেবল মাত্র রাজ্য সরকারেরই।

বাস্তব এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্থান নির্বাচন সমস্যাটির সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমাধান প্রয়োজন। কলেজ বা বিদ্যালয় কারোর প্রতি "বায়াস" না হয়ে এই দুই বছরের শিক্ষার লক্ষ্য ও তার সার্থক রূপায়ণের প্রতি "পায়াস" দৃষ্টি রেখে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নয়া "উচ্চ মাধ্যমিক ইন্সটিটিউশন" প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যথা—(এক) উন্নত মানের উপযুক্ত

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

যাক্‌গে যাক্ লুকিয়ে থাক

অনার্য মিত্র

বরণীয় মৃত্যু

হায়রে আমার গ্যালারী,
হায়রে কলিম ভাই
তোমার মতো মরতে যে রোজ
খেলার মাঠে যাই।
তুমি মরলে বটে
কিন্তু বাঁচালে দুই বোন;
যুগে যুগে থাকনা বেঁচে
এমন মরণ।
মরে তুমি ভূত হয়েছে
দয়া করলেন সরকার,
আমার বোনের জন্যে
আমার মরা ভীষণ দরকার ॥

লুকিয়ে থাকো

কে যে কারে চটায়, আর কে যে কারে হটায়
সেই কথাটা জানতে পাবে কালকে সকাল নটায়।
সে কাল কি আর আসবে, নটা কি আর বাজবে,
সাতমন তেল পুড়িয়ে রাধা তেমন কি আর নাচবে?

কে যে কারে হাসায়, আর চোখের জলে ভাসায়
দাবার চালে কেবা জেতে কেবা হারে পাশায়।
সেই কথাটা জানতে, জ্যোতিষ ডেকে আনতে
ভীরুর মতো যা ছুটে যা হিমালয়ের প্রান্তে।

কে জলে কে ডাঙায়, কে কারে চোখ রাঙায়
আজন্মকাল থাকতে রাজা বাবার নাম কে ভাঙায়।
বাজ পড়বে মাথায়, কাজ কি এসব কথায়,
যথায় আছো সুখ লুকিয়ে, লুকিয়ে থাকো তথায় ॥

ঘুরন্ত মুণ্ডু

নটবর কুণ্ডু
যখন যে পথে যান
যেমন সুবিধা চান
সেই মত ঘোরে তার
ঘুরন্ত মুণ্ডু।

এমন মুণ্ডু ভাই
জন্মেও দেখি নাই
বিনাচাড়ে এতবার এতদিকে ঘোরে;
একথা যে শোনে হায়
সব থতমত খায়
মানুষেরা বোবা হয়, পড়ে বেঘোরে।

নটবর কুণ্ডু
রাখিতে নিজের মান
ঘুচাইতে অপমান
নতুন বিধানে তিনি বাঁচালেন মুণ্ডু।

অদ্ভুত বায়না

যাই যাই হরেও সে যায়না
ভারী অদ্ভুত তার বায়না।
থাকবই থাকব সে থাকছে
ইতি উতি দিয়ে সব ঢাকছে।
বক্ বক কত বুলি বকছে
কে জানে সে জিতছে না ঠকছে।
চুপচাপ সকলেই ফুসছে
ঘরে বসে ভাগ্যেরে দুষছে।
ঘুমোলেই রাত যদি ভোর হয়
তবে কেন চুপচাপ থাকা নয়?
যাক্ তিনি নাহি যাক যাকগে।
ঘটবার ঘটবেই ভাগ্যে।

যাত্রার জয়যাত্রা : উৎস থেকে মোহনায় (৪)

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

বিদ্যাসুন্দর'কে কেন্দ্র করে আম। আরও কয়েকজন শিল্পচেতনা বোধ সম্পন্ন মানুষের সন্ধান পাই। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঠাকুরদাস দত্ত।

১৮৩১ সালে তিনি কয়েকজনকে সঙ্গী করে সখের যাত্রাদল তৈরী করে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা দেখাতে থাকেন।

ঠাকুরদাস দত্তকে একটু বিস্তারিত ভাবে পরিচিত করার একটা প্রবণতা থেকেই বলি, ১২০৮ বঙ্গাব্দে ঠাকুরদাসের জন্ম হয় হাওড়ার বাঁটরার অভিজাত দত্ত পরিবারে। ঠাকুরদাস নিজেও ছিলেন তখনকার দিনের একজন সুলেখক এবং জনপ্রিয় যাত্রা পালাকার। 'লক্ষ্মণ বর্জন' পালা লিখে তিনি অনেকের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। বাঁটরার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় অভিনয় করতে ভালবাসতেন বলে ঠাকুরদাস বাবু তাঁকে বিদ্যাসুন্দর পালায় 'মালিনী' চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ করে দেন।

যা হোক, ঠাকুরদাস তো ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যাত্রার দল করেননি, করেছিলেন সখের দল, তাই বোধ করি ঠাকুরদাসের দল বেশী দিন বাঁচে নি, মাত্র তিন বছর।

এরপর 'বিদ্যাসুন্দর' পালার সখের দলের সংখ্যা ছড়িয়ে পড়তে থাকল। গঙ্গার প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্যেরা নেমে পড়লেন আসরে। নেমে পড়লেন টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী সদলবলে।

রিষড়ার প্রখ্যাত কৈলাশচন্দ্র রায়ও থেমে থাকলেন না, তিনিও সদলবলে বিদ্যাসুন্দর নিয়ে শুরু করেছিলেন সখের যাত্রা গান।

বউবাজারের ধনাঢ্য ব্যক্তি রাধামোহন সরকার ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। একদিন তাঁর মনেও যাত্রাপালার প্রতি অনুরাগ দেখা দিল। তিনিও বন্ধু বান্ধব নিয়ে তৈরী করলেন সখের দল, যাত্রা সেই বিদ্যাসুন্দর।

এত কথার পর যেটি আসল কথা তা হলো 'বিদ্যাসুন্দর' পালাকে জনপ্রিয়তার উর্দ্ধে নিয়ে যাবার পিছনে এমন একজনের দান যার কথা একটু বিস্তারিত বলা দরকার। তিনি গোপাল। ইতিহাসের পাতায় যার নাম গোপাল উড়ে নামে চিরদিনের জন্য লেখা হয়ে আছে।

গোপালের আসল নাম কিন্তু গোপাল দাস। গোপালকে উড়ে বলে সবাই ডাকত বলে একদিন সে 'উড়ে' হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে গেল বোধ হয়। কটক জেলার যাজপুরের এক গ্রামের ছেলে গোপাল। যেহেতু সে কটকের ছেলে, সেই হেতু কোলকাতার বাবুরা তাকে উড়ে বলে সম্বোধন করতে করতে শেষ পর্যন্ত তার দাস পদবীটা হারিয়ে গিয়ে 'উড়ে' পদবীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যা হোক সেই গোপালের কথায় আসবার আগে একবার বউবাজার রাধারমণ সরকারের কথায় ফিরে যাই।

রাধারমণবাবু যে সখের দল করেছিলেন সেই দলে আস্তে আস্তে যোগ দিয়েছিলেন এমন অনেকেই যারা পুরনো কোলকাতার এক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্বনাথ মতিলাল, হিদারাম ব্যানার্জী, বউবাজারের প্রখ্যাত ধরেরা। এঁরা রাধারমণবাবুর দলে একা একা এসে যোগ দিয়েছিলেন তা নয়, মতিলাল এসেছিলেন তাঁর গোষ্ঠীকে নিয়ে, হিদারাম ব্যানার্জীও এসেছিলেন কয়েকজন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে, ধরেরাও তাই। ফলে রাধারমণ সরকারের দল একটা বিরাট দলে পরিণত হয়েছিল। টেলিমেক্কের অনুবাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই দলে জড়িয়ে ছিলেন।

আর এই দলে থেকেই, গোপাল দাসের উত্থান। এই দল থেকেই সবার ডাকা 'উড়ে' ছেলেটির খ্যাতি। বলা বাহুল্য, সেই উড়ে ফেরিওয়ালা, চাকর গোপালের জন্যই রাধারমণ সরকারদের যাত্রা সংস্কৃতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এতখানি আধিপত্য। এবার আসল ঘটনায় আসা যাক—

গোপাল দাসের বাবার নাম ছিল মুকুন্দ দাস।

মুকুন্দ দাসের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না বলেই গোপাল যখন সবে মাত্র যুবক তখন সংসারের স্বার্থে গোপাল একদিন চলে এলো কোলকাতায়। কটা দিনের মধ্যে একটা কাজ জুটে গেল। কোলকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি বীর নৃসিংহ মল্লিকের বাড়ীতে পরিচারকের কাজ। ভিতরের আসল মানুষটাকে কি চেপে রেখে যায়? যায় না। তাই সে এমন কিছু করতো যাতে মাঝে মাঝে নৃসিংহবাবু নিজেও মাঝে মাঝে বিস্মিত হতেন। এর পর গোপালের জীবন যাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা দেখা গেল। পরিচারকের কাজ করতে আর তার ইচ্ছে হলো না বলেই বেছে নিল ফেরীওয়ালার কাজ।

চাঁপা কলার ফেরা করতো গোপাল। অনেকে আবার বলেন, মনোহারী দ্রব্যের ফেরীওয়ালা ছিল সে। কিন্তু যতদূর জানবার চেষ্টা করেছি তাতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে গোপাল দাস চাঁপাকলা বিক্রি করতো। একদিন দুপুরে হাঁক-ডাক ছাড়তে ছাড়তে গোপাল যখন বউবাজারের রাধামোহন সরকারের বাড়ীর বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই তাঁর কপাল গেল খুলে। গোপাল সেই যে সেই বাড়ীতে ঢুকলো, সেই থেকে তার সেখানেই থাকা।

গোপালের কণ্ঠস্বর মিষ্টি, সুতরাং তাকে দিয়ে অনেক কাজই হতে পারে এই কথাটা কেন জানি না রাধামোহনবাবুর মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে গোপালের মাইনে ঠিক হলো মাসিক দশ টাকা।

এই বিলাসীবাবুদের বাড়ীতে সঙ্গীতের ওস্তাদ ছিলেন। তিনি হরিকিষণ মিশ্র। গোপাল সেই হরিকিষণ মিশ্রের কাছে গান শিখতে লাগলেন। অদ্ভুত স্মরণ শক্তি বলে গোপাল মাত্র কটা দিনের মধ্যে বেশ ভাল ভাবেই ঠুংরি শিখলো। কটা দিনের মধ্যে রাধামোহন বাবুরা 'বিদ্যাসুন্দর' পালা আসরস্থ করলেন। গোপাল পেল মালিনীর ভূমিকা। সেই একটি ভূমিকাতে প্রথমেই সবাইকে মাতিয়ে দিলেন গোপাল। সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে রাধামোহনবাবু গোপালের মাইনে বাড়িয়ে দশ থেকে একেবারে পঞ্চাশ টাকা করে দিলেন।

যাত্রাকে তখন কয়েকজন আনন্দ বিনোদনের একটা বিশেষ মাধ্যম ধরে নিয়েছিলেন, তার ফলে এই যাত্রার জন্য মাত্র দু এক রাতের মধ্যে লক্ষ টাকা খরচ করতেও তাঁরা দ্বিধা করতে না।

রাধামোহনবাবু তেমনি একজন, যিনি হাটখোলায় দত্ত বাড়ীতে এবং সিমলার ছাতুবাবুদের বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর পালা যাত্রা করে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন।

রাধামোহন হঠাৎ মারা যান মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে। সুতরাং দলের দায়িত্ব এলো গোপাল উড়ের ওপর।

শেষ পর্যন্ত রাধামোহনের দল গোপাল উড়ের দল নামে খ্যাত হয়ে গেল।

এই গোপাল উড়ের দলে সংগীত সুরকার এবং গীতিকার হিসেবে যিনি খ্যাতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন তিনি হলেন ভৈরব হালদার। ভদ্রলোক সিঁদুরে থাকতেন। দল চালাবার সময় 'মালিনী'র চরিত্র গোপাল কাশী নামে একজনের ওপর ন্যস্ত করেন, যিনি নাচের ব্যাপারে বেশ পারদর্শী ছিলেন।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা

ষান্মাসিক এগারো টাকা

ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৬১, লেক লেন, কলি-১৩

শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের তোড়জোড়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জলপাইগুড়ি : গত ২০শে জুলাই স্থানীয় চৌধুরী ধর্মশালায় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনের জন্য জেলার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটি জেলা কমিটি গঠিত হয়। কলকাতায় কেন্দ্রীয় ভাবে সারা বাংলা ব্যাপী প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও মানিক মুখোপাধ্যায়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করে যে কমিটি গঠিত এই জেলা কমিটি তারই শাখা। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক পরেশ চক্রবর্তী, যুগ্ম সহসভাপতি অধ্যাপক সঞ্জীবন দত্ত রায়। এই কমিটি জেলাস্তরে চিত্রাঙ্কন, প্রবন্ধ, ছোট গল্প রচনা, আলোচনা, বিতর্ক সংগীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। কমিটির পক্ষ থেকে গৃহীত এক প্রস্তাবে কয়েকটি জরুরী বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে : (ক) বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে ও যথার্থ সুলভ মূল্যে ত্রুটিমুক্ত শরৎ রচনাবলী প্রকাশনা ; (খ) কলকাতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শরৎচন্দ্রের মূর্তি স্থাপন ও শরৎচন্দ্রের বাসভবন স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিকে জাতীয় সংগ্রহশালা হিসেবে সংরক্ষণ ; (গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগে শরৎ অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি ; (ঘ) শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে তাঁর নাটকগুলিকেও অভিনয় সত্বাধিকার আইনের আওতা থেকে রেহাই দিতে হবে। এছাড়াও জেলা কমিটি স্থানীয় ভাবে তিনটি দাবী রাখে : (১) জলপাইগুড়ির একটি রাস্তার নাম শরৎচন্দ্রের নামানুসারে রাখা : (২) শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি শরৎ মূর্তি স্থাপন ; (৩) শরৎচন্দ্রের নামানুসারে এই শহরে আরো একটি পাবলিক হল স্থাপন ও তৎসংলগ্ন শরৎ পাঠাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

শরৎ নাট্য প্রতিযোগিতা

সারা বাংলা শরৎ শতবার্ষিকী কমিটির শরৎ-নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিষয় : শরৎচন্দ্রের গল্প অথবা উপন্যাসের নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে যে কোন পাণ্ডুলিপি। সময়ের ব্যাপ্তি : এক ঘণ্টা। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে ৫০/২, লেনিন সরণী (পঞ্চম তল), কলকাতা-১৩ ঠিকানায়।

সুকান্ত-শরৎ সন্ধ্যা

মেদিনীপুরের (দাঁতন) অগ্নিবীণা গোষ্ঠী আগামী ৩১শে শ্রাবণ এবং ১লা ভাদ্র যথাক্রমে সুকান্ত ও শরৎ স্মৃতি সন্ধ্যা উদ্‌যাপন করবেন। এই উপলক্ষে সুকান্ত স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও শরৎ স্মৃতি ছোট গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস

৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৪১৯৪৩

কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

কলকাতা একদিন

ইরাবান বসুরায়

কলকাতায় আছি আজন্ম—কোন হঠাৎ দেখার মুহূর্ত তাই আসেনি। পিতৃপুরুষের স্মৃতি থেকে তিতাসের জলস্রোত কখনও কখনও দিতে চায় উত্তরাধিকার, কিন্তু বারবারই হাত জড়িয়ে থাকে কলকাতা। সেই কলকাতা মধ্য-দুপুরে তখন নির্জনতা ছিল সার্কুলার রোডে, টানা রিক্সার টুংটাং থেমে যেত গাড়িবারান্দার নীচে ঘোড়ার গাড়ির পা দানিকেই মনে হত পক্ষীরাজের ডানা শৈশবসঙ্গীনী, ফ্রকের ঝুল নামিয়ে রবিবারে যেত গীর্জায়, জানলা দিয়ে চোখে পড়ত সরু গলি দিয়ে হেঁটে যায় ফিরিঙ্গী প্রৌঢ়, পায়রা উড়ে আসত কাঠের খড়িতে, পাইপে আসত গন্ধ-ল, আর সেই বিরাট ছাদটাতে সন্ধে হতে না হতেই কারা যেন বিরাট বিরাট ছায়ামূর্তি সব, ঘুরে বেড়াত। এই ছিল প্রথম চেনা, প্রথম জানার কলকাতা। সেই থেকে কলকাতায় আছি, বড় দীর্ঘকাল—শার্টের নীচ, স্কুলের গভীরে বয়ে বেড়াচ্ছি বিরাট ক্ষত—যার নাম কলকাতা।

আট বছরের একটি ছেলে স্কুলের বারান্দায় বসে প্রথম আবিষ্কার করেছিল, কলকাতায় একটা নদী আছে। ষোল বছর বয়সে সেই ছেলেটি হাত মক্সো করতে করতে বন্ধুদের সামনে প্রথম শুনিয়েছিল তার কবিতা—কলকাতাকে নিয়ে। এমনি ঝরেই দেখাশোনা কলকাতার সঙ্গে, ট্রামের জানালায় ব্যস্ত হাত শীতের দুপুরে বুনে যায় পশম, রেডিওর সামনে ঝুঁকে পড়ে ক্রিকেট উৎসাহী বালক, দেবদারু-পাতার সাজানো সিনেমা হলের সামনে শুক্রবারে বাঁপিয়ে পড়ে কিশোর-তরুণ-প্রৌঢ়, রাত তিনটের সময় প্যান্ডেলের বাইরে বসে আমীর খাঁ শোনে বিত্তহীন স্রোতা, টালীগঞ্জের ভিড়ের মধ্যে ছবি করেন সত্যজিৎ রায়, জলসা-টলসা থেকে অনেক দূরে, যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়, দেবব্রত বিশ্বাসের গলায়। কিন্তু তবু যেন কোথায় না জানা রয়ে যাচ্ছিল কিছু, কলকাতাকে মাঝে মাঝে খুব অচেনা মনে হত। কৈশোর-বান্ধবী হঠাৎ যেন ফুঁসে উঠত রাগে চমক লাগত। আর তারপর আস্তে আস্তে টের পেতে লাগলাম কোথায় যেন অন্যরকম ছোঁয়া লাগছে, খেলার সাথীকে হঠাৎ যদি মনে হয় যৌবনবতী—নতুন রহস্যের স্পর্শ পাওয়া যায়, সেই-রকম নতুন চেনার বিস্ময় লাগল। গ্রাম-গ্রামান্তরে কেউ ভাত পেলনা, কেউবা কেরোসিন, তারা জ্বলে উঠল, আর সেই আগুনে জ্বলতে লাগল কলকাতা, নাকি জ্বালাতে লাগল! আর ছেলেমানুষী উত্তেজনা নয়—কলকাতা সত্যি আগুনের বাসিন্দা আর তখনই টের পেলাম, কলকাতাকে ভালবাসি।

একেকদিন বৃষ্টি নামে। শেষবাসে বাড়ি ফিরতে ফিরতে খালের জলে দুলে ওঠে খড়বোঝাই নৌকোর আলো, ভিজে হাওয়ায় ভেসে আসে বকুলের গন্ধ। আঃ এই বৃষ্টি যদি মুছে নিত চার্লকের বিষ! বকুলের গন্ধে মনে পড়ে কলেজ স্কোয়ারের সেই গাছটার কথা, বকুল কুড়িয়ে হাতে তুলে দিয়েছিল প্রথম নারী—তারপর একদিন সেই বকুলের ছায়া ডিঙিয়ে ছুটে এল টিয়ার ঝাঁসের শেল, প্রেসিডেন্সী কলেজের গেট-আঁকড়ানো ধর্মঘটী ছেলেদের ওপর নামলো লাঠির আঘাত, কিন্তু শুধু এই নয়, ডাস্টবিন, দোকানের সাইন-বোর্ড ছাড়িয়ে রইলো রাস্তায় টেবিল-চেয়ার উল্টেপাল্টে সাজিয়ে দেওয়া হলো। সেন্টিনারী বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে ইঁটের টুকরো, ছাত্ররা লড়ছে, ব্যারিকেড—কলকাতা।

মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে হেঁটে গিয়েছিলাম ময়দানের সবুজে। ঝোড়ো বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল

তবু কাছে নিল না কলকাতা। সুবর্ণরেখার পারে হাওয়া উড়িয়ে নিল বালি, বিকেলের ট্রেনে নামলো সৌখীন ভ্রমণবিলাসীর দল, তাদের পোষাকে কলকাতার গন্ধ, অন্য কলকাতা, সে কলকাতাকে আমি চিনি না। না কলকাতা নেই ঐ দূর গ্রামে, দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকে ছোট-নাগপুরের পাহাড়, শালের জঙ্গলে ফুল ফোটে, ওখানে কলকাতা নেই। অন্ধকার রাস্তায় পায়ের শব্দে সরে যায় ঢোঁড়া সাপ, নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়ায় ফেরারী বান্ধব—আগুনের কথা, রাইফেলের কথা, লড়াই-এর কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভিজে ওঠে গলা—কলকাতার কি খবর?

নির্বাসন ফুরোয়। হাওড়া ষ্টেশনে ভিড়। দোতলা বাসের জানলা থেকে চোখে পড়ে কলকাতা, একাত্তরের কলকাতা।

বড় দেরী হয়েছিল, তবু বাকী থাকে অনেক কিছু। মহল্লায় মহল্লায় ফেরে সন্ধানী চোখ বারাসতের মাঠে পড়ে থাকে লাশ মাঝরাতে যে কোন দরজায় থমকে দাঁড়ায় অন্ধকার গাড়ি। রক্তের কল্লোলে কলকাতা তিলোত্তমা হয়ে ওঠে। তবু ফুঁসতে থাকে জালে ঘেরা কলকাতা, টহলদারী পদধ্বনিকে এড়িয়ে দেয়ালে দেয়ালে কারা যেন লটকে দিয়ে যায় ভবিষ্যতের ডাক, প্রতিবাদী হাত উঠে আসে পাইপগান বোমা, টিকে থাকার তুচ্ছতাকে অনায়াসে ছুঁড়ে দিয়ে বেঁচে থাকে কলকাতা।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে কারা যেন ঢেলে দিয়েছিল বিষ। প্রিয়-জনের শব বুকে নিয়ে নাচে বেহুলা-কলকাতা, এদিকে তার ঠোঁট হয়ে আসে নীল। তখন আর এই কল-কাতাকে চিনতে পারি না, মনে হয় বিশ্বাসঘাতিনী এই নারী, তাকে ছুঁড়ে ফেলতে চাই দূরে, কিন্তু তবু গলা জড়িয়ে থাকে সে, ঠোঁটের ওপর তুলে আনে ঠোঁট, আর আতপ্ত নিঃশ্বাসে বুঝি জ্বরের ঘোর তার শরীরে।

বুঝি না কি করব কলকাতাকে নিয়ে। পালিয়ে আসে তার কাছ থেকে। লাল টকটকে খোয়াই-এর পাশ দিয়ে নামতে নামতে, পাথর-বালিতে ঝিকিয়ে ওঠে মধ্য জুলাই-এর রোদ, তেলরং ছবির মত স্বপ্নে দুলতে থাকে কলকাতা মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ রক্তে দুলতে থাকে কলকাতা। কোয়ার্টজাইট পাথরের স্তরে স্তরে ইতিহাসকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রুদ্র শুশুনিয়া, কে যেন তার বুকে লিখে রাখে—ঠিকানা কলকাতা। পিছু ছাড়ে না কলকাতা, টেনে নিয়ে বেড়ায় গোমতী থেকে অজয়ের চরে, ফরেস্ট-বাংলোর মাতাল রাত থেকে গোয়ালপাড়ার মাঠের ভোরে। শেষে ফিরতে হয় কলকাতায়—প্রাই-ভেট বাসের চাকার ঘসটানি, সুন্দরী ট্রামের বীভৎস হর্ণ, সি এম ডি এ-র বিজ্ঞাপনকে ঝাঁপ করা রাস্তার জল আর স্কাইলাইন পাল্টে দেওয়া জিরাফ-মার্কা বাড়ির জঙ্গলে।

কিন্তু কার কাছে ফিরি? কোথায় সেই অশ্লিষ্ট ভালবাসা? খুব কাছে এসে, বুকে কান রেখে শুনতে পাই উচ্চারণ, দুমড়ে ওঠে কলকাতার শরীর, মুচড়ে ওঠে কল-কাতার ওষ্ঠ। আসফল্টের ওপর ধুলো উড়িয়ে আসে ঝড়, শুকনো পাতা উড়ে যায় ময়দানের ওপর কৃষ্ণচূড়ার লাল ঝরে পড়ে ফুটপাথে, ভেতরে ভেতরে প্রতিবাদ তৈরী করে নেয় কলকাতা, গুমরে ওঠে অভিমান। কখনও শান্ত ভোর জেগে ওঠে সল্টলেকের ঝিলে, কখনও বাঁকানো চাঁদ আটকে থাকে টেলিভিশনের অ্যানটেনায়, কখনও বৃষ্টি নামে শেয়ালদার ট্রামলাইনে বর্শার মত বিঁধতে থাকে জলের শব্দ। বিদেশী জাহাজের ভোঁ বাজে, উদাসীন মানুষেরা হেঁটে যায় ফুটবল-গ্যালা-রীতে, ছেঁড়া ফেস্টুনের পাশ দিয়ে উঁকি মারে ব্যাবারের বিজ্ঞাপন। আর ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে কলকাতা। আমার হাতের মধ্যে কাঁপতে থাকে তার অস্থিরতা, তার রক্তস্রোতে বারুদের জ্বালা নাড়িয়ে দেয় শিরদাঁড়া অব্দি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি দিগন্ত পর্যন্ত পুড়ে যায় স্বপ্নের আগুনে, তখন চোখে চোখ রাখি কলকাতার, সে আমার ঠোঁট ছোঁয়।

নীল খাতা

নীল খাতগো নীল খাতা,
হিসেব করে তোমার পাতা
কে কতো কাজ রেখে বাকি
কে কতোটা দিয়ে ফাঁকি
নিয়ম ভেঙে নিচ্ছে টেনে
আচ্ছা করে বুকটি ভরে
মুক্তবাতাস।
নীল খাতাগো নীল খাতা
তোমার পায়ে ঠোকাই মাথা
এবার আমায় দাওগো রেহাই
প্রাণটা জুড়ে দিচ্ছে তেহাই
নীল আকাশ।

শুভময় রায়

শিক্ষাক্ষেত্রে নির্বাচন

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

সরঞ্জাম ও শিক্ষোপকরণযুক্ত একটি স্বতন্ত্র ইউনিট বা বিভাগ, (দুই) শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি, (তিন) "সাধারণ" ও "ভোকেশন্যাল" উভয়বিধ স্ট্রীমের প্রয়োজনীয় বিভাগ ও কর্মশালা স্থাপন, (চার) বিদ্যালয় কর্মী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণের অংগীকার, (পাঁচ) অনার্স বা মাস্টার ডিগ্রী সহ উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলীর অবস্থিতি, (ছয়) ইনস্টিটিউশানের যতদূর সম্ভব পৃথক বাড়ীঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি এবং (সাত) শিক্ষা পরিচালন উপযোগী স্বতন্ত্র পরিচালকমণ্ডলী ইত্যাদি।

আবার কেবলমাত্র উল্লেখিত শর্ত নয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োগ করার উপযোগী রাজনীতি নিরপেক্ষ বিদ্যালয় অনুমোদন কমিটি একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রগুলির মধ্যে পাঠ গ্রহণের সুযোগগত কোন পার্থক্য যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নেবারহুড স্কুল প্রথা" কার্যকরী করার জন্য প্রতিটি ইনস্টিটিউশনের শাখা বা ফিডার স্কুল সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। শহরাঞ্চলের প্রতি পাঁচটি দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় ভিত্তিক এবং গ্রামাঞ্চলে প্রতি ব্লকে অন্ততঃ একটি শিক্ষা-কেন্দ্র অনুমোদন প্রদান একান্ত আবশ্যক। সকল ক্ষেত্রে কলেজ অপেক্ষা উন্নত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শহরাঞ্চলের জনাকীর্ণ কলেজ বা বিদ্যালয়কে এই সুযোগ গ্রহণে যতদূর সম্ভব নিরুৎসাহিত করাও একান্ত প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা-নীতির এই নয়া প্রকল্প রূপায়নের আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার যাতে গ্রহণ করেন তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজ্যসরকারকে গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি যে মূল লক্ষ্য, নীতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই দুই বছরের শিক্ষাধারা প্রচলিত হতে চলেছে তা যাতে কোন প্রকারে বানচাল না হয় হয় তার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলকে আরো তৎপর হতে হবে। অন্যথায় জাতির ভাবী বংশধররা নূতন পরীক্ষাগারের "গিনিপিগে" পরিণত হবে।

সৌখীন বেলুন, কাঁধের ওপর ভারী হয়ে বসছিল সময়ের হাত, তবু বড় দেরী হয়ে গেল। দুটো খালি হাত আর একবুক ভালবাসা নিয়ে বন্ধুরা চলে গেল কলকাতা ছেড়ে, আর আমি পড়ে রইলাম দ্বিধায় দোটানায়—কে জানে পথটা ঠিক কিনা। কলকাতা ছাড়লাম না, ভালবাসার এই অপমান সইলো না কলকাতা তীব্র ঘৃণায় ঠেলে দিল দূরে। তিনশো মাইল দূরের সেই মফঃস্বল শহর, ট্রেন নেই, এক ঘণ্টা কলকাতা থেকে আকাশ পেরিয়ে, তারপর পাঁচ ঘণ্টা বাসে—রাতে একটা গোটা চাঁদের নীচে নদীর জলে উল্টোনো নৌকোর ওপর বসে অভিমানে বলেছিলাম "আধঘণ্টা পরে তুমি জ্বলে উঠবে কলকাতা।" কলকাতা জ্বলছিল দূরে, আমি ছোঁয়া পাইনি, নিজেরই ঠোঁটে চেপে বসেছিল দাঁত, নোনতা স্বাদে, টিলার নীচে ফাঁকা মাঠ, গর্জন গাছের পেছনে বাঁকা রোদ, আলতো স্বপ্নের মধ্যে ঝিনঝিন ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছিল সারা শরীরে। ঘরে ফিরে আলো জ্বালতেই একটি কিশোরী একমুঠো কুরচি আর তিনটি চাঁপা টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে বললো "কাল আপনি কলকাতায় যাবেন?"

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরীখ্ এঙ্গেল্‌সের

প্রাপ্তব্য সমস্ত **কবিতা, কাব্যনাট্য,** এপিক ইত্যাদি পৃথক দুই খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে মার্ক্স। দাম: দশ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ৭·৫০। ৫ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে গ্রাহক করা হবে।

গ্রাহককেন্দ্র: বিশ্বভিত্তান, ৯/৩ টেমার লেন
কলকাতা-১২। বিকেল ৩টে থেকে।

সম্পাদনা ও অনুবাদ: **বীরেন চক্রবর্ত্তী ও রথীন চক্রবর্ত্তী**

কবিতা: ৪৮এ গড়িয়াহাট রোড। কলকাতা-১৯

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

সময়ের ভুল ছবি

(দর্পণের গ্রন্থ সমালোচক)

নায়ক এবং নায়িকা দুজনেই গোল্ড স্মাগলার। উপন্যাস (পরবাসে ঃ শংকর মিত্র. শ্রোতমধারা। ছয় টাকা) জুড়ে নায়ক রত্নাকর তার অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করেছে। কোন বসের নির্দেশ মত সোনা চোরাই চালানের ব্যবস্থা করেছে, নায়িকা রিটার সঙ্গে ঘুরেছে, মদ খেয়েছে, শুয়েছে। হঠাৎ তাদের মনে হয়েছে শুধু শারীরিক চাহিদা না মিটিয়ে একদিন তারা স্বামী-স্ত্রীর মত থাকবে। তাদের জীবনে এটাই একটা পরম প্রাপ্তি। এর সঙ্গে রত্নাকরের পুরনো প্রেমিকা তীব্রর কথাও আছে—তার বন্ধুর বোন, সে এখন রাজনীতি করা একজনের বউ এবং নিজেও সংগ্রাম সচেতন। রত্নাকর জানে তার বেরোবার রাস্তা নেই, তবু কৈশোর-নায়িকার সংগ্রামী মনোভাবের খবর তাকে বেশ খুশী করে। তার রুক্ষ জীবনে তখন হু হু করে বাতাস ছুটে এলো। এই বিষয় নিয়ে যে উপন্যাস লেখা চলে না তা নয়, কিন্তু কেন লেখা? শংকর মিত্র বোঝাতে চান গোল্ড স্মাগলারদেরও ভালবাসা আছে, বাঁচার সাধ আছে। কিন্তু শংকর মিত্র জানেন না সমস্যার উৎস কোথায়। রত্নাকর রিটার যন্ত্রণাকে মনে হয় অনেকটা আরোপিত—এই জীবন বেছে নেওয়ার কারণগুলো খুব জোরদার মনে হয় না। আর তা হয়না বলেই মনে হয় যন্ত্রণাটাও সাজানো—পাশাপাশি রাজনৈতিক কথাবার্তা এসে যায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে। তাছাড়া সংলাপে অজস্র ইংরেজী শব্দের বাহুল্যে কোন স্মার্টনেস আসেনি—এসেছে কৃত্রিমতা। বিষয় এবং তার উপস্থাপনা—কোনটাতেই শংকর মিত্র নবকল্লোল মার্কা রচনার ঊর্ধে উঠতে পারেননি।

বিষয়ের দিক থেকে পদসঞ্চার (পদসঞ্চার ঃ সিদ্ধার্থ সাহা। প্রান্তিক প্রকাশনী। ছয় টাকা) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখক বলেছেন, যে কালচার মানুষকে এগিয়ে দেয় পদসঞ্চার কালচারেরই ফসল। লেখকের মতে আমরা যে ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে বাস করছি গল্পগুলি সেই সময়ের রচনা। কিন্তু কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহই যথেষ্ট নয় তাকে গল্পে রূপ দেওয়াটা যথেষ্ট দুরূহ এবং সেই দুরূহ কর্মে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন, বলতেই হয়। অধিকাংশ গল্পের চরিত্রই দ্বন্দ্বহীন অতি সরলীকরণ তাদের রক্ত মাংসের মানুষ হতে দেয়নি। "রুচির কথা"য় রুচি বাপের বাড়ি এসে গলগলজব করে, হঠাৎ শ্বশুরের হত্যার সংবাদ তাকে খুশীই করে, কেননা শ্বশুর ছিল জোতদার। কিন্তু এই খুশীর কারণ কি—শ্রেণীচেতনা? গল্পে সেরকম কোন ইঙ্গিত নেই। শ্রমিকের গল্পর মোতি স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনার যন্ত্রণার সামনে দাঁড়িয়ে তার পিসীকে পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেলে। বস্তুত এই বক্তৃতাধর্মিতা গল্প হয়ে উঠবার প্রাথমিক সর্তগুলিকেও বিনষ্ট করেছে। তাছাড়া লেখকের অস্বচ্ছ রাজনৈতিক বোধও ক্ষতিকারক। তৃপ্তি গল্পের নায়ক-নায়িকা ফুটপাথের বাসিন্দা, পদসঞ্চার গল্পের চরিত্রগুলি বাড়ি তৈরীর কাজে নিযুক্ত মিস্ত্রী বা কুলী। এদের নবজীবনে উত্তরণের প্রয়াস লেখকের বক্তব্য বিষয়, ফুটপাথের বাসিন্দারা নিশ্চয়ই প্রোলেটারিয়েট নয়, বা ড্রাইভারি শিখে নতুন জীবনে পৌঁছনো যায় না। কুলি মিস্ত্রিদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার যে বিকাশ দেখানো হয়েছে, তা অত্যন্ত সরল প্রক্রিয়ায় ঘটেছে এবং তাদের শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে লেখকের কোন দ্বিধা নেই। এছাড়া সব গল্পেই প্রায় লেখক সরবে নিজের সিদ্ধান্তটি গল্পের শেষে জুড়ে দিয়েছেন। গল্পের মধ্য দিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করতে না পারার ফলেই এটা করতে হয়েছে। লেখকের ভাষা অত্যন্ত কাঁচা, অকারণ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার ভাষার স্বাচ্ছন্দকে প্রায়ই ব্যহত করেছে। তার আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু চেতনা আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, লেখায় আরও চর্চা দরকার—নিছক জঞ্জাল বাড়িয়ে প্রগতি সাহিত্যের লাভ হয় না।

কিন্তু যদি বিষয় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রগতিশীল, সেই সঙ্গে থাকে আঙ্গিকের চমক, তাহলে পাঠকের পক্ষে সেটা এক-ধরণের সমস্যা। সুবিমল মিশ্রের রচনা সেইরকম (নাঙা হাড় জেগে উঠছে ঃ সুবিমল মিশ্র। পাঠক সমবায়। পাঁচ টাকা) সমস্যা। সুবিমলের গদ্যে নাঙা হাড় জেগে ওঠে বুর্জোয়াদের কাম্বাদাকানুনের খবর মেলে এবং সুবিমলের গদ্য কাঁচা নয়, গদ্যকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে তিনি চমক সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সুবিমল কি বলতে চান? নাঙা হাড় জেগে উঠছে গদ্যে এক বিপর্যয়কর অবস্থার প্রসঙ্গ আছে। বোঝাতে চাওয়া হয়েছে একদিন ভিখিরীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সারা শহর দখল করে নিতে পারে। ভিখিরী ভবঘুরেরা কি বিপ্লবী শক্তি? কোন্ দর্শনে বলে? আর যদি তর্কের খাতিরে তাই হয়, তাহলে এক ভয়ংকর ভবিষ্যৎএর সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না—এই আমরা কারা? লেখক নিজেও? অভ্যুত্থান তাঁর কাছে ভয়ংকর ভবিষ্যৎ? এক লেখককে কফিহাউস থেকে তুলে নিয়ে যায় তিনটি ছেলে, তারপর কয়েকদিন একটা ঘরে আটকে রেখে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, তাঁর লেখা কত নীরস, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। লেখক বুঝে গেলেন দরকার আগে রুটি, পরে কবিতা। যে সমাজব্যবস্থা, শিল্পীর সঙ্গে জীবনের দূরত্ব তৈরী করে, লেখককে সে সম্পর্কে কিছু বোঝাতে হল না। এত সহজ? বুর্জোয়া কাগজ প্রগতিশীল লেখকদের উদারতার ভাণ করে আমন্ত্রণ জানায়, সেই উদারতা লেখককে মুগ্ধ করে, তিনি ফাঁদে পা দেন। ফাঁদ কি শুধু এটাই। গোটা সমাজব্যবস্থার মধ্যেই কি সেই ফাঁদ নেই? সুবিমল সেই পরোক্ষ ফাঁদগুলিকে আড়াল করে রেখেছেন। অবশ্য সুবিমল ধরা পড়ে গেছেন বিপ্লবের দিকে তেত্রিশ ফুট বা রক্ত গল্পে। তিনি স্টাচু ভাঙার বিপক্ষে বক্তব্য রাখতেই পারেন, কিন্তু যদি ইঙ্গিত দেন যে বিদ্যাসাগরের কাছে বিপ্লবীদের শিক্ষার্থী হতে হবে তাহলে সেটা ভুল শেখাতে যাওয়া। "রক্ত" গদ্যে একটা রাজনৈতিক কর্মী একটা হত্যার পর অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। সুবিমল কি মনে করেন সব হত্যা ভুল। এই উদারপন্থী মানবিকতা মারাত্মক প্রবণতা, পক্ষান্তরে যা সাহায্য করে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই। এছাড়া অজস্র লেখাতে কলকাতা বা বাংলাদেশের টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরেন। কিন্তু সংবাদ পরিবেশন যেমন গল্প নয় তেমন প্রগতিশীলতাও নয়। সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে পাঠককে তিনি মজাই দিতে চান, এর বেশি কিছু নয়। এ জন্যই সুবিমল বিপজ্জনক। নাঙা হাড় জেগে উঠছে বুর্জোয়া কাগজের সম্পাদকের কৌশলের মতই একটা ফাঁদ। পাঠকের পক্ষে সমস্যাটা এখানেই—সতর্ক থাকা।

প্রকাশিত হয়েছে

তরুণ সাংবাদিক সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে

বিষয় সূচীতে আছে ঃ

● সত্যেন সেন, সত্যপ্রিয় রায়, অম্লান দত্ত, প্রতাপ চন্দ্র, জ্যোতি ভট্টাচার্য, অমিয় দাশগুপ্ত, সতীন চক্রবর্তী, সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, সুকোমল দাশগুপ্ত, সৌরীন ভট্টাচার্য, নির্মল বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, ভবেশ মৈত্র, সুশীল দেবদাস, সুব্রত মুখার্জী, চঞ্চল চক্রবর্তী, বিমান বসু প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

● ভারতে গঠিত সমস্ত শিক্ষা কমিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

● সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও উঃ ভিয়েতনামের শিক্ষা কাঠামোর বিস্তৃত বর্ণনা।

দাম : সুলভ ছয় টাকা ।। শোভন আট টাকা

প্রাপ্তিস্থান : ১। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২ ২। লেখক সমবায় সমিতি গ্রন্থ বিপনী ; ই ৯২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

চিলিতে বর্বর ফ্যাসিস্ত শাসন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

চিলির ফ্যাসিস্ত পিনোচেৎ-সরকার ইতিমধ্যেই ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার দেশপ্রেমিক মানুষকে খুন করেছে। নিহতদের মধ্যে অনেক শিশু ও রমণী রয়েছেন। কম করে ত্রিশ হাজার মানুষকে জঘন্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্যটি দিয়েছেন সুইস মানবাধিকার সমিতির সভাপতি ডেনিস পেরেট। শ্রীপেরেট মনে করেন, রাজনৈতিক বন্দীর পরিমাণ উপরোক্ত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। ধৃত বন্দীদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা নেতা লুই কারভালন রয়েছেন। ফ্যাসিস্ত পিনোচেৎ এই বর্ষীয়ান নেতাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছে। চিলির শ্রমিকদের সংগঠন কান্ট অভিযোগ করেছে যে কারভালনকে খুন করবার সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ফ্যাসিস্ত পিনোচেতের ঝড়া সেনসর এড়িয়ে যে সব খবর বাইরে আসছে তাতে জানা যায় যে, কারভালনকে কুখ্যাত ডেন্স আলামস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ঠাণ্ডা স্যাঁতে কুঠরীতে আটক রাখা হয়েছে। এখন চিলিতে প্রবল ঠাণ্ডা। সংশিলষ্ট কুঠরী গরম রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। এই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কারভালনের হাঁপানি রোগ খুব বেড়ে গেছে। গোপন ডাক্তারী রিপোর্টে জানা যায় যে, কারভালনের আলসার থেকে রক্তক্ষয় হচ্ছে এবং ভিটামিনের অভাবজনিত কারণে আরো নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। ডেনিস পেরেটের মতে, লুই কারভালনকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাই ঠাণ্ডা ঘরে রাখা ও ঔষধপত্র না দিয়ে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং কারভালনের মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে চালানোর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। পিনোচেৎ।

কারভালনের জীবন বিপন্ন জেনে সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষোভ হচ্ছে। এমন কি, য়ুরোপের বহু দেশের অকমিউনিস্ট মানুষ পর্যন্ত কারভালনের মুক্তি দাবী করেছেন। এই অবস্থায় কারভালনকে খুন করার নতুন কৌশল নিয়েছে পিনোচেৎ সরকার। আরো জানা যায়, চিলির নিষিদ্ধ সমাজতান্ত্রিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, চিলির সমাজতান্ত্রিক যুবসংস্থার সম্পাদক কার্লোস লর্কা তোবরকে সম্প্রতি ফ্যাসিস্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তাকে অজানা কোন গোপন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

চিলিতে রাজনৈতিক বন্দীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত। এমন কি, রাষ্ট্রসংঘ সমগ্র ব্যাপারটা সরেজমিন তদন্তের জন্য একটি কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেছিল। সেই অনুসারে রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার কমিশন একটি প্রতিনিধিদল চিলিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয় জেনিভায় অনুষ্ঠিত কমিশনের বৈঠকে। কিন্তু পিনোচেৎ সরকার প্রতিনিধিদলকে চিলিতে প্রবেশের অধিকার দেয় নি। কারণ হিসেবে পিনোচেৎ বলেছে যে, কমিশনের সদস্যদের পাঠাচ্ছে আন্তর্জাতিক মার্কসবাদীরা। রাষ্ট্রসংঘের কমিশনকে মার্কসবাদী আখ্যা দিয়ে জাতিসংঘের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে।

এই সব কাজ পিনোচেৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় করছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ মার্কিন মুল্লুকের পত্র-পত্রিকা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, আলেন্দেকে গদীচ্যুত ও অপসারণের পেছনে সি আই এ ছিল। খবরে জানা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন পিনোচেতের আপত্তি সত্ত্বেও পিনোচেতের অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত চালাবে। চিলিতে ফ্যাসিস্ত শাসনের পরে হাজার হাজার মানুষ দেশত্যাগ করেছেন। সেই সব দেশত্যাগী মানুষের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কমিশন তদন্ত চালাবে বলে আরো জানা যায়।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মদ্ধ লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৯শে আগস্ট ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

দিল্লীর নির্দেশে

বিজয় নাহার ও কৃষ্ণ শুক্লাকে বহিষ্কারের সুপারিশ পুনর্বিবেচনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহার ও কৃষ্ণকুমার শুক্লার কংগ্রেস সদস্যপদ আপাততঃ বাতিল হচ্ছে না। প্রদেশ কংগ্রেস প্রেরিত বিজয়বাবু সহ কয়েকজন এ আই সি সি সদস্যের বহিষ্কারের সুপারিশ দিল্লী থেকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য আবার প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে।

কিছুদিন আগে রাজ্য পরিষদীয় দলের সচিব লক্ষ্মীকান্ত বসু এক পত্রে বিজয় সিং নাহার, কৃষ্ণকুমার শুক্লা, কাশীকান্ত মৈত্র, শান্তি দাশগুপ্ত ও রামদাস ব্যানার্জীকে কেন তাদের দলবিরোধী কাজের অভিযোগে বহিষ্কার করা হবে না তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শাবার নোটীশ দেন। বিজয়বাবুরা এই অভিযোগ খণ্ডন করে উত্তর পাঠান। কিন্তু পরিষদীয় দলের সভায় অধিকাংশ সদস্যের ভোটে বিজয়বাবু সহ পাঁচজন এম এল এ-কে পরিষদীয় দল থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়।

এরপর প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও বিজয়বাবুদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ এনে উপরোক্ত পাঁচজন সহ আরও কয়েকজনের দল থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ প্রস্তাব নেওয়া হয়। কাশীকান্ত মৈত্র সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দল থেকে বহিষ্কারে প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী করা হয়। যেহেতু বিজয়বাবু, কৃষ্ণ শুক্ল এ আই সি সির সদস্য এবং এঁদের

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আবার রদবদল হবে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে দ্রুত রূপায়িত করার দিকে দৃষ্টি রেখেই এই রদবদল করা হবে।

এই রদবদলে কয়েকজন মন্ত্রী বাদ যাবেন বলে শোনা যাচ্ছে। আবার কয়েকটি নতুন মুখও দেখা যাবে।

কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া হয়তো আবার মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন। তা যদি হয় তাহলে তিনি খুব সম্ভব স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব পাবেন।

দেবকান্তবাবু মন্ত্রিসভায় গেলেও কিছুদিনের জন্য হয়ত কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বও পালন করবেন। কারণ খুব তাড়াতাড়ি নতুন কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত করা সম্ভব নাও হতে পারে।

দেবকান্তবাবু যদি শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় যান তবে নতুন কংগ্রেস সভাপতি কে হবে তা নিয়েও জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যাঁর নাম বেশী করে শোনা যাচ্ছে, তিনি হলেন বর্তমান রেলমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী।

কয়েকজন নবীন মন্ত্রী আরও বেশী দায়িত্ব পাবেন। কারণ এদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ভাল কাজ করছেন।

ওয়াকিবহাল মহলের খবর, এই রদবদলের ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রবীণ সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করছেন। এই কাজ শেষ হলে ঘোষণাটি করা হবে।

৪০৫০ জন কর্মী লে-অফ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ত্রিবেণীর কেশোরাম রেয়নের পাঁচশো উনসত্তর জন শ্রমিককে গত পঁচিশে আগস্ট থেকে লে-অফ করা হয়েছে। জরুরী অবস্থার সময় মালিকের এই শ্রমিকবিরোধী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বি পি টি ইউ সি রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কেশোরাম রেয়নের জাতীয়করণের দাবীও করা হয়েছে।

কেশোরামের কর্মীরা বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ধর্মঘট করে আসছিলেন। সরকারী মধ্যস্থতায় সে অচলাবস্থার অবসান হয় গত দোসরা আগষ্ট। কিন্তু একমাস পূর্ণ না হতেই আবার লে-অফের নোটীশ এল।

ন্যাশনাল রবারেও প্রায় এক হাজার কর্মীকে লে-অফ করা হয়েছে গত সতেরই আগষ্ট। মালিকের অজুহাত ঃ উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রী কমে গেছে। এই আগস্ট থেকেই শ্রমিকদের সাতাশ টাকা ডি এ কার্জর নির্দেশ দিয়েছেন। এ ঘটনার পূর্ববর্তী কোন নজীর নেই।

টেক্সম্যাকোর তিন হাজার কর্মীকেও লে-অফ করা হয়েছে গত সাতাশে আগস্ট থেকে। সংস্থার ইঞ্জিনীয়ারিং এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি অমূল্য দাসকে চার্জসীট দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আরও লে অফের হুমকী দিয়েছেন।

বিহারের বারো জন মন্ত্রী অঢেল টাকা পয়সা ও বাড়ি জমির মালিক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিহার মন্ত্রিসভার বারোজন কংগ্রেসী মন্ত্রী বর্তমানে অঢেল টাকা পয়সা, বেশ কয়েকটি বাড়ী ও জায়গা জমির মালিক বলে খবর পাওয়া গেছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং কংগ্রেসী নীতি অনুযায়ী অবৈধ এবং বেআইনী সম্পত্তির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে এই খবর জানা যায়।

খবরে প্রকাশ, মন্ত্রিসভার সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মোহাম্মদ হুসেন আজাদ বর্তমানে দুশো একুশ একর কৃষিযোগ্য জমি ও কয়েকটি বাগানের মালিক। এর মধ্যে অষ্টাশি একর এবং সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত আরও দু হাজার বিঘা জমি সরকারের হাতে তুলে দিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া পূর্ণিয়ার নোনাদি গ্রামে তার একটি দোতলা বাড়ী, ছেলের নামে আরও একটি বাড়ী এবং স্ত্রীর নামে কিষাণগঞ্জে একটি বড় গো-ডাউন রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতেও আজাদ সাহেবের একটি বড় পাকাবাড়ী ও একটি চা বাগান আছে। পাটনার হারুণ নগরে তাঁর ও স্ত্রীর নামে যে বাড়ীটি রয়েছে তার মূল্য নব্বুই হাজার টাকা। তার স্ত্রীর নামে আরও নব্বুই হাজার টাকা নগদ পাওয়া যায়। এছাড়া চল্লিশ তোলা সোনা, চারশো তোলা রূপা এবং স্বয়ং আজাদের নামে সাত হাজার টাকা নগদ পাওয়া যায়। পঞ্চাশ হাজার টাকার বীমা, কয়েকটি বড় কোম্পানীর শেয়ার, কিষাণগঞ্জে তিনটি চাল কল ও চারটি ময়দাকলের সন্ধানও পাওয়া গেছে তার নামে। তার নিজস্ব চারটি ফিয়াট গাড়ীও রয়েছে।

বন বিভাগের মন্ত্রী বোদসাও ঐশ্বর্যের দিক থেকে কম যান না। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি বর্তমানে চারশো একর ধানি জমির মালিক। তার কাছে পাওয়া গেছে নগদ এক কোটী টাকা। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তার নামে জমা রয়েছে ৩০,৯২,৭২০ টাকা। এছাড়াও বোদসা ও তার স্ত্রীর নামে দুটি ভিন্ন জয়েন্ট এ্যাকাউন্টে যথাক্রমে ৪৮,৯২৬০৪ এবং ৩৮,১১,৮৬৬ টাকা রয়েছে।

রাঁচী শহরে তার নামে বাসযোগ্য তিনটি বাড়ী আছে। ঝাকাপা গ্রামে আট একর জমির একটি বড় বাগান, টালির ছাউনি-

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

একজন উচ্চ পদাধিকারীর দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মহারাষ্ট্র রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান এল বি দুধনের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই তথ্য উদ্ঘাটন করেছে এ্যান্টি-কোরাপশন ব্যুরো।

শ্রীদুধানে বর্তমানে কুড়ি লক্ষ টাকা সম্পত্তির মালিক। বোম্বাইয়ে তার স্ত্রী এবং শ্যালিকার নামে চারটি বড় বাড়ী রয়েছে। এছাড়া তিনি ত্রিশটি কোম্পানীর শেয়ারের মালিক। এর মধ্যে কয়েকটি সংস্থা বিদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গে ব্যবসায়িক কারণে চুক্তিবদ্ধ। শ্রীদুধনের এই বিশাল সম্পত্তির উৎস এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তিনি প্রায়ই স্ত্রী ও শ্যালিকা সহযোগে বিদেশ ভ্রমণ করে থাকেন বলে অভিযোগ। তার এই ভ্রমণের টাকা জুগিয়ে থাকেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। অথচ উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিটিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করেন।

দেশী বিদেশী ওষুধ কোম্পানী দুহাতে মুনাফা লুটছে আর গরীব মানুষ ওষুধ পাচ্ছে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পেট্রোল ও রাসায়ণিক মন্ত্রক "সমাজের দুর্বল অংশের স্বার্থে অত্যাবশ্যক ওষুধ প্রস্তুত ও বন্টনের নয়া কর্মসূচী" গ্রহণ করেছেন।

অন্যদিকে ভারত সরকার নিয়োজিত হাতী কমিটির পঁচাত্তর সালে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় ঃ দেশ স্বাধীন হবার সময়ে মাত্র দশ কোটি টাকার ওষুধ তৈরী হচ্ছিল। ১৯৭৪ সালে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে চারশো আট কোটি টাকায়। বর্তমানে ২৬১৬টি ওষুধ শিল্প ইউনিটে তৈরী পঞ্চাশ হাজার ফর্মুলেশন বাজারে বিক্রী হচ্ছে। এই ইউনিটে একশ ষোলটি সংস্থা সংগঠিত, ২৫০০টি ক্ষুদ্র শিল্প পর্যায়ের।

এই সংগঠিত সংস্থাগুলি (ছেষট্টিটি বহুজাতিক আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগ বাকী পঞ্চাশটি ভারতীয়) মুনাফা অর্জনকারী শিল্পের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন (১৯৬৭) অনুযায়ী ওষুধ শিল্পে লগ্নীকৃত মূলধনের তুলনায় মুনাফার হার ষাট সালে চোদ্দ কোটি থেকে ছেষট্টি সালে বেড়ে হয়েছে সতেরো কোটি টাকা।

গত পাঁচ বছরে বিদেশী বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলি রপ্তানী করেছে পনেরো কোটি টাকার ওষুধ এবং বিদেশে মুনাফা পাচার করেছে ছাব্বিশ কোটি টাকা।

দেখা যাচ্ছে, দেশে স্বদেশী ও বিদেশী ওষুধ শিল্পের ইউনিটগুলি ওষুধ তৈরী করে (পঞ্চম যোজনায় নির্দ্ধারিত সীমা ২৭০০ কোটি) মুনাফা লুটছেন দু হাতে আর দেশের আপামর জন্য আর সাধারণ দুহাত তুলে আরোগ্য লাভের জন্য আর্জি জানাচ্ছেন ঈশ্বরের (?) কাছে। হাতী কমিটির রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শতকরা আশি জন মানুষ প্রাণান্তকর রোগেও ওষুধ পান না। এবং হাসপাতাল মোট ব্যয়ের তুলনায় ওষুধের ব্যয়ের হার শতকরা দশ টাকা মাত্র। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে, একশ ষোলটি অত্যাবশ্যক ওষুধ পেলেই শতকরা আশিজন রোগীর চিকিৎসা করা যায়।

সরকার জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হবেন যদি তারা শুধুমাত্র অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ বন্টনের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

মাদাম সান ইয়াৎ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শিবাজী ভট্টাচার্য

পিকিং ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১। উৎসমুখর চীনের রাজধানী। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ মণীষীরা এসেছেন। এসেছেন চিলির বিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা (যিনি তিয়াত্তর সালে অ্যাংলেন্দে বিরোধী প্রতি-বিপ্লবের সময় নিহত হয়েছেন), প্যারীর পত্তন উপন্যাসের লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ।

সুসজ্জিত সভামণ্ডপ। প্রশান্ত মৌনতা ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন এরেনবুর্গ। হাতে তাঁর স্তালিনের প্রতি-মূর্তি অঙ্কিত একটি পদক, যার দুপাশে যবের শীষ। পাশে বসা দীপ্তিময়ী এক মহিলার দিকে হাত বাড়িয়ে এরেনবুর্গ বললেন, "সোভি-য়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে মহান স্তালিনের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত এই পদক উপহার দেওয়ার ভার আমার ওপর পড়েছে, এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের শান্তিকামী সাধারণ মানুষ উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধু মহান স্তালিনের দিকে, শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন। স্তালিন চীন দেশেরও বিশ্বস্ত এবং চিরদিনের নির্ভরযোগ্য বন্ধু। আজ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সমগ্র জীবনব্যাপী আপনার (মাদাম সান ইয়াৎ সেন) কর্ম-সাধনা, শান্তির প্রতিমূর্তি মহান স্তালিনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত এই পদক আপনার অঙ্গে ধারনের যোগ্যতা দিয়েছে।"

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানে সেদিন যাঁকে ভূষিত করা হয়েছিল, তিনি হলেন মাদাম সুঙ চিং লিং; বিশ্ববাসী যাঁকে জানেন মাদাম সান ইয়াৎ সেন নামে। সমগ্র জীবনব্যাপী যাঁর কর্মসাধনা চীন বিপ্লবকে সাহায্য করেছে, এশিয়ার নারী সমাজকে মুক্তির সঠিক পথ দেখি-য়েছে, বিশ্বশান্তি আন্দোলনকে জোরদার করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কোয়াং টুঙ প্রদেশের হাইনান দ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পৈত্রিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা গেলেন। তখনকার চীনে ধনী পরিবারে এটাই ছিল প্রথা। আমেরিকায় শিক্ষালাভ করে ধনীর দুলাল দুলালীরা তার গাদটা নিয়েই দেশে ফিরত। সাধারণ মানুষের প্রতি ঘৃণা, বিলা-সিতা, অহমিকা এবং শোষণের নতুন পদ্ধতি সবই তারা আয়ত্ত করত এবং স্বদেশে ফিরে তা প্রয়োগে সচেষ্ট হত। সুঙ চিংকে কিন্তু এসব ছুঁতেও পারলো না। বরং স্বাধীনতাকামী আমেরিকাবাসীর কর্মোদ্যোগ তাঁর মনে তীব্র রেখাপাত করল। শোষণমুক্ত পূর্ণ স্বাধীন চীন প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

১৯০৫ সালে রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব বিদ্যুৎ দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তার অনুপ্রে-রণায় ১৯১১ সালে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্ব চীনা বিপ্লবীরা মাঞ্চু রাজবং-শকে উচ্ছেদ করে চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সুঙ চিং লিং দেশে ফিরে এসে এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

কিন্তু সে সময় চীনের বিপ্লবী শক্তি সম্পূর্ণ সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ মানুষের সংগঠিত শক্তি বিপ্লবের পুরোভাগে আসতে সক্ষম হয়নি। এর সুযোগ নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পা চাটা কুকুরেরা শাসন ক্ষমতা দখল করে ও চরম অত্যাচার শুরু করে। সান ইয়াৎ সেন প্রমুখ বিপ্লবীরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই প্রবাস জীবনে সুঙ চিং সান ইয়াৎ সেনের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান এবং ১৯১৫ সালে সানকে বিয়ে করেন।

১৯১৭ সালে রুশদেশে বিপ্লব সফল হলে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির সহায়তায় সান ইয়াৎ সেন সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গে সাম্রাজ্য-বাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী চীনের বিপ্লবী শক্তির মৈত্রী গড়তে অগ্রসর হলেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে চীনের শ্রমিক আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ হল কিন্তু ডাঃ সান ইয়াৎ সেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতা দেখে যেতে পারলেন না। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বামীর মৃত্যুতে সুঙ চিং লিং নিরাশায় ভেঙে পড়লেন না। ১৯২৪—২৭ সাল, প্রথম বিপ্লবী গৃহ-যুদ্ধ তখন চলছে। কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় সান ইয়াৎ সেন প্রতিষ্ঠিত কুয়োমিন্টাং দল তখন ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ তীরে যুক্ত-রাজদের ধ্বংস সাধনে ব্যস্ত। সমগ্র চীন বিপ্লবী প্রেরণায় উত্তাল। এই রকম সময়ে হঠাৎ কুয়োমিন্টাং নেতৃত্ব কমিউনিস্টদের পেছনে ছুরি মারল। আক্রমণ করল বিপ্লবী শক্তিকে। সুঙ চিং লিং চিয়াং কাইশেকের এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে বললেন যে, "সান ইয়াৎ সেনের ত্রিনীতি ভঙ্গ করা হয়েছে। জনসাধারণ এঁদেরকে বিচ্ছিন্ন করুন।" শুধু কথায়, নয়, কাজেও তিনি কুয়োমিন্টাঙের কার্যকরী সমিতি থেকে পদত্যাগ করলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে সান ইয়াৎ সেন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে-ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে বলো যে চীনের জনগণ তাদের অভেদ্য বন্ধু। চীন যেন কোনদিন তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হয়। সুঙ চিং লিং স্বামীর এই শেষ বাণীকে পৌঁছে দিতে সাতাশ সালে আগস্ট মাসে সোভি-য়েত যান।

নতুন প্রেরণায় তিনি দেশে ফিরে এসে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। একা-ধিক গণসংগঠনের কাজ তিনি পরি-চালনা করতে লাগলেন, যথা চীনা ব্যক্তি স্বাধীনতা সমিতি চীনা জন-কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি।

উনিশশো একত্রিশ সালের সেপ্টেম্বরে জাপান চীন আক্রমণ করল। জাপ-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশে গণআন্দোলন সুসংগঠিত হল। সুঙ চিং লিংও এই কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

তাঁর দুই বোন চীনের প্রতিক্রি-য়াশীল নেতা চিয়াং কাইশেক ও জেনারেল কুকে বিয়ে করেছিলেন। ভাই টি ভি সুং এবং পুত্র প্রতিক্রিয়া-শীল আদর্শের শিকার হয়েছিলেন। এ সব সত্ত্বেও এই নিষ্ঠাবতী নারী এক মুহূর্তের জন্যও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি।

উনপঞ্চাশ সালে মুক্তিফৌজ সমগ্র চীন মুক্ত করল। চীন কম্যু-নিস্টদের নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হল। দেশবাসী মাদাম সান ইয়াৎ সেনকে অন্যতম ভাইস চেয়্যা-রম্যান পদে নির্বাচিত করলেন।

ইজরায়েলের অর্থনীতি বিপর্যয়

ইজরায়েলের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অনুসৃত হঠকারী কর্মনীতি দেশের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। সমরসম্ভার উৎ-পাদনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পগুলির বিকাশ এবং সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান অর্থনীতিতে বি-সম অনুপাত সৃষ্টি করেছে। দেশের অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে সামরিকী-করণের ভিত্তিতে যার ফলে দেখা দিয়েছে স্থায়ী সঙ্কট। বল্গাহীনভাবে সামরিক শক্তি গড়ে তোলা এবং বিপুল পরিমাণে ব্যয়বহুল অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার ফলে দেনার পরিমাণ ও রাষ্ট্রের ঋণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ইজরায়েল এখন ধার করেই বেঁচে আছে এবং তার অর্থ-নৈতিক ও আর্থিক বিপত্তি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। এইসব বিপত্তি ও অসুবিধা এমন বিরাট আকার ধারণ করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক উগ্র ইহুদী রাষ্ট্রসাম্রাজ্যবাদী সংগঠনের বিপুল অর্থ সাহায্যও ইজরায়েলী অর্থনীতি-কে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারছে না।

যুদ্ধবাবদ ইজরায়েলের খরচ হয়েছে ৩৫০০ কোটি ডলার এবং অস্ত্রসজ্জার কর্মসূচীর জন্য আরও শত শত কোটি ডলার ব্যয় করার দরকার হয়। বর্তমানে সামরিক ব্যয় বাবদ দেশের জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ চলতে হচ্ছে। ১৯৭৩-৭৪ সালের আর্থিক বছরে ইজরায়েলের সামরিক ব্যয় (মাথা পিছু হিসাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী) দাঁড়ায় মোট বাজেটের প্রায় অর্ধেক। চলতি বছরে সরকার সামরিক উদ্দেশ্যে আরও বেশী অর্থ —৩৬০ কোটি ডলার—মঞ্জুর করে-ছেন। একটি ছোট্ট দেশের পক্ষে বিপুল এই অর্থ অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপ-করণ ক্রয়ের এবং স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী পুনর্গঠনের জন্য ব্যয় করা হবে।

১৯৭৪ সালে ইজরায়েলের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ শত কোটি ডলার (আগের বছরের চাইতে দুই শত কোটি ডলার বেশী) এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি যথেষ্ট বেড়ে যায়। মনে হয় যে, ১৯৭৫ সালে ইজরায়েলের সামরিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮ শত কোটি ডলার। মুদ্রাস্ফীতি দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের তুলনায় চারগুণ বেড়ে গেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় ঊর্ধ্বমুখী। অর্থমন্ত্রী ইহোশুয়া রাবিনোভিৎস বলেছেন যে, "অক্টোবর যুদ্ধের জন্য ইজরায়েলকে পরবর্তী দশ বছরের সব কিছু দিতে হবে।"

এইসব অবস্থা রাবিন সরকার-কে ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন-বিধানের জন্য "নয়া অর্থনৈতিক কর্ম-সূচী" গ্রহণ করতে বাধ্য করে। কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য হল সামরিক ব্যয়ের জন্য কর বৃদ্ধি করা। এই "উন্নতি বিধানের কর্মসূচী" রূপা-য়ণের অর্থ মেহনতি জনগণের গুরুত্ব-পূর্ণ স্বার্থগুলি ক্ষুণ্ণ করা ও অর্থনীতির অ-সামরিক শাখাগুলিতে উৎপাদন হ্রাস করা এবং এর ফলে যে অর্থ বেঁচে যাবে তা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যয় করা।

এই কর্মসূচী রূপায়ণের প্রথম ফল আশানুরূপ হয়নি, তাই ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে সরকার অতি-রিক্ত কয়েকটি জরুরী ব্যবস্থা অব-লম্বন করেন। ইজরায়েলী পাউণ্ডের ৪৩ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটানো হয় এবং খাদ্যদ্রব্য, অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ও আলানীর দাম দারুণ ভাবে (১৯৭৩-৭৪ সালের আর্থিক বছরে এই সব জিনিসের দাম গড়ে ৩৮ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল) বাড়িয়ে দেওয়া হয়। পাউরুটির দাম ১০০ শতাংশ, চিনির দাম ২০০ শতাংশ এবং বনস্পতির দাম ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্যাদির দর বেড়ে যাওয়ার ফলে শহরের পরি-বহনের ভাড়া ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জলের বাবদ দেয় অর্থের হার বেড়ে যায় এবং রেলের ভাড়াও বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৪ সালে ইজরায়েলের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় তিন শত কোটি ডলার। এই ঘাটতি কমানোর উদ্দেশ্যে ইজরায়েলী সরকার আমদানি কমিয়ে রপ্তানী বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ আমদানির বেশীর ভাগ হলেও এসব জিনিসের আম-দানি কমানো হয় নি। বহু পণ্যের উপর করবৃদ্ধি করা হয় এবং মোটর গাড়ী, টেলি ভশন সেট এবং কাপড়-চোপড় কাচার যন্ত্র সহ ২৯টি জিনি-সের আমদানির উপর ছয় মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

এই বছরের ১ এপ্রিল থেকে যে আর্থিক বছর শুরু হয়েছে সেই আর্থিক বছরে বিভিন্ন আর্থিক ব্যব-স্থার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় মুনাফার, উপর কর ধার্যের উপর। বিশেষজ্ঞদের হিসাবে এই করের প্রতি শতাংশ রাজকোষে ৫০ থেকে ৬০ কোটি ডলার যোগাবে। দেখে মনে হতে পারে যে, ইজরায়েলী অর্থনীতির সামরিকীকরণের দৌলতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে সব কোম্পানীর আয় ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে তাদের মুনাফার কিছুটা অংশ ছাড়তে হবে। কিন্তু আসলে এই কর বাবদ অর্থ আসবে শেষ পর্যন্ত জনগণের পকেট থেকে। শিল্প-পতিরা করকে উৎপাদনের খরচার একটি অংশ বলে মনে করেন এবং

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে ভারতীয় নারীদের অবস্থান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্বে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা এবং কর্মরত জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তাদের অধিকারে। সে তুলনায় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা এখনও গৌণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থা কি? আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমদপ্তর থেকে "শিল্পে নারী" নামক প্রকাশিত পুস্তিকায় মহিলাদের কাজের সুযোগ মজুরী, ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্পে আন্তর্জাতিক মহিলা শ্রমিক সংস্থার ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পুস্তিকার মাধ্যমে জানা যায়, একাত্তর সালের গণনা অনুযায়ী দেশের মোট ১৮০.৪ লক্ষ কর্মরত জনসংখ্যার মধ্যে ৩১.৩ লক্ষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১১.৯ শতাংশই মহিলা। শুধুমাত্র দেশের নগরাঞ্চলের আশি ভাগেরও বেশী মহিলা কৃষিকর্মে যুক্ত। সহজেই অনুমেয়, এরা সকলেই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। তেয়াত্তর-চুয়াত্তর সালের হিসাবের ভিত্তিতে বলা হয়েছে এর মধ্যে ৭.২ শতাংশ সরকারী শিল্পে কর্মরত।

একশি শতাংশ অর্থাৎ দুশো চোদ্দ লক্ষ কর্মরত মহিলাই এখন গ্রামের অধিবাসী। এরা অর্থনৈতিক দিক থেকে দারিদ্র্য সীমার নীচে। প্রায় সকলেই ভূমিহীন কৃষি পরিবারের অন্তর্গত। কৃষি ছাড়া শিল্পের সঙ্গে যে মহিলাকর্মী যুক্ত আছেন গত দশ বছরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হত ঘটেই নি, বরং তা নিম্নগামী। উনিশশো তেষট্টি সালে শিল্পে কর্মরত মহিলার সংখ্যা ছিল ১০.৩৭ শতাংশ, বাহাত্তর-এর হিসেবে তা দাঁড়িয়েছে ৮.৭৩ শতাংশে। অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মহিলা শিল্পে নিযুক্ত। খনি অঞ্চলেও মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা অধোগামী। আটষট্টি সালে ছিল ২৮.৬ শতাংশ, বাহাত্তর সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৬.২ শতাংশ। গত তিন বছরে সে সংখ্যা আরও কমেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

চুয়াত্তর সালের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত ২১.৮৮ লক্ষ মহিলা কর্মী সরকারী শিল্পে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহন, ষ্টোরেজ ও যোগাযোগ ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর সংগঠনগুলির সঙ্গেও বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী যুক্ত। এদের সংখ্যা সংগঠিত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সর্বমোট মহিলা কর্মীর অর্ধেক। প্রস্তুতকারক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে শতকরা কুড়ি ভাগ। বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালিত সরকারী শিল্প শাখাগুলিতে শতকরা বিয়াল্লিশ ভাগ কর্মী যুক্ত আছেন। আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাকর্মীর সংখ্যা ১৫.৫ শতাংশ হলেও কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলিতে এই সংখ্যা মাত্র ৮.২ শতাংশ।

সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলিতে কর্মরত মহিলাসংখ্যার তুলনামূলক বিচারে বলা হয়েছে যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেসরকারী সংস্থা অপেক্ষা সরকারী সংস্থায় ছয়গুণ বেশী মহিলাকর্মী নিযুক্ত ছিলেন, যান্ত্রিক ও কারিগরী শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থায় এই সংখ্যা বেসরকারীর চাইতে দ্বিগুণ।

ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসে এ পর্যন্ত ৬,১৩,৪৩৭ জন কর্মপ্রার্থীর মহিলা নাম রেজিষ্ট্রী করেছেন। বিভিন্নস্থানে ৩২,০০০ শূন্যপদ মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। তার মধ্যে ২৮,০০০ অর্থাৎ সাতাশি শতাংশেরও বেশী কর্মী চাকুরীলাভে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু দেশের মোট মহিলা কর্মপ্রার্থীর তুলনায় এ সংখ্যা কিছুই নয়। বাহাত্তর সালে এই সংখ্যা ছিল ৭.৬৩ লক্ষ, চুয়াত্তর সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৭৩ লক্ষ।

মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও কম নয়। চাকরীর বাজারে কারিগরি বা বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেয়ের সংখ্যাও যথেষ্ট। দিল্লী, দেরাদুন, চণ্ডীগড় ও মাদ্রাজ—এই চারটি স্থানে বিবিধ শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের যে কেন্দ্রগুলি রয়েছে তার মধ্যে ইঞ্জিনীয়রিং ও অন্যান্য শিল্পে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে মেয়েদের জন্য যথাক্রমে ৮৮ ও ১,০১০টি আসন সংরক্ষিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, সর্বসাকুল্যের একশ চার জন মেয়ের পক্ষে এই শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে।

১৯৪৮ সালের নিম্নতম মজুরী আইনের বিধির সংশোধিত বেতন হার অনুযায়ী পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও কোন কোন শিল্পে এখনও উভয়ের মধ্যে বেতন হারের চূড়ান্ত ব্যবধান রয়েছে। বিশেষ করে প্রস্তুতকারী শিল্প চা বাগিচা ও খনিতে এই নিন্দনীয় ব্যবধান রয়েছে। অন্যান্য প্রস্তুতকারী শিল্পের মধ্যে ম্যাচ ফ্যাকটরীগুলির বেতনহারে ব্যবধান চূড়ান্ত। এখানে পুরুষরা মেয়েদের তুলনায় চারগুণ বেশী মাইনে পায়।

একমাত্র চার পাঁচটি রাসায়নিক শিল্পে এর বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়।

সরকারী সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সামাজিক সচেতনতা ও অধিকারবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে মেয়েরা ব্যাপকহারে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং ক্রমাগত তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শ্রমিক স্বার্থের ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠে। বাষট্টি সাল থেকে আটষট্টি সালের মধ্যে মেয়েদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের সংখ্যা শতকরা চোদ্দ ভাগ বেড়েছে। আটষট্টি সাল পর্যন্ত মহিলা ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় তিরিশ হাজারেরও বেশী।

শিশু ও মহিলাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বিশেষভাবে সচেতন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংবিধানের বিধিকে আরও সুসংহত রূপ দেবার জন্য এ পর্যন্ত চোদ্দটি কিনভেনশন ও একশ আটচল্লিশ বার বিবিধ সুপারিশ গৃহীত হয়েছে।

বলবাহুল্য, সমীক্ষার এই পরিসংখ্যান আজ থেকেও দু বছরের পুরোনো। এর পরেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়া সরকারী পরিসংখ্যানকে কিছু বাড়িয়ে ধরে সমস্যাটি অনুমান করাই সতঃসিদ্ধ রীতি।

চিলিতে বন্দী নির্যাতন

পিনোচেটের একনায়কতন্ত্রী সরকার যে নতুন করে নির্মম অত্যাচার সুরু করেছে পৃথিবীর মানুষ তা জানতে পেরেছে। কারাগারে গণঐক্য সরকারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের ১১৯ জন দেশপ্রেমিকের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে। সম্প্রতি চিলির সামরিক শাসকরা ১১৯ জন দেশপ্রেমিকের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে এবং বলেছে যে এদের পাওয়া যাচ্ছে না।

সংবাদপত্রগুলি এখন পুরোপুরিই তাদের হাতে। এই সব সংবাদপত্রে তারা গল্প ছেড়েছে। যাদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তারা নাকি আর্জেন্টিনা এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে নিহত হয়েছে। এইসব মিথ্যা খবর প্রচারের প্রতিবাদে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাতে পিনোচেটের মানববিদ্বেষী রূপ ও ভয়ঙ্কর প্রকট হয়ে উঠেছে। আর্জেন্টিনার সংবাদপত্র 'ওপিনিয়ন' বলেছে, যাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না বলা হচ্ছে তাদের যে হত্যা করা হয়েছে তার প্রমাণ তাদের হাতে আছে। সংবাদপত্রটি জুন্টাকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে এবং যে পরিস্থিতিতে চিলির দেশপ্রেমিকরা মৃত্যু বরণ করেছেন তার যথাযোগ্য তদন্ত দাবী করেছেন।

ফ্যাসিবাদ যখন নিজেদের অপরাধ ও অপকর্মের সমর্থন করে তখন তারা বাগাড়ম্বর ও মানব বিদ্বেষের আশ্রয় নেয়। সন্ত্রাস ও হিংসার নীতিকে গোপন করার জন্য এসব কথার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত কমিশনের প্রতিনিধিদের এজন্যই চিলিতে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। কারণ তাঁরা চিলিবাসীদের গ্রেপ্তার ও রহস্যজনক অন্তর্ধান সম্পর্কে তদন্ত করতে চেয়েছিলেন।

সত্যকে কেউ কোনদিন গোপন করে রাখতে পারেনি। চিলির জুন্টাও পারবে না। পৃথিবীর অগণিত মানুষ জানে যে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর চিলিতে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সেই সময় যাঁদের জেলে পাঠানো হয়েছে তাঁদের সংখ্যা ১৫০ ০০৬-রও বেশী। মনে হচ্ছে, বন্দী শিবিরগুলিতে হাজার হাজার দেশপ্রেমিকের কোন খোঁজ খবর নেই। যাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আছেন। যেমন গণঐক্য সরকারের আমলে চুকিকামাটা তামাখনির জেনারেল ম্যানেজার, কমিউনিস্ট ডেপুটি সিলভার ম্যান এবং জাতীয় গৃহ নির্মাণ শ্রমিক ফেডারেশনের একজন নেতা হেক্টর কুয়েভাস। সেই জন্যই চিলির রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম দেশে দেশে তীব্র হয়ে উঠছে এবং সেই জন্যই পিনোচেট জুন্টার সন্ত্রাস ও হিংসা বন্ধের দাবীতে পৃথিবীর মানুষ দিন দিনই মুখর হয়ে উঠছে। এ খবর দিয়েছে তাস

অবহেলিত রাস্তা

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়না থানার এগারো মাইল ব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রঘুনাথবাড়ি-পাঁশকুড়া আড়ং কিয়ারাপাময়না আজো সরকারের দৃষ্টি লাভ করাতে সক্ষম হয় নি। এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা বহুদিন থেকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও ব্যর্থ হয়েছেন। রাস্তাটি সংস্কারের আশু প্রয়োজন। কারণ বর্ষায় মানুষের যাতায়াতের বেশ অসুবিধা হয়। বর্ষায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বলতে গেলে দ্বীপের মধ্যে বাস করে থাকেন।

রাজ্য সরকার গ্রামের উন্নতির জন্য আট কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং এই অঞ্চলের প্রায় দেড় লক্ষ গ্রামবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন রাজ্য সরকার যদি এই রাস্তা যাতায়াতের উপযোগী করা যায়।

বোবার স্বর্গ

অনার্য মিত্র

অদৃষ্টবাদী
কথায় শুধু চটক,
আসল কাজের সময়ে তুই
ভেজিয়ে দিলি ফটক।

দুষ্টজনে দুষ্ট হলে
তুই কি হবি শিষ্ট,
এই কি ইতিহাসের বিধান
বলেছে কোন্ খৃষ্ট?

চতুর্দিকে গরম হাওয়া
রাখিস মাথা ঠাণ্ডা,
ঘরকুণো তুই ঘরের কোণে
ভাজবি কি ভ্যারাণ্ডা?

এমন শিষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট
আছে বা কার খোঁজে,
আস্তর নামে হাল ছেড়ে দেয়
অদৃষ্টে মজে।

বাচাল ছেলে
তোবা তোবা তোবা
কাল ছিল যে বাচাল ছেলে
আজ হল সে বোবা।

নড়েনা সে কয়না কথা
এমনি আজব সং,
বৌ-এর খোঁপায় ফুল গুঁজে
সে করছে নানান ঢং।

ঢং যদি তুই করবি এমন
বাচাল হলি ক্যানে,
মিছেই ক্যানে মানুষের মন
ভরিয়ে দিলি জলে?

ধুস্তুরি ছাই পোড়া কপাল
ধুস্তুরিকা ধুৎ,
যারে দিয়ে ভুত ছাড়ব
তারে ধরল ভুত।

দেশের শোভা
গাধা পেটালে
হয়না কভু ঘোড়া,
ঘাস বেঁধেও হয় না
ফুলের তোড়া।
চোখ রাঙালে
মানুষ যে হয় বোবা,
বোবা মানুষ
মহান দেশের শোভা।
এমন শোভা
বড়ই মনলোভা,
এক ধমকেই সবাই
হাবাগোবা।
আধপেটা খাই
দাঁত কেলিয়ে হাসি,
সুখী দেশের
নীরব অধিবাসী।
কানে গোঁজা তুলো
আর পিঠ বাঁধা কুলো,
হাতে নিয়েছি বিশালাক্ষীর
বৃহদাকার মূলো।

মার্কসবাদের বিকাশশীলতা ও সর্বহারা বিপ্লবী

মণি চৌধুরী

জ্যামিতিতে একটি রেখার পাশে আরেকটি ছোট কিংবা বড় রেখা অংকন করলে যেমন পূর্ববর্তী রেখাটিকে বড় কিংবা ছোট প্রমাণ করা যায় তেমনি প্রকৃতি বিজ্ঞানেও পরবর্তী আবিষ্কার পূর্ববর্তী আবিষ্কারকে বাতিল অথবা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকাস এবং ব্রুনোর প্রচেষ্টা গ্যালিলিওর আবিষ্কারের মধ্যে রূপ পেল। তেমনি সমাজ বিজ্ঞানে প্যারী কমিউন উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সর্বহারা বিপ্লবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্নকে তুলে ধরলো। রুশ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল দেশগুলির সর্বহারা বিপ্লবে জাতীয় সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিল। সর্বহারা চীন বিপ্লব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয় সাধন করে এগিয়ে গেল। মাও সে তুং চিন্তাধারা লেনিনবাদ সম্পর্কে ভাবিয়ে তুললো। এইভাবেই মার্কসবাদ বিকশিত হচ্ছে। মার্কসবাদ বস্তু এবং চেতনার বিকাশশীল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান সব সময় পরীক্ষা নিরীক্ষা দাবী করে এবং বিফলতা সেখানে সফলতার অপরিহার্য অঙ্গ। যারা অনুশীলনের মধ্যে মার্কসবাদের এই বিকাশশীলতা দেখেন না তারা মার্কসবাদী নন।

বিজ্ঞান হলো কোন বস্তুর নিয়মবিধি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে যুক্ত। এ কারণে তাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতার জন্য বস্তুগুলি একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সবল বস্তু প্রভাবিত করছে দুর্বল বস্তুকে দুর্বল বস্তু প্রভাবিত হচ্ছে সবল বস্তুর দ্বারা। পারস্পরিক প্রভাবের ফলে বস্তুগুলির মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে গতিবেগ। এই গতিবেগ বস্তুগুলিকে করছে পরিবর্তিত। এ কারণে কোন বস্তুর নিয়ম বিধি সম্পর্কে জ্ঞান হলে বস্তু জগতের আংশিক জ্ঞান। মার্কসবাদ হোল সচেতন অনুশীলন এবং চিন্তার দ্বারা বস্তু জগতের নিয়মবিধি জেনে মানুষের চেতনা জগতের পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে সমাজে গতিবেগ সৃষ্টি করার বিজ্ঞান। তাই মার্কসবাদ বস্তু এবং চেতনা জগতের সাধারণ জ্ঞান। প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখায় আবিষ্কারগুলি এবং সামাজিক বিপ্লবগুলি মার্কসবাদের সঠিকতা বেশী বেশী করে প্রমাণ করে চলেছে। মার্কস এঙ্গেলসের লেখাগুলির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে মার্কসবাদ। তাই লেনিন সঠিকভাবেই বলেছিলেন, "মার্কস এঙ্গেলস— মার্কসিজম।" মার্কসবাদ অনুশীলনের মধ্যদিয়ে কমিউনিস্টরা নির্দিষ্ট সমাজে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে। একমাত্র বিশ্ব কমিউনিজমের মাধ্যমে মার্কসবাদ সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হবে। তাই কমিউনিস্টরা হোল আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং কমিউনিজম হোল ব্যক্তিমালিকানাহীন মানবতাবাদ।

পুঁজিবাদ বিকাশের পূর্বে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের ব্যবসায়ী পুঁজি বাণিজ্যিক পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়ে অর্থবল, সৈন্যবল এবং নানা অপকৌশলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতিসত্তাগুলিকে পদানত করতে শুরু করেছিল। এইভাবে বাণিজ্যিক পুঁজি বিভিন্ন দেশের বাজার, সম্পদ দখল করে নিজেদের দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধতর করে শিল্প পুঁজির বিকাশ ঘটিয়েছিল। তারপর তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করে একদিকে যেমন সামন্ত শাসনকে উৎখাত করল এবং কৃষক সমস্যার সমাধান করে গণতান্ত্রিক এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি জাতিতে পরিণত হয়ে বিশ্বকে শান্তি মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী শোনাল, অন্যদিকে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির ব্যবসায়ী পুঁজির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামন্তদের সঙ্গে কখনো সংগ্রাম কখনো আপোষ করে জাতিসত্তাগুলিকে পদানত করে পরাধীন নির্ভরশীল দেশের এক বিরাট সাম্রাজ্যের সৃষ্টি কোরল। উন্নত দেশগুলির শিল্প পুঁজি বিকাশের একটা পর্যায়ে ব্যাঙ্ক পুঁজির সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি কোরল একচেটিয়া পুঁজির। জন্ম হোল ট্রাষ্ট, কার্টেল, সিণ্ডিকেটের। লগ্নী পুঁজি শুরু কোরল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করতে। একচেটিয়া পুঁজির দেশীয় সংস্থাগুলি বিশ্ব সংস্থায় পরিণত হতে লাগল। এইভাবে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের উন্নত পুঁজিবাদ সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করতে শুরু কোরল। প্রধানত অনুন্নত দেশগুলির কাঁচামাল বাজার এবং শ্রমশক্তির উপর দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদ হোল পরজীবী ও ক্ষয়িষ্ণু। শুরু হোল পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী যুগের। এই ভাবে পৃথিবীর দেশগুলি পদানত আর পদানতকারী এই দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। বিপ্লবের সম্ভাবনা ঘনীভূত হোল সাম্রাজ্যবাদের শোষণে জর্জরিত পদানত অনুন্নত নির্ভরশীল দেশগুলিতে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী বিদেশী পুঁজি অনুপ্রবেশের ফলে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ ঢিমেতালে শম্বুকগতিতে এগুতে শুরু কোরল। দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর শক্তিশালী বৃহৎ অংশ বিদেশী পুঁজির সঙ্গে যুক্ত থেকে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের সঙ্গে আপোষ করে চলতে শুরু করল। ফলে পূর্বের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের থেকে এই দেশগুলির বিপ্লবের সমস্যা ভিন্নতর হয়ে দেখা দিল। বিদেশী পুঁজি এবং জাতিসত্তাগুলির অনগ্রসরতা নতুন সমস্যা হিসাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামনে আবির্ভূত হোল। কৃষক সমস্যা সাধারণ মৌলিক সমস্যা হিসাবেই রয়ে গেল। ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী কৃষকদের সঙ্গে নিয়েই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করেছিল। জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবের মধ্যেই কৃষকদের ত্যাগ করেছিল। কিন্তু ফরাসী কিংবা জর্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সামনে বিদেশী পুঁজির সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল না অনগ্রসর জাতি সত্তাগুলির এমন বিকাশের। অনুন্নত দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর এক অংশ বিদেশী পুঁজির সঙ্গে যুক্ত থেকে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের সঙ্গে আপোষ করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিরোধী ভূমিকা নিল। অন্য অংশের মধ্যে দেশপ্রেম থাকা সত্ত্বেও বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীলতার কারণে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়ে পড়ল। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণের দায়িত্ব এসে পড়ল সর্বহারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের উপর।

বিদেশী পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব মুক্ত না হয়ে কোন একটি দেশ প্রকৃত জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। স্বাধীন পুঁজিবাদই জাতিসত্তাগুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে এক একটি দেশকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এক একটি জাতিতে পরিণত করেছিল। ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি জাতি গঠনের ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়। অনুন্নত দেশগুলিতে বিদেশী পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। এই সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক চেতনা জাতীয় চেতনা বিকাশের উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই সমস্ত দেশে সর্বহারা বিপ্লব হোল জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব হোল সর্বহারা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অংশ। সর্বহারা কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব নীতি, পদ্ধতি পরিকল্পনার দ্বারা পরিচালিত যে কোন বিপ্লবই হবে আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের অংশ। এই বিপ্লব নির্দিষ্ট সমাজটির বিকাশের যে স্তরেই ঘটুক না কেন তার মূল লক্ষ্য থাকে ব্যক্তিমালিকানাহীন সাম্যবাদী সমাজ গঠন। এ কারণে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নির্দিষ্ট সমাজের বিকাশের স্তর অনুসারে সর্বহারা একনায়কত্বের রূপেরও পার্থক্য হয়। অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থাই মানুষের রাজনৈতিক সামাজিক চেতনা নির্ধারণ করে এবং রাজনৈতিক সামাজিক চেতনা অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। মার্কসবাদ অনুশীলন করে কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক সামাজিক চেতনার পরিবর্তন করে সচেতনভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা নির্ধারণের হাতে নেয়। আর এখানেই ছিল রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির সর্বহারা চেতনার সীমাবদ্ধতা।

সচেতনভাবে ইতিহাসের নিয়ম

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সাহিত্য সেমিনার প্রসঙ্গে

পনেরোই আগষ্ট দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাভলভ ইনস্টিটিউটে সাহিত্য সেমিনার প্রসঙ্গে লিখিত শ্রীনির্মল সাহার পত্রটি কিছু অংশে উদ্দেশ্যমূলক ও স্থানে স্থানে বিকৃত। আমি উক্ত সেমিনারের কথাসাহিত্যের দিন দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় শ্রোতা হিসাবে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলাম। সেদিন সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে শ্রোতার সংখ্যা কুড়ি, পঁচিশ জনের বেশী ছিল না। সভার মূল উদ্বোধক বক্তা অসীম রায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীসুধী প্রধান প্রবন্ধ পাঠ শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর অসীম রায় উপস্থিত হলে ধনঞ্জয় দাশ ও অমিতাভ দাশগুপ্ত সুধী প্রধানকে বাধা দিয়ে সভাপতির উদ্দেশ্যে বলেন, "উনি অনেক সময় নিয়েছেন। অন্যান্য বক্তা—"। এই সময় অমিতাভবাবু তপোবিজয়ের নাম করলে তপোবিজয় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেন, "আপনি সুধীদাকে বাধা দিচ্ছেন কেন, তাঁকে পড়তে দিন, আমরা না হয় কম করে বলব।" তাঁর এই কথা আমি স্বকর্ণে শুনেছি। তখন প্রবন্ধ পড়া না পড়া নিয়ে বেশ গোলমাল চলছিল। তপোবিজয় সভাপতিকে উদ্দেশ্য করেও এই কথা বলেন। এই সময় আমিও তাকে সমর্থন করি। নির্মল সাহা যদি তা না শুনে থাকেন তবে তার দায় আমাদের নয়। সভার শেষে তপোবিজয়ের সঙ্গে সুধীপ্রধানের কোনো কথা হয়নি। সুধীবাবু এসে বললেন প্রতিবাদ করা উচিত ছিল ইত্যাদি, নির্মল সাহার বানানো কথা ভিত্তিহীন।

সেমিনারের একজন অনিমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে যতটুকু প্রতিবাদ শোভন ও সঙ্গত ছিল তপোবিজয় তা করেছিলেন। সময়াভাবে সুধীবাবু তার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পাঠ করতে পারেন নি। বাকি অংশ অতিদ্রুত মুখে মুখে সংক্ষেপে বলে শেষ করেন দু তিনজন ছাড়া প্রায় সকলেই তার প্রবন্ধের প্রশংসা করেছেন— এটাও সত্যঘটনা। "পরিচয়ের" অন্যতম সম্পাদক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুধী প্রধানকে যেমন আক্রমণ করেন তেমনি সরাসরি জোরালো ভাবে তপোবিজয়কেও আক্রমণ করেন— এটাও ঘটনা। সবশেষে একটা কথা। সুধীপ্রধান ও তপোবিজয় উভয়েই আমাদের পরিচিত গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট লেখক ও কর্মী। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের দ্বারা উভয়ের সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে নির্মল সাহা মশাইরা কার স্বার্থ সিদ্ধি করছেন? বাঘাদানকারীদের মুখগুলিই চাপা হাসিতে ভরে উঠেছে, তা একবার তাঁরা ভেবে দেখছেন না?

সাধন চট্টোপাধ্যায়

মেয়েদের আচরণ প্রসঙ্গ

পঁচিশে জুলাই তারিখের দর্পণে "আমাদের চোখে মেয়েরা" পড়লাম। প্রতিবেদক শঙ্খশুভ্র বিশ্বাসের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। প্রথমত, প্রতিবেদনটির নাম "আমাদের চোখে মেয়েরা" না হলেই ভালো হত। দ্বিতীয়ত, নারীরা বঞ্চনা নিয়ে জন্মায়, বঞ্চনা নিয়ে যায় একথা আদৌ সত্য নয়, ব্যতিক্রমের কথা অবশ্য আলাদা। তৃতীয়ত, ছেলেরা চাকরী করলেই "মাল" খেয়ে টাকা নষ্ট করবে আর মেয়েরা চাকরী করে টাকাটা বাপ-মা ভাই বোনের জন্য খরচ করবে এটাও সর্বদা সত্যি নয়, অনেক মেয়ে তার চাকরীর টাকা প্রতি মাসে শাড়ী, প্রতি সপ্তাহে সিনেমা-থিয়েটার এবং প্রসাধনীতে খরচ করেন। চতুর্থত, বেকার ছেলেকে কোন মেয়ে জীবন সঙ্গীরূপে পেতে চায় না, তিনি চাকুরীরতা হোন বা নাই হোন, কিন্তু ছেলেরা বেকার মেয়েদের জীবন সঙ্গিনী করে তার সব দায় দায়িত্ব বহন করে চলে।

পঞ্চমত, নারীত্বের অ-মানবিক মূল্যের জন্য মেয়েরা নিজেরাই দায়ী। বিজ্ঞাপনে, সিনেমায় নারীর মাতৃত্ব রূপকে ঢাকার যে অপচেষ্টা চলে তার বিরুদ্ধে কোন মেয়ে প্রতিবাদ করেন না। প্রতি বৎসর "বিউটি কনটেস্টে" যোগ দিয়ে মেয়েরা নিজেদের শ্রী শালীনতা কি হারাচ্ছেন না? শিল্পের নামে চলে ক্যাবারে, স্ট্রিপটিজ প্রভৃতি অপসংস্কৃতি সম্পন্ন নাচ। ষষ্ঠত, রাস্তাঘাটে মেয়েরা চললে ছেলেরা দেখে ঠিকই। কিন্তু মেয়েরা মেয়েদের এক পলক দেখেই তার সাজসজ্জা, কেশবিন্যাস, চলার ধরণ, কানের দুলের ডিজাইন সব লক্ষ্য করে থাকে এবং তার সমালোচনা করে থাকে। সপ্তমত, ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা পাই— হেলেনের জন্য ট্রয়ের যুদ্ধ, দ্রৌপদীর জন্য কৌরব ও পান্ডবদের যুদ্ধ এবং মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা ও দিল্লীর প্রথম সিংহাসনাধিকারিণী সুলতানা রিজিয়ার শেষ পরিণতির জন্য দায়ী তাঁরা নিজেরাই। সবশেষে বলি পুরুষের চরিত্র বোঝা যায় তার কাজ ও আচরণ দেখে, মেয়েদের চরিত্র সৃষ্টিকর্তা নিজেই জানেন না।

তপন সান্যাল

মতামত

চিলির রাজনৈতিক অতীত

রাঘবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লাতিন আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী দেশ চিলিতে গত কয়েক-মাস আগে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেল তা ঐ মহাদেশের পক্ষে নতুন না হলেও পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণের সামনে কয়েকটি প্রশ্নকে নতুন করে তুলে ধরেছে। একটি মূল প্রশ্ন হল এই যে, ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে না পালটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব কি না। প্রশ্নটি গত পঞ্চাশের দশকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ক্রুশ্চেভ প্রদত্ত 'শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ'-এর তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। সাবেকী মার্কসিস্ট মতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের প্রথম ধাপ হল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্ভব। ক্রুশ্চেভের নতুন তত্ত্ব বলে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক শিবির সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক পাল্লা দিতে সক্ষম এবং 'তৃতীয় দুনিয়া'তে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে সমাজতান্ত্রিক সাহায্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার পথে নিয়ে যেতে পারে। রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে হিংসা (violence) জড়িত এবং এই হিংসা তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সূচনা ঘটাতে পারে, তাই বর্জনীয়।

১৯৭১ সালে চিলিতে 'মার্কস-বাদী' সালভাদর আয়েন্দের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সরকারী ক্ষমতায় আসার পর উপরোক্ত তত্ত্ব পরীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যদিও আয়েন্দের শোচনীয় মৃত্যু এই তত্ত্বকে পুরোপুরি বরবাদ হয়তো করতে পারবে না, কেন না নানা-রকম যুক্তি যে কোন তত্ত্বের পক্ষে, বিপক্ষে অনেকদিন ধরেই চলে, তবে আমাদের মতন দেশে যারা অর্থনৈতিক উন্নতি তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন বা করতে চান তাদের কাছে চিলির ঘটনার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়।

চিলির ঘটনা আসলে এটা প্রমাণ করে যে মার্কসবাদকে 'সংশোধনে'র চেষ্টা অন্তত এখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষের স্বার্থে যাচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য গুলিয়ে ফেলা যে মারাত্মক 'ভুল' তাই পরিষ্কার হয়েছে এই ঘটনায়। একটি শোষণভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোর কোন সৎ বা মার্কসবাদী ব্যক্তি বা দল সরকারী ক্ষমতায় অল্প সময়ের জন্য যেতে পারলেও সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে কিছুই শেষ পর্যন্ত করতে পারে না। উপরন্তু এই ধরণের কাজ সাধারণ মানুষের সতর্কতাকে, সচেতনতাকে বিভ্রান্ত করে এবং ফল হয় মারাত্মক। শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবি জনগণের নেতৃত্বের ভুলে ফ্যাসিবাদ বারবার ক্ষমতায় আসার সুযোগ পাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এই ধরনের ঘটনা আমরা ইন্দোনেশিয়ায় ঘটতে দেখেছি, এবার চিলিতেও। এই একই পথে হিটলার এসেছিল।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণ পত্র-পত্রিকায় 'গণতন্ত্র হত্যা'র প্রশ্ন নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়েছে। কিন্তু এই গণতন্ত্রের আসল রূপ এবং চিলিতে এই ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গাফিলতি খুবই।

বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের চেষ্টা হবে চিলির অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিষ্কার তুলে ধরে আয়েন্দের মৃত্যু, তার সরকারের পতন এবং চিলিতে ফ্যাসিবাদের আগমনের সম্ভাব্য মূল কারণ যতদূর সম্ভব বোঝা।

॥ এক ॥

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এই দেশটি দক্ষিণ আমেরিকার একটি আশ্চর্য দেশ হিসাবে পরিচিত; ঐতিহাসিকরা একে 'Land of Crazy Geography' বলে বর্ণনা করেন। যদিও উপকূল প্রায় তিন হাজার মাইল বিস্তৃত কিন্তু দেশটি গড়ে মাত্র ১০০ মাইল চওড়া। উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক জায়গায় বছরে ৬ ফুট গিয়ে দাঁড়ায়। 'বছরে তের মাস বৃষ্টি হয় এখানে'। লোক সংখ্যা এক কোটির ওপর। কিন্তু চাষের জমি সমগ্র অঞ্চলের মাত্র আট শতাংশ। বাইশ শতাংশ জমি অরণ্যাবৃত। বাকি অংশ প্রায় মরুভূমি। এই সরু লম্বা দেশটি দক্ষিণ আমেরিকাকে প্রায় পুরো পশ্চিম উপকূল জুড়ে থাকলেও, দেশের ষাট শতাংশ লোক বাস করে মধ্যবর্তী 'সান্টিয়াগো' অঞ্চলে।

সাধারণ ভাবে অর্থনীতির আলোচনায় অর্থনৈতিক অনুন্নতির সঙ্গে লোক সংখ্যার আধিক্যকে সংযুক্ত করা হয়। জনসংখ্যার আধিক্যই নাকি গ্রামীণ অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়ে থাকার কারণ। চিলিতে লোক সংখ্যা মোটেই বেশী না হওয়া সত্ত্বেও চিলির কৃষি অর্থ-নীতি প্রায় সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। যদিও চিলির আয়-তনের তুলনায় লোকসংখ্যা খুবই কম এবং বেশীর ভাগ লোকই শহরাঞ্চলে এবং খনি অঞ্চলে বসবাস করে। চিলির গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষকের অবস্থান বাস্তবিক প্রায় ভূমিদাসের।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্পেনীয়রা এই দেশ আক্রমণ শুরু করে। দিয়েগো আলমাগ্রোর (Diego Almagro) প্রথম বিফল আক্রমণের পাঁচ বছর পরে পেদ্রো দ্য ভালদ্যাভিয়া (Pedro De Valdavia) আর একটি আক্রমণ চালায়, এই যুদ্ধে ভালদাভিয়া, চিলির তৎকালীন স্থানীয় অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদের হাতে প্রাণ হারালেও সতের বছর লড়াই-য়ের পর ইণ্ডিয়ানরা স্পেনীয়দের কাছে হেরে যায়।

স্পেনীয় লুটেরাদের বর্বর লোলুপতা

১৫৩৬-এর প্রথম আক্রমণের পরে প্রায় তিন'শ বছর স্পেন চিলিতে লুটতরাজ চালিয়েছে। দক্ষিণ আমে-রিকার অন্যান্য অনেক দেশের মত চিলিতেও স্পেনীয়রা এসে ছিল লোভে! ইণ্ডিয়ানদের তখনকার সমাজ সম্বন্ধে আজকাল প্রায় কিছুই জানা যায় না। ইস্পাহালিরা সে সমাজ পুরো নষ্ট করে নিজেদের মত করে চিলির অর্থনীতিকে পরিচালিত করে ছিল। স্পেনীয়দের আমলে চিলিতে গড়ে ওঠে লাটিফাণ্ডিয়া ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। বিরাট বিরাট অঞ্চল জুড়ে এক এক ভূস্বামির মালি-কানায় ছিল এই লাটিফাণ্ডিয়াগুলি (আমাদের পুরানো জমিদারির মত প্রায়)। চাষীদের, বা সোনা খোঁজার শ্রমিকদের, শোষণ শাসণের মালিক ছিল এই সমস্ত স্পেনীয় ভূস্বামীরা।

এই লাটিফাণ্ডিয়াগুলির অন্তর্গত ছিল মিনিফাণ্ডিয়াগুলি (minifundia)। ছোট ছোট জমির মালিকা-নাকে ভিত্তি করে এই মিনিফাণ্ডিয়া তৈরী হ'ত। কিন্তু মূলত লাটিফাণ্ডি-য়ার মালিকই সমস্ত কিছুর ওপর কর্তৃত্ব ক'রত এবং এই সমস্ত মালি করা প্রায় সবাই ছিল হয় স্পেনীয় অথবা ইউরোপীয়ানরা। এই সমাজ ব্যবস্থা এখনও চালু। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত চিলিতে জমির মালিকানার কোন উচ্চসীমা নির্দিষ্ট ছিল না। এক এক জন ভূস্বামী ৫,০০০—১০,০০০ হেক্টর জমির মালিক। প্রায় ৬০০ মালিকের হাতে দেশের চাষের জমির ষাট শতাংশ। ১৯৬৭ সালে ফ্রেই (Frei) সরকার আইনত একটি উচ্চ সীমা—৮০ হেক্টর সেচভুক্ত জমি—বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে এই ধরণের আইনের পরিণাম আমাদের নিজেদের দেশের অভি-জ্ঞতা থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি। চিলির জনগণের বিপুল অংশ—ষাট শতাংশ—শহরাঞ্চলে বাস করেন। একমাত্র সানতিয়াগো শহরাঞ্চলই ১৯৬৮ সাল নাগাদ চিলির একচতুর্থাংশ লোকের বাস-স্থান ছিল। অন্যান্য বড় শহর ভাল্-পারাইসে (Valparaiso) কন্সেপ-সিয়োঁ (Consepcion) এবং আরিকা (Arica)। শহরাঞ্চলে বস্তি গড়ে উঠেছে হাজারে হাজারে। এইসব বস্তি অঞ্চলে অমানুষিক অবস্থার জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয় দেশের অধিকাংশ মানুষ। রাজনৈতিক ঝড় ঝাপটাও এদের ওপর দিয়েই বেশী বয়। বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার অগুনতি লোককে এই সব অঞ্চলে গুলি করে মেরেছে। কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পে রেখেছে আরও হাজার হাজার মানুষ। অবশ্য পাল্টা মারও সব থেকে বেশী এরাই দিচ্ছেন। গ্রামে গরীব-ছোট চাষী, এবং ক্ষেত-মজুররা, সংখ্যায় ৫,০০,০০০ ইন্‌কু-ইলিনো নামে পরিচিত। জমির কোন মালিকানা এদের নেই। জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আয়ের নীচে বংশানুক্রমিকভাবে একই জমিতে চাষ করতে বাধ্য এরা। শিশু মৃত্যুর হার ৩৩·৩%।

স্পেনীয়রা চিলি অধিকার করে সোনার জন্য। লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই ইউরোপের অধিবা-সীদের মূল লোভ ছিল সোনার। চিলিতে সোনা পাওয়া যেত কম না। এই সোনা লুটের পাশাপাশি স্পেনীয় ভূস্বামীরা চাষবাসের ব্যবস্থায় জোর দেয়। সবুজ অঞ্চলে গমের চাষ এবং গবাদি পশুপালনের ব্যবস্থা বেড়ে ওঠে। উৎপন্ন দ্রব্য ইউরোপে এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে রপ্তানি হ'ত। গমের রপ্তানি বেড়ে যায় পেরুতে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে চাষের জমির বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়। এই ভাবে প্রকৃতির কাছ থেকেও এরা কিছু সাহায্য পেয়ে-ছিল।

অর্থনীতিতে উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার একটা প্রধান মুশকিল এই যে দেশটি সম্বন্ধে আমদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং চিলির গবেষকরাও এই ব্যাপারটার ওপর খুব ভাল আলোচনা করেন নি। আন্দ্রে গুন্দের ফ্রাঙ্ক লাতিন আমেরিকার আলোচনায় দেশগুলিকে পৃথিবীর metropolis—মূলত আমে-রিকার—satelite হিসাবে বিশ্লেষ-ণের চেষ্টা করেছিল। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে যদিও সাম্রাজ্যবাদই 'অনুন্নত' দেশগুলির অনুন্নতির কারণ কিন্তু শুধু এইটুকুই কোন দেশের অর্থনীতির বিশ্লেষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষতঃ শ্রেণী-বিন্যাসের প্রশ্নটি সমস্ত সময়েই জরুরী। এই বিষয়ে খুব জোরের সঙ্গে কিছু না বলতে পারলেও মোটামুটি ভাবে অর্ধসামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সংজ্ঞা চিলির গ্রামীণ অর্থনীতির শ্রেণী বিন্যাসের কিছুটা আন্দাজ দিতে পারে, লাটিফাণ্ডিয়ার মালিকরা উৎপাদন চালায় বাজারের দিকে তাকিয়েই, কিন্তু চাষী যেভাবে জমির সাথে প্রায় বাঁধা তা প্রায়শই ভূমিদাসের অবস্থান সূচিত করে। আমাদের দেশের মতই চিলিতেও ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। চিলির গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোন গুণগত পরিবর্তন গত তিন'শ বছরে প্রত্যক্ষ করা যায় নি।

উনবিংশ শতকে ইউরোপে পুঁজি-বাদের যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছিল স্পেন তার সাথে তাল রাখতে পারে নি। পাশাপাশি, ঐ সময়েই স্পেন তার উপনিবেশগুলিও হারাতে শুরু করে। ১৮১৭ সালে চিলিতে সন্ মার্তিনের নেতৃত্বে ৪,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী লড়াই শুরু করে স্বাধী-নতার জন্য। চিলি স্বাধীন হয় ১৮১৮ সালের ৫ই এপ্রিল।

চিলির প্রথম প্রেসিডেন্ট বার্নার্দো ও'হিগিনস্ (Bernardo O'Higgds) একটা স্বাধীন অর্থনীতি বিকাশের চেষ্টা করেন। এই সময়ে চিলির জনসমষ্টির একটা মোটা অংশ ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকেরা। স্পেনীয়রা ছাড়াও জার্মান এবং অন্যান্য জাতিও বসবাস আরম্ভ করে। এছাড়া আছে আদিবাসী ইণ্ডিয়ানরা। জাতি হিসাবে নিপীড়িত এরা। এই inquilino-দের দিয়ে চাষবাস করানো হয়। খনির শ্রমিকের কাজেও এরা আছেন।

১৮১৮ সালে রাজনৈতিক স্বাধী-নতা কিন্তু চিলির অর্থনীতির স্বাধীনতা এনে দিতে পারে নি। ও'হিগিনসদের চেষ্টা বেশী দিন সফল হয়নি। ইতিমধ্যেই ইংরাজরা তাদের জায়গা করে নিয়েছিল। ভারত প্রভৃতি দেশে আমরা দেখেছি যে সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং সমস্ত উপনিবেশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সরাসরি দখলে রাখতে নানা কারণে সম্ভব না হওয়ায়, বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে বৃটেনের শক্তি কমে যাওয়ায়, সাম্রা-

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

নান্দীকার প্রযোজিত আন্তিগোনে

(দর্পণের সমালোচক)

নান্দীকার তাদের আন্তিগোনে প্রযোজনায় ঋত্বিক কুমার ঘটকের একই নামের নাটকটি থেকে অনেকখানিই সরে এসেছেন। তাঁদের এবং অনুবাদক চিত্তরঞ্জন ঘোষের আশ্রয় অবশ্যই আনুই-এর রূপান্তর এবং ঋত্বিক কুমার রচনাই কালে কালে নতুন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। নান্দীকার এবং প্রযোজনার এই নতুন ব্যাখ্যা কতখানি সফল সেটাই বিচার্য। পর্দা উঠবার পর প্রায়ান্ধকার মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সূত্রধার, নাটক শুরু করার দায়িত্ব নিয়ে, এবং শুরু হল তাঁর অবিরত হাত নাড়া, মুখ ব্যাকাঁনো, কাঁধ ঝাঁকানো। একেকটি চরিত্রের ওপর আলো পড়ল, সূত্রধার তাদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন—মঞ্চের এককোণে আন্তিগোনে তার চোখে যে উদাস, গভীর দৃষ্টি দেখা গেল পরবর্তী সময়ে চরিত্রটির প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে দৃষ্টি একেবারেই অন্তর্হিত। সূত্রধার দর্শকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন আন্তিগোনে প্রতিবাদ করবে, আর তাকে মরতে হবে কেন না আন্তিগোনেদের মরতেই হয়। চিরকাল? যারা রুখে দাঁড়াতে যায়, মরাই তাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ? নান্দীকার বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়' এই পংক্তি উদ্ধৃত করে। আন্তিগোনের মৃত্যু তাহলে শহীদের মৃত্যু। কিন্তু নাটকের শেষ অন্যরকম বোঝায়। পরিচয় পর্বে হীমনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল ইসমেনের সামনে, আন্তিগোনের নয়। অথচ সে আন্তিগোনেরই প্রেমিক। তবে কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল হীমন লঘুচিত্ত বৈচিত্র্য প্রয়াসী, নাটকে কিন্তু উল্টো পরিচয়ই পাওয়া যায়। রাণী ইউরিদাইসকে দেখানো হল, অথচ তিনি নাট্য চরিত্র যন, তাহলে তাকে মঞ্চে তোলা হল কেন। নাটকে উল্লেখ থাকলেই কাউকে মঞ্চে আনতে হলে খেবাই-এর জনগণকেও আনলে হত। এই পরিচয় পর্বে একেক জনের পরিচয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মুখ ঘুরিয়ে প্রস্থান অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়েছে। আর এই পরিচয় ও সেই সঙ্গে নাটকের ব্যাখ্যা চলেছে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে। দর্শকরা কি এতই নির্বোধ, যে তাদের হাতে নোটবই ধরিয়ে দেওয়া হল। প্রকৃত পক্ষে সূত্রধারই নাটকের বেশ জায়গা জুড়ে রইলেন, নাট্য চরিত্রদের সরিয়ে রেখে। এটাও কি ব্রেখটীয় কৌশল?

সান্ধ্য নাট্য সংঘের দুটি একাঙ্ক

(দর্পণের সমালোচক)

মিনার্ভা মঞ্চে চৌঠা আগষ্ট উত্তর কলকাতার সান্ধ্য নাট্য সঙ্ঘ দুই যুগের দুটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করলেন। এর আগে তারা বার্টল্ট ব্রেখটের দ ডড উত্তম্যান অব্ সেজল্লন অবলম্বনে বহুবল্লভ যাত্রা নাটকটি পরিবেশন করে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এবার একই মঞ্চে অরুণ মুখোপাধ্যায়ের মারীচ সংবাদ-এর সংক্ষিপ্তরূপে স্বর্ণমৃগের আত্মবিশ্লেষণ ও গ্রীক নাটকার সফোক্লেসের কিং ইডিপাস্-এর সংক্ষিপ্তরূপ রাজা অয়দিপাউস একটু বেমানান ঠেকল। নাটক। নির্বাচনে পরিচালককে আরও একটু সতর্ক থাকতে অনুরোধ করছি।

রামায়ণের মারীচ, আজকের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ঈশ্বর লেটেল আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকার মার্কি-এদের নিয়েই স্বর্ণমৃগের আত্মবিশ্লেষণ। কেউ মৃত্যুর শিকার হয়, কেউ আত্মহত্যা করে, কেউবা রুখে দাঁড়ায়। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই এ নাটকের মূল উপজীব্য।

মঞ্চ জুড়ে ধূমপানরত দর্শকের নাটক দেখা খুবই চোখে লাগে। অভিনেতারা প্রত্যেকেই যথেষ্ট পরিশ্রমী মনে হল। শুধু প্রয়োজন একজন ভাল পরিচালকের। অভিনয়ে নিষ্ঠার ছাপ রেখেছেন শ্রীদেবাংশু, সুকুমার সরকার, প্রদীপ সিং, অশোক মজুমদার। সঙ্গীতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পরেশ ধর। বাঙালী পালবাবুকে মারোয়াড়ীর রূপসজ্জা নিতে হল কেন ঠিক বোঝা গেল না।

আড়াই হাজার বছরের পুরনো গ্রীক ট্রাজিডি ঈডিপাসের মূল বক্তব্য মানুষ নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র। দৈববাণীকে খণ্ডায় তার সাধ্য মানুষের নেই। লাইয়স-এর পুত্র অয়দিপাউস (গ্রীক উচ্চারণে) পিতাকে হত্যা করবে এবং মাতার গর্ভে সন্তানের জন্ম দেবে—অনেক চেষ্টা করেও এ দৈববাণীকে প্রতিরোধ করা যায়নি। বহুরূপী দীর্ঘদিন যাবৎ এ নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছেন। এ ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল নাটকের দিকে সান্ধ্য নাট্য সঙ্ঘের দৃষ্টি কিভাবে আকৃষ্ট হল সেটাই ভাবনার বিষয়।

অয়দিপাউসের চরিত্রে পরিচালক হিমাংশু দাস যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে পারেননি। তিনি নিজে এ চরিত্রে অভিনয় না করে অন্য কাউকে সুযোগ দিলে চরিত্রটির প্রতি সুবিচার হত। ইয়োকাস্তের চরিত্রে মেনকা শান্ডাও আগাগোড়া যাত্রার অভিনয় করেছেন। সঙ্গীতের প্রয়োগেও যাত্রার সঙ্গীত কেন ব্যবহৃত হল ঠিক বোঝা গেল না। হিমাংশু দাসের সংলাপ উচ্চারণে বাংলা মঞ্চের কোনও ঐতিহ্য রচিত হয়নি। রূপসজ্জা ও বেশভূষায় পরিচালকের আরো সতর্ক হওয়া উচিত। শেষ দৃশ্যে রাজা অয়দিপাউস দৃষ্টিহীন হয়েছেন এটা আমরা বুঝতে পারিনি। অভিনয়ে নিতাই দত্ত, জহর চৌধুরী, প্রদীপ সিং ও রঞ্জিত নস্কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নাটক দুটি সম্পাদন ও একাঙ্কায়নের দায়িত্বে হিমাংশু দাস যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখতে পারেননি। আশা করব ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে তিনি আরো সতর্ক হবেন।

নাট্যাভিনয়

এ নাটকের আন্তিগোনে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি। সে পলিনিসেসকে সমাহিত করতে চায় সব পরিণতি ভেবে নিয়েই। এই আত্মসচেতনা, ক্রেয়নের আদেশের বিরুদ্ধে একা প্রতিবাদ জানানোর বলিষ্ঠতা আন্তিগোনেকে যে ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয়ে তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। কেয়া চক্রবর্তী এবং নির্দেশক মনে রেখেছিলেন আন্তিগোনে বালিকা। ফলে আন্তিগোনে মঞ্চের ওপর দৌড়ে বেড়ায় আছড়ে পড়ে, চিৎকার করে কাঁদে, জিভ আর দাঁতের অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটিয়ে মুখভঙ্গী করে চোখ নাচায় মাথা বাঁকায়—কিশোরীর মত। চরিত্রটিকে আদৌ বুঝবার চেষ্টা না করায় আন্তিগোনে যখন বেদনার কথা বলে, বা ক্রেয়নকে অগ্রাহ্য করতে চায় দৃপ্ত ভঙ্গীতে, তখন তা চা-চলনে এসে পড়ে কৃত্রিমতা, মনে হয় কালো চশমা পরিয়ে দিলেই সে একেবারে শান্তাপ্রসাদ। বস্তুতঃ কোন অভিনেতাই কেবল চরিত্রকে ধরতে না পারায়, এবং নাটকের মূল বক্তব্য কি এটা নির্দেশক বুঝতে না পারায়—এ নাটক সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ক্রেয়নের আচরণের মধ্যে এখানে ফুটে ওঠে একজন স্বার্থান্বেষী, ভীরু, কৌশলী ব্যক্তি, এই ব্যাখ্যায় আপত্তি ছিল না, কিন্তু এর সঙ্গে শেষ পর্বে হীমনের মৃত্যুর দর্শক ও ইউরিদাইসমৃত্যু সংবাদের শ্রোতা ক্রেয়নের স্তব্ধ বসে থাকাটা আদৌ মেলে না ফলে তার ওপর যে মহিমা আরোপিত হতে চায় তার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রেয়নকে অবশ্য সারাক্ষণই অবিশ্বাস্য মনে হতে থাকে। নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত, অথচ তার বদলে এখানে তাকে মনে হতে থাকে, একটি লোভী পুরুষ, সুযোগের অপেক্ষায়। ক্রেয়ন যখন আন্তিগোনের সামনে এতিয়োক্লেস ও পলিনেসিস এর চরিত্র উন্মোচিত করে আন্তিগোনে বাধা পায়, কিন্তু একে সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তার। তাহলে তার প্রতিবাদের ভিত্তি কি; কোন আদর্শ? বিদ্রোহী পলিনেসিস কি অনেক ম্লান হয়ে যায় না, বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়ায় না অনেকটা স্বার্থ সন্ধান। তাহলে এই ব্যাখ্যা ক ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অন্তর্বিরোধের দিকে তাকিয়ে—কিন্তু এটা তো ভারতবর্ষ।

ক্রেয়নের কাছে মুখের সংজ্ঞা শোনার পর আন্তিগোনের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল ধীর স্থির প্রত্যাখ্যান, তার বদলে চীৎকার করে সে সত্যিই নাটক করে। এই চীৎকৃত অভিনয় কেয়া প্রায় আগাগোড়াই করে গেছেন, যেখানে করেননি, সেখানে আবার আধো আধো স্বরে ও সুরে কথা বলতে চেয়েছেন। চীৎকারের প্রসঙ্গে লতিকা বসুর কথা মনে পড়ল, তিনি ধাই-এর ভূমিকা করেছেন। অসহনীয় মুখ বিকৃতি, তীব্র চীৎকার চরিত্রটিকে ডুবিয়েছে। অথচ চরিত্রটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে রাজ পরিবারের সম্মান রক্ষার চেষ্টা অন্যদিকে আন্তিগোনের প্রতি স্নেহ, একটা বিপদের আশঙ্কা কিন্তু তার স্বরূপ বুঝতে না পারা—এই সব মিলে এই সহজ মানুষটির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা বুঝে উঠতে না পেরে লতিকা বসু চরিত্রটিকে একটি ভাঁড় বানিয়েছেন। 'ভালোমানুষ' আর 'আন্তিগোনে' যে এক নয় এটা কেউ বোঝেননি।

নাচের আসরের শেষে আন্তিগোনেকে খুঁজে বার করে হীমন প্রেম নিবেদন করেছিল। নাটকে তার দেখা পাই দু বার, প্রথমে আন্তিগোনের সঙ্গে। সেখানে সে প্রণয় মুগ্ধ, কিন্তু তার বাচনভঙ্গী এত হাল্কা, বাংলা সিনেমার চাঁদ ওঠা, ফুল ফোটা দৃশ্যের নায়কের মত—পরবর্তীকালের দৃঢ়তার কোন সম্ভাবনা সেখানে থাকে না। চরিত্র তো তাতাতাতি গড়ে ওঠে না। এই দুর্বলতা থেকে হীমন মুক্ত হতে পারেনি অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের ত্রুটিতে—ক্রেয়নের মুখোমুখি যখন দাঁড়ায় হীমন, একটি ভালো নাট্য মুহূর্ত গোটা নাটকে একবারই তৈরী হতে যাচ্ছিল। শুদ্ধের সামনে ক্রেয়ন তার মুখোমুখি হীমন। সব আবেদন নিষ্ফল সারা মঞ্চ অন্ধকার, আলো কেন্দ্রীভূত এই দু'জনের ওপর, হীমন ক্রেয়নের সমস্ত অস্তিত্বের ওপর প্রায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে—সমস্ত অংশটাই নষ্ট হয়ে গেছে অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের দোষে, তার মুখে ঐ সময়ে যে হাসি ফুটে ওঠে, তা আরও মৃদু হওয়া উচিত ছিল, তার বদলে যে মুখ ব্যাদান, মনে হল রাস্তার চ্যাংড়া ছেলে গুরুজন স্থানীয় কাউকে টিটকিরি দিচ্ছে।

ইসমেনের ভূমিকায় বীণা মুখোপাধ্যায় আগাগোড়াই আড়ষ্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরী হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে সংলাপ আউড়েছে। সংলাপাংশও অবশ্য দুর্বল। আন্তিগোনের মুখে হঠাৎ মাসী ভাক শুনে মনে হয় ঠাট্টা করছে সে।

মঞ্চসজ্জায় বহুরূপীর 'রাজা আয়দিপাউস' প্রযোজনার অনুকরণ স্পষ্ট। পোষাকে অবশ্য সে অনুকরণ পুরোপুরি নেই। ফলে কোন সঙ্গতি নেই। অন্ততঃ ক্রেয়নের পোষাক অত্যন্ত বেমানান, আন্তিগোনে বা ইসমেনের ম্যাক্সি থেবীয় নয় একেবারেই কলকাতাই।

নাটকটি নিয়ে আসলে সকলেই খুব সমস্যায় পড়েছিলেন। এমন কি দৃশ্য বিন্যাসেও। তাই বারবার সূত্রধারকে টেনে আনতে হয়েছে। তাই বিরতির আগের মুহূর্তের নাট্যাবস্থাই আবার দেখতে হয়েছে বিরতির পরবর্তী পর্দা ওঠার সময় তাতে চমক দেবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি।

কিন্তু এ নাটক কেনই বা প্রতিবাদের, কেনই বা ১৯৭৫ এর। থেবাই'এর আকাশে শকুন, রাজপথে গলিত মৃতদেহ, থেবাই জুড়ে শ্মশানের শান্তি—এই অনুষঙ্গে কি ধরতে চাওয়া হয়েছে ১৯৭৫'এর স্বদেশ। ১৯৭৫'এর স্বদেশে ও প্রতিবাদীদের মরতে হয় কিন্তু নাটকে সেই প্রতিবাদের ভিত্তি যে দুর্বল হয়ে পড়েছে তাতো দেখাই গেল। এখানে তো শেষ পর্বে এসে দাঁড়ায় ক্রেয়ন, হৃতসর্বস্ব, বিনষ্ট ক্রেয়ন, সর্বস্বান্ত হয়েও যে ধীর ভাবে গ্রহণ করে ভাগ্যকে, তারপর চলে যায় কর্তব্যের টানে। দর্শকদের মনোযোগ ক্রেয়নের দিকে টানতে চাওয়া হয়, চাওয়া হয় দর্শকের সহানুভূতি। এই সহানুভূতি যদি না আসে সেটা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের ত্রুটি, নাটক কিন্তু সে রকমই চায়। ১৯৭৫-এর স্বদেশেও কি তাই প্রয়োজন। এই তাহলে প্রতিবাদ?

অবশ্য ১৯৭৫' এ তো কত কিছুই ঘটছে। কত রকম নাটক। রংতামাসা। কাজেই আন্তিগোনেও ১৯৭৫' এর নাটক, ক্ষতি কি।

একটি নাটক, অভিনেতারা বা নির্দেশক নিজেরাই বুঝে উঠতে পারেননি, এর নাম আন্তিগোনে। এবং এই অভূতপূর্ব নাট্যোপহারটির নির্দেশক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

চিলির রাজনৈতিক অতীত

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

জ্যবাদ অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে গেছে উপনিবেশ সোজাসুজি কব্জায় না রেখেই। এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ যা সংক্ষিপ্ত নয়া উপনিবেশবাদ হিসাবে পরিচিত, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেও নিজের স্বার্থে চালিয়ে নিচ্ছে নানারকম চাপ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের এই ধরনের শোষণ চালু থাকার মূল কারণ আসলে এই সমস্ত দেশের অর্থনীতি। যে পুঁজি বাদি নিয়মে এই সমস্ত দেশের অর্থনীতিকে চালু রাখা হয়েছে তা পুঁজিবাদি বাজারের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান অনুন্নত দেশগুলি এই বাজারের সঙ্গে মূলত কাঁচা মাল সরবরাহ করার মাধ্যমে জড়িত। এদের অর্থনীতির কাঠামো পরিবর্তন না করলে এই সমস্ত দেশের পক্ষে এই বাজার থেকে বেরোনোও কষ্টসাধ্য। উলটে এই বাজার দেশ ওবির গুটিকয়েক প্রচুর ক্ষমতাশালী দালাল ব্যবসায়ীর স্বার্থও রক্ষা করে।

সাম্রাজ্যবাদের পুরানো ঔপনিবেশিক শোষণের থেকে নতুন ধরনের শোষণের ব্যবস্থা চিলিতে বিংশ শতাব্দি থেকেই চালু। স্পেনীয় বেনেরা সরে যাওয়ার পর জির হল বৃটিশ শিল্প পুঁজপতিরা। খনেরা লুট করত সোনা, রূপা ভৃতি দামী (Precious metal) নিজ পদার্থ, ইংরাজরা জোর দিল তামা, সোরা প্রভৃতি অন্যান্য খনিজ দ্রব্য এবং উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের যোগে ইংরাজদের চিলির শিল্প র্থনীতিকে ১৮৬০ সাল নাগাদই বৃটেনের ওপর নির্ভরশীল করে তুলল। পরে আমেরিকা বিশ্ব বাজারে বৃটেনকে হারিয়ে দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে চিলিতেও নিজেদের একাধিপত্য কায়েম করে।

এই সময় কৃষি অর্থনীতিতেও এই অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে চিলির উৎপাদন বাড়ে প্রায় চারগুণ। কিন্তু এই উৎপাদনের বেশীর ভাগই রপ্তানি হ'ত দেশের বাইরে। গমের রপ্তানি ১৮১৮ সালের আগে ছিল ১৪,০০০ কুইন্টাল। বেড়ে, ১৮৬০ সালে হয় ৩০০,০০০ কুইন্টাল। আগে রপ্তানি হ'ত পেরুতে। ১৮৬০ সাল নাগাদ মূল রপ্তানি হ'ত ইউরোপে।

তামা চিলির অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। চিলির রাজনীতিতে বিভিন্ন টানাপোড়েন অনেক সময়েই এই তামাকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীতেই মূলত তামার উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম দিকে এই তামা শিল্প মূলত রাষ্ট্রাধীন ছিল। ১৮৭৬ সাল নাগাদ চিলি পৃথিবীর ৬২% তামা তৈরী ক'রত। ১৮৮০ সাল নাগাদই তামা উৎপাদনের ক্ষেত্রে চিলি আমেরিকার কব্জায় চলে যেতে থাকে। রাষ্ট্র মালিকানাও এই সময় থেকেই কমতে শুরু করে।

১৮৮০ সাল অবধি রাষ্ট্র মালিকানাধীন থাকলেও চিলির তামা উৎপাদনের লাভের সিংহভাগ পেত বৃটেন। তামা খনি থেকে সোজা চলে যেত বৃটেনে আর সেখানেই তামা পরিশোধনের ব্যবস্থা ছিল। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চিলির তামা মোটা দামে বিক্রী করে বৃটেন মোটা লাভ ক'রত।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থাংশ পর্যন্ত তামার খনিগুলি ছিল ছোট ছোট বিভক্ত। কিন্তু আমেরিকা তামা শিল্পে প্রচুর অর্থ ঢেলে বিভিন্ন খনিগুলিকে একত্রিত করে একচেটিয়া কারবার শুরু করে। এই একচেটিয়া মালিকানার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি চিলির ছিল না। ফলে পুরো তামার ব্যবসাটাই ধীরে ধীরে আমেরিকার হাতে চলে যায়।

১৯৬৩ সাল নাগাদ চিলি তার তামা শিল্পের ৮০% এর মালিক ছিল। ১৯৭০ সালে এসে চিলির মালিকানা দাঁড়ায় ১০%। বাকি ৯০% এর মালিক আমেরিকার কয়েকজন পুঁজপতি।

তামা শিল্পে চিলির রাষ্ট্র মালিকানা হস্তান্তর শুরু হয় চিলিতে রেলওয়ে শুরু হওয়ার সময় থেকেই। ইংরাজরা চিলিতে রেলওয়ে পত্তন করে তামার খনিগুলিকে রপ্তানি কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে যোগ করার জন্য। ভারতবর্ষেও অনুরূপ অর্থনৈতিক কারণেই রেলওয়ের সূচনা করেছিল। এই রেলওয়ের ভিতর দিয়ে তামা উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকেও ইংরাজরা নিজেদের হাতে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু আমেরিকা তাদের হটিয়ে নিজেরা সমস্ত কিছু দখল করে।

আমেরিকা যে শুধু মাত্র তামা শিল্পে একচেটিয়া ব্যবস্থা আনয়নের মাধ্যমেই চিলিকে কব্জা করেছিল তা নয়। চিলিতে তামা শিল্প পুঁজ বিনিয়োগের সম্ভবনা খুব কম ছিল না। ১৮৮৬ সালে বাল্মাসেদা (Balmaceda) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে চিলির অর্থনীতির বিকাশের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তিনি চিলির পুঁজপতিদের এক অংশ শিল্পপতিদের কাছ থেকে সাহায্যও পেয়েছিলেন। কিন্তু চিলির ব্যাঙ্ক মালিক, ভূস্বামি, খনির মালিক এবং অন্যান্য পুঁজপতিদের দল তার এই চেষ্টাকে বিফল করার সমস্ত রাস্তাই নিয়েছিল। বাল্মাসেদা জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্ত করে দেশীয় শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে এক অভ্যুত্থানের মুখে বাল্মাসেদা আত্মহত্যা করেন। শেষ হয় চিলির স্বাধীন বিকাশের চেষ্টা। বাল্মাসেদা চিলির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তার সরকারকে 'দ্য টাইমস' পত্রিকা কমিউনিষ্ট বলে চিহ্নিত করত।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাঃ শিক্ষকদের অভিযান

মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের অধীনে প্রায় আট হাজার প্রাথমিক শিক্ষক চাকরী করেন যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষক বেশী। মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষকরা অসুস্থতা, আর্থিক অভাব প্রভৃতি কারণে বর্তমান সময়ে তাদের গচ্ছিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ঋণ নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন। এবারে যথারীতি দরখাস্ত করছেন কিন্তু ঋণ পাচ্ছেন না। এই অবস্থার প্রতিবাদে সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডি-অই-এর হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে নিকট গত ছয়ই আগষ্ট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ডি-আই প্রতিনিধি দলকে এই সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিলেও তিনি বলেন যে অফিসের কর্মচারীর সংখ্যা না বাড়লে এ ধরণের সমস্যার স্থায়ী সমাধান পারে যে শিক্ষকদের পি-এফ-এর হিসাব পৃথকভাবে ব্যাঙ্কে রাখা এবং শিক্ষকদের সার্ভিস বুক নিয়মমত রক্ষিত হচ্ছে না।

বাল্মাসেদার বিরুদ্ধ প্রতি বিপ্লবী অভ্যুত্থানে মদত জুগিয়েছিল A Edwards & Compenia বঙ্ক। এই এডোয়ার্স পরিবার বর্তমান চিলির সব থেকে শক্তিশালী পুঁজিপতি; দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র 'এল মারকিউরিও' (El Mercurio) এদের হাতে। ১৯৬৫ এবং পরবর্তী নির্বাচনে এই সংবাদপত্র খোলাখুলি ভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নিয়েছিল।

বাল্মাসেদার মৃত্যুর পর থেকে চিলিতে বিদেশী শোষণ আধিপত্য বিস্তারিত হতে শুরু করে। চিলির আর একটি অন্যতম খনিজ দ্রব্য ছিল সোরা (Nitrate)। একটি দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে চিলির মরুভূমি অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ সোরার অস্তিত্বের কথা সরকার জানতে পারে। এক দল ইণ্ডিয়ান ক্যাম্পে একত্রে আগুন জ্বালাতে গিয়ে বিস্ফোরণের সম্মুখীন হয়। তাদের কাছ থেকে জানতে পেরে এক স্পেনীয় পাদ্রী ঐ অঞ্চলের মাটি সংগ্রহ করে আনেন পরীক্ষা করানোর জন্য। কিন্তু কেউ তাকে পাত্তা না দেওয়ায় রেগে ঐ মাটি নিজের বাগানে ফেলে দেন। অজান্তে দেওয়া এই সোরা ফলে তার বাগানে যে বিপুল ফলন হয় তা সকলকে ঘটনাটা সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তোলে। এই নাইট্রেটের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় চিলির অর্থনীতিতে একটা নতুন উদ্যম দেখা দেয়। হাজারে হাজারে মানুষ বাসা বাধে মরুভূমি অঞ্চলে। এদের বেশীর ভাগই ছিল ইণ্ডিয়ান শ্রমিকরা। ফলে সোরার উৎপাদন ১৮৮০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে ২০০,০০০ টন থেকে বেড়ে ৩০০০,০০০ টনে পৌছোয়। ১৯০০ সাল নাগাদ চিলির nitrate রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১,৩০০,০০০ টন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কৃত্রিম nitrate প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার হওয়ায় চিলির স্বাভাবিক nitrate-এর চাহিদা পড়ে যায় অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে।

সোরা বা nitrate-এর চাহিদা পড়ে যাওয়ায় খনি শ্রমিকদের অনেকেই বাধ্য হন আবার গ্রামে ফিরে যেতে। কিন্তু গ্রামেও এদের স্থান হয়নি। ফলে এরা শহরাঞ্চলে এসে ভীড় করতে বাধ্য হন। সোনার ব্যবস্থা পড়ে গেলেও তামা শিল্প ততদিনে চিলির অর্থনীতিতে মূল আসন করে নিয়েছে মূলত তিনটি কোম্পানি—তিনটিই মার্কিন—এই শিল্পকে পরিচালিত করে। এছাড়াও আরো গোটাকয়েক তামার কোম্পানি ছিল। কিন্তু এগুলি ঐ বড় কোম্পানিগুলির তাঁবেদারি করতে বাধ্য ছিল। ব্রডেন সাহেব, মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ, চিলিতে ১৯১১ সালে ভেগোর কাছে খনি চালু করেন। এই 'ব্রাডেন কোপ্পানি' ছাড়া 'চিলি কপার' ১৯১৫ সালে চিকুইকামাটা (Chiquicamata) শিল্প শহর স্থাপন করে। 'আণ্ডেস কপার কোম্পানি' (Andes Copper.) কাজ শুরু করে ১৯২৭-এ। এই তিনটি কোম্পানি আসলে দুটি বৃহৎ মর্কিন তামা প্রতিষ্ঠান আনাকণ্ডা (Anaconda) এবং কেনেকট (Kenecott) এর অন্তর্ভুক্ত।

তামা চিলির বৃহত্তম শিল্প হলেও এই শিল্পে মাত্র ৫০ ০০০ মত শ্রমিক বর্তমানে নিয়োজিত। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে নাইট্রেট শিল্পে ১০০,০০০ শ্রমিক কাজ করত।

সর্বহারা বিপ্লব

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

অনুধাবন করে সমস্ত মানুষের কল্যাণে সমাজকে পরিবর্তন না করলে সমাজ তার নিয়মে কিছু মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে চলবে আর ব্যাপক মানুষ হবে শৃংখলিত। রাশিয়া ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল একটি দেশ। অথচ রাশিয়ায় কমিউনিস্টরা জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধাপটি সচেতনভাবে অনুসরণ না করে, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বিদেশী পুঁজি এবং দেশীয় দালাল পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জাতীয় চেতনা বিকাশের পরিবর্তে শ্রমিকদের দেশপ্রেমকে সমালোচনা করে তাদের সরাসরি পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে নিয়ে গেল। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটল না। জাতীয় চেতনার বিকাশ ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে পারে না। বিপ্লবের পরে সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয়করণ করে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে দেশীয় পুঁজির মিলিত কোম্পানী গঠন করে রাষ্ট্রীয় পুঁজির প্রবর্তন করে, জাতিসত্তাগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানের নামে তাদের রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং সর্বহারা একনায়কত্বের মাধ্যমে শ্রমিক কৃষক জনগণকে পরিচালনা করার পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করা হোল তা সর্বহারা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অংশ হোল না। হোল পুঁজিবাদ। তাই আমরা সমস্ত মার্কসবাদীদের ভেবে দেখতে বলি মার্কসবাদের লেজুড় হিসাবে লেনিনবাদ মাও সে তুং চিন্তাধারা অবশ্য প্রয়োজনীয় কিনা।

মণি চৌধুরী

ইজরায়েল

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

াদের পণ্যের দাম বাড়িয়ে এই র ক্রেতাদের উপরেই চাপিয়ে নী কাজেই এই নতুন কর র্যের ফলে তাদের মধ্যে কোন াপত্তি ওঠে নি বলে আশ্চর্য হওয়ার কছু নেই।

সমস্ত আর্থিক ও অর্থনৈতিক বস্থার প্রধান বোঝা চাপানো ছে কারখানার শ্রমিক ও অফিস ীদের ঘাড়ে। ইজরায়েলী জনণ সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শী ট্যাক্স দেয়। এই ট্যাক্সের শত ত কোটি পাউণ্ড খরচ করা হয় র্ধস্ত্র ও অন্যান্য সমরসম্ভার ক্রয় ার জন্য। রাষ্ট্রের বাজেটে াক্সের অংশ ১৯৭ সালে যেখানে ড়েছিল ২৮ শতাংশ, সেখানে ১৯৭৪ লে বেড়েছে ৬৬ শতাংশ এবং নও বেড়েই চলেছে। এ খবর। াশনাল এ্যাফেয়ার্সের।

Regd. No. WB/CC-82

PRICE: 40 PAI

স্বাধীনতা দেশভাগ এবং যাত্রার পালাবদল

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

উমেশ নামে এক ভদ্রলোক সাজতেন বিদ্যা। সুন্দর চরিত্রে অভিনয় করতেন ভোলানাথ দাস।

এই ভাবে আবার এরই মধ্যে যাত্রা থেকে এসে গেল থিয়েটার। যাত্রা আর থিয়েটারের এক মিলন ঘটে গেল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে। এর মূলে যাঁদের দান অনস্বীকার্য তাঁদের মধ্যে ভবানীপুরের প্রখ্যাত উমেশ মিত্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বনাধন্য উমেশ মিত্র যে দল তৈরী করেছিলেন সেই দলও কিন্তু বিদ্যাসুন্দর পালাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এছাড়া উনিশ শতকের শেষ দিকে গগন দাস ও পূর্ণ দাস দুই ভাই নিজেদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা করে খ্যাতির সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর পালা অভিনয় করে কোলকাতাবাসীদের আনন্দে মাতিয়ে তুলেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দর পালার খ্যাতি বিদ্যমান ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই কোলকাতার উচ্চশিক্ষিত ধনাঢ্য এবং রুচিশীল লোকের মধ্যে একটু একটু করে থিয়েটার প্রবণতা বিস্তার লাভ করতে থাকে বলা বোধহয় ঠিক হবে না, বলা উচিত রীতিমত প্রকট হতে থাকে। ১৮৩১ সালে প্রসন্ন ঠাকুর স্থাপন করেন হিন্দু থিয়েটার কোলকাতার খুঁড়ি-পাড়া অঞ্চলে। ১৮৩৩ সালে শ্যামবাজারের প্রখ্যাত ধনী এবং শিল্পীমনা নবীন বসু থিয়েটারের আদারে বিদ্যাসুন্দর বেশ খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে আশুতোষ দেব কোলকাতার কয়েকজন উচ্চ-অভিজাত ভদ্রলোকের নিয়ে অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটক। ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়ার রাজারা চুপ করে থাকতে না পেরে বাড়ীর ভিতরেই তৈরী করলেন রঙ্গমঞ্চ। এই ভাবে থিয়েটারের প্রসার হতে লাগল।

যাত্রার চাইতে থিয়েটারের চরিত্র অনেকের কাছেই নির্মল বলে প্রকাশিত হতে থাকল। কুরুচি বা অশ্লীলতা বলতে তখনকার যাত্রা-দর্শকরা যা পেতেন বা বুঝতেন, থিয়েটারে তার প্রকাশ নেই দেখে শিক্ষিত সমাজ এ থিয়েটারের আলাদা একটা সম্মান দিল বটে কিন্তু থিয়েটার করতে হলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হয় বুঝতে পেরে অনেকেই থিয়েটার করার ইচ্ছা থাকলেও সরে এলেন, তবে যাত্রার রুচি পাল্টাবারও একটা চেষ্টা চলতে থাকল।

এবার নতুন করে জন্ম নিল আর এক নতুন ধরনের যাত্রা তার নাম গীতাভিনয়।

১৮৬৪ সালের প্রথম ভাগ থেকে এই গীতাভিনয়ের প্রচলন হয়।

১৮৬৪ সালে শকুন্তলা গীতাভিনয় বার বার অভিনীত হয়। এই সময়ে বাগবাজারে মদনমোহনতলায় কালিদাস সান্যালের নলদময়ন্তী গীতাভিনয় বেশ জনপ্রিয়। ১৮৬৪ সালে বউবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় গীতাভিনয় হয়। শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের বাড়ীতে 'সাবিত্রী সত্যবান' গীতাভিনয় হয়। এই বছরেই বউবাজারের আর একজন ধনী অথচ সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন বাবুরাজেন্দ্র দত্তের বাড়ীতে মাইকেলের 'পদ্মবতী' নাটকের গীতাভিনয় হয়। এই ভাবে গীতাভিনয় বা 'অপেরা' একটু একটু করে জনপ্রিয় হতে থাকে। এই গীতাভিনয় বা অপেরা বলে যা বোঝায় তেমনি খাঁটি অপেরা রচয়িতা হিসেবে হরিমোহন কর্মকারের নাম বিশেষ করে পাওয়া যায়। এই বিশুদ্ধ অপেরার নাম ছিল জানকী-বিলাপ।

এই সময়ে এই গীতাভিনয় নিয়েই আসরে আত্মপ্রকাশ করেন মতিলাল রায়।

আমার এই রচনায় গোড়াপত্তন মতিলাল রায়কে দিয়ে শুরু-সুতরাং এই অধ্যায়ের শেষে পুনরায় মতিলাল প্রসঙ্গে ফিরে এসে শুধু এই কথাই বোধকরি বলা ঠিক হবে যে, মতিলাল রায় এই গীতাভিনয়কে চরম নির্মল অর্থাৎ ভাঁড়ামি মু করেছিলেন, গীতাভিনয়কে লোক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ কা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উঁচু-নীচু স লের মনেই বিদ্যা বিস্তারের চরম ব্যবস্থা করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামা দেশের বাহ্যনৈতিক, সামাজিক, অথ নৈতিক এমন কি সর্বক্ষেত্রে এক বিবর্তন একটু একটু করে শুরু হ থাকল। এদেশে তখন বিদে শাসক। এই বিদেশী শাসকের দ শুরু করল শেষ বল, অবিচার।

উনবিংশ শতাব্দীর গো থেকে এক এক করে শুরু হ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দো একদিন যে সাধারণ মানুষের অস্পৃশ্যতা বাসা বেঁধেছিল নে মানুষই মুহূর্তে অস্পৃশ্যতা বর্জ উদ্বেলিত হলো, পরিশেষে পরাধী নতার শিকল থেকে এই দেশ মা কার মুক্তির সাধনায় শুরু হলো ইং সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান। তার ছাড়, আন্দোলনের আগুন অ উঠল। দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষের বুঝতে বাকী রই না যে এই দুর্ভিক্ষ স্বাভাবিক নয় কৃত্রিম। তারপর একদিন দে দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

এলো স্বাধীনতা। আ স্বাধীন হলাম বটে কিন্তু সেখা সব শেষ হয়ে গেল না। দেখা দি একের পর এক সমস্যা। এই সমস্যা প্রতিফলিত হচ্ছে আজকে যাত্রাভিনয়ে।

বিজয় নাহার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বহিষ্কারের জন্য কেন্দ্রীয় কংগ্রে কমিটির অনুমতি প্রয়োজন, তা এঁদের বহিষ্কারের সুপারিশ দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্প্রতি কেন্দ্র কংগ্রেস নেতৃত্ব বিজয়বাবু, কৃষ্ণ শ সহ যে সব এ আই সি সি সদস্যের বিরুদ্ধে দল থেকে বহি স্কারের সুপারিশ করা হয়েছিল তাঁদের অভিযোগগুলি পুনর্বিবেচ করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসের কা ফেরৎ পাঠিয়েছেন।

বিহারের মন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ওলা একটি বড় বাড়ী রয়েছে। বোদসার স্ত্রী ও তর কন্যার বর্তমান গহনার মূল্য যথাক্রমে ৫,০০,০০০ এবং ৫০,০০০ টাকা।

পূর্বোক্ত দুই মন্ত্রীর তুলনায় মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র কিঞ্চিৎ দরিদ্র। তিনি মাত্র আশি বিঘা অতিরিক্ত জমি সরকারের হাতে সমর্পণ করেছেন।

মন্ত্রিসভার একমাত্র মহিলা-মন্ত্রী শ্রীমতি রামদুলারী সিনহার কাছে সোনা বা গহণাপত্রের কোন সন্ধান পাওয়া না গেলেও, তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি বর্তমানে নব্বই একর কৃষিজমির মালিক। মোট জমির মূল্য পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। পাটনার বোরিং রোডে চারটি ঘর বিশিষ্ট তার যে বাড়ীটি রয়েছে, তার মূল্য কম করে তিপ্পান্ন হাজার টাকা। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তিনি জমিয়েছেন ছিয়াশি হাজার একশো সত্তর টাকা এবং স্টেট হাউসিং ডিপার্টমেন্ট ও স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেও যথাক্রমে তিনি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ও সাত হাজার টাকা জমা রেখেছেন।

শুল্ক বিভাগের মন্ত্রী নরসিং বইঠার আছে দশ একর জমি। তার গ্রামে তিনি এখন একটি বড় বাড়ী তুলছেন। এছাড়া নতুন একটি ফিয়াট গাড়ী, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমানো অর্থ এবং ব্যক্তিগত ঋণে মোট তেত্রিশ হাজার দুশো টাকা রয়েছে। জমানো সোনা রূপার মূল্য কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

পি ডব্লু ডি বিভাগের মন্ত্রী বিদ্যাকর কবির জমির পরিমান ছেচল্লিশ বিঘা। তার দুই ছেলের নামেও আলাদা জমি আছে। তার স্ত্রী ও পুত্রের নামে ব্যাঙ্কে জমানো অর্থের পরিমান এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা।

রাজস্বমন্ত্রী রামজয়পাল সিং যাদবের জমির পরিমান অবশ্য কম, মাত্র দশ বিঘা। এর মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা। ছাপড়ায় তার নামে সোয়া এক কাঠা এবং পাটনায় চার কাঠা বিশিষ্ট যে জমি রয়েছে তার মূল্য যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ হাজার এবং দুইলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। ধানবাদে শ্রীযাদবের ছেলের নামে যে জায়গা রয়েছে তার মূল্য বিশ হাজার টাকা। সারাইতে পিতৃপুরুষের সম্পত্তির যে অংশ শ্রীযাদবের দখলে তার মূল্য পনেরো হাজার টাকা। এছাড়া নয়শো টাকা নগদ ও পাশবুকে ছয়শো টাকা রয়েছে। একটি নতুন ফিয়াট গাড়ী ছাড়াও তার স্ত্রীর অলংকারাদির মূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিন্দেশ্বরী দুবে এক হাজার একর জমির মালিক। এছাড়া তার অরও বারো একরের মতো কৃষিযোগ্য জমি আছে। ভোজপুরে একটি বৃহৎ অট্টালিকার শেয়ারও রয়েছে তার নামে। তিনি ২, ৫০, ০০০ টাকার জীবনবীমা করেছেন। একটি নতুন ফিয়াট গাড়ী ছাড়াও তার স্ত্রীর অলংকারাদির মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী কে সি ভগৎ-এর সমগ্র সম্পত্তির মূল্য ১·৮৮ লক্ষ টাকা। এবং ব্যক্তিগত ঋণে রয়েছে চৌত্রিশ হাজার টাকা। তার তেইশ একর জমি, দুটি অট্টালিকা, একটি প্রাইভেট কার, একটি জীপ ভ্যান, একটি মোটর সাইকেল ও অলংকারাদির মূল্য তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। এছাড়া তার নামে একটি বড় ছাপাখানাও রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী রামরাজ প্রসাদ সিং জন্মসূত্রেই নব্বুই একর জমির মালিক। রাজমীরে এছাড়াও সাড়ে তিন কাঠা জায়গা রয়েছে। ব্যাঙ্কে জমানো অর্থ, শেয়ার ও গহনাপত্রের সামগ্রিক মূল্য তিন লক্ষ নব্বুই হাজার টাকা।

পরিবহন মন্ত্রী সুকদেও প্রসাদ ভর্মার একশ চোদ্দ একর জমি। অবশ্য এর মধ্যে তার ভাইয়েরও শেয়ার রয়েছে, এছাড়া নিজের গাঁয়ে একটি অট্টালিকা ও তিনটি পাম্পিং সেট আছে। তার পুত্রবধূর নামেও কুড়ি তোলা সোনা ছাড়াও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রয়েছে বিশ লক্ষ টাকা।

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী রমেশ রয় প্রসাদ সিনহার আছে পনেরো বিঘা উচ্চফলনশীল জমি, বোরিং রেডে ও পাটনায় ছেলের নামে দুটি বড় বাড়ী। একটি ফিয়াট গাড়ী ছাড়াও তার স্ত্রীর হাজার টাকার অলংকারাদি রয়েছে।

করা মন্ত্রী রাম রতন রাম ও তার স্ত্রীর যুগ্ম মালিকানায় কাঁকেতে তিন একর উচ্চফলনশীল জমি রয়েছে। উক্ত জমির একাংশের মূল্য এক লক্ষ টাকা। তার স্ত্রী ও পুত্রবধূর ষাট হাজার টাকার অলংকারাদি রয়েছে। এছাড়া তার একটি চামড়ার কারখানাও রয়েছে, যার পুঁজির পরিমাণ এক লক্ষ টাকা।

রাষ্ট্রমন্ত্রী তানেশ্বর অজাদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যার নামে এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা আছে। পিতৃ পুরুষের সূত্রে পাওয়া নয় একর জমির অর্ধেক অংশই তার নামে। বর্তমানে তিনি নিজের গ্রামে বাসগৃহ ছাড়াও আরেকটি নতুন বাড়ী তুলছেন।

কৃষিমন্ত্রী নওয়াল কিশোরের জমির পরিমাণ ৩·৩ একর। এছাড়া তার স্ত্রীর নামেও রয়েছে তিন একর জমি। মুজফ্‌ফরপুরে তার নিজস্ব দুটি বাড়ী আছে। আর আছে একটি ফিয়াট গাড়ী ও একটি স্কুটার।

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরীখ্ এঙ্গেল্‌সের

প্রাপ্তব্য সমস্ত কবিতা, কাব্যনাট্য, এপিক ইত্যাদি পৃথক দুই খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে মার্ক্স। দাম : দশ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ৭·৫০। ৫ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে গ্রাহক করা হবে।

গ্রাহককেন্দ্র : বিশ্বভারতী, ৯/৩ টেমার লেন
কলকাতা-১২। বিকেল ৩টে থেকে।

সম্পাদনা ও অনুবাদ : বীরেন চক্রবর্তী ও রথীন চক্রবর্তী

কবিতা : ৪৭-এ গড়িয়াহাট রোড। কলকাতা-১৯

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক ভারত ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ নং লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশি

পশ্চিমবঙ্গে বহু কলকারখানা বন্ধ

মালিকদের বেপরোয়া শ্রমিক ছাঁটাই বা লে-অফ

১৮শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৫ই সেপ্টেম্বর ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জরুরী অবস্থা ঘোষণার দু' মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। দেশে সর্বস্তরের অরাজকতা দূরীকরণ ও জনজীবনে সুখশান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য যে আইনী ব্যবস্থা ও কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তার আপাত প্রতিফল যে এখনও আশা-ব্যঞ্জক নয়, কলকারখানার শ্রমিকদের দিকে এক পলক চাইলেই অনুধাবন করা যায়।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কলে-কারখানায় মালিকদের যে দাপট এবং নৃশংস শোষণের যে চক্রজাল তার হাত থেকে শ্রমিকরা রেহাই পায়নি। উপরন্তু শ্রমিকদের আজন্ম নিয়তির চিরাচরিত খেলা অর্থাৎ ছাঁটাই ক্লোজার লে-অফ লক আউট পুরো-দমে চলছে। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার পরে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি শিল্পে বেশ কয়েক হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন, লে অফ হয়ে বসে আছেন।

গত সাতই আগষ্ট পর্যন্ত রাজ্য সর-কারের শ্রমদপ্তরের হিসেবে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে মোট দুশোটি ছোট বড় কারখানা ক্লোজারের কবলে। এর ফলে সতেরো হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত। উনত্রিশটি কারখানায় লক আউট চলছে যার ফলে কাজ হারিয়েছেন আঠারো হাজার শ্রমিক। এছাড়া মোট আটটি কারখানায় দশ হাজার শ্রমিকের কোন কাজ নেই। পরে আরেকটি কারখানায় লে-অফের ফলে তিন হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত। অন্যদিকে বারোটি কারখানায় শ্রমিক-দের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ফলে ধর্মঘটের জন্য কাজ বন্ধ রয়েছে, শ্রমিকরাও বেতন পাচ্ছেন না।

কিন্তু সাতই আগষ্ট পর্যন্ত এ হিসেব ছাড়াও পরবর্তীকালে এই আগষ্ট মাসেই আরও কয়েক হাজার কর্মী ছাঁটাই ও লে-অফ হয়েছেন। এর মধ্যে ন্যাশনাল রাবার, কেশোরাম রেয়ন ও টেক্সম্যাকোর ঘটনা উল্লেখ-যোগ্য। শুধুমাত্র এই তিনটি কার-খানাতেই মোট সাড়ে চার হাজার কর্মী লে-অফ হয়েছেন। এ ছাড়া উষা অটোমোবাইল, হাওড়ার জেটিয়া কটন মিলের মতো বহু ছোটখাটো কারখানায় ছাঁটাইয়ের আরও ঘটনা রয়েছে, যা সংবাদপত্রের পাতায় সব-সময় স্থান পায় না। হাওড়ার দাশ-নগর জুট মিলেও লক আউটের ফলে গত সপ্তাহে দু হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাঁটাই লে-অফের কোন পরিবর্তন হয়নি; কিন্তু ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের জীবনে স্বস্তি না ফিরিয়ে আনলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি কি? জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরবর্তী দু সপ্তাহে জনহিতকর বহুবিধ সরকারী ঘোষণা কিছু সংখ্যক মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন মালিকী জুলুম এবার খানিকটা সংযত হবে। কিন্তু সে আশা দ্বিগুণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

সরকার মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্পের মালিকদের উৎপাদন বাড়া-বার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে শ্রমিকরা গোড়া থেকেই তৎপরতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু অধি-কাংশ শিল্প সংস্থার শ্রমিকদের অভিযোগ : মালিক উৎপাদন বাড়া বার জন্য শ্রমিকদের দিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু সেজন্য কোন বাড়তি পয়সা দিতে রাজী নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা মালিকের এই জুলুমের প্রতিবাদ করতে গিয়েই ছাঁটাই লে-অফের কবলে পড়ছেন।

যেমন ধরা যাক, বজবজের চিভিয়ট জুট মিলের কথা। এখানে গত উনিশে আগষ্ট মিল কর্তৃপক্ষ এক নোটিশ জারী করে শ্রমিকদের ওপর অতিরিক্ত নাইট শিফটের কাজ অতিরিক্ত বেতন ছাড়াই চালু করার আদেশ দেওয়ার প্রতিবাদে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে রাত্রের কাজ বয়কট করে। এই মিলে বিদ্যুৎ সংকটের অজুহাতে সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ হয়। একদিন লে-অফ এবং একদিন সাপ্তাহিক ছুটির নিয়ম চলে আস-ছিল। মালিকপক্ষ কাজের দিন না বাড়িয়ে ছুটির রাত্রে অর্থাৎ সপ্তাহের সপ্তম রাত্রে নাইট শিফট চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ওয়ার্কিং কমিটিতে মালিকপক্ষ হেরে গিয়ে জোর করে বে-আইনীভাবে মিলে

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

বন্যার মোকাবিলায় সরকারী আমলাদের চরম শৈথিল্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বন্যায় পাটনা শহর ভেসে গেল, অপ্রস্তুত বাসি-ন্দারা চূড়ান্ত সঙ্কটে পড়ল। অথচ সংকেত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বিহারের প্রশাসন তার মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়নি। এ-ব্যাপারে তাদের অদ্ভুত এক শৈথিল্য সকলকে বিস্মিত করেছে।

শোন নদী স্ফীত হয়ে বিহারের দিকে দ্রুত বেগে এগোচ্ছে একথা মধ্যপ্রদেশ থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃ-পক্ষ বাইশে আগস্ট রাত্রে ইন্দ্রপুরী বাঁধের ইঞ্জিনীয়ার-দের জানিয়ে দেন। পরি-স্থিতি সম্পর্কে বিহারের চীফ সেক্রেটারীকে পরদিন জানিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় পাটনা শহর বিপদের সম্মুখীন। অনেকের মনেই এখন এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, সিনিয়র অফিসাররা কি করছিলেন। বিভাগীয় কমি-শনার শ্রীইউ কে ভর্মা স্থানীয় একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে বলেছিলেন, পাটনা শহর সে রকম বড় বিপদের সম্মুখীন নয়। অল ইন্ডিয়া রেডিও মারফৎ লোককে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধানও করা হয়নি, সাধা-রণত এসব ক্ষেত্রে যা করা হয়ে থাকে। ফলে পশ্চিমে আগষ্ট পশ্চিমাঞ্চলের লোক ছাড়া পাটনার অন্যান্য নাগ-রিকরা আশ্চর্য হল যখন তারা শুনল বন্যার জলের জন্য তারা অফিসের পর বাড়ি ফিরতে পারবে না। বন্যার জল অল্প সময়ের মধ্যেই শহর ভাসিয়ে দিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হল, যার রেশ এখনও কাটেনি।

নিউজ প্রিন্টের খদ্দের নেই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দু বছর আগে যে নিউজ প্রিন্টের জন্য ভারতবর্ষে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল সেই নিউজ প্রিন্ট এখন গুদামে গাদা হয়ে পড়ে আছে। এই পরিস্থিতির ফলে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন কয়েক মাস তারা বাইরে থেকে কোন নিউজ প্রিন্ট আমদানী করবে না।

জানা গেছে, স্টেট ট্রেডিং-য়ের কাছে এখন কানাডা ও জাপান থেকে আমদানী করা ৪৫ হাজার টন নিউজ প্রিন্ট মজুত রয়েছে এবং তাছাড়া আছে কিছু বাফার স্টক। এই কাগজ তারা বেচছে টন প্রতি ৪৬০০ টাকা দামে।

নিউজ প্রিন্টের মূল্য বৃদ্ধি এবং সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে সাম্প্রতিক নিষে-ধাজ্ঞার ফলে তিনশরও বেশি সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেছে।

এম পিদের ভাতা বাড়ল

পেনসন প্রথা চালু হতে পারে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এম পি দের মাসিক পাঁচশত টাকা ভাতা বাড়ানো হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারা গেছে। এই কাঙ্খিত ভাতা অবশ্যকরের আওতা থেকে বাদ থাকবে। বর্তমানে এম পিরা মাসিক পাঁচশত টাকা মাইনে ছাড়াও সংসদ চলাকালীন অবস্থায় পঞ্চাশ টাকা দৈনিক ভাতা পান। তাছাড়া বিভিন্ন সাবকমিটির মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার জন্য আলাদা ভাতা পান।

প্রাক্তন এম পি-দের জন্য পেনসন প্রথা চালু করার জন্য দিল্লীতে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে। এই প্রস্তাবের সমর্থকরা সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে যাতে এই প্রস্তাব বিলের আকারে পেশ করা যায় তার জন্য চেষ্টা করছেন।

এই প্রস্তাব উত্থাপকদের মতে অন্ততঃ মানবিক কারণে ও সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রাক্তন এম পিদের পেনশন প্রথা চালু করা উচিত।

যে সদস্য তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ সময় দেশ ও জনগণের স্বার্থে সংসদ সদস্য হিসাবে কাজ করছেন তিনি যখন আর সদস্য থাকবেন না তখন তাঁকে যাতে আর্থিক সঙ্কটের পড়তে না হয় তার মোকাবিলা

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

যুব কংগ্রেস নেতাদের আনন্দবাজার প্রীতি

দলের মধ্যে মতবিরোধ ও অসন্তোষ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আনন্দবাজার পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যুব কংগ্রেসের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দিয়েছে। পরিণতিতে মধ্য কলকাতার যুব কংগ্রেস নেতা অখিল রায়কে শো-কজ নোটীশ দেওয়া হয়েছে। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে শ্রীরায়কে দল থেকে বের করে দেওয়া হবে বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে।

অভিযোগ, আনন্দবাজার পত্রি-কায় বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধে মুজিবর রহমান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল। অখিলবাবু পত্রিকায় প্রকাশিত মুজিব বিরোধী নিবন্ধের প্রতি যুব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আনন্দবাজার পত্রিকার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য অনুমতি চান। জেলা কংগ্রেস ও প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে কোন রকম বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শ্রীরায়কে নিষেধ করেন।

কিন্তু এবার শ্রীরায় অন্য একটি সংগঠনের নামে আনন্দবাজারের সামনে বেশ কিছু যুবক নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ফলে যুব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চটে যান। এবং শ্রীরায়ের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনেন।

নেতৃস্থানীয় যুব কংগ্রেস কর্মীদের একাংশের অতিমাত্রায় আনন্দবাজার প্রীতিতে অনেকেই অসন্তুষ্ট। এর ফলে কংগ্রেসের জনৈক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে যুব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মত-বিরোধ চরম পর্যায়ে।

রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা অরাজকতা বিদেশী শোষণ

রাঘবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিলি

চিলি লাতিন আমেরিকার একটি অন্যতম শিল্পোন্নত রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিদেশীদের কাজ-কর্মে বরাবরই দুর্বল রয়ে গেছে। এর প্রতিফলন দেখা গেছে দেশের রাজনীতিতেও।

রাজনীতি, অর্থনীতিরই ঘনীভূত রূপ (politics is the concentrated of Economics)। একদিকে চিলির সাধারণ মানুষ বরাবরই এই অর্থনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সবসময়েই বিদেশীদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার শপথ নিতে হয়েছে। রাজনীতিতে ভারসাম্যহীনতা চিলির ক্ষেত্রে সাবেকী বৈশিষ্ট্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে সরকারী ক্ষমতায় এসেছে। কোন দলই ১৯৬৭-র আগে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি, ফলে একই লোককে কখনও বামপন্থী, কখনও দক্ষিণপন্থী মোর্চার নেতা হিসাবে ক্ষমতায় বসতে দেখা গেছে। ১৯২৮ সালে ইবানেজ (Ibanez) রাষ্ট্রপতি হন। তখন তিনি চার বছর ডিকটেটারি কায়দায় শাসন চালান। ১৯৩২ সালে দেশের মানুষের প্রবল অভ্যুত্থানের মধ্যে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হন। এই বিদ্রোহে হাত মেলায় সৈন্যবাহিনীর তরুণ অফিসার এবং সৈন্যদের এক অংশও। এই ইবানেজকে অনেকে পেরুর ফ্যাসিস্ট নেতা পেরোন (Peron)-এর পূর্বসূরী হিসাবে চিহ্নিত করেন। পেরোনের সঙ্গে এর রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে মিলও খুব। পেরোনের সঙ্গিনীর মত এরও এক সঙ্গিনী ছিল—চিলির রাজনীতিতে ঐ সময় তার ক্ষমতাও ছিল অনেক। ইবানেজের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় চিলির সোসালিস্ট পার্টি। অধুনা নিহত সালভাদর আয়েন্দে (Salvador Allende) এই পার্টিরই নেতা ছিলেন।

এই ইবানেজই আবার ৭৫ বছর বয়সে নতুন করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ১৯৫২ সালে। দেশে ফিরে এবার তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য চিলির বামপন্থী দলগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারেও তিনি পেরোনের পূর্বসূরির কাজ করেন।

চিলির কমিউনিস্ট পার্টি তৈরী হয় এই শতকের দ্বিতীয় দশকে। মোটামুটিভাবে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমসাময়িক। এই পার্টির রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও খুব মিল। ১৯৪৮ সালে চিলির তৎকালীন ফাসিস্ট সরকার এই পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে। পার্টি এই সময়ে যথেষ্ট জঙ্গী ছিল। বেআইনী অবস্থায়ও চিলির বিভিন্ন গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন চিলির কমিউনিস্ট পার্টি। পাশাপাশি সোসালিস্ট পার্টিও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

১৮৫২ সালে রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য ইবানেজ কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্য নেন। প্রতিদানে ১৯৫২ সালের পর এই পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত বেআইনী অবস্থায় ছিল। ১৯৫২তে আবার আইনি সমর্থন মেলার পর চিলির কমিউনিস্ট পার্টিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে ঝোঁক বেশী দেখা যায়। ফলে পার্টির বিপ্লবী কর্মীদের অংশবিশেষ পার্টি থেকে বেরিয়ে নিজেদের দল তৈরী শুরু করেন ষাটের দশকে। সারা পৃথিবীতেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে সমসাময়িক সময়ে ঘটনার মিল স্পষ্ট। চিলিতে এই দলগুলির মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী এম. আই. আর. (M. I. R—— Movement of the Revolutionary Left)। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে এবং শহরাঞ্চলে সব থেকে নিপীড়িত শ্রমিকদের মধ্যে এদের ঘাঁটি। এই সংগঠনই আয়েন্দের মৃত্যুর পর সামরিক জুন্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

চিলির সংসদের রাজনীতিতে শক্তিশালী দল হিসাবে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি, চিলির সোসালিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি বেশী পরিচিত। এছাড়া আরও অনেক 'দক্ষিণপন্থী' 'বামপন্থী' পার্টি চিলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক জোটে ছিল চিলিতে পুঁজিবাদের বিকাশ অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় চিলির জনগণের রাজনৈতিক মানও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশ থেকে উন্নত। অবশ্য পুঁজিবাদ চিলিতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিরই পকেট ভারী করেছে। বর্তমান শতকের প্রথম থেকে যতগুলি দল সরকারে আসীন হয়েছে, প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষের জীবনযান উন্নত করার শপথও নিয়েছে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ক্রমেই বেড়ে গেছে। মূল্যবৃদ্ধির উঁচু হার চিলির মানুষের পকেট আরও হাল্কা করে নিয়েছে।

তামা চিলির অন্যতম সম্পদ। যখনই তামার বাজার কমে গেছে তখনই রাজনীতিতে ও টালমাটাল অবস্থা হয়েছে। আসলে রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতার কারণ তো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। বিদেশী অর্থনীতির শোষণ দিনের পর দিন বেড়ে গিয়ে সমস্ত অর্থনীতিতেই প্রচণ্ড সমস্যা এনে দিয়েছিল। শুধু মাত্র ১৯৫৮ সালের মধ্যেই তামার দাম পড়ে যায় ৫০%, আর চিলির বিদেশী ধারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ কোটি ডলারে। ইবানেজের দ্বিতীয় শাসনকাল চিলির অর্থনীতিকে আরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে। এই অবস্থায় ১৯৫৮ সালে যে নির্বাচন হয় তাতে দক্ষিণপন্থী নেতা জর্জ অলেজান্দ্রি (Jorge Allensandri) চিলির সোসালিস্ট পার্টির নেতা আয়েন্দেকে কম ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই আলেজান্দ্রির পিতা ছিলেন চিলির প্রথম 'বামপন্থী' রাষ্ট্রপতি। দ্বিতীয় আলেজান্দ্রি সরাসরি দেশের শোষক, সুতরাং আমেরিকার, সপক্ষে ছিলেন। আলেজান্দ্রি সরকার চিলিতে অর্থনীতির কোন উন্নতি না করতে পারায় শাসন চালায় সামরিক বাহিনীর সাহায্যে। সাধারণ মানুষের রোষ বেড়ে চলে এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও সোসালিস্ট পার্টির প্রতি সমর্থনও বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রক্ষমতার আসল দখলদার চিলির ম্যুৎসুদ্দি ও বেনের দল এতে বিপদের গন্ধ পায়। চিলির তামা শিল্পের অধিকারী আনাকণ্ডা ও কেনেকটও শঙ্কিত হয়ে পড়তে থাকে। ১৯৬৪ সালে নেতা নির্বাচিত হন তথাকথিত মধ্যপন্থী দলের নেতা এদোয়ার্দো ফ্রেই মন্তালভা (Edwardo Frei Montalvr) বা সংক্ষেপে ফ্রেই। 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে'র আশ্বাস দিয়ে নির্বাচনে জেতেন ভদ্রলোক। এর শপথ ছিল ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টনের, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি বন্ধ করার, দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান করার এবং দেশকে বিদেশী শোষণ থেকে মুক্ত করার—এক কথায় গরিবী হঠানো এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। আসলে এই ফ্রেই-এর মত নেতাদের চিনতে আমাদের খুব অসুবিধা হবে না। ফ্রেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে শহরে মধ্যবিত্তদের দলে টানার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে ২৪২,০০০ নতুন চাকরির বন্দোবস্ত করা হয়। যদিও সংখ্যার দিক থেকে বড় তবে চিলির মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা খুব বেশী নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে চিলির অধিবাসীদের অধিকাংশ শহরে বসবাস করতে বাধ্য হন। ১৯৬৩তে বেকার ছিল ৭ শতাংশ। ১৯৬৮তে কমে দাঁড়ায় ৫ শতাংশ। স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে তিন বছরে নতুন ৫,০০,০০০ ছাত্রের পড়াশুনার সুযোগ করা হয়। নতুন বাসস্থান তৈরী হয় বছরে গড়ে ২২,০০০ করে—যদিও গৃহসমস্যা মেটানোর জন্য ১০৫১ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ৪,৪০,৫০০০ বাড়ী তৈরীর প্রয়োজন ছিল। গ্রামের দিকে নতুন ব্যবস্থা নেওয়ায় প্রায় ৩০,০০০ মত চাষী জমি পেয়েছিল—প্রতিশ্রুতি ছিল ১০০,০০০ ভূমিহীনকে জমি দেওয়ার।

ফ্রেই-এর এই সমস্ত কাজকর্মের পাশাপাশি অন্যদিকটাও আমরা দেখতে পারি। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার হার বাড়তে বাড়তে ১৯৬৮র গোড়ায় ৩৫% দাঁড়ায়। জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে ১৯৬৫তে ২৫%, ১৯৬৬তে ১৭% এবং ১৯৬৭-তে ২২%। চিলির কারেন্সি এসকুদো (Escudo)র দাম পড়তে থাকে হু হু করে। আমেরিকার ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশ আরো বেড়ে যায় এই সুযোগে।

দেশে অসন্তোষ বেড়ে চলে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্য ফ্রেই সরকার ১৯৬৭-র শেষের দিকে নতুন শ্রমিকনীতি চালু করার চেষ্টা করে। এই নীতিতে শ্রমিকদের হাত থেকে ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়।

প্রচণ্ড বিক্ষোভের সামনে এই নীতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় সরকার। এরপর ফ্রেই সরকার বামপন্থী দলগুলির, বিশেষত চিলির কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এদের সহায়তায় শ্রমিকদের শান্ত করায়। ফ্রেই সরকারকে কিন্তু বিদেশী শক্তিগুলি ক্রমাগত সমর্থন দিয়ে চলেছিল। আমেরিকার স্বার্থ খুবই স্পষ্ট। রাশিয়াও ফ্রেইকে ক্ষমতায় রাখার চেষ্টা চালিয়েছে এই সময়ে। মূলতঃ এই সময় থেকেই রাশিয়া চিলির রাজনীতি, অর্থনীতিতে কৌতূহলী হতে সুরু করে। চিলির মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি যদিও সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে মোর্চা বেঁধেছিল কিন্তু রাশিয়া ফ্রেই সরকারকে মদত দেওয়ায় এরাও ফ্রেইকে নানারকম সাহায্য করত। চিলির তামা তামা শিল্পের শ্রমিকরা অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় অবস্থাপন্ন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছিল। তামা শিল্পের শ্রমিকরা বিক্ষোভ থেকে বিরত থাকত প্রায়ই। ১৯৬৮ সালের এপ্রিলে রাশিয়ার মন্ত্রী সান্তিয়াগোতে খান একটা ৪·২ কোটি ডলার দামের শিল্প প্রতিষ্ঠান (Industrial Plant) বিক্রীর ব্যবস্থা করতে, ফেরার পথে ফ্রেইকে নতুন করে নেমন্তন্ন করেন রাশিয়ায় বেড়াতে।

ফ্রেই দেশের লোককে সব থেকে বড় ভাঁওতা দিয়েছিলেন তামা শিল্পের 'চিলিকরণ'-এর নামে। 'ব্রাডেন কোম্পানি' কেনেকটের অন্তর্ভুক্ত, চিলিতে তামার উৎপাদনে রাজি ছিল। প্রতিদানে এদের শর্ত ছিল যে সরকার তাদের লাভের ওপর ৫০% শতাংশের বেশী কর বসাতে পারবে না। এই ব্যবস্থায় ব্রাডেনের লাভের হার ২৬·৯% থেকে কমে (১৯৪৫—৬৩ সালের গড় হিসাবে) ১২·৪% দাঁড়াতো। ফ্রেই সরকার এই শর্ত না মেনে 'চিলিকরণে'র প্রস্তাব নিলেন। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্রাডেনকে ১৬০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার বন্দোবস্তই করা হল। যদিও এই কোম্পানীর দাম তখন আসলে ছিল ৬৬ মিলিয়ন ডলার। এই ভাবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার ব্রাডেন কোম্পানীর ৫১% শেয়ার কিনলেন। শুধু তাই না, সরকার উৎপাদন বাড়ানোর খরচার অংশও নিজের ঘাড়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে উৎপাদন বাড়ানোর খরচা আনুমানিক ৩০ মিলিয়ন ডলার বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে এই নতুন ব্যবস্থায় ব্রাডেন তার পুঁজির ওপর ২৪% লাভের সুবিধা পেল। এই হার সাবেকী গড় ৩৬·৯% থেকে অল্প কম হলেও, ব্রাডেন যে লাভে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল—১৩%—তার দ্বিগুণ। পাশাপাশি চিলির নিজস্ব বিনিয়োজিত পুঁজির ওপর লাভের হার মাত্র ৮·৫%। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমে-

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কয়লাখনি পরিক্রমা

জাতীয়করণের ফলে শ্রমিকদের বেতন বাড়েনি ঃ মনেও অনাস্থা

সাধন গুহ

জাতীয়করণের পর কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে মূল্যবোধের কোন হেরফের ঘটেছে কি? প্রশ্নটি করেছিলাম কোল মাইনস অথরিটি, ইস্টার্ণ ডিভিশনের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার শ্রীজয়ন্ত বসুকে। শ্রীবসু সহৃদয়তার সঙ্গে মুক্ত মনেই আলাপ করছিলেন আমার সঙ্গে। অভিযোগ না করেও তিনি বলছিলেন যে, প্রাইভেট সেকটরের চলনায় শ্রমিকদের বেতন অনেক পরিমাণে বাড়লেও এবং তাদের চাকরীর নিরাপত্তা স্বীকৃত হলেও কাজে উৎসাহ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

প্রাথমিক তথ্য

সি এম এ ইস্টার্ণ ডিভিশনে বর্তমানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার। এর মধ্যে একজিকিউটিভ গ্রেডের অফিসারের সংখ্যা বারো শ'। প্রাক্ জাতীয়করণ পর্বে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকাধীন দুইশ চোদ্দটি খনি এবং একুশ আটচল্লিশটি বন্ধ কয়লাখনিকে জাতীয়করণ করার পর এগুলোকে ছয়টি এরিয়া এবং কুড়িটি সাব এরিয়ায় ভাগ করে সাকুল্যে ইস্টার্ণ ডিভিশনে ছিয়াশিটি কোলিয়ারীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ইস্টার্ণ ডিভিশনের প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন এম ডি অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। বর্তমানে এম ডি হচ্ছেন শ্রীরামাইজী ভার্মা। ইনি নন্ টেকনিক্যাল ম্যান। শ্রীভার্মার প্রশাসনিক যোগ্যতা সম্পর্কে নীরব থেকেও সঙ্গত কারণেই একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কয়লাখনির গোটা কাজটাই যেখানে টেকনিক্যাল সেখানে একজন নন্ টেকনিক্যাল অফিসারের পক্ষে অভিজ্ঞ প্রশাসন পরিচালনা করা কতখানি সম্ভব। কোলিয়ারীতে ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমার এই প্রশ্ন।

কয়লার শ্রেণীবিভাগ

নন্ কোকিং কয়লা হচ্ছে সি এম এ-র অন্তর্ভুক্ত। কোকিং কোল বি সি সি এল অর্থাৎ ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের অন্তর্ভুক্ত। আগুন দিলে কোকিং কোলের কণিকাগুলো পুড়ে গিয়ে একটা পিণ্ডে পরিণত হয়। নন্ কোলিংয়ের ব্রেণ্ডেবেল কোয়ালিটিতে আগুন দিলেও অংশত পিণ্ডে পরিণত হয়। তাছাড়া আছে সিলেকটেড্ এ বি সি ডি ই। কোকিং কোল এবং নন্ কোলিংয়ের সিলেক্টেড "এ" শুধু ইস্পাত কারখানায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণের ব্যবহার্য নয়। যত নীচ থেকে তোলা হয় ততই কয়লার গ্রেড ভাল হয়। গ্রেড ঠিক করা হয় পোড়া ছাইয়ের পরিমাণ দিয়ে। সিলেকটেড বি এবং সি ব্যবহৃত হয় বয়লার এবং ফার্নেস ইত্যাদিতে। বাকীগুলো সাধারণের ব্যবহার্য।

খাদে কিভাবে কাজ হয়?

খাদে প্রতিটি কয়লার স্তরকে বলা হয় "সীম"। একটা সীমকে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট বিভিন্ন ফেজ-এ ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে কমপক্ষে চারটি ফেজ থাকে। কোলিয়ারী কন্ট্রোল অর্ডার অনুযায়ী খাদে কয়লা কাটার নিয়ম হচ্ছে এই ঃ

(এক) কোল কাটিং মেশিন দিয়ে প্রথমে আণ্ডার কাট অথবা নীচটা কেটে ফাঁপা করে দেওয়া হয় যাতে রুফ অর্থাৎ ছাদ না ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেশিন পাওয়া না গেলে সলিড ব্লাস্টিং করা হয়—যেটা নানা-কারণেই বিপজ্জনক। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে করবো।

(দুই) এরপর "স্প্রে" অর্থাৎ জল ছিটিয়ে কয়লা ভিজিয়ে দিতে হয়। যাতে কোল ডাষ্ট না উড়তে পারে অর্থাৎ সাপ্রেশন অথবা সাফোকেশন না হয়।

(তিন) এরপর মাইনিং সর্দারকে নিয়ে ম্যানেজার গিয়ে দেখবে যাতে রুফ-এ কোন পাথর কুচি না থাকে। থাকলে গাঁইতি দিয়ে তা ভেঙে দেবে।

(চার) এরপর কয়লা কাটা শুরু হয়।

একটা কথা এখানে বলা দরকার যে, রানীগঞ্জ এবং বরাকরে সবগুলোই গ্যাসিয়ার মাইন। ফলে সমস্ত নিয়ম কঠোরভাবে পালিত না হলে প্রতি মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং ঘটছেও। সি এম এ ইস্টার্ণ ডিভিশনের সেফটি এ্যাণ্ড কলজারভেশন সেল কর্তৃক প্রকাশিত সেফটি ?রিভিয়ুর উনিশশ চুয়াত্তর সালের বার্ষিকী সংখ্যা থেকে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর তালিকা দেখা যায় যে, উনিশশ্বে তিয়াত্তর সালে যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল একচল্লিশ, চুয়াত্তর সালে সেটা বেড়ে হয়েছে পঞ্চান্ন। পঁচাত্তর সালের জুন মাস পর্যন্ত শুধু বিস্ফোরণঘটিত মৃত্যুর সংখ্যা ছয়। সি এম এ ইস্টার্ণ ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত বুলেটিন থেকেই এই তথ্য উদ্ধৃত করছি। চলতি বছরের দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর সংখ্যা জুন মাস পর্যন্ত MD/ED/ S & C/ CTA 2047 Dt 2-7-75 নং সাকুলার অনুযায়ী আঠাশ। এই সার্কুলার প্রচারের পরেও এই অঞ্চলে বিরাট দুর্ঘটনা হয়েছে—সংবাদপত্রে প্রচারিত যার নিহতের সংখ্যা যোগ করলে চলতি বছরে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা চুয়াত্তর সালকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা প্রাথমিক সত্য হিসাবে আমার মনে হয়েছে যে, অর্থকরী উন্নতি হলেও খাদের নীচে জীবনের নিরাপত্তা নেই বলেই সম্ভবত শ্রমিকদের মনে প্রয়োজনীয় আস্থা এখনও ফিরে আসেনি। একমাত্র না হলেও হতাশা সৃষ্টিতে এটাই প্রধান কারণ। সবকিছু সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়ছে ঠিকই কিন্তু তার উৎস কোথায় এটা আজ বিশেষভাবে বিচার্য। পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করবো।

বেতাল ছড়া

অনার্য মিত্র

বলং তস্য
ধনুর্বস্য বলং তস্য
নির্ধনস্য কুতো বলম্
বেদনাবিধুরে শুষ্কে বক্ষে
পানং করোতি হলাহলম্।

অদ্ভুত যোজনা বস্তু ঘোষণা
এগিয়ে যাচ্ছি জোর কদম,
ধন্য ধন্য অগ্রগণ্য
দেহী পদপল্লবম্।

বিনি পয়সার ভোজ
জুটতো যদি রোজ
বিনি পয়সার ভোজ
তবে কি কেউ সাত সকালে
করত কাজের খোঁজ?

ভাবনা বটে,
এ এক আজব
বিনে পয়সায় খাবার খাওয়া
কার ভাগ্যে ঘটে।

মাথা যে লোক বেচতে
পারে চাঁদমারির হাটে
খাবার ক্যানে, পয়সা এসে
তাহারও পাও চাটে।

মাথার যদি এতই গরব
এতই মাথার মায়া
বিনি পয়সায় তবে কেন
ভোজ খেতে চাও ভায়া?

দেশপ্রেমিক হিটলার
হুক্কা হুয়া হুয়া
ফ্যাসীবাদের ধুয়া
নিজের হাতেই বিষ ছড়িয়ে
ধুয়া তুলিস ভুয়া।

মাপতে গেলে দেশপ্রেম
আনগে দাঁড়িপাল্লা,
তার আগে ছাড়তো দেখি
হিটলারী আলখাল্লা।

মায়ের চাইতে সম্মর আগে
দরদ দেখায় মাসী,
প্রভুর আগে চোখ রাঙিয়ে
ধমক্ লাগায় দাসী।

গায়ে পড়ে দরদ দেখাস
হিটলারী জলঢোঁড়া
যার ঘোড়া তার ঘোড়া না
চ্যারাকদারের ঘোড়া।

চোর বদল
থোড় বড়ি খাড়া
খাড়া বড়ি থোড়
এক চোরের মুণ্ডু কেটে
বসল আরেক চোর।

চোরের মায়ের বড় গলা
বিদেশে তার বাস,
দেশে দেশে বাণিজ্য তার
ঘটায় সর্বনাশ।

হরির লুটের দেশে হল
লুটের বখরা ভাগ
ঢাক্ রে ব্যাটা ঢাক্ তুই
শাক দিয়ে মাছ ঢাক্।

কৃষ্ণ ভজে সর্বজনে
চোর সে ননীচোর
চোর মহারাজারে তুই
এমন কি দোষ তোর?

রবীন্দ্রসঙ্গীতও কি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পক্ষে হানিকর?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের বিচারে বিশেষ বিশেষ রবীন্দ্র সঙ্গীতও কি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পক্ষে হানিকর বলে বিবেচিত হচ্ছে? গত একুশে আগষ্ট টেলিভিশনে রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান লিপি প্রচার করা হয় তাকে কেন্দ্র করেই এই প্রশ্নটি আরও দৃঢ়মূল হচ্ছে।

দর্পণের প্রতিনিধি বিশ্বস্ত মহল থেকে খবর নিয়ে জেনেছেন যে, একুশে আগষ্ট কলকাতা টেলিভিশনে প্রদর্শিত রাখি পূর্ণিমার অনুষ্ঠান সূচীটির নির্মমভাবে অঙ্গহানি করা হয়েছে। যিনি এর পাণ্ডুলিপি রচনা করেন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে রাখি বন্ধন উৎসবের ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত রাখি বন্ধন উৎসবও এর অঙ্গীভূত হয়। আরও জানা গেছে যে, আলোচ্য পাণ্ডুলিপি রচনার কাজে সত্যজিৎ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও নানাভাবে পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। পাণ্ডুলিপি যিনি রচনা করছেন তিনিও কলকাতার বিদগ্ধ মহলের একজন। তিনি রাখি উৎসব প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই রবীন্দ্রনাথের "শীহিন্দুমেলা" যুগের কয়েকটি গান এর অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর নির্দেশমতোই এটি টেলিভিশন স্টুডিওতে গৃহীত হয়। প্রদর্শনের সময় মূল পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ, এমনকি "বিধির বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান" নামক রবীন্দ্র সঙ্গীতটিও নাকি ছাঁটাই করা হয়েছে। খবরে আরও প্রকাশ যে, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ নাকি রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশ" পর্যায়ভুক্ত কিছু কিছু গান প্রচারেও নারাজ।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টেলিভিশনে পূর্বঘোষিত "কোরাস" ছবির প্রদর্শনও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাকি ছবিটি না দেখে এটি টেলিভিশনে দেখতে পারছেন না। তাদের আপত্তির অন্যতম বিচার্য নাকি এট যে ছবিটি "এ" মার্কা কিনা এবং ছবিতে ভায়োলেন্স আছে কিনা! মৃণাল সেন কলকাতার বাইরে থাকায় এ সম্পর্কে তার মতামত জানা যায়নি। কিন্তু, আমাদের কাছে যে খবর আছে তার ভিত্তিতে একথা বলা সম্ভব যে, কলকাতা টেলিভিশনের বয়স একমাস হতে না হতেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালীপনার চূড়ান্ত নজির সৃষ্টি করে চলেছেন। "কোরাস" ছবি সম্পর্কে যদি তারা বিশদ বিবরণ না-ই জানেন তবে এই ছবি প্রদর্শনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় কিভাবে? সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রশ্ন করা যায় যে, "কোরাস" জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এই ছবি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বহু পুরস্কার পেয়েছে। এমন কি, ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকা কালীনই মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে "কোরাস" ছবির কপি সরকারীভাবে হস্তান্তরিত করেছেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জী। এর পরও ছবিটি "এ" মার্কা কিনা অথবা এতে ভায়োলেন্স আছে কিনা টেলিশন কর্তৃপক্ষের এই প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? স্বয়ং ভারত সরকার যে ছবিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধি স্বয়ং যেখানে এট ছবির প্রিন্ট হস্তান্তরিত করছেন বিদেশে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেখানে কলকাতা টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ নতুন করে এই ছবির প্রদর্শনের যোগ্যতা সম্পর্কিত নতুন শর্ত আরোপ করেন কি করে?

দর্পণের প্রতিনিধি বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে অনুমান করছেন যে, ইতিমধ্যেই কলকাতা টেলিভিশনে গোষ্ঠী চক্রান্ত দানা বাঁধতে শুরু করেছে যার ফলে কলকাতা এবং মফঃস্বলের শীর্ষ স্থানীয় গ্রুপ থিয়েটারগুলো এখানে হয়তো কোনভাবেই অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রিত হবেনা নয়।

দর্পণ
সংবাদ সাপ্তাহিক
বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা ঃ
৬১, বউ বাজার, কলি-১৩

বিপর্যস্ত মূল্যবোধ

আমরা যখন ছোট ছিলাম—সে মাত্র বছর দশেক আগের কথা, তখনও আমরা বড় কিছুর একটা স্বপ্ন দেখতাম। আজকাল ওসব প্রায় উঠে গেছে। আমার বাবা বলতো—তিন তলা লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়লে দোতলায় যাবে, দোতলা লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়লে একতলা যাবে। অতএব বড় কাউকে আদর্শ কর, তাহলে অন্তত তার কিছুটা পাবে। আজকাল ছেলেরা বড় কিছুর স্বপ্ন দেখেনা। বড় জোর ভাবে বড় হয়ে ধর্মেন্দ্র হব।

ছোট বেলায় আমাদের বড়রা কেউ ডাকলে "আজ্ঞে" বলে উত্তর দিতাম ("আজ্ঞে"টা অবশ্য আমারো পছন্দ নয়, তার বদলে "কেন" অথবা "বলো" বলে উত্তর দেওয়াই ভালো)। আর এখনকার বাচ্চারা বড়রা কেউ ডাকলে কর্কশভাবে চেঁচিয়ে ওঠে "কি"। যৌথ পরিবার-গুলিতে ভাঙ্গন ধরার জন্য আজ-কালকার বাচ্চারা "জ্যাঠতুতো দাদা" "মাসতুতো দাদা" খুব ভাল চিনে গেছে। তাই নিজের পরিবারের কাউকে বাইরের কেউ শাসন করতে এলে রুখে দাঁড়ায়। কিছুদিন আগে আমি নিজেই আমার এক আত্মীয়ের বাচ্চা ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ছোটবেলায় আমরা অন্যায় করলে পাড়ার দাদারাও কান মুলে দিতে পারতো।

সমস্ত রকমের মূল্যবোধই আজকাল ওলট পালট হয়ে গেছে। আমরা চোদ্দ পনের বছর বয়সে প্রথম যখন লুকিয়ে লুকিয়ে একটা দুটো সিগারেট খেতাম তখন আশপাশে লেবুপাতা ঘষে চ্যানাচুর খেয়ে বাড়ী ফিরতাম আর এখনকার পনেরো ষোল বছরের অনেক ছেলে সন্ধ্যার পর দিব্যি মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে।

বেশ কিছুদিন আগে একটি দৈনিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে হিসাব কষে দেখিয়ে দিয়েছিল যে পশ্চিমবাংলায় মদ বিক্রি গত কয়েক বছরে অনেক বেড়ে গিয়েছে। আজ-কাল বহু চায়ের দোকান আর রেস্টুরেন্টে একরকম খোলাখুলি-ভাবেই মদ বিক্রি হয়। এত মদ খাও-য়ার হুজুগের মধ্যে কখনো সুস্থ মূল্যবোধ তৈরী হতে পারে না।

মাস কয়েক আগে আমি উত্তর কলকাতার কাশী বিশ্বনাথ মন্ডপে ক্যাবারে নাচ দেখতে গিয়েছিলাম। প্রধান "আকর্ষণ" মিস শেফালী। গোটা হলে একটাও সিট খালি ছিল না। পনেরো টাকা, বিশ টাকার সব টিকিট শেষ, হলের বাইরেও প্রচুর লোক। পুলিশ কয়েকবার মৃদু লাঠি চার্জও করল। অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। কিন্তু শেফালীর নাচের আগে একটি বাচ্চা মেয়ে নাচতে এল। সঙ্গে সঙ্গে হলের মধ্যে চীৎকার শুরু হয়ে গেল। কয়েকজন চিৎকার করে উঠল—শেফালী চাই, শেফালী। একজন আবার ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল—তুই বড় হয়ে শেফালী হবি—বাড়ী যা। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে তালি মেরে ঐ বাচ্চা মেয়েটিকে এক রকম হটিয়ে দিল। যার প্রতি ঐ রকম কান্ডটা করা হল তার বয়স নয় দশের বেশী না, আর যারা ঐরকম কান্ডটা করল তাদের কারো বয়সই পঁচিশের কম নয়।

বিপর্যস্ত মূল্যবোধের পরিচয় আজকাল সর্বত্র মেলে। ট্রেনে ট্রামে বাসে কলেজগামী ও কলেজ ফেরৎ ছেলেদের দেখি বাপের বয়সী লোকের সামনে অনায়াসে দুই নম্বরী খিস্তি চালিয়ে যায়। কোন দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই। আসলে লজ্জাবোধই নেই—তো লজ্জা আসবে কোথা থেকে। বরং বয়স্ক লোকেরাই বিব্রত বোধ করে, গাড়ীতে পাশ ফিরে বসে বা কম্পার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যায়। এই জেনারেশন সম্বন্ধে এক তিক্ত ধারণা নিয়ে বাড়ী ফেরে। কতরকমের উল্টো-পাল্টা ব্যাপার যে বাসে ট্রেনে রাস্তা-ঘাটে দেখা যায়। শিয়ালদা স্টেশনে বিকালের দিকে যখন ডাউন ট্রেন-গুলো এসে থামে তখন অফিস ফেরৎ যাত্রীরা যেভাবে তার উপর সামান্য জায়গা রাখার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তা দেখে বাইরের অপরিচিত লোক আঁৎকে উঠতে পারেন। জীবন বিপন্ন করে চলন্ত ট্রেনে যেভাবে শয়ে শয়ে লোক উল্লাদের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে তা দেখে বিদেশের কোন লোক হয়ত ভেবে বসতে পারে ওর মধ্যে কি হীরে জহরৎ আছে? অফিসফেরৎ ক্লান্ত মানুষের কাছে একটা সিট খুবই লোভনীয় ঠিকই। কিন্তু ট্রেনের

মতামত

ভেতরের যাত্রীদের নামতে না দিয়ে, তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে, তাদের মাড়িয়ে চলে যাওয়া কি সুস্থ মূল্য-বোধের পরিচয়? ট্রেনের ভিতরের বিপক্ষ যাত্রীরা যতই চিৎকার করুক না কেন—আমাদের আগে নামতে দিন, আপনারা পরে উঠবেন—কেউ কারো কথা শোনে না, হুটোপাটা করে উঠে পড়ে। এতে সব থেকে অসুবিধায় পড়ে শিশু মেয়েরা।

এত বিপর্যয়ের মধ্যেও মাঝে মাঝে দু-একটা ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যা দেখে ভাল লাগে। কিছুদিন আগে ময়দানে শহীদ মিনারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। সঙ্গে আমার পিস-তুতো দাদা। বেশ কিছুক্ষণ থেকে আমরা সিগারেট ধরাব ধরাব করছি কিন্তু কাছে কোন দেশলাই নেই। কাছাকাছি কোন লোক দেখছিলাম না যার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট আছে। হঠাৎ খেয়াল হল বেশ কিছুটা দূরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে সিগারেট খাচ্ছেন। আমার পিসতুতো দাদাটি তাই দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। তাঁর কাছাকাছি গিয়ে একটু দাঁড়াল, তারপর সোজা ফিরে এল। সিগারেট ধরাল না। ও ফিরে আস-তেই আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিরে, সিগারেট ধরালি না? ও বলল—নারে, ওরকম বয়স্ক লোকের কাছ থেকে সিগারেটের আগুন চাইতে কেমন যেন লাগল। পারলাম না। ভদ্রলোক আমার বাবার বয়সীই হবে।

আরেকটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। নীলরতনে এক তিনতলায় একদিন আমি একটা কাজে গিয়েছি। হঠাৎ তিনতলায় উঠেই আমার পেটেব্যথা করে মাথা ঘুরে যায়। আমি ওখানেই একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ি এবং বমি করি। ঐ সময় এক ভদ্রমহিলা এসে আমাকে সুস্থ করে তোলেন। উনি আমাকে বমি করতে ও শুয়ে পড়তে দেখে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকেন আমার কি হয়েছে। আমি খুব ইতস্তত করছিলাম। উনি আমাকে তার পরিচয় দিয়ে বললেন—উনি একজন লেডী ডাক্তার। তাতেও আমাকে চুপচাপ দেখে উনি বলতে থাকেন—আমার কাছে অসুবিধা কিসের, আমি তো তোমার মায়ের মতন। ডাক্তারদের সম্বন্ধে আমার ধারণা মোটেই ভাল না। অনেক লোকের কাছেই ডাক্তারদের সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনতে পাই। কিন্তু সেদিন তার কথায় ও ব্যবহারে চমকে উঠেছিলাম। সাধারণত রাস্তা-ঘাটে বাইরে দেখা কোন মানুষের চেহারা আমার বিশেষ মনে থাকে না, কিন্তু সেই ভদ্রমহিলার মুখ এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে।

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

লজ্জাজনক আচরণ

এমন অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলো চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কদিন আগে আমরা সামনে এমন একটি ঘটনা ঘটে-ছিলো, যেটা সত্যিই চিন্তা করা যায় না। ঘটনাস্থলে আমি না থাকলে, সে কাহিনী অন্য কারো কাছ থেকে শুনে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না।

গত আটই আগস্ট তারিখে, কলকাতা গিয়েছিলাম একটা চাকু-রীর ইন্টারভিউ দিতে। আমার এক বন্ধু ছিলো আমার সঙ্গে। ইন্টার-ভিউ দিয়ে বিকেলের রাণাঘাট লোকাল ট্রেনে উঠলাম। দমদম স্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন কিছুটা এগিয়ে গেছে। দেখলাম, দমদম থেকে ওঠা তিনটে মেয়ে বন্ধুর চারপাশ দিয়ে দাঁড়ালো। একজন ওর সামনে এক-জন পাশে একজন পেছনে। তিন জনেই ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম ও বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। একটু পরে ও ওদের বলল, আপনারা একটু প্রপারলি দাঁড়ান। একথা শুনে মেয়েগুলো খিলখিল করে হেসে উঠলো ও নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে ঠেলা মারতে লাগলো। এ-ধরণের ঘটনা দেখতে আমি অভ্যস্ত নই, তাই ব্যাপারটা আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিল। আমি ব্যাপারটা ভাল-ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম। এর কিছুক্ষণ পরে আমি অবাক হয়ে দেখলাম ওই মেয়ে তিনটির একজন আমার বন্ধুটির পায়ের উপর পা চাপিয়ে দিল আর আর একজন আস্তে করে ভীড়ের মধ্যে বন্ধুটির পেটে চিমটি কাটল। আমার বন্ধু এবার চীৎকার করে উঠলো—কি হচ্ছে কি? অসভ্য, বদ কোথাকার। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এর পরেও মেয়েগুলোকে হাসতে দেখে। ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—ব্যাটার মাথায় বোধহয় স্ক্রু ঢিলে আছে। এরপর আমার বন্ধুটির সঙ্গে গাড়ীর আরো কিছু লোক এর প্রতিবাদ করলেন। শেষে প্রচন্ড চেঁচামেচির মধ্যে মেয়েগুলো বেলঘরিয়া স্টেশনে নেমে যায়। মেয়েগুলোর চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদ দেখে ভদ্র সন্তান বলে মনে হয় অথচ আচার-আচরণ কেমন নীচু স্তরের। ভদ্রঘরের মেয়েরা যে এরকম আচরণ করতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। আন্ত-র্জাতিক নারীবর্ষে মেয়েদের এ-ধরণের আচরণ লজ্জাকর।

কমল ঘোষ

ওষুধের ফাটকাবাজী

উনত্রিশে আগস্টের "দর্পণ" পড়ে দেশী বিদেশী ওষুধ কোম্পানীর অঢেল মুনাফা অর্জনের ব্যাপারটা জানা গেল। স্বভাবতই এই সব বিদেশী, বহুজাতিক এবং ভারতীয় বৃহৎ সংস্থাগুলোর কোনও সামা-জিক লক্ষ্য নেই। আমাদের দেশে ওষুধের ক্ষেত্রে যেখানে মাথা পিছু ব্যয় পাঁচ টাকা সেখানে উনিশশো সত্তর সালে ছত্রিশটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বিদেশে মুনাফা পাচার করেছিল পাঁচ কোটি টাকা। কমিটির রিপোর্টে এর উ আছে।

মুনাফা লুটের দু চারটি নমুনা দর্পণের পাঠক সাধারণের কাছে পেশ করছি। রোশ্ নামে সুইস্ প্রতি ষ্ঠানটি এদেশে বহুকাল ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের সারিডন মাথা ধরার ওষুধ—ট্যাবলেটের নাম গ্রামা-ঞ্চলের লোকেরাও জানেন। এই রোশ কোম্পানীর লিব্রিয়াম ভারতের বাজারে আমদানী হত প্রতি কেজি পাঁচ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকায় যার আন্তর্জাতিক বাজারে দর হচ্ছে তিনশ বারো টাকা মাত্র। মুনাফার হারটা একবার লক্ষ্য করুন।

মার্ক শার্প অ্যান্ড ডোম সুবি খ্যাত একচেটিয়া ভেষজ সংস্থা, য ভারতের বুকে অনেককাল ব্যবস করছে যাদের বি জি কম্প নামে ভিটামিন টনিক আপামর জনসাধা-রণের কাছে অতি পরিচিত। এই এম এস ডি কোম্পানী ইন্ডো-সিড নামে বাতের ওষুধের মৌল উপাদান ইন্ডোমেথিসিন আমদানী করত খোদ আমেরিকায় ওদের নিজেদের কারখানা থেকে। দাম পড়ত প্রতি কেজি চার হাজার পাঁচশ টাকা। অথচ পাঁচশ সত্তর টাকা কেজি দরে ইন্ডোমেথিসিন আমদানী করল আমাদেরই স্টেট ট্রেডিং কর্পো-রেশন উনিশশো চুয়াত্তর সালে পোল্যান্ড থেকে। কোথায় সুড়ে চার হাজার টাকা কেজি আর কোথায় পাঁচশ সত্তর টাকা। মুনাফা না বলে একে লুটের মাল বলাই সমীচীন হবে।

এসব ফাটকাবাজী করা সত্ত্বেও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তি-শালী লবীর জোরে এদেশে বহাল তবিয়তে ব্যবসা করার নামে মুনাফা কামিয়ে যাচ্ছে, অথচ খোদ মার্কিনী মুলুকেই উনিশশো আটষট্টি সালে কেফোভার কমিটি তিনটি আমেরিকান কোম্পানীকে ওষুধ নিয়ে ফাটকাবাজির দায়ে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করে জরিমানা দিতে বাধ্য করেছিল। বলা বাহুল্য তারা কিন্তু আমাদের গরীব দেশে বুক ফুলিয়ে ব্যবসা করে মুনাফার পাহাড়ের উপর বসে পা দোলাচ্ছেন। না খেয়ে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কিন্তু মরার আগে কোরামিন নিতে পারব না দুর্মূল্যের জন্যে একথা মনে পড়লে মুখ এবং কলমের কালি দুই-ই শুকিয়ে যায়।

নাসা ঘোষ

পুজোয় এবার অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিন বন্ধ থাকছে

এবার পুজোয় বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশ বন্ধ থাকছে। যে সমস্ত পত্রপত্রিকা অর্থ সংকটের জন্য সাধারণভাবেই অনিয়মিত প্রকা-শিত হয়, তারাও অতিকষ্টে একটি পুজো সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন, কিন্তু এবারে সে উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

কলকাতার একটি প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতি ত্রৈমাসিকের সম্পাদক সেদিন কথা প্রসঙ্গে জানা-লেন ঃ জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকার বরাবরের মেজাজ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। ফলে আমাদের পাঠকরা অনেকেই হতাশ হবেন। পত্রিকা বিক্রীও অসম্ভব রকম কমে যাবে। এ অবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে কাগজ বের করা মুশকিল।

তাছাড় লেখক সমস্যাও রয়েছে। প্রগতিবাদী মননশীল অনেক লেখকই হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। আকর্ষণীয় লেখা না থাকলে পাঠক পড়বে কী? অপরদিকে বিজ্ঞাপনের বাজারও খারাপ। কেউই বিজ্ঞাপন দিতে চাইছেন না।

প্রতি বছরই দেখা যায়, বিজ্ঞা-পনদাতারা অন্তত পুজোর সময় একটু দরাজ হন। রুচিশীল পত্রিকা হলেই, প্রচার সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে এই সময়টা ওরা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। অবশ্য সব প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু এবারে ওরা বেঁকে বসে-ছেন। সামনে গিয়ে হাজির হলেই সকলের এক কথা ঃ এবারে কোন বিজ্ঞাপন নয়।" পুজোর পত্রিকা প্রকাশে তাই অনেকে পেছিয়ে যাচ্ছেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে কয়েকটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এবার পুজোয় সে আকর্ষণ থাকছেন। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় কিছুটা আর্থিক দিক থেকে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রেস এবং বুকস্টল-ওলারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেশদর্পণ

পাটনায় বিধ্বংসী বন্যার কারণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত সপ্তাহে এবং এ সপ্তাহেও সারা দেশের খবর কাগজের পাতা জুড়ে সবচেয়ে বড় খবর পাটনার বন্যা। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাকি পাটনা শহরের মানুষ এমন বন্যা আর দেখেনি। শুধু পাটনা কেন, ভারতের কোন প্রাদেশিক রাজধানীতে ইদানীংকালে এমন বিধ্বংসী বন্যা আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। ব্রহ্মপুত্রের কোলে আসামের অধুনা রাজধানী গৌহাটি শহরে প্রায় ফি-বছরই বন্যা হয় বটে, কিন্তু কখনো বোধহয় তা শহরের মানুষকে বা গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকে এমন বিপাকে ফেলেনি।

গত আটদিন ধরে বিহারের রাজধানী কার্যতঃ অচল। কার্যতঃ কেন, সত্যি কথা বলতে অচল পুরোপুরি। একমাত্র কিছু- কিছু রিলিফের কাজ ছাড়া শহরে আর কিছুই তো চলছে না। তা-ও আবার খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ভাষ্য অনুযায়ী ঐ রিলিফের কাজও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

যাহোক, ওসব ভিন্ন কথা। রাজ্যে সরকার আছেন, কেন্দ্রের মন্ত্রীরা আছেন। তাঁরা বলেছেন, রিলিফের কোন অভাব হবে না। ইতিমধ্যেই তো দশ হাজার টন বাড়তি খাদ্যশস্য সঞ্চয় করা হয়েছে এবং কেন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মিশ্রকে বলে পাঠিয়েছেন আপনার কত এবং কি পরিমাণ সাহায্য দরকার তা ঠিক ঠিক হিসেব করে জানান। মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছেন, তাঁর দরকার দশ কোটি টাকা। সুতরাং হিসেব যখন করা গিয়েছে, তখন টাকাও পাওয়া যাবে এবং বন্যার্ত জনগণেরও একটা কিছু হিল্লে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

এতো গেল মানুষের ত্রাণের ব্যাপার, তাঁদের কোনমতে জানে-প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপার। কিন্তু যে মানুষগুলো জলের তোড়ে ভেসে গেল, বা সাঁতার জলে ডুবে বা অনাহারে বা কলেরায় ভুগে মরল, তাদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না! অথবা ধনসম্পত্তি গঙ্গার পবিত্র জলের তলায় পলি চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে গেল, তা-ও তো আর কখনো তুলে আনা যাবে না।

ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে, তাতে এখন আর করার কিছু নেই। কিন্তু দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বারে বারে এই প্রলয়ঙ্করী বন্যার ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। এখনই সতর্ক হওয়া দরকার।

পাটনা শহরে যে এখন বন্যা হতে পারে তা কখনই অভাবিত ছিল না। শুনলে অনেকেই আশ্চর্য হবেন, শহরের একটা বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গার নদী-তলের চেয়ে নীচু। এই অঞ্চলটি হচ্ছে দক্ষিণ পাটনা। শহরে একটি রাস্তাই আছে, যার নাম নীচলি সড়ক নীচু রাস্তা। সুদীর্ঘ এই পিচঢালা রাস্তাটি নদীর তীর বরাবর সমান্তরাল।

শুধু দক্ষিণ পাটনাই নয় গোটা শহরটাই আসলে এখন নদীতলের প্রায় সমান উচ্চতায়। দুয়ের উচ্চতার ফারাক এখন ক্রমেই কমে আসছে। যে একচুল ফারাক এখনো রয়েছে নদীর বুকে আরও কিছু পলি জমলো বা গোটা অববাহিকার কোথাও নদী তার গতিপথ কিছু বদবদল করলে তা-ও মিলিয়ে যেতে পারে। এবং তখন বিহার রাজ্যের এই রাজধানীটিই সামগ্রিক ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে।

আসলে সমস্যার মূল অনেক গভীরে এবং কখনই তা হঠাৎ এক-দিনে সৃষ্টি হয়নি। এর জন্য নির্দিষ্ট ভাবে কাউকে দায়ী করাও সম্ভব নয়। এর জন্য দায়ী সভ্যতার বিবর্তন এবং আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা।

যে কোন নদীর চরিত্রই হচ্ছে, তার গতিপথ পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের পাশাপাশি যে সর্বদাই তার অববাহিকা (basin) বরাবর কিছু ধাপ সৃষ্টি করে যায়। নদী যত উঁচু থেকে সমুদ্রের দিকে নীচে নামতে থাকে। এই ধাপগুলির উচ্চতাও তত কমতে থাকে। উত্তরপ্রদেশ থেকে বিহার পর্যন্ত গঙ্গার অববাহিকা এ রকম অন্তর চারটি ভাগে বিভক্ত। বিহারে এসে তাদের উচ্চতা সমুদ্র তলের থেকে ২৫০ থেকে ১৫০ ফুট। ধাপগুলিই নানা ভাবে 'প্লাবন ভূমিতে' পরিণত হয়। এই প্লাবন-ভূমির উর্বর জমির জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ এখানেই বাসা বেঁধেছে, চাষ-আবাদ করেছে। পাটনা শহরের ক্ষেত্রেও তাই। অতীতে নগর সভ্যতা পত্তনের আগে পলি জমে নদীর তল যত ওপরে উঠত, মানুষও কাঁচামাটি ফেলে তার কাঁচা বাড়িকে তত ঠেলে ওপরে তুলত। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনে কাঁচা জায়গায় পাকারা এসে ভীড় করেছে। তাই নদীর তল ঠেলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ভিতকে আর ঠেলে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। শক্ত ভিতের ওপর গোটা শহরটাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে নদীতলের সঙ্গে পাটনা শহরের উচ্চতার ফারাক ক্রমেই কমতে কমতে এখন একচুলে এসে দাঁড়িয়েছে।

একদিকে শহর কঠিন ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে, অন্যদিকে, নদীর উচ্চতা ক্রমেই বাড়ছে। বাড়ছে, তার কারণ পলি পড়ছে। গোটা অববাহিকা বরাবর বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল জুড়ে মাটির বাঁধ দেয়ার ফলে পরিস্থিতি এমনই হয়ে উঠেছে যে নদীর জল দু-পাশে সরাবার আর কোন জায়গা নেই। সব পলিমাটি তাই জমছে নদীগর্ভে। আর নদীগর্ভ যতই ওপরে ঠেলে উঠছে, নদীতলও তত ফুলছে। বাড়তি সামান্য জল সরাবার ক্ষমতাও আর আজ তার নেই। জল বাড়লে, কোথাও না কোথাও বাঁধ ভেঙে তা বিধ্বংসী প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলবেই তুলবে।

পাটনার এবারকার বন্যার মূল কারণ এখানেই। শহরের ২৬ মাইল পশ্চিমে বয়ে গেছে শোন এবং তা থেকে শহরের দিকে বেরিয়ে এসেছে দুই শাখা নদী মোরহার এবং পুনপুন। একদিকে যোগ তার বাড়তি জল ঠেলে দিয়েছে মোরহার আর পুনপুন-এর মধ্য দিয়ে শহরে, অন্যদিকে উপচে উঠেছে গঙ্গা। দুই দিকে ঝড়ের গতিতে জলধারা শহর তাসিয়ে নিয়েছে।

আগেই বলেছি, পাটনার এবারকার বন্যা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া দরকার। আমরা এতদিন বন্যা নিয়ন্ত্রণের ভার ছেড়ে দিয়ে এসেছি কুশলী ইঞ্জিনীয়ারদের ওপর। তাঁরা নিশ্চয়ই অনেক করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় বড় পরিকল্পনা সত্ত্বেও বন্যাকে ঠেকানো যায় নি। না বিহারে, না উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গে। এবার অবিলম্বে একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা দরকার। নতুবা আজ পাটনায়, কাল গৌহাটি, পরশু কলকাতা—সব অতল জলের তলায় তলিয়ে যাবে। বাঁধ অনেক অনেক হয়েছে। বারে বারে অভিযোগ উঠছে, এই বাঁধের জন্যই বন্যা, বাঁধের জন্যই খরা। তাই এখন নতুন করে কোন বাঁধের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করার আগে সব কিছু তলিয়ে দেখা হোক।

আমাদের প্রস্তাব, পরিমণ্ডল সংক্রান্ত পরিকল্পনার জন্য যে জাতীয় সংস্থা রয়েছে (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এনভায়রণমেণ্টাল প্ল্যানিং), তার হাতেই সমগ্র বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা ও গবেষণার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হোক।

সালভাদরেতে ছাত্ররা বিক্ষোভে উত্তাল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

লাতিন আমেরিকায়, এল সালভাদরেতে সামরিক শাসক কর্ণেল আরতুরো আর্মান্দো মলিনার বিরুদ্ধে ক্রমেই এল সালভাদরের মানুষ সরব হচ্ছেন। সামরিক প্রশাসনের বর্বর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ছাত্ররা প্রবল আন্দোলন শুরু করেছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি ও বর্বর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি এল সালভাদরের জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে ধরণের বিক্ষোভ প্রকাশ করেন তার তুলনা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের সন্নিকটে ছাত্ররা মারমুখী ফৌজের মুখোমুখি হয়। বর্বর ফৌজ গুলী চালিয়ে বারোজনকে খুন করেছে। আহতের সংখ্যা পনেরো, বহু নিখোঁজ। আক্রমণের মধ্যে দাঁড়িয়েও ছাত্ররা ব্যাপক গণভিত্তিক আন্দোলন গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সান্তাআনার বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে তারও প্রতিবাদ করেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ছাত্ররা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে দুর্নীতি মুক্ত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

করভালনকে হত্যার ষড়যন্ত্র

লাতিন আমেরিকার বিশিষ্ট জননেতা, চিলির কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা লুই করভালনকে তিলে তিলে মারার ষড়যন্ত্র করেছে ফ্যাসিস্ত পিনোচেৎ-সরকার। খবরে জানা যায়, ২৪শে জুলাই কুখ্যাত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে (রিতোকে) করভালনকে প্রচণ্ড অসুস্থাবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বন্দী শিবিরটি আন্তিয়াগো থেকে দেড়শত কিলোমিটার দূরে। আরো জানা যায়, করভালনকে নৌ-হাসপাতাল তালপারাইসোতে নেওয়া হয়েছিল অ্যাপেনডেসাইটিসের জন্যে। এর পূর্বে কুখ্যাত বন্দীশিবির ত্রেস আলামসের ঠাণ্ডা কুঠরীতে হাঁপানি রোগগ্রস্ত করভালনকে রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া, করভালনের ওরুতর ধরণের ডিউডোন্যাল আলসার রয়েছে। করভালনের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করে বিভিন্ন দেশের গণ-সংগঠন তুমুল আন্দোলন শুরু করেছেন। এমন কি, লাতিন আমেরিকায় কয়েকটি দেশের পরিচালক গোষ্ঠীর কিছু ব্যক্তিও করভালনের মুক্তি দাবী করায় ফ্যাসিস্ত পিনোচেতের পক্ষে অন্য অনেকের মত তাঁকে গুম-খুন করা সম্ভব হয়নি।

চিলির ফ্যাসিস্ত সরকারের

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে নতুন চক্রান্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভিয়েতনামে—কাম্বোডিয়া এবং লাওসের বিপ্লবী বীর মুক্তি বাহিনীর মোক্ষম মারে ধরাশায়ী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সরকার কাম্বোডিয়াকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানে বাধা দেওয়ার নয়া ষড়যন্ত্র আঁটছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিধ্বস্ত হবার পর ফোর্ড প্রশাসন গভীর চক্রান্ত শুরু করেছে।

আগামী সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত কাম্বোডিয়া নিপীড়িত জনগণ এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির অন্যতম প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হচ্ছে। এই নতুন বৈপ্লবিক তৎপরতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সরকার আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ হেনরি কিসিংগার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, "এশিয়ার ভূখণ্ডে আমাদের পবিত্র দায়িত্বের কথা আমরা ভুলতে পারি না।" কিসিংগারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ফোর্ড প্রশাসনও কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য নিউইয়র্ক আসার ভিসা দিতে অস্বীকার করেছে।

ফোর্ড সরকারের এই নোংরামির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য কাম্বোডিয়ার বিপ্লবী সরকার বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশকে আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে পিকিংয়ে কাম্বোডিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রিন্স নরোদোম সিহানুকের কার্যালয় থেকে জানান হয়েছে, প্রেসিডেন্ট সিহানুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের আসন্ন সাধারণ অধিবেশন কাম্বোডিয়ার জনগণের পক্ষ থেকে ভাষণ দেবেন। ঐ ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই সিহানুক ওখানে যাবেন এবং তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

যাত্রাভিনয়

খবরাখবর

এই ১৩৮১ সন বাংলার লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একে একে কয়েকটা শুভ ঘটনার সূচনা করেছে।

এর মধ্যে প্রথমেই যে ঘটনার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় তা হলো, প্রমোদকর মুক্তি। সুদীর্ঘ কাল থেকে এই প্রমোদকরের বোঝা যে ভাবে এই শিল্পের উপর চেপে বসেছিল ১৩৮১ সনে সেই বোঝা তার থেকে মুক্তির স্বাদ পেল যাত্রা শিল্প। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শিল্পের ওপর থেকে প্রমোদকর তুলে নিয়ে একটা কাজের মত কাজের নজির রাখলেন। সুতরাং যাত্রা সন্দেশ পরিবেশন আমি পশ্চিমবঙ্গের তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগ থেকেই শুরু করি।

এ কথা সকলেই জানেন যে গত বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনোজ্ঞ যাত্রা উৎসব শুরু করেছেন। বর্তমান বছরেও তেমনি এক জোরদার যাত্রা উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। গত ২৯শে জুলাই তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাত্রা দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি চূড়ান্ত কমিটিও তৈরী করেছেন। এই যাত্রা উৎসব শুরু হবে আসছে ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে।

এই সুবৃহৎ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎসবের জন্য সুব্রতবাবুর সভাপতিত্বে এক সমিতি তৈরী হয়েছে। রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই উৎসব এবার চলবে ১৭ দিন ধরে। ২৩টি দল যোগ দেবে এই উৎসবে। গতবারের মত এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও কলাকুশলীদের পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

এই উৎসবে যে ২৩টি দল যোগদান করছে তাদের নামগুলি হলো এই—নট কোম্পানী, তরুণ অপেরা, লোকনাট্য, মোহন অপেরা, সত্যম্বর অপেরা, নিউ প্রভাস অপেরা, শিল্পীতীর্থ, নাট্য ভারতী, গণনাট্য কোং, অগ্রগামী, আনন্দলোক, অনামিকা, ভারতী অপেরা, সুশীল নাট্য কোম্পানী, নিউ রয়েল বীণাপাণি, নবরঞ্জন অপেরা, নব অম্বিকা, ভোলানাথ অপেরা, যাত্রা মহিলা শিল্পী গোষ্ঠী, আর্য অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, জনতা অপেরা, নবযুগ অপেরা।

আসন্ন এই যাত্রা উৎসবে সবাই এক সঙ্গে অভিযানের দামামা বাজিয়ে যে যার মত ছড়িয়ে পড়বেন, শহরে, গঞ্জে, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

এম পিদের পেনসন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তিনি করবেন কি করে।

সব সংসদ সদস্য যে বিত্তশালী পরিবার থেকে আসেন এমন নয়। বরঞ্চ অধিকাংশ সদস্যই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। কেউ পেশায় আইনজীবী, কেউ বা অধ্যাপক, ডাক্তার অথবা চাকুরীজীবী। তাই সংসদ সদস্য হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তারা নিজ জীবিকার প্রতি নজর দিতে পারেন না। দশ বছর বা পনেরো বছর সংসদ সদস্য হিসেবে থাকার পর তাঁদের পক্ষে পুরনো জীবিকার প্রতিষ্ঠা পাওয়াও সম্ভব হয় না।

যাঁরা সমাজসেবী তাঁরা যখন আর সংসদ সদস্য হিসাবে থাকবেন না, তাঁদের অনেকেরই এমন নির্দিষ্ট আয়ের পথ থাকে না যাতে জীবনধারণ করা যায়।

সৎ ও সুষ্ঠুভাবে রাজনীতি করার পক্ষে এম পি-দের পেনসন স্কীম চালু করা প্রয়োজন বলে এই মতের প্রবক্তরা মনে করেন। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রায় সকলেই এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন।

কারখানা বন্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নাইট শিফট চালু করার নোটিশ দেয়।

বিড়লাও তার একটি দুটি প্রতিষ্ঠানে একে একে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। বারসতের ইষ্টার্ণ স্পিনিং মিলে লক্ আউট ঘোষণা করা হয়েছে গত আঠাশে আগষ্ট। ফলে এক হাজার কর্মী বেকার। ওরিয়েন্ট ফ্যানেও লক আউট আজ প্রায় তিন মাসের বেশী।

কলকারখানার দুর্গতি বাদ দিলে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থাই বা কী? সিনেমা হলের কর্মীদের ওপরও মালিকের জুলুম চলছে। কলকাতার টকী শো হাউস, কোচবিহারের ? ভবনী সিনেমায় দীর্ঘদিনের কর্মীদের বঞ্চিত করে মালিক নতুন কর্মীদের নিয়ে হাউস চালাচ্ছে। বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্মীরাও আশু ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে আতঙ্কিত। এখানে প্রয়োজনের তুলনায় বাসের সংখ্যা বাড়ানো হয়নি, এখন উদ্বৃত্ত কিছু সংখ্যক শ্রমিককে ছাঁটাই করার জন্য তিনশো কর্মীর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। এই সংস্থার কর্মীর সংখ্যা ৪,৪৪৩। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য কিছু সংখ্যক কর্মীদের জন্য নাকি সংস্থার লোকসান বেড়েই চলছে। অতএব উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিলির ভাগ্যলিপি

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

রিকার ব্যবসায়ীদের পত্রিকার (Hanson's American Letter) উক্তি: "এর আগে আর কোন এমন কি চরম দক্ষিণপন্থী সরকারও উত্তর আমেরিকার কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বন্দোবস্তে ফ্রেই সরকারের মত উদারতা দেখায়নি··· এই ব্যবস্থা চিলির স্বার্থের এত বিরুদ্ধে যে তা ওয়াশিংটনের হাসির উদ্রেক করেছে।" (Hanson's American Letter)

ফ্রেই সরকারের দেশের মুৎসুদ্দি দালাল, আর মধ্যবিত্তদের এবং বিদেশী শোষকদের সন্তুষ্ট করার প্রয়াস তাকে দেশের মানুষের রোষের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। ফ্রেই রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলন বাড়তে থাকে। এম. আই. আর.-এর নেতৃত্ব চিলির কৃষকরা জমি দখল করতে শুরু করেন। ফ্রেই সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এদের মোকাবিলার চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষকরা রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন তৈরীর ক্ষমতা অর্জন করেন। এই সমস্ত ইউনিয়ন বিপ্লবীদের সংস্থায় রূপান্তরিত হয়। চিলির শোষকরাও ফ্রেইকে, দেশের মানুষকে কোনোরকম স্বাধীনতা দিতে রাজী ছিল না। জমি সংক্রান্ত যে কোন বিল পার্লামেণ্টে একের পর এক বানচাল করে দিতে থাকে এদের প্রতিনিধিরা। কিন্তু ফ্রেই সরকার চিলির রাজনীতিতে শান্তি আনতে পারেনি। ফলে শোষক শ্রেণীর কোন দীর্ঘস্থায়ী সুবিধাও এর পক্ষে করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সাধারণ মানুষের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। ১৯৭০ সালে চিলির বাৎসরিক দাম বাড়ার হার দাঁড়ায় ৩৫%, বেকারীর হার সরকারী মতে ছিল ৬·৪%। কিন্তু বেসরকারী গবেষকদের মতে এই সময়ে এই হার ১২% থেকে ২৮% এর মধ্যে অবস্থান করছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের সরকার তৈরী করেছিলেন ফ্রেই। ১৯৭০ এর নির্বাচন তাকে আর আসনে ফেরায়নি। ১৯৭০ এর নির্বাচনে সালভাদর আয়েন্দে, চিলির রাজনীতিতে দ্বিতীয়বার প্রার্থী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

['অন্য অর্থ' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত]

চিলিতে আন্দোলন

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধে সেখানকার মানুষ নীরবে বসে নেই। সমস্ত দেশে নিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট, সমাজতন্ত্রী দলের কর্মীরা তৎপর। "খুনী পিনোচেৎ, তোমার দিন ঘনিয়ে আসছে" এই পোস্টার চিলির বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। আতঙ্কিত পিনোচেৎ বেপরোয়া ভাবে ধরপাকড় করছে। ৩১শে জুলাই ফ্যাসিস্ত সরকার সাতজন শ্রমিকনেতা সহ ১৭জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে মরু অঞ্চলের আতাকামা শহরের বন্দী শিবিরে নিয়ে গেছে বলে শোনা যায়। এঁরা নাকি নিষিদ্ধ তামা শ্রমিক সংগঠনের সদস্য। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, এঁরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনে ব্যস্ত ছিলেন। আরো জানা যায়, ধৃত সমাজতন্ত্রী নেতা কার্লোস মর্কাকে গোপন কোন জায়গায় আটক করা হয়েছে।

কলকাতা কালে কালে

কলকাতা একদিনে হয়নি। কালে কালে বদলেছে। মহানগরী হয়ে ওঠার পথে তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি, অনেক দুর্বিপাক। ১৭০০ সালের কথাই ধরা যাক। সেদিনের কলকাতায় না ছিল কলের জল, না গ্যাসের বাতি, না পাকা বাড়ি, না রাজপথ। যানবাহন বলতে একটিই। পাল্কি। বিদ্যুতের আলো কিংবা কলে-চলা গাড়ি কলকাতাবাসীর কাছে ছিল স্বপ্নেরও অতীত।

আজকের কলকাতায় ভূগর্ভ-রেল কিন্তু আর স্বপ্ন নয়। একটি বাস্তব পরিকল্পনা। কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা, সীমিত আয়তন, অপরিসর পথ এবং যানবাহনের সংখ্যাল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ-রেলের প্রয়োজনীয়তা আজ একান্তভাবেই জরুরী। কিন্তু এই বিশাল পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেবার পথে সবার আগে প্রয়োজন কলকাতার মানুষের সহৃদয় সহযোগিতা।

কলকাতা একদিনে হয়নি

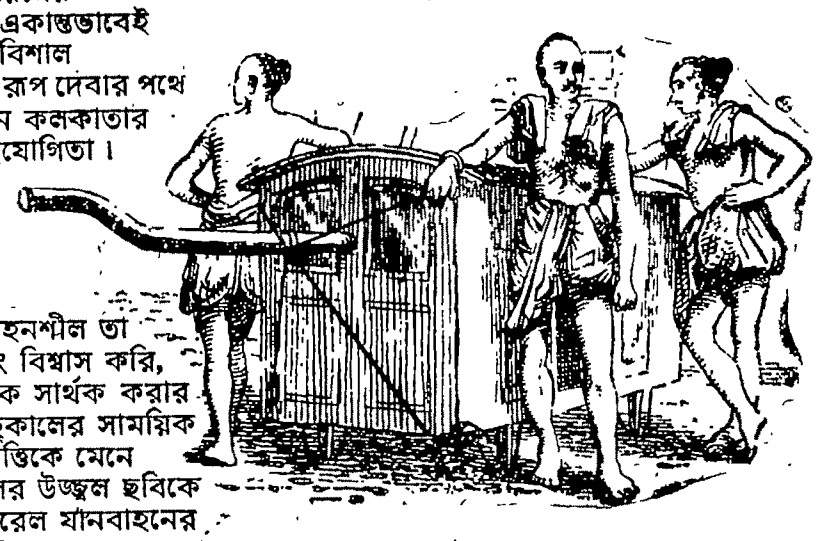

কলকাতার মানুষ সহনশীল তা আমরা জানি। এবং বিশ্বাস করি, এই বিপুল কর্মযজ্ঞকে সার্থক করার প্রচেষ্টায় তাঁরা কিছুকালের সাময়িক দুর্ভোগ ও বাধা-বিপত্তিকে মেনে নেবেন আগামীকালের উজ্জ্বল ছবিকে মনে রেখে। ভূগর্ভ-রেল যানবাহনের তালিকায় শুধু একটা নতুন নাম নয়, কলকাতার নতুন মানচিত্র গড়ে তোলার এক সুবৃহৎ উদ্যোগ।

কলকাতায় নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল।

MJ

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক নভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা নবকৃষ্ণ লিটল লেনস্থিত কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

সি পি এমের ঘর ভাঙতে গিয়ে সি পি আইয়ের ঘরে আগুন

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৯শে সেপ্টেম্বর ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি এমের ঘর ভাঙতে গিয়ে সি পি আইয়ের নিজের ঘর ভেঙে এখন তছনছ। বিভিন্ন রাজ্য থেকে দলে দলে সি পি আই কার্ড হোল্ডাররা হয় দলত্যাগ করছেন, নয়তো বা বসে পড়ছেন। সবারই এক বক্তব্য সি পি আই নেতৃত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সুবিধাবাদী নীতি নিয়েছেন। সুবিধাবাদ শুধুই নেতৃত্বের আখের গোছাবার ধান্ধায়।

সি পি আই দলের মধ্যে সংকট যতই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ততই তারা মরীয়া হয়ে সি পি এম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রীতমত কুৎসা রটনা শুরু করেছেন। এই কুৎসা প্রচার সমস্ত রকম সভ্যতা ও ন্যায়-নীতির সীমা ছাড়িয়ে গেছে রাজ্যেশ্বর রাও-এর সাম্প্রতিক এক বক্তব্যে।

শ্রীরাও সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী। তিনি কলকাতায় এসে বলেছেন, সি পি এমের নেতারা নাকি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আপোষ রফা করার চেষ্টা করছেন। এবং এই দলের সভ্য ও কর্মীরা নাকি সব দল ছেড়ে শ্রীরাও-এর দল অর্থাৎ সি পি আই-দলে ঢুকে পড়ছেন। এত বড় অসত্য কথা কোন রাজনীতিক দলের দায়িত্বহীন পদাধিকারী বলতে পারেন শ্রীরাওকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

আসলে নিজের দলের মধ্যেই প্রচণ্ড বিরোধ। এই বিরোধ বহুদিন ধরে চলতে চলতে আজ বিস্ফোরণের মুখে। পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বনাথ মুখার্জী, গীতা মুখার্জী, কানাই ভৌমিক প্রভৃতি নেতারা নেতৃত্বের কাজে ও নীতিতে প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট। তাঁরা নিজেরা প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পারলেও তাঁদের সমর্থকরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারছেন না। তাই দলে দলে পদত্যাগ ঘটছে।

সি পি আই-এর আভ্যন্তরীণ বিরোধ চরমে ওঠে যখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুরোপুরি ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চায় আসার সিদ্ধান্ত নেন। অনেক নেতা ও কর্মী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্ত মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের বক্তব্য এতে দলের বামপন্থী 'ইমেজ' নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া সি পি এমের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা করতেও তারা গররাজী। এ নিয়ে রাজ্য কমিটিগুলিতে ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এসবের পরোয়া করেন নি।

অপর পক্ষে কর্মীদের এক বিরাট অংশের সি পি এমের সঙ্গে মিত্রতার মনোভাব থাকায় সি পি আই নেতৃত্ব নিজ দলের কর্মীদের বিভ্রান্ত করতে ও ভাঙন রোধ করতে মাঝে মাঝেই সি পি এম দলের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের আশ্রয় নিয়েছেন। তাতে করে হয়তো সি পি এম দলে ভাঙন ঘটবে এবং নিজ দলের কর্মীরা আর গুন্ডগোল করবে না এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। করা গেল না। পরের ঘরে আগুন লাগাতে গিয়ে নিজের ঘরেই আগুন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক নিয়োগে দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক নিয়োগে মৌরসী পাট্টা চলছে। অধ্যাপক নিয়োগ সংক্রান্ত যে সিলেকশন কমিটি রয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের আশীর্বাদই প্রার্থী নির্বাচনে প্রধান লাভ করছে। ফলে অযোগ্য শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত বহু অধ্যাপক পদ পূরণ করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত, দর্শন, রাসায়ণ, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ইসলামিক ইতিহাস ইত্যাদি আর্টস বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাপক পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি ছিল। সম্প্রতি উপাচার্য মহাশয় হঠাৎ তৎপর হয়ে রেজিস্ট্রার ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিলেকশন কমিটি ডাকার নির্দেশ দেন। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না। সিলেকশন কমিটিও যথারীতি মনোনয়নপর্ব সেরে ফেলে। কিন্তু এই মনোনয়নগুলি যোগ্যতা অনুসারে হয় নি বলেই শিক্ষাভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ।

প্রবীণ শিক্ষাবিদ এবং কংগ্রেস শিক্ষক সেলের নেতা অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আচার্য এ এল ডায়াসের কাছে ঐ সমস্ত অধ্যাপক নিয়োগ যথাযথ হয় নি বলে জানিয়েছেন। অধ্যাপক নিয়োগে স্বজনপোষণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। আচার্য-উপাচার্য বৈঠকে তাই বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভিস কমিশন গঠনের কথা ওঠে। কলকাতা ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণই সার্ভিস কমিশন গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের বক্তব্য, অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারটা সার্ভিস কমিশন মারফৎ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বলতে আর কিছুই থাকে না। আচার্য শ্রীডায়াস উপাচার্য ডঃ সেনের এই অভিমত সমর্থন করেন নি। অথচ স্বাধীনতাপ্রিয় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ সেনই শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে বহু স্মৃতি বিজড়িত এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে কসুর করেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি আর আর্টসের ডীন মনোনয়নকে কেন্দ্র করে আর এক বিরোধও উপস্থিত।

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কালের যাত্রায় শরৎচন্দ্র

মধু গোস্বামী

মাও সে তুং "কাগুজে বাঘ" বলে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত শূন্যতার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে মাও সে তুং-এর সেই ব্যঙ্গাত্মক পরিভাষা আজ প্রেরণার বিষয়। কিন্তু মাও সে তুং-এর অনেক আগেই শরৎচন্দ্র শ্রীনাথ বহুরূপীর গল্প বলে সমাজকে সচেতন করেছেন নকল বাঘের সম্পর্কে। আমরা বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মীরা প্রতিক্রিয়ার শূন্যগর্ভ আস্ফালনকে যদি শরৎ-শতাব্দীতে "ছিনাথ বহুরূপী" বলে চিহ্নিত করি তবে কি খুব ভুল হবে।

ভিয়েতনামে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে মারের চোটে ছটফট করতে করতে সাম্রাজ্যবাদ যখন পাতাড়ি গোটাচ্ছে তখন কি আমাদের সেই ছবিটাই মনে পড়ে না যে এক তুলসীতলার অন্ধকারে একদল ভয়ার্ত মানুষের চমকে ওঠা চোখের সামনে ইন্দ্রনাথ কান ধরে আছে নকল বাঘের আর সেই নকল বাঘ পাড়ুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে হাত জোড় করে বলছে: "বাবুগো। আমি ছিনাথ বহুরূপী" বাঘ নই। অবশ্য আমরা কে কি তা জানি না, জানি না আমরা কতজন সেই ভয়ের লজ্জা ঢাকা পিসেমশায়ের মত নকল বাঘ ধরা পড়ার পরেই তার ন্যাকরার লেজ কাটবার ঘাতক সাহসে জ্বলে উঠব আর কতজন তার আগেই।

শরৎচন্দ্র সমাজের এই রকম অনেক "নকলে"রই মুখোশ খুলে দিয়ে গেছেন বারে বারে, তা সে তার গল্পে উপন্যাসেই হোক, আর প্রবন্ধে চিঠিতেই হোক। এই নকলের মুখোশ খোলার মধ্যে দিয়ে তিনি এঁকে গেছেন ইতিবাচক অনেক আসল চরিত্র।

রক্ত সম্পর্কের নকল অনিবার্যতার তত্ত্বকে নস্যাৎ করে তিনি কাদম্বিনীর অমানবিকতার পাশাপাশি তুলে ধরছেন হেমাঙ্গিনীকে। এখানেও যেন লেখক অদৃশ্য ইন্দ্রনাথ হোয়ে কাদম্বিনীর কান ধরে তাকে বলতে বাধ্য করিয়েছেন: ওগো পাঠকেরা, রক্তের সম্পর্কের তত্ত্বটা মিথ্যে, আমি আসল দিদি নই।

গো ব্রাহ্মণ সেবার একমাত্র এজেন্ট কাশীপুরের জমিদারের জমিদারীতে অভাবী গফুরের হাতে ক্ষুধার্ত চামসার মহেশ খুন হলো, এখানেও অদৃশ্য ইন্দ্রনাথের কাছে নকল গো ব্রাহ্মণ সেবী জমিদারের যেন আর্ত স্বীকৃতি: আমি গোসেবক নই, আমি জমিচোর। প্রজাদের রক্তচোষা জমিদার।

সমগ্র শরৎসাহিত্য ও জীবনে

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

উৎসব। ঈদ আসছে পুজো আসছে

কিন্তু গ্রামবাংলার পথে পথে অনাহারক্লিষ্ট মুখ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

গ্রাম বাংলার মাঠে মাঠে কাশফুলের ঢেউ খেলছে। রাত্রিশেষের বাতাস বয়ে আনছে শেফালী ফুলের বাতাস বয়ে আনছে শিউলী ফুলের গন্ধ। ঋতু বৈচিত্র্যের এই বৈশিষ্ট্যটুকু দিয়ে বিচার করলে মনে হবে শারদোৎসবের দিন সমাগত। এবার চারদিন আগে পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুই সম্প্রদায়ের প্রধান দুটি জাতীয় উৎসব। ঈদ এবং দুর্গাপূজা।

গ্রাম বাংলার পথ চলতে চলতে এখন একটি ছবিই নিয়ত দৃশ্যমান এবং তা হচ্ছে অনাহারক্লিষ্ট এই বাংলার মুখ। পুজো আসছে? ঈদ আসছে? কেউ সে কথা ভাবছে না। কারো সে কথা ভাববার অবকাশও নেই। সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রস্তুতিপর্বও গ্রাম বাংলায় সুরুই হয় নি বলা যায়। এককথায় বলা যায়, গ্রামবাংলা ধুঁকছে। জমি থেকে ভাগচাষী উচ্ছেদ হচ্ছে নতুন করে। এরই সঙ্গে বাড়ছে শিক্ষিত বেকার। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে হুগলী জেলায়, বৃষ্টির অভাবে এবারের ফসল ভাল হয় নি। আউস যা-ও বা পাওয়া যাবে, আমন বেশ ভালভাবেই মার খাবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। চলতি সপ্তাহের দুদিন মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার ফলে আমনের কিছুটা সুবিধে হলেও অনেক জমিতে এখনও রোয়াই হয় নি। নতুন করে রোয়া জমিতে ফলন হবে অর্ধেকেরও কম। এই হচ্ছে গ্রাম বাংলার চেহারা। এর ওপর আছে জোতদারদের জবরদস্তি ফসল কাটার হামলা। অনেক জায়গায় অবশ্য ভাগচাষীরা রুখে দাঁড়িয়েছে। ফসল কাটতে দেয় নি। যেমন হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার কোন কোন গ্রামে ঘটেছে। প্রতিরোধের স্ফূর্তি দেখা যাচ্ছে। এটা আশার কথা সন্দেহ নেই। শুনতে পাচ্ছি ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া হবে। সেদিন বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ থানার জামুরিয়া দুই নম্বর ব্লকের সামনে দেখছিলাম দুই শতাধিক নারী-পুরুষের ভীড়। এরা এসেছে জমির আশায়। সরকার তাদের জমি দেবে বলে শুনেছে। তাই এই ভীড়। এ পর্যন্ত কতজন ভূমিহীন চাষী জমি পেয়েছে—এই প্রশ্নের জবাবে ওরা সমবেতভাবে জবাব দিল—"এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে একজনও নয়।"

এই অভাবক্লিষ্ট, অনাহারে বিধ্বস্ত, বেকারীর জ্বালায় পর্যুদস্ত গ্রাম বাংলায় ঈদ আর দুর্গাপূজা তাই আনন্দের বান আনবে না বয়ে আনছে বিষাদের ক্লান্তি, কলমার রোল।

প্রশ্ন করেছিলাম খন্যানের জুতোর দোকানদার রোশন আলিকে, এবার ঈদ আর পুজোর বাজার কি

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সর্বাণী গৌতম

তেরোই সেপ্টেম্বর রাত দু'টোয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ নরেন্দ্র নাথ মিত্র। এই মৃত্যু অকাল মৃত্যু। অনুত্তীর্ণ ষাটেই তিনি চলে গেলেন। বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক গতি-বিধি সম্পর্কে যাঁরা অবহিত, তাঁদের কাছে এটা অজানা নয় যে, নরেনবাবু মতাদর্শের আনুগত্যে বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা শিবিরের লেখক হলেও জীবনের শেষ কয়েকটা বছর তাঁর সহযোগী ও সহকর্মীদের কাছে তিনি প্রত্যাশিত ব্যবহার পাননি। বরং বলা যায় এই মহল প্রয়াত নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অতি সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু অনীহাই প্রদর্শন করেছেন। কারণ, বাজারী নির্দেশ তিনি সর্বক্ষেত্রেই নতমস্তকে মেনে নিতে পারেন নি।

বিগত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে বাষট্টির পরবর্তীকাল থেকে, বাংলা সাহিত্যে শিল্প চিন্তায় বিভাজন অথবা আরও সহজ করে বলা যায় মেরুকৃতির আভাসটি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে এইসব বাজারী মহলের সাহিত্যিক দেউলেপনার ছবিটি। নারীদেহের গোপন থেকে গোপনতম ভাঁজের ক্লিন্ন চিত্রায়ণই হয়ে উঠেছে এইসব তথাকথিত "সাহিত্যিক" নামধারী কিছু বিকৃত রুচি ও বিক্রীত বিবেক স্বার্থসন্ধীদের প্রধান উপজীব্য। এবং, গণতান্ত্রিক সংগ্রামী মানুষের প্রত্যক্ষ বিরোধিতাই এদের প্রধান সম্বল। নরেন্দ্রনাথ মিত্র বৃহত্তর ঐক্য সূত্রে এই সাহিত্য শিবিরের সতীর্থ হলেও কোনদিনই তাঁর শিল্পীমনকে সস্তা ও চটকদারি সাহিত্য সৃষ্টির দিকে ধাবিত করতে চাননি। এখানেই তিনি অতি উজ্জ্বল এক ব্যতিক্রম। অবশ্যই তিনি গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শিবিরভুক্ত লেখকদের সমগোত্রীয় ছিলেন না, কিন্তু ওজন দরে চিৎপুর মার্কা যৌন পাঁচালী রচনায়ও তাঁর আগ্রহ ছিলো না এবং একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরোধিতা করতে গিয়ে সমস্ত বামপন্থী দল বিশেষ করে সি, পি, আই (এম) এর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কুৎসা অভিযানেও তিনি শরিক হতে চাননি কোনদিনই। অথচ অবাক যে, বামপন্থী মতাদর্শে তাঁর আস্থা ছিলো না। এখানেও তিনি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। মতান্তরকে তিনি মনান্তরে পরিণত করেননি কোনদিনই। নরেনবাবুর এই স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বই তাকে করে তুলেছিলো অনন্য সাধারণ-মহিমায় ভাস্বর।

স্বীকারোক্তি (২)

সি আই এ আমেরিকার সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করেনা

জন গেরাসি

গেরাসি ঃ আর একজন সি আই এ অফিসার মারসেটির কথা আপনি বলেছেন যিনি এজেন্সি ছেড়ে সেই সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন। কিন্তু আপনারটা আলাদা। এজেন্সির কাজে নিয়োগের পন্থা, প্রতিদিনের তৎপরতা ও আপনি যেসব গোপন বে-আইনী কাজকর্ম নিজে করেছেন বা আপনার জানা তার কথাই শুধু আপনি বলেন নি, আপনি অনেকের নামও করেছেন—চারশো নাম। আপনি দেখিয়েছেন তারা কেমন অকপটভাবে নীতিহীন, কোন নির্দেশ কেমন বিনা প্রশ্নে আপনা থেকেই তারা সাড়া দেয় যা নির্দোষ লোকের জীবন তছনছ করে দেবে। মোট কথা, আপনার বই দেখিয়েছে যে, অধিকাংশ সি আই এ গোয়েন্দা একজন সাধারণ আইখম্যানের চেয়ে উন্নত কিছু নয়। সে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে না এবং কেবল পারদর্শিতায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ আপনার বই সামগ্রিকভাবে আমেরিকান সরকারের বিধিব্যবস্থাকেই আঘাত করেছে। এর সঙ্গে যোগ করুন কাস্ত্রো সরকারের অতিথিরূপে আপনার কিউবা ভ্রমণ। এর ফলে আমেরিকান সরকার আপনাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করবে না? আপনি আমেরিকা ফিরলে গ্রেপ্তার হবার ভয় থাকছে না?

এগি ঃ আমি এত বছর ধরে বুঝেছি যে, সি আই এ এবং সামগ্রিকভাবে সরকার আমেরিকার সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে না। এর প্রধান কাজ—আর লাতিন আমেরিকায় আমাদের নীতিতে যা পরিষ্কার, যে নীতি কার্যকর করতে আমি বারো বছর ধরে সাহায্য করেছি—আমেরিকার যে শ্রেণী লাতিন আমেরিকা থেকে মুনাফা তুলছে তাদের প্রতিনিধিত্ব করা, তাদের সাহায্য করা। আমি যখন কাজে নিযুক্ত ছিলাম (এবং তারপর অবস্থার কোন পরিবর্তনও ঘটেনি) তখনো লাতিন আমেরিকায় সি আই এর প্রধান কাজ ছিল তাদের যে কোন রকমে অভিযুক্ত করা, জেলে পোরা, বেইজ্জত অথবা ক্ষমতাহীন করা যে কোন লোক—জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট অথবা লিবারেল—যারা লাতিন আমেরিকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের ওপর আমেরিকার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে। আর যারা এইসব প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের মালিক—রকফেলার, গুগেনহাইমস, হান্স প্রভৃতি—তারা আপনি আমি বা সাধারণ মানুষ নয়, তারা ধনী। এই শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক বললে আমি সুখী হব এবং আমি খুব গর্বিত বোধ করব যদি আমার বই আমেরিকার মানুষের চেতনা জাগ্রত করতে সাহায্য করে যে আমেরিকান সরকার ও তার গোপন রাজনৈতিক পুলিশ কেবলমাত্র এক ক্ষুদ্র, অতিধনী সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষা করে।

গেরাসি ঃ আপনি কি আমেরিকা ফিরে যাবার পরিকল্পনা করছেন?

এগি ঃ হ্যাঁ, তবে কখন তা জানি না। আমায় দেখতে হবে ফিরে গিয়ে ও জেলে বন্দি হবার আশঙ্কা নিয়ে, না বাইরে থেকে আমি বেশি কাজ করতে পারব।

গেরাসি ঃ নির্বাসন কেমন লাগছে?

এগি ঃ এই সময়ে ঠিকই আছে। সারা দুনিয়ায় আমার বইয়ের প্রকাশ সম্পর্কে আমি এখন উত্তেজিত। আমার এখন যেমন কাজ সেই কাজই চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছি ঃ বিভিন্ন দেশে সি আই এর লোকদের চিনিয়ে দেওয়া যাতে সেই সব দেশের প্রগতিশীল সংস্থাগুলো তাদের কোন না কোনভাবে বিতাড়িত বা নিষ্ক্রিয় করতে পারে। যেমন, আপনি লক্ষ্য করেছেন যে, গত অকটোবরে আমি একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলাম যেখানে আমি মেক্সিকোয় কর্মরত সাইত্রিশ জন প্রথম শ্রেণীর সি আই এ এজেন্টের নাম করেছি

গেরাসি ঃ হ্যাঁ, কিন্তু কাগজে তার প্রায় কিছুই বেরোয় নি।

এগি ঃ সে ইংল্যান্ড বা আমেরিকাতে। কিন্তু মেক্সিকোর সংবাদপত্রে সব নামগুলো বেরিয়েছে এবং মেক্সিকান সাংবাদিকরা আমার সংবাদ সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে (এগি মেক্সিকোর সমস্ত সংবাদপত্রের ক্লিপ্ আমার হাতে দিলেন যাতে দেখা গেল শুধু তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনই শিরোনাম হয় নি, তদন্তের ফলে তাঁর সংবাদ সত্য বলে জানা গেছে)।

গেরাসি ঃ আপনার আশ্চর্য লাগছে না সি আই এ এসব বন্ধ করার চেষ্টা করছে না ধরুন, আপনাকে আমেরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আমি লক্ষ্য করেছি আপনি আপনার দুই ছেলেকে খুব ভালবাসেন—এবং আরও বলছি পিতা হিসেবে আপনি ভাল—এজেন্সি কেন ওদের আসতে বাধা দিল না।

এগি ঃ কিছুদিন দিয়েছিল, বইটা শেষ করার আগে।

গেরাসি ঃ কিভাবে?

এগি ঃ ছেলেদের মাকে প্রলুব্ধিত করে তাদের জন্য আমায় আসতে বলে পীড়াপীড়ি করা, তাদের আমার কাছে আসতে না দেওয়া। কিন্তু তারা আমার সঙ্গে থাকতে চায়। তারা শেষ পর্যন্ত বিচারককে সে কথা বলে আমার কাছে আসে।

গেরাসি ঃ বেশ, কিন্তু ফিলের বয়েস তেরো, আর ক্রিসের দশ। আদালত তাদের কথা অগ্রাহ্য এবং সি আই এর প্রভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারত।

এগি ঃ আইনত তা পারত বলে আমার মনে হয় না।

গেরাসি ঃ আপনি আপনার বইয়ে যাকে খবরের কাগজে বলে "নোংরা কায়দা" নিরপরাধ লোকদের বিরুদ্ধে এজেন্সি কর্তৃক প্রয়োগের বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এমন কয়েকটি নিকৃষ্টতম ঘটনার কথা বলতে পারেন যার সঙ্গে আপনি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন?

এগি ঃ আমি কেবল সেই কাজই করেছি। মানে আমার কাজ ছিল তাই, যাদের আমরা শত্রু মনে করি তাদের ওপর নজর রাখা তাদের অভিযুক্ত করা, তাদের হেয় করা, অথবা যদি সম্ভব হয় টাকা খাইয়ে বা ব্ল্যাকমেল করে আমাদের হয়ে কাজ করার জন্য তাদের জোগাড় করা।

গেরাসি ঃ এরকম কিছু ঘটনার কথা বলবেন?

এগি ঃ বলছি। ১৯৬১ সালে ইকোয়েডরে আমরা কিছু নকল দলিল তৈরি করি একথা প্রমাণ করার জন্য যে, বামপন্থী জাতীয়তাবাদী সমস্ত নেতাকে, কিউবানরা টাকা দেয় ইকোয়েডর ও পেরুর মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ লাগাবার জন্য। তালিকায় প্রথম নাম ছিল বিদেশ মন্ত্রীর যাকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়েছিল, যদিও অবশ্যই তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলেন। পরের বছর প্রেসিডেন্ট অ্যারোসেমেনাকে গদিচ্যুত করতে সামরিক বাহিনীকে প্ররোচিত করার জন্য অশান্তি সৃষ্টি করতে সোশ্যাল ক্রিশ্চান আন্দোলনের একটি বম্ব স্কোয়াডকে অর্থ সাহায্য করেছিলাম। এই স্কোয়াড সমস্ত রকমের কমিউনিস্ট বিরোধী কেন্দ্রে, এমন কি কার্ডিনালের বাড়িতেও বোমা রেখে দিয়েছিল বামপন্থীদের দোষী করার জন্য।

১৯৬৩ সালে আমরা খুব সাবধানতার সঙ্গে পাঁচ পাতার দলিল তৈরি করে টুথ পেস্টের একটি খালি টিউবে ভর্তি করি, তারপর এক কাস্টমস অফিসারকে নির্দেশ দিই কিউবা ভ্রমণ করে ফিরছেন এমন একজন ইকোয়েডরিয়ান কমিউনিস্টের সুটকেশ থেকে সেই টিউব "খুঁজে" বার করার। স্বভাবতই সেই দলিল "প্রমাণ" করল যে বামপন্থীরা বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে এবং প্রচণ্ড অত্যাচার চালানোর পথ করে দিল।

ইকোয়েডরে ও ১৯৬৫ সালে উরুগুয়েতে আমি বামপন্থীদের হেয় করার জন্য প্রচণ্ড। প্ররোচনামূলক "বামপন্থী" দাঙ্গা লাগাতে সাহায্য করেছিলাম। উভয় দেশেই কমিউনিস্ট শিবিরভুক্ত দেশের কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে আমি সাহায্য করেছিলাম যাতে তারা বহিষ্কৃত হয়। স্থানীয় বিদ্রোহী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আমি সংবাদ সরবরাহ করেছি যাতে তারা অন্তর্দলীয় লড়াইয়ে জিততে পারে এবং তারপর তাদের এজেন্সির হয়ে কাজ করার জন্য ব্ল্যাকমেল করেছি।

মেক্সিকোয় আমি ওলিম্পিক গেম অফিসারের সরকারী আবরণ ব্যবহার করেছি এজেন্ট সংগ্রহ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট করার কাজে। উরুগুয়েতে আমরা বিভিন্ন কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি যারা আসলে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী, যাতে পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। তারপর এজেন্সি কর্তৃক শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কিছু কমিউনিস্টের ওপর অত্যাচার চালানো হয় যদিও তারা অভিযোগ সম্পর্কে কিছুই জানত না।

কিন্তু এইসব কাজ আমার পক্ষে বাড়তি ছিল। আমার প্রধান কাজ ছিল ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে গোয়েন্দাগিরি, আড়ি পাতা। এ ব্যাপারে আমি খুব পাকা ছিলাম। ইকোয়েডর ও উরুগুয়েতে যেখানে আমি আমার কাজের অধিকাংশ বছর কাটিয়েছি কমিউনিস্ট দূতবাস, বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনের প্রধান কার্যালয় ও সর্বশ্রেণীর লোকের বাড়িতে আমি সাফল্যের সঙ্গে আড়ি পেতেছি। আর শুধু টেলিফোনে আড়ি পাতার কথা আমি বলছি না। আমি বলছি সমস্ত বাড়িতে। একটি ঘটনায় আমি এমন কি ক্যামেরা লাগাই যা ঘটছে সব ধরে রাখার জন্য। অবশ্যই স্থানীয় পুলিশের সাহায্য ছাড়া আমরা এসব করতে পারতাম না। সে সাহায্য আমরা পেতাম, যেহেতু আমাদের হাতে অঢেল টাকাপয়সা ছিল, এড গ্র্যান্ট স্লোগানকে ধন্যবাদ।

গেরাসি ঃ আপনার বইয়ে আপনি সি আই এর সঙ্গে আপনার বিরোধ বাড়ছিল তাও দেখিয়েছেন। প্রথমে ছোটখাট আমলাতান্ত্রিক গণ্ডগোলে অসুখী মনে হয়। তারপর তথাকথিত অন্তর্ঘাত-বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কেই আপনি প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন যখন ১৯৬৫ সালে ডোমিনিকান রিপাবলিকে আমেরিকার নৌবাহিনীর হস্তক্ষেপের অজুহাত হিসেবে চার হাজার সংবিধানসম্মত ফৌজের মধ্যে থেকে আটাম জন "জানা কমিউনিস্টের" নাম দেওয়া হল—বিশেষত আপনি নিজেই যখন লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে এই ধরণের নকল তালিকা তৈরি করেছেন। শেষ পর্যন্ত আপনি ঠিক করলেন আপনি বেরিয়ে আসতে চান যখন উরুগুয়ের একজন নির্দোষ কমিউনিস্ট, যার আপনি নাম করেছেন, অত্যাচারিত হল এবং তার চীৎকার আপনি শুনতে পেলেন। বেশ, কিন্তু কেন আপনিই, অন্য কেউ নয় কেন? আপনি, ফ্লোরিডার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন এক বাড়ির নটরডাম গ্র্যাজুয়েট কেরিয়ার সর্বস্ব এক প্রাণী যেখানে জাতীয় পতাকা পবিত্র বলে গণ্য।

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

ফ্যাসীবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রসঙ্গে

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

চল্লিশের দশকে বিশ্বের বিপ্লবী জনতা যে মতবাদকে প্রত্যাখ্যান ও পরাস্ত করেছিল সেই ফ্যাসিবাদকে সত্তরের দশকে ভারতের বুকে সার্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্ত চলছে। পারমাণবিক বোমা যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের মারাত্মক হাতিয়ার, ফ্যাসীবাদ তেমনি পুঁজিবাদের হিংস্রতম মতাদর্শগত হাতিয়ার। প্রতিক্রিয়াশীলরা আজ এই হাতিয়ারে শান দিচ্ছে। গত দু বছরে সারা বিশ্বে প্রগতিশীল শিবিরের পক্ষে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটায় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আজ খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই চাঞ্চল্যকে সাধারণ মানুষ ভালোভাবে দেখতে পারে না—খুব সতর্কতার সঙ্গে নজর রাখবার প্রয়োজন আছে। বিশেষকরে দক্ষিণ এশিয়ার এই ষাট কোটি মানুষের বিরাট দেশ ভারতবর্ষে তো বটেই।

কদিন আগে মধ্য কলকাতায় কংগ্রেসের উদ্যোগে "ফ্যাসীবাদ বিরোধী সম্মেলন" হয়ে গেল। এখানে প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা ভালো ভারতবর্ষে ফ্যাসিস্ট শক্তির ব্যাপারটা বড় গোলমেলে। এ নিয়ে জনগণের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি আছে। ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে ফ্যাসীবাদও আজ অনেক নূতন নূতন কায়দা রপ্ত করেছে—নতুন জামা পরে কায়েম হবার চেষ্টা করছে। আমি ফ্যাসিস্ট—একথা আজ আর কেউ প্রকাশ্যে বলে না, বলতে পারে না—ফ্যাসীবাদের পক্ষে প্রকাশ্যে সওয়াল করবার দিন ঐতিহাসিক ভাবে খতম।

মধ্য কলকাতায় "ফ্যাসী বিরোধী সম্মেলনে" কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রচার করা এক ঘোষণাপত্রে বলা হয়: "আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত সাময়িকভাবে প্রতিহত করা হয়েছে কিন্তু তারা নির্মূল হয়নি। আজও তাদের চক্রান্ত শেষ হয়নি। দেশে অর্থনৈতিক সংকট ও অনগ্রসরতার সুযোগ তারা গ্রহণ করতে চায়।" কিন্তু কথা হচ্ছে যে ফ্যাসী বিরোধী প্রচারের থেকে অর্থনৈতিক সংকটের উচ্ছেদের ব্যাপারটাকে আলাদা করে দেখা যায় না। কারণ ফ্যাসীবাদ যেমন অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগ নেয়, তেমনি তার লক্ষ্য অর্থনৈতিক সংকটকে টিকিয়ে রাখা এবং জটিল করা। অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানই ফ্যাসীবাদ উচ্ছেদের একমাত্র গ্যারান্টি। কে কতটা ফ্যাসী বিরোধী তার প্রমাণ হবে কে কতটা ধন-বৈষম্যের বিরোধী। জনতা এর ভিত্তিতে যাচাই করবে।

ঐ সম্মেলন থেকে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে "সাম্রাজ্যবাদী ও চরম জাত্যাভিমানী" বলে অভিযুক্ত করা হয়। বস্তুত চরম জাত্যাভিমান থেকে সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা জাগে। এই জাত্যাভিমান জিনিসটা প্রচণ্ড শক্তিশালী ও সংক্রামক। বিশেষ করে অসচেতন তরুণ সমাজে এর প্রভাব পড়তে পারে। হিটলারও তার দেশের যুব সমাজের মধ্যে উগ্র দেশপ্রেমের হিস্টিরিয়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। সারা বিশ্বকে পায়ের তলায় রাখতে হবে—এই মানসিকতা হিটলার ও তার অনুরাগীদের প্রেরণা যোগাতো। ফ্যাসিস্ট শক্তিকে নিয়ে সব থেকে মুশকিল হল যে এ যদি নিছক গুণ্ডামি হোত তা হলে একে মোকাবিলা করা খুব একটা কঠিন হত না। কিন্তু এটা একটা উগ্র ঝাঁকালো রোমান্টিক রাজনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। যুব সমাজের কাছে এই ধরণের উগ্রতার একটা আবেদন আছে—রোম্যান্টিসিজম আছে। দেশপ্রেমের মোড়কে উগ্র জাতীয়তাবাদ আর তার সঙ্গে সমাজবাদের ককটেল—এ জিনিষ অনেক যুবককেই বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই হিটলারের অভ্যুদয়ের সময়ে দেখা যেতো "মেইন ক্যাম্ফ" হাতে ২০/২৫ জনের দলকে ইউনিফর্ম পরে কুইক মার্চ করতে, সারা বার্লিনের দেওয়ালে ওরা লিখে রাখতো "হেইল হিটলার"—হিটলার তোমায় অভিনন্দন জানাই। আর কমিউনিস্টদের ওপর বেপরোয়া আক্রমণ চালানো হত, তাই এদেশে যারা ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রাম করতে চান তাদের মনে রাখা দরকার জার্মানী ইটালীতে কমিউনিস্টদের ধ্বংস-রার জন্যই ফ্যাসীবাদের অভ্যুদয় হয়েছিল, কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করেই সেখানে ফ্যাসীবাদ কায়েম হয়েছিল। জাত্যাভিমানের ব্যাপারে এদেশের কিছু পত্রিকাকে অভিযুক্ত করা যায়। একাত্তর সালে বাংলা দেশে যুদ্ধের সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় একদিন হেড লাইন ছিল: এদিকে যশোর, ওদিকে শ্রীহট্ট—আমাদের। এ ধরণের উগ্র জাতীয়তাবাদী ব্যাপার মুক্ত দেশপ্রেম নয়। এবং এইভাবেই একদিকে পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়ানো হয় এবং অন্যদিকে পররাজ্য গ্রাসের উদগ্র আগ্রহ ও মানসিকতা গড়ে তোলা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পর থেকে একশ্রেণীর কংগ্রেসী দাবী করে থাকে যে এই স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ভারত সরকারের দান। আমার প্রশ্ন: এই ধরণের দাবী কি উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও জাত্যাভিমান থেকে আসছে না? এতে কি বাংলাদেশের মানুষের মর্যাদাবোধ আহত হয় না? ভারতীয় সংবাদপত্রে সি কি ম র ব্যাপারে এতদিন পড়ে আসছি সে সিকিমের সাধারণ মানুষই উদ্যোগী হয়ে ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়েছে অথচ এ ব্যাপারেও আজকাল দাবী করা হয়ে থাকে যে এটা ভারত সরকারের আরেকটা কৃতিত্ব বা দান।

ফ্যাসীবাদের বীজাণু এই সমাজদেহেই ঢুকে আছে। দেশে যখন প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখা দেয় তখনই ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জনতার বিক্ষোভকে যদি প্রগতিশীল দলগুলো সঠিকভাবে সংগঠিত বা পরিচালিত করতে না পারে, ফ্যাসিস্ট শক্তি তার সুযোগ নেবেই। জনতার ক্রোধ আবেগ কখনো চুপ করে থাকতে পারে না।

১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল "ফ্যাসিজমের প্রধান উদ্দেশ্য—বিপ্লবী শ্রমিক অগ্রগামীদের ধ্বংস করা অর্থাৎ কমিউনিস্ট এবং সর্বহারা শ্রেণীর সচেতন অংশকে নিধন করা। ওদের চরিত্রগত লক্ষণ হলো বাগাড়ম্বর, নীতিবোধহীনতা এবং সন্ত্রাসের সমন্বয়।..."

একটা জিনিষ আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা দরকার ফ্যাসীবাদের শ্রেণীভিত্তি মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণরা। একশ্রেণীর উগ্রপন্থী তরুণরাই হয় ফ্যাসিস্ট বাহিনীর মূল শক্তি। এইসব তরুণদের ফ্যাসিস্ট রাজনীতিতে টেনে আনা হয় মূলতঃ দুটি উপায়ের সাহায্যে। প্রথমতঃ এদের নৈতিক অধঃপতন ঘটানো হয়। দ্বিতীয়তঃ 'ডেমাগ্যগি' বা বাগাড়ম্বরের সাহায্য এদের মধ্যে একধরণের রাজনৈতিক মোহ সৃষ্টি করা হয়। যারা বলে তরুণরা অনেক সময় ফ্যাসিস্ট রাজনীতিতে যায় টাকা পয়সার মোহে এবং সন্ত্রাসের ভয়ে, আমি তাদের সঙ্গে একমত না। একটা জিনিষ ভুলে গেলে চলবে না যে ফ্যাসীবাদও এক ধরণের রাজনীতি। অর্থের মোহ ও সন্ত্রাস কিছু সংখ্যক যুবককে বিপথগামী করতে পারে, কিন্তু বিরাট সংখ্যার যুবককে বিপথগামী করতে হলে অবশ্যই একটা না একটা রাজনীতি চাই। এ প্রসঙ্গে হিটলার মুসোলিনীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ স্মরণ করা যেতে পারে। তারা দেশের মানুষের বিশেষ করে বেকার যুবকদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এবং সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপারে এত জংগী কথাবার্তা বলতো যে তারা সরকার বিরোধীদের এবং কমিউনিস্টদের ছাড়িয়ে যেতো। জমিতে বীজ বপনের আগে যেমন জমি চাষ করতে হয়, তেমনি যুব মনে ফ্যাসিস্ট রাজনীতি ঢোকাবার আগে তাদের মধ্যে অশ্লীলতার চাষ করা হয়। চরিত্রবানদের দিয়ে কখনো ফ্যাসিস্ট রাজনীতি হয় না। একমাত্র নৈতিকতা বর্জিত যুবকদের দিয়েই বেপরোয়া জনবিরোধী সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্ভব। তাই দেখি এই ভারতবর্ষেও শিল্পের নামে চলে অশ্লীলতার অভিযান। আজকাল বহু দায়িত্বশীল পত্রিকা এমন অশ্লীলতার প্রচার অভিযানে নেমেছে এবং নামতে গিয়ে এমন সব কাণ্ডকারখানা করছে যে এতে নিষিদ্ধ বইগুলোও লজ্জা পেয়ে যাবে। ব্লিৎস পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় একটা করে উলঙ্গ ছবি থাকে কেন? প্রত্যেক সংখ্যায় 'আনন্দলোক' যুব সমাজের কাছে কি ধরণের 'আনন্দ' নিয়ে হাজির হয়? কিছুদিন আগে আমি 'ফিল্ম মিরর' নামে একটা পত্রিকায় এক গুচ্ছের একেবারে উলঙ্গ ছবি দেখেছি। যারা আজ ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামের কথা বলছেন তারা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? অশ্লীলতাকে বাঁচতে দিয়ে ফ্যাসীবাদকে খতম করা যায় না।

ফ্যাসীবাদী দক্ষিণপন্থী শক্তি আজ শুধু ভারতবর্ষেরই সমস্যা নয়—সারা বিশ্বে আজ এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে যারা নিজেদের ফ্যাসীবিরোধী বলে দাবী করেন তাদের নিজেদেরও অনেক দোষ। যেমন বাংলাদেশের ঘটনা প্রসঙ্গেই বলা যায় যে আমরা খোন্দকার মোস্তাক আমেদের যতই সমালোচনা করিনা কেন একটা জিনিষ কোন মতেই ভুলতে পারা যায় না যে শেখ মুজিব নিজেই বাংলা দেশে সব পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা রব-সিরাজ জলিলকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। যুব লীগের মস্তানরা যখন সারা বাংলা দেশের বুকে সন্ত্রাস নামিয়ে দিয়েছেল তখন তাঁর 'বজ্রকণ্ঠ' শোনা যায়নি। ফ্যাসীবাদ বিরোধী হতে হ'লে নিজেকে গণতন্ত্রী হতে হয়। আজ পর্তুগালে যে অবস্থা এর জন্য সেখানকার কমিউনিস্টদের অবদান কম নয়। যারা শ্রমিকদের দিয়ে ধর্মঘট করিয়ে সোসালিস্ট পার্টি পত্রিকা রিপাবলিকা বন্ধ করে দিয়েছিল, জনগণ তাদের সম্বন্ধে কি ভাববে? জনগণ কি ভাববে না তারাই ফ্যাসিস্ট? কেন আজ উত্তর পর্তুগালে কমিউনিস্ট পার্টির সদর বারবার আক্রান্ত হচ্ছে? কাদের হাতুড়ির প্রতিকৃতি ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে? যারা এইসব বিক্ষোভ করছে তারা সবাই সি আই এর এজেন্ট নয়, সাধারণ মানুষও আছে। আসলে অনেক প্রগতিশীল পার্টির মধ্যে অনেক সময় এত অসহিষ্ণুতা দেখা যায় যে তা প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলোর উগ্রতাকে ছাড়িয়ে যায়। সন্ত্রাসবিরোধী কথাবার্তা যে যতই বলুক না কেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মস্কোপন্থী ও মাওপন্থীদের বৈরিতা উভয়কে এমন এক এক জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে যেখান থেকে উভয়েই এক এক সময় মনে করছে এই দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করবার জন্য বিশ্বের যে কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মেলানো যেতে পারে। যেমন কম্বোডিয়ার ব্যাপারে দেখতে পেয়ে ছিলাম রাশিয়া আমেরিকার অনেক কাছাকাছি। আবার চিলি ও বাংলা দেশের ব্যাপারে ঠিক এর উল্টো।

তবে ফ্যাসিস্ট শক্তি যতই লম্ফঝম্ফ না কেন, জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী। বিপ্লবের শাশ্বত অভিযাত্রা কেউ রোধ করতে পারবে না। ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদের যারা জন্মদাতা সেই হিটলার মুসোলিনীই কোথায় তলিয়ে গেল, তো তার চামচারা আর কি করবে।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস

৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১৩

ফোন: ২৪১৯৪৩

কয়লাখনি পরিক্রমা (৩)

কয়লা-শ্রমিক এখনো মানুষের মর্যদা পায়নি

সাধন গুহ

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে উৎসাহ নীনতার অভিযোগ প্রসঙ্গটি আলো-না করতে গিয়ে এই প্রতিবেদনের র্ববর্তী দুই অধ্যায়ে যে কথাটা ামরা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে এই ধ, সব কিছু সত্ত্বেও শ্রমিকদের ধ্যে একটা প্রচণ্ড আস্থাহীনতার াব বর্তমান। অথবা বলা যায়, একটা প্রচণ্ড অনন্বয় বোধ—যাকে ংরেজীতে বলা হয় "এলিয়েনেশন।" নজের শ্রমে তৈরী পণ্যের শিকারেই যন পরিণত হয়েছে সে নিজে। য়লাখনি অঞ্চলে এলে এটা সকলে-রই নজর পড়ে। এই মানসিকতা লে আসছে বংশানুক্রমে। সবচেয়ে বেদনার কথা হচ্ছে এই যে, জাতীয় করণের পর প্রশাসন শ্রমিকদের ধ্যে এমন আস্থা গড়ে তুলতে পারেন নি যার ফলে উৎপাদন ও ৎপাদন শক্তির মধ্যে সৃষ্টি ও স্রষ্টার হার্দ্য সম্পর্কের ব্যাপ্তি ঘটতে পারে।

সি. এম. এ. ইস্টার্ন ডিভিসনের াঁকতোড়িয়াস্থিত এম ডি অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অফিসে জন সংযোগ দপ্তরে পি. আর. ও শ্রীজয়ন্ত বসু আমাকে জাতীয় করণের পরবর্তীকালের কর্মসূচী বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির ওপরই খুব বেশী জোর দিয়েছেন। অবশ্য, শ্রীবসু যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এ সব কথা বলেছেন তা নয়, এটা যান্ত্রিক প্রশাসনিক আচরণেরই ফলশ্রুতি। অর্থাৎ, শ্রীবসুর মত তরুণ জনসংযোগ অফিসারের পক্ষেও এটা ভাবা প্রায় অসম্ভব যে, বেতন বৃদ্ধিই কয়লা শ্রমিকদের মানসিকতা পরিবর্তনের একমাত্র শর্ত হতে পারে না। জাতীয় করণের পর শ্রমিকরা অদ্যাবধি এটা বুঝবার সুযোগ পাননি যে, বর্তমানে এই শিল্পের তারাও অংশীদার, এই শিল্পের মালিকানায় তারাও শরিক। বরং বলা যায় যে, তারা অতীতের মতোই যেই তিমিরে সেই তিমিরেই আছেন। প্রথম এবং প্রধান পরিবর্তনের শর্ত হচ্ছে শ্রমিকদের পারিপার্শ্বিক এবং পরিবেষ্টনীর মৌলিক পুনর্বিন্যাস। সারাটা অঞ্চল আমি ঘুরে দেখেছি, কয়লাখনি অঞ্চলের সেই ভয়াবহ কুলীধাওড়ার আজও কোন পরিবর্তন হয়নি। অবশ্যই এমন দাবী আমি করছি না যে, আড়াই বছরেই শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মানুষের বাসোপযোগী কোয়ার্টার তৈরী করা সম্ভব ছিল। কিন্তু, এ পর্যন্ত কিছু কিছু কোয়ার্টার তৈরী করা নিশ্চয়ই অসম্ভব ছিলো না। এখনও এগুলো সব প্রস্তাব হয়েই আছে। জানি না, কবে এগুলো কার্যকরী হবে। কিন্তু, শুনেছি যে, কোন এক এরিয়া জেনারেল ম্যানেজারের বাংলো পুনর্বিন্যাসের জন্য লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে। সেখানে টাকার অভাব হয়নি কিংবা পরিকল্পনাটি ফাইল বন্দীও হয়নি। এগুলোতো শ্রমিকরা জানেন, শ্রমিকরা দেখেনও। তারপর, কোলিয়ারী অঞ্চলে বারবনিতাদের সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না। এটা কি ভাবে সম্ভব হচ্ছে তা কিন্তু প্রশ্ন করেও জানা যায়নি। বলা বোধ হয় অসমীচিন হবে না যে, এইসব বারবনিতাদের ঘাঁটি বৃদ্ধির কোন খবরই প্রশাসনের অজ্ঞাত সারে হচ্ছে না। মদের আড়তগুলো এই সঙ্গে বাড়ছেই। অর্থাৎ, প্রাইভেট সেক্টরের আমলে শ্রমিকদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়ার যে সব প্রথা চালু ছিল জাতীয় করণের পর সে সব প্রথার বিলুপ্তিতো দূরের কথা, সেগুলো রয়েতো গেছেই, বরং বেড়েছে। এই সঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। কোলিয়ারী অঞ্চলগুলো বহির্জগত থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও বাস পাওয়া যায় না। মুক্তিমেয় কয়েকটি মিনি বাস আছে। রাণীগঞ্জ কোলিয়ারী অঞ্চলে আবার তা-ও নেই। কোলিয়ারী বাজারগুলোতে জিনিষের দাম প্রতিক্ষেত্রেই বাইরের বাজারের তুলনায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ বেশী, ফলেই, সব কিছু মিলে শ্রমিকরা নতুন কোন প্রাণের স্পর্শ পাচ্ছেন না। এরপর, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে উৎসাহহীনতার অভিযোগ নিঃসন্দেহেই যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

এটা সকলেই জানেন যে, প্রাইভেট সেক্টরের আমলে শ্রমিক ছিলো ক্রীতদাস। তাদের জীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলা হতো। বর্তমানে অবশ্যই শ্রমিকরা সে বিষয়ে অনেক বেশী সচেতন হয়েছে। আগে কোলিয়ারী ম্যানেজার কিংবা সুপিরিয়ার মাইনিং অফিসাররা শ্রমিকদের কুকুর বেড়ালের মতোই মনে করতেন। এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রমিকদের এই সচেতনতা সুদীর্ঘ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। অবশ্য অনস্বীকার্য যে, তার সাথে জাতীয়করণের পরবর্তী কিছু কিছু অধিকারের সংযোজনও শ্রমিকদের নতুন মানসিকতা গঠনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। যেমন, আগে মাইনে পাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা ছিলো না।

এখন মাইনে পাবার নির্দিষ্ট তারিখ আছে। আগে প্রাণের দায়েই ম্যানেজার এবং অন্যান্য অফিসারদের বাংলোয় শ্রমিকদের যখন তখন গুতর খাটাতে হতো। এখন সেটা আর চালাও ভাবে এবং প্রকাশ্যে সম্ভব হচ্ছে না। এটাকেই বলা হচ্ছে শ্রমিকদের ঔদ্ধত্য এবং শ্রমিকদের এই সচেতনতা অফিসাররা কিছুতেই হজম করতে পারছেন না। অথচ, করারও কিছু নেই।

প্রাইভেট সেক্টরের আমলের সেই ম্যানেজার, সেই অফিসাররাই আছেন। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের পদোন্নতি ঘটেছে। কিন্তু, এসব অফিসারের তো মানসিকতা পরিবর্তনের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। তাই, তারা গৌরী সেনের টাকার জোয়ারেই গা ভাসিয়েছেন। যেমন চলছে চলুক—ভাবটা যেন এই। কোলিয়ারী ম্যানেজাররা অনেকেই খাদের নীচে যান না—এই অভিযোগ আমি প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই পেয়েছি। এমনও শুনেছি যে, প্রশাসনও ম্যানেজারদের এই ঔদাসীন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে সম্প্রতি এক সার্কুলার জারী করে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, ম্যানেজার এবং সিনিয়র মাইনিং অফিসারদের মাসে অন্ততঃ আঠারো দিন খাদে নামতে হবে। এই সার্কুলারের ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলে তো বলতে হবে যে, ঘটনা খুবই গুরুতর। আমরা কিন্তু এটাকে নিছক রটনা বলে মনে করতে পারছি না। যে সব অফিসাররা চিরদিন শ্রমিকদের শেয়াল কুকুরের মতোই মনে করে এসেছেন তারা আজ মুক্ত মনে শ্রমিকদের উন্নতশির চলাফেরাটা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারছেন না। এর ফলে শ্রমিকদের সাথে ও তাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক হতে পারছে না। জাতীয় করণের পর প্রশাসন ফাইল চালাচালির কাজে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেও শ্রমিকদের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারেননি বা পারছেন না। বাস্তবতঃ যা-ই হোক না কেন, জাতীয় করণের পরও কয়লাখনির শ্রমিক মানুষের ন্যূনতম মর্যদাও পায়নি।

প্রধান শিক্ষক সমিতি প্রসঙ্গে

মতামত

প্রধান শিক্ষক সমিতি সম্পর্কে ১৫ই আগষ্টের সংখ্যায় শিক্ষক রতন সেন যে চিঠি লিখেছেন সে সম্পর্কে বলছি: সহকারী শিক্ষকদের এ সমিতিতে স্থান নেই, থাকতে পারে না, এ সহজ কথাটা বুঝতে শ্রীসেনের এত দেরী হলো। এজন্য অবশ্য আমি দুঃখিত। সমিতিই তো প্রধান শিক্ষকদের; সহকারী শিক্ষকদের এখানে জায়গা কোথায়? এ কথাটা সহঃ শিক্ষকরা কেন বোঝেন নি; বুঝি না। বহরমপুর ঘুরে এসে এখন "গেল গেল" রব কেন? ভোট দিতে দেওয়া হয়নি, ঠিকই হয়েছে। আমাদের একটা মাত্র সমিতি; এখানেও যদি শ্রীসেনেরা ঢুকে পড়েন, তবে আমাদের অবস্থা কি হবে? আমি বলি শ্রীসেনকে—"ক্ষোভ কম-বেশ না।" মিছিল ও সভার দরকার যখন হবে আবার তাদের ডেকে নেবো। আমরা আর কতজন আছি মিছিল করার জন্য?

আমি বলছি অন্য কথা; যে কথা শ্রীসেন বলেননি, শেষ লাইনে শুধু ইঙ্গিত করেছেন। স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট। তা চাপা পড়ে গিয়েছে। মাত্র কয়েক হাজার টাকার হিসেব নেই। এ নিয়ে বেশী প্রচার হলে সমিতির পূজনীয় নের্তাদের সম্মানহানি হবে, তাই সে জিনিস চাপা। নেতাদের তো মানহানি করা যায় না। জেনারেল সেক্রেটারীর আত্মীয় ও কোষাধ্যক্ষ এদের আত্মীয়রা জড়িয়ে আছেন, এ নিয়ে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। টেষ্ট পেপারের ক্ষেত্রে হেভী লোকসান হয়েছে। "প্রোব কমিটি" তাদের রিপোর্ট দিয়েছে। তাও চাপা পড়েছে। কারণ এটার প্রচারেও সমিতির ভাবমূর্তি মসীলিপ্ত হবে, একথা উপলব্ধি করেই আমরা আমাদের সভায় বসে তা চাপা দিয়ে দিয়েছি। তবে একটা কাজ করেছি আমরা। যারা দু বছর টেষ্ট পেপার চালিয়েছেন দায়িত্ব নিয়ে এবং লোকসান করিয়েছেন, তাদের একজনকে প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক করেছি; অপরজনকে পত্রিকার সম্পাদক করেছি। আর যার সর্বাত্মক তত্ত্বাবধানে এ কাজগুলি সংগঠিত হয়েছে। তাকে এবারও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেনারেল সেক্রেটারী করেছি। শ্রীসেনকে অনুরোধ এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন না। আমাদের ইমেজ নষ্ট করবেন না। মন্ত্রীদের সঙ্গে আমাদের নেতাদের ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। এটা আমরা চাই না। আমাদের নেতাদের দুর্নাম হলে আমরা যাবি কোথায়? মন্ত্রীরা নেতাদের উপর চটে গেলে নেতাদের উপায় কি হবে? সেটা ভেবে দেখেছেন কি শ্রীসেন? তাই বলছি—সাবধান।

রবীন রায়

ওষুধের ফাটকাবাজী

দর্পণের ২৯শে আগষ্ট তারিখে সংবাদদাতার রিপোর্ট এবং ৫ই সেপ্টেম্বর জনৈক রাণা ঘোষের চিঠিতে বিদেশী ঔষুধ কোম্পানীগুলোর মুনাফার বহর জেনে আঁতকে উঠলাম। আমাদের দেশে ডাক্তারের ফি দেবার পর ঔষুধ কেনার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে। সাধারণতঃ আমরা প্রেস্‌ক্রিপসন নিয়ে কেমিষ্ট শপে গিয়ে সস্তায় বিকল্প ঔষধ খুঁজি এবং তাতে নিম্নমানের কিংবা ভেজাল ঔষধের শিকার হতে বাধ্য হই। যেখানে শতকরা সত্তর ভাগ লোক দারিদ্র্য-সীমার নীচে, যে দেশে অধিকাংশ লোকের ডাল ভাত জোটে না, সেখানে বিলাতী কোম্পানীর ভিটামিন-টনিক কেমার মত ভিটামিন—এম (মানি) আমাদের হাতে কবে হবে বলতে পারেন? এমন দিন কি হবে মা তারা?

কঙ্কন ঘোষ
বাগইআটি,

দর্পণের ৫ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় "ওষুধের ফাটকাবাজী" প্রসঙ্গ ছাপার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি শ্রীরাণা ঘোষকেও বিলাতী ওষুধ কোম্পানীগুলোর মুখোশ খুলে দেবার জন্য। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি, কালোবাজারীর ক্ষেত্রে (ওষুধ নিয়ে) শুধু রোশ বা মার্ক শার্প ডোম কোম্পানীই দোষী নয়। আরও বহু নমুনা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিলাতী কোম্পানীর কথা ধরা যাক্ (অনিবার্য কারণবশতঃ নাম উল্লেখ করলাম না) যারা প্রতি কেজি "ডেকসামেথাসোন" আমদানী করত ৬০,০০০ টাকায়, যার দাম সরকারী চাপে পড়ে তারা কমাতে বাধ্য হয়েছিল ১৬,০০০ টাকায়। কোথায় ষোল হাজার আর কোথায় ষাট হাজার।

জনৈক
মেডিকেল রেপ্রেজেন্টটিভ

গ্রন্থ সমীক্ষা

অজয় ভট্টাচার্যের গান

(দর্পণের সমালোচক)

আজকের দিনে রেডিও বা সিনেমায় যেসব আধুনিক নামধেয় গান প্রচারিত হয় তা শুনলে মনেই হয় না রবীন্দ্রনাথ নামে কোন কবি ও সঙ্গীতকার দীর্ঘকাল জীবিত থেকে পরলোক গমন করেছেন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে, পরন্তু এই ধারণাই জন্মায় যে, বাংলা কাব্য এখনো শৈশবাবস্থায়। হয়ত রবীন্দ্র সংগীতের ভাষা ও ভাবের অসাধারণ ঐশ্বর্য তিরিশ ও চল্লিশ্ দশকের গীতিকারদের মধ্যে অনুপস্থিত, কিন্তু তাদের সঙ্গে এখনকার অক্ষম রচয়িতাদের কোন তুলনাই চলে না। বরং তাদের রচনার গুণে তৎকালীন কয়েকটি সিনেমার গান সম্বন্ধে এখনো হয়ত অনেকের ধারণা সেগুলো রবীন্দ্রনাথের গান।

স্বর্গত অজয় ভট্টাচার্য সে যুগের একজন অগ্রগণ্য গীতিকার। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত প্রতিভা যখন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত সেই সময় বাংলা কাব্যসঙ্গীতের জন্ম, যাকে এখনকার ভাষায় বলা হয় আধুনিক বাংলা গান। অবশ্য নজরুল পরবর্তী বাংলা গানে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। নজরুল পর্যন্ত একই ব্যক্তি ছিলেন কথা ও সুরের রচয়িতা —নজরুলের বহু গান অবশ্য অন্য লোকের সুর দেওয়া, কিন্তু পরবর্তীকালে এই দুই ক্ষেত্র দ্বিধাবিভক্ত। অর্থাৎ যিনি গান লেখেন তিনি সুর দেননা, অজয় ভট্টাচার্য লিখতেন, তার গানে সুর দিয়েছেন হিমাংশু দত্ত, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীনদেব বর্মণ, পঙ্কজ মল্লিক, অনুপম ঘটক প্রভৃতি অনেকে—সিনেমার বাইরে বেশির ভাগ গানেই অবশ্য হিমাংশু দত্ত।

অজয়বাবু মারা গেছেন ১৯৪৩ সালে। কবির জীবিতকালে তাঁর কয়েকটি গানের বই প্রকাশিত হয়েছিল। সে বইগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি কবি-পত্নী তার নির্যারিত গানের একটি সংকলন (অজয় গীতিসংগ্রহ: অজয় ভট্টাচার্য। সংকলন ও সম্পাদনা: নারায়ণ চৌধুরী। পরিবেশক: এম সি সরকার, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২। মূল্য: পনেরো টাকা।) প্রকাশ করেছেন। এতে এককালের বহু জনপ্রিয় কাব্যসংগীত ও সিনেমার গান সংকলিত হয়েছে—যেমন, তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে, গোধূলির ছায়া পথে, কাঁদিব না ফাগুন গেলে, বাংলার বধূ বুকে তার মধু, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, যবে কণ্টক পথে হবে রক্তিম পদতল, চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে, পাখী আজ কোন কথা কয় শুনিস কিরে, শুনি ডাকে মোরে ডাকে, এই পেয়েছি অনল আলা, বাঁধিনু মিছে ঘর, শেষ হলো তোর অভিমান; তাছাড়া রয়েছে বিখ্যাত কয়েকটি রাগপ্রধান গান। অবশ্য সঙ্গে স্বরলিপি থাকলে বাংলা গানের এই সর্বাত্মক অধঃপতনের যুগে সংগীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে কিছু বাংলা গান শেখার সুবিধা হত। কিন্তু এগুলোর কাব্যগুণও সাধারণ স্তরের নয় বরং আধুনিক বাংলা গানের এই দৈন্যের দিনে অসাধারণই বলতে হয়।

স্পেনে ফ্যাসিস্ত শাসনের বিরুদ্ধে সেনাবিদ্রোহ

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর স্বপশাসনের বিরুদ্ধে ক্রমেই স্পেনের মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। আগষ্ট মাসে ফ্যাসিস্ত সরকার কুড়িজনের মত সামরিক অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছে, এই অফিসারদের মধ্যে বেশ কিছু মেজর, ক্যাপ্টেন পদাধিকারী রয়েছেন। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, এঁরা ফ্যাসিস্ত শাসন অবসানকল্পে সামরিক বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করছেন। টাইমস পত্রিকার একজন সাংবাদিকের মতে, লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল আঞ্জেল কামপানো জুলাই মাসে একজন মেজর ও ছ'জন ক্যাপ্টেনকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে ভুল কাজ করেছেন। এতে বর্তমান সরকার সম্পর্কে ঘৃণা বাড়বে বই কমবে না।

প্যারিসের লা মঁদ খবর দিয়েছে: "মাদ্রিদে সামরিক অফিসাররা ধৃত। স্প্যানিশ সৈন্যবাহিনীতে গণতান্ত্রিক সামরিক ইউনিয়নের গোপন কেন্দ্র সক্রিয়। সৈন্য বিদ্রোহ ঘটানোর অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের বিচার হবে।"

ইউ ডি এম বা ইউনিয়ন দেমোক্রাতাসিয়া মিলিতার (গণতান্ত্রিক সামরিক ইউনিয়ন) ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনীর একটি গোপন জোট। অভিজ্ঞ মহলের মতে এই ইউ ডি এমের সঙ্গে এক হাজার উচ্চপদস্থ অফিসার রয়েছেন। এই ঘটনাকে ছোট করে দেখানোর জন্য অবশ্য মন্ত্রী জেনারেল কলোমা গালেগোস অবশ্য বলেছেন, এটা সামান্য ব্যাপার। কিন্তু এটা যে সামান্য ব্যাপার নয়, তা বোঝা যায় বৃদ্ধ ফ্রাঙ্কোর কথায়। সম্প্রতি বৃদ্ধ একনায়ক ফ্রাঙ্কো প্রাক্তন সেনানায়ক ও অফিসারদের সভায় বিরোধীদের "ঘেউ ঘেউ কুকুর" বলে অভিহিত করেছে। চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ জেনারেল ফার্নানডেজ দু ভালেসপিন কিন্তু ব্যাপারটা অত ছোট করে দেখেন নি, তিনি এখন "বিদ্রোহী" খুঁজে ফিরছেন।

এ দিকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। অন্যদিকে বেসামরিক মহলেও চাঞ্চল্য। অতীতে স্পেনে সামান্য ধর্মঘট করার জন্য ধর্মঘটীকে নির্বিচারে খুন করার বেওয়াজ ফ্রাঙ্কোর যে ফ্যাসিস্ত বাহিনী আমদানি করেছিল এখন তারা চুপসে গেছে। ইতিমধ্যেই স্পেনে নানা দাবির ভিত্তিতে প্রায় ন'শো শ্রমিক ধর্মঘট করেছেন। শুধু শ্রমিকরা নন, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, পাদ্রী, ছাত্র, সরকারী কর্মচারীরাও এই আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। বাসক্ অঞ্চলে আবার নতুন করে এক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। শত শত মানুষকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। স্পেনের মানুষ এখন নতুন করে গণতন্ত্রের জন্য লড়ছেন। মাদ্রিদ ও বার্সিলোনায় ছাত্ররা বাসকের সংগ্রামী মানুষের সমর্থনে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন পর্যন্ত করছেন। খবরে আরো জানা যায়, বিভিন্ন বামপন্থী দল (নিষিদ্ধ) একজোট হয়ে ফ্যাসিস্ত শাসন উৎখাতের জন্য গণতান্ত্রিক মঞ্চ নামে একটি সংগঠন করে তুলেছেন। এই সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্রী দল। এখন ইউ ডি এম ও এই গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম একযোগে কাজ করছে বলে জানা যায়। প্যারিসে নির্বাসিত কমিউনিস্ট নেতা সান্তিয়াগো কারিলো আশা প্রকাশ করেন যে, স্পেনের মানুষ স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাড়া দেবেন। যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁদের সবাইকেই এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সাদরে গ্রহণ করা হবে। এরাই ভবিষ্যতে স্পেনের সম্মান বাঁচাবেন।

সি আই এ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

এগি: হ্যাঁ। আমি অর্থ-লোভী ও কোরিয়ার-সর্বস্ব, কিন্তু আমি সৈন্যবাহিনীতে যেতেও চাইনি এবং এজেন্সিস-আপনাকে এই বাধ্যতা থেকে বেরোবার সুযোগ দিয়েছে। অন্যদিকে আমি সবসময় বৈদেশিক ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম আর সেই আগ্রহ বাড়ল যখন কর্মক্ষেত্রে আমায় নিয়োগ করা হল। আমি অবশ্য তখনই লক্ষ্য করলাম কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় মানুষ বাস করে। অতএব আমি বুঝতে শিখলাম। বামপন্থীরা খারাপ—এটা আমার মধ্যে সম্পূর্ণ গেঁথে গেল। কিন্তু উদারনৈতিকরা দুর্বল। অতএব আমাদের কাজ, আমি বললাম, কালক্ষেপণের জন্য বামপন্থীদের বাইরে রাখা এর মধ্যে উদারনৈতিকদের ঠেলে তোলা। ফলত, আমি ভাবলাম লাতিন আমেরিকায় প্রয়োজনীয় সংস্কার আনার মত শক্তিশালী হয়ে উঠবে উদারনৈতিকরা। তারপর আস্তে আস্তে আমি দেখলাম সংস্কার ফংস্কার আমরা চাই না। আমরা অন্যান্য সংখ্যালঘু সরকারদের সমর্থন করছি আর জনপ্রিয়-সংখ্যাগরুদের বিনাশ করছি। তার মানে আমি যখন আমেরিকা সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করি। এটা ভিয়েতনামে প্রস্তুতি, নাগরিক অধিকার আন্দোলন ও পল্লী অঞ্চলে দাঙ্গার সময়। আমাদের উদারনৈতিক বাগাড়ম্বর একদিকে, অন্যদিকে যারা পরিবর্তন চায় না তাদের প্রতি সরকারী কঠিন সমর্থনের মধ্যে আমি যোগসূত্র খুঁজতে শুরু করি।

গেরাসি: এক মিনিট! ১৯৬১-৬২ সালে আপনি ইকোয়েডরে আর প্রচন্ড কমিউনিস্ট বিরোধী ভেলাস্কো ইবারা ছিল প্রেসিডেন্ট। সে সংস্কার চায়, সে জনপ্রিয় আর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচনে জেতে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্য কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে সে নারাজ। আপনি নিজে তাকে গদিচ্যুত করার জন্য কাজে নামেন এবং তার জন্য কেবল আপনি জাল দলিল তৈরি করে তাকে অভিযুক্ত করাই নয়, চরম দক্ষিণপন্থীদের, অন্যান্য উদারনৈতিকদের নয়, ফ্যাসিস্তদের সাহায্য করেছেন। আর আপনার অভ্যুত্থান কার্যকর হবার পর তার উত্তরাধিকারী আরোসেমেনাও কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে রাজি হয়নি, আপনি আবার একই কাজ করেন। এখন ওতে উদারনৈতিকদের কালক্ষেপনে সাহায্য করা হয়েছে কি?

এগি: আমার মনে হয় তখন আমার মস্তিষ্ক এত ধোলাই ছিল যে আমি প্রকৃতপক্ষে বামপন্থীদের ওপর অত্যাচারের সঙ্গে উদারনীতিকে এক করে ফেলেছিলাম। আমি সত্যিই ভাবতাম যে, চরম বামপন্থীদের উৎখাত করতে না পারলে প্রকৃত সংস্কার করা যাবে না, তাই ভেলাসকো ও আরোফেমেনা আমার কাছে প্রকৃত সংস্কারবাদী বলে প্রমাণ হল না, যেহেতু তাদের "দলিল" দেওয়া সত্ত্বেও বামপন্থীদের কারারুদ্ধ এবং কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে রাজি হল না। অবশ্য আমি দ্রুত শিখছিলাম।

গেরাসি: কি রকম?

এগি: কেন, আমি দেখেছি আমাদের অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর কি ঘটেছে।

গেরাসি: আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে কি আপনি এসব ব্যাপারে আলোচনা করেন?

এগি: না।

গেরাসি: কি বিষয়ে আপনারা কথাবার্তা বলেন?

এগি: গলফ।

গেরাসি: সবসময়?

এগি: গলফ আর আবহাওয়া। সেটা ইকোয়েডরে। পরে উরুগুয়েতে আমরা ভয়ঙ্কর দুর্নীতি সম্পর্কে কথা বলি। মাঝে মাঝে আমরা ঠাট্টা করে বলি যে, উরুগুয়ের পক্ষে সবচেয়ে ভাল জিনিস হচ্ছে কিছুকালের জন্য কমিউনিস্ট হয়ে যাওয়া যাতে দেশটা দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে।

গেরাসি: আপনি কখনও কোন সি আই এ অফিসার দেখেছেন যিনি সত্যই চিন্তিত, একজন আদর্শবাদী?

এগি: না। কিন্তু একথা বলব না সব অফিসারই নৈরাশ্যবাদী। ব্যাপারটা জটিল। এমন নয় যে, কোন অফিসার কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কোন অবিচার দেখবে না। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা যত বাড়বে সে তত নির্লিপ্ততার মধ্যে দিয়ে যাবে। সে একজন যন্ত্রী হয়ে উঠবে যে সর্বদাই প্রশ্নহীন। আর তখন সে তার উন্নতির অর্ধেক পথে। সে তার বাচ্চাদের কলেজে পাঠাচ্ছে। সে বাড়ির জন্যে, গাড়ির জন্যে টাকা পেয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সে ভাবে অনেক দেরী হয়ে গেছে। অবসরকালীন পাওনার জন্য সে কেবল লেগে থাকে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

টেলিফোনে লাইন পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার

মেদিনীপুরের বালিচকে টেলিফোন লাইন ঠিকমত পাওয়া বেশ ভাগ্যের ব্যাপার। লাইন পাওয়া গেলেও কথা বলার সময় কথাগুলি স্পষ্টভাবে শোনা যায় না। সর্বদা কিম্ভূত আওয়াজ হয়। পেদের ওপর বিষফোড়ার মত ভুল নম্বরের ব্যাপার আছে।

ট্রাঙ্ক লাইন পেতে গেলে খড়্গপুরের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হয়। সব সময় কাজও করে না। বিল অনিয়মিত ভাবে আসার জন্য গ্রাহকদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। অনেক সময় একসঙ্গে অনেক দিনের বিল আসে।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

ঋত্বিক ঘটকের নাটক 'জ্বলন্ত'

(দর্পণের সমালোচক)

চলচ্চিত্র-সফল একজন পরিচালক তার শিল্পসম্ভার নিয়ে মঞ্চে এলেই যে তাকে আনুপাতিক দক্ষতা নিয়ে সাফল্য লাভ করতে হবে এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ শর্ত না থাকলেও; তার পূর্বকৃত সৃষ্টির পরিমিতিবোধের সঙ্গে সর্বশেষ সৃষ্টির কোন যোগ থাকবেনা, এমন দুর্ঘটনা অবশ্যই প্রত্যাশিত নয়। অসুলিসেয় সফল চলচ্চিত্র পরিচালকের একজন হয়েও ঋত্বিক ঘটক সেই দুর্ঘটনাই ঘটিয়েছেন। সম্প্রতি একাডেমী মঞ্চে প্রাচীভীর্থের প্রযোজনায় ঋত্বিক ঘটকের নাটক 'জ্বলন্ত' দর্শকদের এই দুঃসহ অভিজ্ঞতা দিয়েছে। নাটক নির্দেশনা মঞ্চ সঙ্গীত আলো—এসব কিছুর নেতৃত্বে থেকেও ঋত্বিকবাবু শিল্পমনস্কতার কোন ছোপই রাখতে পারেন নি।

সেই পুরোনো চিন্তা অর্থাৎ বঙ্গবিভাজনের আর্তি দিয়েই এ নাটকেরও (যে চেতনা নাট্যকারের 'জ্বালা' নাটক বা 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির মধ্যে প্রবল) শুরু। দুই বাংলার সীমান্তই মোটামুটি ভাবে নাটকের পটভূমি। গাঁয়ের মাষ্টার মশাই তার পুরনো দিনের স্তিটের ফিরেছেন, যুদ্ধ থেমে গেছে। এর পরেও বাংলাদেশে রয়েছে সেই অরাজকতা। দারিদ্র্য নিপীড়ন আর নারীর সম্ভ্রমহানি। একালের বহু নাটকের এই বহুবিচিত্ত ঘটনাকে নাটকীয় করে তোলার ব্যাপারে কোন অভিনবত্ব তো নেই-ই উপরন্তু অসংবদ্ধ এবং এলোমেলো ঘটনা ও সংলাপ দিয়েই এ নাটকের কাঠামো তৈরী হয়েছে।

নাটকে গ্রামের মেয়েরা কখনও দারিদ্র্যে দুঃখে কাঁদে, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতো গলায় আবার পরক্ষণেই রবীন্দ্র সুরাশ্রয়ী অদ্ভুত গান গাইতে গাইতে লবঙ্গলতিকার মতো কোমর দুলিয়ে নেচে ওঠে। গাঁয়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা ঘরের সমস্যা ফেলে বিশ্বরাজনীতি নিয়ে মশগুল (যেন ঘরের সমস্যা নিয়ে ভাবলে তারাই দেশকে উদ্ধার করে দিত) ওয়াগন ব্রেকার, যারা সীমান্তে ওয়াগন লুট করে আর বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো কুমারী মেয়েকে সম্ভোগের পর তার দেহে আগুন জ্বালিয়ে দেয় আর তাদের মদত দেয় 'আইনের ভাইপো', একমাত্র যাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই আইন ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যপট নাটকেও বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। অন্তর্নিহিত রসসৃষ্টি বা নাটকে প্রাণ সঞ্চারের কোন চেষ্টাই নেই। তার বদলে ব্রেখটীয় কায়দায় মাঝে মাঝেই দুষ্পাঠ্য পোষ্টার প্রদর্শন, দর্শকদের বোকামির উদ্দেশ্যে ধমক —এরকম অনেক আবেগ তাড়িত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।

প্রযোজনাটি প্রকৃত অর্থে কোন বিশেষ মঞ্চ বা প্রযোজনারীতির অনুসারে তো নয়ই, এমনকি নাটকটি মঞ্চে না পর্দায় প্রদর্শিত হচ্ছে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। নাটকটি দেখে প্রতিটি বাস্তব, অবাস্তব সব কিছুরই বিলুপ্ত সমন্বয় বলে মনে হয়। যে নাটক দর্শক মনে কোন আবেদনই সৃষ্টি করতে পারলো না সেই নাটকের শেষে যদি পোষ্টারে "ঘরে ঘরে ক্ষেপে না উঠলে কিন্তু (বানানটি লক্ষণীয়) হবে না" এই বাণী দিয়ে জনজাগরণের চেষ্টা চলে তবে তা দুঃস্বপ্নের ঘোরে ভুল বকে যাওয়ার সামিল।

শরৎচন্দ্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এই যে নকল চেনানর ব্রত উত্তরাধিকারী সূত্রে আজকের বাংলা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে সেটাই পুষ্টিলাভ করেছে তাকেই আরো পুষ্ট করে তুলতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে ভালো-মন্দ প্রগতি প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের কি কোন পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল? উত্তরে বলা যায়, না। তবে কোন কম্পাসের সাহায্যে শরৎচন্দ্র দিক নির্ণয়ে নেমেছিলেন। মানবতাবাদ—জীবনের অভিজ্ঞতাজাত মানবতাবাদ—এই ছিল শরৎচন্দ্রের দিক নির্ণয়ের কম্পাস।

অনেক কথা উঠবে, সে মানবতাবাদ কি সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের শেকলে বাঁধা ছিলনা? সে মানবতাবাদ কি "বুর্জোয়া মানবতাবাদ", মার্কসীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সে মানবতাবোধের সামঞ্জস্য কতখানি ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র "কমিউনিস্ট ইস্তেহার" পড়েছিলেন কিনা এসব পণ্ডিতী জিজ্ঞাসাও উঠছে। জানিনা অতশত, শুধু জানি ভূমিহীন গফুর যখন বলে "চল আমরা ফুলবেড়ের চটকলে যাই" তখন মনে হয় "ইস্তেহার" না পড়া এরকম দু'চারজন শরৎচন্দ্র পৃথিবীতে বাস করলে আমাদের খুব অসুবিধা নেই। সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনে ক্ষুধার্ত স্বামীর মুখে স্ত্রীর ভাত তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপত্তি আছে তাতে আমাদেরই? এ মানবতাবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের বিরোধ কোথায়?

মানব সংস্কৃতির প্রত্যেক পর্বেই সমসাময়িক অর্থনৈতিক কাঠামোজাত সামাজিক অনুশাসন প্রতিফলিত সেই অর্থনৈতিক কাঠামোর মত সেই অনুশাসনেরও ভালো মন্দ দুই আছে। ভালোর দিকটা নিয়েই আর এক পর্বের নতুন যাত্রা শুরু হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মানবমুখী আচার-আচরণ নিশ্চয় পরবর্তী পর্বে বাতিল হয়ে যাচ্ছে না— তাই শরৎসাহিত্যের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের প্রতিফলন যদি হয়েই থাকে তবে সেটা মনবতাবাদী ভালো দিকটাই—স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা অমানবিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রামবাংলায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রকম? জবাব পেলাম, "খুব খারাপ।" যোশন আলি বলছিলেন, "মানুষ পেট চালাতে পারছে না। ঈদ আর পুজোর বাজার করবে কি দিয়ে?" আমার প্রশ্ন, "জুতোর দাম কি গত বছরের তুলনায় বেড়েছে?" জবাব, "হ্যাঁ, খুব বেশী না হলেও দাম বেড়েছে।" প্রশ্ন করেছিলাম খন্যানেরই বস্ত্র ব্যবসায়ী বিমল বস্ত্রলয়ের মুখুজ্যে মশাইকে। একই জবাব, "লোকে খেতে পাচ্ছে না—পুজো আর ঈদের বাজার করবে কি দিয়ে?" মুখুজ্যে মশাই বললেন যে, কাপড়ের দাম পুজো আর ঈদের মরশুমে কিছুটা বেড়েছে। পরিধানের প্রয অনুপোযোগী একটি শাড়ীর দাম কম করে চোদ্দ টাকা এবং একই কোয়ালিটির একটি ধুতির দাম কমপক্ষে বারো টাকা। বাজারে চাল আছে। তুলনামূলকভাবে দামও কিছুটা কমেছে। কিন্তু, লোকের হাতে অপেক্ষাকৃত কম দামে চাল কেনার পয়সাও নেই। তাই চলছে একটানা অনাহার। চলছে অর্ধাহার। চাকুরীজীবি নিম্নবিত্তদের ঘাড়ে চাপছে নিত্য নূতন ঋণের বোঝা।

পুজো আসছে। কি ভাবছো তোমরা? আমার এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জবাব দিচ্ছিলো বৈঁচিগ্রামের কয়েকটি তরুণ-তরুণী যারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমরণ লড়াই করছে। দীপক নাগ ছেলেটি অর্থাভাবে পার্ট ওয়ান পাশ করেও কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। গানের টিউশানী করে সংসার চালায়। সন্ধ্যা বর্মণ নামে মেয়েটি বি এ পাশ করেছে, কিন্তু বেকার। ওরা চারটি মেয়ে মিলে "শিশুতীর্থ" নামে একটি নার্সারী স্কুল চালাচ্ছে বাইশ মাস ধরে। বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও স্কুলটি এখনও সরকারী স্বীকৃতি পায়নি। চারজনের দুইজন —সন্ধ্যা এবং জ্যোতির্ময়ী দত্ত বি এ পাশ করেছে। রীতা ব্যানার্জী এবং বনানী চ্যাটার্জী বি এ পার্ট টু দেবে। সবাই নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে। ওদের প্রশ্ন, "আমাদের স্কুল সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছেনা কেন?" এই "কেন"র জবাব কে দেবে?

বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্য ডঃ সেন আটই সেপ্টেম্বর সি পি আই নেতা অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যকে ঐ পদে মনোনয়ন দেন। ডীন পদের জন্য অনেক যোগ্য শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও উপাচার্যের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজে অনেকে বিস্মিত হয়েছেন। শিক্ষাবিদদের ধারণা আগামী ছিয়াত্তর সালের পর আর একটি টার্ম উপাচার্য পদে বহাল থাকার জন্য ডঃ সেন সি পি আই তোয়াজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে ডীন মানোনয়ন সম্পর্কে মহামান্য আদালত থেকে ইনজাংশন জারী হয়েছে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক প্রভাত ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মাঁ সেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

সি পি আইয়ের তিন নেতার বাড়ী তল্লাসী ঃ বিদেশী মুদ্রা উদ্ধার

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর ৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি আই-এর তিন বাঘা নেতার বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে আয়কর দপ্তর বেশ কিছু কালো টাকা-ও বৈদেশিক মুদ্রা উদ্ধার করেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

সি পি আই-এর এই তিন নেতা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। একজন সি পি আই প্রভাবিত ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়নের সর্বভারতীয় নেতা। অপরজন পার্লামেন্টের সদস্য এবং কোলিয়ারী শ্রমিক নেতা। অপর নেতা প্রাক্তন এম পি এবং বহু হোটেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম সারির নেতা।

সি পি আই নেতাদের বাড়িতে অস্করের দপ্তরের হানা দেওয়ার খবরে অন্যান্য রাজনৈতিক মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রগতিশীলতার আড়ালে নেতাদের আসল স্বরূপ দেখে সি পি আই দলের মধ্যেও তোলপাড় শুরু হয়েছে। এতদিনের চাপা দেওয়া নেতৃত্ব ও আদর্শের সঙ্কট এখন তীব্র হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত সাধারণ স্তরের পার্টি ক্যাডারও এখন কোন নেতৃত্বকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আদর্শ তো বটেই, বেশ কিছু নেতার ব্যক্তিগত সততার প্রশ্নও উঠেছে।

সদ্য দলত্যাগী সি পি আই নেতা জে এম বিশ্বাস দলকে কঠিন আঘাত দিয়েছেন। শ্রীবিশ্বাস বলেছেন তিনটি উপদলে বিভক্ত পার্টিতে এখন আদর্শ বলে কিছু নেই। যা আছে তা হচ্ছে ক্ষমতালোলুপতা। এরই প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন জিলা থেকে সি পি আই-এর কর্মীরা দলত্যাগ করছেন বলে শ্রীবিশ্বাস দাবী করেছেন।

১লা অক্টোবর প্রকাশিত হচ্ছে

বিশেষ শারদীয় সংখ্যা

দর্পণ

দাম ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

আপনাকে চিন্তার খোরাক জোগাবে

সংগ্রহ করতে ভুলবেন না

ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত বিশে সেপ্টেম্বর মধ্য কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে পাঁচ জন যুবক ছুরিকাহত হয় বলে জানা গেছে।

বিবদমান দুটি গোষ্ঠীর নেতারা হলেন অশোক দেব এবং দুলাল রায়। অশোক দেব ও দুলাল রায়ের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। কিন্তু উভয় গোষ্ঠীই তাদের নিজেদের ঝগড়া মুলতুবি রেখে এতদিন যুবনেতা সোমেন মিত্র সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল। বর্তমানে সোমেনবাবুর সঙ্গে এই গোষ্ঠীর নেতাদের একটা সমঝোতা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে আর লড়াইয়ের প্রয়োজন নেই। তাই প্রকাশ পেল আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী লড়াই।

বিবরণে জানা গেছে, ঘটনার দিন বাইরে থেকে একদল যুবক অস্ত্রশস্ত্র সহ কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। সেখানে উপস্থিত আরেকদল যুবকের সঙ্গে কথা হতে হতেই সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। সংঘর্ষে রীতিমত ছোরা, বোমা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

এই সময় কলেজে মর্নিং শিফটের ছাত্রীরা ছিল। ওরা সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। চেঁচামেচি হৈ হট্টগোলে কলেজটি সাময়িক ভাবে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

প্রকৃত গণতন্ত্রপ্রেম, না মতলববাজি অথবা পাগলামি ?

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

সম্পাদক হিসেবে আমার চেয়ে বেশি সাহস দেখানোর জন্য ইতিপূর্বে আমি কোন সম্পাদককে ঈর্ষা করিনি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত "কলকাতা" পত্রিকার সম্প্রতি-প্রকাশিত "বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা" পড়ার পর আমি তাঁকে ঈর্ষা করছি। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আরোপিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ আমরা মেনে নিয়েছি। আমরা নিজেদের সম্পাদকীয় বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী কাগজ ছাপছি না। কাগজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে গেলে এছাড়া কোন উপায় নেই। সরকারী নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করলে কাগজ "বেআইনীভাবে" গোপনে ছেপে গোপনে প্রকাশ করতে হয়। কোন ব্যক্তি বা গুটিকয়েক লোকের গোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। কোন রাজনৈতিক দলই একাজ পারে যদি জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে তারা লড়াইয়ে নামবে বলে ঠিক করে।

কিন্তু জ্যোতির্ময় দত্ত জরুরী অবস্থা ও সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে যা ছেপেছেন সেই বস্তু যেমন চাঞ্চল্যকর, তেমনি তাঁর এই সাহসও বিস্ময়কর। সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্তের মতই "কলকাতা" কাগজের গতিবিধি কেউ জানে না। অধিকাংশ বাংলাভাষীর কাছে এই কাগজের নাম অপরিচিত। কাগজটি মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাম্মাষিক, না বার্ষিকী কিছুই জানবার উপায় নেই, হঠাৎ হঠাৎ ধূমকেতুর মত উদয় হয়। এর খরচ জোগায়ই বা কে ? অকস্মাৎ এই কাগজের তথা জ্যোতির্ময় দত্তর এই বেপরোয়া সাহসিকতাই বা কেন ?

জ্যোতির্ময় দত্ত বি এ পাশ করে ডি এ জি পি টি-তে কেরানীগিরি করতে ঢোকেন বহু বছর আগে। তিনি এম এ পড়েন নি, কারণ "বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ে তারা মূর্খ, যারা পড়ায় তারাও মূর্খ।" তারপর এই পণ্ডিতম্মন্য শ্বশুরের পৃষ্ঠপোষকতায় স্টেটসম্যানে চাকরীতে ঢোকেন। "ব্যক্তি স্বাধীনতা" ও "গণতন্ত্রের পূজারী" এইসব সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে যা হয় জ্যোতির্ময় দত্তের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। অতঃপর তাঁর "গণতন্ত্রের পীঠস্থান" আমেরিকা ভ্রমণ সমাপ্ত হয়। এরপরই গোল বাধে। আমেরিকা ফেরত জ্যোতির্ময় দত্ত স্টেটসম্যান-কর্তৃপক্ষের কাছে পদোন্নতির দাবী করেন। দাবী অস্বীকৃত হতে তিনি স্টেটসম্যানের চাকরী ছেড়ে দেন।

এরপর জ্যোতির্ময়ের ভোল বদল। দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ নিয়ে ময়লা পোষাক পরে খালিপদ জ্যোতির্ময়কে এখানে সেখানে দেখা যায়। তিনি প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি সারেন নাকি রাস্তার পায়খানায়। আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ। এবং আনন্দবাজারের সঙ্গেও বহুকাল ধরেই। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কাগজে লিখে তিনি মোটা টাকা পান। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজে প্রকাশিত ওড়িশাবাসীদের সম্পর্কে যে-সম্পাদকীয় মন্তব্যের জন্য বাঙ্গালী-নির্যাতন শুরু হয়েছিল সেটির রচয়িতা জ্যোতির্ময়। জ্যোতির্ময় কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর এবং তাঁর স্বর্গত শ্বশুরমশায়ের পশ্চিমীপ্রীতি সুবিদিত।

জ্যোতির্ময় একজন আধুনিক কবি। অধিকাংশ তথাকথিত আধুনিক কবিদের মত তিনিও চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং আত্মকণ্ডুয়নে অভ্যস্ত—দেশ, দেশের সমস্যা ও দেশের মানুষ সম্পর্কে কোনকালেই তাঁর কোন মাথাব্যথা হয়নি। তাই হঠাৎ "কলকাতার" বিশেষ রাজনৈতিক সংখ্যা প্রকাশ করে গণতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বেগ অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। ২৬শে জুন জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরবর্তী কালের বহু "চাঞ্চল্যকর" ও "অপ্রকাশিত" তথ্য এ সংখ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব কি প্রকৃত গণতন্ত্রপ্রেম, না মতলববাজি অথবা শ্রেফ পাগলামি ?

এন এল সি সি সংবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেস হাই কমাণ্ড সাম্প্রতিক এক নির্দেশে এন এল সি সিকে আই এন টি ইউ সির আওতার বাইরে থেকেই আলাদা ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন।

এ আই সি সির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ও লেবার এ্যাফেয়ার্সের ভারপ্রাপ্ত শ্রীআজিজ ইমাম এক পত্রে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

কিছু দিন আগে কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া পাটনা থেকে ফেরার পথে কিছুক্ষণের জন্য কলকাতায় অবস্থান করেন। সেই সময় এন এল সি সির নেতারা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। দেবকান্তবাবু যখন দিল্লী ফিরে যান তখন একই বিমানে লক্ষ্মী বসু, পঙ্কজ ব্যানার্জী ও বারিদবরণ দাস দিল্লী যান এন এল সি সির ব্যাপারে উচ্চপর্যায়ে কথা বলতে।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সামাজিক চরিত্রহীনতার সংকট

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

হেগেল তাঁর ইতিহাসের দর্শনে ভারতীয় সভ্যতার প্রবণতা প্রসঙ্গে বলেছেন, ভারতীয় মানস এমন এক সৌন্দর্যস্বপ্নে অনুপ্রাণিত হতে অভ্যস্ত যাতে সকল রুক্ষতা, কর্কশতা এবং স্ববিরোধিতা লুপ্ত হয়, ব্যক্তির সঙ্গে বৃহত্তর সমাজজীবনের বিভিন্ন সম্বন্ধঘটিত বাস্তব অস্তিত্বের জটিল সমগ্রতা গৌণ হয়ে পড়ে। 'হিন্দুরা' ঈশ্বর-জ্ঞানে পিঁপড়েদেরও মাড়াতে চায়না, কিন্তু দরিদ্ররা ক্ষিধের জ্বালায় শেষ হয়ে গেলেও তারা সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকে। আমাদের ইতিহাস এবং জীবনের দিকে তাকালে হেগেলের উক্তির সত্যতা কি আমরা অনুভব করিনা? অবিশ্যি ভারতবর্ষের জটিল সত্যতা ও সমাজ সম্পর্কে আপ্ত-বাক্যের উচ্ছ্বাস যেমন, তেমনি সমাজ-তাত্ত্বিক সরলীকরণও সমান মারাত্মক, ম্যাক্স ওয়েবর-এর মত পণ্ডিত ব্যক্তিও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অপাঠ্য, হাস্যকর বই লিখে যখন চূড়ান্ত বিচার-বিভ্রান্তির উদাহরণ দিতে পারেন, তখন তাঁদের যে কোনও প্রশ্নেই সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে, কুৎসিত-তম লোভে, হীন স্বার্থপরতায়, সামাজিক নীতিহীনতার নির্লজ্জ ব্যভিচারে আমাদের অস্তিত্ব যখন কলুষিত, সমাজের সৎ, বিবেকবান মানুষেরা চারদিক থেকে শিকারীর তাড়া-খাওয়া অসহায় ভীরু প্রাণীর মত অবসাদ ও নৈরাশ্যের অন্ধকার কোণে অপমানিত জীবনের গ্লানিতে, বিষাদ শূন্যতার বোঝায় মুহ্যমান, সামাজিক নীতিহীনতার এক একটি আঘাতে তাঁদের বুকের রক্ত ঝরছে, তখন যতই দুরূহ ও বিপজ্জনক হোক, দেশের সভ্যতা ও সমাজ ঘটিত সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ লোক-দেরও মাথা না ঘামিয়ে উপায় থাকে না, অতীত ও বর্তমান জড়িয়ে আমাদের যে অস্তিত্ব (ভবিষ্যতের কথা এখন থাকুক) তার সম্বন্ধে ভাবতে হয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে য়ুরোপীয় সভ্যতার সমাজ-কেন্দ্রিকতার তুলনায় ভারতবর্ষের সভ্যতার সামাজিক বোধের দৈন্য বোধ হয় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। য়ুরোপের চিন্তার জগতে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সমস্ত হুকে সামাজিক কর্ম-কাণ্ডময় বাস্তব জীবনের দায়ভাগ নানাভাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। নির্বিশেষ অদ্বৈতের ধারণায় ভারতীয় অধ্যাত্ম বিশ্বাসের পারমার্থিক শক্তি এবং ইন্দ্রিয়-জগতের দ্বৈততাকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা প্রতীচ্যের ধর্মবিশ্বাসে আমরা দেখি না। কখনও হয়ত বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রতার দিকে ঝোঁক পড়েছে, যেমন সেন্ট অগাস্টিনে, কখনও বা পার্থিব জীবন বিষয়ে আদিম পাপবোধঘটিত নৈরাশ্য তীব্র হয়েছে যা প্যাস্কালে দেখি; কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁদের কাছেও নিছক মায়ার অধ্যাস ছিল না: কাসিরের ঠিকই বলেন, দ্বন্দ্বময়তাই যে মানব অস্তিত্বের মৌল ভিত্তি তা প্যাস্কালের চিন্তায় স্বীকৃত। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা টমাস একুইনাস ও অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিন্যাসে ঐ দুই জগতের সমন্বয় সাধনে ধর্মতত্ত্ববিশ্লেষণের মনীষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই রেখে গেছেন। সামাজিক পুরুষার্থবোধের অনু-প্রাণণায়ই একটি রচনায় তিনি বলেন: প্রকৃতির প্রয়োচনায়ই মানুষ সমাজে বাস করে, কারণ তার জীবনের জন্যই এমন অনেক জিনিসের প্রয়োজন যা একাকী তার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সে যার অংশ এবং যার ওপরই তার প্রকৃত মঙ্গল নির্ভরশীল, সেই সমাজ দ্বিতীয় প্রয়োজনেও, যাতে সে শুধু বাঁচতে নয়, ভালভাবে বাঁচতে পারে তার জন্যেও তাকে সাহায্য করে: সামাজিক সংযোগ-জাত সুযোগ সুবিধায়ই তা লভ্য। পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথে নানা দ্বন্দ্বজটিলতায়, বিকাশের গতিময়-তায় য়ুরোপীয় সভ্যতা যেভাবে সচল থেকেছে সমাজসচেতনাই কি তার কারণ নয়!

ভারতবর্ষের ধর্মসাধনায় ব্যক্তির মোক্ষলাভই অন্বিষ্ট, সেখানে কর্ম-কাণ্ডশ্রয়ী সামাজিক পুরুষার্থ বিশেষ স্থান পায় নি। এদেশে বিমূর্তনের ক্ষমতা এবং তার প্রতি আসক্তি সর্বগ্রাসী আধিপত্য বিস্তারে, বাস্তব দ্বন্দ্বসংঘাতহীন মসৃণতায় আশ্চর্য-ভাবে নিরংকুশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তৃণ-তরুলতা পশুপক্ষী থেকে আরম্ভ করে মানুষের মধ্যে সর্বত্রই এক বিরাট নিখিলপ্রাণ স্পন্দিত, ভারতীয় মনীষী-কবিদের অদ্বৈত ঈশ্বরের সেই সৃষ্টি-গত বিস্তারের ধ্যান ও কল্পনার সৌন্দর্য, তার থেকে উৎসারিত শান্তির এষণা ও সর্বজীবে কারুণ্যের ঐশ্বর্য মানব সভ্যতার অতুলনীয় সম্পদ। কিন্তু একথা কি করে অস্বীকার করি, এই বোধ বিমূর্ত চিন্তাকল্পনার বিশুদ্ধতায় যতটা আবদ্ধ থেকেছে, ততটা চলিষ্ণু সমাজসক্তি হয়ে দাঁড়ায় নি। বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার প্রতি অত্যধিক আশক্তির ফলে এদেশে আত্মপ্রবঞ্চনা সহজেই মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা আদর্শের বর্ণাঢ্য, মনোরম বাক্যজাল রচনা করেছি, কিন্তু তার সবল সংগ্রামনিষ্ঠ সামাজিক দায়িত্বপালনে অপরাগ হয়েছি। সামাজিক বিবেকবোধ-বর্জিত ধর্মের খোলসে ট্রাইবল্ ক্রিয়াকর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের মত্ততায় ও আত্মস্বার্থসন্ধানী নির্বিচার প্রথাপালনের মনুষ্যত্বহীন অন্ধতায়, সংস্কারের অভ্যাসিকতায়, অদৃষ্টের ওপর অসহায় নির্ভরতার ক্লীবত্বে আমাদের সমাজ যে কিভাবে ক্লেদ ও পংকিলতার কুণ্ডে নিমজ্জিত থেকেছে, সে সম্বন্ধে কোনও জিজ্ঞাসাই উনবিংশ শতাব্দীর আগে দেখা দেয়নি। ভারতবর্ষ য়ুরোপের মত অবিশ্বাসীদের পুড়িয়ে মারে নি, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য লোলুপ হয়নি কোনও দিন; কিন্তু অন্যদিকে, সংহত রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে উদাসীন অক্ষম, বাইরের শক্তির ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় এই দেশ দিনের ভেতরেই গুটিয়ে গিয়ে যে ক্রুর নির্মম বর্ণবৈষম্যের নাগপাশে, এক বিচিত্র হীনতায় তার সমাজের একটি বৃহৎ অংশের মনুষ্যত্বের, আত্মমর্যদাবোধের তিলে তিলে নিঃশব্দে অসাড় মৃত্যুর যে নিখুঁত ব্যবস্থা করে রেখেছিল তা কি কম মর্মান্তিক।

সামাজিক ও সমাজসংগঠনের চৈতন্য ভারতবর্ষে গড়ে ওঠেনি, তাই বার বার বিদেশী আক্রমণে শোচনীয় ভাবে লাঞ্ছিত হলেও ট্রাইবল্ স্বার্থ-চেতনায়, ধর্মীয় বিরোধে, রাষ্ট্র ও সমাজনৈতিক চেতনাবর্জিত সামন্ত-তান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক শক্তির নেতা-দের আত্মস্বার্থ সর্বস্বতায় খণ্ডিত এই দেশ নিজের অস্তিত্বের সমস্যা সম্বন্ধে কোনও আত্মানুসন্ধানী জিজ্ঞাসায়ই বিচলিত হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে, যে দেশে এত জটিল শাস্ত্র-বিচার, ক্ষুরধার নৈয়ায়িক বুদ্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চলেছে, এমন কি জড়বাদী য়ুরোপকে তাক লাগিয়ে দেবার মত কামকলার ব্যাখ্যানের, নারীদেহের উপভোগ্য-তার খুঁটিনাটি বর্ণনার উৎসাহ ও পারঙ্গমতারও অভাব ঘটেনি, সেই দেশ তার চিন্তাভাবনা এবং বিদেশী আক্রমণে, যথেচ্ছ উৎপীড়নে, অবাধ লুণ্ঠনে আহত, রক্তাক্ত অস্তিত্বের অসঙ্গতি বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

আর আমরা যখন আমাদের বর্তমান জীবনের দিকে তাকাই, তখন কি আমাদের অস্তিত্বের সেই মৌল অসংগতি, সামাজিক চরিত্র-হীনতাকে দুর্বিষহ অভিশাপ বলে মনে হয় না? নিয়তম সামাজিক নীতিবোধ, সভ্য দেশের সামাজিক জীবনাচরণের যুক্তিসিদ্ধ হক আমরা কতটুকু মেনে চলি, আমাদের চিন্তায় আচরণে, বৃহত্তর মানবসম্বন্ধের ক্ষেত্রে? কিছুটা পরিমাণে ট্রাইবল্, আধা গ্রাম্য, আধা শহুরে প্রভৃতি উপাদানের জগাখিচুড়ি সাবেশে আমরা এক একজন ভালগোল পাকানো চরিত্র, আমাদের চিন্তায় ও আচরণে প্রতি পদে অসংগতি, বিরোধ, ভাবের ঘরে এত চুরি। একদিকে জপতপ, দানধ্যান, পূজা, বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান, গুরুসেবায় নিষ্ঠা, অন্যদিকে পার-লৌকিক সদ্গতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নীচ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেপরোয়াভাবে সামাজিক নীতি-লঙ্ঘন ও সমাজের ক্ষতিসাধন—এই-ভাবে অস্তিত্বকে দ্বিখণ্ডিত করে এবং এই বিরোধ সম্বন্ধে কিছুমাত্র যন্ত্রণা-সচেতন না হয়েই আত্মপ্রবঞ্চনার নির্দ্বন্দ্ব, নিরঙ্কুশ স্বর্গে স্থিতিলাভ—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ বঞ্চনা কি কুষ্ঠক্ষতের মত নিঃশব্দে, এক বিচিত্র অসাড়তা অথচ ভয়াবহ, অমোঘ নির্মমতায় আমাদের অস্তিত্বকে কুরে কুরে খাচ্ছে না? আর সমাজের মুষ্টিমেয় যে কজনের জাগ্রত বিবেকে, প্রকৃত আত্মসচেতনায় এই পচন ধরা পড়ে, তীব্র জ্বালায়, নিষ্ফলতার যন্ত্রণায় মাথা কুটে মরা ছাড়া তাঁদের আর কি উপায় আছে, উইন্ড্‌হ্যাম লুইসের উপন্যাসের নায়কের মত প্রবল পৌরুষের যন্ত্রণায় নিজের আত্মাকে অভিশপ্ত, দগ্ধ করার ক্ষম-তাও বোধ হয় তাঁদের নেই।

হ্যাঁ, আমাদের সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বঞ্চনার হীনতা। ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীদের মধ্যে রেনে-সাঁসের মার্চেন্ট প্রিন্স কিংবা উন-বিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের এন্টার-প্রাইজারদের বিশেষ দেখা যায় না, তাঁরা উমিচাঁদের মত নিকৃষ্ট ধরণের দালাল এবং ফাটকাবাজ মাত্র। এদেশের ব্যবসায়ীরা বিশেষ বিশেষ পর্বে দরিদ্রনারায়ণের সেবায়, দেব-মন্দির ধর্মশালা প্রতিষ্ঠায়, গুরুসেবায় পুণ্যার্জনে তৎপর, অন্যদিকে খাদ্য-বস্তুতে, ওষুধে ভেজাল দেবার মত মারাত্মক সামাজিক অপরাধ অনু-ষ্ঠানে অকুণ্ঠ। নিয়তম পরিমাণে সামাজিক দায়িত্ববোধটুকুও তাদের নেই। আড়াল থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতির পুতুলনাচের খেলার সুতো ধরে টানেন এমন এক ভারত-বিখ্যাত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী পরি-বারের এক কারখানার কর্মীর কাছে শুনেছিলাম, তাঁদের কর্মক্ষেত্র প্রতি-ষ্ঠান চলে ঠিক জমিদারী কায়দায়, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মালিকদের কারুর বাড়িতে এলে তাঁদের আগমন বার্তা এভাবে ঘোষিত হয়: অফিস কা নোকর আয়া। এই কার-খানাটিতে শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলোও ছিল না, একদিন মেসিনের দাঁতে একজন শ্রমিকের একটা হাত সম্পূর্ণ কেটে যায়। পরের দিন পুরোহিত এলেন, তিনি যন্ত্রদানবদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন, ফুল-বেলপাতা গঙ্গাজল ছিটোতে লাগলেন, দুর্ঘটনা নিবারণের কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গ্রহণে কারুর মাথাব্যথা দেখা গেল না। সত্য সেলুকাস বিচিত্র এই দেশ।

ধূর্ত ব্যবসায়ী ইংরেজ আমাদের হাড়ে হাড়ে চিনেছিল, তাই এদে-শের সর্ববিধ ধর্মীয় ট্রাইবল্ সংস্কার ও প্রথা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ব-বোধহীন জমিদারি ধাঁচ ও মনো-ভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে তার শাসনের শক্ত, মজবুত বনেদ তৈরী করেছিল। আজও কি তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে? এই দুর্ভাগা দেশে নিম্ন-পদস্থ কর্মচারীটি থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই এক একজন মনিব, যে যেখানে যতটুকু ক্ষমতা পেয়েছেন তা নিজেদের জমিদারির অধিকার বলেই ভাবতে অভ্যস্ত। সামাজিক কর্তব্যপালনের চেতনা ছিটেফোঁটাও তাঁদের মধ্যে নেই। তাঁরা সভ্যদেশের নিয়মানুযায়ী অপ-রের জন্য বিধিসম্মত কাজ করতে গিয়ে কর্তব্যের তাগিদ অনুভব করেন না, অনুগ্রহ বিতরণের স্পর্ধিত মনোভাবই দেখান। কোনও না কোনও ভাবে স্বার্থসিদ্ধিতে সাহায্য না করলে, পরিচয়ের সূত্র অথবা ক্ষমতাবানের সুপারিশ না থাকলে অতি সাধারণ, তুচ্ছ কাজগুলোর জন্যই এ দেশের সাধারণ মানুষদের যে হয়রাণি, অপমান, দুর্ভোগ এবং বর্বর আচরণের সম্মুখীন হতে হয়, তা বোধহয় য়ুরোপীয় দেশগুলোতে অকল্পনীয়। অন্যদিকে আমাদের মধ্যে সংকীর্ণ ট্রাইবল্ সংস্কার, গোষ্ঠী-চেতনা, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ এমন ভাবে কাজ করে যে সেই সূত্রে সর্বপ্রকার অন্যায় সুযোগ সুবিধা দিতেও আমরা পশ্চাদপদ নই। আপনি সাধারণ কাজে অফিসে হাসপাতালে, স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্পোরেশন মিউনিসি-প্যালিসিটিতে যান, দেখবেন সেই জনারণ্যে নাগরিক, সামাজিক মানুষ হিসেবে আপনি কোনও স্বীকৃতিই পাবেন না, এক একটি বাধায় ঠোক্কর খেতে খেতে আপনাকে বিধ্বস্ত হতে হবে। কিন্তু সেখানে যদি কারুর সঙ্গে আপনার সাধারণ পরিচিতি বা সম্বন্ধের যোগসূত্র

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

স্বীকারোক্তি (৩)

লাতিন আমেরিকায় সি আই এর কার্যকলাপ

জন গেরাসি

গেরাসি ঃ আপনি কি মনে করেন একজন সি আই এ অফিসার যিনি দাঙ্গা বাঁধানোর জন্যে মিথ্যা দলিল ও ইস্তেহার তৈরী করেন যাতে পঞ্চাশ জন নিরপরাধ বিরোধী মারা যায় ও একজন এস এস অফিসার যে পঞ্চাশ জন ইহুদীকে হত্যার আদেশ দেয় এদের মধ্যে কোন গুণগত তফাৎ আছে ?

এগি ঃ হ্যাঁ, নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা তফাৎ আছে। তাছাড়া সি আই এ অফিসাররা হত্যাকারী নয়।

গেরাসি ঃ এস এস নেতারাও নয়। আর নিষ্ঠুরতা, নির্যাতনের আদেশ সম্পর্কে কি বলেন ?

এগি ঃ ষাট দশক থেকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন লাতিন আমেরিকার সর্বত্র ফ্যাসিস্ত একনায়কত্ব—বলিভিয়া চিলি উরুগুয়ে ব্রাজিল—অতএব একজন সি আই এ অফিসারের পক্ষে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। সে হয়ত ইলেকট্রোশকের হাতল ঘোরাচ্ছেনা, কিন্তু সে যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়েছে। স্থানীয় নির্যাতনকারী শিক্ষা দিয়েছে, টাকা দিয়েছে, অনেক সময় এমন কি চাক্ষুষ করেছে এবং নিশ্চয় যোগাযোগ রেখেছে। কিন্তু সে নিজেকে টেকনিসিয়ান মনে করে।

গেরাসি ঃ অর্থাৎ আপনি মনে করেন সাধারণ সি আই এ অফিসার "শত্রু"কে গুলী করতে অস্বীকার করবে, কিন্তু তাকে "শেষ" করার আদেশ দিতে পারে।

এগি ঃ হ্যাঁ আর আমি মনে করি তফাৎটা গুরুত্বপূর্ণ। বি-৫২ পাইলটের মত যারা ভিয়েতনামী শিশুদের ওপর গাদা গাদা বোমা ফেলতে পারে, কিন্তু কাউকে সামনা সামনি গুলী করতে পারে না। অর্থাৎ তার মধ্যে এখনও মানবতার স্ফুলিংগ আছে—যাকে আমরা বাড়িয়ে তুলব।

গেরাসি ঃ আপনি বলছেন অধিকাংশ সি আই এ অফিসার যদিও নিরপরাধ লোকদের খতম বা তাদের ওপর নির্যাতনের আদেশ দিয়েছে তা এখনও শোধরানোর বাইরে নয়।

এগি ঃ ঠিক তাই। কারণ আমি জানি দুজন বা তিনজন বা পঞ্চাশ জন এই মুহূর্তে তারা কি করছে সেই সম্পর্কে হয়ত নতুন করে ভাবছে, হয়ত তারা ছেড়ে দেবার মুখে, তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমার মতই বই লিখবে। আমি আশা করি আমার বই এইসব অফিসারদের এই কাজে উৎসাহ দেবে। আমরা যদি সি আই এর লোকদের অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য আলকোহলিক্স্ অ্যানোনিমসের মত সংগঠন তৈরী করতে পারি। কল্পনা করুন। আমরা কি মানবিক অগ্রগতি অর্জন করতে পারব, অন্ততঃ মানুষের চেতনার ক্ষেত্রে যদি ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স্ দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, চিলি, গুয়াতেমালা সম্পর্কে, ইরাণের শাহ-র অত্যাচার, কঙ্গো, ঘানা, গায়না সম্পর্কে যদি সি আই এ বই থাকত। এখন ওয়াটারগেটের উদ্ঘাটনের মধ্যে দিয়ে আমেরিকানরা খানিকটা বুঝতে পেরেছে আমাদের সরকার কি ধরণের কৌশল নিয়ে থাকে, কল্পনা করুণ পৃথিবীর সমস্ত দরিদ্র দেশে সেই একই সরকারের সেই একই (অনেক বেশি বিষাক্ত উদ্ঘাটন) কৌশল থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই আমার আশা যে, অন্যান্য সি আই এ অফিসাররা এখন সরব হবে।

গেরাসি ঃ আপনি মনে করেন না আপনার কিউবা ভ্রমণের ফলে সেই অফিসাররা এখন ঘুরে যাবে না।

এগি ঃ একেবারেই না।

গেরাসি ঃ প্রথম কথা আপনি কি করে কিউবা গেলেন ?

এগি ঃ আমার ফরাসী প্রকাশক ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যাতে সেখানে আমি কিছু গবেষণার কাজ করতে পারি।

গেরাসি ঃ তারা আপনাকে ঢুকতে দিল কেন ?

এগি ঃ তারা ভাবল আমার বই কাজে লাগবে।

গেরাসি ঃ নিশ্চয়, কিন্তু আপনি একজন নিযুক্ত ব্যক্তিও হতে পারতেন।

এগি ঃ নিশ্চয়, সেকথা তারা ভেবেছিল।

গেরাসি ঃ আপনার কোন সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ? ওদের গোয়েন্দা সংস্থা আপনার কাছ থেকে কথা বার করতে চেয়েছিল ?

এগি ঃ না।

গেরাসি ঃ কে জি বি কি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল ?

এগি ঃ না। তাছাড়া ইতিমধ্যে আমার তথ্য অনেক পুরনো হয়ে গেছে।

গেরাসি ঃ মানে, আপনি যাদের নাম করেছেন তারা সব নিখোঁজ ?

এগি ঃ জানি না, কিন্তু তাদের কার্যকারিতা এখন সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

গেরাসি ঃ আপনি একজন এজেন্টের নাম, পরিচয় পরিবর্তন করতে এবং তাকে বদলী করতে পারেন না ?

এগি ঃ সেটা খুব সহজ নয়। স্ত্রী ছেলেমেয়ে বন্ধুরা আছে তারা ঝামেলা করবে।

গেরাসি ঃ আপনার বইয়ে কি আছে সেকথা জানলে কে জি বি-র কাজে লাগবে ?

এগি ঃ ওদের নাম—এবং মেক্সিকোর ঐ সাঁইত্রিশ জন এজেন্টের তালিকা দেওয়ার কারণ—এবং আমরা এ কাজ আরও করতে যাচ্ছি—সি আই এ যতদূর সম্ভব অপদার্থ করা যায়। আমেরিকা-বিরোধী সংস্থারূপে, কথাটার প্রকৃত অর্থ সি আই এর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

গেরাসি ঃ তাহলে আপনার বই কে জি বি কে সাহায্য করছে ?

এগি ঃ সম্ভবতঃ আমার উদ্দেশ্য তা নয়।

গেরাসি ঃ আপনি আপনার বইয়ে বলেছেন কিভাবে বিভিন্ন সময়ে আপনার কাজ ছিল কে জি বি এজেন্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা।

এগি ঃ হ্যাঁ, উরুগুয়ে ও মেক্সিকোতে আমার অন্যতম কাজ ছিল যোগাযোগের, মানে শত্রুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা। মন্টিভিওতে কয়েকজন কে জি বি অফিসার একজন চেক গোয়েন্দা বিভাগের লোক ও একজন রোমানিয়ানের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রেখেছিলাম। মেক্সিকোতে আমি একজন কে জি বি ও একজন জি আর ইউ (সোভিয়েত সামরিক গোয়েন্দা) অফিসার উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম।

গেরাসি ঃ এইসব যোগাযোগের ফলে কি আপনার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে ?

এগি ঃ না। একমাত্র স্থানীয় সরকারের রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন রাজনীতি নিয়ে আমরা প্রায় আলোচনাই করতাম না।

গেরাসি ঃ তাদের আপনার ভাল লেগেছে ?

এগি ঃ হ্যাঁ, মেক্সিকোতে তাদের মানুষ হিসেবে আমার ভাল লেগেছে। মন্টিভিডিওতে আমি বড় বেকায়দায় ছিলাম কারণ জায়গাটা আমার কাছে নতুন।

গেরাসি ঃ এমন ব্যবস্থা করা যায় না যে, যে-পক্ষ ইউ এস-কে সমর্থন করে সি আই এ শুধু তাদেরই সমর্থন করবে ?

এগি ঃ যদি তাই চান, কিন্তু যে-পক্ষ ইউ এস-কে সমর্থন করে তারাই স্থানীয় দেশগুলোকে শোষণ করার জন্য ইউ এস কর্পোরেশনদের সঙ্গে চুক্তি করে।

গেরাসি ঃ সেটা কি মেক্সিকোতে ?

এগি ঃ হ্যাঁ, মেক্সিকোতে সরকার আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে। প্রেসিডেন্ট লোপেজ মাটেস ও ডিয়াজ অরডাজ সি আই এর এত ঘনিষ্ট ছিল যে, উইনস্টোন স্কট যিনি উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে উনসত্তর সাল পর্যন্ত সি আই এর স্টেশন চীফ ছিলেন, যখন আবার বিয়ে করলেন তখন লোপেজ মাটেস (তৎকালীন প্রেসিডেন্ট) ও ডিয়াস অরডাজ (তৎকালীন গৃহমন্ত্রী) দুজনে সাক্ষী ছিলেন।

গেরাসি ঃ মেক্সিকো সরকার সি আই এর সঙ্গে এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখত কেন ? নিশ্চয় তার টিকে থাকার জন্য দরকার নয়, দরকার কি ?

এগি ঃ হ্যাঁ দরকার। মেক্সিকোতে এত বেশি চরম অত্যাচার হয়েছে যে, বিদ্রোহ প্রচন্ড, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। এসব কাগজে বেরোয় নি, কিন্তু আমরা তার খবর জানি। সি আই এর সাহায্য ছাড়া মেক্সিকোর গোপন পুলিশ ও নির্যাতনী যন্ত্র তা দমন করতে পারত না। আমি বলছি না যে সি আই এর সাহায্য ছাড়া লোপেজ মাটেস গদীচ্যুত হতই, কিন্তু তার পক্ষে খুব সঙ্কট দেখা দিত।

গেরাসি ঃ এই সাহায্যের বিনিময়ে সি আই এ কি পেয়েছে ?

এগি ঃ লোপেজ মটেজ ও ডিয়াজ অরডোজ উভয়েই (বর্তমান প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়া সম্পর্কে আমি জানি না) আমাদের জন্য টেলিফোনে আড়িপাতা, চিঠিপত্র খুলে দেখা এবং কিউবা যাবার সমস্ত ব্যবস্থাদি নিয়ন্ত্রণের আদেশ দিয়েছিলেন। যারা হাভানা যাচ্ছে তাদের যাত্রার আগে সি আই এ ছবি, আঙ্গুলের ছাপ তুলত আর কাগজপত্র পরীক্ষা করত। আমরা যখন কাউকে যেতে দিতে চাইতাম না—আমার মনে আছে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ইউ এসের পাঁচজন নয়া বামপন্থীর বেলায় যা ঘটেছিল—তাদের অপেক্ষমান গাড়িতে তুলে পাচার করা হয়েছিল, অবশ্যই বেআইনী ভাবে, আমেরিকার সীমান্তে যেখানে তাদের এফ বি আইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের ঘটনা বহুবার ঘটেছে। মনে আছে আমি শেবারলেনেসিয়ানকে ফোন করতাম আর বলতাম, "আমি অমুক লোককে যেতে দিতে চাই না," আর সে যেত না।

গেরাসি ঃ আর এসব উদ্ঘাটন করে, নাম বলে দিয়ে আপনি আশা করেন এসব বন্ধ হবে ?

এগি ঃ তা সত্যি।

গেরাসি ঃ কিন্তু আপনার এজেন্টদের কি হল ?

এগি ঃ তাদের বসিয়ে দেওয়া হবে।

গেরাসি ঃ এবং সম্ভবতঃ খতম ?

এগি ঃ আশা করি তারা দৈহিক বিপদে পড়বে না। সি আই এ কি ভাবে কাজ করে তা যদি আমি দেখাতে চাই তাহলে গল্পাকারে অথবা ভাসা ভাসা উপায়ে কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না। আমায় স্পষ্ট হতে হবে। আমায় এজেন্ট, অফিসার, ও অত্যাচারিতদের নাম এবং ঠিক কোন সময়ের ঘটনা বলতে হবে যাতে কোন সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি আমি যা বলছি খোঁজ নিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারে।

গেরাসি ঃ আমরা কিছুক্ষণ এই ধরণের অনুমান করি। সি আই এ অফিসার রূপে আপনি ইকোয়েডরে সমস্ত প্রধান কমিউনিস্টদের ফোনে আড়ি পেতেছিলেন। এইভাবে আপনি জানতে পারলেন যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে রেষারেষি আছে। আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, তাকে খানিকটা মদ খাওয়ালেন, তাকে বিশ্বাস করালেন যে, অন্যজন সম্পর্কে সে যদি কিছু বাড়তি খবর আপনাকে দিতে পারে তাহলে আপনি এই অন্যজনকে অভিযুক্ত করতে পারেন। এই অন্যজন যে খারাপ কমিউনিস্ট এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ এই ব্যক্তি, যে সরল কিন্তু আদর্শবাদী কমিউনিস্ট আপনার প্রয়োজনীয় খবর দিয়েছিল এবং আপনি অন্যজনের অভিযুক্ত

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

বিকারগ্রস্ত ছড়া

অনার্য মিত্র

মাথার বিকার

পশ্চাতে যার জনগণ
তাকে কে আর নড়ায়,
তবু সে কেন দু এক জনায়
বাঘের মতো ডরায় ?

বাঘ যদিও বন্দী খাঁচায়
তবুও ডর যায় না,
তবে কি বাঘ বাইরে আরো
কিংবা তারা হায়না ?

ভয়কে যিনি জয় করবেন
তিনিই ভয়ের শিকার।
কি জানি ভাই, মরণকালে
এ কোন মাথার বিকার।

বাহারী দৃশ্য

পাটনা ভাসিয়ে নিল বন্যা,
আকাশে উড়িল রাজকন্যা।
ইতি উতি ওড়ে, দুই ডানা তার
বাস্তুহারার মুখে দানাদার।

বন্যা পীড়িত বুকে হাহাকার,
কন্যা চাহিয়া দ্যাখে কি বাহার।
রাজপুত্রও আসে উড়িয়া
বাহারী দৃশ্য দ্যাখে ঘুরিয়া।

বেঁচে থাকার মর্ম

হাঁটি হাঁটি পা পা
আমার সোনা হাঁটে না,
কীনো রে সোনা হাঁটিস নে
তুই ক্যানো পা চাটিস নে।

পা চাটা তোর কর্ম
এই তো কলির বিধির বিধান
বেঁচে থাকার মর্ম।

মিছিল

প্রভাতকুমার গোস্বামী

মিছিলের দৈর্ঘ্য মাপি বিপ্লবের পথ
কখনও দূরত্ব বাড়ে
কখনও বা পৌঁছে যাই
তোরণ দুয়ারে।

ফুটবলের মাঠে খেলি
সাজানো ক্রিকেট
বারে বারে কট্ আউট।

আবার মিছিল সাজাই।

মালিকদের ছ্যাঁচড়ামির ফলেই মেটাল বক্স কারখানা খুলছে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মেটাল বক্স কারখানার মালিকপক্ষ আপোষ আলোচনার মাধ্যমে কারখানা খোলার পথ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। গত ছয়ই জুন থেকে কর্তৃপক্ষ একতরফা ভাবে এই কারখানায় লক-আউট ঘোষণা করেন।

মালিক পক্ষ থেকে লক-আউটের যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে যে, বর্তমান ব্যবসার বাজার মন্দা যাওয়ায় লে-অফ অথবা ছাঁটাই অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু ইউনিয়ন এ ব্যাপারে সম্মতি না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে কারখানা লক-আউট ঘোষণা করা হয়েছে।

কোম্পানীর বক্তব্য যে স্রেফ ভাঁওতা তা ব্যালেন্সসীট থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে যেখানে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি হয়েছিল ৪৫,৬৫।৫৪,৪০৮ সেখানে ১৯৭৫ সালে বিক্রি হয়েছে, প্রায় সাতান্ন কোটি টাকার জিনিস। শুধু তাই নয় বর্তমান বছরে মোট লাভের অঙ্ক গত বছরের তুলনায় সাতানব্বুই লক্ষ টাকা বেশী। এই হিসাব থেকেই স্পষ্ট হবে যে ব্যবসায় লোকসানের যুক্তি মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়।

মালিকপক্ষ প্রথমে ইউনিয়নকে প্রস্তাব দেয় যে, কারখানা চালু রাখতে গেলে মাসে আড়াই লক্ষ টাকা খরচ কমানো দরকার। এবং এটা করার জন্য তাঁরা চারশ পঞ্চাশ জন কর্মীকে ছাঁটাই করতে চান। অন্যথায় মাসে আটদিন কারখানায় লে-অফ চালু করা হবে। পোষাক পরিয়ে ছাঁটাইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে ভলান্টিয়ারী রিটায়ারমেন্ট স্কিম। এই স্কীম যাতে কর্মীরা মেনে নেন তার জন মালিক পক্ষ কর্মীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তারা এই স্কীম চালু করার ব্যাপারে রাজী নন।

এই অবস্থায় দোসরা জুন তিন দিনের লে-অফের নোটীশ এক্স নং কারখানার গেটে টাঙানো হয়। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মালিকপক্ষের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয় প্রস্তাবিত আড়াই লক্ষ টাকা বক্স সাশ্রয়ের ব্যাপারে ইউনিয়ন অন্য নানাভাবে সহাযোগিতা করবে। অগত্যা যদি লে-অফ করতেই হয় তবে তা সর্বস্তরেই প্রযোজ্য হোক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মোটা মাইনের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে লে-অফ প্রয়োগ করতে রাজী নন। অর্থাৎ এক কোটী ছিয়াশি লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের (ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাদে) ম্যানেজিং ডিরেকটরের ওপর কোম্পানীর দুর্দিনের (যদি হয়ে থাকে) কোন দায়দায়িত্ব বর্তাবে না, অথচ সর্বসাকুল্যে চার হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের কর্মীদেরকে কোম্পানীর স্বার্থে বলি দেওয়া হবে। খুবই সঙ্গত কারণে ইউনিয়ন নেতারা এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন নি।

এ পর্যন্ত শ্রমমন্ত্রীর ঘরে মালিকপক্ষের সঙ্গে বহু বৈঠক হয়েছে। একবার মুখ্যমন্ত্রীও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু মালিকপক্ষ সাসপেনসন ও ছাঁটাই-এর দাবীতে অটল। এমন কি এ ব্যাপারে তারা মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব মানতেও রাজী নন।

আলোচনা বৈঠকে মালিকপক্ষ এখন নিত্যনতুন অসম্মানজনক শর্তাদি আরোপ করতে শুরু করেছেন, যথা, যখন তখন ছাঁটাই করার বিরুদ্ধে ইউনিয়ন প্রতিবাদ করতে পারবে না। মেশিন থেকে মানিং কমিয়ে নিলেও উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। কোন রকম বিক্ষোভ আন্দোলন করা চলবে না।

এই সব তথ্যাদি পরিবেশন করতে করতে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বারবার উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিলেন। নেতৃবৃন্দ জোরের সঙ্গে বললেন, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগীয় দাসত্বের চুক্তিতে দাসখৎ দিতে পারব না। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় নেতৃবৃন্দের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সাড়ে তিন হাজার কর্মচারীর রুটি রুজির লড়াইয়ের দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রামেও ওঁরা ক্লান্ত নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত

মতামত

দুঃশাসনের পক্ষপুটে আশ্রয়গ্রহণকারী ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বাঙালীর গর্বের ধন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মর্যাদাশূন্য ও কলঙ্কিত করেই ক্ষান্ত হন নি। সংবাদে প্রকাশ (বিশ্ববিদ্যালয়ের) সিন্ডিকেট এবং পশ্চিম বাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন (ভাড়াটে নন) শিক্ষিত সমাজের প্রকাশ্য মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এই বিদ্যাপীঠকে তিনি দিল্লীর হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চালিয়েই যাচ্ছেন।

এমন একদিন ছিল যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে লন্ডনের বৃটিশ পার্লামেন্ট পর্যন্ত সম্মান দিতেন। আজ ব্যক্তিত্বহীন শ্রীসেন ও তাঁর কিছু সাকরেদ মিলে তার কি দুরবস্থা করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই তা জানা। আমি বলতে পারি, তাঁর দৃঢ়তার অভাব এবং ক্ষমতার লোভেই বৃহত্তর পশ্চিম বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির এই কেন্দ্রটি আজ একটি রাজনৈতিক দলের দুর্নীতিবাজ মস্তানদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

বিশ্বভারতী দিল্লীর দখলে যাওয়ায় তার যে সার্বিক অধঃপতন ও স্বাধিকারহীন ম্যাড়মেড়ে শ্রী হয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। "শিক্ষাবিদ" নামে পরিচয় প্রদানকারী ডঃ সেন সে অবস্থা দেখেও শিক্ষা নিতে অস্বীকার করছেন।

খণ্ডিত বাংলার জাতীয় জীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান এতই উচ্চে যে, এটির ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য নির্ধারণ শ্রীসেন বা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট, এমন কি বর্তমান রাজ্য বিধানসভাও এককভাবে করার অধিকারী বলে আমি মানি না। স্বাধীন সত্তা নিয়ে এই বিদ্যা-কেন্দ্রের অস্তিত্ব থাকা না থাকার সঙ্গে এই এলাকার ভাষা ও স্বাতন্ত্র্য চেতনারও গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

সুতরাং আমি দাবী করছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার প্রশ্ন উঠলে অবশ্য এখানে গণভোটের মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করতে হবে—সস্তা চালাকির দ্বারা নয়।

আয়েশা মহশীনা

বিদেশী ওষুধ কোম্পানীর ব্যবসা

সাপ্তাহিক দর্পণে বিদেশী ওষুধ কোম্পানীগুলো একজোট হয়ে কিভাবে আমাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ পড়ে মনে হচ্ছে নিজেই একমুঠো স্লিপিং পিল খেয়ে এদের হাত থেকে রক্ষা পাই।

সদাশয় সরকার আমাদের মত গরীবদের সস্তায় ওষুধ সরবরাহ করার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন খবরের কাগজ মারফৎ। কিন্তু এই সব বিদেশী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান সরকারকে কদলী প্রদর্শন করে দিব্য বহাল তবিয়তে এদেশে ব্যবসার নামে মুনাফার পিরামিড বানিয়ে যাচ্ছে। লাইফ সেভিং ড্রাগ উৎপাদনের ভণিতা করে আসলে দেখছি ওরা আমাদের লাইফটাই হেল করে দিচ্ছে।

হাতি কমিটি বসিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। হাতি কমিটি জাতীয়করণের সুপারিশ করেছে। কিন্তু যতদূর জানি, কেন্দ্রীয় রাসায়ণিক মন্ত্রক জাতীয়করণের ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এত ঘটা করে কমিশন বসানোর প্রয়োজনটাই বা কি ছিল?

অমল মজুমদার

স্বীকারোক্তি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

করেছিলেন। এরপর আপনি এই ব্যক্তিকে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সি আই এর এজেন্টরূপে থাকবার জন্য ব্লাকমেল করেন। এখন আপনার বই বেরিয়েছে এবং সে কাহিনী বলা হয়েছে। এ পর্যন্ত আমার অনুমান নয়, সত্য ঘটনার মধ্যেই রয়েছি যেহেতু আপনার বইয়ে এই ধরণের অনেক কাহিনী আছে। এখন অনুমান করছি ঃ এই ব্যক্তির কমরেডরা আপনার বই পড়ে তাকে চেপে ধরল এবং হত্যা করল। এটার খুব সম্ভাবনা। এ সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়? এ কাহিনী বলার ফলে আপনার সামনে কি নৈতিক সঙ্কট দেখা দিচ্ছে?

এগি ঃ না, আমার উত্তর চিলিতে দেখুন সি আই এর জন্য হাজার হাজার লোক খুন ও নির্যাতিত হয়েছে ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়াতে লক্ষ লক্ষ লোক খুন হয়েছে ১৯৬৮ সালে মেক্সিকোতে হাজার হাজার লোক খুন হয়েছে..

গেরাসি ঃ কিন্তু এটা ত আপনারই কাজ। এখন আপনি তার নাম করছেন, প্রকৃতপক্ষে আপনি তাকে খুন করছেন।

এগি ঃ সে যদি এজেন্ট হিসেবে এখনও কাজ করে তাহলে চিলির জুন্টাকে সি আই এ যে ধরণের তালিকা দিয়েছিল সেই ধরণের তালিকা তৈরি করতে সে সাহায্য করছে। এখন সে একটা কান্ড ঘটাবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। আমি যদি তাকে থামাতে পারি—

গেরাসি ঃ আপনি পারবেন। এবং এইভাবে চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আপনার?

এগি ঃ সম্পূর্ণ!

গেরাসি ঃ তাহলে আপনি এখনও সি আই এর কাছে বিপজ্জনক।

এগি ঃ হয়ত। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে, সি আই এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমরা এলোপাথারি বোমা ছুঁড়ছি না। আমরা ঠান্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করছি কে কি কাজ কোথায় করছে। এরপর স্থানীয় সরকার প্রগতিশীল সংস্থা ও জনগণই ঠিক করবে কি ভাবে এজেন্ট ও অফিসারদের নিষ্ক্রিয় করা যায়। ইতিমধ্যেই কয়েকটি গোষ্ঠী সেই সব অফিসারদের সাহায্য করতে পারে যারা নিজেরা যা ক্ষতি করেছে তা পুষিয়ে দিতে চায়। যেমন, ওয়াশিংটনে যেসব সি আই এ অফিসারদের মনে সন্দেহ আছে তাদের সেন্টার ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজের দ্বারস্থ হওয়া উচিত। যত উদ্ঘাটিত হবে, তত বেশি সংখ্যক অফিসার উদ্ঘাটিত করতে চাইবে। তারা যত বেশি উদ্ঘাটিত করবে সি আই এ সম্পর্কে কংগ্রেসের তরফ থেকে গুরুতর তদন্তের সম্ভাবনা বাড়বে।

যেমন আমেরিকার নাগরিকরা মনে করে তাদের ট্যাক্সের কিছু অর্থ এড পাবলিক সেফটি প্রোগ্রামকে টাকা জোগাতে খরচ হয়। তাদের বিশ্বাস যে, তৃতীয় দুনিয়ার মানুষদের ভালভাবে ও নিরাপদে থাকতে সাহায্য করার জন্য এইসব পাবলিক সেফটি প্রোগ্রাম। তদন্তে তাদের কাছে প্রমাণ হবে প্রত্যেক এজেন্সীর অফিসার যা জানে ঃ যে বে-আইনী আটক ও নির্যাতন সমেত সি আই এর সমস্ত গোপন কার্যকলাপের একটি ফ্রন্ট হল এড পাবলিক সেফটি প্রোগ্রাম। আমেরিকার শ্রমিকদের দেওয়া কঠিন পরিশ্রমের রোজগার যায় আমেরিকান ইন্সটিটিউট ফর ফ্রি লেবার ডেভেলপমেন্টকে সমর্থন করতে, যা শ্রমিকদের ধারণা দরিদ্র দেশগুলোর ইউনিয়নদের সাহায্য করে তাদের অধিকার রক্ষা করতে। যদি সি আই এ সম্পর্কে তদন্ত হয় তাহলে জানা যাবে এ আই এফ এল ডি একটি সি আই এ ফ্রন্ট, যার মারফৎ হত্যাকারী, প্ররোচনাকারী ও অভ্যুত্থান-সংগঠকদের টাকা পাঠানো হয়; যেমন এ আই এফ এল ডি-কে ব্যবহার করা হয়েছে চিলির অভ্যুত্থানের জন্য টাকা জোগাতে। যদি আমেরিকার জনসাধারণ এটা ও তাদের সঙ্গে সি আই এর অন্যান্য জুয়াচুরির কথা জানতে পারে— আমি নিঃসন্দেহ যে এমন প্রচন্ড হৈচৈ উঠবে যে কংগ্রেস সি আই এ ভেঙ্গে দেবে।

(সমাপ্ত)

শ্যামসুন্দর কলেজের অর্থ সমস্যা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

বর্ধমান জেলার রায়না থানার শ্যামসুন্দর এডুকেশন কাউন্সিলের খাস জমির জন্য বাৎসরিক প্রাপ্য টাকা সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে না পাওয়ার জন্য শ্যামসুন্দর কলেজের উন্নতিমূলক কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে এবং শ্যামসুন্দর এডুকেশন কাউন্সিলের রায়না থানা থেকে প্রাপ্য ভাড়া না পাওয়ার জন্য কলেজ কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে না। উনিশশো চুয়ান্ন সাল থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা শ্যামসুন্দর এডুকেশন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শ্যামসুন্দর কলেজ পাবে। কলেজের উন্নতির জন্য এবং পাওনা টাকা সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে পাওয়ার জন্য কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীদিলীপ কুমার রায় জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, (ভূমি) পুলিশ আরাধ্যক্ষ বর্ধমান সেটেলমেন্ট অফিসার (এ সার্কেল) নিকট লিখিত ডেপুটেশন দেন।

পুনর্মুদ্রণ

ট প লে স

নীলকণ্ঠ

কয়েকদিন আগে পর্যন্ত পৃথিবীর মাথাব্যথা ছিল, মেরিলিন, টেরিলিন ও বেরিলিন। এরাই ছিল চায়ের কাপে তুফান তোলার ব্যাপারে "টপ"। এখন এই মুহূর্তে সেই ঈর্ষাযোগ্য স্থান যে দখল করেছে তার নাম "টপলেস"। টপলেস মেয়ের বদলে টপলেস মেয়ের ছবি, দুধের অভাবে আমাদের যথেষ্ট ঘোল খাওয়াচ্ছে। জ্যান্ত টপলেস আমাদের কি খাওয়াবে, তা নিয়ে টপ টু বাটাম সবাই ভ্যাবাচাকা। কিন্তু এহ বাহ্য। মেয়েদের হসটেলে-এর সংগে পাল্লা দিতে ছেলেদের ঝোঁট চুল, মেয়েদের নাইকুন্ডু বার করা ছোট জামার [সবার উপরে (মেয়ে) মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই] সংগে পাল্লা দেওয়ার কারণেই ছেলেদের চেপা প্যান্ট, এখন মেয়েদের টপলেসকে ম্যাচ করতে কবে আবির্ভূত হবে ছেলেদের বটমলেস, তারই অপেক্ষায় সে আছে, যার নাম সভ্যতা।

আমাদের দেশেও টপলেস এলো বলে যাদের আশা। তারা জেনে রাখুন যে তাদের আশা কোনওদিন ফলবতী হবে না। কারণ ফিগারলেস-দেশের পক্ষে টপলেস কোনও আকর্ষণ নয়, বরং যেটুকু এখনও আছে, সেই মরীচিকাও অচিরেই মেলাবে। আর যাদের সাঁওতালি শরীরের টপের প্রয়োজন হয় না তারা স্মরণাতীত কাল থেকেই কোনওদিন ফ্যাসানের ক্রীতদাসী নয়; তারা চিরকাল প্যাসানের সম্রাজ্ঞী। ফুল ছাড়াই যেমন কোনও কোনও মানুষ স্বভাবের কারণেই বিউটিফুল, তেমনই সাঁওতালি মেয়ে জামা ছাড়াই যথেষ্ট উদ্ধত।

আমরা সভ্যতার বড়াই করি কিন্তু ফিরি করি অসভ্যতা; ওরা বন্য তাই লাবণ্য ওদের সর্বাংগে। আমরা রং করি ওরা রং ছড়ায়। আমরা সাজি; প্রকৃতি ওদের সাজায়। ম্যাক্সি ফ্যাকটার আমাদের জীবনে ম্যাক্সীমাম ফ্যাক্টার, প্রসাধনাই আমাদের প্রধান সাধনা। ওদের মেক-আপের হীনতা সহ্য করতে হয় না, কারণ ওদের মেকআপ বিহীনতা প্রকৃতি নিজের হাতে মেক-করে দেয়। টপ্ টু বাটাম্ আমাদের সব ধার করা; ফ্যাসানের তাগিদে টাইম টু টাইম, একটু আধটু এধার ওধার করা, এই মাত্র! আর ওদের চারধার খোলা,—ওরা বাধার ধার ধারে না। আমরা কালচারের শব; ওদের সব হচ্ছে,—নেচার! কালচারই আমাদের কাল হবে! আগামীকাল আবার "নেচার"!

কালচার্যাল টপ লেস থেকে টপলেস ন্যাচারালে প্রত্যাবর্তনেই হিসটরি, H I S Story repeats itself!

কিন্তু টপলেস কি কেবল মেয়েদের পরিচ্ছদেই এসেছে? না। জীবনের ও জগতের খাতার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ আজ টপলেস। মিডিওক্রিটির জয়যাত্রা আজ প্রতিভার পরাজয়বার্তা ছাড়া আর কি? সাহিত্যে যারা টপ আজ তাদের কারুর হতবার্ষিকীর কারুর চতুর্থ হতবার্ষিকীর শবের ওপর ভালচারের উৎসবে আমরা কাদের কণ্ঠস্বর শুনছি? তারা কারা? তারা ঘরেরও নয়, ঘাটেরও নয়; তলারও নয়, ওপরেরও নয়। তারা সিডিওকার। সাহিত্যে নয় শুধু, চিত্রে, চলচ্চিত্রে, রাজনীতিতে, সংগীতে, নাটকে অভিনয়ে, নৃত্যে, ভাস্কর্যে কোথায় নয়? কেবল দুর্নীতির ক্ষেত্রে ছাড়া? সেখানে টপ লেস নয়, ম্যাক্সিমাম। কালোবাজার, ভেজাল কারবার, ঘুষ বজ্জাতির! ক্ষেত্রে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে টপ-রা সব জাতের টপ বজ্জাতেরা আজ জুটেছে, ইন্ডিয়া দ্যাট ইস ভারতে। এই এক জায়গায় ভারত আজ লেস নয়, টপ!

এক সময় ছিল যখন ভারত কিছুতেই ভয় করত না এক অন্যায় করতে ছাড়া; এখন এক দুঃসময় এসেছে যখন ভারত সব কিছুতে ভয় পায়, এক অন্যায় করতে ছাড়া!

'ইন্ডিয়া দ্যাট ইস ভারত' এ য়্যাডমিনিস্ট্রেশান নেই; আছে ব্যাডমিনিস্ট্রেশান। এবং সেই দুঃশাসনের মূলে যারা, তারা আছে টপে। টপ হেভি ব্যাডমিনিস্ট্রেশান যত টপলেস হয় ভারতের পক্ষে ততই ভাল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলেও যত দলমাদোল সব ওপর তলায়। কমিউনিস্ট পার্টি—কংগ্রেসের বিকল্প দুঃশাসনও ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। র‍্যাংক এন্ড ফাইলের জন্যে নয়। টপ লিডারদের দূরদৃষ্টির অভাবে। কংগ্রেস আজ অথবা আগামীকাল যে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে সে অপসিসানের চাপে নয়, নিজেদের মধ্যে টপ পসিসান নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে। নেহরু যাবার পর, অতঃপর টপলেস কংগ্রেসের টপ টু বাটাম সবাই চেষ্টা করছে এ ওকে লেংগি দেবার। এই নিজেদের মধ্যে খেওখেয়িতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের অন্তিমদশা যদি ঘনায় তাহলে দেশের লোক যেদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে সেদিন কার কাছে কৃতজ্ঞ হবে তারা? টপলেস-এর কাছে নয় কি?

ইতিহাসে যত বিপ্লব আজ পর্যন্ত ঘটেছে তা কি বাটামের বিদ্রোহ নয়, দেশকে টপলেস করবার কারণে? ফরাসী দেশে ষোড়শ লুই, রাশ্যায় মহামান্য জার, এই দুই মাথা কাটা যাবার মধ্যেই কি বিপ্লব দীর্ঘজীবী-র জন্ম এবং এবং জয়যাত্রা নয়। টপে যারা আছে আর যারা আছে বাটামে, তাদের লড়ায়ে চিরকাল যারা মারা গেছে, সেই উলুখড় হচ্ছে মধ্যবিত্ত। মিডিল ক্লাস নয়; Muddle ক্লাস।

কবি বলেছেন ওরা কাজ করে। কারা? যারা নীচের মহল। তারা তাঁত বোনে, হাল ধরে, বীজ পোঁতে। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে এই বাটাম যারা, তারাই কেবল টিকে থাকে। কথাটা অর্ধসত্য। ওপরে যারা, তারাও চিরকাল আছে। তাদের নাম পালটায় কিন্তু কাম পালটায় না। রাজার বদলে আসে ডিক্টেটার; ডিক্টেটারের বদলে ডেমোক্রেসির মুখোস পরে অটোক্র্যাট! জারের বদলে ক্রুশ্চভ, নীরোর বদলে নেহরু—নামে আলাদা, কামে কি সেই এক বস্তু নয়, যাকে যেনামেই ডাকো, সেই একই রকম দুর্গন্ধ ছড়াবে?

আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে দরকার কী? আসুন ঘর থেকে দুপা ফেলে আসেপাশে তাকিয়ে দেখি। কী দেখব সেখানে? ওই টপ-এর খেয়া। জীবনের সকল কুরুক্ষেত্রেই কর্ণার্জুনের পালায়। এই পালায় যারা মার খায়, পালায় না কখনও, তারা ওই বাটাম নয়, তারা আপনার-আমার মতো মধ্যবিত্ত—সবচেয়ে বেশি দিয়ে যারা কম পায় সব চেয়ে বেশি।

নবনাট্য আন্দোলন হচ্ছে পোস; পার্পোস হচ্ছে বহু RUPEE! একবার জমাতে পারলেই ব্যস, সবাইকে খেদিয়ে নিজে রাজা সেজে বসা, রানীকে পাশে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে। লিটল অর্থাৎ ছোট ছোট যাত্রার দলের জয়যাত্রা যখন সুরু হয় তাদের সেই টপ-এরই শোভাবর্ধন হয়; হয়ে যায় তার উৎপাত। অভিনয়গৌরবের রবি অস্ত যায়; তরুণকে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না আর টপ বৃদ্ধ। কারণ, টপ চিরকাল টপ-ই থাকে। অংগারং শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে!

টপ-এর যুগ গিয়ে আসছে নতুন হুজুগ এখন,—টপলেস। যুগ বলতে এখন কিছু নেই, এখন হুজুগই টপে আছে। র‍্যালিসমের যুগ গিয়ে নিওর‍্যালিসমের হুজুগ চলচ্চিত্রে; সররর‍্যালিসমের চিত্রে, সাহিত্যে হাংরি ডি-জেনারেসানের, রংগমঞ্চে এখন ছিমেমাস্কোপর সঞ্চারণ, সাহিত্যের কাগজ সিনেমার, সিনেমার কাগজে সাহিত্যের হুজুগ!

এখন যুগাবতার কেউ নেই; সব হুজুগাবতার!

টপলেস পোষাক যাদের অংগে তারাও সবাই সমাজের টপে আছে। আর কয়েকদিন বাদে টপলেস হুজুগও কেটে যাবে। তারপর আসবে বাটামলেসের যুগ। থুড়ি, হুজুগ। লোকে তা নিয়েও হতবাক হবে। হবে তার কারণ, টপলেস এবং বাটামলেস,—সমাজের যারা টপে আছে তারা এই দুজুগের জনক বলে। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষরা অনেক কাল থেকেই টপ এবং বাটাম সামলাতে সামলাতে যেদিন সত্যি সত্যি আর পারবে না, বিপজ্জনক পরিস্থিতি হবে সেদিনই।

মধ্যবিত্ত মানুষ স্বাধীন ভারতে কাপড়ের কালোবাজারের কল্যাণে এমনিতেই টপ সামলাতে বাটাম, বাটাম সামলাতে টপলেস হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কেউ তাদের কথা ভাবেনি, ভাবছে না, ভাববে না। টপে যারা আছে তাদের টাকা আছে। তারা জানে পৃথিবীটা কার এ-প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে উত্তর।

পৃথিবীটা টাকার। বাটামে যারা আছে তারা জানে স্ট্রাইকের হাতিয়ার আছে তাদের হাতে। যাদের হাতে কিছু নেই তারা চিরকাল স্কুলমাস্টার, কেরাণী, বেকার। তারা মধ্যবিত্ত। তাদের হয়ে বলবার কেউ নেই।

মাসে মাসে স্ত্রীর হাতে
সেরা উপহার ইউকোব্যাঙ্কের সঞ্চয়

ইউকোব্যাঙ্কের ডিপোজিট সার্টিফিকেট এমনই উপহার, যা স্ত্রী তো বটেই, সকলেই খুশিমনে গ্রহণ করবেন। গহনা নয়, শাড়ি নয়, অথচ দিতে আর পেতে সকলের সমান আগ্রহ—ইউকোব্যাঙ্কের ডিপোজিট সার্টিফিকেট।
ইউকোব্যাঙ্কে সঞ্চয়, আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুখ ও নির্ভরতা।

ইউকোব্যাঙ্কে আপনার সাদর নিমন্ত্রণ বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন শাখায় চলে আসুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ডিপোজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনা

মাত্র ১০০ টাকা জমালে ১৫ বছর বাদে চারগুণেরও বেশি ফিরে পাবেন।

ইস্যুর দাম টাকা	৬১ মাস	৭ বছর	১০ বছর	১৫ বছর
১০০	১৬৬	২০১	২৭১	৪৪৬
৫০০	৮৩০	১০০৫	১৩৫৬	২২৩২
১০০০	১৬৬০	২০১০	২৭১১	৪৪৬৫
৫০০০	৮৩০০	১০০৫০	১৩৫৫৫	২২৩২৫

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য সঞ্চয় পরিকল্পনা ঃ

১। সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট : বছরে ৫% সুদ
২। রিকারিং ডিপোজিট : বছরে ১০% পর্যন্ত সুদ
৩। ফিক্সড ডিপোজিট : বছরে ১০% পর্যন্ত সুদ
৪। রিকারিং ডিপোজিটযুক্ত ফিক্সড ডিপোজিট : ৭ বছরে ১৪.৫০% কার্যকরী সুদ

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

MCOC-5182 BEN

মার্কিন সাহিত্য কি বাস্তব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে?

(জনৈক পর্যবেক্ষক)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে চিত্রিত জীবনের কি কোনও সম্পর্ক আছে?

হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই যতটা সম্পর্ক আছে বলে মনে করি জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক তার চেয়েও বেশী নিবিড়। এক প্রশ্নের উত্তরে জোরের সঙ্গে এই কথাগুলি বলেছেন অধ্যাপক লেসলি ফিডলার। বাফালোয় অবস্থিত নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জনপ্রিয় চলচ্চিত্র বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প উপন্যাস, রোমাঞ্চ কাহিনী, মহান সাহিত্য প্রভৃতির মানুষকে মুগ্ধ করার অপরিসীম আকর্ষণীয় শক্তির অনেক কথাই প্রাণ খুলে বললেন সেদিন। তিনি বললেন, "সাহিত্য প্রভৃতি তাদের গুণের এক ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে আমাদের কাছে আমাদেরকেই এক বিচিত্ররূপে উপস্থাপিত করে। আমরা আমাদের আরও নিবিড় আরও গভীর ভাবে জানবার ও বোঝাবার সুযোগ পাই। আমরা কোন্ দৃষ্টি নিয়ে জগৎকে সংসারকে অবলোকন করি সেই কথাই কাব্য-সাহিত্য, চলচ্চিত্র প্রভৃতি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। এর চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, এই কাব্য-সাহিত্য যেন আমাদের স্বাভাবিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়। রোমাঞ্চকর কাহিনী, দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প বীরত্ব গাথা আমাদের যেন প্রকৃতির কোলে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এই সবেরই সূত্র ধরে আমরা প্রত্যেকে বাস্তবতার জগতে ফিরে আসি।"

ডঃ ফিডলার ঘটনা কেন ঘটে, তার সূত্রপাত নিয়ে সর্বদা মাথা ঘামান। একটা বিষয়কে প্রকাশ্য দিবা লোকে টেনে এনে বাস্তবতার আলোকে পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধহস্ত। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের পূর্ব পর্যন্তও মার্কিন সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের আসরে নিজের আসন সুদৃঢ় করে নিতে পারে নি বলা যায়। এমন কি তখনও আমেরিকার জনসাধারণের অনেকেই সাহিত্যের জন্য ইউরোপের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন।

পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন সাহিত্যের পুণর্মূল্যায়ন হয়। এই সময় এক নতুন যুগের ছাত্র সমাজের উদ্ভব ঘটে। যুদ্ধোত্তর যুগের এই ছাত্রসমাজের জানবার আগ্রহ যেমনি অফুরন্ত, তেমনি তাদের আন্তরিকতাও উল্লেখযোগ্য। চাওয়া পাওয়ার অন্ত নেই এদের। স্বীকৃতি লাভের আশায় এরা সর্বদা-উন্মুখ। যে কোন কিছু একটা করে ফেলবার জন্য যেন তাদের প্রচেষ্টার শেষ নেই। জ্ঞানস্পৃহায় উদ্বেল সেই ছাত্রসমাজের সম্মুখে সেই সময়ে এসে হাজির হলেন ফিডলার, নরথ্রোপ ফ্রাই এইং রিচার্ড চেজ্ প্রমুখ প্রতীক ধর্মী লেখক গোষ্ঠী। আমেরিকার ছাত্রসমাজের মনোভূমিতে এঁরাই প্রথম সাহিত্যে বীজ বপন করলেন। তাঁরা একাধারে শিক্ষক ও নিবন্ধকার।

আমেরিকায় সাহিত্যের ব্যাখ্যায় এঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে নতুন প্রাণশক্তি আর দৃষ্টিভঙ্গীর আন্তরিকতা।

বিশেষতঃ ফিডলারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার। মার্কস, জাং এবং ফ্রয়েডের সম্মিলিত প্রভাব তাঁকে পরিচালিত করেছিল। মার্কিন সমাজের কল্পনায় ইন্দ্রিয়, জাতি ও সমাজ সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত সেই ধারণাই ফিডলারের রচনায় বড় স্থান নিয়েছে।

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত এই "লাভ এণ্ড ডেথ ইন দি আমেরিকান নভেল"-এ তিনি দেখিয়েছেন যে, আমেরিকার ঔপন্যাসিক পরিণত যৌন সম্পর্কের ব্যাপার নিয়ে গল্প ফাঁদেন নি বলে আমেরিকার গল্প কাহিনী বাস্তব না হয়ে মধ্যযুগীয় হয়েছে। সেগুলি সত্যিকারের সমাজচিত্র না হয়ে কপটতার কথার ফুলকিতে পর্যবসিত হয়েছে। সেগুলি বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা, ও মৃত্যুর পরোয়ানা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ঐ গ্রন্থে তিনি আরও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, আমেরিকার অধিবাসীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পুরোপুরি উপন্যাসের পরিণত ধারা লাভ করেছে। সেই সব উপন্যাস লেখা হয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজের জনপ্রিয় মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে। আমেরিকার জনচিত্তে এই রচনা-সম্ভারের প্রভাব ছিল অসামান্য। প্রতিটি লোক এই সব বই পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠত। প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই গ্রন্থরাজির সমাদর।

তা সত্ত্বেও ভাবের পুনরাবৃত্তিমূলক অথবা কল্পকাহিনীমূলক কিছু কিছু রচনা আমেরিকার আদর্শ উপন্যাসরূপে অভিহিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, জেমস ফেনিমোর কুপার, হারম্যান মেলভিল ও মার্ক টোয়েনের কতিপয় বিখ্যাত উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ সব উপন্যাসের নায়ক সমাজের কঠোর শাসনের বন্ধন থেকে পলায়ন করে বিজন প্রান্তরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। সেখানে অন্য জাতির, এবং মত ও পথের লোকের সঙ্গে তার সুদৃঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। আমেরিকার উপন্যাসগুলি সেখানকার অধিবাসীদের দুর্গম অভিযানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের এই ভাবধারা উইলিয়াম ফকনার এবং আরনেস্ট হেমিংওয়ে পর্যন্ত চলে এসে ষাটের দশকের সর্বাধিক জনপ্রিয় মার্কিন চলচ্চিত্র "ইজি রাইডার," ও "মিডনাইট কাউবয়" পর্যন্ত চলে এসেছে।

ষাটের দশকে আমেরিকার সমাজে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই নবযুগের আগমনী ধ্বনি লেসলি ফিডলার সর্বপ্রথম শুনতে পেয়েছিলেন। পেছন ফিরে তাকিয়ে আমরা একেই "প্রতি সংস্কৃতি" বলে চিহ্নিত করে থাকি। এই যুগে তরুণ জনচিত্তে দেখা গেল এক অসংগঠিত ভাবোন্মাদনা। বাধা বন্ধহীন এলোমেলো উৎসাহের বন্যা। এমন চরম ধ্বংসাত্মক আন্দোলন এর আগে কখনো আর দেখা যায় নি।

প্রবল যুদ্ধ বিরোধী ঢল পাশাপাশি গড়ে উঠল। উন্নত সমাজের লোকেরা সমাজের অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্য নানা নবতর জীবন ধারার পথ দেখালো। সুরা সংস্কৃতির স্থান দখল করল বিভিন্ন নেশায় লিপ্ত হওয়ার সংস্কৃতি। তরুণেরা সব একের পর এক রাস্তায় বেরিয়ে আসতে শুরু করল। বাড়িতে বসে বসে বই পড়ার চেয়ে গান গাওয়া আর শোনার কাজে বেশি মনোযোগী হয়ে উঠল। চিরাচরিত নিরাপদ পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে জীবন যাপনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় তরুণ সম্প্রদায় হয়ে উঠল মাতোয়ারা। এর পাশাপাশি শিক্ষার পরবর্তী কৃষ্টি হিসেবে চলচ্চিত্র, ভিডিও এবং টেলিভিশন প্রভৃতির ব্যাপক ছড়াছড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি বিদ্যার রূপান্তরের সংকেত ঘোষণা করল। মার্কিন জীবনের মূল্যায়ন আর সৃজনধর্মী কর্মকুশলতা সুদূর প্রসারী ফল লাভ করল।

মার্কিন সাহিত্য ও সমাজের যে কয়জন নিষ্ঠাবান প্রবক্তা আছেন ফিডলার তাঁদের অন্যতম। অগ্রগতির পথে সাহিত্য তার যে অবদান রেখে গেছে তার পুরোপুরি যথার্থ মূল্যায়ন

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

বলিভিয়ার ফ্যাসিস্ত সরকারকে উচ্ছেদের আহ্বান

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোরেজ বিপ্লবীদের দলে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। বলিভিয়া, উরুগুয়ে, ব্রাজিল প্রভৃতি ফ্যাসিস্ত দেশে গণতন্ত্রী মানুষ ক্রমেই সরব হচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই। নির্বিচারে হত্যা, গুম খুন, গ্রেপ্তার এদের বিশেষত্ব। যে কোন সৎ মানুষের কণ্ঠ এদের কাছে বিপদের কারণ; কমিউনিস্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করে খুন করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এত সব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ এইসব দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। আজ লাতিন আমেরিকায় ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ উঠেছে। আজ আর কোন সৎ মানুষ এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছেন না, তার বড় প্রমাণ বলিভিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জুয়ান জোসে তোরেজ। বলিভিয়ার ১৫০ তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি একটি দলিলে বলিভিয়ার বর্তমান ফ্যাসিস্ত শাসকদের উৎখাত করার আহ্বান জানিয়েছেন। লিমা-তে প্রচারিত উক্ত দলিলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তোরেজ বলিভিয়ার জনসাধারণের কাছে এই মর্মে আহ্বান জানান: "আপনারা সাম্রাজ্যবাদীদের সেবাদাসদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিন, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করুন।" তোরেজ তাঁর দলিলে বলিভিয়ার জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্যের কথা বলেন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তোরেজ বলিভিয়ার বর্তমান প্রশাসনকে স্পেনের দখলদার আমলের সঙ্গে তুলনা করেন। এবং স্পেনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বলিভিয়ার জনসাধারণ যে স্বাধীনতা অর্জন করেন সেই গৌরবের কথা পুনরায় তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বর্তমান ফ্যাসিস্ত প্রশাসনকে দখলদার বলে উল্লেখ করে এই ফ্যাসিস্ত শাসন অবসানের জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, অতীতে আমরা মুক্তির জন্যে যে ভাবে লড়েছি এবারও সেই পদ্ধতি নেব। কারণ পুনরায় আমাদের দেশ অধিকৃত। অধিকৃত বলতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তোরেজ বর্তমানের সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুল সরকারকে বুঝিয়েছেন। বর্তমানে ফ্যাসিস্ত সরকার যে ভাবে পুলিশী সন্ত্রাস চালাচ্ছে তোরেজ তার তীব্র নিন্দা করেন।

জেল থেকে পলায়ন

উরুগুয়ের বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জোয়েল কাসাল সম্প্রতি মন্তেভিদিওর সামরিক হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন। ৩২ বৎসর বয়স্ক কাসাল উরুগুয়ের মেডিক্যাল ট্রেড ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা। কাসালকে উরুগুয়ের ফ্যাসিস্ত সরকার দু' মাস আগে গ্রেপ্তার করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উরুগুয়ের সরকার দেশে সমস্ত ধরণের গণতান্ত্রিক অধিকার চূর্ণ করে দিয়েছে। এখন সন্ত্রাস, গ্রেপ্তার, হত্যাই বর্তমান সরকারের সম্বল। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এখন সংগঠিত হচ্ছে।

ব্রাজিলে ফ্যাসিস্ত শাসন

লাতিন আমেরিকার ব্রাজিলেই ফ্যাসিস্ত ও উপনিবেশবাদীদের শক্ত ঘাঁটি। ব্রাজিলের ফ্যাসিস্ত সরকার নির্বিচারে গ্রেপ্তার, খুন, জখম চালিয়ে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করছে। কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বামপন্থী দল এখানে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ব্রাজিল কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লুইস কার্লোস এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ফ্যাসিস্ত শাসক ব্রাজিল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দশজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের মধ্যে পাঁচজনের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত তাদের খুন করা হয়েছে। খুন করে কমিউনিস্টদের শেষ করা যায় না।

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

আমার চোখের পাওয়ার বদলাবার পর থেকেই সংসারে হাফ্-গেরেস্ত-বেশ্যা-দালাল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনে। এই কিছুকাল আগেও আমি অনেক ভদ্র গেরস্তের বাড়ি দেখেছি, ঝলে মনে হয়। এখন সেই বাড়িগুলিতেও "সাবধান গৃহস্থ বাড়ি" লকেট ঝুলছে।

সম্ভবত এটা আমার পাওয়ার বদলেরই কারণ।

* * *

ইদিকে ভাদ্রমাসের কামার্ত কুকুরের মতো শারদীয় সংখ্যাগুলো ফুটপাথের জঞ্জাল চতুর্গুণ বাড়িয়েছে। দেশব্যাপী বন্যার বিভীষিকার সঙ্গে এই পত্রিকাগুলিও অভাবী মানুষগুলোর সামনে যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক। রাস্তার জঞ্জালের সঙ্গেই এই উপদ্রব আমরা সহ্য করে যাচ্ছি। এগুলি "আধুনিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভার" এবং পূজা সংখ্যা মানেই "……।" এই পত্রিকার মলাট থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে থই থই করছে। এরা লিঙ্গ প্রহার ছাড়া অন্য বিষয় দেখতে পায় না। "দেশ"-এ সুনীল গাঙ্গুলী নামক ছোকরার উপন্যাসটির পাতা তিন চার খুলে দেখুন। কিন্তু এখন দিনকাল এমন কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাননা।

হয়তো সেই জন্যেই ভাবছিলাম আমাদের যৌবনে-দেখা ভদ্র গৃহস্থের বাড়িগুলি রাতারাতি কীভাবে হাওয়া হয়ে গেল। এখন হিজড়েদের সঙ্গেই আমাদের বাস।

* * *

নরেন মিত্তির একরকম বিনা নোটিশেই ইহলোক থেকে সরে পড়লেন। হালের বংশধরেরা তাঁর নাম জানত না। অথচ এই নরেন মিত্তির আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প-লিখিয়ে। মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ছোটখাটো দুর্বলতা, স্খলন তাঁর লেখনীতে আশ্চর্য সহানুভূতি পেয়েছে। মনে হয় এই সব দুর্বলতাকে তিনি এমন ভালোবেসেছিলেন যে তার উর্ধে বৃহত্তর সমাজ-জিজ্ঞাসা বা রাজনীতিসচেতনতা তাঁর দৃষ্টিতে এড়িয়ে গেছে। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প "রস"-কে আমরা কেউ ভুলতে পারব ?

নরেন মিত্তিরের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তিনি আনন্দবাজারে সাব এডিটার হিসেবে ঢুকেছিলেন এবং এই দীর্ঘ চাকরিজীবনে সাব-এডিটারের উপরে উঠতে পারেননি।

* * *

চল্লিশের দশকের আরো-একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার সুশীলা জানা। চাষী ও শ্রমিক জীবনের সংগ্রামী গল্পগুলো এঁর অনবদ্য। সাম্প্রতিকালে প্রচারের দৈন্যে সুশীল জানা হালের পাঠকের কাছে কিম্ভূতনাম। এই সেদিন তিনি সম্পাদক ও অনুবাদকের ভূমিকায় নতুন করে অভিধান জানালেন ম্যাক্সিম গর্কির পূর্ণাঙ্গ ডায়েরির অনুবাদের মাধ্যমে : "আমার ডায়েরি থেকে।" (পরিবেশক, বুকমার্ক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট)

* * *

মাঝে মাঝে রবীন্দ্র সংগীতের গায়কী নিয়ে অধিকারী-অনধিকারীর শিরঃপীড়ার শেষ নেই। এই সেদিনও খ্যাতিমান দেবব্রত বিশ্বাসকেও এরা কামান দেগেছিলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিল্পীর পরিবেশনের যে স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে হালের রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী রেখে সেটুকুও দিতে চাননা। অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পঙ্কজ মল্লিককে স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্র সংগীতে বিদেশী বাদ্য বাজানো যাবে না, এমন নির্দেশও হাস্যকর।

দেখছি ইদানীং দেবব্রত বিশ্বাসের পুনর্বাসন হচ্ছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই ছিদ্রান্বেষীদের সম্পর্কেই সম্ভবত ভলতেয়ার বলেছিলেন এমন একটি সময় যখন monkey torments tiger!

এন এল সি সি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ্মীবাবুরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড, ইউনিয়ন আন্দোলনে এন এল সি সির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী মনোযোগ সহকারে লক্ষ্মীবাবুদের বক্তব্য শোনেন এবং কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে লক্ষ্মী বারিদ পঙ্কজের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র শ্রীসঞ্জয় গান্ধী। এরপর লক্ষ্মীবাবু বারিদবরণ দাস ও পঙ্কজ ব্যানার্জী যান দেবকান্তবাবুর বাড়ীতে। সেখানে জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আই এন টি ইউ সির জনৈক প্রবীণ নেতা উপস্থিত ছিলেন। দেবকান্তবাবু আগেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পৌঁছেছিলেন। এরপর লক্ষ্মীবাবুদের বক্তব্য শোনেন এবং ট্রাঙ্ককলে অরুণ মৈত্রকে নির্দেশ দেন যাতে এন এল সি সি-কে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য কোনরকম চাপ না দেওয়া হয়।

এরপর লক্ষ্মীবাবুরা আবার সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। এবং সাংগঠনিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন। সঞ্জয় ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত বক্তব্য শোনেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আজিজ ইমাম। এরপর শ্রীইমাম এল এল সি সি-কে আলাদা ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য লিখিত নির্দেশ দেন।

সামাজিক চরিত্রহীনতা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

আবিষ্কৃত হয় তবে হয়ত সুবিধে পাবেন, যদি আপনারা একই জেলার লোক, একই গ্রামের, একই আত্মীয়-গোষ্ঠীর হন, পরিচয়ের বৃত্তটি যদি এ ভাবে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়, তবে আরও সুবিধে আশা করতে পারেন। সর্বপ্রকার প্রশাসনিক স্তরে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন পোষ্য, অনুগৃহীত কিংবা তাঁর সঙ্গে গোষ্ঠীগত ধাঁচে আনুগত্যমূলক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে এমন লোক সহজেই যথেচ্ছাচারের সুযোগ পায়, সামাজিক স্বার্থের চরম ক্ষতি করলেও তাঁর জমিদারসুলভ ক্ষমতার দুর্ভেদ্য আশ্রয়ে তাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ে না।

মুখে আমাদের দার্শনিক বুলির খই অবিরাম ফোটে, কিন্তু তাদের ক্ষীণ টানটুকু পর্যন্ত আমাদের চরিত্রে পড়ে না, আচরণে অতি সাধারণ সংযম, সৌজন্য দেখাতেও আমরা ব্যর্থ হই। বড়ো রকমের ক্ষতি বা আঘাত ত দূরের কথা, গায়ে সামান্য একটু টোকা পড়লেই আমাদের ভেতরকার হীন, স্বার্থকলুষিত, আত্মপরায়ণতার মূর্তি দগ্‌দগে ঘায়ের মত বেরিয়ে আসে। বুলির নেশায় মত্ত হয়ে, প্রগল্‌ভতায় আমরা আত্মসম্ভোগে মজে থাকি মাত্র, সেইজন্যই আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমহিমাবিজ্ঞাপনের কাঙালপনা কোনও গভীর নীতিবোধে নয়, সাধারণ সামাজিক রুচিতে ভদ্রতাবোধে সংযত হতে জানে না, মিথ্যার চঠকদার পসরা সাজিয়ে কখনও বা অবজ্ঞাতাচ্ছিল্যের অশালীন, অশিষ্ট নিছক ব্যক্তিগত আক্রমণে জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। সেই বহু উল্লিখিত ভারতীয় প্রশান্তি, স্থৈর্য, শান্ত নম্র সহিষ্ণুতা, অপ্রমত্ততা আমাদের জীবনে, আচরণে কোথায় ? ভারতবর্ষের সত্য সাধকদের কি ঐতিহ্য আজ আমাদের মধ্যে জীবন্ত, সর্বব্যাপ্ত ?

ব্যক্তিগত স্তরে, দুই একটি জীবনে সেই ভারতীয়তার ঐশ্বর্য আমরা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতারই দেখেছি। দেখেছি বাক্‌কুণ্ঠ নম্র, শান্ত দুই একটি মানুষ, এক আশ্চর্য সর্বব্যাপী কল্যাণবোধে স্থির, অবিচল, জ্যোতির্ময়। শুধু অন্তরের গভীর শুভময়তায় সেই দধীচিদের শুধু নিজেদের গোষ্ঠী প শ্রেণীর জন্য নয়, সর্বসাধারণের জন্য অপরিসীম দুঃখবরণের চরিত্রবল লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এই সমাজের বিষে তাঁরা নীল হয়ে গেছেন, কুৎসিত লোভে তাঁদের শুভবোধকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে, হীনতার বোঝায় তাঁদের পিষে মেরে আমাদের সমাজ তাঁদের ঋণ শোধ করেছে। তাও আমাদের দেখতে হয়েছে। আমাদের সত্যতার জড়তার অভিশাপ তাঁদের আত্মদানে কিছুমাত্র দূর হয়নি। পারিবারিক গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত সীমায় আমাদের মত সাধারণদেরও কেউ কেউ হয়ত অপরের প্রতি বিবেচনাশীল, পরিচ্ছন্ন মমতাবান, সহৃদয় ; কিন্তু যখন আমরা জীবনের কোনও বিরাট ক্ষেত্রে বৃহত্তর সংগঠনে জড়ো হই, তখন আমরা উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক বোধ ও শৃঙ্খলহীন, সামাজিক চরিত্রবর্জিত, লক্ষ্যহীন জনতা মাত্র। এই সমাজচৈতন্যের দৈন্য অপ্রীতিকর নিশ্চয়ই, তবু তা সত্য। ঐতিহাসের কোনও নির্মম শক্তির আঘাতে আমাদের জীবনের এই পঙ্গুতা হয়ত একদিন দূর হতে পারে। এছাড়া আর বেশি কিছু বলার সাধ্য আপাতত আমাদের নেই।

[শারদীয় সংখ্যা, ১৯৬৪]

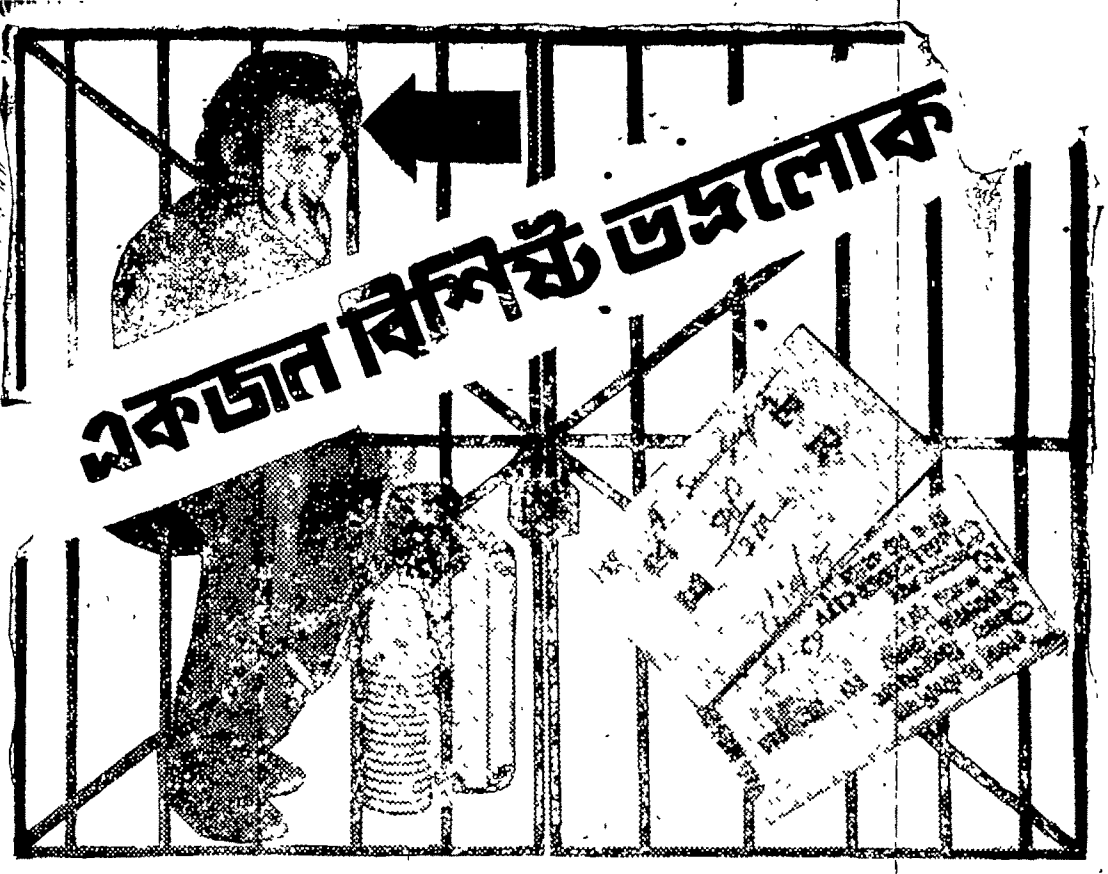

ইনি এমনিতে আইন মেনে চলেন। কিন্তু হঠাৎ একটা অবিবেচনার কাজ করে ফেলেছেন।

উনি রিজার্ভকরা টিকিট কিনেছিলেন। কিন্তু রিজার্ভেশনটা ছিল অপরের নামে—নিজের নামে নয়। বুঝেছিলেন কাজটা উচিত হচ্ছে না। তবু ভাবলেন কী আর এমন এসে যাবে।

এখন মহাঝামেলায় পড়েছেন। মাঝপথে তাঁকে ট্রেন থেকে নেমে যেতে হয়েছে। এবার হয় জেল তিন মাস পর্যন্ত, নয় আড়াইশ' টাকা অবধি জরিমানা—হয়তো বা দুই-ই ! পুরো ভাড়া আর জরিমানা তো দিতেই হবে।

পূর্ব রেলওয়েতে এই ধরনের ঘটনা রোজই ঘটছে। অনেকে সরলমনে অসাধু লোকেদের কাছ থেকে ভুয়ো নামে রিজার্ভকরা টিকিট কিনে পথে ঝঞ্ঝাটে পড়ছেন। কাজেই কোন অবস্থাতেই এমন টিকিট কিনবেন না যেটা অন্যের নামে রিজার্ভকরা। যে সে লোকের কাছ থেকে কোন টিকিট কিনবেন না। কখনও না।

পয়সা খরচ করে অযথা ঝামেলায় পড়বেন কেন ?

INDIAN RAILWAYS

পূর্ব রেলওয়ে

madura

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

বিদেশী ওষুধ কোম্পানী কি ভাবে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে

দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আপনারা জেনে শঙ্কিত হবেন যে, স্বাধীনতা লাভের আঠাশ বছর পরও এদেশে ওষুধ শিল্পে নিয়োজিত বিদেশী পুঁজির হার দশটি কোম্পানীতে শতকরা একশো ভাগ, চব্বিশটি সংস্থায় শতকরা পঞ্চাশ থেকে নব্বুই ভাগ এবং পনেরোটি প্রতিষ্ঠানে শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ। ভারতীয় অন্য কোন শিল্পে এতটা বিদেশী পুঁজি খাটে বলে আমাদের জানা নেই।

এদেশে যতরকমের ওষুধ ব্যবহার হয় তার মধ্যে এ্যান্টিবায়োটিকসের স্থান শীর্ষে। বর্তমানে আমাদের দেশে খুব কম করে হলেও একশ রকমের পেনিসিলিন, একশ পনেরো রকমের ট্রেটাসাইক্লিন, একশ পঞ্চাশ রকমের ক্লোরমফেনিকল চালু আছে। এই বহু ব্যবহৃত পেনিসিলিনের কথাই ধরুন যা ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিদেশ থেকে বহুল পরিমাণে আমদানী করা হত। বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলো পেনিসিলিন আমদানী করত এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে। আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্থান এ্যান্টিবায়োটিকস উৎপাদন শুরু করার পর যার বাজার দর হল শুধু পঞ্চাশ পয়সা। যখন হিন্দুস্থান এ্যান্টিবায়োটিক (কারখানা প্রিমপ্রীতে) উৎপাদন বাড়তে শুরু করল তখন এই সব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান আপন লবীর জোরে "প্রিমপ্রীতে তৈরী পেনিসিলিনে মাছি" পাওয়া গিয়েছে বলে সংসদে হৈ চৈ শুরু করে যা খবরের কাগজের পাঠকমাত্রেই জানেন। আসলে ভারতীয় পাবলিক সেক্টর তৈরী ওষুধের মান সম্বন্ধে ডাক্তার, রোগী এবং সংশ্লিষ্ট মহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ওরা পঞ্চাশ পয়সার পেনিসিলিন একটাকা পঞ্চাশ পয়সা করে বিক্রী করে অঢেল মুনাফা কামানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছিল না। যে দেশে মাথা পিছু ওষুধের পেছনে ব্যয় হয় মাত্র পাঁচ টাকা সেখানে তিনগুণ দামে পেনিসিলিন বিক্রী করত এই সব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মহাজনেরা। সালফার বেলায়ও তাই হল। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থা হফ্‌কিনস ইনস্টিটিউট সালফা ড্রাগ তৈরী করার আগে পর্যন্ত বহুসংখ্যক বহুসংস্থা কোটি কোটি টাকার সালফা বিক্রী করে এ দেশ থেকে মুনাফা পাচার করেছে বিদেশে।

একবোরে হালের কথাই ধরুন। আই ডি পি এল (ইন্ডিয়া ড্রাগস এ্যান্ড ফার্মাসিউটিকাল) উৎপাদন শুরু করার আগে (১৯৬১) একশ ট্যাবলেট এনালজিন বিক্রী হত একশ পনের টাকা করে যার বর্তমান দর মাত্র আশি টাকা।

বহুজাতিক সংস্থা স্রেফ ব্র্যান্ড নেম-এর সুযোগ নিয়ে (হেকসট-এর নোভালজিন আসলে এনালজিন ছাড়া আর কিছুই নয়) অঢেল মুনাফা কামিয়েছে। এদের প্রচন্ড শক্তিশালী প্রচার যন্ত্রের জোরে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ওদের তৈরী ওষুধেই সত্যিকারের মান রক্ষা করা হয় এবং ওষুধটা হচ্ছে "বিলেতী কোম্পানীর", যার মোহ থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারিনি আজও। হাতি কমিটি ব্রান্ড নেম অবলুপ্তির সুপারিশও করেছে জোরালো ভাষায়, যা কেন্দ্রীয় রাসায়ণিক মন্ত্রক আপাতত চেপে রেখেছে। জাতীয়করণের সুপারিশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

অ্যান্টিবায়োটিকসের পরই ভিটামিনের স্থান। আমাদের দেশে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার মতই অপুষ্টিজনিত ম্যালনিউট্রিশান, অর্থাৎ রোগের প্রকোপ সবচাইতে বেশী। এই দুর্বলতার পুরোপুরি সুযোগ নিতে বিদেশী ওষুধ কোম্পানীগুলো কসুর করে নি। এরা গত বছরে প্রায় দুই কোটি টাকার মত ভিটামিন তৈরী কবার কাঁচামাল আমদানী করেছে। হাতি কমিটির রিপোর্টেই তার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

দৈনন্দিন অনশনের দেশে অভাব হচ্ছে ডাল-ভাতের। ক্যালরির। সেক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার ভিটামিন টনিক খাইয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্ন হাস্যকর ও অবান্তর।

যে দেশে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে সেখানে একা ফাইজারের মত অমেরিকান কোম্পানী বছরে তিন কোটি টাকার বিকোমল্ল ভিটামিন ক্যাপসুল বিক্রী করে। অপুষ্টিজনিত ব্যাধির সামাজিক লক্ষণটি জেনে প্রায় তিনশোটি দেশী, বিদেশী, বহুজাতিক কোম্পানী বারোশ রকমের ভিটামিন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ইনজেকশন ও টনিক বিক্রী করে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে। তিনশ রকমের মালটিভিটামিন, চারশ রকমের ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, সাতশ রকমের টনিকের কোন প্রয়োজন নেই এদেশে। হাতী কমিটি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে স্রেফ একশো ষোলটি ওষুধ আমাদের দেশে অত্যাবশ্যক যা দিয়ে শতকরা আশি ভাগ রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

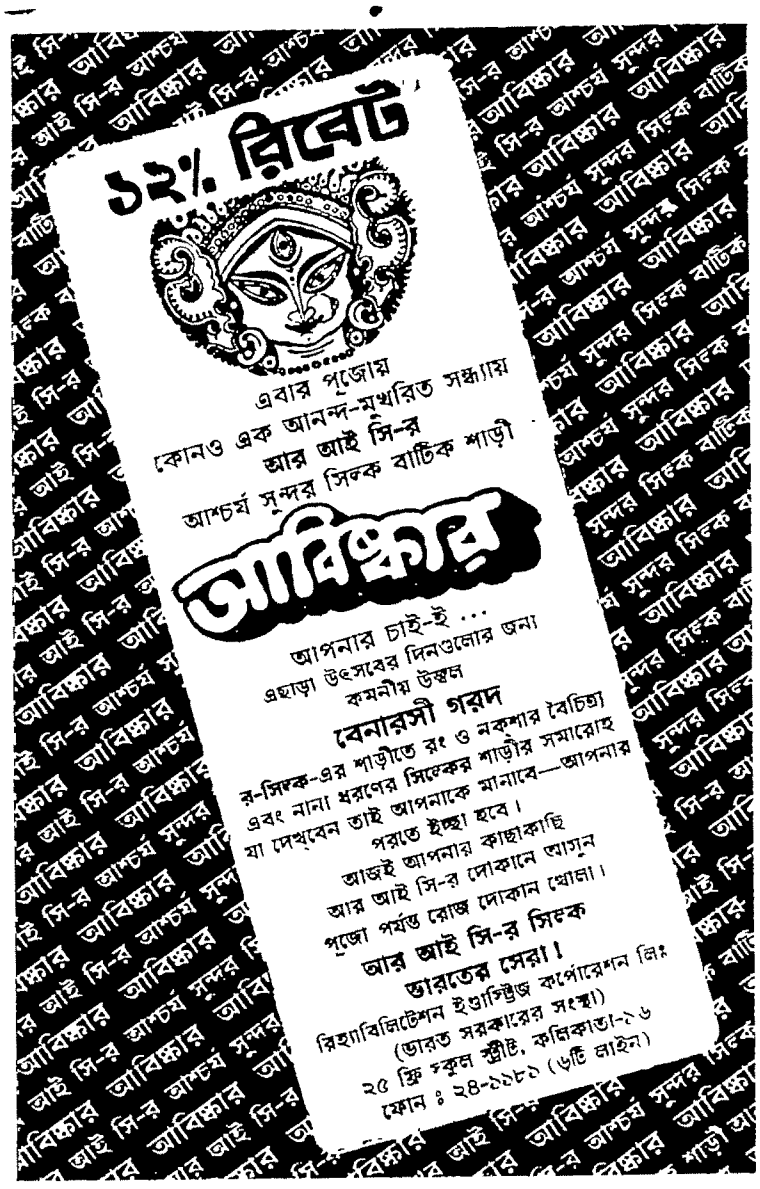

'বারবধূ' নাটক প্রসঙ্গে

(দর্পণের সমালোচক)

এই আণবিক যুগেও ধনতান্ত্রিক সমাজে নারীদেহ ভোগ্যপণ্য রূপে বিক্রিত। দরিদ্র দেশগুলিতে ত বটেই প্রাচুর্য যাদের উপচে পড়ছে, প্রাচুর্যের জন্য যেখানে এক শ্রেণীর নরনারী বিভিন্ন "কাল্টের" ভেক নিয়ে নেশাগ্রস্ত সেই সব দেশেও। এই রকম এক নারী তার পয়সাওলা খরিদ্দার এবং কিছু স্বাস্থ্যান্বেষী কলকাতার মানুষকে নিয়ে চতুর্মুখের অসীম চক্রবর্তী জমিয়ে তুলেছেন "বারবধূ" নাটক যা বর্তমানে প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে হাজার রজনীর প্রবেশ দ্বারে।

বেশ কয়েক বছর আগে, অর্থাৎ জাঁদরেল অভিনেতারা বিদায় নেবার পর বাংলা পেশাদার মঞ্চে শুরু হয়েছিল আলোর যাদু এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এল উৎপলীয় রাজনীতি এবং তারপর এই কিছুদিন আগে ক্যাবারে-নৃত্য যার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বহু আলোচিত এবং বহু কুখ্যাত নগ্নতা। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে বর্তমানে শ্রীমতী শেফালীদের যুগ।

"বারবধূ" নাটকে এই জাতীয় এক নারীর আর এক দিক উপস্থিত। তাই এখানে ক্যাবারে-নৃত্য নেই, আছে এক সরল মানবিক আবেদন। নাটকের ঘটনাস্থল হাজারিবাগ। এক লালসা-প্রমত্ত পুরুষ এক দেহোপজীবিনীকে নিয়ে এখানে এসেছিল কদিন "ফূর্তি" করবে বলে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাতে বাধা পড়ে। কলকাতা থেকে আগত কিছু স্বাস্থ্যান্বেষী তাদের বাড়িতে হানা দেয় ভাব জমতে। ফলে যুবকটি নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য সেই ভাড়াকরা মেয়েমানুষকে তার বউ সাজায়। এই মেয়েটির সঙ্গে সদ্য আলাপীদের নানারকম পাতানো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইখান থেকেই নাটকের সংঘাত শুরু। যুবকটির সঙ্গে মেয়েটির, মেয়েটির নিজের অন্তরে। এই সংঘাতের মধ্যে থেকেই তার পেশাদারী খোলস ছিঁড়ে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসে। বলা যায় তার জন্মান্তর ঘটে।

বারবধূর এখানে দুই রূপ। যখন সে ভোগ্যপণ্যরূপে এক পরগাছা লালসাগ্রস্ত পুরুষের মদ্যপান ও "ফূর্তি" তথা শয্যাসঙ্গিনী তখন তার এক রূপ আর যখন স্বাস্থ্যান্বেষীদের পাতানো সম্পর্কে কারো বৌদি, কারো নাতবৌ তখন তার আর এক রূপ। এই শেষোক্ত রূপ তার কাছে নতুন এবং এতেই তার জন্মান্তর ঘটে, কিন্তু এই রূপকেই সে চিরন্তন করে রাখতে চায়। কারণ সে একজন স্বাভাবিক মানুষ। সাধারণ মানবিক সম্পর্কগুলো সম্পর্কে তার মধ্যে একটা অভাববোধ ছিল।

প্রশ্ন। এই শ্রেণীবিভক্ত, ন্যায়-বিচারহীন, নির্দয় সমাজ ব্যবস্থায় সে কি নতুনভাবে বাঁচতে পারবে? অথবা দেহের মূল্য সাময়িকভাবে প্রত্যাখ্যান করলেও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাকে পুনরায় দেহবিক্রয়ের অপমৃত্যুকেই বরণ করে নিতে হবে?

কেতকী দেবী বারবধূর দুই রূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অসীম চক্রবর্তীও ভাল। দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়।

মার্কিন সাহিত্য

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

তিনি করেছেন। সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, মার্কে শোয়ারৎজ প্রভৃতি তরুণ সমালোচকরা সাহিত্যকে স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে রচনা আর পাঠকের সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার করেন। লেখক নিজেই পাঠক সম্প্রদায়ের অংশ। তাই পাঠকই লেখকের লক্ষ্য।

ডঃ ফিডলার এ কথা বিশ্বাস করেন যে, লেখক আর পাঠক এই দুয়ে একত্র মিলেই গড়ে ওঠে সমাজ। কাহিনী সৃষ্টির মূলে তাঁরা উভয়েই পরস্পর দায়ী। কিন্তু রচনাকে প্রসাদগুণে মণ্ডিত করে তাকে রসোত্তীর্ণ কালজয়ী চিরন্তন সাহিত্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার মূল্যায়ন নির্ভর করে একমাত্র লেখকের উপর। নিজে নির্বিকার নিস্পৃহ থেকে অন্যের মধ্যে রূপান্তর ঘটানোই লেখকের ধর্ম। যে সমাজের তিনি অংশ সেই বিশেষ সমাজের জন্য তিনি নীরবে কাজ করে যান। মানুষের স্বপ্নগুলিকেই তিনি তুলে ধরলেন মানুষের সামনে। কিন্তু লেখক কি তাঁর সমাজের জন্য স্বপ্ন দেখেন? ডঃ ফিডলার এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, না, সব সময় নয়। স্বয়ং আমেরিকার সাহিত্যের একজন মহান ঔপন্যাসিক তথা সবচেয়ে উদার প্রবক্তাদের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই রকম মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এই রকম দাবী করা লেখকের পক্ষে অযৌক্তিক নয়, "আমার নিজের জন্যই আমি লিখি। আমার রচনার আসল বক্তব্য পাঠকের সব সময় বোধগম্য নাও হতে পারে সৃষ্টির লেখনী দিয়ে আমি যা দান করছি, সে তো আমিই আমাকে অঞ্জলি দিচ্ছি। এই মসীযুদ্ধ সুদীর্ঘকালের। এ আমার আমৃত্যু একক জীবন সংগ্রাম।"

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মদ্‌ই লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী অপসারিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১০ই অক্টোবর ৭৫ ॥ দেড় টাকা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অবশেষে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী অপসারিত হলেন। গত পয়লা অক্টোবরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় প্রিয়বাবুর অপসারণের সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে যায়। কেবল প্রিয়বাবুর অনুরোধে পাঁচই অক্টোবর পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। প্রিয়বাবুর জায়গায় নতুন সভাপতি হচ্ছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত এ আই সি সি সদস্য কুলদীপ নারায়ণ।

প্রিয় দাসমুন্সীকে যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চুয়াত্তর সালের গোড়া থেকেই শুরু হয়। এবং এই প্রচেষ্টার কথা সর্বপ্রথম "দর্পণ"ই প্রকাশ করে। অনেক দেরীতে হলেও সেই প্রচেষ্টা প্রিয়-বিরোধীরা আজ কার্যকর করেছেন।

প্রিয় মুন্সীকে যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য নেপথ্যে অনেক কংগ্রেস নেতা কলকাঠি নেড়েছেন। এদের মধ্যে আছেন বর্তমান রেলমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠী, উমাশঙ্কর দীক্ষিত, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী সৎপথী প্রভৃতি প্রথম সারির কংগ্রেসী নেতারা।

এঁরা কিন্তু প্রথমে কেউই প্রিয়র বিরোধী ছিলেন না। প্রিয় নিজগুণে এই সমস্ত প্রভাবশালী নেতাদের বিরোধী করে তুলেছেন। উল্লিখিত নেতারা ছাড়াও প্রায় সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাই প্রিয়বাবুর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর প্রধান কারণ রাজ্যে রাজ্যে যুব কংগ্রেস কমিটি গঠনে প্রিয়বাবু মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। শুধু তাই নয় তিনি এমন এমন লোককে রাজ্যে রাজ্যে যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে বসিয়েছেন যাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীদের কোন সদ্ভাব নেই। এই সব মুখ্যমন্ত্রীরা ধরে নিয়েছেন প্রিয়বাবু তাঁদের বিব্রত করার জন্যই এইভাবে কমিটি তৈরী করেছেন। ফলে তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রিয়বাবুর ওপর।

এই ঘটনা সব থেকে গুরুতর রূপ নেয় উত্তর প্রদেশে। শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। প্রিয়বাবু উত্তর প্রদেশে যুব কংগ্রেস কমিটি তৈরী করলেন ত্রিপাঠীজীর মতামতের তোয়াক্কা না রেখেই। ত্রিপাঠীজী রাজ্যের কয়েকজন যুব কংগ্রেস নেতাকে কমিটি থেকে সরিয়ে দেবার জন্য প্রিয়বাবুকে অনুরোধ করেন। ত্রিপাঠীজীর অনুরোধে প্রিয়বাবু কর্ণপাত তো করলেনই না, পরন্তু ঐ সব যুব নেতাদের মদত দিতে লাগলেন ত্রিপাঠীজীকে উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য।

নানা কারণে ত্রিপাঠীজী মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। এবং তখন থেকেই প্রিয় মুন্সীকে যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেবার কলকাঠি নাড়তে শুরু করলেন। ত্রিপাঠীজীর অনুগত একদল যুব নেতা রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষুব্ধ যুব কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করলেন। দিল্লীতে বিক্ষুব্ধ যুব নেতাদের এক সর্বভারতীয় সম্মেলনও হয়। তাতে ঠিক হলো যদি প্রিয় মুন্সীকে সভাপতির পদ থেকে অপসারণ না করা যায় তাহলে তাঁরা সর্বভারতীয় স্তরে পাল্টা যুব কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হবে।

এই বিক্ষুব্ধ যুব নেতারা প্রধান মন্ত্রী, কংগ্রেস সভাপতি উমাশঙ্কর দীক্ষিত, জগজ্জীবন রাম প্রমুখ প্রবীণ ও প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং প্রিয়বাবুকে অপসারণের দাবী জানান। অনেকের ইচ্ছা থাকলেও প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভাপতির মনে এ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সে দ্বন্দ্বেরও অবসান ঘটল গত বছর দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে যুব কংগ্রেসী জমায়েতে। এই জমায়েতে আগত বিভিন্ন রাজ্যের যুব কংগ্রেসীদের কার্যকলাপ সারাভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। খোদ পার্লামেন্টে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। এই ঘটনা প্রধানমন্ত্রীকেও বিচলিত করে। বস্তুত এখানে থেকেই প্রিয়বাবুর পতন শুরু হয়।

আসলে অত্যন্ত দাম্ভিকতাই প্রিয়বাবুর পতনকে ডেকে আনে।

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

ইউনিয়ন নিয়ে কংগ্রেসীদের লড়াই আবার প্রকাশ্য রাজপথে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসী কোন্দল আবার প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে এসেছে। গত পঁচিশে সেপ্টেম্বর কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের লেক ডিপোতে লক্ষ্মী বসুর সমর্থক গোষ্ঠীর সঙ্গে সৌগত রায়ের সমর্থক গোষ্ঠীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে পাঁচ জন মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

রাষ্ট্রীয় পরিবহনে কংগ্রেসীদের দুইটি ইউনিয়ন আছে। একটির নেতৃত্বে আছেন লক্ষ্মীকান্ত বসু অপরটির নেতৃত্বে সৌগত রায়। হাইকোর্টের এক আদেশ বলে সৌগত রায়ের সমর্থকরা লেক

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

চটকল শ্রমিকরা বোনাস নেবেন না

সমস্ত মিলে প্রতিরোধ আন্দোলন

শ্রমিকদের দাবি উপেক্ষা করে চটকলগুলিতে চার শতাংশ বোনাস ঘোষণা করলে শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সমস্ত চটকলে শ্রমিকেরা বোনাস না নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন এবং মিলগুলিতে ম্যানেজারদের কাছে গণডেপুটেশনে উপস্থিত হন। মিলে মিলে এক অনিশ্চিত অবস্থা বিদ্যমান। শ্রমিকেরা বিশ শতাংশ বোনাস দাবি করেছেন।

ইউনিয়ন নর্থ জুট মিল ম্যানেজার জানান যে এ সপ্তাহে সাপ্তাহিক বেতন না দিয়ে তাঁরা চার শতাংশ বোনাস দেবেন। শ্রমিকেরা দলমত নির্বিশেষে এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তারা চার শতাংশ বোনাস নেবেন না এবং যথারীতি সাপ্তাহিক বেতন দিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক বেতন দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে শ্রমিকরা কাজে ফিরে যান।

বজবজের নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের শ্রমিকেরা চার শতাংশ বোনাস বয়কট করেছেন এবং গত বুধবার ছুটির পর ম্যানেজারের ঘরের সামনে বিশ শতাংশ বোনাস দেওয়ার দাবি জানান।

বিড়লা জুট মিল মুনাফার হিসাব অনুযায়ী দু ধরণের বোনাস ঘোষণা করেছেন। কর্মচারীদের জন্য বিশ শতাংশ এবং শ্রমিকদের জন্য চার শতাংশ। এই বোনাস ঘোষণার বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীরা বিক্ষোভ জানিয়েছেন।

৩৫টি চটকল এখন বোনাস দেবেন না

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী এস এন রায় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে আই জে এম এ-র আবেদন অনুযায়ী সরকার পঁয়ত্রিশটি জুট মিলের মালিকদের দাবি মেনে নিয়ে পুজা এবং ঈদের আগে বোনাস দিতে হবে না বলে জানিয়েছেন। শ্রমিকেরা জানিয়েছেন যে, যখনই দেওয়া হোক না কেন পুরো বিশ শতাংশ বোনাস দিতে হবে।

পূর্বের বোনাসের হার ছিল বেশী

পূর্বের বোনাসের হার ছিল অনেক বেশী। চটকলে যখন সর্বনিম্ন চার শতাংশ বোনাস আইন চালু ছিল তখনই উনিশশো সত্তর সালে শ্রমিকেরা তিন সপ্তাহ ধর্মঘট করে বোনাস আইনের বাইরে এসে সাত শতাংশ সর্বনিম্ন বোনাস সম্পর্কে চুক্তি করেন। তারপর গত বছর ভারত সরকারের রায় অনুযায়ী সর্বনিম্ন বোনাসের হার হয় ৮·৩৩ শতাংশ। সেক্ষেত্রেও চটকলের শ্রমিকেরা এই বোনাসের অতিরিক্ত উনিশশো তিয়াত্তর বাবদ আরো একশ টাকা এবং উনিশশো চুয়াত্তর বাবদ একশ কুড়ি টাকা পেয়েছেন।

স্মারকলিপি

চটকলের শ্রমিকেরা সর্বনিম্ন বিশ শতাংশ বোনাসের দাবিতে সমস্ত মিলেই প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর কাছে গণ স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি পাঠানো হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে তেরটি মিলের পক্ষ থেকে রাইটার্স বিল্ডিংএ তা জমা পড়েছে বাকী মিলগুলির পক্ষ থেকে এই স্মারকলিপিতে গণস্বাক্ষর সংগৃহীত হচ্ছে। চটকল এলাকায় শ্রমিকেরা খুবই বিক্ষুব্ধ।

উৎসবের প্রাক্কালে মহানগরী ও জনসাধারণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পুজোর আর মাত্র একটি দিন বাকী। উৎসবের আমেজ চারিদিকে, কিন্তু মানুষের মনে খুশীর জোয়ার ততটা নয়। প্রকৃতি পুজো মণ্ডপ নতুন সাজে সাজলেও চারিদিকে আলোর রেশনাই জ্বললেও, মানুষের মনকে উৎসবের রঙে রাঙানো যায়নি।

শারদীয় উৎসব বাঙালীর বহু প্রতীক্ষিত; তেমনি এই উৎসবকে কেন্দ্র করে তাদের কিছু বহু প্রত্যাশিত চাহিদা থাকেই। এবারে তার কতটুকু মিটেছে? প্রতিবারই সরকারী তরফে চেষ্টা চলে কিছু নতুন বিধি নিয়ম কানুন প্রয়োগের মাধ্যমে উৎসবকে সার্থক রূপ দেবার। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু মানুষের মনে চাপা অসন্তোষের কারণ তবুও ঘোচেনা।

পুজোর আমেজ নিয়ে গ্রাম শহরে এখনও অনেক পরিবারের মুখে হাসি ফোটেনি। অনেক পরিবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যারা নতুন জামাজুতোর আশায় অভিভাবকের মুখ চেয়েছিল, তাদের আশার মুখ আজ বেদনায় নীল। কি দিয়ে আশা পূরণ করবে অভিভাবকরা ছোট ছোট অবোধ শিশুদের? এই আশার কিছুটা মেটে প্রতিবারই বোনাস আর পুজো অগ্রিমের টাকা দিয়ে। কিন্তু এবারে তা কোথায়? বোনাস পুজো অগ্রিম আজও অনেকের ভাগ্যে জোটেনি। অর্ডিন্যান্সের ফলে বোনাসের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্য আজও অনেক শ্রম সংস্থায় শ্রমিক কর্মচারীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বেশ কিছু চটকল, ট্রাম কোম্পানী ও বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা চার ভাগ বোনাস প্রত্যাখ্যান করেছে। ট্যাংরার বেঙ্গল পটারী, ন্যাশনাল রবার, হিন্দুস্থান গ্লাস কোম্পানী প্রভৃতি ক্লোজার লে-অফ ছাঁটাই করা সংস্থাগুলোর মতো এমন অনেক সংস্থার শ্রমিক আছেন, যাদের বোনাস পাওয়া তো দূরের কথা দাবী করবার অধিকার পর্যন্ত নেই। বাটা কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে শ্রমিকদের পুজা অগ্রিম দেওয়া হবে না। চার ভাগ বোনাসের কথা শুনে

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

দর্পণের ছুটি

শারদীয় পুজা উপলক্ষে দর্পণের দু সপ্তাহ ছুটি। দর্পণ পুনরায় প্রকাশিত হবে আগামী ৩১শে অক্টোবর।

পুনর্মুদ্রণ

হিং টিং ছুট

কবি গৌড়ানন্দ

এই আয়না বস্তুটা যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার জন্ম শত্রুতা। কারণ কি জানেন?

* *

কারণ, আমার মুখটি যেমন আয়নাতে অবিকল তেমনি দেখায়। তাহলেই বুঝে দেখুন কেলেঙ্কারী কতদূর পর্যন্ত গড়ায়!

* *

আর আয়নাটাও, আপনার গিয়ে ভারতের সংবিধান তো নয়। তাই ওটাকে মেজরিটির জোরে খুসিমত যে বদলে নেব, সে উপায়ও নেই। কাজেই আমার অবিকল রূপটি তার মধ্যে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে বাধ্য হই।

* *

আমি এই সুমহান গৌড় দেশের জাতীয় কবি। প্রবল প্রতাপ মহারাজ হরচন্দ্র স্বয়ং আমাকে এই মহাসনে বসিয়ে গেছেন। কর্তার আমলে অবশ্য রাজকবিই ছিলাম। প্রজাতন্ত্রী ভারতে সাইনবোর্ডটি বদলে দিতে হয়েছে। আমাদের আমলের দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা এখন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। কিংসওয়ে হয়েছে জনতা পথ।...

* *

আমাদের এই গৌড়দেশ কালচারভোজী। গৌড়বাসী সব ছাড়তে পারে। কিন্তু তার কালচারের গায়ে আঁচড়টি লাগুক দেখি, অমনি সে তেরিয়া মেরীয়া। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, গৌড়ের এক কবিই সে গান গেয়ে গেছেন।

* *

এই গৌড়দেশ অতীতে মূর্খ ছিল। তখন গৌড়বাসীরা কালচার কাকে বলে জানত না। তাই তারা বিদ্যাচর্চায় মন দিয়েছিল। একদিন মহোৎসাহে ইস্কুল কলেজ বানিয়েছিল। সে সবের ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়।

* *

অবশেষে এ জাতি কালচারের মর্ম বুঝল। বিশ্বকবি যেদিন বললেন, বিদ্যেটা হল কমলাহীরে আর কালচারটা হল তার দীপ্তি—সেদিন গৌড়বাসীর যেন চোখ ফুটল। সেইদিন থেকেই তার সুবুদ্ধির উদয়। তাই সে ঝটিতি বিদ্যেটা ছেড়ে কালচার ধরেছে। তারই নগদ ফল কালচারাল কনফারেন্স। পাড়ায় পাড়ায় আজ কত প্যাণ্ডেল। এই দেশেতে জন্ম আমার কথাটা যত মনে পড়ে গর্বে ততই যেন ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়।

* *

গৌড়বাসী সাধে কবিদের খাতির করে। কালচারের মান রাখতে সে বই পড়ে না কিন্তু সভায় পৌরোহিত্য করতে কবিদেরই ডাকে। গৌড়দেশের কালচার কবিদের তার পুরুত বানিয়ে ছেড়েছে। এত সম্মান কে কবে কাকে কোথায় দিয়েছে।

* *

এ হেন গৌড়দেশের জাতীয় কবি আমি। আমি এ দেশের যৌগ্যতম প্রতিনিধি। আমাকে দিয়েই তো দেশকে চেনা যাবে। তাই আমি কত সাবধানে থাকি। কত যত্নে পোষাক পরি, প্রশাধন করি।

* *

কিন্তু ঐ আয়নাটা আমার সব শ্রম বরবাদ করে দেয়।

* *

আমার ধারণা, আমি সাক্ষাৎ চির যৌবনা শ্রীময়ী রাধা। কিন্তু আয়নায় ছায়া পড়ে কুব্জার। দেখি আমার আননে প্রৌঢ়ত্বের বলি কসমেটিকসের প্রলেপ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। সুর্মার কলিতে নয়নের কোলের শ্যাম কলঙ্ক আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। ইলাসটিকের কড়া বাঁধন সত্ত্বেও আমার অঙ্গ আমার স্বভাব শৈথিল্যে নিম্নমুখী হয়েছে।

* *

আমার ধারণা আমি বসরাই গোলাপ কিন্তু আয়নায় দেখি যেঁটু ফুল!

* *

কে না জানে আমি নিঃস্বার্থ দেশসেবক। দেশ বই আর কিছু জানি না।...

* *

আমি পরম নিষ্ঠাবান সাংবাদিক। আমার দাপটে গৌড়দেশ সতত কাঁপে। জাতির নৈতিক মানের আধোগতি কলমের খোঁচায় বন্ধ করে তাকে মনুমেন্টের ডগায় তুলি। মদ্যপান নিবারণী সভার আমি স্থায়ী সভাপতি। কিন্তু আয়নায় দেখি আমার সাত্ত্বিক গুম্ফ কেরু কোম্পানীর তামসিক দোলায় মধুর আবেশে দোদুল দোলে।

* *

আমি বামপন্থী প্রোলেতারিয়াত। দুনিয়ার মজদুরকে দুবেলা এক করি। সব সর্বহারার বিক্ষুব্ধ মিছিলে লাল ঝাণ্ডার নিচে নিচে পেটেন্ট লেদারের জুতো পায়ে মসমসিয়ে চলি। আর বেয়াই বাড়িতে জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব পাঠাই মুর্শিদাবাদ বালালোরের সিল্ক আর এম বি সরকারের গহনা। আয়নাতে ধরা পড়ি।

* *

আমি গৌড়দেশের যুবক। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কুলতিলক। নির্বিচারে প্রেম করি। কিন্তু বিয়ের সময়, জীবনে একবার মাত্র পিতৃআজ্ঞা পালন করি, পণের টাকা গুণে নিই।

* *

আমি বৈজ্ঞানিক। জড় পদার্থ অণুপরমাণুর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার উপর গবেষণা করে স্বর্ণপদক পাই। কিন্তু জামা খুলতেই আয়নায় দেখি বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর অষ্ট ধাতুর কবচ বাঁধা।

* *

আমার ধারণা আমি মহাজন, আমি ব্যবসায়ী, আমি মঠের সন্ন্যাসী। আমার ধারণা, আমি মন্ত্রী, আমি অধ্যাপক শিক্ষক, আমি ছাত্র। কিন্তু আয়নায় ভাসে এমন সব চেহারা যাদের আমরা হামেশাই লালবাজারে দেখি।

* *

বিক্রমে আমি ভীম কিন্তু সে যাত্রার ভীম। পরাক্রমে আমি সিংহ কিন্তু সে সিংহ সার্কাসের।

* *

আর আমার যা কিছু গৌরব, যা কিছু গরিমা, সে সব তো দেখি স্বপ্নমঙ্গলের কথা।

* *

বাস্তবের ছবি আয়নায় যথাযথ ফোটে। তাই আয়না আমার পরম শত্রু।

[২৬শে জানুয়ারী ১৯৫৮ সংখ্যা]

উৎসব প্রাক্কালে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সকলের মুখেই এক কথা: এই ভিক্ষেটুকু না দিলেই বা কি ক্ষতি ছিল। এই সামান্য বোনাসকেও যারা মুখ বুজে সহ্য করে নিয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই সেই সামান্য কয়েকটা টাকা হাতে পাবেন পুজোর আগের দিন। তা দিয়ে তারা কি করবেন তারাই জানেন।

পুজোর কদিন শহর মফস্বলের পথে সকলেই বেরিয়ে পড়ে খুশীর নেশায়, প্রতিমা দর্শনের জন্য। সকলেই চান এই সময়ে যানবাহনের সুব্যবস্থা। কিন্তু এ ব্যাপারে পরিবহন কর্তৃপক্ষগুলির তৎপরতা তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা। বাস ট্রামের ভাড়া অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও যাত্রীদের দুর্ভোগ যে কমেনি, তার প্রমাণ গত সপ্তাহে বেলগাছিয়ায় ট্রাম কর্মী ও যাত্রীদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ। এবছর বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা পুজোর সময়। অতএব যানবাহন সমস্যা, রাস্তার গর্ত এসব মিলিয়ে জনসাধারণের প্রচণ্ড দুর্ভোগ অনিবার্য।

সারা বছর হাত গুটিয়ে থেকে প্রতিবারই পুজোর আগে জঞ্জাল সাফাইয়ের মহড়া চলে। এবারেও পৌর কর্তৃপক্ষের তরফে জঞ্জাল-মুক্তির সাফাই গাওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে শহর জঞ্জাল মুক্ত হয়েছে কতটুকু?

পঞ্চচারীদের অসুবিধের কথা ভেবে, কলকাতা পুলিশ এবারে ফুটপাত আগলে কোন পুজোই করতে দিতে রাজী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে কলকাতার বহু অঞ্চলে বড় বড় রাস্তার ফুটপাত এবং সরু গলিতে প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। তার ওপর আছে প্যাণ্ডেলে মাইক-যুদ্ধের আতঙ্ক।

পুজোর সময় কলকাতার আরেকটা চেহারাও আছে, সেটা কুৎসিত, বীভৎস। রাস্তাঘাটে চুরি ছিনতাই, মেয়েদের সম্ভ্রম হানির ঘটনা আকছার ঘটে। রাত আটটার পরে পথের মোড়ে মোড়ে মদো মাতালের নৃত্য শুরু হয়ে যায়। দিন কয়েক আগে মদ নিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে যে টালবাহনা চলল, তার কোন শুভ ছায়াই এই উৎসবে পড়বে বলে মনে হয়না। প্রতিবারই অভিযোগ পাওয়া যায়, যারা এই দুষ্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করবে তারাও অনেকে এই বিকৃত রুচির আড্ডায় ভিড়ে যায়। তাই এ বারের পুজোয় সুব্যবস্থার ভরসা বড় কম। এটা কোন নির্বাচনের পূর্বাবস্থা নয় বলে মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর ভরসা আরও কম।

প্রিয় দাসমন্সী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আর এই দাম্ভিকতা আসে তার স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবনে সাধারণ স্তর থেকে হঠাৎ ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায়। না হলে নন্দিনী সৎপথীর মত সুহৃদকে তিনি তিনি বিরোধী করে তোলেন। শ্রীমতী সৎপথীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি উড়িষ্যার যুব কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠন করতে অস্বীকার করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়ার পর থেকেই চেষ্টা শুরু হয়েছিল নতুন নেতা খোঁজার। প্রিয়বাবু সব ব্যাপারটা আন্দাজ করেই আড়াই বছর ধরে জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির কোন সভা ডাকেননি। অবশেষে গত পয়লা অক্টোবর সভা ডাকতে তিনি বাধ্য হলেন এবং সেই সভায় প্রায় সব সদস্যই প্রিয়বাবুর অপসারণের পক্ষে রায় দিলেন। প্রিয়বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজ্যে রাজ্যে যুব কংগ্রেস কমিটি গঠনে তিনি গোষ্ঠী-গত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে কাজ করেছেন। তাই দলে বিরোধ বেড়েছে। তাছাড়া অন্যান্য নেতৃত্বের অভিযোগও তার বিরুদ্ধে সেই সভায় আনা হয়।

চুপ করে প্রিয়বাবু সব অভিযোগ শোনেন। কোন প্রতিবাদ করেন নি। কেবল বলেন যেহেতু সব সদস্য আজ উপস্থিত নেই তাই "পাঁচই অক্টোবর" আবার সভা ডাকা হবে এবং সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাঁচ তারিখের সভাতে প্রায় সব সদস্যই একমত হয়ে প্রিয় মুন্সীকে হটিয়ে দিলেন।

পুরুলিয়া জেলায় সাধারণ মানুষের ভয়াবহ দারিদ্র্য

কল্যাণ চৌধুরী

পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পশ্চাদপদ জেলা। মোট জনসংখ্যা ১৬·৫ লক্ষ। তার মধ্যে নয় লক্ষ তপশীলী ও আদিবাসী। তাদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক। বছরে কেবল তিন মাস তারা কাজ পায়, বাকি সময় বেকার—জুন থেকে অকটোবর এই কয়েক মাস কেন্দু বা মোহনা ফল খেয়ে তারা জীবনধারণ করে।

সংবিধানের তেইশ ধারায় দাসশ্রম প্রথা (বেগারি) নিষিদ্ধ হলেও পুরুলিয়ায় তপশীলী ও আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রথা ভিন্ন চেহারায় অদ্যও বর্তমান। প্রধানতঃ দক্ষিণ অংশের পার্বত্য অঞ্চলে। সাধারণতঃ উচ্চবর্ণের মহাজন বা জোতদারের কাছে অবস্থা বিপাকে এর ঋণ করে যার বদলে নিজেরা বা পরিবারের কোন লোক বেগার খাটে। টাকা শোধ হলে তবেই তারা এর থেকে মুক্ত হয়। সেটা না হওয়া পর্যন্ত সেই ব্যক্তি অথবা তার পরিবারের কোন লোক খোরাকির বিনিময়ে বেগার খাটে। যেহেতু সে কোন টাকা পয়সা পায় না তাই টাকা জোগাড় করার জন্য তাকে বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে পরিবারের কোন লোকের ওপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য সেই টাকা খুব কম ক্ষেত্রেই জোগাড় হয়। অতএব বেগার খাটা চলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, কখনো সারা জীবন, কখনো উত্তরাধিকার সূত্রে। ব্যাপক মহাজনী ঋণ, ক্রয়ক্ষমতার প্রচণ্ড অভাব এবং বছরে নয় মাস বেকারদশার ফলে দাসশ্রমপ্রথার সৃষ্টি হয়েছে পুরুলিয়া জেলার বন্ধ্যা পার্বত্য অঞ্চলে।

ঋণী ব্যক্তি ও তার পরিবারের মেয়েরা জোতদারের বাড়ি ঝি-চাকরের কাজ করে আর ছেলেরা গরু চড়ায়। পরিবারের সমস্ত লোকের কাজের বিনিময়ে শোধ হয় কেবল সুদ—আসল টাকাটা ধার হিসেবে থেকে যায়।

ইচাগড় পুলিশ থানার অন্তর্গত পরদি গ্রামের কুড়িজন রাজোওয়ারা হরিজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে, দশটি ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের ওপর পূর্বপুরুষদের ঋণ চেপেছে। পনেরোটি ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। মাত্র দুটি ক্ষেত্রে টাকা শোধ করার চেষ্টা হয়েছে। বারউনি রাজোওয়ার নামে পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ বলল যে, জোতদারের কাছে বেগার খাটার বিনিময়ে তাকে গ্রামে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

ইচাগড়, সোনাহাট বিমদি ও বাগমুন্ডি পুলিশ থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামের কৃষি-শ্রমিকরাই বেশি সংখ্যায় ঋণগ্রস্ত—যাদের মধ্যে অধিকাংশই হরিজন। প্রত্যেক গ্রামে দেড় হাজার জনসংখ্যার মধ্যে বারোশো ভূমিহীন হরিজন—যারা জোতদারের ক্ষেতে কাজ করে। এই অঞ্চলে চাষ করে বিশেষ লাভ হয় না। জমি অসমতল হওয়ার ফলে ছড়িয়ে থাকা বিস্তৃত জায়গার মধ্যে দ্বীপের মত ছোট ছোট জোতে চাষ করতে হয়। সম্প্রতি আমি যখন পুরুলিয়া গিয়েছিলাম তখন অনেকে আমায় বলেন যে, বর্ণহিন্দু জোতদারদের (অধিকাংশ মাহাতো সম্প্রদায়ের) কাছে এদের ঋণের পরিমাণ তিনশো থেকে ছশো টাকা। সুদ প্রতি মাসে টাকা পিছু ছ পয়সা, অর্থাৎ বছরে বাহাত্তর শতাংশ। এখানেও সেই বেগার খেটে সুদ দেওয়ার নিয়ম।

কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার বউ বা মেয়েকে শহরে পাঠিয়েছে দেহ বেচে পয়সা রোজগারের জন্য। এর পেছনে রয়েছে জোতদার-মহাজনের ষড়যন্ত্র। এই সব অনাদৃত দুর্ভাগা মেয়েদের অধিকাংশ সেই সব হরিজন পরিবারের যারা দীর্ঘকাল ঋণে ডুবে আছে। হরিজন মেয়েদের দেহ বিক্রয়ের পেছনে রয়েছে তাদের দারিদ্র্য। এই মেয়েদের পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিহীন, পুরুষরা শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ক্ষেত্রে সারাজীবন শ্রম দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। যে কোন হরিজন মেয়ের বাবা ভাই বা স্বামী উচ্চবর্ণের জোতদারদের জমিতে কাজ করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা জোতদারদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

জোতদারদের পক্ষে নাচনি বা নাচিয়ে মেয়ে রাখার প্রথা প্রচলিত। এদের দারিদ্র্য-জর্জরিত পরিবার থেকে সংগ্রহ করা হয়। কার কজন নাচনি আছে তাই দিয়ে জোতদারদের মর্যাদা বাড়ে। এদের সর্বসমক্ষে নাচিয়েও পয়সা রোজগার করা হয়।

অবশ্য পশ্চাদপদ লোকদের সচেতনতা বাড়ার ফলে দাস শ্রম প্রথা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। তপশীলী ও আদিবাসী যারা এখন দাস শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত তারা একথা স্বীকার করে না, কারণ তাহলে তাদের প্রভুরা তাদের উপর চটে যাবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এরা নিজেদের অবস্থা বুঝলেও এবং আইন মারফত তাদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে একথা জানলেও তারা আদালতের দ্বারস্থ হয় না।

দারিদ্র্য ও অনাহারে পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুধার্ত মানুষরা দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। ডাকাতি ও শস্য লুণ্ঠন আকছার ঘটছে যখন বিশেষ চাষবাস থাকে না। অবশ্য এখন তার সংখ্যা কমে আসছে, খাদ্যের জন্যে লোক ডাকাতি করতে বাধ্য হয়। নাহলে অনাহার অবধারিত। এর প্রমাণ মেয়েরা ও শিশুরা একাজে তাদের সাহায্য করে, প্রথমে লুণ্ঠিত শস্য বা অন্যান্য জিনিস তারা বহন করে নিয়ে যায়, তারপর ছেলেরা বড় হলে নিজেরাই ডাকাতি শুরু করে।

কুখ্যাত উপত্যকার ডাকাতদের মত এদের সকলেরই তেমন খ্যাতি নেই, যদিও গ্রামের লোকের মুখে মান সিং কর্তার সিং লক্ষণ সিং নামগুলো শোনা যায়।

পুরুলিয়া জেলায় এমন অনেক গ্রাম আছে যার চল্লিশ শতাংশ লোক ডাকাতি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুশো কি তার বেশী লোক দলবদ্ধ ভাবে টাঙ্গি, তরোয়াল, বর্শা, তীরধনুক নিয়ে নিকটবর্তী গ্রাম আক্রমণ করে, বাড়ী তছনছ করে, শস্য লুণ্ঠন করে, বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়। এই ধরণের ডাকাতি বাড়ে যখন ফেব্রুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাষের কাজ থাকেনা এবং এরা বাঁচে ফল খেয়ে। দারিদ্র্য তাদের পাগল করে তোলে এবং কখন কখনো তারা দু কিলো চালের জন্যে লোক খুন করে। সরকারের মতে পুরুলিয়ায় চাল কম হয় তা নয়। গত কয়েক বছরে এখানে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের শিল্পাঞ্চলে প্রচুর চাল চোরা পথে পাচার, প্রচণ্ড দারিদ্র্য, ক্রয়ক্ষমতার অভাব এবং কৃষি শ্রমিকদের সামান্য মজুরী হারের জন্যে জেলার পল্লী অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ অনাহারে থাকে ও অপুষ্টিতে ভোগে। স্থানীয় ডাক্তাররা যারা গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত বলেন পুরুলিয়ার ক্ষয় ও কুষ্ঠ রোগ বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ অপুষ্টি। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলাতেই কুষ্ঠ রোগী সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। সামাজিক দিক থেকে অচ্ছুত দশ হাজার কুষ্ঠ রোগী পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে শিমলপুরের একটি গ্রামে (ভিখারীদের গ্রাম নামে পরিচিত) নিজেদের সংগঠিত করেছে।

এখানে অন্তত এরা পরস্পরের সঙ্গ ও মানবিক উত্তাপ পাচ্ছে এবং তথাকথিত সুস্থ মানুষদের নির্মম ব্যবহার থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে। যদিও বিদেশের বহু কুষ্ঠ রোগের বিশেষজ্ঞ শিমলপুরকে বলেছেন "পৃথিবীর মধ্যে অসাধারণ গ্রাম", কিন্তু এই গ্রামের লোকদের বেঁচে থাকার জন্য ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সমাজবিচ্যুত এই দরিদ্র লোকেরা সহজেই সমাজ বিরোধীদের কবলে পড়ে যারা এই অঞ্চলে দলে দলে আসছে চোলাই মদ তৈরী ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য।

সরকারের কৃতিত্ব বড় করে বলার কিছু নয়। কর্তৃপক্ষকে যখন জিজ্ঞেসা করা হয় পুরুলিয়ার কুষ্ঠ নিবাস ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই সব লোকদের পুনর্বাসনের জন্য যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলার কথা বলেছেন সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তখন তারা পরিষ্কার কোন উত্তর দিতে পারেন না।

উপযুক্ত সেচ ও বৃষ্টির অভাবে গত বছর পুরুলিয়া জেলায় ৮·৫ টন চাল উৎপন্ন হয়েছে। সেখানে একটী মাত্র ফসল হয়। এই বছর উৎপাদন ৪·৫ টন বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা এক লক্ষ টনের চেয়ে অনেক কম হয়েছে এবং বেশ কিছু পরিমাণ চাল সীমান্ত পেরিয়ে টাটা, রাঁচি মুড়িতে পাচার হয়েছে। এখানে চালের দাম কিলোপ্রতি দুটাকা পঁচিশ পয়সা আর বিহারে চাল বিক্রি হয় চার টাকা দামে। পুরুলিয়া জেলায় এত পুলিশ নেই যে কর্ডন জোরদার করা যাবে।

এখনকার জমি ভাল নয় বলে চাষে খুব অসুবিধা হয়। উৎপাদনও খুব কম। সামান্য ফসল ফলাতে পুরুলিয়ার অনেক কৃষি শ্রমিক দরকার হয়। চাষের যোগ্য ৫·৬ লক্ষ একর জমির মধ্যে মাত্র ৮৫ হাজার একর জমিতে সেচের সুবিধা আছে। জেলার আশি শতাংশ জমি তিন হাজার জোতদারের দখলে।

প্রায় এক বছর পর পর খরার জন্য পুরুলিয়ায় চাষের ক্ষতি হয় ও শস্য নষ্ট হয় যখন চল্লিশ শতাংশ লোককে সরকারী খয়রাতী সাহায্য ও ষ্টেট রিলিফের কাজের উপর নির্ভর করতে হয়।

১৯৭৫ সালের মধ্যে পুরুলিয়ায় রিলিফের কাজে সাত কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রকৃত চেষ্টা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প গড়ে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা না করে সরকার যে মোটা টাকা বছর বছর সাহায্যের জন্য ব্যয় করছেন তাতে রাজনৈতিক নেতারা এমন কি জেলা কংগ্রেস কমিটিও সুখী নয়।

পুরুলিয়ায় সেচ ব্যবস্থা খুবই অনুল্লেখযোগ্য। নয় হাজার কূপ আছে পুরুলিয়ায়, কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলো শুকনো। সরকার কুড়িটি ব্লকে একশটি কূপ খনন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র পঁচিশটি খনন করা হয়েছে। পুরুলিয়ায় প্রচণ্ড জলের অভাব, অথচ এখনে প্রকৃতপক্ষে কোন গভীর নলকূপ নেই। প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এই জেলায় কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি। অথচ এখানে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারত। পুরুলিয়া শহরের কাছে গত জুলাই মাসে যে সাবেধন নীলমণি মিনি ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করা হয়েছিল সেটি উৎপাদন শুরু করার পনেরো দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। কেন বন্ধ হয়ে যায় তা জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে অজ্ঞাত। এই প্রকল্পের অর্ধেক খরচ ইন্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ও রাজ্য সরকার ভাগ করে নেয়। জেলা কর্তৃপক্ষ কারখানা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জানার জন্য প্রকল্পের পরিচালকদের কাছে বহুবার আবেদন করা সত্ত্বেও কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। তাদের অজুহাত যে বিদ্যুৎ-সরবরাহ অনিয়মিত, সেট বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঝালদায় সিমেন্ট ফ্যাক-

দুটি মৃত্যু

রাজকুমার চক্রবর্তী

বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী শিক্ষাগুরু রাজকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের জীবনাবসান ঘটেছে। হয়তো পরিণত বয়সেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মত শিক্ষকগুরু, উন্নতশির চিন্তাবিদ এবং সমাজকল্যাণব্রতী ব্যক্তিত্বের অভাব বড্ড বেশী করে মনে হচ্ছে। জীবনের যা কিছু সঞ্চয় তার সবই তিনি দান করে গেছেন জনকল্যাণে।

শ্রদ্ধেয় রাজকুমার চক্রবর্তী তাঁর বয়সের সীমানা অতিক্রম করেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বর্তমান যুগচিন্তার প্রতি গভীর প্রত্যয় রেখে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেছেন। যদিচ তিনি বামপন্থী ভাবাধারাকে অন্তরগ্রাহ্য করেননি, কিন্তু একই সঙ্গে সনাতন সংস্কারের বশবর্তী হয়ে রক্ষণশীলতার নিগড়েও তিনি বন্দী করেননি নিজেকে। এখানেই তিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল এক অনন্যকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

আজকের শিক্ষাজগতে যেখানে নৈরাজ্যের উন্মত্ত তান্ডবে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই পর্যুদস্ত, যেখানে উপাচার্য, অধ্যক্ষ প্রমুখ শিক্ষাজগতের শীর্ষনায়করাও এখন দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসন এবং শাসক সম্প্রদায়ের পোষা বয়স্যদের হামলাবাজী কর্মসূচীর কাছে নিয়তই নতশির, যেখানে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি হোস্টেলের কোন কোনটি পরিণত হয়েছে প্রকাশ্য গুন্ডামী এবং বদমায়েসীর আড্ডখানায়, সেই অন্ধকারে পথ দেখাবার মত শলপ্রাংশু ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন প্রয়াত শ্রদ্ধেয় রাজকুমার চক্রবর্তী। আনতশির শ্রদ্ধা জানাই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে।

জে নটরাজন

বোম্বে ক্রনিকেল ও ফ্রী প্রেস জর্নালের সম্পাদক জে নটরাজন সম্প্রতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ভারতীয় সাংবাদিকতার অন্যতম ঐতিহাসিক এবং সুদক্ষ সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। সহযোদ্ধার আনুগত্য নিয়ে আনতশির অভিবাদন জানাই অগ্রজ সাংবাদিকের স্মৃতির উদ্দেশে।

—সর্বাণী গৌতম

টরী ও মধুকন্ডায় অ্যালয় স্টীল কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব এখনো চূড়ান্ত হয় নি।

সরকারে ন্যস্ত কৃষিজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার কাজ খাতায় কলমে সম্পূর্ণ। কিন্তু ভূমিহীন চাষীদের এটা একটা সাধারণ অভিযোগ যে জমি বিলি বেশীর জমির মালিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভূমিসংস্কার অফিসের জনৈক মধ্যপাত্র জানালেন যে বেশী জমির মালিকরা তাদের উদ্বৃত্ত জমি হাসিমুখে সরকারকে দিয়ে দিয়েছে। এর একটা কারণ আছে, উদ্বৃত্ত জমির

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

কয়লাখনি পরিক্রমা (৪)

পরিচালন কাঠামোর পুনর্বিন্যাসে প্রশাসনিক দুর্নীতি কমবে?

সাধন গুহ

পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোতে আমরা দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনা নিরোধক যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে উৎসাহহীনতার অভিযোগ এবং কয়লা শ্রমিকদের মানুষের মর্যাদা না পাওয়া ইত্যাদি কারণগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। ইতিমধ্যে উনিশে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনির প্রশাসনিক কাঠামোর লক্ষ্যণীয় রদবদল ঘটে গেছে। বি সি সি এল, সি এম এ এল, অম্বের সিঙ্গারণী কোলিয়ারী লিমিটেড নিয়ে গঠিত হলো একটি হোল্ডিং কোম্পানী যার নামকরণ হলো কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। এর নতুন চেয়ারম্যান হলেন লেঃ জেঃ গ্রেওয়াল। সদর দপ্তর কলকাতায়, এখন থেকে সি এম এ এল ইষ্টার্ণ ডিভিশনের নাম হবে ইষ্টার্ণ কোল ফিল্ডস লিমিটেড অথবা ই সি এফ এল। কর্তৃপক্ষের কথামত এই রূপান্তরণের ফলে প্রতেকটি প্রাক্তন সংস্থার লাভলোকসান ভাল ভাবে খতিয়ে দেখা সম্ভব হবে। সি এম এ এল দুবছরেই প্রায় একশ কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। নতুন সংস্থা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কোন নেতিবাচক মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু নতুন সংস্থার বোর্ড অব ডাইরেকটরসে যেহেতু অধীনস্থ কোম্পানীগুলোর ম্যানেজিং ডাইরেকটররাই থাকছে সেইহেতু এই সংস্থা কতটা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের পত্তন করতে পারবে তা অবশ্য দ্রষ্টব্য। এতদ্‌সত্বেও, নতুন সংস্থার চেয়ারম্যান লেঃ জেঃ গ্রেওয়ালের কিছু কিছু মন্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই।

গত পঁচিশে সেপ্টেম্বর ই সি এফ এল-এর সাঁক তোরিয়া হেডকোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে লেঃ জেঃ গ্রেওয়াল সাংবাদিকদের কাছে মুক্তকণ্ঠে আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, সাংবাদিকরা যেন দুর্নীতির সব খবরগুলো তাঁর কাছে তুলে ধরেন এবং তিনি সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহেই আশার কথা। জাতীয়করণের পর কয়লা শিল্পের সঙ্গে আমাদের এবং সারা দেশের সম্পর্ক সহোদরপ্রতিম।

জাতীয় স্বার্থেই এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদের প্রয়োজন আছে। লেঃ জেঃ গ্রেওয়ালকে আমরা অনুরোধ করবো, তিনি শক্তহাতে হাল ধরুন। তিনি দেখবার চেষ্টা করুন কেমন করে গত দু বছরে সি এম এ এল-এর প্রশাসনিক দপ্তর জনসাধারণের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, তিনি দেখবার চেষ্টা করুন, কিভাবে কিছু কিছু অফিসার বে-আইনীভাবে অর্থ উপার্জন করছে, কিভাবে সি এম এ প্রশাসনের সঙ্গে ঝন্দোবস্ত করে বাইরের ব্যক্তিবিশেষও নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। ইতিপূর্বেই সমস্ত ঘটনার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ডি ও স্লিপ কেলেঙ্কারী

কয়লার ডেলিভারী অর্ডার অর্থাৎ ডি ও স্লিপ নিয়ে একদল অফিসার অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত মত মোটা আয় করছে। অসৎ ব্যবসায়ীরা মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে বিপুল পরিমাণ কয়লা ট্রাক বোঝাই করে এবং ঘুষের টাকা মুনাফার সঙ্গে যুক্ত করে ইচ্ছামত বাজারে কয়লার দাম দিনের পর দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওয়াগন বোঝাই করার প্রশ্ন এলেই নানা কল্পিত ইস্যুর ভাটি এবং অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের নাম করে মিথ্যা ডি ও স্লিপ ইস্যু করে সেগুলো পেছন পথে অসৎ ব্যবসায়ীদের ট্রাকে বোঝাই করা হচ্ছে। লেঃ জেঃ গ্রেওয়াল এগুলো সম্পর্কে খবর নিন।

লোকাল পার্চেজ

ষ্টোরের জন্য লোকাল পার্চেজের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। সংশ্লিষ্ট অফিসাররা নিজেদের পেটোয়া লোকদের কন্ট্রাক্ট দিয়ে পেছন দরজা দিয়ে বেশ কিছু কামিয়ে নিচ্ছে। বাহ্যতঃ তারা আইনানুগ ভাবেই কাজ করছে। যেমন একই ব্যক্তি বিভিন্ন নামে তিনটি কোটেশন দিলেন। একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে। বাকীগুলো স্রেফ কাগুজে সংগঠন। এসব কাগুজে প্রতিষ্ঠানের কোটেশন একটু বেশী দেওয়া হয়। এবং আসল প্রতিষ্ঠানটির কোটেশন তুলনামূলকভাবে কম রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট অফিসার খুবই সততার অভিনয় করে তুলনামূলক কম কোটেশনটি গ্রহণ করেন। দর্পণের প্রতিনিধি এই অঞ্চল পরিক্রমা করতে গিয়ে এমন অভিযোগও পেয়েছেন যে, এইসব লোকাল পার্চেজের ভয়াবহ দুর্নীতির মাধ্যমে একমাত্র সোদপুর সেন্ট্রাল ষ্টোরের অফিসার ও কর্মচারী প্রতি মাসে হাজার হাজার কালো টাকা রোজগার করে। সব কোলিয়ারীতেই এই দুর্নীতি চলছে। বাইরে থেকে এটা ধরা যাবে না। লেঃ জেঃ গ্রেওয়াল একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই এটা ধরা পড়বে।

সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট

কয়লাখনি জাতীয়করণের পর অদ্যাবধি কুলী ধাওড়াগুলোর দিকে কেন দৃষ্টিই দেওয়া হয় নি। অথচ, সি এম এ ইষ্টার্ন ডিভিশনের অফিসারদের বাংলো পুনর্বিন্যাসের খাতে ইতিমধ্যেই পঁয়ত্রিশ লক্ষেরও বেশী টাকা খরচ করা হয়েছে। এই দপ্তরে চুণকাম, সারাই, পিচ ফেলা ইত্যাদি নানা কাজের মিথ্যা বিল পেশের মাধ্যমে হাজার হাজার টাকা চোরা পথে চলে যাচ্ছে। সিভিল ইঞ্জিনীয়ার মহাশয়ের বাংলো পুনর্বিন্যাসের নামে অতি খুচরো কাজ করেও খরচ দেখানো হয়েছে একুশ হাজার টাকা। এমনি করে অফিসারদের বাংলো সারাই করার নামে ছোট খাটো কাজেরও বিল হয় কম করেও হাজার টাকা। গ্রেওয়াল সাহেব একটু তদন্ত করে দেখুন অভিযোগ সত্যি অথবা মিথ্যা।

জমি সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ

জমির ক্ষতিপূরণের নামে জনসাধারণের অর্থ ঢালাওভাবে যাচ্ছে অসৎ মুনাফা শিকারীদের পকেটে। জাতীয়করণের বহু আগে যে সব গ্রামে কোলিয়ারী সংলগ্ন জমিতে ধ্বস নেমেছে জাতীয়করণের পর সেই ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করে সি এম এ একমাত্র হিজলী গ্রামেই তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছে। প্রাইভেট সেকটরের আমলে যে সব ক্ষতিপূরণ দেবার কথা সেগুলো দেওয়া হয়েছে সি এম এর কোষাগার থেকে। সি এম এ এল ইষ্টার্ন ডিভিশনের লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত জনৈক অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের রহস্যজনক আনুকূল্যে এক, তিন এবং ছয় নম্বর এরিয়ায় এমন অনেক টাকা জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ পেয়ে যাঁরা পেয়েছেন। এই বাবদ প্রাক্তন কন্ট্রাক্টার জে দাস পেয়েছেন এক লক্ষ সাইত্রিশ হাজার টাকা এবং এস ব্যানার্জী পেয়েছেন পঁয়ষট্টি হাজার টাকা। আলকুশা গ্রামে পরিত্যক্ত জমির জন্য ছয় লাখ টাকা ঠিক করা হয় যদিও সার্ভে এসেসমেন্টে এর পরিমাণ ধরা হয় চার লাখ টাকা। পরে এই অঙ্ক বেড়ে হয়ে যায় আট লাখ টাকা এবং এটা এম ডি-রও অনুমোদন পায়। এখানে স্মর্তব্য যে, এই প্রাক জাতীয়করণ জমি বিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সিনিয়র ল অফিসার ক্ষতিপূরণ মারফৎ মীমাংসার পরামর্শ দিলেও সি এম এ এল-এর সলিসিটাররা উনিশশো সাতান্ন সালের ন্যাশনালাইজেশন এ্যাক্টের 2 (h) vi ধারার উল্লেখ করে সিনিয়র ল অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। লেঃ জেঃ গ্রেওয়াল আশা করি এই ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই এই বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

কোল ফিল্ড ট্রিবিউন

লেঃ জেঃ গ্রেওয়ালের কাছে আর একটি তথ্য তুলে ধরে দেখাতে চাই যে, কেমন করে একদা কয়লাখনির কর্মচারী এবং বর্তমানে সাংবাদিক জনৈক ভদ্রলোক সি এম এ এল অর্থাৎ বর্তমানে ইষ্টার্ণ কোল ফিল্ডস লিমিটেডের টাকায় নিরুপদ্রব সুখে ব্যক্তিগত মুনাফা লুটছে। ভদ্রলোকের নাম শ্রীদামোদর গুপ্ত। ইনি পি টি আই-এর আসানসোলস্থ প্রতিনিধি এবং "কোলফিল্ড ট্রিবিউন" নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক। কাগজটি দেখলে মনে হবে কোল মাইনস অথরিটির একটি বুলেটিন। কাগজটি শুধু সি এম এর বিজ্ঞাপন নিয়েই প্রকাশিত হয়। আমি আমার হাতের কাছে যে কয়েকটি সংখ্যা আছে তা থেকেই বিবরণ উদ্ধৃত করছি। বারো নম্বর ভলিউমের সাতাশ নম্বর সংখ্যাটির পৃষ্ঠা সর্বসাকুল্যে ষোল। এর আটটি পূর্ণ পৃষ্ঠায় আছে সি এম এর বিজ্ঞাপন। অন্যান্য সরকারী বিজ্ঞাপন তিন পাতা। তেরো নম্বর ভলিউমের

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

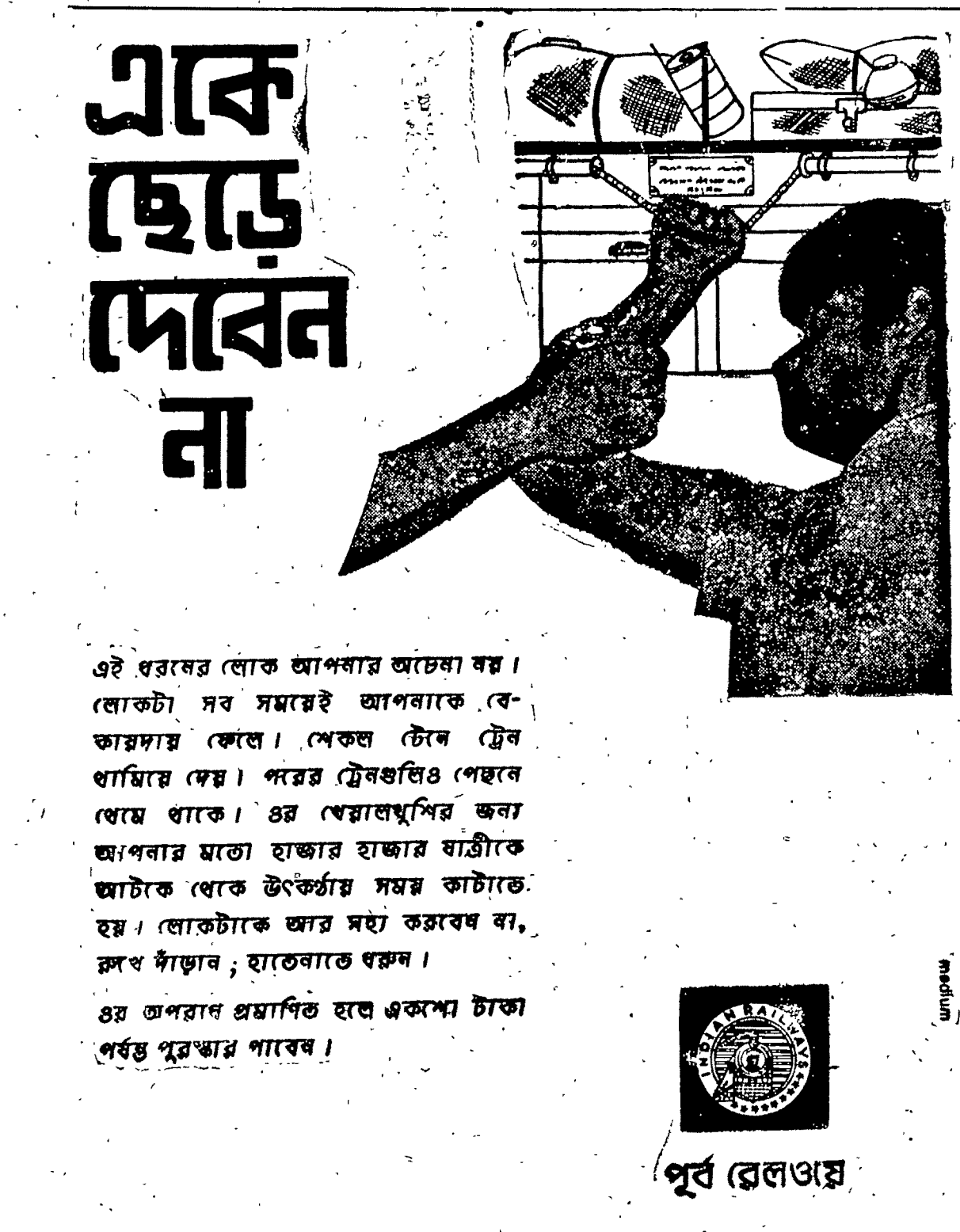

ডায়েরির মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইরাবান বসুরায়

এক্ষণ পত্রিকায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি প্রকাশ করতে গিয়ে সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে এই ডায়েরির কিছু অংশ নিয়ে প্রতিক্রিয়াপক্ষ উল্লসিত হতে পারেন। অপরদিকে প্রগতিশিবিরে উঠতে পারে আপত্তি। বস্তুতঃ প্রতিক্রিয়া-পক্ষের উল্লাস নয়, প্রগতি-পক্ষের আপত্তিটাই সংশয়জনক। আর এ আপত্তি প্রকাশ্যতঃ তেমন না হলেও আড়ালে আবডালে নানাভাবেই উচ্চারিত হচ্ছে।

ডায়েরি নিঃসন্দেহেই পার্টি বা সমালোচকের মুখ চেয়ে লেখা হয়না। সামাজিক প্রতিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রচয়িতার যে ভাবনাগুলো একেবারেই নিজস্ব, যেখানে পাঠকের সাথে সেতুবন্ধনের তাগিদ থাকেনা ডায়েরিতে সেগুলোই ধরা থাকে। এই আপনকথা এজন্যই লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেন না—এই না বাঁধা সেতুর জন্যই। নইলে গোপনতার অন্য কোন কারণ নেই; লেখক ব্যবসায়ী নন। তাঁর দু নম্বর হিসেবের খাতার প্রয়োজন হয় না। আর ডায়েরিতে যে সব অভিজ্ঞতার সূত্র বিধৃত থাকে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই পূর্ণ চেহারাই পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়; তা সত্ত্বেও লেখকের এই ডায়েরী জাতীয় রচনাগুলির পাঠকের এক ধরণের গোপন লোভ থাকে; রচনার মধ্য দিয়ে যে লেখকটিকে দেখা যায়, তার সর্বাঙ্গীন চেহারাটি পাঠক দেখে নিতে চান অনেক সময়। লেখক যা লেখেন, ব্যক্তিগত জীবনে তাই বিশ্বাস করেন কিনা—এমনতরো গবেষণা নিশ্চয়ই পাঠকের প্রিয় বিষয়। ডায়েরি থেকে পাঠক আসলে চিনতে চান প্রিয় লেখকের অন্তরঙ্গ রূপ, ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ঘনিষ্ট মানুষদের ক্ষেত্রে পোষাকী ভদ্রতার আড়াল সরে যায়। সে রকমই।

এখন লেখক পাঠককে এ সুযোগ দেবেন কিনা সেটাও প্রশ্ন। সাধারণতঃ লেখক তা চাননা। তাহলে ডায়েরি সম্পর্কে কি ভূমিকা নেওয়া হবে। যে লেখকদের ডায়েরি বা তার অংশবিশেষ পাঠকের কাছে পৌঁছয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি প্রকাশিত হয় তাঁদের মৃত্যুর পর। আর ডায়েরি পাঠকের হাতে পৌঁছায় দু উপায়ে হয় স্বতন্ত্র রচনা হিসেবেই, নয়ত তাঁর রচনার উপাদান হিসেবে ডায়েরির বিবৃত সূত্রগুলির গবেষণাধর্মী ব্যবহারের সুযোগে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কটি ডায়েরি আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি স্বতন্ত্র রচনারূপেই পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়েছে।

লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বহু-আলোচিত, যদিও আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন এখনও রয়েছে। পাঠক জানেন সারাজীবন লেখক মাণিক "জীবন"কে ধরতে চেয়েছেন। হয়ত সব লেখকই করেন, কেউ কেউ করেন, ন, তবে মাণিকের মত তীব্রতা ও স্পষ্টতা আর কোন বাঙালী লেখকের রচনায় নেই। ডায়েরির মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি সেই জীবন-অনুসন্ধানী, স্পষ্ট করেই বলা যায়—হ্যাঁ।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত ডায়েরিগুলির (এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮১ ও একাদশ বর্ষ / ৩*৪ সংখ্যা ১৩৮১) সময় সীমা ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ তাঁর সাহিত্য জীবনের শেষ অংশ। যে সময়ের প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন—"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমারু বিমানের গর্জন শুনতে শুনতে, মন্বন্তরের কঙ্কাল—কয়েকটি পায়ের তলায় দলিত করে আরো বহুদূর বিস্তীর্ণ পথের অতিক্রমন অবশিষ্ট ছিল তার জন্যে। দ্বিতীয় জন্মের জন্যে প্রস্তুত হইলেন তিনি (বাংলা গল্প বিচিত্রা)। এই দ্বিজ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই পাওয়া যাবে তার ডায়েরিতে।

এই ডায়েরিতে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য টুকরো টুকরো মন্তব্য। এই মন্তব্যগুলির লক্ষ বা উপলক্ষ আত্মীয়, বন্ধব, পরিচিতজন, বা নিছক প্রয়োজনে যাদের কাছে যেতে হয়েছে সেইসব ব্যক্তিকা আর সমসাময়িক ব্যক্তিগত, বা পারিবারিক বা সামাজিক ঘটনাবলী। এই ডায়েরিতে ধরা আছে তাঁর বিশ্বাস, তাঁর সংশয়, তাঁর রাজনৈতিক চেতনা, আর হয়ত বা এক ধরণের আধিদৈবিক উপলব্ধির ফল। পাশাপাশি এই সময়ে রচিত তার উপন্যাসগুলির দিকে তাকালেও দেখা যাবে তাঁর নতুন চেতনার ছাপ, চরিত্রগুলিকে তীব্র আলোর সমনে দাঁড় করিয়ে তাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে পাওয়ার নিদর্শন। ডায়েরিতেও সেই প্রয়াস—তবে এখানে অন্য কোন চরিত্র নয়, মাণিক সন্ধানী আলো ফেলেছেন নিজের ওপরেই। তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখছেন গল্পের প্লট। মাণিক জানছেন চাষীরা আংশিক শ্রমিক। কারখানা শ্রমিকের সঙ্গে তার কনট্রাস্ট ও মিল দেখানোর কথা মনে থাকে তাঁর (ডায়েরী ২৩-১০-৩৫)। পাশাপাশি সুর নিয়ে, গান নিয়ে ভাবছেন, প্রবন্ধ লিখতে চাইছেন, বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করতে চাইছেন (১৬-১-৪৬)। চীনা অতিথি চেন হান সেং-এর সঙ্গে আলোচনার বিবরণে মাণিকের নিজের মতামত ধরা পড়ে। জহরলালের আন্তর্জাতিক জ্ঞানহীন আত্মপ্রধান চেতনা, শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের তুলনায় কবির ঘরবাড়ির উন্নত অবস্থায় বিস্ময়—ডঃ সেং-এর এই মতগুলির পরেই মাণিক তাঁকে বলছেন স্মরণীয় ব্যক্তি; তাঁর কথা শুনে নতুন অভিজ্ঞতা হল (৩১-১-৪৬)। কমিউনিস্ট বলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আক্রমণ চালাচ্ছে। তার ওপর (১৭-৮-৪৬) পারিবারিক সমস্যার চাপে বিব্রত হচ্ছেন তিনি (৭, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৬)। আর এরই মাঝে সেই চিরচেনা, আপোষহীন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জোরের সঙ্গে যিনি নিছের সম্পর্কে দাবী করতে পারেন "আমিই একমাত্র খ্যাতনামা লেখক যে সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করেনি" (১৭-১-৪৮)।

এই আপোষ বিরোধী মনোভাব মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে, গল্পে, জীবনে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মাণিক উপনীত হয়েছিলেন মার্কসবাদে, তখন নিজের পূর্ব-পক্ষের অসম্পূর্ণতা স্বীকারে তার কোন কুণ্ঠা ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল না নতুনতর চেতনাকে সাহিত্যে রূপ দিতে কোন দ্বিধা। এর ফল অবশ্য তাঁর জীবিকার পক্ষে খুব শুভ হয়নি। বিরূপ পরিস্থিতিতে মাণিক মন-রাখা কথা বলতে পারেননি। উপন্যাসের পরবর্তী সংস্করণ কোন প্রকাশক নিতে চাইছে না, ডায়েরিতে তার নামোল্লেখ করে মাণিক মন্তব্য করছেন। বোধহয় উপর-মহলের চাপে, আর সেই সঙ্গে এ রমক হওয়ার রাজনৈতিক কারণও ব্যাখ্যা করছেন (৪. ১, ৪৯)। পারিবারিক জীবনেও যেখানে দেখছেন সুবিধাবাদ, সেখানেই তীব্র শ্লেষ জানাচ্ছেন। শেষদিকের অনেক রচনায় মাণিক এক ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের হলেও পারিবারিক সঙ্কীর্ণতার বাইরে, পরিবারের গুরুজনস্থানীয়দের স্বার্থপর বুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসছে। ডায়েরি থেকে মাণিকের নিজের পারিবারিক জীবনেও এই সঙ্কীর্ণ সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায়—দাদার প্রসঙ্গে। দাদার স্বার্থপর ব্যবহারের বিবরণই নয় শুধু, তার মানসিকতাও বিশ্লেষণ—"স্কলারশিপের লোভে—বড় চাকরীর লোভে পড়ত, জ্ঞানের জন্য নয়। গবর্ণমেন্টের চাকরী পেয়ে তাই অনায়াসে বিজ্ঞান চর্চা ছাড়ল। (২৫. ১. ৪৯)

কখনই গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে রাজী ছিলেন না মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন কি মার্কসবাদের ক্ষেত্রেও না। সাহিত্য-বিচারে মাণিকের দীর্ঘ, পরিচ্ছন্ন ভূমিকা মোটামুটি পরিচিত। নতুন রাজনৈতিক চেতনাকে সাহিত্য বিচারে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মাণিক যে যান্ত্রিকতা-বিরোধী বস্তুবাদী মনোভাবের পরিচয় রেখেছিলেন, ডায়েরিতেও সেই পরিচয় লিপিবদ্ধ। মার্কসের সেক্সপীয়র—অনুরাগের সূত্রে সেকসপীয়রকে বিপ্লবী বলে দাঁড় করানো ও যেহেতু ঐ সময়টা বুর্জোয়া উত্থানের সময় তাই সেকশপীয়রের নাটকে প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের প্রতিধ্বনি শোনার যান্ত্রিক অমার্কসীয় ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন ধরেই মার্কসবাদী মহলে চলতো, (এখনও চলে, তবে উৎপল দত্তের "সেকসপীয়রের সমাজচেতনা" যে ভাবেই হোক, এই অনড় ব্যাখ্যায় একটু ধাক্কা লাগিয়েছে)। মাণিক এই যান্ত্রিকতাকে মেনে নিতে পারেননি, তাঁর সংশয় জেগেছে তাহলে তার নাটক কেন ফিউডালের ক্রোধ জাগায়নি। বুর্জোয়া বিপ্লবের পর ধ্বংস (২৪. ৩. ৪৯)। স্বভাবতই এই প্রশ্ন মার্কসবাদী সাহিত্য-আলোচনার মৌল প্রশ্ন। ডায়েরীর এই ছোট অংশটুকু থেকে মানিকের মার্কসবাদকেও বোঝা যায়। বোঝা যায় নিছক পুঁথিপড়া, বিশ্বাসী মার্কসবাদী তিনি নন। তার আগ্রহও বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার দিকে। শুধু প্রশ্ন বা সংশয়ই নয়। নিজেকে তিনি যুক্ত রাখছেন প্রগতি আন্দোলনের নানা দিকের সঙ্গে, অবশ্যই যা তাঁর পক্ষে সম্ভব সেই সীমার মধ্যেই। প্রগতি লেখক সম্মেলনে থাকছেন তিনি। থাকছেন সারা ভারত শান্তি সম্মেলনে (২২. ৪. ৪৯; ২২. ১১. ৪৯—২৭. ১১. ৪৯)। এই সঙ্গে ভাববাদীদের স্বরূপ ধরা পড়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে, শান্তিনিকেতনে শান্তিবাদী সম্মেলনের স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে তিনি চিহ্নিত করছেন 'মতলব যুক্ত স্বপ্ন' বলে (২. ১২. ৪৯)।

পারিবারিক প্রসঙ্গের উল্লেখগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মাণিক গজদন্ত মিনারের বাসিন্দা ছিলেন না। শুধু দারিদ্র্য নয়, রোগও তাঁর চিরসঙ্গী। পঞ্চাশ সালের জানুয়ারী মাসের কয়েকদিনের ডায়েরিতে বার বার স্ত্রীর অসুস্থতার উল্লেখ, সেই সঙ্গে সাংসারিক দায়িত্ব পালনের ভার যে একা তাঁর ওপরই সেই সংবাদ। আর লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখতে হত এরই মাঝে। কেন না লেখাটা তাঁর কাছে কোন সময়েই সখের নয়, লেখা তাঁর কাছে কলমপেষা মজুরি। এরই সঙ্গে থাকছে টুকরো, কিন্তু অত্যন্ত সচেতন রাজনৈতিক মন্তব্য—"এই ভাবেই চলছে। ডলির বিছানা ছাড়া ডাক্তারের নিষেধ···সব আমি করছি একা। বাবার বিশেষ রান্নাবান্না সেবাযত্নের এতটুকু ত্রুটি নেই। না করলে চলবে কেন? দায়িত্ব নিয়ে তো পালন করা চাই। ২৬শে ভারত রিপাব্লিক হবে। কনস্টিটেউশন শ্রমিক বিরোধী" (১৫. ১. ৫০—২৫. ১. ৫০)। এই রাজনৈতিক বোধ সম্পন্ন, সেই সঙ্গে দায়িত্ব-সচেতন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই কি বারবার পাওয়া যায় না তাঁর উপন্যাসে বা গল্পে?

শুধু পারিবারিক জীবন নয়। সাহিত্য বা রাজনীতির সূত্রে বিভিন্ন, মূলতঃ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষদের সংস্রবে তাকে আসতে হয়েছিল। মাণিক দেখেছেন, কি প্রতিক্রিয়া, কি প্রগতি, উভয় শিবিরেই পেটি-বুর্জোয়ার সুবিধাবাদ। প্রগতি আন্দোলনের কর্মী হয়েও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নানা ব্যক্তির সুবিধাবাদকে মাণিক মেনে নিতে পারেননি। আপত্তি জানিয়েছেন (১৯. ৪. ৫০—৫. ৬. ৫০; ১৪. ৬. ৫০) তীব্র স্বরে বলেছেন—স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা কি ভাবে নিজেদের জোট বাঁধছে (৫. ৬. ৫০)। মাণিকের ডায়েরী থেকেই জানা যায় ব্যবসাদারীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল—এদের ভেদ রেখা খুব অস্পষ্ট। নানা প্রতিক্রিয়াশীল প্রকাশকের সঙ্গে কাজ করার তিক্ত অভিজ্ঞতা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল, সেই সঙ্গে যুক্ত হল প্রগতিশীল প্রকাশকের ব্যবসাদারির চেহারা। আর মাণিকের প্রতিক্রিয়াও স্পষ্ট দেবকুমার ও প্রফুল্ল দুজনেই ধূর্ত (১৫. ৬. ৫০)। প্রগতি আন্দোলনের কর্মী গোপাল হালদার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, নরহরি কবিরাজ, দেবকুমার গুপ্ত, প্রফুল্ল রায়—এদের মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া মানসিকতার যে নানা সঙ্কীর্ণতা তিনি দেখেছেন, সহকর্মী হিসেবে সেগুলো সম্পর্কে মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। হয়ত একটু রূঢ়, তাহলেও সত্য ভাষণ করেছেন। —"সত্যেনদার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা।···দৈনিক মদটা জোটাবার জন্য যে কোনরকম সুবিধাবাদ (২. ৯. ৫০) বা প্রগতি সম্মেলনের অধিবেশনে" আমার ঘাড়ে দায় দিয়ে গোপাল ননীরা সরে পড়ল (১৫. ৪. ৫৩)।

ডায়েরির এই বিভিন্ন উল্লেখ থেকে যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাওয়া যায়, তিনি লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিন্ন তিনি আপোষহীন শিল্পী। আর এই আপোষ বিরোধিতার সূত্রেই দুটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এক তাঁর লেখার দিক অন্যটি তাঁর আধিদৈবিক উপলব্ধির বিষয়টি।

মদ খাওয়ার ব্যাপারে মাণিক

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

পুরুলিয়া জেলা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

মালিকরা সরকারকে জমি দিয়ে একদিকে তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন, অপরদিকে ভূমিহীনদের জমি বিতরণের সময় বেনামদার জমিহীন চাষীদের মারফত নিজেদের জমিগুলো বায়দা করে ফেরত পাচ্ছেন বিনা পয়সায়। এটা খুব শক্ত কাজ নয়, কারণ অধিকাংশ বেশী জমির মালিক ব্লক স্তরে ভূমিসংস্কার উপদেষ্টা কমিটির সদস্য যার উপর জমি বিলি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংশোধনের কবলে সংবিধান (২)

রমাপ্রসাদ মল্লিক

এবার দেখা দিল দিগ্‌দর্শী সাংবিধানিক নীতির দোহাই পাড়া। সরকারী আইন-প্রণেতারা সুচারু কৌশলে পেশ করলেন ৩১ (সি) উপধারা, যার ফলে পার্লামেন্ট এমন কি রাজ্য-আইনসভাদেরকেও ক্ষমতা প্রদান করা হল এমন আইন পাস করার, যা উক্ত দিগদর্শী নীতিকে রূপায়িত করবে। কিন্তু সঙ্গে ফ্যাঁকড়া জুড়ে দেওয়া হল, মৌলিক অধিকারকে ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে। উদাহরণতঃ আর্টিকল্ ১৪, যা প্রত্যেক নাগরিককে আইনের নজরে সমানাধিকার দেয়, আইনের সমান রক্ষাকবচও। আর্টিকল ১৯, যার প্রসিদ্ধি মৌলিক স্বাধীনতার চার্টার হিসেবে, তাও এসে গেল ২৫তম সংশোধনীর আওতায়। আর্টিকল ৩১, যাকে সম্পত্তি অধিকারের গ্যারান্টি হিসেবে সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থী মনে করা হয় সে ধারা অবশ্যই এল। ১৯৭৩ সালের উষ্ণ বৈশাখে তুমুল কানুনী তর্কের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল এই সংশোধনীকে কেন্দ্র করে। সরকারী তরফে অতি সারল্যের ভাণ করা হল। ৩৯ (বি) এবং ৩৯ (সি) ধারায় বর্ণিত অর্থ নৈতিক সম্পদের সুবিচারসম্মত বণ্টন এবং অর্থ নৈতিক শক্তির একচেটে হওয়াকে আটকানোর ঘুয়ো তুলে বলা হ'ল যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা আনা সম্ভব কেবল মৌলিক অধিকারকে খর্ব্ব করে—মৌলিক অধিকার "তথাকথিত" এমন আপাতঃ মনোহর শব্দচাতুরীও শোনা গেল। সমাজবাদের নব-আবিষ্কর্তা রূপে আবির্ভূত হল সরকার-পক্ষ; সম্পত্তি অর্জন ইত্যাদির ব্যক্তিগত অধিকারের সঙ্গে জড়িয়ে আনা হল নাগরিকের গণতান্ত্রিক মানবাধিকারকেও। সংবিধান রচনার আদিপর্বে মৌলিক অধিকার এবং দিগদর্শী নীতিকে সমন্বয়কারী দৃষ্টিকোণ থেকে এক আধেয় রূপে দেখা হয়েছিল; এখন শুধু যে তফাৎ করে দেখান হল তাই নয়, এমন চেষ্টাও করা হ'ল শাসকদলের তরফ থেকে যেন মৌলিক অধিকার সংবিধানের "সমাজবাদী দর্শনের" ঘোর বিরোধী, বুঝি সম্পত্তির অধিকারীরাই কেবল মৌলিক অধিকারকে ব্যবহার করে সমাজবাদের দিকে প্রগতি স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে, জনসাধারণের তাতে প্রয়োজন নেই।...

২৫-তম সংশোধনীর ওপর সংশোধনের প্রবল বন্যা ১৯৭৩ সালে সুপ্রীম-কোর্টের রায় বেরুবার পর থেকেই দেখা দিয়েছে। ৩৬৮ ধারার আক্ষরিক আইনী ভাষ্যের পর প্রশাসন যন্ত্র (Executive organ), আইনসভা (The legislative wing) সামনে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে। আজ পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা হিমালয়ের চেয়েও উঁচু, অমোঘ এবং অপ্রতিরোধ্য। জনগণের প্রকৃত নির্বাচনী ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে কতটা খাঁটিভাবে পার্লামেন্টে প্রতিফলিত হয়, তা সংশয়ের বিষয়, কারণ বাহু—কালোটাকার বিপুল বৈশ্বশক্তি এবং শাসকদলের সঙ্গে টাকার কুমীরদের গোপন গাঁটছড়া, প্রশাসনের সিঁড়িবাহী আমলাকুলের আত্রশক্তি, এবং সবার ওপরে গুপ্ত ও রাজনীতি-ধুরন্ধর "বুদ্ধিমান" পুলিশ বিভাগের কৌশল এবং তাদের বেতনভুকদের গোপন গুণ্ডাবাজীর ফল আজ সকল নিরপেক্ষ দ্রষ্টারই চোরের সামনে। যাইহোক, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ৩২ থেকে ৪৫ শতাংশ জনভোটের (যা সংখ্যা লঘু অংশ) দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট প্রতিনিধিরা জনশক্তিরই প্রতিভূ, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় এই পার্লামেন্ট কি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের উদ্যোগেই উদ্রিক্ত হবে। আজ সরকারী ক্ষমতা একদলীয় নেতৃত্বের কুক্ষিগত, ৩৯তম সংশোধনী মূলতঃ তাদেরই মস্তিষ্কের ঢেউ; তাদের একতরফা অত্যাগ্রহের ফলে পার্লামেন্টে আনা এবং পাশ করান হয়েছে। বিরোধী দল বা জনমত কোথায়? ভারতীয় নির্বাচন পদ্ধতির শেকড় ধরে টান মারা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ বিভাগের ৩২৪ থেকে ৩২৯ ধারায় নির্বাচনের ব্যবস্থা বর্ণিত যথা: (সংক্ষেপে)

(১) প্রেসিডেন্টের দ্বারা নিযুক্ত ইলেকশন কমিশন পার্লামেন্ট তথা প্রতি রাজ্যের আইনসভার নির্বাচন, এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টেরও নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চালন করবে; নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো সন্দেহ বা সংশয় বা বিবাদ দেখা দিলে উক্ত কমিশন তার নিষ্পত্তি ঘটাবে উপযুক্ত ইলেক্‌শন-ট্রাইবুন্যালের নিয়োগ ব্যবস্থা করে।

(২) নির্বাচক মণ্ডলীর তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি সমস্ত নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও কাজ সম্পর্কে বিধি ব্যবস্থা করবে পার্লামেন্ট প্রয়োজনমত আইন প্রণয়নের দ্বারা—তা কেন্দ্রে পার্লামেন্টের অথবা রাজ্যে আইনসভার, যারই হোকনা কেন; (৩) পার্লামেন্ট অথবা রাজ্য আইনসভার যে কোনো সভার কোনো নির্বাচন সম্বন্ধে বৈধতার প্রশ্ন তোলা চলবেনা, যদি না সে সম্পর্কে নালিশ উপযুক্ত আইন সভায় পাশ করা আইনে নির্দ্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে রুজু করা হয়ে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষই হল বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ (judiciary)।

নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আজ পর্যন্ত যত আইনের লড়াই হয়েছে, সবই বিচার বিভাগের বিচার সম্বন্ধীয় তদারকী ক্ষমতা (Power of judicial review) স্বীকার করে নিয়ে তারই ভিত্তিতে পরিচালিত। ভারতের সংবিধানের মৌল চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হল আইনের রাজ্যচালিকা-শক্তি, এবং আইনী ব্যবস্থায় সকল নাগরিকের সমান অধিকার তথা স্থান। এও বলা বাহুল্য হবে যে, শ্রীরাজনারায়ণ, এম. পি. দ্বারা আনীত নির্বাচনী বৈধতা সংক্রান্ত কেস্, যার ফলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক গত ১২ই জুন বাতিল ঘোষণা করা হয় তা বিচার বিভাগের উপরোক্ত তদারকী ক্ষমতার সঙ্গত প্রয়োগ। ৩৯-তম সংশোধনী এই হাইকোর্টের রায়কে নাকচ করে দেবার আইনী ক্ষমতা রাখে—তেমনি দাবীই সরকারী তরফে সুপ্রীম কোর্টের সামনে করা হয়েছে। অপর পক্ষে শ্রীরাজনারায়ণের কৌসলী উক্ত সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছেন, হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে তার কোনো অতীতপ্রসারী ফল (retrospective effect) নেই, সেই দাবী করে।

সুপ্রীম কোর্টের রায় যাই হক না কেন, তা যে এক সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক রায় হবে, সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। এ পর্যন্ত, সংবিধানের রচয়িতা পিতাদের গোড়ায় কি উদ্দেশ্য ছিল সে সম্বন্ধে নানান জল্পনা-কল্পনা হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ এ সমস্ত চর্চা অনুমান বিলাস বলে পরিগণিত হবে একদিন। মূল কথা হল, লিখিত সংবিধানের দায় দায়িত্ব অনেক। চট করে, বা খেয়াল খুশীমত আইন-প্রণয়নী ক্ষমতার প্রয়োগান্তে তার প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য (Basic feature) পরিবর্তন করা উচিত কি না, এই প্রশ্ন আজ দেশের সর্বোচ্চ আইন-প্রণয়নী সভার সামনে। এটা নিছক আইনের ক্ষেত্র আর থাকছে না, রাজনৈতিক নীতির (Political ethics) শেকড় পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলা যেতে পারে যে, তারও বাড়া সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে জনতা।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

বুর্জোয়া সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবর সত্ত্বেও আবার জানা গেল জাঁ পল সার্‌তর দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কারের অর্থ নিতে অস্বীকার করেছেন।

"এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।" খবরের পর খবর।

* * *

বরানগর থেকে সুশান্ত চৌধুরী একটি ধাঁধা পাঠিয়েছেন ঃ

বলুন তো "বাইরে থেকে লেখা চাইনা, শুধু বিজ্ঞাপন চাই" কোন্ কাগজের মোটো?"

উত্তর ঃ আনন্দবাজার।

* * *

আরেকটি পত্রাঘাত ঃ শরৎচন্দ্র প্রবাসী-তে লিখলেন না কেন?

কী জানি, হয়তো রামমোহন লাইব্রেরিতে রামমোহনের ৯৮-তম মৃত্যু দিবস উপলক্ষে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেছিলেন বলে।

সার্ জজ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দবাবুর পত্রাংশ ঃ "যিনি ব্রাহ্ম মাত্রই বদমাইস বলিয়া থাকেন, তাঁহার লেখা আমার কাগজে ছাপিতে পারি না।"

* * *

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুবাসরে শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত ভাষণের কিয়দংশ ঃ "..... এখন আপনারা কেঁদে ভাসাচ্ছেন, কিন্তু জানেন কি যে, বারো বছরে তাঁর পাঁচশ খানা বই বিক্রি হয়নি। অনেকে বোধ করি তাঁর সব পুস্তকের নাম পর্যন্ত জানেন না। অথচ, আজ এসেছেন অশ্রুপাত করতে।"

দৃশ্যান্তর।

১৯৩২। বেলুড় মঠ। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব।

সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। সঙ্গী শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাংশ ঃ

"এটি ধর্মসভা, কিন্তু আমি ধার্মিক নই, কোনোদিন ধর্মচর্চা করিনি। সে কথা আমার লেখার মধ্যে চাইলেই আপনাদের চোখে পড়বে। মঠের সন্ন্যাসীদের কাজ-কর্মের উপর আমার বিশেষ আস্থা নাই।"

বক্তৃতা শেষ হবা মাত্রই সুভাষচন্দ্র ম্যানেজ করবার চেষ্টা করেন ঃ "মিশনের কাজে আরও প্রেরণা ও উৎসাহ অনবার জন্যই শরৎবাবু আপনাদের এই কথাগুলো বললেন। অন্য কিছু ভেবে বলেননি।"

শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ করলেন ঃ "না, না, সুভাষ। আমি যা বলেছি, তা ঠিকই বলেছি। ওর মধ্যে আর অন্য কোনো অর্থ নেই। আমি পরিষ্কারই বলেছি।"

ইনিই শরৎচন্দ্র।

* * *

কলমচী সন্তোষ ঘোষ সম্ভবত বাজার খারাপ দেখে আগের দুখোলশ পালটে হঠাৎ শরৎচন্দ্রের স্মৃতিচারণায় শরৎবাবুর অনর্গল ইংরেজি-বলার তারিফ করেছেন।

"চন্দ্র সাহিত্যিকের" সৌভাগ্যই বটে।

* * *

জনৈকের পত্রাঘাত ঃ শিশু সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়, লোডশেডিংয়ের ভিতরেও অন্ধকার বাড়ির দরজায় কলিং বেল-এর আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন!

"বাক্স রহস্য!"

* * *

—কমার্শিয়াল আর্ট কাকে বলে?

—একটি কাঁচি, গাঁদ, রঙ, তুলি, এবং একটি বিলাতি লে-আউটের বই।

—রবীন্দ্র-সংগীত ও আধুনিক গানের তফাত কী?

—শান্তিদেব ঘোষকে জিজ্ঞাসা করুন।

* * *

চন্দ্রেয়ী মুখোপাধ্যায় ॥ আচ্ছা বলুন তো সূর্যবাবু, আমরা এদেশে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করি কেন? এটা কী ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য?

উত্তর ॥ আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারটা স্বদেশেই একই চেহারার। এতে করে আমাদের আলাদা গর্ববোধ করার কিছু নেই। তবে এদেশে এই জিনিসটির বাড়াবাড়ির কারণ হচ্ছে কিছু মানুষের এটিই একমাত্র জীবিকার উপায়।

চন্দ্রেয়ী ॥ বলতে পারেন আমাদের এই অচলায়তন সমাজটা এখনো কী করে টিকে রয়েছে?

উত্তর ॥ মূর্খতা একটি আশ্চর্য গুণ, এই সর্বিক মূর্খতার কল্যাণে এখনো সমাজব্যবস্থা টিকে রয়েছে। এই মূর্খতাকে আমরা সবলতা জ্ঞানে পুজো করি।

চান্দ্রেয়ী ॥ ইতিহাসে একনিষ্ঠ প্রেমের উদাহরণ আছে?

উত্তর ॥ আছে। শাজাহান। তাঁর অন্য বেগম থাকা সত্ত্বেও তিনি মমতাজের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন।

* * *

আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু তাঁর বহু সমালোচনার জন্যে পত্রিকায় পাঠান না। তাঁর এই অনিচ্ছার কারণ স্বরূপ বললেন, দ্যাখো, একবার অমুক লেখকের বই কাগজঅলারা আচ্ছা তুলোধুনো করলে। দীর্ঘকাল পর আবার ওই একই বইটির সমালোচনা ঐ কাগজে বেরুল। এবার কী ধন্যি ধন্যি! বিষয় কী! জানা গেল উক্ত লেখক ওই কাগজে চাকরি নিয়েছেন! আবার দ্যাখো, এক নামকরা কবির কাব্যগ্রন্থ বেরুল। না কি কবিতাই হয় নি, এমত সমালোচনা। অথচ গ্রন্থের অর্ধেক কবিতা এক সময় ওই কাগজেই বেরিয়েছিল! এমন কাণ্ড কেন? না, কবি অন্য একটি সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন!

আমি থ হয়ে রইলাম।

ডায়েরির মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

কোনও গোপনতার আশ্রয় নেননি। যেমন নেননি রেস খেলার প্রথমে। মদ খাওয়া তিনি কেন শুরু করেছিলেন বা কেন খেতেন—এটা প্রায় অবান্তর প্রশ্ন। মদ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী জীবনকে গ্রাস করেছিলো কিনা সেটাই বিবেচ্য। মাণিকের সমগ্র রচনায় কোথাও কোন উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসংলগ্নতার পরিচয় নেই—তাঁর রচনা আশ্চর্য রকম সুনিয়ন্ত্রিত। আসলে মাণিক তাঁর মদ্যাশক্তিকে লুকিয়ে রাখেননি বলেই ব্যাপারটা প্রাচীন সংস্কারে বাধে। ডায়েরিতে এই মদ খাওয়ার ব্যাপারটিকে মাণিক কি ভাবে নিয়েছিলেন। তার পরিচয় আছে। মদ খাওয়াটা তার কাছে শুধু একটা আসক্তির ব্যাপার ছিল না। যিনি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই নিজেকে বাঁধা রাখতে চাননি। তিনি মদের কাছেও হার মানতে চাইবেন না। এটাই স্বাভাবিক। এই না চাওয়ার উল্লেখ আছে ডায়েরিতে। মদের মাত্রা কমানোর চেষ্টা করছেন (১৯৫২-র প্রথম দিকের ডায়েরি)। মদ নিয়ে নানাজনের নানা অশান্তি। অথচ প্রবল শারীরিক অস্বস্তির সঙ্গে লড়াই করার জন্য মদ একটা প্রয়োজনীয় উপাদান, বারবার তাই এ প্রসঙ্গ আসছে। আসলে মাণিক এখানে নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। একদিকে মদ নিয়ে পরিচিতজনের আপত্তি, অন্যদিকে নিজের মাত্রা ছাড়িয়ে না যাওয়ার সচেতনতা, একদিকে সকলের বাধা, অন্যদিকে রোগ যন্ত্রণার ওষুধ হিসেবে মদ—এর মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছিল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তার কলমপেষার কাজ। তিনি প্রয়োজন মনে করেননি মদ্যাসক্তির মাত্রাতিরিক্ত বিলাসকে প্রশ্রয় দেবার বা মদহীন, 'শুদ্ধ' জীবনযাপনের ভালোমানুষি দেখানোর। তাছাড়া মদ কি কখনও কখনও তার আশ্রয় হয়ে ওঠেনি, যেমন হয়েছিল ধর্ম বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে মাণিক কি ভাবতেন? মার্কসবাদের দিকে যখন সরে এসেছিলেন তিনি, যখন নিজের জীবনচর্চার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইছিলেন মার্কসবাদকে তখন ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার সঙ্গেও নিশ্চয়ই পরিচয় ঘটছিল তার। দ্বিতীয়তঃ আজীবন মাণিক বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অধিকারী। তিনি সব কিছুকে যাচাই করে নিতে চাইতেন। ধর্মের আনুষ্ঠানিক চেহারাটা অবশ্য মাণিক কেন, বহু ধর্ম-অনুরাগী ব্যক্তির কাছেও আপত্তিকর মনে হয়। কাজেই ধর্মকে যখন তিনি সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গে অভিলাষ বলে বর্ণনা করেন (৮/১০·২..৫০)। তখন সেটা সম্পূর্ণই মার্কসীয় বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু মাণিক বিজ্ঞানের ছাত্র এবং মাণিক মার্কসবাদী—কাজেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠক আশা করেন বস্তুবাদী মনোভাব। স্বভাবতই সেই মাণিকের ডায়েরিতে যখন বারবার 'মা' বলে এক অলৌকিক শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন ব্যাপারটা একটু বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। আর এই অলৌকিক শক্তির সম্পর্কে শুধু আগ্রহ নয়, তার কাছে স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় অসহায় আত্মসমর্পণ পাঠককে একটু বিমূঢ় করে। কিন্তু সত্যি বিমূঢ়তার কোন কারণ আছে কি?

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লড়াই করতে হয়েছিল সারা জীবন। বাংলা সাহিত্যের কৃত্রিম, অসুস্থ রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে মাণিককে সাহিত্য জীবন শুরু করতে হয়েছিল। তারপরে তাকে লড়াই চালাতে হয়েছে। একই সঙ্গে নিজের পুরনো ধ্যানধারণা আর একটা গোটা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এই লড়াই চালাতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই মাণিক অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছিলেন প্রতিক্রিয়া মহলের কাছে। নানাদিকের প্রতিকূলতায় ক্রমশঃ রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার জীবিকার্জনের ন্যূনতম উপায়টুকুও। তবু আপোষের কথা ভাবতে পারেননি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাবতে পারেননি আদর্শ বিসর্জন দেবার কথা। কিন্তু লড়াইটা কি একা হয়? অথচ তাই করতে হয়েছিল। যে নতুন আদর্শের জন্য, উপলব্ধির জন্য, মাণিক অনায়াসে সব প্রলোভন ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, সবিস্ময়ে ও সক্ষোভে তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। সেখানে তিনি বহু পরিমাণে নিঃসঙ্গ যাত্রী। মাণিক নিজেকে বলেছিলেন কলমপেষা মজুর, কিন্তু এ কথা সত্যি যে কোন মতেই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন না। তার উৎস ছিল পেটি বুর্জোয়া পরিবেশে—মধ্যশ্রেণীর যাবতীয় পিছুটান তাকে বেঁধে রেখেছিল আষ্টে পৃষ্ঠে—সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন প্রগতি আন্দোলনের অগ্রগামী অংশ কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে। কিন্তু সেই হাত রয়ে গেলো শূন্যে বাড়ানো। কম্যুনিস্ট পার্টি সে হাত ধরলো না, ধরা সম্ভব ছিল না বলেই। মাণিক কম্যুনিস্টদের সঙ্গে এলেন নিজের তাগিদেই। এ দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির বিচিত্র ইতিহাস মনে রাখলে অবশ্য এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। জন্মলগ্ন থেকেই এই কম্যুনিস্ট পার্টিকে কুক্ষিগত করে রেখেছে মধ্যশ্রেণী থেকে আসা অংশ, যেখানে আবার স্বল্পশিক্ষিত সংগঠকের থেকে বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার নেতাদের কৌলীন্য বেশী। সেই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যশ্রেণী-আগত নেতা-আকার্ণ কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেই মধ্যশ্রেণীগত সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন। সে কি করে পথ দেখাবে জনৈক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যিনি লড়াই করতে চাইছিলেন এই পেটিবুর্জোয়া সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। তাই মানিকেরই করুণ উপলব্ধি—The C. P. I. does not understand the mind of India (৫. ৩. ৫৫)। কম্যুনিস্ট পার্টি পথ দেখাতে পারলো না। রাজনৈতিক জ্ঞানের উত্তরোত্তর গভীরতায় পৌঁছতে সাহায্য করতে পারলো না—স্বভাবতই দীর্ঘ ঐতিহ্যের ভার মানিককে মাঝে মাঝে ঠেলে দিল লৌকিক জগতের প্রতিক্রিয়াতেই, অলৌকিক বিশ্বাসের দিকে।

রোগ, দারিদ্র্য, অদ্ভুত রাজনীতি, এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছুটা অসহায় বোধ করছিলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নৌকো পুড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন তিনি। কাজেই পেছনে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। তার চতুর্দিকে প্রগতি আন্দোলনের কর্মীরা এরই মাঝে দিব্যি মানিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছিল। সেই আপোষ ছিল তার কাছে ঘৃণার্হ। তাহলে কোথায়, কোন দিকে মুখ ফেরাবেন তিনি। তাই অসহায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন একটা কিছু—আর তাই এই 'মা'র আবির্ভাব।

কিন্তু এটা ভুল, একথা মানতেই হয়। তাহলেও কি এই ভুলটাই মাণিকের সর্বাঙ্গীন পরিচয়। না, তা নয়। এই ভুলের থেকেও অনেক বড় লেখক ও ব্যক্তি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়লেকটিক্স্ থেকে আমরা জানি মানুষ নিখাদ সরলরেখা নয়। বিপরীতমুখী প্রবাহের নিরন্তর দ্বন্দ্বের মাঝ থেকে যে ধারাটা প্রধান হয়ে ওঠে সেটাই তার পরিচয়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে, তাঁর ডায়েরী থেকেও যে ধারাটা প্রধান হয়ে ওঠে, সেটা হল তার সংগ্রামী মনোভাব। সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর লৌকিক আগ্রহ, যার বিপরীতে চাপা পড়ে যায় তাঁর অলৌকিক বিশ্বাস।

তাই ডায়েরির মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই অপ্রতিরোধ্য অমোঘ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোট বকুলপুরের যাত্রী যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডায়েরির পাতাতেও, স্ত্রীর অসুস্থতা জনিত রক্তপাতের প্রসঙ্গে যিনি লেখেন "এত রক্ত? রক্ত মনে পড়িয়ে দেয় রাজপথে মেয়েরা বুলেটের ছেঁদাপথে যে রক্ত ঝরিয়েছে" (২১. ৬. ৫০)।

কয়লাখনি

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

তিন নম্বর সংখ্যায় পৃষ্ঠা সর্বসাকুল্যে বাইশ। এর মধ্যে সাড়ে ষোল পৃষ্ঠা সি এম এর বিজ্ঞাপন। তেরো নম্বর ভলিউমের পনেরো নম্বর সংখ্যার পৃষ্ঠা হচ্ছে বারো। এর মধ্যে আট পৃষ্ঠা সি এম এর বিজ্ঞাপন। তেরো নম্বর ভলিউমের উনিশ নম্বর সংখ্যার পৃষ্ঠা সবশুদ্ধ কুড়ি। সি সি এম এর বিজ্ঞাপন তেরো পাতা। কাগজটি ডবল ক্রাউন এক-আট সাইজের। এদের বিজ্ঞাপন রেট অনুযায়ী ভেতরের পাতা আশি টাকা। অর্ধেক পঞ্চাশ টাকা। এই হিসাবে উদ্ধৃত কাগজের আয় সহজেই অনুমেয়। লক্ষ্যনীয় যে যে, এতদঞ্চলের আর কোন কাগজেই সি এম এর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। কেন শ্রীদামোদর গুপ্ত মহাশয়ের প্রতি এই কৃপা বর্ষণ? কারণ কি এই যে ভদ্রলোক একদা ছোট কোলিয়ারীর পারমিট ম্যানেজার ছিলেন এবং সেই সবাদে প্রশাসনিক বাস্তুঘুঘুদের সঙ্গে তার কোন নেপথ্য বন্দোবস্ত আছে? "কোলফিল্ড ট্রিবিউন" খুবই সাধারণ স্তরের কাগজ। আসানসেখানে অজ্ঞাত অখ্যাত এই কাগজযেখানে একটিও বিজ্ঞাপন পায়না সেখানে অজ্ঞাত অখ্যাত এই কাগজটির প্রতি অনুকম্পা স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের মনে সন্দেহের মেঘ ঘনীভূত করবে।

সংবিধান

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

আজ যে দল মেজরিটির অহঙ্কারে দিশেহারা হয়ে পার্লামেন্টকে প্রশাসনের মুখপাত্র রূপে ব্যবহার করতে উদ্যত, এবং সাময়িক কার্যসিদ্ধিও সেই সঙ্গে, সেই দল যেন মনে রাখে, প্রশাসন যন্ত্রের একচেটে ক্ষমতা প্রয়োগের যে-নজীর তারা রেখে যাচ্ছে ভবিষ্যতে তা তাদের বিরুদ্ধেই যাবে।

(সমাপ্ত)

মতামত

শরৎ সাহিত্য এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

উনিশশো ছিয়াত্তর সালে দরিদ্র পরাধীন ভারতের এক অনন্য-সাধারণ সৎশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব। ইতোমধ্যেই তাই সচেতন সাধারণ মানুষের উদ্যোগে নানা কমিটি তৈরী হয়েছে, এবং শরৎচন্দ্রের শততম জন্মদিনটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়েছে। শতবর্ষপূর্তি উৎসবের শুভসূচনা হয়েছে বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষক হিসেবে একটা ক্ষোভের কথা দেশের সাধারণ মানুষের গোচরে আনতে চাই। সে আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লজ্জাকর ভূমিকা প্রসঙ্গে। এ-বছর যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সাধারণ স্নাতকশ্রেণীর পার্ট-ওয়ান দিলো বা পার্ট টু দিচ্ছে, অথবা লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আগামী বছর উচ্চমাধ্যমিকে বসতে যাচ্ছে, পর্ষদ ও বিশ্ববিদ্যালয় সযত্নে তাদের শরৎ-সৃষ্টি থেকে দূরে রেখেছেন। যেখানে হুমায়ুন কবীর সুভাষ মুখুজ্যেরা স্থান করে নিতে পারলেন, সেই পাঠ্যতালিকায় শরৎচন্দ্র কেন উপেক্ষিত, তা আমরা জানতে চাইছি না কেন? স্কুল-কলেজের শিক্ষক সংগঠনগুলিরও কি এ-ব্যাপারে কিছু করণীয় নেই?

নির্মল সাহা

'পথের দাবী' অভিনয়

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ই এন্ড এন এফ রেলওয়ে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা গত উনত্রিশে সেপ্টেম্বর রঙ্গনায় "পথের দাবী" অভিনয় করেন। বৃটিশ যুগে "পথের দাবী" উপন্যাসটি নিষিদ্ধ ছিল। তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল। আজকের দিনেও এ রচনার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। এ নাটকের অভিনয়মূল্য অনস্বীকার্য। প্রযোজনাটি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

চিত্তরঞ্জন মুখার্জী, অজিতকুমার চ্যাটার্জী, প্রভাতকুমার চ্যাটার্জী, শাশ্বতী রায়, ইন্দ্রানী লাহিড়ী ও দিপালী মৈত্র প্রমুখ শিল্পীদের অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। তবে অপূর্ব, তেওয়ারী ও কবি চরিত্রাভিনেতাদের অভিনয় ততটা উন্নতমানের নয়।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

ডাষ্টবিনের সাহিত্য

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

"....তারপর হঠাৎ রুদ্ধশ্বাসে প্যান্টের বোতামগুলো খুলে চেপে ধরলো নিজের পুরুষাঙ্গ। এবং যাবতীয় মোহময়ী চিত্র তারকাদের কথা চিন্তা করতে লাগলো খুব মন দিয়ে। একটু বাদেই তাদের সকলের মুখ হয়ে গেল শিখার মতন।" এখানে যে উদ্ধৃতিটি দিলাম সেটা পিন-আপ করা কোন নিষিদ্ধ বই-এর না, বা লেখকের নামহীন প্রেসের নামহীন বে-আইনী কোন অশ্লীল বই-এরও নয়। এটা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি উপন্যাস থেকে নেওয়া। উপন্যাসটির নাম "একা জীবনে" এবং লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু এইটুকুই নয় আরো নানা রকমের কথা আছে। যেমন "..... তোদের মতন ভালো ছেলের যদি আমি ইয়ে না মারি তাহলে আমার নাম সুখময় বিশ্বাস নয়?" "....অনিন্দ্য উল্টে বললো, যা, যা, ওরা আমার ইয়ে ছিঁড়বে।" ....."রাখ তোর শিখার কথা। তুই ঝেড়েছিস? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরণের অসংখ্য কথা আছে উপন্যাসটিতে। বেশী উদ্ধৃতি দিয়ে দর্পণের পৃষ্ঠা নোংরা করতে চাইনা। উপন্যাসটির আগাগোড়াই এই সব। বঙ্গসংস্কৃতির যারা পান্ডা সেজে বসে আছে, সেই গোষ্ঠীরই পত্রিকা "দেশে" এ উপন্যাস ছাপা হয়েছে। আমি বুঝে উঠতে পারি না—এর নাম সাহিত্য? খিস্তি যদি সাহিত্য হয়, তা হলে পাড়ার রকবাজ আর সন্ধ্যাল সন্ধ্যায় যারা রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকানগুলো আলো করে রাখে তারাই এ দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হতে পারে। "দেশ" সাহিত্য সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন "আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।" হায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়!

বাংলা সাহিত্যিক আজ কোথায় নামিয়ে দিয়েছে এরা। এদের জীবন দর্শনই (?) অন্য রকম। সাহিত্যকে এরা সিরিয়াসলি নেন নি। তাই তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন: "আমার কাছে এই বেঁচে থাকা, চাকরি, প্রেম, উপন্যাস লেখা ইত্যাদি সবই ভ্রমণের মতন সাবলীল, কোনোটাই দাঁতে দাঁত চেপে কিছু করার ব্যাপার নয়। আমার মৃত্যুর মতই, আমি একটা খারাপ উপন্যাস লিখলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না, এই রকম ধরে নিয়েছি।" (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২) যে লোক নিজেই বলছে যে তার খারাপ উপন্যাস নিয়ে চিন্তিত নয় সে লোক তো ভাল কিছু লিখতে পারে না। এরকম মানসিকতা যার তার তো কোন উদ্যম থাকতে পারে না। উদ্যমহীন, আদর্শহীন মানুষ কখনো মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারে? কেউ মহৎ কিছু করতে না পারলেও আপত্তির কিছু থাকতে পারে না, কিন্তু যখন দেখি কোন সাহিত্যিকের কলম যুব সমাজের ক্ষতি করতে এগিয়ে আসে তখন সেটা নিয়ে ভাববার আছে।

এ ধরণের লেখায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য একা নন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসুও কম জান না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের "নিশীথে সুকুমার" নামে একটি গল্প কিছুদিন আগে রবিবারের আনন্দবাজারে পড়েছিলাম। ঐ গল্পে দুই বয়স্কা মেয়ের বাবা সুকুমার মদ খেয়ে রাত্রি বেলা বাড়ীতে ফিরে কি কি করল সেই কাহিনী। রাতের পাশাক পরা তার দুই মেয়েকে সুকুমার কেমন দেখলো তার বর্ণনা আছে, এবং তারপর সম্ভবত এক মেয়েকে চুমু খেলো। তার বউকে কি রকমভাবে শুতে দেখলে তার সেক্স জাগে তারও বর্ণনা আছে। এবং সব শেষে সম্ভবত সে ল্যাংটো হয়ে বারান্দায় নাচানাচি করল। আমি ভাবি, যেখানে যত জঞ্জাল আছে সবই কি আনন্দবাজার দখল করে বসে আছে? আর সমরেশ বসু তো অশ্লীল লেখার একেবারে মাস্টার লোক। বিবর, প্রজাপতি, আয়নায় আমার মুখ, পাতক ইত্যাদি তো একেবারে মার্কামারা বই। এই সব একেবারে মার্কামারা বই। এই সব বই উনি আগে লিখেছিলেন বলে এগুলো বেশী সমালোচনা হয়েছিল। এখন সব বইই বিবর, প্রজাপতির মতো। বকাটে ছেলেরা যেমন অশ্লীল কথা বলতে বলতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে বয়স্ক লোকেদের সামনেও যে কোন ধরণের কথা বলতে গেলেই অশ্লীল শব্দ বেরিয়ে যায়, তেমনি সমরেশ বসুদেরও অশ্লীল লিখতে লিখতে এমন হয়েছে যে এখন যাই লিখতে যান তাই অশ্লীল হয়ে যায়। সন্তোষ ঘোষ "বিবর"-কে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে বলেছিলেন—কথা সাহিত্যের মাইলস্টোন, এক সারিতে ফেলেছিলেন "দুর্গেশনন্দিনীর" সঙ্গে। কথায় বলে রতনে রতনে রতন চেনে, শুয়োরে চেনে কচু। আর সন্তোষ চিনেছে সমরেশকে।

অশ্লীলতা যে আজ শুধু বাংলা উপন্যাসেই অনুপ্রবেশ করেছে তাই নয়। সিনেমা, থিয়েটার যাত্রা, বিভিন্ন পত্রিকা সর্বত্রই এর পদসঞ্চার। দুই সিনেমা পত্রিকা "ঘরোয়া" আর "আনন্দলোক" তো পরস্পরের সঙ্গে অশ্লীলতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ঘরোয়ার অশ্লীলতার কথা আমরা জানি। কিন্তু মাঝে আনন্দলোকের অশ্লীলতার গুতোয় এদের বাজার কিছুটা খারাপ যাচ্ছিল। এখন ঘরোয়া আবার জোর কদমে উঠে পড়ে লেগেছে।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বলেছিলেন চুয়াত্তর সালের আগস্ট মাসের মধ্যে সিনেমাতে অশ্লীলতা বন্ধের ব্যাপারে ঠিক মতো সেন্সরশিপের ব্যবস্থা না হলে তারাই নাকি পাল্টা সেন্সরশিপের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু চুয়াত্তর সালের আগস্টের জায়গায় তো পঁচাত্তর সালের আগস্ট পার হয়ে গেল সিনেমাতে অশ্লীলতা বন্ধ হবে কবে? শুধু হিন্দি সিনেমাই নয়, বাংলা সিনেমাও আজ অশ্লীলতার চূড়ান্ত করছে।

আমি একটা জিনিস বুঝে গেছি—যারা অশ্লীল লেখা লেখে বা প্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে হাজার লেখা লিখে বা আবেদন করে কোন কাজ হবে না। কারণ এদের মানসিকতা বুজোয়াদের মানসিকতার মতন। এরা যা করার তা করবেই। তাই আজ দরকার এদের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চালানো।

কংগ্রেসীদের লড়াই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ডিপোতে লক্ষ্মীবাবুর ইউনিয়ন অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

এই ঘটনায় ডিপোতে লক্ষ্মীবাবুর সমর্থকরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা দলবল নিয়ে তালা ভেঙে ইউনিয়ন অফিস খুলে ফেলে। লক্ষ্মীবাবুর সমর্থকরা যখন তালা ভাঙছিল তখন সৌগতবাবুর সমর্থকরা তাদের ওপর চড়াও হয়। শুরু হয়ে যায় উভয় পক্ষের খন্ডযুদ্ধ।

বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে লেক ডিপোতে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। নিরীহ কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে।

লেক ডিপোর ঘটনায় পরের দিন অন্যান্য ডিপোগুলোতেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বেলঘরিয়া, হাওড়া ও পাইকপাড়া ডিপোতেও উভয় পক্ষে তুমুল মারপিট হয়।

খবরে প্রকাশ, বিভিন্ন ডিপোতে সৌগত রায়ের সমর্থক ইউনিয়ন সদস্যদের ওপর প্রচন্ড অত্যাচার চালানো হয়েছে। বেলঘরিয়া ডিপোতে সৌগত রায়ের ইউনিয়নের জনৈক সমর্থককে প্রচন্ডভাবে মারা হয়েছে। এর ফলে ঐই ইউনিয়নের সদস্যদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়েছে। অনেকে এই ইউনিয়ন থেকে নাম কাটিয়ে লক্ষ্মীবাবুর ইউনিয়নের সদস্য হচ্ছেন।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক পার্থ রায় চৌধুরী প্রহৃত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বেহালায় একটি কারখানায় গেট মিটিং করার সময় লক্ষ্মীবাবুর সমর্থক একদল যুবক পার্থ রায়চৌধুরীর ওপর চড়াও হয়ে মারধোর করে।

এরপর পার্থবাবু স্বয়ং এন এল সি সি অফিসে এসে লক্ষ্মী বসুর কাছে আপোষের প্রস্তাব দেন।

বারবধূ নাটক

সমাজকে এড়িয়ে
এ নাটক নয়
সমাজের অন্তরঙ্গ
এই নাটক!
পুজোয়
এবার দেখুন
হাজার রজনী উত্তীর্ণ
সৎ নাটকের দিক্‌চিহ্ন

প্রতাপ ৩৫-৯২১৯ চতুর্মুখ

ভালবাসার রোহট নাটক।

প্রতিটি দৃশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের

রাহুমুক্ত

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ৩ ও ৬॥০ দশমী ৩
বৃহঃ ৬॥০ শনি ও রবি ৩ ও ৬॥০
শ্রেঃ অসীম, তরুণ, শঙ্কর, স্নিগ্ধা, মঞ্জু ও কেতকী
এবং

কলামন্দিরে ১৫ অক্টোবর ৬॥০

একটি মাত্র অভিনয় ॥ টিকিট আছে
নাটক ও নির্দেশনা ॥ অসীম চক্রবর্তী

চতুরঙ্গ শরৎকালীন সংখ্যা প্রকাশিত হল

সম্পাদনা: সমীর ঘোষ * ভবেশ দাশ

সূচনাসূচী / অমরেন্দ্রনাথ দত্ত: স্মৃতিচারণ * গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ। সাক্ষাৎকার * হবীব তনবীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ * বিভুকুমার। ভারতীয় নাটকে 'এলিট' আর 'পপ্যুলার' * ধরণী ঘোষ। পরিচালক ব্রেখ্‌ট * পল রীলা। নাটকের অভাব, কেন? * সুধন্বা সেন। গণসংগীতের আপন রূপ * সাধন গুহ।

বিশেষ আকর্ষণ: নাটক / এর উপায় কি?

মীর মশাররফ্ হোসেন। (ক্রোড়পত্র)

একমাত্র পরিবেশক: পাতিরাম পারিজা। কলেজ স্ট্রীট

দাম ॥ তিন টাকা

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক নবার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৩১শে অক্টোবর ৭৫ ॥ দাম ঃ ৪০ পঃ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ নিয়ে খেয়োখেয়ি শুরু হয়েছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মেয়াদ ফুরোনোর আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ নিয়ে কামড়া-কামড়ি শুরু হয়ে গেছে। বর্তমান উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ছিয়াত্তর সালের আগস্টে। এর আগেই তিনি প্রাক্ অবসর-কালতন ছুটি নিচ্ছেন এই সংবাদ প্রচার মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে-কানাচে সম্ভাব্য উপাচার্য সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেষট্টি সালের আইন অনুযায়ী আচার্য সিনডিকেট মনোনীত একজন সদস্য এবং বহিরাগত দুজনের মধ্যে থেকে উপাচার্য নিয়োগ করেন। সিনডিকেটের মনোনীত সদস্য হিসাবে উপাচার্যপদের জন্য ইতিমধ্যেই একাধিক সদস্যের পক্ষে লবিং শুরু হয়েছে।

ডঃ সেন নাকি পরবর্তী উপাচার্যপদে যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের নাম দু-এক জায়গায় বলেছেন। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিককে আচার্য শ্রীডায়াসও ফেলে দিতে পারবেন না বলেই ডঃ সেনের ধারণা। এছাড়া এক চালেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ডঃ পি কে বসুকে ঘায়েল করতে পারবেন এবং নিজের সম্মানও বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।

অপরপক্ষে ডঃ পি কে বসুও এই সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নন। ডঃ বসুই যাতে পরবর্তী উপাচার্য হতে পারেন, তারজন্য এ ক্যাম্পেও সাজসাজ রব পড়ে গেছে। দুর্গাপুজো উপলক্ষে ডঃ বসুর বাড়ীতে তো একটা ঘরোয়া বৈঠকও হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষকদের অনেকেই ডঃ বসুকে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়েও এসেছেন।

হাইকোর্টে একটি চাঞ্চল্যকর মামলা

বাদী প্রাক্তন সি পি আই জে এম বিশ্বাস এবং বিবাদী রাজ্যেশ্বর রাও ও কালান্তর-সম্পাদক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা হয়েছে যেটি রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বাদী—জে এম বিশ্বাস, বিবাদী—রাজ্যেশ্বর রাও এবং জ্যোতি দাশগুপ্ত।

কে এই জে এম বিশ্বাস? ইনি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের রেল কর্মচারীদের একজন পরিচিত নেতা। উনিশশ সাতষট্টি সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে (জনগণের তীব্র কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের জোয়ারে) বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অতুল্য ঘোষকে পরাস্ত করে শ্রীবিশ্বাস ট্রেড ইউনিয়ন মহল থেকে বৃহত্তর রাজনৈতিক মহলে পরিচিতি লাভ করেন।

এরপর চুয়াত্তর সালের আটই মে থেকে সারা ভারত জুড়ে "রেলের চাকা বন্ধ" শুরুর প্রথম দিকে তিনি আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু বিশ লক্ষ রেল কর্মচারীর বীরত্বপূর্ণ লড়াই প্রসঙ্গে উনিশশ বারো সালে মহামতি লেনিনের হাতে-গড়া আজকের প্রাভদার মন্তব্যে এবং সতের দিনের মাথায় "আন্দোলন চালানোর ব্যাপারে আঞ্চলিক নেতারা সিদ্ধান্ত নিন" শীর্ষক ডাঙ্গের প্রস্তাবে জে এম বিশ্বাস সাড়া দেন এবং কলমের সাহায্যে ডাঙ্গের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। "মনীষা" তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে।

আবার জে এম বিশ্বাস সংবাদ পত্রের হেডিং হয়েছেন। পুরুলিয়া জেলার একশো উনসত্তর জন লাল কার্চধারী পার্টি কর্মীসহ তিনি পদত্যাগ করেছেন। কেউ কেউ ভাবছেন যে, তিনি বামপন্থী শিবিরে আসবেন। মোটেই নয়। জে এম বিশ্বাসের বক্তব্য "পার্টির আরও বেশি করে মস্কোর নির্দেশ ও কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলা উচিত। চেয়ারম্যান ডাঙ্গের বিরোধিতা করা চলবে না।"

সি পি আই দল প্রকাশ্যে, জোরগলায়, সততার সঙ্গে মস্কোর পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত করে। তৎসত্ত্বেও বিশ্বাসবাবুর এ অভিযোগ কেন? অভিযোগের ভিত্তি আছে। প্রাভদায় যখন "ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে" বলা হয় তখন দলের জাতীয় পরিষদের বহু প্রস্তাবে "ভারতে অর্থনৈতিক সঙ্কট মুদ্রাস্ফীতি, বেকারীর জন্য কংগ্রেস দলের মধ্যস্থ দক্ষিণপন্থীদের আর একবার পার্জ করার" কথা লেখা হয়। মনে হয় বিশ্বাসবাবুর এটুকুতেও আপত্তি আছে।

একাত্তর সালে কোচিনে অনুষ্ঠিত সি পি আইয়ের নবম কংগ্রেসের মূল শ্লোগান ছিল—"দিল্লী চলো"। এরপর বিজয়ওয়াদায় অনুষ্ঠিত দশম কংগ্রেসে আরও একধাপ এগিয়ে শ্লোগান রাখা হয়, কেন্দ্রে কেরালা ধাঁচের সরকার গড়াতে হবে।" আগামী লোকসভার নির্বাচনের পর শ্রীভূপেশ গুপ্তের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিহারে রাজ্য পরিষদ সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ সরকার অথবা ইন্দ্রদীপ সিংহ অথবা রাজ্য বিধান পরিষদের নেতা শ্রীসুনীল মুখার্জী যে কোনদিন ডঃ জগন্নাথ মিশ্রের মন্ত্রিসভায় নাকি যোগদান করতে পারেন।

কিন্তু এ প্রশ্নে পার্টির মধ্যে মতভেদ আছে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়। যে কারণে এখানে পি ডি এ ভেঙ্গে গিয়েছিল। কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সি পি আই তিয়াত্তর সালের সাতাশে জুলাই "বাংলা বন্ধ" ডেকেছিল। কিন্তু দলের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেস ঘেঁষা তাঁদের বিরুদ্ধে জে এম বিশ্বাসের এত ক্ষোভ কেন? মনে হয় উনি দু দলের সংযুক্তির পক্ষপাতি। যেমন কথা চলছে আদি কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের মিলনের।

রাজ্যেশ্বর রাও জে এম বিশ্বাসকে পুলিশের চর অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। কিন্তু জে এম বিশ্বাস এত কাঁচা লোক নন। তিনি বহুবাজারের পার্টি অফিসে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে গোপালবাবুর অনুপস্থিতিতে রাজ্য কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী নেত্রী শ্রীমতী ইলা মিত্রের কাছ থেকে রসিদ নিয়ে গেছেন। তাঁর বক্তব্য তিনি বহিষ্কৃত নন, স্বেচ্ছায় দলত্যাগী।

জে এম বিশ্বাস কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যেশ্বর রাও এবং কালান্তরের সম্পাদক শ্রীজ্যোতি দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন। শোনা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণবিনোদ রায় রাজ্যেশ্বর বাবুদের পক্ষে লড়বেন। কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কায় সি পি আই নেতারা এখন বেসামাল। জাতীয় পরিষদ প্রদত্ত মাসিক কুড়ি হাজার টাকা রাজ্য পরিষদের কে বা কারা ভোগ করেন এইসব চাঞ্চল্যকর তথ্য জে এম বিশ্বাসের ঝোলায় আছে। প্রভাত করের বাড়ী থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার ও তাঁর মেয়ের বিয়েতে ষাট হাজার টাকা খরচের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হবার পর বিশ্বাসবাবুর ঝোলার মূল্য অনেক বেড়ে গেছে।

এদিকে জে এম বিশ্বাসকে সামনে রেখে কমিউনিস্ট বিদ্বেষীরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক "দেশ"-এর গত চোঠা অক্টোবর সংখ্যায় জনৈক সমর রায় "দেশ ও কাল" শীর্ষক আলোচনায় সি পি আই-সি পি এমের দলত্যাগকে কেন্দ্র করে বিরোধ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সূক্ষ্ম কমিউনিস্ট বিরোধিতা চালিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েক পাতার পরই ভয়েস অফ আমেরিকার একটা বড় বেহিসেবী বিজ্ঞাপন।

কোরিয়ায় পাক জুং হি জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্ত

কোরিয়ার বুকে আগুন জ্বালার পাকা বন্দোবস্ত করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ইতিমধ্যেই মার্কিনী পুতুল দক্ষিণ কোরিয়ার পাক জুং হি-র সরকার উত্তর কোরিয়ার সীমান্তে বড় রকমের হামলা করেছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে বলছে যে, সে কোরিয়ার ব্যাপারে নিজে জড়াতে চাইছে না। কিন্তু পর্যবেক্ষক মহলের মতে এটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। তা না হলে, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী জেমস শ্লেজিংগারের সাম্প্রতিক কোরিয়া-জাপান ভ্রমণের সঠিক কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার "কোরীয় খেলায়" জাপানকে নিজের দিকে নামাতে চাইবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো সামরিক ঘাঁটি আছে।

খবরে জানা যায়, মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্লেজিংগার সম্প্রতি জাপান সফরে গিয়ে জাপানী মন্ত্রী মিচিতা সাকাতার সঙ্গে গোপন সলাপরামর্শ করেন। প্রকাশ, ঐ গোপন আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "কোরীয় পরিস্থিতি" সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন। বিশেষ করে, মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জাপান সফরের পূর্বে পাকি জুং হি-র সঙ্গে সলা পরামর্শ করে এসেছেন। সেই গোপন আলোচনায় ঠিক হয়েছে; জাপান দক্ষিণ কোরিয়াকে আরো বেশী সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দেবে। এছাড়া, ঐ গোপন আলোচনায় জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তিকে ঝালিয়ে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। জাপানের বর্তমান মিকি সরকারের এই আত্মসমর্পণের কথা জানাজানি হয়ে পড়ায় মিকি সরকার একটু বিপাকে পড়েছে। এমন কি, আশাশি নিমভূমের মত একচেটিয়া পুঁজির কাগজেও কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা হয়েছে। কারণ মিকি সরকারের এই কাজে জাপানের আত্মসম্মানে লাগছে। প্রকাশ, জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য একশোটি ফাইটার বোমারু বিমান কিনতে রাজী হয়েছে। স্বিতীয়ত, ওকিনাওয়ায় মার্কিনীদের "যা খুশি করতে" দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাপানে মার্কিনীদের এই লম্ফঝম্পে জাপানের সাধারণ মানুষেরা বিরক্ত। তারা বেশ কয়েকবার বিরাট বিরাট বিক্ষোভ মিছিল করে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। কিছুকাল পূর্বেও জাপানে মার্কিন বিরোধী প্রতিবাদ মিছিল হয়। এমনকি মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সফরের সময়েও জাপানীরা বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষিণ কোরিয়ার ফ্যাসিস্ত শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমেই প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। এই প্রতিবাদে ভীত হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পারমাণবিক অস্ত্রপ্রয়োগের হুমকী পর্যন্ত দিয়েছে। এই মার্কিন হুমকীতে দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ বরং আরো ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ফলে "কোরীয় খেলায়" জাপানকে জড়াতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবং এ ভাবেই ধীরে ধীরে কোরিয়ায় একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাঁধানোরও ষড়যন্ত্র চলছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ

দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাসিস্ত স্মিথ সরকার নির্বিচারে সন্ত্রাস গ্রেপ্তার, খুন, জখমের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার মানুষ এখন অস্ত্রহাতে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসন উৎখাতে দৃঢ় সংকল্প। সম্প্রতি কায়রোতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে আফ্রিকার মুক্তি সংস্থা

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

ষোড়শী নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-ধারণা

মিহির আচার্য

সাহিত্যের অমরত্বের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িকতার দাবির ঊর্ধ্বে এক-জাতীয় 'চিরকালের সাহিত্যের' কথা ভেবেছেন। শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই স্থির ধারণার কথা তিনি পুনরায় ঘোষণা করেছেন। নগদ বিদায়ের লোভে সাহিত্য-সৃষ্টির লোভ সম্পর্কে তিনি শরৎচন্দ্রকে সতর্ক করেছেন। অপরপক্ষে শরৎচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, সমসাময়িকতার দাবিকে উপেক্ষা করে, চিরকালের সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। এ ছাড়াও সাহিত্যের অমরত্ব বিষয়েও শরৎচন্দ্র যথেষ্ট সন্দিহান। যুগের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী সাহিত্যের আবেদন বদলাতে বাধ্য। তাঁর মতে 'চিরকালের সাহিত্য' বলে, বস্তুত কিছু নেই। দীর্ঘকাল টিকে আছে বলেই সেই সাহিত্য সর্বকালে, সর্বযুগেই বেঁচে থাকবে—এমন রক্ষাকবচ তার নেই। সাহিত্যে অমরতার তাগ না করে সৎ সাহিত্যিক বিশ্বাস করবেন যে, এমন দিনও আসতে পারে যেদিন আগামী দিনের পাঠকের কাছে তাঁর সাহিত্য অকিঞ্চিৎকরতায় পর্যবসিত হবে। তাঁর কঙ্কালের ওপর আরো মহৎ সাহিত্য গড়ে উঠুক, এইটেই লেখকের শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা।

'ষোড়শী' নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পত্রাঘাত উদ্ধৃত করে দিলাম।

১

[রবীন্দ্রনাথের পত্র]

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ষোড়শী পড়েছি। বাঙলা সাহিত্যে নাটকের মতো নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম; কেন না নাটক সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুইটিই যখন সত্য ভাবে মেলে, তখন চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিক ভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার সেই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (পারস্‌পেকটিভ) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে, তবেই সাহিত্য টিকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশি করতে চেয়েচ এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে, এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা ও কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ-পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তা রূপে তোমার কর্তব্য ছিল, এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি 'সেন্টিমেণ্ট' মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমায় কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার'পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোনো দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন, তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুশি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি—৪ ফাল্গুন, ১৩৩৪।

তোমার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২

[শরৎচন্দ্রের পত্র]

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণ ভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটি উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি, এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেছি—এ ঠিক হচ্ছে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয়, তখন ঠিক কি ভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধকরি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ মনে হয়, কিন্তু আর একদিকে ত্রুটিও আছে প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিষ, আপনি যাকে বলেছেন এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধহয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হল আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হল না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসা নিষ্ফল করে দিলে।

এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লীসমাজ, এর বিক্রিও যত, খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে ততই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় টিকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যায় জড়ানো। মিথ্যাও বরঞ্চ টেকে, কিন্তু সত্যের বনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয় না। কথাটা যেন উল্টো মনে হয়।

এক সময় আমি খুব ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ড, ওর ধড়, তার পা এক করে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মতো এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মতো লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়; এবং এই ফাঁকিটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয়ত এই জন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন শুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোনো বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয় এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বলবে, লাভ নেই—এমনি। মাঝে মাঝে হয়ত অত্যন্ত সামান্য মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে—তার ভাষাও যেমন, আড়ম্বরও তেমনি—কিন্তু তবুও মন খুশি হয় না, অথচ এরা বলে, এই ত সাহিত্য।

ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকুই বুঝেছি এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায়নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাপে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মতো যন্ত্রকে মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোনো বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকদের রুচি ও বিচার-বুদ্ধির পরে। নিজেকে করাতে হবে, তার কোনো নির্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির 'পারস্‌পেকটিভ' এবং সাহিত্যের 'পারস্‌পেকটিভ' কথার দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নরনারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অন্তত অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা 'কংক্রিট' উদাহরণ দিই। রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন্ পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তার কত রকমের নাম, কত রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেল তাও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয়, এবং কবির কাছে হয়ত সেকালের লোকে ভিড় করে চেয়েছিল-এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধ কৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দূরব্যাপী'পারস্‌পেকটিভ' বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিতকরেছেন?

আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখি নি। এখন দু একটি লিখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠক সমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারওয়ালারা না বোকা দর্শকরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড্ সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।

পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখছেন, 'তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।' আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মতো জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও শাস্তি দেয়।

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

শারদীয় সাহিত্য, স্বরাজ এবং বাঙালী সাহিত্যিক সাংবাদিক

রাণা ঘোষ

এবারকার শারদীয় সংখ্যাগুলো সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করেছে পাঠককে। ঠকিয়েছে বললেও বোধহয় ভুল বলা হবে না। সর্বাধিক বিক্রীত (বিকৃতও বটে) আনন্দবাজার গোষ্ঠীর থান ইটগুলো তার মধ্যে সবচাইতে বড় জঞ্জাল—যা সরাতে কর্পোরেশনের বেশ কয়েকটা লরী দরকার হতে পারে। পরশুরাম, ক্ষিতিমোহন, সুনীতিবাবু সুকুমার সেন, তিন বাঁড়ুজ্যে, সতীনাথ পাঠে সদা-অভ্যস্ত পাঠককে এখন পড়তে হবে শ/স-কারান্তদের লেখা, যারা সাহিত্যের বাজারে মনোপলি করছে। সন্তোষ ঘোষ, সমরেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দু, শক্তি, শংকর, শরৎ শ্যামল, সন্দীপন এরাই হচ্ছেন কলকাতা করপোরেশনের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর। এদের লেখার উপজীব্য সেক্স আর ভায়োলেন্স, হিন্দী সিনেমার মতই।

* * *

এম, পি মানে মাষ্টার প্রোজ-রাইটার—কথাটা মনে এল জনৈক এম পির দু হাতে লেখা গল্প-উপন্যাস পড়ে। তা এরা যদি লিখবেন তাহলে পোড়া দেশটার কি হবে বলুন ত? অথচ এই জনদরদী আঁধার রাতের রাজা এম পি এ বছরের শারদীয় সংখ্যায় লিখছেন সবচাইতে বেশী।

* * *

পুজোর ছুটিতে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে পুরনো বইপত্তর ঘাঁটছিলুম। হঠাৎ একটি ছড়ায় এসে চোখটা আটকে গেল এবং দেখলুম এটি প্রায় বছর পঁচিশেকের পুরানো একটি লেখা। লেখক ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী—যাকে দেশ-আনন্দ-বাজার গোষ্ঠী শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা লেখক ছাপ মেরে বাজারে চালু করেছিল তারই লেখা থেকে পুজো উপহার হিসাবে পাঠকদের কাছে কিছু অ-রম্যরচনা পেশ করছি ঃ

স্বরাজ লাভের সাথে কালো-বাজারীরে / মারনি তখন তাই কর হানো শিরে। শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল/না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল।" (মার্জার নিধন কাব্য) জবাহরলাল নেহেরু প্রধান-মন্ত্রী থাকাকালে ল্যাম্প পোস্টে কালোবাজারীদের ঝোলানোর সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দেশে ল্যাম্পপোস্ট আর কালোবাজারী দুই-ই জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। শুধু ঝোলানোর ব্যাপারটাই ঝুলে আছে। আঠাশ বছর পরও এনারা দিব্য আছেন। অস্যার্থঃ আমাদের সব বরবাদ হল যেহেতু সময়মত আমরা কোন জাতীয় সমস্যারই সমাধান করতে চেষ্টা করিনি।

* * *

হালে আলী সাহেবের "সিনিয়র এপ্রেনটিস" লেখাটির কথা খুব স্বাভাবিক কারণেই মনে এলো। পুজোর বাজারে কাপড়ের যা দাম, মনে হচ্ছে আমাদের বোধ হয় কিপ্পন টুকুও ("কার্থ-ডে-সুট") আর জুটবে না। আলী সাহেবের জবানীতে এবারে শুনুন। "হুজুর, আমি তিন বছর ধরে এ অপিসে এপ্রেন্টিস করছি। খেতে পাইনে, পরতে পাইনে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম, আমাদের অপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ অপিসের সিনিয়র এপ্রেন্টিস। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রিন্টিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেন্টিস হয়েছেন।"

১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্টিস তখন শুরু হয়। তখনো পরণে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র এপ্রেন্টিস হওয়ার বেশী বাকী নেই।

* * *

সুশীল পাঠক, যদি অপরাধ না নেন তাহলে সবিনয় নিবেদন করছি অর্থের এবং সঙ্ঘের অত্যাচার—যা দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে এ দেশে। এপ্রসঙ্গে আলী সাহেব উবাচ ঃ

"না খেয়ে মানুষ যে পূর্বে কখনো মরেনি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এবারে কলকারখানার জোরে, মানুষের পয়সা কামাবার হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান যে সঙ্ঘ গড়ে উঠল তার অত্যাচার দেশ-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লুন্ঠন যে আগে ছিল না তা নয় কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার আর শেষ নেই। চেঙ্গিস নাদির আট্টিলা আসত দুদিনের তরে; কিন্তু এখন যে পাদ্রী কামান রাজপুরুষ বণিক পুলিশ আসতে লাগল তার আর অন্ত নেই। তাদের শোষণ দিনযামিনী, সায়ং প্রাতঃ শিশির বসন্ত, যুগ যুগ ধরে। জমিদার কারণ যে সুন্দরী ধরে নিয়ে যেত সে তো অজানা নয়। কিন্তু এখন বড় বড় দোকানের চাকরীতে তরুণীদের আর নিস্তার নেই। বড় সাহেবদের বিলাস লালসায় যে নারী মেধ যজ্ঞ জ্বলে তার ইন্ধন অষ্ট-প্রহর দেদীপ্যমান রাখবার জন্য আর কোনো তরুণীর বসনভূষণ বাঁচিয়ে রাখবার উপায় নেই। কোলকাতার বুকের উপরই তার নব নব তান্ডব আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের গড়া দুর্ভিক্ষ, দৈনন্দিন অনশন, অশিক্ষা কুশিক্ষা, দৈন্যের দায়ে দেহ বিক্রয় নিরপরাধের উপর গুলিবর্ষণ, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, মানুষের প্রাণ নিয়ে বিবেকহীন রাজনৈতিকদের ছিনিমিনি খেলা, অরক্ষণীয়ার অন্ধকার ভবিষ্যৎ, অর্থের জোরে সমাজের বুকের উপরে বসে অন্যায়ভাবে মৃত্যু ভয়ে কাতর পিতামাতার সম্মুখে তাদের কুলকামিনীর সর্বনাশ, ভ্রূণ হত্যা—সবই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

এসব দেখে শুনেও আমরা

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

সম্প্রতি ট্রেনে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে। প্রধান কারণগুলি হ'ল ঃ

★ সংগে নেওয়া আতসবাজী পটকা ইত্যাদি।

★ অসাবধানে ছুঁড়ে ফেলা জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি বা বিড়ি সিগারেট-এর জ্বলন্ত টুকরো।

★ সংগে নেওয়া বিস্ফোরক বা জ্বালানী বা সহজদাহ্য পদার্থ।

★ চুল্লী বা স্টোভ জ্বালিয়ে কামরায় রান্না।

এই কাজগুলি বে-আইনী। বিপজ্জনক ত বটেই।

দেওয়ালীর সংগে সংগে এগিয়ে আসছে, বাজী পটকার দিন। সেইজন্য সতর্কতার প্রয়োজন আরও বেশী। ট্রেনে কখনই বাজী বা পটকা সংগে নেবেন না।

নিজের ও সহযাত্রীদের আনন্দের দিন মাটি করে দেবেন না।

এই বিপজ্জনক বস্তুগুলি কখনই ট্রেনে সংগে নেবেন না

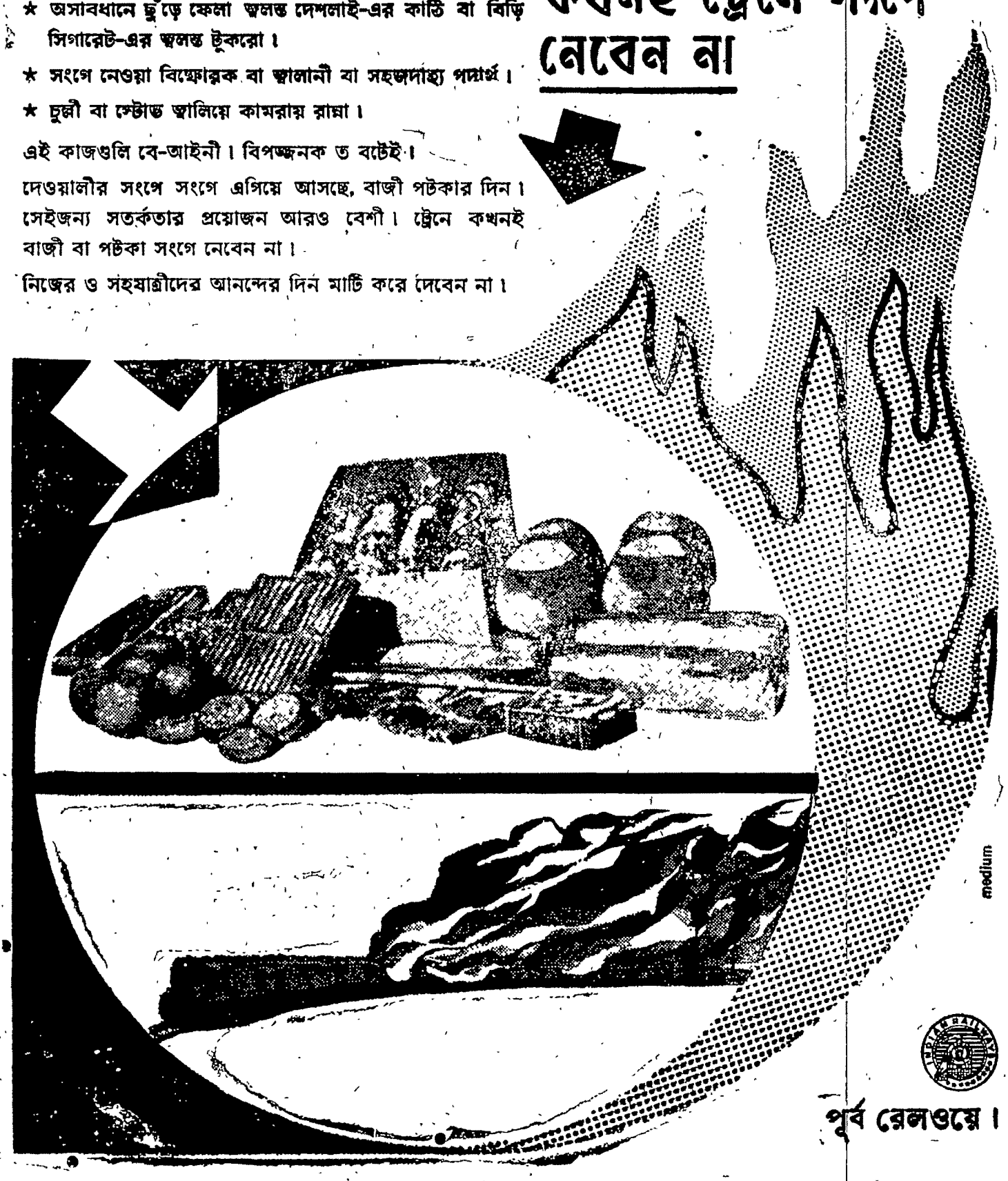

পূর্ব রেলওয়ে।

দলত্যাগের রাজনীতি

সংবাদপত্রে পড়েছি, প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েক বার বলেছেন : "আমাদের দলের নেতারা বিরোধীদের চোখে দুর্নীতিপরায়ণ, অথচ এর মধ্য থেকে কেউ দলত্যাগ করলেই সে হয়ে যায় সুনীতিপরায়ণ।" বস্তুত ব্যাপারটা বেশ মজার। কিছু দিন আগে গুজরাটের হিতেন্দ্র দেশাইয়ের কংগ্রেসে যোগদানের সংবাদ পড়লাম। কংগ্রেসের বক্তব্য অনুসারে জেপির নেতৃত্বে দেশে একদল নেতা বা গোষ্ঠী রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। দেশে যখন অকংগ্রেসীদের আন্দোলন চলছিল তখন হিতেন্দ্র দেশাই তো কংগ্রেস বিরোধীই ছিলেন। কাজেই তার এই দলত্যাগে অনেকের মনে বিভ্রান্তি জাগবে না? শুধু হিতেন্দ্র দেশাইরাই নয়, মধ্য প্রদেশসহ কিছু কিছু জায়গায় জনসংঘের কিছু লোক কংগ্রেসে যোগদান করেছে। কংগ্রেসের তরফ থেকে বারবার এই সব লোককে গণতন্ত্র নিতোধী শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ এরাই যখন কংগ্রেসের হয়ে কাজ করবে, তখন জনগণ ব্যাপারটাকে কেমন ভাবে নেবে? এগুলো কি পরস্পর বিরোধী এবং গোলমেলে ব্যাপার নয়।

সাম্প্রতিক রাজনীতিতে দলত্যাগ প্রসঙ্গে সি পি আই নেতা রাজেশ্বর রাওর একটা বিবৃতি চোখেই সেপ্টেম্বর কাগজে পড়লাম। রাজেশ্বর রাও তাতে বলেছেন—বহু সি পি এম সদস্য সি পি আইতে যোগদান করেছে এবং রাজেশ্বর রাও সি পি এম-এর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক নিয়েও অনেক গরম গরম কথা বলেছেন। কিন্তু তার পর দিনই অর্থাৎ পনেরোই সেপ্টেম্বর কাগজে দেখলাম ঐ পার্টির পুরুলিয়ার একশ উনসত্তর জন সদস্য সমীর চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে দল ত্যাগ করেছে। এবং পার্টির বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগ এনেছে। এর আগে সি পি আই-এর বেশ বড় সাইজের নেতা জে এম বিশ্বাস সি পি আই থেকে ফুটে গেছেন। জে এম বিশ্বাসের সঙ্গে আরো কিছু ফুটেছে। কাজেই সি পি আই-এর আজ নিজেরই টালমাটাল অবস্থা, অথচ এরা পরের সমালোচনা করছে। তাই বলি রাজেশ্বর রাওরা আগে নিজের ঘর সামলান, তারপর পরের জানলায় উঁকি দেবেন। সমীর চ্যাটার্জী সি পি আই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এনে বলেন : "পার্টির কিছু কিছু লোক যে সৎ জীবনযাপন করে না, তার প্রমাণ হল নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির গৃহতল্লাসী। তাদের গৃহ তল্লাসী করে আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ধনরত্নের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং পার্টির নেতৃত্ব ওই লোকদের রক্ষার জন্য তদ্বির তদারক আরম্ভ করেছেন (আনন্দবাজার, পনেরই সেপ্টেম্বর)। সমীরবাবুর এই ধরণের অভিযোগ সাংঘাতিক, কারণ এই ধরণের অভিযোগ একটা বুর্জোয়া পার্টির পক্ষে মানিয়ে যায়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না সি পি আই নিজেকে কমিউনিস্ট পার্টি বলে পরিচয় দেয়। একটা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এই ধরনের ব্যাপার খুব গুরুতর। অনেকদিন আগে কলকাতার এক সাপ্তাহিকে পড়েছিলাম সি পি আই নাকি প্রকাশ্যে মদ না খাওয়ার জন্য পার্টি কর্মীদের এক সার্কুলার দিয়েছিল। হায় সি পি আই হায় রাজেশ্বর রাও

সাম্প্রতিক দল ত্যাগের উপর একটি সম্পাদকীয়তে "যুগান্তর" যা বলেছে সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তেরই সেপ্টেম্বরের যুগান্তরের সম্পাদকীয়তে গুজরাটের সাম্প্রতিক দলত্যাগের ব্যাপারে বলা হয়— "সম্ভবত দল ত্যাগ ঘটিয়ে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঘটানোর রাজনৈতিক কৌশল কংগ্রেস এখনই গ্রহণ করবে না।" নিজের থেকে দলত্যাগ করা আর "দলত্যাগ ঘটিয়ে" ব্যাপারটা তো এক নয়। "দলত্যাগ ঘটিয়ে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঘটানো" বললে কংগ্রেসের এ-ব্যাপারে একটা দায়িত্ব চলে আসে। যুগান্তর সম্পাদকীয়র অর্থ এই দাঁড়ায় যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ভাঙ্গার জন্য দলত্যাগ ঘটায়। এ অভিযোগ নিঃসন্দেহে গুরুতর। বিরোধীরা বহুবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছে। যুগান্তর সম্পাদকীয়ও তাই বলছে। এব্যাপারে কংগ্রেসের বক্তব্য থাকা উচিত। তা না হলে জনতার মধ্যে বিভ্রান্তি জাগবে, আরো প্রশ্ন দেখা দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন : "দেশের কিছু প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এটা অভাবনীয় তবুও সত্য। এই অশুভ আঁতাত ছিন্ন করতে সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।" একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থা আর "বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ" এক জিনিষ নয়। রাজনৈতিক দক্ষিণ পন্থা একটা মতাদর্শগত ব্যাপার। সব পার্টির রাজনীতি এক হতে পারে না। একটা দেশে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী মধ্যপন্থী সব পন্থাই থাকতে পারে। সেটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এখানে "বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ" বলতে সচেতনভাবে কোন দেশের দালালী বোঝায়। এটা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। কাজেই ভয়ংকর। "বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ" সব সময়েই একটা ষড়যন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এরা নিজের দেশের স্বার্থকে বিদেশের পায়ের তলায় বিকিয়ে দিতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থা অতোটা বেইমানীর পরিচয় দেয় না। তাই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল আর দেশদ্রোহী এক হতে পারে না। দেশদ্রোহীরা চিরকালই দেশে দেশে ঘৃণিত। কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী সাম্প্রতিক আন্দোলনের যিনি মূল হোতা সেই জয়প্রকাশ সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী বলেন "আমাকে সরানো হলে জে পি-কেও প্রতিক্রিয়াশীলরা সরিয়ে দিত।" প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতি থেকেই "বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের" অভিযোগ থেকে জে পি খালাস পেয়ে যান। জে পি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারনাও বেরিয়ে আসে। সরকার বিরোধী আন্দোলনের মূল হোতাই যখন খালাস তখন কিছু প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগটা আরো জটিল হয়ে পড়ে। দেশদ্রোহীদের সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে জানতে সব-সময়েই সব দেশে জনগণ কৌতূহলী থাকেন। এদেশে যদি এরকম কেউ থাকে তবে তাদের সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার জন্য জনগণকে পরিষ্কার সব জানানো দরকার। তা না হলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়বে এবং কিছু প্রতিক্রিয়াশীলের বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগও ধোপে টিকবে না।

জনৈক পাঠক

সভামত

সোলঝেনিৎসিনকে নিন্দা করার পুরস্কার

"গত বছর কলকাতায় যাঁরা সোলঝেনিৎসিনকে নিন্দা করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতি। পাস্তারনাকে "ডঃ ঝিভাগো"-র জন্য নোবেল পুরস্কার পেলে রুশ সরকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিষ্ণু দে "সাহিত্য পত্র"-এ এক দীর্ঘ প্রবন্ধে পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেন। বিষ্ণু দে সেই কাজের পুরস্কার পান একটু দেরীতে—রুশ সরকারের একটা অনেক টাকার পুরস্কার ও রাশিয়ায় ঘুরে আসা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো প্রায়ই রাশিয়া কায়রো যাতায়াত করছেন। এত টাকা তিনি পানই বা কোথায়? সম্প্রতি আবার কলকাতায় আফ্রো-এশিয়া লেখক সঙ্ঘের অফিস করে গাসে দু হাজার টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন। মণীন্দ্র রায়ও একটা পুরস্কার পেয়েছেন ও রুশ দেশে বেরিয়ে এসেছেন। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্প্রতি দ্বিতীয়বার রাশিয়া ঘুরে এসেন। এবারে তাঁর সঙ্গী ছিলেন "সপ্তাহ" সম্পাদক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্র সোলঝেনিৎসিনকে নিন্দা করার পুরস্কার হিসাবে কিছুকাল আগে রাশিয়া থেকে ঘুরে এসেছেন। তরুণ সান্যাল সম্প্রতি রাশিয়ায় গিয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সোলঝেনিৎসিনকে নিন্দা করলে, আর্থিক লাভের একটা ব্যাপার আছে। পরের পয়সায় রাশিয়া ঘুরে আসা অথবা রুশ সরকারের টাকায় পুরস্কার অথবা কলকাতায় "বিংশ শতাব্দী" কিংবা "সোভিয়েত দেশ" বা নভোস্তিতে অনুবাদ বা মোটা মাইনের চাকরী এইসব কারণে এদেশে সোলঝেনিৎসিনকে নিন্দার ব্যাপারটাকে ঐ লেখকের রচনার ত্রুটি বলে মনে করা উচিত হবে না। রাশিয়ার টাকার পুরস্কার ও রুশ ভ্রমণের টোপ না থাকলে তাঁদের বক্তব্যের অর্থ হয়তো অন্য রকম করা যেত।"

শ-জ

শারদীয়া ভাবনা-চিন্তা পত্রিকায় "সোলঝেনিৎসিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা কেন" প্রবন্ধে সাংবাদিক শ্রীনিরঞ্জন হালদার উপরোক্ত তথ্য পাঠককুলের কাছে তুলে ধরেছেন। এই তথ্যের সবিশেষ প্রচারের জন্য বর্তমান সংকলয়িতা দর্পণের সম্পাদকের মাধ্যমে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

রাণু ঘোষ

প্রেসিডেন্সী কলেজে গুণ্ডামী

গত চৌঠা অকটোবর সারা ভারত অধ্যক্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অধ্যক্ষদের অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, তাঁরা যেন নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক দলাদলি ও ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকের কবল থেকে মুক্ত রাখেন। তিনি আরও বলেছেন যে পেশাদার ছাত্ররাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান সমস্যা। তারা পড়তে আসে না, কোনমতে "ছাত্র" পদটা টিকিয়ে রাখাটাই তাদের লক্ষ্য।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলার অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সী কলেজের কিছু ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারী বেসরকারী সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গত পয়লা অকটোবর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্র শ্রীসঞ্জীব মুখার্জীকে তার ডিপার্টমেন্ট থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রচন্ড প্রহার করা হয়। এই সময়ে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হয়ে অধ্যক্ষের ঘরে যায়। সঞ্জীব মুখার্জীর একমাত্র অপরাধ যে সে কয়েকদিন আগে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের "যুববাণী" বিভাগের একটি বিতর্কে "প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ে"র বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছিল। ঘটনার দিন তর্কাতর্কির সময় দুষ্কৃতকারীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্রী শ্রীমতী অনুরাধা চ্যাটার্জীকে চড় মারে। এই ঘটনায় কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং দুষ্কৃতকারীরা চাপে পড়ে অনুরাধা চ্যাটার্জীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কিন্তু সঞ্জীব মুখার্জীকে মারার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দুষ্কৃতকারীদের কয়েকজন বর্তমানে কলেজের ছাত্রও নয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে এই ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে এবং প্রতিবারই কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হন।

জনৈক ছাত্র

পিল খাইয়ে মুনাফা

পিল, কনট্রাসেপটিভ পিল, স্লিপিং পিল—এই তিনটেরই চল এখন প্রায় ফ্যাসনে পর্যবসিত। প্রথমটি অর্থাৎ ম্যানড্রেকস জাতীয় ট্যাবলেট—ইস্তেমাল কলেজে এবং হোস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে ব্যবহার ব্যাপক। দ্বিতীয়টি অনিবার্য কারণবশতঃ তথাকথিত মডার্ন হাই সোসাইটিতে বহুৎ চল। আর স্লিপিং পিল—বিজ্ঞাপনের ভাষায়—দাদু খায়, ঠাম্মা খায়, বাবা খায়, মা খায় গোছের। পিল নিয়ে পিলে চমকানোর অনেক ঘটনাই ঘটছে। দর্পণের সংবাদদাতার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি। এদেশে কি পরিমাণ পিল (ট্রাঙ্কুলাইজার, সিডেটিভ, কনট্রাসেপটিভ, স্লিপিং পিল) বিদেশ থেকে আমদানী করে বিলাতী কোম্পানী মুনাফা কামায় সে সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করুন।

বিজয়া চট্টোপাধ্যায়
কোন্নগর

শোক সংবাদ

বিশিষ্ট নৈয়ায়িক অধ্যাপক দ্বারকানাথ ন্যায়শাস্ত্রীর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সতী দেবী গত পনেরোই অকটোবর তাহাদের কুমারটুলীস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। স্বামীর বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে এবং টোলের শত শত ছাত্রের নিকট তিনি সকলের মাতৃস্বরূপা ছিলেন।

তাহার দেবর প্রখ্যাত পন্ডিত অধ্যাপক জানকীনাথ শাস্ত্রীর সহিত তিনি আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন শোকবহুল ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয়েছিল সাতাশি বৎসর।

শারদীয় সাহিত্য

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

চোখ বুজে কানে তুলো আর ঠোঁটে প্লাস্টার লাগিয়ে বসে আছি। কোথায় সে বাঙালী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী যারা এর প্রতিবাদে মুখর হবেন। সিনেমাওলাদের দিকে চোখ রেখে শারদীয় সংখ্যায় জঞ্জাল সৃষ্টি না করে এগিয়ে আসুন, প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে বদ্ধপরিকর হউন। অন্ততঃ সাধারণ মানুষের মনে তারা আশার সঞ্চার করুন। পেট ভরে খেতে না পেলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, স্রেফ যদি তার মনে কিঞ্চিৎ আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।

পুনর্মুদ্রণ

ভারতে সাম্যবাদের সম্ভাব্যতা

জ্যোতি বসু

ভারতে সাম্যবাদের সম্ভাব্যতার ওপর যদি কখনো আমার আস্থা না থাকত তাহলে আমি কমিউনিস্ট থাকতাম না। মার্কসবাদ বিশ্বজনীন এবং আন্তর্জাতিক; এবং এই তত্ত্ব বিকাশের এমন কতকগুলি সূত্র বের করেছে যা সকল জাতি এবং জনসমষ্টির বেলায়-ই সমান ভাবে খাটে। মার্কস এবং এংগেলসের আবিষ্কার অনুসারে পুঁজিতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সমাজবাদী ব্যবস্থা নির্মাণের বিশ্বজনীন এবং ঐতিহাসিক পবিত্র কর্তব্য শ্রমিক শ্রেণীর উপরে অর্পিত হয়েছে। তবু, কোন বিশেষ পদ্ধতির অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি নিজগুণে কালের যে-কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছানির্বাচিত সময়বিন্দুতে সফল হবেই এমন কোন জামিন নেই। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং কোন বাস্তব অবস্থার তথ্যাবলী ছাড়াও এই সম্ভাবনার সাফল্য অর্জন নির্ভুল, সংগঠিত এবং অবিরাম প্রয়াসের উপরে নির্ভরশীল।

নামমাত্র ইতিহাসের বিচারে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর হলের এর কৃতিত্ব খুব উল্লেখযোগ্য মনে না হতে পারে। কমিউনিস্টরা বা নাম করে বলতে গেলে, ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি—আমি যার সভ্য—আজ পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালারাজ্য সরকার দুটির অগ্রণী শরিক। এর বিপরীতে এই ঘটনাও উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় সংসদের ৭৫০টি আসনের মধ্যে পঁচিশটির বেশী আসন সি পি আই এম-এর অধিকারে নয় এবং ভারতের রাজ্য বিধানমণ্ডলীগুলির ৩২০০-এর অধিক আসনের মধ্যে মাত্র ১৫৮টি আসন আমাদের দলের দখলে।

বিধানমণ্ডলীতে প্রতিনিধিত্ব সংখ্যা অবশ্য কমিউনিস্টদের শক্তির সঠিক পরিমাপ নয়। এরকম দাবি করলে কোনো ইচ্ছাপূরণ বা প্রচারমূলক অতিরঞ্জন হবে না যে, বিভিন্ন পরিষদীয় সংগঠনে দলগত শক্তির যে প্রতিফলন দেখা যায়, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন তার চেয়ে অনেক বেশী গণসমর্থনের অধিকারী। বিরাট অসম বিকাশ সত্ত্বেও কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক, কৃষক, যুব ছাত্র শিক্ষক প্রভৃতি সংগঠনগুলির তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া বামপন্থী, গণতান্ত্রিক দলসকল এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত যুক্ত মোর্চার আন্দোলনগুলিও জনসাধারণের অগ্রগামী শক্তির অন্যতম নিদর্শন। কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে থাকে। তবু একথা বললে সততার অপলাপ হবে যে, বিগত ৭৫ বছরের নির্দিষ্ট কালের পটভূমিতে যা করা সম্ভব বিল তা এই আন্দোলনের দ্বারা অর্জিত হয়েছে।

অবশ্য এমন যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, এমন অনেক দেশ আছে যেখানে আন্দোলন সূচনা আরো জোরদার সত্ত্বেও অনেক অল্প অগ্রগতি ঘটেছে। এই রকম যুক্তি দেখিয়ে দায়িত্ব ক্ষালন করা যায় না। ভারতীয়দের দরিদ্রতা এবং অর্থনৈতিক অসাম্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে বিদেশীরা প্রায়ই মন্তব্য করে থাকেন যে, বর্তমান প্রভাবের তুলনায় কমিউনিস্টদের মূল আরো গভীরে এবং বিস্তারে প্রোথিত হওয়া উচিত ছিল। এরূপ প্রতিক্রিয়া যদিও অস্বাভাবিক নয় তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই ধরণের বিচারের পিছনে কোনো যুক্তি যদি সত্যি থেকেও থাকে তবে তা খুবই ওপর ভাসা।

দারিদ্র্য বা অর্থনৈতিক অসাম্য-মাত্রই সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অথবা সেরকম পরিবর্তনের জন্য সার্থক আকাঙ্খারও যথেষ্ট শর্ত নয়। দরিদ্র এবং শোষিত জনতা যদি ভাগ্যকে অপরিহার্য বলে মেনে নাও নেয়, যদি বিশেষ কোনো আত্মসমর্পণমূলক দর্শনের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়, তখন তারা অদৃষ্টবাদী হয়ে ওঠে। তখন যদি কোনো প্রতিবাদ ঘটে তাহলে তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত হঠকারিতামূলক কাজে সীমাবদ্ধ থাকে। সামাজিক বিবর্তন তখনি ঘটে যখন এই মানুষগুলিও জানতে পারে, কার্যত দেখতে পায় যে, এই সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে বদলে ফেলবার উপযোগী একটা সুন্দর পাল্টা পদ্ধতি আছে। কিন্তু সেটা দেখতে হলে আগে তাদের রাজনৈতিক ভাবে শিক্ষিত হতে হবে। এই শিক্ষিত করে তোলাটাই হল যে কোনো কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান কর্তব্য।

আমরা নিজেরা স্বীকার করি যে, এই কর্তব্য যতখানি প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব দুই-ই ছিল ততখানি ফলপ্রসূ এবং বিস্তারিত ভাবে আমরা তা করে উঠতে পারিনি। প্রথমিক স্তরে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন বহুলাংশে শ্রমশিল্পের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বেশী দূরে বিস্তৃত হতে পারেনি। কেবল শেষের বছরগুলিতে এই আন্দোলন একটা রাজনৈতিক গতি লাভ করে। এর সাথে সাথে কৃষক শ্রেণীর অন্ততঃ কিছু অংশকে এর আওতায় আনার চেষ্টা হয় এই সময়েই।

কোনো কোনো ভাবুকের মতে ভারতীয় সমাজ-কাঠামো কমিউনিজমের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারা পরিস্থিতিকে এই সূত্রটির মধ্যে দিয়ে সংক্ষেপিত করতে চেষ্টা করেছেন যে, "ভারতের পরিস্থিতি যখন বৈপ্লবিক তখন তার সমাজ ব্যবস্থা অবৈপ্লবিক"। এই ব্যাখ্যাকে অতিরিক্ত সহজ মনে হয়। বর্ণাশ্রম প্রথায় বিকশিত সামাজিক স্তরবিন্যাস নিশ্চয়ই এক প্রকারের জড়তামূলক প্রতিরোধ দান করে কিন্তু সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিচারের জন্য গণচেতনাকে নির্দিষ্ট আন্দোলনের ভিত্তিতে যদি সঠিকভাবে সমাবেশ করানো যায় তাহলে তাকে ঠেকানোর সাধ্য ঐ প্রতিরোধের নেই।

সম্ভবত এর চেয়েও কঠিনতর সমস্যা হল প্রাদেশিক ও প্রান্তীয় ভেদজ্ঞান। এই দেশ শুধু বিশালই নয়, ভাষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও অসাধারণ রকম বিভিন্ন। এ ছাড়া আরো বহু শক্তি এদের উপরে নিয়ত ক্রিয়াশীল যা এই বিভেদকে আরো তীব্র করে তোলে কিন্তু এখানেও আমার এমন মনে হয় না যে, আমরা অলঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন। বিশেষ বিশেষ স্থানিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট শক্তি সমাবেশে যদি আমরা দেখিয়ে দিতে পারি যে, এই স্থানিক ভেদগুলির ভূমিকা গৌণ তাহলে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলা কঠিন বলে আমার মনে হয় না। এতে হয়তো সময় লাগতে পারে। কিন্তু সীমিত অঞ্চলেও যদি এই আন্দোলন সফল হয় তবে তার প্রতিক্রিয়া দেশের অন্য অঞ্চলগুলিতে এক কার্যকর প্রভাব বিস্তার করবে।

জাতীয় সভায় একটি বহুলজিজ্ঞাসিত প্রশ্ন। "কমিউনিস্টরা বৈদেশিক চর" এবংবিধ অবধারিত প্রচার উপেক্ষিত হতে পারে। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, তারা জাতীয় অভীপ্সা এবং আকাঙ্খার মূল প্রবাহের প্রতিনিধিত্ব করেন কি না। এই প্রবাহ নির্ধারণ হয়তো সহজ নয় কিন্তু একথাও সত্য যে, স্বাধীনতার পূর্বের কয়েক বছর বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চরিত্র জাতীয় মনোভাবের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গুণের দ্বারা অন্বিত ছিল। একথাও স্বীকার্য যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই সংগ্রামসত্তার সঙ্গে একীভূত হয়েছিল।

অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে আজ ভেবে খুবই পরিতাপ হয় যে, যে-কমিউনিস্টরা এই জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন তারা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব অধিকার করে তাকে এমন আন্দোলনে পরিণত করতে পারলেন না যার লক্ষ্য হতে পারত কেবল রূপগত স্বাতন্ত্র্য নয়, পরন্তু সত্যিকারের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লব।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে কমিউনিস্টদের কী করা উচিত ছিল আর কতটুকু তারা করে উঠতে পারতেন তা নিরূপণ করা আজ সহজসাধ্য নয়। নীতি-নির্ধারণের ভ্রান্তি জাতীয় আন্দোলনের কোন কোন স্তরে হয়েছে বটে এবং ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভ্রান্ত প্রয়োগের ফলে কমিউনিস্টরা বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছেন এবং তারা সঠিক পথে সত্যাকারের গণ-আন্দোলনকে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

যাই হোক, অল্প সময়ের জন্য হলেও, স্বাধীনতার পরে অনেকের মনেই কংগ্রেস জাতীয় সভার সঙ্গে একীভূত হতে থাকল। কিন্তু দুদিন আগে বা পরে এই অবাস্তব একাত্মতা দূর না হয়ে পারল না। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস তার কাজের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা স্থিতস্বার্থের প্রতিনিধি। কাজেই মোহমুক্তি দেরি না করে শীঘ্রই ঘটল। কমিউনিস্টরা তাদের গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এদের মুখোস খুলে দিয়ে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য দান লিপিবদ্ধ করেছে। কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিধিব্যবস্থাগুলিও কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তিগুলির যথেষ্ট রক্ষাকবচ নয়। এই সব প্রতিষ্ঠানে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ মাত্রেরই মূল্য হয়তো সীমাবদ্ধ কিন্তু ভারতের দুটি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং কার্যকরণ ভারতীয়দের মনে নিঃসন্দেহে এক সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। এই দুটি সরকারের অগ্রণী ভূমিকায় আছেন কমিউনিস্টরা। অসংখ্য মানুষ আজ এই দুটি সরকারের দিকে এই আশায় তাকিয়ে আছে যে, তারা ভারতের অন্য রাজ্যগুলির সামনে একটা হক এঁকে দেবেন এবং কংগ্রেসের একতান্ত্রিক শাসনের একটি বিকল্প নেতৃত্ব দেবেন।

আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে এই প্রবন্ধ যখন লিখছি তখনি কংগ্রেসকে এমন সংকটের সম্মুখীন দেখা যাচ্ছে যা কালে কালে আরো তীব্র হবে; তার সঙ্গে বাড়বে কংগ্রেসের ভিতরকার উপদলীয় রেষারেষি। নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আদর্শগত ও কার্যক্রমগত মতদ্বৈধ প্রকট হয়ে হয়ে উঠেছে যার সম্পর্কে জনগণ পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে আজ বেশী সচেতন। বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ও শক্তি সঞ্চয়ের পক্ষে এযে কত বড়ো সুযোগ দেবে তা বলাই বাহুল্য কমিউনিস্ট পার্টি দুটোর তত্ত্বগত প্রভেদ এবং কার্যক্রমগত বিস্তর পার্থক্য বর্তমানে যা আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এদের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা দেখছি না। কিন্তু এমন সুযোগ আছে যেখানে শুধু এই দুটো পার্টিই নয়, বরং বামপন্থী ও গণতন্ত্রী সবগুলি দলই যুক্তভাবে কাজ করতে পারে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পন্থার নির্ভুলতা এবং কমিউনিস্ট পদ্ধতির প্রতিযোগক্ষমতা আরো সুস্পষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হবে।

কিন্তু কেউ যদি ধারণা করে থাকেন যে, কংগ্রেস সমকদের মধ্যে যে কোনো ধরণের বিশৃঙ্খলা ও ভাঙন-ই কমিউনিস্ট বা গণতন্ত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাহায্য করবে, তাহলে তাকে আমি সতর্ক করে দেব। বামপন্থীরা যদি কখনো সুযোগ পান তখন তাদের মনে রাখতে হবে যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াও তা পেয়েছে। দক্ষিণপন্থী শক্তি সমাবেশ এবং ক্ষমতালাভের চেষ্টা অবধারিত। যদিও এই ধরণের চেষ্টা স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে পারে না তবু ভারতীয়দের কমিউনিস্টদের সামনে অব্যবহিত কর্তব্য হল দক্ষিণপন্থী চরমপন্থীদেরকে এমনকি অস্থায়ী সাফল্য অর্জন করতেও না দেওয়া।

[শারদীয় সংখ্যা, ১৯৬৯]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার জনগণকে ব্যাপক সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য আহ্বান জানান। সংশ্লিষ্ট আবেদনে তাঁরা বন্দী মুক্তির দাবি জানান।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন গণতন্ত্রী দলগুলোকে নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি মুক্তিফ্রন্ট। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপক গ্রামাঞ্চল মুক্তিফ্রন্ট মুক্ত করেছে। এখানকার ফ্যাসিস্ত সরকারকে এখনো মদত দিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ।

যুদ্ধবাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সি আই-এর চক্রান্ত

দেশে দেশে, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সতত ব্যস্ত। শুধুমাত্র গোপন গোয়েন্দা চক্রের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা সীমাবদ্ধ নয়, অস্ত্রব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপকভাবে। সম্প্রতি মার্কিন পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করেছে। এই তথ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখোশ খুলে পড়েছে। আতঙ্কের কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়-সমরকালে ছত্রিশটি দেশে একশ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করেছে। এই অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আছে ৮৬৬টি ফ্যান্টম জেট। ১৮৫টি ডেস্ট্রয়ার, ২৩৭৫টি হেলিকপ্টার, ১৫০০টি বিমান, পাঁচ হাজার হক ও বিমানধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পাঁচশ হাজার ভূপৃষ্ঠে উৎক্ষেপণ ক্ষেপণাস্ত্র, আঠাশ হাজার ট্যাঙ্ক ধ্বংস ক্ষেপণাস্ত্র, এবং আরো আঠাশ হাজার ট্যাঙ্ক ইত্যাদি অন্যান্য অস্ত্র। এই অস্ত্রশস্ত্র প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য আমেরিকা ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রগুলোতে গেছে ওখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসনগুলোকে মজবুত করতে। এবং এই অস্ত্রশস্ত্র প্রধানত ব্যয়িত হয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোর মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য।

হিসেবের মধ্যে অবশ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত ভিয়েতনাম যুদ্ধের হিসেব নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময়ের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় প্রায় শদেড়েকের বেশি খুঁ সংগঠিত হয় সি আই এর পরিচালনায়।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

পূজা সংখ্যা "আনন্দমেলায়" শ্রীমান্ পুলেন্দু পত্রী এক "রাজকুমারের গল্প" ফেঁদেছেন। একটু অংশ শুনুন ঃ "..... এমন সম্মান যা কেউ কল্পনা করেনি। রানীর ড্রইং রুমে, রানীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াবার অধিকার।"

বলুন তো এমত সম্মানের অধিকারী কে?

আর কে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

আমার রুমমেট ভোলা নন্দী বিরক্ত গলায়, বললেন, "পুলেন্দুটার এখনো বয়েস হলনা। সব "ইতিহাস" যে লিখতে হয়না, সেই বুদ্ধিই ওর হল না!"

\+ + +

পুনরায় একই রচনা।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের ধনী হওয়ার ইতিহাসের আবর্জনা খুঁড়ছেন তিনি। জ্যাঠামশায়ের পুষ্যি দ্বারকানাথের ধনকুবের হওয়ার ফিরিস্তি।

এক ॥ ম্যাকিনটশ কোম্পানীর গোমস্তা-গিরির চাকরী।

দুই ॥ রেশম আর নীল জোগাড় করার কাজ

তিন ॥ অর্ডার মতো মাল কিনে য়ুরোপে সরবরাহ

চার ॥ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি

পাঁচ ॥ চব্বিশ পরগণার কালেক্টার কাম্ সল্ এজেন্ট মিঃ প্লাউডনের অধীনে দেওয়ানীর পদ

ছয় ॥ শুল্ক ও আবগারী বিভাগের দেওয়ানী

সাত ॥ ম্যাকিনটশ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়, ইত্যাদি

ভোলা নন্দীর পুনরপি মন্তব্য ঃ "ছোকরার সব জানাবার ঝোঁকটাই এর বদহজমের কারণ হয়েছে।"

\+ + +

"কৃশাণু" নামক একটি ত্রিমাসিক পত্রের শারদীয় সংস্কার সম্পাদকীয় ঃ

"সান্ত্বনা যে, কৃশানুর চেয়ে পাঁচগুণ নামী দামী ভারী পত্রিকাগুলো প্রয়োজনাতিরিক্ত স্নো-পাউডার-সেন্ট-রুজ-লিপস্টিক বেল্-বটমের আড়ালেও নীরোগ দেহ নিটোল স্বাস্থ্য ও প্রাণপ্রাচুর্যের পরিচয় দিতে পারেনি—তাদের আসল দৈন্য ঢাকা পড়েনি। ..... সে অপযশের ভাগী হোট পত্রিকাগুলোকে হতে হয়না। কারণ আড়তদারের মাসাধিককালের বরফ-চাপা পচা মাছ এটা নয়। কাঁনকোতে আলতা মেখে তাজা বলে চালাতে হয় না। এগুলি নিজ হাতে তৈরি তাজা জ্যান্ত সবুজ ফসল।"

সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সিংহকে স্পষ্ট ভাষণের জন্যে ধন্যবাদ।

\+ + +

পাইকপাড়া থেকে অনিল সাহার পত্রাঘাত ঃ "আপনি কী নিজেকে পরম বোদ্ধা ভাবেন?"

উত্তর ঃ বোদ্ধা নয়, বোদ্ধা। না, পরম মূর্খ। কারণ কোনো সম্পাদকেরই টাকার প্রত্যাশায় আমাকে ফরমায়েসী লেখা লিখতে হয়না!

\+ + +

জনৈক বন্ধুর ইয়ারকি ঃ কবিতা পুং না স্ত্রী?

উত্তর ঃ কবিতার যখন সিং গজায়, তখন গো-জাতির মতোই তাদের লিঙ্গ নির্ণয় করা যায়না।

\+ + +

আরেকজন সাহিত্য-উন্মাদের জিজ্ঞাসা ঃ "জানেন "নন্দন" শারদীয়ায় "চতুষ্কোণে" বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত নেপাল মজুমদারের শরৎচন্দ্র বিষয়ক রচনাটি পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে? এত ঘন ঘন একই লেখা দুটি প্রগতিশীল পত্রিকায় বেরুনো কী ঠিক হয়েছে?

কেন? পুনঃপ্রচারের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশ করায় আপত্তি কী? বিশেষ করে কিছু ব্যক্তি ও মহল থেকে যখন শরৎচন্দ্রকে মার্কসবাদী বানাবার চেষ্টা করা হচ্ছে? তাহলে যে নেপালবাবুর রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র প্রগতিশীল বানাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়!

\+ + +

"গোর্কির উপন্যাস পড়ে অনেক সময়ে তাঁর চড়া সুরে অস্বস্তি বোধ করতে হয়।" গোপাল হালদার/রুশ-সাহিত্যের রূপরেখা।

যতদূর মনে হয় গ্রন্থটির জন্যে শ্রীহালদার সোভিয়েত পুরস্কার পেয়েছেন।

দেশত্যাগী আলেকজান্ডার মিরস্কির "রাশিয়ান সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে গোর্কি সম্পর্কে এই ধরণের মন্তব্যই পাওয়া যায়।

প্রবাদ ঃ "মহান ব্যক্তিরা একই ধরণের চিন্তা করেন।"

\+ + +

শারদীয় "গল্প সংকলনে" ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যের রচনাংশ ঃ

"এখন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রত্ন কলকাতার মুখে জমা হয়েছে। সব লেখকই এখন কলকাতার লেখক। পয়সা দেনেওয়ালা পত্রিকার লেখক। দেনেওয়ালার মর্জি মাফিক লেখক। এবং সে মর্জি সুস্থ নয়। সেই অসুস্থ মনোবিকারের হাওয়া ছড়ানো উদ্দেশ্যহীন নয়।"

\+ + +

চিংড়িপোতা, চব্বিশ-পরগণা থেকে শেখ আমানুল্লা সম্পাদিত "ধরা প্রগতি" পত্রিকা আয়োজিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে গোপা দত্ত, সুখেন্দু নাথ ও গিরিজা-শঙ্কর গিরি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন নিরাপদ অধিকারী। বিচারক ছিলেন শ্রীমিহির আচার্য।

\+ + +

প্রশ্ন ঃ "ভারতী"-তে প্রকাশিত বারোয়ারি উপন্যাসের বারো জন লেখক কে কে বলুন তো?

উত্তর ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎ শতবার্ষিকী

কমিটির উদ্যোগে বর্ষব্যাপী কর্মসূচীর সূচনায় সতেরো থেকে চব্বিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শরৎ সপ্তাহ পালিত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও শরৎ-অনুরাগীদের উপস্থিতিতে শরৎ-প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পথসভা, আঠারো থেকে বিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শরৎনাট্য প্রতিযোগিতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে, বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন, মহাজাতি সদনে শরৎ বক্তৃতামালা প্রভৃতি সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-ধারণা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমার চিঠি লেখার ধারণা ভারি এলোমেলো—কোনো কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে পারিনে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জনা করবেন। ইতি ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৪

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

[রবীন্দ্রনাথের পত্র]

কল্যাণীয়েষু,

আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাকো। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি—সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্তমানের ভোগ বর্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়—রাজ্য সাম্রাজ্য তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে বর্তমানের কোনো প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে এই আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি। বর্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্তলোকে এসেছে, তাদের সংখ্যার সীমা নেই—তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে—মাসিকে, সাপ্তাহিকে, সভাসমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর বাঁশে বাখারিতে তৈরি; তোমরা সেখানে যদি পা দেও, তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ, 'উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার।' সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্তমান কালের একটা বৃহৎ অংশ আছে, যেটা ক্ষীণজীবীদের—মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক 'ডিমক্রাসি'র যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তাবস্বরে ফরমাস করে থাকে। এ ফরমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিষম সমস্যা। এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্যে উন্মত্ত। তোমার মতো সাহিত্যিক যেন সেই দলকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার-বুলি নয়—তোমাদের খাঁচার পাখি না হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে, কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎ কালে, বৃহৎ দেশে। দাশু রায়ের আমলে উপস্থিত কাল দাশু রায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল—কিন্তু সে যে চেক সই করেছিল, আধুনিক কালের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মনসিংহের গাথা কাব্য লোকসাহিত্য, আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি—তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশু রায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশু রায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েছে, এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করছে। এরা কচুরিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেছে। আমি তোমার যে সব গল্প পড়েছি, তাতে তুমি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্তি দিয়েছ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগ দেগে দিতে পারেনি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে ভয় হয়, পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেছে। সে এতবড় লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে 'পারস্পেকটিভ'-এর কথা বলেছি, সে হচ্ছে নাটকের আখ্যান বস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত, তার ভাষায়, চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েছ, তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে, তাহলে ভাষায়, ঘটনায় অন্যরকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম, যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত, তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে, যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তাহলে বলবার কিছু নেই—যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি—যদি কোনোদিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে। ইতি—১১ মার্চ, ১৯২৮

তোমাদের—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা

ষান্মাসিক এগারো টাকা

ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা ঃ

৬১, মদ্ লেন, কলি-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মদ্ লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৭ই নবেম্বর ৭৫ ॥ দাম : ৪০ পঃ

সুব্রত মুখার্জীর দুর্দিন : সঞ্জয় গান্ধীর শরণ নিয়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী হঠাৎ সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার জন্য গত সপ্তাহে দিল্লী গিয়েছিলেন সুব্রতবাবুর এই আচমকা দিল্লী যাওয়ার রাজনীতিক মহলে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে।

সুব্রতবাবুকে প্রচার দপ্তর থেকে সরানোর জন্য রাজ্যের বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি উঠে পড়ে লেগেছেন। এবং সুব্রতবাবুকে বর্তমান দপ্তর থেকে সরিয়ে দেবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধমহল কয়েকজন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতা সহ সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গেও কথা বলেছেন। আমরা যতদূর জানি সুব্রতবাবুকে বর্তমান দপ্তর থেকে সরিয়ে দেবার কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েও গেছে।

সুব্রতবাবুও এই খবর রাখেন। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে সোজা দিল্লীতে যান অবস্থাটা বুঝিয়ে বলার জন্য।

গত সপ্তাহে দিল্লী গিয়ে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন এবং রাজ্য রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। সুব্রতবাবু সরাসরি সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেছেন। সুব্রতবাবু সঞ্জয় গান্ধীকে বলেছেন যে, তিনি সবসময়ই সঞ্জয় গান্ধীর নির্দেশ মেনে চলতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোন দ্বিধা বা সন্দেহ নেই। তিনি সব সময়ই সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে আছেন এবং থাকবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সঞ্জয় গান্ধী সুব্রতবাবুর সব কথা শুনেছেন। এবং তিনি সুব্রতবাবুকে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক মত কাজ করার জন্য। যদি তিনি (শ্রীগান্ধী) দেখেন যে, সুব্রতবাবু ঠিকমত কাজ করছেন, তবে তাঁকে (সুব্রতকে) অপসারণের ব্যাপারটা বিবেচনা করবেন।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে গভীর ষড়যন্ত্র

বাংলাদেশ সামরিক অভ্যুত্থানের সমস্ত রেকর্ডকে প্রায় ম্লান করে দিয়েছে। বেছে বেছে রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা এবং অভূতপূর্ব চক্রান্ত এমন সুপরিকল্পিত, অথচ আকস্মিক যে এর নেপথ্য নায়ক কারা সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা করা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় সামরিক বাহিনীর অফিসররাই এর মুখ্য নায়ক নয়। এর পেছনে কোন বৃহৎ শক্তির গভীর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার। এই উপমহাদেশে গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলা। আজ বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটছে তা বহুদিনের ষড়যন্ত্রের ফল। যদি বলা হয় এই ষড়যন্ত্রের নায়ক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাহলেও অবিশ্বাস করা যায় না পুরোপুরি। বাংলাদেশে (এবং ভারতবর্ষেও) নিজের পছন্দমত শক্তিকে ক্ষমতায় বসাতে চাওয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশে মার্কিনী ষড়যন্ত্রের বহু তথ্য ফাঁস হয়েছে। মার্কিনীরাই এই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে।

এই সন্দেহ হয়ত অমূলক নয় যে, বাংলাদেশের প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীতে সি আই এ নিজের লোকজন ঢুকিয়ে এবং কোন কোন গোষ্ঠীকে হাত করে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ বর্তমান অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান, হত্যা ইত্যাদি চক্রান্তের দিকে এগিয়েছে।

ভিয়েতনাম থেকে মার খেয়ে সি আই এ অন্যত্র ঘাঁটি গাড়তে চাইছে এ খবর বিভিন্ন কাগজে বেরিয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই এই উপমহাদেশে, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে সি আই এর কার্যকলাপ চলছে এ খবর নানা উপায়ে জানা যাচ্ছে। বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান যেসব কাজ কারবার চালাচ্ছে তার সবটাই ব্যবসা সংক্রান্ত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই অবস্থায় একটা ব্যাপারে এদেশের মানুষ আশঙ্কিত বোধ করবেন। তা হল ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের ব্যর্থতা। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকা সত্বেও ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সম্পর্কে আগে কোন খবরই জোগাড় করতে পারে নি।

সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের পথিকৃৎ বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে

'পলাশীর যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ তার শক্তি পুনরুদ্ধার করা, তাকে সংহত করা, তার বিস্তার ঘটানো এবং চূড়ান্তভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে মনোযোগ দিয়েছিল। পলাশী প্রান্তর আত্মাহুতি দিয়েছেন বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা—শহীদ হয়েছেন মোহনলাল, মীরমদন। রাজাউজীরদের মধ্যে তার পরেও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন মীরকাসেম, হায়দার আলী, টীপু সুলতান—লড়েছেন নানাফারনবিশ এবং আরও অনেকে।

জনতা কি করছিল ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ এই দশ বৎসর জনতার ওপর যে বর্বরোচিত শোষণ ও অকথ্য নির্যাতন চলেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর নেই—ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটির (চতুর্থ পার্লামেন্টারী রিপোর্ট পৃঃ ৫৩৫) তদন্তে প্রকাশ, বেইমান শ্বেত-প্রভুরা কেবল উৎকোচ খাতেই এই সময়ে ৯,০০,০০০০০ টাকারও বেশী বাংলা ও বিহারের জনতার কাছ থেকে আদায় করেছিল। এই হলো সরকারী পরিসংখ্যান। তাছাড়া নারীধর্ষণ, লুটতরাজ, রাহাজানী যে কত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই—খোদ ইংলণ্ডে পর্যন্ত এই তীব্র নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠেছিল। ফলে ১৭৭২ সালে কোম্পানী শাসনকে খতম করে দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা দেয় "ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তর।" ঐ সময়ে কৃষক জনতার বিক্ষোভ খুব দ্রুততার সঙ্গে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হতে থাকে—এরই নাম দেওয়া হয়েছিল "সন্ন্যাসী বিদ্রোহ" (১৭৬৩-১৮০০), "চোয়াড় বিদ্রোহ" ইত্যাদি। এই গেল একদিক।

অন্যদিকে সপ্তদশ শতাব্দিতেই ভারতীয় পণ্যসম্ভার ইয়োরোপের বাজারে বিশেষ সমাদর লাভ করে। এই পণ্যসম্ভার চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে মোঘল আমলেই নগর ও শিল্পকেন্দ্রে একশ্রেণীর মানুষ জমায়েত হতে থাকে, যার নাম হলো "মধ্য শ্রেণী।" এরা নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজার বিলাস-সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে প্রভূত বিত্তের অধিকারী ছিল। এরা গ্রামীণ-শিল্প ক্ষেত্রে "দাদন" ও লগ্নির মাধ্যমে মোট উৎপাদন ব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করতো। নবাবী আমলে এই "দাদন প্রথা" রদ করা হলেও ইংরেজ মহাপ্রভুরা তা আবার চালু করে। মধ্য শ্রেণীকে প্রথমে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এবং শেষে দালাল পুঁজি হিসাবে রূপান্তরিত করে এই শ্রেণীই এবং বিশেষ করে পশ্চিম উপকূলের পার্শি সম্প্রদায় ইংরেজদের কাঁচামালের যোগানদার এবং ইংরেজী পণ্যের এই দেশে অনুপ্রবেশের সহায়ক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। এই নিষ্পেষণের বিরুদ্ধেই দেশের শ্রমিকরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, যার নাম "তন্তুবায় সংগ্রাম" (১৭৭০-১৮০০) ইত্যাদি।

১৮৫৭ সালে মহা-বিদ্রোহের পটভূমি এই। একে শুধু "সিপাই বিদ্রোহ" হিসাবে অখ্যায়িত করা গভীর অভিসন্ধিমূলক, ভারতের কৃষক এবং শ্রমিকশ্রেণীর মেহনতী মানুষ এই "মহাবিদ্রোহে" সামিল হয়েছিলেন—তবুও বিপ্লব সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল।

এই ঘটনাগুলোর সার সংকলন করে—মহাবিদ্রোহের চণ্ড-দমন নীতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েই এক তরুণ মারাঠি যুবক সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন। তিনি তাঁর বিচরণভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এই পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো। তিনি চেয়েছিলেন "ভারতে মারাঠাশক্তির যে নিয়মে আবির্ভাব ঘটেছিল সেই নিয়মেই ভারতের জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করতে।" ভারতের অগণিত জনতার দুঃখ-দুর্দশা, নিষ্পেষণ, হতাশা তাকে পাগল করে দিয়েছিল। চিন্তায় জর্জরিত এই মনুষটির দেশপ্রেম এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে তিনি বিত্তবানের কাছেও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেছেন সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার জন্যে—অঙ্গীকার করেছেন দেশ স্বাধীন হলে সেই টাকা তিনি ফেরৎ দেবেন। ব্যর্থ হয়েছেন—ফিরে গেছেন রামোসী নামক উপজাতীয়দের কাছে। মারাঠা বাহিনীর এই রামোসীরা আঠারো ছাব্বিশ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এদের দ্রুত সংগঠিত করেন এই মারাঠা বীর বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে। ফাড়কে প্রথমেই সুদখোর, দাদনদার এবং বিত্তশালীদের ওপর চড়াও হন। ইংরাজের পুলিশ ফাড়কেকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেয়ে বার বার ব্যর্থ হয়।

আত্মত্যাগের বিমূর্ত-প্রতীক এই "ফাড়কে" সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মরণজয়ী শ্রেষ্ঠ সন্তানদের তাঁর "গোপন সংগঠনে" নিয়ে আসেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন দৌলতরাম রামোসী। উপজাতীয়দের মধ্যে দৌলতরামের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল ফলে ফাড়কের সৈন্য-সংগ্রহ (বিশেষ করে তারা যখন এক সময়ে ব্রিটিশ সৈন্যের মধ্যে ছিলেন) খুব দ্রুততার সঙ্গে ঘটে এবং অনতিবিলম্বেই "বিপ্লবী বাহিনীতে" রূপান্তরিত হয়।

ফাঁড়কের পদ্ধতি ছিল একই সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রে তথা পুলিশ ও মিলিটারী চৌকিগুলোতে আক্রমণ সংগঠিত করা—শত্রুকে পর্যুদস্ত করে দেওয়া—শত্রুর অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া এবং তীব্র দ্রুততার সঙ্গে সেইসব স্থান পরিত্যাগ করা। তাঁর আক্রমণের বর্শামুখ থাকতো রেলপথ, তারবিভাগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা; সরকারী সম্পত্তি এবং জেলখানা। প্রথমেই জেলখানা থেকে বন্দীদের মুক্ত করে দিয়ে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে সেই বন্দীদের নিজ বাহিনীতে নিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করা। আঠারোশ উনআশি সালের মে মাসে ফাড়কের বাহিনী পুনা, কল্যান এবং পলাসপেতে দৌলতরামের নেতৃত্বে যে আক্রমণ সংগঠিত করেন তাতে ষাট হাজারের বেশী মূল্যের সম্পদ সংগৃহিত হয়েছিল।

আঠারোশ উনাশি সালের তেসরা জুলাই এই বীর বিপ্লবী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তার কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার এতো সজাগ ছিল যে তাঁকে আদ্দামানের বদলে বিশেষ প্রহরায় এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে এডেনের সেলে পাঠায়। এতৎ সত্বেও ফাড়কে এডেন জেল থেকে পালিয়ে এসে ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী অবস্থায় ফাড়কে আবার ধৃত হন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের এই আপোষহীন ভারতীয় সৈনিক আঠারোশ তিরাশি সালের সতেরই ফেব্রুয়ারী এডেন জেলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রতিবাদ

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদকমণ্ডলী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা লক্ষ্য করছি "গণনাট্য" নাম নিয়ে সম্প্রতি একটি যাত্রাদল খোলা হয়েছে। পঞ্চপাল, শাহীমিস্ত্রিল, সোনাইদীঘি প্রভৃতি নাটকের বিজ্ঞাপনও বিভিন্ন পত্রিকা মারফৎ প্রচারিত হচ্ছে। এইসব নাটকের নামের সঙ্গে "গণনাট্য" নাম জড়িত দেখে গণনাট্য সংঘের অনুরাগী সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তি বোধ করে অনেকেই এ সম্পর্কে আমাদের কাছে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। গণনাট্য সংঘ সম্পর্কে যাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে, গণনাট্যের আদর্শে যারা শ্রদ্ধাশীল, তারা উপরোক্ত যাত্রাদলের "গণনাট্য" নাম ব্যবহারে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। যাই হোক, জনসাধারণের অবগতির জন্য আমরা ঘোষণা করছি উক্ত "গণনাট্য" নামাঙ্কিত যাত্রাদলের সঙ্গে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক অথবা আদর্শগত কোনরূপ সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত এই যাত্রাদলের স্বত্বাধিকারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমরা অনুরোধ করছি, গণনাট্য সংঘের মত ঐতিহ্যপূর্ণ ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ সংগঠনের নাম তাদের দলের নাম হিসাবে ব্যবহার করে তারা যেন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করেন। সাধারণ সৌজন্য বোধের দিক দিয়েও ভিন্ন সংগঠনের নাম ব্যবহারের রীতি সমর্থনযোগ্য নয়।

সমাজতন্ত্রের পথ কঠিন সংগ্রামের পথ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

স্তালিনের মন্তব্যটি যে সুদূর-প্রসারী হবে একথা ১৯২৪ সালে অনেকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। বিশেষ করে, মানবতার শত্রু পুঁজিতন্ত্রের তাড়াটে বাজারদারেরা পর্যন্ত স্তালিনের মন্তব্য একটা কথার কথা ভেবেছিল। কিন্তু যদি তাঁরা মন্তব্যটির তাৎপর্য সত্য সত্যই সেদিন বুঝতে পারত তবে সেদিনই তাঁদের হৃদরোগ হত।

স্তালিন ১৯২৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর "অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের কৌশল" শীর্ষক নিবন্ধে রুশ বিপ্লবকে বিশ্ব বিপ্লবের আরম্ভের সূচনা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এবং স্তালিনের সেদিনের কথা আজকের অভিজ্ঞতায় কত সত্যি তা পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে মনে হয়। এখন পৃথিবীর জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী মানুষ বাস করেন সমাজতান্ত্রিক দেশে। দেড় ডজনের বেশী রাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাজ। "চাষাভুষো"র সোভিয়েত আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী। আজকের বিজ্ঞানের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক অবদান মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কৃতিত্বও পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের; স্পুৎনিক শব্দটির মানে আজকের পৃথিবীর যে কোন শিশু বোঝে।

একথা দুঃখের হলেও সত্য যে, আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরে মতাদর্শের ক্ষেত্রে বিরোধ বর্তমান। এই বিরোধের ফলে বিশ্ব শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন কিছুটা দুর্বল হচ্ছে সে বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যত বিরোধই থাক না কেন, একটা বিষয়ে কিন্তু কোন বিরোধ নেই। তা হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই মানব মুক্তির একমাত্র উপায়; সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রকে ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দেশে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ বিষয়ে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ যা কিছু তা হল কোথায়, কখন, কোন্ শ্রেণীর সহযোগিতায় শেষ আঘাত হানতে হবে পচাগলা পুরোনো সমাজটার ওপর। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে কী হবে দৃষ্টিভঙ্গি এ নিয়েও হয়ত বিরোধ আছে। হয়ত বা বিরোধ আছে, সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার অন্তর্বর্তী স্তরে সংশ্লিষ্ট দেশের কমিউনিস্ট দল কোন রণনীতি বা কৌশল অবলম্বন করবে তা নিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বিপ্লবের পর যে প্রক্রিয়া কোন একটি দেশে শুরু হয় সেই প্রক্রিয়া সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণাকেই শক্তিশালী করে মাত্র; ইতিহাসের নিয়মে এবং অনিবার্য কারণে পুঁজিতন্ত্রের মৃত্যু কাঠির জন্ম পুঁজিতন্ত্র নিজের অজান্তে যেমন দিয়ে থাকে তেমনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নতুন এক বিশেষ ধরণের সমাজ ও শ্রেণীর জন্ম দেয়। এই নতুন শ্রমজীবী মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জগতেও ঘটে যায় বিপ্লব; জন্ম হয় এক নতুন মূল্যবোধের। স্তালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের খসড়া সংবিধান ব্যাখ্যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনযাত্রা, ধ্যান ধারণার যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, জমিদার শ্রেণীর উৎসাদন হয়ে গেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজিপতি দের অস্তিত্ব নেই। কৃষিক্ষেত্রে কুলাকরাও নেই। ব্যবসায়ী মুনাফাবাজরা নেই। সব ধরণের উৎপীড়ক শ্রেণীর ধ্বংস সাধন হয়ে গেছে। এখন এখানে আছে কেবল শ্রমিকশ্রেণী কৃষকশ্রেণী বুদ্ধিজীবী। স্তালিন দেখিয়েছেন কী ভাবে পূর্বেকার শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীর চরিত্রেরও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

আজকে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা মানুষকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করছে। অতীতে এই সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক দেশ নিয়ে যাঁরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তাঁরাও এর ব্যাপকপ্রসারী প্রভাব দেখে নিজেদের কৌশল বদলে ফেলছে, তারা অনেকে সমাজতান্ত্রিক সেজেও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করছে। পূর্ব শ্রেণীশত্রু বিশেষ করে পুঁজিপতিদের সেরকম সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করত এখন তারা তা বদলে ফেলেছে। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বলতে গেলে এক দশকের ওপর এক ডজনের বেশী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েতকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ চালিয়েছে। পরবর্তীকালে হিটলার সোভিয়েত রাষ্ট্র ধ্বংসের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে শ্রমজীবী মানুষের শক্তি বর্বর ফ্যাসিবাদের চেয়ে অনেক বেশী। আজ তাই ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে হিটলার। অন্যদিকে, দেশ দেশে ঘটে চলেছে শ্রমজীবী মানুষের বৈপ্লবিক জয়যাত্রা। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এমনি হয়নি। লেনিনের মহান নেতৃত্বে বলশেভিক (কমিউনিস্ট) পার্টির পরিচালনায় রুশ দেশের শ্রমজীবী শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবী ফৌজ জারতন্ত্রকে ধ্বংস করে। এর পূর্বে, ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে বিপ্লব হয় সেই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী প্রকৃত ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। সুবিধাভোগী বদমাইশরা তখনও কিছু ছিল যারা শ্রমিক কৃষকের সোভিয়েতের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা তুলে দিতে চায়নি। মনে রাখা প্রয়োজন ১৯১৭ সালের পূর্বে ১৯০৫ সালে রুশ দেশের মানুষ জারতন্ত্রকে উচ্ছেদের চেষ্টা করেছিল কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী সেদিন সুসংগঠিত ছিল না; দ্বিতীয়ত, বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে বাস্তব রূপায়ণ করতে যে ব্যাপক সংগঠন প্রয়োজন, সেদিন তা প্রয়োজনের তুলনায় দুর্বল ছিল; তৃতীয়ত, পাঁচ সালের বিপ্লবে নানা "ভেজাল" বিপ্লবীরা এসে জুটেছিল।

রুশ বিপ্লবের সাফল্যের অন্যতম কারণ সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম গ্রন্থিতে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি আঘাত হানতে পেরেছিল। আর এই বিপ্লব হঠাৎ গজিয়ে ওঠে নি। ১৯১৭ সালের ২৩শে অক্টোবর বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রথম সিদ্ধান্ত নেয়। এই বৈঠকে ছিলেন লেনিন, স্তালিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, উরিৎস্কি। কামেনেভ, জিনোভিয়েভ লেনিনের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পরে, ২৯শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন পেত্রোগ্রাদ কমিটির, কার্যকরী কমিটি, সামরিক সংগঠন, পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের প্রতিনিধি ট্রেড ইউনিয়ন, রেল শ্রমিক, কারখানা কমিটি ও পার্টির পেত্রোগ্রাদ (বর্তমানে লেনিনগ্রাদ) অঞ্চল কমিটির প্রতিনিধিরা। এই অধিবেশনে লেনিন জোর দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, রাশিয়া ও য়ুরোপের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে একটি নীতিই বেরিয়ে আসছে এবং সেইনীতি হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নীতি। লেনিনের প্রস্তাব গৃহীত হয়; প্রস্তাবের পক্ষে ১৯ ভোট, বিপক্ষে ২ ভোট পড়ে এবং চারজন ভোট দেননি। আর ৩১শে অক্টোবরই পেত্রোগ্রাদে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

লেনিনের এই প্রস্তাব সমস্ত দেশে বিপ্লবী শক্তির প্রাণে এনে দেয় নতুন জোয়ার। সর্বহারা বিপ্লবের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিই শোনা গিয়েছিল সেদিন। পুঁজিতন্ত্রকে উৎসাদন করে প্রতিষ্ঠিত হল সেদিন তাই সর্বহারার একনায়কত্ব। এই সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সংগঠন চিলে ঢালা ছিল না। তার প্রমাণ বিখ্যাত সাংবাদিক জন রীডের "দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন" গ্রন্থে পাওয়া যায়। লেনিনের বন্ধু রীড রুশ বিপ্লবের সময় পেত্রোগ্রাদে ছিলেন। রীড লিখেছেন, অনেক সময় আমি কাটাই স্মোলনিতে। ভেতরে ঢোকা তখন আর সহজ ছিল না, দু সারি সান্ত্রী বসেছিল ব্যারের গেটগুলোয় এবং সদর দরজা পেরবার পর লোকে লম্বা লাইন দিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। ঢুকতে হত চারজন করে, প্রতিটি লোকের আত্মপরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য নিয়ে জেরা করা হত। পাস দেওয়া হত, তবে কয়েক ঘণ্টা পরই ছাড়পত্রের পদ্ধতি বদলে যেত। কেন না অনবরত ভেতরে সেঁধত গুপ্তচররা···একবার স্মোলনি ইন্স্টিটিউটের বাইরের ফটকের কাছে দেখি সামনে সঙ্গীন উৎস্কি। একজন সৈন্য তাদের আটকেছে। ত্রৎস্কি তাঁর পকেট খুঁজে দেখলেন কিন্তু পাসটা মিলল না।

শেষ পর্যন্ত বললেন, "যাক গে, আপনি তো আমায় চেনেন। আমার নাম ত্রৎস্কি" সৈন্যটি কিন্তু অটল, "আপনার পাস নেই, ভেতরে যাওয়া চলবে না। নাম-ফাম বুঝি না।"

"কিন্তু আমি যে পেত্রোগ্রাদের সোভিয়েতের সভাপতি।"

"অতই যখন ভাবিক্কী লোক তখন সঙ্গে অন্তত একটুকরো চিট থাকা উচিত ছিল।"

বৈপ্লবিক শৃঙ্খলার অসাধারণ নিদর্শন এই ঘটনা। এমন সংগঠন ছিল বলেই সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল সেদিন রাশিয়ার। মনে রাখা প্রয়োজন, এই সর্বহারার একনায়কত্ব চলিত অর্থে কোন বুর্জোয়া একনায়কত্ব নয়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির একনায়কত্ব নয়, যেমন স্পেনে ফ্রাঙ্কো বা অন্যত্র এখন আছে বা হচ্ছে। সর্বহারা বা ব্যাপক অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থ হল সমাজের সংখ্যালঘু শুটিকয় বুর্জোয়া বা ধনপতির একনায়কত্বের অবসান করে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ যারা এতদিন হাতে গোনা পুঁজিপতিদের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছিল তাদের শাসন। এবং এই শাসনের একটি মাত্রই উদ্দেশ্য তা হল শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। "যে কাজ করে না সে খেতেও পাবে না—এই হল এই সমাজের মূল স্লোগান। তবে, দেশ বিশেষে এই সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার রকমফের হতে পারে মাত্র। লেনিন তাঁর "সর্বহারার একনায়কত্ব যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতি" শীর্ষক রচনায় এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেছেন। শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে প্রথমে যে মৌল কাজগুলোর প্রয়োজন তা হল সামাজিকীকরণ। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং এটা সম্ভব শুধু দেশকে শিল্প সমৃদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে কৃষি সমবায়, বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা, মানুষকে শোষণ বন্ধ করা, উৎপাদনের যন্ত্র ও উপায়কে নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে। এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হল জমি থেকে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা এবং এই ক্ষেত্রে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। তেমনি বাজেয়াপ্ত করা প্রয়োজন পুঁজিপতিদের সম্পত্তি।

লেনিন বিপ্লবের পর এই কাজগুলোই করেছেন। নভেম্বর বিপ্লবের পরদিন অর্থাৎ ৮ই নভেম্বর নতুন সোভিয়েত সরকার জমি সংক্রান্ত এক ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় আছে (১) ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারী বাতিল করা হল (২) জমিদারী, চার্চ মন্দির ইত্যাকার যাবতীয় সম্পত্তির মালিক এখন থেকে সোভিয়েত কৃষি ডেপুটিরা। তাই একটি কার্যক্রম থেকেই সোভিয়েত সরকারের আসল লক্ষ্য বোঝা যায়। এখানে স্তালিনের (১৯৩৬ সালের) একটি বক্তৃতার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, সোভিয়েত সরকার প্রাক্তন জুয়ামীদের জমিদারী স্বত্ব বিলোপ করে পনেরো কোটি হেক্টর জমি সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছে। (স্মরণ রাখা দরকার, সোভিয়েত সংবিধানে জমি হস্তান্তর বা বিক্রয় করার অধিকার নেই)। স্তালিন বলেছিলেন যে, জমি দেবার ব্যাপারটি প্রতিশ্রুতি মাত্র নয়, এটা বাস্তব ঘটনা। এ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোভিয়েত সরকার সমবায়গুলোকে টেকনিক্যাল সাহায্য করে

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দুরবস্থা

যে বৃহত্তর জাতীয় আদর্শ ও উদ্দীপনা নিয়ে স্বদেশী আমলে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তৎকালীন ইংরেজীয়ানার ভাবধারা পুষ্ট আরও তিনটি মেডিকেল কলেজের আবহাওয়া থেকে ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের ছাত্রদের মুক্ত করার জন্য তা আজ ব্যর্থতার কালিমালিপ্ত হতে চলেছে। কলেজটির পড়াশুনা এবং পরিচালন-ব্যবস্থা তাসের ঘরের মত খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। বিগত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে কলেজটির আংশিক জাতীয়করণ সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তাতেও সম্পূর্ণ-খোল-নলচে পাল্টানোর সহজ সুযোগ আসে নি। কিছুদিন আগে রাজনীতির ডামাডোলে ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁর অনুসরণ করেছিলেন উপাধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী, ফলে স্পষ্টতই পড়াশুনার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল।

বর্তমানে অবশ্য একজন অধ্যক্ষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। ঠিকানা তাঁর স্থায়ী নয়, বড়ো ছোয়া করে তিনি এক ঘন্টা কলেজে পদস্পর্শ দেন। এই কলেজের প্রায় সমস্ত বিভাগেই প্রফেসর এবং শিক্ষকরা অস্থায়ী, বদলী হচ্ছেন হামেশা, ফলে পড়াশুনা বন্ধ, যেমন অ্যানাটমির রিডার বেশ কয়েকমাস পূর্বে বদলী হয়ে গেছেন, কিন্তু সে পদ এখনও শূন্য। কেমিস্ট্রির কোন হেড-অব-দি ডিপার্টমেন্ট না থাকায় প্র্যাক-টিকাল ক্লাস প্রায় চার মাস যাবৎ বন্ধ। ভালো ছেলেরা মাথায় হাত দিয়েছেন। এও উল্লেখ করা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার সবচেয়ে সেরা ছাত্ররা ডিস্ট্রিক্ট কোটার আওতায় একই মাহিনায় এই কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত ধোঁকা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র কামরুদ্দীন আহমেদ। চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বিমল বতুয়া এবং ছাত্রকল্যাণ সমিতির মৃণাল সুর জানিয়েছেন তাঁরা বার বার স্বাস্থ্য-দপ্তরকে লিখেও কলেজে পড়াশুনার পরিবেশ ও সুযোগ তৈরী করতে পারছেন না। বিদেশে ভারতীয় ডাক্তারদের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশের বীজ এভাবেই বোনা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত শ্লাঘনীয় কলেজ ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে সকলের চোখের সামনে। এই কলেজে পড়াশুনার দুরবস্থা খুবই উদ্বেগের কথা।

গ্রামগঞ্জের রাস্তাঘাট এখনও অবহেলিত

গ্রামেগঞ্জে এখনও হাজার হাজার কাঁচা পথ পাকা করার জরুরী প্রয়োজন অথচ কাজ হয় নি এক চুলও। গ্রামে প্রধানতঃ পি ডবলু ডির অধীনেই রাস্তাঘাট মেরামত হয়। যেখানে সেখানে পি ডবলু ডির পাতে লেখা। "বাস্তু বি", এর পর আর কিছুই দর্শনীয় নেই। হুগলী জেলার চন্ডীতলা থানার মশাট এক নম্বর ব্লকের সোদপুর থেকে গণেশপুর পর্যন্ত রাস্তা পাকা হওয়া খুবই দরকার। স্থানীয় এক সরকারী প্রতিনিধি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন যে বাসুবাটি অঞ্চলে সিঙ্গুরগামী রাস্তা বাসুবাটি হয়ে মশাট পর্যন্ত পাকা হবার চেষ্টায় দশ বছর ধরে মাটি ফেলা হচ্ছে। পি ডবলু ডির নিয়মিত ঠিকাদার মাটিই ফেলছেন অথচ কুড়ি বছর ধরে চেষ্টা করে এক চুলও ধুলো সরকারী বাবুদের দিয়ে সরাতে পারলুম না আমাদের সোদপুর গণেশপুর রাস্তায়। সিঙ্গুর অঞ্চলের মশাট থেকে সিঙ্গুর গামী (বাসুবাটি) রাস্তাও অবশ্য পাকা হয় নি। মাঝখানে আর্জুনগর নামক স্থানে কাঠের পাটাতন দেওয়া পুল হল, তাও আবার কারা যেন তুলে নিয়েছে। বিপজ্জনক অবস্থা।

গ্রামের বেকার ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যুবকদের পি ডবলু ডির কাজে ঠিকাদার করা হবে, কন্ট্রাকটর নিয়োগ হবে বলে সরকারী বিজ্ঞপ্তি থাকলেও কাজ হয় নি। মশাট ধীতপুর রাস্তায় গোপালপুর থেকে চাঁদবাটি ভায়া বাঁদপুরের রাস্তা এখন পঞ্চায়েতের অথচ সারানো হচ্ছে না। পাকা করার জন্য স্থানীয় সানডে ক্লাবের সম্পাদক এন, আহমদ সি এম ডি এ সম্পাদক, পূর্তমন্ত্রী সকলকে লিখেছেন, ফল হয় নি। গ্রামের ছেলেরা বিনা মূল্যে শ্রম দিতে রাজী। আশেপাশের পি ডবলু ডির রাস্তায় বছর বছর পড়ে থাকায় পিচ, খোয়া নষ্ট হচ্ছে। ঐখান থেকে সামান্য মালমশলা দিলেও ছোট রাস্তাগুলো তৈরী হতে পারে। এখানকার বাঁশ শিল্প, চাটাই মাদুর জরীর কাজ মাটির কুটির শিল্প রাস্তা তৈরীতে আরও বাজার পেতে পারে।

শুল্ক বিভাগের 'তৎপরতা'

ভারতীয় শুল্ক বিভাগের কর্মদক্ষতার কথা হালে খবরের কাগজের পাতায় ফলাও করে ছাপা হয়। কিন্তু উক্ত বিভাগের হাইপার একটিভ কার্যকলাপ আমাদের অনেক সময়ই বিব্রত করে। সম্প্রতি পত্রান্তরে প্রকাশ মিশনারীজ অব চ্যারিটির নামে দানসমগ্রী (ডোনেশন) হিসাবে একটি সুইস প্রতিষ্ঠান কুষ্ঠ রোগ প্রতিষেধক ক্যাপসুল এদেশে পাঠালে তার উপর প্রায় আড়াই হাজার টাকার মত শুল্ক কর (কাস্টম ডিউটি) দিতে হয়েছে। মিশনারীজ অব চ্যারিটি একটি বিশ্ববন্দিত সেবা প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া ক্যাপসুল ছিল দান সামগ্রী—আমাদের দেশের ভেষজ সংস্থা এখনও তৈরী করে উঠতে পারেনি এবং যা আমাদের দেশেই কুষ্ঠ রোগীদের নিরাময়ের জন্যই ব্যবহার করা হবে।

ঝাঁঝ প্রকল্পের জন্য (প্রজেক্ট টাইগার) সরকার সম্প্রতি উদযোগী হয়েছেন। কিছুকাল আগে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারকে দুখানা জেট বোট উপহার স্বরূপ দেয়। এই স্পীড বোট নিউজিলান্ডে তৈরী, ঘন্টায় চৌষট্টি কিলো মিটার যেতে পারে এবং তিন ইঞ্চি গভীর জলেও চলাফেরা করতে সক্ষম। পোচারদের (চোরাগোপ্তা শিকারী) হাত থেকে সুন্দরবনের প্রাণীকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে "সুন্দরবন প্রোজেক্ট টাইগার" এর জন্যই এই দুটি বোট এদেশে আনা হয়। শুল্ক বিভাগ এই দুটি স্পীড বোট আনয়ন বাবদ বিরাশি হাজার টাকা শুল্ক ধার্য করে যা "প্রোজেক্ট টাইগার-সুন্দরবন" -এর ফান্ড থেকে ভারত সরকারকে দিতে হয়। অবস্থাটা একবার বুঝুন।

হুগলী জেলা বিজ্ঞান ক্লাব

গ্রামেগঞ্জে বিজ্ঞান আলোচনা ও স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদের নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক কাজ, সমাজসেবা ও গ্রামের হরেক রকম সমস্যাকে জানার চেষ্টা ক্রমশঃ দানা বাঁধছে। গোবরডাঙ্গার রেনেশাঁস ক্লাবের অনুকরণ চারদিকে। সেখানে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা গবেষণা করছে, ডক্টরেট নেবে। হুগলী জেলার চন্ডীতলা থানায় হুগলী বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞান সাংবাদিক সমরজিৎ কর অমল হালদার, মৃণাল ঘোষ, প্রমুখের চেষ্টায়। "পুষ্টি সমস্যা ও গ্রাম বাঙলার গরীব মানুষ" এ সম্পর্কে একটি রচনা প্রতিযোগিতাও হবে। এছাড়া নিয়মিত গ্রামের বিভিন্ন স্কুলে হবে বিজ্ঞান আলোচনা। যোগাযোগের ঠিকানা, সহ সম্পাদক ডাঃ এ এইচ সাইফুদ্দিন আহমদ, হুগলী জেলা বিজ্ঞান ক্লাব, ডাকঘর আঁকুনী, হুগলী। হুগলী জেলার গ্রামে পুষ্টি সম্পর্কে নাগপুরের একটি বিজ্ঞান সংস্থার উদ্যোগে এরা পুষ্টি ও রোগ সম্পর্কে সমীক্ষা চালাবেন।

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

প্রধানমন্ত্রীর ভুবনেশ্বর ভাষণে জানা গেল, পশ্চিম জার্মানীর কাগজে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রীটের খানার ছবি ছেপে সেটাকে আমাদের পার্লামেন্ট বলে চালানো হয়েছে!

আমরা দুঃখিত।

"পশুপাখি জীবজন্তুদের কাছ থেকেও আমাদের শিক্ষা নেয়ার আছে"—শ্রীরামের চিড়িয়াখানা ভাষণ।

ভারতীয় ঐতিহ্য।

* * *

"জরুরী অবস্থা কতদিন চলবে?" জনৈকের পত্রাঘাত।

উত্তর ঃ অনেক ভালো কাজের সঙ্গে "আনন্দলোক"-এর শারদীয় প্রচ্ছদ করা যাচ্ছে, সুনীল গঙ্গো, বিমল কর চুটিয়ে শারদীয়-সংগম করতে পারছে। মন্দ কী!

* * *

জগুবাবু বাজার থেকে আমার শিক্ষকবন্ধু গোপীমোহনের দীর্ঘশ্বাস ঃ "জানেন, বার কয়েক কাগজে বেরুল আমরা পুজোর আগেই বকেয়া টাকা পেয়ে যাচ্ছি। এদিকে ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেল, খালি হাতে বাড়ি ফিরলাম।"

কেন? আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তো বলেছেন, "পুজোর মুখে টাকা পেলেই তো আপনারা খরচা করে ফেলবেন! "ধরুন টাকাটা জমা আছে।

* * *

সোমনাথ দত্ত, হাওড়া ঃ "তাহলে প্রিয় দাসমুন্সীও সাহিত্যিক হলেন?"

উত্তর ঃ "খবর কাগজের কর্মচারীরা সাহিত্যিক হতে পারেন, দাসমুন্সী কী দোষ করলেন?"

* * *

—পাতাল রেল কদ্দুর?

—না, পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয় নি।

* * *

—মার্কসবাদী পার্টিগুলি কী বেকার হয়ে গেল?

—কেন? এ বছর তো শরৎ-কমিটির কাজ পেয়েছেন দাদারা।

\+ \+ \+

খবরে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় নভেম্বরে স্বর্ণ জয়ন্তী পালন করছেন।

কিছু সাহিত্যিকদের ধরে বেঁধে ডকটরেট দিয়ে দিলে কেমন হয়?

\+ \+ \+

আরো খবর ঃ আত্মীয় স্বজনের অভাবে কবি নজরুল ইসলাম বাংলা দেশে একটি নার্সিং হোমে দিন কাটাচ্ছেন।

"যাহার পা দুটো আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দুটো থাকিলেই ত আর লেখা যায়না" বলুন তো উদ্ধৃতিটি কার?

উত্তর ঃ আগে শরৎচন্দ্রের, এখন আপনার।

মায়া নাগ, ডায়মন্ড হারবার ঃ

মায়া নাগ ॥ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন? "গণশক্তি"তে শরৎ-চন্দ্র সম্পর্কে এক রকম বক্তব্য, "এক সাথে"-তেও সেই জাতীয়, অথচ "নন্দনে" শাহেদুল্লা, নেপাল, অনুনয় ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন?

উত্তর ॥ পার্টির বক্তব্যই যদি ধরতে চান তাহলে "গণশক্তির" সম্পাদকীয়টিই গ্রাহ্য।

মায়া নাগ ॥ কয়েকটি ভালো লিটল ম্যাগাজিনের নাম করুন তো?

উত্তর ॥ চতুষ্কোণ, এক্ষণ, শুকসারী, সারস্বত, লেখা ও রেখা,.. আর মনে পড়ছে না।

মায়া নাগ ॥ মার্কসবাদী চেতনাসম্পন্ন ছোট গল্পের কোন সংকলন আছে কী?

উত্তর ॥ আছে। "পরশুরামের কুঠার"। মিহির আচার্য সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান ন্যাশনাল বুক এজেন্সী।

মায়া নাগ ॥ আপনার প্রিয় কবি কে?

উত্তর ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, উভয়েই।

মায়া নাগ ॥ বিপ্লবী গণেশ ঘোষকে পুরনো দিনের কথা লিখতে বলুন না?

উত্তর ॥ বলব। এক সঙ্গে এত প্রশ্ন করবেন না, হাঁপিয়ে উঠছি।

কলকাতায় যৌনব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে—আনন্দবাজারের হেডিং। স্টাফ রিপোর্টারের মতে এই ব্যাধি অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েদের মধ্যে সংখ্যায় কম নয়!

ভোলা নন্দী বললেন ঃ "ওদের সাহিত্য যে শক্তিশালী অস্ত্র এবার বুঝতে পারলেন তো?"

"অপসংস্কৃতিকে রুখতে হবে" —বিবর্ণ দেয়াল লিখন।

পুনরায় ভোলা নন্দী ঃ "কোথায় রুখবেন? সব দেয়ালগুলোই যে জোড়া!"

মহাশ্বেতা দেবীর লিখিত বক্তৃতায় জিজ্ঞাসা ঃ "যখন সন্ত্রাসবাদী যুবকেরা পুলিশের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছিলেন তখন কল্লোলের লেখকেরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন কেন?"

অন্যতম কল্লোল গোষ্ঠীর ভবানী মুখোপাধ্যায় হতবাক প্রায়! এ যে পিতার বিরুদ্ধে পুত্রীর চ্যালেঞ্জ! (কল্লোলের লেখক সুখ্যাত মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) মহাশ্বেতা দেবীর পিতা।)

ছাত্ররা পড়াশোনা করছিল না, শিক্ষকরা পড়াচ্ছিলেন না। সরকারী কর্মচারীরা অফিসের বাইরে তাস খেলছিলেন ইত্যাদি, জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত স্বরূপ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বক্তার যুক্তি।

বিচারক কে ছিলেন জানা নেই।

শরৎচন্দ্রিকা

ধর্ম

সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের সংস্কার। বিশ্বমানবতার এত বড় পরম শত্রু আর নেই। (পথের দাবী)

ধর্মগ্রন্থ

কোনো ধর্মগ্রন্থই কখনও অভ্রান্ত হতে পারে না। বেদও ধর্ম-গ্রন্থ। সুতরাং এতেও মিথ্যার অভাব নেই। (চরিত্রহীন)

আশ্রম

কোনো আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্তু কোনো-একটা বিশেষ আশ্রমের পরেই আমার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই: আমি জানি ও সবই সমান, সবই ভুয়ো।.... (দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্রাংশ)

আত্মা

.... এমন দম্ভ আমার নেই যে সমস্তই নাশ হবে, শুধু আমার এই মহামূল্য আমিটির কোনোদিন ধ্বংস হবে না। এমন কামনাও করিনে যে, আমার মৃত্যুর পরেও আমার আমিটি বেঁচে থাকুক। (চরিত্রহীন)

সত্য

সত্যের কোনো শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ কাল বা পাত্রের যে সম্বন্ধ বা রিলেসন তা দিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ-কাল-পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্য-জ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরি-বর্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

(সত্যাশ্রয়ী)

রাজনীতি

এখন রাজা নেই, আছে রাজ-শক্তি। এবং সেই শক্তি আছে জন-কয়েক বড় ব্যবসাদারের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন, না হয় লোক দিয়ে করান। বণিক-বৃত্তিই এখন মুখ্যতঃ রাজনীতি। শোষণের জন্যেই শাসন। দশ পনেরো বছর পূর্বে যে জগৎ-ব্যাপী সংগ্রাম হয়ে গেল, তার গোড়াতেও ছিল ঐ এক কথা—ঐ বাজার ও খদ্দের নিয়ে দোকানদার-দের কাড়াকাড়ি। (তরুণের বিদ্রোহ)

জমিদারি ব্যবস্থা

"বহু প্রজার রক্ত জমাট করা অসংখ্য টাকা", "কেবল দূর হইতে সত্ত্ব নিঙড়াইয়া যে রস বাহির হয় তাহাই পান করিয়া..আত্ম ও সাহেবত্ব রক্ষা" "বাঙলা দেশের কোন এক পাড়াগাঁয়ে তাহাদের কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার মূলে জলসেচ হরিতে হয়না, খবর দারি লইতে হয় না, শুধু তাহাতে সময়ে ও অসময়ে নাড়া দিলেই সোনা ও রূপা ঝরিয়া পড়ে।"

(জাগরণ)

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অতি-শয়, পবিত্রজ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো?

জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা শক্ত নয়, বোন। (পথের দাবী)

"জমি কেনা ও বেশি সুদে লগ্নী কারবার করা এই হচ্ছে বাঙলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।" (খণ্ড রচনা)

টয়েনবী এবং আমরা

গত ২২শে অক্টোবর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক আর্ণল্ড টয়েনবীর পরলোক গমনে ভারত রাষ্ট্রের ভাষা ও সংস্কৃতি-ভিত্তিক জাতিগুলি হারালো তাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের একজন প্রিয় সাথীকে। এই উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের মানস-বিবর্তনের গতি-প্রকৃতিকে অধ্যাপক টয়েনবীর মত সহানুভূতিশীল নিষ্ঠার সঙ্গে আর কোনও পাশ্চাত্যের মানুষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন কি না, আমার জানা নেই।

শ্রীটয়েনবীর এ-সময়ে মৃত্যু আমাদের কাছে বেশী ক্ষতির কারণ হলো এই জন্যই যে, দিল্লীর বর্ত-মান জবরদস্ত শাসকগণ এ-রাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে আরো অধিক অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্পণের সুস্থ ও প্রগতিশীল দাবীকে শুধু অগ্রাহ্যই করছেন না, এটিকে "রাষ্ট্রদ্রোহের" বদনাম দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।

ইতিহাস-বিশ্লেষক আর্ণল্ড

সংস্কারবাদ

সংস্কার মানে মেরামত, উচ্ছেদ নয়—গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ্য হয়ে উঠেছে তাকেই সুস্থ করা। যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্র-তিষ্ঠিত করার যে কৌশল তারই নাম শাসন-সংস্কার। (পথের দাবী)

বিপ্লববাদ

বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন। (পথের দাবী)

মতবাদ

আপনি বিভিন্ন মতবাদে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্ত বড় শিক্ষা বলছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রকারের মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোনো মতের বালাই নেই। (শেষ প্রশ্ন)

নীতিবোধ

পরাধীন দেশের শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই।

(পথের দাবী)

রবীন্দ্রনাথ

উপমা-উদাহরণ— কোনোটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মতো নিরর্থক-অসম্বন্ধ না হয়। এখানে লজিক যেন কিছুতে বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলঙ্কার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলঙ্কার দিয়ে শো-কেস সাজানোর রুচি এক নয়। (দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্রাংশ)

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ঈশ্বর-বিশ্বাসী জগতে কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। এই পরম ভাগ-বত কবির সহস্র পলিটিক্যাল যুক্তি-তর্ক ভগবানের রুদ্ধদ্বারে এসে আছড়ে পড়ে। (অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পৃষ্ঠা)

সংগ্রহ ঃ মিহির আচার্য

টয়েনবী সুদৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করে গেছেন যে, একদিন এশিয়ার এই অঞ্চলের সব কটি স্বতন্ত্র "জাতিই" নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে। তিনি তাঁর "এ স্টাডি অফ হিস্ট্রী" গ্রন্থে (১৯৬৫) লিখে-ছেন, বিগত অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ডেভেল-পমেন্ট ইন দিস টেন্সশন-রিডেন.. এনটায়ার সাব-কন্টিনেন্ট ইজ দি লিঙ্গুইস্টিক ন্যাশান্যালিজম হুইচ ইজ মেনিফেস্টেড ইন দি ক্রিয়েশন অফ লিঙ্গুইস্টিক স্টেটস ইন ইণ্ডিয়া..." এই প্রসঙ্গে জহরলাল

মতামত

নেহেরুর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের কথাও অপ্রকাশিত নেই।

একজন বাঙালী হিসেবেও আমি এই অসাধারণ স্পষ্টবক্তার কাছে ঋণী। কারণ, পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তির লড়াইয়ে তিনি পূর্ব বাঙলাকেই স্বার্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন (১৯৭১)।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ভারত রাষ্ট্রের রাজ্যগুলির "স্বেচ্ছাবৃত" ঐক্য তথা তাদের "সর্বাধিক স্বাধিকার" দেওয়ার যে আদর্শের কথা ছিল সে সবের অপ-মৃত্যু ঘটিয়ে এ ভূখণ্ডের জাতি-গুলিকে একাকার করে দেওয়ার উনিশশো পঞ্চাশ সালের পরবর্তী সময়ের শ্রীনেহেরু ও তাঁর উত্তর-সূরীদের অপপ্রয়াস দেখে কবর থেকেও ঐতিহাসিক টয়েনবী নিশ্চয়ই উপেক্ষার হাসি হাসবেন।

নির্মল সেনগুপ্ত

বাঁদপুর ডাকঘর

হুগলী জেলা চণ্ডীতলা এক নং ব্লকে আঁকুনীর কাছাকাছি বাঁদপুর গ্রামে একটি নতুন ডাকঘর তৈরীর জন্য হুগলী জেলা সুপা-রিনটেনডেন্ট অফ পোস্ট অফিস, চুঁচুড়া, থেকে পরিদর্শক দল জায়গা দেখে অবিলম্বে ডাকঘর তৈরীর সুপারিশ করেছেন। ঐ ডাকঘরের সঙ্গে বাঁদপুরে একটি টেলিফোন কেন্দ্র স্থাপনের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। স্থানীয় আঁকুনী ডাকঘর বাঁদপুর, আঁকুনী, চাঁদবাটী, গুড়পাড়া জিয়াড়া, ছোট-চৌঘরা, মুকুন্দপুরের একাংশ নিয়ে গঠিত। একজন পিয়-নের পক্ষে উক্ত গ্রামসমূহে প্রায় আট মাইল পথ হেঁটে চিঠি বিলি করা প্রায় অসম্ভব। তাই চিঠি ও ইন্টার-ভিউ লেটার" ঠিকমত পৌঁছায় না! কলকাতা থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত এই সব গ্রামে কলকাতার চিঠি পৌঁছোয় পাঁচ দিন পর! ডেলিভারি দিতে লাগে আরও দুই দিন। তাই বাঁদপুরে ডাকঘর অবশ্যই হওয়া দরকার। চার হাজার লোকের জন্য বাঁদপুরে ডাকঘর স্থাপনের আবেদন নিশ্চয় অযৌক্তিক নয়। এছাড়া ডাকঘর স্থাপনে থাম ডাক-টিকিট বিক্রির সুবিধা ও স্বল্প সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। উক্ত ডাকঘর স্থাপনে রাজ্যসভার সদস্য শ্রীআমজাদ আলী সর্দারের চেষ্টায় কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর-দয়াল শর্মা যে দ্রুত ডাকঘর তৈরীর তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন তা যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছে। মাননীয় আমজাদ আলী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ প্রস্তাবিত বাঁদপুর ডাকঘরের সংলগ্ন বিনামূল্যে পাওয়া জায়গায় একটি টেলিফোন লাইন (ভায়া জগৎবল্লভপুর এক্সচেঞ্জ, হাওড়া) স্থাপনে আমাদের সাহায্য করুন।

কাজী জালালউদ্দীন আহমদ

গোবর গ্যাস প্লান্ট পরিকল্পনা

গ্রামে-গঞ্জে আরও হাজার হাজার গোবর গ্যাস চেম্বার তৈরী করে আলো জ্বালানো ও জ্বালানীর কাজ ত্বরান্বিত করার এবং নাইট্রোজেন যুক্ত গোবর সার সরবরাহের প্রকল্প আরও জোরদার করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে খাদী ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনকে কেন্দ্রীয় সরকার যে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন পশ্চিম-বঙ্গে জেলায় জেলায় গোবর প্ল্যান্ট তৈরীর প্রসারের জন্য তার সবটুকুই রয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ এ পর্যন্ত ২৪০ টির মত গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে এবং মোট খরচের ½ ভাগ অর্থাৎ পাঁচশত টাকা সর-কারী অনুদানও দেওয়া হয়েছে প্ল্যান্ট স্থাপনকারীদের। উত্তর-প্রদেশ এবং বিহারে পাঁচ হাজার গ্যাস প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড খুবই হতাশা-ব্যঞ্জক। এই অবস্থায় লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় দান দিল্লীতে ফিরে যাচ্ছে। তাই জেলায় জেলায় গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরীর জরুরী ব্যবস্থা প্রসার ও প্রচার দরকার। আমাদের হুগলী জেলার চণ্ডীতলা ১নং ব্লক মসাটের অধীন বাঁদপুর প্রগ্রেসিভ কালচারাল সোসাইটির যৌথ খামারে একটি গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরীর অনু-মোদন পাওয়া গেলেও টাকার অভাবে কাজ হয় নি। সমিতি পনের শত টাকা খরচ করে গ্যাস তৈরী করতে অপারক। অথচ হুগলী জেলাতেও আঁকুনী, ইছাপুর ইউনিয়নে বা শ্রীরামপুর মহকুমায় গ্যাস তৈরী হয়নি। তাই আমাদের সমিতিকে একটি আদর্শ গ্যাস প্ল্যান্ট বিনামূল্যে তৈরী করে দেবার জন্য সমবায় ও কুটির শিল্প দপ্তরের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় জয়নাল আবেদিন সাহেবকে অনুরোধ করছি। অন্ততঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ফেরৎ-যোগ্য টাকা থেকে বিনামূল্যে গ্যাস প্ল্যান্ট মসাট ব্লকের বাদপুরে বসানো হোক। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তরে দিল্লীতেও লেখা হয়েছে। অবিলম্বে গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী হলে স্থানীয় লোকেরা গোবর গ্যাস সম্পর্কে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা মুছে ফেলতে পারে।

শেখ সাজিদুল ইসলাম

বাঁদপুর, হুগলী।

সোলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গে

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সোভিয়েত সাহিত্যিক সোলঝেনিৎ-সিনের নতুন বই "লেনিন ইন জুরিখ" বেরুবার খবরে এদেশে সৎ সাহিত্যপ্রেমীমাত্রই উল্লসিত হবেন। সোলঝেনিৎসিন অনেক ভালো ভালো বই এর আগেও আমাদের উপহার দিয়েছেন। যেমন "আইভান দেনিসোভিচের জীবনে একদিন", "ক্যানসার ওয়ার্ড", "ফার্স্ট সার্কেল", "আগষ্ট ১৯১৪" এবং "গুলাগ আর্কিপেলাগো"। প্রসঙ্গত জানাই এই শহর কলকাতায় সোল-ঝেনিৎসিনের নিন্দুকের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এবং স্ব-ক্ষেত্রে এঁরা সবাই খ্যাতিমান লোক।

গত বছর কোলকাতায় যাঁরা সোলঝেনিৎসিনের নিন্দা করে-ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, নিরঞ্জন সেন-গুপ্ত প্রভৃতি। এই নিন্দার ফায়দা এঁরা কিন্তু উঠিয়ে নিয়েছিলেন। সোভিয়েত সরকারের মোটা টাকার পুরস্কার ও রাশিয়া ভ্রমণ কলকাতায় "দ্বিবংশ শতাব্দী", "সোভিয়েত দেশ" কিংবা "নভোস্তিতে" অনুবাদ বা মোটা মাইনের চাকরি। আমাদের অনুমান, পুরস্কার এবং রাশিয়া ভ্রমণের টোপ না এলে হয়ত সোলঝেনিৎসিনের সম্বন্ধে এদের বক্তব্যের হেরফের হত।

সোভিয়েত পরাধী-বিদ্বেষী বিশ্ব-রদ প্রফেসর আন্দ্রেই শাখারভকে এবছর নোবেল "শান্তি" পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যিনি রাশিয়াকে ষ্ট্যালিনের জমানায় আণবিক বোমা এবং ক্রুশ্চেভের সময়ে হাইড্রজেন বোমা উপহার দেন। উনি ডঃ ওপেন হাইমারের—যিনি আমেরিকার আণ-বিক বোমার জনক—রাশিয়ান সংস্ক-রণ মাত্র।

নোবেল শান্তি পুরস্কারটা হালে হোলি রোমান এম্পায়ারের মতই (নাইদার হোলি নর রোমান নর এম্পায়ার) নোবেল (মহৎ) নয়, শান্তি ত দূরের কথা, পুরস্কারটাই দেখছি তিরস্কারে দাঁড়িয়েছে।

রাণা ঘোষ

একজন সংগ্রামী দার্শনিকের প্রয়াণ

প্রবীর সেন

সত্তর বছর আগের কথা। গোটা দেশ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল। একটি শিশু তখন কোটালী পাড়ার শিশুর আর কলকাতায় উত্তরার্ধে প্রবল প্রতাপে হামা দিচ্ছে। পাঁচ সপ্তাহ আগের কথা। পরিপূর্ণ একাত্তর বৎসর বয়স্ক পুরুষের জীবনে শেষ সংগ্রাম চলছে। যমে মানুষে প্রচণ্ড টানাটানি। তার মধ্যেও গভীর উৎসুক্য নিয়ে মানুষটি ক্রমাগত খোঁজ নিচ্ছেন যন্ত্রস্থ একটি গ্রন্থের সম্পর্কে। ইংরাজিতে লেখা তাঁরই 'পার্টিশান অফ ইণ্ডিয়া'। প্রকাশক খুব ঝামেলা করছে অনেকদিন ধরেই। এদিকে মধ্যবর্তী এই ভদ্রলোকেরও সদ্য মাতৃ বিয়োগ হয়েছে। ফলে, ব্যাপারটা যথাযথ ভাঙাও যাচ্ছে না। মর্মান্তিক এই ছলনার মধ্যে যথার্থ বীরের মতো সংগ্রাম করতে করতে চোখ বুজলেন যে মানুষটি তাঁর নাম সুরেশচন্দ্র সেন। ২২শে সেপ্টেম্বর। জন্মদিনও ছিল একই তারিখে। মহৎ জীবনের অধিকারীদের মতো জীবন বরাবরই তাঁকে যথাযোগ্য ছলনার দ্বারা পদে পদে পরীক্ষা করে নিয়েছে আর যার সবগুলিতে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। জটিল সত্তার বহিঃপ্রকাশ মূলতই ছিল নিতান্ত সরল। সুরেশচন্দ্রের সমগ্র জীবনটাই আসলে একটা স্তরে স্তরে বিকশিত রচনা। বিচিত্র ও ব্যাপক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সুরেশচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে বৃহত্তর পরিধিতে যে জনসমষ্টি, তারা প্রায় কিছুই জানেন না। তাই যৎসামান্য একটা কাঠামো এখানে রাখবার চেষ্টা করছি।

পিতা ক্ষীরোদচন্দ্র সেকালের অস্থলিমের শ্রেষ্ঠ কবিরাজদের অন্যতম। 'শতাব্দী'-স্রষ্টা রমেশচন্দ্র জ্যেষ্ঠাগ্রজ। ইংরাজি শিখেছেন রসময় মিত্রের কাছে। দর্শনের পাঠ দিয়েছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। মেধাবী ছাত্র। সমগ্র জীবনের পরিসরে অন্তরঙ্গ বন্ধু গোষ্ঠীতে ছিলেন আর. সি. পি. আই প্রতিষ্ঠাতা সুধীর দাশগুপ্ত, এলাহাবাদস্থ অমৃত বাজারের অমূল্যভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভ.স' ছদ্মনামে পরিচিত কবি প্রভাস চন্দ্র বসু, কবি অনীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, করুণা হাজরা, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন, সন্তোষের হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, দুর্গা পালিত, অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত, আই-ডি হসপিটালের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ অনিল রায়, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহকর্মী বিজন ঘোষ এবং ইউ-এন-আই-এর ভূতপূর্ব পরিচালক মণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

সংরক্ষিত অল্প কয়েকটি জিনিষের মধ্যে আজো একটি টেলিগ্রাম, একটি দিনের পত্রিকা এবং বাঁধানো একটি বই আছে। টেলিগ্রামটি বন্ধু হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদবাহী। পত্রিকাটিতে তাঁর সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য। বইটি তাঁর কাছ থেকেই সুরেশচন্দ্র শেষবার দিল্লী যাবার সময় নিয়ে যান। সেটি কোনোদিন ফেরৎ দেননি। হেমেন্দ্রনাথ মারা গেছেন আটত্রিশ বছর আগে। সংবাদ পেয়ে অস্থির সুরেশচন্দ্র দু' দিন একটানা কেবল পায়চারী করেছেন। এই একটা যুগের ছবি। অথচ সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরের দিনই তাঁর ছেলে যমযন্ত্রণা ঘুমিয়েছে। দুটো যুগের কি অদ্ভুত পার্থক্য!

সন্তোষের জমিদার হেমেন্দ্রনাথের এই রকম বন্ধু কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার আবল্য তালুকদারি পরিবেশে মানুষ সুরেশচন্দ্রই 'অনল রায়' ছদ্মনামে 'যুগের আলো' গ্রন্থের লেখক। 'ইন্দ্রনাথ রায়' ছদ্মনামে লিখলেন 'বাস্তবের পটভূমিতে রবীন্দ্র সাহিত্য'। এছাড়া, 'ইন্দ্রনাথ' ও 'বিশু সেন' নামের আড়ালে অনেকগুলি নিবন্ধ। 'যুগের আলো' মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল বাংলা বই। এটি প্রকাশের সময়ে ছদ্মনাম ছিল অপরিহার্য। কিন্তু অবসর গ্রহণের পরেও স্বনামে কিছুই লিখতেন না আসলে, নিজেকে লুকিয়ে রাখাটা ওঁর একটা খেলার মতো ছিল। আত্মপ্রচারের এই মারাত্মক যুগে আমাদের পক্ষে সুরেশচন্দ্রের অসাধারণ আত্মগোপনপ্রবণতা সঠিক আন্দাজ করাই সম্ভব নয়। বাস্তব জীবনেও তিনি সযত্নে সর্বদা নিজেকে আড়ালে রেখে চলতেন। মৃত্যুর পরে আরও দু'খানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে। অভিনয় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য সম্বলিত একটি বাংলা বই এবং আর্ট অফ আক্টিং সম্বন্ধে একখানা ইংরাজি বই। জানি না, তিনি বেঁচে থাকলে এই বই দুটি কোন নামে ছাপাতেন!

কর্মজীবনে শিক্ষকতা করেছেন, সাংবাদিকতা করেছেন। সরকারী চাকরি তো করেছেনই। অধ্যাপক হওয়ার প্রবল অভিলাষ ত্যাগ করে কেরাণীর জীবনে গিয়েছেন দারিদ্র্যের কারণে। অকালে পিতৃবিয়োগের ফলে প্রায় রাতারাতি বিপুল বৈভবের জীবন থেকে সরাসরি বরণ করতে হয়েছে দু'মুঠোর রূঢ় চিন্তাকে।

স্কুলে শিক্ষকতাকালে পরবর্তী জীবনে সুখ্যাত ইংরেজির অধ্যাপককে ইতিহাসে দিলেন একশোর মধ্যে একশো। প্রধান শিক্ষক তলব করলেন। সুরেশচন্দ্রের জবাব: একশো দশ দেওয়া যায় না বলেই আমি একশো দিয়েছি।

বর্তমানে সর্বাধিক বিক্রিত বাংলা দৈনিকের একেবারে সূচনায় প্রথম সারির কর্মী ছিলেন। সেই পত্রিকায় দেশবন্ধুর প্রয়াণের পরে শোকযাত্রার রিপোর্ট সুরেশচন্দ্রেরই লিখিত। এ যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনয় প্রতিভা সম্পর্কে অগাধ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁর কোনো একটি চরিত্রের অভিনয় সম্পর্কে ঐ পত্রিকাতেই কিছু কড়া মন্তব্য করেন। হুমকি এলো বিজ্ঞাপন বন্ধের। কর্তৃপক্ষের অনুরোধ মিশ্রিত নির্দেশ, বিপরীত বক্তব্য রাখা হোক। সে-কথা রাখবার পক্ষে একেবারেই উল্টো ধাতু সুরেশচন্দ্রের। যার পরিচয় এমন কি বৃটিশ আমলের দিল্লীতেও আমরা পেয়েছি তাঁর আচরণে।

কেন্দ্রীয় সরকারে কেরাণীর কাজে রত অবস্থায় সাদা চামড়ার উপরতলার সঙ্গে আত্মমর্যাদা তথা প্রচ্ছন্ন দেশাত্মবোধের কারণেই কথা কাটাকাটি থেকে চড়তে চড়তে তদানীন্তন পার্লামেন্ট অব্দি গড়াচ্ছিল। সেই অবস্থায় বেগতিক দেখে সাহেবই মিটিয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটা। দৈনন্দিন ব্যবহারিক পর্যায়ে বিরোধ তো ছিল প্রায় রুটিনের মতো।

যে কারণে খুব একটা উন্নতিও করতে পারেননি আর একসটেনশানের তো কথাই ওঠে না।

কর্মজীবনের বাইরে লেখক সত্তা বাদেও আরো কিছু দেবার যোগ্য পরিচয় সুরেশচন্দ্রের আছে। এমন নিপুণ খেলোয়াড়, দক্ষ অভিনেতা এবং সুরসিক আড্ডাক মানুষ একাধারে বিস্তর সুলভ নয় একথা বলা যায় অসঙ্কোচেই।

দাবা এবং ক্যারমের ইন্টার-কলেজ চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। ক্রিকেটে ওয়াজির আলির বলের বিরুদ্ধে ব্যাট ধরেও দাঁড়াতে দেখা গেছে তাঁকে।

বগ্রাম পিঞ্জরী, দিল্লী এবং কলকাতায় তিনি অসংখ্য নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আদৌ নেই। একটা খবরই প্রাসঙ্গিক যথেষ্ট। তাঁর উদাত্ত আবৃত্তি ও অসামান্য অভিনয়ের রজনীগুলিতে দিল্লীর বিখ্যাত বেঙ্গলী ক্লাবের আসরে আশপাশের প্রদেশ থেকেও আগ্রহী দর্শক মণ্ডলীর সমাবেশ হতো। বছর চার-পাঁচ আগেও তাঁর 'বর্ষ শেষ' ও 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' শ্রোতৃ মণ্ডলীকে সত্যি সত্যি অভিভূত করে রাখতো।

আর ছিল তাঁর আড্ডা। সারা জীবন। মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগেও বেলা দেড়টা-দুটো ছিল বাঁধা। কোন কোনদিন এমন কি বেলা চারটের দিকেও গড়িয়েছে। রাতে কোনদিন তিনি এগারোটার আগে বাড়ি ঢুকলে চিন্তিত হতেন গৃহস্থেরা। আড্ডাকে যে তিনি কী চোখে দেখতেন সেটা স্পষ্ট হয় 'বাস্তবের পটভূমিতে রবীন্দ্র সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকাংশ পাঠে। কোন নিষেধই ঠেকাতে পারতো না শরীরকে নিয়ে তাঁর এই অনিয়ম। দুনিবার আকর্ষণ। আর জমাতেও জানতেন। জাদুমন্ত্রের মতো।

মার্কসবাদ-বিশেষ তার ডায়লেকটিক্স তথা মূলগত বস্তু ছিল তাঁর দীর্ঘ জীবনের সর্বোত্তম ধ্যানের বিষয়। জীবনের গোটা দ্বিতীয়ার্ধই অতিবাহিত মার্কসবাদ নিয়ে। কেবল যে মার্কসবাদ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক গ্রন্থ 'যুগের আলো' লিখেছেন তাই নয়, সম্ভবত ডায়লেকটিক্স থেকে রবীন্দ্র প্রতিভার ক্রমবিকাশের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ তিনিই প্রথম করেছেন বাংলা ভাষায় তাঁর 'বাস্তবের পটভূমিতে রবীন্দ্র সাহিত্য' গ্রন্থে। চৌষট্টি সালের পরে রুশ, চীন, সি-পি-আই, সি-পি-এম কাউকেই তিনি পরিপূর্ণ সমর্থন করতে পারেন নি। র‍্যাডিক্যালিজম-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাঘা যতীনের পরবর্তী সন্ত্রাসবাদকে সম্পূর্ণ নিরর্থক জ্ঞান করতেন। শহীদ ভগৎ সিং যেদিন বোমা ফাটান সেদিন তিনি পার্লামেন্টে উপস্থিত ছিলেন। গোটা ব্যাপারটা সুরেশচন্দ্রের কাছে তামাশার চেয়ে বেশী বলে প্রতিভাত হয়নি। অথচ রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও 'চার অধ্যায়'-কে গ্রহণ করতে পারেন নি।

এতক্ষণ সদ্যপ্রয়াত সুরেশচন্দ্র সেনের জীবনের নানাদিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত কাঠামোর মধ্যে আলোকপাতের যে চেষ্টা করা হলো শেষ বিচারে সেগুলো সত্যিই কাঠামো মাত্র। এই কাঠামোর ওপরে জীবনের মূর্তিটাকে নিতি যে মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি চরিত্রের মন্ত্র। চরিত্র বাদে সুরেশচন্দ্র যেদিন বৈদ্যুতিক চুল্লীতে যে নিষ্প্রাণ শরীরটাকে শেষ করে আসা হলো তার চেয়েও অনেকখানি কম। এ সম্পর্কেও এখানে বিস্তারিত হবো না। কেবল এই সংবাদটুকুই যথেষ্ট বিবেচনা করি যে, তার পরিবারের লোকেরা কোন রূঢ় শাস্ত্রীয় সংস্কার অনুসরণ করেননি তাঁর মৃত্যুর পরে। এটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কারণ সুরেশচন্দ্র আজীবন সত্য পথাশ্রয়ী ছিলেন। বিশ্বাস ও কর্তব্যে তিনি কদাচ পেছপা হয়েছেন।

'শ্রীকান্ত'-এর ইন্দ্রনাথ আঁধার রাতে মাছ ধরতে গেছে। সাপে তাকে কেটেছে এই বিবরণ শরৎচন্দ্র দেননি। ইন্দ্রনাথেরও খুব বেশী বিবরণ আর আমরা পাইনি। কিন্তু আমাদের এই ছদ্ম নামধারী ইন্দ্রনাথকে নিয়মিত সর্প-সঙ্কুল খাল পারাপার কালে সাপে কেটেছিল। ক্ষতস্থান তিনি স্বয়ং ছুরি দিয়ে কেটেছেন। দীর্ঘকাল পর রোগ মুক্তির পরে ফের সেই খাল সাঁতরে পারাপার করেছেন। হার্নিয়ার অপারেশান করাতে হবে। পরিবারের লোকদের বললেন, অফিসের কাজে দিন কয়েকের জন্যে বাইরে ঘুরে যাচ্ছেন। ভর্তি হলেন আর. জি. কর হাসপাতালে। ব্যাপারটা জানালো শুধু দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। গলায় একটা সুকঠিন ও সূক্ষ্ম অপারেশান করতে হবে। দেশী ডাক্তারের সাধ্য নয়। কলম্বো প্ল্যানে এলেন প্রখ্যাত সার্জেন ক্রাউচ সাহেব। বিনা ক্লোরোফর্মে সহাস্যে অপারেশান টেবিলে শুলেন সুরেশচন্দ্র।

এই দুর্দান্ত সাহসের সঙ্গে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ এবং তদুপরি গভীর সত্য সন্ধিৎসা মিলিত হয়ে সুরেশচন্দ্রকে সংগ্রামী দার্শনিকে রূপান্তরিত করেছিল। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধকালীন যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, কথাটা তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর কোনো আত্মচরিত নেই।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

সত্যের মত বদমাশ

মিহির আচার্য

গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো আটষট্টি-তে। ঠিক এক বছর পর নবেম্বর উনিশশো উনসত্তর সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার অশ্লীলতার অভিযোগে গ্রন্থটিকে বাজেয়াপ্ত করেন। লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় একই সময়ে শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর "জেলে ত্রিশ বছর"; বদরুদ্দিন ওমরের "সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়িকতা" ও "সংস্কৃতির সংকট"; কমরুদ্দিন আহমদের "সোস্যাল হিস্ট্রি অফ ইস্ট পাকিস্তান"; সত্যেন সেনের "আল বেরুণী" গ্রন্থগুলির উপরও নিষেধাজ্ঞা অথবা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়।

অন্যান্য বইগুলির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজহাত নিঃসন্দেহেই রাজনৈতিক।

আবদুল মান্নানের গ্রন্থটির বিরুদ্ধে অভিযোগ স্পষ্ট। পাকিস্তান অবজর্ভার-এর বাইশে নভেম্বর উনিশশো উনসত্তর-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী

"contains words reporting crimes of sex in a manner likely to ercite unhealthy or an urge to imitation."

সোভগাক্রমে ইয়াহিয়া শাসনের অবসানের পর গ্রন্থটির উপর বাধানিষেধ প্রত্যাহৃত হয়। এবং দৈনিক পূর্বদেশ, উনিশে এপ্রিল উনিশশো বাহাত্তর-এর স্টাফ রিপোর্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী সংবাদটি এইভাবে ছাপা হয়ঃ

"পাকিস্তান আমলে উনিশশো উনসত্তর সালে নিষিদ্ধ আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পগ্রন্থ "সত্যের মতো বদমাশ" বইটি গত সোমবার ঢাকা স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে আবার বিক্রয় শুরু হয়েছে।

"গণপরিষদ সদস্য জনাব মনজুর আহমদ বইটির আনুষ্ঠানিক বিক্রি শুরু করেন।....

"বাঙলা দেশের ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনার আর দ্বিতীয় কোনো নজির নেই।"

আমার হাতে এখন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশকাল অক্টোবর উনিশশো তিয়াত্তর। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক জানাচ্ছেন "প্রথম সংস্করণে সংখ্যাহীন ভুল থেকে গিয়েছিলো; এবার সে-সব বহুলাংশে শোধিত ও মার্জিত হলো। গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিলো "ঢাকা কলেজ বার্ষিকী", পরিচয়, পূর্বমেঘ, ছোট গল্প, পূবালী, কণ্ঠস্বর, পাকিস্তানী খবর, শ্রাবন্তী ও বহুরূপী পত্রিকায়। "চাবি" গল্পটির দ্বিতীয় ও পরিবর্তিত লেখন এখানে মুদ্রিত হয়েছে।"

গ্রন্থটি বাঙলা দেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা রাজশাহী যশোর রংপুর কর্তৃক পরিবেশিত। ডিমাই, পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ ত্রিশ, দাম ছয় টাকা। প্রচ্ছদপট ও অঙ্গসজ্জা গোলাম সরোয়ার মহম্মদ খসরু।

গল্পসংখ্যা বারো। শেষ গল্পটির শিরোনামের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির নাম "সত্যের মতো বদমাশ"।

গল্পগুলির নামকরণ থেকে লেখকের বয়স, অভিজ্ঞতা, রচনাশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতা সহজেই ধরা পড়ে। যেমন কোনো গল্পের নাম "মাতৃহননের নান্দীপাঠ" কোনোটি "সময়ের ঘর", আবার কোনোটি "সমীচীন মানব" এবং "সত্যের মতো বদমাশ" তো যথেষ্ট আগ্রাসী!

বস্তুত অবিভক্ত বাঙলার যে গল্পের ধারা কমবেশি পূর্ব ও পশ্চিমে অভিন্ন ঐতিহ্যের বাহক, সেই সমাজমুখীন গ্রাম বাঙলা কেন্দ্রিক গল্পের বাতাবরণ হালের নতুন লেখকদের মধ্যে পুরোপুরি অস্বীকৃত।

এর ঐতিহাসিক কারণ আবিষ্কার করতে হলে প্রথমেই মনে পড়ে নবজাগ্রত লেখক ও পাঠকের তথাকথিত ধর্মোন্মাদনা অতিক্রান্ত ক্রমে-গড়েওঠা শিক্ষিত সংস্কারবিমুক্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিপ্রধান শ্রেণীর সাহিত্যে প্রাধান্য।

পাইকারী দারিদ্র্য ও অশিক্ষার দরুণ স্বাভাবিকভাবেই দেশভাগের পর বাঙলা সাহিত্য-পাঠকের সংখ্যা বিশেষত পূর্ব বাঙলায় সীমিত হয়ে পড়েছিল। অনিবর্যত বাঙলা বইয়ের বাজারের ক্ষতি হয়। দেশবিভাগোত্তর পরবর্তীকালে ক্রমশঃ স্বাবলম্বী একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লেখক-পাঠক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এবং হালের পূর্ব বাঙলার সাহিত্য কার্যত সেই সীমাবদ্ধ গন্ডীর মধ্যেই তার সাধনা শুরু করেছে।

এই নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকদের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্যকেও শনৈ শনৈ পথ করে নিতে হচ্ছে। ফলে এই নতুন সাহিত্যকে বুঝতে হলে সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর মেজাজকে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করতে হবে।।

এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে ধর্মীয় উন্মাদনাই পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেরণা। এবং এই প্রেরণাকে প্রবল রেখে দীর্ঘকাল উর্দু স্থিতস্বার্থের শাসন ও শোষণ নিশ্চিন্ত ছিল। বাঙালী মুসলমানদের মোহভঙ্গ ঘটেছে উনিশশো বাহান্ন সালে, যার প্রত্যক্ষ চেহারা ভাষা আন্দোলন হলেও, মূলকথা ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে বাঙালী মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রকাশের বলিষ্ঠ শপথ। ধর্মের নাম করে সমধর্মের উপর শোষণ যে কী মারাত্মক হতে পারে, এবং বাঙালী মুসলমানের শত্রু যে বাঙালী হিন্দু নয়, এই রাজনৈতিক তথা সংস্কৃতিক চেতনাই বিশেষ করে বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের পুনর্জন্ম এনে দিল।

কিন্তু ইতিমধ্যেই সংস্কৃতির জগতে বিষ ঢুকে গিয়েছে। লেখক-বুদ্ধিজীবীদের প্রবীণ অংশ কোথাও কোথাও ঘোঁষা, এবং কোথাও কোথাও চূড়ান্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট। সেক্স স্বভাবতই এঁদের প্রিয়-প্রসঙ্গ। বাইরে থেকে চরিত্র আমদানি না-করে বেশির ভাগ চরিত্রই এঁদের নামশূন্য "আমি"।

এই ধারায় অ্যাবস্ট্রাক্ট রচনা কী শীর্ষবিন্দুতে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমার তরুণ বন্ধু জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। তাঁর এই রচনাদর্শের কারণ স্বরূপ তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন : প্রথমত হিন্দু বলে মুসলমান প্রধান সমাজে সংখ্যাগুরুর চরিত্র নিয়ে লেখা তাঁর পক্ষে প্রধান বাধা। ফলে তাঁর গল্পে যাবতীয় চরিত্রই অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবমূর্তিতে গড়া। জানি না জ্যোতিপ্রকাশের এবম্বিধ যুক্তিতে সারবস্তু কী পরিমাণে রয়েছে। তবে মনে হয়, তাঁর সমস্যাটা চিন্তা করার যোগ্য।

কিন্তু যখন হাসান আজিজুল হক মুসলমান চরিত্র নিয়েও প্রায়শই গল্পে একই আবহ সৃষ্টি করেন তখন জ্যোতিপ্রকাশের যুক্তিটিও কমজোর হয়ে যায়। কারণ হাসান আজিজুলের চরিত্রগুলিতে আইডিয়াই প্রধান, চরিত্রগুলির নাম প্রিয়ব্রতই থাক কিংবা আসাদোল্লাই থাক, কিছু আসে যায় না। কারণ চরিত্রগুলি বাস্তবে প্রিয়ব্রতও নয়; আসাদোল্লাও নয়! এগুলি "নাম" ছাড়া কিছু নয়!

"সত্যের মতো বদমাশের" আবদুল মান্নান সৈয়দ এই ধারারই লেখক। রচনাভঙ্গি, বিষয় এই ধারারই অনুসারী। একটি কী দুটি গল্পে মেয়েদের যৌন-শরীরের প্রতি তাঁর পক্ষপাতও লক্ষণীয়। কিন্তু এর জন্যেই যদি গ্রন্থটিকে অশ্লীল বলে ধরা হয়ে থাকে তাহলে তৎকালীন সরকারি বিচারকে সমর্থন করা যায় না। সাহিত্য-বিচারে যদি আমার মূল্যকে গুরুত্ব দেয়া যায় তাহলে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই মান্নান সাহেবের গলদ অন্যত্র। নতুন কথা বলতে শেখা শিশুর মতো অবস্থা হয়েছে তাঁর। তিনি বোঝেন নি ভাষার স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই যদি না তা চরিত্রানুগ হয়। লেখকের কাব্যিক কিছু বাক্য বা বাক্যাংশ গল্পের শরীরে অপটু হাতে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি চিন্তা করেন নি তা গল্পের শরীরের সঙ্গে অঙ্গীভূত হল কিনা! অনেক লাগসই উপমা চিত্রকল্পও যদি প্রয়োজনীয় শর্তে রচনায় না গাঁথা যায় তাহলে তা ব্যাড আর্টেরই নমুনা হয়ে পড়ে। পূর্বসূরী জ্যোতিপ্রকাশ হাসান আজিজুলের বিষয় যাই হোক ভাষানির্মাণে তাঁরা যথেষ্ট কুশলী। অন্তত তাঁদের গদ্যকে কেউ দুর্বল বলবেন না। মান্নান সাহেব এই পরিণত শিল্পবোধ দেখাতে পারেন নি, এটা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য। গল্পগুলির আলাদা আলাদা বিচার করে দেখানোর কোন প্রয়োজন দেখছি না। কারণ সিদ্ধান্ত একই হবে।

তবে আশার কথা মান্নানের সাহিত্যপর্ব শুরু হয়েছে মাত্র, অভিজ্ঞতা ও শিল্পবোধ ভবিষ্যতে তাঁকে সঠিক পরিণতি এনে দেবে, এমন বিশ্বাস রাখা যায়।

সমাজতন্ত্রের পথ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

থাকে। এবং সোভিয়েত ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। স্তালিন সংশ্লিষ্ট বক্তৃতায় বলেন যে, সোভিয়েত সরকার ধনপতিদের উচ্ছেদ করে ব্যাঙ্ক, কারখানা, রেলপথ, এবং অন্যান্য উৎপাদনের যন্ত্র নিয়ে নিয়েছে। এগুলোকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এই সব সংস্থার দায়িত্ব নিয়েছে শ্রমজীবী মানুষের সবচেয়ে সেরা লোকজন। এসব বাস্তব সত্য, শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি নয়।

স্তালিন ঐ বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ রাশিয়ায় বেকারত্বের অবসানের কথা উল্লেখ করেছেন। স্তালিন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সোভিয়েত সমাজ মানুষকে কাজ করার অধিকার দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, আজ পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে বেকারত্বের জ্বালা নেই। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পিত অর্থনীতির ফলে জীবিকা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশেই ছেলে মেয়ের শিক্ষার জন্য বাপ-মাকে এক পয়সাও ব্যয় করতে হয় না। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশেই ফাটকাবাজি চলা সম্ভব নয়। প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি শব্দ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ছেলেমেয়েদের কাছে আজব শব্দ, কারণ ঐ দু'টোর অস্তিত্ব কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে নেই, থাকা সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎসাদন ঘটতে থাকে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে এক শ্রেণীহীন সমাজের বনিয়াদ। এবং ক্রমে সমগ্র দেশ একটি শ্রমজীবী মানুষের সমবায়ে পরিণত হতে থাকে। নতুন সমাজে গড়ে উঠতে থাকে নতুন ধরণের সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ। উৎপাদনেও আসে জোয়ার। মানুষের কল্যাণের মহান মন্ত্রে দীক্ষিত এক সমাজ। এখানে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণারও প্রভূত বিকাশ ঘটতে থাকে। বুর্জোয়াতন্ত্রে, গণতন্ত্রের মানে হ'ল মুষ্টিমেয়র গণতন্ত্র। আর শ্রমিকশ্রেণীর এই নতুন সমাজে গণতন্ত্রের মানে সমাজের 'সমস্ত নাগরিকদের গণতন্ত্র' অধিকার। এটা নিশ্চিত যে, সর্বহারার একনায়কত্বের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীর কোন গণতন্ত্র সর্বহারারা স্বীকার করে না। এই সর্বহারারাই সমাজের শতকরা নব্বুই ভাগ। ক্রমে, যখন সমস্ত সমাজটা শ্রমজীবী সংঘে পরিণত হবে তখন সেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিকাশ গণতান্ত্রিক বিকাশ সম্ভব হয়। আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানবজাতির এই উন্নত সামাজিক স্তরের উত্তরণের কাজ চলছে।

সুতরাং সমাজতন্ত্র প্রতিশ্রুতি নামক কোন অর্থহীন শব্দ নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ফলশ্রুতি। পুঁজিতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, বড় বড় একচেটিয়া পুঁজপতিদের জীইয়ে রেখে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ইত্যাদি দু, একটা কার্যক্রম নিলেই সমাজতন্ত্র কোন দেশে গড়ে ওঠেনা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্রের বদলে সর্বহারার একনায়কত্ব যাদের নেতৃত্বে চলবে সামাজিকীকরণ পদ্ধতি। সমাজতন্ত্রের পথ বড় কঠিন সংগ্রামের পথ।

জ্যোতির্ময় বসু এম পি

(হাসপাতাল হইতে আনীত)

সান্ত্বনাবার্তায় সবিবারে কৃতজ্ঞ।

হৃদরোগাক্রান্ত হেতু,

প্রাপ্তিস্বীকারে অক্ষম

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক অভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দপ্তর অফিসের ৬১ বউ লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৪১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৪ই নবেম্বর ৭৫ ॥ দাম : ৪০ পঃ

কর্মী নিয়োগ কমিটি থেকে অজিত পাঁজার বিদায়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজাকে রিক্রুটমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গায় নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ।

সরকারী কর্মী নিয়োগের জন্য জেলাওয়ারী মন্ত্রীদের রিক্রুটমেন্ট সাব-কমিটি করা হয়েছিল। যে যে মন্ত্রী যে জেলা থেকে এসেছেন তাঁরাই সে জেলার রিক্রুটমেন্ট সাব-কমিটিতে আছেন। এই সাব কমিটির একজন চেয়ারম্যান আছেন। যার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া থাকে।

কলকাতার জন্য যে কমিটি তাতে পাঁচজন মন্ত্রী আছেন। এঁরা হলেন সুব্রত মুখার্জী, অজিত পাঁজা, শঙ্কর ঘোষ, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ ও মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন অজিত পাঁজা। লোক নিয়োগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অজিত পাঁজার বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল। সম্প্রতি এক ক্যাবিনেট মিটিংয়ে অজিতবাবুকে সরিয়ে শঙ্কর ঘোষকে কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে উত্তর কলকাতার রাজনীতি থেকে অজিতবাবুকে উৎখাত

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

বি টি এ-তে দুর্নীতি চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ পি কে সেন। তাঁরই নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি চলছে বলে কলকাতার একটি পত্রিকা ফ্রি লান্স টাইমস অভিযোগ করেছে।

এই প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে আটশ হাজার টাকা (মোট খরচের সত্তর শতাংশ) এবং পাবলিক ফান্ড ইনভেস্টমেন্ট থেকে আরও বত্রিশ হাজার টাকা (মোট খরচের তিরিশ শতাংশ) পায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখানে ঠিকমত হিসাবপত্র রাখা হয় না এবং অডিট রিপোর্টে প্রকাশ টি বি সীল বিক্রির টাকারও ঠিকমত হিসাব নেই; কেন্দ্রীয় গবেষণাগার থেকে মূল্যবান যন্ত্রপাতি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং দুষ্কর্ম ও থামখেয়ালিপণার জন্য প্রবীরকুমার ডায়গনস্টিক ক্লিনিক বন্ধ হয়ে গেছে।

অভিযোগ যে, সমাজ সেবার সুঘোশ পত্র ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এসোসিয়েশনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। এসোসিয়েশন বর্তমানে অনেকগুলি মামলায় জড়িয়ে গেছে, যার খরচ জোগাচ্ছে হয় সরকার, না হয় সাধারণ মানুষ। তিনতলা বাড়ির অধিকাংশ ঘর বছরের পর বছর খালি পড়ে আছে।

এই গোষ্ঠী অর্থাৎ ডাঃ পি কে সেন ও তার সহযোগীরা বিনা কারণে অনেক কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছেন। এদের মধ্যে চব্বিশ বছর চাকরী করছেন এমন স্থায়ী কর্মচারীও আছেন। এসোসিয়েশনের সদস্যপদ দেওয়া হচ্ছে নিজের পছন্দমত লোককে এবং পুরনোদের মধ্যে অনেকেরই সদস্যপদ নবীকরণ করা হচ্ছে না। উনিশশো ষাট সালে সাধারণ সদস্য ছিল দুশো পঁচিশ, কিন্তু উনিশশো সত্তর সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় একশ সাতশ!

কর্মকরী সমিতি থেকে শ্রীমোহন কুমার মুখার্জী (কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ) এবং ডাঃ অরুণকুমার শীল পদত্যাগ করেন ডাঃ সেন ও তার সহযোগীদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে। সমস্ত বিষয়টি স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজাকে জানানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব চাপা পড়ে গেছে। জাতীয় স্বার্থে এই এসোসিয়েশন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া দরকার।

প্রদেশ যুব কংগ্রেসে অ্যাডহক ঃ সুদীপ ব্যানার্জীর বিদায় আসন্ন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রদেশ যুব কংগ্রেসের বর্তমান কমিটি ভেঙে দেওয়া হবে। এবং নতুন এ্যাড হক কমিটির সভাপতি হবেন বারিদবরণ দাস। বর্তমান সভাপতি সুদীপ ব্যানার্জীকে অপসারণের কাজ চূড়ান্ত। এখন শুধু দিল্লী থেকে ফরমান জারী করা বাকি।

প্রিয়দাস মুন্সীকে যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে অপসারণের সংবাদ সর্ব প্রথম দর্পণে প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সংবাদের সত্যতা সম্পর্কেও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই সন্দেহকে দূরমূল করতে সাহায্য করল কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক। সুদীপ ব্যানার্জীও একটি সাপ্তাহিকে এই সংবাদ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

যদিও সুদীপবাবু ভাল করেই জানেন যে পয়লা অকটোবরের যে সভায় গোপন ব্যালটে প্রিয়ববু যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে অপসারিত হন সেই গুরুত্বপূর্ণ সভায় তিনি তো বটেই পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন না প্রিয়বাবুর অপসারণের বিরুদ্ধে ভোট দিতে।

সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি পদে অস্থায়ী ভাবে অম্বিকা সোহানীকে সম্প্রতি বসানো হয়েছে। এর পর নির্বাচনের মাধ্যমে ইউ পির কুলদীপ নারায়ণ সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হবেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

প্রিয়বাবু সম্প্রতি দিল্লী থেকে ফিরে আসার পর মহাজাতি সদনে এক বামী সভার আহ্বান করেছিলেন। সেই সভায় সুদীপ ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন না। যে প্রিয়বাবুর দৌলতে সুদীপবাবু এখনো রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি আছেন সেই প্রিয়বাবু আহূত গুরুত্বপূর্ণ সভায় সুদীপের অনুপস্থিতি অনেককেই বিস্মিত করেছে।

এদিকে বারিদবরণ দাস বিদেশ সফর সেরে যেদিন দমদম বিমান বন্দরে ফিরলেন, সেদিন কয়েক হাজার যুব ছাত্র বারিদবাবুকে সম্বর্ধনা জানাতে দমদম বিমান বন্দরে হাজির ছিলেন। অথচ দিল্লীর পাট চুকিয়ে প্রিয়বাবু যেদিন কলকাতায় ফিরলেন সেদিন তাঁকে স্বাগত জানাতে যাদের যাওয়া উচিত ছিল তারা কেউই যান নি। প্রিয়বাবুর অস্তগামী ভাগ্যরবির সঙ্গে বোধহয় ওরা নিজেদের ভাগ্যকে আর জড়াতে চান না। যারা এতদিন প্রিয়বাবুকে ঘিরে জয়ধ্বনী দিয়েছে তাঁরাই এখন বারিদবাবুদের সম্বর্ধনায় ভিড় করছেন। ক্ষমতার এই-ই হচ্ছে মাহাত্ম্য।

প্রিয়বাবুও হাড়ে হাড়ে একথা বুঝেছেন। তাই তিনি অকপটে তার সমর্থকদের বলেছেন ঃ এখন আর আমার সামনে পেছনে পুলিশ ভ্যান থাকবে না, এখন আর আমি কাউকে চাকরী দিতে পারব না। ধরা পড়লে আমার টেলিফোনে পুলিশও কাউকে ছাড়বে না। এসব জেনে যারা নতুন করে সংগঠন করার জন্য আমার সঙ্গে থাকতে চান তারা আসুন।

কলকাতার ওয়াক্ফ সম্পত্তি নিয়ে যাচ্ছেতাই ব্যাপার চলছে

(দর্পণের প্রতিনিধি)

কলকাতার ওয়াক্ফ বোর্ডে দুর্নীতি ক্রমশই জট পাকাচ্ছে। ওয়াক্ফের নতুন আইন সংশোধন করে মুসলিম সমাজে যে নাড়া দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তার ফাঁকি এবং অসার নিয়ম পাল্টানো ধরা পড়ে গেছে। তাই আজও মূলক্ষ টাকা বাকী ভাড়া ওয়াক্ফ বোর্ড আদায় করতে পারছেনা। দখল ছাড়ছেনা ওয়াক্ফ বাড়ীর এই শহর কলকাতার বুকে অনেকেই।

এদিকে ওয়াক্ফ বোর্ডের ম্যাডান স্ট্রীটের দপ্তরে কমিশনার গফফর সাহেব বা গফুর রহমান সাহেবের বিরুদ্ধে সকল কর্মচারীরা বিক্ষুব্ধ। গফফুর সাহেবের ইচ্ছামত গরীব ক্লার্ক এবং বদলী চাকুরীর কেরাণীও চিরকাল বসে আছেন বিনা মাহিনাতে ডাক পাবার আশায়। সেখ আতিয়াল ইসলাম (শেখ পুটি) (ত্রিশ) চার বছর ধরে বদলী চাকরীর আশায় বসে আছেন হুগলী জেলার চণ্ডীতলা বাঁদপুর গ্রামে। অথচ আশ্চর্য তিনি সরকারী কর্মচারী। চাকুরী পাকা। মাসের মধ্যে দুমাস বদলী কাজ করেন বেয়ারার। তাও আবার কমিশনারের নিজের লোক আছে বলে দুমাস কাটা পড়ে। অভিযোগ করেছেন ওয়াক্ফ এস্টেট এ্যাসোসিয়েশনের বিক্ষুব্ধ সম্পাদক নিয়ামত আলী মজুমদার। শেখ পুটি দীর্ঘদিন অনাহারে অর্ধাহারে ভুগছেন। তিনি মন্ত্রী আবদুস সাত্তার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ধর্মতলায় টিপু সুলতান মসজিদের গায়ে যে সমস্ত ফাঁকা জায়গায় দোকান ভাড়া দেয়া হচ্ছে তার জন্য একদল অবাঙালীর মৌরসীপাট্টা। তারা ছাড়া কেউই পাবেন না। অথচ এটি ওয়াক্ফের জায়গা। যুব কংগ্রেস নেতা নাজিম আহম্মদ অভিযোগ করলেন অনেকেই ঐ জায়গায় দোকান দেবার জন্য সরকারকে আবেদন করলেও কোনও সাড়া নেই। এন আহমদের অভিযোগ অনর্থক গরীব মুসলমানের টাকা নিয়ে কেন মালয়েশিয়ায় প্রতিযোগিতায় পাঠানো হচ্ছে আবৃত্তি করতে। এ টাকার অপচয় রোধ করবে কে? ওয়াক্ফ কমিশনার নীরব। এখনও দালালশ্রেণী ওয়াক্ফের ঘর দখল করছে নির্বিকারে।

কলকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেসের লোকেরা চাকরী পাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা কর্পোরেশনে একদল বেপরোয়া লোক ঢোকানো হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই পুরনো কর্মচারীরা দেখছেন অফিসে নতুন নতুন লোক। এরা নাকি চাকরী পেয়েছে। কোথা থেকে পেল, কে দিল চাকরী, সবই রহস্যাবৃত। বলাবাহুল্য সকলেই বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের লোক। যারা হাজারে হাজারে বিভিন্ন সরকারী অফিসে, রাষ্ট্রীয় সংস্থায় চাকরী পেয়েছে। এবং বাহাত্তর সালের পর থেকে এরাই—কেবলমাত্র এই বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোকেরাই চাকরী পাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন নিয়ম কানুনও মানা হচ্ছে না।

সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনে সুব্রত মুখার্জীর দুই সাগরেদ চাকরী পেয়েছে। ভালই চাকরী—এ্যাসেসমেন্টে। নাম কাশীনাথ দে ও দেবাশিস সেন। তবে নিজ বালিগঞ্জের লোক বলে সুব্রত কোন পক্ষপাতিত্ব করেন নি। কাশীনাথ বালিগঞ্জের ছেলে বটে, কিন্তু দেবাশিস উত্তর কলকাতার। এসব ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন বলে একটি বস্তু আছে সেকথা কর্পোরেশনের কর্তা ব্যক্তিরা ভুলেই গেছেন।

পুনর্মুদ্রণ

আদ্যাশক্তিমহাশক্তিকালিকাকাহিনী

অশোক মিত্র

ব্যাপার-স্যাপার দেখে হকচকিয়ে যেতে হয়। জিনিশ-পত্রের দাম বাড়ছে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাড়ছে, চাকরির বাজারে মন্দা, নানা তরফের বাগবিস্তার সত্ত্বেও কলকারখানার প্রসার আদৌ নেই, এ বছর ফসলও ঈষৎ কম হয়েছে, বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান; যেদিকেই তাকানো যায়, কোনো আশার আলো নেই। অথচ ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্য ক'রে মাতামাতি তুঙ্গে উঠেছে। কোথায় এ রকম অবস্থায় একটু বুঝে-সুঝে খরচ করা হবে, হৈহল্লোড় একটু কম ক'রে করা হবে, হচ্ছে ঠিক উল্টোটা। কলকাতার গলিতে-গলিতে-কোণে-সুড়ঙ্গে দুর্গাপূজার সমারোহ: যেখানে গত বছর দুটো পুজো ছিল, সেখানে এবার চারটে; যেখানে চারটে, সেখানে অন্তত সাতটা। সার্বজনীন পুজোর শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিই ঘটছে না, চটকও বাড়ছে, পুজো উপলক্ষ্য ক'রে চলাও অর্থের বন্যা বইছে। দেশে বিজলী সঙ্কট, পুজোর ক'দিন কে দেখে বলবে: নানা রঙের আলোর রোশনাই, উৎসবের দাপাদাপি। আমাদের এ পাড়ার পুজোর চমকেগমকে তোমাদের ও পাড়ার পুজোকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, অন্যথা মুখরক্ষা হবে না। সুতরাং প্রতি বছর মাতামাতির বহর বেড়েই চলেছে: মাতৃপূজা গৌণ, আসল লক্ষ্য কে কাকে কতটা হারিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু দুর্গার আরাধনাতেই ক্ষান্তি নেই। শ্যামাপূজার সন্তার, সন্দেহ হয়, দুর্গোৎসবকে ছাপিয়ে উঠেছে। এক সন্ধ্যার কালীসাধনা টেনে-হিঁচড়ে প্রায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে: ডামাডোল, ডামাডোল, কে কত বাজি ফোটাতে পারে, কে কত আলোর ছটায় আকাশকে উদ্ভাসিত ক'রে আনতে পারে। প্রাণ-কাঁপানো শব্দের অংশোরাত্র সমারোহ, প্রতি রাস্তায় কাতারে-কাতারে শ্যামাপূজা, এমন কি পাশাপাশি দুটো সার্বজনীন ব্যাপার একই রাস্তার উপর, অথবা মুখোমুখি। তাছাড়া, পৃথিবীতে দেবদেবীর শেষ নেই: কালী পূজার পর জগদ্ধাত্রী পূজা, জগদ্ধাত্রীর পর কার্তিক, কার্তিকের পর বাসন্তী, বাসন্তীর পর বিশ্বকর্মা, এমনি ক'রে, পৌষ পেরোতে না-পেরোতে, দেবী সরস্বতীতে পৌঁছে যাওয়া। শুধু সময়ের ফাঁকগুলি ভরিয়ে যেতে থাকো, পূজা থেকে পূজান্তরে এ ভাবে বিহার ক'রে ক'রে অচিরে ফের দুর্গোৎসবের ঋতুতে উপনীত হওয়া যাবে। প্রতি নতুন ঋতুতে নিনাদ আরো একটু উচ্চগ্রাম হোক; আমাদের ডুবতে দাও, আমাদের মরতে দাও।

বছর কয়েক আগেও, পুজোর সন্তার জোটানো হতো পাড়ায়-পাড়ায় চাঁদার হামলা ক'রে। চাঁদা, যা যেচ্ছায় দেয়, তাকে ত্রিগুণিতে পরিণত ক'রে তোলা হয়েছিল, সাধারণ গৃহস্থের না দিয়ে উপায় কী। হালে চাঁদার অত্যাচার হয়তো কমেছে, উৎসবের সমারোহ বাড়া সত্ত্বেও কমেছে। খুচরো অর্থ সংগ্রহের আর তেমন দরকার নেই ছেলেদের, তারা প্রচুর কাঁচা টাকা পাচ্ছে হাতে। রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পাচ্ছে, ভয়ে-নীল-হয়ে-আসা ব্যবসায়ীরাও বিজ্ঞাপনের ছুতোয় মোটা টাকা দিচ্ছে। তাছাড়া, সরকারি সৌহার্দ্যও প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হচ্ছে। বলতে গেলে, এ বছর থেকে, এই পশ্চিম বাংলায়, যাবতীয় হিন্দু পূজাদি রাষ্ট্রীকৃত, রাষ্ট্রপ্রসাধিত অনুষ্ঠানে পরিণত। সরকার এবং প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রসন্ন অভয় সার্বজনীন সর্ববিধ উৎসবকে মায়ার কাঠি ছুঁয়ে গেছে। সুতরাং যত ইচ্ছে বেলেল্লা হল্লোড় চলুক, পাড়ায়-পাড়ায় ছেলের দলের ভয়চকিত হবার কোনোই কারণ নেই। আপ তত তাদের কেন্দ্র ক'রে পৃথিবী অস্তিত্ব হচ্ছে, তাদের কড়ির অভাব নেই, যন্ত্রপ্রসাদেরও অভাব নেই। পূজা থেকে পূজান্তরে, নিবিড় ঘোরের মধ্য দিয়ে যুবশক্তির বিহার চলবে।

অথচ, খোঁজ নিয়ে দেখুন, বেকারের সংখ্যা ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে গত কয়েক বছরে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছেলেরা ঠায় ব'সে আছে, সতেরো হাজার পদের জন্য সতেরো লক্ষ দরখাস্ত গুজো হচ্ছে; যারা কলাবিজ্ঞান নিয়ে সাধারণভাবে পড়াশুনা সমাধা করেছে তাদের যেমন সুবিধা হচ্ছে না, যারা কারিগরি শিক্ষায় অভিক্রম হয়েছে, তাদেরও একই অবস্থা। সেচের তেমন প্রসার না-হওয়ায়, এবং ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার উপস্থিত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকায়, পল্লী অঞ্চলেও অনুরূপ ঘটনার ঘনঘটা; ভিড় বাড়ছে, কিন্তু লোকনিয়োগ বাড়ছে না। অথচ সর্বত্র মূল্যমান ঊর্ধ্বগতি: যাঁদের উদ্বৃত্ত ফসল নেই, অথবা মূল্যবৃদ্ধি থেকে যাঁরা সামান্যতম বাড়তি মুনাফা হাতাতে পারছেন না, তাঁরা সংখ্যায় অমেয়। দেশের জনসাধারণ সার্বিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপে হাঁসফাঁস করছে। সার্বজনীন পূজাসমূহের উদ্যোক্তারা কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। বেকারের সংখ্যা যত বাড়ছে, জিনিশপত্রের দাম যত বেশি চড়ছে, মহাশক্তি মহাবিদ্যা-মহাদুর্গা-মহামায়া-মহাসরস্বতী-আদ্যা-শক্তি-কালিকা-পরমেশ্বরী বন্দনা ততোই আরো চড়াচ্ছে।

কেন এমনধারা হচ্ছে তার কিন্তু একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সম্ভব। ধরুন গোটা পশ্চিম বাংলায় বেকারের সংখ্যা তিরিশ লক্ষ ছুঁই ছুঁই করছে। সামান্য বেশি কম হতে পারে, কিন্তু নানা অনুসন্ধানে মনে হয় এই হিশেবটিতে তেমন কোনো ভীষণ গরমিল নেই; এমন কি রাজ্য সরকারও দু' একবার এই সংখ্যাটিকেই ব্যবহার করেছেন। যদি রয়েসয়ে অঙ্ক কষে বলা যায় যে বর্তমান অবস্থায় নতুন কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন জনপ্রতি অন্তত পাঁচ হাজার টাকার বিনিয়োগ, তা হলে তিরিশ লক্ষ নতুন কাজ সৃষ্টি করতে হলে পনেরো শো কোটি টাকার দরকার পড়বে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, হিশেব আরো একটু ছুঁটুন, এখন যে সমস্ত কলকারখানা বন্ধ আছে কিংবা ভৈষজ্যাদির অভাবে অথবা আর্থিক সঙ্কটহেতু যে সব কারখানায় পুরো কাজ হচ্ছে না, সে সব জায়গায় অতিরিক্ত লোক-নিয়োগের জন্য জনপ্রতি আদৌ পাঁচ হাজার টাকার দরকার নেই, কম হলেও চলবে। কৃষিক্ষেত্রেও ঐ হারে বিনিয়োগ তেমন আবশ্যিক নয়: ভূমিসংস্কার প্রয়োজন, সার-সেচ-বিদ্যুৎ উন্নত ধরনের বীজ-লগ্নি ইত্যাদি নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে গড়ে দু' হাজার আড়াই হাজার টাকা ঢাললেই এক-জন লোকের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। তর্কের খাতিরে এত সব কথা মেনে নিলেও তিরিশ লক্ষ বেকারের ব্যবস্থা করতে হলে নিদেনপক্ষে এক হাজার কোটি টাকা চাই-ই চাই। এই পরিমাণ মুদ্রার সংস্থান রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে উপস্থিত সুদূরপরাহত। তা যদি নাও হতো, বিনিয়োগের মারফত উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ চারটিখানি কথা নয়; তা সময়সাপেক্ষ, বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ হ'তে। বেকার সম্প্রদায় কি অতটা সময় শ্রেফ আঙুল চুষতে রাজি থাকবে?

পরিকল্পনার জাল পেতে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিকশিত উন্মোচিত ক'রে বেকার সমস্যার তাই আশু সমাধান সম্ভব নয়। অত পরিমাণ টাকা নেই, যথাযোগ্য সংগঠনশক্তি নেই, সবচেয়ে যা বড়ো কথা, আপনারা টিপে-টিপে মেপে-জুপে পরিকল্পনা রূপায়িত করবেন বহু বছর ধরে, আর সুবোধ বালকের মতো বেকারের দল চুপচাপ আশায় বুক বেঁধে পাশ থেকে আপনাদের প্রকর্ষ অধ্যবসায় সহকারে নিরীক্ষণ করবে, তা হতেই পারে না। সেই ঋতু আমরা অতিক্রম করে এসেছি। তাছাড়া ততদিনে বেকারের সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যাবে।

এই মুহূর্তে অন্ত যা করা যেতে পারে তা কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতার ব্যবস্থা। এখানেও কিন্তু পাটিগণিত মারাত্মক। প্রতি বেকারকে মাসে একশো টাকা করে বৃত্তি দিতে হলেও, বছরের হিসেবে গিয়ে দাঁড়ায় বারোশো টাকায়। তিরিশ লক্ষ বেকারের জন্য তা'হলে বাৎসরিক বরাদ্দ পড়ে তিনশো ষাট কোটি টাকা, এবং বছরের পর বছর ধরে অতএব এই তিনশো ষাট কোটি টাকা বা সমপরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা রাখতে হয়। জনপ্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ধরলেও বাৎসরিক হিসেব একশো আশি কোটিতে স্তম্ভিত থাকে। বেকারদের শান্ত রাখা কর্তব্য, নইলে আগুন জ্বলবে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার এমন সামর্থ্য নেই যে শ্রেফ পশ্চিম বাংলায় বেকারভাতা বিলোনোর জন্য প্রতি বছর দুশো কোটি টাকার মতো আলাদা করে নির্ধারণ করা হবে।

সমস্ত কর্মহীনকে সুষ্ঠু বিনিয়োগের মারফত কাজ পাইয়ে দেওয়া, অন্যথা প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম ভাতার ব্যবস্থা করা, আপাতত সরকারের পক্ষে অসম্ভব। ময়দানে বক্তৃতার পাটাতনে দাঁড়িয়ে কার্যিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে, কিন্তু প্রতিশ্রুতির পরিপূরণ সম্ভবপরতার বাইরে, বহু যোজন বাইরে। কিন্তু একটা কিছু করতেই হয়, নইলে যে যুবশক্তিকে নির্ভর করে রাজনৈতিক সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছনো গেছে, তা বিগড়ে যাবে, বিগড়ে গিয়ে উল্টো-পাল্টা কথা বলা শুরু করবে, উল্টো-পাল্টা কথা থেকে উল্টোপাল্টা কাজ, বিষম বিপত্তি ঘটবে।

সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না; যুবকসম্প্রদায় মারমুখো হয়ে উঠবে না, অথচ সরকারি খাতে তেমন মারাত্মক অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন হবে না, এমন রাজযৌটক সূত্রের খোঁজে অথচ দূর বেশি দূরে যেতে হলো না। পল্লী অঞ্চলের যুব সম্প্রদায় সম্বন্ধে এখনো তেমন মাথা না-ঘামালেও চলবে: কর্মস্থানের অভাবে তাদের মনে যাদই বা বিক্ষোভ দানা বাঁধে, সে-অসন্তোষ সহসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই, কারণ গরিব কৃষকদের সংগঠন তেমন জোরালো নয়; পশ্চিম বাংলায় যা-ও একটু জোরালো হয়ে উঠেছিল, রাজনৈতিক ঘটনা-সংঘাতে ফের ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সুতরাং, যদি পুজোভূত অসন্তোষকে নিগড়ে বাঁধতে হয়, কলকাতা এবং প্রধান প্রধান মফস্বল শহরগুলির কর্মহীন যুবকদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। এমন-এক আয়োজন চাই যার প্রসাদে কর্মসংস্থানের কোনো সুচারু ব্যবস্থা হোক না হোক, ন্যূনতম কোনো নিয়মিত উপার্জন থাকুক না থাকুক, যুবকের দল ভুলে থাকবে, সম্মোহিত থাকবে, নিয়োজিত থাকবে। সার্বজনীন পুজার সমারোহে সেই প্রার্থিত পথের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অঙ্কের হিসেবেই ফেরা যাক। ধরুন তামাম কলকাতা শহরে সব-মিলিয়ে দু'হাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইদানীং জনশ্রুতি কোনো কোনো এ ধরনের পুজোয় খরচের বহর এক লাখ-দেড় লাখে গড়িয়ে গেছে; অন্য দিকে, কোনো-কোনো মন্দিরতর পাড়ায়, দশ-পনেরো হাজার টাকার মধ্যেই এখনো মহাদেবীর আরাধনা সম্পন্ন হতে পারছে। যদি গড়ে প্রতি সার্বজনীন অনুষ্ঠানের খরচের পরিমাণ

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টাকা ফেরত দিচ্ছে না

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের গাফিলতি ক্রমশঃ চরমে উঠছে। রেজাল্ট সেকসানে খবর নিতে গেলে পাত্তাই পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য দেয় ফি ফেরত নিতে গিয়ে অনেকেই বিপত্তিতে পড়ছেন। জনৈক ছাত্র উনিশশো তিয়াত্তর সালে এল এল বি পরীক্ষা ডিসেম্বর সেসনে দিয়েছিলেন। রেজ নম্বর কল ডি ১৮৭৪। ঐ ছাত্রটির রেজাল্ট রিভিউ হয়েছিল। রিভিউয়ের ফল বের হবার আগেই আসন্ন পরীক্ষার ফি দাখিল করেন। অথচ পাশ বলে গণ্য হলেও ফি ফেরত দিতে কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করছেন। রিভিউ নম্বর ছিল ৯৬৪৭ ইস্যু করেছেন অ্যাসিসট্যান্ট রেজিস্ট্রার। কন্ট্রোলার স্বয়ং ফি-এর টাকা ফেরত দিতে দিলেও টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে না নানা অজুহাতে। অথচ ছাত্রটির কাছে যাবতীয় দরখাস্ত মার্কসিট কপি এবং কন্ট্রোলারের লেখা চিঠিও রয়েছে।

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্যআদিত্য

সোভিয়েত বিজ্ঞানী আন্দ্রে শাখারভকে বিজ্ঞানে শান্তি পুরস্কার অর্পণ করবার জন্যে নোবল কমিটি নির্বাচন করেছেন বলে খবরে প্রকাশ।

গুণগ্রাহী সলঝেনিৎসিন সুইজারল্যাণ্ডে বসে ঝটীত তাঁকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেছেন।

ভোলা নন্দী মন্তব্য করল : সোভিয়েত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তির সুফল।

* * *

ব্রিটিশ ফেডারেশন ফিল্ম সোসাইটি সত্যজিৎ রায়কে অর্ধ-শতাব্দীর বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক চিত্র পরিচালকের সম্মান দিয়েছেন।

আমরা আনন্দিত। কিন্তু "সোনার কেল্লার" কী হল ?

* * *

নীহার দাশ ॥ একবার বিরুদ্ধে লিখে পরের বার অনুতাপ করে ক্ষমা চাওয়া কী কলমচী সন্তোষকুমার ঘোষের রেওয়াজ হয়ে যাচ্ছে ?

উত্তর ॥ বার বার অপরাধ করতে হয় বলেই ক্ষমা চাওয়ার রেওয়াজটা তাঁকে রাখতে হয়। মদ্যপের প্রতিজ্ঞা আর কী।

* * *

করবী বসু ॥ শিব্রাম চকরবর্তির সঙ্গে আপনার তফাত কী ?

উত্তর ॥ শিবরামকে "মস্কো কনম পণ্ডিচেরী" লিখেও পরবর্তীকালে পালটাতে হয়, আর আমি যা লিখি তার জন্যে কোন দিনই কারুর কাছেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না।

* * *

"...তাঁর "শ্রীকান্ত" একটি ক্লাসিক। পাঁচশালা পরিকল্পনার গ্রামজীবনের পরিবর্তন ঘটলেও তাঁর "পল্লীসমাজ" কোনকালেই বিস্মৃত হবে না।"

স্টেটসম্যানের তেসরা অক্টোবরের তিন নং সম্পাদকীয়-প্রশস্তি।

* * *

গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশস্তি :

"শরৎচন্দ্রের সাধারণ জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ইহার সাক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন।...তিনি ছিলেন মনীষীরও অধিকারী, তাঁহার মননশীলতার পরিচয় তাঁহার লিখিত "নারীর মূল্য", "স্বদেশ ও সাহিত্য" "তরুণের বিদ্রোহ" পুস্তকে ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে সুপরিস্ফুট। কেবল কথা-সাহিত্যিক রূপে নহে, প্রবন্ধকার রূপেও তিনি বঙ্গ সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবী করিতে পারেন।"

"মদন" গোষ্ঠী ভাবিয়া দেখুন।

* * *

একজনের জিজ্ঞাসা : এস ইউ সি শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছে না কী ?

উত্তর : কেন ? বাড়াবাড়ি বলছেন কেন ? প্রগতিশীলদের দীর্ঘকাল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন তাঁরা। এ কথা তো মিথ্যে নয় এঁরাই কিছুকাল ধরে শরৎচন্দ্রের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ কিন্তু "বনফুলকে" টানলেন কেন ? তিনিই না কম্যুনিস্ট-বিরোধী "মানদণ্ড" উপন্যাসের লেখক ?

উত্তর ॥ এই দুর্বলতা তো বামপন্থী আন্দোলনের সর্বত্র। একা ওঁদের দোষ দিয়ে কী লাভ ?

প্রশ্ন ॥ আমরা কী এখনো পোল্যারাইজেশনের কথাটা ভাববো না ?

উত্তর ॥ আপনি-আমি শুধু ভেবে কী করব ? আরো বেশি লোককে ভাববার সময় দিন।

প্রশ্ন ॥ দুঃখটা কী জানেন, আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে বার বার কিছু লোক আমাদের চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, আমরা তাঁদের কাছ থেকে কোন শিক্ষাই নিইনে।

উত্তর ॥ নিলে যে সেই পথেই এগোতে হয়। অন্যের কথা কী, আপনি-আমিও কী এক ফাঁসির-ও স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত ?

* * *

চান্দ্রেয়ী মুখোপাধ্যায় ॥ "অজাতশত্রু" কে ?

উত্তর ॥ যার নিজস্ব কোন মতের বালাই নেই।

চান্দ্রেয়ী ॥ "সাহিত্য" মানে কী ?

উত্তর ॥ সম্পাদক-লেখকের সহিতত্ব।

চান্দ্রেয়ী ॥ বুদ্ধিজীবি কে ?

উত্তর ॥ যিনি বুদ্ধি করে বাঁচেন।

চান্দ্রেয়ী ॥ "সংবাদ" কাকে বলা হয় ?

উত্তর ॥ যা নিছক বলাই হয়, বাস্তবে ঘটে না।

চান্দ্রেয়ী ॥ "ইতিহাস" কী ?

উত্তর ॥ শক্তিমানরা পরিস্থিতি বুঝে যেটা বলেন।

চান্দ্রেয়ী ॥ "সত্য" কী ?

উত্তর ॥ শক্তিমানের পয়সায় যা লেখা হয়।

* * *

খবরে প্রকাশ, প্রতিমা দর্শনে বহু দর্শনার্থী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। বুঝেছি। সম্পূর্ণ দোক্তা পাতার প্রতিমা।

অন্য খবর, সপ্তমীর দিন আস্ত প্রতিমা অদৃশ্য!

শুনেছি। আখের গুড়ের প্রতিমা। ষষ্ঠীর রাত্রেই পিঁপড়ে শেষ করেছে।

দুঃসংবাদ, এবার পুরোহিত বাড়ন্ত ?

পুনরায় রেকার্ড।

মাদার টেরেসা

রাশা ঘোষ

["মিশনারীজ অব চ্যারিটির" রজত জয়ন্তী উপলক্ষে রচনাটি প্রকাশিত হল। —সম্পাদক, দর্পণ]

আমরা কলকাতার নাগরিকেরা ক্লেমলিন, পিকিং, দশ নং ডাউনিং স্ট্রীট, মায় হোয়াইট হাউসের দুষ্কৃতির খবর রাখি, রাখি না শুধু ৫৪/এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোডের ছাই রঙের বাড়ীটির কোনও সুকৃতির খবর। অথচ এই বাড়ীটিই হচ্ছে মিশনারীজ অব চ্যারিটির মূল কর্মকেন্দ্র—যেখান থেকে মাদার টেরেসা তাঁর বিরাট কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করেন।

কে এই মাদার টেরেসা ? আজ থেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে যুগোস্লাভিয়ার স্কোপজে শহরে আগনেস গোক্সা বোজাক্সিয়ু জন্মগ্রহণ করেন এক সম্পন্ন আলবেনিয়ান চাষী পরিবারে। জেসুইট সম্প্রদায় পরিচালিত স্কুলে ছাত্রী অবস্থায়ই কলকাতার নীচের মহলের দুর্দশার কথা জেনে উনি মিশনরী হয়ে এদেশে আসার জন্য মন স্থির করে ফেলেন এবং উনিশশো উনত্রিশ সালে ডাবলিনে প্রশিক্ষণ শেষ করে কলকাতায় এসে সেণ্ট মেরীজ স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। স্কুলে শিক্ষকতার কাজে থাকা অবস্থায় গ্রীষ্মাবকাশে দার্জিলিং যাবার পথে সিস্টার টেরেসা "দৈব-নির্দেশ" পান। ওঁর নিজের ভাষায় : "আই হার্ড দি কল টু গীভ আপ অল এণ্ড ফলো হিম টু দি স্লামস টু সার্ভ হিম এমং দি পুওরেস্ট অব দি পুওর।"

সেটা উনিশশো ছেচল্লিশ-এর দশই সেপ্টেম্বরের ঘটনা যা সিস্টার টেরেসার মাদার টেরেসার রূপান্তরের আলৌকিক কাহিনী। তারপরই পোপের সম্মতি নিয়ে পঞ্চাশ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো মিশনারীজ অব চ্যারিটি সংস্থা—যার মধ্যমণি হলেন মাদার টেরেসা। মাত্র পাঁচ টাকা সম্বল আর দশ জন কর্মী নিয়ে মাদার টেরেসা যে কর্মযজ্ঞে হাত দিয়েছিলেন সেই সংগঠনে বর্তমানে আছেন এগারোশ কর্মী এবং এরা পরিচালনা করছেন : একাশিটি স্কুল (ছাত্রসংখ্যা আট হাজার পাঁচশো); তিনশো পঁয়ত্রিশটি চিকিৎসা কেন্দ্র (রোগী সংখ্যা ষোল লক্ষ); সাতষট্টিটি কুষ্ঠ নিরাময় কেন্দ্র (১১৭২টি শিশু), ৩২টি নির্মলাবাস (৫১০৫ মুমূর্ষু) এবং ২৮টি অবাঞ্ছিত-পরিত্যক্ত শিশুভবন (১৬০০০ শিশু)। বর্তমানে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ি আছে মিশনারীজ অব চ্যারিটির একষট্টিটি শাখা :

পশ্চিমবাংলায়—তেরো, তামিলনাড়ু—ছয়, কর্ণাটক—তিন, মেঘালয় দুই, অন্ধ্রপ্রদেশ—তিন, হরিয়ানা—এক, বিহার—সাত, উত্তর প্রদেশ—সাত মধ্যপ্রদেশ—তিন, উড়িষ্যা—তিন, মহারাষ্ট্র—পাঁচ, কেরালা—পাঁচ, গুজরাট—এক, কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল—দুই, এবং বিদেশে আছে সাতাশটি কেন্দ্র।

মাদার টেরেসাকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে ভারত সরকার সম্মানিতা করেছেন বাষট্টি সালে। ঐ সালেই তিনি ম্যাগসেসে পুরস্কার পান যার আর্থিক মূল্য দশ হাজার ম্যানিলা ডলার। একাত্তর সালে পান পোপ জন শান্তি পুরস্কার (একুশ হাজার পাঁচশত ডলার) এবং জোসেফ কেনেডি জুনিয়র ফাউণ্ডেশন এওয়ার্ড (পঞ্চাশ হাজার ডলার)। বাহাত্তর সালে পান টেম্পলটন ফাউণ্ডেশন পুরস্কার (চৌত্রিশ হাজার পাউণ্ড)। এর প্রতিটি পাই

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

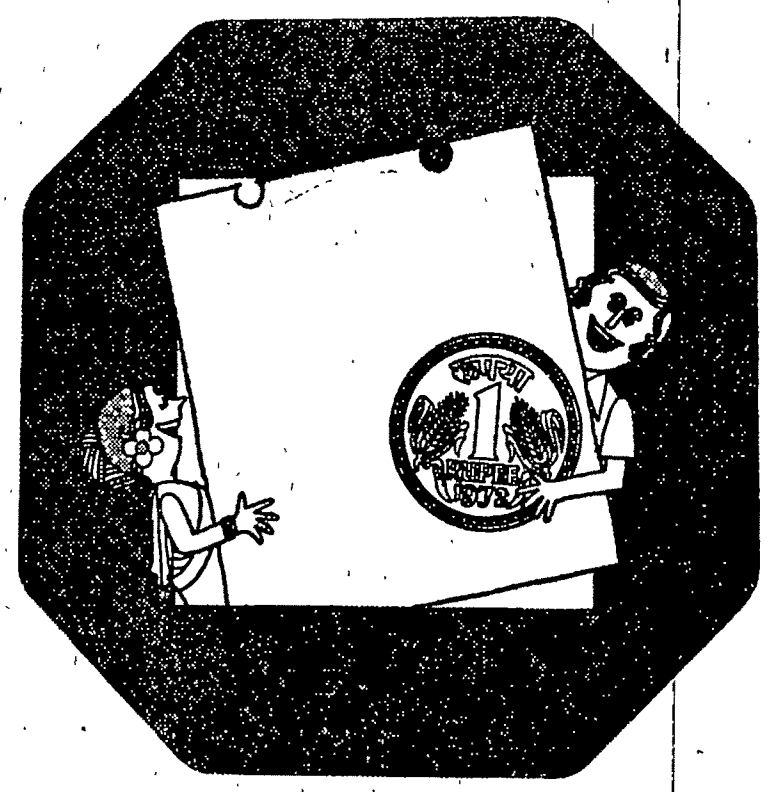

রোজ এক টাকা জমিয়েও দুর্ভাবনা দূরে রাখতে পারেন !

টাকা জমানো নিয়ে এত চিন্তার কী আছে ? এতদিন জমান নি ? তাতে কী। এখন আমাদের পরামর্শ মত, আজ থেকেই শুরু করুন। যদি এক টাকাও দিনে জমাতে পারেন, দেখবেন জমানো টাকা কীভাবে অচিরে বেড়ে ওঠে। আর এই সঞ্চয়ের ফলে আপনার সুখ ও নিরাপত্তাও পাল্লা দিয়ে বাড়বে।

ইউকোব্যাঙ্কে আপনার সাদর নিমন্ত্রণ বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন শাখায় চলে আসুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

রিকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনা

মাসে মাত্র ৫ টাকা করে জমালেও বছরে আপনি ৮% থেকে ৯০% পর্যন্ত সুদ পাবেন।

মাসে ৫ টাকা	ফেরত পাবেন	সুদ
১২ মাসে	৬৩ টাকা	৮%
২৪ মাসে	১৩১ টাকা	৮%
৩৬ মাসে	২০৭ টাকা	৯%
৪৮ মাসে	২৯০ টাকা	৯%
৬১ মাসে	৩৯৯ টাকা	৯০%

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য সঞ্চয় পরিকল্পনা :

১। সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট : বছরে ৫% সুদ

২। ফিক্সড ডিপোজিট : বছরে ৯০% পর্যন্ত সুদ

৩। রিকারিং ডিপোজিটযুক্ত ফিক্সড ডিপোজিট : ৭ বছরে ১৪.৫০% কার্যকরী সুদ

৪। ডিপোজিট সার্টিফিকেট : আসলের চাইতেও বেশি ফেরত

UCOC-5182 BEN

গুণ্ডা এবং কংগ্রেস

কিছুদিন হল সিদ্ধার্থ রায় প্রায়ই বলছেন : কিছু বিরোধী দলের চক্রান্তে কিছু গুণ্ডা কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করে থাকতে পারে। এই সব গুণ্ডাদের উদ্দেশ্য কংগ্রেসের নামে খারাপ কাজ করে কংগ্রেসের "ইমেজ" খারাপ করে দেওয়া। তিনি আরো বলেছেন তিনি ঐসব গুণ্ডাদের শায়েস্তা করবেন।

গুণ্ডাদের সম্বন্ধে ঠিক এই ধরণের কথা তিনি বলতেন বাহাত্তর সালের মাঝামাঝিতে। কংগ্রেসে গুণ্ডা অনুপ্রবেশ নিয়ে, সেই সময় খুব হৈচৈ হলে তিনি প্রায়ই বলতেন : সস্তায় কংগ্রেসের পতাকা সব জায়গায় কিনতে পাওয়া যায়। আর গুণ্ডারা এই পতাকা নিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গুণ্ডামি করছে। আমার প্রশ্ন : বাহাত্তর সাল থেকে এই তিন বছরের মধ্যে সিদ্ধার্থ রায়রা তাদের পার্টি থেকে গুণ্ডাদের তাড়াতে পারলেন না? গুণ্ডারা কি এতই ক্ষমতা রাখে? সি পি এম আর নকশালের মতো দুটো জাঁদরেল পার্টিকে যারা নানাভাবে প্রায় উচ্ছেদ করে ফেললো, তারা "কিছু" গুণ্ডাকে পার্টি থেকে তাড়াতে পারছে না? কোন এলাকায় কংগ্রেসের নাম করে যদি গুণ্ডারা গুণ্ডামী করে তাহলে সে এলাকার কংগ্রেসের দায়িত্বশীল নেতারা কি সে সব গুণ্ডাদের চিনে রেখে তাদের বিরুদ্ধে পার্টি থেকে বহিষ্কারের কথা তুলতে পারে না? এতো অতি অল্প সময়ের ব্যাপার। এর জন্য কি তিন বছরেরও অধিক সময় লাগে? মোহন ধারিয়া, চন্দ্রশেখরদের বহিষ্কারের ব্যাপারটা তো খুব তাড়াতাড়িই মিটে যায়। আসলে দরকার সৎ ইচ্ছে, সৎ প্রচেষ্টা। সেটারই আজ বড় অভাব।

উনত্রিশে আগস্ট সাঁওতালডিহিতে তাপ বিদ্যুত কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানের পরে স্থানীয় এম এল এদের সঙ্গে ঘরোয়া এক পরিবেশে আলোচনার সময় বলেন : "শুধু দেওয়ালে লিখে বা বা "যুগ যুগ জীও" ধ্বনি দিতে পারলেই যে তাকে দলে নিতে হবে তা নয়। কারণ তারাই পরে ঘাতক হয়ে দাঁড়ায়।" কিন্তু এর পরেই তিনি দুঃখ করে বলেন, "কংগ্রেস-বিরোধী বলে যতোজনকে আটক করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশী কংগ্রেসী বলে পরিচিতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটা দুঃখের ও লজ্জার। কিন্তু উপায় নেই এরা সমাজ বিরোধী। (যুগান্তর, একত্রিশে আগস্ট) আমি বুঝে পাই না সিদ্ধার্থ রায়রা যাদের "গুণ্ডা" আর "অনুপ্রবেশকারী" বলে মনে করেন, তাদের গ্রেপ্তারে "দুঃখ" বা "লজ্জা" লাগবার কি আছে? আর "কিন্তু উপায় নেই" বলেই বা বিলাপ করার কি আছে? এই সব সমাজ

মতামত

বিরোধীদের গ্রেপ্তারে তো আনন্দ হওয়া উচিত। দুঃখ আর লজ্জা তখনই আসে, যখন অপরাধকারীরা নিজের লোক হয়। এক মুখে অপরাধকারী গুণ্ডাদের "অনুপ্রবেশকারী" বলা আবার তাদের জন্য দুঃখ ও লজ্জা বোধ করা তো গোলমেলে ব্যাপার।

যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে প্রিয় দাসমুন্সীর অপসারণের খবর নিয়ে যে বিতর্ক চলছে সে প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সন্দীপ ব্যানার্জী উত্তর প্রদেশের এস পি রান্না ও মধ্যপ্রদেশের মহেশ যোশী এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠির পুত্র মায়াপতি ত্রিপাঠির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন "এদের প্রচেষ্টায় পাঁচ-ছয়টি ট্রাক ভর্তি মানুষ সভাস্থলে (যুব কংগ্রেসের জাতীয় পরিষদের পয়লা অক্টোবরের অধিবেশন) এসে প্রিয়রঞ্জন বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সমাজ বিরোধী ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।" কাজেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের এই ব্যাপারটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, এক শ্রেণীর কংগ্রেসীরাই সমাজবিরোধীদের পুষছে। আর এর পরেও কি বলা যাবে যে কংগ্রেসের ভেতরে অবস্থানকারী গুণ্ডারা "অনুপ্রবেশকারী?" অনুপ্রবেশকারী তাদেরই বলা যায় যাদের পিছনে পার্টির কোনও নেতার সমর্থন নেই। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্য রকম। কংগ্রেসের এক যুব নেতাই যখন এক শ্রেণীর কংগ্রেসীর বিরুদ্ধে গুণ্ডা পুষবার অভিযোগ এনেছেন তখন তা তো আর কোন মতেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। আর একটা পার্টি যদি নিজের পার্টির অভ্যন্তরেই গুণ্ডামী রুখতে না পারে তা হলে সে পার্টি বাইরের গুণ্ডামী রুখবে কি করে?

পশ্চিমবঙ্গে এখন পুজোর হুজুগেই কি কম গুণ্ডামী হচ্ছে? সিদ্ধার্থ রায়কে অনুরোধ করবো? পয়লা অক্টোবরের যুগান্তরে কালীপদ ভদ্রের "কালী পুজোর কী রূপ দেখছি" শীর্ষক লেখাটি পড়ুন। এবছরের কালী পুজোয় বেপরোয়া গুণ্ডামীর একটা সুন্দর ছবি তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি ক্ষোভ করে বলেন : এসব কি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না? ইমার্জেন্সির সুযোগে অনেক রকম শৃঙ্খলাই তো সম্ভব হয়েছে, সম্ভব করা যায় না এক পাড়ায় বিশেষ এক চৌহদ্দির মধ্যে একটার বেশী পুজোর অনুমতি দেওয়া হবে না। এত অর্ডিনান্স হয়, এর জন্য হয়না? তাতে দলাদলি রেষারেষি বিদেশের অপচয় মাইকের হট্টগোল উপাচার উপকরণের অসঙ্গতি, বিশৃংখলা এবং সর্বোপরি ভদ্রলোকদের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ধনক্ষয় নিবারণ করার কোন ব্যবস্থাই কি করা চলে না? সত্যিই, ভেবে পাই না ইমার্জেন্সির গুতোয় জে পি, মোরারজীর মতন বাঘা বাঘা নেতারা কাৎ হয়ে যায় অথচ পশ্চিম বাংলায় কিছু গুণ্ডা সমাজজীবনকে বিধ্বস্ত করার ক্ষমতা রাখে।

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে

চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় সম্প্রতি ওয়াশিংটন ঘুরে এলেন। সেখানে তাঁর নিজস্ব ছবির উৎসব চলছিল। ছবির বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে গিয়ে সত্যজিৎবাবু সাংবাদিকদের জানান যে তিনি ভবিষ্যতে সাদা-কালোয় আর ছবি তুলবেন না, যা তুলবেন সবই রঙ্গীন চিত্র।

শ্রীরায়ের মতো বিশিষ্ট পরিচালকের যে কোন মন্তব্যের ভেতরই তাঁর অনুরাগীরা গভীরতা এবং তীক্ষ্ন মননশীলতার অনুসন্ধান করবেন। কিন্তু আগামী দিনে তাঁর সব ছবিই "রঙ্গীন" করার সিদ্ধান্ত অনেকের মনেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে। সাদা-কালোয় ছবি করেও যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা অর্জন করা যায় তার প্রমাণ সত্যজিৎবাবু নিজেই। তাছাড়া রঙ্গীন ছবি করাই যে চূড়ান্ত আধুনিকতা এ কথাও পুরোপুরি মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।

সুতরাং সত্যজিৎবাবুর মতো বিশ্বখ্যাত পরিচালককে এখন থেকে বিষয় বা কাহিনী নয়, সেলুলয়েডের ওপর রঙই নিয়ন্ত্রণ করবে তাঁর ছবির বিষয়, অন্তত রঙের ব্যবহারে সফল হওয়া সত্বেও যখন অশনি সংকেত-এর মতো ছবিতে রঙের ব্যবহার সমালোচনার অপেক্ষা রাখে।

নীলাঞ্জন দাশ

অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতি রক্ষা

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় মানচিত্রে প্রথম নাট্যশিক্ষণ বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ, ভারতবর্ষের প্রথম চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রভারতীর চারুকলা বিভাগের প্রথম ডীন, শিশির যুগের অমিত বিক্রম শিল্পী, নাট্যবিদ নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রয়াণের পর এক বছর অতিক্রান্ত হলো সম্প্রতি। জাতির দুর্ভাগ্য, ইতিমধ্যে আমরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন আয়োজনই করতে পারিনি।

বাংলার নাট্যকর্মীদের তরফ থেকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পৌরমন্ত্রী সমীপে আবেদন রাখছি আর কালবিলম্ব না করে প্রয়াত শিল্পীর চেতলার বাসভবন, যার একাংশ এখন অহীন্দ্র চৌধুরী ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালিত "নাট্য পাঠাগার" ও "আরকাইভস মিউজিয়াম", তারই সংলগ্ন গোপালনগর রোড "অহীন্দ্র সরণি" নামে চিহ্নিত করা হোক।

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোল লক্ষ থেকে ষাট লক্ষ

একত্রিশে অক্টোবরের দর্পণে প্রকাশিত পত্র "পিল খাইয়ে মুনাফা" প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে প্রাচীন চীন দেশে জনগণকে আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার মত এদেশেও যুবশক্তিকে উচ্ছন্নে দেবার জন্য কোকাকোলা কালচারের সঙ্গে আরও অনেক কিছু বিদেশ থেকে আমদানী করেছে বিদেশী ওষুধ কোম্পানীগুলো। সিডেটিভ, ট্রাঙ্কুলাইজার, এন্টিডিপ্রেসেন্ট—এসব গ্রুপের ওষুধসেবী মাত্রই ক্রমশঃ মাত্রা হারিয়ে ফেলে, ফলে মাদকদ্রব্যের মতই নিয়মিত সেবন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। বিদেশী ওষুধ কোম্পানীগুলির এদেশের যুবশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা কতখানি নিখুঁত সে প্রসঙ্গে নিবেদন এই যে প্রায় তিনশটি স্বদেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতি ওষুধ প্রতিষ্ঠান চারশো রকমের ঐ জাতীয় মারাত্মক ওষুধ উৎপাদন করে এবং তার মৌল উপাদান আমদানী উনিশশো একাত্তর-বাহাত্তর সালে ষোল লাখ থেকে তিয়াত্তর-চুয়াত্তর-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ষাট লাখে! কোথায় ষোল আর কোথায় ষাট লাখ! তাও মাত্র এক বছরের মধ্যে। এর আমদানী ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে ও যাবে। এবং এই ধরণের ফর্মুলেশনে মুনাফা থাকে সেন্ট পারসেন্ট।

জনৈক পাঠক

উরুগুয়েতে সন্ত্রাস গ্রেপ্তার খুন

সমস্ত লেখা সেন্সর করা হচ্ছে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

চিলি, উরুগুয়ে, পারাগুয়েতে ফ্যাসিস্ত তান্ডব চলছে। এই বর্বরতার প্রচন্ডতা যে কত ব্যাপক তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সাম্প্রতিক একটি তথ্যে। য়ুরোপের একটি পত্রিকা হরাইজন্ট খবর দিচ্ছে যে, চিলিতে ফ্যাসিস্ত শাসনের এক বছরে চিলির বাহাত্তর হাজার শিশু কোন কোন ক্ষেত্রে মা বা বাপ বা কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়কেই হারিয়েছে। সম্প্রতি ঐ খুনীদের পান্ডা চিলির গুপ্ত পুলিশ দিনার প্রধান কর্ণেল মান্নুয়েল কনত্রেরাস পালভেদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বেশ কয়েকজন জবরদস্ত সি-আই-এ অফিসারদের কাছে তালিম নিয়ে ফিরেছে। ঐ অফিসারদের মধ্যে রয়েছে ভারনন ওয়ালটারস, যাকে সি আই এ মহলে "দ্বিতীয় বাঘ" বলে মনে করা হয়।

শুধু চিলি নয়, উরুগুয়েতে চলছে ফ্যাসিস্ত শাসকদের হত্যা অভিযান। শুধু হত্যা নয়, গ্রেপ্তার তল্লাসি, বেধড়ক মারধোর, এখন ফ্যাসিস্তদের অস্ত্র। তা সত্বেও উরুগুয়ের দেশপ্রেমিক মুক্তি আন্দোলন দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝেই অতর্কিত হানায় ফ্যাসিস্ত ফৌজ বিপর্যস্ত হচ্ছে। তবে, সম্প্রতি ফ্যাসিস্ত সরকার যে ধরণের হামলা চালাচ্ছে তার তুলনা মেলে না।

সম্প্রতি ফ্যাসিস্ত পুলিশ তুপামারোজ গেরিলা পেদ্রো লারেনা মার্তিনেজকে জেলের মধ্যে খুন করেছে। দিনের পর দিন অত্যাচার চালানোর পর মার্তিনেজ মারা যান। মার্তিনেজ আর্জেন্টিনা থেকে মে মাসে দেশে ফেরেন। তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ গোপন স্থানে রেখে দিয়েছিল। লারেনা মার্তিনেজের মাকে একটি ঢাকা ঝুড়িতে মার্তিনেজের দেহটি দেওয়া হয়। লারেনা মার্তিনেজের মাকে ফ্যাসিস্তরা ঢাকনা খুলতে বারণ করে। কিন্তু তিনি ফ্যাসিস্তদের হুমকি অগ্রাহ্য করে ঝুড়ির ঢাকনা খোলেন। তিনি দেখতে পান লারেনা মার্তিনেজের সারা মাথায় ব্যান্ডেজ, অঙ্গুলগুলো ভাঙ্গা, সর্বশরীরে ক্ষতের দাগ, সারা শরীরে আগুন সেঁকা দেবার দাগ। তেমনি কমিউনিস্ট কর্মী আলভারো বালবিকে সম্প্রতি খুন করা হয়। অন্যান্য আরো দশজনের সঙ্গে বালবিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অন্যান্যদের সাজা দিয়েছে ছয় থেকে আট বছরের জেল। আর বালবিকে পিটিয়ে জখম করে ফ্যাসিস্তরা খুন করেছে।

এখানেই শেষ নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ী বাড়ী তল্লাসি চালাচ্ছে পুলিশ। মিনাসে সম্প্রতি আরো চারজন রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাড়ীতে তল্লাসির সময়ে মার্কসবাদ সম্পর্কিত যে কোন বই-ই পুলিশ নিয়ে গেছে। সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক সেনসর শুরু করেছে। সংবাদপত্র, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে যে কোন বই সেনসর না করে প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমন কি পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত সেনসর করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, উরুগুয়েতে শিক্ষার ব্যাপারে কর্তৃত্বের ভার দেওয়া হয়েছে নাৎসী মতালম্বী ফার্ণান্দো বসের ওপর। বসকে এই ক্ষমতা দেওয়ায় দেশব্যাপী শিক্ষা জগতে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। ফ্যাসিস্তদের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে নানা ইস্তাহার, পুস্তিকা বের করছে ছাত্র-শিক্ষকরা। ঐ সব ইস্তাহারের একটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, শিক্ষাজগতের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে গুণ্ডা, বদমাইশ, মাস্তান ও বিকৃত চরিত্রের ব্যক্তিদের হাতে।

বর্তমানে উরুগুয়েতে মাস্তানদের পোয়াবারো। তাদের ধরে ধরে স্কুল-কলেজের পরিচালক বানানো হচ্ছে। অন্যদিকে সেনসরের সুযোগে যা খুশী প্রচার চালানোর এক তরফা সুযোগ পাচ্ছে ফ্যাসিস্ত সরকার। এক কথায় গণতন্ত্রকে তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে।

গ্রন্থ সমীক্ষা

গ্রাম বাংলার পথে পথে

(দর্পণের সমালোচক)

বর্ষীয়ান সত্যেন সেন ওপার বাঙলার যশস্বী লেখক এবং দীর্ঘকাল সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ইয়াহিয়াশাহীর আমলে তাঁর "আল বেরুনী" গ্রন্থটি বাজেয়প্ত হয়ে লেখকের খ্যাতিকে আরো সমুজ্জ্বল করে।

আমাদের হাতের কাছে সত্যেন সেনের "গ্রাম বাংলার পথে পথে" শীর্ষক অন্য একটি গ্রন্থ। এটি একটি রিপোর্টাজ। অবিভক্ত বাঙলায় কৃষককে কেন্দ্র করে যে সাম্যবাদী আন্দোলন গ্রাম বাঙলায়, বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে ঘটেছে, সে-আন্দোলন হাট-মেলায় জমিদার জোতদারের তোলার বিরুদ্ধেই হোক অথবা তে-ভাগার জন্যেই হোক, সেই সব সাহসিক কর্মী মানুষের প্রিয় প্রসঙ্গই এই গ্রন্থের উপজীব্য।

লেখকের ভাষায় : "যাঁরা নিজেদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ জনসাধারণের জন্য তিলে তিলে দান করে দিয়ে গিয়েছেন, গণ-আন্দোলনের পথে যাঁরা আমাদের অফুরন্ত শক্তি ও প্রেরণার উৎস হতে পারেন, তাঁদের আমরা এমন করে হারিয়ে ফেলি কেন? আমরা মহাত্মা গান্ধীকে জানি, কায়েদে আজম জিন্নাকে জানি, কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলীকে জানি, জানি দেশের গৌরব সুভাষচন্দ্রকে। কিন্তু আমাদের নিকটতম সংগ্রামী যাঁরা, যাঁরা দেশের ব্যাপক কৃষক জনসাধারণের ভাত-কাপড় আর তাদের দৈনন্দিন জীবনের বহুমুখী সমস্যার জন্য আন্দোলন করে গেছেন, তাঁদের কথা আমরা জানি না।"

লেখকের এ আক্ষেপ আন্তরিক হলেও এই বিরূপতার কারণ আমরা সকলেই জানি। জাতীয়তাবাদী নেতারা তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যেই আন্দোলন করেছেন, কৃষকের স্বার্থ তাঁদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়ার কথা নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া কৃষকের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জমিদার জোতদার মিল মালিকের ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ং গান্ধীজিই কী এই শ্রেণীগত স্বার্থের বাইরে যেতে পেরেছিলেন?

কাজেই এ-কাজ সমাজতান্ত্রিক কর্মীদেরই। এবং কমিউনিস্ট পার্টির। গ্রাম বাঙলায় কৃষক কর্মীরা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে সচেতনভাবে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সজ্ঞান হয়েছিলেন।

উত্তর বাঙলায় বিশেষ করে দিনাজপুর রঙপুরে যে ঐতিহাসিক তে-ভাগা সংগ্রাম একদা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কৃষক সমিতির অধীনে সশস্ত্র ভলন্টিয়ার তৈরি হয়েছিল। দল বেঁধে ধান কেটে চাষিরা ধান নিজেদের অওতায় এনে তার পর জমির মালিককে নির্দিষ্ট প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের আগে জমির বেশির ভাগ ধান আগে গিয়ে উঠত মালিকের খামারে, তারপর সুদে-ঋণ আদায়ের ফিকিরে চাষির ঘরে সামান্য ধানই জমা হত।

তে-ভাগা আন্দোলন সর্বপ্রথম চাষিদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই স্থানীয় কর্মীরা যে শৌর্যের প্রমাণ দিয়েছেন তাতে তাঁরা কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হয়েছেন। শহীদ তমারায়ণ, শহীদ কম্পরাম সিং, কৃষক নেতা রূপনারায়ণ, স্পন্টরাম-জয়মণি, জাল মোহাম্মদ—এমনি কত নাম!

এই আন্দোলন এবং কর্মীরা এখন ঐতিহাসিক বিষয়। সত্যেন সেন অপূর্ব সহানুভূতির সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার গৌরবের দিকটি তুলে ধরেছেন। সম্ভবত নিজেও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণেই তাঁর মমতা নিবিড় হয়েছে।

শুধু উত্তর বাঙলায় নয়, কৃষক আন্দোলন কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানায় ইতিহাস রচনা করে।

পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনের থেকে কী শিক্ষা নিয়েছেন, তার বাস্তব প্রমাণ জানা নেই। বরং এই আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে শহরে ট্রেডইউনিয়ন এবং নির্বাচনের একমাত্র লক্ষ্যে কার্যবলীকে ধাবিত করেছেন।

সত্যেন সেন কৃষক আন্দোলনের বীরত্ব-গাথা চিত্রিত করেছেন। এই আন্দোলন ঠিক কী বৈঠিক ছিল তার সমালোচনা করেননি। বীরত্ব-কাহিনীগুলির ভূমিকা স্বরূপ আন্দোলনের তাৎপর্য তিনি আজকের সচেতন পাঠককে বোঝাতে পারতেন। সম্ভবত তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

তে-ভাগা আন্দোলনের প্রকৃতি বিচার করে কমিউনিস্ট কর্মীদের কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এই আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক, জমির মালিকদের কাছ থেকে কৃষকদের কিছু সুবিধে আদায় করে নেয়া। কিন্তু কিসের শক্তিতে কৃষকেরা এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে? তার দেখেছে পিছনে রয়েছে কৃষক সমিতি। শুধু এই টুকুই? না, দাবিকে সুরক্ষিত করবার শক্তি আছে কিনা, চাষিরা সেটাও লক্ষ্য করেছে। জমি থেকে ফসল কেটে নেবার সময় তার প্রহরী হিসেবে পেয়েছে সশস্ত্র ভলান্টিয়ার অর্থাৎ গণবাহিনীকে। চাষীদের যে কোন লড়াইকে সাফল্য মণ্ডিত করতে হলে গণবাহিনী গঠন একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। আর, মালিকদের সঙ্গে এই সংগ্রামে তারা এই অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে যে, জোতদার-জমিদারের পিছনে রয়েছে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র, তার পুলিশ মিলিটারী।

এইখানেই প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক শিক্ষার, না ট্রেডইউনিয়নপাগল পার্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আমার বিবেচনায় তে-ভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কমিউনিস্ট পার্টির দূরদৃষ্টির অভাব। এবং সংগ্রামী চাষিদের রাজনৈতিক দীক্ষার দৈন্য।

প্রবীণ কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে সত্যেন সেনের কাছে এই আন্দোলনের বিশ্লেষণ প্রত্যাশিত ছিল। কারণ কমিউনিস্টরা কোনো গণ-আন্দোলনকেই ব্যর্থ মনে করেন না, তার ভুলভ্রান্তি থেকে ভবিষ্যতের পাথেয় অন্বেষণ করেন। এবং তার ধনাত্মক দিকগুলিকে কাজে লাগান। অতীতের বল-আন্দোলনের অভিজ্ঞতাগুলো সৎ কমিউনিস্টদের সামাজিক-পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রবর্তী করে। পরবর্তী আন্দোলন নতুন করে অ আ ক খ থেকে নয়, অগ্রবর্তী ধাপ থেকে শুরু হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন অতীতকে কাজে লাগায় না, আবার পুনর্মূষিকবৃত্তি ধারণ করে।

তাই লেখকের কাছে তে-ভাগা আন্দোলনের বীরত্ব-গাথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। পাঠক হিসেবে আমাদের এখানেই সন্তুষ্ট হতে হবে।*

---

* "গ্রাম বাংলার পথে পথে"—সত্যেন সেন, কালিকলম প্রকাশনী, চৌত্রিশ বাংলা বাজার, ঢাকা—এক। তৃতীয় সংস্করণ। দাম পাঁচ টাকা।

দিনেশ দাসের সাম্প্রতিক কবিতা

শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মণ্ডহীন ধরগুলি অহ্যাকে চিৎকার করে" শীর্ষক কবিপুস্তক প্রকাশিত হবার তিন বছর পর কবি দিনেশ দাসের ("কাস্তে" : দিনেশ দাস / গণতন্ত্রী প্রকাশনী / দাম তিন টাকা) লেখনীতে আবার শুনি,

"হঠাৎ নিশুতি রাতে শুনি যেন
কার হাহাকার?
মুখ আছে জিভ নেই, চোখ
আছে পাতা নেই তার!"
(শহরের সাদা অন্ধকারে)

মনে পড়ে যায়, সত্তরের একুশে নভেম্বর। আড়িয়াদহের নয়টি তরুণ তরুণের বারাসত-কৃষ্ণনগর রোডে প্রাপ্তির কথা। কিংবা অভিশপ্ত ভবানী দত্ত লেন, ডায়মণ্ডহারবার, নবগ্রাম কাশীপুর-বরানগর।

বীরেনবাবু অনুবাদক—সাংবাদিক শ্রীসরোজ দাত্তর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন,

"এ দেশে মানুষ আছে কি কেউ?
আমিই কি মানুষ?"

"কাস্তে" পুস্তকেও আবার দেখি,

"আমার দু পায়ে ঠেকে শত
মৃতদেহ
তবু তো বহেছি প্রাণ নিঃসন্দেহ
এদের অনেকে একদিন ঝরায়ে
অনেক স্বেদজল
মাঠে মাঠে পুঁতে গেছে সোনার
ফসল,
তাদের মুখের অন্ন মুখে তুলি
আজকে যখন
মনে করি প্রাণপণ
আমার কি প্রাণ আছে? যদি
বেঁচে থাকি আমি
এর চেয়ে নেই লজ্জা, নেই বড়
গ্লানি।"

"বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর জুলুম দিয়ে নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু কবর খুঁড়ছে"—কার্ল মার্ক্সের এই শিক্ষাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি বলেছেন,

"আজ যে পথে আবর্জনার
দৈবরিতা
বণিক—প্রভু, মহাপ্রভু! সবই
তোমার তৈরি তা।
দেখছি বসে দূরবীণে,
তোমায় শেষে আসতে হবে
তোমার গড়া ডাস্টবিনে।
(ডাস্টবিন)

বামপন্থী শিবির ও চল্লিশ দশকের প্রগতি লেখক সংঘের একসময়কার সদস্যরা আজ যখন অ্যাকাডেমী পুরস্কার, অর্থ তথা মস্কো ভ্রমণের লোভে "পসাতিক" ডাস্টবিনে ছুঁড়ে "ছেলেরা গেছে বনে" হাতে ধরেন, তখনও দিনেশ দাস লেখেন,

"দক্ষিণ দিক যত ইঙ্গিত দিক
দক্ষিণ হাওয়া দিক যত হাতছানি,
ও পথে বন্ধু হবে জানি রাহাজানি
উলটো মুখে চলা ঠিক
নির্ভীক।

দক্ষিণ পথে মেলে যদি দক্ষিণা
ভেবে দেখো তবু সেই পথ ঠিক
কিনা
বন্ধু তোমার পথ নয় দক্ষিণে—
বামপথ নিও চিনে।
(বামপন্থী)

মনে পড়ে, দিনেশবাবুর বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু সুকান্ত ভট্টাচার্যের ঘোষণা,

"আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু :
এক লাল পথ,
শত্রুর প্রাঘাত আর বুভুক্ষুর
উদ্দীপ্ত শপথ।"
(শত্রু এক, ছাড়পত্র)

গত ছাব্বিশে জুনের পর যাঁরা হতাশায় ভুগছেন, "কাস্তে" পুস্তক তাঁদের প্রেরণা দেবে, কারণ কবির ভাষায়,

"কেটে যাবে এই আমাবস্যার
ঘোর,
দেখা যাবে ঠিক
কাকের মুখেতে বটফল যেন—
টকটকে রাঙা ভোর।"
(লেনিন শতবর্ষে কোনো চাষী)

দিনেশবাবু বিশ্ববিপ্লবের চিন্তায় বিশ্বাসী তাইতো লিখেছেন,

"পৃথিবীর ভস্মশেষ স্তূপের
ওপর,
এবার নামবে ভোর—নতুন সকাল—
জানি জানি ভোর হবে কাল।"
(আগামী)

সত্যিই তো কম্বোডিয়া—ভিয়তনামের বিজয়ের পর বুঝতে দেরী হয় না যে, "বিপ্লবই এ দুনিয়ার জনগণের প্রধান ঝোঁক।"

"কাস্তে" পুস্তকটির প্রথম সংস্করণের এগারো শত কপি এক মাসের মধ্যে শেষ হওয়ায়, এর জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কবিতা-অবশ্যই ভালো লাগবে।

শিবাজী ভট্টাচার্য

জনসেবক কার্যালয় জবর দখল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অতুল্য ঘোষ পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের দৈনিক মুখপত্র "জনসেবকে"র বাড়ি (১০৫/৭ এ এস এন ব্যানার্জী রোড) দীর্ঘকাল ধরে মধ্য কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদের দখলে। এখান থেকে ইকনমিক টাইমসের কলকাতা সংস্করণ বেরোবার কথা যাতে 'জনসেবকে'র কয়েকজন প্রাক্তন কর্মী সহ কিছু স্থানীয় লোকের চাকরী হবে।

জানা গেছে, কিছুকাল আগে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্যের হস্তক্ষেপে ছাত্র পরিষদ নেতা শ্রীনির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা শুরু হয় জনসেবক প্রেসের মালিক জনসেবক কার্যালয় লিমিটেডের একজন ডিরেক্টর শ্রীহাজারিলাল প্রামাণিকের মাধ্যমে। শ্রীভট্টাচার্য, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বাচ্চু), শ্রীশিবশঙ্কর বসু (শিবু) শ্রীপ্রামাণিক ও কোম্পানীর চেয়ারম্যানের মধ্যে এক বৈঠকে ঠিক হয় যে, ছাত্র পরিষদের অফিস ওখান থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং ওখানে বসবাসকারী শিবু ও বাচ্চুও ১০৬/১এ এস এন ব্যানার্জী রোডের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটে উঠে যাবেন যদি কোম্পানী তাদের পাঁচ বছরের ভাড়া এবং ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য খরচ বাবদ দশ হাজার টাকা দেন।

শ্রীপ্রামাণিক বলেছেন, কথা অনুযায়ী তারা সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করেন এবং তিরিশে অক্টোবর উক্ত ছাত্র পরিষদ কার্যালয় নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যায়, ১০৫/৭এ এস এন ব্যানার্জী রোডের গেটে বেলা দুটো নাগাদ "জনসেবক কার্যালয় লিমিটেড সাইনবোর্ড'ও টাঙিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐদিন মধ্যরাত্রে শিবু, বাচ্চু ও অন্যান্য কয়েকজন ঐ সাইনবোর্ড সরিয়ে দিয়ে ঐ বিল্ডিং আবার দখল করে এবং "আই এন টি ইউ সি যুবকদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়" এই নাম গেটে লটকে দেয়।

একত্রিশ তারিখ সকালে ঘটনাটি শ্রীনির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের গোচরে আনা হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। শ্রীপ্রামাণিক সমস্ত ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

আদ্যাশক্তিমহাশক্তিকালিকাকাহিনী

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চাশ হাজার টাকা ব'লে ধরা হয়, তা হলে দু' হাজার অনুষ্ঠানের জন্য মোট ব্যয় ঠেকে গিয়ে এক কোটি টাকায়। দুর্গোৎসব বাদ দিয়ে সারা বছর ভরে অন্য আরো যা-যা পূজোর প্রকোপ চলে, ধরুন সার্বজনীন খাতে সে সমস্ত অনুষ্ঠানে আরো দু' কোটি টাকা প্রবাহিত হয়ে যায়। সংবৎসরে জননী ভগবতী এবং তাঁর আশেপাশের দেবদেবীদের উপলক্ষ করে তাহলে সাকুল্যে তিন কোটি টাকার চাহিদা। মফস্বলে শহরের পূজাপ্রক্রিয়ায় কলকাতার জৌলুষ নেই, খরচপত্রের বহরও অনেকটাই পরিসীমিত। তাহলেও যদি মেনে নেওয়া যায় যে মফস্বলে নানা সার্বজনীন পূজানুষ্ঠানে দু' কোটি টাকা ব্যয়িত হয়, তাহ'লে সারা পশ্চিম বাংলার প্রকাশ্য পীঠ বহুবিধ দেবীবন্দনার জন্য সম্পূর্ণ খরচের মাত্রা মোটামুটি পাঁচ কোটি টাকার মতো দাঁড়ায়।

এই অঙ্কের একটু-আধটু হেরফের হতে পারে, কিন্তু তুলনাগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাতে ব্যত্যয় ঘটবে না। কর্মহীন যুবকদের চাকরি দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই, বিনিয়োগের ব্যবস্থা শিল্পবিস্তারের প্রতিভা আমাদের আয়ত্তের বাইরে, আমাদের যে কোনো প্রতিশ্রুতির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ঘটবার আশঙ্কা। যুবক সম্প্রদায় অলন্দের বাইরে দাঁড়িয়ে আশায় দোলায়িত হচ্ছে, কিন্তু দু'দণ্ড বাদেই, যে মুহূর্ত নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের কাহিনী ঘোষিত হবে, তাদের প্রতীক্ষার চরিত্র বদলে যাবে: তারা হিংসায় ফুঁসবে, ক্রোধে খানখান্ করতে চাইবে অলিন্দ-প্রকোষ্ঠসুগঠিত প্রাসাদ। সেই সর্বনাশের হাত যদি এড়াতে চাই, এসো যুবকদের লেলিয়ে দিই, দেবীপূজার ভিড়িয়ে দিই, নেশায় ওরা মাতাল হয়ে উঠুক। একবার নেশায় মাতলে ওদের দিয়ে আর ভয় নেই, নেশার ঘোরে ওরা পরিপার্শ্ব ভুলবে, নিজেদের অতীত ঐতিহ্য ভুলবে ভবিষ্যৎ চিন্তা ভুলবে। এই নেশা দৈনন্দিন দিনযাপনের গ্লানিকে চাপা দেয়, খিন্নতা জীর্ণতার আলোক পরিধির বাইরে যুব সম্প্রদায়কে তুলে নিয়ে যায়, সমস্ত ভাবনাচেতনা এক উতরোল সম্মোহনে ডুবিয়ে দেয়: কাড়ানাকাড়া-জগঝম্প, হট্টগোলশঙ্খনাদদামামা-দ্রিমিকি, রক্তসদৃশসিন্দুরচর্চিতবিভা, নৃত্যগীতঅট্টহাসি উচ্চহুঙ্কার, ক্রমোত্তম-ধমনীস্পন্দনহতচকিত বিদ্যুৎবহ্নি। নেশা, ঘোর, বিষাদ ও আনন্দের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা এক অসহ্য সুখসঙ্গীত। যে ভয়াবহ পার্থিব আরতি জীবনানন্দকে মুহ্যমান করে এনেছিল, সেই শত শত শূকরের চিৎকার, শত শত শূকরীর প্রসববেদনা, কান্না-প্রেম-মোহ-অভিমান-অনুভূতি সবকিছু পিছনে ফেলে রেখে দেবীপূজার উন্মত্ত প্রস্থান। কেউ কেউ কিছু পায়, অধিকাংশ পায় না; অল্প সংখ্যক কয়েকজন ফুলে ফেঁপে অপরের মাথায় কাঁঠাল বুলিয়ে ঐশ্বর্যের তুঙ্গ পাহাড়ে চড়ে বসেছেন, অথচ অধিকাংশই সানুদেশে ধিকিয়ে-ধিকিয়ে নরকপ্রতিম জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে; শিল্পপতি সদাগরের দল মিথ্যে কথা বলছেন, জালিয়াতি করছেন, পুকুরচুরি করছেন, সমাজতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে আখের গুছোচ্ছেন, অন্যদিকে চুমুঠো অন্নের সংস্থানও বি. এসসি-এম. এসসি এম. টেক পাশ করা অগণিত ছেলেমেয়েরা করতে পারছে না; গুটিকয়েক অসাধু রাজনৈতিক নেতা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আপোষরফা করে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তে খবরকাগজে নাকি কান্নার প্রবাহ বইয়ে দিচ্ছে: একবার মহাশক্তিকালিকাপরমেশ্বরী প্রভৃতির পুজোর ফেরে ভিড়িয়ে দিতে পারলে এবংবিধ উটকো চিন্তায় মোহাবরণ আর যুবকদের জড়াতে পারবে না। শ্রেণীসংঘর্ষের ইতিকথার মধ্যে তাদের আর প্রবিষ্ট হবার উপায় থাকবে না তাহলে, তাঁরা নির্বেদ নির্মোহ মেষশাবককুলে পরিণত হবে। পূজো থেকে পূজান্তরে, এক দেবীর স্তুতি থেকে অন্য এক ভীষণতরা দেবীর স্তুতিতে, এক তন্ত্রের অজ্ঞান থেকে ঘোরতর অন্য এক তন্ত্রের গভীরতর জ্ঞানহীনতায় যুবকযুবতীরা বিহার করবে। তারা আলাদা ভাবে চিন্তা করতে ভুলে যাবে, দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা তাদের আর স্পর্শ করবে না, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিসম জৈব প্রয়োজন তারা উপস্থিত ভুলে থাকবে; সেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-কথিত নেশার মতো, তারা ভেসে, ভেসে যাবে।

অথচ, কত সস্তায় কিস্তি মাৎ দেখুন। হাজার হাজার কোটি টাকার শিল্পসম্ভার নয়, কয়েক শো কোটি টাকার বেকার ভাতা পর্যন্ত নয়, প্রতি বছর কমবেশি কোটি পাঁচেক টাকার সামান্য মামলা। যাঁরা রাষ্ট্রশক্তির হাল ধরে আছেন, শিল্পপতি উচ্চবিত্ত কৃষিব্যবসায়ীদের সঙ্গে যাঁদের নাড়ির সংযোগ, পাঁচ সাত কোটি টাকার ব্যবস্থা করা তাঁদের কাছে অতিশয় সরল ব্যাপার, চিনি বা গম বা সুতি কাপড়ের দাম একটু বাড়িয়ে দিলেই এই ঈষৎপরিমাণ টাকা তাঁদের করতলগত আমলকি হয়ে যায়। তাই গঙ্গাজল দিয়েই গঙ্গাপূজার উপচার সাজানো হচ্ছে: তৈজসাদির দাম চড়িয়ে সাধারণ লোকের কাছ থেকে বাড়তি যে-অর্থ আহরণ করা হয়, তার একটা অংশ যুবককুলকে বশীভূত করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হতে থাকে। অল্পলতার এক বিশাল বন্যা ভব্যতা সভ্যতাকে পরাভূত ক'রে বিজয়ী রাজপুত্রের মতো এগিয়ে যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্র তথা মনোবিজ্ঞান দু'পক্ষ থেকেই এই মীমাংসার সমর্থন মেলে; পাশ্চাত্যের মহাদেশাদিতে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যে-নৈরাজ্য দেখা গেছে তার আভাসটাও অনুরূপ: একবার নেশার আবর্তে নিমজ্জিত হলে বেশ কয়েকদিনের জন্য খাদ্য পানীয়ের তাগিদের বাইরে চলে যাওয়া যায়, শরীরের আদিম প্রয়োজনগুলি স্তিমিত হয়ে আসে। অবশ্য, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, স্রেফ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দিন আতিক্রান্ত করলে, দেহে কোনোরকম পুষ্টি অনুপ্রবেশের সুযোগ না থাকলে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দূতরা এগিয়ে আসবে, নেশার ঘোর আর মৃত্যুর সমাচ্ছন্নতার মধ্যে তখন আর বিশেষ তফাৎ থাকবে না, শরীরের বিভা ক্রমশ নিস্তেজ হবে, নিস্তেজ হ'তে হ'তে একদিন সম্পূর্ণ নিভে যাবে। কিন্তু কী লাভ আগে থেকে সেই মহাশ্মশানের কথা ভেবে দেশের যাঁরা হাল ধরে আছেন, তাঁদের আপাতত সমস্ত গুরুতর চিন্তার প্রবাহ থেকে মুক্তি। দেশে অন্নাভাব থাক, ক্ষতি কী; দেশে প্রতিদিন বেকারের সংখ্যা হাজারে বেড়ে যাক, কোনো ক্ষতি নেই; আর্থিক প্রগতি এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে থাক, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কোনো ক্ষতি নেই দেশ যদি চরম সর্বনাশের দিকে ধাপে ধাপে এগোতে থাকে, কারণ আমরা অক্ষত থাকবোই, আমাদের হাতে জাদুকাঠি, আমরা দেশের লোককে পুজোর নেশায় ভিড়িয়ে দিয়েছি, দেবীশক্তিআদ্যাশক্তিমহাশক্তিকালিকাপ্রলয়ংকরীপ্রলয়েশ্বরী আমাদের আশ্রয়, কোনো প্রলয় তাই আমাদের আর ছুঁতে পারবে না।

একবার চিন্তা করুন এটা ১৯৭২ সাল, মানুষ বহুসাধিত বিজ্ঞানের সাহায্যে চন্দ্রলোকে পৌঁছে গেছে, পদার্থের নিভৃততম রহস্য আজ মানুষের কুক্ষিগত, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডে ঈশ্বরের যে-কোনো অভিব্যক্তি ধূলাবলুণ্ঠিত। চিন্তা করুন, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর পঁচিশ বছর গত হয়েছে, অথচ ঐ সময়ের পরিসরে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে তো নেই ই, বরঞ্চ হ্রাস পেয়েছে, স্বনৈশ্বর্যষণ্টনের অসাম্য কমে না গিয়ে আরো বিস্ফারিত হয়েছে। চোখ মেলে দেখুন, দুর্গোৎসবকালিকাসাধনার আলোকঝলকিত মণ্ডপের ঠিক বাইরে, কী গভীর সাঁতসেঁতে অন্ধকার, দু'পা এগোলে শীর্ণ ক্ষুধাক্ষুব্ধ ভিখিরির শরীরে আপনার পা জড়িয়ে যাবে, এরকম অন্তত পনেরো লক্ষ ভিখিরি-প্রায়-ভিখিরি কলকাতায় রাস্তায়, খোলা আকাশের নিচে গ্রীষ্ম শীতে বর্ষায় বীভৎসতায় দিনাতিপাত করে যাচ্ছে। অথচ কোনো পুরুষার্থ উত্তেজিত হয় না, ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে, কাড়ানাকাড়া, শঙ্খনাদ, দেবীর রসনানিঃসৃত রক্তের বিদ্যুৎ ঝলক, দেবীকে পুজো করো, দেবীতে আনত হও, পুরুষার্থ স্তিমিত হয়ে আসুক।

স্তিমিত হয়ে আসে। সন্দেহ হয়, যাঁরা রাজনীতির লীলাকেলি খেলছেন, তাঁরা দুই স্তরে হেলুকি সাধছেন। অনবচ্ছিন্ন দেবীসাধনার অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যার গহনে হয়তো আরো এক গূঢ় অভিপ্সা নিহিত আছে। এখানেও মনোবিজ্ঞান ছায়া ফেলে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, সাংকেতিকতার সূত্রে অনেক সময় যে প্রয়াস বিধৃত, ইশারায় ইঙ্গিতে সে ধরনের কোনো প্রজ্ঞা আমাদের চেতনার উপর চাপিয়ে দেওয়া চলছে যেন। দেবীপূজা, মাতৃসাধনা, শাক্তমা ধনা, মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতীমহাভগবতীমহেশ্বরকে তদ্গতচিত্তে তর্পণ: এটা প্রসাদভিক্ষার ঋতু, সর্বস্বসমর্পণের ঋতু, অন্তর্ভক্তির ঋতু, অলৌকিকতায় বিশ্বাসের ঋতু, অন্ধ আবেশের ঋতু। যিনি এই আবেগের প্রত্যয়ের আবেশের নিষ্ঠার ভক্ত। ভরের মোহাচ্ছন্নতার অভিরূপ, তিনি কে? তিনি কি শুধুই বৈদেহী দেবকী, যাঁকে আমরা প্রতিমামৃত্তিকায়, আমাদের সঙ্কীর্ণ পার্থিবকল্পনায় সীমিত করে আনি, নাকি তিনি কোনো মানবীয়রূপা, ঈশ্বরীর রক্তমাংসবিভূষিতা প্রতিভূ? দেখে শুনে মনে হয়, বড়ো জটিলকুটিল নাটকাভিনয় চলছে, ভামাডোল, ভামাডোল, মাত্র কোটি পঁচেক টাকার সাবলীল আহুতি, অথচ কী ভয়াবহ তার প্রক্রিয়া, অন্ধমত্ত দেবীপূজাই শুধু নয়, ভারত গণ্ডীরে এক মানবীকে দেবীস্থানে প্রতিষ্ঠা করে ক্রমান্বয়ে হারে লাভের হিসেব কষা চলছে।

ভ-শ্রুতি, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, দশ কোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নাকি তাঁদের স্বতন্ত্র বিশ্বাসে প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে স্থিত থাকতে পারেন, ভারনা-চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা সংখ্যালঘু তাঁরাও নাকি পারেন। এ সমস্তই কিংবদন্তী। আসলে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে কারোরই হয়তো আর নিস্তার নেই. পৃথক চিন্তা বা বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার আশা কম, দেবীপূজায় সকলকেই ব্যাপৃত হতে হবে। জনে জনে অভয় দেওয়া হচ্ছে, জলাতঙ্কের আশঙ্কা অমূলক, দেবীকে সবাই মিলে ভজনা করো, দেবী কামড়াবেন না। আর যদি নিখোঁজ হয়ে পাও, খাঁড়ে গিয়ে দেবীর স্থান থেকে পালাতে শুরু করো, তা হলে সুকুমার রায়ের ছড়ার সেই যখানের মতো দেবী এবং তার সঙ্গীসাথিরা সবাই মিলে ছুটে এসে সত্যি সত্যি কামড়ে দেবেন। [চক্র-ক্র। ১৩৭৯]

মাদার টেরেসা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

পয়সা কষিত হয়েছে এদেশে আর্তের সেবায় বিভিন্ন কেন্দ্র মারফৎ।

মাদার বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক। বাংলা বলেন। শাড়ি পরেন। বাঙালী খাবারে অভ্যস্ত। নিতান্তই আমাদের আপনজন। উচ্চতায় ৯৫০ সেন্টিমিটার বড় জোর। অধিকাংশ মিশনারীদের মত ধর্মান্তরিত করায় তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সর্বান্তঃকরণে দুঃস্থদের সর্বাঙ্গীণ সাহায্য হচ্ছে তাঁর জীবন-দর্শন।

মাদার টেরেসার কথা লিখতে গিয়ে একটি ইংরাজী প্রবাদ মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ওরা বলে ইউ ডু নট পেইন্ট এ লিলি। মাদার টেরেসার কথাও তেমনি, যেখানে রঙ ফলানোর তুলি বুলোনোর কোন অবকাশ বা সুযোগ নেই। খ্যাতিমান লেখক ও সাংবাদিক খুশবন্ত সিংহের (কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব কতদূর?) এক প্রশ্নের জবাবে মাদার বলেন—"ওরা আমাদের বিশেষ বন্ধু। হরতালের সময়েও আমাদের কাজে বাধা পড়ে না।" সিংহজী আরও বলেন জীবনে আমি মাদার টেরেসার মত আর দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। মোক্ষম বলেছেন বিশ্ববন্দিত সাংবাদিক ম্যালকম ম্যাগারিজ। মাদার টেরেসা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন "সামথিং বিউটিফুল ফর গড।"

অজিত পাঁজা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করতে শত ঘোষ আদা জল খেয়ে লেগেছেন। এমন কি তিনি সার্বজনীন পুজোর ভসানের মিছিলেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সঠিকভাবে রাজনীতির পালাবদলের পালায় অজিতবাবুদের জোর কমে যাওয়ায় অনেক সমর্থক এখন শত-বারিদ্ধ গোষ্ঠীতে নাম লেখাচ্ছে। হাওয়া খারাপ বুঝে অনন্ত ভারতী জেলা কংগ্রেসের পাল্টা অফিসে আসাই বন্ধ করে দিয়েছেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক নবভারত প্রিন্টার্স ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ব্রজনাথ দত্তের লেন কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৪পৃষ্ঠা কার্যালয় ৬১ বি লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৪২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২১শে নভেম্বর ১৯৭৫ ॥ দাম ৪০ পঃ

ডানকুনি ষ্টেশনে চুরির আড্ডা ঃ দরজা জানালা ভাঙা ট্রেন চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সরকারের জরুরী অবস্থার বাণী কাগজে কলমে থাকলেও অনুশাসনপর্ব সাধারণ মানুষের বিবেকবোধ এবং তেলাতন্ডুল লুবণের সমস্যা জর্জর জবালাকে শান্ত করে মর্মে প্রবেশ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তাই ডানকুনি থেকে সি সি আর এর রেলের স্টেশনে চুরির আড্ডা। ডানকুনির ওয়াগন ব্রেকারের দল বাড়ছে। ডানকুনি হাওড়া কর্ড লাইনেও গভীর দরজা পাল্লা ভাঙা। যে কোনও সময় বৈদ্যুতিক তারে আগুন লাগতে পারে। খোলা সুইচ বোর্ড বিপদ সংকেতহীনভাবে মাথার কাছে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু চাবি।

ডানকুনি লাইন রেলের চলাচলে উন্নতি হলো না এপর্যন্ত। জরুরী অবস্থার তুলব পেয়ে যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল তা এখন স্তব্ধপ্রায়। দেরীর ট্রাডিশন চলছে চলবে। স্থানীয় ক্লাব প্রোগেসিভ কলচারাল সোসাইটি এবং ডানকুনি উন্নয়নী বার বার রেল বিভাগকে লিখেও সুফল পায়নি। রেলে চুরি এবং ডানকুনি স্টেশনে আলোর অভাব এবং দু মাইল দূরে বাস দাঁড়ানোর সমস্যার জন্য হুগলী জেলা শাসককে চিঠি লেখা হয়েছে, এখনও উত্তর নেই। জানালেন ডানকুনি উন্নয়নীর রতন শেঠ।

প্রোগেসিভ কালচারাল সোসাইটির জালাল আহমদ ডানকুনি স্টেশনে দুটি টিকিট কাউন্টার এবং স্টেশন এলাকায় মোষের ও শুয়োরের খাটাল তুলে দিতে বলেন। যাত্রীরা অল্প ইন্ডিয়া রেল প্যাসেঞ্জার কংগ্রেস গড়েছেন। এরা রেল মন্ত্রী সফি কুরেশীকে রেল কনশালটেটিভ কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি নিতে অনুরোধ করেছেন বলে রতন ঘোষ জানান। ঐ রেল কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক নাজিউদ্দীন আহমদ বলেছেন তারা রেল প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে চান সরকারের সহায়তা পেলেই কাজ হবে। আশেপাশে রেল প্রতিরোধ প্রতিরক্ষা বাহিনী নেই। সম্প্রতি রেল মন্ত্রক প্রোগেসিভ কালচারাল সোসাইটিকে জানিয়েছেন কাছাকাছি হাওড়া আমতা হাওড়া শিয়াখালা ব্রডগেজ লাইন বসলে তাদের সমিতির সাহায্য নেওয়া হবে। রেল বোর্ড একটু নজর দিলেই ডানকুনি রেলনগর এবং রামচন্দ্রপুরে দৈনিক হাজার হাজার টাকার রেল সম্পত্তি চুরি ও ধ্বংস রোধ করতে পারেন।

সদ্য গঠিত অল ইন্ডিয়া রেল প্যাসেঞ্জার কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন মৈত্রেয়ী দেবী, এ এইচ মন্ডল এম পি, ভারত চেম্বার সম্পাদক কে এল দে মহাশয়। রেল প্যাসেঞ্জার কংগ্রেস খোলা নিয়ে শিয়ালদহ ডানকুনি এবং হাওড়া বর্ধমান রেলের কামরায় যাত্রীদের থেকে অভিযোগ এবং তার সমাধানের কথা শুনবেন। এবিষয়ে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ অ্যাডভোকেট কিউ আহমদ সম্পাদক, অথবা বৃন্দাবন চক্রবর্তী, অধ্যায়ক, এ আই আর পি সি ডাকঘর আকুনী চাঁদবাটি হুগলী জেলা অথবা রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, ডাকঘর হরিপুর, হুগলী। ঐ সমিতি নিয়মিত রেলমন্ত্রককে অনুরোধ করে যাবে রেল সম্পত্তিকে ক্ষতি থেকে কিভাবে বাঁচানো যায় এবং যাত্রীদের বোঝাবে। ইতিমধ্যেই সমিতি চলন্ত ট্রেনের মধ্যে সভা করে এবং মতামত নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। সমিতি হাওড়া আমতা শিয়াখালা লাইনে ব্রডগেজ ট্রেন তৈরী সম্পর্কে দ্রুত কাজ চালাতে এবং পরিত্যক্ত জিনিসপত্র কাজে লাগাতে অনুরোধ করেছে।

কল্যাণী লোকালের জনৈক যাত্রী সম্প্রতি দর্পণের কাছে অভিযোগ করেছেন যে কল্যাণী লোকাল, নৈহাটী লোকাল এবং শিয়ালদহ—শান্তিপুরগামী ট্রেণ) প্রত্যেকটি বৈদ্যুতিক ট্রেনেরই ভাঙচুর অবস্থা। ট্রেনের অনেকগুলি কামরায় বসবার সিট নেই। অধিকাংশ কামরায় আলো পাখা কিছুই নেই। তার ওপর কামরার দেয়ালের প্লাইউডের কাঠগুলি কারা ভেঙে নিয়ে গেছে। ফলে বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক তারগুলি বেরিয়ে পড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে আলোহীন কামড়ায় যে কোন যাত্রীর বিপদের আশঙ্কা। কল্যাণী লোকালে সম্প্রতি এরকম একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভূমিহীনদের বাস্তুজমি বণ্টনের বিচিত্র রহস্য

জেলায় জেলায় বহুচাষী বাস্তুচ্যুত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মতে এই রাজ্যে ভূমিহীনদের বাস্তু জমি বণ্টনের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে গত দোসরা অক্টোবর। প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী সাফল্যের হাসি হেসে সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন, রাজ্যে আর ভূমিহীন নেই। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও এই সগর্ব ঘোষণা করতে পারেন নি, যদিও তিনি বলেছেন, সারা ভারতে মোট পাঁচ লক্ষ ভূমিহীনকে বাস্তু জমি দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ঘটনাটি যদি সত্য হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা পঞ্চাশ ভাগ মিটে যাওয়ার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি ঘটেছে? অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে, অনেক ভূমিহীন গরীবই বাস্তুর পাট্টা পায়নি, যে সব ভূমিহীন দীর্ঘদিন ধরে অন্যের জায়গায় বসবাস করছেন, তাদের জমির মালিকরা উচ্ছেদ করে দিচ্ছে, তাছাড়া দু একটি ক্ষেত্রে যাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র বাস্তুজমি দেওয়া হয়েছে, তারা অনেকেই ঘর বাড়ী তোলবার জন্য কোন সরকারী অর্থ সাহায্য পাননি।

সি পি এমের কৃষক সভার জনৈক প্রতিনিধি হুগলী জেলায় বাস্তু জমি বণ্টনের অবস্থা পরিদর্শন করে এসে জানাচ্ছেন ঃ হুগলী জেলার চারটি মহকুমার ছয়টি থানার সাতটি গ্রাম পরিদর্শন করে দেখলাম এখানে দুশো ছত্রিশটি পরিবার বাস্তুর কোন পাট্টা পায়নি। এদের মধ্যে একশ উনষাটটি পরিবার অন্যের জায়গায় ঘরবাড়ী করে অনেকদিন ধরে বস করছেন, কিন্তু কোন সত্ব নেই। উনিশশো উনসত্তর সালে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার যে বাস্তু আইন পাশ করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল, দুই একর বা তার কম জমির গরীবরা যারা অপরের জায়গায় ঘরবাড়ী করে উনিশশো উনসত্তর সালে এগারোই আগস্ট পর্যন্ত অন্তত তিন বছর বসবাস করছেন তাদের মোট বাস্তুর অনুর্ধ পাঁচ কাঠা জায়গায় স্থায়ী সত্ব দেওয়া হবে। সরকার যদি এই আইনকেই কার্যকরী করার চেষ্টা করতেন, তাহলে বাস্তুহীনদের একটা বড় অংশই জমির সত্ব পেয়ে যেতেন।

বর্তমান বাস্তু থেকে সরিয়ে অন্যত্র পাট্টা দেবার ফলে দিহিবাতপুর, জাঙ্গীপাড়া, মুড়িগাছি কন্দর্পনগর, হাউসি, বৈদ্যপুর জান্দা প্রভৃতি অঞ্চলে যারা দীর্ঘদিন বসবাস করছিলেন, তাদের নতুন বাস্তুতে ঘর তোলার কোন ক্ষমতা নেই। এরা অনেকেই দুবেলা পেট পুরে খেতে পান না। বর্তমান বাসস্থানের গ্রামে অনেকেই এক

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত সেন্সরশিপের প্রতিবাদ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের ওপর যে সরকারী সেন্সারশিপ আরোপিত হয়েছে, তার প্রতিবাদ করেছে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস। এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে উক্ত সংস্থার "দি ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট" নামক মুখপত্রের অক্টোবর সংখ্যায়।

ফেডারেশন গত চৌঠা জুলাই এই সেন্সারশিপের প্রতিবাদ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে। এর পর গত ছয়ই এবং সাতই সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের দুদিন ব্যাপী এক সভায় এই সেন্সারশিপের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাবাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার যেভাবে স্বীকৃত তার ফলে একচেটিয়া সংবাদপত্র মালিকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যথেষ্ট বেড়েছে। এবং সেন্সারশিপর ফলে একচেটিয়া সংবাদপত্রের চাইতে ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির দুর্দশাই বেশী। এছাড়া আরও বলা হয়েছে যে সেন্সারশিপের লক্ষ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য, তার কারণ আমলতান্ত্রিক কর্মকান্ডে সেন্সারশিপ সংবাদপত্রের ওপর নির্যাতন এবং খামখেয়ালী চরিতার্থতার মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফেডারেশন কর্তৃক গৃহীত পাঁচটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, (এক) সাহস এবং অনুরূপ তৎপরতার সঙ্গে সেন্সারশিপ দ্রুত প্রত্যাহার করতে হবে, (দুই) বৃহত্তর জনসাধারণের ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে রূপদানের জন্য সংবাদপত্রকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমের শিক্ষা দিতে হবে, (তিন) সংসদকে অবিলম্বে সংবাদপত্রের মৌলিক সংস্কার অর্থাৎ একচেটিয়া মনোভাবের নিয়ন্ত্রণ এবং সংবাদপত্রকে একচেটিয়া মালিকের হাত থেকে কর্মরত সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের কর্মীদের পেশাদারী নিয়ন্ত্রণে আনা হক, (চার) সংবিধানের উনিশ ধারার সংশোধন ঘটিয়ে সংবিধানকে "সম্পত্তিহীন গণতন্ত্র" (প্রোপার্টিলেস ডেমোক্রাসি) আখ্যা দিতে হবে। কোন সংবাদপত্রকেই কোন একক ব্যক্তির মালিকানায় রাখা চলবে না, পাঁচ) উল্লিখিত প্রস্তাব কার্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম স্বাধীনভাবে করতে দিতে হবে।

বেকার যুবকরা সরকারী ঋণ পাচ্ছেন না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য সরকার বেকার ও শিক্ষিত যুবকদের মাছ চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমিত আছে। গ্রামে গঞ্জের সত্যিকার উপযুক্ত উৎসাহীদের মাছ চাষের জন্য টাকা না দিয়ে ডোবায় ইলিশ মাছ তৈরীর গবেষণাতে কিংবা আমদানীকৃত মাছের পরিমাণ বাড়িয়ে শহরের অভাব মেটাতেই সরকার ব্যস্ত। গ্রামে ব্লক অফিসে মৎস্য দপ্তর তথা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের উদ্যোগ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে কিছুই জানা যায় না। মেদিনীপুরের বালিচক এলাকায় মনুজ সেন বললেন মাছ চাষের জন্য যে সাত হাজারের মত টাকা সরকার ঋণ দেবেন বলেছিলেন তা হাজার দরখাস্ত করেও পাইনি। হুগলীর চন্ডীতলা ব্লক এক আকুনী ইদ্রিসর-এর কামালউদ্দীন বলেন, তিনি বি এ (অনার্স) পাশ করেছেন, পাঁচটি পুকুর ভাগে করেন। ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রীকে লিখে একটি সমবায় সমিতি গড়ে টাকা চাইলেন, চিঠির উত্তর নেই।

পশুপালন দপ্তরের অবস্থাও তথৈবচ। তাহেরপুর, নদীয়ার নাজিম বিশ্বাস, এম এ পাশ। বেকার। পাটুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় তিনি গরু ও মহিষ পালনের জন্য সরকারের কাছে ঋণ ও অনুদান চেয়ে হতাশ হয়েছেন। পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য, অথচ শ্রম দপ্তরের কাজেই তিনি ব্যস্ত আছেন বলে পশুর ব্যাপার দেখার সময় নেই। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রচার সচিব এস কে মিশ্র মশাটে বলেছেন তাঁরা পাঞ্জাব থেকে ভালো জাতের মহিষ কিনে সাধারণ লোককে ধার দেবেন। দুধ বেচে তারা টাকা দেবে। তার মতে রাজ্য সরকারের পশু পালন দপ্তর এ বিষয়ে বেকার ও অন্যদের পশু ক্রয় করে দিয়ে সাহায্যের জন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলেননি। এমন সরকারী প্রস্তাবও নাকি শোনা নেই। জয়নাল আবেদিন সাহেব ও প্রদীপ ভট্টাচার্যের দপ্তর থেকে চিঠির উত্তর অসেনি বলে অনেক বেকার আমাদের জানিয়েছেন।

এবারের কালীপুজো ও কংগ্রেসী রাজনীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি আবার নির্বাচনের জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। গত উনত্রিশে আগস্ট দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যসচিব সম্মেলনে এ ব্যাপারে জোর আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনী কমিশনারের মাত্র 'তেত্রিশ দিনের নোটিশে'র কথাটা শুনে ব্লক কংগ্রেস অফিসগুলোতেও তৎপরতা বেড়েছে। এর প্রতিফলন শ্যামার উদ্বোধনেও দেখা গেছে।

কেষ্টবাবুর পুজোর উদ্বোধনে এলাকার এম. এল. এ সোমেন মিত্রকে দেখা গেল না। অবশ্য কোনো বছরেই থাকেন না। আগামী বছর কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হলে কেষ্টবাবুকে নাকি কাউন্সিলার করা হবে। জরুরী অবস্থায় প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও কর্পোরেশনের বিধি নিষেধ অনুযায়ী ঐ রাস্তায় পুজো হতো না, প্রতিমাও দু-একদিনের বেশ থাকার কথা নয়। কিন্তু ঐ যে প্রবাদ আছে, মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। ঐ খুঁটির জোরে সব কিছুই হচ্ছে।

এদিকে চেতলা পার্কে অনুষ্ঠিত চেতলা ব্যায়াম সমিতির পুজোর স্থানীয় এম. এল. এ শ্রীকানাইলাল সরকারকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডাকের কথা, কমিটিতেই নেওয়া হয়নি। তপনবাবু চেতলার যুব কংগ্রেসী নেতা ও কানাইলাল সরকারের বিরোধী।

পার্কে পুজো করতে হলে কর্পোরেশনের অনুমতি প্রয়োজন। সেই বাহাত্তর সালের মার্চ মাসে বর্তমান সরকার কর্তৃক কর্পোরেশন বাতিলের পর থেকেই কলকাতার তেইশজন এম. এল. এ কর্তৃক দুজন মনোনীত ব্যক্তিকে দিয়ে একশোটি ওয়ার্ড দেখাশুনো করা হচ্ছে। এ কারণে চেতলা পার্কে ঐ পুজোর অনুমতির জন্য পুজোর উদ্যোক্তারা ডাঃ সরকারের কাছে যান। কিন্তু ডাঃ সরকার পার্কে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর অসুবিধে হবার অজুহাতে অনুমতি দেন না। কিন্তু তাঁরা যথারীতি পুজো করেন। কোন খুঁটির জোরে তাঁরা পুজো করতে সাহস পেলেন?

শ্রীঅজয় মুখার্জীর এককালের ডান হাত, পরবর্তীকালে সুকুমার রায়ের বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য এই সুযোগে কমিটির সভাপতি হয়েছেন। শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর মারফৎ প্রধানমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে পাঁচশো টাকা দান করে, কানাইবাবু প্রধানমন্ত্রীর সনজরে আসতে চেয়েছেন। সি. পি. আই নেতা শ্রীমণি সান্যালের নামও শ্যামা মায়ের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে দেখলাম। ঐ আলিপুর কেন্দ্রে এবার নাকি যুব কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীশোভনদেব চট্টোপাধ্যায় দাঁড়াবেন। তাই শোভনদেববাবু রাসবিহারী মোড়ে তিলক করের। পুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারলেও চেতলা পার্কে গেছেন।

প্রিয়-ব্রত-সুদীপ-শোভনদেব কলকাতার বহু জায়গায় পুজোর উদ্বোধন করেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রীশঙ্কর ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ শ্রীসুদীপ ভট্টাচার্য ও তরুণ আবেদিনও ছিলেন। ছাত্র পরিষদ সভাপতি শ্রীকুণাল ভট্টাচার্যকে কোথাও দেখা যায়নি। মনে হচ্ছে যে, গত মে মাসে উত্তরবঙ্গের বন্যের পর তাঁর সঙ্গে নেতৃত্বের যে বিরোধ হয়েছিল এখনও তার জের চলছে।

শোনা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে পুজো সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাশুনা করার জন্য একজন মন্ত্রীকে নাকি ভার দেওয়া হবে। বর্তমানে শ্রীব্রত মুখার্জী বেসরকারী ভাবে এই দফতরের মন্ত্রী। তিনিই এ বছর থেকে দুর্গাপুজোর সরকারী পুরস্কারের বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু পুরস্কার দেবার ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেসীদের ক্ষোভ আছে। অনেকের মতে, তিনি তাঁর কেন্দ্রস্থ লেক ভিউ রোডের বালিগঞ্জ কালচারাল এসোসিয়েসনকে প্রথম ও একডালিয়া এভারগ্রীন ক্লাবকে দ্বিতীয় পুরস্কার দিয়ে সুবিচার করেননি। এদিকে রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ এই পুরস্কারের দিকে তাকিয়ে বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনী প্রদর্শন করেছেন এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। আর বাগবাজারকে তো পুরস্কার দিতেই হবে। নইলে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না।

বছর চারেক আগেও কলকাতায় বড় কালীপুজো বলতে ছিল একমাত্র শ্মশানকালী, কেওড়াতলায়। ইদানিং ক্লাবের বা জায়গার নামে নয়, পুজোওলা ব্যক্তির নামে পরিচিত হয়েছে। প্রত্যেক পুজোর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে থাকছেন স্থানীয় থানার ও. সি। যুবকদেরকে বিপথে চালাবার সবরকম চেষ্টাই হচ্ছে। গত দু বছর কলকাতায় জগদ্ধাত্রী ও কার্তিকপুজো যে ভাবে শুরু হয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে এখানে প্রতিক্রিয়ার শক্তি কতখানি।

এবারে চাঁদার জুলুম অন্য বছরের তুলনায় কম। কিন্তু প্রত্যেকটি পুজোর বাজেট বেড়েছে। স্যুভেনিয়ারে "একুশ দফা কর্মসূচী সফল করুন" লিখে অনেক অনিচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকেও বিজ্ঞাপন পাওয়া গেছে। ভূগর্ভ রেলপথের ব্যানার পুজো মণ্ডপের সামনে টাঙিয়ে টাকা এসেছে। বড় বাজারের বহু ব্যবসায়ী পাড়ার মাস্তানদের হাতে রাখার জন্য মোটা টাকা দিয়েছেন। উপরন্তু হ্যারিসন রোডের মেহেবুব ব্যান্ডের তিন-চারটে দলকে আনার ভার নিয়েছেন। সেই বাহাত্তর-তিয়াত্তর সালের মত বাগড়ি মার্কেটের সামনে অনশনের প্রহসনটুকুও যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা করে রাখছেন।

সার্কাসের বাঘকে যেমন না খেতে দিয়ে নির্বীর্য করে আফিম খাইয়ে খেলানো হয় তেমনি সকাল আটটা-নয়টার সূর্যের মতো ভাস্বর দেশের যুব সম্প্রদায়কে, শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তদেরকে ধর্মের ঘোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে রাখা হচ্ছে। কালীপুজোর দিন সকালে ট্যাংরার চীনে পাড়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিশ-পঁচিশ জন চীনে যুবক কালীপুজো করেছেন, স্বজাতিদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে, মাইকে "জুলি, আই লাভ ইউ" গান হচ্ছে আর সমস্ত ছেলেরা বিকট অঙ্গভঙ্গী করে নাচছে। বুঝতে দেরী হল না যে, কেন এখনও ট্যাংরার নয় হাজার চীনে চিয়াং কাইশেকের গুনগান করে, বেঙ্গল বিড়লা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির গড়ার জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করে, বিড়লা চ্যারিটি ট্রাস্ট মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দির আলোকিত করার দায়িত্ব নেয়।

হ্যাঁ আচার্য বিনোবাজীর মতে গত ছাব্বিশে জুন থেকে চলছে "অনুশাসন পর্ব"। হ্যাঁ, সবকিছুই জনসাধারণের কাঁধে বোঝা বাড়াবার জন্যই। নতুবা দুর্গাপুজোর সময় আইন করা হল যে, "নির্দিষ্ট দিনেই বিসর্জন দিতে হবে।" অথচ এবারে বহু জায়গাতেই প্রতিমা দশ-বারো দিন ছিল এবং প্রায় মেলা বসিয়ে চুনোপুটিদের ভাগের টাকা উঠে গেছে। আগামী অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে নাকি একজন যুব কংগ্রেসী নেতা বিরাট ইতুপুজো করবেন বলে মনস্থ করেছেন। মধ্য কলকাতার ফ্ল্যাসটিকের গেটকে টেক্কা দেবার জন্য তিনি নাকি কাঁচের গেট করবেন। মা তাদের সহায়।

বাস্তু জমি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিঘা জমি ভাগে করেন, দীর্ঘদিনের পরিচিত জায়গায় একরকম করে অন্নের সংস্থান করা যায়, কিন্তু পুরোনো বাস্তু ছেড়ে অপরিচিত জায়গায় জীবিকার অনিশ্চয়তা রয়েছে।

বাসস্থানেই সত্ব না দেওয়া এবং জমি থেকে উৎখাত নিষিদ্ধ করার আইন চালু না হওয়ার ফলে বিষ্ণুবাটি, বাগনান, কুচপালা বালিগোড়ি, গোপীনগর রাজবলহাট ইত্যাদি অঞ্চলের অনেক নিরাশ্রয় গরীবই বাস্তু থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন।

এছাড়া ভূমিহীন বা বাস্তুহীন নয় এমন অনেক ব্যক্তিকেও নতুন করে বাস্তুজমি দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত পনেরোই আগস্ট ধনেখালি থানার নপাড়া থানায় এরকম একটি কান্ড ঘটিয়ে এসেছেন ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী গুরুপদ খাঁ স্বয়ং। এখানে রাধাকান্ত পাকড়ে ও তিনকড়ি পাকড়ে সত্তর শতক উঁচু জমির সবটার স্থায়ী পাট্টা পেল। এরা হলো পূর্বপুরুষ জমিদারের নায়েব। সকলেই চাকরী করে এবং অবস্থাপন্ন।

জমি থেকে উচ্ছেদ হবার ভয়ে আতঙ্কিত, এই রকম বাস্তুহীনের সীমা সংখ্যা নেই। ধনেখালি, দাদপুর, তারকেশ্বর, কোকাবচক হরিপাল, পুড়সুড়া, জগদীপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের বাস্তুহীনদের যে সব দুর্গম স্থানে বাস্তু দেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশ জায়গাতেই বাস্তুহীনরা আরও অভাবের মধ্যে পড়বেন বলে ঘর তুলতে সাহস করেন নি। ধুলোসিমলা, বড়গাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক কৃষকেরই বন্ধকীতে জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে, এরা অন্যের জমিতে বসবাস করছেন, কিন্তু কোন পাট্টা পান নি। কালিনগর, জগদীশপুর করাতবেড়িয়া, তেহট্ট, ধানাবাই কীটবেড়িয়ায় অনেকের বাস্তুজমি থাকা সত্ত্বেও আরও জমি পেয়েছে।

উলুবেড়িয়ার কালিনগর অঞ্চলের কেষ্ট দাস দীর্ঘ পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে সাড়ে চার বিঘা জমি ভাগে চাষ করতেন। তার অন্যত্র কোন জমি নেই, ভাগেও আর জমি চাষ করেন না। তাকে বণ্টন করা হল মাত্র দুই বিঘা, বাকী আড়াই বিঘা কেটে নেওয়া হল। সেই মত ধ্রুব দলুই ভাগে চাষ করতেন ১.৬৬ শতক। তিনি একজন গরীব চাষী তাকে বণ্টন করা হল মাত্র আশি শতক। এইসব জমি কেটে নিয়ে কালিনগর অঞ্চলের বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী ও রেশন ডিলার মদন ঘোষকে দেওয়া হল। তাকে আড়াই বিঘা জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভাই স্বপন ঘোষকে দেওয়া হয়েছে ষোল শতক জমি।

অন্যদিকে দার্জিলিং-এর তিহান্না চা বাগানের তিনশো দশটি পরিবারকে অন্যায়ভাবে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। চা-বাগান কর্তৃপক্ষ বহুদিন থেকেই এই সব ভূমিহীন কৃষক খেত মজুরদের হটানোর চেষ্টা করছিল, জরুরী অবস্থা ঘোষণার আটদিন পর এক সরকারী নির্দেশে সমস্ত কৃষক পরিবারকে জমির দখল ছেড়ে দিতে বলা হয়।

বর্ধমানের আসানসোলের অনেক বাস্তুহীন পরিবারেই জমির পাট্টা পেয়েছেন, জমি পাননি। আবার কারও কারও জমি বাসস্থান থেকে দু তিন মাইল দূরে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এর কোনটাই সুষ্ঠু পুনর্বাসন নয়। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকেই এই একই খবর আসছে। এই হল বাস্তুজমি বণ্টনের নমুনা।

ফলে বাস্তুহীনদের অবস্থা সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু তাড়হুড়ো আর বাজার সরগরম কথাই শুনেছে সবাই।

জিনিসপত্রের দাম এখন আগুন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পুজোর মরশুম চলে গেল, শীত এল; অথচ দৈনন্দিন জিনিষপত্রের দাম এক কৌটোও কমল না। বরং কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম এবারে রেকর্ড সৃষ্টি করল। পুজোর মরশুমে জিনিষপত্রের দাম অনেকেই মেনে নেন, তার পরে সবলেরই শূন্যহাত। এরপরে দাম বাড়লে মানুষের মাথায় হাত পড়বেই।

সেরা সব্জীর মরশুম শীত। গত দু এক সপ্তাহে শীত জেঁকে বসেছে। বাজারে এখন নতুন সব্জীর আনাগোনা। তবু দাম পড়ছে না, বরং বাড়ছেই। প্রধানমন্ত্রীর মতে জরুরী অবস্থার পরে জিনিষপত্রের পাইকারী দর শতকরা আট ভাগ কমেছে। অথচ খোলা বাজারে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। তাহলে এর মধ্যবর্তী রহস্যটা কি?

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাজারে আলুর দর এক টাকা সত্তর থেকে আশি পয়সা কেজি। পিঁয়াজ তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা। আগাম মরশুমের ফুলকপির পসরা উঠে গেছে, তা সত্ত্বেও দূরবীক্ষণে ধরা পড়ে এরকম সাইজের একটি ফুল কপির দাম দেড় টাকা থেকে দু টাকা। দোকানদারকে কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে: মাল নেই। বাজারও তেমন জমজমাট নয়। দশ পয়সার কাঁচা লঙ্কা কিনতে চাইলে দোকানদার তেড়ে আসে। মাছ বাদ দিয়ে ডিম খেতে গেলে দাম পড়বে জোড়াপ্রতি এক টাকা তিরিশ থেকে চল্লিশ পয়সা। মশলাপাতির দাম আগুন। অনেক বাড়ীতে মাসিক বাজারের রেওয়াজ উঠে গেছে। যখন যেমন দরকার সামান্য এনে রান্নার কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। কিছু কিছু জিনিসের দাম রোজই উঠছে নামছে, তাই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

সংশোধিত রেশন এলাকার 'মুষ্টির ভিক্ষে' রেশনে চিনি পান নি। অন্য দিকে ভুয়া রেশন কার্ড আবিষ্কারের জোর তৎপরতা চলছে। দিন কয়েক আগে জনৈক বাসযাত্রী অভিমত প্রকাশ করলেন: কেউ পাঁচটা ভুয়া রেশন কার্ড রাখলেও তার বাইরে থেকে চাল কিনতে হচ্ছে, পেট ভর্তি খাবার দিয়ে আইনের চাতুরী দেখালে তবু মানায়। অন্য একজন যাত্রীর টিপ্পনি কাটলেন: এবার থেকে টেলিভিসনের ছবিতে আলুর চাষ দেখে পেট ভরাবেন। বাজার থেকে আলু কেনার দরকার কি?

শিয়ালদহ অঞ্চলের জনৈক আপেল বিক্রেতা ক্রেতাদের বশে আনবার জন্য সম্প্রতি স্লোগান তুলেছেন: পেঁয়াজের চেয়েও সস্তা,

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

ন্যাটোচক্রের বিপুল সমরসজ্জা

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সামরিকচক্র কীভাবে সমরসজ্জা করে যাচ্ছে তার চাঞ্চল্যকর তথ্য ন্যাটোর পত্রিকা নাটো রিভিউ পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি বড় বড় নাটো দেশের মোট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া হল। সংশ্লিষ্ট নাটো দেশে উনিশশো একাত্তর সালে সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১০৪৩৯৮ মিলিয়ন ডলার, উনিশশো বাহাত্তর সালে ৯০৫০১৭ মিলিয়ন ডলার, উনিশশো তিয়াত্তর সালে ১২৯০৯৯ মিলিয়ন ডলার, উনিশশো চুয়াত্তর সালে ১৩১৬০৯ মিলিয়ন ডলার। আর একটি তথ্যে জানা যায়, ন্যাটো চক্র তার জন্মের পঁচিশ বছরে শুধু সামরিক খাতেই ব্যয় করেছে দু লক্ষ কোটি ডলার।

পশ্চিম জার্মানির বিশিষ্ট পত্রিকা স্টার্ণের এক তথ্যে জানা যায় যে, ন্যাটো দেশগুলি একটি আন্তর্জাতিক নাটো সৈন্যবাহিনী পালন করে। ন্যাটোর সৈন্যের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার, বারো হাজার চারশ ট্যাঙ্ক; নয় হাজার তিনশতটি প্লেন, ষোলশ যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিন রয়েছে। এছাড়া, বিপুল পরিমাণ নানাধরণের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নাটোর হাতে রয়েছে। শুধুমাত্র য়ুরোপেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাত হাজার দুশোটি পারমাণবিক সমরাস্ত্র রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রের মোট শক্তি আট হাজার মেগাটন। উনিশশো পয়তাল্লিশ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোসিমায় যে আণবিক বোমা ফেলেছিল তার চেয়ে এই শক্তির পরিমাণ হল ছয় লক্ষ পাঁচ হাজার গুণ বেশি।

ন্যাটো চক্রের এই সুবিপুল শক্তি যে য়ুরোপ তথা বিশ্ব শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক সেকথা না উল্লেখ করলেও চলে। এখানে ন্যাটো চক্রের পাণ্ডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়ের একটা নমুনা দেওয়া গেল। উনিশশো একাত্তর সালে মার্কিন দেশের সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল চুয়াত্তর হাজার অষ্টশত বাষট্টি মিলিয়ন ডলার; উনিশশো বাহাত্তর সালে বেড়ে হয় সাতাত্তর হাজার ছয়শত উনচল্লিশ মিলিয়ন ডলার; উনিশশো চুয়াত্তর সালে চুরাশি হাজার তিনশত বত্রিশ মিলিয়ন ডলার। সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর উনিশশো পচাত্তর-ছিয়াত্তর সালের ব্যয় একশ চরলক্ষ সাতশত মিলিয়ন ডলার করার জন্য রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে সুপারিশ করেছে এবং ঐ অর্থের মধ্যে তিরিশ হাজার তিনশ মিলিয়ান ডলার অস্ত্র-ক্রয়ের জন্যে বরাদ্দ করেছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রতিবছরই ন্যাটো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ বেড়ে যাচ্ছে। এটা যে শান্তির পক্ষে নয় এটা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে, ন্যাটোচক্র যেভাবে পৃথিবীর চতুর্দিকে সামরিক ঘাঁটি নতুন করে গড়ে তুলছে তাতে ন্যাটোর যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন ইচ্ছে নেই সেটা স্পষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভরত দরিয়ায় দিয়াগো গার্থিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নতুন সামরিক ঘাঁটি তৈরী করে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর শান্তি বিঘ্নিত করতে চায়।

সংখ্যালঘু নারীদের সমস্যা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্ব নারীবর্ষ শেষ হতে চললো অথচ কলকাতার বাঙলা বা ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র কেউই মুসলমান নারীর সমস্যার কথা তুলে ধরেননি ঠিকমত। তেমন প্রবন্ধও ছাপা হয়নি। আলোচনা হয়নি। এ-বিষয়ে আকাশবাণী এবং টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ নীরব। অথচ মুসলমান সমাজের বিবাহ আইন নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ দুপাতা প্রবন্ধ ছাপতে উৎসাহ অনেকের। সংখ্যালঘু ও অনুন্নত নারীর সমস্যা সম্পর্কে কলকাতায় এক সেমিনার হবে। ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ফেডারালিস্ট এবং অন্য কয়েকটি সংস্থা ঐ সভার আয়োজন করেছে। দিল্লী টাউন কমিটির রাজ উষা চোপরা উদ্বোধন করবেন। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী এবং উত্তর প্রদেশের সংখ্যালঘু ও হরিজন দপ্তর মন্ত্রী আর কিদওয়াইয়ের উপস্থিত থাকার কথা আছে। সহযোগিতা করবে ভারত চেম্বার অফ কমার্স। যোগাযোগের ঠিকানা ওয়ার্ল্ড ফেডারালিস্ট সমিতি পনেরো, পার্ক স্ট্রীট (এ পি জে হাউস) কলকাতা ষোলো।

বর্তমানে যেসব সংখ্যালঘু নারীর বেশ কয়েকজনকে নিয়েই মতামতি, তারা হয়তো কোনও রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক সংবাদ পত্রের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন খোদ কলকাতায়। অথচ এঁদেরকেই ধরা হয় সমস্ত বাঙলার সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর নারীর মুখপাত্র। তাই খোলখুলি আলোচনা দরকার। সংখ্যালঘু নারীকে দূরে সরিয়ে রেখে সমস্যা সমাধান হবে না। সমস্যার মূল উৎস খুঁজতে তাদেরও মতামত নিতে হবে। শুধু খদ্দি বোর্ডে বিশেষ মুসলিম নেতার কন্যাকে সভ্য করে এবং অন্যত্র বিশেষ নেতার বোনকে মেম্বার করে বরং সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। চাই সমস্যা সমাধান। নীচুতলার নারীর সমস্যা সমাধান।

সমাজবিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুলিশী জুলুম চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ক্ষমতা লোলুপ ধান্ধাবাজরা পঞ্চায়েতের কর্তা কিংবা মোড়ল থানা কমিটির সেক্রেটারী আর জি পার্টির আহ্বায়ক হয়ে গাঁয়ে ফুঁদে ডিকটেটর হচ্ছেন বলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও থানা থেকে দর্পণ অফিসে বিভিন্ন সময় মারাত্মক সব অভিযোগ এসেছে। স্বভাবতই গ্রামের লোক এদের অত্যাচারে বিব্রত ভীত ও বিক্ষুব্ধ। নদীয়ার পাটুয়াভাঙ্গা ছোট আন্দুলিয়া থানার কিছু সমাজ বিরোধীর কথায় পুলিশী জুলুম হচ্ছে বলে সীমান্ত এলাকায় কিছু লোক জানিয়েছেন। বনগাঁয়ের কাছাকাছি একটি থানায় পুলিশ প্রধানরা সমাজবিরোধীদের সমিতিকে মদত দিচ্ছেন। সমিতির প্রধান কর্তারা রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ট লোক বলে জানিয়েছেন বালীগঞ্জ বাসী জনৈক ব্যক্তি। তাঁর ত্রিশ বিঘা ধানজমি বেদখল আছে।

হাওড়ায় বাঁকড়ার ডোমজুড়ে থানায় দুই এম পি মহাশয়ের লোকজনরা সময় সুযোগ বুঝে যাকে তাকে গ্রেপ্তার করছে। ডোমজুড়ে থানার অফিসার বললেন এখনই তো আমজাদ আলী সর্দার এম পি ফোন করলেন। বিপক্ষদলের এম পি আহমদ হোসেন মণ্ডল, এম পির বড় ভাই "বড়দা" দাবড়ে বলে উঠলেন বাঁকড়ায় যে ছেলেটাকে আমরা বেঁধে রেখেছি বাজারে থানার সঙ্গে, তাকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। প্রশ্ন : "কেমন করে করব স্যার?" কেন, বলুন বোমা ফেলতে এসেছিল ধরা হয়েছে। হুগলীর চন্ডীতলা থানায় পুলিশ কর্তারা জঙ্গলপাড়া মশাট ইত্যাদি অঞ্চলে পূজোর চাঁদা আদায় করেছেন নিজেরা হৈ হল্লা করার জন্য। হুগলী জেলার জনৈক এম এল এ বললেন "চন্ডীতলার থানার কমিটির সম্পাদক সাহেব আমার প্রভাব খর্ব করতে চাইছেন। শীঘ্রই আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলে বে-আইনী সব থানা কমিটি আর টাউটদের আড্ডা ভাঙবো। সম্পাদক যখন তখন ফোন করে পুলিশ নিয়ে গিয়ে নিরীহ লোকেদের গ্রেপ্তার করছেন কিংবা নিজের পুকুরে থানা কর্তাদের মাছ খাওয়াচ্ছেন। বলরামবাটির স্থানীয় থানায় সিঙ্গুরে রেল প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা চরিত্র দায়ে ধৃত হয়েও থানার জোরে বেকসুর খালাস অবিলম্বে বে-আইনী থানা পুলিশ কমিটি, আর, জি পার্টির লোকেরাই চরিত্র দায়ে ধৃত হয়েছে এবং গ্রামবাসীর বিশ্বাস হারিয়েছে।

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

আন্দামান থেকে নিবারণ হালদার কড়া ধমক দিয়ে চিঠি লিখেছেন : এ কী ব্যাপার, আপনাদের খুশিমতন প্রশ্নকর্তার নাম আপনারা সব সময় প্রকাশ করছেন না! দেখুন আমরা নেতা নই যে কাগজে আমাদের নাম ছাপা হবে, অথচ কাগজে নিজের নামটা ছাপা দেখতে কার না সাধ জাগে? বাড়ির গিন্নির কাছেও খানিকটা দেমাক দেখানো যায়। কাজেই, আমার দাবি, দয়া করে প্রশ্নকর্তা হিসেবে আমার নামটা ছাপবেন, অন্যথায় প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজন নেই।

বাধ্য হয়ে নিবারণবাবুর এক তথ্য প্রশ্নের জবাব দিতেই হচ্ছে।

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ভ্রমণকালে অসুস্থ মাক্সিম গোর্কির সঙ্গে দেখা করলেন না কেন?

উত্তর ॥ সোভিয়েত শিক্ষা বিভাগ থেকে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবেই রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ ছিল। সম্ভবত এটি তাঁর সাহিত্যিক-সফর ছিল না।

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রনাথ "চার অধ্যায়" লিখলেন কেন?

উত্তর ॥ শ্রাদ্ধেয় ভবানী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য এই বিভাগে আগেই ছাপা হয়েছে। খুঁজে পড়ুন।

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রনাথ "পথের দাবী" বাজেয়প্ত হলে শরৎচন্দ্রের অনুরোধে প্রতিবাদ করলেন না কেন?

উত্তর ॥ কেন? রবীন্দ্রনাথ তো ওঁর "কলের যাত্রা" নাটিকা শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন।

প্রশ্ন ॥ আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কোনও কিছু লেখেননি?

উত্তর ॥ খটকায় ফেললেন! দেখতে হবে। তবে, পরমহংসদেব সম্পর্কে তাঁর পদ্য দেখেছি বটে। ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কেও তাঁর রচনা।

প্রশ্ন ॥ "শান্তিনিকেতন" কী কবিপ্রতিভার পক্ষে আবশ্যিক ছিল।

উত্তর ॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান। শরৎচন্দ্রই এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন "আমি জানি আমাদের দেশে অনেকেই বিশ্বভারতীকে তাঁর একটা খেয়াল বলে মনে করেন। আমি বলি, হলই বা খেয়াল, কিন্তু তার খেয়াল-কর্তব্য খেয়াল তা আমাদের ভুললে চলবে না। .... তিনি এই বুড়ো বয়সে বিশ্বভারতীর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এ লজ্জা আমাদের।"

প্রশ্ন ॥ বিশ্বভারতীতে কী রাজনীতি অস্পৃশ্য ছিল?

উত্তর ॥ সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে এলে কবি তাঁকে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করেন।

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রনাথকে "কবিগুরু" বলা হয় কেন?

উত্তর ॥ তিনি একাধারে কবি ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের গুরু। তাই সংক্ষেপে কবিগুরু।

প্রশ্ন ॥ আবার "বিশ্বকবি" কেন?

উত্তর ॥ সম্ভবত নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বলে? কিংবা বিশ্বপরিক্রমা করেছিলেন বলে।

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রনাথ কী জমিদারী ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন?

উত্তর ॥ না। কেবল রায়তেরা নষ্ট করে দেবে বলে ওদের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা পাননি।

প্রশ্ন ॥ বঙ্কিমচন্দ্র নাকি একদা তাঁর গলার মালা রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন?

উত্তর ॥ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ ঘটনার আর কে সাক্ষ্য দিতে পারেন?

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রনাথ কী নজরুল ইসলামকে শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর কাছে গানের তালিম নিতে বলেছিলেন?

উত্তর ॥ শুনেছি। নজরুল যাননি।

প্রশ্ন ॥ আধ্যাত্মিকতা-ধর্ম-ঈশ্বর-আশ্রম প্রভৃতি ব্যাপারগুলি মনে রেখে একজন মার্কসবাদী রবীন্দ্রনাথকে কোন যুক্তিতে প্রগতিশীল বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন?

উত্তর ॥ মার্কসকে বাদ দিয়ে যাঁরা মার্কসবাদী হয়েছেন তাঁরাই পারেন।

প্রশ্ন ॥ অথচ ন্যাশনালিজম ইমপিরিয়ালিজম সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করেছেন তো?

উত্তর ॥ করেছেন। সেটা এ্যাকাডেমিক ধরণের আলোচনা। সেগুলো তাঁর ধর্ম, আধ্যাত্মিকতার মতোই আরো দশটা বিষয়ের অন্তর্গত। এ দেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তিনি কোন অজুহাতেই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসেন নি।

প্রশ্ন ॥ তথাপি একথা তো স্বীকার করতে হয় শেষ জীবনে ভাববাদী ধ্যানধারণা থেকে তিনি বস্তুর দিকে গ্রহণ করতে উন্মুখ ছিলেন? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছিল?

উত্তর ॥ হাঁ স্বীকার করি। প্রগতিশীল মানুষের কর্তব্যই হচ্ছে কবির এই উত্তরণের পরিচয়টুকু তুলে ধরা। কিন্তু এইখানেই বাধবে আসল লড়াই। প্রতিক্রিয়ার খপ্পর থেকে তাঁকে বাইরে টেনে আনতে হবে। এই রবীন্দ্রনাথ জনগণের নিজস্ব সম্পত্তি, তার প্রিয় উত্তরাধিকার, পবিত্র বহ্নির মত তাঁকে বাইরের কলুষ হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

* * *

নেপথ্যে শোনা।

: বড়দা, হোটেলে মদ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুনছি, বাঙলা সাহিত্যের কী হবে?

: ফরেন টুরিস্ট হয়ে ঢুকে পড়ব।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

মতামত

আপনার সরকার "কলিকাতাকে সুন্দর" করার জন্যই নাকি দেওয়াল লিখন, দেওয়াল পোস্টার হ্যাণ্ডবিল লাগানো, এমনকি রাস্তায় ব্যানার টাঙ্গানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এক বিস্ময়কর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই পুলিশ নিয়োগ করে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে দেওয়াল মোছা ও চুনকাম করা সুরু হয়ে গেছে। এর দ্বারা কলিকাতা মহানগরীকে কতটা সুন্দর করতে পারবেন, তা আপনারাই বলতে পারেন।

আমাদের এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্য-মণ্ডিত কলিকাতা মহানগরীকে সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত এবং সভ্য জাতির বাসোপযুক্ত করে যথার্থই গড়ে তুলতে হলে অন্যান্য সমস্যার কথা ছেড়ে দিলেও আশা করি আপনিও স্বীকার করবেন সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে, কলিকাতার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা। বিজ্ঞান ও সভ্যতার বর্তমান অভাবনীয় অগ্রগতির যুগে এই নগরীতেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস স্তূপীকৃত জঞ্জালের পাহাড় জমে থাকে, বন্ধ জলাশয়ে মশা-মাছি অবাধে জন্ম নেয়, পয়ঃপ্রণালী, নালা-নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার হয় না, হাইড্রান্টে জল থাকে না, পরিশ্রুত পানীয় জলের নামে দূষিত জল সরবরাহ করা হয়। এরই ফলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ম্যালেরিয়া আবার ফিরে এসেছে, কলেরা বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দিয়ে প্রতি বছর নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের ব্যাপকহারে জীবনহানি পর্যন্ত ঘটছে। এই অবস্থার হাত থেকে নাগরিক জীবনকে মুক্ত করার জন্য নিয়মিত জঞ্জাল সাফাই, পয়ঃপ্রণালী নালা নর্দমা সদা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মশা-মাছি সমূলে উৎসাদনের কার্যকরী ব্যবস্থা করা, পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা ইত্যাদির জন্য যদি আপনার সরকার যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে পুলিশ, এমনকি মিলিটারী পর্যন্ত নিয়োগ করত, তাহলে সেটা হত নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্য, তথা নগরীর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে নগরীকে সত্যিকারের সুন্দর করার পন্থা বা পদক্ষেপ।

সুদীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় মেরামতের অভাবে রাস্তাঘাটগুলি ভেঙ্গে গিয়ে, কোথাও কোথাও বিবাট গর্তে পরিণত হয়ে যে মৃত্যুগহ্বর করে রেখেছে তার মেরামত করা এবং রাস্তায় প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জল দিয়ে পরিষ্কার রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অক্ষমতা বা অপদার্থতার দোহাই না শুনে যদি আপনার সরকার কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করতো তবে তা যথার্থই নাগরিক স্বার্থে বা নগরীকে সত্যিই সুন্দর করার প্রয়াস বলেই বিবেচিত হত।

এই একান্ত অপরিহার্য কাজগুলি না করে দেওয়াল পরিষ্কার বা চুনকাম করে নগরীকে সুন্দর করার প্রয়াস যদি বিষাক্ত ঘায়ে জর্জরিত শরীরের ওপর স্নো-পাউডারের প্রলেপ লাগিয়ে সুন্দর করার ব্যর্থ চেষ্টার সামিল বলে মনে করা যায়, তবে কি তা আপনার সরকারের মতে অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে? আমরা অত্যন্ত বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনার সরকার সেই রাস্তাই নিচ্ছেন।

দেওয়াল লিখন, পোস্টারিং, হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি বা ব্যানার টাঙ্গানো নিষিদ্ধ করে আপনার সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা আর কিছু করুক আর নাই করুক, গণতন্ত্র সম্মত পদ্ধতিতে (কারোর দেওয়ালে জোর-জবরদস্তি করে নয়) দেওয়াল লিখন ইত্যাদির দ্বারা রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রচার ও জনমত সৃষ্টির এক গণপদ্ধতির চিরাচরিত অধিকারকেই খর্ব করছে এবং স্বল্প আয়ের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রচারের সুযোগ নষ্ট করছে। আপনার সরকারের এই প্রচেষ্টার রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন থেকে সুরু করে এমনকি জনগণের ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশের দীর্ঘদিনের এই পদ্ধতিটিকেই অতি সুকৌশলে স্তব্ধ করে দিতে উদ্যত—যার প্রতিবাদ না করে পারি না।

সত্যসত্যই যদি আপনার সরকার এই কলিকাতা মহানগরীকে সুন্দর, স্বাস্থ্যসম্মত ও বাসোপযোগী করে গড়ে তুলতে আগ্রহী হন, তবে অনতিবিলম্বে কলিকাতাকে জঞ্জাল নরকযন্ত্রণা ও রাস্তাঘাটের মৃত্যুগহ্বর হতে মুক্ত করতে, পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখতে মশা মাছি নির্মূল করতে ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে তৎপরতার সঙ্গে উদ্যোগী হোন—এই দাবীই জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এই দাবী করছি যে, আপনার সরকার দেওয়াল লিখন-পোস্টার-ব্যানার ইত্যাদির মারফৎ জনগণের আদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রচারের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করে নিন।

নীহার মুখার্জী
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
এস ইউ সি আই

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রসঙ্গ

ওষুধ শিল্পের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি নিয়ে দর্পণে সম্প্রতি কয়েকবার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত জানাই, শুধুমাত্র ওষুধ শিল্পে নিযুক্ত তিন তিনটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব থেকে দেখা যায় যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারী তহবিলে জমা পড়েনি।

হিসাব নিম্নরূপ: ক্যালকাটা কেমিক্যাল—দশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা, বেঙ্গল কেমিকাল—পনেরো লক্ষ বেয়াশি হাজার টাকা। গ্লাক্সো-নেট—চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা।

এ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলে আরও তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

মদেলা চ্যাটার্জী

বেকার ইঞ্জিনীয়ার

বিলেতে দীর্ঘ সাত বছর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর পাঁচটি বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভের পর দেশে ফিরেও আজ আমি বেকার এবং বঞ্চনার শিকার।

প্রথমটায় স্বদেশে চাকরীলাভে ব্যর্থ হবার পর আবার বিদেশে যাব স্থির করেছিলাম, কিন্তু আত্মীয় পরিজনের অনুরোধে তা পারিনি। অবশেষে গত আটষট্টি সালে একটি চাকরী জুটলো তৎকালীন বিলিতি কোম্পানী "মিনিমাক্স"-এর ইঞ্জিনীয়ারিং সেলসম্যান হিসেবে। কোম্পানী আমার শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বুঝে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া—এই কয়েকটি জেলার বিক্রয়-প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেয় এবং চুক্তি হয় যে মিনিমাক্স ফায়ার এক্সটিংগুইসার এণ্ড এক্সপ্লোসেস—এর উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের ওপর আমাকে কমিশন দেওয়া হবে।

আমি প্রস্তাবে রাজী হই এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু করি। কিছুদিনের মধ্যেই উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রী চারগুণ বেড়ে যায় এবং চুক্তি অনুযায়ী আমি যার প্রাপ্যও বুঝে পাই।

কিন্তু এই কোম্পানীটি যখন বোম্বাইয়ের স্টিল এজ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (মিনিম্যাক্স ডিভিশন) কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়, তারপর থেকেই বিভ্রাট দেখা দেয়। এরপর কোম্পানী কলকাতা ব্রাঞ্চের কর্মীদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একের পর এক ছাঁটাই করে এবং কর্মীদের কমিশনের হাজার হাজার টাকা এবং সিকিউরিটি মানি বাবদ জমা দেওয়া জনপ্রতি দু হাজার টাকাও বাকী পড়ে থাকে।

উক্ত কোম্পানীতে সাত বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমি আজ বেকার এবং আমার প্রাপ্য কিছু টাকাও বুঝে পাইনি। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষকে এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রমমন্ত্রীদের পত্র দিয়ে সুবিচার প্রার্থনা করেছি। আজও কোন ফল হয়নি।

আমরা দীর্ঘদিনের শিক্ষা পরিশ্রম, বিদেশী ডিগ্রী—এসবের এই কি জবাব?

নবীনকৃষ্ণ সেন
পুরুলিয়া

টুকরো কথা

রাণা ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীমজগোপাল ভট্টাচার্য "আমার জ্যাঠামশাই" রচনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন:

"হরপ্রসাদের (শাস্ত্রী) বাড়ীতে নানা বিচিত্র রকমের লোক মধ্যে মধ্যে আসত। কুলকর্ণী সেইরকম একজন মানুষ ছিলেন। ইনি মহারাষ্ট্র দেশীয় এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। বেশ বাকপটু ছিলেন। বলতেন "এভার সিন্স উই গেভ আপ আওয়ার ন্যাশনাল অকুপেশন। আমরা অন্যা দের ইন্মেলেক্ট এণ্ড এনার্জি অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগ করছি।" হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট ওয়জ ইওর ন্যাশনাল অকুপেশন? উত্তর, শাস্ত্রীজী আপনি হিস্টোরিয়ান আপনি একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আওয়ার ন্যাশানাল অকুপেশন ওয়জ প্ল্যানডারিং পিপল।"

উনিশশো বাষট্টি সালের পয়লা ডিসেম্বর সুলেখক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় শান্তিনিকেতন থেকে বন্ধু কবি মণীশ ঘটককে ঐকটি পত্রে লেখেন—"রাইট এণ্ড রংস নিয়ে আমি অযৌবন পীড়িত। গায়ের জোরে কোন বড়ো সমস্যার সমাধান হবে না, হতে পারে না। ন্যায়ের জোর চাই। গায়ের জোর থাকুক, একেবারে দুর্বল হওয়া কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু শুধু গায়ের জোরই থাকবে, তার উপর ন্যায়ের জোর অঙ্কুশ চালনা করবে না, এর পরিণাম আমরা বার বার জার্মানীর ইতিহাসে দেখেছি।"

পরান্তরে প্রকাশিত খবরে: দুই ভিয়েতনাম এক হবার কথাবার্তা সায়গন শহরে সম্প্রতি চলছে। এ প্রসঙ্গে হো চি মিনের অন্তিম ইচ্ছাপত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি।

"আমাদের দেশ, আমাদের পর্বতরাজি এবং আমাদের মানুষ থাকবে চিরকাল। মার্কিন আক্রমণকে পরাস্ত করার পর, আমরা দেশকে পুনর্গঠন করব এখনকার চাইতে দশগুণ বেশী শক্তিশালী করে। সামনের দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও আমাদের জনগণ নিশ্চিতরূপেই সর্বাত্মক বিজয় অর্জন করবেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চলে যেতে হবে। আমাদের পিতৃভূমি পুনরায় এক হবে এবং উত্তর ও দক্ষিণে আমাদের স্বদেশবাসীরা পুনর্মিলিত হবেন।"

[হানয়, দশই মে, উনসত্তর, হো চি মিন]

সমাজের শ্রেণীগত সম্পর্ক না-বদলালে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশাল কোন পটান্তর না ঘটলে ভারতবর্ষের আর্থিক, প্রগতি বাহত থাকবে, মোটামুটি এই প্রত্যয়ে আমি স্থিত হয়েছি। প্রগতি কলা-কৌশলের কাপর নক্ষ আরো গহনে যেতে হবেই। স্রেফ শৈলীর দীপ্তি দিয়েই যদি আর্থিক অবস্থার মোড় ফেরানো সম্ভব হতো, তাহলে আমরা গত দেড় দশকে বহুদূর এগিয়ে যেতাম। কিন্তু স্থূল ব্যাপার তা নয়। শ্রেণীগত স্বার্থ, খণ্ডরাজ্যগত স্বার্থ, দলসম্প্রদায়উপসম্প্রদায়গত স্বার্থ, যেখানে প্রতি পদে জাতির মূল লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রয়াসকে বাহত করছে, আস্তিকতায় শিব হয়ে থাকা সেখানে ভণ্ডামি, নয় মূর্খতা। দুধ-ও-তামাকে একই সঙ্গে সমান আগ্রহ থাকলে জাতীয় উন্নতি পরাহত থাকবে, অন্তত ধনবিজ্ঞান সে-কথাই বলে দেশের যাঁরা হাল ধরে আছেন, উৎকীর্ণ সমস্যাগুলি সমাধানের প্রধান দায়িত্ব যাদের, তাঁরা কিন্তু এই সত্যটি মানতে রাজি নন। তিতিক্ষার কাছাকাছি অলিন্দ দিয়েও হাঁজতে তাঁরা গররাজি, অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের অনীহা, গোষ্ঠীস্বার্থের ময়না কাটিয়ে উঠতে তারা অপরাগ। এই চর্বাকভক্তরা যতদিন রাজত্ব করবেন, মনে হয় না দেশের খুব একটা হালফিল বদল হবে। সামরিকভাবে, এক বছর-দুবছর, এখানে-ওখানে, একটু-আধটু শ্রীছাঁদ পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু সব-মিলিয়ে কিছু হবার নয়। শেষ পর্যন্ত, ইতিহাস তার স্বল্পিকতার নিয়মে প্রত্যাবর্তন করবেই।"

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক মিত্র মহোদয় তাঁর "সমাজ সংস্থা: আশা-নিরাশা" গ্রন্থের ভূমিকায় উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন।

গ্রামোন্নয়নের সমস্যা

গ্রামে গঞ্জে রাস্তাঘাট মেরামত ও নতুন সড়ক তৈরীর প্রয়োজনীয়তা যেমন প্রকট তেমনি আছে খাল বিল ক্যানাই করা পুকুর কাটানো এবং সেচের জন্য জল সরবরাহ করার দায়িত্ব। এই সব সমস্যা চিরকালই অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। ভোটের সময় সামান্য কাজ হলেও তখন মোড়লের দরদালানের গায়ে টিউবয়েল বসানো হয়। পঞ্চায়েত কর্তার পুকুর কেটে রিলিফের টাকা বন্টন করা হয়। গ্রাম উন্নয়নের জন্য বিচ্ছিন্ন ভাবে যে সব সভাসমিতি হয় তার ঠিকমত প্রচারও হয় না যার ফলে সমস্যা বাড়েই। হুগলী জেলার আরামবাগ থানাকুল, শাবলসিংহপুর ইত্যাদি অঞ্চল প্রতি বছরই বন্যার ডোবে, প্রতি বছর লোক ভাসে। শেষে সাহায্য যখন পৌঁছায় তখন সবশেষ অবস্থা।

হুগলীর চণ্ডীতলা থানা, গোঘাটা থানা, খানাকুল থানা শাবলসিংহপুর থানা এবং শ্রীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমা এলাকার শহুরে এবং শহরবাসী নিত্য শহরযাত্রীরা মাঝে মধ্যে গ্রামে যান এমন শ্রীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমা এলাকার শহুরে এবং শহরবাসী নিত্য শহরযাত্রী বা মাঝে মধ্যে গ্রামে যান এমন লোকেরা একত্র হয়ে গ্রাম উন্নয়নী নামের সংস্থার মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানে প্রয়াস চালাচ্ছেন। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এদের উদ্যোগে মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে গ্রামীণ সমস্যা সমাধান শীর্ষক এক সেমিনার তথা আলোচনা সভা হচ্ছে।

গ্রন্থ সমীক্ষা

মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক

ইরাবান বসুরায়

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বয়স অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেছে। পেরিয়ে গেছে ইতিহাসের নানা বাঁক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সময়ের অভিজ্ঞতা এই আন্দোলনকে যতটা প্রাজ্ঞ করে তুলতে পারত তা ঘটেনি। ঘটেনি যে তারও নানা ইতিহাসগত কারণই আছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে মূল শক্তি, সেই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ কতটা হয়েছে, কতটা জোরই চালানো হয়েছে ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে ভাঙবার জন্য এ সব ব্যাপারেও ইতিহাসের হিসেবেই সংশয় জানানো যায়। স্বভাবতঃই মৌল কাজের ক্ষেত্রেই যেখানে সন্দেহের অবকাশ সেখানে শিল্পসাহিত্যের বিষয়টি আরও আশাপ্রদ না হবারই কথা। এ কথা মোটামুটি জানা আছে যে শিল্পসাহিত্য যদিও উপরিসৌধের ব্যাপার তাহলেও এটি কোনভাবেই যান্ত্রিক বিচারের আওতায় আসে না। যে অমোঘ ডায়লেকটিক মার্কসবাদের মূল সূত্র, সেই ডায়লেকটিক শিল্পসাহিত্যের প্রসঙ্গে আরও জটিল প্রয়োগ ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ভিতের সঙ্গে উপরিসৌধের সম্পর্ক সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্ক নয়, সমাজকাঠামো আর শিল্পসাহিত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ বরং অনেকটাই রসায়নের প্রক্রিয়ার অনুরূপ।

কিন্তু মার্কসবাদীই তো এগিয়ে অসংবেন এই জটিলতর গ্রন্থিমোচনে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোয় তাঁর সামনেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে ওপর-নীচের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতি। ভারতবর্ষের দীর্ঘ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এই সমস্যাকে তাই পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, যদিও যে কারণে মূল রাজনৈতিক আন্দোলনই বারবার চোরাগলিতে পথ হারিয়েছে বা মুখ থুবড়ে পড়েছে, সেই কারণেই বিচ্ছিন্ন দু একটি উদাহরণ ছাড়া শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও কোনও সঠিক রাস্তা খুঁজে বার করা সম্ভব হয়নি।

তবু যা হয়েছে, তারই একটি চেহারা তুলে ধরতে চেয়েছেন ধনঞ্জয় দাশ। অবশ্যই মাত্র বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রচনাই তার অবলম্বন এবং সে দিক থেকে কিছুটা খণ্ডিত, তা হলেও এই প্রয়াসের মধ্য থেকে গোটা ভারতবর্ষের শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে রাজনৈতিক ধারনার একটা পরিচয় পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই পরিচয় তুলে ধরতে পারেন ঐতিহাসিক, স্বভাবতই ধনঞ্জয় দাশের এই প্রয়াস কিছুটা সেই ঐতিহাসিক মর্যাদা দাবী করতে চায়। সেই দাবী প্রতিষ্ঠিত কিনা সেটাই বিচার্য।

"মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক" এর প্রথম খণ্ড (মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক। প্রকাশক/নতুন পরিবেশ, দাম সতেরো টাকা।) মাত্র প্রকাশিত। ধনঞ্জয় দাশের সুদীর্ঘ ভূমিকা আছে এতে। এই ভূমিকায় ধনঞ্জয় দাশ তুলে ধরতে চেয়েছেন এ দেশের শিল্পসাহিত্যের মার্কসীয় বিচারের একটি ইতিহাস। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ইতিহাসই যদি, তবে এরকম একটি উচ্চাভিলাষী নামকরণের সঙ্গে গ্রন্থিত রচনার এত ফারাক কেন? আসো কি কোন ইতিহাস এতে অনুসৃত? না। এতে আছে মার্কসবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য সম্পর্কিত রচনাগুলি। ইতিহাস সম্পর্কে যদি নিষ্ঠা দেখাতে হয়, তাহলে হয় মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত সাহিত্য-সাজাতে হয়, অথবা বাদী-প্রতিবাদী-আলোচনাগুলিকে কালানুক্রমে গুলিকে পাশাপাশি রাখতে হয়। এ দুই রকমের কোনটাই মানা হয়নি। একটি বিশেষ পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু রচনাকে একত্র সংকলিত করা হয়েছে মাত্র। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক এই নামকরণ কি তাহলে একটি মধ্যপদলোপী শব্দগুচ্ছ মাত্র? নিশ্চয়ই এই অভিপ্রায় ছিল না সম্পাদকের। অথচ তিনি নিজেই সংশয়ের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। অগ্রণী পত্রিকায় প্রকাশিত সরোজ দত্ত, সমর সেন বিতর্ককে তিনি বলে ছেন "ভুল হোক শুদ্ধ হোক, সরোজ দত্ত বনাম সমর সেন-এর বিতর্কটিই প্রথম সচেতন আর বলিষ্ঠ মার্কসীয় বিতর্ক। এই প্রথম বিতর্ক কিন্তু সংকলনে স্থান পায়নি। অন্য খণ্ডে থাকবে? তাহলেও কিন্তু ইতিহাস একটু হোঁচট খায়।

অসলে ধনঞ্জয় দাশের দীর্ঘ ভূমিকা থেকে মনোযোগী পাঠক কিছু তথ্য পেয়ে যাবেন শুধু, যদিও সেই তথ্যকে সংকলিত রচনার সঙ্গে মেলাবার সুযোগ পাবেন না। আর পাবেননা সংকলকের কোন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। এমন কথা বলা হচ্ছে না যে তিনি বেছে বেছে একধরণের লেখাই ছাপুন (যদিও আলোচ্য প্রথম খণ্ডে তাই করেছেন), কিন্তু তার নিজস্ব মতটাও জানা দরকার।

ধনঞ্জয় দাশ অবশ্য একহাত নিয়েছেন সাহিত্য পত্রের জনৈক তরুণ বুদ্ধি-বিলাসীকে। এবং অস্বীকার করার উপায় নেই তার আক্রমণের লক্ষ্য অনেকটাই সঠিক। মার্কসবাদের মোড়ক দীর্ঘদিন ধরে গায়ে ঝুলিয়ে রেখে যে মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকরা বাজার মাত করছিলেন, তাদের অধিকাংশেরই তখন এবং এখনও প্রধান আশ্রয় সাহিত্যপত্র। সাহিত্যপত্র দীর্ঘদিন ধরেই মার্কসবাদের সংস্কার সাধনে ব্রতী—কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ধনঞ্জয় দাশ সাহিত্যপত্রের বিরাধিতা করলেও নিজের অবস্থানটা কোথাও পরিষ্কার করেননি। ভূমিকায় তিনি প্রকাশ রায় ও রবীন্দ্র গুপ্তর নামে লেখাগুলিকে অতি-বামপন্থী দুষ্টকারী সিদ্ধান্ত বলেছেন, আবার কয়েকলাইন পরেই বলেছেন এগুলি এ পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিতর্ক ফলে মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক-এর প্রথমখণ্ডে যাবতীয় ইতিহাস-ধারাকে অস্বীকার করলেও একটি পত্রিকার লেখাগুলিকেই স্থান দেওয়া হয়, সেখানেও হঠাৎ অবায় সমস্ত ক্রমকে উল্টিয়ে বারো-তেরো বছর পরে লেখা ভবানী সেনের একটি রবীন্দ্র কিচরকে জায়গা দেওয়া হল, যার বক্তব্য পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের বিরোধী। এটাকে নিরপেক্ষ ইতিহাস উপহার দেওয়ার চেষ্টা কোনমতেই বলা যাবে না, কেননা চরটি প্রবন্ধের সুর যেখানে প্রতিবাদী, একটি প্রবন্ধের হঠাৎ উপস্থিতি সেখানে ভারসাম্য রাখেনা। তবে কি এটা শ্রীধনঞ্জয় দাশের ব্যক্তিক তাড়না—তার নিজের দলে জায়গা রাখার প্রয়াস মাত্র?

মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশের সময়ই যথেষ্ট বিতর্কের সূচনা করেছিল বিশেষতঃ ছদ্মনামী ভবানী সেন ও প্রদোৎ গুহর রচনা চরটি। এই রচনাগুলি সম্পর্কে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এর রচয়িতারা সকলেই পরবর্তীকালে মত পরিবর্তন করেছিলেন। এবং এই রচনাগুলি যে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবেও আর কখনও পুনর্মুদ্রিত হয়নি, তার কারণ এই মত-পরিবর্তন। ভবানী সেনের নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করতে গিয়ে এই যুক্তিতেই এই লেখাগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে; এবং এই যুক্তিতেই সম্প্রতি সাহিত্যপত্রের সমালোচক এই সংকলনের যথার্থকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এবং ধনঞ্জয় দাশ তাঁর ভূমিকায় চিত্তমোহন সেহানবীশের সাক্ষ্য করে জানিয়ে দিয়েছেন যে ভবানী সেন স্বয়ং এগুলি কখনও প্রত্যাহার করেননি। সাহিত্যপত্রের দল অনুরাগী সমালোচকের প্রীতি অবশ্য এতই গভীর যে তিনি এই সাক্ষ্যকেও স্বীকার করতে রাজী নন। প্রশ্ন এই যে মত পরিবর্তন ঘটতেই পারে, কিন্তু একজন মার্কসবাদী কি নিজের অতীতের ভুলকে লুকিয়ে রাখতে চাইবেন, না সেই ভুলকেও অনায়াসে জনগণের সামনে তুলে ধরবেন বিচারের অপেক্ষায়? ভবানী সেনের রচনাসংগ্রহের প্রকাশক বা সাহিত্যপত্রের সমালোচক পক্ষান্তরে উল্টোটাই করতে চেয়েছেন।

এই রচনাগুলি নিয়ে সেদিনের যে উত্তাপ, তার আঁচ আজও বেশ টের পাওয়া যায়—এমনই টাটকা এই লেখাগুলি। এ নয় যে একেবারে নির্ভুল এই লেখা। এর মধ্যে শোধনবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মানসিকতা যেমন রয়েছে, তেমনই আছে বামপন্থী অতিরেক। এই বামপন্থী উল্লম্ফ প্রদোৎ গুহর রচনায় একটু বেশী। তাই বিষ্ণু দের অ-মার্কসীয় বক্তব্যের প্রতিবাদ রাখতে গিয়ে তিনি চলে যান সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে, লোককবি গুরুদাস পাল-এর আন্তরিক কিন্তু শ্লোগানধর্মী লেখাকে আদর্শ হিসেবে দাঁড় করাতে চান। বীরেন পাল বা রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেনের রচনা দুটি বা ঊর্মিলা গুহ নামে লেখা প্রদোৎ গুহর রচনাতে বারবার রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু বারবারই বিষ্ণু দে-ই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আসলে বিষ্ণু দের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে এই সমালোচকদ্বয় ছদ্ম মার্কসবাদকেই আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন, মার্কসবাদের নাম করে পেটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদ কিভাবে কাজ করে তা উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনাংশগুলি আজও গভীর অভিনিবেশের দাবী রাখে। বীরেন পাল-রবীন্দ্র গুপ্ত চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের পটভূমিতে রেখে বিচার করতে চেয়েছিলেন তার রচনার মূল ধরাটিকে খুঁজে বার করতে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিক-সংগ্রামে নিযুক্ত বা সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবল বিদ্রোহ বীরেন পাল বা ঊর্মিলা গুহর এই সূত্রগুলি অবশ্যই রবীন্দ্র আলোচনার সহায়ক। কিন্তু তারপরেই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিকেই প্রায় নস্যাৎ করে দেন প্রতিক্রিয়াশীল বলে, সে সঙ্গে একথাও মনে করিয়ে দেন যে "মার্কসবাদী রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাণ্ডার থেকে এমন বিশেষ বিশেষ উপাদান আহরণ করতে পারেন, যা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শিবিরকে সমৃদ্ধ করবে, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য যে প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করে, প্রগতিকে নয়—এ সত্য স্বীকার করে নিলে তবেই। অসলে রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ও জটিল প্রতিভার বিচার রীতিমত দুরূহ। দ্বিতীয়তঃ তার সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে প্রভূত স্ব-বিরোধ একজন সৎ শিল্পীর পক্ষে ইতিহাসের বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সেটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্র গুপ্তর আলোচনাতে রবীন্দ্র-বিচারের যে পদ্ধতি অনুসৃত, তা যেমন আজও আদর্শ বলে মেনে নেওয়া দরকার, তেমনই সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে আলোচনায় না আনার উগ্র বাম ঝোঁক, তাও আজকের দিনে খেয়াল রাখা দরকার।

নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিম-আলোচনা নির্দোষ আলোচনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের মতে যে স্ববিরোধ দেখা গেছে বঙ্কিমে তা একেবারেই অনুপস্থিত। কেননা কার জন্য, কাদের হয়ে লিখবেন, এ সম্পর্কে বঙ্কিম প্রথম বধি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন—উপনিবেশবাদ ও তার সহযোগী সামন্ততন্ত্রের স্বার্থরক্ষায় বঙ্কিম কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হননি. দক্ষতা তার ছিল, কিন্তু সেই দক্ষতাকে তিনি ব্যয় করেছেন প্রগতির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজের আবিষ্কৃত নতুন সাহিত্য-আঙ্গিকে উপন্যাসকে তিনি ব্যবহার করলেন পুরনো সমাজের স্বার্থেই। নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

বিকারগ্রস্ত ছড়া

অনার্য মিত্র

এবার পুজোয়
অনেক কিছুই পেলেন
চুপি চুপি
অনেক কিছুই খেলেন;
তার থেকে কি
আমায় কিছু দিলেন?
চতুর্থ ভাগ বোনাস তো
ঠিক নিলেন।

মাস্কি পরে
ট্যাক্সি চড়ার সুখে
গিন্নীকে ঠিক
আঁকড়ে নিলেন বুকে।
তখন কি আর
কেউ মরেনি ধুঁকে,
কাঁদেন নি তো
বেতনহীনের দুঃখে?

একলা সুখী
জিনিসের দাম
বাড়ছে আরো বাড়ুক,
জোচ্চোরেরা
কলকাঠিটা নাড়ুক,
দুর্জনেরা যতই না
গাল পাড়ুক
গরীবের ধন
ধনী কাড়ুক কাড়ুক।

লোক ঠকিয়ে
জিতছে যারা লাফায়,
আইন ভাঙিয়ে
বিশ্বটারে কাঁপায়;
স্বৈরিণী কোন
সুখের নেশায় দাপায়,
একলা সুখে
প্রাণটা যে তার হাঁপায়।

হাঁপির টানে
মরছে যারা মরুক,
গদি হারানোর
ভয়ের জ্বরে ধরুক
লড়াই যারা
করার তারা লড়ুক
একলা সুখীর
মুখোস খুলে পড়ুক।

রাজা হবার মওকা
বারে মজা বাঃ
রাজা যদি হতে চাস তো
বাংলাদেশে যা।

যেথায় থাকে সামনে পথি
কাটবি গলা মন্ত্রী খাবি
একবেলা তুই গদি পাবি
আরেকবেলায় না—
মওকা ছাড়িস না, ব্যাটা তুই
বাংলাদেশে যা।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

মার্কসবাদী গল্প সংকলন

(দর্পণের সমালোচক)

শোনা যায় বামপন্থী সাহিত্যের ঐতিহ্য বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক সভায় দ্বিধায় পীড়িত হন! ঘটনাটি সত্যি কী মিথ্যে এ-প্রশ্ন অবান্তর হলেও বিষয়টি সত্যিই যে আজও পর্যন্ত বামপন্থী মহলেও বুর্জোয়া সাহিত্যের তুলনায় আমাদের মধ্যে এ-জাতীয় হীনমন্যতা বর্তমান। নারায়ণ চৌধুরীর মতো সমালোচক পর্যন্ত এই দ্বিধায় জর্জরিত হন। বিশেষত বুর্জোয়া লেখকেরা যথেষ্ট টেকনিক ও সাহিত্যগুণ অধিকার করে রয়েছেন, এমত মনোভাব সংস্কারে পরিণত।

এই ধারণার কারণ কী? আমরা কী কখনো আত্মবিশ্লেষণ করবার পরিশ্রম স্বীকার করেছি?

মনে হয় এই ভ্রান্ত ধারণা বদলাবার গরজেই মিহির আচার্য লিখিত দলিল নিয়ে অবিশ্বাসী, দ্বিধাবিতদের অবিশ্বাস মজবুত করবার উদ্দেশ্যেই সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন।

"পরশুরামের কুঠার" মিহির আচার্য সম্পাদিত মার্কসবাদী চেতনা-সম্পন্ন বাংলা ছোট গল্পের একটি প্রামাণিক দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে। গবেষকের মতো শ্রীআচার্য এদেশে ছোট গল্পের মার্কসবাদী উন্মেষ সঠিকভাবে লক্ষ্য করেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মহেশ" গল্পের মধ্যে। উৎখাত চাষি গফুরের চটকলের মজুরের পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে সচেতন লেখক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র তৎকালীন সামাজিক মূল দ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও তস্য লেজুড় সামন্ততন্ত্রকে সঠিকভাবে চিনেছিলেন। বস্তুত লেখক হিসেবে তিনিই এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের মুখোশটিকে সাহসের সঙ্গে উদ্ঘাটন করেন।

ক্ষোভের বিষয় সমসাময়িককালে শরৎচন্দ্রের এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উত্তরাধিকার আর কেউ বহন করেন নি। এই বিশেষ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র একক। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা যথেষ্ট সম্ভাবনা নিয়ে এলেও সামাজিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার প্রমাণ দেন। সমাজবহির্ভূত এক জাতীয় বোহেমিয়ান চিন্তাধারা ও দেহসর্বস্ব যৌনবিকারের সহজ শিকার হন।

ফলত শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা অনেক পরে পেলাম মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অবশ্য প্রথম পর্বে মাণিক রচনায় মর্বিডিটি ও যৌনবিকৃতির প্রতিফলন দেখা গেলেও তাঁর সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আসল ব্যাধি অচিরেই ধরা পড়ল। অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা ছাড়া সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তি নেই, এই বিশ্বাস মাণিককে মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত করল। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুনর্জন্ম হল। শরৎচন্দ্রের সামাজিক প্রতিবাদ সমাজতন্ত্রের গনগনে আগুনে মাণিক-রতনায় পরিশুদ্ধ ও ভাস্বর হয়ে উঠল।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে এদেশে সচেতন মার্কসবাদী রস-সাহিত্যের সূচনা হল। দ্বন্দ্ব-দুর্ভিক্ষ-লাঞ্ছনা-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন কৃষকের তে-ভাগা লড়াই সাহিত্যে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারায় শরৎচন্দ্রের মত একা নন। এলেন রমেশচন্দ্র সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সুশীল জানা প্রমুখ লেখকগণ। উত্তরকালে কে কম বেশি সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে সরে এসেছেন সেটা অন্য বিচার। এই লেখককুলের সাহিত্যকৃতি যে সাম্যবাদী আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে স্বীকার করেই, এ কথা অনস্বীকার্য। এসেছেন আরো লেখক। সুরকার সলিল চৌধুরী তাঁর দাপ্তার বাতাবরণে রচিত অনবদ্য "ট্রেসিং টেবিল" গল্প নিয়ে। চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটকও একই বাতাবরণে লিখেছেন তাঁর "সড়ক" গল্পটি। সোমেন চন্দের "দাঙ্গা" তাঁর আত্মাহুতিরই জীবন্ত কাহিনী। সুলেখা সান্যাল লিখেছেন "সংঘর্ষে" একটি বাঙালী বধূর মোহমুক্ত ও রাজনৈতিক উত্তরণের কাহিনী। মিহির আচার্যের "আজ কাল পরশু" সমাজজীবনে নিয়ত বিপ্লবের শর্তে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছে।

এই গ্রন্থে গল্পনির্বাচনের কালে লেখকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নারায়ণ-সুশীল জানার রোমান্টিক বিপ্লববাদের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের গল্প দুটিতে। রমেশচন্দ্র সেনের গল্পে তথাকথিত লুমপেন প্রলেটারিয়েতের চরিত্রটি ধরা পড়ে। নবেন্দু ঘোষের গল্পে কৃষক রমণীর জমি হারানোর দুঃখ দেখা যায়।

এ রকম একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব দীর্ঘকাল অনুভূত হচ্ছিল। বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রত্যুত্তরে এমন একটি দলিল তুলে ধরার দরকার আছে। অন্যদিকে প্রগতিশীল মহলে এখনো যাঁরা বামপন্থী সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত তাঁরাও একটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন বলে আশা করি। *

* পরশুরামের কুঠার (সমাজসচেতন গল্পসংগ্রহ)—মিহির আচার্য সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। কলকাতা—বারো। দাম দশ টাকা।

নিউ প্রভাস অপেরার যুগের ধারাপাত

নিউ প্রভাস অপেরার একটি জমজমাট খাসর মাতানো পালার নাম 'যুগের ধারাপাত'। নাম করণেই বোঝা যায়, এই যুগের এই সময়ের ধারাটিই পালায় পরিস্ফুট। শহুরে জীবনে বিকৃতি, নীতিহীনতা আর স্বেচ্ছাচারের ছবি অত্যন্ত নিপুণ ভঙ্গীতে তুলে ধরা হয়েছে এই পালায়।

শিক্ষকের অসম্মান, একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন, লটারীদের ল স্পষ্ট

যাত্রাভিনয়

সমকালীন জীবনের এসব সমস্যা নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অনন্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেই সঙ্গে রয়েছে সেকালের সঙ্গে একালের জীবনধারার তুলনামূলক নিরূপণ। যাত্রায় তথাকথিত প্যাটার্ন নয়, অথচ নতুন ছকে অভিনবত্ব দিয়ে সাধারণ দর্শকের হৃদয় জয় করা ভঙ্গীতে এই পালাটি বেঁধেছেন তরুণ পালাকার বীর সেন। দলের অন্যতম প্রধান তিনকড়ি ওস্তাইত জানালেন: একজন তরুণ নাট্যকারকে আমরা যাত্রাজগতে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে এসেছি, এটা আমাদের গর্ব।

সম্প্রতি নৈহাটীতে এই 'যুগের ধারাপাত' পালারই একটি অভিনয় দেখছিলাম। এই পালা যে দর্শকদের অকুণ্ঠ তৃপ্তি দিতে পেরেছে, তার প্রমাণ দর্শকদের সপ্রশংস করতালি আর বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে নির্বাক নিস্তব্ধতা।

নিউ প্রভাস অপেরার এই পালাটিতে অভিনয় করেছেন: পূর্ণেন্দু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে গুণগ্রিদু মণ্ডল, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ, মধু ব্যানার্জী, নন্দদুলাল চ্যাটার্জী, বেলা ঘোষ, লিলি মণ্ডল, কল্যাণী ভট্টাচার্য, অরুণা গোস্বামী, মঞ্জুশ্রী রায়, শিপ্রা দাস, প্রমুখ শিল্পীরা। মঞ্চীতে আছেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য (বোম্বে)।

এ ছাড়া নিউ প্রভাস অপেরার আরো জনপ্রিয় পালার নাম: মা সারদামণি।

গ্রন্থ সমীক্ষা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

বঙ্কিমের এই প্রগতি-বিরোধী ভূমিকাকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, এবং স্বভাবিকভাবেই আঘাত দিয়ে ফেলছিলেন বহু বঙ্কিম-অনুরক্ত মার্কসবাদীর মনে।

এই সংকলনে আরও দুটি খণ্ড প্রকাশিত হবে শোনা যাচ্ছে। তা হলে হয়ত একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া সম্ভব হবে, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্কের, নচেৎ এই প্রথম খণ্ড অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। কিন্তু এই রচনাগুলি আজও মূল্যবান, তাদের নানবিধ ঠিক বা ভুল, উভয় প্রবণতার জন্যই। আজকের মার্কসবাদী সমালোচকরা এগুলিকে সামনে রাখলে বুঝবেন কতটুকু গ্রহণ করতে হবে, কতটুকুই বা বর্জনীয়। গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ায় নিশ্চয়ই মার্কসবাদীর আপত্তি হবার কারণ নেই।

দাম আগুন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তাই পেঁয়াজ বেচে আপেল খান। কথাটা সত্যি। এক কিলো পেঁয়াজের দাম সাতে তিন টাকা। দরাদরি করে কিনতে পারলে এক কিলো ভালো আপেল তিন টাকায় মিলবে। নীরমতাই যদি সুখে থাকার একমাত্র মাপকাঠি হয় তাহলে এই দুর্মূল্যের বাজারে সকলেই সুখে আছেন।

রবীন্দ্র কাননে যাত্রা সম্মেলন

(দর্পণ সংবাদদাতা)

গত আঠ যোই মহেশ্বর থেকে উনিশ দিন ব্যাপী যাত্রা সম্মেলন শুরু হল রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের পদধূলিধন্য রবীন্দ্রকাননে। উদ্বোধন করলেন অশোক সরকার। সভাপতিত্ব করলেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রথম দিনে নিউ কোম্পানীর "চিড়িয়াখানা" পালায় অভিনয় ছিল। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন।

সম্মেলনে এই যাত্রা উৎসবে মোট ২০টি দল অংশ গ্রহণ করছেন। গতবার অংশ গ্রহণ করেছিল সতেরোটি দল। গতবারের চাইতে এবার প্রবেশপত্রের দামও কমেছে। তার কারণও, যাত্রানুষ্ঠানের ওপর রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রমোদ কর ও লেভী নেওয়া হবে না।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে গুণীজন সংবর্ধনার তালিকায় আছেন: নন্দ রায়চৌধুরী (প্রবীণ পালাকার), অমিয় ভট্টাচার্য (প্রবীণ কবি ও সুরকার), শিব ভট্টাচার্য (প্রবীণ অভিনেতা), শম্ভু ঘোষ (প্রবীন প্রযোজক)।

সম্মেলনের সম্পাদক অমল সরকার জানালেন: যাত্রা জগতে সুস্থ ভাবধারা ফিরিয়ে আনা, যাত্রা স্টেজভীতি দূর করা, দুঃস্থ যাত্রা শিল্পীদের সাহায্য, যাত্রা শিল্প নিয়ে গবেষণার জন্য স্মরনিকা প্রকাশ ইত্যাদি বহুবিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই যাত্রা সম্মেলনের আয়োজন।

* অসংখ্য জনতার রায়
* যাঁর আসন সবার উপরে

তাঁরই জীবনালেখ্য—

নিউ প্রভাস অপেরার
ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলী

এবং

যুগ যন্ত্রনার
বাস্তব পালারূপ
যুগের ধারাপাত

পরিবেশনায়
নিউ প্রভাস অপেরা

বিনামূল্যে। বিনামূল্যে।

ধবল বা শ্বেত

রোগীদের শাদা দাগ দূরীকরণের চিকিৎসায় আমাদের ঔষুধ প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিনামূল্যে ঔষুধের জন্য লিখুন। চিকিৎসার সংগে সংগেই ফল পাবেন। রোগের বিবরণসহ জানান:

Vidya. V. N. Prasad
P. o. Katri Sarai (Gaya)

প্রায় দুই দশকের ঐতিহ্য নিয়ে "দর্পণ"-এর জয়যাত্রা আজও অব্যাহত।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষাণ্মাসিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

যোগাযোগের ঠিকানা:
সার্কুলেশন ম্যানেজার
৬১নং মট লেন
কলিকাতা-তেরো

সম্পাদক—হীরেন বসু

মুদ্রাকর কর্তৃক নবার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭০ কৈলাস মুখোপাধ্যায় মল্লিক লেনবাজার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৮শে নভেম্বর ১৯৭৫ ॥ দাম ৪০ পঃ

নির্বাচন ৭৭ সালে ?

কংগ্রেস মহলে জল্পনা কল্পনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। কোন কোন নেতার অভিমত ছিয়াত্তর সালেই নির্বাচন করা উচিত। আবার কোন কোন নেতা বলছেন সংসদের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে নির্বাচন সাতাত্তর সালে করতে। ওয়াকিবহাল মহলের সূত্রে এ পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে একথা স্পষ্ট যে ছিয়াত্তর সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন সম্ভবনা নেই।

বেশ কয়েক মাস যাবত নির্বাচনের দিন-ক্ষণ নিয়ে কংগ্রেস মহলে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে। কোন কোন নেতার অভিমত ছিয়াত্তর সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে অথবা মার্চের প্রথমে নির্বাচন করাই ভাল। কারণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা মোটামুটি ছত্রভঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সুফল দেখা দিয়েছে তার সুযোগ দল নিতে পারবে। সর্বোপরি পর পর দু বছর ফসল ভাল হওয়ায় বাজারে চাউলের দাম অনেক কম অন্যান্য শস্যের তুলনায়।

আবার কোন কোন নেতার অভিমত নির্বাচন আরো এক বছর পিছিয়ে সাতাত্তর সালে করাই ভাল। কারণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর যে সব সুফল পাওয়া যাচ্ছে এখুনি নির্বাচন হলে তা উবে যাবে। তাই বর্তমান অবস্থায় আরও এক বছর চললে দল হিসেবে কংগ্রেস লাভবান হবে। এবং তখন নির্বাচনী হাওয়া কংগ্রেসের অনুকূলে যাবে।

মোট কথা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড কোন ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারেন নি। বিভিন্ন সূত্রে দিল্লী থেকে এপর্যন্ত যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় নির্বাচন ছিয়াত্তর সালে না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। সে ক্ষেত্রে সংসদের কার্যকালের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে নেওয়া হবে। সাতাত্তর সালে বেশ কিছু রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা, তখন বিধানসভার আসনের সঙ্গে লোকসভার আসনেরও নির্বাচন করে নেওয়া হবে।

নির্বাচন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব জানা যায় নি। নির্বাচনের দিন ক্ষণ নিয়ে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই শেষ কথা হবে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেস অধিবেশনের পর এ ব্যাপারে মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

আইন কলেজে সবই বেআইন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে মধ্যম পরীক্ষার ফল প্রকাশ হচ্ছে না অনিশ্চিত সব কারণে। পূজোর আগে প্রিলিমিনারী আইনএর ফল বেরিয়েছে অথচ ইন্টারের ফল সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীরব। প্রিলি পরীক্ষার মার্কসিটও কলেজে যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ল' দপ্তরেও খোঁজ নেই। এদিকে বছর ঘুরে পরবর্তী পরীক্ষার সময় চলে এসেছে। মধ্য কলকাতার এবা পরীক্ষক ইন্টার ল'য়ের পাঁচশত খাতা হারিয়ে ফেলেছেন বলে ফল আটকে আছে জানিয়েছেন ল ছাত্র সমিতির পরিমল ভৌমিক। ইন্টার পরীক্ষার্থী নবকুমার শীল বলেছেন দিন দিন ল পরীক্ষায় অনিশ্চয়তা কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেই বাড়াচ্ছেন! অথচ যাচ্ছেতাই ভাবে ভালো ছেলের সর্বনাশ করার পথ সুনিশ্চিত হল রিভিউ প্রথা তুলে দিয়ে। সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজে সকালের ছাত্র প্রতিনিধি সাবের আলী সুরেন্দ্রনাথ কলেজ লাইব্রেরীতে হাজার হাজার টাকার আইন পুস্তক পড়ে পড়ে পচছে বলে অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে দর্পণ এক বছর আগে সংবাদ প্রকাশ করেছে। ল কলেজ নির্বাচন পদ্ধতি এবং কয়েক বছর ছাত্র সমিতির কাজকর্ম, পত্রিকা প্রকাশ না করা এবং সম্পূর্ণ দলাদলি চলেছে। স্থানীয় নেতা সুব্রত সমর্থক দুলাল রায় এবং অশোক দেবের মধ্যে সংঘর্ষ এখন সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজের আঙিনায়।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে পালাবদল

খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ সভাপতি হতে পারেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য কংগ্রেসের এক মহল থেকে জোর চেষ্টা চলছে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে (শত ঘোষ) প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদে বসানোর জন্য। শতবাবুও মন্ত্রিত্ব ছেড়ে এই পদ গ্রহণ করতে খুব আগ্রহী।

গত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। একদা যারা প্রভাবশালী এবং প্রধানমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ট বলে গণ্য হতেন তাঁদের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। সে জায়গায় অন্যরা এসে ক্ষমতার কাছাকাছি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদলের কথা শোনা যাচ্ছে। তাতে বর্তমান দপ্তরবিহীন মন্ত্রী উমাশঙ্কর দীক্ষিত ভাল একটা দপ্তর পাবেন। যে রাজনীতিতে উমাশঙ্করবাবু দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হয়েছিলেন উল্টো রাজনীতিতে তিনি আবার দপ্তর ফিরে পাবেন।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বে পালাবদলের প্রভাব রাজ্যের রাজনীতিতেও পড়েছে এবং আরও পড়বে। বর্তমান পরিবর্তনে শতবাবু এবং তার দলবল বেশ লাভবান হয়েছেন। তারই ফল স্বরূপ দেখা গেল দার্জিলিংয়ে আঞ্চলিক এন এল সি সি অফিসে প্রধানমন্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর উপস্থিতি এবং এন এল সি সি আহূত সভায় ভাষণ দান।

শতবাবু এখন সঞ্জয় গান্ধীর খুব বিশ্বাসভাজন ও ঘনিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীও সঞ্জয় গান্ধীর খুব ঘনিষ্ট। রাজ্য রাজনীতিতে এরা হাত মিলিয়েছেন। এদের সঙ্গে আছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক সেন। দার্জিলিংয়ে প্রধানমন্ত্রী এসে জরুরী তলব দিয়ে প্রণব মুখার্জীকে ডাকিয়ে আনেন। এই ঘটনা তার প্রভাব প্রতিপত্তির ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করে। অবশ্য সিদ্ধার্থবাবুর কাছে প্রণববাবুর দার্জিলিংয়ে আসাটা পছন্দসই হয়েছে বলে মনে হয় না।

শতবাবু এই অবস্থায় প্রভাব খাটিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে রদবদল ঘটাতে চান। বর্তমান সভাপতি অরুণ মৈত্রও এসম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পেয়েছেন। তাঁর ঘনিষ্ট মহল তাঁকে পদত্যাগের জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার অরুণবাবুর ওপর।

প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগের বিচার চেয়ে শতবাবুর সমর্থকরা ঘন ঘন দিল্লীতে যাতায়াত করছেন। এ আই সি সির বর্তমান প্রভাবশালী মহল সবাই এই গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই তাদের তদ্বির সফল হলে অরুণ মৈত্রকে সভাপতির পদ থেকে বিদায় নিতে হবে।

শতবাবু রাজনীতি অঙ্ক মিলিয়ে করতে চান। তিনি তাঁর 'ভাইটি'দেরকেও এই অঙ্ক মিলিয়ে চলতে বলেন। শতবাবুর অঙ্ক মিলে গেলে প্রদেশ কংগ্রেসে রদবদল হবে। এখন অশোক সেন প্রণব মুখার্জী প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতাদের সমর্থনপুষ্ট শতবাবু রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতির পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হবেন।

অত্যাবশ্যক ওষুধ নিয়ে মুনাফাবাজী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাতী কমিটি ভারত সরকারের কাছে গত ছয়ই এপ্রিল তাদের সুপারিশ পেশ করেছেন। বছর শেষ হতে চলেছে, অথচ সুপারিশ কার্যকরী করার নাম গন্ধ নেই। ন্যায্যমূল্যে সমাজের অবহেলিত অংশের জন্য ওষুধ সরবরাহ করার জন্য হাতী কমিটি দুশো রকমের সুপারিশ রেখেছেন, যার দুটিও আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রাসায়ণিক মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন বিদেশী বহুজাতিক ভেষজ কোম্পানীগুলি হাতী কমিটির সুপারিশক্রমে একশ সতেরোটি অত্যাবশ্যক ওষুধের দাম কমানোর সুপারিশ মেনে নিয়েছে এবং আগামী দু-তিন মাসের মধ্যেই তা কার্যকরী হবে। ও যে "বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়"। কারণ সরকার উনিশশো সত্তর সালে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে এই মর্মে চেষ্টা করে একবার হাত পুড়িয়েছিলেন। ঐ বছরেই আইনের ফাঁক দিয়ে ছত্রিশটি বিলাতী কোম্পানী পাঁচ কোটি টাকার মুনাফা বিদেশে পাচার করেছিল এবং সেই মুনাফা পাচারের ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে। গত বছরেও ছয় কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। নীচে বিলাতী কোম্পানীর বিদেশে মুনাফা পাচারের কিছু নমুনা পেশ করছি ঃ

ফাইজার	৬৮ লাখ
সিবা	২৩ ,,
আই. সি. আই	৩২ ,,
গ্লাক্সো ল্যাবরেটরী	৬২ ,,
সায়নামাইড	২৪ ,,
জন ওয়ায়েথ	৪১ ,,
বেয়ার	২২ ,,
রোশ্	১৬ ,,
পার্ক ডেভিস	২৬ ,,
মার্ক, শার্প, ডোম	২৬ ,,

উপরোক্ত বিদেশী—বেশীর ভাগই মার্কিন কোম্পানীগুলো উনিশশো একাত্তর-বাহাত্তর সালে লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা বিদেশে পাচার করেছে এবং সরকার এ ব্যাপারে জেনেও কিছু করে উঠতে পারেন নি। এরা প্রচন্ড শক্তিশালী লবীর

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

আলোচনা চক্রের নামে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের লক্ষ টাকা অপচয়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নতুন শিক্ষাক্রমের দশ সালা পরিকল্পনা কার্যকর করতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জনৈক প্রভাবশালী সদস্য হাতি ঢেপে বেড়াচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনছে। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আগের এগারো ক্লাশের মৃত্যু ঘটছে। তার পরিবর্তে জন্ম নিয়েছে নয়া দশ ক্লাশ। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস ও নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার জন্য পর্ষদ কর্তৃপক্ষ জেলায় জেলায় আলোচনা বন্ধের ব্যবস্থা করেছেন।

পর্ষদ এ পর্যন্ত এধরণের দশটি আলোচনা চক্র করেছে। সব মিলিয়ে যা ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ এক লক্ষ টাকার কম নয়।

সম্প্রতি কোচবিহার জেলায় মহাধুমধাম সহকারে একাদশ আলোচনা চক্র হল। বিদ্যুৎ সংকটের আবর্তে বিব্রত উত্তরবঙ্গ মহারাজের আমলের বেলোয়ারী ঝাড়ের স্মৃতি ভুলে গেলেও ষোলো থেকে 'আঠারোই নভেম্বর' কোচবিহারের টাউন হাই স্কুলের আলোর রোশনাই কলকাতার খাস সাহেব পাড়াকেও হার মানিয়েছে।

টিনের চালের তলায় প্রায় শ দুয়েক স্কুল অর্ধাভাবে ধুঁকছে। শিক্ষকদের মাস মাইনে প্রায়শই সময়মত হয় না। সরকারী সাহায্য এই পার্বত্য অঞ্চলে অনেক তোষামোদের পর আসে। তাও প্রয়োজন অনুপাতে নয়। ছাত্রদের পড়ানোর সাজ সরঞ্জাম নেই। আর বৈজ্ঞানিক পাঠক্রমের চাপে অসহায় শিক্ষক-

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

ভুয়ো ফ্যাসীবিরোধীদের মুখোস উন্মোচন যজ্ঞ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

অনেক দিন আগে একটা গল্পে পড়েছিলাম যে, জনৈক চোর ভীড়ের মধ্য থেকে জনসাধারণকে বোকা বানানোর জন্য 'চোর চোর' বলে পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। জনতা তাকে ধরে ফেলে এবং তারপর প্রহারেন ধনঞ্জয়। গত আঠারো ই নভেম্বর রবীন্দ্র সদনের সম্মুখে পশ্চিমবঙ্গ ফ্যাসি বিরোধী সম্মেলনে প্রবেশ করেই গল্পটা মনে পড়ে গেল।

সি. পি. আই দল এ বছর বিশ্ব নারী বর্ষ কমিটি ও ফ্যাসি বিরোধী সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির কাজ নিয়েছে। রবীন্দ্র সদনের সামনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ত্রিশতম বার্ষিকী পালনের নামে কংগাই কোম্পানী গত ১৮ই নভেম্বর থেকে রাজ্য সম্মেলন করে। প্রথম দিন মধ্যাহ্নে ছাত্র ও শিক্ষকদের আলোচনা ও রাতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকগণ বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয়ার্ধে তৃতীয়/চতুর্থ বক্তা হিসাবে প্যাভলভ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'মানবমন' পত্রিকার পম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন হিটলার মুসোলিনীর কার্যকলাপ নিয়ে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখছিলেন তখন শ্রোতা বলতে সেখানে জনা পঁচিশেক ছিলেন। প্রায় বক্তারাই পালাক্রমে পরস্পরের শ্রোতা হয়েছেন, যদিও সেখানে শ পাঁচেক চেয়ার ছিল। এককোণে অবশ্য শ্রীদুদীপ ব্যানার্জী, শ্রীসৌগত রায়, শ্রীশোভনদেব চ্যাটার্জী জনা দশেক স্তাবক সহকারে বেশ আলোচনা করছিলেন। ওরা তখন বোধ হয়, গত দোসরা এপ্রিল ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হলে জে পির সভায় বিক্ষোভ দেখানোর পূর্বে ওদের বন্ধু রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জীর বিশ্ববিদ্যালয় লনের বক্তৃতা স্মরণ করছিলেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন যে, "আধা নয়, দেশের প্রয়োজনে পুরো ফ্যাসিস্ট হতেও আমরা রাজি"। সুব্রতবাবুরা কথা রেখেছিলেন, তিন মাসের মধ্যেই কাজ দেখিয়ে। "সত্যযুগ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলেন যে, "ফ্যাসিবাদ কায়েমের যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কালান্তর পত্রিকা প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছে।" 'যস্মিন দেশে যদাচার' —এই আর কি।

দ্বিতীয় দিন সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযশোবন্ত চ্যবন। সভাপতি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। চ্যবনকে দেখে শ্রীডাঙ্গের একটি সাংবাদিক বৈঠকের কথা মনে পড়ে গেল।

সি. পি. আই-এর দশম কংগ্রেসে "কংগ্রেসের মধ্যস্থ প্রগতিবাদীদের নিয়ে কেন্দ্রে কেরালা ধাঁচের সরকার গড়া" শীর্ষক কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডাঙ্গে শ্রীচ্যবনকে আধা-আধি বলেছিলেন। তারপর বোধহয় বিভিন্ন কার্যকারণে প্রভাবিত হয়ে শ্রীচ্যবন এখন ষোল আনা না হলেও তিন পোয়া মস্কোপন্থী প্রগতিবাদী হয়ে গেছেন। তাই চ্যবন সাহেব এসেছেন ও ফিতে কেটেছেন। জরুরী অবস্থা জারী করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের প্রচেষ্টাকে কেমন ভাবে রোখা গেছে তাও বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনে (অর্থাৎ বিশে ও একুশে নভেম্বর) শুরু হয় নয়া-ফ্যাসিবাদ, ইন্দো-সোভিয়েত সহযোগিতা প্রসঙ্গে কমিশনের আলোচনা। তৃতীয় দিনে সি. পি. আই মতাবলম্বী ডঃ জগদীশ দাশগুপ্ত, রণজিৎ লাহিড়ী, অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী, 'মনীষা'র কর্তা শ্রীদিলীপ বসু, কংগ্রেসের ডঃ ফলরেণু গুহ এবং শ্রীআবুর রাউফ আনসারী লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জনসঙ্ঘ, আর. এস. এস আনন্দমার্গ প্রভৃতি দক্ষিণপন্থীরা কেন এদেশে নয়া ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চেয়েছিল, কি ভাবে ফ্যাসিবাদ সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ায়, এসব কিছু বক্তারা আলোচনা করেন।

অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স এবং ইলিকট্রনিক্স বিভাগে আমেরিকার "ইউ. এস. এয়ার ফোর্স ক্যামব্রিজ রিসার্চ ল্যাবরেটারিজ" এর সহযোগিতা, ফোর্ড কাউণ্ডেশন, আন্তর্জাতিক সহায়ক কমিটি, পিস কোর, কেয়ার প্রভৃতি আমেরিকান গুপ্তচর সংস্থার কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেন। দিলীপ বসু ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তেইশ সালে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটিতে ক্লারা জেটকিন, তেত্রিশ সালে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা জর্জি ডিমিট্রভের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু আলোচনা করেন নি মহান স্তালিনের ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে বক্তব্য নিয়ে। করলেই বিপদ। ক্রুশ্চেভ কবর থেকে লাফিয়ে উঠবেন যে।

জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ কায়েম হলে স্তালিন বলেছিলেন যে, "একে শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে দেখলেই হবে না। একে ফ্যাসিবাদের পথ প্রশস্তকারী সোস্যাল ডেমোক্রাটদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল বলে ভাবলেই হবে না। একে বুর্জোয়াদের দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবেও দেখতে হবে। নিয়মতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুরোনো পদ্ধতিতে শাসন চালিয়ে যেতে বুর্জোয়ারা এখন অক্ষম, তাই তাদের দরকার ফ্যাসিবাদ।" বিড়লা তার এ্যামবাসাডার গাড়ীর দাম বাড়িয়ে ছত্রিশ হাজার টাকা করল। কিন্তু কেনার লোক কই? শতকরা সত্তর জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে আর শতকরা ২।১ জন ঐ দামে গাড়ি কেনার ক্ষমতা রাখে। তা সেখানে তো ক্রেতা সঙ্কুচিত হওয়ায় সঙ্কট দেখা দেবেই। যার জন্যই দরকার হয়েছিল পার্শ্ববর্তী সাত কোটি লোকের বাজার। কিন্তু এত সত্ত্বেও বিড়লা হিন্দ মোটরের ষোল হাজার কর্মচারীর তিন হাজার অর্থাৎ প্রায় বিশ শতাংশ ছাঁটাই করলেন। অন্য দিকে স্বার্থরক্ষক সরকার বিক্রয় কর কমিয়ে, অর্থনীতিবিদ ডঃনবগোপাল দাসকে দিয়ে বিভিন্ন পথ বের করতে লাগলেন। এখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রটুকুও থাকলে সেখানে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন হবেই। তা যাতে না হতে পারে তার জন্যই দরকার এত সব দমনমূলক ব্যবস্থা।

একুশে নভেম্বর কমিশনে ডঃ পঞ্চানন সাহা, ডঃ এম. এন. দস্তুর, শ্রীসৌগত রায় ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার জন্য ইন্দো সোভিয়েত সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। এরপর আসেন সি. পি. আই-এর রাজ্য সম্পাদক শ্রীগোপাল ব্যানার্জী এবং শ্রীদেবেন দাশ। দেবেনবাবু তাঁর জেলা মেদিনীপুরে কেমন ভাবে একবট্টী সালের তুলনায় দশ বছরে গরীব চাষীর সংখ্যা কমে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ভয়াবহ ভাবে বেড়েছে তার ব্যাখ্যা করেন আদম সুমারীর রিপোর্টের আলোকে। গত দোসরা অক্টোবরের পর বাস্তুহারারা আর ঐ জেলায় আছে কি না তা নিয়ে কিন্তু তিনি আলোচনা করেননি।

গোপালবাবু ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেন। ফ্যাসিবাদ কেমন করে মধ্যবিত্ত যুবকদের আকৃষ্ট করে তা তিনি দেখান। কলকাতার দেওয়ালে "শ্রমিক ভাই লড়াই কর, আমরা তোমার পাশে আছি" এরকম লেখাকে তিনি ব্যঙ্গ করেন এবং একে শ্রমিকশ্রেণীর উপর মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেবার ফ্যাসিস্ট কায়দা বলে বিকৃত অর্থ করেন। সংহতি ও সমর্থন জ্ঞাপক স্লোগানকে এরকম ব্যাখ্যা করে গোপালবাবু অবশ্যই পুলিশ কমিশনারের দেওয়াল লিখন মোহার নিষেধাজ্ঞাকে মদত দেন।

এরপর সভার সভাপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ডঃসন্তোষ ভট্টাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীসেনের, মুখার্জীর প্রতি দুটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

'ভলান্টারী ডিসক্লোসার স্কীম' অনুযায়ী আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনার অঘোষিত আয় ও ধন-সম্পত্তির বিবরণ ঘোষণা করার একটা মস্ত সুযোগ পাচ্ছেন।

এর জন্যে কোন জরিমানা নেই, কোন শাস্তিও নেই। কেবল ন্যায়সংগত হারে কর দিতে হবে।

তাড়াতাড়ি করুন। আয়কর আধিকারিকের কাছে নির্ধারিত ফর্মে আপনার আয় ও ধনসম্পদের বিবরণ ঘোষণা করুন। ঘোষণা করার শেষ তারিখ 31 ডিসেম্বর, 1975

বিশদ বিবরণ ও ফর্মের জন্যে আপনার আয়কর আধিকারিকের সংগে যোগাযোগ করুন।

নিজের সাহায্য নিজে করুন, দেশের সেবা করুন।

ডিরেক্টর অফ ইন্সপেক্শান
(পাবলিকেশান্স অ্যাণ্ড পাব্লিক রিলেশান্স)
ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট
নতুন দিল্লী

ডি. এ. ভি. পি. 75 / 366

দেওয়াল সেন্সরশিপের মহড়া চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জনসাধারণ দৈনিক কাগজগুলো সরকারী বুলেটিনে রূপান্তরিত হওয়ার কারণ ও ফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। প্রেসমাধ্যম হাতছাড়া হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই তারা দেয়ালকেও পূর্বের তুলনায় আরও বেশি করে আগামীদিনে ব্যবহার করবে এটা শাসকরা বুঝেছেন। ঝানু পুলিশ অফিসাররা এখানকার রাজনৈতিক কর্মীদের মানসিকতা বোঝেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর অতি সাম্প্রতিক ঘোষণা, "প্রেস সেনসর পূর্বের থেকে শিথিল করা হয়েছে" প্রচারিত হবার পরই দেয়ালে পোস্টার পত্র-পত্রিকা কিংবা লিখন বে-আইনী করা হয়েছে।

দশই নভেম্বর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়েছে। কলকাতার তেত্রিশটি থানার ও সি পুলিশ কমিশনারকে চুনকাম করা হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন। লালবাড়ীর দেওয়ালে মাঝখানে খানিকটা সাদা চুনের প্রলেপ পড়ে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। একাধিক গৃহস্বামী এতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু "আঠারো ঘায়ের" ভয়ে বাধা দেননি। অবশ্য পুলিশ কমিশনার একথা চিন্তা করে গৃহস্বামীদেরকে শীতের রোদে বাড়ি রঙ করে নিতে বলেছেন।

"মিছিল নগরী কলকাতা"-কে পরিচ্ছন্ন করার নামে পুলিশ কমিশনার এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। এখন তো কলকাতা তাহলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিশ্চয়ই হয়েছে। বেশ তো আপনি একদিন উত্তরের ডালহৌসি থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়ে দেখুন না, দয়া করে। দেখবেন, ট্রাকগুলো বেআইনীভাবে দোতলা সমান উঁচু হয়ে ভারী মাল নিয়ে অনায়াসে কলকাতায় ঢুকছে, যাহাতে ট্রাফিক পুলিশকে ঘুষ ছড়িয়ে। মানব সভ্যতার এতদিন পরেও এই কলকাতাতেই দেখতে পাওয়া যায়, মানুষ পয়সার জন্য আরেকজন মানুষকে টানছে। মাত্র এক মাইল পথ যেতে এখানে বাসে আধঘন্টা সময় লাগে। এই কলকাতায় পথে পথে দরজায় দরজায় গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়া সর্বস্বান্ত ক্ষেতমজুরের দল কলাইয়ের সানকি হাতে 'মা একটু ফ্যান দাও' বলে চিৎকার করে বেড়ায়। এই কলকাতায় বেকার যুবকেরা বাস-লরী থামিয়ে জোর করে চাঁদা আদায় করে। এবং এই কলকাতায় আধ মাইল অন্তর গলিতে গলিতে সন্ধেবেলা ঝিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের ধারে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত পরিবারের বোনেরা ঠায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে পয়সার জন্য। এত সবের পরেও আপনি যদি কুড়ি পয়সায় দু ঘন্টা বাসে বসে থাকতে চান, নাকে রুমাল দেওয়া ছাড়া তাও সম্ভব নয়।

এই আইন কলকাতার পর মফঃস্বল শহরগুলোতেও প্রয়োগ করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এক কথায় প্রেসের পর দেওয়াল মাধ্যম বন্ধ। গরীব পার্টিগুলো অল্প পয়সায় আর প্রচার করতে পারবে না। সম্পূর্ণ মহিলাগণ পরিচালিত লিন্টন স্ট্রীট ডাকঘরের পাশের দেওয়ালে এখনও "কালান্তর" দেখলাম। বোধহয় সি পি আই-এর কলকাতা জেলা পরিষদের সম্পাদক শ্রীসুশীল চক্রবর্তীর অনুরোধে বিশ্ব নারীবর্ষে ঐ দেওয়ালটিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কিংবা কায়েম রাখতে গেলে শোষক এবং শোষিত উভয়কেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য চালাতে হয়। সরকারী বুলেটিনগুলোয় প্রত্যহ প্রধানমন্ত্রী কোথায়, কখন, কি বলছেন তার বিবরণ ফলাও করে বেরুচ্ছে, কিন্তু বিরোধীদের প্রচার স্তব্ধ। প্রেস ও দেয়াল বন্ধ করেও কিন্তু কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রচার কার্য থেকে বিরত করা যাবে না। এবার তাঁরা ব্যাপকভাবে লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করবেন। তখন বোধহয় সরকার ছোট দোকানেও সাদা কাগজ বিক্রি নিষিদ্ধ করবেন, স্কুল-কলেজের ছেলেদের হয়তো পুলিশ থানা থেকে দুটো একটী করে বঙ্গলিপি দেবেন। নইলে বংশতন্ত্র গড়ে উঠবে না যে।

সঞ্জয় গান্ধীর বিভ্রান্তিকর বক্তব্য

সম্প্রতি দার্জিলিংয়ে সঞ্জয় গান্ধী যে সকল ভুল বক্তব্য জনসভায় রেখেছেন, কংগ্রেস সংগঠনের পক্ষে সেই বক্তব্য মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। পশ্চিমবাংলায় উনসত্তর সাল থেকে বাহাত্তর সালে সংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে পশ্চিমবাংলায় তখন লক্ষ্মীবাবুর সমাজবিরোধীদের নিয়ে তৈরী দল এন এল সি সি কি উত্তরবঙ্গে নকশাল ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি বন্ধ করেছিল, না ছাত্রপরিষদ, যুব কংগ্রেস, আই এন টি ইউ সি, কৃষক সংগঠন, মেহনতী মানুষ এগিয়ে এসেছিল ঐ সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিকে বন্ধ করতে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের মাধ্যমে কত শত যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষককে রক্ত দিতে হয়েছিল রক্তপিপাসু দলের হাতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে এনেছিল জাতীয়তাবাদীর পূজারী মহাত্মাজীর আদর্শে বিশ্বাসী কংগ্রেস সংগঠনকে। লক্ষ্মীবাবুর দল কিন্তু তখনও বাংলাদেশে জন্ম নেয়নি। সমাজবিরোধীদের নিয়ে লক্ষ্মীবাবুর দল তৈরী হয় এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে। কিন্তু উনসত্তর থেকে বাহাত্তর-এর নির্বাচন পর্যন্ত সঞ্জয়বাবু কোথায় ছিলেন? দার্জিলিংয়ে সঞ্জয়বাবুর বক্তব্যে মনে হচ্ছে কংগ্রেস সংগঠন দুভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনা আগেভাগেই ছিল। অতএব পশ্চিমবাংলায় ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষকের সংগঠন দিল্লীর রাজনীতি থেকে বহুলাংশে ভিন্নরূপ, সঞ্জয়বাবুর সংগঠনের গোষ্ঠীগত চিন্তা-

মতামত

ধারাকে পশ্চিমবাংলার ছাত্র, যুব কৃষক, শ্রমিক বুদ্ধিজীবি এবং চিন্তাশীল মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছে।

অসীমকুমার সোম
সম্পাদক
পঃ বঃ ছাঃ বিঃ পর্ষদ এবং ইউনিয়ন

মাদার টেরেসা

ছাত্রী অবস্থায় ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের কথা শুনেছি, বইতে পড়েছি। কলকাতায় এসে মাদার টেরেসাকে নিজের চোখে দেখেছি। এ এক অলৌকিক আনন্দঘন বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। চোদ্দ নভেম্বরের দর্পণ সাপ্তাহিকে মাদারের কথা প্রসঙ্গে খানিকটা তথ্য সংযোজন করছি।

উনিশশো একাত্তর সালে পদ্ম সামারিটন এ্যাওয়ার্ড, বাহাত্তর সালে দিল্লীতে জবাহরলাল নেহেরু এ্যাওয়ার্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল আন্ডার স্ট্যান্ডিং দিয়ে মাদারকে সম্মানিত করা হয়েছে যা অনবধানতাবশতঃ শ্রীরাণা ঘোষ তাঁর লেখায় উল্লেখ করেননি। তাছাড়া দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করার পর মাদারের প্রশাসনিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে ওঁকে সেন্ট মেরীজ স্কুলের প্রিন্সিপাল পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল। কালীঘাটের নির্মল হৃদয়াবাস, দমদম বিমানবন্দর রাণওয়ের পাশে নির্মল হৃদয় কেনেডী কেন্দ্র, হাওড়া ষ্টেশনে প্রেমনিবাস, তিলজলা কেন্দ্র, নরেপুর ফার্ম, শান্তিনগর (কুষ্ঠরোগীর পুনর্বাসন কেন্দ্র)—এই সব কেন্দ্রে মাদারের তত্ত্বাবধানে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে যা মিশনারীজ অব চ্যারিটি সংস্থা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন। মিশনে যোগ না দিয়ে ও বাইরে থেকে মাদারকে যারা ভালোবাসেন তারা পৃথিবীর বড়ো বড়ো নগরে গড়ে তুলেছেন "ইন্টার ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব কোওয়ার্কার্স অব মাদার টেরেসা" নামে প্রতিষ্ঠান—যাদের কাজ হচ্ছে সর্বহারাদের সেবা ও সব রকমের সুযোগ সুবিধা দান।

বিজয়া চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

কামরাজের শেষ ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার জন্যে তামিলনাড়ুর দুই কংগ্রেসের এক হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রধান মন্ত্রী।

দলত্যাগকে উৎসাহিত করা হবেনা—কংগ্রেস সভাপতি বরুয়া।

* * *

চৌ-এর পরে কে? — বিশ্ব জিজ্ঞাসা।

জানি। কিন্তু বলব না!

* * *

সেতারের পর রবীন্দ্র সংগীতের ভালো বাজার শোনা গেল মার্কিন মুলুকে, সদ্যপ্রত্যাগত সুচিত্রা মিত্রের রিপোর্ট।

অবশ্য এই পরিশ্রমণে অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের টাকি খরচা করেই যেতে হয়েছে।

* * *

কালো টাকার হিসেব দেয়ার জন্যে শেষ সুযোগ দেয়া হয়েছে।

আশা করা যায় দেশপ্রেমী ব্যবসায়িসমাজ এ সুযোগ গ্রহণ করবেন।

* * *

নাট্যপরিচালক উৎপল দত্ত এখন কী করছেন?

কেন? তিনি ম্যাকবেথ নামিয়ে দিয়েছেন।

* * *

মৃণাল সেনের "এক অধুরী কহানী" দেখেছেন?

দেখেছি। আনন্দবাজার কী বলে তার জন্যে অপেক্ষা করছি। "গোত্রান্তর" কিনা!

* * *

বাজে শিবপুর কী সত্যিই বাজে?

হ্যাঁ। এক কালে দিনরাতই বাজনা শোনা যেত।

* * *

বলুন তো উত্তমকুমার কী খেতে ভালোবাসেন?

কবিতা সিংহকে জিজ্ঞেস করুন।

* * *

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "ভেলেনাপোতা আবিষ্কার" গল্পটি পড়েছেন? ইংরেজি অনুবাদ করলে কেমন হয়?

কেন? প্রেমেনবাবুর আগে একই জিনিস আরো ভালো করে লিখেছেন, গল্‌সওয়ার্দি "অ্যান অ্যাপল ট্রি"। পড়েন নি? অরিজিনাল ছেড়ে ইংরেজি-পাঠক কেন প্রেমেনবাবুর অনুবাদ পড়তে যাবে?

* * *

সাহিত্যে চুরি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী বলেন?

শক্তিশালী লেখক স্বীকরণ করেন, দুর্বল অনুকরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের "কঙ্কাল" গল্পটি স্বীকরণের দৃষ্টান্ত।

* * *

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ডায়েরি" অনুযায়ী লেখক কী শেষ জীবনে আদ্যাশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন?

পূজা বন্ধের আগের সংখ্যায় ইরাবান বসুরায়ের রচনাটি পড়ুন। তিনি ব্যাপারটি ঠিক ধরেছেন। তবে মাণিক-জামাতা শ্রীমান্ যুগান্তর চক্রবর্তীর এই ডায়েরি প্রকাশের ব্যাপারে উদ্দেশ্য দুরভিসন্ধিমূলক। অন্তত মাণিক সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন করবার কোনো সাধু সংকল্প তাঁর নেই। অগ্রণী বুক ক্লাবের দেববাবু ও প্রফুল্লবাবু সম্পর্কে যে মন্তব্য ডায়েরিতে রয়েছে তার সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। দেববাবু মৃত, কিন্তু প্রফুল্লবাবুর রায় এখনো বেঁচে, মাণিকবাবুর "পরিস্থিতি" গল্পগ্রন্থের রয়্যালটির টাকা তাঁরা যথারীতি পরিশোধ করেছেন। কাজেই সমস্ত বিচার না করে ডায়েরির ওপর নির্ভর করলে অকারণ অগ্রণী বুক ক্লাবের সুনাম ক্ষুণ্ণ করা হয় বলে আমরা মনে করি। শ্রীমান্ যুগান্তর এক কালে "অগ্রণী"র সঙ্গে লেখক সূত্রে যুক্ত ছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁকে একটু সৎ হতে কে বাধা দিয়েছিল?

খবরে প্রকাশ মহিলা বর্ষে সম্পূর্ণ সুরুচিসঙ্গতিবর্জিত দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন মহিলারা। ঢাকও বাজিয়েছিলেন জনৈক তরুণী। পুরোহিত মহিলা না পুরুষ জানা যায়নি।

* * *

সুযোগ পেলে মহিলারা যে কোনো কাজে দক্ষতা দেখাতে পারেন —সুবচনী। বিধবা বিবাহ আন্দোলন ঘটিয়ে বিদ্যাসাগরই করেন।

শরৎ জন্মশতবর্ষ উৎসবে রবীন্দ্র সংগীত কেন?

শরৎবাবু যে গান লিখে যাননি!

* * *

দেখেছেন? পুজোর সময় রাস্তাঘাটে কোথাও এক টুকরো আবর্জনা ছিল না?

থাকবে কী করে? কথাই ছিল, না মরলা পরিষ্কার না বোনাস।

* * *

খবরে প্রকাশ, পশ্চিম বাঙলায় আর একজনও বাস্তুহারা নেই!

এখন বাড়ি তোলার খরচটা পেলেই হয়।

* * *

—আহা, "কালিদাস" বাঙালী ছাড়া কারুর নাম হয়?

মহাকবি কালিদাস কী বাঙালী ছিলেন?

—"মল্লবভি" মানে কী?

—বোধহয় সাঁড়াশি-? নাকি? ছিন্নানবন্ধই?

পুনর্মুদ্রণ

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শিল্পীর স্বাধীনতা

শিবনারায়ণ রায়

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মৃত্যুতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের কতটা ক্ষতি হোল, ঠিক জানি না কিন্তু তার ফলে এদেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং দক্ষ রূপায়ণের সাধনা যে অকস্প্রা আত্মপ্রত্যয় এবং আদর্শনিষ্ঠার পরিপন্থী নয়, এ কথাটা যখন এদেশের গুণী ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই ভুলতে বসেছেন, তখন সেই মারাত্মক বিস্মরণের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিবাদ হিসেবে শিশিরকুমার আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর নৈসর্গিক অভিনয় প্রতিভার কথা কে না জানে? কিন্তু যে অসামান্য চরিত্রবলের সমর্থনে এই প্রতিভা শিল্পোত্তর অর্থসমৃদ্ধি অর্জন করেছিল তার তুলনা দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বাংলা দেশে আমার অন্তত চোখে পড়েনি।

মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা সভ্য সমাজের বিধি তবু শিশিরকুমার প্রসঙ্গে চরিত্রবলের উল্লেখ অপ্রত্যাশিত ঠেকতে পারে। প্লেটোর কাল থেকে অভিনেতাদের সম্বন্ধে চরিত্রহীনতার অভিযোগ সুবিদিত; উক্ত গ্রীক দার্শনিক যে সব যুক্তির দ্বারা এই অভিযোগ প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় না থাকলেও এই অভিযোগের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাধারণের মনে বিশেষ সন্দেহ দেখা যায় না। শিশিরকুমার অধ্যাপনার নির্ঝঞ্ঝাট বৃত্তি ত্যাগ করে নটের প্রলোভনসঙ্কুল পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর সুরাসক্তি এবং অমিতব্যয়ের কথা কারো অজানা ছিল না; তিনিও তা গোপন করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন না। তাঁর অতি বড় অনুরাগীরাও সম্ভবত তাঁর পারিবারিক জীবনকে আদর্শস্থানীয় বলে দাবী করবে না, তবে শিশিরকুমারের চরিত্রবল কোনখানে?

এই প্রশ্নের আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস বুলিপোষা বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বয়ঃপ্রাপ্তির জন্যে এ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

দুই

সমকালীন কোনো পশ্চিমী সমাজতান্ত্রিক আধুনিক সমাজকে "নিঃসঙ্গ জনতার সমাজ" বলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানব চরিত্রকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। এর মধ্যে যে শ্রেণীটি সংখ্যার দিক থেকে সব চাইতে বড় তার সদস্যরা নিজেদের চরিত্রের কাঠামো নিজেরা গড়ে তুলতে অনিচ্ছুক এবং সে কারণে অক্ষম। এঁরা সবসময়ে অন্যদের নির্দেশ অনুসারে নিজেদের পরিচালিত করতে অভ্যস্ত। উক্ত সমাজতাত্ত্বিক এই জাতীয় চরিত্রের নামকরণ করেছেন "অপর নির্দ্বারিত" বা "আদার ডাইরেক্টেড।" এঁরা (পুরুষ হলে) শ্রীমান উত্তমকুমারের অনুকরণে চুল রাখেন, (মেয়ে হলে) সুচিত্রা সেনের অনুকরণে শাড়ী পরেন। আর পাঁচজনের পছন্দের ছাঁচে নিজেদের ঢালতে পারলে এঁরা সুখী। বাহারে যখন "পরম পুরুষকে" নিয়ে খুব মাতামাতি, তখন এঁরা উক্ত বই সংগ্রহের জন্যে বইয়ের দোকানে "ভিউ" দিয়ে থাকেন, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের সার্টিফিকেট নিয়ে অবধূত মহাশয় বাজারে আবির্ভূত হলে তাঁর বই পড়ার জন্যে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে এঁদেরই ভীড় দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র "ঐতিহ্য-নির্দ্বারিত" বা "ট্রাডিশান ডাইরেকটেড"। এরা সংখ্যায় চাইতে ইতিহাসকে বেশী মূল্য দেন, সিনেমার নায়কের চাইতে শাস্ত্রীয় নির্দেশকে। দীর্ঘ দিন ধরে সমাজ যে সব প্রত্যয় এবং আচার অনুষ্ঠান মেনে এসেছে, তারই আদলে এঁদের চরিত্র গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য প্রথম শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রে নির্ভরযোগ্যতা বেশী। কিন্তু নানা কারণে কোনো সমাজের ঐতিহ্যে যখন ভাঙন ধরে তখন এঁদের অবস্থা বড় অসহায়। শুধু তৃতীয় শ্রেণীর মানুষই "অন্তর নির্দ্বারিত" (inner-directed) বা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন। এঁরা ঐতিহ্যের নির্দেশ মেনে বা জনযূথের অনুসরণ করে নিজেদের জীবন পরিচালিত করেন না। আপন বুদ্ধি, কল্পনা এবং প্রয়াসের দ্বারা এঁরা নিজেদের নির্বাচিত আদর্শে আপন আপন জীবন গড়ে তোলেন। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের যুগে মানবতন্ত্রীরা এঁদের কথাই ভেবে ঘোষণা করেছিলেন, মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা পরতন্ত্র মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়।

এখন আমাদের দেশে সহজতাব্দী ধরে "ঐতিহ্য নির্দ্বারিত" মানুষকেই চরিত্রবান বলে কল্পনা করা হয়েছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত মনে এই ধারণা সম্বন্ধে সংশয় জাগে; এবং এদেশের কিছু মানুষ নিজের বিবেক অনুযায়ী আপনাকে গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেন। রামমোহন রায় এবং ডিরোজিও বাংলা দেশে এই অভিনব নীতি চিন্তার প্রথম প্রবক্তা।

প্রচলিত আদর্শের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে স্বকীয় বুদ্ধি বিবেক অনুযায়ী এঁরা আপন আপন ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করে তোলেন। যে স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা প্রৌঢ় রামমোহন এবং তরুণ ডিরোজিওর চরিত্রে বাক্তিত্বের সমৃদ্ধ বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল, আমার বিশ্বাস গত দেড়শ বছরের মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যা কিছু স্মরণীয় সৃষ্টি তা মুখ্যত এই প্রেরণারই ফল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ যাঁর মধ্যে জাগ্রত তাঁকে কোনো ভয় অথবা প্রলোভন স্বধর্মচ্যুত করতে পারে না। তিনি হয়ত মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত, অথবা অমিতব্যয়ী হতে পারেন, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে অথবা সামাজিক শাস্তির আশঙ্কায় নিজের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিতে তিনি নারাজ। শাস্ত্র অথবা বিজ্ঞাপনের দ্বারা অনুশাসিত গড্ডল সমাজ তাঁকে দুশ্চরিত্র আখ্যা দিতে পারে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার যাঁরা আদি প্রবক্তা, পশ্চিমী রেনেসাঁসের সেই মানবতন্ত্রী মনীষীরা এই স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার মধ্যে যথার্থ চরিত্রবলের সন্ধান পেয়েছিলেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী উপরোক্ত অর্থে আমাদের যুগের অন্যতম চরিত্রবান মহৎ শিল্পী। যৌবন কালে যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় তাঁকে অধ্যাপনার সমাজ সম্মানিত বৃত্তি ত্যাগ করে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সমাজ বিকৃত পথ বরণ করার সাহস যুগিয়েছিল, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাতে কোনো শিথিলতা দেখা দেয়নি। তাঁর স্বনির্বাচিত শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে তিনি কোনো রকমের পরতন্ত্রতার সঙ্গে রফা করেননি। উনিশ শতকের বাংলাদেশে এ জাতীয় চরিত্রবল হয়ত একেবারে দুর্লভ ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে এ ধরণের চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যে কত কঠিন আমাদের সমকালীন শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার বিচার করলেই তা বোঝা যায়। যে দেশে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকরাও চিত্র এবং বিজ্ঞাপনের লোভে নিকৃষ্টতম সিনেমা পত্রিকার চড়াদামে নিজেদের রচনা প্রকাশে উদ্যোগী, ক্ষমতাবান গল্পলেখক প্রকাশকের চাপে ছোট গল্পকে খেলিয়ে উপন্যাস বানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, দেশশ্রুত অধ্যাপক অপরের লেখা ছাত্রপাঠ্য নোট বইতে মোটা সেলামীর বিনিময়ে নিজের নাম লেখক হিসেবে ছাপতে দিতে প্রস্তুত, প্রখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক জনপ্রিয়তার আকাঙ্খায় অথবা মালিকের হুকুমে নিজের প্রত্যয় বিরোধী প্রস্তাব ফলাও করে উপস্থিত করতে দু'বার, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভের জন্যে যখানে শিল্পী সাহিত্যিক মনীষীরা ঘোর প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত—সে দেশে শিশিরকুমারের মত স্বাধীনচেতা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ শিল্পীর উপস্থিতি বিস্ময়কর না ঠেকে উপায় কি?

আমাদের দেশে (এবং পৃথিবীর অন্য দেশেও) শিল্পী এবং মনীষীদের স্বাধীনতা আজ নানাদিক থেকে আক্রান্ত। রুশ, চীন, স্পেন কিংবা পর্তুগালের মত সুস্পষ্ট ভাবে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই আক্রমণের ভয়াবহ রূপ আজ আর গোপন নেই। কিন্তু আধুনিক কালের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক সমাজের এই আক্রমণ অতটা বীভৎস আকার না নিলেও মোটেই অনুপস্থিত নয়। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, কিন্তু আমাদের দেশেও এই আক্রমণ ক্রমেই যেসব পথে প্রবল হয়ে উঠেছে, তার একটা খুব সংক্ষিপ্ত আভাস এই প্রসঙ্গে দেওয়া দরকার মনে করি। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল ব্যবসায়ীদের আক্রমণ, শিল্পী নিজের প্রেরণার ভাগিদে রূপ সৃষ্টি করতে পারেন; কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকেও ব্যবসায়ীর দ্বারস্থ হতে হয়। ব্যবসায়ী শিল্পকর্মের গুণাগুণ ঠিক করেন বাজারের চাহিদার মাপকাঠি দিয়ে। যে শিল্পীর যথেষ্ট পৈত্রিক বিত্তপশার আছে অথবা অন্য কোন সূত্রে জীবিকা নির্বাহের বন্দোবস্ত আছে, তিনি হয়ত ব্যবসায়ীর ফরমাসকে অগ্রাহ্য করে নিজের খুশীমত সৃষ্টি করে যেতে পারেন (বাঙালী লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং সম্প্রতিকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্নদাশঙ্কর রায় এরই উদাহরণ)। কিন্তু এদেশে অধিকাংশ শিল্পী সাহিত্যিকই দরিদ্র; প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ধীরে ধীরে জীবিকা নির্বাহের জন্যে শিল্পের ওপরে একান্তভাবে নির্ভর করতে শুরু করেছেন। তাঁদের পক্ষে ব্যবসায়ীদের মানদণ্ডকে অগ্রাহ্য করার অর্থ অনেক ক্ষেত্রে হয়ত সপরিবারে উপবাস। বিশেষ করে যদি তাঁরা এক্ষেত্রে নবাগত হন। আবার ব্যবসায়ীদের ফরমাস মাফিক তাঁদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করে যখন তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠ হন, তখন সুযোগ থাকলে স্বাতন্ত্র্যের সাধনায় ফিরে যাবার সামর্থ্য আর তাঁদের থাকে না। বাংলাদেশে বৈষয়িক নির্দেশের চাপে শিল্প বিবেকের এই অবক্ষয় আমাদের চোখের সামনে দিনে দিনে মর্মান্তিক ভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। কয়েক বছর আগে জাঁ পল সার্তর-এর একটি নাটক আমি বাংলায় তর্জমা করি, বাংলাদেশের কোনো বিখ্যাত প্রকাশক তাঁদের কোনো উপদেষ্টার মুখে সেটির কথা শুনে তর্জমাটি প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন, আমার সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি বলে বসলেন যে এদেশে নাটকের দোকান চাহিদা নেই। মূল নাটকটিকে তর্জমাতে যদি আমি উপন্যাসের আকার দিতে রাজী থাকি, তাহলে তিনি তখনই কিছু আগাম টাকা দিতে পারেন। আমি তাঁকে কি উত্তর দিয়েছিলাম পাঠক অনুমান করে নেবেন, কিন্তু যদি সেদিন আমার ঘরে চাল বাড়ন্ত হত, তাহলে?

বাঙলা দেশের কোনো বহুল প্রচারিত একটি পত্রিকার সম্পাদক একবার আমাকে তাঁর কাগজে লেখার জন্য অনুরোধ করেন, একটি দুইটি লেখা বার হবার পর তিনি সসঙ্কোচে নিবেদন করলেন, কাগজের মালিকরা জানিয়েছেন যে, আরেকটু মোলায়েম করে না লিখলে আমার প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় বার করা কঠিন হবে। সৌভাগ্যবশত আমি পেশাদার লেখক নই, এবং আমি আশৈশব দারিদ্র্যে অভ্যস্ত। ফলে ফরমায়েসী লেখার নৈপুণ্য আমাকে অর্জন করতে হয়নি; তবে বড় কাগজে লেখার পথ বন্ধ হল।

ব্যবসায়ীরা বাজারের চাহিদা দেখে শিল্পের মূল্য নির্ণয় করেন; আর বাজারের চাহিদা ঠিক করেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক জনসাধারণ। শিল্পী হয়ত কোন রকমে একজন ব্যবসায়ীকে প্রভাবান্বিত করে তাঁর শিল্পকর্ম প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সেটি যদি সাধারণ ক্রেতাকে আকৃষ্ট না করে তাহলে কোন ব্যবসায়ী দ্বিতীয়বার আর সে শিল্পীকে সুযোগ দিতে রাজী হবেন? এখন জনসাধারণের রুচি যদি সুশিক্ষিত হোত, তাহলে শিল্পী কিম্বা বুদ্ধিজীবীদের কোন সমস্যা ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথিবীর কোন দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের শিল্পরুচি খুব একটা সূক্ষ্ম নয়। উপযুক্ত শিক্ষা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে অনুশীলনের অভাব জনরুচির এই স্থূলতার প্রধান কারণ।

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

বিনামূল্যে। বিনামূল্যে।

ধবল বা শ্বেত

রোগীদের শাদা দাগ দূরীকরণের চিকিৎসায় আমাদের ওষুধ প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিনামূল্যে ওষুধের জন্য লিখুন। চিকিৎসায় সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাবেন। রোগের বিবরণসহ জানান:

Vidya. V. N. Prasad
P. o. Katri Sarai (Gaya)

দিয়াগো গার্থিয়ায় মার্কিনী ষড়যন্ত্রের কৌশল

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাজ্য লিপ্সা নতুন নয়। সতেরোশ তিরাশি সালে থেকে উনিশশো সতেরো সাল পর্যন্ত নানা কৌশলে এ কাজটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করে যাচ্ছে। সতেরোশ তিরাশি সালে ভারতীয়দের তাড়িয়ে পশ্চিমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। উনিশশো দুই সালে পানামা খাল অঞ্চল দখল ও উনিশশো সতেরো সালে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ ক্রয়ের মধ্য দিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদী বাসনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চরিতার্থ করে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেরোটি উপনিবেশ গড়ে তোলে। পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদের কৌশল বদলায়। সরাসরি জমি দখলের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের মারফৎ ঔপনিবেশিক শোষণের রাজনীতি নেয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রায় দু হাজারটি ছোটবড় সামরিক ঘাঁটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। অনা দেশের ভূখণ্ডে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সৈন্য পোষা, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা যে শান্তির সহায়ক নয় তা সহজেই অনুমেয়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলির সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ধ্বংস করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নানা ধরণের ফন্দিফিকির করছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দিয়াগো গার্থিয়ায় সামরিক ঘাঁটির মার্কিন সিদ্ধান্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির অঙ্গ।

দিয়াগো গার্থিয়ার মার্কিন ঘাঁটি হলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া, আফ্রিকায় ছ হাজার থেকে আট হাজার মাইল এলাকার বিরাট অঞ্চলে সামরিক আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ইতোমধ্যে বাহরিন দ্বীপপুঞ্জ, কোকো দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়ার নর্থওয়েস্ট কেপ, ইরাণ, তাইল্যাণ্ডে মার্কিন ঘাঁটি আছে। অধিকন্তু, সেসেলিস্ দ্বীপাবলির বড় দ্বীপ মা হো তে সামরিক সংবাদ আদানপ্রদানের বন্দোবস্ত আছে। দিয়াগো গার্থিয়ায় ঘাঁটি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধে হল- দক্ষিণ আফ্রিকার সাইমনস ঘাঁটি, মরিসাসের পোর্ট লুই, সেসেলিস, দিয়াগো গার্থিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দীর্ঘ নৌ সেনার এক পরিমন্ডল গড়ে উঠবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের।

এখানে দিয়াগো গার্থিয়ায় মার্কিনী চক্রান্তের সামান্য কিছু ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল। ভারত মহাসাগরের গোস দ্বীপাবলির একটি দ্বীপ এই দিয়াগো গার্থিয়া। দ্বীপটি দৈর্ঘে পঁচিশ কিলোমিটার, প্রস্থে দশ কিলো মিটার। দ্বীপটি ভারতের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ষোলশ কিলোমিটার দূরে। এই দ্বীপটির আসল মালিকানা মরিসাস সরকারের। মরিসাস ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তিতে ঠিক হয় যে, গ্রেট ব্রিটেন প্রয়োজনে দ্বীপটিকে যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। এই দ্বীপটির প্রতি নজর পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বীপটিকে নিজের কব্জায় নেবার চেষ্টা করে। এই জঘন্য উদ্দেশ্যে দুই সাম্রাজ্যবাদ, গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথমে একটি চুক্তি হয়। পরে আরো সুবিধাজনক সর্তে শেষতম চুক্তি হয় উনিশশো তিয়াত্তর সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারী। বিশ্বজনমতের ধিক্কার অগ্রাহ্য করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উনিশশো একাত্তর সাল থেকেই ঐ দ্বীপে সামরিক ঘাঁটির কাজ শুরু করে দিয়েছে। ঐ সামরিক ঘাঁটির কাজ উনিশশো ছিয়াত্তর সালে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে পেন্টাগনের। দিয়াগো গার্থিরায় প্রথম দিকে যেখানে দশের মত মার্কিন বিশেষজ্ঞ ছিল সেখানে এখন বিশেষজ্ঞের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকেই ঐ অঞ্চলে মার্কিন সপ্তম নৌবহর ঘুরপাক খাচ্ছে। তৃতীয়ত, তাইল্যাণ্ডে মার্কিন বিমান ঘাঁটির সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের এক ব্যবস্থা করা হয়েছে। পেন্টাগনের পরিকল্পনা হল আড়াই হাজার মিটার দৈর্ঘের বিমান নামার জায়গা নির্মাণ করা, যাতে কুখ্যাত বি-৫২, এফ ১১১ বিমান ওঠানামা করতে পারে। এই সর্বনাশা সামরিক ঘাঁটির জন্য মার্কিন কংগ্রেস এক কোটি একাশি লক্ষ ডলার ব্যয় বরাদ্দ করেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই নতুন ঘাঁটি নির্মাণের বিরুদ্ধে ভারত সিংহল সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিশিষ্ট দেশগুলো প্রতিবাদ করেছে। এই নতুন ঘাঁটির বিরুদ্ধে দেশে দেশে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ হচ্ছে। গণতান্ত্রিক মানুষের তীব্র প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া-আফ্রিকার বুকে নতুন করে যুদ্ধ চালাবার ষড়যন্ত্র করছে।

শিশির ভাদুড়ী

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

তবু পশ্চিমের অনেক দেশে দীর্ঘদিন ধরে যথার্থ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকার ফলে গণরুচির আক্রমণ থেকে প্রতিভাবান এবং পরীক্ষাশীল শিল্পী প্রতিভাকে রক্ষা করার মত কিছু বিদগ্ধ পৃষ্ঠপোষক আজও বর্তমান; এবং সংখ্যায় একেবারে নগণ্য নয়। কিন্তু আমাদের দেশে সম্প্রতিকালে অক্ষর পরিচয় যেমন বাড়ছে উচ্চ শিক্ষার মান তেমনি দ্রুত নামছে। এদেশে শিল্প সাহিত্যের বিবর্দ্ধমান পৃষ্ঠপোষক সম্প্রদায় কোন জটিল চিন্তা সুস্থ শিল্প কর্ম অথবা ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ কল্পনার আবেদনে সাড়া দিতে প্রায় অক্ষম, যাঁদের হয়তো সে বৈদগ্ধ আছে তাঁরা সংখ্যায় এতই অল্প যে তাঁদের পৃষ্ঠপোষণার উপরে নির্ভর করে কোন দরিদ্র শিল্পী অথবা মনীষীর পক্ষে জীবিকা উপার্জনের আশা নিতান্ত অসম্ভব কল্পনা। জনরুচি সেই শিল্পকর্মকেই তারিফ করতে পারে যাতে আছে সস্তা ভাঁড়ামি আর না হয় নির্বোধ ন্যাকামী যাতে ধর্মের সস্তস্ত অসহায় বোধের সঙ্গে মেশানো হয়েছে ক্লীবের যৌনলালসা কিংবা রাজনৈতিক মাতলামির সঙ্গে ক্রাইমের রোমাঞ্চ। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "সত্যাসত্য"র তিন সংস্করণ প্রকাশিত হতে দু দশক লেগে যায়; কিন্তু মনোজ বসু বিমল মিত্র এবং অবধূতের রচনাবলীর মাসে মাসে পুনর্মুদ্রণ ঘটে। সৌখীন অভিনেতারা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নাটক কেউ অভিনয় করতে চান না, অথচ "উল্কার" মত নিকৃষ্ট নাটক দেখার জন্যে মাসের পর মাস ভীড় বেড়েই চলে। সত্যজিৎ রায়কে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যেতে হয় বিদেশে এদিকে "লুকোচুরির" প্রযোজক বক্স অফিসের দৌলতে লাল হয়ে ওঠেন। যথার্থ আত্মপ্রত্যয়ী শিল্পী তা সত্বেও হয়ত নিজের সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠ থাকতে পারেন। কিন্তু গণসমর্থনের লোভ এবং গণ ঔদাসীন্যের ভয় যে সকলকে না হোক অনেক ক্ষমতাবান শিল্পী এবং মনীষীর মনে সচেতন অথবা অবচেতন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং করছে একথা অন্তত বাঙলা দেশে বাস করে অস্বীকার করা অসম্ভব।

তৃতীয় আক্রমণের উৎস হোল রাজনৈতিক দল এবং মতবাদ। ব্যবসায়ীরা যেমন জনসাধারণের চাহিদার হিসেব করে শিল্পী এবং মনীষীদের সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে রাজনৈতিক দলরাও তেমনি গণশক্তির প্রতিভূ হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত। বাংলাদেশে এদিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপই বেশী প্রকট; কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিও এ ব্যাপারে একেবারে পিছিয়ে নেই। শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং বৈষয়িক সাফল্য আজকের দিনে মুখ্যত নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের ওপরে; এবং বিজ্ঞাপনের টেকনিকে রাজনৈতিক দলগুলির নিপুণতা অসামান্য। শুধু বার বার ঘোষণার জোরেই কম্যুনিস্টরা সুভাষ মুখোপাধ্যায় অথবা সুকান্ত ভট্টাচার্যকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি বলে জনমনে প্রতীতি উৎপাদনে সক্ষম। শুধু মুখে মুখে কুৎসা রটিয়ে তারা কোন ক্ষমতাবান সাহিত্যিক সম্বন্ধে জনমনে আজও অশ্রদ্ধা সঞ্চারে সমর্থ। দলীয় মতবাদ এবং নির্দেশ অভ্রান্ত বলে মেনে নিলে তবেই দলের সমর্থন লাভ সম্ভবপর হয়। কিন্তু যেমন ব্যবসায়ীর ফরমাস অথবা গণরুচির দাবী তেমনি দল এবং মতবাদের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ শিল্পীর আত্মহত্যা।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর গত বারো বছরের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতার ওপরে নতুন এক আক্রমণ চোখে পড়ছে। এটি হোল রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণ। স্বৈরতন্ত্রে রাষ্ট্র গায়ের জোরে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা হরণ করে। আমাদের এই "জনসেবী" গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের আক্রমণের চেহারাটা অন্য রকম। আমাদের শিল্পী মনীষীরা দরিদ্র; কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে বিত্ত এবং ক্ষমতা প্রায় অপরিসীম। উপাধি এবং পুরস্কার দিয়ে, নির্দায়িত্ব অথচ উঁচু মাইনের চাকরীতে নিয়োগ করে, পৃষ্ঠপোষিত লেখকের রচনা প্রচুর সংখ্যায় কিনে, দেশ বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে—অর্থাৎ নানাভাবে ঘুষ দেবার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র আজ শিল্পী সাহিত্যিককে তার অনুগত জনে পর্যবসিত করতে উদ্যোগী। হয়ত এর পেছনে কোন সচেতন অসদিচ্ছা এখনো সক্রিয় নয়; কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এর বিষময় প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

সমকালীন বাঙালী শিল্পী এবং মনীষীদের তুলনায় শিশির কুমারের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে তিনি আজীবন এই চতুর্বিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর শিল্পীবিবেককে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন, তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রফা করেননি; তাই ভারতবর্ষের সব চাইতে প্রতিভাবান নটকে শেষ জীবনে রঙ্গমঞ্চের অভাবে মাসের পর মাস নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে হয়েছে। যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে কি ভাবে তিনি বার বার দর্শকদের মূঢ়, অসহিষ্ণু দাবীকে প্রকাশ্যভাবে ধমকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছেন, কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন পাবার জন্য তিনি জীবনে চেষ্টা করেননি, অথচ এদিকে সামান্য ইঙ্গিত দিলেই যে কোনো সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের নেতৃত্ব পাওয়া তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল, আর মৃত্যুর পূর্বে এই নিঃস্ব শিল্পী আকাডেমীর চাকরী এবং সরকারী খেতাব যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এই হতভাগ্য দেশের মানস ইতিহাস যদি কোনোদিন লিখিত হয় তাতে সে কাহিনী একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে। অথচ কে না জানে, যে কোন অভিনেতার পক্ষে এই সব প্রলোভন জয় করা কত কঠিন, চিত্রকর নিজের মনে আঁকতে পারেন, মনীষী নিজের ভাবনা লিপিবদ্ধ করে সুখী হতে পারেন কিন্তু অভিনেতার রঙ্গমঞ্চ চাই, দর্শক চাই, বিজ্ঞাপন চাই, তাছাড়া যেহেতু সমাজ অভিনেতাকে শ্রদ্ধার আসন দিতে অপ্রস্তুত, সেহেতু রাষ্ট্রীয় সম্মানের উপরে তাঁর প্রবল আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। শিশির কুমার শুধু যে এসব আক্রমণকে প্রকাশ্যভাবে প্রতিহত করেছিলেন তাই নয়; তাঁর মনের গোপনে এই সব প্রলোভন কিছুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি।

বহুদিন আগে দার্শনিক এপিকুরস বলেছিলেন, দেবতাদের খুশী করার জন্যে নয়, সমাজের শাস্তির ভয়ে নয়, সৎ হয়ে আনন্দ পাই বলেই আমি সৎ। এটি যথার্থ মানবতন্ত্রীর কথা; আর এই প্রত্যয় ছাড়া শিল্পীর স্বাধীনতা নিরর্থ, জীবিকার জন্য নয়, প্রতিষ্ঠার লোভে নয়, অভিনয়ের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকৃত প্রকাশ, এ সত্য উপলব্ধি করে শিশিরকুমার অভিনয়ের পথ বেছে নিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে কজন শিল্পী সাহিত্যিক মনীষীর জীবন এমন উপলব্ধির দ্বারা পরিচালিত, জানতে ইচ্ছা করে।

[দর্পণ, ১৪ই আগস্ট, ১৯৫৯]

ভিখারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতায় ভিখারীর সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে বহুদিন। পাঞ্জাবে অর্ডিনান্স করে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করা হলেও পশ্চিমবঙ্গে তেমন কিছু হয়নি অথচ ভিক্ষাবৃত্তি ক্রমশই উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। ভিখারী আর ভবঘুরে লোকেরাই নানা রকম রোগ ছড়াচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত শ্রীজন ক্লার্ক কলকাতায় বলেছেন কুষ্ঠরোগীদের বেশীর ভাগই কলকাতা এবং আরও বড় বড় শহরের ভিখারী আর ভবঘুরে। কৃত্রিম দৈহিক বিকৃতি সৃষ্টি করা, ঘা করা, অ্যাসিড ইত্যাদি দিয়ে দেহ পুড়িয়ে ভিক্ষা করার রীতি এবং আড়কাঠির সাহায্যে ভিক্ষা চালানোর মনোবৃত্তি বাড়ছেই। সম্প্রতি ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী সমিতির সহকারী সম্পাদক এ এইচ এস আহমদ বলেছেন মুসলীম ও সংখ্যালঘুর মধ্যে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা করা এবং কৃত্রিম ফকির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার।

তিনি অভিযোগ করেন হাওড়া শহরে বেলিলিয়াস রোডে ভিখারীরা একটি বাড়ী ভাড়া করে থাকেন বৃহস্পতিবার রাত্রে শুক্রবার সাপ্তাহিক নামাজের শেষে ভিক্ষা করার জন্য। এদের মধ্যে শক্ত সমর্থ লোক বর্তমান। এই জঘন্য বৃত্তির প্রতি মোহ কাটাতে গেলে সামাজিক সংস্কার এবং আইনের বাধা তৈরী করা দরকার। ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করার জন্য আইন প্রণয়নের কথা ভাবা জরুরী।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

যাত্রা সম্মেলনের কয়েকদিন

প্রভাতকুমার দাস

রবীন্দ্র-কাননে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনে উনিশ দিন ব্যাপী পালা নাটকের আসর প্রায় প্রত্যেক দিনই সরগরম। এই সম্মেলনে প্রতিটি দলেরই প্রতিনিধি স্থানীয় পালা গুলিই পরিবেশিত হচ্ছে। কোন কোন দিন যাত্রামণ্ডপ নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই পরিপূর্ণ হওয়ায় অগণিত দর্শক ব্যর্থমনোরথে ফিরে গিয়েছেন, কেউ কেউ নিজেদের অদম্য আকাঙ্খা চরিতার্থ করেছেন গোপনে বিক্রিত বর্দ্ধিত মূল্যের প্রবেশপত্র কিনে। দু-একটি দলের দর্শকদের অপরিমিত ভীড় ঠেকানোর জন্য স্বেচ্ছাসেবকদেরও হিমসিম খেতে হয়েছে।

কয়েক বছর পূর্বে যেমন চিৎপুরের পরস্পর প্রতিযোগী দলগুলির মধ্যে নিত্য নতুন চমকপ্রদ আয়োজনে আধুনিকতার নামে পালাগানের মূল সুরটি হারিয়ে যেতে বসেছিল, এখন যেন সেই ঐতিহ্যের সুরকে পুনরায় আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন প্রত্যেকে। নাচ গান আর উচ্চ গ্রামের অভিনয়, পালা নাটকের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই আবার নতুন আয়োজনে ফিরে আসছে উপস্থাপনার উদ্যোগে। আলোর বৈচিত্র্য, নিছক চমক, উত্তেজক সঙ্গীত, ভোগ লালসার উদার দৃশ্যাবলীর অপ্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ সরিয়ে রেখে এখন পালাকার ও পরিচালকরা ভাবতে সুরু করেছেন, চরিত্রের চমৎকারীত্ব দিয়েই দর্শকদের মন জয় করতে হবে। সেইজন্য ঘটনার ঘনঘটায় সাজানো মানুষের নিত্য দৈনিকের অবহেলিত বঞ্চিত ও শোষিত আত্মার উদ্বোধনই আজ পালাগানের বিষয়। কিছুটা মোটা দাগের হলেও, সাধারণ গল্পকে সাধারণের জন্যই পরিবেশনের প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছে প্রত্যেকটি পালায়। নট কোম্পানীর বহু বিজ্ঞাপিত পালা ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চিড়িয়াখানা' দিয়ে সম্মেলনের সুরু।

দারিদ্র্য, হতাশা আর বঞ্চনার কবলে পড়ে কেমন করে দিনের পর দিন মানুষ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অরুণ দাশগুপ্ত (মিটার), দীপেন চ্যাটার্জী (পবিত্রবাবু), তরুণকুমার (মঙ্গল), পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবেন), সুদেশ কুমার (গোপাল), বীণা দাশগুপ্তা (শুভা), রিক্তা সরকার (অহল্যা) প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা নানা রকমের চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। পালাটির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ভ্রাম্যমান বেদে পরিবারের তিন সদস্য। শিববেদে মতি (মোহিত বিশ্বাস), বৌ ময়না (তারা দেবী) আর তাদের পালিত কন্যা চুমকী (সুলতা চৌধুরী)। আপাতকঠিন জমিদার কন্দর্প চৌধুরীর (অমর চৌধুরী) উচ্ছৃঙ্খল ভাই অনঙ্গ চৌধুরীর (হিমাংশু দাস) দাপটে সকলে অস্থির। অনঙ্গের নজরে পড়ে যায় চুমকী। চুমকীর প্রেমিক অচিন (বপন কুমার) জড়িয়ে যায় সংঘাতের মধ্যে। জমিদারের ছেলেকে সাপে কাটলে বেদেদের ডাক পড়ে। ঝাড়াই করতে এসে অকস্মাৎ স্মৃতি ফির পায় চুমকী। কন্দর্পও অবাক হয়ে যায়। আসলে তারা ভাই-বোন। কোন এক ঝড় জলের রাতে নৌকো থেকে পড়ে গিয়েছিল চুমকী, তাকে মতি কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিল। পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় খুব যত্নে প্রত্যেকটি চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন গণেশ অপেরার 'ময়নামতির মাঠ' পালায়। নাচ গান পালাটির গতিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। চটুই (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) চরিত্রটির পরিহাস, হাসির বন্যা বইয়ে দেয় দর্শকদের মধ্যে, আর অজান্তে কখন চরিত্রটির বেদনাবোধও আমাদের কে টেনে নিয়ে যায় সমবেদনায়। বাসন্তী (মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়), কাঁকন (সবিতা চ্যাটার্জী), জগৎপতি (অনিল রায়), মেঘলাল (জয়দেব দাস), মটর (তারক দাস), বিজয় (সূর্য কুমার) প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সু অভিনীত। অমল মুখোপাধ্যায় সুন্দর সুর দিয়েছেন গানগুলিতে।

ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্ন দুটি ছিল, (১) আমাদের প্রধান শত্রু কে (২) আমরা ব্যাপকতম মোর্চা কাদের সঙ্গে এখন করব। হীরেনবাবু তাঁর এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বিশ্ব রাজনীতি এবং পূর্বদিন দার্জিলিঙে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর "স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে" শীর্ষক বক্তব্যকে লেনিনের বিপ্লবকে চোখের মণির মত রক্ষা করতে হবে" কথাটির সঙ্গে তুলনা করে বোধহয় আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শ্রীমতী গান্ধী এশিয়ার মুক্তি সূর্য শুধু নয়, এ যুগের লেনিনও বটে।

অবশ্য সন্তোষবাবুর প্রশ্ন দুটির যথাযথ। উত্তর দিয়েছিলেন সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের সম্পাদক শ্রীঅমিয় দাশগুপ্ত, অবশ্যই সি. পি. আই এর রাজনীতি অনুসারে হিটলারী ফ্যাসিবাদের সঙ্গে, জে পির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বিদেশী মাল্টিন্যাশানাল কর্পোরেশনের সহযোগিতায় নয়া ফ্যাসিবাদের পার্থক্য তিনি বিশ্লেষণ করেন। মিত্র শক্তির মধ্যে তিনি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যে অংশ সংসদীয় ব্যবস্থা ধ্বংস, নির্বিকারে গণহত্যা প্রভৃতি অমানবিক ব্যবস্থাগুলির বিরোধী তাঁদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার লাইন রাখেন। অর্থাৎ জে পির পেছনে রামনাথ গোয়েঙ্কার বিরুদ্ধে ইন্দিরা সমর্থক টাটা বিড়লার সঙ্গে তারা ফ্যাসি বিরোধী মোর্চা করবেন।

সম্মেলন স্থলে বেশ একটা মেলা মত বসেছে। সি. এম. ডি এ, সি. এম. পি. ও, গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ, মনীষা, 'সপ্তাহ' 'পরিচয়' সোভিয়েত ও চেক কনস্যুলেট, এমন কি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীও তাঁদের গ্যাভেলিয়াম খুলেছেন। বহু ব্যানারের একটিতে লেখা দেখলাম, "বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করো।" একজন সি. পি. আই নেতার কথায়, "ঠাণ্ডা একটু কম হলে আর ছেলেমেয়েগুলোর পরীক্ষা হয়ে গেলে রোজ সপরিবারে আসতুম। কিই বা করব, অফিস থেকে ফিরে।" আর সোভিয়েত বিনামূল্যে মোটা মোটা "আমাদের চোখে নেহেরু" সোভিয়েত সমীক্ষা তত্ত্ব" প্রভৃতি প্রায় তিন-চারশো গ্রাম ওজনের বই ঢালাও দিচ্ছেন। সেই লোভেও অনেককে যেতে দেখলাম। সামনেই পুলিশ ট্রেনিং স্কুল। সেখান থেকে পুলিশেরা বেড়াতে এসে বই বগলে করে নিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ

"অভিযাত্রী"র

"তিন নম্বর ছাগল ছানার গল্প

মুক্ত অঙ্গন—সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ

২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার

টিকিট—হলে ও গণনাট্য কার্য্যালয়ে

১৩এ ক্রীক লেন

লক্ষ টাকা অপচয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদের কথা না বলাই ভাল।

মধ্য শিক্ষা পর্ষদের কর্মকর্তারা দলবল নিয়ে এসেছিলেন। মাননীয় সব সদস্য ও শিক্ষাব্রতীর স্পর্শে কোচবিহার ধন্য হয়েছে। তিনদিন ধরে মাংস, পোলাও আর মিঠাইয়ের ছড়াছড়ি। প্রাথমিক হিসাবে কোচবিহার জেলার আলোচনা চক্রে পর্ষদ পোনেরো হাজার টাকা ব্যয় করেছে। শিক্ষা পরীক্ষা নিরীক্ষার আলোচনাই নয়। প্রমোদ বিহারের ব্যবস্থাও ছিল। মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সবচেয়ে "পাওয়ারফুল" সদস্য পর্ষদের খরচে ডজন খানেক সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ডাক বাংলায় অতিথি হয়েছিলেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর খাতায় হাজিরা দিয়ে তিনি জলপাইগুড়ি গেলেন জলদাপাড়ার অভয়ারণ্য দেখতে। সারাদিন হাতির পিঠে চড়ে বেড়ালেন। খানা পিনাও হল। টাকাটা গুনতে হল পর্ষদের কর্মসচিবদের।

কিছুদিন আগে দার্জিলিং জেলাতেও পর্ষদের আলোচনা চক্র হয়। পর্ষদের ঐ মাননীয় শিক্ষক সদস্য জনৈক প্রকাশককে নিয়ে দার্জিলিঙের ম্যালে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলেন। চাকুরী খোয়ানোর ভয়ে পর্ষদের কর্তা ব্যক্তিরা সে যাত্রায়ও নীরবে সব পাওনা গন্ডা মিটিয়ে দিলেন। টাকাটা যে জলে যাচ্ছে, তা নয়। পর্ষদের নাম ভাঙ্গিয়ে ঐ সদস্য মশাই জেলায় জেলায় তার শিক্ষক সংগঠনকে ছড়িয়ে দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার হৃদ্দমুদ্দ করে ছাড়ছেন।

মুনফাবাজী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জোরে এসব বেআইনী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকার অপারগ।

অতএব দেখা যাচ্ছে মুনাফা অর্জন এবং পাচারই যেখানে লক্ষ্য সেখানে সরকার এদের বিফলীত ভাগুতে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট না হলে কিছুতেই সস্তাদরে ওষুধ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবেন না। কারণ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এইসব বিদেশী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানই শীর্ষস্থানে। এদেশে অত্যাবশ্যক ওষুধের সত্তর ভাগই উৎপন্ন হয় বিলাতী কোম্পানীর কারখানায়। সর্বভারতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানীর অংশভাগের নমুনা পেশ করছি ঃ

এন্টিবায়োটিক	৮০% ভাগ
ভিটামিন	৮০% ,,
টনিক	৫৬% ,,
এনালজেসিক	৭২% ,,
এন্টি-রিউমেটিক	৮২% ,,
কফ্ সিরাপ	৮৩% ,,

সেন-র‍্যালে সম্পর্কে একপেশে সংবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রুগ্ন শিল্পকে সুস্থ করে তোলার জন্য সরকার টাকা ঢালছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিচালন ভার দেওয়া হচ্ছে কোন সরকারী পদাধিকারীর ওপর, যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রচার করতে থাকেন যে, তাঁদের কেরামতীতে ঐ রুগ্ন শিল্প সুস্থ সবল হয়ে একেবারে সোনা ফলাচ্ছে। আর দৈনিক পত্রিকাগুলো তো ঢক্কানিনাদের জন্য সব সময়ে প্রস্তুত।

এরকম ঘটনা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে সেন র‍্যালে কোম্পানীর ক্ষেত্রে। এই কোম্পানী দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর উনিশশো বাহাত্তর সালের মার্চ মাসে খুলেছে। ঋণ দিয়েছে ইন্ডাষ্ট্রিয়ার রি-কন্সট্রাকশন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। আর্থিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ গোড়া থেকেই সরকারী সংস্থা আই আর সি আইয়ের। পরিচালন ভার ছিল সেন র‍্যালে কর্তৃপক্ষের ওপর। কিছুদিন হল সে দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন সরকার এবং এই কোম্পানীর সর্বোচ্চ পদে বসানো হয়েছে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এম কে মডওয়েলকে। তিনি এই শিল্পের উৎপাদন বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই সম্ভবতঃ জানেন না, কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রচারে নেমে গেছে। মডওয়েল সাহেব নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে অমৃতবাজারের স্টাফ রিপোর্টারকে যা বলেছেন রিপোর্টার তাই লিখে দিয়েছেন যা সতেরই নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে খোঁজ খবর করার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি।

জানা গেছে, মডওয়েল সাহেব শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। তাই অমৃতবাজারের রিপোর্টারকে দিয়ে অফিসার-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেছেন।

মডওয়েল সাহেবের মার্কেটিং সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। তাই তিনি বলেছেন সেন র‍্যালের দৈনন্দিন উৎপাদন সেলিং এজেন্টকে নগদ টাকায় বিক্রি করবেন। কিন্তু সেলিং এজেন্ট সেন পন্ডিত যদি নগদ টাকায় মাল নিতে রাজি না হয় তাহলে প্রতিদিন বারো চোদ্দশো সাইকেল জমে যাবে। প্রতিদিন যেখানে প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ সেখানে এই উৎপাদন বিক্রি না হলে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাটা কোথায় নিয়ে দাঁড়াবে? মডওয়েল সাহেব যদি ফাঁকা প্রচারে আত্মতৃপ্ত না হয়ে যথার্থ সুনাম কিনতে চান তাহলে সেন-র‍্যালে কোম্পানীর বাস্তব সমস্যাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ সট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ ॥ দাম ৪০ পঃ

CONSENT LETTER

I,.....authorise the Pay Drawing Authority to deduct from my salary for the current wage period one day's pay to be credited to the Prime Minister's National Relief Fund. This Consent Letter has been given by me voluntarily out of my free will.

Signature.....

Name in full.....

Station.....

Designation.....

Dated.....November '75.

Office.....

'সিদ্ধার্থ রায়কে যেতেই হবে'—প্রফুল্লকান্তি ঘোষ
কংগ্রেসী রাজনীতিতে নতুন খেলা

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজনীতিতে নতুন খেলা শুরু হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছেন। তিনি প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন: সিদ্ধার্থ রায়কে যেতেই হবে। তাকে দিল্লীতেও ঠাঁই দেওয়া হবে না, হাইকোর্টে ফিরে যেতে হবে।

প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন সুপ্রীম কোর্টে প্রধানমন্ত্রীর মামলা জিতে কলকাতায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রফুল্লকান্তি অর্থাৎ শতবাবুর জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অশোক সেন শতবাবুর পুরনো

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সাংবাদিকের উপর পুলিশী নির্যাতন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা প্রেস ক্লাব আনন্দবাজার পত্রিকার একজন রিপোর্টার শ্রীনিশীথ দের প্রতি পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। তারা মনে করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কোন সুবিচার পাওয়া যাবে না, তাই তারা প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত উনত্রিশে অক্টোবর শ্রীনিশীথ দেকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। পরের দিন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশের হেপাজতে থাকার সময় তার প্রতি নৃশংস আচরণ করা হয়। তার কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়া দিয়ে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয় না। শ্রীদেকে গ্রেপ্তারের কারণ কি? তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তার আন্দোলন সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন। তাকে যারা গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছিল তারা শুনেছিল বইটি জয়প্রকাশের প্রশংসা করে লেখা। পরে জানা গেল উল্টো কথা—শ্রীদে লিখেছেন জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে। সঙ্গে সঙ্গে খালাস। এ ব্যাপারে পুলিশ আদালতেও ঝাড়া ধমক খেয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আনন্দবাজারের আর একজন সাংবাদিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষকে প্রায় দুমাস হল মিসায় আটক রাখা হয়েছে। শ্রীঘোষ একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং আনন্দবাজার ও দেশে বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কলম লেখেন গৌড়ানন্দ কবি ও রূপদর্শী ছদ্মনামে। শ্রীঘোষ যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে যেমন তীব্র বিদ্রূপ করতেন তেমনি সিদ্ধার্থ সরকারকেও রেহাই দেননি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীঘোষ সাম্যবাদী মতাদর্শের বিরোধী। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি ধান্ধাবাজ—সাধারণত কমিউনিস্ট বিরোধীরা যা

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

প্রধান মন্ত্রীর নাম নিয়ে পূর্ব রেলওয়ের অফিসে চাঁদা আদায়ের জুলুম

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উপরের সম্মতিপত্রটি ছাপিয়ে পূর্ব রেলওয়ের কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে। এই অভিনব কায়দায় সাহায্য তহবিলের জন্য চাঁদা আদায় ভারতবর্ষে বোধহয় এই প্রথম। এর আগে বিভিন্ন ঘটনায়, এমন কি বাষট্টি সালে চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ও দেখা গেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে এবং সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকারী কর্মচারী সহ সমগ্র দেশবাসী নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ দান করেছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে যদিও বলা হচ্ছে "দিস কনসেন্ট লেটার হ্যাজ গিভন বাই মি ভলেন্টারিলি আউট অফ মাই ফ্রী উইল", কিন্তু আসলে এটা টাকা আদায়ের জন্য জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। এবং সেই জুলুম করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে। বিভিন্ন অফিসে উপরওলারা প্রকাশ্যে বলছেন, আপনারা স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন, কিন্তু দিতে হবেই। কোন কর্মচারীর এত বড় বুকের পাটা নেই যে অস্বীকার করবেন একদিনের বেতন দেওয়ার মত আর্থিক অবস্থা না থাকলেও।

যেভাবে সম্মতিপত্রটির মুসাবিদা করা হয়েছে তাতে মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত অফিসে এইভাবে টাকা আদায় করা হচ্ছে।

পুলিশের সাহায্য নিয়ে মালিকরা শ্রমিকদের ওপর জুলুম চালাচ্ছে

চতুর্দিকে লক-আউট লে-অফ ছাঁটাই
শ্রম-মন্ত্রী নির্বিকার

মালিকপক্ষ এখন সরাসরি পুলিশের সাহায্য নিয়ে শ্রমিকদের ওপর জুলুম চালাচ্ছেন, আর সমস্ত কিছু জেনেও রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী শ্রীগোপাল দাস নাগ নীরব হয়ে আছেন। এই মর্মে অভিযোগ পাওয়া গেছে কংগ্রেসের দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে দীর্ঘদিন বিরোধের পর মেটাল বক্সের এক নম্বর কারখানার শ্রমিক-মালিক পক্ষ এক্স মীমাংসার চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী পুজোর আগে কারখানা খুলে যায়। ঠিক হয় আট জন শ্রমিক ছুটিতে থাকবেন এবং এই ছুটি চলাকালীন অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে মালিকপক্ষ যে সমস্ত

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

পূর্ব রেল কর্মচারী সমবায় ব্যাঙ্কে যথেচ্ছ শাসানি

পূর্ব-রেলওয়ে কর্মচারী সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কর্তাব্যক্তিরা মর্জি মাফিক একের পর এক ব্যাঙ্ক কর্মীদের উপর প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কর্মচারীদের অপরাধ, নিয়মনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মী রূপে জীবনের অর্ধেক তাঁরা ব্যাঙ্কের সেবায় অতিবাহিত করেছেন।

সম্প্রতি ঐ ব্যাঙ্কের কয়েকজন কর্মকর্তা জনা কয়েক কর্মীকে বিনা কারণে শাসানি দেয় বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে অন্যান্য কর্মীরা সোচ্চার হয়ে উঠেন। পরের দিন চারজন স্থায়ী কর্মচারীকে সাসপেন্ড করা হয়।

ডালহৌসি অঞ্চলে ঐ সাসপেনশানের খবর ছড়িয়ে পড়লে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীদের মধ্যেও নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রকাশ সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহারের দাবীতে সবাই সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

এদিকে উক্ত ব্যাঙ্কের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই বেআইনী সাসপেনশনের প্রতিকারের দাবী জানিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। জানা গেছে, ইতিপূর্বে ব্যাঙ্কের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই ধরণের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার বিরোধিতা করার অপরাধে একাধিক কর্মীকে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশেই নাকি সুদূর গণ্ডগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়।

সম্পাদকীয়

স্পেন কোন পথে?

দীর্ঘ প্রায় চার দশক স্পেনে জঙ্গী ফ্যাসিবাদী প্রশাসন পরিচালনার পর বৃদ্ধ অথর্ব পঙ্গু একনায়ক ফ্রাঙ্কোর মৃত্যু হল। এই চার দশকে স্পেনের অর্থনীতি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। বিদেশী নির্ভরশীলতা, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী পুঁজিতন্ত্রের প্রতি নির্ভরশীলতার ঝোঁক বেড়েছে। অন্যদিকে, দুর্নীতি স্বজনপোষণ, নৈরাজ্য, একদলীয় শাসন ব্যবস্থার যাবতীয় রোগগুলো প্রকট হয়ে পড়েছে। ফলে, স্পেনের সামরিক জুন্টার মধ্যে নানা ধরনের গোষ্ঠী বিরোধ দেখা দেবে সেটাই স্বাভাবিক। অবশেষে, স্পেনে ফ্যাসিবাদী প্রশাসনের বর্তমান কাঠামোটিকে বজায় রাখার জন্য একনায়ক ফ্রাঙ্কো রাজকুমার কারলোসকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে গেছেন। কারলোস শোনা যায়, সামরিক জুন্টার মধ্যপন্থী অংশের প্রবক্তা। অর্থাৎ পুরোনো কায়দায় স্পেনে ফ্যাসিবাদ চালানোর চেষ্টা না করে সাধারণ মানুষকে সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। কারণ দীর্ঘকাল একদলীয় শাসনে স্পেনের মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, স্পেনের পুঁজিপতিদের একটা বৃহৎ অংশ চান পশ্চিমী ধরণের "গণতান্ত্রিক প্রশাসন"। গীর্জা বা খৃষ্টীয় ধর্মগুরুদের বেশীর ভাগ পশ্চিমী ধরণের গণতন্ত্রের পক্ষে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্পেনে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্পেনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সম্পর্ক অনেক সঙ্কুচিত। তাই, স্পেনের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীও একটু "স্বাধীন" প্রশাসনের পক্ষপাতী।

আরও উল্লেখ্য, স্পেনের কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী দল, খৃষ্টান গণতন্ত্রী দল প্রভৃতি বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলো প্রায় গত চার দশক ধরে নিষিদ্ধ। উনিশশো ছত্রিশ সালে স্পেনে গণতন্ত্রের কবর হয়। হাজার হাজার কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রীর শবের ওপর ফ্রাঙ্কোর প্রেত সেদিন নৃত্য করেছিল স্পেনে; পশ্চিমী দুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল। স্পেনে গণতন্ত্র রক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শুরু করে ব্রিটেন, চিলি, মেক্সিকো, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের গণতান্ত্রিক মানুষ, লেখক আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দিয়ে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়েছিল সেদিন।

তারপর থেকে স্পেনে নেমে আসে অন্ধকার। কমিউনিস্ট গেরিলারা পাহাড় জঙ্গলে পালিয়ে যায়। কেউবা দেশত্যাগ করে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি স্পেনের সাধারণ মানুষ, বিশেষত গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রীদের ডাক দিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ হতে। তবে এবার সাড়া পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই প্যারিসে স্পেনের কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক দলগুলোর একটি ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে। এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সৈন্যবাহিনীর প্রগতিশীল অংশও রয়েছে। এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নিম্নোক্ত দাবী করেছেন (এক) অবিলম্বে ধৃত রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। (দুই) নির্বাচন অনুষ্ঠান করে স্পেনে গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। (তিন) ট্রেড ইউনিয়ন, গণসংগঠন করার অধিকার দিতে হবে। মোট কথা, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট স্পেনে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন। অন্যদিকে, সৈন্যবাহিনীতে একটি গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে যারা রাজনৈতিক দলগুলোর ফ্রন্টের সঙ্গে এক সঙ্গে আন্দোলনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফ্যাসিস্ত রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে বাসক অঞ্চলে শত শত মানুষ প্রতিদিন রাস্তায় বেরিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শ্লোগান তুলছেন। সম্প্রতি প্রিন্স কারলোস কিছু রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন। এখনই স্পেন সম্পর্কে শেষ কথা বলা যায়না। কারণ সেখানে এখন নানা ঘটনা ঘটবে। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধ ক্রমশঃ বাড়ছে।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দুরবস্থা

বর্তমানে বেতন ভাতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, ব্যাঙ্ক, এল আই সি, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের থেকে অনেক নীচে নেমে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার-তাঁদের কর্মচারীদের প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও বিগত কয়েক বছর যাবত সুনির্দিষ্ট ফর্মুলার ভিত্তিতে দফায় দফায় যে অন্তর্বর্তীভাতা ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করেছেন অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলিও নিজ নিজ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সেই অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সেই ন্যূনতম বৃদ্ধিটুকুও হয় নি। আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরবর্তীকালেও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীগণ পাঁচ দফায় মহার্ঘ ভাতা পেয়েছেন।

রাজ্য প্রশাসনের চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের অবস্থা আরও শোচনীয়।। বর্তমানের প্রাপ্ত বেতনের টাকায় পরিবার পরিজনদের ভরণপোষণ তো দূরের কথা অনেকের পক্ষে দুবেলা সামান্য আহার করেও দপ্তরে আসা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেক সময় অভুক্ত অবস্থায় এসে দপ্তরে অজ্ঞান হয়ে পড়ার ঘটনা অনেক ঘটেছে। অথচ সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া সত্বেও এ রাজ্যের প্রায় এক লক্ষ চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী সহ অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের যেটুকু মহার্ঘ ভাতা দিয়েছেন সেটুকু মহার্ঘ ভাতাও মঞ্জুর করা হয় নি। ফলে রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে কর্মরত অন্যান্য কর্মচারীদের মত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণকে সুতীব্র অর্থনৈতিক দুর্গতির মধ্যে দিন যাপন করতে হচ্ছে।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আশু ও জরুরী দাবী সম্বলিত কয়েক হাজার আবেদন পত্র বিগত উনিশে এপ্রিল তারিখে পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম (চতুর্থ) শ্রেণীর কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃভাগ্যের বিষয় যে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে আজও পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দুরবস্থার কথা শুনবার সময় হয় নি। পূজা অবকাশের পূর্বে সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে সব বক্তব্য প্রচার করা হয়েছিল তা থেকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ অত্যন্ত সংগতভাবে আশা করেছিল যে অতি শীঘ্রই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা সম্পর্কিত কোন সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষিত হয় নি।

এমতবস্থায় সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানানো হয়েছে যে, রাজ্য প্রশাসনে কর্মরত একলক্ষ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অসহনীয় পারিবারিক দুরবস্থা দূর করার প্রশ্নটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অন্তর্বর্তী ও মহার্ঘ ভাতার সমপরিমাণ ভাতা এ রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য মঞ্জুর করা হক।

লক-আউট ছাঁটাই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ এনেছেন তার তদন্ত হবে। বলা বাহুল্য এরা সবাই ইউনিয়নের প্রথম সারির নেতা।

সম্প্রতি অভিযোগ পাওয়া গেছে, এই শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা সময়ে অসময়ে বাড়ী থেকে তুলে এনে নানারকম অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছেন এবং চাকরী ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকী দিচ্ছেন। পুলিশের এই কার্যকলাপে এবং মালিক পক্ষের চুক্তি ভঙ্গের কথা শ্রমমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে

কিন্তু অভিযোগ শ্রমমন্ত্রী এব্যাপারে এপর্যন্ত কোন পদক্ষেপই নেননি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে তিনি আশ্চর্যজনক উদাসীনতা দেখাচ্ছেন যা মালিকপক্ষকে শ্রমিক বিরোধী কাজে উৎসাহিত করছে।

একই অভিযোগ ক্যালকাটা কেমিক্যাল কারখানার শ্রমিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এই কারখানাতেও কিছুদিন আগে লক-আউট ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন লক-আউট তুলে নিলেও শ্রমিকদের ওপর ক্রমাগত পুলিশী জুলুম চলছে। অভিযোগ ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের পুলিশ নানাভাবে হেনস্থা করছে।

এদিকে রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা টেক্সম্যাকো-তে শ্রমিক ছাঁটাই-এর নোটীশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ছাঁটাইটা একটু কায়দা করে করা হচ্ছে। প্রায় হাজার-বারোশ লোককে কোম্পানীর পক্ষ থেকে ছুটি নিতে বলা হবে। এরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি নিয়ে বসে থাকবেন। এর জন্য কোন পয়সা পাবেন না। কোম্পানী যখন মনে করবেন এদের পুনর্নিয়োগ প্রয়োজন কেবল তখনই এদের কাজ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রাজ্যের চতুর্দিকেই লক-আউট, লে-অফ, ছাঁটাই-এর হিড়িক পড়ে গেছে। মালিকের হাতে শ্রমিকরা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছেন। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথ বন্ধ। আর রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী উদাসীন।

সাংবাদিক নির্যাতন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়ে থাকে। শ্রীঘোষ কোন বিদেশী স্বার্থের জন্য ওকালতী করেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলেরও অনুগামী নন।

আরও একজন সাংবাদিক বহরমপুর থেকে প্রকাশিত "অনীক" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্তীকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার অব্যবহিত পরেই আটক করা হয়েছে।

কংগ্রেসী রাজনীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মতাদর্শের বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক দাদা। সফল ব্যারিস্টার, কিন্তু রাজনীতিতে অখ্যাত অশোক সেন প্রথম ১৯৫৬ সালে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মোহিত মৈত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। সেই অশোক সেন ১৯৫৭ সালে জয়ী হয়েছিলেন শতবাবুরই চেষ্টায়। শতবাবু অশোক সেনকে তার নির্বাচন কেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার পর অশোক সেন আবার যখন রাজনীতি ক্ষেত্রে ফিরে আসতে চাইছেন তখন শতবাবু খুবই তৎপর হয়ে উঠেছেন। কয়েকদিন আগে ক্যালকাটা ক্লাবে জনৈক মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী এক ককটেল পার্টির আয়োজন করেছিলেন অশোক সেনকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শতবাবু বিজয় সিং নাহার, এমন কি স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজাও। জানা গেছে, এ সম্পর্কে অজিত পাঁজাকে মুখ্যমন্ত্রী পরে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি মন্ত্রী হিসেবে যাইনি, ব্যারিষ্টার হিসেবে গিয়েছিলাম। উল্লেখযোগ্য, এই পার্টিতে প্রচুর সরকারী অফিসারকেও দেখা গিয়েছিল। বোধহয় এরা আন্দাজ করতে পেরেছেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হাওয়া এখন সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে ঘুরছে।

একথা অনেকেই জানেন কংগ্রেস সংগঠনে দৃঢ়পদে দাঁড়াবার কোন ভিত্তিভূমি নেই মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপদলের ঘনিষ্ট হয়ে নিজের ক্ষমতা বজায় রেখেছেন। তার কোন বিকল্প ব্যক্তি পাওয়া যায়নি বলেই এতকাল তাকে সরাবার কথা তেমনভাবে ভাবা হয়নি। শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের কথা উঠলে তাকে কোটিপতি বলে খারিজ করা হয়েছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে কেউ বিশ্বাস করে না। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কথা কেউ কেউ ভাবলেও তাকে অনেকেই আমল দেন না। শতবাবু মন্ত্রিসভার প্রবীণতম সদস্য। কিন্তু তাকে এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী করে রাখা হয়েছে, পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয় নি। তিনি এখন বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের যত কিছু অঘটনের জন্য সিদ্ধার্থ রায়ই দায়ী।

কিন্তু শতবাবুর জোর কোথায়? কোন খুঁটিকে আশ্রয় করে তিনি তার আক্রমণের কলাকৌশল তৈরি করেছেন? বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে তিনি শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ করেছেন দমদমের ই এম সি কারখানার ম্যানেজার শ্রীকমল নাথ মারফৎ, যিনি শ্রীগান্ধীর সম্পর্কে আত্মীয়। সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে প্রিয় দাসমুন্সীর বিদায় গ্রহণে শতবাবু প্রথম রাউন্ডে বিজয়ী। এখন তিনি বিরোধীদের চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য নিজের শক্তি সংহত করছেন।

ডেভিড হেয়ারের দ্বিশত জন্ম বার্ষিকী

ডেভিড হেয়ারের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন চলছে সারা দেশে। এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে কলকাতায় উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। আগামী বছরের জানুয়ারীর শেষে প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার লেবোরেটরি একসটেনশন হলে দুদিন ব্যাপী এক সভা, প্রদর্শনী এবং আলোচনা ছাড়াও বিশদ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

আগ্রহী ও উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষক পি কে সরকার হেয়ার স্কুল, ৮৭ কলেজ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-বারো, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

প্রশ্ন ॥ জরুরী অবস্থা কবে উঠছে?

উত্তর ॥ বিরোধীরাই বলতে পারেন। কারণ তাঁদের জন্যেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ নির্বাচন কী মার্চে হবে?

উত্তর ॥ পরিস্থিতি অনুকূল হলে আর বাধা কী?

প্রশ্ন ॥ প্রাক্-সেনসার কী উঠে গেছে?

উত্তর ॥ আমাদের কাছে এখনো সারকুলার পৌঁছয়নি।

প্রশ্ন ॥ তাবৎ বাঙলাদেশ হঠাৎ ভারত-বিদ্বেষী হয়ে উঠল কেন?

উত্তর ॥ আমরা মিলিটারি পাঠিয়ে ওদের মুক্তি এনে দিলাম সেই উপকারের প্রতিদান, আর কী!

প্রশ্ন ॥ শরৎচন্দ্র শত বার্ষিকী স্মারক ডাক টিকিট কী বেরুচ্ছে না?

উত্তর ॥ বেরুলে নিশ্চয় দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন ॥ উচ্চ মাধ্যমিকে মাতৃ-ভাষা বাংলাকে নাকি ঐচ্ছিক রাখা হচ্ছে?

উত্তর ॥ ভবিষ্যতের কথা ভেবেই স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায় বাংলা-বিহার এক করতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন ॥ কলকাতা কবে জঞ্জাল মুক্ত হবে?

উত্তর ॥ করপোরেশন আরো কিছু গাড়ি জোগাড় করতে পারলেই।

প্রশ্ন ॥ আরো দশটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মতো রবীন্দ্র-ভারতীর কী কোনো দরকার আছে?

উত্তর ॥ কিছু লোক ওখানে চাকরি করছেন যে!

প্রশ্ন ॥ শুনেছেন, বিশ্ব-ভারতী মিউজিক বোর্ডে একজনও সংগীতজ্ঞ নেই?

উত্তর ॥ খবরটা এইমাত্র জান-লাম। জর্জ বিশ্বাসকে খবরটা জানাতে হচ্ছে।

* *

মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে' গ্রন্থের মালিনী ভট্টাচার্যের সমালো-চনার অংশ বিশেষ:

"বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে নাগরিক বাঙালি, বিশেষত যারা বুদ্ধিজীবী, কেন নিজেদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক আদর্শের খোঁজ করছিল, এই আদ-র্শের মূর্তি হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে তারা কি ভাবে আত্মসাৎ করে নিল, এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নিজের ভূমিকা কি ছিল—এক কথায় বাঙালি সমাজে 'রাবীন্দ্রিক' সংস্কৃতির ক্রম-বিকাশ নিয়ে যদি কেউ কখনো গবেষণা করতে চান, তাহলে এই উপন্যাস থেকে তিনি কিঞ্চিৎ তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।"

প্রাচীন কলকাতা-সম্পর্কে অন্যতম গবেষক শ্রীরাধারমণ মিত্র শারদীয় এক্ষণ এ কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন।

এক ॥ 'শালিমার' শব্দটি নির্মাতার নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত হয়েছে। ইনি আফগানিস্থানের কান্দাহার দুর্গের পারসিক শাসন-কর্তা ছিলেন। নাম শা আলি মার-দান। মোগল সম্রাট সাজাহানের পক্ষে বিশ্বাস ঘাতকতা করলে চাকরি যায়। তিনি তখনকার দিনের সেরা সামরিক এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। 'শালিমার বাগ' নামে সাজাহান তাঁকে দিয়ে সাজাহান লাহোরে ও কাশ্মীরে দুটি বাগান তৈরি করান।

শা+আলি=শালি+মার দা ন-এর 'মার' (দান বাদ দিয়ে)= শালিমার।

দুই ॥ সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় বিদ্যাসাগরের বড়বাজারের ভাগবত সিংহের বাড়িটি ছিল ১৩ দয়েহাটা স্ট্রীট। এখন রাস্তার নাম দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড। বাড়ির নম্বর ১৩এ, ১৩বি, ও ১৩সি।

তিন ॥ উত্তরপাড়া থেকে মৃত্যুর আগে কলকাতায় যে বাড়িতে মাই-কেল ছিলেন তার ঠিকানা ২২ বেনিয়াপুকুর রোড। এখান থেকেই মাইকেল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। এই বাড়ি-তেই হেনরিয়েটা মারা যান।

চার ॥ ফিরিঙ্গি কমল বসু ক্রিশ্চান ছিলেন না। তিনি মেসার্স ডি. সুজা অ্যাণ্ড কোম্পানি নামক বিখ্যাত পর্তুগীজ বণিক কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করতেন বলে লোকে তাকে 'ফিরিঙ্গি কমল বসু' বলত।

পাঁচ ॥ 'জগুবাবুর বাজার' নয়, হবে 'যদুবাবুর বাজার।' রাণী রাসমণির দৌহিত্র যদুনাথ চৌধুরীর নামেই এই বাজার।

* *

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র সম্প্রতি 'রুশী কবিতার' তর্জমা করেছেন।

সোভিয়েত পুরস্কার ও সোভি-য়েত ভ্রমণ গ্যারান্টি।

"কোনো কোনো লেখকের হাতে লেখনী হতে পারে তরবারির চেয়ে জোরালো।...তার থেকে ঘটতে পারে বিপ্লব বা যুদ্ধ। "অন্নদা-শঙ্কর রায়/লেখকের সঙ্কট।

* *

"আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রধান দিক। "ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/রবীন্দ্র চেত-নার স্বরূপ।

* *

"১৯২২ সাল থেকে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের প্রাথমিক কাল পর্যন্ত একজন ফেরারী বিপ্লবীর মতো 'পথের দাবী' স্বদেশ মুক্তির প্রেরণা জুগিয়েছে, সংগঠন গড়েছে।" কল্পতরু সেন-গুপ্ত/স্বাধীনতা সংগ্রামে 'প থে র দাবীর' ভূমিকা।

লাতিন আমেরিকায় মার্কিনী তৎপরতা বাড়ছে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমে-রিকা হল মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদের চমৎকার মৃগয়াক্ষেত্র। বিংশ শতা-ব্দীতে সেই পুরোনো কায়দায় ঔপ-নিবেশিক শোষণ সম্ভব নয়, তাই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী জোট শোষণের 'নতুন' কায়দা নিয়েছে। এবং যদিও এ কায়দাটির মধ্যে পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী কৌশল রয়েছে। অর্থাৎ বণিকের মানদণ্ড' রাজদণ্ড করবার কৌশল। কারণ সরাসরি অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় এখন বিপদ আছে। এ ছাড়া, যখন রাষ্ট্রসংঘে ঔপনিবেশি-কতার বিরুদ্ধে একটা প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে তখন তো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও একটা 'চক্ষুলজ্জা' আছে।

এখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লাতিন আমেরিকা শোষণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক। ১৯৭৩ সালে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমী দেশ-গুলোর নতুন বিনিয়োগ হল সাড়ে তিন হাজার কোটি ডলার। এই বিনিয়োগী অর্থের শতকরা আশী ভাগ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। ১৯-৭২-৭৪ সালে মার্কিন পুঁজিপতিরা লাতিন আমেরিকা থেকে এক হাজার দু'শ আশী কোটি ডলার মুনাফা লুটেছে। এ ছাড়া, সংশ্লিষ্ট বছরে আরো দু'শ কোটির মত বিনি-য়োগ করেছে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লাতিন আমে-রিকার দেশগুলোর মধ্যে পারাগুয়ে, ওয়াতামালা, চিলি, নিকারাগুয়া ও হাইতিতে বর্তমানে মার্কিন পুতুল সরকার চলছে। এবং পুতুল সর-কারগুলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে প্রায় বিকিয়ে দিতে বসেছে। ক্রমে ক্রমে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি পারা-গুয়ে থেকে চিলি পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার সম্পদ গিলে ফেলছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে দীর্ঘকাল ধরে বলেছে সামরিক ফ্যাসিস্ত এক নায়-কত্ব।

অভাব, অনটন, অনাহার মৃত্যু, রোগ জর্জর আজ লাতিন আমে-রিকার মানুষ। প্রতিবাদ করতে যারা সাহস পান তাদের স্থান এক হয় ফ্যাসিস্ত কারাগারে, আর নয় কবরে। তবুও লাতিন আমে-রিকার দেশে দেশে দেশপ্রেমিক মানুষ ফ্যাসিস্ত শাসনের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই ফেটে পড়ছেন, এটা সুখের কথা।

লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য শোষণ কতদূর ব্যাপ্ত তার একটা নমুনা পারাগুয়ে। প্রায় দু'দশক ধরে চলছে ফ্যাসিস্ত একনায়ক আলফ্রেদো স্ত্রোসারের রাজত্ব। জেনারেল আলফ্রেদো "প্রভু" মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য সুবিধাজনক শর্তে পারা-গুয়ের প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ড অর্থাৎ এক

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

বর্তমানের সঞ্চয়,ভবিষ্যতের নির্ভরতা

এখন সঞ্চয় করলে, প্রয়োজনে খরচ করতে পারবেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা থেকে যতটুকু আজ আপনি সরিয়ে রাখছেন, ঝড়-ঝাপটার দিনে সামাল দিতে, অথবা আনন্দ-উৎসবের দিনে প্রিয়জনের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে সেই টাকাই আপনার অশেষ উপকারে আসবে। ভবিষ্যতে কী হবে, আর কী না-হবে, সেই দুর্ভাবনা থেকে আপনি এভাবেই মুক্ত হতে পারেন।

ইউকোব্যাঙ্কে আপনার সাদর নিমন্ত্রণ বিশদ বিবরণের জন্যে যে কোন শাখায় চলে আসুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

ফিক্সড ডিপোজিট পরিকল্পনা

ফিক্সড ডিপোজিট পরিকল্পনায় আপনি জমা টাকার উপরে বাৎসরিক ৯০% পর্যন্ত সুদ পেতে পারেন:

১৫ থেকে ৪৫ দিন	৬%
৪৬ থেকে ৯০ দিন	৬½%
৯১ দিন ও বেশি কিন্তু ৬ মাসের কম	৫½%
৬ মাস ও বেশি কিন্তু ৯ মাসের কম	৬%
৯ মাস ও বেশি কিন্তু ১ বছরের কম	৭%
১ বছর ও বেশি কিন্তু ৩ বছরের কম	৮%
৩ বছর ও বেশি কিন্তু ৫ বছর পর্যন্ত	৯%
৫ বছরের বেশি	১০%

ন্যূনতম আমানত ৫০০ টাকা।

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য সঞ্চয় পরিকল্পনা:

১। সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট স্কীম: বার্ষিক ৫% সুদ

২। রিকারিং ডিপোজিট স্কীম: বার্ষিক ১০% পর্যন্ত সুদ

৩। রিকারিং ডিপোজিটমুক্ত ফিক্সড ডিপোজিট: ৭ বছরে ৯৪.৫০% কার্যকরী সুদ

৪। ডিপোজিট সার্টিফিকেট স্কীম: আসলের চারগুণেরও বেশি ফেরত

UCOC-1175

অন্য রবীন্দ্রনাথ

দর্পণের "সংবাদ দুঃসংবাদ" কলমে সূর্য আদিত্য বারংবার রবি-শরৎ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নন্দন-নেপাল মজুমদারাদির সমালোচনায় মুখর হয়েছেন, যদিও সমালোচনা-গুলো প্রায়শ সূক্ষ্মতায় অস্পষ্ট ও ঝাপসা থেকে গেছে। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্রের সততা ও স্বদেশপ্রীতির মেঘনাদী পরাক্রমের বিপ্রতীপে রবীন্দ্রনাথকে অমলিন করে ধরে রাখার নিত্য-ক্রিয়াটি আজ এমনভাবে ব্যাহত হবার উপক্রম যে, কবিগুরুর ভক্তবিশেষ নির্লজ্জভাবে শরৎচন্দ্রের "মুচলেকা"-দানের কল্প-কাহিনী পর্যন্ত ছড়াতে উদ্‌গ্রীব; সেই সঙ্গে উদ্‌গ্রীব রবীন্দ্র মাহাত্ম্যের সর্বতো-মুখী অনন্যতা প্রচারেও। দুঃখের মাত্রা বেড়ে গেলো, যখন একুশে নভেম্বরের সংবাদ দুঃসংবাদে সেই রবীন্দ্র মাহাত্ম্য প্রচারেই মদত দেওয়া হলো—"উত্তরণ", "উত্তরাধিকারের পবিত্র বহ্নি" ইত্যাদি বাগ্‌বিভূতি মারফৎ। কিন্তু এ মাহাত্ম্যের ভিত্তি-ভূমির কোনো পরিষ্কার আভাস দেওয়া হলো না যে!

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের শেষ কবিতাখানিও কি সাক্ষ্য দেয় যে, উপনিষদ তথা ঈশ্বরপ্রীতির জাল কেটে বেরিয়ে এসে কবি পীড়িত, পরপদানত স্বজাতির মুক্তিসংগ্রামের সাথী হতে চেয়েছিলেন? তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সলজ্জ আকাঙ্ক্ষাটিও তো চীন-আফ্রিকার তটে তটে ঘুরে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু বৃটিশ অনুরক্তি-মুক্ত হয়ে পরাধীন জাতির প্রতিনিধিত্বের দর্প তাঁর কবেই বা স্থায়ী হয়েছে? বিশ্বমনীষার প্রতিনিধি রোমা রোলা বা মার্কসালেনিনময় রুশ-সমাজের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় হলো, তাতে ভারতবাসীর কোনো উপকারই কি হতে পারলো? রাশি-য়ায় গিয়ে কবির তীর্থভ্রমণ সম্পূর্ণ হলো; অর্থাৎ "ভারত-তীর্থ", আমেরিকা-তীর্থের মতো রাশিয়াও একটি তীর্থমাত্র হয়ে রইলো! সৃষ্টির জটিল স্বার্থকতার মাঝেই জন-গণ-মনের কবিকে আত্মরক্ষা করতে হয় কেন?

উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-নির্ঝরের নাকি স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছিল কিন্তু স্বদেশী স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরুদ্ধে শাসকের হাত শক্ত করার জন্যে "চার অধ্যায়ের" মতো হাতি-য়ার গড়ার যে "অনন্যতা", তা ভাঙার কোনো দৃষ্টান্ত বিশ্ব-ইতি-হাসে আছে কি? এপ্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে, গুরুদেব চার অধ্যায় লিখেছিলেন বিভীষণভূমি সিংহলে বসে। তাঁর সভ্যতার সঙ্কটে ভারত-বর্ষের মৌলিক সঙ্কট প্রায় মৌন, গৌণ; মানুষের উপরও যে তাঁর বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ, সে কেবল দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মতো ব্যক্তিত্বের সৌজন্যে। কোনো মহত্তর মানুষের কথা উচ্চা-রণে তাঁর যেন অপার বাধা।

উনিশশো চল্লিশ সালে চীনের লঙ মার্চ হয়ে যাবার অনেক-অনেক পরেও রবীন্দ্রনাথ চীয়াং কাইশেককে "বন্ধু" বলে শুভেচ্ছা পত্র পাঠ-য়েছেন, আর আপনদেশের কোটনীশ বা বিশ্বপ্রাণ বেথুনকে চাপা দিতে যিনি হ্যারি টিম্বার্সের প্রচারে মগ্ন সেই নেপাল মজুমদার গণতান্ত্রিক দোহাই পেড়ে সওয়াল করেছেন এই বলে যে, ঐ শুভেচ্ছা-পত্রটি চীনের জনসাধারণকেই উদ্দেশ্য করে

মতামত

লেখা। কিন্তু স্টালিন-'বন্ধু'র নামে এমন একখানিও পত্র না-লিখে কবি রুশ জনসাধারণকে কেনো তাঁর শুভেচ্ছা থেকে বঞ্চিত করলেন।

"পথের দাবী"র ব্যাপারে কবির প্রতিবাদ-স্পৃহা যে-যুক্তিতে দমিত হলো, তা তো জালিয়ানওয়ালা বাগের বৃটিশ নৃশংসতার বেলায়ও প্রযোজ্য হতে পারতো। সেখানকার সভা আয়োজকদের ভর্ৎসনা করার মতো রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বুঝি তখনও অর্জিত হয়নি তাঁর, তাই হঠাৎ লাট বাহাদুরের সমীপে পত্র-পেশ করে নাইট উপাধি ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে বসেন। কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথের যোগ্য পৌত্র হিসেবে তিনি অবিলম্বে এই হঠকারিতা অবিমৃষ্যকারিতা বুঝতে পারেন—হয়তো কোনো বড়ো ইংরেজেরই উপদেশে। তাইতো উনিশশো তিরিশ সালে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার লিন্ড-সের হাত ধরে তিনি হাজির হতে পারেন হোয়াইট হাউজে। এখানে একান্তে তাঁর আলোচনা হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুবারের সঙ্গে। এ সাক্ষাৎ-কারের কোনো বিবরণ কখনও তিনি প্রকাশ করেন নি; তিনি এ সাক্ষাৎকারকে বলেছেন "এ ডিলাইটফুল ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান দ্যাট উইল লিভ ইন মাই মেমারী"। এই মর্মেও দেখি, মার্কিন সাংবাদি-কেরা কবিকে সম্বোধন করছেন "স্যার" বলে। আজও বিদেশী ভাষা-কোষ ও অভিধানাদিতে তাঁর পরি-চয় দেওয়া আছে স্যার রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর বলে। বিষম বুর্জোয়া সমাজে আর্ট এবং সাহিত্যও যে ধর্মের ন্যায় আরও-আরও অহিফেন, তা স্বীকার করে রোমা রোলা বলেছেন—"জনসাধারণকে ইহারা নির্জীব করিয়াছে। মানুষকে তাহার সামাজিক দায়িত্ব এড়াইবার পথ দেখাইয়াছে। বাস্তব জীবন থেকে যাহারা পলাতক, তাহাদের আশ্রয় দিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ এক পলা-তক শিল্পী, তাই বৃদ্ধ কবি হঠাৎ ছবি-আঁকার নেশায় মেতে পরশাসিত আপন দেশের সমস্ত সমস্যা ও সামাজিক দায়িত্ব ভুলে বলে উঠলেন, "দুনিয়াতে এখন যা-ই ঘটুক না কেনো, আমার তাতে কিছু এসে যায় যায় না। আমি এখন আমার সত্যি-কারের আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। আমি স্বাধীনভাবে জীবন শুরু করে-ছিলাম, গান ছাড়া আর কোনো চিন্তা আমার ছিলো না। আমি যে-ভাবে শুরু করেছিলাম, সেই ভাবেই শেষ করবো। পাখি গান করে, যেমন সূর্যোদয়ে, তেমনি সূর্যাস্তে।" এই গান-সর্বস্ব পাখি-সঙ্গীতকে সত্য-দ্রষ্টা টলষ্টয় বলেছেন "একটা বিলা-সিতা, যা মানুষকে কর্তব্য অবহেলা করতে শেখায়।"

অবশ্য আত্মস্বার্থ বা শ্রেণী-স্বার্থের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ খুব একটা উদাসীন ছিলেন না। তাই অতিশয় খেদের সঙ্গে রোমাঁ রোলাঁকে মন্তব্য করতে হয়েছে—"হায় ইতা-লীয় ফ্যাসিবাদের আওতা থেকে মুক্ত হতে না হতেই রবীন্দ্রনাথের এই দলটি আবার গিয়ে হাঙ্গারিয়ান ও বলকান ফ্যাসিবাদের খপ্পরে পড়েছে। উপরন্তু আর্থিক অস্বচ্ছ-লতা সত্ত্বেও এই যে তাঁর দেশ-ভ্রমণের বালসুলভ লোলুপতা, এর জন্য তিনি নিজেকে ফ্যাসিস্ট দালালদের হাতে সমর্পণ করেছেন।"

যথার্থ রবীন্দ্র-ভক্তদের দায়িত্ব, এই সমস্ত বিষয়ে খোলাখুলি আলো-চনা করে তবেই গুরুদেবের প্রগতি-শীলতার বাঁও মেলানো। "মার্কস-বাদী" ও অন্যত্র ভবানীসেনাদির স্বনামে-ছদ্মনামে লেখা যুক্তি-গুলোরও খণ্ডন করা আরেক অপরিহার্য দায়। ভবানী সেন যুক্তি-গুলি প্রত্যাহার করেন নি, অভিমত-গুলো জীবদ্দশায় পাল্টেছিলেন বলেও শোনা যায় নি। "মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক"-র পরিশিষ্টে ভবানী সেনের লেখা বলে যে রবীন্দ্রপ্রশস্তিটি ছাপা হয়েছে, তা এক অখ্যাত জনের সুভেনীর জাতীয় পত্রিকা থেকে নেওয়া, যেখানে লেখক হিসেবে "ভবানীশঙ্কর" সেনের নাম ছিলো বলে জানি। ভূমিকাংশে ধনঞ্জয় দাশের দেওয়া কৃতজ্ঞতার অন্যতম অংশীদার হিসেবে বলতে চাই যে, "শঙ্কর"-সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে শ্রীদাস আমাদের সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু দর্পণের গ্রন্থসমীক্ষক ইরবান বসু-রায়ের বলা উচিত ছিল যে, পানসে রবীন্দ্র-প্রশস্তি বা তাঁর বিরূপ সমালোচনার প্রত্যাহারই যথেষ্ট নয়, উত্থাপিত যুক্তির খণ্ডনই কাম্য।

নির্মল সাহা
নাট্য-সমালোচক, "অভিনয়"

ডাকবিভ্রাট

হুগলী জেলায় চন্ডীতলা এবং জাঙ্গীপাড়া থানা এলাকায় বহু স্থানের চিঠিপত্র পৌঁছুতে নিয়-মিতভাবে দেরী হচ্ছে। কলকাতা থেকে চিঠি মাত্র আঠারো মাইল দূরে তিনদিন পরে পৌঁছনোর ঘট-নার জন্য ডাকবিভাগের গাফিলতি আছে। স্থানীয় মশাট ব্লকের ডাকঘর বাজার ও দোকান এলাকা থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ডাকবিভাগে চারজন কর্মচারী রেখেছে, বাড়ীর ভাড়া দেয় অথচ জনমানবহীন যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ঐ স্থানে ডাকঘর অবস্থিত হওয়ায় জনগণের অসুবিধা চরম। শ্রীরাম-পুর ও চুঁচুড়া থেকে পোষ্ট বিভাগের যে ডাকগাড়ী ভ্যান আসে সেটি এগারটার মধ্যে শিয়াখালা চলে যায়। সেখান থেকে চিঠি সংগ্রহ করে এবং কলকাতার চিঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। এদিক মশাট ডাকঘরের দু মাইল দূর থেকে মেল ব্যাগ ও হিসাবপত্র সমেত কাগজ বয়ে আনতে আনতে গাড়ী উধাও। মশাট ডাক-ঘরে আঁকুনী, দক্ষিণডিহী, আঁইয়া অঞ্চলের ব্যাগ পড়ে থাকে, তাও পৌঁছায় না ডাক গাড়ীতে। ফলে চিঠি যেতে দেরী হয়। আবার কল-কাতা আগত স্থানীয় হরিপুর, আইয়া ও আকুনীর চিঠিও লোকের অভাবে মশাটে পড়ে থাকে, দুদিন পর বিলি হয়। তাই অবিলম্বে মশাট ডকঘর বাজার ও বি ডি ও অফিস এবং ব্যাঙ্ক অফিস এলাকায় স্থানান্তরিত হোক। মেল ভ্যান মশাট থেকে সোজা

দর্পণ ॥ শুক্রবার ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৫

আঁইয়া ও আকুনী চলে যেতে পারে। শিয়াখালার একটি কাজের জন্য অতদূর না যাওয়া সঙ্গত। সেক্ষেত্রে হরকরা ব্যাগ এনে দশ মিনিটের মধ্যে মশাটে হাজির করতে পারে মলে ভ্যানের অভাবে আকুনী বাদ-পুর জিয়াড়া গোপালপুরের চিঠি প্রায়ই বিলি হচ্ছে না বা পড়ে থাকছে তিনচারদিন। সুপারেনটেন্ডেন্ট অফ পোষ্ট অফিস হুগলী ডিভিশন, চুঁচুড়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাজেদুল হক চৌধুরী
মৃণাল বণিক
গ্রাম—মশাট, জেলা—হুগলী

বাঙলা ভাষার অপমান

স্বাধীনতার পর আমরা সর্ব বিষয়েই বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বভাবতই স্বাধীনভাবে একটু অদ্‌-ভূত ব্যবহার করে এসেছি। সেই স্কুল ফাইনাল থেকে হায়ার সেকে-ণ্ডারী হয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। তেমনি আর একটি বিষয় হলো বাঙালীর বাংলা ভাষাকে ঐচ্ছিক ভাষারূপে গণ্য করা। কেননা আমরা অতিশয় গণতন্ত্রবাদী অথবা ভাব-জগতের অধিবাসী কিনা তাই উদা-হরণ বা অজুহাত হিসেবে বলা হয়েছে যে পশ্চিম বাংলায় বাঙালীর তুলনায় অবাঙালীই বেশী, সুতরাং তাঁদের সুবিধার্থে, হ্যাঁ বাংলা ভাষা-টাই তুলে দেয়া হোক অর্থাৎ ওটাকে "ইচ্ছা টিচ্ছার" ব্যাপার করা হোক। আশ্চর্য বর্তমান পৃথিবীতে কত মানুষের কত কাজ। প্রতিটি লোকই কোনো না কোনো ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত, কিন্তু এঁদের কী কোনো কাজ নেই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। আর এঁদেরকে এখানে বসিয়েছেনই বা কারা? মনে হয় এই বর্বর ও অসভ্য বাংলা ভাষাটার একমাত্র অপরাধ—যাকে চেপে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে, হয়ত বা চলবেও—তার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভূত সম্মান ও স্বীকৃতি। হা ভবি-তব্য। এহেন শিক্ষা ব্যবস্থার যাঁরা হোতা, আমরা লজ্জিত এ কারণে যে তাঁরা বাঙ্গালী।

বাংলা ভাষাকে এহেন বাঙ্গালী কর্তৃক ইচ্ছা অনিচ্ছার মাধ্যমে আনার জন্য একটা নোংরা কালো হাতের রাজনীতি তথা ষড়যন্ত্র বহুদিন থেকেই চলে আসছে, এবং ব্যাপারটা আশাকরি প্রায় প্রতিটি সচেতন মানুষই জানেন, তবে এতদিন এটা লুকিয়ে চুরিয়ে আবডালে ঘটেছে আর বহু চতুরতায়, কিন্তু এখন—যেহেতু মুখোশ পরে থাকাটা সব-সময়ই সম্ভব নয়, সে কারণে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। নানা ভাষা আন্দোলনের জন্য বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ শহীদের উদাহরণ দেবো না, দিয়ে কি লাভ! বিশেষ কোরে এঁদের কাছে। কেননা আমরা নিশ্চিত যে, যত ষড়যন্ত্র যত নোংরামি, যত মূর্খামি বা গোঁয়া-তুমিই থাকুক না কেন, বাঙালীর প্রাণের ভাষা কিছুতেই কারুর খেয়াল করুণার ওপর নির্ভর করে থাকতে দেবো না। "আমি বাঙালী, বাংলায় কথা বলি এবং বাংলাই আমার মাতৃ-ভাষা"—ব্যাস এর থেকে আমার বড় পরিচয় নেই। আমার মাকে আমি ধর্ষণ করতে ও ধর্ষিতা হতে দিতে পারিনা।

তবু আশ্চর্য আর দুঃখ কী জানেন পাঠক, আমরা এসব পাপ আর অপরাধের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি কি করে, আর কলমে ফেলেও লজ্জিত হই না কেন?—ছিঃ

অচিন্ত্য সাঁতরা

পোষ্ট অফিসের সমস্যা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মেদিনীপুর জেলায় দুটো পোষ্টাল ডিভিশন করা হচ্ছে। এছাড়া সুন্দর-এর জন্য মেদিনীপুর শহর তো আছেই। এই দুটি পোষ্টাল ডিভিশন হল—তমলুক এবং কাঁথি।

ডেবরা, বালিচক, সবং, পিংলা লোয়াদা ও পশকুড়ার পোষ্ট অফিস-গুলি কাঁথি আঞ্চলিক অফিসের অধীনে এসেছে কিন্তু এসব উল্লি-খিত অঞ্চলগুলি কাঁথি থেকে একশো বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। এসব অঞ্চলের যে সব মানুষেরা পোষ্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, বিশেষ করে টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে, তাঁদের সামান্য অসুবিধা দেখা দিলে তা জানার জন্য বা সংশোধনের জন্য সুদূর কাঁথিতে ছুটতে হয়। এর ফলে তাঁদের অযথা অর্থ, সময় নষ্ট হয়ে যায়।

উক্ত অঞ্চলগুলির পোষ্ট অফিসগুলিকে যদি সদর মেদিনী-পুরের অধীনে আনা যায় তবে জন-সাধারণের কষ্টের এবং অর্থের সাশ্রয় হয়, কারণ মেদিনীপুর মাত্র বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার দূরে।

টুকরো কথা

অন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

রাণা ঘোষ

ভারতবর্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৫২) "বাই-সাইকেল থীভস্" "ফল অব বার্লিন", "মিরাকল ইন মিলান" "অ্যান আমেরিকান ইন প্যারিস", "ওপেন সিটি" এবং ভারতীয় ছবি "আওয়ারা", "বাবলা", "অমর ভূপালী" দিল্লীতে দেখানো হয়েছিল। দ্বিতীয় উৎসবে (১৯৬১) ভারতীয় ছবি "মুঘল-এ-আজম" "কাবুলীওয়ালা", "সমাপ্তি" দেখানো হয়েছিল দিল্লীতে এবং সেবারে উৎসব উদ্বোধন করেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। তৃতীয় উৎসবই (১৯৬৫) হল এদেশে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব যাতে পুরস্কৃত হয় শ্রীলংকার ছবি "গাম-পোবেলিয়া"। পঁয়ষট্টির উৎসবে আমরা কলকাতায় ষাটের দশকের উন্নতমানের ছবি দেখার সুযোগ পাই যাতে কুরোশওয়া, পোলানস্কি, বার্গম্যান, ওয়াজদা, আন্তোনিয়নির ছবি দেখানো হয়। চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৬৯) ভিসকান্তির "দি ড্যামড" শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হয় দিল্লীতে। গান্ধী শতবার্ষিকী বছর হিসাবে সেবারে গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় "এট্ ফাইভ পাস্ট ফাইভ" নামক ভারতীয় ছবিকে যা পরবর্তীকালে এদেশে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৭৫, জানুয়ারী) জুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসত্যজিৎ রায় হাঙ্গেরীর "ড্রিমিং ইয়ুথ"কে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে (সোনার ময়ূর) পুরস্কৃত করেন। গড ফাদার ছবির নায়িকা জিনা লোলোব্রিজিদাকে নিয়ে দিল্লীতে হৈ চৈ পড়ে যায় সেবারে। নভেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত উৎসবে গুটিকয়েক ভালো ছবি দেখানো হয়। হাঙ্গেরীর "ড্রিমিং ইয়ুথ", কুরোশওয়ার "লোয়ার ডেপথস", ওশিমার "দি বয়", "ডেথ বাই হ্যাঙ্গিং", ফরাসী ছবি "জেড" পশ্চিম জার্মানীর ছবি "ব্রুটালাইজিন অব ফ্রাজ ব্লুন" তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

গত তেরই নভেম্বর কলকাতায় যখন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের গ্লোব সিনেমায় ধুমধাম সহকারে উদ্বোধন হচ্ছিল এবং যা নিয়ে সরকারী আমলারা খুব-উ-ব ব্যস্ত ছিলেন তখন আমার বারবারই মনে পড়ছিল এমন একজন সমাজ-সচেতন কমিটেড চলচ্চিত্র পরিচালকের কথা যিনি উদ্বোধন উৎসব কেন্দ্রের থেকে মাত্র ছ ফার্লং দূরে রোগশয্যায় শায়িত। তাকে এক তোড়া ফুল পাঠানোর কথাও কারু মনে আসেনি। অথচ উনি আমাদের "অযান্ত্রিক", "মেঘে ঢাকা তারা", "সুবর্ণরেখা"-র মত ছবি উপহার দিয়েছিলেন। স্বনামধন্য ঋত্বিক ঘটক গত বছরে দুখানা বই করেছেন। একটি অত্যন্ত বিতর্কিত রাজনীতি বিষয়ক। বইয়ের নাম "যুক্তি, তক্কো, গপ্পো"। অপরটি অদ্বৈত মল্ল বর্মণের "তিতাস একটি নদীর নাম"। এই দুটি ছবিই কলকাতার সাধারণ দর্শকেরা দেখতে পান নি। অথচ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে চৌরঙ্গী পাড়ায় কী হুল্লোড়ই না হল। যাদের কাছে "ফিল্ম ইজ এ ফোর লেটার ওয়ার্ড"-এর আবেদন ছাড়া আর কিছুই নয় তারাই কালো টাকার জোরে রঙীন ছবি দেখতে পেল এবারে। আজ থেকে দু দশক আগে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার একটা চিঠিতে আশা প্রকাশ করেছিলেন দর্শকের রুচি পরিবর্তনের বিষয়ে, যার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

"কয়েক বছর আগে থেকেই আমি অনুভব করছিলাম যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ছায়াচিত্র জগতে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসন্ন।.. কারও সাধ্য নেই এই পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখে। কারণ সাধারণ মানুষের চেতনার পরিবর্তনই এটা ঘটাচ্ছে। সিনেমার সাধারণ দর্শক সচেতনভাবে বিচার না করুক, না বুঝুক, সময়ের সঙ্গে তাদের রুচি বদলে যাচ্ছে। তারা ছায়াচিত্রে বাস্তব জীবনের, জীবন্ত মানুষের কাহিনী চায়। রোমান্টিক, রোমাঞ্চকর বা ধর্মঘটিত কাহিনী— আড়ম্বরপূর্ণ রঙীন ছবি, এসবের দিকে টান এখনো আছে, কারণ পছন্দ একদিনে ঝট করে বদলে যায় না কিন্তু পরিবর্তন যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।..পরিবর্তনের আসল কথাও এই যে শুধু রোমান্স, রোমাঞ্চ, পুরাণ, ধর্ম এসব অবলম্বন করে তৈরী ছবি সাধারণ মানুষকে তুষ্ট করতে পারবে না—তারা বাস্তব জীবন, বাস্তব চরিত্র চায়।..রোমান্স, রোমাঞ্চের মোহ যে দর্শকদের একদম ঘুচে গেছে তা অবশ্যিই বলছি না। রাতারাতি মানুষ পাল্টে যায় না—তারও একটি প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু এটুকু লক্ষণ আজ স্পষ্ট যে বাঙালী দর্শকেরা বাস্তব জীবন বাস্তব মানুষকে ভিত্তি করা কাহিনী খুশি হয়ে গ্রহণ করছে।"

সুশীল পাঠক, আপনিই বুকে হাত দিয়ে বলুন আমাদের রুচির পরিবর্তন কতখানি হয়েছে। আমি বলি, আশানুরূপ হয়নি, হয়নি।

সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের ধান্দাবাজী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা ও শহরতলীতে প্রখ্যাত সব সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান আখের গুছিয়ে চলেছে। বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের নাম খাড়া করে ধান্ধাবাজ ব্যবসায়ী, আধা নেতা ও টাউটরা কাজ বাগাচ্ছেন। "সমাজসেবী সংস্থার ভূমিকা" শীর্ষক পি সি সোসাইটি ও ভলানটারী অ্যাকশন ফোরাম আয়োজিত সভায় অভিযোগ করা হয়েছে রেড ক্রশ এবং সেন্ট জনস অ্যামবুলেন্স নিয়ে রাজনীতি চলছে। রুশী বি জিমি কলকাতার শেরিফ হবার পরেই রেড ক্রশের প্রাপ্য শেরিফের তহবিল থেকে বার্ষিক পাঁচশত টাকা কেটে নিয়ে সেন্ট জনস অ্যামবুলেন্সকে দিলেন বিনা কারণে। যেহেতু তিনি সেন্ট জনসের কর্তা। রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে সেন্ট জনসের সভায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হলো কেন প্রশ্ন তুলেছেন সেন্ট জনসের ছাত্র নেতা অমিয় নাগ। চন্দ্রগুপ্ত অফ কোম্পানীর তরফে রাষ্ট্রপতির হাতে এক হাজার টাকার চেক দেওয়া হলো কি জন্যে। একই ডায়াসে বসে রুশি সাহেবের হাতে হাওড়ার এক ভদ্রলোক দিলেন পাঁচশত টাকা। তাঁকে রাষ্ট্রপতির ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। আশ্চর্য বাঙলাদেশের সহায়তার নামে যারা চুরি করে ধরা পড়লেন তারাই আবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সমাজসেবার ভূমিকার উপদেশ দিচ্ছেন। রেড ক্রশ কর্তৃক উলঙ্গ নাচ গান এবং সুন্দরী প্রতিযোগিতা সম্পর্কেও অভিযোগ উঠেছে। সভায় স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদার বলেছেন শহরে বসে বুলি না কপচে আদিবাসীর গ্রামে সেবা করতে যান। অথচ ধান্ধাবাজী চলছে।

ওষুধশিল্পে কর্মচারী ছাঁটাই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হালে কলকাতায় এক ঘরোয়া আলোচনা চক্রে নিখিল ভারত কেমিকেল ও ফার্মাসিউটিকাল এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীজ্ঞানশংকর মজুমদার ভারতীয় ওষুধ শিল্পে কর্মচারী ছাঁটাই প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

বোম্বের মেসার্স কেম্প এন্ড কোং এবং কলকাতার মেসার্স এন্টিবায়োটিক্স স্টোরস্—এই দুই প্রতিষ্ঠানই তাদের পাটনা ডিপো বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে অসংখ্য ডিপো কর্মচারী এবং বহু সংখ্যক মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ কর্মচ্যুত হন। বিহারে নিযুক্ত বোম্বের মেসার্স ফারমেড কোম্পানী তাদের সমস্ত মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভকে কাজ করার সময় টাই না পরার জন্য চার্জশীট দিয়েছেন। কলকাতার ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিটিকাল ওয়ার্কস তাদের বেতিয়ায় (বিহার) কর্মরত মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভকে বরখাস্ত করেছেন। বোম্বেস্থিত আমেরিকান একচেটিয়া পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠান মেসার্স জন ওয়ায়েথ কোম্পানী তাদের লুধিয়ানায় (পাঞ্জাব) কর্মরত মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভকে ছাঁটাই করেছেন।

শ্রীমজুমদার বলেন এই সব ক্লোজার বা ছাঁটাইর ক্ষেত্রে কোনও কারণ দর্শানো হয়নি। দেশে জরুরী অবস্থা বলবৎ। সরকার শিল্পে শান্তি বজায় থাকুক এই ধরণের কথা প্রচার করেও থাকেন। অথচ এসব স্বদেশী বিদেশী ওষুধ কোম্পানীগুলি শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। সরকার দর্শকের ভূমিকায়।

হুগলী জেলার বাসযাত্রীদের দুর্ভোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হুগলী জেলার বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল নিয়ে যাচ্ছে তাই ব্যাপার চলছে। উত্তরপাড়া থেকে পাঁচ নম্বর বাস চণ্ডীতলা পর্যন্ত রুটে চলার কথা থাকলেও বাস দেখা যায় না। কেউ জানে না কখন আসে কখন যায়। ৫৭এ বাস হাওড়া থেকে শিয়াখালা যাবার কথা থাকলেও কোন নিয়ম কানুন মানে না। পঁচিশ নম্বর বাস ডানকুনি থেকে বকপোতা ঘাট চলার কথা ছিল হঠাৎ তারা রাস্তা বাড়িয়ে সোজা উদয়নারায়ণপুর যেতে শুরু করেছে। এদিকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ছোটে। অথচ মাত্র পাঁচটা বাস, তাও ভাঙ্গা যখন-তখন খারাপ হয়। মশাট, আঁইয়া, পাকুড়, অঞ্চলের যাত্রীদের কষ্টের সীমা নেই। হুগলী জেলা শাসকের দপ্তরের কর্তারা বলেছেন আমরা তো বাস অনুমতি ও ছাড়পত্র দিয়েছি। হরিপুর হাওড়া মিনিবাসও অনিয়মিত চলে। বাস মালিকের অভিযোগ বডি তৈরী হচ্ছে না। মাত্র পাঁচটা বাসের মধ্যে চারটির সপ্তায় চারবার বিয়ের রিজার্ভ বায়না লেগেই আছে। ছাব্বিশ নম্বর বাস যা শিয়াখালা যায় ডানকুনি হয়ে তার অবস্থাও তথৈবচ। দু চারটে বাস টাইম টেবিল নেই রুট কমিটি নেই ভাড়ার তালিকা গরমিল, তারাও দাবী করছে রুট বাড়িয়ে আরও ছয় মাইল দূরে সারভিস দেবে। আর টি এ কমিটি হুগলী জেলার অথরীটি হলেও পূর্বতন দাপট আর যা খুশি ভাব বজায় রেখেছে। যাত্রীরা ক্রমশঃ অভিযোগ করে বিফল মনোরথ।

সত্যযুগ সম্পাদকের বক্তব্য

গত সপ্তাহের (আঠাশে নভেম্বর) দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল যে, ফ্যাসি বিরোধী সম্মেলনের এক সেমিনারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সত্যযুগ সম্পাদক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে "কালান্তর" পত্রিকার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আসলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন এবং তা হোল, ফ্যাসিজমের আক্রমণ সর্বগ্রাসী। প্রথমে গণতন্ত্রীদের উপর আক্রমণ এলেও পরে তা উদারতাবাদীদেরও ছেড়ে কথা বলে না। জার্মানীর এবং অন্যান্য এায়গার অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয়। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন সত্যিকারের ফ্যাসিজম এখানে প্রতিষ্ঠিত হলে কালান্তর সম্পাদকের সঙ্গে আনন্দবাজার সম্পাদকেরও জেলে মোলাকাৎ হয়ে যেতে পারে।

ভুতুড়ে ছড়া

অনার্য মিত্র

॥ এক ॥

সামনে পুলিশ ভ্যান এবং
পিছে পুলিশ ভ্যান
মধ্যিখানে মিছিল এবং
ধরতাই শ্লোগ্যান।

তিনিই আমার ধ্যান এবং
তিনি আমার জ্ঞান
তিনি আমার জগদ্ধাত্রী
গডেস ওয়োম্যান।

আকাশবাণীর জ্ঞান এবং
দিনরাত ভ্যান ভ্যান
সইতে থাকুন আরো খানিক
সো ফার অ্যাজ য়ু ক্যান।

॥ দুই ॥

পুলিশ পুলিশ পুলিশ
নয় বটে তুই ফুলিশ,
একটা সোনার মেডেল পেলে
নিজের দঃখ ভুলিস।

পুলিশ মশাই পুলিশ
নিজের প্রাণ কি খুলিস ?
তিনি যখন যেমনি দোলান
তেমনি সবাই দুলিস।

পুলিশ বেজায় পুলিশ
ঘুষ নিতে কি ভুলিস।
নিজের ছেলে খেতে চাইলে
তার কান কি মুলিস?

॥ তিন ॥

আহা ভূত বাহা ভূত
কিম্ভূত কিমাকার,
ভূতে ভূতে অদ্ভুত
চারিদিক চারিধার।

এ ভূত সে ভূত নয়
ভূতস্য বেদনা
ঘাড়ে যদি ভূত চাপে
তবু তুমি কেঁদোনা।

সরষেতে ভূত যদি
কখনো থেকে যায়
সেই ভূত দেখো যেন
ঘরে ঘরে পুজো পায়।

কোন ভূত করে যদি
কখনো রাম গান
তিনশত চরকা
তাহারে করিও দান।

আরেক প্রকার ভূত
বিধাতার সৃষ্টি
হাতে দেয় হ্যারিকেন
মুখে দেয় মিষ্টি।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

কেন্দ্রীয় সরকার জ্যোতির্ময় বসুকে দিল্লী নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এবং লোকসভার সি পি এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শ্রীনারায়ণ এখন প্রচণ্ড অসুস্থ। সম্ভবতঃ সেইজন্য সরকার তাকে মুক্তি দিয়েছেন। তার চিকিৎসা চলছে। শ্রীজ্যোতির্ময় বসু আটক ছিলেন দিল্লীর তিহার জেলে। এখন তিনি কলকাতায় এবং হৃদরোগে বেশ অসুস্থ। ভারত সরকার তাকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীবসুর পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হলে মহামান্য হাইকোর্ট বলেন, সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে সরকার তাকে স্থানান্তারত করতে পারেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যদপ্তর কর্তৃক মনোনীত এক মেডিকেল বোর্ড শ্রীবসুকে পরীক্ষা করে তাকে কলকাতা থেকে সরানোর বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছেন।

তাকে কলকাকাতায় আনা হয় তার পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য। "নিয়মভঙ্গে"র দিন ছিল বাইশে অকটোবর। শ্রীবসু হৃদরোগে ভুগছেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতায় এনে তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে অন্তরীণ রাখা হয়। সেখানে ডাঃ বি রায়চৌধুরী তাকে পরীক্ষা করেন। তাকে শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করানোর জন্য জেলের মেডিকেল অফিসার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন।

ইতিমধ্যে নয়াদিল্লী থেকে কলকাতায় আদেশ আসে যে, শ্রীবসুকে বিশে অক্টোবর তিহার জেলে স্থানান্তরিত করতে হবে। এই আদেশের বিরুদ্ধে শ্রীবসুর পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। বিচারপতি শ্রীদেব এই আবেদনের ফলে ছয় সপ্তাহের জন্য রুল জারী করেন এবং প্রতিবাদকারীদের আদেশ দেন যে, বাইশে অকটোবর "নিয়মভঙ্গ" সম্পন্ন হওয়ার পর যেন শ্রীবসুকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। মাননীয় বিচারপতি আরও আদেশ দেন, আবেদনকারীর চিকিৎসার জন্য ডাঃ বি রায়চৌধুরী ও প্রেসিডেন্সী জেলের মেডিকেল অফিসার যে সুপারিশ করেছেন তদনুযায়ী যেন তার চিকিৎসা করানো হয়। যথাযোগ্য চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এবং আদালত পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত শ্রীবসুকে কলকাতা থেকে সরানোর বিরুদ্ধেও বিচারপতি ইনজাংশন জারী করেন।

চব্বিশে অকটোবর আবেদনকারী শ্রীবসুর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র মারফৎ জানানো হয় যে, কলকাতার একজন বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডি পি বসু শ্রীবসুর চিকিৎসা করছেন। আটাশে অকটোবর আর একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ জে সি ব্যানার্জীও শ্রীবসুকে পরীক্ষা করেছেন। এরা তাকে তিন সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। এই অবস্থায় শ্রীবসু কলকাতার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গত একত্রিশে অকটোবর জানান যে, আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে তার পরীক্ষা ও চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য ঐ হাসপাতালে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। চৌঠা নভেম্বর ডাঃ জে সি ব্যানার্জী আবার তাকে পরীক্ষা করে বিশ্রাম নিতে বলেন।

অতঃপর নভেম্বর মাসে হাইকোর্ট খুললে বিবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এ্যাডভোকেট জেনারেল ললেন যে, সরকার শ্রীবসুকে নয়াদিল্লীর ডিরেক্টর-জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ডকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে চান। যদি মেডিকেল বোর্ড অভিমত দেয় যে, তাকে কলকাতা থেকে সরানো চলে তাহলে এই আদালতের পুনরাদেশ ছাড়াই তাকে কলকাতা থেকে স্থানান্তরের আদেশ দেওয়া হক; আর বোর্ড যদি সে অভিমত না দেয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীবসুকে হাসপাতালে বা বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করাবেন।

আবেদনকারীর পক্ষে শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, বর্তমানে আবেদনকারীর যা অবস্থা তাতে তাকে কলকাতা থেকে সরানো চলে না। শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন, মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক আবেদনকারী শ্রীবসুকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে তার আপত্তি নেই, কিন্তু আবেদনকারীর চিকিৎসকদের সামনেই তাকে পরীক্ষা করা উচিত। আদালতের পুনরাদেশ ছাড়া শ্রীবসুকে স্থানান্তর সম্পর্কেও শ্রীচট্টোপাধ্যায় আপত্তি করেন এবং আরো বলেন যে, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক্তারদের নিয়ে যেন মেডিকেল বোর্ড গঠন করা না হয়।

বিচারপতি সমস্ত বক্তব্য শুনে ডিরেকটর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড দ্বারা আবেদনকারীকে পরীক্ষা এবং আবেদনকারীর চিকিৎসকদের সেই সময়ে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেন। বিচারপতি আরও বলেন, যত শীঘ্র সম্ভব মেডিকেল বোর্ডকে রিপোর্টের একটি কপি আবেদনকারীকে দিতে হবে। ভারত সরকার মেডিকেল বোর্ডের অনুমতি অনুযায়ী কাজ করতে পারেন, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে সরকারের দায়িত্বে। বিচারপতি আরও বলেন যে, মেডিকেল বোর্ড যদি অভিমত দেয় যে, আবেদনকারীকে স্থানান্তরিত করা চলে তাহলে ভারত সরকার তাকে কলকাতা থেকে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের।

যাত্রা সম্মেলনের কয়েকদিন (২)

প্রভাতকুমার দাস

লোক শিল্পী ভারতী পরিবেশিত 'সূর্য আলো দাও' পালা থেকে দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল একটু বেশী। বিশেষ করে যারা অপেশাদার মঞ্চের দর্শক, শ্যামল ঘোষের নামের সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা ভেবেছিলেন নতুন কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু কাহিনীটির গতি এত মন্থর যে শ্রীযুক্ত ঘোষের বলিষ্ঠ অভিনয় ছাড়া, পালাটির অন্যান্য দিকগুলি খুব শিথিল মনে হয়েছে। এমন কি এই পঁচাত্তর সালেও, আসরে চলন্ত মটর বাইকের গর্জ্জনেও তলিয়ে গিয়েছে চমক সৃষ্টির এই হাস্যকর প্রয়াস।

অরুণ রায় রচিত ও পরিচালিত, নবরঞ্জন অপেরার 'পবিত্র পাপী' পালা নাটক হিসেবে একটি বলিষ্ঠ প্রযোজনা। একজন সৎ কয়েদী (জহর রায়), যে আসলে সাধারণ সৎ মানুষ হয়েই বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস তাকে বারবার ঠেলে দিয়েছে কারাগারে। চিরঞ্জীব চৌধুরীর (তপনকুমার) নিত্য নতুন লালসার চাহিদা মেটাতে প্রথমে সুন্দরী (পাপিয়া মুখার্জী) ও পরে লক্ষ্মীকেও (ভারতী মুখার্জী) মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে, জীবনের জীবনে নেমে এসেছে এক ঘনায়মান অন্ধকার। ঘটনাচক্রে জেলার অসিত রায়ের (হিরণ বসু মল্লিক) কাছে বড় হয়ে অধ্যাপক করছে জীবনের ছেলে অমর (কার্তিক বাগ)। চিরঞ্জীবের ঔরষজাত সুন্দরীর অবৈধ কন্যা ইন্দ্রাণী বড় হয়েছে জীবনের তত্ত্বাবধানে। এই মিলনান্তক পালাটির সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ ডি-সুজা (অমিতাভ ঘোষ), রজ্জাক (শক্তি ব্যানার্জী), কেশব সিং (রবীন চ্যাটার্জী) এবং সমরের (বিনোদ কুমার) সম্মিলিত গান এবং নাচ। প্রশান্ত ভট্টাচার্যের সুর সত্যি প্রশংসনীয়। দুর্গাবতীর (ফিরোজাবালা) অভিনয়ও একটি বলিষ্ঠ উপহার।

অনামিকা কর্তৃক প্রযোজিত মল্লিকা দিলীপকুমারের একটি স্মরণীয় কীর্তি বলেই আখ্যাত করা যেতে পারে। তাঁর নীলেন্দু চৌধুরীর অন্তর্দ্বন্দ্ব মুখর চরিত্রটি আপাতদৃষ্টিতে ক্রূর স্বভাবের হয়েও শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের সমবেদনা কেড়ে নেয়। কাহিনীটির গতি সুনিয়ন্ত্রিত, তাঁর বিপরীতে কল্যাণী (জয়ন্তীলতা) এবং মল্লিকা (মধুশ্রী দেবী) অনবদ্য অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে নাটকের শেষাংশটি খুব রুদ্ধশ্বাসে দেখতে হয়। বরং পালাটিতে ব্যবহৃত নেপথ্য সঙ্গীতগুলি (হেমলতা ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য) সুগীত হয়েও কিছুটা যেন বেমানান মনে হয়েছে।

লাতিন আমেরিকা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

কোটি ত্রিশ লক্ষ হেক্টর জমি লীজ দিয়েছে আমেরিকান অয়েল কোম্পানিকে। এ ছাড়া, চল্লিশ বছরের চুক্তিতে ১৯৭০ সালে টেকমাকোকে আরো ত্রিশ লক্ষ হেক্টর জমি দেওয়া হয়। হাইতিতে ফ্যাসিস্ত দুবালিয়ে সুবিধাজনক শর্তে ষাট বছরের জন্য আমেরিকান রেদল্ড মাইনিং কর্পোরেশনকে দেড় লক্ষ হেক্টর জমি দিয়েছে। তা ছাড়া, ইউ এস ক্যানাডিয়ান সেডরেন কপারও এক লক্ষের ওপর জমি দখল করেছে। চিলিতে শোষণের নমুনার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক; অ্যানাকোণ্ডা কোম্পানি এবং কেনেকোট কপার চিলি থেকে এক হাজার কোটি ডলার লুট করে নিয়ে গেছে। ওয়াতামালাতে চলছে ফ্যাসিস্ত শাসন; আসল মালিক ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি। এই ফ্রুট কোম্পানির ষড়যন্ত্রের ফলে কুড়ি বছর আগে রাষ্ট্রপতি আরবেনজ গদীচ্যুত হন। নিকারওয়াতে ১৯৩৪ সাল থেকে দুর্নীতিপরায়ণ সামোসা পরিবার রাজত্ব চালাচ্ছে। নিকারগুয়া হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বড় ঘাঁটি, নিকারগুয়া লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে গুণ্ডা হিসেবে কাজ করে। ১৯৪৮ সালে কোস্টারিকায় গণতন্ত্র ধ্বংস সাধনের কাজে নিকারগুয়া অংশ গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালে গুয়াতামালায় এবং ১৯৬৫ সালে দোমিনিকান রিপাবলিকে গণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য নিকারগুয়া ফৌজ পাঠায়। ১৯৬১ সালে নিকারগুয়ার বুক থেকেই কিউবাকে ধ্বংস করার নানা ষড়যন্ত্র হয়। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি শুধু সংশ্লিষ্ট দেশগুলো শোষণ করেই ক্ষান্ত নয়, সেখানে মার্কিনষ্টাইল সরকার গঠনেও সচেষ্ট, সি আই এর তালিমের আদর্শন স্থান লাতিন আমেরিকা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও মনীষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মূল্যবান একটি সংকলন

সত্যজিৎ চৌধুরী ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

উদ্দালক / হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক সংকলন

লিখেছেন: রবীন্দ্রনাথ, রাধাগোবিন্দ বসাক, সুশীলকুমার দে, রমেশ মজুমদার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, দীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

দুটি দুষ্প্রাপ্য রচনা এবং হরপ্রসাদের লেখা ও হরপ্রসাদকে লেখা বিদেশী মনীষীদের চিঠি এবং হরপ্রসাদের রচনাপঞ্জী

সিগনেট বুকশপে পাওয়া যাচ্ছে

বিনামূল্যে। বিনামূল্যে!

ধবল বা শ্বেত

রোগীদের শাদা দাগ দূরীকরণের চিকিৎসায় আমাদের ওষুধ প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিনামূল্যে ওষুধের জন্য লিখুন। চিকিৎসার সংগে সংগেই ফল পাবেন। রোগের বিবরণসহ জানান:

Vidya. V. N. Prasad
P. o. Katri Sarai (Gaya)

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৭শে ডিসেম্বর ॥ দাম : ৪০ পঃ

অশোক সেনকে কেন্দ্র করে জোর তৎপরতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আসন যে ভাল রকমই নড়ে উঠেছে এ সংবাদের উত্তাপে সারা পশ্চিমবঙ্গ এখন মুখর। দর্পণের পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত "কংগ্রেসী রাজনীতিতে নতুন খেলা" শীর্ষক সংবাদে সিদ্ধার্থবাবুর সম্ভাব্য পতনের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, অশোক সেনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসী মহলের একাংশের জোর তৎপরতা দেখে তার বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে কারুরই আর সন্দেহের অবকাশ থাকবেনা।

গত মঙ্গলবার ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদেও দর্পণের অগ্রিম তথ্যের সমর্থন মেলে। সোমবার অশোক সেন তাঁর জোড়াবাগানের বাড়ীতে এক সম্বর্ধনা সভায় বেশ জোরের সঙ্গে বলেন : পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির দায়িত্ব যুবকরা যাতে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, সেজন্য তিনি কংগ্রেসী যুবকদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

এই আসন্ন পরিবর্তনের মুখে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে, তার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব যদি যুবকরা বিশ্বস্ত চিত্তে শ্রীসেনের হাতে তুলে দেন, তবে তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণে পিছুপা হবেন না।

বলাবাহুল্য রাজ্যস্তরে যুব কংগ্রেসের রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে গত দু এক সপ্তাহের মধ্যে অশোকবাবু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে একটি ফলপ্রসূ ভাবমূর্তি রচনা করতে পেরেছেন এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। মাসাধিককাল ধরে তাকে নিয়ে রাজ্যের সর্বত্র সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের মহড়া চলছে। যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বের আসনে যারা আবির্ভূত হয়েছে তাদের সকলের মুখেই এখন অশোকবাবুর নাম।

অন্যদিকে প্রফুল্লকান্তি ঘোষও মনে মনে বেশ প্রফুল্ল। সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে অশোক সেনের মত একজন নেতার প্রয়োজন। তিনি শ্রীসেন সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, রাজনীতি শ্রীসেনের কাছে সমাজসেবার সমার্থক।

রাজ্য রাজনীতিতে অশোক সেনের আবির্ভাবে সিদ্ধার্থবাবুর প্রতিক্রিয়া জানা না গেলেও তিনি যে স্বল্পায়ু তার প্রমাণ তাঁর প্রতি কংগ্রেসের যুবশক্তির উদাসীনতা। সবাই ঝুঁকছেন অশোক সেনের দিকে। গত ২০শে ডিসেম্বর ময়দানে যুব কংগ্রেসের সম্বর্ধনা সভায় অশোক সেনের আবির্ভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতায় জীর্ণবাড়ির মৃত্যুফাঁদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শহর কলকাতার হাজার জরাজীর্ণ বাড়ির যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়ে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে সংবাদ প্রকাশ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে বাড়ি মেরামতী ও উন্নয়ন বোর্ড গঠনের একটি প্রস্তাব করেছিল কলকাতা পৌরসভার সি. এম. ডি এর কাছে। জানা গেছে প্রস্তাবটি ফাইলে আবদ্ধ রয়েছে। এই প্রস্তাব করেছিলেন তদানীন্তন সিটি অফিসার বর্তমানে ডেপুটি কমিশনার। তৎকালীন পৌর পরিচালক শরদিন্দু দত্ত মজুমদার এই প্রস্তাব অনুমোদন করে পাঠিয়ে দেন সি. এম. ডি. এ দপ্তরে।

জানা গেছে শহরের বিপদজ্জনক জীর্ণ বাড়ী দেখা শোনার জন্য কলকাতা পৌরসভার বিল্ডিং বিভাগে মাত্র চারজন বিল্ডিং সার্ভেয়ার পদ আছে। বর্তমানে তিনটি পদই শূন্য। পৌরসভার এক মুখপাত্রের মতে কর্মী না থাকায় শহরে কত বাড়ি জীর্ণ তার সঠিক হিসেব পৌরসভার কাছে নেই। শহরের অনেক বাড়ি ঝঁঝরা হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। উত্তর কলকাতায় জীর্ণ বাড়ীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী।

পৌরসভা যে প্রস্তাটি পাঠিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে সব জীর্ণ বাড়ি মেরামত করা হবে, সেই বাড়ির ভাড়াটেদের অন্যত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। মেরামতী হবার পর ভাড়াটেদেরই পূর্বসতির সুযোগ দেয়া হবে। মেরামতী খরচ কুড়ি বছরে কিস্তিতে ভাড়াটেদের কাছ থেকে আদায় করা হবে।

ঔষধ উৎপাদনে পাবলিক সেক্টর

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আমাদের দেশে ছ'শ কোটি টাকার ওষুধ উৎপাদনের যে লক্ষ্য মাত্রা ভারত সরকার স্থির করেছেন আগামী ১৯৮-৭৯ সালের মধ্যেই তা অর্জন করা সম্ভব বলে অর্গেনাইজেশন অব ফার্মাসিউটিকাল প্রডিউসার্স অব ইণ্ডিয়ার মুখপাত্র শ্রী ডি. বন্দ্যোপাধ্যায় জানান।

কলকাতায় সাংবাদিকদের শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ১৯৭৪ সালে এদেশে ৪০৮ কোটি টাকার ওষুধ তৈরী হয়েছিল; তার মধ্যে বহুজাতিক সংস্থার প্রায় তিনশ কোটি টাকার। আর পাবলিক সেক্টারে হয়েছিল ৬০ কোটি টাকার। অবশিষ্ট বে-সরকারী শিল্পে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলি যেখানে এখনই তিনশ থেকে পাঁচশ কোটি টাকা মূল্যের ওষুধ উৎপাদনে সক্ষম সেখানে পাবলিক সেক্টারের এবং বে-সরকারী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে নিদেন তিন থেকে চার বছর সময় লেগে যাবে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন উৎপাদনের তিনটি ইউনিটের মধ্যে কোটা বণ্টন সম্পর্কে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে।

কঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত রেজিস্ট্রার ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আচার্যের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছে।

ছাত্ররা আচার্য, শিক্ষামন্ত্রী এবং সিনডিকেটের সদস্যগণের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে পাঁচ দফা অভিযোগ এনেছে। ঐ চিঠিতে তারা বলেছে : ডঃ ব্যানার্জি তাঁর পদাধিকারে বিভাগীয় প্রধানের সম্মতি ছাড়া উনিশশো চুয়াত্তর সালের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থীদের ভারতীয় দর্শনের অনার্স খাতা রিভিউ করেন। তিনি নাকি অত্যন্ত অসঙ্গত ভাবে রিভিউ করার নামে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর কন্যার প্রাপ্ত নম্বর অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে পারিবারিক কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী ব্যবহারের। রেজিস্ট্রার সাহেব প্রতি ছুটির দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচায় গাড়ী করে বসিরহাটে তাঁর পৈত্রিক ভিটা ঘুরে আসেন।

পুজোর ছুটিতে তিনি সপরিবারে শিলং পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে বেরিয়েছিলেন। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে : রেজিস্ট্রার হিসাবে তিনি আসামের একটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে শিলংয়ে থাকার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও শঙ্করীবাবু সরকারী অতিথি হয়ে পুজোর ছুটি শিলংয়ে কাটিয়ে এলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের এই সমস্ত কাণ্ডকারখানার প্রতি আনাচে-কানাচে বিশেষ আলোচনার বিষয়। ছাত্ররা ঐ সমস্ত অভিযোগের অনুসন্ধান করে রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

দুই কংগ্রেসের ঐক্য সম্পর্কে কামরাজের চিন্তাধারা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

"দুই কংগ্রেসের মিলন হোক" একথা পরলোকগত কামরাজ কোন দিনই বলেন নি। তিনি শুধু তামিলনাড়ুতে দুই কংগ্রেসের নির্বাচনী আঁতাত চেয়েছিলেন। দর্পণ প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত কথা কয়টি বলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

শ্রদ্ধেয় গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন দর্পণ প্রতিনিধির এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কামরাজজী দুই কংগ্রেসের মিলনের কথা কোন দিনই বলেন নি। চুয়াত্তর সালের প্রথম দিকে আমি অশোককৃষ্ণ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে তামিলনাড়ুতে গিয়েছিলাম কামরাজের সঙ্গে দেখা করতে। দুই কংগ্রেসের মিলন নিয়ে কামরাজের নাম যে সব গুজব চালু হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নির্দেশ অনুসারে আমি তামিলনাড়ুতে যাই। রামরা সেখানে কামরাজজীর অতিথি হিসেবেই ছিলাম। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আমার সঙ্গে কামরাজজীর নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার সময় কামরাজজী স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, তামিলনাড়তে ডি এম কে দলকে রুখতে হবে। ওদের সঙ্গে কোন আপোষ করতে অথবা মদত দিতে আমি রাজী নই। কারণ ওরা বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির এই কাজে আমি শাসক কংগ্রেসের সহযোগিতা নেব। তবে এই সহযোগিতা শুধু নির্বাচনী সমঝোতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই নির্বাচনী সমঝোতার অর্থ দুই কংগ্রেসের মিলন নয়। আমরা আমাদের আদর্শ ও দলীয় প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে লড়ব। আর এ সমঝোতা শুধু তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

শ্রীসেন আরও বলেন সেই সময় আমি কামরাজজী যে দুই কংগ্রেসের মিলনের বিরোধী এই মর্মে এক সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলাম এবং সেই বিবৃতির বয়ান কামরাজজীর সম্মতি নিয়েই তৈরী করা হয়েছিল। প্রফুল্লবাবু বলেন, সখন পণ্ডিচেরীতে নির্বাচনের সময় দুই কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছিল। কামরাজজী ও প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

দুঃখিত

অনিবার্য কারণ গত দুই সপ্তাহ দর্পণ প্রকাশ করা যায়নি। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

অথ ওয়াক্ফ সম্পত্তি কথা

পশ্চিমবঙ্গ ওয়াক্ফ এস্টেটে বছর বছর কমিশনার বদলের পালা চলছে। আই চৌধুরী, আলাউদ্দীন, এম রহমান-এর স্থলে, শুধুমাত্র তদবীরের জোরে এবং জনৈক মুসলীম বিচারপতির সমর্থনে বর্তমান কমিশনার আবদুর রজ্জাক সাহেব টিঁকে আছেন। সাতষট্টি সালে নং ৭/৫৮ আই চৌধুরীর সময়ে পিয়নের চাকরী পায় আবদুস সাত্তার নামের কর্মচারী। তিনি সৈয়দ মনজুর আলমের স্থলে পিয়ন হন অথচ আজও তার চাকরী পাকা হয়নি তো বটেই, বছরে কাজ পান মাত্র একমাস। সাম্প্রতিক ডি এ বাড়লেও ক্লার্করা বলেন খাতায় নাম ওঠেনি তাঁর। গরীব সরকারী কর্মচারী আবদুস সাত্তার অনাহারে আছেন। এদিকে নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল হওয়ার পর পুরানো থাপ্পাবাজ এবং চোরের দল পাকাপাকিভাবে স্থান পেলো ওয়াক্ফ অফিসের আশেপাশে। এরাই সম্প্রতি মধ্য কলকাতায় একটি মসজিদ বিক্রি করে দিয়েছেন।

কলকাতায় সম্প্রতি দশটি ওয়াক্ফ সম্পত্তি সমেত মসজিদ যা বেদখল ছিল, দখলে এসেছে অথচ সেই ধান্ধাবাজ লোকেরাই মসজিদ ও সম্পত্তি নিয়ে আখের গোছাচ্ছেন। এ বিষয়ে শক্তিশালী কমিটি থাকা দরকার। কলকাতায় যে সব ওয়াক্ফের বাড়ী আছে তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দু-চারজন কংগ্রেসী এম এল এ শওকাত চৌধুরীর মত লোকের মধ্যে বিলি হচ্ছে, ওয়াক্ফ অফিসে এ সব ব্যাপারে খবর নিতে গেলেও হতাশ হতে হয়। জনসংযোগ দপ্তর বা ভারপ্রাপ্ত কেউ নেই মাঁডান স্ট্রীটের অফিসে। হুগলীর ইমামবাড়ার ওয়াক্ফ সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য আলাদা অফিস এবং মুতাওয়াল্লী রাখার প্রস্তাব নিয়ে প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব ফজলে হক চেষ্টা করেও ফাইল খুঁজে পাননি। মহসীনের রাখা কোটি টাকার সম্পত্তি এবং তার থেকে দেওয়া বৃত্তি সম্পর্কে অভিযোগ নানা মহলে। হাজী মহসীন কলেজ ও মাদ্রাসা ওয়াক্ফ নিয়ে জুয়াচুরির জবাব নেই বলে যুবনেতা কে, আই, হক, হুগলী যুব কংগ্রেস অফিসে জানিয়েছেন।

পুস্তক প্রদর্শনী ও সেমিনার

(দর্পণের সংবাদমাত্য)

সম্প্রতি কলকাতায় এক পুস্তক প্রদর্শনী হয়ে গেল দুইটি সংস্থার মাধ্যমে। বই পড়ার নেশা বৃদ্ধির জন্য এবং বেশী বই কেনার প্রবণতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে ওক্সফোর্ড বুক ট্রাস্ট এবং হুগলী জেলা বিজ্ঞান ক্লাবের চেষ্টায় একটি সেমিনারও হয়ে গেল। মফঃস্বলের কিছু সাংবাদিক এবং ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক অভিযোগ করলেন পুস্তক প্রকাশকের অভাব সম্পর্কে। কবিতার বই কেউ নাকি ছাপাতে রাজী হচ্ছেন না সহজে। নতুন লেখকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ ইয়ং এনট্রপ্রেনরের সদস্য বিমলেন্দু দাস বললেন ব্যাঙ্কগুলির উচিত তরুণ লেখকদের টাকা সাহায্য করা। কলকাতার নামী দামী লেখক প্রকাশক এবং সমালোচকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সম্ভাবনাময় তরুণ লেখকদের ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারেন।

দুই কংগ্রেসের ঐক্য প্রসঙ্গে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর ফলে সেই সময়। উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে সংগঠন কংগ্রেসের প্রচণ্ড অসুবিধার মুখে পড়তে হয়েছিল। এ কথা কামরাজজীকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক আবেদন পাঠিয়ে সংগঠন কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিতে বলেন। এবং নিজে পণ্ডিচেরী নির্বাচনে ব্যস্ত থাকায় না আসতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

পরলোকগত কামরাজজীর প্রসঙ্গে শ্রীসেন আরও একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সেটা প্রায় মাস পাঁচেক আগের কথা।

জুলাই মাসের প্রথম দিকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ও ডি এম-কে দলের নেতা শ্রীকরুণানিধি কামরাজের সঙ্গে দেখা করে তাঁর (শ্রীকামরাজের) নেতৃত্বে তামিলনাড়ুর আন্দোলন পরিচালনার অনুরোধ করেন। কামরাজ নাদার তখন অসুস্থ। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর শারীরিক অক্ষমতার কথা বলেন। এর পর ডি এম কের পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ লোকের এক সমাবেশ করা হয়। এই সমাবেশে প্রদেশ সংগঠন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীরামচন্দ্রন সহ প্রথম সারির কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শাসক কংগ্রেস বিরোধী এই সমাবেশে শ্রীরামচন্দ্রন প্রমুখ নেতাদের উপস্থিতি কামরাজজীর সম্মতি ছাড়া সম্ভব ছিল না।

তামিলনাড়ুতে বর্তমানে দলীয় অবস্থা কী? —এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসেন বলেন, বাহাত্তর সালের পর কিছু ডি এম কে সমর্থক সংগঠন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। এরাই এখন দলত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্রন জানিয়েছেন যে, দলের অধিকাংশ সদস্যই সংযুক্তির বিরোধী।

যাত্রা সম্মেলনের কয়েকদিন (৩)

প্রভাতকুমার দাস

জনপ্রিয় পালাকার নির্মল মুখার্জীর 'স্বামীর কোলে মৃত্যু' পরিবেশন করলেন ভোলানাথ অপেরা। যাত্রা ও রেকর্ডের দুই প্রতিভাবান শিল্পী পঞ্চানন মিত্র এবং সতীনাথ মুখার্জী পালাটির মুরকার। পূর্ণ মণ্ডপে পালাটি বেশ উপভোগ্য করে পরিবেশন করা হয়েছে। প্রধানতঃ গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব, মানবিকতার বিরুদ্ধে চিরকালের অহংকারী ধনীদের কার্যকলাপ, বঞ্চিত সাধারণ গ্রাম্য মানুষের সমস্যা পালাটিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কল্যাণপুর নিবাসী বিজয় হালদারের চরিত্রটিকে, সরল, সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে চিত্রিত করেছেন শম্ভু সিন্‌হা। বিজয়ের স্ত্রী অহল্যার চরিত্রে রূপদান করেছেন কবিতা চক্রবর্তী। অন্যান্য চরিত্রগুলিও বেশ সমাদর পাওয়ার যোগ্য।

নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরার কানাইলাল নাথ রচিত 'সতী না অসতী' পালার নামকরণের সার্থকতার প্রসঙ্গটি আপাততঃ সরিয়ে রাখলেও, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই পালাটির প্রধান চরিত্র মহিতোষ (তপনকুমার)। পূর্বের তিন তিনটে চাকরী ছেড়ে এসে মহিতোষ জীবিকা হিসেবে স্কুল মাষ্টারীকেই বেছে নিয়েছেন, কারণ সত্যকে আঁকড়ে ধরে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। এই বেঁচে থাকবার জন্য তাকে জীবনের অনেক মূল্য দিতে হয়েছেন, নিয়তির করাল চক্রে তাঁর সতীসাধ্বি স্ত্রী তপতীকে (শর্মিলা পাল) অভিনেত্রী হতে হয়েছে। নিজের ছেলে মধু (মাঃ রাধাকান্ত) অকালে মারা গেছে। এমন কি পয়সা রোজগারের জন্য নিজেকে কুলিগিরি করতেও হয়েছে।

অশ্রুসজল এই কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত মিলনের মধ্যে শেষ হলেও, দর্শকের মন অনেকক্ষণ বিষাদে ভরে থাকে। সংলাপগুলি কোথাও কোথাও নিছকই বক্তৃতাধর্মী ও অভিনাটকীয়তায় ভারাক্রান্ত হলেও, মহিতোষের চরিত্রটিতে তপনকুমারের অভিনয় খুব উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে গোরাশশী মণ্ডল, সাধন দাশগুপ্ত, অচীন মৈত্র, সান্ত্বনা ঘোষ, কৃষ্ণকুমারী ও লতিকা পাল সুন্দর অভিনয় করেছেন। পালাটিতে সুর দিয়েছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য।

গণ-নাট্যের 'পদ্মপাল' পালায় অবক্ষয়িত সমাজের আর একটি নিষ্ঠুর দিক আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন নিতাই মাষ্টার চরিত্রে দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। পূর্ণ মণ্ডপে পদ্মপাল পালার নানা ঘাত প্রতিঘাত, বিচ্ছেদ মিলন, আনন্দ ও বেদনা দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করেছেন। মানুষের এই বিশাল সমাজে ভাল মন্দ সৎ অসৎ কুমতি আর সুমতির চিরকালের লড়াইয়ে পর্যুদস্ত মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার ক্ষতবিক্ষত চরিত্র ও চিত্রগুলি দর্শকদের সামনে জীবন্ত করে উপহার দিয়েছেন পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়। তবে সেন্টিমেন্টের সস্তা চমক দু-এক জায়গায় একটু অতিরিক্ত মনে হতে পারে। অমল (অতুল ভট্টাচার্য), কুনাল (শচীন গোস্বামী), অনঙ্গ (জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়), তমাল (অমিয় রায়), কমল (রঞ্জিত ব্যানার্জী), কৌশিক (রবি বর্মণ), দুর্গা (মুকুন্দ ঘোষ), নেড়া (সুধীর ঘাড়া), অভয় (বিজয় ভদ্র), প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রত্যেকটিই সু-অভিনীত। নারী চরিত্রগুলি মমতা (বন্দন দেব), রূপালী (বেলা ব্যানার্জী), ঝুমুর (মঞ্জুশ্রী সেন) এবং বিশেষ করে দীপালী (শ্যামলী ভট্টাচার্য) বেশ বিশ্বস্ত করে অভিনয় করেছেন। পালাটির সুরারোপ পঙ্কজ ভট্টাচার্যের।

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি পালা 'অজগর' অভিনয় করলেন ভারতী অপেরার কলা-কুশলীরা। পালাটির নির্দেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন জ্ঞানেশ মুখার্জী, সুরারোপ করেছেন অভিজিৎ ব্যানার্জী। বিষয় এবং আঙ্গিকের দিক থেকে কয়েকটি মঞ্চ নাটকের দ্বারা প্রভাবিত এই কাহিনীটি মূলতঃ অভিনয়ের গুনে সবাইকে বেশ টেনে নিয়ে যায়। রূপমঞ্চের মালিদ শমিতরূপী রাখাল সিংহের অভিনয়ে এক ক্রুর শিল্পপতির ভূমিকাটি স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয়। আর রূপমঞ্চের ম্যানেজার নিমাই দত্ত-ও দক্ষতার সঙ্গে অভিনীত মনোজকুমারের তাপস, গোপাল হালদারের তুষার, দেবকুমারের আমত, বিবেকরঞ্জনের সন্দীপ, অনিল দাসের বাড়ীওয়ালা,—চিত্তাকর্ষক চরিত্র চিত্রণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অঞ্জনা ব্যানার্জী (সন্ধ্যা), ক্ষমা ভট্টাচার্য (আশা), গীতা দত্ত (আভা) ছবি চ্যাটার্জী (আলতা)—বলিষ্ঠ অভিনয়ে দীপ্ত।

কানাই নাথ রচিত 'আমি মা হতে চাই' পালাটি সুরু হওয়ার পূর্বে অগ্রগামীর পক্ষ থেকে কয়েকজন কলা-কুশলীকে উপহার প্রদান করা হয়। পূর্ণ মণ্ডপে 'আমি মা হতে চাই' পালাটিতে বীররস এবং করুণ রসের প্রাধান্য তিন ঘণ্টা ব্যাপী সবাইকে দস্তুরমত একাগ্র করে রেখেছে। পান্না চক্রবর্তী চন্দ্রদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন পালা নাটকের সব চেয়ে বড় সম্পদ অভিনেতার বলিষ্ঠতা। একটা ক্ষতবিক্ষত মনের দ্বান্দ্বিক দিকটিও তাঁর অভিনয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা পেয়েছে। মান্দার রাজকন্যা মধুশ্রীর ভূমিকাটিতে চিত্রা মল্লিককে চন্দ্রদেবের বিপরীতে খুব উদ্দীপ্ত মনে হয়েছে। রঘুদেব (রঞ্জিত সরকার), মঙ্গল (শৈবাল ঘোষাল), যোধরাও (তাপস কুমার) পর্বত সরদার (অনিল ভট্টাচার্য), অপর্ণা (গীতা দাশগুপ্তা), লক্ষ্মী (যোধরাওএর স্ত্রী) চরিত্রগুলি স্মরণীয়। পঞ্চানন মিত্র সুরারোপে পালা গানের পুরাতন রীতিকেই নতুন করে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

একটি বক্তব্য

পঃ বঃ রাঃ বিঃ পর্ষদ্ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (আই. এন. টি. ইউ. সি)-এর সভাপতি শ্রীঅমর দে একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, দর্পণ পত্রিকার গত ২৮শে নভেম্বর সংখ্যায় মতামত কবাসে 'সঞ্জয় গান্ধীর বিভ্রান্তিকর বক্তব্য' শীর্ষক যে পত্র প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ইউনিয়নের অন্যতম সম্পাদক অসীম সোমের নামে প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে ইউনিয়নের কোন সম্পর্ক নেই। মতামতটি সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত।

* অসংখ্য জনতার রায়
* যাঁর আসন সবার উপরে

তাঁরই জীবনালেখ্য—

নিউ প্রভাস অপেরার

ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলী

এবং

যুগ যন্ত্রণার বাস্তব পালারূপ

যুগের ধারাপাত

পরিবেশনায়

নিউ প্রভাস অপেরা

পুত্রহন্তা ধীরেন্দ্রনাথের করুণ কাহিনী

(দর্পণের প্রতিনিধি)

কয়েকদিন আগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে যে, ষাট বৎসর বয়স্ক ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে তার বারো ও তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র কন্যাকে হত্যার দায়ে দায়রা বিচারক শ্রীপি এল চ্যাটার্জী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

বিচারক নিজে পৃথকভাবে আসামী ধীরেন্দ্রনাথ ও তার স্ত্রী শ্রীশৈলবালার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি আমার সন্তানদের তিলে তিলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি। আমি তাদের হত্যা করিনি। আমরা হত্যাকারী নই।"

ধীরেন্দ্রনাথ চার বছর বেকার ছিলেন। দারিদ্র্যের জ্বালা তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা স্থির করেন সন্তান সমেত নিজেদের খতম করবেন। ১৯৭৪ সালের আটই আগস্ট রাত্রে তিনি নিদ্রিত সন্তানদের ছুরি দিয়ে হত্যা করেন। তারপর আত্মহত্যার জন্য স্বামী স্ত্রী দুজনেই টিক টোয়েন্টি খান। তারা থাকতেন টালিগঞ্জে মুদিখানার বারান্দায়। পরের দিন প্রত্যুষে পুলিশ আসে এবং সকলকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে রানা যায় সন্তান দুটি মারা গেছে। পিতামাতাকে ডাক্তাররা বাঁচিয়ে তোলেন। স্বামী স্ত্রী দুজনকেই হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং তারা অভিযোগ স্বীকার করেন।

জানা গেছে, ধীরেন্দ্রনাথ বিড়লা ব্রাদার্সে চাকরী করতেন। ১৯৭০ সালে তিনি চাকরী হারান। তারপর থেকে সম্পূর্ণ বেকার। অফিস থেকে তিনি যে টাকা পেয়েছিলেন তাতে আর কতদিন সংসার চলে! ভাড়া দিতে না পারার জন্য বাড়িও ছাড়তে হল। তারপর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এক বেলাও খাওয়া জোটে না। রাত্রিতে মাথার গোঁজার জন্য জায়গা খুঁজতে হয়। ধীরেন্দ্রনাথকে ক্ষয়-রোগে ধরল। সাতই আগস্ট নয় টাকায় শেষ পরিধেয়টি বিক্রি করে ধীরেন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের পেট ভরে মিষ্টি খাওয়ালেন এবং চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, কারণ বাঁচবার আর কোন পথ খোলা ছিল না।

চাকরী যাবার পর ধীরেন্দ্রনাথ আর চাকরী জোগাড় করতে পারেন নি। বিচারক বলেছেন, অধিকাংশ দিন পরিবারের সকলকে অনাহারে থাকতে হত। কখনও কখনও শুধু চা মুড়ি জুটত। ফলে সন্তান দুটিকে ক্ষয় রোগে ধরল এবং তাদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল।

বিচারক আরও বলেছেন, "শীঘ্রই তার সামনে আরও একটা সমস্যা দেখা দিল স্ত্রীর নিয়াপত্তা যাকে সমাজ-বিরোধীরা ফুসলানোর চেষ্টা করতে লাগল। বন্ধু ও আত্মীয়রা তার প্রতি মুখ ঘোরাল।—প্রত্যেকটি দিন তার কাছে ছিল দুঃস্বপ্ন তার আশ্রয় ছিল না, অর্থ ছিলনা খাদ্য ছিল না।....সমাজ তার প্রতি সহানুভূতিহীন সে নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে বিনাশ করাই স্থির করল।"

বিচারক বলেছেন, সমাজ যদি তার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হত, যদি সে কোনরকম একটা কাজ পেত তাহলে সে তার প্রিয় সন্তানদের জীবন বিনাশ করার কথা ভাবত না। পাগলের মত চেষ্টা করেও সে তাদের খাদ্য ও আশ্রয় দিতে না পেরে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য হত্যার চরম পন্থা গ্রহণ করেছে। যে অবস্থায় সে হত্যা করেছে সেজন্য সে অনুকম্পা ও সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য।

বিচারক আরও বলেছেন, 'যেহেতু আমি আইনের দ্বারা আবদ্ধ রাই আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে বাধ্য হলাম, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার ন্যূনতম শাস্তি।"

বিচারক শ্রীচ্যাটার্জী সরকারকে অনুরোধ করেছেন ধীরেন্দ্রনাথকে ছেড়ে দেবার জন্য যেহেতু তিনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছেন।

নিম্ন আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শ্রীমতী শৈলবালা বলেছেন, "চাকরী যাবার পর গত চার বছর আমার স্বামীর চাকরী ছিল না। আমরা ভাড়া দিতে পারিনি বলে বাড়িওলা আমাদের বাড়ি থেকে উঠিয়ে দেয়। আদালতে মামলা হয়েছিল। উনিশশো বাহাত্তর সালের তেইশে জানুয়ারী আমাদের বাড়ি ছাড়তে হয়।"

ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, "সত্যি-কথা বলুন।"

শৈলবালা বলেন, "আমি সত্যিকথাই বলব। বাড়ি থেকে উচ্ছেদের পরদিন আমরা একটা জায়গায় থাকি, কিন্তু তার পরদিন আমাদের যাবার কোন রায়গা ছিল না। রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের বাড়ির বাইরের বারান্দায় আমরা সকলে বসেছিলাম। রাত্রি বারোটায় টালিগঞ্জ থানার একজন কন্সটেবল আমাদের বারান্দায় দেখতে পেয়ে থানায় নিয়ে যায়। রাত্রিটা আমাদের থানায় কাটে সেখানে আমাদের কিছু খেতে দেওয়া হয়। সকালে আমরা থানা থেকে বেরোই আর ভবানী সিনেমার কাছে একটা প্রাইমারী স্কুলে আশ্রয় নিই।"

স্থানীয় লোকেরা তাদের খাদ্য ও পরিধেয় দেয়। সেখানে তারা প্রায় বছর দেড়েক ছিল। সেখানে শৈলবালা রান্নাবান্নার একটা কাজ পান। কিন্তু ঐ বাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হবে বলে তাদের সে আশ্রয় নেয়। হবে বলে তাদের সে আশ্রয় ছাড়তে হয়। তারা একটা মুদিখানার বারান্দায় আশ্রয় নেয়।

এরমধ্যে ধীরেন্দ্রনাথের ব্লাড প্রেসার হয়। একবার তিনি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাকে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল থেকে ছাড় পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি নতুন আশ্রয়ে যান। টাকা নেই ওষুধ কেনার। সপ্তাহে পাঁচদিন ছেলেদের নিরম্বু উপবাস। মাঝে মাঝে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে শৈলবালা তাদের জন্য পান্তাভাত ও চা জোগাড় করতে পারতেন। ইতিমধ্যে তার চাকরীটা গেল কারণ অসুস্থতার জন্য তিনি কাজে যেতে যেতে পারেন নি।

আশ্রয়ের সন্ধান চলতে থাকে। একদিন চোরে ধীরেন্দ্রনাথের স্লিপার চশমা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে গেল। ছেলেদের কোন পরিধেয় নেই। তারা জ্বরে শয্যাশায়ী এবং তাদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। সকলে বলছে তাদের টিবি হয়েছে।

তাদের কোথাও যাবার ছিল না। তারা ঠিক করল নিজেদের বিনাশ করবে। বেঁচে থেকে লাভ কি।

শৈলবালা বলেছেন, "আমরা ঘুমিয়েছিলাম, আমি জানতে পারিনি কখন আমার স্বামী পাঁউরুটি কাটার ছুরি দিয়ে ছোট ছেলেকে খুন করেছে। বড়টাকে যখন খুন করে তখন সে আস্তে "মা" বলে। আমি উঠে বসি। আমার স্বামী প্রায় উন্মাদ। আমি বলি আমার কি হবে, আমায় খুন কর। তখন আমার স্বামী আমায় টিক টোয়েন্টি দেন। আমার স্বামী উন্মাদের মত ব্যবহার করছিলেন। বারান্দায় আর একজন লোক ছিল যাকে আমার স্বামী নিতাই বলতেন। তাকে বলেন, "নিতাই, পুলিশে খবর দাও। আমরা দুজনেই শীঘ্র জ্ঞান হারাব।"

ধীরেন্দ্রনাথও ম্যাজিস্ট্রেটকে একই কথা বলেছেন। তিনি গোপনে ভিক্ষা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ ভিক্ষা দেয় না। অতএব ছেলেদের জন্য খাদ্য ও ওষুধ জোগাড় করতে পারেন না। ধীরেন্দ্রনাথ বলেন, "পরে তারা হাঁটতেও পারত না। তাদের কান্না আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি আমার আত্মীয় ও এতদিনের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু কেউই আমাদের সাহায্য করে না।"

এরপর ধীরেন্দ্রনাথ মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার ও সাহায্য দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টরকে চিঠি লেখেন। কিন্তু কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। একদিন এক ভদ্রলোক পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু সেদিন বাচ্চাদের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং তারপর পরিধেয় বিক্রি ও বাচ্চাদের শেষ আহরি। মিষ্টান্ন। আহা, বাঙ্গালীর বড় রসনা পরিতৃপ্তিকর।

"আমরা ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে বাচ্চাদের মুক্তি দিয়েছি। আমরা হত্যাকারী নই।"

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

* * *

সিরাজুল ইসলাম ॥ এবার সাহিত্য আকাদামি পুরস্কার কী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাচ্ছেন?

উত্তর ॥ উনি এ ব্যাপারে তদ্বির শুরু করেছেন বলে তো জানিনে।

সিরাজুল ॥ আচ্ছা, নীরেন চক্রবর্তী কী বীরেনবাবুর বন্ধু?

উত্তর ॥ দুজনে দুজনকে স্বীকার করলেই বন্ধু। বাধা দিচ্ছে কে?

সিরাজুল ॥ সমর সেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন কেন?

উত্তর ॥ কী জানি, বোধহয় দীর্ঘদিন সিগনেট ওঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতাটি" নতুন করে ছাপাচ্ছেন না বলে।

সিরাজুল ॥ কবিতার ভবিষ্যত কী?

উত্তর ॥ বর্তমানই বা কী?

* * *

চান্দ্রেয়ী মুখোপাধ্যায় ॥ মনীন্দ্রলাল বসুর "রমলা" কী পাওয়া যায়?

উত্তর ॥ না।

চান্দ্রেয়ী ॥ সোমনাথ লাহিড়ী কী গল্প লিখেছেন?

উত্তর ॥ হ্যাঁ। "কলিযুগের গল্প"।

রতন বর্মন ॥ সুতারকিন আর বাগবাজারের কাগজঅলাদের চরিত্রের তাগত কী?

উত্তর ॥ অশ্বেতর আর অশ্বের মধ্যে যে তাগত।

রতন ॥ আপনারা ওখানে পাত্তা পাননা বলেই বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন নাকী?

উত্তর ॥ চামড়া বাঁচাতে বিবেককে বলি দিয়ে কী সাহিত্যিক কোনোদিন জন্ম নেয়? এই সব ক্রীতদাসরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছেন যে আজকাল সাহিত্যিকদের কেউ পকেটমারের অধিক সম্মান দেয় না। বিশ্বাস না হয় ওদের গায়ের জামা খুলতে বলুন, পৃষ্ঠদেশে দাগের কলংক এখনো মুছে যায়নি।

রতন ॥ বিবেকমান্য লেখক নিশ্চয় ওখানে আছেন?

উত্তর ॥ তাঁরা বিবেকের তাড়নায় লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। বড়লোকের রাদুরে কন্যার মনোরঞ্জনের জন্যে "সাহিত্য" করা তাঁরা পছন্দ করেন না।

রতন ॥ ওঁরা কাগজে চাকরি করেন সেটাই কী তাঁদের অপরাধ?

উত্তর ॥ চাকরিটা তাঁদের সাংবাদিকতার। নিশ্চয়ই সাহিত্যের নয়।

রতন ॥ এমন তো হতে পারে তারা যা বিশ্বাস করেন তাই লেখেন?

উত্তর ॥ তাঁদের বিশ্বাসটাও নিরপেক্ষ নয়। লেখার জন্যেই তাঁদের টাকার বরাদ্দ, সেটা তাঁদের ভালো করে বুঝতে হয়।

চান্দ্রেয়ী ॥ গোলাম কুদ্দুসের ইলা মিত্রের ওপর কাব্যপুস্তকটি পাওয়া যায়?

উত্তর ॥ যাবে কী করে? কুদ্দুস সাহেব যে সেখানে ইলা মিত্রকে স্টালিন-দুহিতা বলে ফেলেছিলেন।

* * *

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আপনার প্রশ্নোত্তর আমার ভালো লাগে।

উত্তর ॥ আমার পৃষ্ঠপোষক সম্পাদক হীরেন বসুকে সেটা জানান। তিনি তো আমাকে পাত্তাই দিতে চান না।

মিহির ॥ একটা জোক্ করুন তো?

উত্তর ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে খাজনা আদায়ের জন্যে জমিদারিতে পাঠালেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ গিয়ে দেখলেন প্রজাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা। তিনি বাবাকে তক্ষুনি টেলিগ্রাম পাঠালেন ঃ "সেন্ড ফিফটি থাউজেন্ড।" মহর্ষির ঝটিতি জবাবঃ "কাম ব্যাক।"

* * *

তরুণ মিত্র ॥ শুনলাম বাঘা যতীন নাকি ইংরাজদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন নি?

উত্তর ॥ হ্যাঁ। জানা যাচ্ছে ক্ষুদিরামের ব্যাপারটাও নাকি ইংরেজদের প্রোপাগ্যান্ডা?

তরুণ ॥ পার্কে পার্কে স্বদেশী দেশপ্রেমিকদের মূর্তি খাড়া করা হয়েছে, তাঁতু মীর, মজনু ফকিরদের কোন মূর্তি নেই কেন?

উত্তর ॥ এঁরা ব্রিটিশের চোখে স্বদেশী বা দেশপ্রেমিক কোনোটাই ছিলেন না। তট্টস্থ

তরুণ ॥ ধর্মতলা স্ট্রীটের নাম লেনিন সরণি হল কেন?

উত্তর ॥ বিপ্লবের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল।

তরুণ ॥ নেতাজী কী ফ্যাসিস্ট ছিলেন?

উত্তর ॥ আবার এ প্রশ্ন কেন? আমরা তো ভুল স্বীকার করেছি।

* * *

শ্রীপতি নন্দী ॥ বিশ্বে মার্কসবাদের এখন পয়লা নম্বর শত্রু কে বলুন তো?

উত্তর ॥ সাম্রাজ্যবাদ?

শ্রীপতি ॥ ধুর্। মাওবাদ।

উত্তর ॥ (সবিনয়ে) জানতামনা

শ্রীপতি ॥ জানেন, চীনে শ্রমিক অসন্তোষ দমন করবার জন্যে সৈন্য লাগানো হয়েছে?

উত্তর ॥ মার্কসবাদ থেকে সরে এলেই এ জিনিস হবে। আগেই জানতাম।

শ্রীপতি ॥ চুপি চুপি একটা খবর বলি, বেঙ্গল পটারিজে লক-আউট।

উত্তর ॥ নিশ্চয় মালিক অসন্তোষ।

জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কিঞ্চিৎ রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষের দামেও রদবদল ঘটেছে। জিনিষের দামে রদবদল মানেই মূল্যবৃদ্ধি।

রান্নার গ্যাস ও বিভিন্ন জ্বালানীদ্রব্যের সঙ্গে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের একান্ত প্রয়োজনীয় কেরোসিন তেলেরও দাম বেড়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ হয়তো মৌখিক বিবৃতিতেই শেষ হয়ে যাবে, পথে হয়তো কোন মিছিল বেরুবেনা, মানুষের দুর্ভোগ যা হবার তা হবেই। কেরোসিন তেলের কৃত্রিম অভাব তৈরী হলেই কন্ট্রোলে তেল নেবার জন্য শুধুমাত্র কি দীর্ঘ লাইন পড়ে, সে কথা সকলেরই জানা। সুতরাং গ্রামের মানুষ, বস্তি অঞ্চলের মানুষ, সাধারণ মধ্যবিত্তের পরিবার—যারা অন্ধকারেই ছিলেন, আরও অন্ধকারে ডুববেন।

গ্রাম গাঁয়ে বস্তি এলাকায় যাদের ঘরে বিদ্যুতের আলো নেই, তারা কি তবে প্রতিশ্রুতির বিজলীতে মুখ রাঙাবে? বাড়তি দাম দিয়ে তেল কিনতে কজন পারছে, একবার সমিক্ষা চালিয়ে দেখা হক

মতামত

তো! অথচ সাম্প্রতিক বিধানসভার বিতর্কে জানা গেল জরুরী অবস্থার অবস্থার পর গত পাঁচ মাসে মোট এক লক্ষ আশি হাজার কর্মী ছাঁটাই হয়েছেন। কেরোসিন তেল তো দূরের কথা, এদের পরিবারের কারও মুখে খাদ্য নেই।

শ্যামল বিশ্বাস

কুৎসিত ভাঙ্গমার পোস্টার

সরকার বাহাদুর সম্প্রতি কলকাতাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার সংকল্প নিয়েছেন। যার ফলে কড়া পাহারায় দেয়াল পরিষ্কার অভিযান শুরু হয়েছে। এবং দেয়ালে পোস্টার, পত্র-পত্রিকা এবং কানো-রকম লেখালেখি বে-আইনী বলে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। অর্থাৎ নগরীর দেয়াল নোংরা করা জনলণের শারীরিক তথা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর (বা বিপজ্জনক)

কিন্তু, সরকারের এ প্রচেষ্টা যদি সৎ উদ্দেশ্যমূলক হয়, তবে আজও কেন বাবা-মা-ভাই-বোনদের নিয়ে রাস্তায় নামলে দেয়ালে দেয়ালে সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের কুৎসিত ভঙ্গিমার পোস্টারগুলো দেখতে হচ্ছে? তবে কি সেগুলো আইনী? অর্থাৎ জনগণের শারীরিক তথা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক?

সরকারের এ উদ্দেশ্যর অন্তরালে যদি কোনো দুরভিসন্ধি না থাকে, তবে অবিলম্বে সিনেমা বা যে কোনো বিজ্ঞাপনের পোস্টার লাগানোও বন্ধ করতে হবে।

কৈবর্ত রায়

রাজগীরে দুর্বৃত্তের হাতে

পুজোর আগে রাজগীরে বেড়াতে গিয়ে আমি সপরিবারে কয়েকজন দুর্বৃত্তের হাতে পড়ি। দিনটি ছিল ছয়ই অক্টোবর। এখানে কুণ্ডের ধার ঘেঁষে যে পাহাড়টায় রয়েছে, বেলা সাড়ে চারটের সময়ে আমরা সেই পাহাড়ে আরোহনের জন্য প্রস্তুত হই। আমাদের ধারণা ছিল, পরে আরো কিছু আরোহী যাবেন। সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিল, সে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যায়। ওপরে একটা সমতল জায়গা আছে; সেখানে উঠে দেখি একজন হিন্দিভাষী লোক পায়চারী করছেন। এখানে জৈন ও শিব—এই দুটি মন্দির আছে। সেখানে সপ্তপর্ণি গুহা পরিদর্শন করে আমাদের সঙ্গে এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা গল্প করে চলে যাবেন এমন সময় তিনজন দেহাতী লোক লাঠি হাতে তাদের ঘিরে ধরল এবং যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। আর ঠিক তখনই আরেকজন হিন্দিভাষী লোকটির কাছ থেকে ঘড়িটি ছিনিয়ে নিতে ব্যস্ত। আমার স্ত্রীর গলার "ইমিটেশন" চেনটিও ছিনিয়ে নেয়। আমার বন্ধু ও শ্যালকের কাছ থেকে খোয়া যায় মোট চুয়াত্তর টাকা।

এরপর দুর্বৃত্তরা সপ্তপর্ণি গুহার দিকে পালিয়ে যায়। ঐ ঘটনার পর আমরা পাহাড় থেকে উর্দ্ধশ্বাসে নীচে নেমে আসি। নামতে নামতে পাহাড়ের সিঁড়িতে রক্ত দেখতে পাই। সেইদিনই এইখানে পঞ্চানন ব্যানার্জী নামে জনৈক বৃদ্ধ ও তার পরিবারবর্গকে দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করে। পড়ে থাকা রক্ত তারই নিদর্শন। এঘটনা সত্যযুগেও প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বিচিত্র দেশে ভ্রমণেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই।

অমরেন্দ্রনাথ কর্মকার

ফ্যাসিস্ত শাসনে প্যারাগুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভয়াবহ অবস্থা

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

লাতিন রামেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে পিবধু দেশ, প্যারাগুয়ে। ফ্যাসিস্ত একনায়ক আলফ্রেদো ত্রোয়েজনারের একুশ বছরের রাজত্বে সমস্ত দেশটা শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। বর্বর ফ্যাসিস্ত অত্যাচারের তান্ডবে প্যারাগুয়ের প্রতি তিনজন নাগরিকের একজন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। উনিশশো চুয়ান্ন সালে সি আই এ একনায়ক ত্রোয়েজনারকে গদীতে বসিয়েছে। আলফ্রেদোর এই "রাজা" হবার মাশুল আজ প্যারাগুয়ের সাধারণ মানুষকে গুণতে হচ্ছে। লীজ দেবার নাম করে আলফ্রেদো প্যারাগুয়ের বেশির ভাগ অঞ্চল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে বাঁধা দিয়ে দিয়েছে। শুধু মাত্র স্টান্ডার্ড অয়েল ও ইন্টার ন্যাশনাল প্রোডাক্টস কর্পোরেশনকে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি লুন্ঠনের সুযোগ দিয়েই আলফ্রেদো ক্ষান্ত নয়, প্যারাগুয়ের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ, তৈল এবং যানবাহন বিমান সংস্থা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কতদূর পা-চাটা এই আলফ্রেদো তার প্রমাণ মেলে উনিশশো আটষট্টি সালে। উনিশশো আটষট্টি সালে ভিয়েৎনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস লীলায় মদদ জোগানোর জন্য আলফ্রেদো একটি প্যারাগুয়ে ফৌজ মার্কিন সরকারকে উপহার দেয়। আলফ্রেদো হল লাতিন চিলির খুনী শাসস পিনোচেতের উগ্র সমর্থক। দেশের বাইরে প্যারাগুয়ের বন্ধু হচ্ছে বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা।

এহেন প্যারাগুয়েতে শত শত মানুষ খুন হয়েছে এবং হচ্ছে আলফ্রেদোর হাতে। সমস্ত দেশটা একটা বিরাট কারাগারে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই ফ্যাসিস্ত পুলিশ কোননা কোন শান্তিপ্রিয় নাগরিককে ধরে নিয়ে আসছে। হাড়গোড় ভাঙা তালগোল পাকানো অবস্থায় দেহ ফেরৎ দিচ্ছে আত্মীয় সজ্জনদের। সমস্ত দেশ জুড়ে জরুরী অবস্থার এক সন্ত্রাস। আলফ্রেদোর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে লাতিন আমেরিকার অনেক বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক রয়েছেন। স্বোয়ান আন্তোনিও মাইদানা। গত সতেরো বছর ধরে একনায়ক আলফ্রেদোর কারাগারে পচছে। কিউবা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের মানুষ লাতিন আমেরিকার বর্ষীয়ন কমিউনিস্ট নেতার মুক্তির দাবী করেছেন। লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে আন্তোনিও মাইদানার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ মাইদানার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ ফ্যাসিস্ত নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন এটাই স্বাভাবিক।

শত সন্ত্রাস সত্বেও মাঝে মাঝেই প্যারাগুয়ের গ্রামে শহরে আলফ্রেদো বিরোধী স্লোগান পোস্টার দেখা যায়।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ফ্যাসিস্ত পাক জুং হির শাসনে সমস্ত দেশটা একটা অপরাধী তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়েছে। একটি তথ্যে জানা যায়, প্রতি বছর কম করে ন' লক্ষ অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে। খুন, জখম, হত্যা, জালিয়াতি, জুয়াচুরি বলাৎকার ইত্যাকার ব্যাপার দক্ষিণ কোরিয়ার নিত্যকার ঘটনা। আত্মহত্যা, ডাকাতিতে পঞ্চাশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছে বলে আরো জানা যায়।

সমস্ত দেশটা বিদেশী লুন্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্র। মার্কিন পুঁজির পরিমাণ বাড়ছে। অন্যদিকে দেশে প্রশাসনে নানা ধরণের দুর্নীতি। প্রায় ছেষট্টি হাজার সরকারী কর্মী ঘুষ, চুরি জালিয়াতির ফিকিরফন্দির সঙ্গে জড়িত। অর্থনৈতিক অবস্থা ডেঙ্গে পড়ছে।

এ অবস্থায় দেশে পাক জুং হির বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ বাড়ছে। দেশে নানা ধরণের বিক্ষোভ মিছিল প্রভৃতিও সংগঠিত হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ তাদের ভ্রাতা উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে মিলিত হবার কথা বলছেন। আতঙ্কিত পাক-জুংহি বেপরোয়া গ্রেপ্তার, পিটুনি চালিয়ে যাচ্ছে।

আপনারই স্টেশনঃ পরিষ্কার রাখতে আমাকে সাহায্য করুন

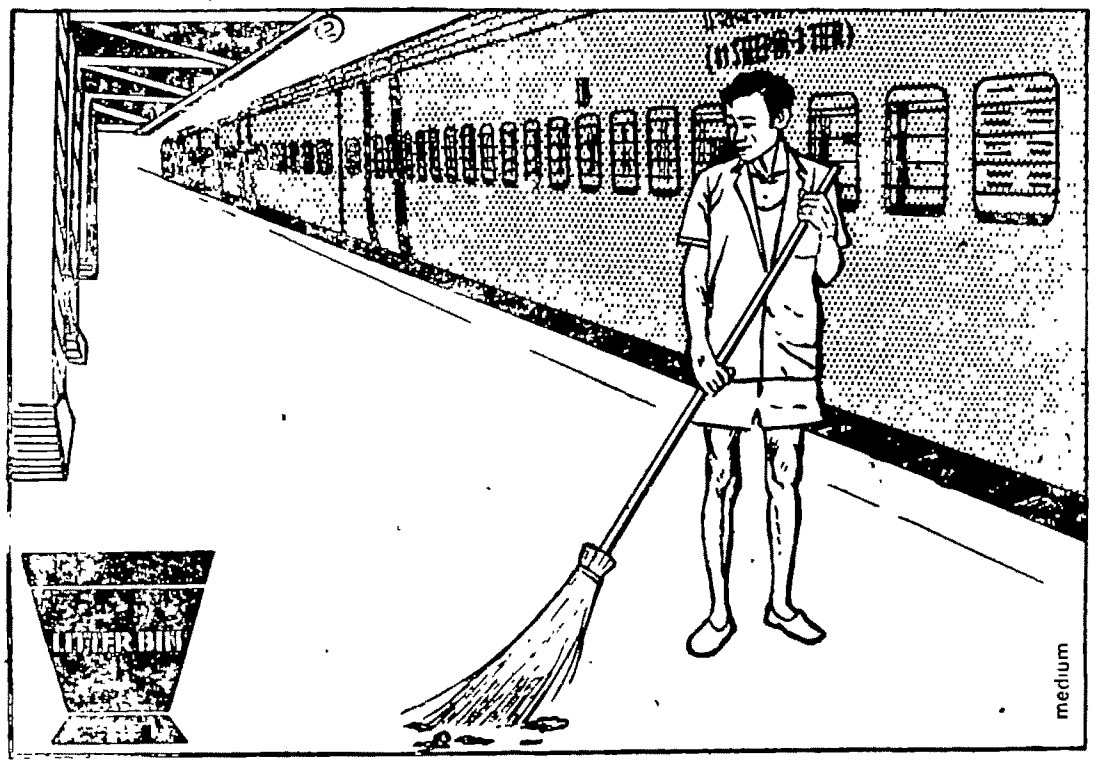

স্টেশনটি আপনাদেরই। আমি পরিষ্কার করি বটে, কিন্তু আপনারা ব্যবহার করেন।

আপনারা তো সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ, আর, আমরা যারা এই স্টেশন পরিষ্কার করি তাদের সংখ্যা কিন্তু সামান্য। আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা কি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না?

সামান্য প্রত্যাশা। ভেবে দেখুন তো হাত বাড়ালেই যেখানে জঞ্জাল ফেলার পাত্র, সেখানে জঞ্জাল ফেলতে আপনার কতটুকুই বা কষ্ট হবে। আর, আপনার নিজের বা বন্ধুর বাড়িতে কিংবা অফিসে এ কাজ আপনি করেই থাকেন।

যদি দেখেন আপনি একাই এসব করছেন কিছু মনে করার নেই। অন্যান্যরা আপনাকে দেখে শিখবেন। আপনার স্টেশন অপরিষ্কার করতে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই লজ্জা পাবেন। আপনি দেখবেন, স্টেশনটি আপনার মনের মতো ঝকঝকে তকতকে থাকবে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংগঠিত পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী অবশ্যই লড়াই করবেন

অসিত সেন

১৮৬৫ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় জন ওয়েস্টন নামে ইংলণ্ডের এক শ্রমিক প্রতিনিধি এই বক্তব্য পেশ করেন যে উচ্চতর মজুরী শ্রমিকের অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটাতে পারে না এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো পরিণামে শ্রমিকের ক্ষতি সাধন করে বলে বিবেচনা করতে হবে। ওয়েস্টনের এই প্রতিপাদ্য বিষয় দুটিকে ২০শে এবং ২৭শে জুনের দুটি বৈঠকে সুদীর্ঘ বক্তব্যের দ্বারা কার্ল মার্কস অসার প্রতিপন্ন করেন। ওয়েস্টনকে বিতর্কে হারানোটাই মার্কস-এর দেওয়া যুক্তির শেষ কথা ছিল না। এই বক্তৃতায় যুক্তিজাল বিস্তার করতে গিয়ে মার্কস মজুরি দাম মুনাফার পারস্পরিক সম্বন্ধের একেবারে মূলে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ট্রেড ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে আংশিক দাবী দাওয়ার লড়াই এর আসল তাৎপর্য তুলে ধরেন।

ওয়েস্টনের প্রথম বক্তব্যের পেছনে যুক্তি ছিল এই যে মজুরির হার বাড়লে পণ্যের দামও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে কাজেই মজুরি বৃদ্ধিতে শ্রমিকের কোনো লাভ নেই; কাজেই তার জন্য ধর্মঘট আন্দোলন করেও কোনো লাভ নেই। এর জবাবে মার্কস মুনাফা মজুরী ও দামের সাধারণ সম্পর্ককে বিশেষ করে এই সত্যকে তুলে ধরেন যে মজুরি হারের সাধারণ বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মুনাফা হ্রাস পায় কিন্তু মোটের উপর, পণ্যের দামের ওপরে তার কোনো প্রভাব পড়ে না। মার্কস বাস্তব ঘটনা তুলে ধরে দেখিয়েছেন ইংলণ্ডের শ্রমিকের মজুরী বেশী হওয়া সত্ত্বেও সস্তা উৎপাদনের দরুন অন্য সব জাতির থেকে কম দামে তাদের মাল বিকোয়। অথচ ইংরেজ কৃষি মজুরের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উৎপন্ন সামগ্রীর দাম পৃথিবীর আর প্রায় সবদেশের চেয়েই বেশী। অতএব 'পণ্যের দাম নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় মজুরির দ্বারা' ওয়েস্টনের এই সিদ্ধান্ত ভুল। এই ভুল সিদ্ধান্ত অনুসারে পণ্যের দাম ঠিক হয় মজুরি দিয়ে, তারপরে তার সঙ্গে বাড়তি একটা অংশ পুঁজিপতিরা যোগ করে নেয় এবং এই বাড়তি অংশই হলো পুঁজিপতির মুনাফা। অর্থাৎ এই যুক্তি অনুসারে পুঁজিপতির মুনাফা আসে মজুরির উপর বাড়তি কিছু শতকরা অংশ যোগ করে, মজুরি বাড়ালে যেহেতু পণ্যের দামের প্রাথমিক অংশ বৃদ্ধি পায় এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় পুঁজিপতির জুড়ে দেওয়া বাড়তি অংশটুকু, অতএব পণ্যের মোট দামও বেড়ে যায়।

কিন্তু এই যুক্তির পাণ্ডারা এই জুড়ে দেওয়া শতকরা অংশের মাত্রা কী হবে তাকে কোনো অর্থনৈতিক নিয়মের মধ্যে ফেলতে পারেন নি। এঁদের মতে তাই ঐতিহ্য, প্রচলিত প্রথা, পুঁজিপতির খেয়াল খুশি এই ধরণের যথেচ্ছ ও ব্যাখ্যাতীত কোনো পদ্ধতিতেই মুনাফা নির্ধারিত হয়। মুনাফা স্থির হয় পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দিয়ে একথা বললেও ঠিক বলা হয় না। প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মুনাফার হারকে নিশ্চয়ই সমান করতে থাকে, যেমন কাপড়ের ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা কাপড়ের ব্যবসা বা সিমেন্টের ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা সিমেন্টের ব্যবসার ক্ষেত্রে মুনাফাকে সমান হারে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু সমান হারে মুনাফার যে মাত্রাটি তাকে, অর্থাৎ সাধারণ মুনাফার হারকে নির্ধারিত করতে পারে না।

পণ্যের দাম মজুরির দ্বারা নির্ধারিত হয় একথা বলতে মার্কস বলেন শ্রমের দামই যেহেতু মজুরি, তাই পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমের দাম দিয়ে। অর্থাৎ পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রমের মূল্য দিয়ে, অথবা শ্রমের মূল্যই হলো পণ্যের মূল্যের সাধারণ পরিমাপ। আবার দাম যেহেতু বিনিময় মূল্য, তাই পয়সার হিসাবে ব্যক্ত বিনিময় মূল্যই হলো শ্রমের দাম।

কিন্তু শ্রমের মূল্যটা স্থির হয় কী ভাবে? কোনো একটা পণ্যের মূল্যকে যেমন শ্রম শস্য বা অন্য কোনো পণ্যের মূল্যকে মূল্যের সাধারণ পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করলে সঙ্কট সমাধানের রাস্তা পাওয়া যায় না, সঙ্কটকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রচেষ্টাই শুধু হয়।

মার্কস বলেন, একটি মূল্য যার নিজেরই পরিমাপ প্রয়োজন তাকে দিয়েই আমরা স্থির করতে চাইছি আর একটি মূল্য, অতএব প্রথমে প্রশ্ন তুলতে হয় পণ্যের মূল্য কী? কী ভাবে তা নির্ধারিত হয়? আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় পণ্যের মূল্য জিনিষটি বুঝি একেবারেই আপেক্ষিক, অর্থাৎ একটি পণ্যকে অন্য সমস্ত পণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে না দেখলে বুঝি মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে তাহলে পণ্য সমূহের ভেতর পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাতটা নির্ধারিত হয় কী ভাবে? এই অনুপাতগুলো ত অসংখ্য ধরণের হতে পারে। যেমন বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে অসংখ্য রকমের অনুপাতে এক নির্দিষ্ট পরিমাণের গমের বিনিময় হতে পারে। তবু এই নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের মূল্য একই হওয়ায় রেশম, সোনা বা অন্য যে কোনো পণ্যের সঙ্গে বিনিময়ের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশ পাক না কেন বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে বিনিময়ের বিভিন্ন হার থেকে তাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মূল্য বিশিষ্ট একটা সত্তা হতেই হবে। অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ গম এক বিশেষ পরিমাণ লোহার সঙ্গে যদি বিনিময় করা যায় তবে সেই বিশেষ পরিমাণ লোহার মধ্য দিয়ে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের মূল্য ব্যক্ত হলো ঠিকই, কিন্তু এখানে মূল্য এবং লোহায় তার তুল্য মূল্য হচ্ছে তৃতীয় একটি জিনিষের সমান যা গমও না লোহাও নয়, কারণ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মূল্যকে ওরা দুই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করছে মাত্র। কথাটা দাঁড়ায় এই যে সমস্ত পণ্যকেই পরিণত করতে পারা চাই এমন একটা সাধারণ মানদণ্ডে যেটা বিভিন্ন অনুপাতে তাদের মধ্যে বর্তমান থাকছে বলেই তাদের মূল্যের পার্থক্য।

সেটা বের করতে গেলে প্রথমেই বোঝা দরকার যে পণ্যের বিনিময় মূল্য হলো ঐ সব পণ্যের সামাজিক ক্রিয়ার প্রকাশ, তাদের স্বাভাবিক গুণাগুণের সঙ্গে বিনিময় মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন গমের স্বাভাবিক গুণ হলো যে সে খাদ্য হিসাবে গ্রহণীয়, শরীরের পুষ্টির জন্য তা প্রয়োজন, আর সোনা খাদ্য হিসাবে অচল এবং তার এমন সব গুণ রয়েছে যা গমের নেই—গম এবং সোনার এই গুণাগুণ দিয়ে এদের বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হয় না। তাহলে সামাজিক ক্রিয়ার ফলেই যদি হয় ত সমস্ত পণ্যের ভিতরকার সেই সাধারণ সামাজিক সারবস্তুটি কী? সে হচ্ছে শ্রম। কোনো পণ্য উৎপাদন করতে গেলে কিছু পরিমাণ শ্রমকে কাজে লাগাতেই হবে এবং এই শ্রমকে নিশ্চিত ভাবেই সামাজিক শ্রম হতে হবে তার অর্থ, যদি কেউ নিজের আশু ব্যবহার এবং ভোগের জন্য কোনো সামগ্রী সৃষ্টি করে তবে সেই সৃষ্টি হলো উৎপন্ন দ্রব্য মাত্র, পণ্য নয়। একজন আত্মভোগী উৎপাদনকারী হিসাবেই তাকে গণ্য করতে হবে, সমাজের সঙ্গে এই উৎপাদনের ব্যাপারে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটি পণ্য উৎপাদন করতে গেলে মানুষ শুধু সমাজের চাহিদা মেটাবার জন্য কোনো সামগ্রী উৎপাদন করলেই চলবে না, তার নিজের শ্রমকে সমাজ যে শ্রম ব্যয় করে তার সমগ্র পরিমাণের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হতে হবে। শ্রমকে এই সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগের অধীন হতে হবে। অন্যান্য বিভাগের শ্রম না থাকলে এই শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় মূল্যের কোনো প্রশ্ন উঠে না।

পণ্যের মূল্য বিচার করতে গেলে তাকে শুধু এই ভাবেই বিচার করতে হয় যে এই মূল্য হল নির্দিষ্ট অথবা ঘনীভূত সামাজিক শ্রম যা পণ্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠছে, হঠাৎ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম পণ্য উৎপাদনে ব্যয় হচ্ছে। অতএব এই সূত্র অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্যের মূল্যে পার্থক্য ঘটছে তাদের মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণে কমবেশীর দরুণ। একটা ইটের চেয়ে একটা সিল্কের রুমালের মধ্যে বেশী পরিমাণ শ্রম নিহিত রয়েছে বলেই সিল্কের রুমালের দাম ইটের চেয়ে বেশী হচ্ছে। কিন্তু শ্রমের এই পরিমাণকে মাপা যাবে কী দিয়ে? একমাত্র উপায়, যতক্ষণ শ্রম চললো সেই সময়টুকু দিয়ে।

সামাজিক শ্রমের ঘনীভূত রূপ বলেই পণ্যের মূল্য থাকে এই হচ্ছে মার্কস-এর সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পণ্যের আপেক্ষিক বা বিনিময় মূল্যের পরিমাণ নির্ভর করে তার মধ্যে নিহিত এই সামাজিক সারবস্তুর পরিমাণের কমবেশির উপর, অর্থাৎ উৎপাদনে যে শ্রম লাগে তার পরিমাণের কমবেশির উপর। আবার একই শ্রম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ সমান হয়। কাজেই কোন দুই পণ্যের মূল্যের অনুপাত যথাক্রমে তাদের মধ্যে নিহিত শ্রমসময়ের অনুপাতের সমান।

বিষয়টিকে উপর উপর দেখলে ভুল বলেই মনে হবে। মনে হবে তাহলে ৮ ঘণ্টা শ্রমসময়ে যে সব জিনিষ তৈরী হচ্ছে তাদের মূল্য সমান হচ্ছে না কেন। হচ্ছে না এই জন্য যে কোনো পণ্যের বিনিময় মূল্য স্থির করার সময় সর্বশেষ যে শ্রম নিয়োগ করা হল, অর্থাৎ ঐ ৮ ঘণ্টার শ্রম, উৎপাদনে সেটার একমাত্র কথা নয়। এর সঙ্গে পণ্যের কাঁচামাল এবং যে সব সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার বা বাড়ীঘরের সাহায্য নিয়ে শ্রম করা হলো তাদের মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণটাও যোগ করে নিতে হবে। এইভাবে হিসাব করলেই দেখা যাবে উপরের সিদ্ধান্তে কিছু ভুল নেই।

কিন্তু এর পরেও অবশ্য মনে হতে পারে যে পণ্যের মূল্য যদি তার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ দিয়েই স্থির হয় তাহলে মানুষ যত কুঁড়ে বা আনাড়ি হবে তত বেশী তার সময় লাগবে পণ্য উৎপাদন এবং তার পণ্যের মূল্যও কাজেই বেশী হবে। এটা মস্তবড় ভুল এবং এই ভুল যাতে কেউ না করে, তার জন্যই মার্কস 'সামাজিক শ্রম' কথাটি ব্যবহার করেছেন। 'সামাজিক শ্রম' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, সমাজবিকাশের একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট সামাজিক গড়পড়তা পরিস্থিতিতে উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের গড়পড়তা দক্ষতার সাহায্যে পণ্য উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম লাগে, তাকেই। যেমন ইংলণ্ডে যখন হাতে চালানো তাঁতের সঙ্গে কলের তাঁত পাল্লা দিতে এল, তখন এক গজ কাপড় তৈরী করতে আগের শ্রমসময়ের অর্ধেক সময় প্রয়োজন হলো। এটাই হবে গড়পড়তা সামাজিক শ্রম সময়। এক্ষেত্রে তাঁতি যদি বলে তার যখন বেশী সময় লাগে তখন তার কাপড়ের মূল্য বেশী হবে, তবে সমাজ সেটা মেনে নেবে না, সমাজ এক্ষেত্রে বিচার করবে গড়পড়তা সময়ের মাপকাঠি দিয়ে। ফলটা দাঁড়ালো এই যে তাঁতি বেচারাকে আগের আয় রাখতে গিয়ে যেখানে ৯।১০ ঘণ্টা খাটলেই চলত এখন সেখানে ১৭।১৮ ঘণ্টা খাটতে হল। কারণ সামাজিক গড়পড়তা হিসাবে এখন এক গজ কাপড় তৈরী করতে দশ ঘণ্টা লাগে। অথচ হাতে চালানো তাঁতির লাগে সতেরো আঠারো ঘণ্টা অর্থাৎ আগে ৯।১০ ঘণ্টা খেটে সে যা পেত এখন ১৭।১৮ ঘণ্টা খেটে তাই পাবে।

পণ্যের মূল্য বা বিনিময় মূল্য এইভাবে স্থির হয় বলা যায়, পণ্যের দাম বা বাজার দর এই মূল্যেরই মুদ্রাগত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ সকলেই জানেন ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদকের উৎপাদনের অবস্থায় যতই ফারাক থাকুক না কেন একই ধরণের সমস্ত পণ্যের বাজার দর এক কাজেই একটা পণ্যের বাজার দর আর তার মূল্য এই পর্যন্ত একই মূল্য বা স্বাভাবিক দামের কখন উপরে কখনও নিচে বাজার দরের যে উঠতি পড়তি যোগান ও চাহিদার ওপরে নির্ভরশীল। এই যোগান চাহিদার

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

শ্রমিক শ্রেণী লড়াই করবেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভারসাম্যের অভাবের দরুণ আসল মূল্য থেকে বাজার দর অনবরতই বিচ্যুত হয়ে চলে কিন্তু তা থেকেই এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, যোগান ও চাহিদার টানা পোড়েনের মধ্য দিয়েই পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। এটাই বরং বাস্তব সত্য যে যোগান ও চাহিদা যদি পরস্পরের ভারসাম্য ঘটায় তাহলে পণ্যের বাজার দর তার স্বাভাবিক দাম অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রমের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত যে মূল্য তারই অনুরূপ হবে। তাছাড়া রোজকার বাজারের উঠতি পড়তি বিচারের বদলে যদি দীর্ঘতর কালজুড়ে বাজারদরের গতি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে বাজারদরের উঠতি পড়তি, মূল্য থেকে তাদের বিচ্যুতি পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। অবশ্য একচেটিয়া শিল্পের ফলাফল ও আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সেগুলোকে বাদ দিলে সব ধরণের পণ্যই গড়ে তাদের নিজ নিজ মূল্য বা স্বাভাবিক দামে বিক্রি হয়। কাজেই বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিয়মিত ও স্বাভাবিক মুনাফা উদ্ভূত হয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে বা মূল্যের তুলনায় চড়া দামে তাকে বিক্রি করে—একথা-অর্থহীন। সামগ্রিক ভাবে বিচার করলেই দেখা যাবে এই পথে মুনাফা আমদানী অসম্ভব। কারণ বিক্রেতা হিসাবে লোক এইভাবে যদি অনবরত লাভ করতে থাকে তবে ক্রেতা হিসাবে সে সমভাবেই লোকসান দিতে থাকবে। আর একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না যে এমন মানুষ আছে যারা বিক্রেতা নয় শুধুই ক্রেতা বা উৎপাদক নয় শুধুই ভোক্তা।

সুতরাং মুনাফার সাধারণ প্রকৃতি বুঝতে হলে এই সূত্র থেকেই সুরু করতে হবে যে গড়পড়তা হিসাবে পণ্য বিক্রি হয় তার আসল মূল্যে অর্থাৎ তার মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম নিহিত রয়েছে তার পরিমাপের মূল্য পণ্য বিক্রি করেই মুনাফা লাভ হয়।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে তাহলে শ্রমের মূল্য বলে নিশ্চয়ই একটি জিনিষ আছে। অর্থাৎ প্রত্যহ শ্রমিক যা বিক্রি করে তা হচ্ছে তার শ্রম, তাই শ্রমের একটা দাম আছে এবং যেহেতু পণ্যের দাম তার মূল্যের মুদ্রাগত রূপ তাই শ্রমেরও একটা মুদ্রাগত মূল্য আছে। মূল্য সম্পর্কে এই ধারণা দিয়ে দশ ঘন্টা খাটুনীর রোজের মূল্য বিচার করা যায় না। ওই রোজের ভিতর কতটা শ্রম আছে? দশ ঘন্টার শ্রম, দশ ঘন্টা খাটুনীর রোজের মূল্য দশ ঘন্টার শ্রম বা সেই রোজের মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণ একথা বলার অর্থ কেবল একই কথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলা। দেখা যাচ্ছে সাধারণ অর্থে যেভাবে কথাটি গ্রহণ করা হয় সেভাবে শ্রমের মূল্য বলে কিছু নেই। আসলে 'শ্রমের মূল্য' কথাটির প্রকৃত অর্থের মধ্যেই লুকনো রয়েছে মূল্য সম্পর্কে সমস্ত রহস্য।

শ্রমিক পুঁজিপতি মালিকের কাছে যা বিক্রি করে তা তার শ্রম নয়, শ্রম করার শক্তি। মজুরি হিসাবে এই শ্রম করার শক্তির মূল্যই শ্রমিক পায়। অন্য যে কোনো পণ্যের মত এই শক্তির মূল্যও নির্ধারিত হয়। এই শক্তি উৎপাদন করতে যে শ্রম দরকার তার পরিমাণের দ্বারা। তার মানে এই শ্রমশক্তি অর্জন করতে তাকে পোষণ করতে যে দ্রব্যাদি অবশ্য প্রয়োজন তার মূল্যের দ্বারাই শ্রমশক্তির মূল্য মাপা হয়। ধরা যাক, একজন শ্রমিকের গড়ে প্রতিদিন যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন তা উৎপাদন করতে ছয় ঘন্টার গড়পড়তা শ্রম লাগে অর্থাৎ একজন শ্রমিক প্রতিদিন যদি ছয় ঘন্টা খাটে তবে প্রতিদিন গড়ে তার যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি প্রয়োজন ঠিক ততটা ক্রমের মত মূল্য সে উৎপন্ন করতে পারে। সোজা কথায় মেহনতী মানুষ হিসাবে নিজেকে বজায় রাখার মত মূল্য সে উৎপন্ন করতে পারে ছয় ঘন্টা শ্রম করে। এই হিসাবেই মজুরি খাটা শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে তার শ্রম শক্তি বিক্রি করে। এই ছয় ঘন্টা শ্রমের মুদ্রামূল্য যদি তিন টাকা হয় তবে প্রতিদিন কোনো কারখানার শ্রমিক ছয় ঘন্টা শ্রম করে কারখানা জাত পণ্যে তিন টাকার মূল্য যোগ করে অর্থাৎ সে নিজে শ্রম করার শক্তির যে দাম পাচ্ছে তার ঠিক সমান সে ফেরত দিচ্ছে। এমন ক্ষেত্রে কোনো উদ্বৃত্ত মূল্য বা উদ্বৃত্ত উৎপাদন পুঁজিপতির হাতে আসবে না।

কিন্তু মজুরের শ্রমশক্তিকে মূল্য দিয়ে কিনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে কেনা পণ্যকে যথেচ্ছ ভোগ বা ব্যবহার করার অধিকার পুঁজিপতি অর্জন করে। তার মানে মজুরের শ্রম করার শক্তির দিনের বা সপ্তাহের মূল্য দিয়ে পুঁজিপতি গোটা দিন বা সপ্তাহ জুড়ে তাকে খাটাবার অধিকার অর্জন করে। আবার শ্রম করার শক্তির রোজকার মূল্য ঐ শক্তির রোজকার প্রয়োগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, ঠিক যেমন ঘোড়ার যে খাদ্য দরকার আর যে সময় ধরে সে সওয়ার বয়ে বেড়াতে পারে তা হলো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কাজেই শ্রম করার শক্তির মূল্য যে পরিমাণ শ্রমের দ্বারা সীমাবদ্ধ তা কখনই শ্রম শক্তির প্রয়োগ ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে না, ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে পুঁজিপতি মালিক ছয় ঘন্টা শ্রমের মুদ্রামূল্য তিন টাকা দিয়ে শ্রমিকের শ্রম শক্তিকে কিনে নেয় এবং কেনার সঙ্গে সঙ্গে যে অধিকার সে অর্জন করে তার জোরে তাকে বারো ঘন্টা হয়ত খাটায়। এইভাবে মজুরি হিসাবে শ্রমিককে যা দেওয়া হয় তা তুলে নেবার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় ঘন্টার ওপরেও অর্থাৎ শ্রম করার শক্তির মূল্যের ওপরেও শ্রমিককে আরও ছয় ঘন্টা খাটতে হয়। এই উদ্বৃত্ত শ্রমই রূপায়িত হয় উদ্বৃত্ত মূল্য আর উদ্বৃত্ত উৎপন্নের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে এই উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্য পুঁজিপতিকে কোনো প্রতিমূল্য দিতে হচ্ছে না। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে এই ধরণের বিনিময়ের উপরই পুঁজিবাদী উৎপাদন বা মজুরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এই থেকেই মজুরের মজুর হিসাবে আর পুঁজিপতির পুঁজিপতি হিসাবে অবিরাম পুনরুৎপাদন হয়ে চলেছে।

অথচ মজুর যেহেতু তার মজুরি পায় শ্রম সম্পাদনের পরে এবং যেহেতু সে এই জানে যে পুঁজিপতিকে আসলে সে দিচ্ছে তার শ্রম, সেইহেতু শ্রম করার শক্তির মূল্য বা দামই তার কাছে শ্রমের দাম বা মূল্য হিসাবে প্রতিভাত হয়। আসলে দেখা যাচ্ছে শ্রমের মূল্য ও দাম কথাটা অর্থহীন। যদিও প্রতিদিনকার শ্রমের একটা অংশের জন্যই শুধু মজুরকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় এবং অপর অংশের কিছুই দেওয়া দেওয়া হয় না, তবু মনে হয় যে মোট শ্রমের জন্যই বুঝি পারিশ্রমিক দেওয়া হলো আর এই ফাঁকে ঐ বিনা পয়সার উদ্বৃত্ত শ্রম থেকেই নির্বিঘ্নে গড়ে উঠে উদ্বৃত্ত মূল্য মুনাফার তহবিল।

মজুরির দাম মুনাফার পারস্পরিক সম্পর্ক এইভাবে বিশ্লেষণ করে মার্কস মজুরির বৃদ্ধির জন্য বা মজুরি হ্রাস প্রতিরোধের জন্য শ্রমিকরে প্রচেষ্টার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই তিনি দেখিয়েছেন যে প্রতিদিনকার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যিক সামগ্রীর দাম যদি বেড়ে যায় তবে আগের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী শ্রমশক্তির দামও ন্যায্যত বেড়ে যাওয়া উচিত। অবশ্য এক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধির দাবী তুলে মজুরী এই বর্দ্ধিত মূল্যটুকুই শুধু দাবী করবে এছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যদি এই বর্দ্ধিত মূল্য আদায় করে সে নিতে পারে তবে মজুরের জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে যাবে। বর্দ্ধিত মূল্য দাবী না করা মানে জীবনযাত্রার মানের অবনতিকে নিঃশব্দে মেনে নিয়ে পুঁজিপতির মুনাফাকে বজায় রাখতে সাহায্য করা হবে। আবার উল্টোভাবে আবশ্যিক জিনিষপত্রের দাম কমে গেলে শ্রমের মূল্যও কমে যাবে এবং এই হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে আগের সমপরিমাণ মূল্যই মিলবে। কিন্তু এই অবস্থায় পুঁজিপতির মুনাফাও যাবে বেড়ে। কাজেই মজুরের জীবনযাত্রার মান এক থাকলেও সমাজে তার আপেক্ষিক স্থান নেমে যাবে। শ্রমিক যদি এই আপেক্ষিক মজুরী হ্রাসে বাধা না দেয় তবে নিজের বর্দ্ধিত উৎপাদিকা শক্তির অংশটুকু পুঁজিপতিকে ছেড়ে দেবার এবং সামাজিক অবস্থা বিন্যাসে তার সাবেকী স্থান মেনে নেবার পথ করে দেবে।

এরপর মার্কস দেখিয়েছেন মুদ্রার মূল্য যদি কমে যায়, তখন অন্য সমস্ত পণ্যের মত শ্রমের মূল্যও আনুপাতিক হারে বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে, মজুরের আনুপাতিক মজুরি বৃদ্ধির জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়, একথা বলাও যা, জিনিষের বদলে নাম নিয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত এই কথা বলাও তা। ইতিহাস একথাই জমাণ করে যে যখনই এই রকম মুদ্রার মূল্য হ্রাস ঘটে তখনই পুঁজিপতিরা মজুরদের ঠকিয়ে নেবার সুযোগ গ্রহণ করে।

খাটুনীর ঘন্টা বাড়িয়ে মুনাফার অংশ বাড়ানো এক সহজ পথা। কাজের ঘন্টা কমানোর দাবী নিয়ে তাই শ্রমিকের লড়ায়ের ইতিহাসও বিরাম। এই লড়াই করেই ঘন্টার সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার মত কারখানা আইন চালু করাতে পেরেছে শ্রমিকশ্রেণী। কিন্তু এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেও শ্রমমূল্যের সাবেক মান বজায় রাখার জন্য মজুরি বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে। শ্রমের তীব্রতা বাড়িয়ে আগে দুঘন্টার যত জীবনীশক্তি ব্যয় হত এখন এক ঘন্টাতেই ততটা ব্যয় করতে শ্রমিককে বাধ্য করা যেতে পারে। যন্ত্রবেগ বাড়িয়ে এবং একজন মানুষকে যে সব যন্ত্রের তত্ত্বাবধান করতে হয় তার সংখ্যা বাড়িয়ে এই ব্যাপারই করা হয়। এই অবস্থায় এক ঘন্টায় যে শ্রম ঢালতে হয় তার পরিমাণ যদি খাটনীর ঘন্টার মাত্রা হ্রাসের ন্যায্য অনুপাতে চলে তবে মজুরেরই জিত। কিন্তু এই মাত্রা পেরোলেই একদিকে সে যা জিতবে অন্য দিকে তাই হারাবে এবং এ ক্ষেত্রে দশ ঘন্টার শ্রম আগের বারো ঘন্টা শ্রমের মতই সর্বনাশা হবে। পুঁজির এই ঝোঁককে ঠেকিয়ে, শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করে মজুর তার শ্রমের ক্ষয় ক্ষতিকেই প্রতিরোধ করবে।

সর্বোপরি, পুঁজিবাদী উৎপাদন নিষ্পন্দভাব, ক্রমবর্ধমান তেজীভাব সমৃদ্ধি, অতিবাণিজ্য সংকট, অচল অবস্থা—এইসব পর্যায়ের এক চক্রের মধ্য দিয়েই চলে। পণ্যের বাজার দর ও মুনাফার বাজার হার এইসব পর্যায় অনুসরণ করে কখনও গড়পড়তা হারের নিচে নেমে যায় কখনও বা তার উপরে ওঠে। পড়তি বাজারদর সংকট ও অচল অবস্থার যুগে মজুরের কাজ যদি একেবারে না যায়, তবে তার মজুরি অন্তত নিশ্চয়ই কমে যাবে। এই নিয়ে পুঁজিপতির সঙ্গে লড়াই না করে পুঁজিপতির মুনাফা বজায় রাখার পথকে নিষ্কন্টক করে দেওয়া হবে। সমৃদ্ধির সময় যখন বাড়তি মুনাফা কামানো হয় তখন মজুরি বৃদ্ধির লড়াই না করলে শ্রমিক তার গড়পড়তা মজুরি বা তার শ্রমের মূল্য পর্যন্তও পাবে না, ক্রীতদাস একটা স্থায়ী ও নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরণপোষণ পায়, মজুরি খাটা শ্রমিক তা পায় না। সে তার শ্রমশক্তিকে পণ্য হিসাবে বিক্রি করে। পণ্যের দাম নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার আয় থেকে কোনো যুক্তিতেই তাকে বঞ্চিত দেওয়া যায় না। তাই শ্রমিককে এ সময়ে মজুরি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতেই হবে।

গোঘাট ব্লক এলাকার দুরবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হুগলী জেলার গোঘাটা থানার ভূরকুণ্ডা গ্রামের প্রাথমিক স্কুল পড়ে যায় চার বছর আগে। ডি পি আই থেকে চোদ্দশ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ছিল অথচ তদ্বির করেও কাজ হয় নি বলে ডানকুনি উন্নয়ণীর সম্পাদক শ্রীঅনিশ ঘোষ জানিয়েছেন। আরামবাগ মহকুমার গোঘাট ব্লক এলাকায় রাস্তাঘাট মেরামত করা হচ্ছে না। মোট পাঁচটি স্যালোর মধ্যে মাঝে মাঝেই দু একটি অকেজো হচ্ছে। বিদ্যুতের অভাব চরমে পৌঁছেছে। অঞ্চলপ্রধান অমৃত মণ্ডল অবিলম্বে বিদ্যুতের জন্য আবেদন জানালেন। আইনের ছাত্র ইদ্রিশ আলী বললেন একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুব বেশী দরকার। ঐ সব অঞ্চলে হুক ওয়ার্ম এবং পায়ের পাতায় বিচিত্র অসুখের প্রভাব বাড়ছে। এ ছাড়া সাপে কাটা রোগীর মৃত্যু সংখ্যা উদ্বেগজনক। এই সব অঞ্চলে সাপে কাটলে স্থানীয় দশ মাইল দূরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। সেখানে ভেনম বা সাপের বিষনিরোধক ওষুধ পাওয়া যায় না। আলু উৎপাদনের এমন একটি সুযোগ স্থানে জেলার শেষ প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা ভাঙ্গা। রাস্তায় প্রায় ত্রিশটি ভাঙ্গা গরুর গাড়ী পড়ে আছে।

সাহিত্যে মার্কসবাদী চেতনা ও 'মহেশ'

মিহির আচার্য

শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্পে সচেতনভাবে মার্কসবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে আমার এই মন্তব্য দুর্ভাগ্যবশত মার্কসবাদী-সমাজে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। অধিকন্তু নেপাল মজুমদারের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি কোথাও কোথাও এমন কটাক্ষ করেছেন যে, কতিপয় মতলববাজ শরৎচন্দ্রকে মার্কসবাদী প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এমত কটাক্ষের অন্যতম লক্ষ্য যে আমিও সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি আমার কোন প্রবন্ধেই শরৎচন্দ্রকে মার্কসবাদী প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত হইনি।

"মহেশ" গল্পটি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত যে ভুল, এমন স্পষ্ট অভিযোগও নেপালবাবু কোথাও করেন নি। এর অর্থ এই হতে পারে নেপালবাবু ও আমার মার্কসবাদী বিশ্লেষণে ঐকমত নেই।

আমার বিশ্লেষণটিকে সূত্রাকারে বলতে গেলে

(এক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাহিনীতেও লেখক ব্যক্তিকে এমন করে চিত্রিত করেন যার ফলে ব্যক্তি তার শ্রেণীচরিত্রের স্বরূপে উপস্থিত হয়।

(দুই) গল্পের পরিণতিতে চরিত্রটিকে লেখক এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত করেন যা ভবিষ্যতের ইতিহাস-চেতনাকে লক্ষ্যবিদ্ধ করে।

"মহেশ" গল্পে গফুর দরিদ্র, শোষিত কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি। এবং কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমান চরিত্রকে বেছে নিয়ে লেখক কী এই সত্যটিকেও আঙুলে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে বাঙলা দেশে মুসলমান-কৃষকও সংখ্যাগুরু? আপাত-নিরীহ, বশ্য, গফুরের জমিদারদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের প্রকাশ সেটিও কী বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত সাধারণ চাষীদের চরিত্রানুযায়ী নয়? যে-মানুষও ঘা দিয়ে পবিত্র মেজাজ দেখিয়ে জমিদারকে উপেক্ষা করবার মারাত্মক চেহারা দেখায় অথচ হাঁটু গেড়ে বসলে প্রভুর মার্জনা পাওয়ারও অসুবিধে হয় না। গফুর গ্রামত্যাগ করবার আগে নিষ্ঠুর সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে ধিক্কার দেয়।

আমার প্রবীণ বন্ধু নেপালবাবু রবীন্দ্রনাথের "সমস্যাপূরণ" গল্পের 'অছিমুদ্দির' মতো আশা করেছিলেন গফুর কাস্তে হাতে জমিদারের গলা কাটতে যাবে, যা জমিদারের "জারজ সন্তান" "সম্পন্ন কৃষক" অছিমুদ্দি করতে উদ্যত হয়েছিল! কাস্তে হাতে তাড়া না খেলেও গল্প যে কী-পরিমাণ শক্তিশালী হতে পারে "মহেশ" গল্পই তার দৃষ্টান্ত। আমাদের অতীব দুর্ভাগ্য নেপালবাবু "মহেশ" গল্পটিকে শক্তিশালী সমাজ-সচেতন গল্প হিসেবে ধরতেই চান না! এমত তাঁর মার্কসবাদী চৈতন্য!

গ্রাম থেকে উৎখাত তাঁর গফুর চরিত্রকে শরৎচন্দ্র কোথায় নিয়ে গেলেন? তর্কে টেনে আনলেন টকলে মজুর হিসেবে, যে মজুর-শ্রেণী পরবর্তীকালে তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করবে। মূলত উৎখাত কৃষক আমাদের দেশের মজুর শ্রেণী কী সেইভাবেই গড়ে ওঠে নি? সেইকালে হাওড়া-হুগলীতে গঙ্গার তীরে তীরে গড়ে-ওঠা চটকলগুলি সম্পর্কে লেখক বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন অবশ্যই।

এইসব পটভূমিকায় "মহেশ" গল্পকে মার্কসবাদী চেতনাসম্পন্ন গল্প কেন বলা যাবে না, আমার মাথায় তা আসে না।

এবার "মহেশ" গল্পটি প্রকাশকালীন ঘটনাটি বিচার করে দেখা যেতে পারে।

হুগলী গবর্ণমেন্ট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বন্ধু অক্ষয়কুমার সরকার। বর্ধমান বিভাগের তৎকালীন কমিশনার সরকারি মত প্রচারের জন্যে "পল্লীশ্রী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করেন। সম্পাদক নির্বাচিত হন অক্ষয়কুমার সরকার। পল্লীচিত্র নিয়ে একটি গল্প লেখার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্র "মহেশ" গল্পটি লেখেন। গল্পটি তেরোশ উনত্রিশ সালের আশ্বিন সংখ্যায় "পল্লীশ্রীতে" প্রকাশিত হয়। অধিকন্তু গল্পটির বহুল প্রচারের জন্যে অক্ষয়বাবু গল্পটি কপি করে দিলে একই সময়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলেদের পত্রিকা "বঙ্গবাণবতেও" প্রকাশিত হল।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বঙ্গবাণীতে শরৎচন্দ্রের "অভাগীর স্বর্গ" তেরেশ উনত্রিশ, মাঘ, এবং "পথের দাবী"-ও তেরোশ উনত্রিশ, ফাল্গুন, ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

গল্পটি কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল?

শরৎচন্দ্রের "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে।

"মহেশ নামে আমার লেখা একটা ছোটগল্প আছে, সেটি সাহিত্য-প্রিয় বহু লোকেরই প্রশংসা পেয়েছিল। একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি ম্যাট্রিক-এর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে, আবার একদিন কানে এলো সেটি নাকি স্থানভ্রষ্ট হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোন যোগ নেই, ভাবলাম এমনিই হয়তো নিয়ম। কিছুদিন থাকে আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে নাকি গো-হত্যা আছে। আহা! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের বহু টাকা মাসনের কর্তা মশায় এ অনাচার সইবেন কি করে? তাই মহেশের স্থানে গোভাগমন করেছেন তাঁর স্বরচিত গল্প "প্রেমের ঠাকুর"।

"....আমার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে (প্রেমের ঠাকুরের লেখক যোগেন্দ্রনাথ মিত্র—বর্তমান লেখক) সসম্মানে নিবেদন করে রাখি যে খুব বড় হলেও মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় থাকা ভালো। ভাবা উচিত, তাঁর রচিত গল্পের সঙ্গে বাংলার ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় না ঘটলেও বিশেষ কোনো লোকসান ছিল না। টেক্সট বুক থেকে পয়সা পাইনে—ও ব্যবসা আমার নয়—সুতরাং ক্ষতিবৃদ্ধিও নেই—তবু ক্লেশ বোধ হয়। নিজের জন্য নয়,—অন্য কারণে। শুধু সান্ত্বনা এই যে অযোগ্যের হাতে পড়লে এমনি দশাই ঘটে। যে ব্যক্তি কোনো কোনোদিন সাহিত্য সাধনা করেনি সে কি করে বুঝবে কার মানে কি! শুনেছি না কি আমার রামের সুমতি গল্পের খানিকটা দিয়েছেন। অত্যন্ত দয়া,—বোধ করি আশা এর থেকে রামেদের সুমতি হবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, দেশে রহিমরাও আছে।

"আর শুধু বিদ্যালয়ই নয়, মহেশের ভাগ্যে অন্য দুর্ঘটনাও ঘটছে। তার বিস্তারিত বিবরণ বিবরণ দিতে চাইলে, কিন্তু নিঃসংশয়ে জানি এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ ধরণের গল্প যেন আর না ছাপা হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেশের সর্বনাশ হয়।"

প্রসঙ্গত বলা যায় "মহেশ" গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণীর এক রশও ক্ষুব্ধ হন। মুসলির সম্পাদিত পত্রিকায় এর কড়া সমালোচনা বেরিয়েছিল।

"মহেশ" সম্পর্কে আমাদের এই তথ্যগুলি বিবেচনা করার দরকার রয়েছে। বেশিরভাগ পাঠক তথা সমালোচকবর্গ এই সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত নাথাকার কারণে গল্পটির যুগান্তরকারী মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ। এই গল্পে ঐতিহাসিক-ইঙ্গিতটি ধরতে না-পেরে ইদানীংকালের অন্যতম শরৎ গবেষক গোপালচন্দ্র রায়ও "মহেশ" গল্পে পশুপ্রীতি ছাড়া কিছু দেখতে পান না। শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক পশুপ্রীতির সঙ্গে তিনি এমনি সরলীকরণ করেছেন। অথচ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "আদরিণীর" মতো "মহেশ" নিছক পশুপ্রীতির উদাহরণ নয়। এমনকি শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার পশুক্লেশ নিবারনী সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাটাও গল্পের ক্ষেত্রে বিচার্য নয়।

দৃঢ়তার সঙ্গেই সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, উৎখাত চাষির শ্রমিক সত্তায় উত্তরণের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র সচেতনতার সঙ্গে ভবিষ্যত ইতিহাসের দলিল তুলে ধরেছেন।

"মহেশ" লেখকের প্রক্ষিপ্ত নয় কিংবা বৈচিত্র্যের লোভে তিনি এমন গল্প লিখেছেন তাও মনে করা সমীচীন হবে না। কারণ শরৎচন্দ্রের জীবন ও রচনাদর্শকে যাঁরা সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন তাঁরাই এ-সত্যকে স্বীকার করবেন।

সমাজজিজ্ঞাসা তথা রাজনীতিসচেতনতা শরৎ সাহিত্যের মূল প্রেরণা। লেখক তাঁর যুগের মূল দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে লক্ষ্যবিদ্ধ করেছিলেন। তাই সাম্রাজ্যবাদ তথা সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। "পথের দাবী" কিংবা "স্বদেশ ও সাহিত্যের" প্রবন্ধাবলী তার প্রমাণ। পরাধীন দেশের একজন সৎ সাহিত্যকর্মী হিসেবে তার সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সংগ্রামী মানুষের কাছে অফুরন্ত উৎসাহের কারণ।

জাতীয় সংকটের দিনে সাহিত্যচর্চা অপেক্ষা সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করা তাঁর কাছে অভিপ্রেত ছিল। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন পরাধীন দেশে সত্যকার "স্বাধীন" রচনা লেখা সম্ভব নয়, তারি জন্যে দরকার বিদেশী শাসনমুক্ত অনুকূল পরিবেশ।

এমন ধারণা যে-সাহিত্যিকের তাঁর কাছে স্বাধীনতার লড়াই-ই বড় হয়ে উঠবে বইকি।

তাই লেখকের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-লাঞ্ছিত রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-অধ্যুষিত পল্লিসমাজ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

নেপালবাবুর মতো অত্যুৎসাহী পণ্ডিত এলোপাথাড়ি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের জমিদার চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি অন্বেষণ না-করে মুক্তচক্ষে দেখতে পারতেন "প্রেমিক" জমিদারের চাষি-শোষণে রঞ্জিত হাতটিকে তিনি কখনো লুকোননি। সেই বিশেষ চরিত্রটিকে তিনি আড়াল করবার চেষ্টা করলে নেপালবাবুর অভিযোগ সত্য মনে হত যে জমিদারি-ব্যবস্থার প্রতি শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথের মতোই দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু শরৎ-সাহিত্য চলনোই জমিদারি প্রথার অন্যায়কে সমর্থন করেনি। জীবানন্দ নয়, রমা নয়, বিজয়াও নয়। "পথের দাবী", "জাগরণ", "স্বদেশ ও সাহিত্যের" প্রবন্ধগুচ্ছে তার প্রমাণ আছে।

বিষয়টা ভেবে দেখা চলে যে সামতাবেড়েতে বাড়ি তৈরি করে বাস করলেও শরৎচন্দ্র, যা তিনি ইচ্ছে করলেই পারতেন, কোনোদিন জমিদারি খরিদ করবার স্বপ্ন দ্যাখেননি।

রাজনীতি অবাধ সাহিত্য-সাধনার জন্যেই লেখকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আরো দশজনের মতো কেরিয়ার তৈরির যন্ত্র ছিল না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে সহিংস-অহিংস কোনো পন্থার প্রতিই তাঁর

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

শরৎ জবানী

মাথা নুয়ে আসে আমার গোর্কির লেখা পড়ে।

সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। স্যাকরার দোকানে তোমাকে স্যাকরা হতে হবে, ভিক্ষুকের সঙ্গে ভিক্ষুক হতে হবে।

জন্মভূমি বলে হৈ হৈ করা আমার স্বভাব নয়। নিজেকে বড় করে ভাবলে লোকে তার জন্মভূমিকে বড় করে তুলতে চায়। দেখলে না, এত বয়সেও আমার আত্ম-জীবন-চরিত লেখার সাহস হল না। ও ধৃষ্টতা আমি কোনোদিনই করব না।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব—সে দেবত্বের চাইতেও বড়। অত্যন্ত সতী নারীকে চুরি, জাল-জুয়োচুরি ও মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে আমি দেখেছি। আবার উলটোটা দেখবার ভাগ্যও আমার হয়েছে।

মানুষের ভালো অথবা মন্দ লাগার উপর কোনো সাহিত্যই নির্ভর করে না—সে তার প্রয়োজনে আপনা হতেই নেমে যায়। সমাজের মধ্যে, জীবনের মধ্যে পরবর্তীকালে মানুষ যদি এটাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে না করে, তবে তা আর থাকবে না।

যাঁর যে রকম শিক্ষা, যাঁর যে রকম দৃষ্টি, যাঁর যে রকম শক্তি, যাঁর যে রকম রুচি—তিনি তাবই অনুপাতে সাহিত্য গড়ে তোলেন। এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি থাকবার তা থাকবে এবং যা না থাকবার তা লোপ পাবে।

আমি জানি আমাদের দেশের অনেকেই বিশ্বভারতীকে তাঁর একটা খেয়াল বলে মনে করেন। আমি বলি, হলই বা খেয়াল, কিন্তু কার খেয়াল ও কত বড় খেয়াল তা আমাদের ভুললে চলবে না।—তিনি এই বুড়ো বয়সে বিশ্বভারতীর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এ লজ্জা আমাদের।

যাঁরা বলেন আর্ট ফর আর্টস্ সেক, আমি সে দলে নই। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, যুবকেরা বেকার, মেয়েদেরও দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই—এ অবস্থায় লেখার ধারা কোন্ পথে চলবে—তা চিন্তা করার দিন এসেছে।

সংসারে অনেক ব্যাপার আছে যা সত্যি কিন্তু সাহিত্য নয়। আমার বলবার কথা এই যে, সত্যিটা যেন বনেদের মতো মাটির নীচে থাকে এবং তাহলে তার উপর যে সৌধটা গড়ে তুলব কল্পনা দিয়ে—সেটা সহজে ডুবে যাবে না।

মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমান, ভালোবাসা ও মানসিক দ্বন্দ্বই আমি আমার সাহিত্যে ফোটাবার চেষ্টা করে থাকি। সেই দিক থেকে আমি একজন বিজ্ঞানী অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানী।

ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের স্ট্যান্ডার্ড যুগে যুগে বদলে যায়। দুর্নীতি প্রচার করছে বলে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি, দেখতে হবে সে কোনো নতুন "আইডিয়া" দিচ্ছে, না সত্যের অজুহাতে কতকগুলো নোংরা জিনিস চালাচ্ছে।

রবিবাবু সেদিন বললেন, ও স্কুল মাস্টারের দল আমরা মানবো না। ওদের বিধিনিষেধ ঠেলে যা খুশি করব।

আমার কিন্তু মনে হয়—এ কথা বলা যায় না। তাদেরও চাই। তাদেরও বলবার "রাইট" আছে। আমরা সকলে মিলেই ভাষাকে পর পর গঠিত করে যাচ্ছি।

গ্রন্থনা ঃ মিহির আচার্য

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

সাপ্লায়ারদের সমস্যা

সম্প্রতি কলকাতায় একটি বণিকসভার উদ্যোগে পার্ক হোটেলে সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ এবং সরবরাহকারীর সমস্যা শীর্ষক আলোচনাচক্রে মন্ত্রী কে আর খাদিলকার ডি জি এ্যান্ড এস ডি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থায় মাল সরবরাহ সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন। অথচ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের পরিচালিত সংস্থা সরকারী দপ্তর মালপত্র সরবরাহ করে টাকা পাচ্ছেন না। অল ইণ্ডিয়া গ্লভস এ্যান্ডস সেফটি গুডস সাপ্লায়ার্সের সহঃ সম্পাদক অভিযোগ করেছেন ক্ষুদ্র সরবরাহকারীরা কারখানায় নিরাপত্তার জন্য হেলমেট, বুট, গ্লভস, এ্যাপ্রন ইত্যাদি সরবরাহ করে টাকা পাচ্ছেন না। আধা সরকারী বা সরকার অধিগৃহীত শিল্প সংস্থায় পারচেজ অফিসারদের কেউ কেউ বিনা কারণে টেন্ডার নাকচ করে অথবা টেন্ডার না দিয়ে নিজের বেনামীতে নিরাপত্তা দ্রব্য সরবরাহ করছেন। জি এস জি সি সমিতির দপ্তর চাঁদনী চক স্ট্রীট এক সাংবাদিক বৈঠকে বলা হয়েছে অফিস আদালত স্টেশনারী দ্রব্য সরবরাহ করে নিয়মিত টাকা না পেয়ে প্রায় দশজন শিক্ষিত বেকার কারবার গুটিয়ে নিয়েছেন। স্টেশনারস মেকারস গিল্ড-এর সম্পাদকও বলছেন টাটা স্টীল (সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন) সংস্থার কলকাতা অফিসে বার বার অফিস দ্রব্যাদি, কালি ফোল্ডার, ডট প্যাড ইত্যাদি সরবরাহের জন্য আবেদন করেও সদস্যরা চিঠির উত্তর পান নি। ডি জি এস এ্যান্ড ডির মত সংস্থায় ছোট সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে টেন্ডার মূল্য, সদস্যভুক্তি ইত্যাদি নিয়ম শিথিল করার দাবী করা হয়। গ্রামে গঞ্জে রাস্তা মেরামত প্রভৃতি কাজের জন্য চুনসুরকী খোয়া ইট সরবরাহের ব্যাপারে বেকার শিক্ষিত ছেলেদের অগ্রাধিকারের দাবী করা হয়।

বিদেশ ভ্রমণ প্রসঙ্গে

ওয়ার্লড ইউনিয়ন সম্পাদক অভিযোগ করলেন হুমায়ুন কবীর কর্তৃক স্থাপিত কাউনসিল ফর কালচারাল রিলেসনস বিনিময় কর্মসূচী অনুযায়ী বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতো। এদের কলকাতা অফিস প্রায় অকেজো হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সত্যিকার সাংবাদিক শিল্পীর বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ মিলছে না। বিদেশে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগীদের মধ্যপ্রাচ্য আরব ইরাক বাহরাইন গালফ এবং অন্যত্র দেশে পাঠাবার কর্মসূচী ছিল, কিন্তু কেউ সুযোগ পায়নি। কলকাতার পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটির তরফ থেকে সরকারী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আরব পাঠানোর জন্য যে কর্মসূচী আছে তাতেও বিশেষ কর্মী ছাড়া অন্য কেউ পাত্তা পাচ্ছেন না। যোগ্যতা ও ডিগ্রী থাকা সত্বেও প্রার্থীদের এবারেও হজ কমিটির প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হয়নি।

পরিবার পরিকল্পনায় ধান্ধাবাজী

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে হুগলী জেলায় ইদানীং খুব ভালো কাজের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসী এবং ধান্ধাবাজ টাউটরা ফায়দা ওঠাতে শুরু করেছেন ফিকির ফন্দী করে। হুগলী জেলায় আদিবাসী ও মুসলীম সংখ্যালঘুদের মধ্যে নির্বীজকরণের জন্য অস্ত্রোপ্রচার মুর্শিদাবাদ জেলাকে ছাড়িয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবী। মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে না বলে যে অপপ্রচার চলছিল কিছু মহলে তার যৌক্তিকতা খুবই কম।

এই কাজের জন্য যে অসম্ভব পরিশ্রম ও বাধা পেতে হয় তার স্বীকৃতি নেই। হুগলী জেলা ফ্যামিলী প্ল্যানিং অফিসার এবং ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার নিজের ইচ্ছামত সমিতি বা গোষ্ঠীকে প্রচারের জন্য টাকা দিচ্ছেন এবং পুরস্কারও দিচ্ছেন। অথচ আদিবাসী ও অনুন্নত সমাজের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার জন্য যে সব নিঃস্বার্থ কর্মী ও বেসরকারী ব্যক্তি কাজ করেছেন তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়নি। সম্মানমূল্যও নয়। অথচ নিয়ম আছে কিছু সংখ্যক অস্ত্রোপ্রচারে আগ্রহী ব্যক্তিকে জোগাড় করলে মাসিক একশত টাকা চাঁদা হিসাবে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পাবে। কাপসিট যুব কংগ্রেস নেতা অমর হাজিরা এবং খোঁড়াগোড়ের আহসান মোবারক এই তীব্র অভিযোগ তুললেন পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের বিরুদ্ধে। এদিকে হুগলীর কংগ্রেস নেতা শান্তিমোহন রায় এবং মন্ত্রী গোপাল নাগের ঠাণ্ডাযন্ত্রে পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মীরাও অতিষ্ঠ। চণ্ডীতলার এম এল এ মহম্মদ সফিউল্লা শান্তিবাবুর লোক। তাঁর চেষ্টায় বেশী অস্ত্রোপচার হয়েছে দেখে মন্ত্রী গোপাল নাগ কংগ্রেস নেতা সাহাদাত আলীকে পাল্টা কাজ দেখিয়ে মন্ত্রীর ফিল্ড বজায় রাখার চেষ্টা করতে বলেছেন। জেলা মেডিক্যাল অফিসার অস্ত্রোপচারের প্রচারে বেরিয়ে কংগ্রেস হাফ নেতাদের গাড়ী চড়াচ্ছেন। ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় লোকের। পরিবার পরিকল্পনার রাজনীতি জোর চলছে হুগলীতে।

শরৎচন্দ্রের মহেশ

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

অরুচি ছিল না। এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং পরবর্তীধাপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথাও তিনি ভেবেছিলেন নিঃসন্দেহে। সোস্যালিস্ট নিউক্লিয়াস তৈরির প্রেরণা সৃষ্টিই শুধু নয়, "জাগরণ" উপন্যাসে বলশেভিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীস্বার্থের কারণেই "বলশেভিক গুণ্ডাতন্ত্রের" নিন্দা করেন।

আলোচনা এত বিস্তারিত করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মূল প্রতিপাদে ফিরে যাওয়া, শরৎ-সাহিত্য "মহেশের" মতো গল্প সৃষ্টি করাটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্য-চেতনার সঙ্গেই সুগ্রথিত। অর্থাৎ যিনি অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ে লেখেন; মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, পথের দাবীও সেই মানুষই লেখেন। শরৎ-সাহিত্য ধর্মে এইটিই স্বাভাবিক। এমনকি "পরিণীতা"র মতো সেনটিমেন্টাল প্রণয়কাহিনী লিখতে গিয়েও তিনি নায়কের রাবার মহাজনী শোষণের চিত্রটি আঁকতে ভুলেননি। নেপালবাবুর মতো গবেষকরা এই সত্যটিকে এড়িয়ে গিয়ে নিজের বিচারবুদ্ধিকেই অপমান করেছেন বলে আমার দৃঢ় ধারণা।

পরিশেষে বিষয়টির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেখানে শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করেছেন রাশিয়ান সাহিত্যের মতো আমাদের সাহিত্য যতদিন না নীচুতলার মানুষের মধ্যে নেমে আসতে পারছে ততদিন আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যত নেই। "গর্কির লেখা পড়লে আমার মাথা নুয়ে আসে"—এবম্বিধ উক্তিটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস

৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৪১৯৪৩

বিবাহিত জীবন উপভোগ করুন

নিরোধ

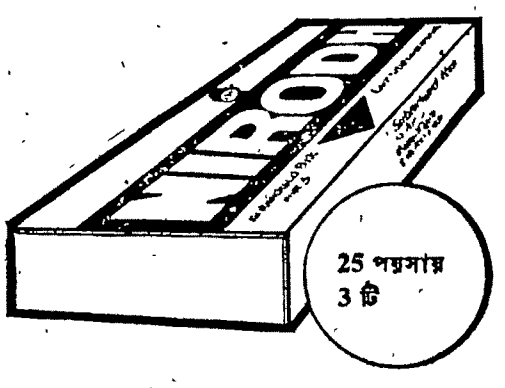

নিরাপদ
নিশ্চিত
সহজ

জেনারেল স্টোরগুলিতে পাবেন

উৎকৃষ্ট [illegible] বৈজ্ঞানিক জন্মনিরোধক—লক্ষ লক্ষ লোক ব্যবহার করছেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

আগামী সংখ্যায় ঃ চাসনালা খনি দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ রিপোর্ট

বর্ষশেষের মর্মান্তিক সংবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ষশেষের বেদনা আর নববর্ষের অশুভ সূচনার ভার বয়ে আনল ধানবাদের চাসনালা কোলিয়ারীতে খনিবন্দী প্রায় চারশো শ্রমিক। ওরা এখন খনি-বিধ্বস্ত উষ্ণ জলোচ্ছ্বাসের তলায়। ঘটনার দিন থেকে আজ এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত, মৃত্যুর ফাঁদে বন্দী শ্রমিকদের উদ্ধারের কাজ চলছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় খনিমন্ত্রী চন্দ্রজিৎ যাদবের কথামত "নিয়তিও" কাউকে বাঁচাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

এতদিন জল নিষ্কাশনের জন্য দেশী আটটি পাম্প দিয়ে কাজ চলছিল, সেই আটটি পাম্পের চারটি আবার বিকল হয়েছিল গত বৃহস্পতিবার, ফলে সেদিন জল অপসারণের কাজ তেমন এগোয় নি। সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা এবং পোল্যাণ্ড—এই তিনটি দেশের কাছে অনুরোধের পর সাড়া মিলেছে। ইতিমধ্যে আঠারোটি উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট মার্কিনী পাম্প এসে পৌঁছেছে, সোভিয়েত ও পোল্যাণ্ড থেকে বিশেষজ্ঞ দল এসে গিয়েছেন।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জানা গিয়েছিল যে খনিগর্ভে সঞ্চিত জলের পরিমাণ এগারো কোটি গ্যালন। দিন যতই এগোচ্ছে, সে হিসেবের পরিধি বাড়ছে। এ ছাড়া পাতাল ও জল উঠছে হু হু করে। সুতরাং হিসেব করে কূল পাওয়া যাচ্ছে না। হিসেব মিলছে না খনিবন্দী শ্রমিকদের সংখ্যার ব্যাপারেও। কর্তৃপক্ষ গত কয়েকদিন ধরে সঠিক হিসেব দিতে পারছেন না তার কারণ সংশ্লিষ্ট খাতাপত্র এবং রেজিষ্ট্রার নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খনিবন্দী শ্রমিকদের শোকার্ত পরিবারবর্গের হিসেবে গণনা চলছে। বিশ্বের এই তৃতীয় বৃহত্তম খনি দুর্ঘটনা নতুন করে আরো দুর্ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। বছরের শেষ দিনে খনিবন্দী একজন শ্রমিকের স্ত্রী আগুনে পুড়ে আত্মহত্যাও করেছেন।

খনিগর্ভ থেকে নগণ্য হারে জল নিষ্কাশন খনি অঞ্চলের মানুষকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। সমস্যা দেখা দিচ্ছে বহুবিধ। যে সব নতুন বিদেশী পাম্প বসানোর কথা চলছে, তার জন্যে স্থানাভাব দেখা দিয়েছে। ফলে সবগুলি মার্কিনী পাম্প কাজে লাগানো যাবে কিনা সন্দেহ। যে জল খনিগর্ভ থেকে বের করা হচ্ছে, তা ফেলা হচ্ছে দামোদরের জলে। ফলে নদীর জল হচ্ছে দূষিত বিষাক্ত এবং পানের অযোগ্য। অতএব দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের সঙ্কট। খনিগর্ভের এই বিষাক্ত জল কোথায় ফেলা হবে তারও কোন বিকল্প ব্যবস্থা হয়নি।

দুর্ঘটনার উৎস অনুসন্ধানের জন্য নিয়োজিত তদন্ত কমিটি আজ সুরু করার আগেই দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার কিছু কিছু সংবাদ জানা যাচ্ছে।

কয়েকজন খনি-বিশেষজ্ঞের অভিমত ঃ খনিটিতে গোড়া থেকেই জল জমার সমস্যা ছিল। খনিটির কর্তৃত্বের ব্যাপারে হাত বদল হয়েছে বহুবার। বর্তমানে দায়িত্ব ছিল ইস্কো কোম্পানীর হাতে। এর আগেও এখানে জলোচ্ছ্বাস দেখা গেছে, সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এবারের জলপ্লাবন ঘটেছে পার্শ্ববর্তী একটি জলজমা খনির ৮০ ফিট মোটা বাঁধ ভেঙে। এটি নাকি পানীয় জলের জলাধার হিসেবেই এত-

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

ই এস আই স্কীম সম্পর্কে অভিযোগ

দর্পণ

১৮শ বর্ষ ৪৬শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২রা জানুয়ারী '৭৬ ॥ দাম ঃ ৪০ পঃ

ই এস আই স্কীম সম্পর্কে অনেক অভিযোগ ইদানীং শোনা যাচ্ছে। এই স্কীমের আওতায় পড়েন এমন শ্রমিক কর্মচারীদের মনে রয়েছে এক বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা। তা হলো, ই এস আই কার জন্য?

পশ্চিমবঙ্গে এই স্কীমটি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন। গত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই স্কীমের আওতাভুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল প্রায় নয় লক্ষ। সম্প্রতি এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় এগারো লক্ষ। কারণ এতদিন পর্যন্ত এই স্কীমের আওতায় পড়তেন অনধিক পাঁচশো টাকা বেতনভোগীর দল। গত তিরিশে নভেম্বর থেকে এক আদেশ বলে মাসিক এক হাজার টাকা উপার্জনকারী কর্মচারীদেরও এই স্কীমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণের ফলে কিন্তু কেউই খুসি হননি। কারণ সকলের মনে একটাই প্রশ্ন : যখন পাঁচশো টাকা উপার্জনকারীর বেলায় এই স্কীমের কার্যকলাপ সন্তোষজনক নয় তখন কেন এই স্কীম সম্প্রসারিত করা হলো।

...নির্বাচন হলে তবু দু একটা কম্বল পাওয়া যেত

এই স্কীমের কার্ড হোল্ডারদের আউটডোর চিকিৎসার জন্য প্যানেল ডাক্তার আছে। এই ডাক্তাররা মাথাপিছু সাড়ে সাতশো কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা করেন। এ ছাড়া আছেন প্রায় শ' তিনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। এই সব প্যানেলভুক্ত ডাক্তার এবং বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের অভিযোগ অনেক। ডাক্তারবাবুরা কখনোই নির্দিষ্ট সময়ে চেম্বারে আসেন না ফলে প্রেসক্রিপসন লেখাবার জন্য রুগীকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয়। আবার সেই প্রেসক্রিপসনের কোন ওষুধ যদি রাজ্য বীমা ঔষধালয়ে না পাওয়া যায় তবে আবার আসতে হয় ডাক্তারবাবুর দরবারে কাঁটছাঁট করার জন্য। প্যানেলভুক্ত ডাক্তার এবং তাঁর ডিসপেনসারীর কর্মীদের ব্যবহার ভাল নয় বলেও অনেক কর্মী অভিযোগ করেছেন।

এমন অভিযোগও আছে যে দিনের পর দিন ডাক্তাররা চেম্বারে আসেন না ফলে রোগীকে কমপাউন্ডারের মুখ দেখেই ঘরে ফিরতে হয়। অথবা হয়রানি হতে হয় এই স্কীমের আওতাভুক্ত কর্মীদের। অবশ্য এই অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে জনকয়েক ডাক্তার বলেছেন যে, সরকারের কাছ থেকে ঠিক সময় মত টাকা পাওয়া যায় না। ভাল ঔষধ বা প্রয়োজনীয় ঔষধের প্রেসক্রিপসন তাঁরা করতে পারেন না। প্রয়োজনীয় ঔষধের প্রেসক্রিপসন কেন করতে পারেন না সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি।

কর্মীদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য অভিযোগ হল : ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মত ঔষধ সংগ্রহ করতে কর্মীদের চূড়ান্ত দুর্ভোগ করতে হয়। রাজ্য বীমা ঔষধালয় অনেক দূরে এবং সব ঔষধ সেখানে পাওয়াও

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

কেমিষ্টের অভাবে নাইট সার্ভিস বন্ধ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

নিখিল ভারত কেমিষ্ট ও ড্রাগিস্ট সংস্থার সভাপতি শ্রীত্যাগরাজ সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্ব-ভারতীয় সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীত্যাগরাজ জানান ভারতে প্রায় আশী হাজার কেমিষ্ট আছেন। সরকারী নিয়মানুসারে প্রতিটি কেমিষ্ট একজন ফার্মাসিস্ট নিয়োগে বাধ্য। অথচ সরকার বছরে মাত্র ১৮০০ ফার্মাসিস্টকে প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রী দিতে সক্ষম। সরকারের নির্দেশ কার্যকরী করতে হলে সরকারকে ফার্মাসিস্ট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে অবিলম্বে ঢেলে সাজানো ছাড়া অন্য কোন পথ নেই বলে তিনি জানান।

উপযুক্ত ফার্মাসিস্টের অভাবে কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লীর মত শহরেও সংস্থা নাইট-সার্ভিস বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। সরকার বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ট্যাক্স সিস্টেম চালু করাতে পরোক্ষ ভাবে আন্তঃপ্রাদেশিক স্মাগলিংকে সহায়তা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। ইউনিফর্ম ট্যাক্স ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু না হলে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে বেআইনী ভাবে ওষুধ আসতে বাধ্য বলে তিনি মন্তব্য করেন। সরকার উক্ত ব্যবসায়ে লাভের অঙ্ক শতকরা পঁচিশ থেকে দশ ভাগে নামিয়ে দেওয়াতে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কেমিস্ট শপ্ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং শহরের কেমিস্টরা ওষুধের ব্যবসা ছেড়ে অন্যান্য ব্যবসায়ে ঝুঁকি নিতে বাধ্য হচ্ছেন বলে সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ মন্তব্য করেন।

এইসব ব্যাপারে সরকার যদি অগ্রণী হয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তবেই শুধু জনসাধারণ সস্তাদরে সব সময়ে ওষুধ পাবেন বলে সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহসভাপতি শ্রীহীরেন সাহা জানান।

আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে। কিন্তু কেন?

নীলকান্ত দাশ

আত্মহত্যা এখন আকছার ঘটনা। প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। এঁদের তালিকায় তরুণ তরুণী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সবাই রয়েছেন। বয়সের পার্থক্য যতই থাক আত্মঘাতী হওয়ার শোচনীয় সংবাদে এঁরা সবাই আছেন। প্রতি তী সংবাদপত্রে আত্মহত্যার খবর আজ একটি নিয়মিত সংবাদ। এই তো সেদিন প্রগতি পূর্ণা শেষ হয়ে গেলেন। বারাসতের এক ছোট্ট গ্রামে ওরা দু'জন কেন যেন গিয়েছিলেন। পরের দিন দু'দুটো তরুণীর মৃতদেহ। ছোট্ট চিরকুটে লেখা "আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।" কয়েকঘণ্টা পার না হতেই বালিগঞ্জ কসবায় আরেকটি ঘটনা গৃহস্থ বধূ গলায় দড়ি দিয়েছেন। কসবা বারাসাত নয় রাজ্য জুড়েই এই ঘটনা এখন ঘটছে। শুধু রাজ্যই বা কেন, বরং আরও প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলা যায় আত্মহত্যা এখন সারা বিশ্ব জুড়েই চলেছে। মৃত্যুর শান্ত শীতল কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য একদল মানুষ যেন ছটফট করছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন—আত্মহত্যা যারা করছেন, তাদের চেয়ে অনেক বেশী মানুষ আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করেন। বলা যায়—আত্মহতদের তুলনায় এঁদের সংখ্যা কম করেও ১০।১৫ গুণ বেশী। এরা দফায় দফায় আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন ও করছেন। এই শোচনীয় মৃত্যুকে যারা বেছে নিয়েছেন, দেখা গেছে এদের মধ্যে কম করেও শতকরা ৬০ জন আগেই নানা ভাবে পৃথিবী থেকে সরে যাবার চেষ্টায় ছিলেন। তারা বিভিন্ন ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এতে তারা সফলকাম হননি। সাধারণ তরুণ তরুণীর মৃত্যুকে কেউ কেউ বয়সোচিত আবেগ প্রবণতার ঝোঁক বললেও, দেখা যাচ্ছে বয়স্ক ব্যক্তিরাও এই হঠকারী আত্মহত্যার পথকে নির্বিচারে বেছে নিচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যারা আত্মঘাতী হচ্ছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনেরই বয়স ৬০ বছরের বেশী। অর্থাৎ আত্মহত্যার ঘটনাগুলির সঙ্গে প্রবীণ মানুষেরাও নানাভাবে এখন জড়িয়ে পড়ছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, আত্মহত্যার ঘটনাগুলির নেপথ্য কারণও বড় অদ্ভুত। কেন না, এই ধরণের মৃত্যুর করাল ছায়া ধনী দরিদ্র, কিশোর কিশোরী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, রাজনৈতিক নেতা, সামরিক অফিসার প্রায় সবাইকে গ্রাস করেছে। কোন একটি বিশেষ নীতি নির্ধারণ করে এই আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা বিচার বিশ্লেষণ করাও মুস্কিল। কেন না, বিবাহিতরা আত্মহত্যা করছেন, অবিবাহিতরাও আবার আত্মঘাতী হচ্ছেন। বিধবা, ডাইভোর্সড স্বামী স্ত্রী সুইসাইড করছেন। এতো নিত্যদৃষ্ট ঘটনা। আবার সুখী সংসার থেকেও কেউ কেউ নীরবে সরে যাচ্ছেন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের হিসেব হল—আরবান পিপল অর্থাৎ শহরে মানুষের ক্ষেত্রেই এই আত্মহত্যার ঝোঁকটা মারাত্মক রকম বেশী। তবে গ্রামাঞ্চলেও কম নয়। ফালিডল খেয়ে, রেল লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, জলে ডুবে মরার পথটি এদের অনেকের কাছেই খুব প্রিয়। দেখা গেছে গ্রামে যারা সাত চড়েও রা করেন না, একদিন সকালে তাদেরই কেউ কেউ হয়ত কোন গাছে ঝুলছেন। গ্রামের পার্শ্ববর্তী কোন রেল লাইনে দু টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছেন। নয়ত গ্রামের বারোয়ারি কোন পুকুর ঘাটে ভেসে উঠেছেন। গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুর বড় রকমের হিসাব দেখে কেউ যদি মনে করেন দারিদ্রাই ওর মূল কারণ তিনি নির্ঘাৎ ভুল করবেন। এর কিছুটা সত্য হলেও সর্বাংশে সত্য নয়। কেন না আমেরিকায় দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা বেশী লক্ষ্য করে দারিদ্রাই এর অন্যতম কারণ যারা বলেছেন তারাই অবাক হয়ে গেছেন ইউরোপের ঘটনা দেখে। এখানে রোজগার বেশী, সম্ভ্রান্ত বলে পরিচিতদের মধ্যেই আত্মঘাতীর সংখ্যা বেশী। আত্মহত্যা সমাচারের আরও খবর হল আমেরিকায় সাদা সাহেবরা নিগ্রো শ্রেণীর কালোদের চেয়ে চারগুণ বেশী আত্মঘাতী হন। ইটালী স্পেন আইসল্যাণ্ডের প্রোটেস্টেণ্ট ধর্মাবলম্বীরা এই ঘটনার সঙ্গে বেশীরকম জড়িত। আবার অস্ট্রিয়ার এর ব্যতিক্রম—এখানে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষই বেশী সংখ্যায় বেছে নিচ্ছেন আত্মহননের পথ। সারা বিশ্বজুড়ে আত্মঘাতীদের তালিকায় পুরুষের সংখ্যাই বেশী বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। এদের বক্তব্য, সারা বিশ্বে যত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে তাতে পুরুষের মৃত্যুর সংখ্যাই বেশী। মেয়েদের চেয়ে কম করেও চারগুণ।

আত্মহত্যা করতে হলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতীদের একটা পথ খুঁজে নিতে হয়। দেখা যায় ছেলেরা ও পুরুষেরা ফায়ার আর্মসকেই এ ব্যাপারে শেষ সঙ্গী করে নিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য মৃত্যুকে সুনিশ্চিত ও যন্ত্রণামুক্ত করতেই পুরুষেরা এ ব্যাপারে আগ্নেয়াস্ত্রকে সাধারণত সম্বল করে নেয়। বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে পিস্তল রিভলবারের ছড়াছড়ি। যে কেউ একটু চেষ্টা করলেই এগুলো যোগাড় করে নিতে পারেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পরেই আত্মঘাতী দল এই হাতিয়ারকে কাছে টেনে নেন। এরপর একদিন বন্ধ ঘরে কিংবা খোলা ময়দানে একটা বিকট শব্দের নেপথ্যে সবার অজান্তে একটা ছোট্ট টোটার সঙ্গে একটা জীবনের শেষ বোঝাপড়া হয়ে যায়। ইউরোপে, বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক শহরে আত্মঘাতীরা বেছে নেন বিরাট বিরাট আকাশ ছোঁয়া বাড়ীগুলো। এর সর্বোচ্চ তল, কিংবা যেখান থেকে পড়লে মৃত্যু অবধারিত সেখান থেকে আত্মঘাতীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেখা গেছে এই শহরে আত্মহত্যার শতকরা ১৫ ভাগই ঘটে বহুতল বাড়ীগুলোকে ঘিরে। মৃত্যুর হাতিয়ার বাছার ব্যাপারে মে য়ে দে র ক্ষেত্রে কিছুটা বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে। এঁদের অনেকেই বিষ খেয়ে মরার পক্ষপাতি। আগের মত কেউ আর গলায় কলসী বেঁধে মরতে রাজী নন। কিংবা পুরোনো পথে যেতে গররাজী। এখন আধুনিক যুগ। বিজ্ঞানের জা রি জু রি তে অনেক কিছুই এসেছে। তাই আত্মহত্যার আধুনিক ঘ ট না য় মেয়েরা সদ্যআবিষ্কৃত কড়া বিষ, কিংবা গ্যাসকেই বেছে নেন। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোয় কাপড়ে আগুন দিয়ে মৃত্যুবরণ করা, রেল লাইনে ঝাঁপিয়ে আত্মঘাতী হওয়া ছাড়াও গ্যাস-মৃত্যুর ঘটনাও প্রচুর ঘটেছে। দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের রান্না করার গ্যাস খুলে মেয়েদের অনেকেই আত্মঘাতী হচ্ছেন।

অনেকেরই ধারণা আত্মহত্যার ঘটনা অনেক সময়েই নানা কারণে জানা সম্ভব হয় না। ফলে আত্মঘাতীদের প্রকৃত সংখ্যাও নিরূপণ করা খুব কঠিন কাজ। তবু মোট মুটি হিসাব হচ্ছে আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার মানুষ এই মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হচ্ছেন।

সুইডেন, ডেনমার্ক, আফ্রিকা হাঙ্গেরীতে প্রতি বছর প্রতি লক্ষে ২০ জন মানুষ নিজেকে নির্মম ভাবে শেষ করে দিচ্ছেন।

আয়ারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড আইসল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ডে এই সংখ্যা হচ্ছে লক্ষ জন কিছু ও জন। বর্ষে এই হতভাগ্যদের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে। বলা যা যারা শেষ হয়ে যাচ্ছেন—ত চেয়ে অনেক অনেক বেশী সং মানুষ এই শোচনীয় পথ খুঁজে নে জন্য পাগল হয়ে ঘুরছেন।

কিন্তু মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক কেন এই উন্মাদনা। কেন জনদের কাছে থেকে নিতে সরিয়ে নেবার এই করুণ প্রচে প্রগতি পূর্ণরা কেন বারবার হা যাচ্ছে! এর কি সদুত্তর নে মনোবিদরা হন্যে হয়ে এর ব খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এঁরা বলে আমরা সঠিক কোন তথ্য বা কা পেয়েছি এটা বলা অসম্ভব। ত যা পেয়েছি তাও কম নয়। এক বিচিত্র ব্যাপারে!

[আগামী সংখ্যায় সমা

ফিলিপাইনে মার্কিন-বিরোধী প্রবল বিক্ষোভ

সম্প্রতি ফিলিপাইনে মার্কিন বিরোধী প্রবল বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ফিলিপাইন দীর্ঘকাল ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্ভরযোগ্য অনুচর। সেই ফিলিপাইনে এ ধরণের বিক্ষোভের ঘটনা নিঃসন্দেহে অর্থবহ। আর এই বিক্ষোভ সংগঠিত হয় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের সফর কালে।

খবরে জানা যায়, সামরিক আইনকে অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার মানুষ ম্যানিলায় রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে জমা হয় ৬ই ডিসেম্বর। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী অবশ্য মিছিলের গতিরোধ করে। এ সময় রাষ্ট্রপতি ভবনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ড ও ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি মারকোস নানা ধরণের সলা পরামর্শে ব্যস্ত। বি ক্ষো ভ কা রী রা মার্কিন বিরোধী শ্লোগান দেবার সঙ্গে সঙ্গে মারকোস বিরোধী শ্লোগানও দেয়। সম্প্রতি একনায়ক মারকোস ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা শ্লো গা ন দেয় 'ধর্মঘট, ধর্মঘট' বলে। এ ছাড়া বিক্ষোভ মিছিল থেকে অবিলম্বে দেশে বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্র, যুব, শ্রমিক, শিক্ষক, ধর্মযাজক প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।

ফ্যাসিস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা

ফ্যাসিস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বিরুদ্ধে দেশে দেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি এমন একটি দেশ যারা আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ সত্বেও খুনের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দেশটা এক বিরাট জেলখানায় পরিণত। ভ ৎ স ত্বে ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশপ্রেমিক মানুষ ফ্যাসিস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আতঙ্কিত ফ্যাসিস্ত সরকার নির্বিচারে বন্দীদের খুন পর্যন্ত করছে। ১১ই ডিসেম্বর প্রিটোরিয়ায় দু'জন দেশপ্রেমিককে ফাঁ সি দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে প্রায় এক বছরে ৩৪ জন দেশপ্রেমিককে ফাঁসি দিয়েছে বর্ণ বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার। রাষ্ট্রসংঘে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা রয়েছে। সো ভি য়ে ত ইউনিয়ন, রোমানিয়া থেকে শুরু করে ভারত পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য বয়কট করেছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার এই ফ্যাসিস্ত সরকারকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে মার্কিন দেশ, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি ন্যাটো সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। সুখের সম্প্রতি প্রায় এক লক্ষ ম্যা নাগরিক রাষ্ট্র সংঘে প্রেরিত এক গণ দরখাস্তে রাষ্ট্র সংঘ থেকে আফ্রি কাকে ব হি ষ্কা র ে র দ জানিয়েছেন।

বন্দী মুক্তির দাবীতে স্পেনে প্রবল বিক্ষোভ

ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর স্পেনে রাজ জুয়ান কার্লোসের রাজত্ব দেশে নাকি "গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করবে! রাজা কার্লোস এই গণতান্ত্রিক দেশে রাজবন্দীদের নাকি মুক্তি দেবেন দফায় দফায়। অবশ্য রাজা কার্লো ক্ষমতায় বসার পর. মার্সেলিনো কামাশো সহ ত্রিশ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশের মানুষ শুধুমাত্র ত্রিশজন বন্দীর মুক্তি দেখে খুশি নন, তারা চান আ যে সব হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দী বছরের পর বছর কারাগারে রয়েছেন তারাও বেরিয়ে আসুন কামাশো স্পেনের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম সারির একজন নেতা। ১৯৩৬ সালের পর থেকে কখনো তাঁর দিন কেটেছে কারাগারে, কখনো বা তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে বা শ্রমিক মহল্লায় আত্মগোপন করে রয়েছেন। তাই কার্লোসের সর-

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বঞ্চনা ?

শিবাজী ভট্টাচার্য

মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রফল পশ্চিমবাংলার প্রায় সাড়ে তিনগুণ। পশ্চিমবাংলার ৮৮'৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার, মহারাষ্ট্রের ৩০৭'৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার, উত্তরপ্রদেশের ২৯৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার। মহারাষ্ট্রের লোকসংখ্যা পশ্চিমবাংলার থেকে বেশি, উত্তরপ্রদেশের লোকসংখ্যা এখানকার দ্বিগুণেরও বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অন্য সব রাজ্যের থেকে বেশি। এখানে ১৯৭২ সালে সতেরো হাজার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য বারো লক্ষ এবং রাজ্য সরকারের ৩৫৫ পর্যদে দশ হাজার লোক নেওয়ার বিজ্ঞাপনে এগারো লক্ষ দরখাস্ত জমা পড়েছে। দুটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার তেইশ লক্ষ টাকার পোস্টাল অর্ডার বিক্রী করেছেন। ১৯৭২ সালের ২০শে মার্চ রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের পর রাইটার্সের সামনে এক সমাবেশে শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বলেছিলেন, "সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। বেকারদের চাকরী দিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।"

ততঃকিম্ এর দু বছর পর সারা-ফুঁড়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের পাওলো ঘেঁটে দেখলাম যে, সংখ্যা বছর বছর বেকারের সংখ্যা বেড়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে এবং এ রাজ্য এখনও এ ব্যাপারে প্রথম স্থানে রয়েছে। ১৯৭৪ সালের হিসাব অনুসারে ;

পশ্চিমবাংলা	১৬,০০,০০০
বিহার	১১,০৭,০০০
উত্তরপ্রদেশ	৮,৪২,০০০
মহারাষ্ট্র	৬,১৯,০০০
তামিলনাড়ু	৫,৯৫,০০০

১৯৭৪-৭৫ সালে বাড়তি কর্মসংস্থান প্রকল্প অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে চেতাল্লিশ হাজার বেকারকে কাজ দেওয়া হয়। বছর শেষ হওয়ার আগেই এরমধ্যে বাইশ হাজার জন ছাঁটাই হয়েছেন। বিধানসভার গত বাজেট অধিবেশনে কংগ্রেস দলের শ্রীবারিদবরণ দাশ এই অভিযোগ করেন। (আনন্দবাজার ৮।৩।৭৫)

অর্থলগ্নী, কাঁচামাল যোগান ও লাইসেন্স দানের ক্ষেত্রে এ রাজ্য বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীর সংস্থা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ সিংহ বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলিকে তাদের প্রয়োজনায় কাঁচামালের মাত্র দশ শতাংশ দেওয়া হচ্ছে" (আনন্দবাজার ১৪,৬ ৭২)। ১৯৭৩ সালে কলকাতা ডক এক্সচেঞ্জের উদ্যোগে আয়োজিত "পূর্বভারতে বিনিয়োগ" সম্পর্কে এক আলোচনা চক্রে ভারপ্রাপ্ত কালে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ কয়েকটি সংখ্যা পেশ করে বলেন যে "বিনিয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্র পৃষ্ঠপোষিত আর্থিক সাহায্য দানকারী সংস্থাগুলি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় মহারাষ্ট্রকে অনেক বেশী মূলধন যোগাচ্ছেন।" (আনন্দবাজার ৮।৮।৭৩) পঞ্চম যোজনাতেও কেন্দ্র ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গের দাবী দুই তৃতীয়াংশ ছাঁটাই করেছেন। কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীঅন্নদা আবেদিন দিল্লীতে ৪৫ কোটি টাকার জন্য দরবার করেছিলেন, কিন্তু পেয়েছেন মাত্র ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে এ রাজ্যের মন্ত্রীরাও এ ব্যাপারে দায়ী কম নন। ফিলিপ্স কোম্পানী (যার ৬৭ শতাংশ শেয়ার নেদারল্যাণ্ড দেশীয় মালিকের হাতে রয়েছে) প্রফুল্ল সেন ও সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার আমলে তাদের ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গে না বাড়িয়ে আস্তে আস্তে মহারাষ্ট্রে বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৫৮ সালেই কোম্পানী তাদের হেড অফিস বোম্বেতে সরাতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বর্গত ডাঃ বিধান রায়ের ধমক খেয়ে তা আর করতে পারেনি। কিন্তু বিধান রায়ের মৃত্যুর দু বছরের মধ্যেই (১৯৬৪) তারা বোম্বাইতে হেড অফিসের একটি ইউনিট খোলে। ফলে তাদের কলকাতার বাণিজ্যিক অফিসগুলোর কর্মচারী সংখ্যা ১৯৬৪ সালের ৪৮০ থেকে কমতে কমতে আজ ২৬০ এ এসে দাঁড়িয়েছে।

(আনন্দবাজার ১৭।৯।৭৩)

১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের প্রধান চারটি রাজ্যে এল. আই. সি. সরকারী খাতে ৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে। অথচ কেবল মহারাষ্ট্রে এই সময় বিনিয়োগ করা হয়েছে ৬৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, এবং গুজরাটে ৬৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা।

গত জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত শিল্পোন্নয়ন দফতর মোট ১৯১টি শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুর করে। এর মধ্যে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি পেয়েছে মোত্র ২১টি। এই সময়ে মহারাষ্ট্রকে ৬৩টি শিল্প লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, গুজরাটে ২৫টি, তামিলনাড়ুতে ২০টি, মহীশূরে ১২টি, হরিয়ানায় ৮টি। ১৯৭৩ সালের ১০ই আগস্ট রাজ্যসভায় শ্রীকল্যাণ রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা রোহাতগী এই তথ্য জানান।

সারা দেশে মোট ছয়শো সাতাশটা কাপড়ের মিল আছে। পূর্বাঞ্চলে আছে তিপান্নটি। এখানে সম্প্রসারণ তো দূরের কথা, মহারাষ্ট্রের চেয়েও শতকরা ১৭ ভাগ বেশি দামে সুতো কেনা, কাঁচামালের অপর্যাপ্ত সরবরাহ ও রেল ভাড়ায় কনসেসন না পাওয়ার জন্য (বোম্বাই, আমেদাবাদে কিন্তু সরকারী নির্দেশে এই কনসেসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে) আজ সেগুলির টিকে থাকা দায় হয়ে উঠেছে। এর ফলে কয়েক লক্ষ শ্রমিকের জীবন বিপদাপন্ন হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলের একমাত্র অর্থকরী ফসল পাট। পশ্চিম ভারতে তুলো কিন্তু একমাত্র অর্থকরী ফসল নয়। সেখানে ব্যাপক ভাবে তৈল বীজ ও আখের চাষ হয়। কেন্দ্রীয় সরকার পাট চাষী ছাড়া অন্য সব ফসল উৎপাদনকারীদের কল্যাণ সাধনের জন্য খুবই তৎপর। এর ফলে সব কৃষিপণ্যেরই দাম বেড়েছে, দাম কিন্তু বাড়েনি পাটের। পাটের ন্যূনতম দর (একশত টাকা কুইন্টাল) সরকার বেঁধেছেন, তাতে উৎপাদনের খরচাই ওঠে না। ফলে পশ্চিমবাংলার বিশাল সংখ্যক পাট চাষী আজ মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন।

১৯৬১ সালে চেম্বার অফ কমার্সের এক তথ্য অনুযায়ী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্যের মাথা পিছু সৃষ্টমূল্য ৩৭০০ টাকা। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রের শ্রমিকদের মাথা পিছু সৃষ্টমূল্য ছিল ৩৩০০ টাকা। (পশ্চিমবাংলার বেকার সমস্যা : সুদর্শন রায়চৌধুরী)। কলকাতার জয়া কারখানার শ্রমিকদের উৎপাদনী ক্ষমতা পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রমিকদের চাইতে বেশী। এ কথা ঐ কারখানার একদা জেনারেল ম্যানেজার শ্রীটি. কে. রায় স্বয়ং স্বীকার করেছেন। জয়ার শ্রমিকদের মাথা পিছু সৃষ্টমূল্য হল ১২০০০ টাকা। পশ্চিমবাংলার শ্রমিকদের উৎপাদনী ক্ষমতা অধিক দেখে চরণরামের মত একচেটিয়া মালিকেরা এখানেই কারখানা খুলতে চায়। কিন্তু সেই ১৯৬৪ সালের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের পর থেকেই জয়ার শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনায় ভীত হয়ে আজ জয়ার মালিকরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে তাঁরা হেড অফিস কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করবেন। ন্যাশানাল গ্রিণ্ডলেস ব্যাঙ্ক তাদের কলকাতার হেড অফিসে অটোমেশন বসাবার প্রস্তাবে কর্মচারীদের কাছ থেকে বাধা পায়। ফলে এখন তারা হেড অফিস বোম্বেতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হ্যাঁ, ব্রিটেন, আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদী দেশের কোম্পানীগুলো এবং টাটা বিড়লারা এখানে ফ্যাক্টরী খুলতে চায়। এ রাজ্য কৃষিজ বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে দক্ষ শ্রমিক সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার মানুষ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। এখানকার শ্রমিকরা কতখানি সচেতন তার একটা পরিচয় দিই। টাটা গ্রুপের ভলটাস কোম্পানীর বোম্বাইয়ের ফ্যাক্টরীতে ১৯৭৩ সালে লক আউটের প্রতিবাদে কলকাতার হাইড রোডের ফ্যাক্টরীর চার হাজার কর্মচারী লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেন। এবং একই সঙ্গে দুটি কারখানা খুলিয়ে কার্যতঃ তাঁদের দাবী আদায় করেন। সাধারণতঃ এ রকম আন্তঃপ্রাদেশিক সৌভ্রাতৃত্ব (শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এ গুণ আছে) দেখা যায় না।

এ রাজ্যের শ্রমিকগণ মালিকদের মুনাফা আদায়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই মালিকরা মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাটে কারখানা গড়ে। ওখানকার শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আই. এন. টি. ইউ. সি, এইচ. এম. এস. বা ডি এম কের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কোথাও বা ডাঙ্গে সাহেব। শ্রমিকদের মালিকরা তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে ৭'৫ লক্ষ টাকা উপহারও দিয়েছেন। কিন্তু আজ সেখানকার মেহনতী মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে। বাদামের উৎপাদন কম হয়েছে ফলে দেশে বনস্পতির দাম চড়েছে। তা সত্ত্বেও ভারত সরকার মস্কোতে রপ্তানীর জন্য বোম্বাই বন্দরে ১৯৭৩ সালের ৩রা আগস্ট 'সালাভাত' নামক একটি রুশ জাহাজে বাইশ হাজার টন বাদাম তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাদামের বস্তাগুলো বন্দরের শ্রমিকেরা জাহাজে তোলেননি। জাহাজে মাল বোম্বাইয়ের কাজ বয়কট করেছিলেন। (স্টেটসম্যান ২৪।৮।৭৩)

পশ্চিমভারতের শ্রমিকগণও আজ আজ আর বিশ্বস্ত নয়। তাই আজ দিল্লী, হরিয়ানা, গাজিয়াবাদে মালিকেরা ছুটেছে। বুর্জোয়ারা আজ সেখানেও শিল্প শ্রমিকদের জন্ম দিয়ে নিজেদের কবর খুঁড়ছে।

সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম রাজ্য পাঞ্জাব, যেখানে পঞ্চাশের দশকের প্রথমেই কৃষিতে ট্রাকটর প্রবর্তন করা হয়। আজ পশ্চিমবঙ্গে ট্রাকটর ও পাওয়ার টিলার মিলিয়ে মোট সংখ্যা আটশত ছাড়ায়নি। অথচ আজ পাঞ্জাবে এর সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার (আনন্দবাজার ৯।১।৭৪)। ট্রাকটর চালাবার ফলে দৈহিক পটু বহু চাষী উদ্বৃত্ত হল। পরিকল্পনা অনুসারে এঁদেরকে তখন নেওয়া হল সেনাবাহিনীতে। এর ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আজ পাঞ্জাবীরাই সংখ্যাধিক। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত মিলিটারীতে রাজ্যভিত্তিক কিরকম নিয়োগ করা হয়েছে, এই প্রশ্নের (প্রশ্নের নং ২১৪১) উত্তরে ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল লোকসভায় তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম নিম্নোক্ত তথ্য জানান—

১ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক অধ্যুষিত উড়িষ্যা থেকে ২,১১৬ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মোট লোকসংখ্যা ১ কোটি ৮৭ লক্ষ কিন্তু ঐ দুটি রাজ্য থেকে একই সময়ে মোট ৪১ হাজারেরও বেশি লোককে নিয়োগ করা হয়েছে।

যদিও সরকার ঠিক করেছেন, সেনাবাহিনীতে প্রতি রাজ্য থেকে জনসংখ্যার আনুপাতিক ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হবে, তথাপি ১৯৭৩-৭৪ সালেও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে কম লোক নিয়োগ করা হয়েছে। গত ১৮ই এপ্রিল লোকসভায় শ্রীসমর গুহের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজগজীবন রামও একথা স্বীকার করেন। অবশ্য গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতরের মন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা রাজ্যসভায় বলেন যে, "সশস্ত্র বাহিনীতে লোকনিয়োগের ব্যাপারে সরকার তথাকথিত লড়াকু জাতির লোক

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

রাজ্য	জনসংখ্যা (১৯৬১র লোক গণনা অনুসারে	১৯৬৮র মার্চ থেকে ১৯৭১-এর মার্চ পর্যন্ত মোট নিয়োগ
উঃ প্রদেশ	৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার	২৭,১৩৩ জন
পাঞ্জাব	১ কোটি ১১ লক্ষ ৫০ হাজার	২৬,৩১২ জন
হরিয়ানা	৭৬ লক্ষ	১৪,৮৪১ জন
পশ্চিমবঙ্গ	৩ কোটি ৫০ লক্ষ (প্রায়)	৫,৮৫৫ জন
বিহার	৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯ হাজার	৮,৬৬৪ জন
উড়িষ্যা	১ কোটি ৭৫ লক্ষ	২,১১৬ জন
রাজস্থান	২ কোটি ২ লক্ষ (প্রায়)	১২,০৫২ জন

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

সৎ নাগরিকেরা এবার শুনে সুখী হবেন "১৯৭৫ সালের আপত্তিকর বিষয় প্রকাশ নিরোধক অরডিনান্স" চালু হয়ে গেছে।

আশা করা যায় এবার প্রিসেনসারশিপ উঠে যাবে।

* *

আর একটি বর্ষশেষের সন্দেশ : সঞ্জয় গান্ধী যুব কংগ্রেস জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন।

যুব কংগ্রেসে যোগ্য নেতৃত্বের সমস্যা এবার ঘুচল।

* *

মেডিকেল বুলেটিনে জানা গিয়েছে জয়প্রকাশকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল এবং তিনি প্রাতরাশ হিসেবে দুটি ডিম, আধখানা কমলালেবু, ছোট এক টুকরো রুটি, চিনি ছাড়া কফি গ্রহণ করেছেন।

* *

খবরে প্রকাশ, প্রিয় দাসমুন্সী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্গাদারদের স্বার্থে গ্রামীণ পদযাত্রা শুরু করেছেন। এঁদের অভাব পুরণ করতে বারিদবরণ ও পঙ্কজবাবু দিল্লি গেছেন।

* *

শ্রমিকদের প্রকৃত বন্ধু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

* *

বর্ণ সিংয়ের বিদায়-সম্বর্ধনায় শ্রীমতী গান্ধীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন : "আমার কাছে তিনি শুধু সহকর্মীই নন্—পথ প্রদর্শকও ছিলেন।"

* *

খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রীর মামলায় বিজয়ী অশোক সেন তাঁর নির্বাচনী এলাকায় সফর শুরু করেছেন।

* *

তামিলনাড়ুর দুই কংগ্রেসের মিলনে কামরাজের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হল। কংগ্রেস সভাপতি বরুয়া বলেছেন।

* *

প্রথম প্রেস কনফারেন্সেই যুব কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী অম্বিকা সোনী ঘোষণা করেছেন কয়েক মাসের মধ্যেই ৩৫০.০০০ লক্ষ যুবক-সভা করা হবে।

* *

বিদ্যালয়ের পরিচালন-সমিতিগুলি বাতিল করে আরো অধিক সরকারী প্রতিনিধি নিযুক্ত করার প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সরকারী তরফের এই উৎসাহ অভূতপূর্ব।

* *

সি. পি. এম কেন্দ্রীয় দপ্তরের দিল্লি স্থানান্তরের সংবাদে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, নিছক পাগলের প্রলাপ। মার্কসবাদীরা এবার আশ্বস্ত হবেন। কমরেড জ্যোতি বসুও সুন্দরাইয়ার পদত্যাগের ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন। কমরেডরা এখন আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের কথা চিন্তা করছেন।

* *

মৌলানী ভাসানী বলেছেন : "যে কোনো দেশের মুক্তি সংগ্রাম সে দেশের মানুষের দ্বারাই অর্জিত হয়। বাঙলা দেশেও তাই ঘটেছে। যেমনটি ঘটেছে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং অন্যত্র।"

* *

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সংবিধানের রজত-জয়ন্তী উৎসবে সংবিধানকে লঘু করে দেখার জন্যে বিরোধীদের তিরস্কার করেছেন।

* *

পশ্চিম বাঙলার শিক্ষামন্ত্রী পুনরায় ঘোষণা করেছেন, এখানকার অবাঙালীদের স্বার্থেই বাঙলা ভাষাকে ঐচ্ছিক করার সাধু সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

* *

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র জানাচ্ছেন, শিক্ষিত বেকারের সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে প্রচণ্ড।

* *

তিন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ-গোবিন্দ-আনন্দ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ ও সঞ্জয় গান্ধীর শুভেচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসে এই পরিবর্তন (ব্যাপক ঐক্য) রাজ্য রাজনীতিতে স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি নিয়ে আসবে।

* *

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের পঁয়ষট্টি বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করানোর জন্য অরডিনান্স হবে।

* *

মস্কো থেকে পি. টি. আই-এর খবর : "সোভিয়েতকায়া রাশিয়া পত্রিকায় বলা হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সংঘর্ষের খবর যা চালানো হচ্ছে তা মাওবাদীদের অপপ্রচার।

* *

কলকাতায় বছরে শবদাহের জন্য আট হাজার টন কাঠ লাগে এই কাঠ সংগ্রহের জন্য বত্রিশ লক্ষ বর্গফুট বন কেটে ফেলতে হয়।

* *

"যদিও সঞ্জয় গান্ধীর বয়স আঠাশ তবু তাকে সর্বভারতীয় নেতা বলতে বাধা নেই—"প্রফুল্লকান্তি ঘোষ।

বিদ্যুৎপর্ষদে কূটনীতির খেলা

কলকাতার শুধুমাত্র একটি দৈনিক পত্রিকার ৩০শে নভেম্বরের সংখ্যায় বিদ্যুৎ পর্ষদের একজন চীফ ইঞ্জিনিয়ার সমেত সাতজন পদস্থ ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে—এ সংবাদে বিদ্যুৎ পর্ষদে নিযুক্ত দুর্নীতিপরায়ণ ইঞ্জিনিয়ারদের সম্বন্ধে এতদিনের জল্পনা কল্পনা সাধারণ মানুষের কাছে সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুনরায় ঐ পত্রিকার ৭ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় বিদ্যুৎ পর্ষদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষমতার সংবাদে সকলে বিভ্রান্ত। উক্ত দু দিনের সংবাদই পর্ষদের ইঞ্জিনিয়ার চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীবি. এন. ব্যানার্জীর কাছ থেকে সংগৃহীত। প্রথম দিনের সংবাদে পর্ষদ-প্রশাসন এবং অভিযুক্ত অফিসারদের মধ্যে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কোন উল্লেখ ছিল না, এবং উক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স কমিশন ও পর্ষদের আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষা দপ্তর মারফৎ অভিযোগের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর বলে প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বাদে প্রকাশ ভিজিল্যান্স কমিশনের রিপোর্ট পর্ষদে এখনও পৌঁছায় নি এবং এ রিপোর্ট পর্ষদে পৌঁছালে রাজ্য সরকারের কাছে সব রিপোর্ট পেশ করা হবে। অর্থাৎ দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলেই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পক্ষে সরাসরি একতরফা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব। ঐ দু দিনের প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করলে একটি তথ্যই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—বিদ্যুৎ পর্ষদে এখনও কূটনীতির খেলা চলছে এবং মাননীয় চেয়ারম্যানের বিবৃতি দুটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

রাজ্য সরকারের কাছে বিনীত আবেদন, বিদ্যুৎ পর্ষদের ন্যায় উন্নয়নমূলক সংস্থা থেকে কূটনীতির খেলা দূর করে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীদের তৎপর হতে উৎসাহিত করুন।

চন্দ্রকান্ত সেন
নদীয়া

খাদ্যদপ্তরে একটি নিয়োগ প্রসঙ্গে

খাদ্যমন্ত্রীর অজান্তেই খাদ্য বিভাগে বহু ঘটনা ঘটে চলেছে। বর্তমানের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা একজন দুর্নীতিগ্রস্ত সাব ইন্সপেক্টারকে চীফ ইন্সপেক্টারের পদে বহাল করতে সরকার পরিচালিত ক্যাবিনেট সাব-কমিটি নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবকের চাকুরীর কোন সংস্থান সরকার করতে পারছেন না সেখানে এমন ঘটনা কেন ঘটতে চলেছে বুঝতে পারছি না। আমরা খাদ্য বিভাগের বর্তমান সরকারের স্বীকৃত একটি ইউনিয়ন। ঐ সাব-ইন্সপেক্টারটিও একটি ইউনিয়নের সম্পাদক। এখন দেখা যাচ্ছে ঐ সম্পাদক মহাশয় একটি সুযোগ্য বেকার যুবকের চাকুরী ছিনিয়ে নিচ্ছেন। উনি এখন কর্মচারীদের স্বার্থ ছেড়ে নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

তাই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই ব্যাপারটা তারা যেন পূর্ণ তদন্ত করেন। তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন কর্মচারীদের বিভ্রান্তির পথে ঠেলে না দেন। কারণ, ইতিমধ্যে কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

সাবঅর্ডিনেট ফুড্ এ্যাণ্ড সাপ্লাই
এসোসিয়েশনের কর্মীবৃন্দ

মিতব্যয়ের আবেদন

সম্প্রতি কলকাতায় বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস পালিত হলো। অথচ কম খরচ এবং জিনিসপত্রের অপচয় রোধ করা সম্পর্কে দেশে সরকারী নিয়ম এবং বেসরকারী উদ্যোগ খুবই কম। তাই বড় বড় ডিনার পার্টি বা উৎসবে ইচ্ছাকৃতভাবেই প্লেটে খাবার উচ্ছিষ্ট রাখতে হয় ভদ্রতার খাতিরে। কলকাতার প্রায় শতাধিক সরকারী অফিস কাছারীতে ফ্যান চেয়ার বৈদ্যুতিক বাতির যন্ত্র এবং জল ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্র নষ্ট হচ্ছে, অকেজো হলে ফেলে দেওয়াও হয়।

ঐসব ডাঁই করা পুরানো জিনিস জং ধরে নষ্ট হয়, পচে অথবা গলে। এছাড়া অকেজো ফাইলপত্র খাতা ইত্যাদি নষ্ট হয়। ঐসব পুরনো খাতা ইত্যাদি বিক্রি করলে অনেক লাভ হতে পারে। ঐ টাকা দিয়ে দুঃস্থ কর্মচারীদের উন্নতি করা যায়, এমনকি প্রতিটি বড় দপ্তরের কর্মীকে ভাঙাচোরা পড়ে থাকা জিনিস বিক্রির টাকায় সামান্য দু চার টাকা বোনাস দেওয়াও বিচিত্র নয়।

এই ব্যাপারে হুগলী জেলা বিজ্ঞান ক্লাব সরকারী বেসরকারী সংস্থায় পড়ে থাকা কাগজপত্র কিনে নিয়ে বিক্রয় লব্ধ অর্থ উন্নয়নে ব্যয় করতে আগ্রহী। যোগাযোগ করতে পারেন।

সাজেদুল হক চৌধুরী
সম্পাদক হুগলী বিজ্ঞান ক্লাব
১৫ ধর্মতলা স্ট্রীট, প্রথমতল,
কলিকাতা-১৩

বঞ্চনা ?

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগের নীতি বরাবরের মত ত্যাগ করেছেন।"

বিভিন্ন রাজ্যে সান্স্ অফ দি সয়েলের শ্লোগান উঠেছে। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র সরকার শিবসেনার দাবী অনুযায়ী শতকরা আশিটি চাকরী রাজ্যের বেকারদের জন্য সংরক্ষিত রাখার নিয়ম চালু করেছেন, অন্ধ্র প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী শ্রীলক্ষ্মণ দাস অন্ধ্রে কর্ণাটকের মতই রাজ্যের বেকারদের অগ্রাধিকারের নিয়ম চালু করার কথা ভেবেছেন। এ রাজ্যেও বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি এবং বিশেষ করে আনন্দবাজার বেকার সমস্যার নামে উগ্র প্রাদেশিকতার জিগির তুলেছে। অবাঙালী শ্রমিকেরা এখান থেকে কত টাকা মাসে মনিঅর্ডার করেন তা তাঁদের রিপোর্টাররা খুঁটিয়ে লেখেন, কিন্তু বেকারীর বিরোধী যুব-ছাত্র সমাবেশের রিপোর্ট এক কলমও লেখেন না।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষান্মাষিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা :
৬১, মট লেন, কলি-১৩

ই এস আই স্কীম সম্পর্কে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

া না। অথচ কোন্ ঔষধ আছে নেই সে বিষয়ে কোন নোটিশ নো থাকে না। তার ফলে বৃষ্টিতে ভিজে লাইন দিয়ে ক্রিপসন হাতে যখন কাউণ্টা- সামনে পৌঁছান যায় তখন ক জানান হয় যে ঔষধ বাড়ন্ত। স রুগীকে বেশ কয়েকদিন ছাড়াই কাটাতে হয় এবং সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন যেতে হয় প্যানেল ডাক্তারের খিচুনি শুনতে। এ যে কি নি ভুক্তভোগী ছাড়া আর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়।

একজন কর্মী দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—নামকরা বা বাজারে চালু এমন কোন ঔষধ পাবার অধিকার আমাদের নেই। আর একটি গুরুতর অভিযোগ পেলাম সিক বেনিফিট সম্পর্কে। এই সিকনেস বেনিফিট পেতে হলে কর্মীদের ডি ম পাওনা অর্থাৎ অর্ধেক বাদ যায় যার কারণ এই । ফলে কোন কর্মী অসু- স্থতার জন্য ছুটি নিলে তার প্রথম দু'দিনের টাকা অর্থাৎ সিকনেস বেনিফিট মার যায়। ফলে অসুস্থ হলেও টাকা মার যাবার ভয়ে কোন কর্মী আর ছুটি নিতে সাহস পান না।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের প্রেস-ক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ পাওয়া যায় না বলেও অনেকে অভি-যোগ করেন। তারা বাইরে থেকে ঔষধ কিনতে কার্যত বাধ্য হন। তার দাম পাওয়া যায় না।

দুর্ঘটনা জনিত কারণ সম্পর্কেও গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রতি বৎসর এই স্কীমের আওতাভুক্ত কল কারখানায় প্রায় লক্ষাধিক কর্মী দুর্ঘটনার শিকার হন। কিন্তু মেডিকেল বোর্ডের বিচারে শতকরা দু'জন কর্মী ক্ষতিপূরণ পান। এ ছাড়া লক-আউট লে-অফ ক্লোজার তো আছেই, কিন্তু এরজন্য কর্মীরা ই এস আই-এর তরফ থেকে কোন সুবিধা পান না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মর্মান্তিক সংবাদ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ন কাজ করছিল, কিন্তু দিনে দিনে যে জলভর্তি প্রাচীরটির রুদ্ধ কমে আসছিল সেদিকে কেউ লক্ষ্য রাখেন নি। এ াড়া জলের চাপও পরীক্ষা করা হয়নি। অন্যদিকে এবারে উৎপাদন বাড়াবার জন্য নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন একজন খনি-বিশেষজ্ঞ; সেই কর্মকাণ্ডের আকস্মিক ফলশ্রুতি এই দুর্ঘটনা।

খনিবন্দীদের দুর্ভাগ্যপীড়িত পরিজনদের জন্য চারদিক থেকে এখন সাহায্য আর সমবেদনা আসছে। তবু তাদের শোকার্ত মুখের রূপ বদলায় নি। এই দুর্ঘটনা দিয়েই ওদের আরেক জীবনের যাত্রা শুরু।

স্বদেশে পরবাসে

ফাল্গুনী বসু

ভীরুতা ভীষণ ঠাণ্ডা, তার কাছে বরফও গরম।
আমরা সবাই সেই ভয় নিয়ে কোমর অবধি
জমে আছি দই হয়ে, অন্তরীণে রেফ্রিজারেটারে।
পেছনে ব্যাধের তীর, হরিণের মতো ছুটে ফিরি;
শহর অরণ্য নয়, এ শহরে কোথায় লুকাই।
আকাশে চাঁদের মুখ মনে হয় লক্ষ শিয়াল;
কেঁচো হয়ে গর্ত খুঁড়ি, তবু দাগ মাটির উপর
থেকে যায়। যেখানেই যাই দেখি ফণা-তোলা সাপ।

হাসি-কান্না ভুলে গেছি। জিয়ল মাছের মতো বন্দী
হয়ে বাজারে ডালায়, কেঁপে উঠি কী করে কী হয়;
সারা বুক কুরে খায় ভয় ভয় শুধু এক ভয়।

ভয়েতে মরিয়া হয়ে মনে হয় ভেঙে ফেলি ভয়॥

এই স্কীমের টাকা ব্যয় নিয়েও নানা মহলে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। তবে কোন কোন মহলের ধারণা যে ই এস আই-এর দৌলতে কিছু অসাধু ব্যক্তি বেশ দু পয়সা কামিয়ে নিচ্ছেন। আগের হিসেবে দেখা যায় যে, এই স্কীম বছরে এক কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা পেত স্কীমের আওতাভুক্ত শ্রমিক এবং মালিকদের কাছ থেকে। যার শতকরা তিরিশ ভাগ মাত্র দেয়া হয় ক্যাশ বেনিফিট। তাহলে বাকি টাকা কি হয়? এ সম্পর্কে অভিযোগ যে হিসাব খতিয়ে দেখলে অনেক কারচুপি ধরা পড়বে। মালিকপক্ষের কাছ থেকে ই এস আই বাবদ পাওনা কয়েক কোটি টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এ সম্পর্কে প্রশ্ন: মালিকদের বিরুদ্ধে আইন সম্মত বিধিব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন? এই অনাদায়ী টাকার একটা অংশ শ্রমিকদের বেতন থেকে কেটে নেয়া হয়েছে। এই কেটে নেয়া টাকা না জমা দেওয়ায় যে সমস্ত কর্মচারীরা মেডিকেল বেনিফিট পাননি তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি?

তিরিশে নভেম্বরের আদেশ বলে এই স্কীমের কর্মী সংখ্যাই শুধু বাড়েনি, স্কীমের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন থেকে শ্রমিকরাই শুধু এই স্কীমের সুযোগ পাবেন না, পাবেন অফিসের কেরানী সহ কর্মীর দলও।

অফিসের কর্মীরা এই স্কীমের আওতায় পড়ে নানারকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদের চাকুরীতে দেহে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এতদিন এই সব সংস্থার কর্মীরা অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং ভাতা পেতেন, কিন্তু এই স্কীমের আওতায় পড়ে আর্থিক ক্ষতির মাত্রা তাদের বেড়ে গেল কারণ তাদের বক্তব্য যে এই স্কীম থেকে কোনরকম বেনিফিট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাঁরা এই বাবদ কেটে নেওয়া টাকাকে "অর্থকরী দণ্ড" বলে উল্লেখ করেছেন। কোন কোন কর্মী আবার অন্যান্য রাজ্যে প্রচলিত ই এস আই স্কীমে নতুন ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেন ঐ সব রাজ্যে কর্মচারীদের অযথা হয়রানি ভোগ করতে হয় না।

ই এস আই হাসপাতালের জনৈক ডাক্তার মন্তব্য করেন যে, প্যানেল ডাক্তাররা পয়সার জন্য রুগীকে আটকে রাখেন কারণ যত-বার তিনি রুগীকে দেখছেন ততবারই পয়সা পাবেন। জনৈক রোগী অভিযোগ করে বলেন যে, হাস-পাতালে দেখাবার জন্য ফরোয়ার্ড করাতে হলে ডাক্তারদের পয়সা দিতে হয়। কত দিতে হয় প্রশ্ন করা হলে উত্তর পাওয়া যায় কম করে পঁচিশ টাকা তো বটেই।

আর একটি বিষয়ে কর্মীদের মনে ক্ষোভ রয়েছে। বিষয়টি হল নো ক্লেম রিবেট। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কিছু করেননি। এই বিষয়টির মর্মার্থ হল যে যারা এই স্কীমের অন্তর্ভুক্ত হয়েও কোন সুযোগ নেন না তাদের নো ক্লেম রিবেট পাওয়ার দাবী একেবারেই উপেক্ষা করা যায় না। এ বিষয়ে সরকারের বিবেচনা করা দরকার কারণ দেখা গেছে এই স্কীমের আওতাভুক্ত বহু কর্মচারী এই স্কীম থেকে কোন সুযোগ নেন না কিন্তু অর্থ জুগিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই।

এই স্কীমের শুভ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কর্মচারীদের মধ্যে কোন বৈরী মনোভাব নেই। তাদের অভিযোগ হল এই কীমের ব্যর্থতা, অপপ্রয়োগ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

এই স্কীমভুক্ত সকল কর্মীর মুখে একটাই মাত্র কথা—"যাদের মাইনে থেকে কেটে নেয়া টাকায় এই স্কীম চলছে তাদের এবং তাদের পরি-বারের কল্যাণে এই স্কীম প্রযুক্ত হচ্ছে না।" অবিলম্বে এই সব অভিযোগ খতিয়ে দেখা দরকার বলেই আমাদের ধারণা।

বিড়লাদের স্কুলে সাম্প্রদায়িকতা

(দর্পণের প্রতিনিধি)

আপনি যদি ধর্মে মুসলমান হন তাহলে ভারতের রাষ্ট্রপতি হতেও আপনার বাধা নেই কারণ আমাদের দেশ একটি বহুঘোষিত সেক্যুলার রাষ্ট্র। বাধা শুধু একটি জায়গায়। আপনি যদি মুস্লিম্ পরিবারে জন্মান আর কলকাতার হিন্দী হাই স্কুলে (ইংলিশ-মিডিয়াম) পড়াশোনা করতে চান তাহলে সে গুড়ে বালি। কারণ হিন্দী হাই স্কুলে মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা হয় না, মুস্লিম পরবে ছুটি দেওয়া হয় না, এমন কি মুসলমান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীও সেখানে নেই। ময়রা স্ট্রীটে অব-স্থিত হিন্দী হাই স্কুল বিড়লা গোষ্ঠীর মালিকানায় পরিচালিত।

প্রেস ক্লাব সংবাদ

কলকাতার প্রেস ক্লাবে বসে আপনি কলকাতা, বোম্বে, দিল্লী মায় লণ্ডন ফ্লীট্ স্ট্রীট থেকে ছাপা দৈনিক, সাপ্তাহিক পড়তে পাবেন, পাবেন না শুধু কলকাতার সুতার-কিন স্ট্রীটের আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পত্র-পত্রিকা। এর রহস্য উৎঘাটন করতে পারেন এমন শার্লক হোমস সাংবাদিক কেউ আছেন কি?

সারমেয় সংবাদ

অথ সারমেয় কথা। কলকাতা কেনেল ক্লাব ময়দান তাঁবুতে বাৎ-সরিক সারমেয় প্রদর্শনী শেষ হল গত সপ্তাহে। কলকাতা শুধু ক্যালকেশিয়ানদেরই নয়, এলসে-শিয়ানদেরও। অন্নদাশঙ্কর উবাচ:

"মানুষের মধ্যে ক্যালকেশিয়ান,
কুকুরের মধ্যে এলসেসিয়ান"

এলসেসিয়ান ছাড়াও অনেক নামী দামী কুকুর আসে প্রদর্শনীতে। ধরুণ, সেণ্ট বার্নাডের কথাই।

বিদেশ থেকে আনা হয়। দাম পড়ে ১০ হাজার। তাছাড়া কল-কাতায় এনে এয়ার কনডিশন্ ঘরে রাখতে হয়। কারণ ট্রপিকাল কান্ট্রিতে এনাদের কষ্ট হয়। ডিজেটান ম্যাস্টিফ্, বুল টেরিয়ার, বুল ডগ (চার্চিলের কথা মনে পড়ে) ফক্স টেরিয়ার, সিড্নী সিল্কী, ফ্রেঞ্চ পুড্ল, স্কটিশ টেরিয়ার, আইরিশ হাউণ্ড, লাসা, ক্যুলি, ভবারমান পিন্চার, ডেশাউণ্ড, বক্সার—এ সব হচ্ছে উচ্চ-কুলোদ্ভব সারমেয় যা হাই-সোসাইটিওয়ালারা তা দের ষ্ট্যাটাস সিম্বলের জন্য পুষে থাকেন। খরচ যা হয় কুকুর প্রতি তাতে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসের খরচা উঠে আসবে।

আয়কর বিভাগ টেলিফোন আছে এমন ব্যক্তি মাত্রকেই পত্রা-ঘাত করছেন। সারমেয় পুষছেন এমন কর্তাব্যক্তিদের নামের ফর্দ তৈরী করে তল্লাসী চালালে ডগ বিস্কুটের সঙ্গে গোল্ড বিস্কুটও হয়ত পেয়ে যেতে পারেন।

ফিলিপাইন

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

কার আবার গ্রেপ্তার করে কামা-শোকে। কামাশোর মুক্তি দাবি করে মাদ্রিদ, বার্সিলোনা থেকে শুরু করে সমস্ত স্পেনে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। ১২ই ডিসেম্বরের খবর ধাতু শ্রমিকরা কামাশোর মুক্তির দাবিতে পর পর তিন দিন ধর্মঘট করেছেন। অবশেষে, কার্লোসের আদালত ১২ই ডিসেম্বর কামাশোকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কামাশোর মুক্তি লাভের ঘটনা স্পেনের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে একটা বিরাট জয়। আজ সমগ্র দেশ এক নতুন বিপ্লবী পরিস্থিতির জন্য তৈরী হচ্ছে।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAI

যাত্রা সম্মেলনের শেষ কয়েকদিন

প্রভাতকুমার দাস

শিল্পীতীর্থের বিবি আনন্দময়ী ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পালা, নির্দেশনা অরুণরায়ের। এই পালাটির সুর রচনা শ্যামল মিত্রের সম্ভবতঃ সেটাই এই পালার বিশেষ আকর্ষণ, অন্ততঃ শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত এবং গুরুদাস ধাড়া যেখানে যুগল গায়ক গায়িকা। পূর্ণ মণ্ডপে শ্রীমতী দত্তের অভিনয় দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মত উপভোগ করেছেন। আনন্দময়ী (জ্যোৎস্না দত্ত) ছিলেন হিন্দুর ঘরের বিধবা, জমিদার রবিশঙ্কর (অসীমকুমার) চক্রান্ত করে তাকে নিজের বশে আনতে চান, কিন্তু গৃহ পরিত্যক্তা আনন্দময়ী বৈষ্ণব সাধক মতুজের (গুরুদাস ধাড়া) সান্নিধ্যে এসে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পান। ছাপাঘাটির জায়গীরদার রহিম খাঁ (ভোলা পাল), তাঁর ভাই শামিম খাঁ (কুমার ইন্দ্রজিৎ) এবং মীনা বেগমের (সীমা বসু) উপ কাহিনীটি দর্শকের মনে একটা ভিন্ন অনুভূতি জাগায়। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে শায়েস্তা খাঁ (মনোজ বিশ্বাস), কাদের বক্স (প্রসেনজিৎ চৌধুরী), লীলাবতী (শ্রীমতী নন্দী), ভ্রুবং উষাশশির (ভারতী সিং অভিনয় প্রশংসাযোগ্য।

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ বিয়োগ মোহন অপেরার একটি বহু বিজ্ঞাপিত কীর্তি। নির্দেশক মোহন চট্টোপাধ্যায় নিজেই একটি নতুন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি সার্কাসের রিং মাস্টার যোশেফের চরিত্রটিকে অগাধ মমতা দিয়ে চিত্রিত করতে পেরেছেন। তাঁর বিপরীতে মিতা চ্যাটার্জীর (ব্যভিচারিণী) গান এবং অভিনয় বেশ জীবন্ত। একটি খল চরিত্রে (বেণী ঘোষাল) নীতিশ স্যান্যাল প্রমাণ করতে পেরেছেন যাত্রাজগতে নতুন হয়েও তিনি প্রতিভাবান। সুনীল কাপাদায় (নেপাল) এবং সন্ন্যাসীর মুখার্জী (ব্রজলাল) দুটি ভিন্নধর্মী কৌতুক চরিত্রে সার্থকতার সংগে অভিনয় করেছেন। আনন্দময় (কমল), রাজেন সাহা (হরেকৃষ্ণ), নিতাই দাস (গজেশ), কনকলতা (চম্পা) প্রত্যেকেই যে যার নিজ নিজ চরিত্রগুলিকে বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। পালার গানগুলি কথা ও সুর প্রশান্ত ভট্টাচার্যের, শ্যামাপ্রসাদ গেয়েছেন ভাল। কিন্তু গানের সংখ্যা একটু কম হলে হয়ত পালাটি আরও গতিশীল হতে পারত।

উৎপল দত্ত রচিত এবং পরিচালিত এবছরের পালার সংখ্যা মাত্র এক, এবং সেটি পরিবেশন করলেন লোকনাট্য। পালাটির নাম সীমান্ত। সমীর মজুমদার এই পালার সহ পরিচালক, সুরকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য। পালাটির বিষয় আফগানিস্থানের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কিন্তু পালাটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দলগত অভিনয়। গানের সংখ্যা একেবারেই কমিয়ে এনে উৎপল দত্ত সম্ভবতঃ একটা নবতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। শিবদাস মুখার্জীর সুজা এ বছরের একটা শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না। চরিত্রটার ভেতরের যেদনা দুঃখ ও বিষণ্ণতা তার বাইরের সহজলভ্য বীরত্বের পাশে প্রতিমুহূর্তের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তার প্রকাশ বড়ই কৌশলপূর্ণ। অনাদি চক্রবর্ত্তীর আকবর অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বীরত্বপূর্ণ। তাঁর প্রতিভা সহজেই দর্শকদের চোখে পড়ে। আর এ পালার একটা বিশেষ সাফল্য ব্রিটীশ কন্যা ইসাবেলের চরিত্রে বর্ণালী ব্যানার্জীর অভিনয়। নিরঞ্জন ঘোষ (এলফিনস্টোন), অনুপকুমার (ম্যাকনটন) গৌতম সাধুখাঁ (বার্নস), বেলা সরকারের (জহরৎ বেগম) অভিনয় অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং প্রাণবন্ত।

হাওয়ার্ড ফাষ্ট-এর স্পার্টকাস অবলম্বনে তরুণ অপেরার 'ক্রীতদাস' এবারের সম্মেলনের মর্যাদা বাড়িয়েছে। শম্ভু বাগ রচিত এই পালায় যাত্রাভিনয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব শান্তিগোপালের চিত্তাকর্ষক অভিনয়ই শুধু নয়, বিষয়ের বলিষ্ঠতায় এবং তার সময়োত্তীর্ণ আবেদনে পালাটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের ছয় হাজার দর্শকের মন ভরিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক এবং প্রত্যক্ষ সমাজ সচেতন পালার ক্ষেত্রে তরুণ অপেরার যে অবদান তা সমৃদ্ধতর রূপ নিয়েছে ক্রীতদাস পালায়। শান্তিগোপালের নির্দেশনার পটুত্বে সাধন চ্যাটার্জী (ক্রাসাস), সত্যব্রত মুখার্জী (সিসেরো), নরেন দে (প্রাকাস), অমর ভট্টাচার্য (স্রাবা), মিতা তালুকদার (ভেরেনিয়া), সোনালী গোস্বামী (জুলিয়া) প্রমুখ সব কলাকুশলীর অভিনয়ই যাত্রার প্যাটার্ণকে অক্ষুণ্ণ রেখে শিল্পোত্তীর্ণ।

সত্যম্বর অপেরার 'একদিন রাত্রে' পালাটি এ বছর যাত্রা আসরে নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরব্য উপন্যাসের কাহিনী যথাযথ উপস্থাপিত করতে গেলে যে ত্রুটিমুক্ত আঙ্গিক রচনার দরকার তা এতে স্পষ্ট। যেমন রূপসজ্জা নাচ এবং গান। এর সবগুলিই যথাযথ ভাবে একদিন রাত্রে পালায় উপস্থিত। ছন্দা চ্যাটার্জীর অভিনয় চমৎকার। এ ছাড়া নবকুমারের অভিনয় যথাযথ ভাবে রূপায়িত।

উৎসবের শেষ দিনে শিব ভট্টাচার্য, শম্ভু ঘোষ, অমিয় ভট্টাচার্য, নন্দ রায়চৌধুরী, সুহৃদ রুদ্র যাত্রা জগতের এই পাঁচজন কলাকুশলী ও গুভানুধ্যায়ীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

লেখকের কথা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

শুধুই শব্দের খেলা, বেলফুল টাকার দালালি ?
দিন কি এভাবে যাবে এ রকম মেয়েলি জ্যোৎস্নায়
এই শুধু চলবে আজ মোলায়েম চুমু চালাচালি
সঙ্গে ফুলনদীপাখি—ন্যাকামার্কা হিজড়ে কবিতায় ?

রৌদ্রের মুখোশ নেই সূর্য তো রাখে না সানগ্লাস।
কবিরা ফ্রিজ-এর মধ্যে খণ্ড টুকরো ইলিশের মতো
আঁশের পোশাক পরে নিজেদের স্পোরেট ক্লাস
নিজেরা মেনটেন্ করে বেশ্যাদের বারমাস্যা ব্রত।

চোয়াড়ে চোয়াল কব্জি রগশিরা হাড়ের কাঠামো
হাতে-কাচা ধুতি শার্ট দড়ি বাঁধা বিছানা বালিশ
নিয়ে ঘোরা যাযাবর ছিলেন লেখক বাঙলায়
গদ্যে গল্পে কবিতায় যাবতীয় দূর্ত ধাষ্টামো
থাবড়ে ভেঙে, ছেঁচে ফেলে সাহিত্যের শৌখিন পালিশ
মানিক আছেন আজো, মৃত্যুহীন যাঁকে বলা যায়॥

সাম্প্রতিক কয়েকটি নাটক

(দর্পণের সমালোচক)

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে যা কিছু কথা, যা কিছু আবেগ তার মধ্যে যে বড় রকমের ফাঁক ও ফাঁকি থেকে যায় তার হিসেব নিতে গেলে আমাদের জীর্ণ হৃদয়ের যে আত্মোন্মোচন ঘটে তাকে যারা মেনে নিতে পারবেন না তাদের জন্য সুন্দরমেয় 'পরবাস' নাটক নয়। যারা শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী হিংসা প্রক্ষেপণের মাধ্যমে একজন নিরাশ্রয় মানুষের অসহায়ত্বের বেদনাকে আড়াল করতে চাইবেন তারা প্রযোজনাটিকে ঝটুক্তির কালিমা দিয়ে পরোক্ষে হয়তো শ্রেণী চেতনারও সুপাত করতে পারেন এই। আশঙ্কা ও আতঙ্কের ঝুঁকিতেই সুন্দরম একজন আশ্রয়চ্যুত ভাড়াটেকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর কৌতুকের যোড়কে ফাঁপা ভালবাসার খেলা খেলতে খেলতে দর্শকের হৃদয়ের দুরান্তিক গভীরতাকে জড়িয়ে তাদেরই হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে যে আঘাত করে বসলেন, তার মেজাজে অবশ্যই যাতন্ত্র্য আছে।

নাটকের সার্থক রূপায়ণে নাট্যকার নির্দেশক কেন্দ্রীয় অভিনেতা মনোজ মিত্রের যে অবদান এবং স্বার্থকতা তা আজকের মঞ্চে অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কলাকুশলীর চাইতে যে কম নয়, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন। নাটকের সংলাপ রচনায় মনোজবাবুর মাত্রাজ্ঞান বহুবার প্রমাণিত। এ নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে ভালো নাটকের সব কিছুই ভালো হক, সবাই চাইবেন—সেদিক থেকে বেলা সরকারের সাফল্য ছাড়া অন্য সকলেরই যথেষ্ট অনুশীলনের প্রয়োজন। বিশেষ করে দাদু চরিত্রে দুলাল ঘোষের প্যাটার্নটাই বদলানো দরকার বলে মনে হয়। মঞ্চকৃতি সুপরিকল্পিত (শঙ্কর প্রসাদ)। আবহ সুরে স্পষ্ট বোঝা যায় জগন্নাথ বসু নাটকের অন্তর্গীন সুরটিকে ধরতে পেরেছেন, তবে বিরতির পূর্বে ব্যবহৃতটি সুরমূর্চ্ছনাটি একটু শ্রুতিকটু এবং নাট্যমুহূর্ত বিরোধী বলে মনে হয়। ত্রুটি সংশোধনের সামান্য আব্দার নিয়েই বলছি এ নাটকের বহুল অভিনয় প্রয়োজন।

ছেঁড়াতার : অন্বেষক

একটি বহুল অভিনীত এবং বহু পরিচিত পুরোনো নাটক তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়াতার অন্বেষক নতুন উদ্যমে অভিনয় করলেও তার আবেদন যে আজকের দিনে আজও প্রত্যক্ষ, বোধকরি সেই বিশ্বাসেই এই নাটক নির্বাচন। নির্বাচন সুচিন্তিত, কিন্তু প্রযোজনা সুনিয়ন্ত্রিত নয়। পূর্ববঙ্গের রংপুর জেলার কথ্য ভাষাবলম্বী নাটক যে দাপ্তসঙ্গে অভিনয় করা প্রয়োজন, অভাব আছে যথেষ্টই, তবে যকের পূর্ববর্তী প্রযোজনার তুলনায় এ প্রযোজনা পরিণত নেই।

নাটকের অন্তর্বস্তু এবং রূপায়ণের বহুমুখী সমস্যা ও সত্বেও অন্বেষক যে এ নিয়েছেন, তাতে সাহস নিশ্চয় রয়েছে। রহিম হাকিমুদ্দি এবং মহিমের তিনটে ডাইমেশন যে মঞ্চে রয়েছে, তার সার্থক ব্যবহার হয়নি। তাছাড়া মহিমের ভগ্নাংশটুকু নির্দেশনা ও উপস্থাপনের ত্রুটিতে আবশ্যিক মনে হয় না। তড়িৎ চৌধুরীর পরিণত মঞ্চকৃতির তুলনায় প্রযোজনাটি ম্লান, যদিও শ্রীচৌধুরী গীত প্রযোগে নাট্যমুডের কম। আশা করি প্রযোজনা শাণিত করার জন্য নির্দেশক দত্ত পরিশ্রমের মাত্রাটা বাড়াবেন।

রূপদক্ষের পঞ্চদশ বর্ষ পু

গত এগারোই নভেম্বর রূপদক্ষের পঞ্চদশ বর্ষ পুর্ত্তি উৎসঐ দিনই গান আবৃত্তি 'অরুণোদয়ের পথে' নাটকটি অনয়ের মাধ্যমে সংস্থার জন্মা পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠা আবৃত্তিতে কিরণ লাহিড়ী (সুক ভট্টাচার্য: প্রাগৈতিহাসিক) এ গানে গৌতম মুখোপাধ্যায় শ্রোতাদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আ করেন। এ ছাড়া রাজেশ্বর ভ চার্য ও তার সহশিল্পীরা সংগীত প বেশন করেছেন। অনুষ্ঠানটি অ সন্দেহ নেই।

সবশেষে সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে' নাটকটি তড়িৎ চৌধুরীর নির্দেশনায় সাফল্যের অভিনীত হয়।

ভাল ছাপার জন্য
মডার্ন ইণ্ডি
প্রেস
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কে
কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৪১৯৪৩

সম্পাদক—হীরেন বসু
সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত